প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪১শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৮
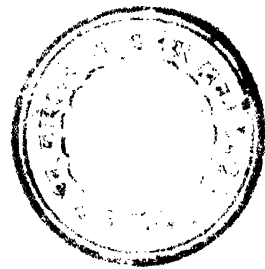
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

ঝড়ের মাঝে
শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৮

১ম সংখ্যা

পথের শেষে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে,
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।

আজ সব কথা
মনে হয় শুধু মুখরতা।
তা'রা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন।
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ জানি না তো শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু মাঝে।

প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা মাঝে
মর্ত্য জীবনের কাজে!
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে, যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো॥

উদয়ন
১৯ জানুয়ারি, ১৯৪১
সকাল

গিরি-নিবাস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিত্রা।—

মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটীর ;—
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে,
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে

ছায়াপুঞ্জ তার। শৈল-শৃঙ্গ অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয় ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্র হিম রেখাঙ্কিত মহা নিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।
গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ী ছুটে চলে থেকে থেকে
পার্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে,
রেখা রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানা রঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগ-যুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা।

উদয়ন
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১
বিকাল

আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাষ্টারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[গত পূজোর ছুটিতে পূজনীয় গুরুদেব যখন অসুস্থ হয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে—তখন তাঁর শুশ্রূষার কাজে আমরা অনেকেই সেখানে ছিলাম। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ প্রতিদিন দু'বেলা এসে গুরুদেবের খবর নিয়ে যেতেন। যেদিন গুরুদেবের অবস্থা একটু ভালোর দিকে মনে হোতো, সেদিন সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যেতো, আমাদের সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠতো। ঐ রকম সময়ে অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে বসে নানা গল্পগুজব করে যেতেন। এক দিন খুব সাহস করে তাঁর কাছে শিল্পপ্রসঙ্গে কথা পাড়তে তিনি খুব প্রফুল্ল মনেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন—তাঁর নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলে। ক্রমে এরূপ গল্পই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো—অবনীন্দ্রনাথও আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আসর জমিয়ে বসলেন। তাঁকে চিনতাম ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু এতদিনে তাঁকে জানলাম। তাঁর শিল্পজীবন সম্বন্ধে তিনি আমাকে যা গল্প করেছিলেন—যথাসাধ্য তা কলমে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে দেশী আর্টের নবজীবন যিনি প্রবর্ত্তন করেছেন—তাঁর নিজের মুখে বলা সেই প্রথম প্রয়াসের ইতিহাসের মূল্য খুব বেশী বলেই প্রকাশ করতে সাহসী হলাম। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী অন্য কারো রচনায় ব্যক্ত করা অসম্ভব মনে করি—তবুও যতদূর সম্ভব তাঁর নিজের কাহিনী তাঁরই বলার ভাষায় রাখতে চেষ্টা করেছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে—সমস্ত প্রবন্ধটি তিনি নিজে যত্ন করে ধৈর্য্য ধরে পড়েছেন ও প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীরাণী চন্দ]

ছবি আঁকা শিখতে ক'দিন লাগে? বেশি দিন না, ছয় মাস, আমি শিখিয়েছিও তাই। ছয় মাসে আমি আর্টিষ্ট তৈরি করে দিয়েছি। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরই মধ্যে যাদের হবার হয়ে যায়—আর যাদের না হবে, তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, মানি যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে একটা নির্দ্ধারিত সময় লাগে—তার পরে, ব্যস্, এইবারে উড়ে যাও, হাঁসের বাচ্চা হও তো, জলে ভাস। ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাষ্টার মশায় তার ভুল ঠিক করে দেবেন কি? তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাষ্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারিতে নুন বেশি হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না কর; পায়েসে মিষ্টি কম হয়, মিষ্টি আরও দাও। ছবিতেও ভুল হয়—ফেলে দিয়ে আবার নতুন ছবি আঁক। বারে বারে একই সব্জেক্ট্ (subject) আঁক—আমি হ'লে ত তাই করাতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে দিয়ে জোড়াতাড়া দেওয়া, ও কি রকম শেখানো? দরকার হয়—আর একটু নুন—তা দিতে পার। দরকার হয় একটু চিনির—তাও দিতে পার। কিন্তু গাছের ডালটা এমনি হবে—পা টা এমনি করে আঁকতে হবে, এ রকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলাল ওদের অমনি করেই শিখিয়েছি। তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয় যে, "এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।"

এই কথাই বলেছিলেন রবিকাকা, আমার লেখার বেলায়। এক দিন আমায় উনি বললেন, "তুমি লেখ না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখ।" আমি ভাবলুম, বাপ্‌রে লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন-কালেও হবে না। তা আবার আমি লিখব কি করে? উনি বললেন, তুমি লেখই না; ভাষায় কিছু দোষ হয়—আমিই ত আছি। সেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম। এক দিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম্ শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন—আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন; শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃততে। কথাটা কাটতে গিয়ে—'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ; সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লিখবার ক্ষমতা আছে। এত যে ইগ্‌নোরেন্সের (ignoranceএর) ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় স্ফূর্ত্তি হ'ল, নিজের ওপর মস্ত বিশ্বাস এলো। তার পর পটাপট্ করে লিখে যেতে লাগলুম। ক্ষীরের পুতুল— ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন, "ভয় কি, আমি ত আছি"—সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।

কিন্তু আমার ছবির বেলায় তা হয় নি। failure— one after another (ক্রমাগত অকৃতকার্য্যতা) তাই তো এদের বলি—শেখা জিনিসটা কি? কিছুই না। কেবলই মনে হবে কিছুই হ'ল না। আমার সেই দুঃখের কথাটাই বলি। শেখা—ওকি সহজ জিনিস? কী কষ্ট করে যে আমি ছবি আঁকা শিখেছি—তোমাদের মতন নয় —দিব্যি আরামের ঘর, কয়েক ঘণ্টা গিয়ে বসলেম, কিছু করলেম, মাষ্টার মশায় এসে ভুলটুল শুধ্‌রে দিয়ে গেলেন। আর্টিষ্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনও বছরের পর বছর শেখা-ই চলছে। প্রথম আমার ইচ্ছে হ'ল ইউরোপীয়ান আর্ট শিখতে হবে, তখন ইণ্ডিয়ান আর্টের নামও জানতো না কেউ। এক জন ইউরোপীয়ানকে ধরলুম, নাম তাঁর ও গিলার্দি (O. Gillardi), আর্ট ইস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল। ছবি লেখার হাতে খড়ি হ'ল সেই ইটালিয়ান মাষ্টারের কাছে। কিছু দিন যায়, দেখি তাঁর কাছে হাতে খড়ির পর বিদ্যে আর এগোয় না। আর এক জন ইংরেজের, (C. L. Palmar এর) কাছে যাই—পয়সা খরচ করে মডেল আনি—মানুষ আঁকতে শিখি। ওঁদের আর্টের তৈল চিত্র (oil painting) টেক্‌নিকটা ত শিখলাম। তখন এক দিন সাহেব মাষ্টার একটা মডেলের কোমর পর্যন্ত আঁকতে দিল—বললে এক সিটিঙে দুই ঘণ্টার মধ্যে ছবিখানা শেষ করতে হবে। দিলুম শেষ করে; সাহেব বললেন passed with credit (প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ)। আমি বললুম, তা ত হ'ল, এখন আমি করব কি? সাহেব বললেন, আমার যা শেখাবার তা আমি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে তোমার এনাটমি study (অনুশীলন) দরকার—এই বলে একটি মড়ার মাথা আঁকতে দিলেন। সেটা দেখেই আমার মনে হ'ল যেন কি একটা রোগের বীজ আমার দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। সাহেবকে বললুম আমার যেন কী রকম মনে হচ্ছে। সাহেব বললেন, no, you must do it (না, তোমাকে এটা করতেই হবে)। সারাক্ষণ গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। কোনো রকমে শেষ করে দিয়ে ১০৩° ডিগ্রি জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলুম যখন—তখন বেহুঁস।

সন্ধ্যেবেলা জ্ঞান হ'তে দেখি ঘরের বাতিগুলো নিবন্ত প্রদীপের মতো মিটমিট করছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল—মাকে মড়ার মাথার ঘটনা বললুম। মা তখনকার মতো ছবি আঁকা আমার বন্ধ করে দিলেন, বললেন, কাজ নেই আর ছবি আঁকার। তখন আমার কিছুকালের জন্য ছবি আঁকা বন্ধ ছিল। বয়স ২০।২১ বছর হবে। তার পরে এক জন ফ্রেঞ্চ পড়াবার মাস্টার এলেন আমাদের জন্য, নাম তাঁর Hamargren (হামারগ্রেন)। রামমোহন রায়ের নাম শুনে তাঁর দেশ নরওয়ে থেকে হেঁটে এদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে একটু একটু ফ্রেঞ্চ পড়তুম, তিনি খুব ভালো পড়াতেন। কিন্তু পড়ার সময়ে খাতার মার্জিনে তাঁর নাক মুখের ছবিই আঁকতুম বসে বসে। তাই আর আমার ফ্রেঞ্চ পড়া এগুলো না। এদেশেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পরে আমার খাতার সেই নোটগুলো দেখে পরে তাঁর ছবি আঁকি। বহুদিন পরে সেদিন রবিকাকা বললেন যে নরওয়েতে তাঁর মিউজিয়ম হচ্ছে, যদি তোমার কাছে তাঁর ছবি থাকে তবে তারা চাচ্ছে। তাঁর চেহারা কারুও কাছে ছিল না। আমি পুরাতন বাক্স খুঁজে সেই ছবি বের করে পাঠাই। বেশ নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন খুব খুশী হয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস তাঁর চেহারা নোট করে রেখেছিলুম। যাক্ ও কথা, অয়েল পেণ্টিং ত হ'ল, ওয়াটার কালারটা শিখবার ইচ্ছে, যাকে বলে আবার তাঁর কাছেই শিখলুম। এখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিষ্ট হয়ে, ঘাড়ে 'ইজিল', বগলে রংএর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কতকাল চলবে আর এমনি করে? তবু মুঙ্গের ওদিকে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি করেছিলুম।

দিন ত চলল কিছু দিন এমনি করে। মন আর ভরে না—ছবি ত এঁকে যাচ্ছি কিন্তু মন ভরছে কই? কি করি ভাবছি, রোজই ভাবি কি করা যায়। এমনি সময়ে এক ঘটনা। শুনতেম আমার ছোট দাদামশায়ের চেহারা অতি সুন্দর ছিল কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর একখানাও ছবি ছিল না। আমি তাঁর ছবির জন্য খোঁজখবর করছিলুম নানা জায়গায়। তখন বিলাত থেকে এক মেম মিসেস্ মার্টিনডেল খবর পেয়ে লিখলেন যে, "তুমি তাঁরই নাতী? বড় খুশী হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। তোমার বিয়ে-থাওয়া হয়েছে? তোমার মেয়ের জন্য আমি একটা পুতুল পাঠাচ্ছি।" বলে প্রকাণ্ড একটা বিলিতি ডল নেলীকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কি রকম আশ্চর্য তাঁর মন ছিল; কোন কালে আমার ছোটদাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল সেই সূত্রে আমাকে না দেখেও তিনি নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতী বলেই স্নেহ করতে চাইতেন। তিনি বিলাত থেকে লিখলেন, তোমার আর্টের দিকে ঝোঁক

আছে—আমিও একটু আধটু আঁকতে পারি। বল তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারি কি না। তিনি লিখলেন যে তুমি যদি কিছু দাও ত তার চার দিকে ইলিউমিনেট করিয়ে দিতে পারি। বইয়ের লেখার চার দিকে ডিজাইন আঁকা থাকে, খুব পুরোনো আর্ট এদের—তাই একটা এঁকে পাঠাবেন। ভাবলুম তা মন্দ নয় তো। তিনি বলেছিলেন, "আমি গরিব—এজন্য কিছু দিতে হবে।" পাঠিয়েছিলুম কিছু ১০।১২ পাউণ্ড—মনে নেই ঠিক—তবে শ'খানেক টাকা হবে। আইরিশ মেলডিজের কবিতা ছোটদাদামশায়ের বড় প্রিয় জিনিস ছিল। ভাবলুম, সেটাই যত্ন করে রাখবার বস্তু হয়ে আসুক। কিছুকাল বাদে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ১০।১২ খানা বেশ বড় বড় প্লেট—সে কি সুন্দর কী বলব তোদের। থ' হয়ে গেলুম ছবি দেখে!

আবার হ'বি ত হ' সেই সময়ে আমার ভগ্নীপতি শেষেন্দ্র, প্রতিমার বাবা একখানা পার্শিয়ান ছবির বই দিল্লীর, আমাকে বকশিশ দিলেন। রবিকাকাও আবার সে সময়ে রবি বর্মার ছবির কতকগুলি ফটো এনে আমাকে দিলেন। তখন রবি বর্মার ছবিই ছিল কিনা ইণ্ডিয়ান আর্টের আদর্শ। যাই হোক, তখন সেই আইরিশ মেলডির ছবি ও দিল্লীর ইন্দ্রসভার নক্সা যেন আমার চোখ খুলে দিলে। এক দিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর এক দিকে পুরাতন ইণ্ডিয়ান আর্টের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন-চিত্রকলার গোড়াকার কথা—একই। সে যে আমার কী আনন্দ—সেই সময়ে সাধনাতে আমার ঐ ইন্দ্রসভার বইখানির বর্ণনা দিয়ে 'দিল্লীর চিত্র শালিকা' বলে বলেন্দ্র ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন—চার দিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দিল্লীর চিত্র শালিকাতেও সোনা লাগিয়েছে মিজেলের ছবিতেও সোনা লাগিয়েছে, দুইই এক সাজ এক অলঙ্কারে মণ্ডিত। যাক্, ইণ্ডিয়ান আর্টের তো একটা উদ্দিশ পেলাম এখন সুরু করা যাবে কি করে কাজ? তখন এক তলার বড় ঘরটাতে এক ধারে চলেছে বিলিয়ার্ড খেলার হো-হা, এক ধারে আমি বসেছি রং তুলি নিয়ে আঁকতে। দেশের শিল্পের রাস্তা ত পেয়ে গেছি এখন আঁকব কি? রবিকাকা আমায় বললেন বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাত্‌লে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি (ইণ্ডিয়ান আর্ট) চণ্ডীদাসের দু'লাইন কবিতা—"পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ"। এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই বাক্স বন্ধ। সেই আমার প্রথম দেশীধরণের ছবি "অভিসারিকা" কিন্তু দেশী রাধিকা হল না, সেটা হল যেন মেম সাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের অবেলায় ছেড়ে দিয়েছি। বড় মুষড়ে গেলুম—নাঃ, এ হবে না। দেশী টেকনিক শিখতে হবে। তখন টেকনিকের দিকে ঝোঁক দিলুম। ছবিতে সোনাও লাগাতে হবে। তখনকার দিনে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে এক মিস্ত্রি ফ্রেমের কাজ করে, লোকটির নাম পবন, আমার নাম অবন, তাকে ডেকে বললুম 'ওহে, আমাকে শিখিয়ে দাও তো, সোনা লাগায় কি করে।' সে বললে, 'সে কি বাবু—আপনি ওকাজ শিখে কি করবেন? আমাকে বলবেন আমি করে দেব।' "না হে আমার ছবিতে সোনা লাগাবো; আমাকে শিখিয়ে দাও।" শিখলাম তার কাছে কী করে সোনা লাগাতে হয়। সব রকম টেকনিক ত শেখা হল, তার পর আমাকে পায় কে? বৈষ্ণব পদাবলীর এক সেট ছবি সোনার রূপোর তবক ধরিয়ে এঁকে ফেললুম। তার পর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আঁকতে শুরু করলুম। সেই পদ্মাবতী পদ্মফুল নিয়ে বসে আছে, রাজপুত্তুর গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। আর অন্য গুলিও। যাক্ রাস্তা পেলুম, চলতেও শিখলুম, এখন হু হু করে এগুতে হবে তো? তখন এক একখানি করে বই ধরি আর ২০।২৫ খানা করে তার ছবি এঁকে যাচ্ছি। তাই যখন হ'ল কিছুকাল গেল এমনি।

তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা—মায় প্রত্যেক রং এর সেড্ অবধি। তখন যে আমার কি অবস্থা বোঝাব কি তোমায়। চোখ বুজলেই ভিতরে ছবি দেখছি। ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর—হাত লাগালেই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে। হু হু করে ছবি হ'তে লাগল। কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ইত্যাদি। নীচের তলার দালানটাতে বসে মশগুল হয়ে ছবি আঁকতুম। আমি যখন কৃষ্ণের ছবি আঁকছি তখন শিশির ঘোষ মশায় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এক দিন তিনি এলেন কৃষ্ণের ছবি দেখতে। আমি নীচের তলার ঘরটিতে বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছি, মুখ তুলে দেখি দরজার পাশে একটি অচেনা মুখ উঁকি ঝুঁকি মারছে। আমি বললাম কে হে। তিনি বললেন "আমি শিশির ঘোষ, তুমি কৃষ্ণের ছবি আঁকছ তাই শুনে দেখতে এলুম।" আমি তাড়াতাড়ি উঠে—আসুন আসুন বলে তাঁকে ঘরে এনে ভালো করে বসিয়ে ছবিগুলি সব এক এক করে

দেখাতে লাগলুম। তিনি সবগুলি দেখলেন, শেষে হেসে বললেন, "হঃ কি এঁকেছ তুমি, এ কি রাধাকৃষ্ণর ছবি? লম্বা লম্বা সরু সরু হাত পা যেন কাটখোট্টাই—এই কি গড়ন? রাধার হাত হবে নিটোল, নধর তাঁর শরীর। জান না তাঁর রূপ বর্ণনা?" এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলুম কিন্তু তাঁর কথায় মনে কোনও দাগ কাটলো না। ছবি করে যেতে লাগলুম। তখন আমি বিলিতি ছবির কাগজ পড়িও নি, দেখিও নি, ভয় পাছে বিলিতি আর্টের ছোঁয়াচ লাগে। গান বাজনা আর ছবি নিয়ে মেতে ছিলুম। দিনরাত কেবল এস্রাজ বাজাই ছবি আঁকি।

সেই সময়ে কলকাতায় লাগলো প্লেগ। চারদিকে মহামারি চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্‌সপেকসনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল। সেই প্লেগ লাগলো আমারও মনে। ছবি আঁকার দিকে না ঘেঁষে আরও গান বাজনায় মন দিলুম। চারদিকে প্লেগ আর আমি বসে বাজনা বাজাই। হ'বি ত হ' সেই প্লেগ এসে ঢুকলো আমারই ঘরে, আমার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে গেল। ফুলের মতন মেয়েটি ছিল, বড় আদরের। আমার মা বলতেন এই মেয়েটিই অবনের সব চেয়ে সুন্দর। ৯।১০ বছরের মেয়েটি আমার টুক করে চলে গেল; বুকটা ভেঙ্গে গেল। কিছুতে আর মন যায় না। এ বাড়ি ছেড়ে চৌরঙ্গীতে একটি বাড়িতে আমরা পালিয়ে গেলেম। সেখানে থাকি; একটা টিয়ে পাখি কিনলুম, তাকে ছোলা ছাতু খাওয়াই, মেয়ের মাও খাওয়ায়, পাখিটাকে বুলি শেখাই; দুঃখ ভোলাবার সাথী হল পাখির ছানাটা, নাম দিলেম তার চঞ্চু, মায়ের কোল ছাড়া টিয়া পাখির ছানা!!

সে সময়ে ঘুড়ি ওড়াবারও একটা নেশা চেপেছিলো। পাশের বাড়ির মিসেস আর্মার বলে এক বুড়ী ইহুদী মেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। আমাকে খুব যত্ন করতেন, কত রকম রান্না করে খাওয়াতেন। তাঁর সুন্দর একটি বাগান ছিল; ছাগলের জন্য দিব্বি বেড়া দিয়ে ঘেরা পাহাড়। খুব বড় ঘরের সেকেলে ইহুদী-পরিবার। মায়ের সঙ্গে বুড়ী ইহুদী মেমের মনের কথা হতো; মাঝে মাঝে আমার জন্যে ভালো সুগন্ধি তামাকও পাঠাতো। সেখানে ত এমনি করে আমার দিন যাচ্ছে। সে সময়ে মেজো মার কাছে যাওয়া আসাতে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। এক দিন মেজো মা আমাকে ধরে বসলেন তোমাকে আর্ট স্কুলে যেতে হবে। হ্যাভেল তোমাকে ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল করতে চান। আমার তখন কি কাজকর্ম করবার মতো অবস্থা? আমি সাহেবকে বললুম সে কথা। তিনি আমার জ্যেষ্ঠের মতন ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি করছ কি? **You do your work —your work is your only medicine** (তুমি তোমার কাজ কর, কাজই তোমার একমাত্র ঔষধ)। তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি জ্যেষ্ঠের মতো ভক্তি করেছি কি সাধে? তিনিও আমাকে **collaborator** (সহকর্মী) বলে ডাকতেন আদর করে; কখনও চেলাও বলেছেন। ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি নন্দলালকে যতখানি ভালোবাসি তার বেশি তিনি আমাকে ভালোবাসতেন।

সে ত গেল, কিন্তু আমি চাকরি করব কি? ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া, দিনে সাত বার করে তামাক খাওয়া, তার উপরে শরীর তখন খারাপ; মাকে বললুম, "সে আমি পারবো না মা', তুমি যা হয় বলো সাহেবকে।" সাহেব ইংরেজের বাচ্চা—নাছোড়বান্দা। বলে পাঠালেন মাকে, 'তোমার ছেলের সব ভার আমার। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব হবে না। দুপুরে আমি তার খাওয়ার ভার নিলাম, তামাক সে যতবার ইচ্ছে খাবে। আমি বলছি আমি তার শরীর ভালো করে দেবো।' কিছুতেই ছাড়ে না, আমাকে রাজী হতেই হল। কিন্তু ভয় হল আমি শেখাবো কি? নিজেই বা কি জানি। সাহেব তাতেও বললেন, "সে আমি দেখব'খন। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু নিজের কাজ করে যাবে। তুমি কত টাকা মাসে চাও বল।" আমি বললুম, "সে আর আমি কি বলব সাহেব, সবই ত তুমি জান—এও তুমিই জানবে। দেবে না দেবে সেও তোমার ইচ্ছা, আমি চাইনে কিছুই।" সাহেব বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমি ভাইস্‌-প্রিন্সিপাল করে দিলাম। তুমি এখন মাসে ৩০০৲ টাকা করে পাবে।" যেতে শুরু করে দিলাম সকাল সকাল চারটি ভাত খেয়ে। প্রথম দিন গিয়ে তো আপিস ঘরে ঢুকে মুষড়ে গেলুম—আমি ত আপিসের কাজ বলতে কিছুই জানি না। সাহেব বললেন, "কে বললে তোমায় ওসব কাজ করতে হবে? তার জন্যে হেড মাস্টার আছে, ক্লার্ক আছে, তারা সব দেখবে আপিসের কাজ। তুমি তোমার কাজ করে যাও। চল, তোমাকে আর্ট গেলারী দেখিয়ে

নিয়ে আসি।" আমাকে নিয়ে গেলেন আর্ট গেলারী দেখাতে, আমি আর সাহেব চলেছি আগে পাছে চাপরাশী মস্ত হাতাবড় হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে করতে যাচ্ছে। বাদশাহী চালে চলেছি বড় সাহেবের আর্ট গেলারী দেখতে। সাহেব চাপরাশীকে বললেন পর্দা সরাতে। ভারী তো আর্ট গেলারী তার আবার পর্দা সরাও, এখন ভাবলে হাসি পায়। দুই তিন-খানা মোগল ছবি, আর দুই একখানা পার্শিয়ান ছবি, এই খান চার-পাঁচ ছবি নিয়ে তখন আর্ট গেলারী। পর্দা তো সরানো হল। একটি বক পাখির ছবি—ছোটই ছবি-খানা—মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে, আমাকে বললেন "এই নাও এটি দিয়ে দেখ" বলে বুক পকেট থেকে একটি কাঁচ (magnifying glass) বের করে দিলেন।

সেই কাঁচটি পরে আর আমি হাতছাড়া করি নি। বহু কাল সেটি আমার জামার বুক পকেটে ঘুরেছে। আমি নন্দলালদের বলতুম এটি আমার দিব্য চক্ষু। সেই কাঁচ চোখের কাছে ধরে বকের ছবিটি দেখতে লাগলুম। ওমা! কী দেখি, এ ত সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি যে তার প্রতিটি পালকে কী কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক—কী দেখি—আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই। পিছনে সাহেব তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, আমার অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসছিলেন, যেন উনি জানতেন যে আমি এমনিই হয়ে যাব এ ছবি দেখে। তারপর আর দু'চারখানা ছবি যা ছিল দেখলুম। সবই ঐ একই ব্যাপার—মাথা ঘুরে গেল। তবে ত আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে; মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপো সব কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা। তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্যে ভরে, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই কিন্তু 'ভাব' দিতে পারে নি। সবই যেন সাজিয়ে গুজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম এই বারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম—কী করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়ি এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে। আঁকলুম "সাজাহানের মৃত্যু"। এই ছবিটি এতো ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। 'সাজাহানের মৃত্যু' প্রতীক্ষাতে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম। এই ছবিখানা—তখন দিল্লীর দরবার হয়, বড় বড় ও পুরাতন আর্টিষ্টদের ছবি সেখানে এগ্‌জিবিট করা হবে, হ্যাভেল সাহেব আমার এই ছবিখানা আর তাজ নির্মাণের ছবি দিলেন পাঠিয়ে দিল্লী দরবারে। আমাকে দিলে বেশ বড় একটা রূপোর মেডেল, ওজনে ভারী ছিল মন্দ নয় রে। তার পরে যোগেশ কন্‌গ্রেস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিশনে সেই ছবি পাঠিয়ে দিল সেখানে দিল একটা সোনার মেডেল। এই রকম করে—তিন চারটে মেডেল পেয়েছি, পরি নি কোন দিন।

সাজাহানের ছবির কথা থাক—হ্যাঁ, সেই পদ্মাবতীর ছবিখানার কথা বলি। হ্যাভেল সাহেব পদ্মাবতী ও বেতাল পঞ্চবিংশতির আরও তিন চারখানি ছবি স্কুলের একজি-বিশনে এগ্‌জিবিট করলেন। পদ্মাবতী ছবিখানার দাম কত দেওয়া যায়? সাহেব দিলেন ৮০৲ টাকা দাম ধরে। লর্ড কার্জন এলেন, পদ্মাবতী দেখে পছন্দ হল তার, বললেন দাম কিছু কমিয়ে দিতে। ৬০৲ টাকা মতন দিতে চাইলেন। আমি বলি যে সাহেব দিয়ে দাও টাকামাকা চাইনে কিছু, লর্ড কার্জন চেয়েছেন ছবিখানা সেই ত খুব দাম। সাহেব বললেন, তুমি চুপ করে থাক না' বলবার, বোঝাবার আমি বলব, বোঝাব। এই বলে তিনি তাঁকে কি সব বোঝালেন, ছবিখানার দাম কমালেন না, লর্ড কার্জনকেও দিলেন না। আমি শেষে কি করি, পদ্মাবতীর ছবিখানা ও অন্য ছবি যে ১৩ খানা ছিল তা হ্যাভেলকে ধরে দিয়ে বললুম—এই নাও সাহেব আমার 'গুরুদক্ষিণা'। এগুলি আমি তোমাকে দিলুম। সাহেব ত লুফে নিলেন, কী খুশী হলেন। বললেন আমি এ ছবি গেলারীতে রেখে দেব যত্নে থাকবে চিরকাল।

এদিকে আমার মাস্টারী শুরু করার কথা বলি। সাহেব তো তাঁর স্কুলে আমাকে নিয়ে বসালেন। সুরেন গাঙ্গুলী হল আমার প্রথম ছাত্র। সুরেনকে সাহেব তাঁত শেখাবার জন্য বেনারসে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আবার ফিরিয়ে এনে আমাকে বললেন, "তুমি তোমার ক্লাশ শুরু কর।" সুরেন ও আর ২।৪টি ছেলেকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। কিছুকাল বাদে গণেন মহারাজ এক দিন একটি ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির, বললে—এ'কে আপনার নিতে হবে। তখন মাস্টার কিনা, গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকালুম—দেখি কালোপানা ছোট একটি ছেলে, বললুম "লেখাপড়া শিখেছ কিছু।" বললে, "ম্যাট্রিক অবধি

পড়েছি।" আমি বললুম, "দেখি তোমার হাতের কাজ কিছু।" একটি ছবি দেখালে একটি মেয়ে, পাশে হরিণ, লতাপাতা গাছগাছড়া, শকুন্তলা এঁকেছিল। এই আজকালকার ছেলের মতন একটু জ্যাঠামি ছিল তাতে। বললুম, "এ হবে না, কাল একটি সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি এঁকে এনো।" পরদিন নন্দলাল এলো একটি কাঠিতে ন্যাকড়া জড়ানো, সেই ন্যাকড়ার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। বেশ এঁকেছিল প্রভাত ভানুর বর্ণনা দিয়ে। বললুম সাবাস্। সঙ্গে ওর শ্বশুর, দিব্যি চেহারা ছিল ওর শ্বশুরের, বললেন, ছেলেটিকে আপনার হাতে দিলুম। আমি তাকে বললেম, লেখাপড়া শেখালে বেশি রোজগার করতে পারবে। নন্দলাল জবাবে বললে লেখাপড়া শিখলে ত ৩০২ টাকার বেশি রোজগার হবে না। এতে আমি তার বেশি রোজগার করতে পারবো। আমি বললুম তাহলে আমার আর আপত্তি নেই ; সেই থেকে নন্দলাল আমার কাছে রয়ে গেল। তখন এক দিকে সুরেন গাঙ্গুলী, এক দিকে নন্দলাল, মাঝখানে আমি বসে কাজ সুরু করে দিলুম। এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন চাকরি চাই। আমি বললুম বেশ লেগে যান, রোজ আমাদের মহাভারত রামায়ণ পড়ে শোনাবেন, আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত মশায়, নাম, রজনী পণ্ডিত। সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকাতুম। নন্দলাল বললে, "কি আঁকব ?" আমি বললুম "আঁক কর্ণের সূর্যস্তব।" ও সব্জেক্টটা আমি চেষ্টা করেছিলুম ঠিক হয় নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এলো। আমি তার ওপর এই ২।৩টা ওআশ্ দিয়ে দিলুম ছেড়ে। হাতে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাই নি। ছবি করে নিয়ে আসত আমি শুধু কয়েকটি ওআশ্ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, কিংবা একটু আধটু রঙের টাচ্ দিয়ে দিতুম, যেমন ফুলের ওপর সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া, সূর্য নয় ঠিক—আমি তো আর রবি নই, নানা রঙের মাটিরই প্রলেপ দিতেম। তখন আমাদের আঁকার কাজ তেজে চলেছে। নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকলো তো সুরেন এদিকে রামচন্দ্রের সমুদ্র শাসন আঁকলো ; এই তীর ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রুখে দাঁড়িয়েছে। নন্দলাল এঁকে আনলো একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়ন পিটন, টান টানা চোখ ভুরু, আমি বললুম, "এত হল কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ী এঁকে দাও ;" হয়ে গেল "কৈকেয়ী মন্থরা"। ছবির পর ছবি বের হতে লাগলো। চারিদিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটি খুলে গেল ; হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুটলো। আমি নিজে যখন ছবি আঁকতুম—কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতুম না। আপন মনে ছবি আঁকতুম। মাঝে মাঝে হ্যাভেল সাহেব পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেন, পিছন দিক দিয়ে দেখে যেতেন কি করছি। চৌকি ছেড়ে উঠতে গেলে ধমকে দিতেন। আমার ক্লাশেও সেই নিয়ম করেছিলুম। দরজায় লেখা ছিল, "তাজিম মাফ"। আমার ছবি আঁকবার পদ্ধতি ছিল এমনি, বলতুম "তোমরা এঁকে যাও ; যদি লড়াইতে ফতে না করতে পার, তবে এই আমি আছি—ভয় কি ?"

১৩।১০।৪০

সেদিন কেন বলেছিলুম যে আমার আর্টের বেলায় (ক্রমাগত ফেল) **failure one after another** ? কী কষ্ট মনে যে আমি পেয়েছি আমার ছবির জীবনে। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি ? যে রং, যে রূপ, রস মনে থাকতো ; চোখে ভাসতো—যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না তখনকার মনের অবস্থা, বেদনা—অবর্ণনীয়। চিরকালটা এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি ? শুধু দুবার আমার জীবনে আনন্দময় ভাব এসেছিল। দুবার আমি নিজেকে ভুলে গিয়ে বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম। ছবিতে ও আমাতে কোনও তফাৎ ছিল না। আত্মহারা হয়ে ছবি এঁকেছি। একবার হয়েছিল আমার কৃষ্ণ-চরিত্রের ছবিগুলি যখন আঁকি। সারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই চারদিকে ছবি দেখি আর কাগজে হাত ছোঁয়ালেই ফস্ ফস্ করে ছবি বের হয়। কিছু ভাবতে হয় না, যা করছি তাই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে। তখন কৃষ্ণের সব বয়সের, সব লীলার ছবি দেখতে পেতুম, প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি রং সমেত। সেই ভাব আমার আর এল না। শুধু আর একবার এসেছিলো কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সেবারে হচ্ছে আমার মার আবির্ভাব —মৃত্যুর পর। মার ছবি একটিও ছিল না। মার ছবি কি করে আঁকা যায় এক দিন বসে বসে ভাবছি, এমন সময়ে যেন আমি পরিষ্কার আমার চোখের সামনে মাকে দেখতে পেলুম। মার মুখের প্রতিটি লাইন কী পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি কাগজ পেন্সিল নিয়ে মার মুখের ড্রইং করতে বসে গেলুম। এই কপাল থেকে যেই নাকের ওপর ভুরুর খাঁজ টুকতে

এসেছি—সে কি? মা কোথায় মিলিয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হ'ল কে যেন আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিলো—সব অন্ধকার। আমি চমকে বললুম, "দাদা, এ কি হ'ল?" দাদা একটু দূরে বসেছিলেন, মুখ টিপে হাসলেন; বললেন, "বড্ড তাড়া করতে গিয়েছিলে তুমি।" মন খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলুম আর মনে হতে লাগলো, তাইতো এ কি হ'ল? মা এসে অমনি করে চলে গেলেন। কতক্ষণ ওভাবে ছিলুম, এক সময়ে দেখি আবার মায়ের আবির্ভাব। এবারে আর তাড়াহুড়ো না—স্থির হয়ে বসে রইলাম। মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন অস্তদিনের রং দেখা যায় তেমনিতরো মায়ের মুখখানি ফুটে উঠতে লাগলো। দেখলুম মাকে, খুব ভাল করে মনপ্রাণ ভরে মাকে দেখে নিলুম। আস্তে আস্তে ছবি মিলিয়ে গেল, কাগজে রয়ে গেল মায়ের মূর্ত্তি। এই যে মার ছবিখানা ঐ অমনি করেই আঁকা। এত ভালো মুখের ছবি আমি আর আঁকি নি।

তাই তো বলি ছবির জীবনে দুঃখ অনেক। আমিও চিরকাল সেই দুঃখই পেয়ে এসেছি। প্রাণে কেবলই একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কিছুতেই মনে হয় না যে এইবারে ঠিক হল যেমনটি চেয়েছিলুম। কিন্তু তাই বলে থেমে গেলে চলবে না বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে চলবে না। কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কাজ। আবার কিছুকাল যদি ছবি না আসে তা হলেও মন খারাপ করো না। ছবি হচ্ছে বসন্তের হাওয়ার মতন। যখন বইবে তখন কোনও কথা শুনবে না। তখন একধার থেকে ছবি হতে শুরু হবে। মন খারাপ করিস নি, আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখিস। * * * ১৫।১০।৪০

ছাত্রকে তার নিজের ছবি সম্বন্ধে মাস্টারের কিছু বাৎলানো—এক এক সময়ে তার বিপদ বড়, আর তাতে মাস্টারেরও কি কম দায়িত্ব? একবার কি হয়েছিল বলি, নন্দলাল একখানা ছবি আঁকলো—"উমার তপস্যা।" বেশ বড় ছবিখানা। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্য তপস্যা করছে। পিছনে মাথার উপরে সরু চাঁদের রেখা, ছবিখানিতে রং বলতে কিছুই ছিল না। আগাগোড়া ছবিখানায় ব্রাউন রঙের অল্প অল্প আভাস। আমি বললুম, "নন্দলাল, ছবিতে একটু রং দিলে না; প্রাণটা যেন চড়্‌বড়্‌ করে ছবিখানির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও অন্ততঃ উমাকে একটু সাজিয়ে দাও, কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরাও, অন্ততঃ একটি জবাফুল।" বাড়ি এলুম রাত্রে আর ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো আমি কেন নন্দলালকে বলতে গেলুম ওকথা? আমার মতন করে নন্দলাল হয়তো উমাকে দেখে নাই। ও হয়তো সত্যিই উমাকে দেখেছিল—উমার সেইরূপ—পাথরের মত দৃঢ়—তপস্যা করে করে রং, রস সব চলে গেছে। তাইতো—উমার তপস্যা দেখে তো বুক ফেটে যাবারই কথা, তখন আর সে চন্দন পড়বে কি? ঘুমুতে পারলুম না—ছটফট্‌ করছি কখন সকাল হবে। সকাল হতেই ছুটলুম নন্দলালের কাছে। ভয় হচ্ছিল পাছে সে রাত্রের মধ্যেই ছবিখানাতে রং লাগিয়ে থাকে আমার কথা শুনে। গিয়ে দেখি নন্দলাল ছবিখানাকে সামনে নিয়ে বসে, রং দেবার আগে আর একবার ভেবে নিচ্ছে। আমি বললুম, "কর কি, নন্দলাল থামো থামো। কী ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম, তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না।" নন্দলাল বললে, "আপনি বলে গেলেন উমাকে সাজাতে—সারারাত আমিও সেকথা ভেবেছি—এখনও ভাবছিলাম রং দেব—কি না?" কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বল দেখি, আর একটু হলেই অত ভালো ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি। সেই থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি, আর এটা জেনেছি যে, এ ঠিক নয়। ছবি যার যার নিজের নিজের সৃষ্টি, তাতে অন্য কেউ উপদেশ দেবে কি?

যখন আমাদের জোরে ইণ্ডিয়ান আর্টের চর্চা হচ্ছে তখন ভাবলুম যে শুধু এটি ছবিতে নয়—সব দিকেই এর চর্চা করতে হবে। লাগলুম আসবাবের দিকে, ঘর সাজাতে, আশেপাশের চারি দিকে ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রাধান্য আনতে। ঘরে যত পুরোনো আসবাব ছিল কর্তাদের আমলের—বিদেশ থেকে আমদানী দামী দামী জিনিসপত্তর—সব বিক্রী করে দিলুম। বললুম সব ঝেড়ে ফেল, যা কিছু আছে বাইরে ফেলে দে। মান্দ্রাজী মিস্ত্রি, ধনকোটি আচারি, তাকে এনে লাগিয়ে দিলুম কাজে। নিজে নমুনা দিই আর তাকে দিয়ে আসবাব করাই। সব সাদাসিধে আসবাব করালুম। তাকে দিয়ে ঘর জুড়ে জাপানী গদি করালুম। এই যে আজকাল তোমরা খাটের পায়া দেখছ—এ কোত্থেকে নেওয়া জান? মাটির প্রদীপের দেহলি থেকে নেওয়া। খেটেছি কম? প্রথম ইণ্ডিয়ান আসবাবের চলন ত এইখান থেকে হ'ল। একলা আমি আর দাদা, এই আমাকে সব দিক সামলে চলতে হয়েছে। এখন এরা সবাই একটি ধারা পেয়ে গেছে—এ থেকে একটু আধটু নূতন কিছু এদিক-ওদিক করতে পারা সহজ। কিন্তু আমাকে যে তখন গোড়াসুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ লাগাতে হয়েছিল নিজের হাতে। তাকে লাগানো থেকে জল ঢালা থেকে সবই আমাকেই করতে হয়েছে। আজ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি বলেই তোমরা হয় তো তাতে এক দিন ফুল ফোটাতে পারবে।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৯

শেষের দিকে, আমার কথা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, বিস্ময়ে, আবেগে মীরার মুখের চেহারা প্রতিমুহূর্তেই কি এক যেন অদ্ভুত রকম হইয়া উঠিতেছিল! অন্তরে অন্তরে সে অতিরিক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, আমায় শেষ করিতে না দিয়াই প্রশ্ন করিল, "আপনি যাবেন?—সে কি?—যাবেন কেন?—যাবার কথা কি হয়েছে এমন…"

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মীরা সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছে যেন। আমার সংযম হারাইবার কোন বালাই নাই, আমি আজ দ্রষ্টা মাত্র, দেখিতেছি। বুঝিতেছি মীরা একটা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছে;—আমি যে যাইব বা যাইতে পারিব এটা ওর কল্পনাতীত, অথচ আমার থাকার জন্য জিদ করাও যে অসম্ভব। ও প্রাণ দিয়া চায় আমি থাকি, কিন্তু এই চাওয়ার দুর্বলতাটুকু ও প্রাণ ধরিয়া প্রকাশ করিবে কি করিয়া? দুটা কথা বেশী করিয়া বলিতে গেলেই ওর সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে যে এক মুহূর্তেই স্খলিত হইয়া পড়িবে।…মীরা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছে। সে বুঝিতেছে নিজেকে সংযত করা দরকার, সাধারণ অনুরোধের চেয়ে একটা কথাও বেশী বলা তাহার শোভা পায় না; মুখচোখে তাহার একটা অবহেলা বা নির্লিপ্ততার ভাব থাকা দরকার—এক জন মাস্টার যাইতে চাহিতেছে, এক বার মুখে বলা থাকিবার কথা—একটা মামুলি, মৌখিক ভদ্রতা, তাহার পরও যাইতে চাহে, যাক্। আবার শত শত মাস্টারের দরখাস্ত পড়িবে।

কিন্তু এই নিতান্ত দরকারী ভাবটা—কথায় এবং চেহারায়—মীরা কোন মতে আনিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ এর চেয়েও একটা ঢের বড় প্রয়োজন আছে, মীরার সমস্ত সত্তার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ;—অর্থাৎ আমার এখানে থাকাটা।…মীরা যে এত দূর আগাইয়া গিয়াছে আমার এই বিদায়-ভিক্ষার পূর্বে সে জানিত না; আবিষ্কার করিয়া যেন অসহায়ভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আমিও এতটা জানিতাম না। কিন্তু আমি বিচ্ছেদের জন্য শঙ্কিত নই, মুক্তি আমায় ডাক দিয়াছে, আমি সাড়া দিয়াছি।

ভালবাসা দুর্বল আমার?—তাহাতে খাদ আছে?—তা সে কথা তো গোড়াতেই স্বীকার করিয়াছি যে পুরুষের ভালবাসা মেয়েদের ভালবাসার শতাংশের একাংশও নয়।

আমি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠেই বলিলাম, "আমায় যেতেই হবে মীরা দেবী।"

মীরা স্থির নেত্রে আমার মুখের পানে চাহিল, প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও একটু দুর্বলতা আছে কি না আমার মুখের রেখায় তাহার অনুসন্ধান করিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "না, যাওয়া আপনার হ'তেই পারে না শৈলেনবাবু।"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

মীরা একটু চিন্তা করিল, তাহার পর কৌচে হেলিয়া পড়িল; আঁচলের একটা কোণ ধীরে ধীরে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "কেন?…কেন?…আপনি যাবেনই বা কেন তাও তো বুঝছি না।"

বলিলাম, "বললাম তো সব কথা।"

"কি কথা?…ও, হ্যাঁ; কিন্তু সে-সম্বন্ধে তো বললাম আপনাকে।"

"কি বললেন?"

মীরা বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে।

একটু চুপ করিয়া রহিল, কপালের চুল চারিটি আঙুল দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে লাগিল, তাহার পর খোঁজ করিতে করিতে কথাটা হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে এই ভাবে বলিল, "বাঃ, বললাম না যে ওটা খালি সম্ভাবনার কথা বলছিলাম?··আপনি এত শীগ্‌গির ভোলেন!"—শেষের কথাটুকু বলিল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া।

আমি বলিলাম, "তার উত্তরও তো আমি দিয়েছি,—অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে বলেই—একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলা সম্ভব ব'লেই আমার যাওয়া দরকার এ-জায়গা

থেকে।…মীরা দেবী; বিশ্বাস করুন, সরমা দেবী সম্বন্ধে এটুকু কথা বলতেও, ওঁকে নিয়ে এ-ধরণের আলোচনা করতেও আমি অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি। আমায় ছেড়ে দিন।"

মীরা নিরাশ ভাবে আবার এলাইয়া পড়িল; তাহার পর ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যাবেনই? তা বেশ।"

পরক্ষণেই তাহার যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বনের কথা মনে পড়িয়া গেল, আবার হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, "বেশ, আমার আপত্তি নেই শৈলেনবাবু; আপনি যেতে চাইছেন কেনই বা থাকবে আপত্তি? তরু কিন্তু আপনাকে কখনই ছাড়বে না। পারেন তো যান আপনি, আমার কোনই আপত্তি নেই। একেবারেই না।"

বুঝিলাম তরু যে আমায় রুখিবেই তাহার প্রেরণাটা কোথা থেকে পাইবে সে। আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ, সেই কথাই থাক্।"

মীরা আবার একটু দ্বিধায় পড়িল, উহারই মধ্যে মুখের স্বচ্ছন্দ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আপনি রাজী ক'রে নেবেন তরুকে?"

হাসিয়া বলিলাম, "সেটুকু ভরসা আছে বৈকি।"

"কি করে?"

"আপনার মত বুদ্ধিমতীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে যে কসরৎটা হ'ল সেটা কি বৃথাই যাবে মীরা দেবী? শক্তি বৃদ্ধি হ'ল তো? তাই দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে আর ভোলাতে পারব না?"—একটু হাসিলাম।

মীরা বলিল, "আপনি ভুল করছেন শৈলেনবাবু, তার শক্তি ভালবাসায়, স্নেহে, সেখানে আপনাকে হারতেই হবে।"

হাসিয়া বলিলাম, "ওই ভালবাসাই তো জোর আমার মীরা দেবী, ওর দোহাই দিয়েই তো জিতব আমি।"

"কি রকম?"

"বলব—'তোমার মাস্টারমশাইকে এত ভালবাস তরু তবু তাকে আটকে রাখতে চাইছ?—বাঁধার ভয়ে সে নিজে কাতর হচ্ছে জেনেও?'"

নিজেকে হাজার সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াও আমি কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। তরুর নাম করিয়া মীরাকে আমার মর্মের কথাটা যাইবার পূর্বে একবার শুনাইয়া দিবার লোভটা কোন মতেই সংবরণ করা গেল না, বলার মিষ্টতাটুকু থেকে রসনাকে বঞ্চিত করিতে পারিলাম না।… সত্যই তো, ওরই বাঁধনের তো ভয়—এত গ্লানি মাথায় করিয়াও যে বাঁধন কাটা দুষ্কর হইয়া পড়ে।…কিন্তু আজও অনুতাপ হয়, নিজের সাধ মিটাইতে গিয়া সেই প্রথম আমি মীরার চক্ষের জল টানিয়া আনি।

অনুতাপের পাশে পাশে এও ভাবি—ঐটুকুই আমার সম্বল—ঐ অশ্রুবিন্দুর স্মৃতিটুকু, না হইলে কি লইয়া বাঁচিতাম?

মীরার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। টলটলে দুই বিন্দু জল, ঘরের চারিদিকে সবুজের আভা পড়িয়া দুইটি মরকতের মত দেখাইতেছে। মনটা আমার বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল—কেন বলিতে গেলাম কথাটা?—দরকার কি বাঁধন ছিঁড়িবার? এই বাঁধনেই বাঁধা থাকি না চিরদিন…"

"মীরা দেবী…"—বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, এখন ঠিক গুছাইয়া মনে পড়িতেছে না। মীরা চোখের জলে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাড়াতাড়ি এ-পর্বটা শেষ করিবার জন্যই যেন বলিল— "আপনি যাবেনই। যেতে চাইলে তরুর সাধ্যি কি বাঁধে…"

কথাটা আটকাইয়া গেল।

মীরার কৌচের পিছনে খোলা জানালা দিয়া এক ঝলক হাওয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর থেকে একটা পাৎলা কাগজের টুকরা উড়াইয়া দিল। মীরা বাঁচিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিবার জন্য আমার দিকে পিছন ফিরিয়া গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুর লজ্জা গোপন করিতেছে মীরা। জানালা বন্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, ঘরের গুমট ভাঙিতে ঐ রকম কয়েক ঝলক হাওয়ারই দরকার বরং। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া জানালার পাল্লা দুইটা টানিতে টানিতে বলিল—"আমি শুধু এই জন্যে বলছিলাম যে আমার মনে একটা চিরজন্মের মত খেদ থেকে যাবে।"

কিসের খেদ? যাইবার সময়, চোখাচোখি না হইয়া থাকিবার এই সুযোগে মীরা কি মন উজাড় করিয়া আমাকে তাহার অন্তরতম কথাটি বলিবে? এমন হয়। যখন সব সম্বন্ধ ফুরাইয়া আসে তখন পরম সম্বন্ধের কথাটা বলা যায়। একটু উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, তাহার পর প্রশ্ন করিলাম— "খেদ কিসের?"

জানালা বন্ধ করিতে অত বিলম্ব হয় না, আসল কথা মীরা নিজেকে, নিজের অবুঝ অশ্রুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; এখন ধারায় নামিয়াছে কি না তাহাই বা কে জানে? একটা পাল্লা আবার একটু বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া, মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—"আপনি রূঢ় ব্যবহার

পেলেন আমার কাছ থেকে, তাই,...কাল...তার পর চিঠি..."

আবার থামিয়া গেল, আর যেন ও নিজেকে সামলাইতে পারিতেছে না।

আমিও এবার বোধ হয় সংযম হারাইতাম; কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে তরুর মোটর আসিয়া থামিল এবং তরু কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া, দু-একটা সিঁড়ি বাদ দিতে দিতেই হুড়মুড় করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

লুকাচুরি সামলাইতে গিয়া আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়া গেলাম: মীরা জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়াছিল, চেষ্টাও করিতেছিল, কিন্তু তরুর পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি পাল্লা দুইটা আবার বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কৌচে আসিয়া বসিল। ভাবিবার চিন্তাইবার পূর্বেই তাহাকে আরও একটা কাজ করিতে হইল, অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু দুইটি মুছিয়া লইতে হইল—নিতান্ত আমার সামনা-সামনিই। আমিও বিষণ্ণতা চাপা দিয়া মুখে হাসির ভাব টানিয়া আনিলাম।

তরু পর্দাটা এক সাপটে সরাইয়া ঘরে আসিয়া পড়িল। আমাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, কখনও দেখে নাই আমায় এ-ঘরে; মীরার মুখের পানে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইল, চোখে জল না থাকিলেও পাপড়ি তাহার ভিজা তখনও। আমরা দু-জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিলাম—"কি তরু?"

মীরা আরও একটু বাড়াইয়া বলিল—"বড্ড ফূর্তি তোমার দেখছি!"

তরু বর্তমান ভুলিয়া তাহার স্ফূর্তির কারণের ব্যাপারে গিয়া পড়িল, বলিল—"আমাদের মেজ গুরুমার বিয়ে, তাই..."

আমরা দু-জনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; মীরা বলিল—"তাই এত ফূর্তি? আমরা ভাবলাম তোমার নিজের বিয়ে বুঝি!"

"যাঃ"—বলিয়া তরু ছুটিয়া গিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইল।

মীরা বলিল—"তুমি কি দেবে গুরুমাকে?—এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে এস, ইমামুলকে ব'লে দেব আমি।"

তরু মুখটা তুলিয়া আব্দারের স্বরে বলিল—"আর একটা পদ্য দিতে হবে, হুঁ..."

মীরা আবার হাসিয়া বলিল—"ও, প্রীতি উপহার! তা তো চাই-ই, না হ'লে বিয়ে পাকাই হবে না তোমার গুরুমার। কিন্তু সে তো মুশকিল, তোমার মাস্টারমশাইকে এবার আমাদের ছেড়ে দিতে হবে; কে লিখে দেবে তোমায়?"

তরু বিস্ময়ের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বিদ্রূপের মধ্যে এই গম্ভীর কথাটা বিশ্বাস করিবে কি না বুঝিতে পারিতেছে না। একবার দিদির সিক্ত চোখের পানে চাহিল। মীরা বিব্রত হইয়া মুখ ঘুরাইতে যাইতেছিল, আমি হাসিয়া বলিলাম—"যাতে ছেড়ে না দেন সেই জন্যেই আমি ওর দরবার করতে এসেছি তরু; তুমিও বল না আমার হ'য়ে, তাহ'লে খুব ভাল ক'রে তোমার মেজ গুরুমার বিয়ের প্রীতি-উপহার লিখে দোব'খন—প্রীতি-উপহার তো নয়, শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

কঠিন এক রহস্যের মধ্যে পড়িয়া তরু আবার তাহার দিদির মুখের পানে চাহিল।

মীরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নত নয়নে আমার কথাগুলা শুনিতেছিল, একবার চকিতে আমার পানে চাহিয়া লইল, তাহার পর তরুর পিঠে দুই-তিন বার হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা, হবে না ছাড়া।...পদ্যর বন্দোবস্ত হ'ল তো? এবার আগে জামাজুতো ছাড়গে তরু, যাও।"

২০

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি কখন একটা কুশন চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছি, মনে নাই। তরু চলিয়া গেলে আমরা দু-জনেই খানিকক্ষণ নীরবে রহিলাম। একবার চাহিয়া দেখিলাম মীরার মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছে; তরু সেখানে কৌতুকের ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার পর মনে হইতেছে যেন বর্ষার পর স্বচ্ছ আর্দ্র আকাশে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। দুই জনেই বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছি কথাটা অপর দিক থেকে উঠুক। মীরাই মুখ খুলিল, প্রশ্ন করিল, "তরুকে কি বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। সত্যিই কি মত বদলালেন?"

উত্তর করিলাম, "মীরা দেবী, আপনার মনে একটা স্থায়ী খেদ রেখে যাব আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নয়। তা ভিন্ন যদি এমনই হয় যে সত্যিই আপনি সন্দেহের ওপর চিঠিটা লিখেছেন, বা ঐ সম্ভাবনার কথাটা বললেন, তো থেকেই বরং প্রমাণ করি আমি আর যাই হই, অত হীনচেতা নই। যেদিক থেকে ভেবে দেখছি, মনে হচ্ছে, আমার থাকাটাই যেন সমীচীন—more honourable.

মীরা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "শুধু একটু দুঃখ রইল, শৈলেনবাবু যে আপনি থেকে গেলেন বটে, কিন্তু আপনার মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। ওটুকু তুলে ফেলবার উপায় নেই?"

একটু চুপ করিয়া নিজেই বলিল—"বেশ, এটুকুর জন্যেও আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। তার কারণ আপনি গেলে আমার মনে যে আপশোষটা থাকত সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল না, সবচেয়ে বড় চিন্তা এই ছিল যে বাবা আর মার কাছে আমার কোন জবাবদিহি ছিল না। আপনি সেদিক থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন। জানেন তো যাঁদের কাছে অতিরিক্ত আদর পাওয়া যায় তাঁদের কাছে খুব বেশী সাবধানে থাকতে হয়। আমি যে কি বলতাম তাঁদের, ভেবেই সারা হচ্ছিলাম।"

আমি মীরার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম; আবার সেই চতুরা মীরা! প্রথম সুযোগেই ওর অশ্রুজলের ভিতরের কথাটা চাপা দিবে ও;—যেন বাপ মা কি বলিবেন সেই চিন্তাই ওর আসল চিন্তা। এতক্ষণ যে অশ্রু লুকাইবার জন্য ওকে অত ঘটা করিয়া জানালা খোলার অভিনয় করিতে হইল, রুদ্ধকণ্ঠে মিনতি করিতে হইল থাকিবার জন্য—তাহার গোড়ায় শুধু ছিল বাবা-মা কি বলিবেন—আর কিছুই না!

একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করিলাম না। মীরার কাছে যখন সব কথা বলিবার অধিকার পাইব সেই সময় এক দিন এই কথাটা তুলিয়া ওর প্রবঞ্চনায়, ওর চতুরতায় ওকে লজ্জা দিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসা যাইবে। কথাটা স্মৃতির মণিকৌটায় তুলিয়া রাখিলাম। আপাততঃ এইটুকুই লাভ যে মীরা চতুরা বলিয়া ওকে আরও ভাল লাগিতেছে।

মীরা বলিল, "আরও একটা উপকার হ'ল শৈলেন বাবু; চিঠির মধ্যে, কিম্বা কথাটার মধ্যে যে আমার তরফ থেকে অবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই, আপনি থেকে যাওয়ায় সেটা প্রমাণ করবার আমিও যথেষ্ট অবসর পাব।"

অর্থাৎ আমি যে-ভাবে কথাটা বলিলাম মীরাও সেইভাবে একটা কথা বলিবার লোভটা সামলাইতে পারিল না;—ও-ও প্রমাণ দিবে!

আমার আবার হাসি পাইল। হাজার চতুরা হইলেও মীরা এখানে নিজের কাছেই প্রবঞ্চিত হইতেছে। নিজের মনের নিজেই নাগাল পাইতেছে না। আমায় শত নিরপরাধ বলিয়া জানিলেও যে ওর এ-ঈর্ষা থাকিবেই এ-কথা ওকে কি করিয়া বুঝাই?

চেতনা হইল, অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। আমি ওর কথার উপর আর কোন মন্তব্য করিলাম না; দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "তাহলে এখন আমি আসি।"

মীরা কোন কথা বলিল না; ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নীরব সম্মতিতে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম।

দেখি রাজু বেয়ারা একতাড়া ডাকের চিঠি লইয়া ভারিক্কে চালে উঠিয়া আসিতেছে। চিঠি সব আগে মীরার কাছে যায়, সেখান থেকে আবার রাজুর মারফৎ যথাস্থানে বিলি হয়। এখানকার এই সাধারণ নিয়ম। রাজু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেয় না,—এইখানে অন্য চাকরের তুলনায় রাজুর অসাধারণত্ব।—ব্যারিস্টার হইতেছে নিয়মের রক্ষক, সেই ব্যারিস্টারের চাকর হইয়া রাজু নিয়ম ভাঙিবে!

অবশ্য নেহাৎ সামনে পড়িয়া গেলে আমি কখন কখন নিজের চিঠি বাহির করিয়া লই। বলিলাম, "দেখি আমার কিছু আছে কি না।"

রাজু যেন একটু নিরুপায় হইয়া তাড়াটা দিল।

অনিলের একখানা চিঠি আসিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সৌদামিনী

১

কেন যে এমনটা হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে খামের উপর অনিলের হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার সমস্ত মনে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। হইতে পারে আমার মনটা বর্তমান অবস্থা থেকে কোন দিকে মুক্তির জন্য উন্মুখ, উদগ্র হইয়া ছিল বলিয়াই এমনটা হইল।—হঠাৎ অতীতের মধ্যে থেকে একটা স্মৃতির জোয়ার আসিয়া বর্তমানটাকে যেন ঠেলিয়া কোথায় লইয়া গেল। সেটা এতই অভিভবকারী যে চিঠিটাও খুলিয়া পড়িতে এক রকম যেন হয় ভুলিয়াই গেলাম। সিঁড়িটা যেখানে উপরে আসিয়া শেষ হইয়াছে তাহার সামনেই ছোট্ট একটি বারান্দা, বাহিরের দিকটা খোলা, নীচে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢালাইকরা লোহার রেলিং।

আমি মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম, সরিয়া গিয়া রেলিঙে ভর দিয়া সেইখানে, বাহিরে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া দাঁড়াইলাম।

নীচে, বাঁদিকে বাগানটা দেখা যাইতেছে। কাল বিকাল থেকে এ-পর্যন্ত এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়া

কাটিয়াছে, মনে হইতেছে কত দিন বাগানটাকে দেখি নাই—যেন কত যুগ! নূতন হইয়া আজ হঠাৎ আমার সামনে আসিয়াছে।…বাগান ছাড়াইয়া, রাস্তা ছাড়াইয়া, রাস্তার ওপারে বাড়ী ছাড়াইয়া, দৃষ্টি উর্ধ্বে উঠিল; মনটাকে লইয়া উঠিতেছে—বাড়ীর পেছনে কতকগুলা গাছের জটলা, তাহারই মাঝখান থেকে গোটাতিনেক নারিকেল গাছ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ পত্রদল সঞ্চারিত করিয়া আকাশের স্বচ্ছ নীল যেন সর্বাংশে মাখিয়া লইতে চায়।… আরও দূরে—কালের ও-প্রান্তে জাগিয়া ওঠে সাঁতরা, আকাশের কৈশোরের জীবন লইয়া—বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—বেনে বৌয়েদের দোতলার বাড়ীর সামনে তামাটে রঙের পানফলের লতা-বিছান পুকুর—নারিকেলের কাটা গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারি পিচ্ছিল ঘাট। আমি, অনিল ভালমানুষের মত বসিয়া আছি—একটু দূরে, একটা মোটা সজিনা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে, খাটো কাপড় পরা, মাথায় বেড়াবেণী, মুখের ভাবটা আমাদের চেয়েও নির্বিকার।…সদগোপদের ছোট বৌ ঘাটে বাসন মাজিতেছে—ওর উঠিয়া যাওয়ার অপেক্ষা—তাহা হইলেই আমরা পানফল-অভিযানে অগ্রসর হই।…পচা পাঁকের একটা গন্ধ উঠিয়া আসিতেছে, কেমন যেন দেশ-দেশ মাখান গন্ধটা।…ঝক্‌ঝকে বাসনের গোছাটা বাঁ-হাতে করিয়া, ঘোমটার রাঙা পাড়টা নাকের ওপর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া, বঙ্কিম ভঙ্গিতে সদগোপদের বউ উঠিয়া আসিল। কচি বউ, হদ্দ বছর তের কি চৌদ্দ বয়স।…"বামুনঠাকুরেরা এখানে ব'সে যে?"…অনিলই উত্তর দিল, "এমনই বসে আছি, পুকুরের ধারটা একটু ঠাণ্ডা কিনা।"…বেলা দুপুরের রোদে মাথার চাঁদি ফাটিতেছে ওদিকে! সদগোপদের বউ ঠোঁট চাপিয়া হাসিতেছে।—"ঠাণ্ডা, না পানফল?—আমি বলে দিতে চলনু জেলে গিন্নীকে।"…দুই পা আগাইয়া গিয়া আবার ঘুরিয়া বলিল, "যাই?—আচ্ছা যাব না যদি এক কাজ কর।"…আমরা উৎসুক ভাবে চাহিয়া আছি।…"কাজ কর মানে যদি আমার জন্যেও খানকতক ঐখানটায় ঐ পাঁকের মধ্যে পুঁতে রাখ—আমার জন্যে মানে ঠাকুরজির জন্যে—আমি আবার বাসন মাজতে এস্‌ব এক্ষুণি।"

অনিল বলিতেছে, "তুমি আর এই দুপুরের তাতে আসবে কেন? সদী লুকিয়ে দিয়ে আসবে'খন।"… সদগোপদের বৌয়ের সমস্ত মুখটা কৌতুকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, চোখ ঘুরাইয়া বলিতেছে, "ও, সদুঠাকরুণ বুঝি এর মধ্যে আছেন? কোথায় তিনি? তাই তো বলি দুপুরের এমন কড়া তাত এত ঠাণ্ডা লাগে কিসে!…"

হাসিটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—"না না, এই-খানেই পুঁতে রেখো; আমি বলব্‌ নি জেলেগিন্নীকে…"

রাজু বেয়ারা আবার উপরে উঠিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল। পায়ের গতি খুব নিয়ন্ত্রিত—যেন একটা ফৌজী সেপাই। মনটা লিগুসে ক্রিসেণ্টে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আবার স্মৃতির বন্যা—অনেক দিন পরের এক দৃশ্য। আকাশ ঘিরিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সন্ধ্যায় অনিলদের বাড়ী আটক হইয়া গেলাম। অনিলের বাবা ছাতার নীচে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উঠিলেন। ছাতা মুড়িতে মুড়িতে বলিতেছেন, "আরম্ভ হ'ল—শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, —এখন সাত দিন নিশ্চিন্দি থাক।"…মজা নদীতে বাঁশের পুল এখনও বাঁধা হয় নাই, বোধ হয় কাল থেকেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইবে; অনিলের বাবার "নিশ্চিন্দি" কথাটা আগামী ছয়-সাতটা দিনের একটা স্পষ্ট ছবি যেন ফুটাইয়া তুলিল—ওপারে স্কুল, এপারে আমাদের স্কুল-মুক্ত নিরুদ্বেগ দিনগুলা—মাঝে বর্ষার জলে টইটম্বুর মজা নদী, আর সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম বর্ষা—চারি দিকে কুল্‌ কুল্‌, ঝরঝর—একটা সিক্ত মর্মরধ্বনি—সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার মত একাকার, আর পরেই একেবারে অন্ধকার রাত্রি…

অনিলের বাবা বলিলেন, "শৈল আটকে গেল বুঝি।"

একটু একটু শীত করিতেছে, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়াছি। অনিল বলিল—"ও বলছে বাড়ী যাবে।" অনিলের মা একটু যেন শিহরিয়া বলিলেন, "রক্ষে কর। এই বর্ষায় কুকুর বেড়ালকেও বাড়ী থেকে বের করে না। —কেন? খোলা মাঠে পড়ে আছে নাকি?"

বেশ মনে পড়িতেছে অনিলের মাকে—আধবয়সী মানুষটি, প্রদীপটা বাঁ-হাতে ধরিয়া কথাটা বলিতেছেন—মুখে, নথের সোনায় আর পান্না দুইটিতে, শাড়ীর চওড়া রাঙা পাড়ে প্রদীপের কম্পমান আলো পড়িয়া ঝলমল করিতেছে…

মজা নদীর ধারে বৈরিগী বাবাজীর আখড়ায় আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে তানপুরার একঘেয়ে সুরের মত বর্ষার আওয়াজটা…ব্যাঙেদের ঐকতানে গায়কদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার অল্প পরেই রাত্রি নিশুতি হইয়া উঠিল।

এক ভাবে আছি দাঁড়াইয়া। এক একবার নিজেকে অনুভব করিতেছি, আবার স্মৃতির আলোড়নে যাইতেছি তলাইয়া। কত ছোট বড় ঘটনার টুকরাটাকরা স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে।—

সাঁতরার বসত এক রকম তুলিয়া আমরা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছি। আবার আসিয়াছি অনিলের বিবাহের বছর-দেড়েক পরে, ওর বৌ যখন ঘর করিতে আসিয়াছে। বিবাহের সময়টা আমার পরীক্ষা ছিল, তখন আসিতে পারি নাই; অর্থাৎ সাঁতরাকে দেখিতেছি আবার ঠিক সতের বছর পরে। দেশটাকে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে, কতকটা প্রবাসের বিরহের জন্যও, আর কতকটা কি বলিব?—যৌবনের নবীভূত দৃষ্টিভঙ্গি?—রাস্তা, ঘাট, পুকুর মাঠের সঙ্গে পুরাণ স্মৃতির ছোপছাপ লাগিয়া আছে

সতের বছরও পূর্ণ হইবার আগেই অনিলের বিবাহ হইল। দুই বৎসর হইল এন্ট্রান্স পাস করিয়া জেলা কোর্টে চাকরি করিতেছে। দশ টাকা জলপানি পাইয়াছিল, বাপ পক্ষাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ায় জলপানিটা কাজে আসিল না। আমায় পত্র লিখিয়াছিল—"শৈলেন, বিধাতা একটু রসিকতাপ্রিয় ব'লে আমাদের শাস্ত্রে তাঁকে পিতামহ বলে কল্পনা করা হয়েছে—আমার পড়া বন্ধ করার বন্দোবস্ত করে দশ টাকা জলপানি পাইয়ে দিলেন।"

ষোল-সতের বছরে বিবাহ আমরা—পশ্চিমের দিকের বাঙালীরা—কল্পনায়ও আনিতে পারি না; আমার বন্ধু সেই অনিলকে বিবাহিত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি বয়সের অনুপাতে ও ঢের বেশী উপযোগী। বৈবাহিক রহস্য লইয়া এমন অনেক কথা বলিল যাহা শুনিতে প্রথমটা আমায় রাঙিয়া উঠিতে হইল। অনিল হাসিয়া বলিল, "তুই জেন্টেলম্যান্ হয়ে গেছিস শৈল, বিপদে ফেললি দেখছি, তোকে আবার মানুষ ক'রে নিতে সময় নেবে। পশ্চিমের শুকন হাওয়ায় তোরা সব বোদা হয়ে যাস।"…সেই প্রথম দিনের কথা :—সকালে গল্পচ্ছলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীর কথা তুলিলাম। ওদের বাড়ীর বাহিরে রকে বসিয়া আমাদের কথা হইতেছে। অনিল কেমন একটা মলিন হাসি হাসিল, বলিল, "ভাই, সদুর কথা না তুলে পারলি নি? আমাদের বিয়ের কথা তো বলেইছি তোকে কয়েক বার যে, আমাদের মত তাকিয়ায় হেলান দেওয়া জাতের পক্ষে বৌ জিনিসটা গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাকের মত, সেজে দেয় অভিভাবকেরা। নিজের পছন্দয় রোম্যান্স ক'রে সংগ্রহ করা নয়…"

সামনের রাস্তায় দুইটা মোটরে আর একটু হইলেই ধাক্কা লাগিত। খানিকটা বচসা, খানিকটা কথা-কাটাকাটি হইতে স্মৃতিসূত্র আবার ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আজ কি হইয়াছে, কলিকাতা আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

একটু চুপ করিয়া আছি আমরা দু-জনে; তাহার পর অনিল আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিল—চোখে একটা আতুর দৃষ্টি, বলিল, "শৈল, সৌদামিনী পড়ে রইল, তুই তুলে নে তাকে; তুইও তো ভালবাসতিস, একটু লাজুক ছিলি এই যা…"

রাত্রের ছবিটা খুব স্পষ্ট এখনও।—নিশুতি রাত, অনিল নীচের দুয়ার খুলিয়া আমার ওপরে, তাহার ঘরে লইয়া আসিয়াছে, দিনের বেলায় বৌ দেখাইয়া আশ মেটে নাই ওর। বৌয়ের সামনেই প্রশ্ন করিল—"মুখদেখানি কি দিলি—হৃদয় নাকি?"

ওর বৌ বেচারি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিলাম—"রাস্কেল, আড় নেই মুখে তোর। দিলুম একটা জিনিস, একটা নতুন নাম।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কি?—রাস্কেলের গিন্নী রাসকেলী?"

বলিলাম, "না, অম্বুরী।"

দুই জনে হাসিয়া উঠিলাম। হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া ওর বৌও হাসিয়া আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ দূর ভবিষ্যৎ থেকে দৃষ্টি আসিয়া পড়িল সন্নিহিত বর্তমানে।—

সংসার পরিবর্তিত ওদের। অনিল এখন বাড়ীর কর্তা। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক জন যুবার যদি সংসারের কর্তা হইতে হয় তো তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও একটা মস্ত বড় পরিবর্তন আসে, কতকটা মেঘভারাক্রান্ত দ্বিপ্রহরের মত। এই কর্তামি আর ডেলি-প্যাসেঞ্জারি মিলাইয়া অনিল যেন অনেকটা বুড়ো হইয়া গিয়াছে। তবুও অনিল অনিলই। বিশেষ করিয়া আমি গেলে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।—সেই কথার ভাবে উচ্ছ্বসিত অনিলকে যেন সামনে দেখিতেছি। আমি গেলে আমাদের যা বাঁধা প্রোগ্রাম,—সমস্ত গ্রাম আর গ্রামের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—বেনে বৌদের বাড়ীর সামনে পুকুর ধারটায়, মজা নদীর ধারে ধারে অনন্তপুরের রাস্তা, স্কুলের ধার। এক দিনও ভালবাসি নাই স্কুলটাকে, কিন্তু এখন যে কি চমৎকার লাগিতেছে! ঠিক যেমন পুরনো মাস্টারমশাইদের কাহাকেও দেখিলে প্রীতি আর ভক্তিতে মনটা ভরিয়া ওঠে আজকাল; আগে যাদের যমের মত দেখিতাম।…গা-ঢাকা হইয়া আসিল—আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অন্ধকারের মধ্যে, অতীতের অন্ধকারে ডুব দিয়া কি সব জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সব প্রগল্ভতা মৌন হইয়া গিয়াছে, দুজনেই বুঝিতেছি দুজনে কোথায় আছি, সেখান

থেকে ডাক দিয়া—এক অন্যকে ফিরাইয়া আনিতে মন সরিতেছে না। অবশ্য ভিতরে সঞ্চয় যখন খুব বেশী হইয়া উঠিতেছে, এক একবার কথাবার্তাও আবেগময় হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবিয়া এক বার প্রশ্ন করিয়া বসিল—"ছেলেবেলাকার বইগুলো এদিকে আর পড়েছিস শৈল?"

খুব আশ্চর্য্য হইয়া ওর দিকে চাহিয়া আছি। অনিল বলিতেছে, "প'ড়ে দেখিস। দেয়াল-আলমারির পুরনো বইগুলো গুছোতে গিয়ে সেদিন আমার হাতে একটা "মনোহর পাঠ" ব'লে বই পড়ল। অদ্ভুত রে! এমন মিষ্টি লাগছিল! কোথায় লাগে একটা ভাল কাব্য তার কাছে! লেখাগুলোর মধ্যে যে বিশেষ কিছুই নেই সেকথা মনে থাকে না; তার মানে লেখাগুলোর চারি দিকে সমস্ত ছেলেবেলাটা এসে ঘিরে দাঁড়ায় কিনা। বইটাও অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল—কোণগুলোতে আঙুলের দাগ···যেখানে কাঁচা হাতের নাম লেখা। হ্যা, একটা পদ্য···"পুষি আর আমি।"—একটা মেয়ে একটা বেড়ালকে বুকে চেপে রয়েছে,···বেশ ছবিটা—বেশ মোটাসোটা গোলগাল মেয়েটা। নীচে পেন্সিলে কি লেখা আন্দাজ কর দিকিন?"

আমি একটু ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলাম, "সৌদামিনী।"

অনিল বলিল, "অনেকটা আন্দাজ করেছিস, তবে অনিল চৌধুরী চিরকালই সেয়ানা কিনা, অত ধরা-ছোঁয়া দেওয়ার পাত্র নয়।—লাল পেন্সিলে লেখা আছে—'সু-দা-ম।' কেউ ধরতে বা ধরিয়ে দিতে পারবে না, নামটা আইনের প্যাঁচ বাঁচিয়ে রেখেছি; এমন কি জাত পর্যন্ত বদলে দিয়েছি—আমাদের সখী সৌদামিনী নয়, একেবারে কৃষ্ণসখা সুদামা!"

মজা নদীর ইউনিয়ন বোর্ডের তৈয়ারি করা পুলের উপর বসিয়া আমাদের অনেকখানি রাত হইয়া গেল, কিন্তু ঐটুকু কথার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নাই। ···আবার অনিলের উচ্ছ্বাস আসিয়াছে, কি রকম একটা স্বপ্নালু দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া বলিতেছে, "তোর অম্বুরীকে আমাদের এই অংশের জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করে শৈল। এক একবার মনে হয় সায়েব হতাম তো বেশ হ'ত—তুই, আমি, অম্বুরী—একসঙ্গে পাশাপাশি ছেলেবেলাকার জীবনের টুকরাটাকরা জড় ক'রে বেড়াচ্ছি। ···এক এক সময় মনে হয় ক্রীশ্চান হয়ে যাই, কিন্তু তা'হলে গ্রামছাড়াই ক'রবে সবাই মিলে, আর এ গ্রাম রাজত্ব দিলেও প্রাণ ধরে আমি ছাড়তে পারব না এই তোকে বলে দিলাম শৈল। একে ছেড়ে যে মরতে হবে এক দিন এইটুকু মনে হ'য়ে এক এক সময় মনটা উদাস ক'রে দেয়। ···অম্বুরীটা বেশ শৈল, কিন্তু বড় আদিম। আমাকে, অর্থাৎ ওর পুরুষটিকে কি করে ঠাণ্ডা রাখবে অষ্টপ্রহর ওর এই চিন্তা, সকালে উনুন ধরান থেকে রাত্রে মশারি ফেলার মধ্যে যা কিছু ওর কাজ সবগুলোরই মুখ আমার দিকে। কষ্ট হয়, কি অসহ্য আদাম-ইভের জীবন বল্‌দিকিন! —ও ব'সে ব'সে আমার স্থূল ভোগের যোগাড় করে যাচ্ছে—রান্না থেকে আরম্ভ ক'রে—আর আমি সপৌরুষে ভোগ ক'রে যাচ্ছি!···"

সাঁতরা আবার মিলাইয়া গেল। মীরা গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে, তাহারই রণন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মীরার সুর কাণে এই প্রথম গেল। মীরার গলা খুব মিষ্ট, তবে সুরের জ্ঞান নিখুঁৎ নয়; কিন্তু আশ্চর্য্য ভুল সুরে এমন একটা ছেলেমানুষি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—লাগিতেছে ভারি মিষ্ট।

রকে মাদুরের উপর অনিল আমি বসিয়া, আমার কোলে অনিলের ছেলেটা, তাহার ঝাঁকড়া মাথার উপর আমার চিবুকটা চাপিয়া বসিয়া আছি। অম্বুরী আমাদের কাপড় কোঁচাইতেছে, আলনায় তুলিয়া রাখিবে। অনিল বলিতেছে—"ওগো, তুমি একেবারেই 'আমি' নয় যে 'আমি-ধ্যান' 'আমি-জ্ঞান' হ'য়ে রয়েছ, একটু নিজের জীবনটাও আলাদা ক'রে দেখ দিকিন। নারী পুরুষের একখানা পাঁজর খসিয়ে তোয়ের করা জানি; কিন্তু তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখে আমার সব পাঁজরাগুলোই খ'সে পড়তে চাইছে···আহা, বেচারি! ···দেখ, তোমার স্বামী-দেবতার বাইরেও জগৎ আছে, গাড়ু মাজা আর কাপড় কোঁচানোর অতিরিক্তও কাজ আছে পৃথিবীতে···"

অম্বুরী হাঁটুতে চাপিয়া কোঁচান কাপড়টা পাকাইতেছে। হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আমার জন্ম জন্ম এইটুকুই বজায় থাক্।"

অনিল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "মাফ কর, তাহ'লে এর পরের জন্মেই তুমি দয়া ক'রে অন্য মানুষ দেখো বাপু, আমায় রেহাই দিও; আমায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে যে তুমি শুধু···জন্মের পর জন্ম না বাপু, আমি আর এর মধ্যে নেই, ক্ষ্যামা দাও···"

আমরা তিন জনেই হাসিয়া উঠিয়াছি,·ছোট ছেলেটাও আমার মুখের দিকে ঘুরিয়া চাহিয়া যোগ দিয়াছে। অম্বুরী হাসির উপর গাম্ভীর্য চাপাইয়া আমায় সাক্ষী মানিয়া অনুযোগ করিতেছে—"শুনলে ঠাকুরপো? হিঁদুর ঘরে এ রকম আদাড়ে কথা শুনেছ কখন? কি মানুষ বাপু!—আমি তো বুঝি না···"

ক্রমশঃ

মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতা

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, এম-এ, বি-এল

পৃথিবীতে মানবের জন্ম হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে; ভারতবর্ষে এরা যে কবে থেকে বসবাস সুরু করেছে তা আমরা জানি না। ভারতের ইতিহাস যা আমাদের জানা আছে তা এখন হতে মাত্র আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ জাতি কোন্ লোক যে ভারতবর্ষে বাস করত আমাদের তা সঠিক জানা নেই।

ইতিহাস-লেখকদের এত দিন অনুমান ছিল যে আর্য্যগণ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এসে ভারতের আদিম নিবাসী কোল, ভীল, সাঁওতালদের মত কৃষ্ণবর্ণ এক অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে পরাজিত ক'রে, রাজ্য বিস্তার করেছিল। এর আগে ভারতে কোন সভ্যতাই বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু সেই অনুমান আমাদের এখন ছাড়তে হচ্ছে।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসবার পূর্ব্বে, সিন্ধুদেশে আর্য্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের এক সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল—তাহার সন্ধান পেয়েছি আমরা মহেন্‌জোদড়োর আবিষ্কারের ফলে।

নানা প্রকার শিলমোহর। [প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে।]

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে, লারকানা জেলায় একটি খুব সুন্দর বড় শহর বিদ্যমান ছিল। এই শহরটি সিন্ধুনদের প্রবল বন্যার জন্য পরিত্যক্ত হয় এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। কত দিন যে এই শহরটি এই ভাবে মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল কে জানতো? আর কেই বা জান্‌তো যে এই স্থানটি সুদূর বাংলা দেশ হ'তে এক জন বাঙালী এসে আবিষ্কার করবে?

গত ১৯২২ সনে প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শহরটি আবিষ্কার করেন এবং পরে ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ দ্বারা এই শহরের অনেকটা অংশ খুঁড়ে বাহির করা হয়। এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীময় এক সাড়া পড়ে যায়, কারণ ইহাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন।

এই শহরটির প্রকৃত নাম যে কি ছিল তাহা কেহ জানে না এবং এই শহর যারা নির্ম্মাণ করেছিল তাদের ইতিহাসও কারও জানা নেই। কিন্তু তারা যে সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠেছিল তা তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যায়। বর্ত্তমানে এই জায়গাটির নাম হচ্ছে "মহেন্‌জোদড়ো", সিন্ধি ভাষায় এর মানে হচ্ছে "মৃতের ঢিপি"। অতীত কালের মৃত ব্যক্তিদের দেহাবশেষ এখানে নিহিত ছিল বলেই পরবর্ত্তী কালের লোকেরা উহার নাম দিয়েছিল "মৃতের ঢিপি" বা "মহেন্‌জোদড়ো"। ইহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে

বাঁধান পুকুর [প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে]

স্থানীয় লোকেরা ভূতের ভয়ে দিনের বেলায়ও সেই জায়গায় যেত না। সেই জন্যই বোধ হয় এই স্থানটি বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পরিত্যক্ত ও লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন ছিল।

মহেন্‌জোদড়ো শহরটি খুব বিস্তৃত। প্রায় আট-দশ বৎসর ধরে খুঁড়ে'এর কয়েকটি অংশ বাহির করা হয়েছে। আরও অনেক অংশ এখনও মাটির নীচে রয়েছে। এই শহরটির খননকার্য্যে এক সময়ে আমি নিযুক্ত ছিলাম ব'লে এর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে অনেক বিষয় জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃত ভাবে বলা এখানে সম্ভব হবে না। আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানা গিয়েছে তা হ'তে কেবল মোটামুটি ভাবে মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতার একটু আভাস দিব।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা এই শহরটি খুব দক্ষতার সহিত নির্ম্মাণ করেছিল। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা শহরের ভিতর দিয়ে এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে চলে গিয়েছে। তাদের দু-ধারে রয়েছে ইটের নির্ম্মিত বিশাল অট্টালিকা, প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি। বড় রাস্তা থেকে অলিগলি শহরময় ছেয়ে গিয়েছে এবং তার দু-ধারেও রয়েছে ছোট-বড় সকল রকম পাকা বাড়ী।

এই শহরের নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রধান বিশেষত্ব—শহরময় মাটির নীচে ইট-বাঁধান পাকা নর্দ্দমা বা ড্রেন। প্রতি গৃহ থেকে নোংরা জল বাড়ীর নর্দ্দমা দিয়ে এসে গলির নর্দ্দমায় গিয়ে পড়ত। আবার গলির নর্দ্দমার জল পড়ত গিয়ে বড় রাস্তার নর্দ্দমায়। বড় রাস্তার মাঝে মাঝে থাকত বাঁধান চৌবাচ্চা, সেখানে সমস্ত নর্দ্দমার জল জম্‌ত এবং বোধ হয় মেথরেরা সেই ময়লা জল ও আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করত।

আপনারা শুনে বোধ হয় অবাক্ হবেন যে আজও অনেক শহরে মাটির নীচের নর্দ্দমা ত দূরের কথা, এমন কি খোলা কাঁচা নর্দ্দমাও নেই। আর পাঁচ হাজার বৎসর আগে কি পরিপাটি ক'রে মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা এই সকল নর্দ্দমা তৈরি করেছিল। দেখে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। আর এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদের কি গভীর জ্ঞান ছিল এবং কত দূর সভ্য এরা ছিল।

বড় বড় ইট দিয়ে এই শহরের বাড়ীগুলা নির্ম্মিত। ঐতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষে যে প্রকার ছোট ছোট ইট আমরা সচরাচর দেখতে পাই, মহেন্‌জোদড়োর বাড়ীর ইট-গুলি সেরূপ নয়। উহা বর্ত্তমান কালের ইটের মত বড় বড়। এই ইট দেখে মনে ভ্রম হয় যে বাড়ীগুলি বুঝি এখনকারই তৈরি।

মহেন্‌জোদড়োর বাড়ীগুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, যদিও বাড়ীগুলি খুব বড় বড়, কিন্তু খুবই সাদাসিধে ধরণের; কোন কারুকার্য্যই দেখতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় কাঠের কারুকার্য্য দ্বারা এই বাড়ীগুলি অলঙ্কৃত ছিল, কিন্তু কাঠ পচে মাটিতে মিশে যাবার দরুন এখন আর তার কিছুই জানবার উপায় নেই। কোন কাঠের জিনিসই পাওয়া যায় নি।

এক-একটা বাড়ীতে অনেকগুলি কামরা ছিল এবং কাঠের দরজা জানালা ছিল। ধনী লোকদের বাড়ী এক-একটি ছোটখাট দুর্গ-বিশেষ ছিল। বাড়ীগুলির রাস্তার দিকের দেয়াল খুব পুরু। সদর দরজা ছিল একটি। কোন কোন বাড়ীতে ছোট খিড়কির দরজাও ছিল। বাড়ীর সদর দরজায় বরাবর ছোট একটি ঘর থাকত দরোয়ানের জন্য, পরে থাকত বহির্বাটীর বড় ঘর। পেছনে থাকত অন্দরমহল, শোবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। অনেক

দোতলায় উঠবার সি ড়ি [আর্থার প্রবস্থেনের সৌজন্যে]

দোতলা বাড়ীও ছিল। দোতলার সিঁড়িগুলি এখনকার সিঁড়ির মতই ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করে জলের জন্য পাকা কুয়া এবং তার পাশে বাঁধান জায়গা ছিল, বাসন মাজবার ও অন্যান্য গৃহকাজের জন্য। এই বাঁধান জায়গাটি একটি নর্দ্দমার সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং নোংরা জল তা দিয়ে রাস্তার নর্দ্দমায় পড়ত। বাড়ীর পেছনে ছিল আজকালকার মত পাকা পায়খানা। মেথরেরা ময়লা পরিষ্কার ক'রে নিত।

মহেন্‌জোদড়োর বাড়ীগুলি প্রায়ই কাদার গাঁথুনি—চুণ ও সুরকির মশলা দিয়ে নয়। কোন কোন বাড়ীতে জিপসাম্ দিয়ে গাঁথুনি।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে—তা কোন রাজার প্রাসাদ বলে অনুমান করা হয়। এটা মন্দিরও হ'তে পারে। এই প্রাসাদের মধ্যে চার দিকে রয়েছে অনেক ঘর। তার মাঝখানে রয়েছে চার দিক খোলা বিস্তৃত এক হল-ঘর। এই হল-ঘরের ছাদ বড় বড় স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল, এখনও সেই স্তম্ভের চিহ্ন রয়েছে। এই হল-ঘরের ঠিক পাশেই ইট-বাঁধান একটি পুকুর আছে। এই পুকুরের চার দিকে বারান্দা-যুক্ত সারি সারি ঘর। হল-ঘর হতে একটি বাঁধান সিঁড়ি ও তার উল্টা দিক থেকে আর একটি সিঁড়ি ধাপে ধাপে পুকুরে নেমে গিয়েছে।

এই পুকুরটি সব সময়েই জলে ভরা থাকত। হয়ত রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা রোমের মহিলাদের মতই এই পুকুরে জলকেলি করত। কিন্তু আমার মনে হয়—এই অট্টালিকাটি একটি মন্দির এবং এই পুকুরের পবিত্র জলে ধর্ম্মার্থীরা পূত হ'ত। পুকুরের নিকটেই একটি কূয়া দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় ঐ কূয়া থেকেই পুকুরটি জলে ভর্ত্তি করা হ'ত। আবার ঐ পুকুরের জল নোংরা হ'লে তা বের ক'রে দেবার জন্য একটি বৃহৎ নর্দ্দমা ঐ পুকুরের সহিত সংলগ্ন ছিল। নর্দ্দমাটির পরিধি এত বড় যে অনায়াসে একটা লোক দাঁড়িয়ে ভিতরে চলতে পারে।

এই প্রাসাদের অন্য দিকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর স্নানাগার রয়েছে। খুবই আশ্চর্য্য এই যে, যখন পৃথিবীর অন্যান্য লোক অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ে মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা এতই সভ্য ছিল যে তাহারা স্নানের ঘর তৈরি করবার দরকার বোধ করেছিল।

মহেন্‌জোদড়ো হ'তে বহু রকম দ্রব্যসামগ্রী খুঁড়ে বার করা হয়েছে। সেই সকল জিনিস দেখে তাদের উচ্চ ধরণের জীবনযাত্রার বিষয় অনেক জানা যায়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, মহেন্‌জোদড়োর অনেক জিনিসই দেখতে প্রায় আজকালকার জিনিসের মত, তাই হঠাৎ এসব সাধারণ ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু যখন মনে করা যায় কোন্ যুগে, কি ভাবে জিনিসগুলি তৈরি হয়েছিল তখন বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। কি নিপুণতার সহিত কত অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে তারা সব জিনিস তৈরি করেছে।

কূপ ও ড্রেন [আর্থার প্রবস্থেনের সৌজন্যে]

যুগে যুগে মানব নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার ক'রে এসেছে। যে-যুগে যে-ধাতু দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয়েছে সেই যুগকে সেই ধাতুর যুগ বলা হয়। যখন কোন ধাতুই আবিষ্কৃত হয় নি তখন লোকেরা প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করত। কুড়ুল, ছুরি, বর্শা সবই ছিল তখন পাথরের। সেই যুগকে বলা হয় প্রস্তর-যুগ। প্রস্তর-যুগের হাজার হাজার বৎসর পরে এল তাম্র-যুগ, তখন লোকেরা

তামার অস্ত্রশস্ত্র বাসনপত্র ব্যবহার করত। তাম্র-যুগের হাজার হাজার বৎসর পরে এল আমাদের বর্ত্তমান লৌহযুগ।

মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতা বিকাশ হয়েছিল যখন প্রস্তর-যুগ শেষ হয়ে এসেছে এবং তাম্র-যুগ সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। মহেন্‌জোদড়োতে আমরা তাই পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং তামার অস্ত্রশস্ত্র দুইই বর্ত্তমান দেখতে পাই।

লোহা বা স্টীলের যন্ত্র দিয়ে এখন জিনিস তৈরি করা সহজ, কিন্তু পাথরের যন্ত্র বা নবাবিষ্কৃত নরম তামার যন্ত্রপাতি দিয়ে জিনিস তৈরি করা কত দূর কষ্টসাধ্য মনে রাখতে হবে আরও মনে রাখতে হবে যে তারা যে-সব জিনিস প্রথম সৃষ্টি করেছিল, পাঁচ হাজার বৎসর ধরে আজ পর্য্যন্ত আমরা সেই সব জিনিসই নকল করে তৈরি করছি।

রাস্তা ও ড্রেন [প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে]

মহেন্‌জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ হ'তে বহু জিনিস খুঁড়ে বার করা হয়েছে। প্রধান প্রধান জিনিসগুলার এখানে উল্লেখ করছি।

তামার ঢালাই-করা এবং পেটান ছোট-বড় নানা আকৃতির বহু বাসনপত্র পাওয়া গিয়েছে। কারুকার্য্য করা সরু গলার ঢাকনা বিশিষ্ট একটি জলের কুঁজো পাওয়া গিয়েছে। দেখে বোঝা যায়, মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা কিরূপ সুরুচিসম্পন্ন ও সৌখিন ছিল। তামার কলসী, হাঁড়ি, থালা, বাটি, ঢাকনাওয়ালা প্লেট ও গৃহস্থালীর বহুবিধ বাসনপত্র পাওয়া গিয়েছে। তামার নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও পাওয়া গিয়েছে যেমন কুড়ুল, বর্শা, তীরের ফলক, ছেনি, করাত, হাতুড়ি, ছুরি, দাড়ি কামাইবার খুর, হাতি চালাইবার অঙ্কুশ, কর্ম্মকারের নিক্তি, এখনকার মতই সেলাই করবার সূচ ও মাছ ধরবার বঁড়শি। পূর্ব্বেই বলেছি যে মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতার কাল প্রস্তর-যুগ ও তাম্র-যুগের মাঝামাঝি, তাই এই সব জিনিস তামার নির্ম্মিত। লৌহ তখন আবিষ্কৃত হয় নি, তাই মহেন্‌জোদড়োতে কোন লৌহের জিনিস পাওয়া যায় নি।
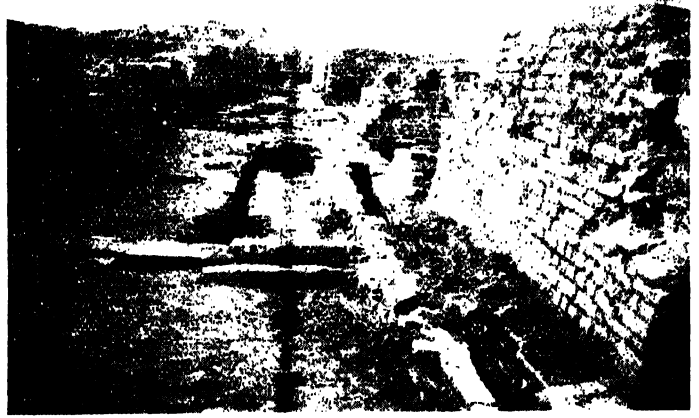
তামার অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া পাথরের কুড়ুল, চাকু, ছুরি প্রভৃতিও পাওয়া গিয়েছে। তীর ধনুক বর্শা কুঠার দিয়ে ঐ সময়ের লোকেরা যুদ্ধবিগ্রহ করত ও জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার শিকার করত। নদীতে জাল ও বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরত।

স্তূপের নিকট ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য [প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে]

নানা প্রকার দ্রব্যের তৈরি মালার দানা রাশি রাশি পাওয়া গিয়েছে। কোনটা মূল্যবান পাথরের, কোনটা

পোড়া মাটির পুতুল [প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে]

সোনার, কোনটা তামার, আবার কোনটা কাচের ন্যায় এক প্রকার জিনিসের তৈরি। হলদে রঙের কর্ণেলিয়ান পাথরের দানা দিয়ে তৈরি একটি কোমরের মেখলা বা গোট আস্ত পাওয়া গিয়েছে, তা বাস্তবিকই দেখবার যোগ্য।

মহেন্‌জোদড়োর জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে পাথরের শিলমোহর। আগ্রা বা দিল্লীতে যে এক প্রকার নরম সাদা পাথরের খেলনা পাওয়া যায়, সেই প্রকার পাথরের তৈরি বহু শিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এই সব শিলমো রে খোদিত রয়েছে নানা প্রকার জীবজন্তু-- যেমন গরু, মহিষ, গণ্ডার, বাঘ, কুমীর, এক-শিং-বিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু ইত্যাদি। তাছাড়া প্রত্যেক শিলের মধ্যে এক প্রকার লেখা খোদাই করা আছে যে ভাষার মানে এখনও পর্য্যন্ত কেহই বুঝে উঠতে পারে নি। নানা প্রকার ছবি হচ্ছে সেই ভাষার অক্ষর। ছবিগুলি পর পর সাজিয়ে তবে প্রকাশ করা হ'ত। শিলমোহরগুলি চৌকা লম্বা, ছোট বড় নানা আকৃতির। প্রত্যেক শিলমোহরের পিছনে আড়াআড়ি ভাবে একটি ছিদ্র রয়েছে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য। এই শিলমোহরগুলি যে কি জন্য ব্যবহৃত হ'ত তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উহা মুদ্রার ন্যায় কাজ করত। কারও ধারণা উহা মাদুলী। আমার মনে হয়, এগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পর্কে ব্যবহৃত হ'ত। বৈষ্ণবদের তিলক-কাটার শিলমোহর এখনও আমরা বাংলা দেশে দেখতে পাই।

পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মতই খেলাধুলা করত এবং তখনকার বাপমায়েরাও রঙীন খেলনা ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে আনন্দ পেত। তাই রাশি রাশি পুতুল ও খেলনা মহেন্‌-জোদড়োতে পাওয়া গিয়েছে। বাংলা দেশের গ্রামের মেলায় পোড়ামাটির পুতুল ও খেলনা অনেকে দেখে থাকবেন। মহেন্‌জোদড়োর পুতুল ও খেলনাগুলি ঠিক ঐ ধরণের। পুতুলগুলি দেখে মনে হবে না যে এগুলি পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার তৈরি। পোড়ামাটির পুতুল ছাড়াও তামার, হাড়ের, হাতির দাঁতের ও নানাবিধ দ্রব্যের তৈরি পুতুলও রয়েছে। ঘোড়া, গরু, ভেড়া, মহিষ, বানর, হাঁস, মুরগী, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি নানা রকম পুতুল ও মেয়েদের খেলবার মাটির ছোট হাঁড়িকুড়ি, থালা বাটি, গ্লাস, ঘট প্রভৃতি বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছে। খেলনার

বড় রাস্তা ও তাহার দুই ধারে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ [আর্থার প্রবস্থেনের সৌজন্যে]
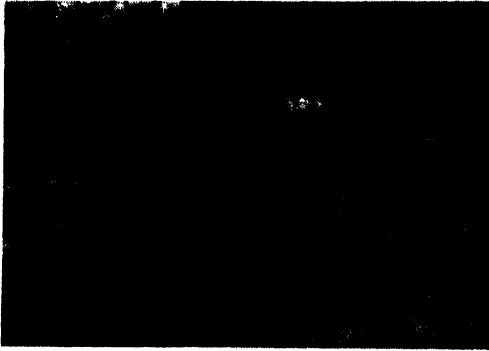
কূপ ও তাহার নিকট বাঁধান জায়গা [আর্থার প্রবস্থেনের সৌজন্যে]

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকা-দেওয়া নানা রকম পোড়ামাটির গাড়ী যা ছোট ছেলেমেয়েরা দড়ি দিয়ে বেঁধে টান্‌ত। মাটির ঝুনঝুনি ও মাটির বাঁশী বা হুইস্‌ল্ পাওয়া গেছে যা এখনও বাংলা দেশে দেখতে পাওয়া যায়। মাটির মুরগী বা কোন পাখীর পেছনে দুটি ছিদ্র রয়েছে তাতে ফুঁ দিয়ে বাঁশী বাজাতে হয়। এই বাঁশী যখন প্রথম খুঁড়ে বার করা হ'ল তখন ফুঁ দিয়ে দেখলাম পাঁচ হাজার বৎসর পরেও আবার বেজে উঠল।

তখনকার ছেলেরা এখনকার মত মার্ব্বেলও খেলত। ছোটবড় নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পাথরের ও মাটির মার্ব্বেল পাওয়া গিয়েছে। শুধু যে ছেলেমেয়েরা খেলা করত তা নয়, বড়রাও খেলতে ভালবাসত। দাবা পাশা তারা খুব খেলত বলেই মনে হয়, কেননা বহু দাবার বড়ে পাশার ছক্ পাওয়া গিয়েছে। এখনকার "লুডো"র ছকের মত ছকও পাওয়া গিয়েছে।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে মাটির বাসন ব্যবহার করত। নানা প্রকার হাঁড়িকুড়ি, থালা, বাটি, গ্লাস, জল রাখবার বড় বড় জালা প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। আজকালকার কুমোরেরা যে রকম চাক্ ঘুরিয়ে হাঁড়ি তৈরি করে এবং যে ভাবে হাঁড়ি পুড়িয়ে নেয় মহেন্‌জোদড়োর কুমারেরাও সেই ভাবেই হাঁড়ি তৈরি করত। হাঁড়ির গায়ে নানা প্রকার চিত্র করবার প্রথাও তখন ছিল।

মহেন্‌জোদড়োর লোকদের কি রকম পোষাক ছিল তা যদিও জানা যায় নি তথাপি যে সকল জিনিষ পাওয়া গেছে তা থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। পুরুষেরা বোধ হয় কোমরে ধুতি জড়িয়ে প'রত, মাথায় পাগড়ি বাঁধত, গায়ে কুর্ত্তা বা কোট পরত। কোটের বোতামও পাওয়া গিয়েছে। বোধ হয় তারা চামড়ার জুতা ব্যবহার করত। মহেন্‌জোদড়োর মহিলারা যে খুবই সৌখিন ছিল তা তাদের প্রসাধনের উপকরণ ও নানা প্রকার অলঙ্কারের বহর দেখেই বোঝা যায়। সোনা, রূপা, তামা ও মূল্যবান রং-বেরঙের পাথরের নানাবিধ অলঙ্কার তথায় পাওয়া গিয়েছে। মেয়েরা মাথায় প'রত সোনার সিঁথি, কপালে টায়রা, গলায় লহরে লহরে মতির মালা, হার ও মটরমালা,—হাতে বালা, চুড়ি, কঙ্কণ ও রুলি; কোমরে মেখলা বা গোট; অঙ্গুলীতে আংটি, কানে মাকড়ি, দুল; নাকে নাকছাবি বা সরু শিকল দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা বেশর। এখনও সিন্ধুদেশে ও বাংলা দেশে বেশরের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। শাঁখার চুড়ি, হাতীর দাঁতের চুড়ি, এক প্রকার কাচের চুড়িও পরত, তাতে আজকালকার মত নানা প্রকার নক্সা থাকত—যেমন লিচুকাঁটা, ডায়মণ্ডকাঁটা পৈঁচি ইত্যাদি। মেয়েদের হাতের কব্জি হ'তে কণ্ই পর্য্যন্ত চুড়িতে ভরা থাকত। এই রকম পরবার ধরণ এখনও সিন্ধুদেশের গ্রামের মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

মেয়েরা চুল বাঁধত ভারি সুন্দর ক'রে। বেণী ক'রে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর খোঁপা তারা বাঁধত এবং খোঁপায় গুঁজত হেয়ার-পিন ও ফুল। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হেয়ার-পিন পাওয়া গিয়েছে। কোন পিনের মাথায় রয়েছে কয়েকটা বানর পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, কোন কোনটায় রয়েছে পশুপক্ষীর মূর্ত্তি, পদ্মের চাকি, ফুল, ফুলের কুঁড়ির নমুনা ইত্যাদি।

মেয়েরা তামার দর্পণে মুখ দেখে হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াত। বাংলা দেশে বিবাহের সময় বরকনের হাতে যে রকম পিতলের দর্পণ দেওয়া হয়

ছোট গলি ও ড্রেন [আর্থার প্রবস্থেনের সৌজন্যে]

এই দর্পণ ঠিক সেইরূপ, কেবল তামার তৈরি। আর তাদের দু-মুখবিশিষ্ট চিরুণীগুলিও ঠিক আজকালকার চিরুণীর মতই। মেয়েরা চোখে প'রত সুরমা বা কাজল। সুরমা রাখবার জন্য লম্বা ধরণের মাটির ও পাথরের পাত্র ছিল। সাদা এলাবেষ্টার পাথরের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সুরমার পাত্র পাওয়া গেছে।

শাঁখার অলঙ্কারও বহুল পরিমাণে মহিলারা পরত; শাঁখার চুড়ি, আংটি, নাকছাবি, মালা প্রভৃতি অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে। ঢাকার শাঁখারীদের মতই শাঁক কেটে এই সব অলঙ্কার তৈরি হ'ত। শাখার একটি করাত পাওয়া গিয়েছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তা দেখতে প্রায় ঢাকার শাঁখারীদের করাতের মতই।

পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও মালা ছাড়া নানাবিধ পাথরের জিনিস পাওয়া গিয়েছে; যেমন থালা, গ্লাস, বাটি, তৌল করবার পাথর ইত্যাদি। আজকালকার মতই মশলা পিষিবার পাথরের শিল-নোড়াও পাওয়া গিয়েছে। আজও তাতে মশলা পেষা যায়।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব, ধান, শাকসব্জী, ফলমূল, ছাগল ভেড়া, গরু হাঁস মুরগী শূকর কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস এবং নদী ও সমুদ্রের নানা প্রকার মাছ। শামুক গুগলীও তারা খেত। আঁস্তাকুড়ের ভেতর অর্দ্ধচর্ব্বিত মুরগীর ঠ্যাং, কচ্ছপ, গরু, ভেড়া প্রভৃতির হাড় পাওয়া গেছে।

কাঠের খাট, তুলার বালিশ, তোষক লেপ প্রভৃতি মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা ব্যবহার করত। একটি মাটির খেলনা পাওয়া গেছে, তাতে একটি মহিলা খাটের উপর শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। মহিলাটির অর্দ্ধাঙ্গ চাদরে আবৃত।

তখন তুলার চাষ খুবই ছিল এবং মেয়েরা তকলি দিয়ে সুতা কাটত। বহু মাটির তকলি পাওয়া গেছে। কাঠের চরকা ও তাঁত নিশ্চয়ই ছিল। সিন্ধুদেশের তাঁতের কাপড় এক দিন বিখ্যাত ছিল। এখানে তুলার চাষ এখনও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এবং তাঁতে কাপড় হচ্ছে। পাঁচ হাজার বৎসর আগে সিন্ধুদেশে যে তুলার চাষ ও বস্ত্র-বয়ন সুরু হয়েছিল তাহাই বোধ হয় ভারতে বয়নশিল্পের গোড়াপত্তন।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল ব'লে মনে হয়। তারা পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করত বলেই এত বড় একটা শহর গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা সমাজকে সেবা করত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্যে পারদর্শী ছিল। মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা বাণিজ্যে খুবই পটু ছিল। বহু দেশ-বিদেশের সঙ্গে স্থলপথে এবং জলপথে বাণিজ্য করত। বড় বড় সমুদ্রগামী নৌকা তাদের ছিল। এখনও সিন্ধুদেশের মাঝিরা এই সব নৌকায় ক'রে আরব সাগর পার হয়ে সুদূর আফ্রিকায় চলে যায়। বাণিজ্য ছাড়া তাদের আরও অন্যান্য ব্যবসায় ছিল। রাজকর্ম্মচারী, স্যাক্‌রা, মুদি, কুম্ভকার, হাতীর দাঁতের কারিগর, শাঁখারী, রাজমিস্ত্রী, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, মেথর, জেলে, পুরোহিত, মাস্টার, সৈনিক প্রভৃতির কাজ করত। এ ছাড়া নর্ত্তকীদের ব্যবসায়ও ছিল। নৃত্যভঙ্গিতে একটি পিতলের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় নৃত্যগীতাদিরও বেশ প্রচলন ছিল।

মহেন্‌জোদড়োর লোকেরা যে শিক্ষিত ছিল তা তাদের শিলমোহরের উপর লেখার প্রচলন দেখেই বোঝা যায়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এই শিলমোহর পাওয়া গেছে।

যানবাহনের মধ্যে প্রধান ছিল আজকালকার মত গরুর গাড়ী ও নৌকা। তারা রথ, গরু, উট প্রভৃতিও যানবাহনের জন্য ব্যবহার করত। এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মহেন্‌জোদড়ো-অধিবাসীদের ঘোড়া ছিল না, কারণ তখন লোকেরা বন্য ঘোড়া বশ করতে শেখে নি।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীদের যে কি ধর্ম্ম ছিল তা এখনো ঠিক ক'রে জানা যায় নি, কিন্তু এটা ঠিক যে আর্য্যদের বৈদিক ধর্ম্ম হ'তে তাহাদের ধর্ম্ম পৃথক্ ছিল। তারা কোন মূর্ত্তিপূজা করত কি না তাও সঠিক কিছুই জানা যায় নি—তবে কতকগুলি পোড়া মাটির পুতুল পাওয়া গিয়েছে তা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত ব'লে মনে হয়। একটি শিলমোহরে একটি মূর্ত্তি আছে তাকে শিব ব'লে অনুমান করা হয়। অনেক শিবলিঙ্গও মহেন্‌জোদড়োতে পাওয়া গিয়েছে। তাতে মনে হয় শৈবধর্ম্ম তখনও প্রচলিত ছিল। দেবাদিদেব বুড়াশিবের পূজা যে বহুকাল ধ'রে চলে আস্‌ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা মৃতের দাহ করত, কি কবর দিত তা জানা যায় নি। অনেকগুলি নরকঙ্কাল রাস্তায় ও ঘরের ভিতর পাওয়া গেছে। এগুলিকে কবরস্থিত বলা যায় না। একটি ঘর থেকে ১২টি কঙ্কাল আমি খুঁড়ে বার করেছিলাম। তার মধ্যে ছিল কয়েকটি শিশু, কয়েকটি পুরুষ ও একটি যুবতী স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটির কঙ্কাল-হাতে তখনও পরা রয়েছিল তামার একগাছি বালা আর মাথার কাছে পড়ে ছিল একটি হাতীর দাঁতের চিরুণী। এই

কঙ্কালগুলির নীচে পাওয়া গেছে বড় বড় দুটি হাতীর দাঁত। আমার মনে হয়, এই বাড়ীটা ছিল কোন হাতীর দাঁতের কারিগরের বাড়ী। ঘরে আগুন লেগে সপরিবারে পুড়ে মরেছে। কঙ্কালগুলির কোন কোন জায়গায় পোড়ার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

এই সব নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলি দেখে মনে হয় মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা আমাদের মতই ছিল। এদের সঙ্গে বর্ত্তমান সিন্ধি, গুজরাটী, মারহাটি ও বাঙালীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়।

মহেন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা যে-শহরটি গ'ড়ে তুলেছিল তা সিন্ধুনদের প্রবল বন্যার জন্য বার-বার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। একাদিক্রমে অন্ততঃ সাত বার তারা শহরটি ছেড়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসে বন্যাবিধ্বস্ত বাড়ীগুলির উপর নূতন ক'রে বাড়ী তৈরি করেছিল। এখনও সেই বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচে একটির উপর আর একটি স্তরে স্তরে রয়েছে। শেষবার বন্যার পর তারা আর বোধ হয় মহেন্‌জোদড়োতে ফিরে আসে নি। খুব সম্ভব তারা অন্যত্র শহর তৈরি ক'রে বসবাস স্থরু করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা স্থানে সিন্ধু হ'তে বাংলা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহেন্‌জোদড়োর খনন-কার্য্যের অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে হয় যে, মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতার কোন একটা যোগসূত্র বাংলা দেশের সভ্যতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত আমরা সেই সূত্র দেখতে পাব।

মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতা যে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নি তার প্রমাণ-স্বরূপ সিন্ধুদেশে আরও কয়েকটি পুরাতন শহর পরলোকগত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় আবিষ্কার করেন, তাতে দেখা গিয়েছে যে মহেন্‌জোদড়ো শহরটি ছেড়ে আসবার পর ঐ সভ্যতার অবনতি ঘটলেও, তা টিকে ছিল বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত।

বহু শত বৎসর পরে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধেরা মহেন্‌জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের উপর সেই প্রাচীন ইট দিয়ে একটি প্রকাণ্ড চৈত্য ও মন্দির তৈরি করেছিল। সেই বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে।

মহেন্‌জোদড়োর এই সব ধ্বংসাবশেষ ভারতের অতীত কালের উচ্চ সভ্যতার গৌরবকাহিনী ঘোষণা করছে। অতীতের ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিল। অতীতের কাহিনী স্মরণ ক'রে আমরা যেন লুপ্ত গৌরব আবার উদ্ধার করতে পারি। তাই কবির কথায় বলছি—

বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত
সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।

বাণীর আসন

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

চিরদিন ভরা রবে বাণীর আসন
জেনেছি এ মহা সত্য, এ ধ্রুব ভাষণ
যেন বেদের চিহ্নিত,—যেন নিজে বসি কাল
এ বাণী রচেন, বুনি অক্ষরের জাল।
স্বপ্ন যবে হবে লয় মায়া হবে ছিন্ন,
বিলুপ্ত হইবে যত অধ্রুবের চিহ্ন;
বাণীরূপা তপস্বিনী অন্তরে রহিবে,
নব নব সৃষ্টিরসে আনন্দ বহিবে।

আকাশে বিছান যেথা আসন ধ্রুবের,
উদ্ভূত উদ্গীত যেথা সংকল্প শুভের;
সেথায় তোমার বাণী হবে উচ্চারিত,
দ্যুলোকে ভূলোকে হবে প্রাণ সঞ্চারিত।
প্রেমের অক্ষয় জ্যোতি অফুরন্ত দান,
ধ্রুবের হৃদয়ে বাণী নিত্য অধিষ্ঠান।

মানসপটে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসীতা দেবী

১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ আশী বৎসর অতিক্রম করিবেন। বাংলায় ও বাংলার বাহিরে অনেক স্থানেই উপযুক্ত ভাবে তাঁহার জন্মোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগেকার কয়েকটি দিনের কথা আমার এই সূত্রে মনে পড়িতেছে। আমি তখন বালিকা মাত্র। ১৩১৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কবিবরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে একটি উৎসব হয়। কলিকাতা হইতে অনেক নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। আমি আমার দিদি ও পিতার সঙ্গে সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই। সঙ্গে পরিচিত আরও অনেকে ছিলেন। বালিকা ও তরুণী মিলিয়া আমরাই বারো-চৌদ্দ জন ছিলাম বোধ হয়।

আশৈশব আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির সহিত পরিচিত। কিন্তু শৈশব ও বাল্যের প্রথম ভাগ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে (এখনকার যুক্তপ্রদেশে) কাটানর জন্য কবিকে চোখে দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে দুই-এক বার মাত্র ঘটিয়াছিল। আমার যখন পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র বয়স, তখন রবীন্দ্রনাথ একবার এলাহাবাদে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে। আমরা তখন এলাহাবাদ সিভিল লাইন্‌সে একটি বাংলাতে বাস করিতাম। বিকাল বেলা বাড়ীর ভিতরের উঠানে খেলা করিতেছি, বাবা তখন সবে মাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় আমাদের "মহারাজ" (পাচক) ছুটিয়া আসিয়া তাহার দেহাতি হিন্দীতে মহা ব্যস্ত ভাবে খবর দিল যে বাহিরে দু-জন রাজা আসিয়াছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কোথায় বসান হইয়াছে। "মহারাজ" (পাচক) বলিল, সে তাঁহাদের নিজের খাটিয়া পাতিয়া বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে! বাবা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার পিছন পিছন রাজা দেখিবার আগ্রহে ছুটিয়া গেলাম। উপকথায় রাজা ও রাজপুত্রদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা অনেক শুনিয়াছিলাম, রাজার চেহারা কেমন হয় কল্পনাও খানিকটা করিয়াছিলাম। কিন্তু অভ্যাগত দুই জনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, রাজারা যে এত সুন্দর হয় তাহা জানা ছিল না। সত্যই তাঁহারা আমাদের বুদ্ধিমান 'মহারাজে'র দড়ি-ছাওয়া খাটিয়ার উপরেই বসিয়াছিলেন! তাঁহারা মাথায় ইরানী পাগড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন, এক জনের পরিচ্ছদ কাল রঙের ও আর এক জনের ধূসর রঙের, এই মাত্র এখন মনে আছে। অল্পক্ষণই তাঁহারা ছিলেন। চলিয়া যাইবার পর বাবা আমাদের বলিয়া দিলেন যে, কাল-পোষাক-পরা যিনি, তিনিই রবীন্দ্রনাথ, ও ধূসর-পোষাক-পরা যিনি, তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

ইহারও সাত-আট বৎসর পরে আমরা পশ্চিমের বাস উঠাইয়া বরাবরের মত কলিকাতায় চলিয়া আসি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি বাড়ীতে আমরা তের-চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। প্রবাসী-কার্য্যালয়ও ইহার নীচের তলাতেই ছিল। এই বাড়ীর পাশে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী। ইহার একতলায় "দেবালয়"। শশিপদ বাঁচিয়া থাকিতে প্রতি সপ্তাহেই "দেবালয়ে" উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতাদি হইত। এখন হয় কি না তাহা বলিতে পারি না এইখানে এক দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখি। উহা বোধ হয় ১৩১৭ সালে, ঠিক তারিখ বলা এখন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও সকলের অনুরোধে তাঁহার নূতন রচিত "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে", এই গানটি গাহিয়া শোনান। প্রথমে "দেবালয়ে"র ঘরটিই মানুষে পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে পৌঁছিবামাত্র 'দেবালয়ে'র সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণে কি রকম লোকে ভরিয়া উঠিল তাহা মনে আছে। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এই গানটির ভিতরেও পৌত্তলিকতার আভাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন, এবং তিনি সস্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন, কোনো উত্তর দিলেন না, ইহাও মনে পড়ে।

১৩১৭ সালের ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "রাজা" প্রথম অভিনীত হয় বোধ হয়। আমার দিদি আরও কয়েকটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়া এই অভিনয় দেখিয়া আসেন।

অসুস্থ থাকাতে আমি সেবার তাঁহার সঙ্গে যাইতে পার নাই। দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন শান্তিনিকেতনের ও অভিনয়ের গল্প আরম্ভ করিলেন, তখন আমার আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার ত আর কোনো প্রতিকার সম্ভব নয়? স্থির করিলাম, ২৫শে বৈশাখ যে উৎসব হইবে তাহাতে যেমন করিয়া হোক যাইবই। এক মাস আগে থাকিতে বাবা মাকে বলিয়া কহিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম, সঙ্গিনী ও আরও কয়েক জন জুটিয়া গেলেন।

২২শে বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে আমরা এক দল ছেলেমেয়ে বাবা ও স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ট্রেনেই আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যাইতেছিলেন, অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। "রাজা" অভিনয় এবারও হইবে শুনিয়াছিলাম। তাহার অনেক সাজ-সরঞ্জাম এই ট্রেনেই চলিল দেখিলাম। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি দুইটা বা আড়াইটার সময় বোলপুর স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বেশীক্ষণ গাড়ী থামে না, এক রকম হুড়াহুড়ি করিয়াই ট্রেন হইতে নামিতে হইল। সবাই নামিয়াছে কি না, কাহারও পোঁটলা-পুঁটলি ট্রেনে পড়িয়া আছে কি না, এই লইয়া খানিক চেঁচামেচি, খোঁজাখুঁজি চলিল। তাহার পর সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী ও একটি বলদ-বাহিত বস্ অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। আমাদের পরিচিত দুই জন যুবক শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা যে হাঁটিয়া যাই, তাহা হইলে দু-ধারের দৃশ্যাবলি ভাল করিয়া দেখা হয়। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা তাহাতে একান্তই নারাজ, তাঁহারা আমাদের গাড়ী না চড়াইয়া কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। ঘোড়ার গাড়ীতে চার জন ও অন্য সকলে বস্-এ চড়িয়া যাত্রা করা গেল। সেদিন শুক্ল পক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নায় চারি দিক উদ্ভাসিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোলপুরের বাজার ছাড়াইয়া আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বালিকার দৃষ্টিতে সেই আলোকপ্লাবিত প্রান্তর স্বপ্নলোকেরই মত সুন্দর লাগিয়াছিল, এখনকার চোখে আর কিছুই যেন তত সুন্দর লাগে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঘোড়ার গাড়ী আগে আগে আসিয়াছে, বলদের গাড়ীটি কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলাম, এক জন চাকর আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। একটি বাগানের ভিতর দিয়া গিয়া একটি চওড়া বারান্দা-ঘেরা বাড়ীতে উঠিলাম। বাড়ীটির চারি দিকেই বাগান, অনেকগুলি সুন্দর আমলকী গাছ চোখে পড়িল। শুনিলাম ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী, তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তখন পুরী বেড়াইতে গিয়াছেন, তাই অতিথিদের এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীটির নাম শুনিলাম নীচু বাংলা। এখানে কেবল আমরা মেয়েরা ছিলাম; একমাত্র কেবল বাবাকে কবি আমাদের অভিভাবক করিয়া সেখানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এক জন ভদ্রলোক আসিয়া এই সময় আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। দিদির কাছে শুনিলাম তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আগের বার যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া গিয়া ইঁহার ভদ্রতা ও অতিথি-বৎসলতার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন দেখিলাম তাঁহারা অত্যুক্তি ত করেনই নাই, হয়ত বা কমাইয়া বলিয়াছিলেন।

সামনের চওড়া বারান্দায় শতরঞ্চি বিছাইয়া আমাদের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গিনীরা তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। আরও আধ-ঘণ্টাখানেক পরে বলদ-যানটি আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম আরোহীরা অর্দ্ধেক পথেই নামিয়া পড়িয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা ও কে কোথায় থাকিবে তাহাই স্থির করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। কয়েকটি ক্ষুদ্র বালকের উপর মেয়েদের আদরযত্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল বোধ হয়। তাহারা যত্নের আতিশয্যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিল। রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বালকগুলির ইচ্ছা আমরা আবার এখন শুইয়া ঘুমাই। বিছানা পাতিয়া দিতে তাহারা মহা ব্যস্ত। অগত্যা অল্পক্ষণের জন্য আমাদের শুইতেই হইল। সন্তোষবাবু বলিয়া গেলেন যে পরদিন সকালেই বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্পোর্টস্ আছে। সুতরাং সকাল সকাল উঠিয়া পড়িবার অনেক সংকল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিজে হয়ত যথেষ্ট ভোরে উঠিতে পারিব না, এই ভয়ে সঙ্গিনীদের ভিতর একজনকে বলিয়া রাখিলাম যেন তিনি আমাকে যথাকালে উঠাইয়া দেন। বেশীক্ষণ ঘুমান হইল না, ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হইল। মুখ হাত

ধুইয়া কাপড়চোপড় পরিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাড়ীটির চারি দিক দিনের আলোয় ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। সামনে বাগান, এক পাশে কিছু দূরে তালগাছবেষ্টিত একটি দীঘির মত দেখা যাইতেছে, পিছনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। বাগানে তখন অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

ছেলেদের খেলা মাঠেই হওয়া সম্ভব মনে করিয়া আমরা ধীরে ধীরে সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা যাঁহাদের কাছে পরিচিত, তাঁহারা সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যে কি প্রকার দেখিতে ছিল তাহা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিকেই মাঠ আর খোয়াই, অনেক দূরে দু-একটি সাঁওতালদের ঘর দেখা যাইত। প্রথম যেবার গেলাম, তখন বোধ হয় দুইটির বেশী পাকা বাড়ী দেখি নাই, সব ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল। বিজলীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না, বাঙালী ছাড়া বিদেশী মানুষও দু-একটির বেশী দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। সে মাঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোটবড় নানা আকারের পাকা বাড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, খোয়াই-গুলিও অনেক স্থানেই শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের অতি-পরিচিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই পরলোকগমন করিয়াছেন, কেহ কেহ বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের শিশু দেখিয়াছিলাম তাঁহারাও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। গত বৎসর ৭ই পৌষের উৎসবে গিয়া শান্তিনিকেতনের যে-রূপ দেখিলাম তাহা আমার কাছে একেবারেই নূতন। কিন্তু ছাতিমতলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূজার বেদীর দিকে চাহিয়া, মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কণ্ঠে উচ্চারিত বেদমন্ত্র শুনিয়া আবার মনে হইল, আমার মনের সেই শান্তিনিকেতন ত হারায় নাই, এই নূতন আবেষ্টনের ভিতরেও ত তাহাকে পাইলাম।

পূর্ব্বের কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক্। মাঠের ভিতর দিয়া খানিক দূর যাইবার পরই একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল যে আমাদের জন্য খেলা আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া খেলার জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খেলা অনেক রকমই হইল, এবং ছেলেরা দর্শকদের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করিল। এইখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শিশুকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে জানিতাম, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি হাতে লেখা প্রোগ্রাম সংগ্রহ করিলাম। বলা বাহুল্য, শান্তিনিকেতনে তখনও ছাপাখানা হয় নাই। আশ্রমবাসিনী মহিলারা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেকগুলি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত আলাপ হইল। এই আলাপ পরে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। মেয়েটির সরল ব্যবহারে আমরা সকলেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ এখন পর্য্যন্ত পাই নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। খেলার মাঝামাঝি সময় একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে গুরুদেব আসছেন।" তিনি আসিয়া আমাদের কাছেই দাঁড়াইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েদের ভিতর যাহারা তাঁহার পরিচিতা তাহাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি ছেলেদের দিকে চলিয়া গেলেন। যত দূর মনে পড়ে সে সময় বেশীর ভাগই তাঁহাকে গেরুয়া রঙের পরিচ্ছদ পরিতে দেখিতাম।

খেলা শেষ হইবার পর আমরা নীচু বাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বার রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গেই আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখি বালকের দল আমাদের জন্য জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা তখনই আমাদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আমরা তখন খাইতে একেবারেই নারাজ। কবিবরের পিছন পিছন গিয়া বাহিরের ঘরে তাঁহার চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম। তাঁহার দুই-চারিটি কথা শুনিতে তখন আমরা উৎসুক। নিজে কথা বলিবার চেষ্টা বিশেষ করি নাই। তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পরও দুই-এক দিন বোধ হয় সাহস করিয়া একটা কথাও বলি নাই। তাঁহার সহিত কি কথা যে বলা যায় তাহাই ভাবিয়া পাইতাম না। অথচ তিনি অনেকের সঙ্গেই বেশ ঘরোয়া বিষয়ে আলাপ করিতেছেন দেখিতাম।

আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতিটি কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। জলখাবারের পাত্রসমেত তাহারা এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা আমাদের সেইখানে বসিয়াই জলখাবার খাইতে হইল, যদিও খানিকটা সঙ্কুচিত ভাবেই। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। আশ্রমবাসিনী কয়েক জন মহিলা আমাদের সঙ্গেই খেলার মাঠ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর একটুক্ষণ গল্প করিয়া নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন। এক জন মহিলা শুধু থাকিয়া গেলেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে। আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না, সেই

ছোট ছেলেগুলি আমাদের সত্যই এত যত্ন-আদর করিয়াছিল যে এখন সে-কথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। কোথা হইতে তাহারা মানুষকে এত আদর-যত্ন করিতে শিখিল? বাল্যকালে মানুষ আদর পাইতেই চায়, করিতে চায় না, জানেও না। সত্যের অপলাপ না করিয়াও বোধ হয় বলা যায় যে পুরুষজাতির এ বালাই আরও কম। কিন্তু এই দশ-বারো বৎসরের ছেলেগুলি দিনরাত হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিত, অতিথিদের জন্য। দারুণ রোদে ক্রমাগত খাবার বহিয়া আনা, জল তুলিয়া আনা, এ ত সারাক্ষণ ছিল। রাত জাগিতেও তাহাদের জোড়া মিলিত না। নিজেদের বিছানাপত্র প্রয়োজন হইলেই অকাতরে অতিথিদের জন্য ধরিয়া দিত, ইহাও দেখিতাম। ইহা শিক্ষার গুণ এবং স্থানমাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হইত না। সন্তোষবাবুকে এখন পর্য্যন্ত যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এতখানি পরিপূর্ণ ভদ্রতা আর কোনও মানুষের ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু সেই ভদ্রতার ভিতর কোনো আড়ষ্টতা কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, দুই দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আমাদের পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেগুলি ইঁহাদের আদর্শ দেখিয়া শিখিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। না হইলে স্কুলের ছেলে বাংলা দেশে আর যে জন্যই বিখ্যাত হোক্, ভদ্রতা এবং অতিথিবৎসলতার জন্য নিশ্চয়ই নহে। ছেলেগুলির যত্নের আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা এক দিন সন্তোষবাবুরই কাছে নালিশ করিয়াছিলাম যে ইহারা ত আমাদের কিছুই করিতে দিতে নারাজ, সবই তাহারা করিবে। সন্তোষবাবু বলিলেন, "এতেও গুরুদেব সন্তুষ্ট হন নি, বলছেন, 'মেয়েদের কষ্ট হচ্ছে'।"

কষ্ট আমাদের বিন্দুমাত্রও হয় নাই। এখন সেই ত্রিশ বৎসর আগের দিন কয়েকটির দিকে তাকাইয়া ভাবি, এইরূপ নির্ম্মল আনন্দ জীবনে আর কোনো দিনও কি জুটিয়াছিল?

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর স্নানাহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে তখন নিরামিষ খাওয়া নিয়ম ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর বাহিরের বড় ঘরখানিতে ঢালা বিছানা পাতিয়া সকলে বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সকলের তখন আকণ্ঠ কথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বিশ্রাম করিবে কে? সকলে কথাই বলিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ খাওয়া-দাওয়ার পর আর একবার এ-বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়া শুনিলাম, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে আসিবেন তাহা জানিতে পারি নাই। হঠাৎ আমাদের কোলাহলের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলাম বয়োজ্যেষ্ঠা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, কবির আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহারাও বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহারা নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমরা তখন তাঁহার গান বা পাঠ শুনিতে উৎসুক, এই সকল আলোচনা আমাদের ভাল লাগিতেছিল না। শান্তিনিকেতনের গরমের কথা ওঠাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "গরমের আমি একটি মাত্র ওষুধ জানি, সেটি হচ্ছে কবিতা লেখা।"

ইহার ভিতর বাহিরে কে একজন শিক্ষক তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মহিলারাও সভা ভঙ্গ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। গান শুনিতে না পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম কবি তখনও চলিয়া যান নাই, বারান্দায় একটি ঈজী-চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমরা আবার গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের এক জন সঙ্গিনী তাঁহাকে "খেয়া" পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন, কিন্তু কোন কবিতাটি পড়িবেন মেয়েরা তাহা স্থির করিয়া বলিতে না পারাতে "খেয়া" আর পড়া হইল না। তিনি বলিলেন, "তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশী ইণ্টারেষ্টিং লাগবে। আমার লেখা জীবনস্মৃতি তোমাদের পড়ে শোনাই।" জীবনস্মৃতির অনেকখানি সেদিন তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যত দূর মনে পড়ে, এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় অল্প কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি স্নেহ করিয়া তিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন। সেটি এখনও আমার কাছে আছে।

বিকালবেলাটা মাঠে ও বাঁধের ধারে বেড়াইয়া কাটাইয়া দিলাম। বাঁধটিতে তখন জল বেশি ছিল না। কিন্তু বৈশাখ মাসের গরমে বিদ্যালয়ের কুয়াগুলিরও জল শুকাইয়া উঠিতেছিল, তাই পুরুষ অতিথিদের ভিতর অনেকে এবং বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই বাঁধের জলেই স্নান করিতে আসিতেন দেখিতাম। আমরা অবশ্য সেই ছোট ছেলেগুলির অনুগ্রহে জলের কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই।

বিকালে আর একপালা ছেলেদের খেলা দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় শান্তিনিকেতন ভবনে আবার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখন ঐ বাড়ীতেই বাস

করিতেন বোধ হয়। কিছুক্ষণ ছাদের উপর বেড়ানর পর এক জন যুবক আসিয়া খবর দিলেন যে কলিকাতা হইতে আরও এক মস্ত দল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এত লোক আসিবার কথা ছিল না। কবিবরকে এই খবরে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন বোধ হইল। এত লোককে যথোপযুক্ত আদর যত্ন করা বা স্থান দান করা সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়েরাও অনেকে আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের ভিতর অনেকে নীচু বাংলায় ফিরিয়া গেলেন নবাগতাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই সময় ছোটখাট একটি ঝড় আসায় আমরা ছাদ হইতে নামিয়া গিয়া নীচের গাড়ীবারান্দার ছাদে বসিলাম। এখানে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা ফিরিয়া গেলাম। অনেকগুলি মহিলা ও বালিকা আসিয়াছেন দেখা গেল, কেহবা পরিচিতা কেহ বা অপরিচিতা। দিদি এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে রাত্রিটা আমাদের বড় উদ্বেগের ভিতর দিয়া কাটিল। অতিথিদের ভিতর একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে কয়েক বার দেখিয়া গেলেন। পরদিন সকালে সে কিছু সুস্থ বোধ করিল। রাত্রিতেও আর এক পালা অতিথি-সমাগম ঘটিল। নীচু বাংলা একেবারে ভরিয়া উঠিল, আমরা এক এক ঘরে বার-চৌদ্দ জন করিয়া শুইতে আরম্ভ করিলাম। একজন মহিলা ট্রেনে নিজের কাপড়ের ট্রাঙ্ক ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। যে তিন দিন তিনি এখানে ছিলেন, সেই হারান কাপড়গুলির জন্য অবিশ্রাম আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা জামা কাপড় ধার দিয়া তাঁহাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২৫শে বৈশাখও সকালে ছেলেদের খেলা ছিল, কিন্তু দিদির অসুস্থতার জন্য সেদিন আমার খেলা দেখিতে যাওয়া হয় নাই। এই দিন আর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই নাই, অভিনয়ের নানা রকম কার্য্যে তিনি সকাল হইতে ব্যস্ত ছিলেন। অভিনেতাদের সাজাইয়া দেওয়ার কাজ প্রায় সবটাই তিনি নিজের হাতে করিতেছেন বলিয়া শুনিলাম। আজ দুপুরে খাওয়ার সময় মেয়েরা পরিবেশনের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন। ইহাতেও অবশ্য সন্তোষবাবু এবং তাঁহার ক্ষুদ্র চেলার দল যথারীতি আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলারা এক দল ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর রবীন্দ্র-রচনাবলি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ শুনিতে গেলেন। আমরা আর এক দল নেপালবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেই দারুণ গ্রীষ্মে নিদারুণ রৌদ্রে কি ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম মনে করিলে এখন আশ্চর্য্য লাগে। ওখানের ছেলেরা জুতা পরিত না, দেখাদেখি আমরাও ঐ কয় দিন জুতা ছাড়িয়াছিলাম, ছাতার বালাই ত ছিলই না।

সন্তোষবাবু তখন নিজের বাড়ীর পাশে একটি গোশালা খুলিয়াছিলেন। অনেকগুলি গরুমহিষ দেখিলাম, তাহারা বেশ যত্নে আছে। একটি প্রকাণ্ড কাল মহিষ দেখিয়া ও তাহার বীর ও রৌদ্র রসের বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম মনে আছে। ডেয়ারি ফার্ম দেখার পর বিদ্যালয়ের ছেলেরা যেখানে থাকে সেই ঘরগুলি দেখিতে গেলাম। লাইব্রেরি, হাসপাতাল ও ছাতিমতলার বেদীও দেখিয়া আসিলাম।

ইহার আগের দিন গুলু বলিয়া একটি ছোট ছেলের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, এই সময় তাহার দেখা পাওয়া গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, তবে মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। ছেলেটি আশ্রমে আসিয়া প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পায়, তাঁহাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি নাকি কবিতা লেখ?" তিনি দোষ স্বীকার করায় গুলু বলিল, "আমিও লিখি।" খাতা বাহির করিয়া সে কবিতা তাঁহাকে শুনাইয়াও দিল।

বিকাল বেলাটা এদিক-ওদিক বেড়াইয়া কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর "রাজা" অভিনয় আরম্ভ হইল। তখন "নাট্যঘর" বলিয়া একটি মাটির ঘরেই অভিনয় হইত, এখন কোথায় হয় জানি না। ব্রাহ্মসমাজে লালিতপালিত হওয়াতে অভিনয় বাল্যকালে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। "রাজা" অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন, অন্তরাল হইতে রাজার অংশের অভিনয়ও তিনিই করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদা সাজিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, সদাসর্ব্বদা যে গেরুয়া রঙের পোষাকটি পরিয়া থাকিতেন তাহারই উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। মাঝে একবার লাল ও শাদা রং মেশান রেশমের পোষাক পরিয়া সেনাপতি সাজিয়া অভিনয় করিয়া গেলেন। দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আল খাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই-তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পাগল সাজিয়া গান গাহিয়া গেলেন। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রাণী সুদর্শনা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুশীলকুমার সুরঙ্গমা সাজিয়াছিলেন। কাঞ্চিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জগদানন্দ রায়

মহাশয়। নাটকের ভিতর অনেকগুলি গান ছিল, তাহার কয়েকটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনিলাম অতিথিরা পাছে অভিনয় বেশী দীর্ঘ হইলে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ক্লান্ত কেহই হন নাই, এবং হইতেনও না। ছেলেদের গান অতি সুন্দর হইয়াছিল।

২৫শে বৈশাখ ভোর ৫টার সময় আম্রকুঞ্জে কবিবরের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। উৎসবের স্থানে আসিয়া দেখিলাম, তখনও অনেকেই আসেন নাই—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আসেন নাই। শান্তিনিকেতনের দিকে একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারই সঙ্গে আমরা আবার উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমের অধিবাসী ও অতিথি-বর্গে জায়গাটি ভরিয়া উঠিয়াছে। আলিপনা ও পত্রপুষ্পে সভাস্থল সুন্দর ভাবে সাজান। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান করিলেন। আচার্য্যের কাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মিলিয়া করিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক হইতে কতকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অল্প কিছু বলিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে প্রীতির সম্বন্ধ সেখানে যোগ্যতাবোধের বিচার থাকে না, লজ্জা থাকে না, এই ধরণের কতকগুলি কথা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। সভাস্থ সকলকে ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল। এইখানে আসিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখিলাম। তাঁহারা আগের দিনই কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই।

সভার কার্য্য শেষ হইলে পর রবীন্দ্রনাথকে আরও কিছুক্ষণ বাধ্য হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে মহা উৎসুক। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

নীচু বাংলায় ফিরিয়া শুনিলাম অভ্যাগতাদিগের ভিতর অনেকেই বেলা দুইটার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাদের নিজস্ব দলটিই খালি থাকিয়া গেল।

ইহারই ভিতর এক দিন শ্রীসুকুমার রায় তাঁহার "অদ্ভুত রামায়ণ" গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪শে বৈশাখ কিম্বা ২৬শে বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ গানটি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত রামায়ণে একটি গান ছিল, "ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কইরে, ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে।" আশ্রমের ছোট ছেলেরা এই গানটি শোনার পর সুকুমার বাবুর নামকরণই করিয়া বসিল, "ঐ-আসে।" একটি ছোট ছেলে মাঠের মধ্যে গর্ত্তে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমার বাবুকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও ঐ-আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও ত।"

২৫শে বিকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ আর একবার তাঁহার জীবনস্মৃতির খানিক অংশ আমাদের পড়িয়া শুনাইয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে আগত দুই-এক জন ভদ্রলোক জীবনস্মৃতি শুনিবার লোভে নীচু বাংলায় আসিয়া বসিলেন। মাঝে এক পালা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল, আমরা বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া বসিলাম। পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে গান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। এমন সময় ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া বলিলেন যে সত্যেন্দ্র বাবুরা কবিবরকে অনুপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিতেছেন, বলিতেছেন শান্তিনিকেতন তাঁহাদের পক্ষে শাস্তিনিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ দুই-চারিটি গান গাহিয়াই অন্য অতিথিদের কাছে চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের নালিশ এই ছিল যে, কবি কেবল মেয়েদিগকে জীবনস্মৃতি শুনাইয়া-ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আবার পুরুষদের আড্ডাতেও উহা পড়িতে হইয়াছিল।

২৬শে বৈশাখ বিদ্যালয় ছুটি হইয়া গেল। অতিথিরা প্রায় সকলেই আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, এখন ছেলেরা এবং অধ্যাপকরাও একে একে চলিলেন। এত আনন্দ-কোলাহলের পর সব অত্যন্ত নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল। সকালে ছেলেদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন, তাহার পর মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া অল্পক্ষণ কিছু বলিলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার নীচু বাংলায় আসিয়া বসিলেন। এ দিন আর পাঠ বা গান হয় নাই, বাবার সঙ্গে সাধারণ নানা বিষয়ে আলোচনা* হইতে লাগিল। "গোরা" সম্বন্ধে অনেক কথা* হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় অনেকে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া

* রবীন্দ্রনাথের সহিত কত বার কত বিষয়ে কত কথাই না হইয়াছে! তাহাতে কত গভীর তত্ত্ব, কত পরিহাসমিশ্রিত অজস্র কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এই যে, সে-সকলের কিছুই লিখিয়া রাখি নাই। ইহা ত্রুটিও বটে। কিন্তু এখন অনুশোচনা বৃথা। —প্রবাসীর সম্পাদক।

গেল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তখন মাঠ, পথ সব প্লাবিত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ নিজের এস্রাজটি লইয়া চলিয়াছিলেন, যদিই প্রয়োজন হয়। 'পারুলবন' বলিয়া একটি জায়গায় যাওয়া হইয়াছিল। স্থানটি ভারি সুন্দর। হাঁটিয়া যাইতে অনেকক্ষণ লাগিল, সকলে নানা দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন, পথ হারানর উৎপাতও দুই-চারি বার ঘটিয়া গেল। বিদ্যালয়ের ছেলেদের দেখাদেখি আমরা খালি পায়েই বাহির হইয়াছিলাম এবং মেঠো পথে অনেকেই পায়ে কাঁটা ফুটাইয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমাদের অবস্থা দেখিয়া কবিও কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনেক দূর আসিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে আমরা অন্যান্য সকলকে পিছনে রাখিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, আশ্রমের ছেলেরা বা অধ্যাপকরা কেহই আমাদের সঙ্গে নাই। এক জন ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "একটা ছেলেও যে দেখছি আমাদের সঙ্গে আসে নি, কি হবে?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন, আপনি কি মনে করেছেন আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব না? আপনি আমাকে এতই অজ্ঞ মনে করেন?"

পারুলবনে পৌঁছিলাম বটে, তবে বনের ভিতর কিঞ্চিৎ সাপের ভয় থাকায় আমরা সেখানে না বসিয়া আবার বাহিরে খোলা মাঠের মধ্যেই আসিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "গান ধরা যাক, তাহলে ওরা বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।" তাঁহার সম্মুখে মেয়েরা কেহই গাহিতে রাজী না হওয়াতে তিনি নিজেই একটি হিন্দী গান আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা সেকালে তাঁহার গান না শুনিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে তাঁহার কণ্ঠ কতখানি মধুর ও শক্তিশালী ছিল। সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ একলা তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। পারুলডাঙা গ্রামের কয়েকটি ছেলে গান শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মনে করিলেন তাহারা আশ্রমেরই ছেলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিক দিয়ে তোরা কোথা থেকে এলি রে?" ছেলেগুলি বলিল, "আজ্ঞে আমরা পারুলডাঙার ছেলে।" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "যা যা বাপু, তোদের কোনো দরকার নেই।" তাহারা খানিক দূরে সরিয়া গেল বটে, কিন্তু একেবারে বিদায় হইয়া গেল না। তিনি আবার গান আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আরও কতকগুলি লোক মাঠের উপর দিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। এক জনের বিরাট দেহ এবং কাঁধের উপর লম্বিত এস্রাজ দেখিয়া এবারে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে তাঁহারা সত্যই আশ্রমের দল। মাঠের মধ্যে বেশ ছোটখাট একটি সভা বসিয়া গেল। আবার গান গাহিবার অনুরোধ চলিতে লাগিল। "পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে", গানটি রবীন্দ্রনাথকে গাহিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "এখানে ত খালি কাঁটা ফুটে, পুষ্প ফুটে আর কই?"

গান অনেকগুলিই পরে পরে হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হিন্দী, বাংলা অনেকগুলি গান করিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মিলিয়া আরও কয়েকটি গান করিলেন। গান আরও চলিত বোধ হয়, তবে দিনেন্দ্রনাথের এস্রাজের ছড়ি খারাপ হইয়া যাওয়ায় তখনকার মত থামিয়া গেল। অতঃপর আবার হাঁটিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসা গেল। রবীন্দ্রনাথ সারাপথ গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিলেন।*

এই দিনই রাত্রির গাড়ীতে আমরা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। এবারে হাঁটিয়াই স্টেশনে আসিয়াছিলাম, গাড়ী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথ আমরা যাত্রা করিবার আগে একবার আসিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে বিদায় গ্রহণ করিলেন, ও শীঘ্রই আবার আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলেরই মন তখন বিমর্ষ; এই তিন দিনের পরিচিত স্থানটিকে ছাড়িয়া যাইতে সকলেই অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আবার আসিতে পারিব, এই আশা লইয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

* সেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ ফিরিবার সময় কতকটা পথ একটি হিন্দী গান গাহিয়াছিলেন। তাহার অন্য শব্দগুলি ঠিক মনে নাই, কিন্তু "কাটাউজী" কথাটি তাহাতে ছিল মনে হইতেছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

১

বাড়িটা বনের মধ্যেই বলিতে হইবে। সদর রাস্তা হইতে একটা পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা গলি—বাড়ির দুয়ারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেকালের মস্তবড় শাল কাঠের দুয়ার—যাহার মধ্য দিয়া ভিতরের ঠাকুর-দালান হইতে অনায়াসে প্রতিমা বাহির করিয়া লইয়া আসা যায়। কিন্তু যিনি ঠাকুর-দালানের পরিকল্পনা করিয়া দুয়ার তৈয়ারী করিয়াছিলেন—আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুন পূজা-মণ্ডপটির ভিত পর্য্যন্ত গাঁথিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সে-কল্পনাকে সার্থক করিবার সুযোগ আর কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই। বরং সিং দরজার চারি পাশের সুউচ্চ প্রাচীর মাথা ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ ভূমিলগ্ন হইবার ভ্রূকুটি দেখাইতেছে। তবু সে প্রাচীর একেবারে ভাঙ্গিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দুই দিকে চাহিলে—উত্তর দিকের এই সৌভাগ্যকে হিংসাই করিতে হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে এককালে যে প্রাচীর ছিল—সে-কথা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কায়েতদের প'ড়ো জমিটার জঙ্গলের সঙ্গে এ-বাড়ির উঠান আশ্চর্য্যজনক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড় জামগাছ ও গোটা তিনেক সজিনা গাছ না থাকিলে সীমানা-নির্দ্দেশে গোলযোগ বাধিবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল। বোসেরা বহুকাল গ্রাম ছাড়া। গাছের মালিকানাস্বত্ব লইয়া বিবাদ করিবার লোকাভাব বশতই—ওদিককার নোনা-আতা, ধলা-আঁকড়া, কালকাসুন্দা ও পিটুলি গাছের ঘন-জঙ্গল মধ্যে শিবাকুল বাসা বাঁধিয়াছে। গোয়ালে ও বন-উচ্ছে লতা ওই সব গুল্মজাতীয় গাছের মাথায় ঘন হইয়া জঙ্গলের নিবিড়ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। লোকে বলে, শীতকালে বাঘ আসিয়া ওখানে বাসা বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু সে কল্পনা-বিলাসী লোকের কথামাত্র। এ-বাড়ির লোকেরা জানেন, বাঘ কোনকালেই লোকালয়ের মধ্যে ওই জঙ্গলে আসিয়া অবস্থান করে নাই। সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি পর্য্যন্ত প্রহর ঘোষণা করিয়া শিবাকুল শুধু যা-একটু কোলাহল জমাইয়া তুলে। প্রাচীরহীন বাড়িতে তাহাদের উৎপাতের চিহ্নও কিছু কিছু রাখিয়া যায়। কিন্তু শৃগালকে গালি দিলে—তাহারা অনেক প্রকার অপকর্ম্মের চিহ্ন উঠানে রাখিয়া যায়, কাজেই বাড়ির গৃহিণী আপন মনেই গজগজ করিয়া উঠানে গোবর জল ছড়াইয়া সকালের পাট-ঝাঁট সারেন। বরং বাড়ির অন্য কেহ শৃগালের দগ্ধ মুখ লইয়া কিছু কটু কথা বলিতে গেলে—নিষেধ করেন।

পশ্চিমে প্রাচীর তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন নাই। দু'খানি কোঠা-ঘর সামনের একটু ফালি রোয়াক সমেত ওদিককার সীমানা রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা হইলেও, অনেকখানি জায়গা থাকা সত্ত্বেও, তাহার প্রজা হিসাবে কেন যে ঘরগুলিকে পূর্ব্বমুখী করা হইয়াছিল—তাহার কৈফিয়ৎ এক শত বৎসর পরে কে-ই বা দিবে? পাতলা ইঁটের ঘর—চূণবালির পলস্তরা নাই। তবু কাদার গাঁথনি হইলেও ইটগুলি সুসজ্জিত বলিতে হইবে। ঘরের দুয়ার ছোট, জানালা ছোট, ছাদ অনেকখানি নীচু। শালকাঠের কড়ি বয়োজীর্ণ হইয়া স্থানে-স্থানে ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে, বরগার অবস্থাও ভীতিপ্রদ। উপরের ছাউনি পাতলা ইঁটেরই। সেকালে টালির চলন হয়ত ছিল না। কড়ি-বরগায় আলকাতরা মাখানো, ফোঁপরা জায়গাগুলিতে আলকাতরা মাখানো ন্যাকড়া গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষের আশা অর্থাভাবে একদিকে যেমন পঙ্গু হইয়া পড়ে, অন্য দিকে উইয়ের পুরাতন-প্রীতিতে মন তেমনই শঙ্কায় ভরিয়া উঠে।

দু'টি ঘরের মাঝখানে চিলেকোঠা-সমন্বিত একটি অপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। দুই দিকের ঘর হইতে ছাদে উঠিবার জন্য ঐ সিঁড়ির মুখে একটি করিয়া দুয়ার আছে। তবে সে দুয়ার দুইটির উপকারিতা বিশেষ নাই। নড়বড়ে খিলে কোন রকমে আটকাইয়া দু'টি ঘরের ব্যবধান সৃষ্টি করা ছাড়া সে দুয়ারের সার্থকতা নাই। সেখান দিয়া হাওয়া চলে না, আলো আসে না, চোর ঠেকানোও দুষ্কর। চিলেকোঠার মুখে যে-দুয়ারটি আছে সেটি মজবুত অর্থাৎ চোর আটকানো চলে। সিঁড়ি এমন অন্ধকার যে দিনে প্রদীপ জ্বালিয়া চলিলে ভাল হয়। চিলেকোঠার মাথায়

একটা টবে তে-কাঁটা সিজগাছ বসানো আছে; বজ্রপতন হইতে গৃহকে রক্ষা করিবার ওটি নাকি অমোঘ অস্ত্র!

সামনেই যা দু'টি জানালা ও একটি করিয়া দুয়ার আছে, এবং সেগুলিতে উইয়ের আক্রমণ নির্ম্মম ভাবেই চলিতেছে, শীতকালে চট টাঙাইয়া না দিলে ঘরের হিম আটকানো যায় না; আর তিন দিকে দুয়ার জানালার বালাই নাই। কর্ত্তাদের ধন-প্রবাদের কথা এ-অঞ্চলে সুবিদিত ছিল, কাজেই চোরের ভয়ে তিন দিকে জানালা না রাখিয়া গৃহটিকে দুর্গবিশেষে পরিণত করিয়াছিলেন। তা সত্ত্বেও বার দুই চুরি হইয়া গিয়াছে ও বার কয়েক চুরির প্রয়াস হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র অনেক। গোটা দুই বড় কাঠের সিন্দুক, একটি করিয়া কড়ির ও কাঠের আলনা, মাইপোষ (বাক্স সংযুক্ত তক্তাপোষ), জলচৌকি, কাঁথা ইত্যাদি রাখিবার জন্য দড়ি দিয়া ঝোলানো তক্তা, কয়েকখানি সেকালের আঁকা পটুয়ার ছবি—কালি, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গণেশ ইত্যাদি। একখানি খাঁড়া ও একখানি টাঙ্গি দেওয়ালে টাঙানো আছে। জোড়া কুলুঙ্গি গোটাতিনেক, তাহাতে অসংখ্য বোতল, শিশি, সিঁদুর-চুপড়ি, মাটির ও কাঠের পুতুল, সিঁদুর-কৌটা, ঝাঁপি, কড়ি, পুঁতির মালা ইত্যাদি রহিয়াছে। কুলুঙ্গির কোণে ও ঘরের কোণে মাকড়সারা জাল বুনিয়াছে। এ-বেলাকার সম্মার্জ্জনী-প্রহারে যে কারুকার্য্য ভাঙিয়া যায়, ও-বেলায় নবতর উদ্যমে সেগুলি গড়িয়া উঠে। গৃহিণীরা কাজেই উদ্যমহীন হইয়া ওই দিকগুলিতে সম্মার্জ্জনী চালনা বন্ধ করিয়াছেন। জীর্ণ কড়ির উপরে কে খড়ি দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে,—১৫ই মাঘ কুয়াশা। অর্থাৎ আষাঢ় মাসের ওই তারিখটিতে বৃষ্টি হইবেই। ফলাফলের কথা অবশ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেন নাই।

উঠানের আমতলার পাশে আর একখানি পশ্চিমমুখী ক্ষুদ্রকায় ঘর আছে। সেখানি পূর্ব্বে রান্নাঘর ছিল—এখন বাসগৃহ হইয়াছে।

ঘর ছাড়িয়া উঠানে পড়িলেই—সেখানকার প্রশস্ততায় মন উৎফুল্ল হয়, ভয়েও শিহরিয়া উঠে। উঠানে একটি আম, একটি কাঁঠাল ও একটি বাতাবি লেবুগাছ আছে। গ্রীষ্মকালে সুশীতল ছায়ায় দু-দণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, শীতকালে অনেকখানি বেলা হইলেও গায়ের দোলাই বা কাপড় নামাইবার ইচ্ছা হয় না, বর্ষাকালে রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গা শির-শির করিয়া উঠে। রোদ পোহানই হউক, আর বড়ি শুকাইতে দেওয়াই হউক—অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া সাবধানে ছাদে উঠিতেই হয়। কাপড় মেলিতে দেওয়ার জন্য গাছের ডালে দড়ি বাঁধা আছে, জানালার গরাদে আছে, শিকল লাগাইবার সুরশো আছে। দেওয়ালে কয়েকটা হাঁসকল ও ডোমনি পোঁতা আছে। সেকালে কব্জা ইত্যাদি ছিল না, কাজেই পুরাতন হাঁসকল ডোমনি ইত্যাদি এধার ওধার অনেক পড়িয়া থাকিত।

ন'বছরের মেয়ে যোগমায়া এই বাড়ির উঠানে পা দিয়া সভয়ে যে শাশুড়ীর আঁচল চাপিয়া ধরিবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

শাশুড়ী সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে আরও একটু টানিয়া লইয়া বলিলেন, ভয় কি, মা। এ যে তোমারই বাড়িঘর—চিরজীবন এইখানেই কাটাতে হবে।

চিরজীবন মানে বুঝিবার বয়স যোগমায়ার হয় নাই। ও একটা কথার কথা—বলিতে'হয়। কিন্তু চারি-পাঁচ দিন মানেই যদি চিরজীবন হয় তো সে বড় ভয়ানক। বাড়ি হইলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া যোগমায়া আপত্তি জানাইত। কনকাঞ্জলির পূর্ব্বে মা পাখী পড়াইবার মত শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে যোগমায়াকে অনেকগুলি সদুপদেশ দিয়াছিলেন। সবগুলিই যোগমায়ার মনে অবশ্য ছিল না। কিন্তু পতি যে পরম গুরু ও শ্বশুরবাড়িতে মুখটি বুজিয়া থাকিলেই লক্ষ্মী মেয়ে বলিয়া সকলে সুখ্যাতি করিবে—এই দু'টি উপদেশ সে ভোলে নাই।—শাশুড়ীর আঁচলের তলায় যোগমায়ার ক্ষুদ্র দেহখানি বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, কোন ধ্বনি শোনা গেল না।

উঠানের মাঝখানে একখানি শিলের চারিদিকে কলার তেউড় পুঁতিয়া যে শুভস্থানটি রচনা করা হইয়াছে—বরবধূ আসিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। বছর ষোল বয়স বরের, গল্পে-শোনা রাজপুত্রের মত রং, টিকলো নাক, উপর ওষ্ঠে ফ্যাকাসে কালোর রেখা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। আর কৌতুকচঞ্চল চোখ দু'টি যোগমায়ার ভালই লাগিয়াছে। না হইলে বার-বার ওদিকে চাহিতে গিয়া একটা ভয়মিশ্রিত লজ্জা কেন আসিতেছে। এমন করিয়া তাকাইলে লোকে বেহায়াও তো বলিতে পারে।

দুধে আলতায় গুলিয়া একখানা কাঁসার থালা পায়ের কাছে রাখিয়া এক জন বর্ষীয়সী বলিলেন, এই থালাখানায় পা দিয়ে দাঁড়াও তো, মা। ভয় কি, দাঁড়াও।

অন্য সময় হইলে ক্রীড়ার আনন্দে যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিত, এখানে প্রতিপদে মার সতর্কবাণী শাসন-কার্য্য করিতেছে। পা কাঁপিতেছে, আনন্দ-চাঞ্চল্যে নহে, ভয়ে। না জানি চারি পাশের কৌতূহলী জনতা কি বলিবে!

চারি পাশ হইতে গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল, আহা, থালায় পা

দিয়ে থালার শোভা যেন উথলে উঠল। কেমন রাঙা টুকটুকে পা দু'খানি! সার্থক বউ ঘরে এনেছ ভাই, যেন দুগ্‌গো প্রিতিমে।

এখানেও বরণ, একযোগে হুলুধ্বনি, চেলির সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া ধীরপদে বরের অনুসরণ। সমবেত মহিলাবৃন্দ শত কণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি তুলিয়াছেন, যেমন বর—তেমনি বধূ। যেন চাঁদ ও রোহিণী একত্রে মিলিয়াছে। প্রশংসার লজ্জায় বালিকার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে, পায়ে পায়ে ও পায়ে চেলিতে জড়াইয়া চলনটিকে আরও সলজ্জ ও মন্থর করিয়াছে এবং এই চলনভঙ্গি লইয়াও প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়াছে।

পূর্ব্বমুখী বড় ঘরটাতেই পুরাতন জাজিম বিছাইয়া বরবধূর শয্যা বিস্তৃত হইয়াছে। পিছনে ও দুই পাশে ঠেস দিয়া বসিবার জন্য মোটা ধবধবে তাকিয়া সাজানো আছে, বিছানার উপর ধবধবে চাদর পাতা। বধূর দুধে-আলতা মাখা আধ-শুকনা পায়ের অস্পষ্ট ছোপ সেই সাদা চাদরের উপর লাগিয়া গেল। বরবধূ পাশাপাশি বসিল। ঘরের মধ্যে সে কি ভিড়! বরবধূর কড়ি খেলা দেখিবার জন্য জনমণ্ডলীর চোখে মুখে আগ্রহ পরিস্ফুট।

—হাঁ মা, কড়ি নাও—যে ক'টা ইচ্ছে নাও। নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে শাড়ীর তলায়, হাঁটুর নীচেয়, বালিশের পাশে; যেখানে হোক, লুকোও।

বধূর আড়ষ্ট হাত আর উঠিতে চাহে না। এ খেলা মন্দ নহে, কিন্তু এতগুলি কৌতূহল ভরা দৃষ্টির সম্মুখে? কে এক জন তাহার আড়ষ্ট হাত ধরিয়া কড়ি লইবার ও লুকাইবার কৌশল শিখাইয়া দিলেন।

বরকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিলেন, খেল তো দেখি কড়ি। এইবার গোন দেখি—ঠিক আছে কি না? দুটো কম? হুঁ, খোঁজ তো ভাই, কোথায় গেল?

বর বেচারা বস্ত্রস্তূপমণ্ডিতা বধূর পানে ও বালিশ-গুলির পানে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। কোন্‌খানে লুকাইয়া রাখা সম্ভব? কোন্‌খানে? কিছু অনুসন্ধানের পর—বধূর বাঁ হাঁটুর তলদেশ হইতে কড়ি বাহির হইল।

সমবেত জনতা হাসিয়া উঠিল।

—শক্ত মেয়ে গো, শক্ত মেয়ে। সংসার গুছিয়ে করতে পারবে। দেখ নি, শাশুড়ী যখন হাতে ভ্যাদা মাছটা দিলেন, কেমন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল? এ বউ ঠাণ্ডা হবে—আর হিসেবিও হবে, দিদি।

—তাই আশীর্ব্বাদ কর ভাই। তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে সংসার আমার সুখের হোক। শাশুড়ীর মুখে-চোখে অপরিমিত উল্লাস-চিহ্ন।

খাইতে বসিয়া মনে পড়িয়া গেল, বেশি খাইতে মা নিষেধ করিয়াছেন। লক্ষণ বাঁচাইয়া চলাটাই নূতন জায়গার রীতি। কিন্তু বালিকা যোগমায়ার তীব্র ক্ষুধাই পাইয়াছিল। থাবায় থাবায় ক্ষিপ্র করে যাহা নিঃশেষ করিবার কথা, তাহা অতি সঙ্কুচিত ভাবে আর এক জনের হাত হইতে মুখে লইবার সময় ক্ষুধার অনেকখানিই যেন কমিয়া আসিতেছে। নিরুপায় যোগমায়া লোলুপ দৃষ্টিতে অন্নের পানে ও হতবুদ্ধির মত চারি পাশের জনতার পানে লুকাইয়া লুকাইয়া চাহিতে লাগিল। বধূর ভোজনও কি একটা দেখিবার জিনিষ! ইহাতেও নিন্দা-সুখ্যাতির কথা উঠিতে পারে বুঝি?

পেট ভরিল কিনা যোগমায়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, কিন্তু খাইবার স্পৃহাও তাহার আর নাই। শাশুড়ীর হাতের গ্রাসে ঘাড় নাড়িয়া সে আপত্তি জানাইল। অর্থাৎ আর খাইতে পারিবে না।

সকলে বলিল, লক্ষ্মী বউ। অর্থাৎ কম খাইয়াছে।

বাহিরের লোক ততক্ষণে প্রায় সব চলিয়া গিয়াছে। নিজেদের সংসারের কাজের ফাঁকে দুই-এক জন যাওয়া-আসা করিতেছিল মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থিতি অতি সামান্য ক্ষণই ঘটিতেছে। যোগমায়া ইতিমধ্যে দু-চার বছরের বড় ননদের সঙ্গে একটু ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ননদটির বিবাহ হইয়াছে, বার দুই শ্বশুরঘর করিয়া সেখানকার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ফাঁকে তাহার সঙ্গে একটু হৃদ্যতা হইয়াছে যোগমায়ার। শ্বশুরবাড়ি আসিয়া এই সঙ্কোচ বালিকা যোগমায়ারই নূতন নহে, চিরকাল সব বধূর বেলায় এমনই ঘটিয়া থাকে। কমলারও ঘটিয়াছিল। কমলার শ্বশুররা নাকি বড়লোক। চারিদিকে চকমিলানো বাড়ি, বাড়িতে এক জন চাকর ও এক জন চাকরাণী আছে, অন্দর-সংলগ্ন পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে মস্ত বাগান। সে বাগানে আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি অসংখ্য গাছ আছে। একটা ঝাঁকড়া মাথা লিচু গাছ আছে। সেই গাছটার ঘন ঝোপে বসন্তকালে কেমন কোকিল ডাকে, 'বউ কথা কও' পাখীর হলদে দেহটি তাহার চিক্কণ পত্রের মাঝখান হইতে দেখা যায়। ওপাশের সজিনা গাছটায় কাঠঠোকরা—ঠক্-ঠক্ করিয়া শুকনা কাঠে ঘা মারিতে থাকে। এমন সুন্দর পাখী—যেন টোপর পরা বরটি।...কমলা অনর্গল বকিয়াই চলিত হয়ত, এমন সময়

এক জন বর্ষীয়সী আধ ঘোমটা টানিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কমলা বলিল, পিসিমা, প্রণাম কর।

যোগমায়া সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি সস্নেহে তাহাকে দু'টি হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

—থাক্, থাক্, জন্মএয়োস্ত্রী হও, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। দেখি মা, মুখখানি দেখি? লজ্জা কি, চোখ চাও?

যোগমায়া চোখ খুলিল না। এই নাকি রীতি। যে-লোক দেখিতে আসে তাহার সামনে গুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পানে চাহিতে পারিবে না, এ-কথা শ্বশুর-বাড়ি আসিবার কালে মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এতক্ষণ চোখ বুজিয়া বুজিয়া যোগমায়ার চোখ ব্যথা করিতেছিল, আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া বিবাহ জিনিষটার উপর তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। অতি জোরে বন্ধ করার দরুন চোখের উপরের পাতা কিছু কুঞ্চিত হইয়াছিল, কিছু বা কাঁপিতেছিল। বিস্তৃত চক্ষুকেও মনে হইতেছিল, ঈষৎ ক্ষুদ্র।

কমলা বলিল, চোখ খোল না ভাই বউ। এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই। উনি আমার পিসিমা।

যোগমায়া চোখ খুলিল। চোখ খুলিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কি প্রশান্ত স্থির রূপ তাঁহার। যেমন দেহের গড়ন—তেমনই ফরসা থান কাপড়খানি মানাইয়াছে। গৌর রঙের জ্যোতিতে—এতটা বয়স হইলেও—চোখমুখ যেন টল টল করিতেছে। আর কি আকর্ণবিস্তৃত সে চোখ; ঘন ভ্রূর নীচেয় পরিপূর্ণ মহিমায় স্নিগ্ধ প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। যেন জগদ্ধাত্রী মা। যোগমায়া অবাক হইয়া চাহিয়াই রহিল।

তিনি অবগুণ্ঠন ঈষৎ নামাইয়া অত্যন্ত মৃদু ও মমতা-মাখা কণ্ঠে বলিলেন, দেখি হাতখানি? বাঃ এ যে লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত হাত! বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সোনার ছোট্ট একটি জিনিষ বাহির করিয়া তাহার করপ্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন।

কৌতূহলী কমলা বলিল, দেখি না, পিসিমা, কি দিলে? বাঃ, এ যে মুড়কি মাদুলী। চমৎকার গড়েছে। নবীন স্যাকরা গড়েছে বুঝি? আমার চিক কিন্তু অমন হয় নি।—বলিয়া বধূর গলদেশের কাপড় খানিকটা সরাইয়া চিক দেখিবার সুযোগ করিয়া দিল।

পিসিমা বলিলেন, ভাল হয় নি কি লো, এ যে চমৎকার মানিয়েছে!

কমলা বলিল, তোমাদের বউ যে সুন্দর, পিসিমা।

—তা বটে, মা আমার লক্ষ্মীঠাকরুণ। বলিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি যোগমায়া ও কমলাকে পর পর চুম্বন করিলেন। কাজেই দুই জনেই আর এক বার অবনত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। এ শিক্ষাও মায়েদের।

প্রণামান্তে কমলা বলিল, বউ-বরণের সময় তুমি বেরোও নি কেন, পিসিমা? ওদিকের ঘরের দুয়োর বন্ধ করে রেখেছিলে।

পিসিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, ঘরের বউ, আমরা তো অষ্টপ্রহরই দেখবো। বলি বাইরের ওরা দেখে যান ততক্ষণ।

কমলা হাসিয়া বলিল, তা নয়, লজ্জা। আমরা তো দেখছি, মেয়েছেলের সামনেও তোমার মাথার ঘোমটা নামে না।

—না—রে। পিসিমা সলজ্জে হাসিলেন। আমরা যখন বউ এসেছিলাম, তখন এক কাল ছিল! যেমন চোর-ডাকাত—তেমনই খারাপ লোকও ছিল। বছরে এক দিনও গঙ্গাস্নান করতে যেতাম না। কখনও মেলায়—কি ঠাকুর দেখতে বাড়ির বার হতে দিতেন না। ওই ছোট্ট ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বিজয়ার দিন ঠাকুরুণের মুখ দেখতাম। তাই কি ভাল ক'রে দেখা—আবছা-আবছা। বাড়িতে বেরোতাম—এই এমনি করে কাপড় পরতাম কেউ যেন পায়ের পাতাটি দেখতে না পায়।

কমলা বলিল, তোমাদের কালে তো বড় কষ্ট ছিল তা হলে!

কষ্ট? তিনি আবার হাসিলেন। কই, কষ্ট বলে তো মনে হ'ত না।

কমলা বলিল, মা তো অতটা আব্রু রেখে চলেন না। সকলের সঙ্গে কথা কন।

তিনি বলিলেন, ওঁরা তো অনেক পরে এ-বাড়িতে আসেন। ওঁদের সময় লোকের দৌরাত্ম্যি অনেক কমে এসেছিল। কই, দেখি—বউকে কি গহনা দিয়ে মুখ দেখলেন!

কমলা যোগমায়ার ঘোমটা অল্প একটু তুলিয়া বলিল, এই সিঁথি আর নারকেল-ফুল।

—হাঁ—হাঁ, মা এই সিঁথি আর নারকেল-ফুল বউকে দিয়েছিলেন। সুন্দর গহনা। কতকালের গহনা, কিন্তু কেমন ঝক্‌ঝক্ করছে।

কমলা বলিল, আর বউয়ের বাবা দিয়েছেন এই পাঁয়জোড়, মৌরিফুল, জশম, সাতনরী।

—তা অনেক গহনা দিয়েছেন বেয়াই।

—তাঁর একটি মাত্র মেয়ে, আর বড় মেয়ে বলে যা দেবার কথা ছিল তার বেশিই দিয়েছেন। সবাই গহনার সুখ্যাতি করছিলেন।

পিসিমা আনন্দ প্রকাশ করিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশিনী বউ দেখিতে আসিলেন। পিসিমা ঘোমটা দীর্ঘ করিয়া রোয়াকের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

নয় বৎসরের মেয়ে—ক্লান্তি আসা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরদিন কুশণ্ডিকা অর্থাৎ প্রকৃত বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলি শেষ করিতে দুপুর শেষ হইয়া গেল। হোমের ধোঁয়ায় চোখ দু'টি লাল হইয়াছে, সপ্তপদী গমন ইত্যাদির ক্লান্তিতে পা টলিতেছে। সর্ব্বক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে থাকাতেই যা ক্লান্তি। ফুলশয্যার রাত্রির অনুষ্ঠানগুলিই কি কম। এক ঘর মেয়ের সামনে ভাবী-সংসার পাতিবার কত না ইঙ্গিত—অনুষ্ঠান। নয় বৎসরের বালিকার হতবুদ্ধি—আচরণের মধ্যে ভবিষ্যতের মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি ও সংসার চালাইবার দক্ষতা ইত্যাদির আবিষ্কারও কম ক্লান্তিকর নহে। অবশেষে দুধের পাত্রে মোনামুনি ভাসাইয়া দিয়া ভাবী মিলন কেমন হইবে তাহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পাত্রের দুধ হাতের তাড়নায় চঞ্চল করিয়া পাতি ময়ুর ও টোপরের টুকরা অর্থাৎ শোলার টুকরা ভাসাইয়া মেয়েরা দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে দুইটি টুকরা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। দু'টি টুকরা সংলগ্ন হইতে যতই বিলম্ব ঘটিবে—উহাদের ভাবী মনের মিল সম্বন্ধে ততই উদ্বিগ্ন হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য বধূর ভাগ্য। আন্দোলিত দুধের মধ্যে পড়িয়াই টুকরা দু'টি দ্রুত সংলগ্ন হইয়া গেল এবং চক্রাকারে থালার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মেয়েরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষীর মুড়কি খাওয়ানোর ব্যাপারে আর এক প্রস্থ কৌতুকরঙ্গ শেষ করিয়া ও দুই জনকে ফুলের বিছানায় বসাইয়া মেয়েরা উঠিয়া গেল।

যাইবার সময় কে এক জন আধা বয়সের বধূ ফিস্ ফিস্ অথচ সকলের শ্রুতিগম্য স্বরে বলিলেন, এইবার খিল দিয়ে ফেল, ভাই। আর কেউ বিরক্ত করবে না।

দুয়ার ভেজাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

মাইপোষের উপর ধবধবে বিছানা। গুটিকতক ফুল বিছানার এধার ওধার ছড়াইয়া রহিয়াছে। বর ও বধূর গলায় ফুলের মালা। লাল চেলি পরিয়া ও সাদা মালা গলায় দিয়া নয় বছরের মেয়েটিকে একটি বড় পুতুল বলিয়া মনে হইতেছে। পুতুলের মতই সে নিশ্চল, পুতুলের মতই সে নির্জ্জীব। কতকটা ঘুমভারেও বটে, কতকটা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় ও অন্তঃপুরীয় বিবিধ অনুষ্ঠানের ঘটাতেও বটে। ফুলের বিছানায় বসিয়াই যোগমায়ার নাকে একটি সুমিষ্ট গন্ধ প্রবেশ করিল। গন্ধ নাক দিয়া মাথায় এবং সেখান হইতে সারা দেহে এমন স্নিগ্ধ আবেশ ধরাইয়া দিল যে, পর পর গোটাকতক হাই তুলিয়া সে বাঁ পাশের ছোট বালিশটায় মাথা রাখিল।

ষোল বছরের বর অত শীঘ্র শুইতে পারিল না। দুয়ারটা যে তাহাকেই বন্ধ করিতে হইবে—সে কথা সে জানে, আর আলো নিবাইতে ভুল হইলেও চলিবে না। ঘরের বাহিরে রোয়াকে অনেকগুলি সন্তর্পিত পদশব্দ ও চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে। অন্তঃপুরিকাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। খাট হইতে নামিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া দুয়ারের কাছে গেল ও তেমনই সন্তর্পণে খিল লাগাইয়া দিল। বাহিরে চাপা কণ্ঠের হাসি যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিশোর তাড়াতাড়ি প্রদীপের কাছে মুখ আনিয়া সজোরে ফুঁ পাড়িল। রেড়ির তেলের অনুজ্জ্বল দীপ নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে বাহিরের শাড়ীর খস্‌খসানি, চাপাহাসি, কথা এবং দুয়ারের ছিদ্রপথে চোখ রাখিবার জন্য হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলির শব্দ মিলিয়া ভিতরের প্রাণীটিকে ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে ভয় ক্ষণিকের। প্রদীপ নিবিয়াছে, ঘরে অন্ধকার নামিয়াছে বটে,—পাশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও তো রহিয়াছে। বেশ প্রাণীটি। ক্ষুদ্র, সুন্দর অথচ নিরীহ। এমন নিরীহ যে, ক্লান্তিকর অনুষ্ঠানের মুখে এতটুকু আপত্তিও সে জানায় নাই। বেশ মুখখানি, আর চলনটি—সলজ্জ হাসির মাঝে··· কিশোরের মনে নেশা ধরিয়া গেল। নূতন পরিচয়ের মুখে আজ কি ঘুমাইতে আছে?

পাশে শুইয়া বালিকার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া সে ডাকিল, শুনছো? ওগো—

আঃ! বলিয়া বালিকা ও-পাশে একটু সরিয়া গেল।

কিশোরের বুকের স্পন্দন দ্রুত বাড়িল। নামটি তার মনে আছে, কিন্তু আলাপ জমাইবার মুখে ওই জানা নামটি জিজ্ঞাসা করাই তো সব চেয়ে সহজ পন্থা। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার চাপা কণ্ঠে বলিল, তোমার নামটি কি আমায় বলবে না? বলবে না?

ঘুমের ঘোরে বালিকা এমন একটা শব্দ করিল যাহা কান্নারই রূপান্তর। সে শব্দ জোরে উঠিলেই বাহিরের

লোকগুলি বধূর ক্রন্দনের কারণ জানিতে দুয়ারে সজোরে করাঘাতও তো করিতে পারে!

কিশোর পুনরায় চুপ করিল। কিন্তু বুকের মাঝে পরিচয় জানার উন্মাদনা তাহাকে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। সে পুনরায় সস্নেহে ডাকিল, শুনছো? ওগো—

পুষ্পসুরভি শুধু বায়ুস্তরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, আর উঠিল বাহিরের চাপা কথোপকথন। মাইপোষটা পাশ ফিরিবার কালে 'ক্যাচ' 'কোঁচ' করিয়া উঠিয়াছে একবার।

ভোরবেলায় বধূর ঘুম ভাঙ্গিল। নূতন অবেষ্টনে সে হতচকিত হইয়া গিয়াছিল। ঘুমভরা কণ্ঠেই ডাকিল, মা?

কিশোর জাগিয়া উঠিল, কে? ওঃ—তা তুমি—

বধূ ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া ওপাশে সরিয়া গেল।

কিশোর তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া ডাকিল, তোমার নামটি কি আমায় তো বললে না। বলবে না?

বধূ দম-দেওয়া কলের মত একনিশ্বাসে বলিয়া গেল, শ্রীমতী যোগমায়া দেবী।

বাঃ—বেশ নাম। আমার নাম কি জান? শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মা

বস্ত্রমণ্ডিতা যোগমায়া একটু নড়িয়া সে নাম জানার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল।

রামচন্দ্র বলিল, তোমার পিতাঠাকুরের নাম?

যোগমায়া বলিল, শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই—এই—তুমি আমার নাম ধরলে?

কই—কই—তোমার—আপনার নাম করলাম?

ওই তো রাম বললে না? বর হাসিল।

বধূ মুখ ফিরাইয়া সলজ্জকণ্ঠে সংশোধন করিয়া বলিল,—শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ-শিক্ষাও যোগমায়া-জননীর।

ক্রমশঃ

মায়ের প্রাণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পুত্র তার পথ্য পাবে দেড় মাস পরে,—
প্রসন্ন-মায়ের চক্ষে দীপ্তি তারই ঝরে!
অতি ভোরে উঠি তাই সুনিপুণ হাতে
পুরাতন চাল-ক'টা ঝাড়িল কুলাতে।
এটা-ওটা-সেটা নিয়ে এঘর-ওঘর
ঘুরিল অনেক বার। ললাটের পর
বারেক রাখিয়া হাত বসি পুত্র-পাশে
ভাবিল—ঠাকুর, আর জ্বর নাহি আসে।

—আমিই খাইয়ে দিই;—কাঁপে, দেখ, হাত!
কাঁপিবে না? দেড় মাস!
—আর দু'টি ভাত?
—না, না, এই থাক্ আজ;—এর বেশী নয়।
না দিয়ে পরাণ কাঁদে, দিতে লাগে ভয়!

—এক চির আমসত্ত? আজ নয়, থাক্,
দিনটা সুভালাভালি আজকে তো যাক্।
—ব'সে কেন?—আজ আর নাই, বাছা, আশা,
মুখে দিয়ে ওঠো এই দু-খানা বাতাসা।
তার পর, ভালো থাকো, রয়েছে তো ঘরে,—
দুটো দিন ধরাকাট,—সবই দিব পরে।
—এঁটোটা যাক্ না নিয়ে,—কোথা গেল দাসী?
এইবার যাই আমি, সেরে-সুরে আসি।
—আজ আর ঘুমিও না—এই বইখানা
নেড়ে-চেড়ে ছবি দেখ, পড়া আজ মানা।

দুটো ভাত মুখে দিতে গিয়ে, ফিরে এসে
রাখিল সওয়া-পাঁচ আনা দেবতা-উদ্দেশে,
এলো চুলে তিন বার করিয়া প্রণাম;—
দুটি চোখে অশ্রু তবু না মানে বিরাম।

আধুনিক কবিত্ব

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এলিয়টই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আধুনিক কাব্যের এই রীতি প্রবর্ত্তন করেছেন যে কাব্যের চাল হবে গদ্যের চালের অনুরূপ—গদ্য অর্থ এখানে মুখের চলিত কথা। অবশ্য ভাষা চলিত হবে, মৌখিক হবে, সাধারণ কথা শব্দ ও অন্বয় যথাসম্ভব অনুগমন করবে—কাব্যরচনার এ সূত্র প্রাচীনতর কালেও একাধিক কবি দিয়েছেন এবং কার্য্যতঃ একে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে সাফল্য-লাভও করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সূত্র ছিল এই ধরণের—স্মরণ করুন তাঁর

Can anyone tell me what she sings?

অথবা

'Tis eight o'clock,—a clear March night
The moon is up,—

কিন্তু আধুনিক চেয়েছেন আরও বেশি কিছু। শুধু ভাষা বা কথা হলেই চলবে না, শুধু শব্দাবলি বা অন্বয়ই যথেষ্ট নয়—সাধারণের চলনটি অবলম্বন করতে হবে এবং সাধারণের যে আবার শুধুই সাধারণ চলনটি তাই গ্রহণ করতে হবে।

গদ্যপদ্য বলে এক রীতি আছে (poetic prose)। এটি সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এক বিশেষ অঙ্গ। গদ্যরচনা যখন থেকে সমৃদ্ধ হতে সুরু হয়েছে তখন থেকেই এই রচনারীতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া আছে পদ্যগদ্য (prose poem)—এটি গদ্য হতে পদ্যকাব্যের দিকে উঠে চলবার আর এক পৈঠে। তার পরের ধাপ হ'ল মুক্তছন্দ পদ্য (free verse)। কিন্তু আধুনিকেরা বর্ত্তমানে যা চান তা এ সব রকম ধারা হতে ভিন্ন ধরণের। তাতে পদ্যের বাঁধন, বাহ্যগড়ন যথাসম্ভব থাকবে কিন্তু চাল বা চলন হবে গদ্যের অর্থাৎ তালমান পদ্যের দাবি অনুযায়ী থাকবে কিন্তু সুর হবে গদ্যের। ফরাসী পয়ার (Alexandrine), কর্ণেই বা রাসীনের উচ্চাঙ্গ দ্বাদশপদী যদি পদ্যের মত পড়া যায় তবে তা বিরস নীরস একান্ত একঘেয়ে শুনায়—কিন্তু মিল যতি সত্ত্বেও পড়ে যাও গদ্যের মত তবে তার সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। বিখ্যাত অভিনেত্রী রাশেল (Rachel) এই আবিষ্কার করেছিলেন বলে তিনি ফরাসী নাট্যজগতে স্বনামধন্যা হয়ে আছেন। আধুনিকের অভিসন্ধি কতকটা এই ধরণের। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক এলিয়টের—না, এলিয়টের কথা পরে বলছি—আগে ধরুন বাঙ্গালী কবির অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি

অনেক দিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গরু-খোজা করে—

অথবা

তবু তোমরা আজকের মত চুপ করো,
একটু চুপ করে থাকতে দাও আমাকে—

"আঙ্গিক" হিসাবে বলা হয়েছে এ সব নাকি অনবদ্য। কারণ প্রথমটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে হ'ল নিখুঁৎ পয়ার (নূতন ধরণের ভঙ্গকুলীন যদিও) আর দ্বিতীয়টি পাঁচের চালের মাত্রাবৃত্ত অথবা মতান্তরে চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত। অবশ্য ছড়ার মধ্যে এ ঢঙের ছড়াছড়ি—ইংরাজীতে limerick যাকে বলে সেই পর্য্যায়ের এ সব জিনিস বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা নয়, আধুনিক সমঝদারি হিসাবে এ হ'ল বাস্তবিকই গুরুগম্ভীর কাব্য। এ সমঝদারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আলঙ্কারিকদের এক রসিকতা। নিখুঁৎ শ্লোকের—কাব্যের—দৃষ্টান্ত কি? দুগ্ধং পিবতি মার্জ্জারঃ। কি রকম? শ্লোকে চারিটি পদ থাকা চাই—মার্জ্জারে তাই পাই। শ্লোকে থাকা চাই রস—দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু রস আর কি থাকতে পারে?

রহস্যের কথা যাক। কথ্য ভাষা—তার চাল ও সুর—নিয়ে বোধ হয় আসল সমস্যা নয়—সমস্যা আরও গভীরে। কথ্যভঙ্গী নিয়ে প্রশ্নটি এক দিককার এক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বটে, কিন্তু তা রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। কারণ প্রাচীন যুগের সব কাব্যই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক ভাষায় ও ভাবে রচিত হয় নাই—বরং বিপরীত কথাই সত্য। ম্যাথু আরনল্ড কবিত্বের সেরা grand styleএর পরিচয় দিয়েছেন—যেমন মিলতনের—

Fall'n cherub! to be weak is miserable

কি দান্তের

In sua volontade e nostra pace

এর চেয়ে সহজ স্বাভাবিক লৌকিক মৌখিক ভাষা ও ভঙ্গি আর কি হ'তে পারে? মিলতনের বাক্যটি না হয়
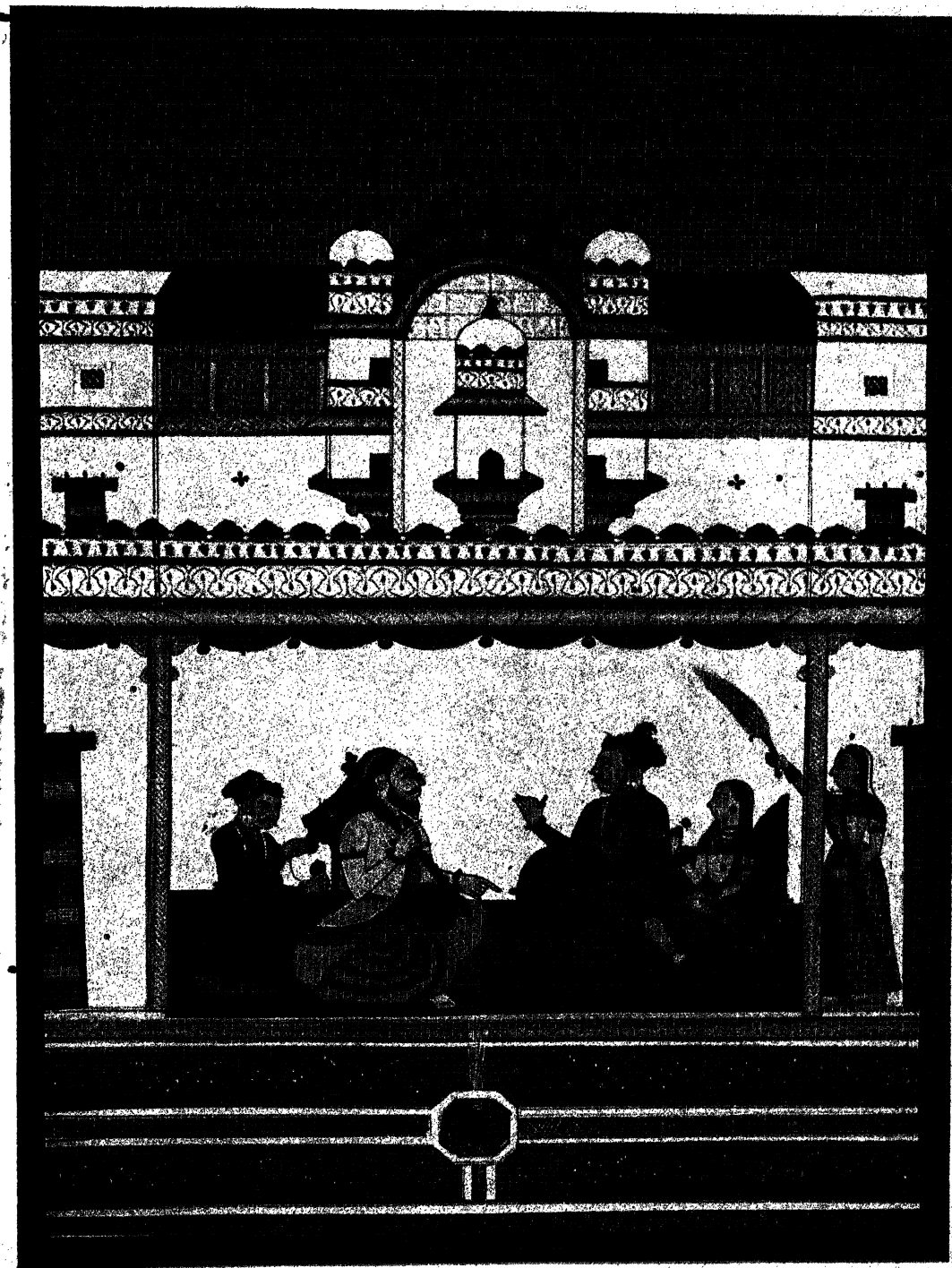
শ্রীরাগ
রাজপুত চিত্র
চিত্রাধিকারী শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলাম, কিন্তু দান্তের রচনা সমস্তখানিই লোকভাষার যথাসম্ভব কাছ-ঘেঁষা হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তা ত নয়—প্রাচীনেরা কাব্যে লোকভাষায় কথা বললেও তাঁরা সর্ব্বদাই উচ্চাসনখানি বেছে নিয়েছেন, আসীন হয়েছেন সে ভাষার তরঙ্গাবলীর শিখরে শিখরে—তলায়, গর্ত্তে নয়—ভাবভঙ্গী যেখানে সমুন্নত একাগ্র বেগময় সেখানে, যেখানে তা শ্লথ শিথিল অবসন্ন সেখানে নয়। আধুনিকেরা তাঁদের কাব্যের সুর আটপৌরে কথাবার্ত্তার যে খাদ (trough) সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন, কেবল তাকেই ধরে থাকতে চেষ্টা করেছেন—পুরাতনের উঁচু বা চড়া সুর যথাসম্ভব বর্জ্জন করে। তাই ত এলিয়ট বলছেন—

Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe.

অথবা

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone
Tell her I bring the horoscope myself :
One must be so careful these days.

কিন্তু কেন? মৎলবটা কি? কি উদ্দেশ্য সাধন হয় এতে? প্রথম কথা কবিতায় আর "কাব্যি" চাই না—কল্পনা মায়ারচনা চাই না, চাই না মন-গড়া আকাশ-কুসুম কিছু। চাই সত্যং রূঢ়ং—শিবং সুন্দরং নয়। অনুভব চাও, তীক্ষ্ণ তীব্র নাট্য চাও—তার উপাদান চার ধারে সহজ জীবনে আটপৌরে দিনগুজরানের মধ্যে পড়ে রয়েছে, তার জন্যে আকাশে উড়তে হবে না, স্বর্গ ঢুঁড়তে হয় না। রোজকার কথা কাহিনীরই মধ্যে মানবজীবনের সত্যকার রস ও রহস্য নিহিত। নাই? আচ্ছা শুনুন আরও একটু এলিয়ট—

HURRY UP PLEASE ITS TIME
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May.
Goonight.
Ta ta. Goonight. Goonight.
Good night, ladies, good night, sweet ladies,
good night, good night.

তবে এখানে লক্ষ্য করবেন গদ্যের ধারাটা ধীরে ধীরে চলছে কোন দিকে—দেখি নাকি অর্থটা কেমন একটু ঘনীভূত হয়েছে—সুরে মোড় ফিরেছে—চালে রঙ ধরেছে? সবই গদ্য, গদ্যাত্মক বটে—কিন্তু কবিকে একটু কারচুপি খেলতে হয়েছে—সূত্র যাই হোক,—গদ্যকে একান্তই গদ্যাবস্থায় রাখলে কবির উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হয় না। কবিপ্রাণ চঞ্চল হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলেই সে আর চেষ্টা করলেও একান্ত খাদে পড়ে থাকতে পারে না। যদি চেষ্টা করা যায় —অনেকে, বিশেষতঃ আমাদের বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে, তা জোর করে সজ্ঞানে করেছেন—তবে ফল এই—

যারা না জন্মালেই পারতো এ পৃথিবীতে
বা জন্মালেও আপত্তি করার কিছু নেই—

কিম্বা

আজ বিকালে হঠাৎ দু-পেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল,
যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়—

(যাকে কাব্য বলা চলে না, বলা চলে "ইয়ার্কী" শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্তের ভাষায়)

আমি বলি কবিচিত্ত যেখানে গাঢ় গভীর কবিকণ্ঠেও ফুটে ওঠে সেই গাঢ়ত্ব গভীরত্ব। এলিয়ট যদি সত্যকার কবি হয়ে থাকেন, তবে হয়েছেন্ যখন তিনি এই ধরণের কথা বলে উঠেছেন :

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream Kingdom
These do not appear :
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

এ বস্তুটুকু তাঁর **Madame Sosostris,** এমন কি **Good Night** হতেও বহু দূরের জিনিস। থিওরী এক জিনিস আর বাস্তব আর এক জিনিস—থিওরী কবির মনের, মৎলবের রচনা কিন্তু বাস্তবসৃষ্টি কবির অন্তরাত্মার অনুশাসন—সে চলে নিজের খুশীমত—**bloweth where it listeth.**

সে-থিওরী এক দিককার হ'ল এই—কাব্যের লক্ষ্য নিরালম্ব অসম্বৃত সত্য। আভরণ আবরণ খুলে ফেলতে হবে, চাই

Sunlight on a broken column

সূর্য্যের নির্নিমেষ প্রজ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে হবে। তাই সত্য হ'ল ধূলা বালি কঙ্কর—কঠিন চূর্ণ বস্তু; সজল সবুজ তার উপর একটা মিথ্যা মায়ার প্রলেপ। ধনদৌলত ঋদ্ধিশ্রী হ'ল বাহ্য সমারোহ, কতিপয়ের বিলাস—সার্ব্বজনীন সুতরাং মৌলিক বস্তু হ'ল অভাব দৈন্য রোগ দুঃখ। সভ্য মানুষ শিক্ষিত মানুষ পরগাছা মাত্র—ধরিত্রীর সাক্ষাৎ সন্তান দীন দরিদ্র আদিম অসভ্য মানুষ। জিনিসের মূলে যেতে হবে অর্থাৎ মাথা কেটে অধমাঙ্গের দিকে চলতে হবে—পঙ্কজের রহস্য খুঁজতে হবে পঙ্কের মধ্যে। জিনিসকে এই রকমে কেটে ছেঁটে তার যে ক্ষুদ্রতম নিম্নতম হেয়তম প্রকরণ তাতে পর্য্যবসিত করতে হবে। আমাদের মুনি ঋষিরা মানুষকে সমুন্নত ঊর্দ্ধায়িত রূপান্তরিত করেছিলেন "বালোন্মত্ত

পিশাচবৎ” অধ্যাত্মসাধকে, বর্ত্তমান যুগেও আমরা সেই বালোন্মত্ত পিশাচ চেয়েছি কিন্তু বিপরীত দিকে অধোদিকে যথাসম্ভব চলে গিয়ে। গদ্যকে আমরা যে রীতি হিসাবে চাই, চাই গদ্যাত্মক গতি তার হেতু ঠিক এই যে মনের মধ্যে আমরা উপরে থাকতে চাই না, চাই নীচের তলায় গড়াগড়ি দিতে।

অল্প ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর, দৈনন্দিন ঘরোয়া উপাদান যে কাব্যের মধ্যে থাকতে পারে না তা নয়। কাব্যের মধ্যে তা যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু কবির মধ্যে, কবিচেতনায় সে জিনিস অর্থাৎ শুধুই সে জিনিস থাকলে চলবে না—কবিচেতনাকে আর একটা জিনিস দিয়ে গড়তে হয়। প্রাচীন মনীষীরা কবিচেতনাকে ঋষি-দৃষ্টির সঙ্গে একীভূত করেছিলেন অর্থাৎ যে দৃষ্টি সব জিনিস দেখে তাকে আনন্ত্যের ছাঁচে ফেলে।

আধুনিকেরা এই জিনিসটাও মানছেন না। অনন্তের জন্য তাঁরা ব্যস্ত নন, কাব্যরসের জন্য তার আবশ্যকতাও তাঁরা অনুভব করেন না, কি স্বীকার করেন না। তাঁদের পদ্ধতি অন্য রকমের। গদ্যময় বস্তুকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু তাকে গদ্যময় ধারায় ব্যবহার করা ছাড়া আর একটু বেশী কিছু করা দরকার—নতুবা কাব্যে আর গদ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না—দুই-ই এক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক কবিরাও কবিপদবাচ্য হ'তে চান, সুতরাং পার্থক্য একটা তাঁরা স্বীকার করেন স্থাপন করেন বৈ কি, অন্ততঃ কার্য্যতঃ।

পদ্ধতির মূলসূত্রটা হ'ল এই যে যে-বস্তু বা যে-ঘটনা হ'ল কাব্যের বিষয় ঠিক তার নিজস্ব ধর্ম্ম ও প্রকৃতি দিয়ে তাকে ফুটিয়ে ধরতে হবে অর্থাৎ সে-বস্তু বা ঘটনাকেই কথা বলতে দিতে হবে, কবি তার হয়ে কথা বলবেন না। প্রাচীনে ও আধুনিকে এইখানেই সমস্ত পার্থক্য বললেও বোধ হয় বেশী ভুল হয় না। ধরুন Wasteland যদি হ'ল বিষয়, তবে তার সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা শুনতে চাই না, শুনতে চাই না তার বিবরণ বিবৃতি (কালিদাসের হিমালয় যে রকম), চাই Wasteland যদি কথা বলতে পারত তবে সে কি বলত, তার নিজের আভাষণ—কবি তার হবেন যন্ত্র মুখপাত্র, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে প্রায় তাই হয়ে যাবেন যেন। সে রকম Hollow Men যদি হয় কবির লক্ষ্য তবে Hollow Menএর পরিচয় চাই না, চরিত্রচিত্র চাই না, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চাই না—চাই এমন একটা বাক্যের ছন্দের ধ্বনির ব্যঞ্জনার সমাহার যার মধ্য থেকে শুনি বেজে উঠছে শুষ্কতা শূন্যতা নৈরাশ্য। চোখের সামনে Wasteland ভেসে উঠছে, শুধু তাই নয় Wastelandএর ভিতর দিয়ে সশরীরে চলি না কি শুনি যখন

> A heap of broken images, where the sun beats,
> And the dead tree gives no shelter, the cricket
> no relief,
> And the dry stone no sound of water. Only
> There is shadow under this red rock . . . .
> Your shadow at morning striding behind you
> Or your shadow at evening rising to meet you;
> I will show you fear in a handful of dust.

অথবা আমরাই কি Hollow Men হয়ে যাই না যখন কানে বাজে—

> The eyes are not here
> There are no eyes here
> In this valley of dying stars
> In this hollow valley
> This broken jaw of our lost kingdoms. . . .

এলিয়ট এ সব জায়গায় যে তাঁর পদ্ধতিতে সাফল্য লাভ করেছেন অনেকখানি তা স্বীকার করতে হয়।

এলিয়টের Good Night একটু আগে আমি শুনিয়েছি। বিদায়ের পালা কত কবি কত ভাবে গেয়েছেন, কাব্যের এ জিনিসটি বোধ হয় সবচেয়ে কবিত্বময় অঙ্গ। ওথেলোর

> Speak of me as I am; nothing extenuate. . . .

কিংবা হ্যামলেটের

> —the rest is silence—

কি ভর্জিলের অরফিউ যখন বলছে

> Heu sed non tua palmas

অথবা শকুন্তলার সেই—

> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্

অথবা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

> "আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
> ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে"—

এ সব মানবহৃদয়ের গভীর নিবিড় মর্ম্মোচ্ছ্বাস—কিন্তু আধুনিকেরা চান জিনিসটা আর এক ভাবে ব্যক্ত করতে। এ সবই হ'ল ব্যাখ্যা বিবরণ বর্ণনা—**articulation** সুঠাম বাচন—কিন্তু আধুনিকেরা চান **articulation** নয়, **incantation** মন্ত্রজপ। বাচন জিনিসকে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী করে এঁকে দেখাতে পারে বটে, কিন্তু মন্ত্র জিনিসটিকেই যেন ধরে দেখায় প্রাণময় ক'রে। এলিয়টের Goonight···Good Night···এবং পুনঃ পুনঃ তার পুনরুক্তি বিদায়-স্পন্দনকে সাক্ষাৎ স্ফুরিত ক'রে তুলছে না?

আর মন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য হ'ল অর্থস্বচ্ছতা নয়, অর্থক্লিষ্টতা। কারণ অর্থ নয়, অর্থাতিরিক্ত একটা জিনিস

তার লক্ষ্য ; মন্ত্রের লক্ষ্য যেমন দেবতাকে অবতরণ করান, দেবতার আবির্ভাব করান, সেই রকম কাব্য সত্যকে বস্তুকে জীবন্ত মূর্ত্তি দিয়ে জাগ্রত করবে। তাই দেখি এলিয়ট যুক্তিগ্রাহ্য পারম্পর্য্য বা অন্বয়কে অবহেলা ক'রে চলেন। ধ্বনির বর্ণসমুচ্চয়ের সংঘাতে তিনি রচনা করেন সত্যের আবাহন বা বোধন। তাই নানা ভাষা মিশিয়ে ফেলতেও তাঁর ইতস্ততঃ হয় না, এবং কাব্যের মন্ত্রত্ব প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি তিনি উপনিষদের বাক্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য এক কবিতায় শেষ করেছেন—শুনুন

> London Bridge is falling down falling down falling down
> *Poi s'ascose nel foco che 'gli affina.*
> *Quando fiam ceu chelidon*—O swallow swallow
> *Le Prince d'Aquitaine a la tour abolie*
> These fragments I have shored against my ruins
> Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.
> Datta. Dayadhvam. Damyata.
> Shantih shantih shantih.

কিন্তু কাব্যে এ হ'ল যাকে বলা যেতে পারে মন্ত্র **with a vengeance**—প্রায় হ্রীং ক্লীং এর পর্য্যায়ে।

কাব্যকে গদ্যাত্মক করবার পদ্ধতি ও আদর্শ হ'তে মনে হবে আমরা বেশ দূরে এসে পড়েছি। কিন্তু ঠিক তা নয়। এ ধরণের মন্ত্র গদ্যেরই সার—এতে তাল আছে হয়ত কিন্তু সুর নাই।

বাংলায় তবু আমরা এলিয়টের পর্দ্দায় উঠে যেতে পারি নাই। এক কারণ এলিয়ট রীতিমত গম্ভীর ও রাশভারী (**highly serious**) এবং তাঁর আছে একটা গভীর অনুভব। তাঁর মস্তিষ্ক যতই খেয়ালী স্বৈরাচারী "স্বতন্তরী" হোক না—তার পিছনে একটা গাঢ় রসবত্তা আছে (যদিও তাকে ঠিক কাব্যরস বলতে ইচ্ছা হয় না)। আমাদের দেশে এলিয়টীয় আবহাওয়া যাঁরা সৃষ্টি করতে চাইছেন মনে হয় তাঁদের বাহ্যাঙ্গটিই সর্ব্বাঙ্গ হয়ে উঠেছে, এলিয়টের অন্তঃসার সেখানে নাই। পাশ্চাত্যের আধুনিক কাব্যসৃষ্টি যতই কেবল মগজী-রচনা হোক না—তবু তা হ'ল পাশ্চাত্যের একটা সমগ্রজীবনের বিশেষ প্রকাশ, তার পিছনে রয়েছে একটা গভীর প্রয়োজন, প্রাণের প্রবেগ। কিন্তু আমাদের দেশে এ জাতীয় সৃষ্টি হ'ল কাগজের ফুল। ইউরোপের আবহাওয়া (সমাজের, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রের মত) কাব্য ক্ষেত্রেও আমাদের মস্তিষ্ককে বড় জোর একটু উস্কে দিয়েছে, আমাদের প্রাণে দোলা দেয় নাই, আমাদের অন্তরাত্মাকে ত স্পর্শ ই করে নাই। যখন শুনি (শ্রীঅতুল গুপ্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)

ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ—

তখন এর জুড়ি হিসাবে স্মরণে আসে—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, অথবা শুনি যখন

> খুঁজে মেলে নিক ইসারা,
> ডাকঘরে নেই ঠিকানা,
> চিঠি নেই ; দিবা নিশারা—
> ভস্মলোচন তৃষা-রা
> ভবঘুরে ঘোরে, ঠিকানা—
> পলায় পিশাচ ইসারা !

তখনও অদীক্ষিতের বলতে ইচ্ছা হবে না কি এ হ'ল স্রেফ **abracadabra**, হযবরল, অথবা ভাল কথায়, ওঁ হিলিহিলিং কিলিকিলিং ?

কাব্য মন্ত্র, স্বীকার করা যায়। কিন্তু মন্ত্র দুই রকমের আছে। আধুনিকেরা অনুসরণ করেন তান্ত্রিকের বামমার্গীর মন্ত্র। প্রাচীন কবিকুল বৈদান্তিক ও দক্ষিণ মার্গকেই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেছিলেন—

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—

কবয়ঃ

"বনফুল"

পাত্র-পাত্রী

লেখক···লেখক এবং কবি
বৃন্দাবন রুজ···মোদক
নরসুন্দর···নাপিত
ভবেশ·· মালী
ধ্রুবেশ গুড়·· অতি-আধুনিক-মনা
(সকলেই নিরক্ষর)
অম্বিকেশ নন্দী···জম্বুদ্বীপের জমিদার
চন্দ্রমুখী···অম্বিকেশের কন্যা
ছয় জন দারোয়ান।

[নিজের ঘরটিতে লেখক বসিয়া আছেন। ঘরটির একটি বিশেষত্ব আছে, দেওয়াল দেখা যাইতেছে না, চারি দিক রঙীন পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। ঘরের পিছন দিকে পর্দ্দাগুলি বিভক্ত হইয়া দুইটি দ্বারে পরিণত হইয়াছে। অভিনয়কালে দেখা যাইবে দ্বারের বাহিরে নানা রঙের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে ও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। লেখক ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী, পরিধানে সাদাসিধা পরিচ্ছদ, কারণ তিনি গরীব। ঘরে কয়েকটি মোড়া ছাড়া আসবাব নাই। একটি টেবিলে কাগজ কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে।]

লেখক [দর্শকবৃন্দকে]

নমস্কার বন্ধুগণ, আশা করি ভাল আছেন সকলে
আমাদের এ জম্বুদ্বীপে খারাপ থাকা শক্ত
জম্বুদ্বীপে কিছু না থাক আনন্দটি আছে সবার দখলে
একটুখানি সুযোগ পেলে হর্ষভরে হই মোরা উন্মত্ত।
হবেই এটা বলতে
স্ফূর্ত্তি সদাই জ্বলছে মনে ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে
তৈল-বিহীন হয় না কভু সলতে।
সবাই হেথায় ফুর্ত্তি করে হাসে নাচে ও খায় দায়
আজকে কিন্তু আমি মশাই পড়েছি এক বেকায়দায়;
টাকার ফেরে পড়ে গেছি—দশটি নগদ টঙ্কা
জাগছে চিতে শঙ্কা!
দশটি টাকার জন্যে হবে কাব্য বিপর্য্যস্ত
এ যে বিপদ মস্ত!
চক্ষু দিয়ে যদিও তারে করি নি কো দর্শন
কর্ণপথে প্রবেশ ক'রে করছে হৃদয়-কর্ষণ
নামের মোহে মন হয়েছে বন্দী
সুমিষ্ট নাম, অপূর্ব্ব নাম—চন্দ্রমুখী নন্দী।
কবিতাটা লিখেইছি তো—কিন্তু তার অর্থকেই
মহত্তর করতে হবে দশটি টাকা সহযোগে
বাপের তার সর্ত্ত এই!
আমার সম্বল একটি টাকা—
দেখাইলেন,
ভরসা একটি আশার 'পর
জম্বুদ্বীপে বক্তা সবাই অধিকাংশই নিরক্ষর।
কালি কলম কাগজ ঘাঁটা—হেথায় কারো সে শখ নেই
স্বভাবকবি অনেক আছেন আমি ভিন্ন লেখক নেই।
চন্দ্রমুখীর পাণিপ্রার্থী হন যদি কেউ তাঁরে
আসতে হবে এই লেখকের দ্বারে।
কন্যাসহ নন্দী মশাই সন্ধ্যা বেলা এসে
এইখানেতেই কাব্য-বিচার শেষে
শ্রেষ্ঠ কবি-করে
কন্যাটিরে দেবেন সমাদরে,
অবশ্য সে যদি পারে দিতে
দশটি টাকাও সুপ্রসন্ন চিতে!
সকাল থেকে বসে বসে লিখেছি তো কাব্য
কিন্তু হায় রে—দশটি টাকা—যাক গে কত ভাবব
যা হবার তা হবেই হবে —থাকে যদি ভাগ্যে
ভাবব না আর যাক গে—

বাহিরে জল-তরঙ্গের বাজনার মতো ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বৃন্দাবন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। লেখক সাড়ম্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন—

এস এস বৃন্দাবন আগে যদি জানতাম
তোমার মতো মহৎ লোকের মিলবে আজি দরশন
কারো কাছে চেয়ে-চিন্তে কার্পেট একটা আনতাম
তার ওপরে বিছিয়ে দিতাম কুন্দ কলি অগণন!
এমন সময় আস না তো—হচ্ছে কেমন সন্দ'
সকাল সকাল আজকে কেন দোকান করলে বন্ধ।

বৃন্দাবন। লেখনী-সম্রাট ওহে, জ্ঞান-তুঙ্গ শির,
জিলাপি বেচিতেছিনু বসিয়া দোকানে

চ্যাটরার বাদ্যভাণ্ড গুরু ও গম্ভীর
আকুল করিয়া দিল অন্তরে ও কানে!
অম্বিকেশ নন্দী নাকি করিছে প্রচার
কন্যার বিবাহ তার দিবে এইবার?

লেখক। তাহাই তো বলিতেছে সবে

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী-বিষয়েতে কবিতা রচিতে নাকি হবে?
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হবে যার
চন্দ্রমুখী তার?

লেখক। তারই বটে—কিন্তু ভাই শুধু পদ্য নয়,
আরও সর্ত্ত আছে গদ্যময়।

বৃন্দাবন। কিবা কহ কহ,
আমি অহরহ
কবিতা লিখিব বসি'—
চন্দ্রমুখী-মুখ-শশী
চটচটে ভাব-লেই দিয়া
রাখিব সাঁটিয়া
শূন্য মম হৃদয়-আকাশে,
দোকান রহিবে বন্ধ, কিবা যায় আসে।
কহ, কোন সর্ত্ত আছে আর?

লেখক। সম্পূর্ণ কবিতা চাই পূর্ব্বেই সন্ধ্যার।

বৃন্দাবন। প্রচুর সময়, এক ঘণ্টা আছে হাতে,
মহাকাব্য হয়ে যাবে তাতে!
ভাব-রস উথলিছে বুকে
চারি ছত্র কবিতা তো এখনি রচিব মুখে মুখে।
নাই মনে? সে বৎসর রায়েদের বাড়ি
সরবরাহ করেছিনু মাল এক গাড়ি
মাত্র একটি ঘণ্টার নোটিসে?
একই ব্যক্তি আমিই বটি সে!
আশা করি আর কোন নাহিক ঝঞ্ঝাট?

লেখক। আছে ভায়া, আছে আরও গাঁট!
কবিতাতে মিল থাকা চাই চন্দ্রমুখীর সঙ্গে
মণি যেমন গাঁথা থাকে কাঞ্চনেরই অঙ্গে!

বৃন্দাবন। অথবা সন্দেশ যথা সুন্দর ছাঁচেতে!
অন্তরে ফুটিছে রস কল্পনা-আঁচেতে···

লেখক। কাগজেতে ঢালতে হবে আঁচের থেকে নাবিয়ে
মুক্তোর মতো অক্ষরেতে লিখতে হবে বাগিয়ে!

বৃন্দাবন। দমাইয়া দিলে যে তাহলে
লেখনী চলে না হাতে মোর—
তাড়ুটাই চলে!

লেখক। আমি তব ভৃত্য আছি ঠিক

বৃন্দাবন। পারিশ্রমিক?

লেখক। একটি টাকা। মুক্তোর মতো অক্ষরে
এমন ধারা লিখে দেব চন্দ্র-মুখী-বক্ষরে
কাঁপিয়ে দেবে দুরু দুরু—

বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ লেখককে একটি টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। বেশ, তাহলে করি শুরু?
থাম, দাঁড়াও কোন দিক দিয়ে ভাবি—
যদি বলি চন্দ্রমুখী তুমি মম হৃদ-প্যাটরার চাবি
কিম্বা যদি বলি চন্দ্র তুমি আমার জগৎ

লেখক। লেখার সঙ্গে দশটি টাকাও দিতে হবে নগদ

বৃন্দাবন। দিব দিব তা-ও দিব নহি পিছপাও
কবিতাটা ভাবি আগে কেন বাধা দাও।
তুমি রস আমি গোল্লা তুমি পুর আমি যে কচুরি
তুমি চিনি আমি বস্তা, মনে আসে উপমা প্রচুরই—
তুমি···না না না···ওদিকেতে যাই—
সম্মুখে থাকিলে কেহ জুৎ নাহি পাই।

বৃন্দাবন ভাবগ্রস্ত হইয়া কবিতা ভাবিতে ভাবিতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন এবং একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন। বাহিরে আবার জল-তরঙ্গ বাজিল।

লেখক। ঘণ্টা বাজায় কে

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর

ফুল-বাগানের মালী আমি ভবেশ

লেখক। আসুন আসুন করুন প্রবেশ

দক্ষিণ দরজা দিয়া ভবেশ প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন ইহা দেখিতে পাইলেন না। ভবেশ দেখিতে সুশ্রী নয়। দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা, তলায় গোলাপী গেঞ্জি। দুই কানে ফুল গোঁজা, হাতে ফুলের মালা জড়ান। মাথায় টেরি, এত তেল মাখিয়াছেন যে গড়াইয়া পড়িতেছে।

লেখক। ফুলের বনে বসতি যাঁর সৌরভে নিশ্বাস
তিনি আজি দীনের দ্বারে! হচ্ছে না বিশ্বাস!

ভবেশ। সাধে কি এসেছি, জ্বালায় জ্বলছি
মাইরি বলছি!
কোণে ও কে? অসুস্থ কি? রয়েছে চোখ বুজে!

লেখক। চেনেন না কি শ্রীবৃন্দাবন কুজে?
সুবিখ্যাত রস-স্রষ্টা, চৌমাথাতে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
তার পাশেই মুদির দোকান দেখেন নি কি তাঁর?

ভবেশ। বৃন্দাবন? না, চিনি না। দুলছে কেন অমন ধারা!

লেখক। ছন্দ-দোলায় দিশাহারা,
এসেছেন মোর কাছে ছেড়ে নিজ গৃহে

ভবেশ। বল কি হে!
কবি-আত্মা ময়রা-বক্ষে
দেখতে হ'ল তাও চক্ষে!

বৃন্দাবন। গোলমাল করিও না, কেটে যায় সুর,
আরে কে ও ভবেশ চতুর!
ভুলি নি তোমার নাম বাকি রাখিয়াছ দাম
বহুপূর্ব্বে নিয়েছিলে কিছু মতিচুর।

পুনরায় ভাবগ্রস্ত হইলেন

"তুমি মতি আমি চুর—এ চিবুকে তুমি সুর—"

ভবেশ। মৎলব আছে বাবা
বেরাল বসে শুঁকছে গোলাপ উঁচু ক'রে থাবা!
শোন লেখক পষ্ট বলি খুলে
তোমার কাছে আসি নি পথ ভুলে
নন্দীকন্যা চন্দ্রমুখীর ঝাঁঝে
প্রাণের খাঁজে খাঁজে—
মানে—

লেখক। অধম সবই জানে।
যা বলেন—রাজি আছি করিবারে তাও

ভবেশ। ভাও বাংলাও
আমার কবিতা লিখে দাও যদি
ক-টাকা চাও?

লেখক। দু-টাকা

ভবেশ। দুই নয় ভাই, একটি,—লক্ষ্মী,
ফাঁসাইতে যদি পারি ও পক্ষী
এক মুঠো টাকা দেব ইনাম্—

লেখক। রাজি হলাম।

ভবেশ টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। [বুক চাপড়াইয়া] হায় কি মুস্কিল
চন্দ্রমুখীর সাথে জোটে না যে মনোমত মিল!

ভবেশ। কসিটাকে কর কিছু ঢিল
হয়ত মিলিবে অকস্মাৎ।

লেখক। [অর্দ্ধ-স্বগত] তিন হ'ল—বাকি এখন সাত।

ভবেশ। এই মূর্ত্তি সামনে রেখে কাব্য করা শক্ত হবে ভাই
একটুখানি একলা হ'তে চাই।

লেখক। বেশ তো, কোথায় বসতে চান

ভবেশ। খুশি হ'ত প্রাণ
পেতাম যদি নিরিবিলি, একটু আলো ঝিলিমিলি
কাছেপিঠে থাকত আতরদান,
গদি-আঁটা নরম সোফা থাকলে হ'ত আরও তোফা
বুঝছই তো চরম কাব্য ভাবব তাতে বসে
শেষতক্ সব ভেস্তে না যায় বসতে পারার দোষে!
তোমার দেখছি কাঠ-খোট্টা ব্যাপার—

লেখক। এই মোড়াটায় বসুন না হয় পেতে দিচ্ছি
র‍্যাপার—

ভবেশ। বেশ তাই হোক,কিন্তু লেখক আর কেউ যদি আসে
গোলমাল যেন না করে আমার পাশে।
একটি বেফাঁস বাক্য কিম্বা মূর্ত্তি বেয়াড়া রকম
একটি হপ্তা করে ফেলে মোরে জখম।
কাব্যই নয় হয়ে যাবে মোর স্বাস্থ্য-নাশ

লেখক। সর্ব্বনাশ!

লেখক মোড়ায় র‍্যাপার পাতিয়া দিতে ভবেশ তদুপরি বসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সজোরে আবার বাহিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ভবেশ। এবার আমি করছি শুরু হুঁশিয়ার—

লেখক। [অর্দ্ধ-স্বগত]
আর এক জন, চমৎকার!

হুড়মুড় করিয়া নরসুন্দরের প্রবেশ, হাতে প্রকাণ্ড একটা কাঁচি। লোকটি বেঁটে মোটা। বাঁ হাতে একটি চিরুনিও রহিয়াছে। নরসুন্দর খুবই উত্তেজিত।

নরসুন্দর। লেখক—লেখক
শুনেছ?
নন্দী—চন্দ্রমুখী!
ঢ্যাঁটরা শোনা মাত্রই
আমি বেরিয়ে এলাম ছুটে!
খাঁচা-ছাড়া পাখীর মতো
ধনুক-ছোঁড়া তীরের মত—
পারলাম না থাকতে
শহর—সমস্ত শহর উত্তেজিত—
চন্দ্রমুখী—চন্দ্রমুখী—
রাজরাণী হবার যোগ্যতা তার
প্রতি আঙুলে একটা ক'রে আংটি
প্রতি আংটিতে দামী পাথর
ইয়া বড় বড়
কানে হীরের দুল
দুল নয় যেন মোচা—

লেখক। কাঁচি সামলাও—চোখে দিও না খোচা

নরসুন্দর। সামলাতে পাচ্ছি না
নিজেকে সামলাতে পাচ্ছি না আমি,
ইচ্ছে করছে নাচি!
লেখক,
লেখ, লেখ—
আমার কবিতাটা লিখে দাও আমাকে!
গদ্য কবিতায় অভ্যস্ত আমি
কিন্তু মিল মেলাবই!

চন্দ্রমুখীকে পাই যদি
ওঃ যদি পাই
আর
চুল কাটতে হবে না
দাড়ি ছাঁটতে হবে না
বনে' যাব—
তরে' যাব—
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ
আমার বুকের কথা
টুকে দাও তুমি !

নেপথ্যে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর

বেরিয়ে আয় ব্যাটা
ধূসর পেঙ্গুইন
রেলটুনটুনি
চুপ
নিঝ্‌ঝুম
আধখানা —

নরসুন্দর। [বিব্রত]
ঐ যাঃ—ছি ছি !
অতি আধুনিক কবি ধ্রুবেশ গুড়ের
ছাঁটছিলাম দাড়ি !
অর্দ্ধেকটা ছেঁটেছিলাম
এমন সময় শুনলাম চ্যাটরা
ছুটে এলাম আত্মহারা হয়ে
ডাক দিলে আমায় অনাগত

ক্রুদ্ধ ধ্রুবেশ গুড়ের প্রবেশ। খুব রোগাগোছের লোক, দাড়ির এক দিক ঠিক আছে, অন্য দিক খাবছা খাবছা করিয়া ছাঁটা। গলায় একটা প্রাচীন তোয়ালে বাঁধা।

লেখক। গুড় মহাশয়, স্বাগত
গুড়। অরুন্ধতীর সক জ্যোতি
ঠোঁটে—হুঁ !
মুচকি ?
চার পাশ ঘিরে চতুর চিকমিক
কেন ?
লেখক। হাসছি কেন ? অনেক দিনের অদর্শনের পরে
দেখা পেয়ে বুক উঠেছে ভরে !

গুড় মহাশয় নরসুন্দরকে দেখিয়া বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

গুড়। ওই যে—শ্রাদ্ধ—লোপাট—
চালাকি—!

হাস্যাস্পদ
সূর্য্য-প্রাখর্য্য, তপ্ত পথ, ছুটছি…
আধ-ছাঁটা দাড়ি—
বাষ্পীয় সম্ভ্রম !
লেখক। ধ্রুবেশবাবু, একটু ধরুন দম।
নর-সুন্দর নাপিত হ'লেও মনে মনে মস্ত কবি উনি
অন্তরেতে অহরহ জ্বলে কাব্য-ধুনী।
প্রিয়া-মিলন লাগি —
গুড়। মিলন !
নাকের সঙ্গে ঘুসির
পিঠের সঙ্গে জুতোর
খুড়ি খুড়ি
উনবিংশ শতাব্দীর উপমা ওগুলো—
থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে টেলিভিশনে মেড়ে
বিলিতী ছ-পেনি মাসিক পত্রের
যে কোন ছোঁড়া লেখকের চোখে
পরিয়ে দিন অঞ্জন,
তারই আবছায়া সৌন্দর্য্যের সঙ্গে
আলশেশিয়ান কুকুরের ল্যাজনাড়ার সুর
ভবেশ। ওহে লেখক, পাগলটাকে দাও না করে দূর !
বৃন্দাবন। ঐ যা, ফের কাট্‌ল সুর !
নরসুন্দর। সবিনয়ে বলছি
আর একদিন
সত্যি বলছি আর একদিন
দেব
হ্যাঁ দেব
বাকি দাড়িটা নিশ্চয়ই ছেঁটে দেব আপনার।
আজ কিন্তু রেহাই দিন
দোহাই !

মোড়া টানিয়া বসিলেন।

লেখক। ধ্রুবেশবাবু, আপনিও তো মস্ত কবি শুনি
ছড়িয়ে বেড়ান পান্না-চুনী
বেণাবনে, আড়ালে আব-ডালে !
উচ্চাঙ্গের চতুষ্পদী ছাড়ুন না এই তালে
দাবড়ে বেড়াক চন্দ্রমুখীর বুকে—
গুড়। ময়নামতীর চরে জাগে সুখে
শ্যাওলার স্বপ্ন
শাকুনিক আকুতি !
ধূসর-পিঙ্গল মিনমিনে পায়রা সব
খরচ

ভয়ানক খরচ
গুহা···
অক্ষি-কোটর

লেখক। চন্দ্রমুখী ধনীর মেয়ে নিজের আছে মোটর
টো-টো ক'রে বেড়ান যদি রেস্ত পাবেন টো-টোর!

গুড়। তাই কি?
কটা-চুলে জড়ানো ভায়োলেট পাপড়ি?
ঘা-খাওয়া এরোপ্লেনের পুচ্ছোৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া?
সত্যি!
নীলাভ সবুজাভা!
হাঁ হাঁ
মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যেন
নিবু নিবু জোনাকী-উৎসবে
নিঃশব্দ পদধ্বনি
ক্লিওপেট্রার!
আসছে···ভাব আসছে···
চিনে মাটির টবে

লেখক। ভাবলে শুধু চলবে না কো লিখতে হবে।
নন্দী নিজে দেখবে এসে কন্যা সহ—

গুড়। কি দুঃসহ!
লিখতে?
স্বপ্নের ফোটোগ্রাফ!

লেখক। করেন যদি মাফ
স্বপ্নটিকে বাঁধতে পারি দিয়ে আখর বাঁধ
একটি টাকা পেলে পরেই পাতব লেখার ফাঁদ!

গুড়। এক টাকা!
অত্যন্ত দেশী!
শিলিং
ফ্রাঁ—

লেখক। টাকা নইলে পারব না!

গুড়। (দন্তে দন্ত ঘষিয়া)
স্বপ্নকে মূর্ত্তি দেবে!
শাদা কাগজে তুলবে
কালি-আবর্ত্ত!

লেখক। কি করব, নন্দীর ওই সর্ত্ত—

গুড়। তবে নাও—টাকাটাই বড় নয়—উঃ মর্ত্ত্য!

টাকা দিলেন

পাষণ্ড—
অ্যামেথিষ্ট্
কপিশ!

লেখক। [হাসিয়া]
একটি কথা রাখলে মনে হালকা হবে বিষ
চন্দ্রমুখীর ঠোঁটটি রাঙা চোখটি কালো মিশ!

গুড় মহাশয় মোড়া টানিয়া বসিলেন ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভবেশ। কচকচানি থামল বাবাঃ—বাঁচা গেল
রে মনুয়া, মিলটি এবার মিলিয়ে ফেল!
চন্দ্রমুখী, খুকি, শুঁকি, ঝুঁকি, ধুকপুকি
উঁহু হচ্ছে না ঠিক—ঢুকি, রুখি,—উহুঁ—

নরসুন্দর। মুহুর্মুহু
আসছে আর পালাচ্ছে!
গদ্য-কবিতার খাত,
কিলবিলিয়ে মিল আসে না,
আসে আর পালায়
এসেছে—পেয়েছি—এই—
চন্দ্রমুখী
ছন্দ ঠুকি—

গুড়। কৃকলাস উৎসুকই···

বৃন্দাবন। হে বন্ধু, নীরব থাকা যদি অসম্ভব
দূরে গিয়ে কর কলরব

ভবেশ। ক্যাঁক্ করে ধরেছি এবার চাঁদ
ঘুঘু দেখেছ দেখ নি তো ফাঁদ!
"অয়ি চন্দ্রমুখী
ফুলবনে আমি বাঁশী ফুঁকি—"

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী হোয়ো না নির্ম্মম
হৃদয়-বাঁশী মম—

ভবেশ। কি বললে, বাঁশী! খবরদার আর বলবে না
পুকুর চুরি ছকুর বেলায় চলবে না!

গুড়। কৃকলাস উৎসুকই
বাঁশী বাজে—

ভবেশ। ফের বাঁশী! খবরদার
মানা করছি বারম্বার
বাঁশী আমার, বাঁশী আমার, বাঁশী আমার!
বাঁশী ছাড়া নিতে পার অন্য কিছু যা খুশি—

লেখক। কল্পনা-আঁকুসি
কখন কি যে পেড়ে আনে ভাব-শাখা হ'তে

ভবেশ। কিন্তু ভাই সহিব না আমি কোন মতে
যদি তাহা ক্রমাগত খালি বাঁশী পাড়ে!

ধরি ঘাড়ে—

লেখক। আপনারা সব কবি প্রেমিক
পাড়ি জমান পাথারে
আপনাদের কি হওয়া সাজে
বাবলা-বনের ছাতারে !
ঝগড়া থামান—
মারতে মশা বুদ্ধিমানের পাততে কি হয় কামান !

নরসুন্দর। [হঠাৎ উত্তেজিত]
লেখক, লেখক
হয়েছে
মিল করেছি
মনের ধূপদানীতে
ধোঁয়াচ্ছে ভাবের ধূপ—

ভবেশ। আরে চুপ—
বাঁশীর ব্যাপার মিটুক আগে।

নরসুন্দর। মিল যে ভাগে !
চট ক'রে, লেখক—
লিখে নাও আমারটা—!
আমি গদ্য-মুখী
তবু চন্দ্র-মুখী
আমি ছন্দ ঠুকি
বাঁশী মন্দ্র—

ভবেশ। তুমিও বাঁশী, রামচন্দ্র !
কিন্তু নয় হাসি—
ছাড়তে হবে বাঁশী।

নরসুন্দর। চিরকাল ধরে বাঁশী বাজে কবিতায়
বাঁশী চিরন্তন

ভবেশ। [মুখভঙ্গী করিয়া]
আজ কিন্তু আমি আগে বাজিয়েছি ধন !

বৃন্দাবন। আমি বৃন্দাবন
মোর বাঁশী আরও সনাতন !

গুড়। মিথ্যুক
করমচা-খোর কোকিল !
সাইরেন—
কষ্ট !

লেখক। একটি কথা বলছি কিন্তু পষ্ট
হু হু করে সময় হচ্ছে নষ্ট।

নরসুন্দর। ঠিক বলেছেন !
তুচ্ছ পরোয়া নেই
ভাগাভাগি করি আসুন
থাক্
সবার কবিতাতেই বাঁশী থাক
রাজি আছি আমি—

ভবেশ। আমি রাজি নই—ইয়াকি
ইজ্জত নেই প্রিয়ার কি !
বাঁশী মোর প্রিয়া তার কাছে
আমি একক—

নরসুন্দর। ভাই লেখক
তুমিই তাহলে
মীমাংসা কর।
তোমার নিজের কোন স্বার্থ নেই
নেই কোন ব্যক্তিগত দ্বেষ

বৃন্দাবন। ইহাতে নাহিক মোর আপত্তির লেশ !

ভবেশ। [অনিচ্ছা সহকারে]
ছাড়বে না যখন—বেশ !

লেখক। বাঁশী যদি বাজান সবাই বেশ তো
কালের এবং স্থানের মতো সুরেরও নেই শেষ তো !
বাজবে ওতে বেহাগ টোড়ি বাজবে ওতে মূলতান
চন্দ্রমুখীর গলবে পরান না হয় যদি ভুল তান।
কিন্তু যদি আমার কথায় রাখেন মশাই আস্থা
বাঁশী ছাড়ুন ! পচে গেছে, ধরুন অন্য রাস্তা !
বৃন্দাবনে বাজত বাঁশী সিনেমাতেও বাজছে
রেফারি আর গার্ড সাহেবে সবাই বাঁশী সাধছে
বাঁশী ছাড়ুন,—বাঁশী ছাড়াও আছে অনেক যন্ত্র

ভবেশ। ঝাড়লে দেখছি অন্য রকম মন্ত্র !

নরসুন্দর। ঠিক হ'ল তাহ'লে
বাঁশী-বর্জ্জন ?
বেশ
আমার আপত্তি নাই !

সকলেই আবার স্ব-স্ব স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বাঁশী-বর্জ্জিত ভাব ভাবিতে লাগিলেন।

লেখক। এক, দুই, তিন, চার, পাচ—আরও পাচটি চাই
সেই পাচটি কি উপায়ে কোথাথেকে পাই !
অদেখা মোর সাকী
পাঁচটি টাকার জন্যে শেষে ফসকে যাবে নাকি !
কবিতাটি লিখেছি যা—নিজের মুখে উচিত নয় ক
বলা—
একেবারে মর্ম্ম-গলা !
সুর-বাহারের সুরটি যেন রূপ ধরেছে
প্রজাপতির ডানায়
শঙ্খধবল পাত্রে যেন মেহেদি রঙ
টলছে কানায় কানায়।

হায় রে পাঁচটি টাকা, পাঁচটি রজত খণ্ড—
তার অভাবেই সবটা হবে পণ্ড!
চুরি করার সময়ও নেই—যা হবার তা হবে—
না পাই যদি তবে
স্বপ্ন দেখেই কাটবে জীবন—জন্মেছি এই বঙ্গে—
কাব্য করেই কাটিয়ে দেব স্বপ্ন-সাকীর সঙ্গে!

নরসুন্দর। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া]
বাস্—হয়ে গেছে
বেঁধেছি
লেখক, লেখ শীগ্‌গির—
গদ্য-কবিতা-ম্যাড়া
ঢু মারছে মনে
মিলগুলো দেবে এখনি তছনচ ক'রে
লিখে নাও—শীগ্‌গির—

লেখক। এই যে ভাই—হাজির
লেখক কাগজ কলম বাগাইয়া বসিলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-স্বর্গে কেন দিলে উঁকি—"
স্বর্গের চেয়ে কুঞ্জই ভাল বোধ হয়
লেখ
"আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি
চুল দুটি কত চমৎকার—"

বৃন্দাবন। হয়েছে আমার
লেখ লেখ হে লেখক—দেরি নহে আর।
"নহ সূর্য্য—নহ তারা—"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা—"

লেখক। দু-হাত আমার চলে না ভাই, একসঙ্গে
এমন ধারা—

গুড়। [হঠাৎ ছুটিয়া আসিলেন]
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিপ্রেশন্ উঠুক—"

ভবেশ। এবার তবে আমারও ফুল ফুটুক—
লেখ দেখি আমারটা
সবাই দেখি মস্ত কবি—কামার, কুমোর, চামারটা!
চোর ব্যাটারা, ভেবেছিল বাঁশীটাকে ভেঙে
চন্দ্রমুখীর কাছে আমায় দেবে না আর ঘেঁষতে!
কিন্তু বাবা ফুলবাগানে যার—

নরসুন্দর। "চুল দুটি কত চমৎকার—"

ভবেশ। "ফুল ফোটান যায় না সখি ক'রে কেবল বুজরুকি—"

বৃন্দাবন। "নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, ওগো চন্দ্রমুখী।"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি!"

লেখক। আমি একসঙ্গে কি ক'রে টুকি!
একে একে হৃদয়গুলি মেলুন
সামলাতে কি পারি মশাই একসঙ্গে
চার চারটে বেলুন!
নরসুন্দর বলুন আগে—ওঁরই প্রথম দাবি
উনিই প্রথম খুলেছিলেন ভাবের ঘরের চাবি।
লেখক আবার লিখিবার জন্য কলম তুলিয়া লইলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি!
চুল দুটি কত চমৎকার
আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি!"

লেখক। [মুগ্ধভাবে]
একে বলে কারুকার্য্য চারু—!

ভবেশ। হরিজন-হস্তে যেন ঝাড়ু—!

নরসুন্দর। বাগান সাফ করতে হয়
ঝাড়ুর কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক!

ভবেশ। মুখ সামলে—বেল্লিক—

লেখক। শান্তি, শান্তি,—ঝগড়াঝাঁটি ভোল
বৃন্দাবন তুমি এবার ঢাক্‌নাখানি তোল।

বৃন্দাবন। নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, তুমি চন্দ্রমুখী,
তবুও তোমারে বন্দি' ছন্দ হয় সুখী
অন্তরে আবেগ জাগে, কণ্ঠে জাগে স্বর
বক্ষে জাগে হর্ষ অহেতুকী।

লেখক। আহা, যেন তরমুজ!

ভবেশ। বন্ধুভাবে বলছি শোন বৃন্দাবন রুজ
সত্যি যদি চন্দ্রমুখীর হৃদয় দখল করতে চাও
অবিলম্বে শেষ কথাটি বদলে দাও—
চলবে না ও কোনক্রমে—

লেখক। বেশ হয়েছে, যাচ্ছ কেন দমে'!
আপনি আসুন গুড়মশায়, করুন মোদের সুখী।

গুড়। জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিপ্রেশন্ উঠুক কিম্বা নামুকই
ভলভিউলাস, ফোটোমিটার, নীট্‌শের যত ফক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী!

লেখক। আমার বিশ্বাস এই লেখাটির কৃষ্টি
চন্দ্রমুখীর ধুসর মনে করবে সুধা-বৃষ্টি।

ভবেশ। আমি কিন্তু গুড়মশাই
একটি কথা বলতে চাই!
দু-বার চন্দ্রমুখী কেন?

ডাক হবে একটি ডাক—
তাতে যদি সাড়া না দেয়—চুলোয় যাক !

গুড় কুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

লেখক। বড্ড কড়া সমালোচক আপনি মশাই
ভবেশ। ফুল নিয়ে দিবারাত্রি করতে হয় যে মাজা-ঘষাই !
ফুলের একটি তোড়া বাঁধা
এটা ছাটো, ওটা কাটো দস্তুর মতো হয়ে দাদা
লোকে ভাবে শক্ত কি আর
লেখক। আপনারটা বলুন এবার
ভবেশ। আমারটা ? মানে, বেশ লিখুন
হয় নি কিন্তু তত নিপুণ !
মাজা-ঘষা করবারও নেই সময় আর
ভাবটি কিন্তু চমৎকার
"ফুল ফোটান যায় না সখি ক'রে কেবল বুজরুকি
ঘটি ঘটি জল ঢাললেই হয় না কভু ফুল সুখী
সময় মত হিসেব মত ঝাঁঝরি দিয়ে ঢালতে হয়
আশা করি মনের কথা বুঝছ তুমি চন্দ্রমুখী"
বৃন্দাবন। বৃক্ষে কভু নাহি ফলে মূর্খ !
নরসুন্দর। সত্যি কি সূক্ষ্ম !
যেন ছুঁচ
মর্ম্ম করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় !
গুড়। ছায়াপথের মোড়ঃ
নীলপরী ম্যাঙ্গোস্টিন খায়
বন্দী নয়
মুক্ত—
লেখক। ঠিক যেন সুকতো
ভারী তৃপ্তি দিলে—

সকলের কবিতাগুলি লেখা হইয়া গেল। লেখক সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া দিলেন।

নরসুন্দর। সবাই মিলে
জটলা ক'রে লাভ কি
নন্দী মশায় এলে
তার পর সব আসা যাবে।
তিনি কত দূর
তাই বরং দেখা যাক, চল।
কি বল লেখক
লেখক। বেশ তাই হোক—

লেখক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

লেখক। নামছে আঁধার ডাইনে বামে নিবছে আলো
জ্বালব না দীপ আঁধার আমার লাগছে ভালো।
জোনাক জ্বলে আঁধার ভরি
চিকমিকিয়ে রূপোর জরি
চুমকি-দেওয়া নীলাম্বরী
অঙ্গেতে আজ কে জড়ালো
কি সুন্দরী ওই মেয়েটি কাজল-কালো !
কপালটিতে ছোট্ট ক'রে টিপটি আঁকা—
কিন্তু হায় রে পাঁচটি টাকা, পাচটি টাকা
পাচটি টাকা !

বাম দিকের পর্দ্দাটি সন্তর্পণে সরাইয়া প্রথমে বৃন্দাবনের মুণ্ড পরে সশরীরে বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন এবং পা টিপিয়া আগাইয়া আসিলেন।

বৃন্দাবন। হে লেখক, আসিলাম আর এক বার
লেখক। কেন, কি ব্যাপার,
বৃন্দাবন। শোন ভাই
চন্দ্রমুখীকে আমি চাই।
সংশয় জাগিতেছে চিতে
ভবেশ কবিতাটিতে
সহজ ভাষায়
কহিয়াছে যাহা হায়
যদিও তাহাতে নাই উচ্চতর ভাব
তবু কিন্তু তাহার প্রভাব
সহজ বলিয়া
চন্দ্রমুখী-হৃদয়েরে দিবে উতলিয়া !
একে নারী, ধনীর দুলালী
কটমট কবিতারে হয়তো ভাবিবে গালাগালি !
তুমি কিন্তু পার ভাই বাঁচাইতে মোরে
ভবেশের কবিতাটি দাও পঙ্গু ক'রে
কলম তোমার হাতে,—আমারে বাঁচাও—
লেখক। পারি,—যদি এক টাকা দাও
বৃন্দাবন। এক্ষুনি, নাও—
লেখক। ঠিক হয়ে যাবে, দাঁড়িও না যাও—

বৃন্দাবন সন্তর্পণে প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের পর্দ্দা সরাইয়া নরসুন্দর মুণ্ড বাড়াইলেন এবং চোরের মতো প্রবেশ করিলেন।

নরসুন্দর। আর কেউ আছে নাকি, লেখক
লেখক। না, আপাতত একক।
কি চাই
নরসুন্দর। শোন ভাই—
কবিতা আমার সুবিধে হয় নি !
মিল দিতে গিয়ে
ভারি পষ্ট হয়ে গেছে কবিতাটা

লেখক। ভালই তো, স্বচ্ছতা থাকাটা—
নরসুন্দর। আগে নাও, ধর টাকাটা

এক টাকা দিলেন

লেখক। কি রকম হ'ল এটা ?
নরসুন্দর। বুঝিয়ে বলছি শোন—
অম্বিকেশ, চন্দ্রমুখী
কবিতার 'ক'ও বোঝে না !
তাই
যে-কবিতা যত দুর্বোধ্য
সে-কবিতা তত গভীর
ওদের কাছে।
ধ্রুবেশ গুড়ই জিতবে সুতরাং
যদি না তুমি ওর লেখার প্যাঁচগুলো খুলে
লেখক। [হাসিয়া]
দিই চেঁচে ছুলে ?
নরসুন্দর। একেবারে সরল রেখা বানিয়ে দাও !
লেখক। আচ্ছা, যাও—

পর-মুহূর্ত্তেই ডান দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ধ্রুবেশ গুড় এবং বাম দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ভবেশ মুণ্ড বাড়াইলেন

ধ্রুবেশ। লেখক !
ভবেশ। লেখক !
ধ্রুবেশ। এরোপ্লেন নির্নিমেষ কিমামি হেঁচকি—!
ভবেশ। কবিতার ছেঁচকি—
ধ্রুবেশ। আমি এসেছি লেখকের কাছে
ভবেশ। আমারও একটু দরকার আছে
ধ্রুবেশ। আপনি একটু বাইরে যাবেন ?
ভবেশ। আপনি একটি মোয়া খাবেন !
ধ্রুবেশ। সত্যি এক বার বাইরে যান
ভবেশ। মাইরি প্রাণ !
লেখক। ঝগড়া করা তো মিথ্যে আওয়াজ ফাঁকা
আসল কথাটি বলছি পষ্ট ক'রে
দেন যদি মোরে আর একটি ক'রে টাকা
ওদের কবিতা দিচ্ছি নষ্ট ক'রে !
প্রতিদ্বন্দ্বী এক জন শুধু রবে
চন্দ্রমুখীরে পাওয়াটা সহজ হবে।
ভবেশ। বেশ, তাই হোক তবে

টাকা দিলেন

ধ্রুবেশ। বিবেক !
হে অষ্ট্রিচ, ক্ষমা কর
নিরুদ্ধ আকুতির কনকনানি,
কিন্তু—ওঃ
যাক্—

টাকা দিলেন

ভবেশ। [যাইতে যাইতে]
বৃন্দাবনকে ভয়টা আমার বেশী
তার সঙ্গেই আসল রেষারেষি
এ দুটো তো নিটোল নিরেট

চলিয়া গেলেন

ধ্রুবেশ। [ধীরে ধীরে অবনত শিরে]
আঙুর-গন্ধী কিসমিসের প্লেট
স্পর্দ্ধা, অসমসাহসিক।
হে নরসুন্দর
পাবে না তুমি
সান্ত্বনা এইটুক—

বাহির হইয়া গেলেন

লেখক। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়
এ যে প্রায় হয় হয় !
এক মোটে বাকি !
প্রিয়া—সখি—শাকী—
বাকিটা কি ক'রে পাই
গুড় মশাই, ও গুড় মশাই—
শুনে যান

ধ্রুবেশ গুড় প্রবেশ করিলেন

ধ্রুবেশ। আবার কি চান
লেখক। হচ্ছে আমার আনন্দ
ধ্রুবেশ। ভেকের যকৃতে সনাতন পিত্ত-ছন্দ !
লেখক। বলতে চাই একটি কথা একলা শুধু আপনাকে
নারীর সেরা চন্দ্রমুখী সত্যি যদি চান তাঁকে
ভবেশটিকে করতে হবে নিষ্প্রভ
ধ্রুবেশ। ভেঙে বলুন, আর এক টাকা ফের দোব ?
লেখক। সত্যি যদি পারেন দিতে মিলবে বাহু-বন্ধ-সুখ
চন্দ্রমুখী বামে নিয়ে হয়ে যাবেন চন্দ্র-মুখ।
ধ্রুবেশ। উঃ
জাম্বুবানের সংস্কার !
মৃতা মৈথিলী
অথচ জীবিতা…
কিন্তু—উঃ—

টাকা দিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন।

লেখক। [সোচ্ছ্বাসে]

হে ধ্রুবেশ গুড়
নীলকণ্ঠ তুমি চন্দ্রচূড়
চিত্ত মম করিলে নির্ব্বিষ
কি আনন্দ কি আনন্দ ইস্!

সহসা তন্ময় হইয়া

আলোক মিলিছে ওই অন্ধকার সনে
অম্বরে গম্ভীর স্বর উঠিছে গুঞ্জরি
শত বর্ণ বিচ্ছুরিত প্রদীপ্ত আসনে
নীলাম্বরী সন্ধ্যা হাসে শ্যামলী সুন্দরী—

উত্তেজিত বৃন্দাবন, নরসুন্দর, ভবেশ ও ধ্রুবেশের পুনঃপ্রবেশ।

বৃন্দাবন। কন্যাসহ আসিছেন নন্দী অম্বিকেশ
নরসুন্দর। চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলাটা চমৎকার বেশ!
ধ্রুবেশ। ইউবোটে আর তিমি মাছে···
ভবেশ। লেখক, আয়না আছে?
লেখক। না ভাই
ভবেশ। কি মুস্কিল, আয়না কোথা পাই—
নরসুন্দর। নখদর্পণ সঙ্গে আছে তাতেই দেখে নিন
লেখক। ওঁরা এসেছেন—সরুন রাস্তা দিন

সকলে ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেলেন। দক্ষিণ দিকের পর্দ্দা সরাইয়া দুই জন দারোয়ান প্রবেশ করিল এবং পর্দ্দা টানিয়া ধরিয়া রাখিল. শ্রীযুক্ত অম্বিকেশ নন্দী প্রবেশ করিলেন। ফস! বেঁটে লোক—দেখিলে মনে হয় যেন খর্ব্বাকৃতি কাবুলিওয়ালা এবং চটা মেজাজের। তাঁহার পিছনে চারি জন দারোয়ান দ্বারা বাহিত হইয়া চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলা প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দোলাটি শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়ার চন্দ্রের মত দেখিতে, চমৎকার করিয়া সাজান। চন্দ্রমুখী গৌরবর্ণা, পরিচ্ছদ রূপালি জরির কাজ করা কালো রঙের। চতুর্দ্দোলা এক ধারে নামান হইলে চন্দ্রমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লেখক দুইটি মোড়া পাশাপাশি রাখিতেই অম্বিকেশ ও চন্দ্রমুখী উপবেশন করিলেন। দারোয়ানেরা সারি বাঁধিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

অম্বিকেশ। জম্বুদ্বীপের সুধীবৃন্দ সময় বেশী নাই আজ
অল্প দু-চার কথা বলেই শেষ করতে চাই কাজ।
আপনারা তো জানেন সবই তবু আবার বলছি
চিরটা কাল আমি আপন খেয়াল মতই চলছি।
মেয়ের পাত্র হিসেবে তাই সন্ধানি সেই লোককে
কাব্য-লোকের রঙীন স্বপন ভাসে যাহার চক্ষে!
চাই না কোন হোমরা-চোমরা রেকর্ড ব্রেকার কুস্তির
জানতে চাই না সে ব্যক্তিটি অস্থির বা সুস্থির,
বিদ্বান বা ধনী কি না সুবোধ কিম্বা দুর্ব্বোধ
একটি কথা জানব কেবল আছে কি না সুর বোধ!
সুর থাকলে পরস্পরে পটাবে ও পটবে
তা নইলে সারা-জীবন ছন্দ-পতন ঘটবে!
লোক দেখেছি অনেক রকম গেছি প্রয়াগ পুষ্কর
সার বুঝেছি বেসুরো লোক নিয়ে চলা দুষ্কর!
পদ্য-লেখক রসিক জনে পারলে দিতে কন্যা
ভাগ্য বলে মানব আমি মেয়েও হবে ধন্যা।
পদ্যও নয়, বাক্যও নয়, আসল কথা রসটি
এবং নিয়ম-রক্ষা বাবদ রজত-মুদ্রা দশটি!
লেখক মশাই আসুন দেখি, কে বাজাল কোন স্বর
গণেশপ্রসাদ, চতুরীলাল হরেন কিম্বা মনস্বর
যে-ই হোক সে,—চিত্তে যদি থাকে কাব্য-দর্পণ
তারই হাতে চন্দ্রমুখী করব আমি অর্পণ!

লেখক লেখাগুলি চন্দ্রমুখীর হস্তে দিলেন

লেখক। অক্ষম অপটু হস্তে আঁকিয়াছি অক্ষরের ছবি
সামান্য লেখক আমি—এঁরা সব কবি।
চন্দ্রমুখী। (মুগ্ধ) আপনিই লেখক! সুবিখ্যাত লিপিকার!
অম্বিকেশ। পড়, দেরি কেন করছ আর—
চন্দ্রমুখী। [একটি কাগজ তুলিয়া]
এটির নীচে নাম দেখছি বৃন্দাবন
বৃন্দাবন। আমিই সেই অধম জন

উচ্ছ্বসিত হইলেন

জানি দেবি জানি
আমার কবিতাখানি—
অম্বিকেশ। চুপ করুন। পড় চন্দ্রমুখী
চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন]
নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি—
বৃন্দাবন। এ কি এসব তো আমি কোথাও—
অম্বিকেশ। চুপ করুন, পড়ে যাও—
চন্দ্রমুখী। নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি
তবু তুমি মিষ্ট চন্দ্রমুখী
নয়ন মুদিয়া ভাবি খুঁদিয়া কি উপমা তোমার?
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমি কি উজবুকই!

অম্বিকেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া চন্দ্রমুখীকে প্রশ্ন করিলেন

অম্বিকেশ। তোর লাগল কেমন?
চন্দ্রমুখী [হাসিয়া]
আর যা-ই হন ফুলবনের ভোমরা ইনি নন!
মনে হচ্ছে ময়রা-বাড়ীর ভীমরুল—
বৃন্দাবন। ভুল, আগাগোড়া সব ভুল
ও কবিতা আমি লিখি নাই
ভবেশ ও ধ্রুবেশ। [একযোগে]
মিছে কথা কেন বল ভাই

বৃন্দাবন। হে শ্রদ্ধেয়, অম্বিকেশ নন্দী
ভিতরেতে আছে হীন ফন্দি
কহিতেছি তার-স্বরে ও কবিতা নহেক আমার
ভবেশ ও ধ্রুবেশ [সমস্বরে]
নিশ্চয় তোমার—
বৃন্দাবন। [আত্মহারা]
মন
এ স্বপ্ন, না জাগরণ!
অম্বিকেশ। [চন্দ্রমুখীকে]
দ্বিতীয়টা —ধর
চন্দ্রমুখী। এটির লেখক নর-সুন্দর
কে তিনি—
লেখক [দেখাইয়া]
এই যে ইনি—
চন্দ্রমুখী [পড়িতে লাগিলেন]
আমি কি পরিপাটি.সখি কামাই ছাটি
থাকি কখনও সিধা ফের কখনও ঝুঁকি,
মোর কাঁইচি চলে ঘন চুলের তলে
আমি ভৃত্য তব ওগো চন্দ্রমুখী!
নরসুন্দর [ক্ষেপিয়া]
লেখক, লেখক
খুন
খুন করব তোমায়—
অম্বিকেশ [সগর্জ্জনে]
এই কোন্ হ্যায়—
এক জন দারোয়ান আগাইয়া আসিল
অম্বিকেশ। টানতে টানতে বাইরে নে যাও
ধরে গলার চাদর
হাল্লাবাজ বাঁদর!

দারোয়ান নরসুন্দরকে বাহির করিয়া দিয়া স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে নরসুন্দর পুনঃপ্রবেশ করিলেন এবং এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চন্দ্রমুখী। তৃতীয় কবিতার লেখক ভবেশ
অম্বিকেশ। বেশ—
ভবেশ। মোর কবিতার মানে বুঝতে
অভিধান হবে না কো খুঁজতে!
সোজাসুজি মোটামুটি—
ধ্রুবেশ। হায় মাখনমুগ্ধ রুটি
তিতিক্ষার স্বপ্ন দেখ
তৈল-সিক্ত গুম্ফ
পেট্রল-সিক্ত কর—
অম্বিকেশ। [ধমকাইয়া]
ফের গোলমাল করছেন! নাও, পড়—
চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন]
খোল-পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহা সুখী—
ভবেশ। থামুন—থামুন—এ কি এ!
অম্বিকেশ। আপনাকেও কি দারোয়ান দিয়ে—
ভবেশ সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইলেন
চন্দ্রমুখী। খোল পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহা সুখী
সার নইলে ফুল ফোটে না
এই কথাটা বুঝবে না কেউ বঙ্গে
ওগো চন্দ্রমুখী!
ভবেশ। লেখক, তুমি সত্যি কথা কও
অম্বিকেশ [ধমক দিলেন]
চোপ রও!
সব কজনই মহা দিগ্‌গজ—নেইক কেবল শুঁড়!
চন্দ্রমুখী। এর পরেরটি শ্রীধ্রুবেশ গুড়
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিপ্রেশন উঠুক কিম্বা নামুকই,
ভলভিউলাস্ ফোটোমিটর নীটশের যত ভ্রূকুটি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী—"
অম্বিকেশ ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। চন্দ্রমুখী লেখকের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।
চন্দ্রমুখী। আমায় নিয়ে এমন ক'রে ঠাট্টা করার অর্থটা কি
লেখক। সব তো পড়া শেষ হয় নি
আরও একটা আছে বাকী
চন্দ্রমুখী। [পুলকিতা]
আপনি সেটার কবি নাকি—
লেখক। নিজের মুখে বলব তা কি!
অম্বিকেশ। এই শুনলাম, দশটি মাত্র টাকাও তোমার নেই
লেখক। পেয়ে গেছি বরাত জোরেই—
অম্বিকেশ। আশা করি কর নি কো চুরি,
লেখক। আজ্ঞে না, পুরোপুরি,
সত্যি বলছি, পুরোপুরি উপার্জ্জন!

অম্বিকেশ। বাজে কথায় সময় গেল অনেকক্ষণ !
পড় শুনি—আশা করি লেখ নি কো যা' তা'—
চন্দ্রমুখী। [কম্পিত কণ্ঠে]
উনি পড়ুন, ঘুরছে আমার মাথা
লেখক। [আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন]
লিখিতে পারি নি কিছু হে দেবি করিও ক্ষমা
উপমা কোথায় পাব তুমি যে গো নিরুপমা
বাঁশরীকে শিখায়েছি তব নাম চন্দ্রমুখী
গাহিয়া তোমার নাম বাঁশরী হয়েছে সুখী !
চন্দ্রমুখী। [অস্ফুট স্বরে]
চমৎকার !
অম্বিকেশ। সময় বৃথা নষ্ট ক'রে কাজ কি আর !
লেখক এবং চন্দ্রমুখী
পরস্পরে হউক সুখী
আমরা এখন অবান্তর
উঠিয়া পড়িলেন
লেখক। সুখের দিনে কারও সঙ্গে রাখতে চাই না মনান্তর।
যথাকালে শোধ করব সবার ঋণ
আপনারা সব আঁশিস দিন
বাঁধি আমার বাস্ত
সকলে। তথাস্তু

যবনিকা*

* Clifford Bax-প্রণীত The Poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত।

আলোচনা

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব, এম-এ বলিয়াছেন—"হিন্দু বিশ্ববিত্তালয়ের বি-এ পরীক্ষার লিখন ও রচনাপদ্ধতি শিক্ষার জন্ত যে সকল পুস্তিকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তন্মধ্যে দেখলাম মৈথলীতে 'কপালকুণ্ডলা', মালায়ামে 'বিষবৃক্ষ', উড়িয়াতে 'কোণারক' এগুলা নিশ্চয় এই নামের বাঙ্গলা পুস্তকের অনুবাদ।" উড়িয়া ভাষাতে বাঙ্গলা হইতে 'কোণারক' নামে কোন পুস্তকের অনুবাদ হয় নাই। অতএব উপরিউক্ত লিখিত বাঙ্গলা পুস্তকের অনুবাদ কথা উড়িয়া ভাষার পক্ষে টিকিতে পারে না। উড়িয়া ভাষাতে 'কোণার্ক' নামে একখানি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থের লেখক স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু মিশ্র, এম-এ। এই গ্রন্থকে হিন্দু বিশ্ববিত্তালয় রচনাপদ্ধতি শিক্ষার জন্ত মনোনীত করিয়া থাকিবেন মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কল্পনা-আকাশে পক্ষ করিয়া বিস্তার
গান গেয়ে চলেছিলে। সহসা তোমার
থামিল ডানার গতি মাটির আহ্বানে,
শৃঙ্খলিত মানবের কান্না এলো কানে।
স্বপ্নের পদ্মার তীর রহিলো পশ্চাতে,
কর্ম্মের বিজয়-শঙ্খ তুলে নিলে হাতে,
উষর প্রান্তরে তুমি পাতিলে আসন
শ্মশানে জাগাতে নব প্রাণের স্পন্দন।
নূতন সৃষ্টির যজ্ঞে করিলে আহ্বান
যৌবনেরে—হাতে দিয়ে মুক্তির নিশান
দুর্গম পথের যাত্রী করিলে তাহারে,
মৃত্যুর বন্দনা তব সঙ্গীত-ঝঙ্কারে।
নব্য ভারতের চিত্তে তব শঙ্খরব
আনিল যুগান্তকারী বিপুল বিপ্লব।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জয়-পরাজয়ের তর্জ্জমাটি আমার ভাল লাগিল। কেবল দুই এক জায়গায় প্রুফের মার্জ্জিনে আমি দুই একটা suggestion দিয়াছি। আপনি বিচার করিয়া যথাবিহিত করিবেন। দুই একটি বাক্য কানে কেমন দুর্ব্বল ঠেকিয়াছে কিন্তু তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

নিবেদিতার কাবুলিওয়ালা কাল বিকালে পাইয়াছি। যদিচ রেজিষ্ট্রীডাকে পাঠানো তবু সেটির খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ তিনখানি খুলিয়া জোড়া চিঠি ইতিমধ্যে পাইয়াছি। * * *

* * * আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনো প্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না। বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি—সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। * * *

* * * দুঃখের মধ্য দিয়া পরাভবের মধ্য দিয়াও যিনি সারথি তিনি গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন—ইতিমধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। হারিলেও ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে থাকিবেন—সেইখানে আমাদের জিত।

*   *   *   *

এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই—যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না।

ইতি ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead
London. N. W.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

লণ্ডনে একটু ফাঁকা জায়গা দেখিয়া একটা বাসা করিয়াছি। ছয় সপ্তাহ এখানে থাকিয়া তাহার পর বাহির হইয়া পড়িব।

এখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিক চক্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি আমার কবিতা ও গল্পের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার জন্য ইঁহারা অকৃত্রিম উৎসাহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন। আমার ভাল গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জ্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইঁহারা যত্নপূর্ব্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন এবং ভাল publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।

Modern Reviewতে যে কয়টি বাহির হইয়াছিল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া আর কিছু কি

করা যাইতে পারে ?

Modern Review এবারে পাই নাই। এখানে Ludgate Circus ঠিকানায় Thomas Cook & Son-এর কেয়ারে পাঠাইলেই আমি পাইব। দয়া করিয়া চারুকে বলিয়া দিবেন।

এ পর্য্যন্ত আমার শরীর ভালই আছে।

প্রবাসীর জন্য পথ হইতে দুইটি লেখা পাঠাইয়াছি আশা করি শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া সেগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে। এখানে এমন আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছি যে লেখার অবকাশ পাওয়া শক্ত হইয়াছে।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে। ইতি ২৭শে জুন ১৯১২।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

508 W. High Street.
Urbana
Illinois
U. S. A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

নূতন ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা করা সম্বন্ধে এক বার আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং পুরাতন ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছেও একবার দরবার করিবার কথা ভাবিয়া দেখিবেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলি আশা করি কোনো ব্যবসাদার ইংরেজ প্রকাশক গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে এবং সেই সঙ্গে আমার তরফেও আমি কিছু প্রস্তাব করিব। যদি সুবিধামত আপোষ হইয়া যায় তাহা হইলে কিছু পাইতে পারি। কিন্তু এদিকে আমি এক কীর্ত্তি করিয়া বসিয়াছি—বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সুরুলের বাড়িটি সিংহদের কাছ হইতে আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া বসিয়া আছি এবং সেই দেনাটা শোধ করিবার চিন্তাও করিতেছি। গীতাঞ্জলি হইতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু যদি পাওয়া যায় তবে ঐ দেনাটা কালক্রমে শোধ হইবার আশা আছে। ইতিমধ্যে ঐ বাড়িটা বিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগাইবার কথা ভাবিবেন। রথী ফিরিয়া গেলে ঐখানে তাহার ল্যাবরেটারি স্থাপন করিয়া ঐ সূত্রে তাহার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্রকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার সংকল্প আমার মনে আছে। রথীর ফিরিবার বিলম্ব আছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ এত দিনে পাইয়া থাকিবেন। Times এবং Nation-এ তাহার ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। বই সম্বন্ধে ইংরেজ পাঠকদের কাছ হইতে দুই একখানা পত্রও পাইতেছি। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাল রাত্রে বষ্টনে আসিয়াছি। পথে আপনার পত্র পাইলাম। রচেষ্টারে উদারমতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একটি কন্‌গ্রেস ছিল, সেখানে আমি আহূত হইয়াছিলাম। কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য আমার প্রতি অনুরোধ ছিল। সেখানে জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ Eucken ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া আমি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি। তিনি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এবারকার ডাকে সন্তোষকে পাঠাইয়া দিয়াছি। Manchester Guardianএ Lascelles Abercrombie যে সমালোচনা লিখেছেন সেটা বোধ হয়

দেখেছেন। বোধ হয় কালীমোহন তার এক কপি বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পড়লে আপনারা খুসি হবেন। যিনি লেখক তিনি ইংলণ্ডের কবি ও সমালোচকদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। আমার সব চেয়ে এইটে আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় যে ইংলণ্ডের আধুনিক কবিসম্প্রদায় এমনতর অকুণ্ঠিত ঔদার্য্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কবিকে উচ্চ আসন দিয়েছেন।

আমি এখানকার সভায় পড়বার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি বক্তৃতা লিখেছি। তার একটা শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি। সেখানকার শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। সম্ভবত এখানেও পড়তে হবে। তার পরে Wisconsin, Iowa, Purdue এবং Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। অর্থাৎ এ দেশে যত দিন আছি এগুলি পড়তে হবে। যদি সময় পাই তাহলে আরো গোটাকতক লিখব। তার পরে ইচ্ছা আছে ইংলণ্ডে যখন ফিরে যাব তখন সেখানেও একবার এই প্রবন্ধগুলো যাচাই করে নেব। এখানকার লোকেরা যতই ভাল বলুক এদের বিচারশক্তির উপরে আমার শ্রদ্ধা নেই—দেখেছি এখানে নিতান্ত সস্তা জিনিষও উচ্চ মূল্যে বিকিয়ে যায়। আমাদের দেশের কত অযোগ্য লোক এখানে বক্তৃতা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করচে। তাদের দ্বারা দেশের গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে।* * * যাই হোক একবার ইংলণ্ডের হাটে পরীক্ষা না করলে আমার এই ইংরেজি রচনাগুলির ঠিক ওজন বুঝতে পারচিনে। আপনারা আমাকে হাজার অভয় দিন তবু বিদেশী ভাষা ব্যবহার করবার সঙ্কোচ সহজে ঘুচতে চায় না। এদেশে পাঁচ ছয় বছর থেকে ভাষার সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেলে তবে অসঙ্কোচ হতে পারতুম। যাই হোক আমার ইংরেজি গদ্য লেখা এখন কোনো কাগজে পাঠাতে ইচ্ছা করি নে—এখানকার কাগজে ছাপাবার জন্যে বার বার অনুরোধ পেয়েছি কিন্তু সে কাটিয়ে দিয়েছি। Rochesterএ যে ছোট্ট প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেটা পাঠাচ্ছি কিন্তু তাতে পদার্থ কিছুই নেই—যদি ছাপাবার যোগ্য মনে করেন ত ছাপাবেন। এখানকার এই অহরহ ঘোরাফেরা চলাবলায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি—এর থেকে কবে উদ্ধার পাব তাই ভাবচি। শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১৩।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Felton Hall.
Cambridge. Mass.
Boston
ফাল্গুন, ১৩১৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি। গতকল্য The Problem of Evil সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। শ্রোতারা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Woods আমাকে বলিতেছিলেন যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক অযোগ্য লোক আসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ দেশে বক্তৃতা করিয়া থাকে—ইহাতে এমন অবস্থা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের কেহ বক্তৃতা করিবে শুনিলে শ্রোতা দুর্লভ হইয়া উঠে। একদা ভারতবর্ষের প্রতি এ দেশের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এখন ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। * * * বিশ্ববিদ্যালয়ে * * * অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শুনিতে পাইলাম সেখানে তিনি এমন সকল কীর্ত্তি করিয়াছেন যে তাঁহাকে বিদায় লইতে হইয়াছে। ইঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু এ দেশের নিকট ইঁহারা আমাদের দেশকে অপমানিত করিতেছেন। দেশে আমাদের সম্মান নাই বিদেশেও যদি আমাদের মাথা হেঁট করিতে হয় তবে আমাদের কি দশা হইবে?

* * *

বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড় বা ছোট গল্প লিখতুম না। যদি জিজ্ঞাসা করেন আমার মেজাজ এমন বিশ্রী কেন তবে তার উত্তর এই যে, আজ পর্য্যন্ত নানা প্রমাণ পেয়েও আমার সত্য বিশ্বাস হয় নি যে, আমি লিখতে পারি। ফরমাস পাবামাত্রই আমার মনে হয় আমার শক্তি নেই। অথচ শক্তি নেই সেটা ধরা পড়ে এমন ইচ্ছাও হয় না। এই ব্যাপারের মূলে একটি গোপন কথা আছে, সেটা বল্লে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। সে হচ্চে এই যে, যে-ব্যক্তির লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে চলে সে রবীন্দ্র ঠাকুর নয়। যে-ব্যক্তি গাল খায় এবং নোবেল্ প্রাইজ্ পায় সেই হচ্চে স্যার রবীন্দ্রনাথ। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে পাছে এক দিন ধরা পড়ে যায়। এই জন্যে কারো কাছে দাদন নিলে শোধ করবার ভয়ে তার রাত্রে ঘুম হয় না। যারা বলে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা আমি নিজে করি নি, আর কেউ করেচে তারা ঠিকই বলে। বস্তুত স্যার রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেই না। আমাকে কোনো ইংরেজি সভাতে বক্তা বা সভাপতিরূপে যদি ডাকা হয় তাহলেই আমার বিপদ—কেন না যিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখেন তিনি কোনোমতেই আমার সঙ্গে ইংরেজি সভায় আসতে রাজি হন্ না—এই জন্যে যদি বা সভায় যাই তবে চাণক্য মুনিকে স্মরণ করে "ন ভাষতে"র দলে বসে থাকি। ছোটখাট ইংরেজী কেজো চিঠি লেখার কাজে গীতাঞ্জলির অনুবাদককে কোনোমতে ভিড়তে পারি নে—বোধ হয় পাছে তাকে কেরানীগিরিতে ভর্ত্তি করে দিই এই তার ভাবনা—কিন্তু কোনো বড় চিঠি লেখার বেলায় হঠাৎ দেখতে পাই সে অনাহূত এসে কলম বাগিয়ে বসেচে। এই রকম খেয়ালী লোকের হাতে আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বাঁধা আছে বলেই কোনো কাজের ভার নিয়ে আমি কাউকে কথা দিতে পারি নে। যাই হোক্ প্রবাসীর লেখার জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখতে পারি।

"আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধটা স্বহস্তে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার জন্যে আমাকে আরো কেউ কেউ অনুরোধ করেচেন। চেষ্টা করে দেখব। আমার মুস্কিল এই যে, অনুবাদ করতে পারি নে, আমাকে প্রায় নতুন করে লিখতে হয়। কেন না ঠিকমত অনুবাদ করতে গেলে নিজেকে ভুলে লেখা চলে না। নিজেকে না ভুললে আমি কথা ভুলি, ব্যাকরণ ভুলি, ষ্টাইল ভুলি। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৪ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি কোনো উপায়ে ইংরেজি অনুবাদ করতে পারি বলে সংস্কৃত অনুবাদ করতেও পারব এমন আশা করলেন কি করে? আমি বাংলা লেখাতেই যে সমস্ত কুকীর্ত্তি করি তাতে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী যদি নামমাত্র রাজা না হতেন তাহলে আমাকে কোনকালে উচ্ছ্ন্ন করে দিতেন। আপনি আমাকে বৈয়াকরণিক মহাপাতকে উৎসাহিত করবেন না। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে যদি অনুরোধ করেন তবে তিনি অতি সহজেই ঐ গানটিকে সংস্কৃত করে দিতে পারেন। আমি ওকে সংস্কৃত রেলপথের প্রায় লিলুয়া পর্য্যন্ত এগিয়ে রেখেছি—অনুস্বার বিসর্গের যোগে আর একটা ষ্টেশন পার হলেই যাত্রা সমাপ্ত হয়।

ইংরেজি বইগুলো ওরা একেবারে stereotype করে রাখে—একেবারে বহু সহস্র ছাপা শেষ হলে তবে বদলের সময় আসে—এই হয়েচে মুস্কিল। যা হোক "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"র ইংরেজিটা বইয়ের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করা যাবে।

কাল থেকে বিষম বাদল নেমেচে। এত বর্ষণের পরেও আজও আকাশে প্রসন্নতার লক্ষণ দেখচি নে। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৪ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে—তাহাতে তাহারা পাঠকদের মনকে বিশেষভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজ পত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশের পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্ত্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিনা কারণে সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিবার বয়স আমার এখন নাই। ছুটির জন্য মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল আছে—অথচ কোনো মতেই ছুটি পাই না। এদিকে আজকাল আমার ক্ষমতার মধ্যে প্রাচুর্য্য জিনিষটা নাই তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনোমতে ভরে, উদ্বৃত্ত থাকে না। নহিলে প্রবাসীকে কদাচ বঞ্চিত করিতাম না—প্রবাসীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মনে মনে ঠিক করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি। রবি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার শেষ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে চায়। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩২১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে কিছু লিখব বলেই ঠিক করেছিলুম কিন্তু দেখচি উদ্বেগ ও ক্লান্তির দরুন আমার মনের শক্তি খুব তলায় এসে ঠেকেচে। এমন কি কারো সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখি অতি সামান্য কথাটা পর্য্যন্ত বেধে যায়। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা লেক্‌চার দিতে হবে এই চিন্তাটা মাথার উপর চেপে আছে, তাতে লেক্‌চার এগোচ্চে না কিন্তু সেই চিন্তার আওতায় অন্য ছোটখাটো লেখাগুলো মুষড়ে আছে। তার পরে এই শান্তিনিকেতনের শরৎ কালের দিনগুলি আমার মনের মধ্যে যে মন্ত্র আওড়াতে থাকে তাতে আমার ধারণা একেবারে বদ্ধমূল করে দেয় যে আমি একজন কবি। সে ধারণাটার মস্ত দোষ এই যে, কিছুই না করাটা যে আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য নয় এমন একটা বিশ্বাস পেয়ে বসে। মনে হয় জগৎটা মস্ত, কালটাও নিরবধি, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃষ্টি করে চলেছেন তা অতি বিচিত্র, এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে আমি যদি ঘাসের ফুলও হই তবে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটাকে তেমনি করেই মেনে নিতে হবে যেমন করে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাকে মানতে হয়। আমার চরম প্রয়োজনটা কি তা আমি জানি নে কিন্তু আমি সত্য যা তা আমাকে পুরোপুরি হতে হবে এইটুকু জানি। কিন্তু আমি যে সত্য কি সে খবরটা নানা দূত নানা রকম করে শুনিয়ে যায়। মুস্কিল এই যে, চৌমাথার ধারে আমার বাসা হয়েচে—জগতের Associated Pressএর আপিসটা তারই উপরের তলায়—সেখানে আমার নিজেরই খবরটা নানা রকম পাঠান্তরে নানা দিগন্তর থেকে এসে জমা হয়। কোনো একটা এক-রাস্তার ধারে যদি আমার বাসা মিলত, তাহলে আমার এই সাতান্ন বছর বয়সে, হয় আমি কন্‌গ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতুম, নয় পাঁচালির দল করে গৌড়ীয় সুধীজনের মনোরঞ্জন করতুম—কিছু না হলেও তবু আলিপুরের জজ আদালতের মাম্‌লা-পল্লবনে মাম্‌লা-বিলাসিনী যে লক্ষ্মী বিরাজ করেন তাঁর সেবকের ফর্দ্দে আমার একটা নাম লেখা হয়ে যেত। যাক্ এখন আর পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করবার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না—ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশী না পাইত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম।

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইতিমধ্যে আমার আরো অনেকগুলি অনুবাদ জমা হইয়াছে। এইবার ম্যাক্‌মিলানদের সহযোগে সেগুলি প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে। গীতাঞ্জলি এখানে সর্ব্বত্রই যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা আমার আশার অতীত হইয়াছে।

প্রবাসীর যে শত্রুসংখ্যা বাড়িতেছে ইহাতে আনন্দিত হইবেন। ইহাতে প্রবাসীর প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শত্রু সৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ—বিশ্ববিধাতারও শত্রুর অভাব নাই। আপনি বন্ধু যদি না পাইতেন তবে শত্রু দেখা দিত না। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus.
London
16th May, 1913.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে Modern Reivewএর জন্য যে লেখাটা পাঠাইয়াছি তাহা আগামী সোমবারে পড়িতে হইবে এই জন্য তাহা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া দেখি তাহাতে বেশ বড় বড় অনেকগুলা ভুল রহিয়া গিয়াছে; তাহার কতকগুলার জন্য আমি দায়ী—কারণ সেগুলা আমার ইচ্ছাকৃত না হইলেও আমার স্বকৃত বটে—আর কতকগুলা টাইপ লেখকের—দুইয়ে মিলিয়া অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি ছাপা সারা হইয়া যায় নাই। যদি পারি আজই আপনাকে একটা সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পাঠাইব। এই জন্যই পরের ভাষায় লিখিতে আমি এত দ্বিধা বোধ করি। ফাঁকে ফাঁকে এত গলদ থাকিয়া যায় যে সে বাছাই করা দায়। বিশেষতঃ বড় গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে এত বেশী কথার ভিড় যে তাহার ভিতর হইতে দুষ্ট ব্যাকরণের কীটগুলো নজর করিয়া বাহির করিতে পারি না। ছারপোকাওয়ালা হিন্দুস্থানী খাটিয়াগুলাকে যেমন করিয়া আছড়াইতে হয় আমার বাকি প্রবন্ধগুলাকেও তেমনি করিয়া একবার আছড়াইব এই স্থির করিয়াছি।

চৈত্র মাসের প্রবাসী ও দুই খণ্ড Modern Reivew আমেরিকা ঘুরিয়া আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা

এখানে অনেকে আমার বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন—হয়ত এখান হইতে সাহায্য লাভ করা অসম্ভব হইবে না। কেবল মুস্কিল এই যে দশ জনের কাছে প্রচার করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এ দেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আর একটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আমি আমার "পুরস্কার" কবিতার কবির মত শুধু বোধ করি মালা হাতে করিয়াই ফিরিব—যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন।

আপনাদের

[illegible]র।

ওঁ

37 Alfred Place West
South Kensington
London S. W.
1st May 1913.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া কেদার এবং প্রশান্ত দুই জনের সঙ্গেই দেখা হইয়াছে। কেদার আমাদের বাসার কাছাকাছিই থাকে এবং প্রশান্তও বোধ হয় আজকালের মধ্যে এই পাড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইবে। এখানকার দুই চারি জন ভাল লোকের সঙ্গে যাহাতে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিব। বাহিরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস একেবারেই নাই বলিয়াই এখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলেই বাসার মধ্যে পড়িয়া পড়া মুখস্থ করে—দেশকে ও দেশের লোককে চেনে না।

Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি Hibbert Journal ও একটি Quest পত্রিকায় দিয়াছি। এই দুটি পত্রই Quarterly সুতরাং জুলাই মাসে বাহির হইবে। এখনো প্রবন্ধগুলি এখানকার কেহ দেখে নাই। আগামী ১৯শে মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা Quest Societyর সভায় পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছি। অর্থ ও খ্যাতির লোভে কৃপণতা করিতে ইচ্ছা করি না—অতএব প্রথম প্রবন্ধটি Modern Reviewএর জন্য পাঠাইতেছি। এটি Chicago Universityতে প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ইংরেজির কোনো গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন—কেন না ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এ দেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার উপরে ইস্কুলমাষ্টারী চোখ পড়ে নাই। একজন ইংরেজ একবার চোখ বুলাইয়াছিলেন তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক articleএর বাহুল্য বর্জ্জন ও অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটা অব্যয় প্রয়োগের ত্রুটিও মার্জ্জনা করিয়াছেন। অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়া দিবার মত ভুল ইহাতে নাই।

চৈত্র মাসের প্রবাসী আমি এখনও পাই নাই—বোধ করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া গোলমালে মারা গিয়াছে। বাংলা লেখা অনেক দিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরেজিও যে বিস্তর লিখিতেছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে। বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি নয়।

শান্তা সীতাকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ১৮ই বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

লেখা ত এগিয়ে চলেচে। আমি সকালে কেবল লিখি। বাকি দিনটা চিঠি লেখা এবং কুঁড়েমির মধ্যে ভাগ করে নিয়েচি। এখন আমার যে রকম শক্তি এবং মনের ভাব তাতে অল্প একটুখানি লেখার কাজের সঙ্গে সের দশ পনেরো ছুটি মিশিয়ে তবে কোনো রকমে লেখকের ব্যবসা চালাতে পারি। যে সব সম্পাদক নিত্য জোগান্ দাবী করেন তাঁদের মন রাখব কি করে এখন থেকে তাই ভাবচি। অথচ আমার দোষ হচ্চে অ্যাডাম্ স্মিথের অর্থনীতির নিয়মেই আমার লেখার কারবার চলে—ডিমাণ্ডের তাগিদ এলে তবেই আমার সাপ্লাই সুরু হয়। আপনি যদি এই সময়ে আমাকে একটু ধাক্কা না দিতেন তবে আমি এই শরৎকালের স্বচ্ছ অতল দিনগুলির মধ্যে ডুব মেরে নিছক নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতুম, আমার টিকি দেখা যেত না। দায়ে পড়ে যখন লিখতে সুরু করা গেল তার অল্পক্ষণের মধ্যেই মন সম্পূর্ণ আলাদা সুর ধরল, বল্লে, আমার লেখা উচিত ছিল। অথচ অল্পক্ষণ আগে আমি ওঁরই মন্ত্রণায় কলম ছেড়ে জানলার কাছে নেহাৎ ভালমানুষের মত চুপচাপ করে বসেছিলুম। আমি যদি চাণক্য হতুম তাহলে তিনি অন্য যে দুই একটি অবিশ্বাস্য পদার্থের উল্লেখ করেছেন তার গোড়াতেই মন পদার্থকে বসিয়ে দিতুম। আমরা না চাইতেই মন জিনিষকে পেয়েচি অথচ কি করলে ওকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি জন্মায় এই সাধনাতেই জীবনটা গেল।

সাতটা লম্বা চওড়া পাতা আমার ক্ষুদে অক্ষরে ভরে গেছে। অর্থাৎ দু কলমে ভাগ করলে প্রবাসীর ১৪ কলমের বেশি ভর্ত্তি হবে। হয়ত আরো গোটা দুই ঐ রকম লম্বা পাতা ভরবে—অর্থাৎ আপনার ফর্ম্মা দুয়েক জুড়ে বসবে। হিসেব ঠিক হল কি না বলতে পারি নে কিন্তু কাছাকাছি হয়ত হবে। এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান, হোমরুল, ইণ্টার্ণমেণ্ট প্রভৃতি কোনো কথাই বাদ পড়ে নি। লিখতে লিখতে কথা বেড়ে চলেচে। আরো দু-তিন দিন যদি এমন ভাবে চলে তাহলে, সেদিন যেমন অবিশ্রাম বাদলার পালা পড়েছিল সেই রকম হবে বাতাসের সোঁ সোঁ, বৃষ্টির ঝরঝর মেঘের গরগর সমস্ত মিশে বীরকরুণহাস্যরসের একটা ছোটখাটো চক্রবাত্যার মত দাঁড়িয়ে যাবে। হয়ত ছাপা হবার পূর্ব্বে একবার সভায় দাঁড়িয়ে পড়লে আসর গরম করা যেতে পারে। সে সম্বন্ধে যথাকালে আপনার পরামর্শ নেওয়া যেতে পারবে।

সেই শচীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তার ভাইয়ের বধ ও বন্ধনের যে ইতিহাস সাক্ষ্যসাবুদসমেত আমার কাছে এসে জমেচে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে সমস্ত দলিলসহ একটা প্রকাশ্য পত্র লিখতে চাই। সেই পত্র আপনি প্রবাসীর সাময়িক আলোচনা বিভাগে যদি সদরে পেশ করে দেন তাহলে কেমন হয়?

আপনারা শান্তিনিকেতনের এই ছুটির সময়কার শারদীয়া মূর্ত্তিটা যে দেখতে পেলেন না এটা আপনাদের লোকসান হল। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫-১১-১৯১৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার সঙ্গে Thompsonএর কথাবার্ত্তা যা কিছু হয়েছে কোনো ছাপার বহিতে তার গতি হবে এমন আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নি। সেগুলো যে আমাকে দেখিয়ে নেবে এমন মানুষই ও নয়। Early British Officerরা তাদের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীমাত্রকেই ঠাকুর বলত এ খবর আমার জানা নেই। Castle of Indolence এবং Faerie Queene আমি পড়ি নি—Princessএর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই—আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।

The Ring and the Book একটা মামলার ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্যের সমষ্টি। ঘরে বাইরেতে প্রত্যেকে মুখ্যতঃ নিজের সম্বন্ধেই নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করেছে—অন্যেরা গৌণ। বিমলার Struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের—সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করচে—নিখিলেশও নিজের feeling-

এর সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্যের adjustment করচে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্চে না! এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।

টমসন লিখেচেন আমি কা'কে বলেচি যে আমি বাইব্‌ল্‌ পড়ি নি। আমাকে প্রশ্ন করলে সহজেই জানতে পারতেন আমি New Testament পড়েচি—একান্ত বিতৃষ্ণাবশত Old Testament পড়ি নি। আমি Shakespeare ভালোবাসি কি না এ প্রশ্ন করবারও যথেষ্ট অবকাশ তাঁর ছিল। আমার বয়স যখন ৯, আমি ম্যাকবেথ তর্জ্জমা করেছি। ৩ আষাঢ় ১৩৩৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বৃক্ষবন্দনা ও বর্ষশেষ কবিতা দুটি আমার আধুনিক সব লেখার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। ইতি ১ জুলাই ১৯২৭।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

* * *

প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্ত্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি। প্রমথ সবুজ পত্রে একেবারে সেদিকে যান নি বলেই আমি আরাম পেয়েছিলুম। সবুজ পত্র কোনো হিসাবেই প্রবাসীর প্রতিযোগী ছিল না, নিজের প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই আমার পক্ষে সবুজ পত্রকে আনুকূল্য করা এত সহজ হয়েছিল। না হলেও সবুজ পত্রকে পরিত্যাগ করতে পারতুম না। কারণ ইন্দিরা আমার একান্ত স্নেহের পাত্রী এবং প্রমথকে সাহিত্যিক ও মনস্বী বলে বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

* * *

২ জুলাই ১৯২৭
আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

অমিয়কে তাড়া লাগাব।

আমার চৈন বন্ধুটিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আছি। হোম য়ুনিভার্সিটির কথাটা আমার মনে লেগেছে। এই রকম অনুষ্ঠানের উদ্দেশে কতকগুলি পাঠ্যগ্রন্থ রচনার আশু প্রয়োজন হবে। সে কথাটাও ভেবে দেখবেন।

অপূর্ব্বকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা সে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে। আপনাকে পাঠাবার জন্যে তাকে লিখে দিয়েছি। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,

নাম্নী কবিতাটার কয়েক কপি যদি পাঠিয়ে দেন ত কাজে লাগাতে পারব।

সেই গাছের গল্প তো দুদিন আগেই পাঠিয়েছি। এত দিনে নিশ্চয় পেয়ে থাকবেন।

অপূর্ব্বর কাছ থেকে তার চিঠিখানার ইংরেজি অনুবাদ তলব করে পাঠাবেন। তাকে আমি আগেই লিখে দিয়েছি। ইতি ১১ই অক্টোবর ১৯২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরণ্যানী
শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভারত-উদ্ধার ও পাঁঠা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নিরামিষ, অর্থাৎ নুন, ছোলা আর আদা খাইয়া ভারত-উদ্ধার করা কি একেবারেই অসম্ভব?—পাঁঠা কি খাইতেই হইবে?

বহুদিন পূর্ব্বে—ছেলেবেলার একটা কথা আজ মনে পড়িয়া গেল বলিয়া প্রশ্নটা করিতেছি। কথাটা ভুলিবার নয়,—মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

যখনকার কথা, তখন 'ভারত' কাহাকে বলে জানি না, 'উদ্ধার' কাহাকে বলে তাহা আরও জানি না। দেশের হাওয়াটা গরম আর সেই গরম হাওয়া থেকে এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি যে সায়েবদের সঙ্গে আর 'হেসে কথা কওয়া' নয়, দেখিলেই চাঁটি বসাইতে হইবে। তাহার জন্য প্রচুর ক্ষমতার দরকার। কষিয়া ডন্ কুস্তি বৈঠকে মাতিয়া গেলাম সবাই।

সবাই মানে—আমি, গোবরা, যুগল, ফ্যালারাম, আর মুকুন্দ। আরও এক আধ জন ছিল বোধ হয়, এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না। ছেলেবেলার কথা তো সব থাকে না মনে···তখন কতই বা বয়স আমাদের?—কাহারও বারো, কাহারও দশ; যুগলের বোধ হয় বছর-তেরো হইবে।

লাহিড়ীদের পোড়ো বাড়ীর খিড়কির দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আমরা আখড়া বানাইয়া ফেলিলাম। জায়গাটা খুব নিভৃত, একটেরে; পিছন দিকটা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, সামনের দিকটায় দোতলা বাড়ীটা। পিছনের দেওয়ালের পরেই ঘন জঙ্গল—নোড়, পেয়ারা, আম, জাম, আমড়া, কলার ঝাড়; তার নীচে আস্‌সেওড়া, কচু, বিচুটি,—কোন ইংরেজ যদি নিজেদের বিপদের কথা টেরও পায় তো সহজে যে আসিয়া পড়িবে এমন আশঙ্কা নাই।

জায়গাটাতে সকালবেলায় হাত মুখ ধুইয়াই আমরা আসিয়া উপস্থিত হইতাম; ডন্ হইত, বৈঠক হইত, কুস্তি হইত, মুগুর ছিল। এই সমস্ত করিয়া যখন যথেষ্ট শক্তি হইবে সে-সময় কোন সায়েব দুর্ভাগ্যক্রমে হাতে আসিয়া পড়িলে কি করিয়া তাহাকে বাগাইতে হইবে সে জন্য একে অন্যের ঘাড়ে লাফালাফির ব্যবস্থাও ছিল। ব্যাপারটা নিতান্ত নির্দোষ নিরাপদ ছিল না,—ফুলিয়াও যাইত, কালসিটেও পড়িত, একটু আধটু রক্তপাতও হইত না যে মাঝে মাঝে, এমন নয়। তবে চোখে জল আনিবার রেওয়াজ ছিল না। জল আসিয়া পড়িলে তাহাকে 'ভীরু' বলা হইত। 'ভীরু' কথাটা মাত্র কয়েক দিন ব্যবহার হইয়াছিল, তার পর যুগল বলিল, "ভীরু না বলে ওকে 'সায়েব' বল।"···যুগল আমাদের সর্দার ছিল।

মোট কথা, দিব্যি ঘেরা-ঘোরা একটা জায়গার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে থাকিয়া একটা জাতকে মনে মনে যতটা নীচু করা যায় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

এই সব করিয়া গিয়া ভিজান ছোলা, আদা আর নুন চিবাইতাম।

পাঠশালের পরে বিকালে আবার ঐ ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্যটাও যে নিতান্ত অনির্দিষ্ট ছিল এমন নয়। মসজিদপাড়ার গোড়াতেই একটা ফিরিঙ্গি-পরিবার ছিল, তাহাদের প্রায় বছর বারো-তেরোর ছেলেটার ওপর বরাবর আমাদের তাক্ ছিল।

কালো চামড়া বলিয়া দু-এক জন একটু গুঁইগাঁই করিয়াছিলাম, যুগল বলিল, "লোকে একেবারেই এম-এ পাস করে না; এ, বি, সি থেকে আরম্ভ করতে হয় হে চাঁদ! ওর ওপর দিয়েই হাত পাকাও আগে। একেবারে কেউটে ধরে না।"

মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যুক্তিটা অকাট্য। স্যামুয়েলের জন্যই আমরা তর্কে তর্কে রহিলাম।

এক দিন বিকালে যুগলের আসিতে বড্ড দেরি হইল বাড়ীর ভিতর দিয়া আগাছার জঙ্গল চিরিয়া সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে। বেশ গা-ঢাকা-গোছের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অনুশীলন শেষ করিয়া আমরা উদ্বিগ্নভাবে পথের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় দূর হইতে দেখি নূতন কে এক জন অতিশয় মন্থর গতিতে আমাদের পানে চলিয়া আসিতেছে; গতিটা শুধু মন্থর নয়, একটু যেন একপেশে অর্থাৎ ডান দিকটায় একটু যেন খোঁড়াইতেছে লোকটা। সন্ধ্যার আবছায়ায় কি রকম হঠাৎ একটা

আতঙ্ক হইল যুগল নাই, তাহার উপর এ আবার নূতন মানুষ কে আসে! বোধ হয় পলাইবারই পথ খুঁজিতেছিলাম এমন সময় আগন্তুক হাত তুলিয়া থামিতে ইসারা করিল। ততক্ষণে কাছেও আসিয়া গিয়াছে, দেখি আমাদের যুগল। ভয় গিয়া তীব্র বিস্ময়ে সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম।

যুগলের নাকের বাঁ-দিকটা ফুলিয়া ঠেলিয়া আসিয়াছে, মুখের ডান দিকটা এমন ফুলিয়া গেছে যে ঠোঁট দুইটাকে যেন মনে হইতেছে একটা ছোট পাঁউরুটি। কপালে একটা এতখানি কালসিটে—চোখ দুইটার নাকের দিকের কোণ দুইটা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। এদিকে মালকোঁচার কাপড় ছিঁড়িয়া ফাতরাফাঁই হইয়া গিয়াছে, পাঞ্জাবীটা গলার সামনাসামনি শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া আসিয়া কোটের মত দুই ধারে সরিয়া গিয়াছে।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, "ব্যাপার কি রে যুগলো?"

যুগল মুখ নাড়িয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখটাও ভাল করিয়া নাড়িতে পারিল না, কিছু বোঝাও গেল না। মুকুন্দ বলিল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না, ভাল ক'রে বল।"

যুগল ঝাঁঝিয়া উঠিল। তাহাতে কথাটা যদিও আরও জড়াইয়া গেল, কিন্তু আওয়াজটা জোর হওয়ায় বোঝা গেল। ঝাঁঝিয়া বলিল, "বলচি—শুধু নুন-ছোলার কাজ নয়, পাঁটা খেতে হবে। তা কালার মত খালি—ভাল করে বল, ভাল করে ব···"

"উঃ" করিয়া হাত দিয়া মুখের ডান দিকটা চাপিয়া যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করিয়া বসিয়া ডাইনে-বাঁয়ে দুলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা চোখের সামনে যতটুকু দেখিতেছি তার সঙ্গে নুন-ছোলার উপর পাঁঠা চাপানোর কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া সকলে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। দারুণ কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু যুগলের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া মেজাজ দেখিয়া কেহই আর ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না।

একটু পরে যুগল নিজেই কথা কহিল; প্রশ্ন করিল, "মুখটা খুব ফুলে গেছে, না রে?"

গোবরা উত্তর করিল, "ভেবেছিলাম—তুই বুঝি মুখোস প'রে ভয় দেখাতে আসছিস সন্ধ্যে হয়েছে দেখে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "বোলতা না কি রে যুগল?"

যুগল কপাল নাক এবং ঠোঁটের উপর আলগা ভাবে হাতটা বুলাইতে বুলাইতে বিরক্ত ভাবে বলিল, "হাঁদার মত কথা ক'সনে শৈল; বোলতা কামড়ালে এমন খাপ-ছাড়া হয়ে ফোলে কখন!—মাদার-ফলের মত হয়ে গেছে মুখটা।"

একটু চুপ করিয়া কতকটা রাগিয়াই ফ্যালারামকে প্রশ্ন করিল, "একলাই স্যামুয়েলকে সায়েস্তা করতে পারব বলতে গেলি কেন রে কাল?···উঃ, ফোলাটা চড় চড় করে বেড়ে···উঃ···"

ফ্যালারাম বলিল, "দেখলাম তুই একলা কাল গোবরা আর মুকুন্দর মোয়াড়া নিলি, তাই···"

যুগল মুখের উপর হাতটা চাপিয়া বলিল, "বকাস নি বলচি ফ্যালা। তোদের ফুর্তি বেড়েচে। মিছিমিছি উস্‌কে দিয়ে···"

মুকুন্দ বলিল, "তুই একলা যেতে গেলি কেন, আমাদের কাউকে···"

যুগল ঘাড়টা তাহার পানে একটু ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, না পারিয়া সামনের দিকেই চাহিয়া বলিল, "বাহাদুরী রাখ্‌···যা না, তোরা তো পাঁচ জন রয়েছিস।"

কথা বাড়াইয়া ফল নাই দেখিয়া সবাই আবার চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে মুকুন্দ বলিল, "ওদের সুবিধে—ওরা বক্সিং জানে, তাই···"

চোখ দুইটা আরও বুজিয়া আসিতেছে, চাড়া দিয়া চাহিয়া যুগল বলিল, "থাম, বক্সিং যেন দেখি নি কখনও।··· বেটা যেন দশভুজার মত ঘুষি চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—বাগিয়ে ধরতে না ধরতে।···পাঁঠার ব্যবস্থা যদি না হয় তো ছেড়ে দে এ-সব ধাষ্টামি। চাল কলা, কি নুন-আদা খেয়ে ও-ব্যাটাদের···"

অনেকখানি বকিয়া যুগল ক্লান্তভাবে হাতে মুখটা রাখিয়া ঘাড় কাত করিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে গোঙাইতে লাগিল।

গোবরা ভীত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিল, "তবুও আসল সায়েব নয়; ফিরিঙ্গি, তাও আবার কটা চামড়াও নয়।··· কিন্তু পাঁঠা পাওয়া যাবে কোথায়?

ফ্যালারাম বলিল, "তাই তো।—হপ্তায় এক বার করেও তো খেতে হবে? ওরা রোজ মাংস চালাচ্ছে, তাও আবার মুরগীর। সকালে যখন ডাকে, গলার জোরেই বোঝা যায় ওগুনোর গরমাই কত।

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিতেছে। ওদের উপর, বিশেষ করিয়া স্যামুয়েলের উপর আক্রোশে মনটা জ্বলিয়া যেন খাখ্‌ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পাঁঠার কোন উপায়ই না

দেখিতে পাইয়া শুধু মাঝে মাঝে নিষ্ফল আক্রোশের দীর্ঘ-শ্বাস পড়িতেছে এক একটা।

একটু পরে ফোলা নাকে খুব একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যুগল বলিল, "ওঠ, রাত হয়ে গেল।···ও-ব্যাটাদের জয়-জয়কার এখনও কিছু দিন।···দেখ না, সবার বাড়ীতেই পূজো হয়, তা এক মা-কালী ছাড়া সব দেবতাই বোষ্টোম।···ক্রমেই আরও টাটিয়ে উঠছে রে! বাড়ীতে যে কি বলব···"

আমি দরদের সঙ্গে বলিলাম, "বোলতা কামড়ানোর কথাই বলিস যুগলো, মা-শেতলার দয়ায় তোর মুখটা সেই রকম নিটোল হয়ে ফুলে আসছে, না রে ফ্যালা? আর আছে ততটা এব্ড়ো-খেবড়ো?"

সবাই যেন বড্ড মনমরা হইয়া গেলাম। অবশ্য যুগলের মুখের ফুলাটা দুই-তিন দিনের মধ্যেই কমিয়া গেল কিন্তু আর তেমন গা নাই যেন কাহারও, কতকটা হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া গোছের ব্যাপার। আখড়ায় আসিতে হয় আসি, একটু-আধটু ডন্-বৈঠকও যে না হয় তা নয়, কিন্তু স্যামুয়েল-ঘটিত ব্যাপারটার আগে ভারত-উদ্ধারের উদ্দীপনায় তাহাতে যেমন একটা উগ্রতা ছিল, স্যামুয়েলকে মনে মনে চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে ডন্-বৈঠক করিতে করিতে যেমন ঘামিয়া উঠিতাম—আর সে-জিনিসটি নাই। কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ সময়ই কাটে পাঁঠা জোগাড়ের গল্প করিয়া; কোন উপায়ই ঠাওর করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ মনে যে-যার বাড়ী চলিয়া যাই।

ছোলাতে আর ভক্তি নাই। কোন দিন ভিজাইতেই ভুলিয়া যাই; কোন দিন বা আদাই থাকে না; নেহাৎ শপথ লইয়া ধরা,—আঙুলের ডগায় গোটা-দশবারো ছোলার দানা মুখে ফেলিয়া দিয়া অশ্রদ্ধার সঙ্গে চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া যাই।···ভীমের আদর্শে ভাতের সঙ্গে ফেন চলিতেছিল, এখন পানসে বোধ হয়।···স্যামুয়েল যে কি মোক্ষম ঘা দিল!

হ্যাঁ, আর একটা কথা।—স্যামুয়েলের খোঁজও করা হইয়াছিল, সকলে একজোট হইয়া। দেখা গেল সে আর একটা ছেলেকে সাথী করিয়া লইয়াছে। দুই "দশভুজা"র সম্মিলিত ঘুষির হিসাব করিয়া আর কেহ ঘেঁষিলাম না।

তার পর এক দিন যুগলই সমস্যার সমাধান করিল। এক দিন দেখি হঠাৎ চরণদাসের মা'র নাতিকে আনিয়া এরা জাতিতে বাগ্দী। চরণদাস মারা গিয়াছে, তাহার বুড়ী-মা এই বছর-দশেকের নাতিটিকে লইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। বুড়ীর বাড়ী-সংলগ্ন খানিকটা জমি আছে, একটা ডোবা আছে; তরিতরকারিটা, মাছটা বেচিয়া চলিয়া যায়। একটা গরুও আছে; আর আছে এক পাল ছাগল—মাদী-মদ্দ, ধাড়ি-বাচ্চায় অনেকগুলি।

তখন রাখিবন্ধন প্রভৃতির হুড়াহুড়ি খুব। যুগল বলিল—আর এক ভাইকে ডেকে নিয়ে এলাম, তোমরা সবাই কোল দাও এক এক ক'রে।

সবাই একে একে সুদামকে আলিঙ্গন করিলাম। যুগল তাহার কপালে আখড়ার মাটির তিলক দিয়া বলিল, "ভারত-উদ্ধার করতে হবে সুদামভাই।"

সুদাম নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় নাড়িল, যেন ব্যাপারটা নারিকেল গাছে ওঠার মত বা জলে ঝাঁপাই ঝোড়ার মতই নির্ভাবনার কথা। একটা অস্পষ্ট গোছের ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাড়ী কিম্বা চারি দিকের জঙ্গলের মধ্যে কিছু স্পষ্টতর অর্থ খুঁজিয়া পায় কি না দেখিবার জন্য এক বার বিমূঢ়ভাবে চারি দিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "তার জন্যে এখন তাহলে কি করব?"

তাহার সুপুষ্ট শক্তিমান্ দেহ দেখিয়া আমি বলিলাম, "একবার স্যামুয়েলকে আচ্ছা ক'রে যদি···"

যুগল কড়া চোখে ইসারা করিয়া আমায় থামাইয়া দিল। সুদামকে বলিল, "আজ তোর প্রথম দিন, এখন গোটাকতক ডন্-বৈঠকি ক'রে নিয়ে বাড়ী যা। ছোলা ভিজিয়ে রেখে এসেছিলি?"

সুদাম বলিল, "হিঁ; আর একটা ছাগলের ছ্যানা মরে গিয়েছিল, সেটাও রান্না আছে, সকালে ঠাকুমা-বুড়ীতে আমাতে অদ্দেকটা খেয়েছিনু, বাকিটা রয়েছে।"

সুদাম চলিয়া গেলে যুগল আমার পানে চাহিয়া খিঁচাইয়া বলিল, "এ ক্যাবলাকান্তের যার সঙ্গেই দেখা, খালি—'স্যামুয়েলকে ঠেঙাও'···তুই নিজে যা না।"

তার পর একটু থামিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "সুদেকে এক মতলব ক'রে টানলাম। ও-ব্যাটা বাগ্দীর পো ভারত-উদ্ধার করবে, না ছাই করবে, বলে আমরাই এত ক'রে থই পাচ্ছি বড়!···ওকে ভিড়োলাম এক মতলব ক'রে।"

আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "ওর ঠাকুমার অনেকগুলো ছাগল; বাচ্চা থেকে নিয়ে সব সাইজের পাঁঠা হরদম মজুদ রয়েছে···"

সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। গোবরা বলিল, "সুদে আনবে বলেছে?"

ফ্যালারাম বলিল, "তাহ'লে মাঝারি সাইজের আনতে বলিস যুগল···"

মুকুন্দ বলিল, "হ্যাঁ, একেবারে কচিগুলো কিছু নয়—ঘাস যেন···"

যুগল সবার মুখের পানে একে একে চাহিয়া শাসনের ভঙ্গিতে বলিল, "ব্যাস, সবাইয়ের নোলায় জল এসে গেল!···শোন্, এই বারণ করে দিচ্ছি, পাঁঠা আদায়ের মতলবে ডেকেছি যদি বলিস ওকে কেউ তো তার কিছু বাকি রাখব না। ও ব্যাটা মাংনায় পাঁঠা জোগাবার পাত্তোর কি না!···আর চাইলেও ওর ঠাকুমা-বুড়ী দিচ্ছে অমনি! ডাকসাইটে কেপ্পন মাগী। ও একটু এসে জমে বসুক, তার পর মতলব ক'রে বের করতে হবে; তত দিন তোরাও ভাবতে থাক্, আমিও মাথা ঘামাই, যার মতলবটা লাগসই হয়।"

সুদামের জমিয়া বসিতে দেরি হইল না। বাংলা দেশের মধ্যে ওদের নাড়ীতেই যা একটু গরম রক্ত আছে, কোস্তা-কুস্তির ব্যাপারে একেবারে মাতিয়া উঠিল। আখড়া খোঁড়া, জঙ্গল পরিষ্কার, ডন্, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, কুস্তি—এক ধার থেকে সব সাঙ্গ করিয়াও একটুও যেন ক্লান্তি আসে না; আরও কিছু চায়,—এক-এক দিন একটু অসহিষ্ণু ভাবে যুগলকে প্রশ্ন করে, "বামুনঠাকুর, তিনি আছে কোথাকে?—সেই যে কাকে উদ্ধার করতে হবে বলছিলে।"

সুদামকে সরাইয়া দিয়া এক-এক দিন আমাদের পরামর্শ হয়। যুগল বলে, "কিন্তু সুদের শরীর হয়েছে দেখেছিস্?—নুনছোলা খাওয়া নাড়ী নয় তো যে···কিন্তু কি ক'রে সরান যায় পাঁঠা? বুড়ী যক্ষীর মত আগলে ব'সে আছে।"

অবশেষে এক দিন সুদামের কাছেই কৌশলে পাড়া হইল কথাটা। সুদাম ভারত-উদ্ধার সম্বন্ধে অধৈর্য্যতা দেখাইলে যুগল বলিল, "সে তো তোর একার কাজ নয়, সুদাম; আমরা সব ক-জনই তোয়ের না হলে তো হবে না।"

সুদাম একটু যেন নিরাশ হইয়া বলিল, "কেন বীর-হনুমান তো এক রকম বলতে গেলে একাই···"

যুগল বলিল, "ভারত তো আর মা-জানকী নয় যে অশোকবনে ব'সে কান্নাকাটি করছে—হনুমান একাই গিয়ে···"

সুদাম একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিল, "তবে?"

চেলার চেয়ে গুরুর জ্ঞান যে এমন কিছু বেশী তা নয়; যুগল কি করিয়া বুঝাইবে কোন হদিস না পাইয়া একবার আকাশ থেকে আরম্ভ করিয়া পোড়ো বাড়ীটা মায় আখড়া পর্য্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, চেলার এ-রকম অসুবিধাজনক অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়াই বলিল, "সে তুই ঠিক বুঝবি কি এখন?—ভারত-উদ্ধার মানে—মানে—সায়েব দেখলে দু-ঘা বসিয়ে দেওয়া—স্কুলে পাঠশালে ইংরিজী পড়া মুখস্থ না করা, স্বদেশী কাপড় পরা···আর এই ধর···"

আমরা সকলে গোড়াতেই মতলব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম—একথা সেকথা করিতে করিতে সুকৌশলে আসল কথাটা পাড়িতে হইবে সুদামের কাছে আজ। বাজে কথা আসিয়া পড়িয়া দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবরা আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, বলিল, "কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পাঁঠা খাওয়া।"

সুদাম একটু বিস্মিত হইয়া চাহিতে যুগল গোবরার পানে চাহিয়া একটু রাগিয়া বলিল, "[illegible] বল কথাটা—তা নয়, মাঝখান থেকে 'পাঁঠা খাওয়া'! পাঁঠা তো ওর ঠাকুমা-বুড়ীও খায়—ক'টা ভারত-উদ্ধার করেছে?"

তাহার পর সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "সে কথা নয়, কথা হচ্ছে—চাল-কলা খেয়ে তো সায়েবদের সঙ্গে ভেড়া যায় না,—এক একখানা লাস দেখেছিস তো?—ওরা দু-বেলাই মাংস চালাচ্ছে, তাও মুরগীর মাংস, সেই জন্যে···"

সুদাম হাতে আখড়ার একটা ঢেলা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, "পাঁঠা তো আম্মো খাই; সকালে বাসী-করা খেয়ে এনু।"

যুগল বলিল, "তুই একা খেলেই হবে? একা একা তাবৎ সায়েবগুলোকে ঠেকাতে পারবি···?"

ফ্যালারাম নীচু মুখে একটা খড় চিরিতে চিরিতে কথার গতিবিধিটা লক্ষ্য করিতেছিল। হাত থামাইয়া সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "তাই যুগল বলছে—আমরা আখড়ার সক্কলেই যাতে পাঁঠার মুখ দেখতে পাই তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোবরা বলিল, "আর এক আখড়ার এক জনে পাঁঠা খায়, আর বাকি সব ছোলা চিবোয় এটা ঠিকও নয়।"

মুকুন্দ টীকা করিল, "এক আখড়ার সবাই গুরুভাই হোল কি না। বোষ্টোম তো সবাই বোষ্টোম, আর, কি যে বলে—পাঁঠা খায় তো সবাই পাঁঠা খায়।"

প্রসঙ্গটা এই পর্য্যন্ত আসিয়া একটু বন্ধ রহিল, তাহার কারণ এবার সুদামের কিছু বলার পালা, কথাটা তাহার দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুদাম কিন্তু 'হ্যাঁ, না, কিছুই না বলিয়া একটা ঘাসের শিষ তুলিয়া দাঁতে কাটিতে লাগিল।

যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরও যখন কিছু বলিল না, ফ্যালারাম কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "তাই যুগল বলছিল, তুই সুদাম যদি মাঝে মাঝে যোগাড় করতিস পাঁঠা তো আমাদের মস্ত বড় একটা সমিস্যে মিটে যেত।"

তাহাতেও উত্তর নাই দেখিয়া একটু থামিয়া বলিল, "অবিশ্যি তোর ঠাকুমাকে ব'লে।"

সুদাম ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, "তুমিই গিয়ে কয়ে দেখ না বুড়ীকে, দেখব কেমন বুকের পাটা।"

গোবরা বলিল, "বলতেই যে হবে তার মানে কি? একটা ভাল কাজের জন্যে নেহাৎ দায়ে পড়ে পাঁঠা খেতে হচ্ছে—এতে না ব'লে সরিয়ে নিলে পাপ হয় না।"

মুকুন্দ বলিল, "তাহলে তো দুগ্‌গা পূজোর জন্যে মল্লিকদের বাগান থেকে অত কষ্ট ক'রে যে গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে আসি সেও পাপ।"

সুদাম বলিল, "পাপের কথা হচ্চে নি; কথা হচ্চে ও খান্দাৎ মাগীর দিষ্টি থেকে সরাবে সে এখনও মায়ের পেটে আছে। নৈলে আমিই কি নিয়ে আসতে পারতুম নি···কবে একটা মরবে সেই ভরসায় বসে থাকতে হয়।"

গোবরা বলিল, "তোর ঠাকুমা গুণতে পারে কত দূর পর্য্যন্ত বল দিকিন,—তোদের তো খাড়িতে বাচ্চাতে অনেক পাঁঠাপাঠী। আমার পিসি তিন দশ পর্য্যন্ত গোণে কোন রকমে, তার পর গুলিয়ে ফেলে···মাল সরাবার সুবিধে হয় তাতে।"

যুগল একদৃষ্টে সামনে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া ছিল, হঠাৎ সুদামের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোর ঠাকুমা মানত-টানৎ করে না ঠাকুরদের কাছে?"

সুদাম বলিল, "আগে করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে।"

সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলাম। সুদাম বলিল, "একবার ক্ষীরী-ছাগলীটা পর্শো হবার সময় বুড়ী মা-শেতলার কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করলে। ক্ষীরীর সুচ্‌রংকুলে সেই বাচ্চা হ'ল, আর গা করে না মাগী। মা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেয়, বুড়ী এলাকারি দেয়, একের লম্বর ঝানু কিনা, বলে—ঐ ক্ষীরীর বাচ্চা নিয়ে মানত করেছিলাম—ক্ষীরীর বাচ্চাই দোব, একটু গোস্তো হোক্ গায়ে,—অন্য ছাগলীর ছাওয়াল মারতে যাব কেন?··· মা-শেতলা আবার ঠাকুমার বাবা তো?—এমা পেটে ব্যথা ধরল ক্ষীরীর,—যায় যায়! ঘাট মেনে বুড়ী দুটোর জায়গায় তিনটে পাঁঠা দিয়ে এলো। কিন্তু সেই থেকে বড্ড চটে গেছে, আর মানতের দিকে যায় না।"

যুগল বলিল, "সে কথা হচ্ছে না; মানে—ভয় করে তো মা-শেতলাকে?"

সুদাম বলিল, "যমের মতন। আর কাকেই বা ভয় করে মাগী ধরাতলে? তোমরা বামুন—মাকে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করাও না, দা-ঠাউর, খাইয়ে খাইয়ে পাঁঠায় অরুচি ধরিয়ে দিই।"

৩

কয়েক দিন আরও গেল।

আখড়ায় একটু মন্দা পড়িয়াছে। যুগলের ভাবটাও একটু বিমর্ষ, মন-মরা-গোছের। মাঝে মাঝে আসেও না আড্ডায়—কোথায় যে থাকে টেরও পাওয়া যায় না। আর সবাই আসি আমরা, কিন্তু যুগল হইল আড্ডার প্রাণ-স্বরূপ,—জমে না।

তাহার পর উপরি উপরি তিন দিন অনুপস্থিত থাকিয়া এক দিন বিকেলে আসিয়া বলিল, "মা মুখ তুলেছেন রে, এবার খা কত পাঁঠা খাবি।

ব্যাপারটা ভাঙিয়া বলিল—আর কোনও উপায় না দেখিয়া যুগল মা-শীতলার শরণাপন্ন হইয়াছিল। রোজ সকালে গিয়া ডাবের জল ঢালিয়া আসিত, ছুটি পাইলেই চিলেকোটার ঘরে গিয়া ধর্না দিত, শুইবার সময়ও মাকে স্মরণ করিয়া শুইত।

মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,···সুদামের ঠাকুমা জ্বরে পড়িয়াছে।

যুগল বলিল, "সুদেকে ডেকে এসেছি, সে একটু ছাড়া পেলেই আসবে চলে।···কিন্তু আসল জিনিসই পাওয়া গেল না এখন পর্য্যন্ত। হঠাৎ ফ্যালারামের পানে চাহিয়া বলিল, "হয়েছে!···ফ্যালা, তোর বাবার তো গড়গড়া আছে, তার সট্‌কাটা জোগাড় কর না।"

আমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে যুগলের মুখের পানে চাহিলাম।

যুগল বসিল, "সুদে আসুক, বলছি।"

ফ্যালারাম বলিল, "সটকার সঙ্গে তামাকও আনব নাকি যুগলো? বাবা কল্‌কাতা থেকে বেশ খানিকটা ফৌজদারী বালাখানা এনে রেখে গেছে।"

যুগল আর ফ্যালারাম কিছু দিন আগে তামাক ধরিয়াছে একটু একটু,—তামাকটা সিগরেট অর্থাৎ বিলিতী জিনিস নয় সেই খাতিরে বা ভক্তিতে যুগল একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তা আনিস। দেখিস তোর বাবা এসে না আবার টের পায়।"

কথাবার্তার মধ্যে সুদাম আসিয়া পড়িল। জ্বরটা যে যুগলেরই কীর্তি শুনিয়া বলিল, "টেঁসে যাবে নি তো? বড্ড কাতরাচ্ছে।"

যুগল বলিল, "টাঁসবার জন্যে তো জ্বর করান নি মা-শেতলা, আমাদের কাজ হাসিল হ'য়ে গেলেই আবার চাঙ্গা ক'রে দেবেন। সব ওঁরই হাতে তো? আর এমনি কি শুনতেন?—নেহাৎ দেখলেন এরা ভারত-উদ্ধারের জন্যে করেছে—দু'টো দিন কাত করে দিলেন বুড়ীকে।...এখন আসল কাজ যাতে আজই রাত্রে হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে; বুড়ো মানুষ, মিছিমিছি কষ্ট বাড়ানর দরকার কি?...আমি মতলব ঠাউরেচি..."

আমরা সকলে ঘিরিয়া বসিলাম যুগলকে। সে বিশদ ভাবে আমাদের কাছে তাহার মতলবটি বুঝাইয়া দিল।

সব শুনিয়া সুদাম বলিল, "কিন্তু, স্বপ্নটাও যদি মাকে দিয়ে বলিয়ে দিতে পারতে। বড্ড হাঙ্গাম, আর যদিই কোন রকমে টের পায় বুড়ী তো..."

যুগল ভারিক্কে হইয়া একটু বিরক্তির সহিতই বলিল, "যা বলছি তাই কর, নৈলে যাবে অক্কা পেয়ে বুড়ী। তোরা জেতে বাগ্দী, ঠাকুরদেবতার কথা বুঝিস না। একটা আবদার করলাম, শুনলেন; সব কাজ ওঁদের ঘাড়ে চাপান ঠিক নয়।"

সেই দিনই প্রায় নটার সময় আহার করিয়া আমি, যুগল আর ফ্যালারাম শীতলাতলায় যাত্রা দেখিবার নাম করিয়া সুদামের বাড়ীতে আস্তে আস্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গোবরার ভূতের ভয় বেশী, মুকুন্দর বাপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, তাহারা আসিতে পারিল না।

ফ্যালারাম তাহার বাপের গড়গড়ার নলটা লইয়া আসিয়াছে। তামাক জোগাড় করিতে পারিয়া ওঠে নাই।

যুগল একটা সঙ্কেত করিতেই সুদাম বাহির হইয়া আসিল। যুগল প্রশ্ন করিল, "কি রকম?"

সুদাম বলিল, "নিঝুম হয়ে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে এক-আধ বার কাতরাচ্ছে। তবে সন্ধ্যের চেয়ে ভালোই।"

সুদামের বাড়ীটা একটু একটেরেয়। একেবারে কাছে কোন ঘর নেই। আগাছার মধ্যে দিয়া আমরা ঘরের পিছনে চলিয়া গেলাম। পাঁঠা-অভিযানের পথে যে সাপ-খোপেরও সাক্ষাৎকার হইতে পারে সেদিকে খেয়াল নাই।

যুগল ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কোন্খানটা শুস তোরা, দেখা।"

ছেঁচা-বেড়ার ঘর, অনেক উঁচুতে মাঝখানে একটা জানালা। সুদাম আন্দাজে তাহাদের বিছানার জায়গাটা বাৎলাইয়া দিল।

যুগল বলিল, "এবার তুই যা ভেতরে। আমি গলিয়ে দিচ্ছি নলটা, তার পর আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে তোর ঠাকুমার মাথার ঠিক নীচে, বালিসের তলায় মুখটা ঢুকিয়ে রেখে দিবি। তার পর সব ঠিক হ'লে দুটো টোকা মারবি। ...যা যা ব'লে দিছলাম সব মনে আছে তো?...যা এবার।"

যুগল প্রয়োজনীয় অস্ত্র আনিয়াছিল। ছেঁচা-বেড়াটা খুব সন্তর্পণে একটু ফাঁক করিয়া নলটা গলাইয়া দিল।...

একটু পরেই দুইটা টোকা পড়িল।

৪

নলে মুখ লাগাইয়া যুগল চাপা স্বরে ডাকিল, "বুড়ী—বুড়ী!..."

থামিয়া আর একটু জোরে ডাকিল, "বুড়ী, শুনচিস্?"

ছেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়া একটা গ্যাঙানির শব্দ ভাসিয়া আসিল।। ফ্যালারাম ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "শুনেছে এবার।"

যুগল বলিল "আমি মা-শেতলা। ক্ষীরীর বিয়ো..."

ফ্যালারাম চাপা গলায় টিপিয়া দিল—"শুদ্ধু ক'রে বল্—ঠাকুরে কথা কইছে যে।"

যুগল সটকার মুখে চালান দিল—"ক্ষীরীর প্রসবের কথা মনে আছে? সেই যে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলি...ফাঁকি দেবার সুখটা আছে মনে?..."

গ্যাঙানিটা বাড়িয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—জ্বরের ঘোরে কাঁপা আওয়াজ—"সুদু জেগে আছিস্?"

সুদাম গভীর ঘুমের আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিল, "কেন ঠা'মা জল খাবি?"

না ঘুমো; একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখনু তাই বলছি।"

"মরুগা; কিসের স্বপ্ন দেখলি? স্বপ্ন, না জ্বরের তারোস।"

"না রে, মা-শেতলার স্বপ্ন দেখনু।"

"কি বলে?"

"ক্ষীরী-ছাগলীর কথা বলছিল মা।"

"বলবে নি ? তুই জোড়া পাঁঠার মানং ক'রে অত ভোগ। দিলি···"

একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর বুড়ী দুই-তিন বার কি যেন একটা শোঁকার আওয়াজ করিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সুদু, তামাকের বাস আসছে কোথা থেকে বল-দিকিন ?"

আমরা ভয়ে কাঁটা হইয়া গেলাম। যুগল নলটা একবার নিজের নাকে দিয়া আমাদের দুই জনের নাকে ঠেকাইল। সত্যই কড়া তামাকের গন্ধ পুরান নলটার ভিতর ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিতেছে।

বুড়ী আরও দুই-তিন বার হ্রস্ব নিঃশ্বাস টানিয়া বলিল, "নাঃ, সত্যিই যেন রে ! পাচ্ছিস্ না তুই সুদু ?"

দারুণ উদ্বেগে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি।

যা হোক সুদামটার বুদ্ধি আছে। খানিকটা চুপ করিয়া বলিল, "না, আমার তো স্বপ্ন নয়, পাবো কন'থে ?"

একটু চুপ করিয়া বলিল, "মা-শেতলার সঙ্গে বোধ হয় মহাদেবও এসেছে ঠা'মা, তিনি আবার মায়ের বর হয় কিনা; সেই জন্যে তামাকের গন্ধ পাচ্ছিস। বলে দে হপ্তায় হপ্তায় একটা করে পাঁঠা বলি দিয়ে বামুনদের পেসাদ বিলি করব। তার পর ঘুমিয়ে পড়; দু-জনেই চলে যাবে'খনি। ···শুনছিস ঠা'মা ?—মিছিমিছি ঠাকুরদেবতাদের মেলা দাঁড় করিয়ে রাখিস্ নি, তানাদের মাত্তোর একটা কাজই নয় তো···"

প্রায় মিনিট পনর-কুড়ি আমরা বুড়ীর এই প্রতিজ্ঞাটুকুর আসায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ওদিকে নাক-ডাকার শব্দ আরম্ভ হইল।

ফ্যালা বলিল, "আবার চালা যুগলো, তাগাদা দে কিপ্‌টে বুড়ীকে। কোন মতে বললে না দেখলি !"

বেজায় মশা কামড়াইতেছে এবং আরও কিছু যে কামড়াইতে পারে, সে চৈতন্যটাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মেজাজই ঠিক থাকে না, তো শীতলার ! বিরক্তি ও রাগের মাথায় মা-শীতলা বেশ একটু চড়া গলায়ই হাঁক দিলেন—"বুড়ী ! এই কিপ্‌টে বুড়ী—যে কথাটা বললাম···"

"গাঁ গাঁ" করিয়া একটা বিশ্রী আওয়াজের সঙ্গে বুড়ী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ডাকিল—"সুদু ! সুদু ! —অ-সুদাম !!···আলোটা বাড়িয়ে !!"

শেষ করিবার পূর্বেই চীৎকারের উপর আর একটা বিকটতর আওয়াজের সঙ্গে সুদামকে টানিয়া একেবারে হুড়মুড়িয়া নীচে পড়িল।—"ওরে বেরো ঘর থেকে ! কি ঠেকলো হাতে লতার মতন—বালিসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ! ···কিলবিল করে উঠল !—বেরো—বেরিয়ে পড় শীগ্‌গির ! ···মা রক্ষে করো···রক্ষে করো মা !!···য-টা পাঁঠা খেতে চাইবে···"

* * * *

এর পরের দৃশ্য আমাদের পাঠশালা। পরের দিন সকালবেলা। পাঠশালার সামনে বাদামতলাটায় বেশ ভিড় জমিয়াছে, এক পাশে সুদাম আর সুদামের ঠাকুরমা। সামনের দিকটায় আমাদের পণ্ডিতমশাই, এক হাতে বেত, —এক হাতে একটা গড়গড়ার ছেঁড়া নলের খানিকটা। একটু বেঁকিয়া, রাস্তার এক প্রান্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাঝখানে ভারত-উদ্ধারের আমরা কয় জন—ফ্যালারাম ছাড়া। পণ্ডিতমশাই এবং আরও সকলে যেদিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে সে-দিকে চাহিলে দেখা যায় একটি বড় মিছিলের মধ্যে, চ্যাং-দোলা হইয়া হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে এবং অশ্রাব্য গালা-গাল দিতে দিতে ফ্যালারাম আগাইয়া আসিতেছে···

কিন্তু, এই পর্য্যন্তই থাক্।

সেই থেকে পাঁঠা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া প্রশ্নটা মাঝে মাঝে এখনও মাথা চাড়া দিয়া ওঠে,—ভারত-উদ্ধার করিতে হইলে পাঁঠা কি খাইতেই হইবে ?

ব্রহ্মদেশীয় বেশভূষা

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন

ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন সভ্য জাতি পিউগণ সমসাময়িক শান, মৌন ও সমুদ্রোপকূলস্থ ভারতীয় ঔপনিবেশিক এবং বর্ম্মীদিগের নিষ্পেষণে ও পরিশেষে চীনদেশীয়দিগের আক্রমণে খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন তাহাদিগের কোনই চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।* ব্রহ্মদেশীয় কোনও পুস্তকে তাহাদের বেশভূষার বর্ণনা নাই। ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে—যখন বর্ম্মীদিগের লিপি ও সাহিত্যের জন্ম হয়, তখন পিউদিগের রাজ্য, জাতীয় সংহতি ও রেসিয়্যাল বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পাগানের প্রাচীন মন্দিরে যে-সকল ফ্রেস্কো চিত্র পাওয়া যায়, পণ্ডিত ট-সিন-কোর মতে তাহা ঐ পিউ-জাতীয় নরনারীর চিত্র। হারভী বলিয়াছেন— পিউগণ টিবেটো-বর্ম্মান্ জাতি; পূর্ব্বোক্ত ফ্রেস্কো চিত্রে নরনারীদিগের যে দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পিউ জাতির পক্ষে অসম্ভব।

এই সকল ফ্রেস্কো চিত্রের পুরুষগণ (১ নং চিত্র) আর্য্য জাতিগণের ন্যায় দীর্ঘদেহ; তাহাদিগের কেশ মস্তকের উপরে কুণ্ডলীকৃত, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে উত্তরীয়; এবং কটিতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধুতি (পূচি)। শীতপ্রধান তিব্বত বা উচ্চ-ব্রহ্মের মঙ্গোলীয় জাতিরা এরূপ নগ্ন শরীরে থাকিত না।

স্ত্রীলোকেরা (২ নং চিত্র) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কবরী বন্ধন করিত। কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয়, কপালে টীকা, গাত্রে কাঁচুলি, গলদেশে ওড়না এবং কটিতে ঘাঘরী পরিধান করিত। এরূপ বেশভূষার সহিত ব্রহ্মদেশীয় আধুনিক বর্ম্মীদিগের বেশভূষার কোনই সামঞ্জস্য নাই। উহা তদানীন্তন ভারতীয় নারীদিগের বেশভূষারই অনুরূপ।

চীনদেশীয় টাঙ্-বংশের ইতিহাসে পিউ জাতির উল্লেখ আছে (হারভী, পৃ. ১২)। ঐ বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে পিউগণ নীল ও লোহিত বর্ণের উজ্জ্বল কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিত; বিবাহিতা রমণীগণ মস্তকের উপরে কবরী বন্ধন করিত এবং কণ্ঠদেশে রৌপ্য বা মুক্তার মালা ব্যবহার করিত। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পদব্রজে গমনকালে গলদেশে লঘু উত্তরীয় ও হস্তে ব্যজনী ব্যবহার করিতেন, দুই পার্শ্বে ব্যজনী হস্তে চার-পাঁচ জন অনুচারিণী তাঁহাদিগের অনুগমন করিত।

১৯৩৯ সনের ২১শে জুলাই তারিখের রেঙ্গুন গেজেটে ড খিন্ তেইন, এম-এ, বি-এল পিউদিগের বেশভূষা সম্বন্ধে চীনদেশীয় সীন বংশের ইতিহাস (২৬৫-৪২০ খ্রীঃ) হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

> সুসভ্য পিউগণ নীল ও পীতবর্ণের উজ্জ্বল কার্পাসবস্ত্র কটিতে জড়াইয়া পরিধান করিত; স্ত্রীলোকেরা মস্তকের উপরে কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে রৌপ্য বা মুক্তার হার সন্নিবেশ করিত এবং গলদেশে রেশমের উত্তরীয় ব্যবহার করিত।···পিউ নর্ত্তকীগণ গোলাপী রঙের ঘাগরী, অঙ্গে আঙ্গরাখা, স্কন্ধে উত্তরীয়, হস্তে মণিভূষিত কঙ্কণ, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে স্বর্ণের শিরোভূষণ ও পুষ্পমাল্য পরিধান করিত। পুরুষেরা শিরোদেশে স্বর্ণ ও মণিভূষিত বকপক্ষযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করিত।···চীনদেশীয় নান্চাও জাতির আক্রমণে পিউদিগের অধিকাংশ লোকই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পিউ রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (অনুবাদ)

৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত চীনদেশীয় কান্-চো-মান্সু-র বিবৃতি হইতে ড খিন্ তেইন ব্রহ্মসীমান্তের অধিবাসী চারি প্রকার জাতির উল্লেখ করিয়াছেন।

> "(ক) ওয়েঙ-ওয়ে-ইউ। ইহারা কড়ি-শোভিত নীলবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করিত। অবিবাহিতা রমণীরা মস্তকে এক কবরী এবং বিবাহিতাগণ মস্তকের উপর দুই কবরী বন্ধন করিত। (খ) ওয়াঙ-চু নরনারীগণ অঙ্গে বর্ম্ম ও শিরোদেশে সমরুপুচ্ছযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করিত এবং উষ্ণীষের এক প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে লম্বভাবে ঝুলাইয়া দিত। (গ) ইয়াঙ-চাও প্রদেশের পশ্চিমে স্ত্রীলোকেরা উজ্জ্বল বঙ্কল বস্ত্র পরিধান করিত এবং পুরুষেরা কার্পাসবস্ত্রের নীল পায়জামা ও রক্তবর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার করিত। ইহারাও ইহাদের উষ্ণীষের এক প্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দিত। (ঘ) ওয়া ও পালাউংগণ নীল ও রক্তবর্ণ পায়জামা ও উত্তরীয় (কটিবন্ধ) পরিধান করিত এবং সম্মুখের দন্তগুলি স্বর্ণ রৌপ্য বা লাক্ষা দ্বারা সুশোভিত করিত। (অনুবাদ)

এই সকল জাতি এখন শান, লাও-শান, ছিন্, কাচীন, ওয়া ও পালাউঙ্ নামে অভিহিত হয়। (৩ ও ৪ নং চিত্র)।

---

* হারভী সাহেব বলেন প্রোম ও হ্মজার ধ্বংসাবশিষ্ট বিপুল দুর্গ-প্রাকার ও ধর্ম্মমন্দিরগুলি পিউদিগের শেষ কীর্ত্তি।

মধ্যযুগ

পাগান রাজত্ব (১০২৪-১২৬৭ খ্রীঃ)

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে[১] উত্তর-ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ উচ্চ-ব্রহ্মদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ রাজবংশেরই[২] ডাটাবাউঙ নামে এক নরপতি প্রোম দেশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং ঐ ডাটাবাউঙ্ নরপতির বংশধরেরাই পরে পাগানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঔপনিবেশিকেরাই পরে বর্ম্মী নামে অভিহিত হয়েন।[৩] একাদশ শতাব্দীতে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম পাগানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ সময় হইতেই ব্রহ্মদেশে বর্ম্মী জাতির সভ্যতার ও অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ড খিন তেইন লিখিয়াছেন—

"পাগানের বর্ম্মী পুরুষেরা একাদশ শতাব্দীতে আট-দশ হাত দীর্ঘ ধুতি (বা পুচি) এবং উত্তরীয় (খার্-ছি=কটিবন্ধ) ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকেরা ঘাগরী, হ্রস্ব আস্তিনযুক্ত আঙরাখা এবং গলদেশে উত্তরীয় (টান্ ফো) পরিধান করিত।" (অনুবাদ)

এরূপ ধুতি, ঘাগরী, কাঁচুলি ও উত্তরীয় প্রভৃতি পরিচ্ছদ বর্ম্মীরা তাহাদের ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষ[৪] কিম্বা সমুদ্রোপ-কূলস্থ দক্ষিণ-ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের অনুকরণে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই ড খিন্ তেইনের সিদ্ধান্ত। (৫ নং চিত্র)

পাগানের মহারাজ নরতু (১১৬৭-৭০ খ্রীঃ) বর্ম্মী স্ত্রীলোকদিগের ঘাগরী ও কাঁচুলি ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া "থামেইন" এবং "ইয়েন-কোয়ে" এঞ্জির প্রবর্ত্তন করেন (ড খিন্ তেইন)। "থামেইন" সিংহল ও মালাবারের বর্ত্তমান "মুনড়ু" বস্ত্রের অনুরূপ। ব্রহ্মদেশে এখন যে লোংজি (লুঙ্গি) বস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে, তাহা ঐ থামেইন বস্ত্রেরই প্রান্তদ্বয় সেলাই করা বস্ত্র। এখনও ব্রহ্মদেশের রাজবংশীয়া ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণ বিশেষ বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে লোংজির পরিবর্ত্তে নানা বর্ণে রঞ্জিত মহার্ঘ রেশমের "থামেইন" ব্যবহার করেন।

১২। পাগানের প্রাচীন মন্দিরের ফ্রেস্কো চিত্র

পুরাকাল হইতেই ব্রহ্মদেশের স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে মহিষ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত বক্রাগ্র পাদুকার ব্যবহার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজবংশীয়গণ কারুকার্য্যসম্পন্ন মখমলের জুতা পরিধান করিতেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ জুতা পরিধান নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্গতিসম্পন্না মহিলাগণ কণ্ঠে ছ-নরী মুক্তার হার, কর্ণে পদ্মরাগমণির কুণ্ডল, অঙ্গুলীতে মণিখচিত অঙ্গুরী, হস্তে স্বর্ণবলয় এবং পাদদেশে সোনার মল পরিধান করিতেন (ড খিন্ তেইন)

নিত্যপুষ্প ব্রহ্মদেশে চিরদিনই ফুলের আদর ছিল। ব্রহ্মদেশীয় রমণীগণ কবরীতে ও গলদেশে মল্লিকা, যূথিকা ও বকুলের মালা ব্যবহার করিতেন।

পিগু রাজ্য (১২৮৭-১৭৪০ খ্রীঃ)

পিগুরাজ্য প্রথমতঃ ভারতীয় ঔপনিবেশিক তালাইঙ-দিগের শাসনাধীনে ছিল। পরে উহা পাগান রাজ্যের শাসনাধীনে আসে। ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাতারদিগের আক্রমণে পাগান রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তালাইঙগণ পুনরায় পিগু রাজ্যের রাজদণ্ড গ্রহণ করে। ঐ সময়ের পিগুয়ান বা তালাইঙ-বর্ম্মীগণ বর্ম্মীদিগের ন্যায় লম্বা চুল না রাখিয়া বাব্‌রী রাখিত, কটিতে কচ্ছহীন ধুতি (পা জো), অঙ্গে

(১) এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। হারভীর মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দী।

(২) হারভী ৩, ৮, ১২, ৩০৮, ৩০৯, ১৫, ১৬৩, ২২৯ ও ২৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হারভী ১৫ পৃষ্ঠা।

(৪) বর্ম্মীরা ইণ্ডোনেশিয়ান জাতি। উচ্চব্রহ্মের টাগাউঙ রাজ্যে উত্তর-ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দী হইতে অষ্টশত বৎসর কাল রাজ্য শাসন করেন। প্রোমে পরাক্রান্ত রাজা বিক্রমের বংশধরগণ বহুবৎসরকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় চোল ও তালাইঙগণ পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিম্নব্রহ্মে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সকল ভারতীয়গণের সংস্পর্শে সান্নিধ্যে, রাজ্যশাসনে ও সন্তান-প্রজননে বর্ম্মী নরনারীর নিজস্ব পরিচ্ছদ-প্রথা যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাসযোগ্য।

৩। ছিন্ মেয়েদের বেশভূষা

ইয়েন-কোয়ে এঞ্জি ও গলদেশে উত্তরীয় ব্যবহার করিত।[৫] বলা বাহুল্য, পাগানের রাজগণ রাজ্য হারাইলেও তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পাগানের পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ পিগু আভা ও টাংগু রাজ্যে তখন সমাদৃত হইতেছিল এবং পাগানীদিগের প্রবর্ত্তিত বেশভূষাই তখন ব্রহ্মদেশে বর্ম্মী ও বর্ম্মী-তালাইঙদিগের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এই সময়ের পিগুনিবাসী তালাইঙ-দিগের রত্নালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও নানা বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টাংগু ও আভার বর্ম্মীসম্রাট-দিগের অমানুষিক অত্যাচারে পিগুর তালাইঙগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শ্যামরাজ্যে পলায়ন করে এবং হতাবশিষ্ট তালাইঙগণ বর্ম্মীদিগের বেশ, লোকাচার ও নাম গ্রহণ করিয়া বর্ম্মী হইয়া যায়।

টাংগু রাজ্য (১৫৩১-১৭৫২ খ্রীঃ)

ষোড়শ শতাব্দীতে শান্ ও চীন জাতির আক্রমণে উত্তর-ব্রহ্মের বর্ম্মীগণ ক্রমশঃ মধ্য-ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দলবদ্ধ হয় এবং টাংগুতে রাজধানী স্থাপন করে। এই রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিয়ানাউঙ শান্ ও তালাইঙ-দিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশের সম্রাট হন। তখন পূর্ব্বোক্ত পাগানী বেশভূষাই সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ছিল। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিয়ানাউঙ শ্যামদেশ জয় করেন এবং শ্যামদেশের রাজধানী অযোধ্যায় একদল বর্ম্মী সৈন্যসহ একজন বর্ম্মী সেনাপতিকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় হইতেই ব্রহ্মদেশের সহিত শ্যামদেশীয় সুকুমারকলা ও অভিজাত পরিচ্ছদ-শিল্পের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ব্রহ্মদেশের রাজসভায় রাজা রাণী মন্ত্রী অমাত্য ও সেনাপতিগণের দরবারী পরিচ্ছদ শ্যামদেশীয় রাজকীয় পরিচ্ছদের অনুকরণে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ব্রহ্মদেশীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ এই সময় হইতে শ্যামদেশের ব্যবহৃত দরবারী চাপকান ও কারুকার্য্যসমন্বিত লম্বা আচকান ব্রহ্মের রাজসভায় ও রাজকীয় অনুষ্ঠানে

৪। কোচিন কন্যার পরিচ্ছদ

(৫) ড থিন তেইন। ইয়েন-কোয়ে এঞ্জি = যে জামার সম্মুখভাগ কর্ত্তন করিয়া বোতাম দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত করা হয়।

৫। উচ্চ ব্রহ্মের মহারাজা মিনডনের দরবারী পরিচ্ছদ

নিৰ্ম্মিত নানাপ্রকার সুদৃশ্য "পাজো" (কঞ্চুলীন প্রভৃতি) ও "থামেইন" ব্রহ্মদেশের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু শ্যামদেশীয় রেশমী ব্যাঙ্কক্ পাজো ও থামেইনই তখন রাজগৃহে ও ধনাঢ্যগণের গৃহে সমাদৃত হইতেছিল। মণিপুরী কার্পাসবস্ত্র সাধারণ লোকের উপযোগী ছিল বলিয়া সমগ্র উচ্চ-ব্রহ্মদেশে উহার প্রচলন ছিল। (হারভী, পৃ. ২৩৯)

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বোডাফায়া পুনরায় শ্যামদেশ আক্রমণ করিয়া তদ্দেশীয় বহুসংখ্যক বস্ত্রনিৰ্ম্মাতা ও পরিচ্ছদ-শিল্পীকে বন্দী করেন এবং রাজ প্রাসাদের ও উচ্চরাজকৰ্ম্মচারী-দিগের বস্ত্র ও পরিচ্ছদ নিৰ্ম্মাণের জন্য তাহাদিগকে অমরপুরে সংরক্ষিত করেন।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মদেশের মসলিন বস্ত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূমণ্ডলে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই বস্ত্র এত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইত যে একটি অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া সমগ্র বস্ত্রখণ্ড চালাইয়া লওয়া যাইত (হারভী, পৃ. ১০)। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিলাতী অরগ্যাণ্ডি বস্ত্রের ব্যবহার করিতে থাকেন। টাংগুর রাজপ্রাসাদে মণিমুক্তা-খচিত মহার্ঘ পেয়ালা কারুকার্য্যময় চীনাংশুক, মণিমণ্ডিত স্বর্ণপাত্র, বহুমূল্য গালিচা ও স্বর্ণ-খচিত গৃহসজ্জা ব্যবহৃত হইতে থাকে। রাজপ্রাসাদের নরনারীগণের বেশভূষাও তখন তদনুরূপ মূল্যবান ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ও পরিশেষে চীন-দেশীয়দিগের আক্রমণে টাংগুরাজ্য বিনষ্ট হয় (হারভী, ২০০ পৃঃ), কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় পরিচ্ছদ-শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

আভার আলাউঙকায়া রাজবংশ
(১৭৫২-১৮৮৫ খ্রীঃ)

পূর্ব্বোক্ত শান ও টাংগু রাজবংশের অধঃপতনের পর মহারাজা আলাউঙকায়া আভা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মণিপুর জয় করিয়া বহু-সংখ্যক মণিপুরী তন্তুবায়কে বন্দী করিয়া ব্রহ্মদেশে আনয়ন করেন। সালাইঙ ও ঈন্ওয়াতে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয় এবং এই সময় হইতে মণিপুরীদিগের

৬। মহারাজ তিব-র মহামন্ত্রী কিন্ উন মিনজীর দরবারী পোষাক

৭। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহৃত রাজকুমারীদিগের বেশভূষা। মুকুট, মালা, ইয়েন-থান, খোডাউং এঞ্জি ও থামেইন

প্রতিযোগিতায় এই সূক্ষ্ম সূত্রের বস্ত্রশিল্প ব্রহ্মদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আলাউংফ্রায়া বংশের রাজা মিন্ডন মোগল-সম্রাট শাহজাহানের ন্যায় সৌন্দর্য্যপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে (১৮৫৬ খ্রীঃ) স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাণী, রাণীর সহচরী ও অমাত্যপত্নীদিগের বেশভূষা ইউরোপীয়-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। রাজসভায় রাজা রাজপুত্র অমাত্যদিগের দরবারী পরিচ্ছদও তখন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে দরবারী পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি পাওয়া যায়। রাজদরবারের পরিচ্ছদ পদ-অনুসারে নানা ভাগে বিভক্ত ছিল—

(ক) রাজা ও প্রধানা রাজমহিষীর দরবারী পরিচ্ছদ। (৫ নং চিত্র)
(খ) অমাত্যদিগের দরবারী পোষাক। (৬ নং চিত্র)
(গ) সেনাপতি ও সেনানায়কগণের পোষাক।
(ঘ) বিচার-বিভাগীয় প্রধান বিচারকদিগের পোষাক।
(ঙ) তুজি ও মিওজা বা মিওউনদিগের পোষাক।
(চ) ধর্ম্মশাসন-বিভাগের শ্রেষ্ঠ ফৌংজি (ফুঙ্গি) দিগের পরিহিত বস্ত্র।
(ছ) উকীল ও রাজচিকিৎসক প্রভৃতির কর্ম্মানুযায়ী পোষাক।
(জ) শোভাযাত্রীদের পোষাক।
(ঝ) নাটকীয় পরিচ্ছদ।
(ঞ) সাধারণ লোকের সর্ব্বদা-পরিহিত পোষাক।

রাজঅন্তঃপুরস্থ—

(ক) ছোট রাণীদিগের দরবারী পোষাক।
(খ) রাণীর সহচরীদিগের পোষাক।
(গ) অমাত্যপত্নীদের পোষাক।
(ঘ) রাজপ্রাসাদের নর্ত্তকীদের পোষাক।
(ঙ) সাধারণ গৃহস্থ রমণীদিগের পোষাক।

ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থিব-র রাজত্বকালে তাঁহার মহারাণী সুপিয়ালা-র বেশভূষার বর্ণনায় তাঁহার ফরাসী অনুচরী মিস ডাক্রস্ বলিয়াছেন:—

প্রভাতে সুদক্ষা পরিচারিকাগণ রাণীকে সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া কমুনতি ও অন্যান্য গন্ধবিশোধক চূর্ণ দ্বারা তাঁহার কেশ ও অঙ্গ পরিষ্কৃত করিয়া দিত। কেতকীপুষ্পগন্ধিত সলিলে পুনরায় তাঁহার অঙ্গ ধৌত করিয়া, কোমল গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা আর্দ্র কেশ ও শরীর মুছাইয়া দিত। সুগন্ধি তৈলযোগে তাঁহার কৃষ্ণ কুন্তলরাশি সংস্কৃত করিয়া হস্তিদন্তের স্বর্ণখচিত কঙ্কতিকা দ্বারা মস্তকের উপরিভাগে সুদৃশ্য কবরী বাঁধিয়া দিত। তৎপরে পীতাভ থানাখাচূর্ণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুবাসিত করিয়া, সূক্ষ্ম রেশমখণ্ড ও হরিৎমণিশলাকা দ্বারা ভ্রূ ও নেত্ররোম মার্জ্জিত করিত এবং বহুমূল্য পারস্য-কজ্জলের সূক্ষ্মস্পর্শে তাঁহার ভ্রূ ও চক্ষু সুশোভিত করিয়া দিত। আলোহিত পুষ্পরঙ্গ বা প্যারি রুজ দ্বারা তাঁহার বদনকান্তি জ্যোৎস্না-ধবলিত করিয়া পুষ্পনির্য্যাসসুরভিত লঘু অলক্তকে তাঁহার অধরোষ্ঠ সুচারুরূপে রঞ্জিত করিয়া দিত। * * * তৎপরে তাঁহার অঙ্গে সূক্ষ্মসূত্র রেশমের "কো চা"* পরাইয়া কটিদেশে রৌপ্যানুস্যূত নীল রেশমের "থামেইন", এবং বক্ষোদেশে স্বর্ণ-কুসুম লতাদি-শিল্পিত মহার্ঘ সাটিনের স্তনাবরণ (ইয়েন্ থান্) বন্ধন করিয়া দিত। তদুপরি বকপক্ষশুভ্র মস্‌লিনের কস্তুরীবাসিত "খ-ডাউং এঞ্জি" পরাইয়া, আলোকসম্পাত-চমকিত হীরক-গুটিকা দ্বারা উহা "ইয়েন্ থান্"এর সহিত আবদ্ধ করিয়া দিত। কর্ণে সদ্যস্ত শিশিরবিন্দু-সন্নিভ মুহুর্মুহু বিচ্ছুরিতাংশু হীরক-কুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণ-দুলন সঙ্কুচিত সপ্তসূত্রসমন্বিত মণিকণাদীপ্ত স্বর্ণহার, হস্তে মণি-ভাস্বর স্বর্ণবলয়কাবলী, পদে দ্বিমুখ স্বর্ণসর্পানুপম পাদভূষণ; চরণে মতিকণাজড়িত স্বর্ণসূত্রখচিত রক্ত মখমলের পাদুকা পরাইয়া গলদেশে নভঃনীলোজ্জ্বল লঘু রেশমের একটি উত্তরীয় ("পওয়া") স্থাপন করিত। * * * সর্ব্বশেষে চিত্র-শিল্পীর শেষ তুলিকা স্পর্শের ন্যায়, একটি হীরক-শীর্ষ সুবর্ণশলাকা কৃষ্ণকেশ মধ্যে অনুবিদ্ধ করিয়া পত্রদ্বয়-সমন্বিত সদ্য-প্রস্ফুটিত একটি ডনা পুষ্প তাঁহার কবরীর দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপিত করিত। অতঃপর রাণীর শ্রীঅঙ্গস্পর্শজনিত অপরাধ মার্জ্জনার জন্য তাঁহাকে "শিখো" (পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম) করিয়া রাণীর প্রাতঃসজ্জা সমাপন করিত। (অনুবাদ।)

অন্যান্য পুস্তকে রাণীর সহচরীগণেরও প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক বেশভূষার বর্ণনা আছে। কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য বিধানের পাশ্চাত্য উপাদানগুলি তখনও ব্রহ্মদেশে প্রবেশ

* কো-চা—আভ্যন্তরীণ বস্ত্র (under-wear)।

৮। ব্রহ্মদেশীয় দরবারী চাপকানের অনুরূপ পাসো ও গাউং বাউং

করে নাই; তথাপি মিস্ ডাগ্‌স্ কথিত পূর্ব্বোক্ত ঐ বেশ-ভূষা পৃথিবীর যে কোনও দেশের রাণীর স্পৃহনীয় ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বিশেষ বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে ব্রহ্মের মহারাণীর বেশভূষা বর্ণনা উপলক্ষে টেনিসন জেসি লিখিয়াছেন :—

The Queen wore a tail mitre-like Crown with jewelled lappers framing her face, to an impersonal abstraction of pure Royalty. With flame-like gold carving of the golden doors spread behind, she stood there in her tired and wired robes of silvery brocade flushed through with rose and yellow, stiffened winglike epaulettes springing from the shoulder looking indeed like a statue of benevolent Nats carved on the golden monasteries. They too were winged— tier after tier of winged and up-springing skirts and winged shoulders, even the shoes upon Thibaw's feet were up-curved velvet shoes, allowed only to Royalty—royal duck shoes with an arched bird's neck and silver wings that seemed as though they might bear their wearer upwards.

রাণীর সহচরীদিগের বেশভূষার বর্ণনায় মন্দালয়ের বৃদ্ধ অধিবাসী মিঃ এইচ নয়েস্ (১৯২০ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন[৬] :—

মান্দালয় রাজপ্রাসাদের পশ্চিম খণ্ডে ব্রহ্মের মহারাণীর যে দরবার-গৃহ ছিল, সেই দরবারকক্ষে রাণীর দরবার সময়ে[৭] রাণীর উচ্চ আসনের পশ্চাতে, স্বর্ণমণ্ডিত গৃহপ্রাচীরের সম্মুখে তথা হেমকাঞ্চনবর্ণাভা বিম্বাধরোষ্ঠী আপিও ড গণ (রাণীর সহচরীগণ) শিখীপুচ্ছমণ্ডিত স্বর্ণ-ব্যজনী হস্তে রাণীর উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইত। তাহাদের কবরীতে নব-মল্লিকা, কণ্ঠে আ নাভিলম্বিত মুক্তাহার, বক্ষে স্বাকারকারুখচিত সুনীল রেশমের স্তনাচ্ছাদন (ইয়েন থান), অঙ্গে রৌপ্য নীবিতপ্রান্ত শুভ্র এঙ্গি এবং কটিতে রামধনুবিনিন্দিত সদৃশ্য থামেইন ব্রহ্মরাজ্যের ভুবনবিজয়া বেশ সম্পদশ্রী প্রকটিত করিত। রাণীর স্বর্ণ সেলেই পেটিকা[৮] উন্মোচনে সেলেই আপিও ড দিগের পুষ্পাঙ্গ নম্র হইলে নীল সরোবর মজ্জনরত রাজহংসীর শুভ্র পুচ্ছের ন্যায় পৃষ্ঠে দোলায়িত তাহাদিগের এঙ্গিপ্রান্ত নিতম্বের পীবরতা অভিব্যক্ত করিত * * * ইত্যাদি। (অনুবাদ)

ব্রহ্মরাজসভার অমাত্যদিগের দরবারী বেশভূষার বর্ণনায় টেনিসন জেসি লিখিয়াছেন :—

The Mingyis (Chief Minister) wore their State robes of apricot velvet tiered in wing-like flounces, edges with gold braid and faced with gold tissue. They wore high mitres glittering with thin beaten gold; and over their heads, attendants carried the red umbrellas up-reared on long deeply curved handles; the crowd of minor officials jostled wearing high white mitres, attendants holding red umbrellas with straight handles over their head (page 131). In the Palace, Dresses, pyathats, roofs, thrones, even the very betel boxes, all were winged upward springing as flames; but the people themselves seemed to have no aspiration save to be happy. (Page 129).

৯। অন্ত্য যুগে ব্রহ্মদেশীয় ড-জু কবরী ও ইয়েন্ কোয়ে এঙ্গি

(৬) নয়েস্ সাহেবের স্ত্রী মহারাণী সুপিয়ালার সহচরী ছিলেন।

(৭) রাণীর দরবারের সময় ছিল বেলা ৩টা হইতে ৫টা।

(৮) সেলেই = ব্রহ্মদেশীয় সুদীর্ঘ চুরুট।

(৯) সেলেই আপিও-ড = যে সহচরীরা রাণীর সেলেই ও সেলেই-পেটিকা বহনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহাকে সেলেই আপিও-ড বলা হইত।

১০। বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরিহিত ইয়েন্-থান, গোড়াউঙ্ এঞ্জি এবং থামেইন

মন্দালয়-রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অনুগ্রহে, ভূতপূর্ব্ব রাজা রাণী, কুমার, রাজকুমারী ও অমাত্যদিগের রাজকীয় পরিচ্ছদের নমুনা রাখা হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ঐ বিবর্ণ হৃতমণি পরিচ্ছদকে "টিন্‌সেল ড্রেস" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মিঃ নয়েস্ কিন্তু রাজা, রাণী, রাজকুমারীদিগের পরিচ্ছদের বর্ণনায় উহাকে সত্য স্বর্ণ মণিমাণিক্যের পরিচ্ছদ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

বহু ইংরেজী পুস্তকে বর্ম্মী সৈন্য ও সেনাপতিগণের সামরিক পরিচ্ছদের বর্ণনা আছে। তাঁহাদের মতে উহা নাটকীয় পরিচ্ছদের অনুরূপ। বঙ্গদেশের যাত্রার দলে রাজা ও রাজসেনাপতিদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় এই সকল পরিচ্ছদ বর্ণভাস্বর—গভীর রক্তবর্ণের কোট, গাঢ় নীলবর্ণের হাফপ্যাণ্ট, খাকি বা পীতবর্ণের মোজা বা পটি, কৃষ্ণবর্ণের পাম-শু-র ন্যায় ফিতাহীন জুতা, শিরে অষ্টকোণ টুপি, তাহার উপরিভাগে অশ্বারোহী ইংরেজ সৈনিকদের টুপির উপরিস্থ ধাতুশলাকার ন্যায় কাঠের শলাকা এবং কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি।

আধুনিক যুগ: ইংরেজ রাজত্ব (১৮৮৬ খ্রীঃ হইতে)

রেঙ্গুনে ইংরেজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের রাজধানী স্থাপনের পর ব্রহ্মদেশীয় সভ্যতার কেন্দ্রও রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মরাজাদিগের প্রবর্ত্তিত বেশভূষা সম্বন্ধীয় নিয়ম ও শিষ্টাচার নিম্ন-ব্রহ্মে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অনাদৃত হইতে থাকে। ধনাঢ্যগণের গৃহে বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী ফ্যাশন অবারিত বিক্রমে প্রবেশ লাভ করে। উচ্চ-ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ যে রাজশক্তির সাহায্যে পূর্ব্বে বিদেশীপ্রিয়তা রোধ করিতেছিলেন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মজয়ের পর সে রাজশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সৌন্দর্য্যবিলাসিতার দুর্ব্বার আবেগে ও বিদেশী শিল্পের নব নব মাধুর্য্যে ব্রহ্মদেশের নরনারী তাহাদিগের পূর্ব্বতন সাদাসিদা স্বদেশী বেশভূষায় বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। গত পাঁচ-ছয় বৎসরে স্বদেশপ্রেমিক বর্ম্মী বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও বিদুষী স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার সমিতির সমবেত চেষ্টায় ব্রহ্মদেশে স্বদেশী প্যিন্-নী, প্যিন-বিউ প্রভৃতি খদ্দর-জাতীয় বস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে; কিন্তু কারুকার্য্যসম্পন্ন বিদেশী বস্ত্রের লোকপ্রিয়তা এখনও প্রবল বন্যার ন্যায় ব্রহ্মদেশ প্লাবিত করিতেছে।

ব্রহ্মদেশীয় নারীগণ এখন "থামেইন" পরিত্যাগ করিয়া কারুকার্য্যসম্পন্ন বিদেশী লোংজি (লুঙ্গি) ব্যবহার করিতেছেন; পুরুষেরাও পূর্ব্বতন "পাজোর" অনুচিত দৈর্ঘ্যে ও মূল্যাধিক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া লুঙ্গি এবং আপিসে কাছারিতে পরিমিত প্রমাণ পাজো পরিধান করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রচলিত ফলোং বাউঙ উষ্ণীষ আর বর্ম্মী রাজপুরুষেরা ব্যবহার করেন না; তৎপরিবর্ত্তে লঘু রেশমের রঙ্গীন পাউঙ-বাউঙ ব্যবহৃত হইতেছে। (৮ নং চিত্র)

বর্ম্মীরা এখন আর দীর্ঘ কেশ রাখে না; ইউরোপীয়-দিগের ন্যায় কেশ কর্ত্তন ও কেশবিন্যাস করে। রাস্তায় চলিতে পূর্ব্বতন ফানা জুতার ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে; তাহার পরিবর্ত্তে সময়োপযোগী বিলাতী ষ্টাইলের জুতা পরিহিত হইতেছে।

ইয়েন-কোয়ে এঞ্জিরও প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ইয়েন-পৌং এঞ্জি আদৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রমণীদিগের মস্তকের পশ্চাতে কবরী বন্ধন করা অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল; সুদীর্ঘ "জ-জু-র" ('পর-কেশ) সাহায্যে ব্রহ্মরমণীদিগের কবরী তখন

আকাশস্পর্শী উচ্চতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল (৯ নং চিত্র)। এখন সে উচ্চতায় তাহারা বীতস্পৃহ হইয়াছে; ব্রহ্মযুবতীদিগের কেশ এখন মনোহর "এয়ারোপ্লেন খোঁপায়" মস্তকের পশ্চাতে উড়ে উড়ে ভাব প্রকাশ করিতেছে।

পুরুষদিগের মধ্যে উত্তরীয় ব্যবহার সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশের প্রৌঢ়া রমণীরাই এখন কখনও কখনও রেশমের "পওয়া" (উত্তরীয়) ব্যবহার করেন।

পূর্ব্বতন কালে রমণীদিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের আদর ছিল তাহার গুরুত্ব, বৃহত্ত্ব ও মণিবিশেষের দুষ্প্রাপ্যতা ও উজ্জ্বলতার জন্য। এখন স্বর্ণালঙ্কারের আদর নির্ভর করিতেছে উহার পালিশ ও কারুকার্য্যের জন্য, সূক্ষ্মতা বা লঘুতার জন্য এবং মণিগুলি কাটিবার নৈপুণ্যের জন্য। পূর্ব্বে বর্ম্মী নারীগণের কণ্ঠে সাতনরী মুক্তা বা মণির হার ছিল এবং হস্তে মণিখচিত গুরুভার স্বর্ণবলয় ছিল। এখন তৎপরিবর্ত্তে হস্তে সূক্ষ্ম সোনার চুড়ি ও গলদেশে মতিশোভিত লঘু সোনার হার ব্যবহৃত হইতেছে (১০ নং চিত্র)। ইহার দাম কম নয় কিন্তু সে দাম উহার কারুকার্য্যের জন্য, স্বর্ণ বা মণির ওজন বা বৈশিষ্ট্যের জন্য নহে। চেটির নিকট বিক্রয় করিতে বা বন্ধক রাখিতে গেলে সোনার ওজনেই উহার দাম নির্দ্ধারিত হয়, কারুকার্য্যের মূল্য থাকে না। পূর্ব্বে বর্ম্মীগণ হীরার অপেক্ষা পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণির বেশী আদর করিত। এখন নকল রুবি ও সাফায়ার তৈয়ারী হইতেছে; আসল নকল চেনা কঠিন; হীরার আদর বাড়িয়া গিয়াছে; মুক্তার আর আদর নাই। বাজু, বাউটি, অনন্ত প্রভৃতি অলঙ্কার বর্ম্মী রমণীদিগকে পরিতে দেখি নাই, এখনও দেখা যায় না। ভারতীয় বা বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের ন্যায় তাহারা নিতম্বে মেখলা পরিধান পছন্দ করে না; পাদদেশেও অল্পবয়স্কা বালিকা ব্যতীত অন্য রমণীরা মল প্রভৃতি পাদভূষণ ব্যবহার করে না।

১১। আধুনিক শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত মহিলার বেশভূষা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মোগলাই বা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে, ব্রহ্মদেশে তেমন হয় নাই। উকীল, ব্যারিস্টার, তুজি, সওদাগর, জজ, ডেপুটি বা হাইকোর্টের বিচারপতিরাও ব্রহ্মদেশীয় রেশমী পাজো ইয়েন পৌং এঞ্জি ও লঘু লাউণ্ড বাউণ্ড পরিধান করিয়া কোর্ট কাছারিতে কার্য্য করিতেছেন। আধুনিক ফ্যাশন-অনুরক্তা বিলাসিনীদিগের পরিচ্ছদ আলোচনার বাহিরে।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র রচনাবলী—ষষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪।৹, ৫।৹, ৬।৹ ও ১০৲ টাকা। ৬৭৪ পৃষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের তিনখানি আলেখ্য এবং "গোরা"র হস্তলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই খণ্ডে আছে।

সর্বাপেক্ষা সস্তা সংস্করণের মূল্য ৪।৹, কিন্তু তাহারও কাগজ উৎকৃষ্ট এবং ছাপা পরিপাটী।

যুদ্ধের সময়ের মধ্যেও "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র নিয়মিত প্রকাশ এবং তাহার বাহ্যসৌষ্ঠব-রক্ষা প্রশংসনীয়।

ষষ্ঠ খণ্ডে "কবিতা ও গান" বিভাগে আছে "কণিকা"। "কণিকা"র অনেক কবিতা প্রবাদবাক্যের মত সংক্ষিপ্ত এবং লৌকিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। দীর্ঘতম যেগুলি সেগুলিও ছোট। সবগুলি প্রাজ্ঞজনোচিত এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রসিকতা বা পরিহাসে পূর্ণ।

"হাস্যকৌতুক" বিভাগে কবির কৌতুক নাট্যগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি য়ুরোপে প্রচলিত শারাড্‌ নামক নাট্যখেলার অনুকরণে লিখিত, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশী। পড়িয়া নির্মল আমোদ পাওয়া যায়। অল্পবয়স্ক অধিকবয়স্ক সকলেই এইগুলির কোন-না-কোনটি অভিনয় করিতে পারেন। বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় ও বিনোদন সভায় এগুলি কেন অভিনীত হয় না, তাই ভাবি।

"উপন্যাস ও গল্প" বিভাগে কবির বৃহত্তম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে আদ্যোপান্ত "প্রবাসী"তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রবাসী"র তাৎকালিক পাঠকেরা (তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও "প্রবাসী"র পাঠক) ইহার সহিত পরিচিত। তাঁহারা জানেন, মাসে মাসে ইহার আবির্ভাবের জন্য সকলে কেমন ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন।

"প্রবন্ধ" বিভাগে "লোকসাহিত্য" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে আছে, "ছেলে ভুলানো ছড়া", "কবিসংগীত", ও "গ্রাম্যসাহিত্য"। ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া তাহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম একত্র মুদ্রিত করেন। তাহার উপর তাঁহার বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও কবিজনোচিত মন্তব্য তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত হওয়ায় তাঁহার এতদ্বিষয়ক রচনাটি অতি মনোজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "কবিসঙ্গীত" কবিওআলা ও তাঁহাদের গান সম্বন্ধে। ইহাতে তাঁহাদের কতকগুলি গান এবং তাহার উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আছে। "গ্রাম্য সাহিত্য" প্রবন্ধটিতেও গ্রাম্য সাহিত্যের কিছু সংগ্রহ এবং তাহার উপর কবির বক্তব্য নিবদ্ধ হইয়াছে।

আরোগ্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা ও চারি টাকা।

উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে সুমুদ্রিত এই কবিতার বহিটিতে তাঁহার "রোগশয্যায়"এর পরে রচিত তেত্রিশটি কবিতা ও "উৎসর্গ" নিবদ্ধ হইয়াছে। "রোগশয্যায়"এর পরে রচিত সকল কবিতা ইহাতে নাই। যেগুলি তাঁহার কবিতাভাণ্ডারীর হাতে মজুত আছে, তাহার উপর আরও কতকগুলি সংযুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই আর একখানি কবিতার বহি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

এক একটি করিয়া "আরোগ্য" গ্রন্থের সকল কবিতার পরিচয় এখানে দিতে পারা যাইবে না। বিস্তারিত সমালোচনা পরে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কবিতাগুলিতে ভগবানের "শান্তম্‌" স্বরূপের উপাসকের মনের প্রতিবিম্ব সর্বত্র বিরাজমান—যেগুলি লঘু পরিহাসের বায়ুমণ্ডলবেষ্টিত সেগুলিতেও। কোথাও রোগক্লিষ্টতা নাই, কোন অভিযোগ নাই। বিশ্বের ও বিশ্বব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব ও নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে দিব্য দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ইহার বহু কবিতাতে আছে। অথচ ইহা দার্শনিক গ্রন্থের মত কঠিন রসবিহীন নহে। সমস্ত কবিতাই কাব্যরসে আপ্লুত, আনন্দদায়ক ও সুখপাঠ্য।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্রাবলী—চয়নিকা তাঁহার অন্যতমা কন্যা শ্রীমণিকা মহলানবিশ। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ৪৫ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা জ+৸৶৹+২৬৭। চিত্র—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের একখানি, এবং কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার সহধর্মিণীর ত্রিবর্ণ মুদ্রিত একখানি। সুমুদ্রিত। মূল্য খুব কম রাখা হইয়াছে।

এই পত্রাবলী পাঁচটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা ১। "ধর্মপিতা শ্রীমদাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পত্র বিনিময়"। ২। "ধর্মবন্ধু ও প্রচারকগণের নিকট"। ৩। "সহধর্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীকে বিলাত প্রবাসের সময় লিখিত পত্রাবলী"। ৪। "পারিবারিক"। ৫। "ইংরেজী হইতে অনূদিত বিবিধ পত্রাবলী"। একটি পরিশিষ্টে পত্রোল্লিখিত নামসমূহের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল, কতকগুলি পত্রে সেই সমুদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সেই সকল বিষয়ে কিছু বলা আমার অভিপ্রেত নহে, অধিকার-বহির্ভূতও বটে।

পত্রাবলীর ভাষা সরল ও মনোজ্ঞ। বহু পত্র শিক্ষাপ্রদ।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ ও প্রামাণিক অভিধান প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। ইহার ৭৪তম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ শব্দ "মলমাস" ও শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩৩৬।

সহজ পাঠ—তৃতীয় ভাগ। অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ রায় কর্তৃক সম্পাদিত। বিশ্বভারতী পাঠভবন, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী পাঠভবন কর্তৃক ৬ষ্ঠ খ বর্গের জন্য পাঠ্যরূপে মনোনীত।

"প্রবাসী"র পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে

সাধারণতঃ কিছু লেখা হয় না। এই পুস্তকটি সম্বন্ধে সেই রীতির ব্যতিক্রম করিবার কারণ এই যে, ইহা আগাগোড়া "কথ্য" বাংলায় লেখা। ইহার গান, কবিতা, ও গদ্য পাঠগুলি সমস্তই চলতি বাংলায় রচিত। এই পুস্তকটি পড়িয়া বালকবালিকারা আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে। ইহা তাহারা আগ্রহের সহিত পড়িবে। বৈজ্ঞানিক পাঠগুলির দ্বারা প্রাকৃতিক নানা বিষয়ে তাহাদের কৌতূহলের উদ্রেক হইবে। গানগুলি পড়া যায়, গাওয়াও যায়। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলি ইহার আর এক বৈশিষ্ট্য। ইহাতে যাঁহাদের লেখা আছে তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ত আছেনই। অন্যেরাও অভিজ্ঞ শিক্ষক।

ড.

অপৌরুষেয়—শ্রীঅবনীনাথ রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, পৃ. ১৮৯। মূল্য ১৷৽।

অবনীবাবু বাংলা সাহিত্যে এখন এক জন প্রতিষ্ঠিত লেখক। কর্ম-জীবনে তিনি এক জন অনলস এবং অনবসর কর্মী। এরূপ লোকের হাতে সাহিত্য সব সময় বিশেষ কিছু আশা করিতে পারে না। অবনী-বাবুর ব্যতিক্রম এই জন্য যে কর্মকোলাহলের মধ্যে তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি অতন্দ্রিত। এইখানেই তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে যোগ এবং এই যোগের যে বিশেষত্ব তাহাই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি কর্মচঞ্চলতার মধ্যে যখন যেটুকু রসের সন্ধান পান তখনই সেটুকু আহরণ করিয়া বাণীর ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখেন। এই জন্য ঠিক প্লট বাঁধিয়া রীতিমত গল্প রচনার দিকে তাঁহার বড় একটা ঝোঁক দেখা যায় না। যেসব টুকরা-টাকরা ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে তাহাদের মধ্যেও কোথায় এক বিন্দু অশ্রু লুকান আছে, কি একটি স্মিত হাস্যের রেখা ফুটিয়া আছে—এসব সবার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ঠিক এই ধরণের খুঁটিনাটির দিকে অবনীবাবুর দৃষ্টি খুব প্রখর এবং সেই জন্যই ঠিক যাহাকে স্কেচ্ বলা যায় তাহা তাঁহার হাতে যেমন ফুটিতে দেখিয়াছি, অন্য কাহারও হাতে তেমন করিয়া ফুটিতে দেখি নাই।

ঠিক এই শক্তির জোরে অবনীবাবু তাঁহার "বঙ্গপ্রতিভা" বইখানি এত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিয়াছেন। সেই শক্তিই "অপৌরুষেয়"তেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি খুব সাধারণ ঘটনাকেও এক অভিনব অথচ সত্য দৃষ্টিতে দেখিয়া শুধু হাল্কা ভাবে বর্ণনা করিয়া যান। এর দ্বারা, প্লটের কোন উদ্বেগ না থাকিলেও পাঠকের মনে একটা শান্ত কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। এদিকে, যাহাদের কেন্দ্র করিয়া ঘটনা সেই চরিত্রগুলিও অনাড়ম্বরভাবে আপনা-আপনিই যেন পূর্ণ অবয়বে ফুটিয়া উঠে।

বইখানিতে ষোলটি গল্প বা স্কেচ্ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি ভূতের। আমার মনে হয় রচনার উৎকর্ষ এবং চরিত্র-চিত্রণ বাদ দিলে গল্পগুলির ভূতুড়ে অংশ একটু হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে। ভূত বিশ্বাস করিয়া ভূতের গল্প বলায় এই একটা বিপদ আছে বলিয়া মনে হয়; অবনীবাবু এ সম্ভাবনাকে এড়াইতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি এই সব অজ্ঞের বিষয়ে যে বিশ্বাসী তাহা ভূমিকাতেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বর্ষায়—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বিভূতিবাবু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার গল্পের রসে বাঙালী পাঠক মুগ্ধ। রাণুর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ,—ঠোঁট ফুলানো, পড়া তৈয়ারি, বিজ্ঞতার অভিমান—স্মৃতির পটে চিরদিনের জন্য আঁকা হইয়া আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের 'পীতু' রাণুর গল্পের মতই সুমধুর; শিশুজীবনের ছবি আঁকিতে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত। 'বর্ষায়' বাস্তব জীবনের আষাঢ়ে গল্প, সত্য যেন কল্পনায় ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস করিতে বাধিলেও বর্ণনাভঙ্গীর আকর্ষণে পড়িয়া যাইতে হয়। বাল্য ও কৈশোরের কত না স্বপ্ন। বন্ধুদের জটলা, সখীদের মজলিস, নববিবাহিতা বালিকার প্রেম,—একে একে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। কিন্তু আট বৎসরের বালকের অস্ফুট প্রেম সংশয়ের বাষ্প ঘনাইয়া আনে।

সর্ব্বসমেত এগারোটি গল্প আছে। রসের গাঢ়তা সব কয়টিতে সমান নহে, কিন্তু রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রত্যেকটিতেই আছে। 'ল্যান্সডাউন ও বিপিন পাল' এবং 'রায়ট' সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাতে কৌতূহলোদ্দীপক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাঁশী—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। পি-২৩০।৩ রসা রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। রসচক্র সাহিত্য সংসদ্ হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এখানি কবিতার বই। বাংলার আকাশ উদার, বাতাস আবেগ-স্পন্দিত, মৃত্তিকা রসসিক্ত। বাংলা কীর্ত্তনের দেশ, প্রেমভক্তির দেশ। "বাংলার বাঁশী"ও সেই সুরে বাজিয়াছে।

"পথের ধূলিতে মধুর মাধুরী ছন্দিত ব্রজরঙ্গে
সে যে গো আমার নন্দভবন বন্দি সে মাতা বঙ্গে।"

বাংলার জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া জীবন অপূর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে ডুবিয়া যায়।

"পূর্ণিমা রাতে গাঙভরা আলো নাচে নীরে বার বার,
ভূতলে অতুল গঙ্গার তীর বন্দিনু মা আমার।"

বইখানিতে তেইশটি কবিতা আছে। শৌরীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "ছন্দের মাঝে কোথাও জড়তা নেই, কষ্ট মিল নেই, পড়লে মনে হয় কবি ছলনা করে নি, নিজের সঙ্গেও না—পরের সঙ্গেও না।" এই তেইশটি কবিতার মধ্যেও সেই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সব কবিতাগুলিই শান্ত ও মধুর রসে পূর্ণ।

"মধুরশৈলবনমধুরক্ষেত্রঘনশস্যহরিতমধুকান্তি,
মধুর মধুর গুরু-গম্ভীর-অম্বর-ওঙ্কার-ঝঙ্কৃত শান্তি।"

"বাংলার বাঁশী"র সুর বাঙালীর হৃদয় স্পর্শ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জল আর আগুন—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা। মূল্য ২৷৽।

ছোট গল্পের বই। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প-লেখিকাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান উচ্চে। এই বইয়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কয়টি গল্পই সুখপাঠ্য—কেবল পড়িতে ভাল লাগে তাই নয়, পড়ার পরেও তাহাদের লইয়া একটু ভাবিতে ইচ্ছা করে।

বইটির সজ্জা সম্বন্ধে আমার একটি অনুযোগ আছে। পৃষ্ঠাসজ্জায় মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত নাই যাহাতে বোঝা যায় এটি গল্প-সমষ্টি, উপন্যাস নয়।

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

কাব্যে অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ইংরেজীতে একটা চলতি কথা আছে,

"Fools rush in where Angels fear to tread."

দেবতা যেথায় পা ফেলিতে ভয় পায়,
মূর্খ সেথায় হুড়মুড়িয়েই যায়।

তার চোখ আছে বটে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা নেই। মোটা বুদ্ধির একটা সুবিধা এই, সূক্ষ্মবিচারের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা তাকে স্পর্শ করে না। অন্ধ আবেগেই সে চলে। যাত্রাটা শুভ কি অশুভ, নিরাপদ কি বিপৎসঙ্কুল সে চেতনা থাকে না তার। একদা ব্রাউনিঙের গুটিকতক কবিতার তর্জমা করেছিলাম এই অন্ধ আবেগের প্রকোপে। এটা অসমসাহস নয়, যাত্রাপথের বিঘ্নবাধা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অজ্ঞানের মত নির্ভীক কে?

কোন দিন সাহিত্যিক ছিলাম না তবে একটু আধটু বিলাতী কবিতা পড়তাম বটে। কে না পড়ে আজকালকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে? তবে এক হিসাবে আমরা সকলেই কবি। আমাদের অল্পাধিক রসবোধ আছে এবং জীবনে অলব্ধির মধ্যে কাল্পনিক লব্ধির বা wish fulfilment এর দিবাস্বপ্ন কিছু কিঞ্চিৎ সকলেই দেখে থাকি। কবির প্রভাব আমাদের এই স্বপ্নদৌর্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে অন্ধ অনুভূতিটা মনে জাগে, অথচ মুখ ফুটে বলবার শক্তি নেই, সেই বোবার ভাষার আস্বাদ পাই তাঁর রচনায়। তিনি আমাদের মনের কথাটা শুধু যে টেনে বলেন তা নয়, এমন অনেক কিছু প্রকাশ পায় তাঁর রচনায়, যা হয় ত আমাদের অভিজ্ঞতা বা চিন্তার এলাকার ভিতর পাই নি, তবু তার অনির্বচনীয় মাধুর্যে রূপকথার মতই আমাদের অপোগণ্ড চিত্তকে অভিভূত করে। আমাদের জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ণতার মধ্যেই ত অকাল শিশুত্ব অন্তর্গূঢ় হয়ে থাকে। সংসারের পোড়-খাওয়া বিষয়বুদ্ধি আমাদের কিলিয়ে কাঁঠাল-পাকা করলেও, নিতান্ত দরকচা-পড়া মন যার নয়, তার মধ্যে আনাচে কানাচে একটু নবীনতা সরসতা লুকিয়ে থাকে। যার যেখানে একটি ব্যথার সাড় আছে, কবির দরদী স্পর্শ ঠিক পড়ে সেইখানটিতে। অমনি আমরা শিউরে উঠি। তাই সর্বদেশে সর্বকালে কবিকে আমরা চিনি আত্মিক অনুভূতির কল্যাণে ও অভিনব স্বপ্নকল্পনার উদ্দীপনায়।

প্রত্যেক মানুষ তার পরিবৃতি, পূর্বসংস্কার ও আত্মস্বজনের সমষ্টি। ভাষার ব্যবধানের চেয়েও এই মৌল পার্থক্য অনেক বেশী। কিন্তু উভয়কে অতিক্রম ক'রে একটা সার্বভৌমিক মানবতা আছে যেখানে আমরা সকলেই বিশ্বমানবীয়। পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হয় এই দেশকালাতীত মানবাত্মিক লোকে। ইংরেজী ভাষা ব্যবহারিক হিসাবে আমাদের কতকটা আয়ত্ত হ'লেও তার পরিস্থিতির আসল রূপটি আমাদের অনেকটা অগোচরেই থাকে। তবু যেটুকু আভাস পাই চিন্তা ও ভাব রাজ্যে তার মূল্য ও প্রভাব অপরিসীম।

আর্থিক জগতের সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা চলে দেশী টাকা পয়সাকে বিদেশী মুদ্রার নিরিখে বেঁধে দিয়ে। এ বাজার দরের উঠ্তি পড়্তি আছে। তবু লেন-দেনের একটা পাকা ব্যবস্থা সচল ভিত্তির উপর অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নতুবা চঞ্চলা লক্ষ্মী বাণিজ্যে তাঁর অটল আসনখানি পাততে পারতেন না। আমাদের অন্তর্লোকের বাণিজ্য চলে ভাষার রূপান্তরিত অনুবাদের ভিতর দিয়ে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও তথ্যাদির পরিচয় এই তর্জমার সাহায্যে ভালই চলে। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবিকৃত ভাবেই দেশদেশান্তরে প্রচারিত হ'তে পারে এই অনুবাদের আনুকূল্যে। কিন্তু কাব্যের অনুবাদে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। কারণ কাব্য কেবল তথ্য ও তত্ত্বাত্মক নয়, রসস্বরূপ ও তৃপ্তিহেতু। মূলকবির ভাব ও চিন্তা কি, এইটুকু বলতে পারলেই তার সব বলা হ'ল না। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে যাকে 'প্রসাদগুণ' বলে, সেটাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ। এই স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি ফুটোতে হবে অনূদিত ভাষার আঙ্গিক ও আত্মিক ব্যঞ্জনায়। এই জন্যে কবিতার অনুবাদে মূল ভাবটি বজায় রেখে তাকে নবজন্মান্তরে উত্তীর্ণ করতে হবে নবদেহে। বহিরাকৃতির সঙ্গে কচিৎ হয়ত প্রাক্তন ছন্দ যতির সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা গৌণ। ছন্দের তাল মান লয় বেঁধে দেয় কথার হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ ও দ্রুত বিলম্বিত গতির ঝঙ্কার। স্বদেশী ও

বিদেশী কথার মধ্যে যেখানে কোন জ্ঞাতৃত্বই নেই সেখানে বিদেশী ছন্দানুবর্তী দেশী বাক্যগুলি ভাবের গণ্ডগোল উৎপন্ন করবে। পায়ের মাপে জুতো না হয়ে যদি জুতোর মাপে পা ছাঁটতে হয় তবে পদরাজ্যে আপদেরই সৃষ্টি হবে। আসল লক্ষ্যের বিষয় মূল কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব। নব রূপায়নে তার আকৃতি ও সৌষ্ঠব গঠিত হবে নব উপাদানের সমীকরণে। এক কথায়, অনূদিত কবিতাটি হবে রূপ ও রীতি হিসাবে সম্পূর্ণ নূতন কবিতা। তার অন্তর্গুহাবাসী জীবাত্মাটি হবে মূল কবিতার প্রেতাত্মা।

প্রাণ বলে 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর'। আরও গোড়ার কথা হচ্ছে এই, মূল কবিতা কিংবা তার অনুধ্বনি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' কি না। বিলাতে এক মেলায় লক্ষ্যভেদের খেলা দেখেছিলাম। বন্দুকের গুলিটা Bull's Eye বা শরব্য বিন্দুটি ভেদ করলেই অমনি পিছনে একটা ঘণ্টা বেজে উঠত। যে-কবিতা পাঠ করা মাত্রই অন্তস্তলে গিয়ে পৌছয়, প্রাণে অমনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রশস্তি জাগে, তার এই আনন্দ সৃজনী উদ্দীপনাই তার শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। মনের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনার রেখায় সে আপনার স্বাক্ষরটি লিখে দেয়।

এক স্তর কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে তার উপর অতসী কাচে কেন্দ্রীভূত রবিরশ্মি যদি ফেলা যায়, তবে দেখতে পাই সেই খরদীপ্ত আলোকবিন্দুটি কখনো পাঁচ-ছ'খানি কাগজ পুড়িয়ে ফুটো করে, কখনো বা প্রথম স্তরেই তার উত্তাপ ফুরিয়ে যায়। এই তারতম্য নির্ভর করে মেঘ-নির্মুক্ত বা মেঘলা আকাশের ঔজ্জ্বল্যের উপর। এই penetrating power বা অন্তর্ভেদী শক্তিই বোধ করি উৎকৃষ্ট কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। কোন কবিতা মর্মান্তে পৌছয়, কোনটি খানিকটা প্রবেশ লাভ করে, কোনটি বা ভিতরে ঢুকতেই পারে না।

মূল কবিতার মর্মস্পর্শিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তার ছন্দে, বাঙমাধুর্যে ও association বা সঙ্গোপাঙ্গিক বিচিত্র ইঙ্গিতের দ্যোতনায়। এই আনুশাব্দিক ব্যঞ্জনায় কবি বাক্যের সহিত অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করেন। যে কবিতাটি পড়বামাত্র চিত্তকে বিদ্ধ করে, তার সেই মর্মভেদিতার অনুপাতেই মূল্য নিরূপিত হয় আমাদের অন্তরে। অনুবাদ বা মূল কবিতার যাচাই করি এই মনোহারিত্বের গুণে। মূল কবিতা পড়ে যে আনন্দ লাভ করা গেল তার অনুবাদে যদি সেইরূপ একটা হর্ষানুভূতি জাগে তবে বলব অনুবাদ সার্থক হয়েছে। নতুবা সেটা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র, রসঋদ্ধি লাভ করে নি। সুতরাং কাব্য হিসাবে নগণ্য।

শ্রেষ্ঠ কবিতা দুর্লভ রত্নের মতই অপ্রতুল। যে কোন বড় কবির লেখা গড়ের উপর সাধারণ শ্রেণীর কবিদের রচনার ঊর্ধ্বে থাকলেও, সে গিরিরাজির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবল-গিরির সংখ্যা খুব বেশী নয়। যথার্থ কাব্যরসিকদের ভোট সংগ্রহ করলে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবে ক'টি? প্রশ্ন এই, এগুলির অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে কি না? উত্তরে বলি, হাঁ—উৎপৎস্যতে যদি কোঽপি সমানধর্মা, সমকক্ষ অনুবাদক যদি জোটে। যে-কবিতা অনুপ্রাণনা এনেছে, ফলাফলের দিকে দৃকপাত ক'রে ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে সেটি তর্জমা করবার চেষ্টায় অনুবাদক কৃতার্থ হবেন। কৃতিত্ব কতটা অর্জন করলেন না করলেন, তার বিচার মরমী পাঠকের হাতে।

ইয়োরোপে কোন ভাল বই প্রকাশিত হলেই অমনই সেটা নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যায়। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" আঠারোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ওই মহাদেশে।

আমাদের দেশে অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার ক্ষেত্র পড়ে আছে। এই ক্ষেত্রের অগ্রণী কবি সত্যেন্দ্রনাথ "তীর্থ-সলিল" সংগ্রহ করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। "রবিবাসর" সহিত্যসেবকমণ্ডলী। তাঁরা স্বতঃ-পরতঃ এ বিষয়ে যত্নবান হ'লে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হ'তে পারে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিরা অনেকেই কিছু না কিছু কাব্যানুবাদ ক'রে মাতৃভাষার সম্পদ বাড়িয়েছেন।

আজ পৃথিবী জুড়ে ভাঙনের মড়মড়ানি জেগেছে। এ সময়ে কাব্যচর্চা করাটা কেউ কেউ বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরা ভাবেন কাব্যের মধ্যে আছে কেবল ভাব-বিলাস। অন্নসমস্যাক্লিষ্ট এই দেশে, বহ্নিমান্ রোমের সামনে নীরোর বেহালা বাজানোর মতই নির্মম। অকর্মণ্যতার গ্লানির মধ্যে এরূপ মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সকলের প্রাণেই কবির গানের ঝঙ্কার বাজে—

> "থাক বীণা মালতী মালিকা,
> পূর্ণিমা নিশি মায়া কুহেলিকা,
> এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
> এসো গো মরণ সাধন।"

কিন্তু একথাও ঠিক, কবির বাণী চিত্তকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমন তো আর কিছুতে করে না। ব্যক্তিগত

জীবনের বিঘ্ন বিপত্তি অক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য আনে উদ্দীপনা। ইংরেজী তর্জমার ভিতর দিয়ে যখন জাপানী কবির অগ্নিময়ী বাণী শুনি—

রাখো বীণা বেণু পুঁথি পাতাড়ি তোলো
অবসর ভরা রুদ্ধ দুয়ার খোলো
লহ তরবারি ভল্ল ভিন্দিপাল,
অধ্যয়নের, গানের ফুরালো কাল।

পল্লী জননী ওই দেখ ঘরে ঘরে
খুলি কেশপাশ সুখে বিক্রয় করে
বসনভূষণ যত আছে নিঃশেষে
পতিপুত্ত্রেরে সাজাতে যোদ্ধৃ বেশে।

কৃপণের মত গণনা করেছে কেবা
দানের বহর? মাতৃভুমির সেবা
করিব জীবন মরণের পণ করি
রাজা ও রাজ্য রক্ষিব অসি ধরি।

—তখন কি কবিকে বলা চলে থাক্ তোমার কবিতা। চরকা নাও সুতো কাটো?

মানুষ মাত্রেই চরকা কাটে। সে কর্মসূত্রে কেউ বোনে খদ্দর, কেউ বনমালীর পীতাম্বর, কেউ ম্যাজিক্ কার্পেট, কেউ বা পাকায় তার উদ্বন্ধনের গলরজ্জু। কবির স্থান আমাদের অন্তরে। তার বাণী হয় অমৃতময় যদি তার পশ্চাতে থাকে সত্যানুভূতির প্রাণস্পন্দন। যে-দেশ মরণাপন্ন তার জীবন সঞ্চারের জন্যই ত চাই কাব্যের মৃত-সঞ্জীবনী ধারা।

কিছু দিন পূর্বে পোল্যাণ্ডের গুটিকতক কবিতার ইংরেজী তর্জমা আমার হাতে পড়েছিল। মনে আছে সেই পুস্তিকার ভূমিকায় পড়েছিলাম, পোল্যাণ্ডের সৃজনীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছিল সেই শতাব্দীতে, যে শতকে ইয়োরোপের মানচিত্র থেকে তার নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছিল। উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দ পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আত্মবিসর্জনের যুগ। এই যুগেই কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পীর অভ্যুত্থান। এইখানে পোলিয় কবি জিগমেণ্ট ক্র্যাসিন্‌স্কির "প্রতীক্ষা" শীর্ষক একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

প্রতীক্ষা

(Z. Krasinski's Waiting for Sunrise হইতে)

বসে আছি প্রতীক্ষায়, মুক্তিপথে কবে মোর স্বদেশী সেনানী
লভিবে অবাধ গতি, দাসত্বের অবসান হবে চিরতরে।
সমুৎসুক আঁখি পরে নবরবি সুপ্রভাত কবে দিবে আনি,
পূর্বাশার পানে তাই চেয়ে আছি অশ্রুজলে আঁখি অন্ধ করে।

গৌরব মণ্ডিত সেই শুভদিন আসে ধীরে মন্থর চরণে,
আজি বর্তমানে হায় স্বদেশের শব দেহে হেরি কৃমিকীট,
দেব মন্দিরের চূড়া পড়ে ভাঙি' দুরাত্মার বজ্র প্রহরণে।
কবে নেহারিব নব সবিতারে! আঁখি জলে ঘনায় প্রাবৃট।

অফুরান বর্ষাবলি ভেসে আসে ভেসে যায় কালের প্রবাহে,
আশা মায়া মরীচিকা, মরুবক্ষে প্রসারিত চিত্রলেখা তার,
ক্ষতি ত্যাগ সহি নিত্য, সাফল্যের আশা কভু ফলিবে পুণ্যাহে
নবীন অরুণরাগে? নয়নে ঘনায় আঁখি অশ্রু বরষার।

ব্যর্থ স্বদেশানুরাগ, কালকূট করিপান হিংসার ভৃঙ্গারে,
আলোক-বুভুক্ষু চক্ষে জাগে শুধু অন্ধকার জগের নিশীথে,
পরাধীন শুধু মোরা, আর সবে ঋদ্ধিমান্ পূর্ণ স্বাধিকারে,
জাগি নবভানু লাগি', হারাই চোখের দৃষ্টি কাঁদিতে কাঁদিতে।

বিদেশী কবিতার তর্জমায় শুধু যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হবে তা নয়। এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা অভিনব শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করবে। আমরা যেমন বেশী কথা বলি, জাপানী বা চীনা তেমনি স্বল্পভাষী। জাপানী 'হক্কু' কিম্বা তজ্জাতীয় বালখিল্য কবিতাগুলি নিতান্ত বাক্যবিরল। তিন লাইন ও পাচ লাইনের কবিতা সতেরো ও পঁয়ত্রিশ syllable বা শব্দাংশে রচিত। মূল জাপানী কবিতা ত আমার চোখে হিজিবিজি মাত্র। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদের দু-চারিটি লাইন পড়লে প্রাণে মৌতাত লাগে।

আমি যাত্রী প্রেমপথে, গতি নিরুদ্দেশ;
যেখানে তোমারে পাব সেথা যাত্রা শেষ।

প্রাণ যাকে চায়, কোথায় সে? হয়ত কাছে, হয়ত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, হয়ত বা অন্তরেই। যেখানেই হোক, প্রেম পরিক্রমার পূর্ণচ্ছেদ রয়েছে লব্ধির সমাপ্তিতে।

দরদের কি মধুর ছবিটি দেখুন—

ছিঁড়িও না ফুলটিরে।
এসেছে অলিরা, কেঁদে তারা যাবে ফিরে।

সর্বহারার বেপরোয়া উক্তি—

নীড় পুড়ে গেছে? যাক্ না!
এ পাখীর আছে পাখ্ না।

অনন্ত আকাশ তার বিহার ক্ষেত্র। বনে বনান্তরে তার নবকুলায় রচনা স্বাবলম্বী পক্ষ দুটির প্রসাদে।

রূপসীর কদর্য অভিরুচিতে কবির বিতৃষ্ণা—

ময়ূর যখন সাপ ধরে ধরে খায়,
পেখমের মোহ এ নয়নে টুটে যায়।

জাপানী কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সুন্দরকে বীভৎস ক'রে তুলেছে একটি ছত্রে।

আর একটি ছবি দেখুন -

তিমির কলাপী গুটাল' পক্ষ তার
তারকা খচিত বিপুল পুচ্ছভার
লুটায়ে গগনে ধীরে ধীরে চলে যায়,
কাঁদি নিশিভোর অসহ প্রতীক্ষায়।

আঁধার রাত্রি ময়ূরের মত পেখমগুটিয়ে আকাশভরা অন্ধকার যেন ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যায়। ব্যর্থ প্রণয়ীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা অশ্রুবন্যায় যায় ভেসে। নিশান্তের এই বিরহ-চ্ছবিখানি কথার আড়ালে ভোরের আকাশ ভ'রে ফুটে ওঠে।

কর্মৈষণার মূলে আছে আদর্শের প্রবর্তনা, আমাদের শক্তিপ্রস্রবণ (বিজ্ঞানীরা Ductless gland-এর secretion বলেন)। আজ যেটা স্বপ্ন কল্পনা মাত্র, কাল সেটা দানা বাঁধে সঙ্কল্প ও সাধনার বীজে, উদ্ভিন্ন হয় সাফল্যের কর্মক্ষেত্রে। এ-কথাটা বিশ্বাস করি ব'লেই মন যখন বলে—"বয়োগতে কিং কবিতাভিলাসঃ ?"—তখন প্রাণ বলে, স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ'। তিনি কবি, তাঁর সৃজনলীলার ছন্দসুর ঝঙ্কৃত আমাদের হৃৎস্পন্দনে। তিনি মনীষী, মনের নিয়ন্তা। তাই যথা 'নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' বুদ্ধেরও ঘাড়ে ধ'রে তাকে কাব্যচর্চা করান। তিনি পরিভূঃ সবার উপরে। এই শ্রেষ্ঠত্বের আভাস মানুষ পায় রসানুভূতিতে। হিংসা দ্বেষ জর্জরিত সংসারে তাই সে বলে—

"সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ।"

জীবমাত্রই আজন্ম আনন্দপন্থী। যে পথেই হোক, সে যখন আনন্দের অধিকারী হয়, তখন সে ক্ষুদ্রত্বের সীমাকে অতিক্রম করে যুক্ত হয় নিখিলমানবের সঙ্গে। তখন বিজ্ঞানী হন বিজ্ঞানানন্দ, ভক্ত হন প্রেমানন্দ, দেশপ্রেমিক হন দেশানন্দ। এঁরাই ত সজ্জন। এঁদের সান্নিধ্য আমরা ঘরে ঘরে পাই পুস্তকাকারে। অনুবাদের সাহায্যে প্রাচ্য ঋষিদের সঙ্গে প্রতীচ্যের মহাপুরুষদের বাণীময় মূর্তি প্রত্যক্ষ করি আমাদের পুঁথিশালায়। তিনি স্বয়ম্ভুঃ। এ সত্যের পরিচয় পাই আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে আত্মসৃজনের রহস্যে। মানুষ ইহজন্মেই আপনাকে উর্ধ্বাধো যোনিতে ভূমিষ্ঠ করে আত্মকর্ম ফলে। রূপ থেকে রূপান্তরেও জন্ম থেকে জন্মান্তরে পুণ্য পাপের ভিতর দিয়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করে চলেছি। অনন্তজ আমরা। সংখ্যাতীত জন্ম আমাদের এই স্বয়ংসৃষ্টির লীলায়। রূপ থেকে যেমন অপরূপে উন্নীত করি আপনাকে, তেমনি আবার পঙ্ক হ'তে পঙ্কিলতম বীভৎসতায় পরিণত হই নরকের কৃমিকীটে। কাব্যানুবাদের ভিতর দিয়ে সর্ব দেশের সর্ব কালের কবিদের বাংলার বাণীপীঠে কেবল উপনীত করি না, সেই সঙ্গে এই রসসাধনায় নিজ নিজ অন্তরে শক্তি ও আনন্দের উৎস আবিষ্কার করি।

সব শেষে একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শান্তিনিকেতনে বিদেশী বিদ্বান ও বিদুষী অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁদের ও বাংলার কবিদের নিয়ে যদি একটি অনুবাদ সমবায় বিভাগ খোলা যায়, তবে "অন্ধ পঙ্গুর" ন্যায় এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। রসগ্রাহী বিদেশী অধ্যাপকরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের সেরা কবিতার কথাগুলি যদি হুবহু ইংরেজীতে তর্জমা করে দেন এবং সেই সঙ্গে কথার অস্পষ্টতার আড়ালে যে ভাব বা ইঙ্গিত অব্যক্ত আছে সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ সুসাধ্য হ'তে পারে। এই সঙ্গে একজন সাহিত্য-রসিক ইংরেজকে যদি পাওয়া যায়, তবে ত পাথরে পাঁচ কিল। আমরা মোটামুটি দোভাষী - ইংরেজী ও বাংলায়। ইংরেজী ভাষাকে এ ক্ষেত্রে যখন ভাববিনিময়ের medium বা সেতুস্বরূপ করতে হবে, তখন একজন ইংরেজের মধ্যস্থতায় নেতির ভিতর দিয়ে তদিদমে পৌঁছবার অনেকটা সুবিধা হবে, অর্থাৎ তিনি বিদেশী ও আমাদের অপটু ইংরেজী প্রতিবাক্যের বদলে ঠিক লাগ-সই কথাটি যোগাতে পারবেন।

রবিবাসর যদি শান্তিনিকেতন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই অনুবাদ কাব্যসৃষ্টির ব্যবস্থা করবার জন্য উদ্যোগী হন, তাহ'লে হয়ত সুফল ফলতে পারে।*

---

* রবিবাসরের একাদশ বৎসরের দ্বাবিংশ অধিবেশনে পঠিত।

বর্ত্তমান লোকগণনা ও পতিতা-সমাজ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সম্পাদক—নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড

এবারকার (ইং ১৯৪১ সালের) লোকগণনায় বাংলা সরকার ওরফে হকমন্ত্রিমণ্ডলী নির্দ্দেশ দেন যে মুসলমানের জাতি জিজ্ঞাসা করা হইবে না; কিন্তু হিন্দুর বেলায় তাহার জাতি; উপজাতি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইংরেজী ১৯০১ সালের বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট পাঠে আমরা অবগত হই যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ৫৫টি জাতি আছে। বর্ত্তমান লোকগণনার প্রারম্ভে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে ব্যগ্রতাও প্রকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের জাতি জিজ্ঞাসা না করার কোন সুযুক্তি নাই। জাতি জিজ্ঞাসা করা হইল কেবলমাত্র হিন্দুর বেলায়—এ অনুজ্ঞা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড সকল হিন্দুকে তাঁহার জাতি সম্বন্ধীয় ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যেখানে হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে সেইখানেই তাহাকে সরকারী বাধা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে—যেন হিন্দুর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ। অনেক স্থলে গণনাকারিগণ, বিশেষ করিয়া মুসলমান গণনাকারিগণ; গণিত ব্যক্তির জাতি জানিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, এমন কি জাতি না বলিলে তাঁহাকে গণনা করা হইবে না, ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে ইত্যাদি ভয় দেখান হইয়াছে। যে-যে স্থলে গণনাকারীরা হিন্দুকে তাঁহার কথা মত হিন্দু বলিয়া লিখিয়া লইয়াছে, মুসলমান সার্কেল অফিসার, মুসলমান স্কুলের ইন্‌সপেক্টার, মুসলমান ডেপুটীরা জোর করিয়া নিজের ইচ্ছামত জাতি বসাইয়া দিয়াছে। এই জাতি বসাইবার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে যাঁহারা তপসীলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের আমলে আইসেন তাঁহারা বিশেষ করিয়া নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। অনেক বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিও নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের নামের পদবী দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি লেখা হইয়াছে। পদবী গুপ্ত বা সেন দেখিলেই তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া লেখা হইয়াছে—কি সুন্দর তথ্য সংকলনের ব্যবস্থা!! তপসীলী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে অনেক স্থলে তাঁহার পদবী দেখিয়া জাতি নির্ণয় করা চলে না, সেজন্য মনযায়ী তাঁহার জাতি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে—উত্তর বঙ্গে রাজবংশী, মধ্য-বঙ্গে নমঃশূদ্র; দক্ষিণ-বঙ্গে পোদ ইত্যাদি। মেদিনীপুরে বহু হিন্দুকে জোর করিয়া মাহিষ্য লেখা হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে পতিতাদের স্থান নাই বলিলেই হয়—তাহাদের জাতি নাই। যাহারা স্বয়ং পতিতা তাহাদের পূর্ব্বে জাতি ছিল; কিন্তু এক্ষণে জাতি নাই। ইহাদের পীড়াপীড়ি করিলে বড় জোর পূর্ব্ব জাতির উল্লেখ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা পতিতা গর্ভসম্ভূতা তাহাদের কি জাতি হইবে? বাংলা-সরকার কি ইহার উত্তর দিবেন? ইহারা যদি নিজেদের কেবলমাত্র "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দেয় ত কি দোষ হয়? তথাপি ইহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছিল, স্ত্রীলোক বলিয়া অব্যাহতি পায় নাই।

পতিতাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেখাইবার ব্যবস্থা আরও উত্তম। তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদের অনেক স্থলে মুসলমান বলিয়া লেখা হইয়াছে। এ-বিষয়ে পতিতাদের নিকট হইতে নিখিল বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড যে কয়েকটি অভিযোগ পাইয়াছে তাহার একটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"যে সমস্ত পতিতা মুসলমান বাবুদের ভরণপোষণ গ্রহণ করেন; এবং যাঁহাদের আদুরে নাম মেহের, আনার, সারা, সেরা, আঙ্গুর, ডালীম, সাকী, দুলা, আয়সা, পোখরাজ ইত্যাদি, জন্মগত অধিকারে হিন্দু হইলেও গণনাকারিগণ মুসলমান বলিয়া লিখিতেছেন। অর্থলোভে পতিতারা

মুসলমান বাবুদের অর্থ গ্রহণ করে মাত্র কিন্তু সমাজে এখনো মুসলমান সংস্পর্শজনিত লজ্জা অনুভব করে।"

উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা যায় যে হিন্দু মহাসভার ডাক কত দূর অবধি কি গভীর ভাবে পৌছিয়াছে।

সমাজের কল্যাণের জন্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য সমাজের হিতকামী ব্যক্তিগণের জানা দরকার যে আমাদের দেশে কত জনা পতিতা। কিন্তু পতিতাদের সঠিক সংখ্যা জানা বা তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা জানা নানা কারণে দুরূহ। আমরা কলিকাতার— নং ওয়ার্ড হইতে যে চিঠি পাইয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম। ইহা হইতে সঠিক সংখ্যা জানা কেন ও কিরূপ দুরূহ তাহা বেশ বোঝা যাইবে।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়, আমি পতিতালয়সম্ভূতা, আমার পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তবে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করি। আমাদের সমাজে আমরা সংঘবদ্ধ হোতে পারি নি তাই হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সাহস ও বিশ্বাস হয় না। লোকগণনার সময় অনেক কারণে আমাদের সঙ্কুচিত হতে হয়। এবার দেখছি লোকগণনা বিশেষত্বপূর্ণ, মুসলমান বাবুরা গণনাকারী আসিবামাত্র আগুয়ান হয়ে নাম লেখাতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের পাড়ায় তত বেশী সুবিধা হয় নি। আমাদের চার্জ্জ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—বাবুকে টেলিফোনে জানাবো ভেবেছিলাম। ডেকে কিন্তু তাঁকে পাই নি। আমার মনে হয় বাস্তবিক আমরা সংখ্যায় যতগুলি তার এক তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যা ও গণনা সম্ভব হয় নি, তার কারণ নিম্নে কয়েকটি মাত্র দিলাম। আমার মনে হয় আমাদের মত নারীর সঠিক সংখ্যা সমাজের চক্ষে প্রকাশ না হওয়াই ভাল। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিবেদিকা

জনৈকা হিন্দু পতিতা

১। পতিতালয়ে কন্যা সন্তানের নাম লেখান সম্ভব নয় কারণ পতিতালয়ে কুমারী মেয়েদের অবস্থান আইন-বিরুদ্ধ। পুত্র সন্তানদের জারজ প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা নাই। সন্তানবতী পতিতা হেয় প্রতিপন্না হয়।

২। সখের পুরুষ অর্থাৎ যাঁহারা পতিতালয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন তাঁহাদের নাম ও বিবরণ প্রকাশযোগ্য নহে। অথচ তাঁহারা সকলেই হিন্দু।

৩। কলিকাতার কোন পতিতা পল্লীতে অধিকাংশ বাড়ীতে কতগুলি লোক বাস করে তাহার সঠিক্ সংখ্যা লেখা হয় নাই। কারণ—

(ক) কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালী ভাড়াটিয়ার সংখ্যা সঠিক ভাবে দেন নাই, (খ) পতিতারা নাম, বয়স ও বিবরণ দিতে নারাজ। (গ) চাকরেরা ভাবী বিপদের ভয়ে সন্দেহক্রমে আত্মগোপন করে অথবা ভাসা ভাসা কথা বলে। (ঘ) অধিকাংশ পতিতালয়ে দাসদাসীর নাম লেখান হয় না।

এ সম্বন্ধে আপনাদের জানান কর্ত্তব্য মনে করি এবং অনুসন্ধান প্রার্থনা করি।"

এই চিঠিখানি দেরীতে আসায় ও উপযুক্ত লোকের অভাবে নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে পত্রে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

নিম্নে আমরা ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে পতিতাদের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য উদ্ধার করিয়া দিলাম।

পতিতার সংখ্যা

	১৯২১		১৯৩১
	পেষা পতিতা বৃত্তি	পোষ্য	পেষা পতিতা বৃত্তি
বর্দ্ধমান	৫,১২৬	১,৩৭২	৩,০৪১
প্রসিডেন্সী	১৬,৩৮৮	২,৭৩২	১১,৯৯৬
(কলিকাতা)	(৮,৮৭৭)	(১,৩৩০)	(৭,৪৪০)
রাজসাহী	৫,৬৯১	১,১৮৬	৩,৯৮৩
ঢাকা	৬,৮৯৫	১,৮৫৭	৪,৩৭২
চট্টগ্রাম	১,৫৯৪	২২৪	৪৩৭
বাংলা	৩৫,৯২১	৭,৪০৪	২৪,০৩৭

ইং ১৯০১ সালে সমগ্র বঙ্গে পতিতার ও তাঁহাদের পোষ্যবর্গের সংখ্যা ৫৯,৮১১ জন ছিল। ইং ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে পতিতাদের ও তাহাদের পোষ্যবর্গের সংখ্যা আলাদা করিয়া দেখান হয় নাই। ১৯২১ সালের বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টমসন সাহেব মন্তব্য করিতেছেন যে (১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট ৩৯৭ পৃঃ)—

"The number dependent on prostitution has fallen from 59,811 in 1901 to 43,333 in 1921, but it is still remarkably high. The actual number is almost certainly understated for there are in every country many more loose women than will admit to following the profession of prostitutes. Because there is some uncertainty in the return of those loose women who do not publicly advertise their profession, for example by living in the recognised prostitutes' quarters in the towns, it would perhaps be unwise to make too much of the decrease in the number of prostitutes in the country shown by the statistics of 1901 and of 1921, but the decrease has been so marked that it seems almost certain that there must have been a large reduction."

১৯৩১ সালের সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পোর্টার সাহেবের মতে যদিও পতিতার সংখ্যা ৩৫,৯২১ হইতে কমিয়া ২৪,০৩৭এ দাঁড়াইয়াছে তথাপি তিনি কোনও মন্তব্য করেন নাই। বোধ হয় গণনার ভুল-ভ্রান্তির কথা চিন্তা করিয়া কোন মন্তব্য করিতে সাহস করেন নাই।

১৯২১ সালের তথ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে ৩৫,৯২১ জন পতিতাদের মধ্যে পোষ্যের সংখ্যা হইতেছে ৭,৪০৪ অর্থাৎ শত করা ২০ জন; কিন্তু সমগ্র বঙ্গের সকল প্রকার লোকেদের মধ্যে 'খাটিয়ের' তুলনায় পোষ্যের সংখ্যা শতকরা ১৮৫ জন করিয়া। পোষ্যের সংখ্যা বা অনুপাত পতিতাদের মধ্যে এইরূপ কম হইবার কারণ বোধ হয় পতিতালয়ের কন্যা-সন্তান বা পুত্র-সন্তানদের নাম না লিখান। কেহ কেহ এই আপত্তি তুলিতে পারেন যে পতিতাদের মধ্যে সন্তান-সংখ্যা খুব কম, সেই জন্য পোষ্য-বর্গের সংখ্যাও অল্প। এই কারণেও পোষ্যের সংখ্যা অল্প হওয়া বিচিত্র নহে। আমরা যদি সকল পতিতাদের ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের ধরিয়া লই, তাহা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানসংখ্যা (অর্থাৎ পোষ্যবর্গের সংখ্যা) সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐ বয়সের সন্তানসংখ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট কম। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রতি ১০০ শত বিবাহিতা ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের অনুপাতে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানের হিসাব গত তিনটি আদমসুমারীতে যাহা ছিল তাহা নিম্নে দিলাম। যথা:—

প্রতি ১০০ বিবাহিতা ১৫-৪০ বৎসরের স্ত্রীলোকের অনুপাতে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানের সংখ্যা:—

	১৯৩১	১৯২১	১৯১১
বাংলা	১৭০	১৭২	১৮১

একথা জোর করিয়া বলা চলে যে পতিতাদের মধ্যে অনেক সন্তানের নাম সেন্সাসে লেখান হয় না।

পতিতারা সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার শতকরা '১৫ ভাগ। কিন্তু যাহারা জেল খাটিতেছে এইরূপ স্ত্রী-কয়েদীদের মধ্যে পতিতাদের শতকরা অনুপাত হইতেছে ৮'৭। অর্থাৎ সাধারণ লোকের তুলনায় ইহাদের অপরাধপ্রবণতা ৫৮০ গুণ বেশী।

ইংরেজী ১৯২১ সালে পতিতাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা দিলাম। ইং ১৯৩১ সালে ঐরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। তালিকাটি এই:—

পতিতা ও পোষ্যবর্গের সংখ্যা (১৯২১)

সকল ধর্ম্ম	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টিয়ান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
৪৪,৩৩৩	৩১,২১৪	১১,৯৩৬	৮৩	৩৬	৬৪

হিন্দুরা ১৯২১ সালে লোক-সংখ্যার শতকরা ৪৩'৭ জন ছিল। আপেক্ষিক (relatively) হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে পতিতার অনুপাত মুসলমানদের অপেক্ষা ৩'১ গুণ বেশী। ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে গৌরবের নহে। বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ইহার একটি বিশেষ কারণ বলিয়া মনে হয়। ইং ১৯২১ সালে হিন্দুদের মধ্যে ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের বিধবার সংখ্যা ছিল ১,০০৮,০০০; আর মুসলমানদের মধ্যে ছিল ৬২১,০০০ অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে বিবাহযোগ্য বয়সের বিধবার সংখ্যা মুসলমানদের অপেক্ষা ১'৬ গুণ বেশী। তথাপি হিন্দুদের মধ্যে পতিতাদের অনুপাত ১'৬ গুণ বেশী না হইয়া ৩'১ গুণ বেশী। ইহার কারণ মুসলমানদের মধ্যে যাহারা বিধবা হন তাঁহাদের পুনর্বিবাহের আশা আছে এবং তাঁহাদের অনেকেই পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আমরা ১৯২১ সালের ভারতবর্ষের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নের কোষ্টাটি তুলিয়া দিলাম:—

প্রত্যেক ১,০০০ মুসলমান নারীর মধ্যে

বয়স	বিধবা স্বরূপে	দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রীরূপে
০—৫	১	০
৫—১০	৪	০
১০—১৫	১৮	১০
১৫—২০	৪১	৪০
২০—২৫	৬১	৭০
২৫—৩০	১০৬	১১৫
৩০—৩৫	৩২১	১২৫
৩৫—৪০	১০৫	৬০

পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা যে বয়সে খুব সম্ভব, সেই বয়সকে যদি আমরা ১৫ হইতে ৩০ ধরিয়া লই তাহা হইলে আমাদের খুব ভুল হইবে না বলিয়া মনে করি। ঐ ঐ বয়সের বিধবার সংখ্যা ২০৮; আর ঐ ঐ বয়সের দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রীরূপে যাহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা ২২৫। অর্থাৎ ৪৩৩ জন বিধবার মধ্যে ২২৫ জন পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। যাহারা বিধবা রহিয়াছেন তাঁহাদের তুলনায় মোট বিধবার সংখ্যা ২'১ গুণ।

পূর্ব্বোক্ত ১'৬ গুণকে যদি আমরা নবপ্রাপ্ত ২'১ দিয়া গুণ করি তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের

অপ্রচলন হেতু পতিতার সংখ্যা বা অনুপাত মুসলমানদের অপেক্ষা ৩'৪ গুণ দাঁড়ায়। আর প্রকৃতই ৩'১ গুণ।

আরও একটি কারণে হিন্দুসমাজে পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। যদি কোনও নারী বলপূর্ব্বক অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়, তাহার স্বগৃহে বা স্বসমাজে বড় একটা স্থান হয় না। এই সকল নারী অবস্থা গতিকে অনেক সময় পতিতাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে পতিতাদের সংখ্যা সঠিক ভাবে সেন্সাসে লিখিত হয় না, এবং সঠিক ভাবে লিখিত হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে। পতিতাদের মধ্যে পোষ্যবর্গের বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সংখ্যা খুব কম—ইহার অনেক কারণ অনুমিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে যে কোনও কারণেই হউক পতিতার সংখ্যা বা অনুপাত খুব বেশী। আর এই বিষয়ে সমাজে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এই সংখ্যা-স্ফীতির সাহায্য করিতেছে বলিয়া মনে করিবার যুক্তিযুক্ত হেতু আছে। পতিতারা অধিকাংশই হিন্দু। হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান অত্যন্ত নিম্নে হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে হিন্দুত্ব বোধ খুব জাগ্রত। এই সব কথাগুলি ভাবিয়া দেখা খুব দরকার। আশা করি সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবেন।

হরি পণ্ডিতের কাহিনী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অজ পল্লীগ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত। কাঁচা-পাকা চুলগুলি খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার মধ্যে সরু একটি টিকি, রৌদ্রদগ্ধ কালো কপালে তিন-চারিটি রেখা, চোখ দুইটি উজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি তাহার তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। হরিনাথ চাটুজ্জের 'নাথ' এবং 'চাটুজ্জে' লোপ পাইয়া হরি পণ্ডিত বলিয়াই লোকটি এখানে পরিচিত।

গ্রামের জমিদারী কাছারী, কিস্তি বা খাজনা আদায়ের সময়—আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র—এই তিন মাসের কয়েক দিন ছাড়া, প্রায় খালিই পড়িয়া থাকে; এই জমিদারী কাছারীর বারান্দাতে পাঠশালা বসে। কিস্তির সময় পাঠশালা বসে গ্রাম-দেবতা বিল্ববাসিনীর প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড বটগাছটার ছায়ায়।

শীতকাল, মাঘ মাসের সকালবেলা। পূর্ব্বদুয়ারী জমিদারী কাছারীর বারান্দায় ইহারই মধ্যে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে; ছেলেরা আসিয়া আপন আপন চ্যাটাই পাতিয়া পড়িতে বসিয়া গেল। কাছারীর উঠানে জমিদারের স্নানের পাকা বেদীটির উপর বসিয়া হরি পণ্ডিত তেল মাখিতে-ছিল। টিকির গ্রন্থি খুলিয়া দুই হাতে টিকিতে তেল মাখাইতে মাখাইতে পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে বলিল, বয়েজ!

ইহার পর পণ্ডিত কোন্ প্রশ্ন করিবে—সে ছেলেদের সুবিদিত, ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে দুই পাটি দাঁত মেলিয়া প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিল—মেজেছি মশায়, মেজেছি।

পণ্ডিত তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে একটি ছেলেকে ডাকিল; তর্জ্জনীটি একটু নড়িল মাত্র। হরি পণ্ডিতের সঙ্কেতগুলির একটি বিশেষত্ব, মুখে কথা কয় কম; কেহ অমনোযোগী হইলে পাশের ছেলের দিকে চাহিয়া হাতের মুঠাটি এক বার চকিত গতিতে ঘুরাইয়া দেয় মাত্র; সঙ্গে সঙ্গে সে অমনোযোগী সহপাঠীর কান মলিয়া দেয়। এই কর্ণমর্দ্দনের কঠোরতা কেমন হইবে, তাহাও তাহার ইঙ্গিতের মধ্যে সুস্পষ্ট। কঠোর হইলে হাতের মুঠা ঘোরে অত্যন্ত আস্তে এবং হাতের মুঠি বাঁধার মধ্যে ভঙ্গি থাকে সুদৃঢ়। পণ্ডিতের সাঙ্কেতিক ভাষার সহিত ছেলেদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং স্পষ্ট।

ছেলেটি উঠিয়া আসিতেই পণ্ডিতের হাতের আঙুল আর এক বার নড়িল, ছেলেটি শঙ্কিত ভাবে একবার ঠোঁট দুটি নাড়িল মাত্র, দাঁতগুলি চকিতের মত বিকশিত করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিল।

কঠোর স্বরে পণ্ডিত বলিল, খোল, খোল।

ছেলেটি এবার পরিপূর্ণভাবেই দন্ত বিকাশ করিয়া দিল ;—সত্যই ছেলেটি দাঁত মাজে নাই। পণ্ডিত ঘৃণাভরে থুথু ফেলিয়া কঠিন শ্লেষের সহিত প্রশ্ন করিল—দাঁত মাজিস নাই ?

ছেলেটি নীরব।

পণ্ডিত আবার প্রশ্ন করিল—দাঁত মাজলে ভাস--সদ লাগে না, না কি ? অর্থাৎ ভাত মিষ্ট লাগে না নাকি ? পরমুহূর্ত্তেই পণ্ডিতের কপালের রেখাগুলি সারি দিয়া দাঁড়াইল—উজ্জ্বল চোখের তীব্র দৃষ্টি তীব্রতর হইয়া উঠিল—কঠিন স্বরে আদেশ হইল—যাও, আভি যাও। রাগিলে পণ্ডিত হিন্দী বাত ব্যবহার করে।

পণ্ডিত শুধু পড়ায় না, যাহা পড়ায় তাই শেখায়। পাশের গ্রাম লোকপাড়া স্কুলের হেলু মাস্টারের মত বলে না—'দন্তধাবন করা উচিত, মানে দাঁত মাজা উচিত—আমরা পড়িয়ে খালাস। দাঁত মাজলে, না মাজলে সে দেখবে ছেলের বাবা।' কথাটা মনে পড়িলেই পণ্ডিত ঘৃণার হাসি হাসে। শিক্ষকের বৃত্তিকে যাহারা ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা অধিক ঘৃণা সে কাহাকেও করে না।

পণ্ডিত আবার এক বার ছেলেদের দিকে চাহিল—একটা ছেলে গভীর মনোযোগের সহিত বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। পণ্ডিত দুই পাশের দুটি ছেলের দিকে চাহিয়া হাতে মুঠি বাঁধিয়া ঘুরাইয়া মুঠা দুটি উপরের দিকে তুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটি মনোযোগী ছাত্রের দুই কান ধরিয়া তাহার মুণ্ডটি সোজা করিয়া টানিয়া তুলিল, ছেলেটা মুখ পর্য্যন্ত ধোয় নাই, চোখে পিঁচুটি, গালে লালার দাগ ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে।

পণ্ডিত হাসিল—নিষ্ঠুর হাসি। পণ্ডিতের শাসনে কৃত্রিমতা নাই। হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ইধার আও। কাম হিয়ার।

ছেলেটি ভয়ে ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পণ্ডিত তাহাকে আর প্রহার করিল না। শাস্তির প্রারম্ভে চুপ করিয়া থাকিলে পণ্ডিত তাহাকে রেহাই দেয় না, কাঁদিলে—কান্নার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকিলে আরও বিপদ; একমাত্র অকৃত্রিম ভয়ের কান্নায় পণ্ডিত নিষ্কৃতি দেয়। সে ছেলেটিকে বলিল—যাও। তাহার পর অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে পুকুরঘাট দেখাইয়া দিল।

ওদিকে ছেলের দল কলরব করিয়া উঠিল—ফট্‌কে কাপড় দিয়ে দাঁত ঘষছে মশায় ! থামের আড়ালে ওই দেখুন।

পণ্ডিত উঠিল। কিন্তু ফট্‌কের ভাগ্য ভাল—ওদিকে বিল্ববাসিনী-তলায় শাসনদৃপ্ত কণ্ঠে গোমস্তার চীৎকার শোনা গেল—তুমি মনে কর কি ? দেবোত্তর জমি ভোগ কর না তুমি ? দেবতার স্থানের এই অবস্থা !

পণ্ডিতের মুখখানা আরও কঠোর হইয়া উঠিল। ফট্‌কেকে দাঁত মাজিবার আদেশ দিয়া সে ঘড়া ও গামছা লইয়া স্নান করিতে বাহির হইয়া গেল। গোমস্তা বকিতেছে মণি পালকে। মণি পাল দেবোত্তর জমি ভোগ করে। তাহার জন্য তাহাকে দেবমন্দিরের উঠান পরিষ্কার করিতে হয়—পূজার ধূপ দীপ জোগাইতে হয়। শীতকালে বটগাছের পাতা ঝরিয়া উঠানটার উপর পড়িয়াছে—তাই গোমস্তার এই শাসন। মণিকে তিরস্কার শেষ করিয়াই গোমস্তা তাহাকে লইয়া পড়িবে। পণ্ডিতকেই গ্রাম-দেবতা বিল্ববাসিনীর পূজা করিতে হয়।

যাইতে যাইতে পণ্ডিত হাসিল—'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র' বিদ্যা—পৌরুষ—মিথ্যা। নতুবা ওই অসাধু ভণ্ড, মূর্খ গোমস্তার অধীনস্থ কৃপার পাত্র হইয়া থাকিতে হয় ! পণ্ডিত আবার হাসিল, ইহার জন্য তাহার কোন দুঃখ নাই, মধ্যে মধ্যে হাসি আসে।

* * *

হরি পণ্ডিতকে কাজ অনেক করিতে হয়। কাজগুলি এই পাঠশালার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

জমিদারের গ্রাম-দেবতা বিল্ববাসিনীর পূজা বিনা বেতনে করিতে হয়। জমিদার আসিলে পাচকের কাজ করিতে হয়। গ্রামের চাষীদের দলিল লিখিতে হয়। কাজ না-থাকিলে পণ্ডিত মানসাঙ্ক তৈয়ারী করে, পাটীগণিতের অঙ্ক কষে, শুভঙ্করীর আর্য্যা আরও সরল-সুগম করিয়া তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করে। উপলক্ষ পাইলে—সে কবিতাও রচনা করে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের করোনেশনে সে কবিতা লিখিয়াছিল—

রাজ-অধিরাজ পঞ্চম জর্জ্জ বস হে সিংহ-আসনে।
মস্ত বড় কবিতা।

হরি পণ্ডিত সে আমলের ছাত্রবৃত্তি পাস-করা শিক্ষক। ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া বৎসর দুয়েক ইংরেজী স্কুলেও পড়িয়াছিল। স্কুলে এক ইংরেজী ছাড়া সব বিষয়েই সে সেরা ছাত্র ছিল। বিশেষ করিয়া অঙ্কে। এখনও বড় বড় অঙ্ক পণ্ডিত মুখে মুখে করিয়া দিতে পারে। অঙ্কের পরীক্ষার দিন সাহায্যের জন্য সহপাঠীদের সে কাতর-মিনতি আজও পণ্ডিতের মনে আছে। কিন্তু হরি পণ্ডিত ছিল অত্যন্ত চতুর—সে ভুল অঙ্ক দেখাইয়া তাহাদের প্রতারণা

করিত। তাহার সহপাঠী—সেই জমিদারের ছেলেটা তাহার অঙ্ক টুকিয়া গোল্লা পাইয়াছিল। অবশ্য অন্যায় প্রাপ্য সে পায় নাই। পণ্ডিত হাসিতে হাসিতেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেই জমিদারের ছেলে আজ রায় বাহাদুর, জেলার বড় বড় সম্মানের পদে সে অধিষ্ঠিত।

—পণ্ডিত, আজ ষষ্ঠীর পূজোটি ক'রে দিও বাবা!

ঘাটের মুখেই রাধাবল্লভের মা খুদি মোল্লানী তাহাকে নিবেদন করিল। মোল্লানীর বারমেসে ষষ্ঠীর ব্রত।

পণ্ডিত বলিল—দেব। পাঠশালা সেরেই যাব।

পণ্ডিত আবার হাসিল। মা-ষষ্ঠীর দয়া অপার, মোল্লানী 'ছেলে-ছেলে' করিয়া যেমন তাঁহাকে বার মাস বিরক্ত করিয়াছে তেমনি মহামূল্য সন্তানরত্ন তিনি দিয়াছেন। এত বড় মূর্খ বোধ করি ভূ-ভারতে নাই। গাঁজার নেশায় চোখ দুটি চব্বিশ ঘণ্টাই লাল হইয়া আছে। সেদিন ঘণ্টাখানেক অখণ্ড মনোযোগে পরিশ্রম করিয়াও 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' বইটার নাম পড়িতে পারে নাই। তবু ইহাদের মন রাখিয়া চলিতে হয়। নানা স্থান হইতে তাড়িত হইয়া অবশেষে এইখানে আশ্রয় মিলিয়াছে। পূর্ব্বে হরি পণ্ডিত পাঠশালা করিত একখানি শহরতুল্য গ্রামে। রোজগারও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু দেশে 'গুরুট্রেনিং' পাস-করা পণ্ডিতের প্রচলন হইতেই—পণ্ডিত অপাংক্তেয় হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তার পর আরও দুই জায়গা হইতে এমনি ভাবে পদচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। পাঠশালার পণ্ডিতি পদের জন্য জমিদার আসিলে পাচকবৃত্তি করিতেও তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রস্তাবটা শুনিয়া হরি পণ্ডিত নীরবে মাথা হেঁট করিয়াই বসিয়া ছিল। গোমস্তা হাসিয়া বলিয়াছিল—আপনিও ব্রাহ্মণ, জমিদারও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি! না পারলে হবে কেন?

হরি পণ্ডিত বলিয়াছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়। হাতের আঙুলও আঙুল, পায়ের আঙুলও আঙুল। অতএব চড় এবং লাথি সংসারে একই বস্তু।

গোমস্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। হরি পণ্ডিত পরক্ষণেই হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—তাই হবে। ও আমি রহস্য করছিলাম।

* * *

পূজা হরি ঠাকুর করে—একেবারে যেন অত্যন্ত দ্রুত আবর্ত্তনশীল যন্ত্রের মত। মন্ত্রগুলি তাহার এত মুখস্থ যে লোকের কানে শব্দগুলি প্রবেশ করে মাত্র, অর্থবোধ করিবার অবকাশ পায় না। তাহার হাত দুইখানিও কাজ করে কলের মত। স্নানীয় জল হইতে পাদ্য পর্য্যন্ত তাহার কুঁষী, কোষা হইতে দেবতার মাথা পর্য্যন্ত ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মত আসে আর যায়, যায় আর আসে। পূজা শেষের ঘণ্টাটি পর্য্যন্ত বাজে ইলেকট্রিক বেলের মত।

পূজা শেষ করিয়া হরিঠাকুর আসিয়া পাঠশালায় জাঁকিয়া বসে। ছেলেরা এই সময়টার একটা চমৎকার নাম দিয়াছে; কে দিয়াছে, কবে দিয়াছে—সে ইতিহাস কেহ জানে না, কিন্তু নামটা চলিয়া আসিতেছে। হরিঠাকুর বিল্ববাসিনীতলা হইতে বাহির হইতেই—একটা ছেলে বলিল—আসছে।

সকলে সতর্ক হইয়া বই লইয়া বসিল। একটা ছোট ছেলে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া বলিল—মরণকাল, নয় বিশুদাদা?

ছেলেরা এই সময়টার নাম দিয়াছে মরণ-কাল।

হরিঠাকুর আসন গ্রহণ করিয়াই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিল—ফড়িং গেল কোথায়?

—আজ্ঞে মাশায়, তার বাবা তাকে ডেকে নিয়ে গেল মাশায়।

—বাবাই ছেলেটার মাথা খেলে! হরিঠাকুর দাঁতে দাঁতে করকষ করিয়া উঠিল। ফড়িং ছেলেটি গরীব চাষীর ছেলে—কিন্তু পড়াশুনায় পাঠশালার সেরা ছাত্র। এবার তাহাকে দিয়া পণ্ডিত বৃত্তিপরীক্ষা দেওয়াইবে।

একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—লোকপাড়ার পণ্ডিত এসেছে মাশায়।

হরিঠাকুর একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পাশের গ্রামের নাম লোকপাড়া। সেখানে একটি ভাল ইউ-পি স্কুল আছে। স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র ঘর, তিন জন শিক্ষক—বই, বোর্ড, ম্যাপ প্রভৃতি সরঞ্জামের অভাব নাই। প্রত্যেক বৎসরই—এল-পি, এবং ইউ-পি পরীক্ষায় লোকপাড়া স্কুলের ছাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকে। উহাদের কাজই এই—আশপাশের পাঠশালা হইতে ভাল ছাত্র ভাঙাইয়া লইয়া যায়, এবং লইয়া যায় ঠিক বৃত্তি পরীক্ষা দিবার বৎসরেই। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে হরিঠাকুরের তিনটি ছাত্রকে তাহারা ভাঙাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা বৃত্তিও পাইয়াছে। এবারও আবার ফড়িঙের জন্য তাহারা আসিয়াছে। হরিঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল ফড়িঙের বাড়ী।

সে শিখাইয়া পড়াইয়া ছাত্রকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবে আর লোকপাড়ার স্কুল তাহাকে লইয়া গিয়া নাম কিনিবে!

লোকপাড়ার শিক্ষকেরা ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে বলে কাক-পণ্ডিত। রং তাহার কালোই বটে, কিন্তু সে জন্য তাহারা তাহাকে কাক বলে না। কাকের পালিত কোকিল-শিশুকে এক দিন যেমন কোকিলে ডাক দিয়া লইয়া যায়, তেমনি তাহার ছাত্রগুলিকে তাহারা লইয়া যায় বলিয়াই তাহার নাম দিয়াছে কাকপণ্ডিত।

কিছুক্ষণ পরেই হরি পণ্ডিত ফড়িংকে লইয়া বিজয়গর্ব্বে ফিরিয়া আসিল। ফড়িংকে সে জয় করিয়া আনিয়াছে। লোকপাড়ার শিক্ষক মাসে তাহাকে এক টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিল—হরি পণ্ডিত সে টাকা দিবে স্বীকার করিয়াছে, উপরন্তু কাপড় জামার প্রতিশ্রুতিও সে দিয়াছে। লোকপাড়ার শিক্ষক ইহারও বেশী দিতে পারিত—দিতেও চাহিয়াছিল, কিন্তু ফড়িং কাঁদিয়া বলিয়াছে—না, আমি এই পাঠশালাতেই পড়ব।

ফড়িঙের বাপ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি হইলেও নির্লজ্জ লোভী নয়। সে লোকপাড়ার শিক্ষকের কাছে হাতজোড় করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়াছে।

হরি পণ্ডিত আসনে বসিয়া ছেলেদের পড়া লইতে সুরু করিল।

ফটকে, পারিপার্শ্বিক বানান কর।

ফটিক উঠিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল—পারিপার্শ্বিক?

—হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক।

ফটকে, যাহাকে বলে গাধা ছেলে, তাই। সে হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া 'পারিপার্শ্বিক' খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত প্রশ্ন করিল ফড়িংকে—ফড়িং!

ফড়িং টপ করিয়া বলিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ফড়িঙের কান ধরিয়া পিঠে একটি চড় বসাইয়া দিল।

ফড়িং হতভম্বের মত প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

গম্ভীর ভাবে পণ্ডিত বলিল—ফটকের পড়া হয় নাই কেন?

—তা আমি কি করব মশায়?

—দেখবে, তুমি দেখবে। তুমি অতি উত্তম বালক, তুমি দেখবে। সকলে যাতে পড়ে সে তুমি দেখবে!

পণ্ডিত হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আজিকার জয়ের আনন্দ কি ভাবে সে প্রকাশ করিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। হাসি থামাইয়া পণ্ডিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—যাও, আজ সব ছুটি।

সকলের ছুটি হইলেও ফড়িঙের ছুটি হইল না। ফড়িঙের বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হইল। অঙ্ক, ধারাপাত, মানসাঙ্ক, সাহিত্য।

ফড়িং সাহিত্যের বই খুলিয়া পড়িতেছিল—"অনেক দূরে সমুদ্রপারে স্কটল্যাণ্ড নামে একটি দেশ আছে। ডেভিড হেয়ার সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত বলিল—স্কটলণ্ড হ'ল ইংলণ্ড দ্বীপের একটি অংশ। এই ইংলণ্ডের যিনি রাজা—তিনিই হলেন আমাদের সম্রাট্।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর নাম পঞ্চম জর্জ্জ।

—হ্যাঁ। রাজা হলেন সাক্ষাৎ দেবতা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজা সকল দেবতার অংশ।

—হ্যাঁ। তুমি ভাল ক'রে পড়াশুনা কর; এল-পিতে বৃত্তি পাবে। তার পর ইউ-পি, মাইনর, ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এতে বৃত্তি পাবে। তখন এই রাজা তোমাকে খুশী হয়ে উচ্চপদে চাকরি দেবেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার। এজলাসে তুমি ব'সে থাকবে। আমি যাব। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠবে—বলবে, আসুন—আসুন পণ্ডিত মশায় আসুন। আমার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠবে আনন্দে অহঙ্কারে। রাজপুরুষ হয়ে তুমি দেশের সেবা করবে, দরিদ্রের রক্ষক হবে, গুণীর আদর করবে; আর কর্ত্তব্য করবে—

পণ্ডিত ক্ষণিকের জন্য নীরব হইয়া স্থির দৃষ্টিতে ফড়িঙের দিকে চাহিল। ফড়িংও প্রদীপ্ত মুখে একাগ্র দৃষ্টিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া ছিল।

পণ্ডিত বলিল—কর্ত্তব্য করবে অবিচলিত চিত্তে।

—পণ্ডিত!

পণ্ডিত বিরক্ত হইয়াই বলিল—আসুন, মোড়ল আসুন গোপাল মণ্ডল গ্রামের শ্রেষ্ঠ বিত্তশালী ব্যক্তি।

গোপাল একমুখ হাসিয়া প্রবেশ করিল—আমার এই চাদরখানা পণ্ডিত রিপু ক'রে দিতে হবে আজ।

পণ্ডিত রিপু করে বড় ভাল। গ্রামের লোকের পশমী রেশমী কাপড় চাদর ছিঁড়িয়া গেলে, দ্বিপ্রহরের অবসরে পণ্ডিতকে সেগুলি রিপু করিয়া দিতেও হয়। পাঠশালার পণ্ডিতপদের জন্য এও একটা মাশুল। তবে এ কাজে পণ্ডিতের নিপুণতা বড় সূক্ষ্ম, এবং এ কাজটি তাহার ভাল লাগে।

* * *

মাস আষ্টেক পর।

পণ্ডিত সেদিন কলরব করিয়া গ্রামখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। ফড়িং বৃত্তি পাইয়াছে। ফড়িঙের বাপ ও

গ্রামের লোকে—পণ্ডিতকে অভিনন্দিত করিতে আসিল। কিন্তু পণ্ডিতের তাহার প্রয়োজন ছিল না। নিজের আনন্দেই সে মগ্ন উন্মত্ত। তাহার মনে হইল জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য সে পাইয়া গিয়াছে।

সে বলিল—কালই আমি নিজে গন্তটিয়ার মাইনর ইস্কুলে ফড়িংকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসব। ওকে পড়া ছাড়ানো হবে না কিন্তু, আর লোকপাড়ার ইস্কুলেও না।

ফড়িঙের বাপ বলিল—বেশ তো। আমি আর কি করলাম বাপ হয়ে। যা করলেন—আপনি।

পণ্ডিত শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কিন্তু সে বক্তৃতায় বাধা পড়িল। লোকপাড়া হইতে আগত হাবু মণ্ডল চোখ মুখ উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—লোকপাড়ার হেডপণ্ডিত মারা গেল।

—মারা গেল!

—হ্যাঁ। আশ্চয্য মিত্যু। কেলাসে পড়াতে পড়াতে। হঠাৎ। হাট ফেল না কি বলছে।

পণ্ডিত উঠিল। পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে আরও জনকয়েক। ফড়িং পণ্ডিতের পাশে পাশেই একরূপ ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছিল।

লোকপাড়া গ্রামখানি এ-অঞ্চলের মধ্যে ভদ্রলোকের গ্রাম। মধ্যবিত্ত এবং মধ্যশিক্ষিত অনেক লোকের বাস গ্রামখানিতে। হার্ট ফেল করিয়া পণ্ডিত মারা গিয়াছেন। হেডপণ্ডিত মহাশয় প্রাচীন লোক—সে-আমলের ত্রৈবার্ষিক নর্ম্ম্যাল পাস—তাহার উপর এ-আমলের গুরুট্রেনিং পরীক্ষাও তিনি দিয়াছিলেন; এ-গ্রামে তাঁহার ছাত্র অনেক; সকলে তাঁহার শবদেহ ফুলে ঢাকিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সংকার করিল। হরি পণ্ডিত অবশ্য বিস্মিত হইল না, সে এমন শোভাযাত্রা দুই-এক স্থানে দেখিয়াছে। কিন্তু অন্তর তাহার আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফড়িঙের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদে তাহার মনে হইয়াছিল সে তাহার চরম কাম্য পাইয়াছে, কিন্তু এখন মনে হইল না।

সে চুপি চুপি ফড়িংকে বলিল—আমি যদি মরি ফড়িং, তবে এমনি ক'রে নিয়ে যাবে তো!

ফড়িঙের চোখে জল আসিল, ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—আজ্ঞে?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—দূর পাগল ছেলে!

তার পর গম্ভীর হইয়া বলিল—মরতেই মানুষের জন্ম ফড়িং! কান্না বা শোক মিছে কথা। আসল কথা হ'ল কর্ত্তব্য। যত কঠোরই হোক কর্ত্তব্য করতেই হবে। ওই যে হেডপণ্ডিত মারা গেলেন, তাঁকে যে ফুলে ঢেকে সম্মান ক'রে নিয়ে গেল; কেন? কারণ তিনি কর্ত্তব্য ক'রে এসেছেন নিখুঁত ভাবে, সমস্ত জীবন।

পণ্ডিতের সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। ফড়িং বৃত্তি পাইয়াছে; আজ যদি সে মরিয়া এমনি পুষ্পাবৃত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে!

কিন্তু ডাকিলে তো মৃত্যু আসে না। আসিলে পণ্ডিত তাহাকে ঈশপের গল্পের কাঠুরিয়ার মত ফিরাইয়া দেয় না, ইহা নিশ্চিত।

চার বৎসর পর হরি পণ্ডিত তখন তাহার সে মৃত্যু-কামনা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! সেদিন আবার হরি পণ্ডিত আপনার জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। ফড়িং মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে। পণ্ডিত আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

ফড়িঙের মাথায় হাত বুলাইয়া সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল—ভাল ক'রে পড়, আমার মুখ উজ্জ্বল কর। ম্যাট্রিক বৃত্তি নিতে হবে। আই-এ, বি-এ, এম্‌-এ-তেও তোমাকে বৃত্তি নিতে হবে। জান ফড়িং—দ্রোণ ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দুধের বদলে ছেলেকে পিটুলি গোলা খাওয়াতো। শিষ্যের কল্যাণে সে হয়েছিল রাজগুরু।

ফড়িং তাহার পদধূলি লইল।

পণ্ডিতের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই—সে বলিল—সেই পুরাতন কথা—তুমি জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। শেষে হবে কমিশনার। তুমি এজলাসে বসে থাকবে আমি যাব।

ফড়িং অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা সার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বড়, না মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু বড়?—সময়টা তখন অসহযোগ-আন্দোলনের উনিশ-শো একুশ বাইশ সাল।

পণ্ডিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে সেকেলে পণ্ডিত, তাহার উপর মাসিক চারি টাকা হিসাবে সরকারী সাহায্য সে পাইয়া থাকে, এ প্রশ্নের উত্তর সে সহসা দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পর বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলিল—ওঁরা হলেন মহা-পুরুষ—মহামানব ফড়িং—ওঁদের সঙ্গে কার তুলনা!

সেদিন সন্ধ্যায় নিত্যকার মত রান্না করিতে গিয়া পণ্ডিতের অকস্মাৎ জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়া গেল। এই দুর্ভোগ আর সহ্য হয় না! সে মৃত্যু কামনা করিল। কিন্তু মরণ সেদিনও আসিল না।

* * *

এক দিন মৃত্যু আসিল।

সেদিন পণ্ডিত মৃত্যুকে ডাকে নাই। ডাকিবার মত মনের অবস্থা সে তখন হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর দিয়া অনেক বিপর্য্যয় বহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বের ঘটনা হইতে ছয় বৎসর পর।

পণ্ডিত সেদিন প্রায় অকস্মাৎই মারা গেল।

সে তখন আর পাঠশালার পণ্ডিত নয়। উনিশ শো সাতাশ-আটাশ সালে কংগ্রেসী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমলে তাহার চাকরি গিয়াছে।

এক দিন একটা ছেলে তাহার অনুপস্থিতিতে 'বন্দে মাতরম্' চীৎকার করিয়া পাঠশালায় গোলযোগ বাধাইয়া তোলায় পণ্ডিত তাহাকে দারুন প্রহার করিয়াছিল। কথাটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের কানে তুলিয়াছিল ফড়িং। ফড়িং বৃত্তি পাইয়া পাইয়া ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করিয়া তখন-কংগ্রেস-সেবক হইয়া উঠিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, বৃদ্ধ এবং সেকেলে বলিয়া হরি পণ্ডিতকে চাকরি হইতে অপসৃত করিলেন। ফড়িংকেই পদটা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা লয় নাই। বলিয়াছিল—উনি আমার গুরু।

হরি পণ্ডিত দেবসেবা এবং জমিদার-কাছারীর পাচক বৃত্তি লইয়াই কাল কাটাইতেছিল। হঠাৎ সামান্য দুই-তিন দিনের জ্বরেই মারা গেল।

গ্রামে ব্রাহ্মণের অভাব, বহু কষ্টে ওই লোকপাড়া হইতে চারি জন ব্রাহ্মণ আনিয়া একখানা গরুর গাড়ীতে চাপাইয়া শবদেহ লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

গাড়ীতে গরু জোতা হইয়াছে—এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—দাঁড়াও।

ডাকিতেছিল—ফড়িং। তাহার হাতে একগাছি গাঁদা ফুলের মালা।

মর্ত্ত্যলোকের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ-মুহূর্ত্তে পণ্ডিতের আত্মা ধরার ধূলার মমতায় আকুল হইয়া উঠিল।

অর্কিডের বর্ণসঙ্কর

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

খুব বেশী দিনের কথা নহে—জীব-জগতের (প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় সজীব পদার্থের বৈচিত্র্য) দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও মনে করিতেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে এই জাতিসমূহের পরিজন সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে অভিনব কোন বৈচিত্র্যের আত্মপ্রকাশ সম্ভব নহে। যদিও ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই য়্যারিস্টোটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২ অব্দ) প্রমুখ মনীষিবৃন্দ জীব-জগৎকে ক্রমোন্নতিশীল বলিয়াই মনে করিতেন তথাপি কিন্তু এই মতবাদকে কেহ বড় একটা আমল দেন নাই। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মানুষ আজ জীব-জগতে অভূতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহারা নিরপেক্ষ জীবন সৃষ্টি করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কিত প্রাকৃতিক রহস্যের চাবিকাঠি হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা যে আরও কত দূর অগ্রসর হইবেন তাহা কে বলিতে পারে! এই রহস্য অবগত হইবার ফলে ফলফুলের বৈচিত্র্য সম্পাদনে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের কৃতিত্বের বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অর্কিড-ফুলের মূল্যবান বিচিত্র বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ লুসিয়েন রিচ্‌লারের কৃতিত্বের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সাধারণ অর্কিডের বংশানুক্রমিক স্থায়ী গুণবিশিষ্ট Mutant ফুলের সহিত কৃত্রিম উপায়ে অপর পুষ্পের পরাগ-সঙ্গম ঘটাইয়া সতেরো বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বিভিন্ন রকমের যে সকল অতিকায় ও সুদৃশ্য অর্কিড-ফুল উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু। কোন একটি মনোনীত ফুলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অপরাপর ফুলের

ক্যাটলিয়া ল্যাবিয়েটা নামক বড় পাপড়িওয়ালা মিউট্যাণ্ট অর্কিড-ফুল

মনোরম বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযোজিত করিয়া তিনি তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। কি উপায়ে তিনি এ-কার্য্যে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া বলিতে গেলে এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব কথার একটু আলোচনা প্রয়োজন।

কেমন করিয়া জীব-জগতে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটিতে পারে এ সম্বন্ধে লামার্কই (১৭৪৪-১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার মতবাদের মূল কথা হইল এই যে, জীবিকার্জ্জন ও আত্মরক্ষার তাগিদে ব্যবহার অথবা অব্যবহারের ফলে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এই নবলব্ধ গুণাগুণ বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া একই জাতীয় কতকগুলি জীব ক্রমশঃ উন্নততর হইতে থাকে এবং অবশিষ্টগুলি সুস্পষ্ট কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ইহাই মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতামাতার অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রবর্ত্তিত হয় না। কাজেই তাঁহার এ মতবাদ বেশী দিন প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার পরে ডারুইন যখন প্রচার করিলেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কৌশলে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তখন জীব-জগতের ক্রমোন্নতির রহস্য অনুধাবন করিতে লামার্কের মতবাদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না। কিন্তু একই বংশীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের পরস্পরের মধ্যে কেন যে বিচিত্র পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে—ডারুইন সে সম্বন্ধে কোনই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। প্রকৃতিতে এইরূপ পার্থক্য বা পরিবর্ত্তন রহিয়াছে, স্বতঃসিদ্ধরূপে ইহা ধরিয়া লইয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য, আবহাওয়া ও অন্যান্য কতকগুলি বাহ্যিক প্রভাবে একই জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্নরূপ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। কোন উদ্ভিদ যদি স্থানবিশেষে অবস্থানের সুযোগে যথেষ্ট পরিমাণ সূর্য্য-কিরণ পায় তবে প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করিয়া ছায়াতে অবস্থিত সেই জাতীয় অন্যান্য গাছ অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠিবে। সেইরূপ, মৃত্তিকায় জলীয় অংশ ও দেহ পোষণ উপযোগী অজৈব পদার্থের প্রাচুর্য্য, পাতা হইতে জলীয় পদার্থ নিষ্কাশনের

ম্যাগালি কোলিন নামক বর্ণসঙ্কর অর্কিড

ব্যবস্থা, তাপমাত্রা, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করা স্বাভাবিক। ডারুইন যে এ সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন নাই তাহা নহে; কিন্তু পরীক্ষামূলক

ফেয়ারলি গ্র্যাটিচুড বর্ণসঙ্কর অর্কিড ফুল

তথ্যাভাবে অনেক কিছুই অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক উদ্ভিদতত্ত্বানুসন্ধীরা অনেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কলম করিবার প্রথায় পুরাতন গাছের অংশবিশেষ হইতে নূতন উৎপাদিত গাছ অপেক্ষা বীজের গাছ অনেকাংশেই সতেজ ও উন্নত হইয়া থাকে। অবশ্য পরাগ-সম্মিলনে ডিম্বকোষ ও জীবকোষের (ovums and sperms) প্রকার ভেদের উপর এই সতেজ ও উন্নত অবস্থা এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। একই গাছের ফুলের মধ্যে পরাগনিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহা হইতে উদ্ভূত নবীন বংশধরদের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু একই জাতীয় বিভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগ-সঙ্গম ঘটিলে বংশধরেরা অপেক্ষাকৃত সতেজ ও উন্নত হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এক জাতীয় হইলেও বিভিন্ন গাছে বংশানুক্রমে অর্জ্জিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত হইতে পারে। এক জাতীয় বিভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগ-সঙ্গমে ফলের উৎকর্ষ ঘটিতে দেখিয়া অনুসন্ধিৎসুদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইল যে, এক জাতীয় না হইয়া দূরসম্পর্কিত অথচ সমগণভুক্ত বিভিন্ন ফুলে পরাগ-সঙ্গম ঘটিলে অধিকতর সাফল্য অর্জ্জিত হইবে কি না? ইহা হইতেই ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সাফল্য অর্জ্জিত হইলেও ইহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ডারুইনের মতবাদ সম্বন্ধে অনুমান ও পরোক্ষ প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়াই নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের উপায় উদ্ঘাটিত হয়। এই সময়েই জীবজগতের বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধীয় এক অপূর্ব্ব তত্ত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব "মেণ্ডেলের নিয়ম" নামে পরিচিত। মেণ্ডেল ছিলেন এক জন অষ্ট্রিয়ান পাদ্রী। প্রাকৃতিক রহস্য অবগত হইবার জন্য তাঁহার কৌতূহল ছিল অসাধারণ। তিনি ডারুইন-প্রবর্ত্তিত মতবাদের সম্বন্ধে সকল খবরই রাখিতেন এবং বংশানুক্রম সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মটর গাছ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি ডারুইনের সমকালেই কতকগুলি অপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডারুইন তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই জানিতেন না। যাহা হউক, বহুকাল পরে দৈবক্রমে তাঁহার এই অপূর্ব্ব গবেষণা সম্পর্কিত কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়। এক জাতীয় অথচ রকমারি দুইটি প্রাণী অথবা উদ্ভিদের মধ্যে যৌন-সংযোগ ঘটিলে বংশধরেরা পিতা-মাতার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার রূপ পরিগ্রহণ করে এবং অনেক সময় ইহাও দেখা যায়, হয় পিতার দিকে নয় ত মাতার দিকে সন্তানের একটু বেশী সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু একটি দীর্ঘাকৃতি ও একটি খর্ব্বাকৃতি মটর গাছের ফুলের মধ্যে যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া মেণ্ডেল দেখিতে পাইলেন তাহা হইতে উৎপাদিত বংশধরেরা সকলেই দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিয়াছে। অধিকন্তু দীর্ঘাকৃতি গাছের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই উহাদের মধ্যে রহিয়াছে। ডারুইনও এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কিন্তু মেণ্ডেল এ পর্য্যন্ত দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই—তিনি আরও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি এই লম্বা মটরের বীজ রক্ষা করিয়া বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত রোপণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা কতকগুলি অদ্ভুত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপাদিত প্রথম পুরুষের বীজ হইতে যে গাছ জন্মিল তাহাতে লম্বা মটরের প্রায় সবগুলি বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করিল বটে; কিন্তু কোন গাছই লম্বায় বর্ণসঙ্কর পিতা-মাতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা প্রাপ্ত হইল না। অথচ সকলগুলি একই রকম লম্বা হওয়ার পরিবর্ত্তে কতকগুলি সম্পূর্ণ লম্বা ও কতকগুলি সম্পূর্ণ খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। এই লম্বা ও খাটো গাছগুলির সংখ্যার অনুপাতও সর্ব্বত্র সমান। প্রত্যেক চারটি গাছের মধ্যে তিনটি লম্বা ও একটি খাটো।

জো ভান য়্যাসেল নামক বর্ণসঙ্কর অর্কিড ফুল

মেণ্ডেল এই খর্ব্বাকৃতি ও দীর্ঘাকৃতি গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া পৃথক পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলেন। দেখা গেল—খর্ব্বাকৃতি গাছের বীজ হইতে সবগুলি গাছই খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। তাহাদের বীজ হইতে পর পর গাছ উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বংশপরম্পরায় সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে তাহারা খর্ব্বাকৃতিই থাকিয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘাকৃতি গাছের বেলায় এই নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া গেল। খর্ব্বাকৃতি গাছের বীজের মত একই নিয়মে বপন করা সত্ত্বেও তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ বীজ মাত্র লম্বা গাছ উৎপাদনে সমর্থ হইল এবং বংশানুক্রমে তাহারা লম্বা গাছই উৎপাদন করিতে লাগিল; কিন্তু বাকী দুই-তৃতীয়াংশ বীজ হইতে পুনরায় পূর্ব্বের মত ৩:১ অনুপাতে দীর্ঘাকৃতি ও খর্ব্বাকৃতি গাছ উৎপন্ন হইল। এই খর্ব্বাকৃতি গাছের বীজ হইতে বংশানুক্রমে কেবল খর্ব্বাকৃতি গাছই আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং দীর্ঘাকৃতি গাছ হইতে পূর্ব্বানুরূপ দুই জাতীয় গাছ জন্মিল। তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ দীর্ঘাকার এবং বংশানুক্রমে দীর্ঘাকার গাছই উৎপাদন করে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ পুনরায় ১, ২, ৩ অনুপাতে দীর্ঘাকৃতি ও খর্ব্বাকৃতি গাছ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই নিয়মে অবশ্য ক্রমোন্নতিবাদ অনুসারে নূতন জাতি সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জীব-জগৎ এইরূপ মন্থর গতিতে বিবর্ত্তিত হইতেছে কি না সে বিষয়ে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, মেণ্ডেলের পরে হিউগো ডি-ভ্রিস্ বর্ণসঙ্করের বংশানুক্রম পরীক্ষায় একটি অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সকল সন্দেহ নিরসন করিলেন। তিনি তাঁহার বাগানে মেণ্ডেলের নিয়মানুযায়ী এক জাতীয় ফুল গাছ পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, কয়েকটি মাত্র ফুলে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্তন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, সেগুলিকে ডারুইন-বর্ণিত অস্থায়ী বা অস্থির পরিবর্ত্তন বলা চলে না। অন্য ফুলের সহিত ইহাদের পরাগ-সঙ্গম ঘটাইয়া দেখা গেল যে, বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় স্থায়ী ভাবেই সংক্রমিত হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাবে পরিবর্ত্তিত এরূপ প্রাণী বা উদ্ভিদকে তিনি বলিলেন মিউট্যাণ্ট। 'মিউট্যাণ্ট'গুলি অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়; কিন্তু বংশানুক্রমে স্থায়ী ভাবে তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। মিউট্যাণ্ট আবির্ভূত হওয়ার ফলেই জীব-জগতে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর বিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

ক্যাট্লিয়া লাবিয়াটা। ছোট পাপড়িওয়ালা মিউট্যাণ্ট অর্কিড ফুল

অধুনা আবিষ্কৃত কতকগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা বাদ দিলেও মোটামুটি উপরোক্ত নিয়মানুসারেই জীবজগতে বর্ণসঙ্কর ও ইচ্ছানুরূপ বৈচিত্র্য আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। মেণ্ডেলের পরীক্ষানুসারে নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় স্থায়ী বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বর্ণসঙ্কর উৎপাদন সম্ভব হইলেও তাহা যেমনই সময়সাপেক্ষ তেমনই অসুবিধাজনক। কিন্তু বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইবার প্রথম পুরুষ

মাডাম লুসিয়েন রিচলার নামক বর্ণসঙ্কর অর্কিড ফুল

হইতেই তাহাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাইতে পারে। যে-কোন একটি ফুলের সঙ্গে নির্ব্বিচারে বিজাতীয় যে কোন ফুলের যৌন-মিলন সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় রকমারি হইলেও সমগণভুক্ত পরস্পরের সহিত মিলন ঘটিতে পারে। এরূপ মিলন হইতে উদ্ভূত বীজ রোপণ করিলে বর্ণসঙ্কর গাছ পাওয়া যাইবে। উহার ফুলে পিতামাতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। বংশানুক্রমে এই বৈশিষ্ট্য স্থায়ী করিতে হইলে মেণ্ডেলের নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে 'কলম' করিবার প্রণালী অনুসরণ করা। কোন কোন গাছের প্রবহণী হইতে আবার কাহারও কাহারও কন্দ হইতে নূতন গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। তাছাড়া অনেক গাছেরই কলমের প্রথায় ডাল হইতে বংশবিস্তারের সুবিধা হইতে পারে। বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইলে বংশানুক্রমিক ধারায় যে সকল পরিবর্ত্তন আত্মপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা, কলমে সেরূপ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কাজেই এই উপায়ে বর্ণসঙ্করকে যতকাল ইচ্ছা স্থায়ী রাখা যাইতে পারে।

বর্ণসঙ্কর সম্পর্কিত মোটামুটি যে সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব আলোচিত হইল লুসিয়েন রিচ্লার তদনুসরণে অর্কিডের অভিনব ফুল উৎপাদনে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি দুইটি মিউট্যাণ্ট অর্কিড সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতেই বহুবিধ বিচিত্র ফুল উৎপাদন করিয়াছেন। বিদেশ হইতে সংগৃহীত ছোট ও বড় দুই জাতীয় ক্যাট্লিয়া ল্যাবিয়াটা'র সহিত অন্যান্য বহু জাতীয় সাধারণ অর্কিডের পরাগ-সঙ্গম ঘটাইয়া তিনি যে কি অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ছবি হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তাঁহার সংগৃহীত এই মিউট্যাণ্ট ক্যাট্লিয়ার গাছ দুইটি অনেক বৎসর ধরিয়া একই রকমের ফুল উৎপাদন করিয়াছে। কখনও কোন ফুলে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বড় ফুলটির পাচটি পাপড়ির সবগুলিই বড় এবং ছোট ফুলটির পাপড়ির সংখ্যা সাত; ইহার তিনটি বড়, চারিটি ছোট। ইহাই ফুল দুইটির বিশেষত্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কেবলমাত্র নূতন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করাই নহে, সেই বৈশিষ্ট্যকে বংশপরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট ভাবে সম্প্রসারিত করাই মিউট্যাণ্টের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি প্রধানতঃ দুই জাতীয় বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে চেষ্টা করেন। প্রথম উপায়—বর্ণ-

মাডাম এটিয়েন রেবৌড নামক বর্ণসঙ্কর অর্কিড ফুল

সঙ্করের পিতামাতার যে-কোন একটি বড় মিউট্যাণ্ট ক্যাট্লিয়া। দ্বিতীয় উপায়—পিতামাতা দুইটিই মিউট্যাণ্ট; একটি বড় ক্যাট্লিয়া অপরটি ছোট ক্যাট্লিয়া। (উভয় জাতীয় স্ত্রী ও পুং-পুষ্পের বিভিন্ন যোগাযোগে আরও রকমারি ফুলের আবির্ভাব সম্ভব।) তা ছাড়া তিনি বড়

ক্যাটলিয়াটির দুইটি ফুলের মধ্যে পরাগ-সঙ্গম ঘটাইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত উপায়ে তিনি তিন রকমের ফুল পাইয়াছিলেন। যথা—এক জাতীয়, পিতৃগুণপ্রাপ্ত, এক জাতীয়, মাতৃগুণপ্রাপ্ত এবং অপরটি মধ্যম। এই মধ্যমটিই দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় উপায়ে তিনি চার প্রকারের বৈচিত্র্য উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এক জাতীয়—সাধারণ আকৃতির, এক জাতীয় পিতৃগুণপ্রাপ্ত, অল্প কয়েকটি যুগ্ম আকৃতিবিশিষ্ট এবং চতুর্থটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ধরণের। কতকগুলি গাছে আবার এক বোঁটায় দুইটি বিভিন্ন আকৃতির ফুলও ফুটিয়াছিল। কয়েকটি গাছে ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন রকমের ফুল ধরিতে দেখা যাইত। ইহাদিগকে তিনি বলিয়াছেন- পরিবর্ত্তনশীল মিউট্যাণ্ট। যাহা হউক রিচ্‌লারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে- তাঁহার কৃতকার্য্যের ফলাফল কেবলমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই নহে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী দীপ্তি বসু

শ্রীমতী দীপ্তি বসু সম্প্রতি লণ্ডনের বেডফর্ড কলেজ হইতে পদার্থ-বিদ্যায় একটি বিশেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক ডব্‌লিউ উইলসন, এফ্‌-আর্‌-এস, তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমতী দীপ্তি রাজশাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মিঃ জে. এম্‌. বসুর কন্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা

নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশ্যন নামক বিখ্যাত বিলাতী সাপ্তাহিকে একটি চিঠি লিখিয়া তাহাতে অন্যতম ভূতপূর্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার ব্রিটেনের সরকারী সংবাদপ্রচার বিভাগের একটি বিজ্ঞাপনের সমালোচনা করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞাপনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "স্বাধীন জাতিদের একটি পরিবার" ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারী সংবাদপ্রচার বিভাগের মন্ত্রী পার্লেমেণ্টেও সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি করেন। লর্ড অলিভিয়ারের চিঠিটির যে-অংশের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক আছে, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

An advertisement recently published by the Ministry of Information in the Press under the headings *The Greatest Crusade* contains assertions, since repeated by the Minister in the House on October 14, which are incorrect and may mislead public opinion. The main statements of the advertisement are that the British Empire is "a family of free nations," that in it "men and women of every colour are working out their own destiny" and that "in this war they are fighting shoulder to shoulder of their own free will."

Unhappily facts controvert these assertions. The large majority of the peoples of the Empire are not free and have little or no say in either their own or imperial affairs. India, for instance, has been committed to this war without any consultation of the wishes of her people and this is leading to a very critical state of affairs in that country.

If the Ministry's statements are true why, for example, are not India, Ceylon and Burma free and independent countries and why are Indians imprisoned for their attitude to the war and, in other parts of the Empire British subjects imprisoned for struggling to improve social conditions and raise the standard of living. Why has there been no undertaking to establish the democratic freedom of the people of the colonies on the lines that they themselves shall freely determine?

The future relation of Britain to her subject peoples must be based on reciprocity, equality and friendship, but this is not at present the case.

তাৎপর্য্য। সংবাদপত্রসমূহে সরকারী সংবাদপ্রচার মন্ত্রীর দপ্তর হইতে, "মহত্তম ধর্ম্মযুদ্ধ" শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদপ্রচার মন্ত্রী পরে পার্লেমেণ্টে তাহাতে মুদ্রিত উক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সেই উক্তিগুলি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ও তদ্দ্বারা জনমত বিপথচালিত হইতে পারে। বিজ্ঞাপনটির প্রধান উক্তি ছিল এই :—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি স্বাধীন জাতিসমূহের পরিবার। ইহাতে প্রত্যেক রঙের পুরুষ নারী আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া লড়িতেছে।"

দুঃখের বিষয়, প্রকৃত তথ্যসমূহ এই সব উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খুব অধিক অংশ লোকেরা স্বাধীন নহে, এবং তাহাদের নিজেদের দেশের ব্যাপার সমূহে বা সাম্রাজ্যিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদের মতকে কার্যকর ভাবে প্রকাশ করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতবর্ষের লোকদের মতামত জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে অংশী করা হইয়াছে, এবং তাহার দরুন সেই দেশে সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হইতেছে।

যদি সংবাদপ্রচার মন্ত্রীর কথাগুলি সত্য হয়, তাহা হইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে কেন, এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের জন্য ভারতীয়দিগকে জেলে পাঠান হইতেছে কেন, এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, নিজেদের সামাজিক অবস্থার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর উন্নতি করিবার চেষ্টার 'অপরাধে', ব্রিটিশ প্রজাদিগকে কেন কারারুদ্ধ করা হইতেছে? উপনিবেশসমূহের লোকেরা স্বাধীন ভাবে যে প্রকার নির্ধারণ করিবে সেই প্রণালী অনুসারে তাহাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা কেন করা হয় নাই?

ব্রিটেনের সহিত তাহার অধীন লোকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ পারস্পরিকতা, সাম্য ও বন্ধুত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সেরূপ নহে।

বর্ত্তমান ভারতসচিবের ও অন্য কোন কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষের উক্তির সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা লর্ড অলিভিয়ারের অনুরূপ মতই বহু বার প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। লর্ড অলিভিয়ারের কথাতেও হইবে না। অবস্থা যখন এইরূপ হইবে, যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে না দিলে আর চলিতেছে না, তখন কাজ হইবে। সেই অবস্থার উদ্ভব হইবে, ব্রিটিশ জাতি ও গবন্মেণ্টের উপর অপ্রতিরোধনীয় চাপ পড়িলে। ভারতবর্ষের লোকেরা সম্প্রদায়নির্বিশেষে একজোট হইয়া সেই চাপ অহিংস ভাবেই দিতে পারেন—এবং সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দল বাঁধাটাই বাঞ্ছনীয়। তাহা আপাততঃ সাধ্য না হইলে, শুধু হিন্দুরাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চাপ দিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের দ্বারাই চাপ দিবার চেষ্টা হউক, তাহা অহিংসভাবে করাই বাঞ্ছনীয় ও বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র তাহাই সম্ভবপর, এবং যাঁহারা এই চেষ্টা করিবেন তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ ত্যাগ ও দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

—

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাল্পনিক বাধা

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের একটি বাধার কথা প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অর্থাৎ পাঠশালাগুলির সংখ্যা বাড়াইতে হইলে শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরুমহাশয় আবশ্যক হইবে। কিন্তু গুরুমহাশয়ের কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্টসংখ্যক লোক পাওয়া যাইবে না। বৎসরে কেবল ৩০০০ শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরুমহাশয় তাঁহাদের শিক্ষালয় হইতে বাহির হন। সমগ্র বাংলা দেশে সার্বজনিক শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত যত পাঠশালা চাই, তাহার নিমিত্ত ১,৪৮,০৪০ শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরুমহাশয় আবশ্যক। এতগুলি গুরুমহাশয় তৈরি করিতে বৎসরে ৩০০০ হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিবে!

এই বাধাটা কাল্পনিক। ইহা দুই প্রকারে অতিক্রম করা যায়। প্রথম উপায়, গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি। দ্বিতীয় উপায়, যাঁহারা শিক্ষাকার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত নহেন অথচ যাঁহাদের যথেষ্ট সাধারণ শিক্ষা আছে, তাঁহাদিগকে আবশ্যক মত পাঠশালার গুরুমহাশয় নিয়োগ।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বলা হইতে পারে, গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় আরও বাড়াইতে হইলে টাকা চাই, কিন্তু টাকা নাই। কেন নাই? সরকারী লক্ষ লক্ষ টাকা বাজে খরচ হয়, মন্ত্রী ও অন্য অনেক কর্মচারীকে অত্যন্ত বেশি বেতন দেওয়া হয়। সেই সমস্ত ছাঁটিয়া ফেলিলে ব্যয় সঙ্কলান নিশ্চয়ই হইতে পারে। তা ছাড়া, নূতন ট্যাক্স বসাইয়া আয় বাড়ান হইতেছে। সেই বর্ধিত আয় কি বাজে খরচের জন্য?

দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে বলা হইতে পারে যে, শিক্ষাদান-কার্যে যাঁহারা শিক্ষা পান নাই, লেখাপড়া জানা এমন লোকদিগকে গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিলে, টাকার অপব্যয় হইবে, পাঠশালার ছেলেমেয়েরা দস্তরমোতাবেক শিক্ষা পাইবে না। এই আপত্তি যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়—আমরা তাহা সত্য বলিয়া মানিতেছি না—তাহা হইলেও ইহা সেইরূপ আপত্তি যেমন কোন দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে যদি দেশের রাজা বলেন আমি নিরন্ন লোক-দিগকে পোলাও কিম্বা অন্ততঃ অত্যুৎকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন খাওয়াইব নতুবা খাওয়াইবই না। আমাদের দেশে জ্ঞানের ও শিক্ষার দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে লম্বাচওড়া কথা বলা ভাল নয়। আপত্তিটা সত্য বলিয়া না মানিবার কারণ বলি। শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষাটাকে আমরা অকেজো বা অনাবশ্যক মনে করি না—ইহা কেজো বটে এবং ইহার মূল্য আছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাঁহারা এম্-এ, এম্-এস্‌সী, পীএইচ্-ডী, ডী-এস্-সীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা এক জনও শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিনা সন্দেহস্থল। যে-সব অধ্যাপক বাংলা দেশের কলেজগুলিতে বি-এ, বি-এস্‌সী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন, তাঁহাদেরও সকলে না হইলেও, অন্ততঃ অধিকাংশ শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত নহেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজসমূহের এই সকল অধ্যাপক কি শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না?

বাংলা দেশে যে মোটামুটি দেড় হাজার উচ্চ বিদ্যালয় আছে, তাহাদের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষা পান নাই এমন লোক বিস্তর আছেন—হয়ত অধিকাংশই তাই। ইহারা কি শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না?

শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষা না পাইয়াও যদি সাধারণ শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পাঠশালার শিক্ষাই বা এমন কি আজব চীজ যে সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সে শিক্ষা দিতে পারিবে না?

বাংলা দেশে হাজার হাজার ম্যাট্রিক পাস ছেলে বেকার বসিয়া আছে। তাহাদিগকে গুরুমহাশয়ের কাজ দিলে তাহারা তাহা করিতে পারিবে। পাঠশালার জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় যাহা, তাহারা তাহা এক মাসে, জোর দু-মাসে, শিখিতে পারিবে। আমাদের কাছে বিস্তর ম্যাট্রিক পাস, এমন কি আই-এ বি-এ পাস, যুবক এ পর্য্যন্ত কাজের সন্ধানে আসিয়াছে যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে সাধারণ কুলি মজুরের কাজ করিতেও প্রস্তুত।

শিক্ষামন্ত্রী ও বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি

শুনিলাম, শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকসমূহে এবং মুসলমানদের লেখা অন্য কোন কোন বহিতে যে-সকল আরবী ফারসী শব্দ ঢুকান হইতেছে, তাহার দ্বারা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা হইতেছে।

নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও প্রক্রিয়া, নবাবিষ্কৃত কোন পদার্থ, নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, আমাদের অপরিচিত কোন বিদেশের পরিচ্ছদ প্রথা রীতি-

নীতি, ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত যদি কোন বিদেশী শব্দের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা সুবিধামত যে-কোন ভাষা হইতে লওয়া যাইতে পারে; তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু যদি নূতন করিয়া শব্দ রচনা করিতে হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তাহা সংস্কৃত হইতেই করা ভাল; কিম্বা যদি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত কোন শব্দ লইলে চলে তাহা হইলে তাহা আমদানী করাই ভাল। যে-সকল পদার্থ জীবজন্তু জিনিস রীতিনীতি আচার কাজকর্ম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ভাব চিন্তা ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত বাংলা ভাষায় যথেষ্ট শব্দ আছে, সেইগুলি বুঝাইবার নিমিত্ত আরও কতকগুলা বিদেশী শব্দ আমদানী করা শুধু অনাবশ্যক নহে, তাহার দ্বারা ভাষাকে বৃথা ভারাক্রান্ত করা হয়।

সিংহ ও বাঘ বুঝাইতে বাংলায় অনেক শব্দ আছে। তাহার উপর মুসলিম লীগের সভ্যদের জন্য "শের" আমদানী না করিলেও চলে। বাংলা ভাষায় উপরি-পাওনা, ঘুষ, উৎকোচ, বকশিশ, ভাতা ইত্যাদি আছে। তাহার উপর বিলাতী য়্যালাওয়্যান্সটা আমদানী না-ই'বা করা গেল? বাংলা ভাষায় ভয় দেখান, ধমকান, হুমকি দেওয়া, শাসান, কড়কান, তম্বি করা, ইত্যাদি আছে। তাহার উপর "সতানা" নাই-বা হইল?

আর যদি অদরকারী বহু শব্দ আমদানী করিয়া বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়াইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেশী ভাষা সংস্কৃতের ত অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে? তবে যদি নিতান্তই বিদেশী শব্দ লইবার দিকে ঝোঁক থাকে, তাহা হইলে এখন ত কোন বিদেশী ভাষাই ইংরেজীর মত সমৃদ্ধ নয়, তাহা হইতেই লওয়া হউক না? তাহাতে একটা সুবিধাও আছে। ইংরেজীনবীশ লোকেরা কেহ কেহ স্বভাবতই তাঁহাদের নিজের বা ফাদারের হাই ব্লাড প্রেস্যরের এবং ওআইফের য়্যানীমিয়ার ও ডটারের হাইহীল্ড স্লিপারের গল্প করেন, বন্ধুবান্ধবের ভিজিট রিটর্ণ করেন, রোজই টেম্পারেচ্যর হওয়া সত্ত্বেও করেন বলেন; তাঁহাদের এই ইংরেজীর বুকনি দেওয়ার অভ্যাসে কোন বাধা না দিয়া উৎসাহ দিলেই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি তর তর করিয়া বাড়িয়া চলিবে। ছাপার অক্ষরে যে-সব বাংলা লেখা বাহির হয়, সেগুলির মধ্যে কোন কোন নামজাদা লেখকের লেখাতেও ইংরেজী অক্ষরে লেখা ইংরেজী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই রকম একটা রীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি বটে যে, বাংলা বাক্যের মধ্যে যেন ইংরেজী শব্দ না আসে, ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না জুটিলে সেটাকে অন্ততঃ যেন বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হয়। এই চেষ্টাটা না-হয় ছাড়িয়াই দেওয়া যাইবে।

আরবী ফারসী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার শব্দ বিদেশী বলিয়াই তাহার প্রতি কোন বিদ্বেষ আমাদের নাই। নানা ভাষার শব্দ বাংলায় ঢুকিয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষার বিশেষ প্রকৃতি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে ভাষাবিশেষের জীনিয়স—ও বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র সেই সকল বিদেশী শব্দকে বাংলার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কোন রাজা উজীরের সুপারিশ ব্যতিরেকেও ফারসী সিফারিশ সুপারিশের বেশে বাংলায় ঢুকিয়াছে; কোন আরদালিকে বক্‌শিশ টিপ বা ঘুষ না দিয়াই ইংরেজী অর্ডারলি আরদালির উর্দি পরিয়া ও তকমা আঁটিয়া বাংলার মুলুকে জায়গা করিয়া লইয়াছে। এমন কি, ভারতের প্রাচীন কবরীকে কবর দিয়া ফরাসী হইতে আমদানী ইংরেজী কোআফিউর (coiffure) খোপা হইয়া বঙ্গললনাদের শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। যাঁহারা পাওরুটি খান অথচ হিন্দু-আচারনিষ্ঠ বলিয়া নিজের মনকে ও পাড়াপড়শিকে প্রবোধ দিতে চান, তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, পাওরুটির পাওয়ের সঙ্গে কোন বাবুরচির পায়ের স্পর্শ যদি বা থাকে, ত, সেটা আকস্মিক—আসলে পাওটা আসিয়াছে পোর্তুগীজ ভাষার "পাও" ("pao") হইতে। দেশী অনেক জিনিস ও মানুষ অস্পৃশ্য, কিন্তু ইয়োরোপীয় কোন কিছুতেই দোষ হয় না।

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে, একথা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে পুলিস-বিভাগের বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনার সময় প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় নারীর উপর অত্যাচার ঘটিত মামলা হয় ১৯৩৮ সালে ১০৭৫টা, ১৯৩৯ সালে হয় ১২২৩টা এবং ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত হয় ১১৯৯টা। মোকদ্দমা হয় অনেক, কিন্তু শাস্তি হয় খুব কম আসামীরই। ১৯৩৮ সালের ১০৭৫টা মোকদ্দমায় আসামীরা দণ্ডিত হয় কেবল ২৭৩-টাতে। অন্যান্য বৎসরও সফল মোকদ্দমার সংখ্যা এইরূপ।

ইহার কারণ কি? কারণ নানাবিধ। সকল সমাজের নারীরাই স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। সত্য না হইলে তাঁহারা সাধারণতঃ এরূপ নালিশ করেন না। অনেক স্থলে পুলিস

কর্মচারীরা অপরাধীদিগকে দণ্ডিত করাইবার নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত যথেষ্ট চেষ্টা করে না। অনেক স্থলে অত্যাচরিতা নারীর বাড়ীর লোকদের অবস্থা ভাল না হওয়ায় তাহারা ভাল উকীল মোক্তার বা কোন উকীল মোক্তারই নিযুক্ত করিতে পারে না, আসামীরা হয়ত পারে। অনেক স্থলে আসামী বা আসামীরা মুসলমান হইলে অন্য মুসলমানেরা মোকদ্দমাটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার মনে করিয়া চাঁদা করিয়াও ভাল উকীল দেয়; কিন্তু হিন্দুনারী ধর্ষিতা হইলে সর্বত্র হিন্দু সমাজ চাঁদা তুলিয়া অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে না। মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবার আর একটি কারণ, অত্যাচারী গুণ্ডাদের ভয়ে অনেক স্থলে সাক্ষী পাওয়া দুর্ঘট হয়।

এক জন ভূতপূর্ব পুলিস ইন্সপেক্টর-জেনারাল—নাম বোধ হয় লোম্যান সাহেব—বঙ্গে এই অপরাধ দমনের নিমিত্ত খুব উদ্যোগী ছিলেন। তিনি পুলিস কর্মচারীদিগকে এ বিষয়ে খুব অবহিত থাকিবার নিমিত্ত হুকুম দিয়াছিলেন। এখন এবং বরাবর সেই রকম এক জন উপরওয়ালা পুলিস-বিভাগের জন্য চাই। কিন্তু বোধ হয় এখন শুধু তাহাতেই হইবে না। লোম্যান সাহেবের আমলে মন্ত্রিসভার শাসন ছিল না, এখন উজীরী আমল। এখন যে মন্ত্রী পুলিস-বিভাগের কর্তা তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি—সর্বদা সজাগ দৃষ্টি—থাকা আবশ্যক। তাহা কি আছে বা থাকিবে? নারীদের উপর যে-সব দুর্বৃত্ত অত্যাচার করে প্রধান মন্ত্রী তাহাদের পাশবিকতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন বটে; কিন্তু বৎসরে দু-এক বার কড়া কথা বলিলে কি হইবে? সারা বৎসরব্যাপী কড়া শাসন চাই।

কিন্তু দুর্বৃত্তদের সমুচিত শাস্তি বিধান কর্তব্য ও একান্ত আবশ্যক হইলেও, শুধু তাহাই এইরূপ অপরাধ দমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সামাজিক মনোভাব, সামাজিক প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক শাসন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর পরিবর্তন আবশ্যক।

কথায় না হইলেও কার্য্যতঃ, নারীকে প্রধানতঃ পুরুষের ভোগ্যা ভাবিলে এবং পুরুষমানুষেরা প্রধানতঃ দৈহিক-সুখসর্বস্ব হইলে অধিকতর পশুপ্রকৃতির মানুষগুলার নারীর উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকিয়া যায়। আবার, সমাজের অধিকাংশ নারীর মনুষ্যোচিত বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ও আত্মিক শক্তির বিকাশ না হইলে তাঁহারা কেবল স্ত্রীজাতীয় জীব বলিয়া বিবেচিত হন। এই জন্য এক দিকে পুরুষদের শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাহারা নারীদিগকে সমাজের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীভূত মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হয়, অন্য দিকে নারীদেরও শিক্ষা এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাঁহারা কেবল স্ত্রীজাতীয় জীব না থাকিয়া মানব সমাজের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ একটি অংশ ও অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হন।

নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে লোকমত খুব প্রবল হওয়া আবশ্যক। হিন্দুসমাজে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে গঠিত ও ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত আরও প্রবল হওয়া আবশ্যক।

নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজে কোন প্রবল জনমত আছে বলিয়া অবগত নহি। প্রবল না হইলেও সামান্য পরিমাণ বিরুদ্ধ মত থাকিলেও তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই না। নারীনিগ্রহকারীদের দমন ও শাস্তি বিধানের নিমিত্ত বাংলা দেশে অসাম্প্রদায়িক বা হিন্দু সমিতি একাধিক আছে। কিন্তু মুসলমান সমিতি একটিও নাই। এ বিষয়ে মুসলমান সমাজের ঔদাসীন্যের ফল সমগ্র দেশের পক্ষে ও মুসলমান সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ হইয়াছে। আগে আগে এইরূপ অপরাধ দুর্বৃত্ত মুসলমানেরা হিন্দু নারীদের উপরই বেশী সংখ্যায় করিত, মুসলমান নারীদের উপর তত করিত না। তখন মুসলমান কোন কোন কাগজওআলা ও নেতা বলিতেন, এ সব মোকদ্দমা হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের ফল, আসলে ব্যাপারগুলা হিন্দুবিধবাদের সহিত মুসলমান প্রণয়ীর প্রণয়ঘটিত বা তদ্রূপ কিছু। সম্ভবতঃ মুসলমান জনমত ঐরূপই ছিল। তাহার ফল এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? দুষ্টপ্রকৃতির মুসলমানদের উপর এইরূপ জনমতের পরোক্ষ প্রভাব ও ফল এই হইল যে, তাহাদের পাশববৃত্তি বাড়িয়াই চলিল। তাহারা তাহার বশে হিন্দুসমাজ মুসলমান সমাজের বিচার না করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল; সুতরাং মুসলমান সমাজের নারী মুসলমান দুর্বৃত্তের অধিক নিকটস্থ ও অধিক সহজে অধিগম্য বলিয়া এখন কয়েক বৎসর হইতে অত্যাচরিতা হিন্দুনারী অপেক্ষা অত্যাচরিতা মুসলমান নারীর সংখ্যাই বেশী দেখা যাইতেছে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে মুসলমানই বেশী। কি প্রকারে ও কেন এরূপ হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের অনুমান ও বর্ণনা সর্বাংশে ঠিক না হইতে পারে; কিন্তু নারীধর্ষকদের মধ্যে যে মুসলমান বেশী এবং ধর্ষিতা নারীদের মধ্যে যে মুসলমান বেশী, ইহা মুসলমান মন্ত্রীদের দ্বারা প্রদত্ত সরকারী তথ্য।

নারীনিগ্রহঘটিত মোকদ্দমায় অতি অল্প আসামী শাস্তি

পাওয়ার আর এক কুফল এই হইয়াছে যে, হিন্দু সমাজের মধ্যেকার দুর্বৃত্তেরাও অধিকতর দৌরাত্ম্য করিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা হিন্দুনারীদের উপর অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের দ্বারা মুসলমান নারীদের উপর অত্যাচার অপেক্ষাকৃত কম। গত তিন সালে হিন্দু ও মুসলমান আসামীর সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ ছিল।

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯৩৮	৫৬৫	১২৭৬
১৯৩৯	১৬২	৩০৬
১৯৪০	৬৪৯	১৩০৬

নারীর উপর অত্যাচার একটা অতি লজ্জাকর ও ঘৃণার্হ অপরাধ। যে-সম্প্রদায়ের যে লোকই যে সম্প্রদায়ের নারীর উপরই অত্যাচার করুক, সে পশুর অধম। দুর্বৃত্তদের মধ্যে মুসলমান বেশী বা অত্যাচরিতাদের মধ্যে মুসলমান বেশী, ইহা হিন্দুর পক্ষে প্রতিহিংসাচরিতার্থতা, সন্তোষ বা অহঙ্কারের কারণ হইতে পারে না। আবার মুসলমান দুর্বৃত্তেরা যত হিন্দু নারীর সর্বনাশ করে, হিন্দু দুর্বৃত্তেরা তাহা অপেক্ষা অনেক কম হিন্দুনারীর সর্বনাশ করে, ইহা মুসলমানদের পক্ষে উল্লাস সন্তোষ বা অহঙ্কারের কারণ হইতে পারে না। এই অপরাধগুলা সমগ্র বাংলা দেশের ও সমগ্র বাঙালী জাতির কলঙ্ক।

—

বঙ্কিমচন্দ্র এবং সামাজিক মত সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীতে বৈষম্য

১২৮২ সালের কার্ত্তিক মাসের বঙ্গদর্শনে অর্থাৎ প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক মত ও শাসন বিষয়ে নারী ও পুরুষে নানা বৈষম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে প্রধান প্রধান সব রকমের বৈষম্যের কথাই ছিল। তাহার মধ্যে একটি বিষয়ের আলোচনার তাঁহার মন্তব্যগুলির কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। নারীর উপর অত্যাচার নির্মূল করিবার সফল চেষ্টা করিতে হইলে এই বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রী গমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভুরি ভুরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। এক জন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে* সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর এক জন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।"

এ বিষয়ে সামাজিক অবস্থার ও মতের ভাল'র দিকে পরিবর্ত্তন কতটা হইয়াছে বা মোটেই হইয়াছে কি না, পাঠিকারা ও পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রবন্ধটির শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন :—

"আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ-সংসার রূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

"যায় না; কেন না তাহাতে রঙ্‌তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায়বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?"

৬৬ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন তখনকার চেয়ে এখন হিন্দু সমাজের কতক লোক স্ত্রীজাতির উন্নতিতে কিছু বেশি মনোযোগী হইয়াছেন স্বীকার্য্য। কিন্তু এখনও স্ত্রীজাতির অবস্থা এত শোচনীয় এবং হিন্দুসমাজ এত বিশাল ও তাহার সম্ভাবিত সামর্থ্য এত অধিক যে, স্ত্রীজাতির উন্নতিতে বঙ্গের হিন্দু সমাজের মনোযোগের পরিমাণ ও মাত্রা এখনও যথেষ্ট মনে করিতে পারা যায় না।

* তাহার কোন দোষ না থাকিলেও, অন্যে তাহার উপর বলপূর্ব্বক অত্যাচার করিলেও। প্রবাসীর সম্পাদক।

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে একাধিক নেত্রীর আন্তরিক নারীহিতৈষণা আছে। তাঁহারা বঙ্গের নারীপ্রচেষ্টাকে সুপরিচালিত করুন। সর্বাগ্রে নারীদের নিরক্ষরতা দূর করুন।

চৈনিক মুসলিম "জিন্না"-বাদ

ভারতবর্ষে যেমন জনাব জিন্নার চেলারা বলেন যে, তাঁহারা একটি আলাদা নেশ্যন, সেইরূপ চীনদেশেও মুসলমানদের মধ্যেও কতকগুলি লোক আছে যাহারা বলে চীনের মুসলমানেরা একগোষ্ঠীজাত আলাদা একটা নেশ্যন এবং তাহাদের সহিত অন্য চীনদের কোন সম্পর্ক নাই। আমেরিকার "এশিয়া" মাসিকে য়ু. প. মেই (Y. P. Mei) নামক এক জন চৈনিক লেখক এই চৈনিক মুসলমান পার্থক্যবাদের হাস্যকর অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

To begin with, a large number of Muslims in China are converted Chinese. We have come across several Mahomedan families by the name of Kung, that is, descendants of Confucius. Since Chinese Buddhists do not become Indians and neither are followers of Jesus considered Jews anywhere in the world, why should Chinese Muslims become any the less Chinese ?"

তাৎপর্য। চীনের বিস্তর মুসলমান ধর্মান্তরিত চৈনিক মানুষ।" কুং" পারিবারিক-পদবীবিশিষ্ট বিস্তর চৈনিক মুসলমান দেখা যায়, তাহারা কংফুচের বংশজাত। বৌদ্ধ চৈনিকরা ভারতীয় বনিয়া যায় না, পৃথিবীতে কোথাও খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টাশ্রিত বলিয়া ইহুদী বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং চীনের মুসলমানরাই বা অন্য চীনদের চেয়ে কম চৈনিক বলিয়া পরিগণিত কেন হইবে?

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু বংশজাত। চীনের বা জাপানের অগণিত লোক বৌদ্ধ বলিয়াই যেমন অ-চৈনিক বা অ-জাপানী হইয়া যায় না, সেইরূপ ভারতবর্ষের মুসলমানেরাও অ-ভারতীয় নহে।

ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী ইংরেজরা যেমন ভারতবর্ষে জনাব জিন্নার মুসলমান পার্থক্যবাদ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সমর্থন করে, চীনের মুসলমান পার্থক্যবাদও সেইরূপ জাপানী সামরিক নেতাদের কাছে প্রশ্রয় ও উৎসাহ পায়; কারণ তাহার দ্বারা চৈনিকদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া চীনের একতা নষ্ট করা যাইতে পারে এবং চীনকে দুর্বল করা যাইতে পারে। কিন্তু চৈনিক জনমতের নেতারা সর্বপ্রকার ভেদবাদের ঘোর বিরোধী। সেই জন্যই অধিকাংশ চীনদের মধ্যে একতা আছে, ও সেই একতার প্রভাবে চৈনিক জাতি এত বৎসর ধরিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে পারিতেছে।

চৈনিক একতা ও তাহার সুফল হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে দলাদলির খুবই প্রাদুর্ভাব—কংগ্রেসে, হিন্দুদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে,…। গভীর পরিতাপের বিষয়।

পঞ্জাবের অধ্যাপক আবদুল মজীদ খান্ কোরান শরীফ হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইস্লাম পার্থক্যবাদ—মুসলমানেরা যে একটা আলাদা বংশজাত আলাদা নেশ্যন, এই মত—স্বীকার করে না। তাঁহার উদ্ধৃত একটি বচনের ইংরেজী অনুবাদের গোড়ায় আছে,

"Mankind were one nation and God sent (unto them) prophets as bearers of good tidings and as warners, ..."

তাৎপর্য। মানবজাতি এক নেশ্যন এবং ঈশ্বর তাহাদের নিকট সুসমাচারের বাহকরূপে এবং সতর্ককারীরূপে পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ প্রফেটদিগকে বা ভগবদ্বাণীপ্রচারকদিগকে) প্রেরণ করিয়াছিলেন,…।

অধ্যাপক আবদুল মজীদ খানের মতে কোরান শরীফ পাকিস্থান পরিকল্পনার বিরোধী।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য

হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বরদারাজুলু নাইডু একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, দেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রবৃত্তি করাই হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য, তাহাকে সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান দখল করা মহাসভার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ইহার প্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুদিগের একতাসাধন এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক অখণ্ডত্ব রক্ষা করা।

ডাঃ নাইডু কংগ্রেস সম্বন্ধে হিন্দুমহাসভার যে উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য তাহাই হওয়া উচিত। কংগ্রেসকে হীনবল করিলে বা নষ্ট করিলে দেশের অনিষ্ট হইবে—যদিও তাহার সংস্কার আবশ্যক। এ পর্যন্ত কথা অনেকেই বলিয়াছেন—ভাল কথা এবং প্রাজ্ঞের কথাও বলিয়াছেন; কিন্তু নিজের কথাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া স্বার্থত্যাগ ও দুঃখভোগ কংগ্রেসওআলারা যত ও যে প্রকার করিয়াছেন, অহিংস্প্রচেষ্টায় রত অন্য কোন দলের লোক তত ও সে প্রকার করেন নাই। কংগ্রেসের লক্ষ্যের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তাহার সকল মত ও কার্যপ্রণালীর সমর্থন আমরা করি না। এই জন্য তাহার সমালোচনাও আমরা আবশ্যক মত করিয়া থাকি। অন্যদেরও তাহা করিবার অধিকার আছে ও করা কর্তব্য। কিন্তু হিন্দু মহাসভার কোন কোন অবাঙালী

নেতা কংগ্রেসকে যেরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করেন, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য ডাঃ নাইডু কখনও সেরূপ আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

হিন্দু সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির যে সম্মেলন কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লাহোরে হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে হিন্দু মহাসভাও স্বাজাতিকতাবাদী।

The Hindu Mahasabha lays down that one of its essential objects is to establish good relationship with all other communities and to work with them in harmonious co-operation for achieving the common good of India.

Indeed we are fully prepared to offer equal rights of citizenship to all persons professing diverse races and religions but residing in India, subject to only one condition. That condition is that they must identify themselves without reservation with India's joys and sorrows, will claim no separate entity of their own and will be sons and daughters of Hindustan first and anything else next. The rights of minorities can be settled according to well-defined policies of adjustment enunciated by the League of Nations and so long as different communities solemnly undertake not to dominate over one another in respect of their cultural and religious rights, equal opportunities for all may be guaranteed in the constitution itself. The policy enunciated by the Hindu Mahasabha is the only policy that can be consistently pursued in relation to the present conditions in India. Ours is not a communal organisation in the sense that we are anxious to fulfil the ambitions of our community as such by depriving other communities of their legitimate rights or by lowering the flag of India herself. All that we say is that the systematic and persistent sacrifices of Hindu rights have created an intolerable situation and we are not prepared to permit any constitutional edifice to be erected on the ashes of the Hindus.

হিন্দুদের ঐক্য সম্পাদন অতি মহৎ উদ্দেশ্য। তাহা সাধন করিতে হইলে হিন্দুসমাজের মনের ভাবে, ব্যবহারে ও সামাজিক প্রথায় যে সকল পরিবর্তন আবশ্যক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার দ্বারা আহূত খুলনার ও কৃষ্ণনগরের সম্মেলনের প্রধান কোন কোন প্রস্তাবে তাহা বলা হইয়াছে। সেই সকল প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার তাগিদ আমরা "প্রবাসী"তে একাধিক বার দিয়াছি।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক অখণ্ডত্বের প্রধান শত্রু এখন পাকিস্তান পরিকল্পনা। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগে তাঁহার অনুচরেরা এ বিষয়ে অযৌক্তিক জেদ দেখাইতেছেন। অন্য মুসলমানেরা যাঁহারা সংখ্যায় জনাব জিন্নার দলের চেয়ে খুব বেশি—যেমন অর্হর দল, জমিয়ৎ-উল-উলেমার দল ও সমর্থকগণ, এবং মোমিনগণ—তাঁহারা পাকিস্তানের বিরোধী। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের প্রধান ব্যক্তিরা ভিতরে ভিতরে জনাব জিন্নার মুরুব্বি আছেন বলিয়া পাকিস্তানের সমর্থকেরা নিরস্ত হইতেছে না। আমরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে "মডার্ণ রিভিয়ু" ও "প্রবাসী"তে অনেক বার লিখিয়াছি। এ বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ "মডার্ণ রিভিয়ু"তে অনেক ছাপিয়াছি।

—

দৈনিক বসুমতীর শাস্তি

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ বঙ্গের মন্ত্রীরা আপত্তিজনক মনে করায় কাগজখানি তিন সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে হুকুম দিয়াছেন। আইন-সভায় এই জন্য মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। তাহার প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যতম সমর্থক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উভয়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী এবং পরস্পর ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা। তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রবন্ধটিতে আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পান নাই। সংবাদপত্রসমূহের পরামর্শদাতা একটি বেসরকারী কমীটি আছে। তাঁহারা প্রবন্ধটিতে কিছু খুঁৎ দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কি করা উচিত সে বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত কিছু সময় চাহিয়াছিলেন; তাহা তাঁহারা পান নাই। তাঁহাদের মতে শাস্তিটা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

এই কমীটি একথা বলেন নাই যে, প্রবন্ধটিতে এমন কিছু আছে, যাহাতে জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বা যুদ্ধের আয়োজনে বাধা ঘটিতে পারে। সরকার-পক্ষ আত্মসমর্থনে যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও এমন কথা নাই যে বসুমতীর লেখাটার দ্বারা যুদ্ধজয়ে ব্যাঘাত জন্মিবার কোন সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রবন্ধটি মোটেই যুদ্ধবিষয়ক নহে। সুতরাং "ভারতবর্ষ-রক্ষা আইন" (Defence of India Act) অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া বসুমতীকে শাস্তি দেওয়া আইনের ও ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়াছে।

মন্ত্রীদের মতে বসুমতীর প্রবন্ধটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ উত্তেজক। তাহা হইলে বাংলা "আজাদ" ও ইংরেজী "স্টার অব ইণ্ডিয়া"র বিরুদ্ধে ঐ আইন প্রযুক্ত হয় না কেন? তদ্ভিন্ন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উৎপাদন অপরাধে ত সাধারণ আইন অনুসারে শাস্তি হইতে পারে? বসুমতীর বিরুদ্ধে সেই অপরাধে কেন সরকারী মোকদ্দমা হইল না? তাহার কারণও আইন-সভায় মন্ত্রিমণ্ডলবিরোধী দলের পক্ষ হইতে যাহা উল্লিখিত

হইয়াছে তাহা এই যে, ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডল বসুমতীর বিরুদ্ধে মামলাযুদ্ধে হাইকোর্টে হারিয়া গিয়াছেন; সেই জন্য এবার এরূপ উপায়ে বসুমতীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বা তাহার নীচের কোন আদালতে আপীল নাই।

দৈনিক বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক দমিয়া যান নাই। "টেলিগ্রাফ বসুমতী" বাহির হইতেছে। তাঁহাদের অদম্যতা ও উদ্যমশীলতা প্রশংসনীয়।

—

সবাই মিথ্যাবাদী কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নহে!

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব সেন্সস উপলক্ষ্যে এই মর্মের মত প্রকাশ করেন যে, হিন্দু আইনজীবী শিক্ষাব্রতী উচ্চবর্ণের হিন্দু তপসিলি হিন্দু প্রভৃতি সবাই মিথ্যা করিয়া হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ মতের এরূপ অর্থ করা অযৌক্তিক নহে যে, মৌলবী সাহেবের মতে সব হিন্দু উকীল ব্যারিস্টার সব হিন্দুশিক্ষক অধ্যাপক মিথ্যাবাদী। তদনুসারে এক জন হিন্দু উকীল হক সাহেবের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। বিচারক যেরূপ রায় দিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন তাহার মানে এইরূপ করা যায় যে, কেহ যদি সবাইকে মিথ্যাবাদী বলেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সেই "সবাই"এর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তিবিশেষকেই মিথ্যাবাদী বলা হয় না। আইন হয়ত ঠিক্ এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে আইনের ফাঁক দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়ার চেয়ে সংযতবাক্ ও বিবেচক হওয়াই শ্রেয়ঃ নহে কি?

—

বঙ্গে বয়স্কদের শিক্ষা

বিহার যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেসী গবন্মেণ্ট যত দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত দিন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রদেশে নিরক্ষর বয়স্ক লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পদত্যাগ করিবার পরও সে চেষ্টা চলিতেছে। বাংলা দেশে মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে সেরূপ কোন চেষ্টা হয় নাই। সেই জন্য আইন-সভায় বগুড়ার প্রতিনিধি খান বাহাদুর মোহম্মদ আলী প্রস্তাব করেন যে, বর্তমান বৎসরের বজেটে বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হউক। আর এক জন সদস্য, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন ও বলেন যে, ১৯৪০-৪১এর বজেটে এই কাজের জন্য যে "বিপুল" ৭৯০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল, তাহারও সবটা ব্যয় হয় নাই। সরকার-পক্ষ থেকে সত্যপ্রিয় বাবুর এই উক্তির কোন প্রতিবাদ হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ৭৯০০০ টাকার কোন অংশও যে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা জানা নাই।

উত্তর দিতে উঠিয়া মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খানসাহেব কতকগুলা মামুলি বুলি আওড়াইয়া দেন। যথা—সরকার বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন (উপলব্ধি করিতে চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে!), এবং বয়স্কদের শিক্ষার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা সম্প্রতি সরকারের বিবেচনাধীন আছে, ইত্যাদি। "সম্প্রতি"র মানে কি? কত দিন বিবেচনাধীন আছে? পরিকল্পনাটা যে কিবিধ, তাহা সর্বসাধারণের অবিদিত। পরিকল্পনা ত আগেও হইয়াছিল, একাধিক কমীটিও বসান হইয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই।

মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রায় দেড় লক্ষ বয়স্ক লোক শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে। একথা কি সম্পূর্ণ সত্য? কোন্ কোন্ সরকারী কেন্দ্রগুলিতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়? তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি কোথায়? সরকারী কোন্ কোন্ কর্মচারী কোথায় কি ভাবে কেন্দ্রগুলির শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন? কোন্ কেন্দ্রে কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য দান করা হইয়াছে? এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা উচিত। বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি (Bengal Adult Education Association) প্রভৃতি যে-সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কাজে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহাদিগকে কিছু উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি? বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত যে-শ্রেণীর সাহিত্য, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে তাহা কি প্রকার? না হইয়া থাকিলে কেন হয় নাই?

"কবয়ঃ"

যাঁহারা সামান্য সংস্কৃতও জানেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে, "কবয়ঃ" "কবি" শব্দের বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃত যাঁহারা মোটেই জানেন না এরূপ পাঠকদের জন্য বলা দরকার যে, এবার প্রবাসীতে প্রকাশিত একাঙ্ক

নাটিকাটি কয়েক জন কবিসুবিধাপ্রার্থী কাল্পনিক ব্যক্তির সম্বন্ধে পরিহাস। তাহাদিগকে কবি না বলিয়া কবিকল্প বলা যাইতে পারে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ ও রবীন্দ্রনাথ

গত বৎসর ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মর্ত্ত্যলোক হইতে অমর্ত্ত্য লোকে যাত্রা করেন। তিনি বংশতঃ ইংরেজ হইলেও সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যেখানে যে-কোন জাতির যে-কোন লোকদের দুঃখ, নির্যাতন, অপমানের কথা তিনি শুনিতেন, তাহাতেই তিনি বেদনা বোধ করিতেন; এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেন। বিশেষ করিয়া তিনি 'ভারতভূমিকেই' নিজের দ্বিতীয় মাতৃভূমিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং দুর্গত ভারতীয়দের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টাই অধিক পরিমাণে করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মন যেমন শান্তি পাইত, এমন আর কোথাও না। সবরমতীর আশ্রমও তাঁহার প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনেই আগে আগে বেশী সময় থাকিতেন; জীবনের শেষের দিকে দীর্ঘকাল দক্ষিণ-ভারতে থাকিয়া মৃত্যুর পূর্বে কলিকাতায় হাসপাতালে যাইবার আগে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনেই বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলিতেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা কিরূপে হইল এবং কেমন করিয়া শাসক-ইংরেজ-সুলভ ঔদ্ধত্য বা মুরুব্বিয়ানার পরিবর্তে তাঁহার মনে ভারতপ্রীতির অভিব্যক্তি ("evolution") ক্রমে ক্রমে হইল, তাহা তিনি ১৯৩৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ওরিয়েণ্ট ইলাস্ট্রেটেড উইক্লিতে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতের কথাও তাহাতে আছে। তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। স্থান ও সময়ের অল্পতাবশতঃ অনুবাদ দিতে পারা যাইবে না। প্রবন্ধটির আরম্ভ এইরূপ :—

It would be difficult to describe in adequate terms the debt which I owe to Gurudev, Rabindranath Tagore. Let me try to explain in this week's *causerie* for *The Orient Illustrated Weekly*, some small fraction of what that debt has been : for it has changed the whole course of my life in India and made me able to understand her people.

The first great reaction came before I met Tagore himself; and it happened in a remarkable manner through reading those translations of his writings which appeared from time to time in *The Modern Review*. Every word which he thus gave to the Press, seemed to have its powerful effect on me and made me long to see the author.

ভারতবর্ষের ও ভারতের লোকদের প্রতি প্রভু ও শাসক ইংরেজ জাতির অনেকেরই মনে একটা অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের ভাব আছে। যে-সব ইংরেজ কতকটা ভাল, তাহাদের মনে তাহার পরিবর্তে আছে মুরুব্বিআনার ভাব। এই মুরুব্বিআনার ভাবটা এণ্ড্রুজের মন থেকে কেমন করিয়া গেল, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন :—

This note of 'patronising' had to be entirely obliterated in my own case if sincerity and reality were to come into the perspective of Indian affairs. Here, Sushil Kumar Rudra, the Principal of St. Stephens College, Delhi, who was the first and greatest among my Indian friends, did me an inestimable service. As a true friend, he pointed out to me this bad habit of mine of assuming a patronising attitude, when I ought really to be understanding how very far from my father's own idea of perfection the administration of India by the Civil Service had been : how there was a haughtiness and arrogance in this very idea of one race being set to rule over another, as if the race that ruled was 'superior' and the race that was ruled over was 'inferior.'

বিদেশী শাসকদের আমলে বাণিজ্যিক উপায়ে ভারত-বর্ষের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহাও সুশীল রুদ্র মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। তাহার পর "জনৈক ভারত প্রেমিকের ক্রমবিকাশ" (**"The Evolution of a Lover of India"**) উপশীর্ষনাম দিয়া ঐ প্রবন্ধে এণ্ড্রুজ লিখিয়া গিয়াছেন :—

A second influence was that of Ramananda Chatterjee, the Editor of *The Modern Review*. From the first day that it was published, I used to be one of its most enthusiastic supporters and readers. Also, from time to time, the editor kindly allowed me to contribute an article. All this going on year after year, formed an admirable training for me in getting rid of that old conceit about the perfection of British rule with which I had started, owing chiefly to my home upbringing.

তাহার পর "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব" (**"Tagore's Influence"**) সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহার গোড়ার কয়েকটি বাক্য এইরূপ :—

Without all this preparation, I should not have been able to appreciate, immediately and instinctively, Tagore's writings, when I came across them in *The Modern Review*. But with Principal Rudra by my side, it was not difficult to do so. Whatever I read (and it was only a very small amount) at once struck me as coming from one who had a perfectly balanced mind and a depth of vision far beyond that of any one I had read before on the Indian problem. He also had evidently a style as a writer which even in an English translation was manifest.

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

উপরে উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফগুলিতে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কয়েক বার মডার্ণ রিভিয়ুর নাম করিয়াছেন। তিনি

অনুগ্রহ করিয়া ঐ মাসিক পত্রে বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; কিছু কবিতাও লিখিয়াছিলেন। মাসিক কাগজের জন্য লিখিত তাঁহার শেষ লেখা মডার্ণ রিভিয়ুতেই বাহির হয়। যে এপ্রিল মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়, সেই এপ্রিলের মডার্ণ রিভিয়ুতেও তাঁহার লেখা ছিল।

শান্তিনিকেতন তাঁহার প্রিয় "হোম" এবং প্রধান কার্যক্ষেত্র ছিল। তাঁহার স্মারক যাহা কিছু হইবে, তাহা এইখানেই করিবার প্রস্তাব অতি উত্তম। মহাত্মা গান্ধী এই জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন। এই টাকা সংগৃহীত হইলে আনন্দিত হইব। না হইলে তাহা লজ্জার বিষয় হইবে।

—

দীনবন্ধু এণ্ড্রূজের রাজনৈতিক মত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনুকূল মত দীনবন্ধু এণ্ড্রূজ কুড়ি বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে, প্রকাশ করেন। তাহার পর তিনি গত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে পুনর্বার এই মত প্রকাশ করেন। তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

In order to avoid any wrong impression let me add that I entirely agree with Prof. Seeley, when he says that '*prolonged* submission to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration.' I quote from memory. The emphasis there is on the word 'prolonged.' Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote, in 1921, called 'The Immediate Need of Independence,' where I emphasized the word 'immediate,' and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once.

এণ্ড্রূজ পনর মাস পূর্বে এই সব কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষে উপদ্রব ও অশান্তি এবং নানা সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থার এই ক্রমাবনতির সহিত দেশের পরাধীনতার যে সম্পর্ক আছে তাহা স্বীকার্য।

—

বিবাহে পণ দান নিয়ন্ত্রক বিল

গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী বিল সমূহের আলোচনা হয়।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বঙ্গীয় বিবাহ-পণ-প্রথা নিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত করিয়া তাহা সিলেক্ট কমীটির হাতে দিতে চান। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বিবাহে পণ লওয়ার প্রথা যাহাতে বন্ধ হয় তাহারই উদ্দেশ্যে এই বিল পেশ করা হইয়াছে। বিলের প্রধান ধারা এই যে, কেহই বিবাহকালে একান্ন টাকা মূল্যের অধিক পণ দিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশ্য ইহার মধ্যে স্বেচ্ছায় পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক যে সমস্ত গহনা বা তৈজসপত্র দিবেন, তাহা ধরা হইবে না। এই **স্বেচ্ছার** ছিদ্র দিয়া পণ ঢুকিবার সম্ভাবনা আছে। বিলটি জনমতসংগ্রহার্থ প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—

ধীবরদের অধিকার সংরক্ষক বিল

গত ২২শে চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ধীবরদের অধিকার আইনগত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুত অমৃতলাল মণ্ডল দুইটি বিল আনয়ন করেন এবং তাহা সিলেক্ট কমীটির হাতে দিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—বিল দুইটি সমর্থন করিয়া বলেন যে, যে ব্যবসার উপর বহু লোকের অন্নবস্ত্র সংস্থান নির্ভর করিতেছে, তাহা গবর্ন্মেণ্ট এত কাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

মন্ত্রী তমিজুদ্দীন খাঁ উত্তর দিতে উঠিয়া স্বীকার করেন যে, ধীবরেরা নানা রকম ভাবে নির্যাতিত ও পর্যুদস্ত হইয়া থাকে এবং আইন করিয়া তাহাদের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। গবর্ন্মেণ্ট এই সম্বন্ধে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা করিতে উদগ্রীব। এজন্য এক জন বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তাঁহার রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া একটি বিল আনয়ন করা হইবে। বর্তমান বিল দুইটির মধ্যে অনেক দোষত্রুটি আছে বলিয়া তিনি বিল দুইটিতে আপত্তি করেন।

বিল দুইটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

ইহা ঠিক হইয়াছে বলা যায় না। মন্ত্রীরা চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। এখনও বলিতেছেন পরিকল্পনার কথা। বিল দুটিতে যে "দোষত্রুটি" আছে, তাহা সিলেক্ট কমীটিতে সুধরাইয়া লওয়া চলিত।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে চাঁদপুরের ধীবরদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের অধিকারচ্যুতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা প্রবন্ধ ছাপিয়াছিলাম। তাহাতে এ-বিষয়ে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ধীবরদের দুঃখ দুর্গতি কিছু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বিশেষ কর্মচারীটি কে?

যুগোশ্লাভিয়ার নূতন গবর্ন্মেণ্ট

যুগোশ্লাভিয়ার নূতন গবর্ন্মেণ্ট সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার আগেকার গবর্ন্মেণ্ট জার্মেনী-ইটালীর দলে যোগ দিয়াছিল। সেই গবর্ন্মেণ্টকে উল্টাইয়া দিয়া এই নূতন গবর্ন্মেণ্ট স্থাপিত হয়। তখন ব্রিটেন ও আমেরিকা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে জার্মেনী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলে, উক্ত দুই রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়াকে সাহায্য করিবে। জার্মেনী বাস্তবিক তাহাকে আক্রমণ করিলে রাশিয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে, না নিরপেক্ষ থাকিবে, বলা যায় না। ইহা লিখিত হইবার দুই দিন পরে দৈনিক কাগজে জার্মেনীর যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের সংবাদ বাহির হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষের সৈন্য যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্যার্থ ইতিমধ্যেই গ্রীস-সীমান্তে পৌঁছিয়াছে। আমেরিকাও অতি শীঘ্র সাহায্য পাঠাইতে প্রস্তুত হইতেছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী ঠিকা দেওয়া

বঙ্গীয় রাষ্ট্রপরিষদে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বঙ্গের সকল জেলায় মুসলমান ও তপসিলি হিন্দুদিগকে অধিক পরিমাণে সরকারী ঠিকার টেণ্ডার দিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং কম দর ও কার্যকরতার দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে বাঁটিয়া দিতে হইবে। সকল বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইয়া দেশের সর্বনাশ করা হইতেছে। যে ভাল কাজ দিবে, ভাল জিনিস দিবে, অথচ দর কম দিবে, সম্প্রদায়নির্বিশেষে তাহাকেই ঠিকা দেওয়া উচিত। অবশ্য সর্বনিম্ন দর যে দিবে, তাহাকেই যে ঠিকা দিতে হইবে, এমন নয়। সে ভাল কাজ বা ভাল জিনিস দিতে পারিবে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে জেলা সমূহে ঠিকা দিবার অর্থ স্পষ্ট নহে। যে-জেলার ঠিকা, সেই জেলার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে ঠিকা বাঁটিয়া দিতে হইবে, না সর্বত্রই মুসলমানদিগকে অন্ততঃ শতকরা ৫৪টা বা শতকরা ৫৪ টাকার ঠিকা দিতে হইবে? যদি সকল জেলায় ঐ হারে দিতে হয় তাহা হইলে যে-সকল জেলায় মুসলমান খুব কম, সেখানে তাহারা ঐ হারে ঠিকা পাইবে, আবার যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় শতকরা ৫৪রও বেশি, সেখানে তাহারা ৫৪রও বেশি পাইয়া যাইবে—কারণ এখন মুসলমান উজীরী আমল চলিতেছে।

আর্থিক সুবিধা অসুবিধা যাহাদেরই হউক, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপনের আশা ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে দুরাশা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কেবল হিন্দুর যাহাতে ক্ষতি, এরূপ সব সাম্প্রদায়িক আইন ও প্রস্তাবে ইয়োরোপীয় সদস্যেরা মন্ত্রীদের দলে ভোট দেয়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাদের নিজেরও অসুবিধা হইবে বলিয়া সাম্প্রদায়িক সংখ্যা অনুসারে ঠিকা বাঁটিবার প্রস্তাবের তাহারা বিরোধিতা করে।

সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া

এত কাল এই নিয়ম ছিল যে, যোগ্যতা থাকিলে যে-কেহ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই পরীক্ষা আগে কেবল বিলাতে লওয়া হইত, কয়েক বৎসর হইতে ভারতেও লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি গবর্ন্মেণ্ট, ভারতবর্ষে যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদের সংখ্যা বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং সেই সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার এই কারণ দেখান হইয়াছে যে, পরীক্ষার কেন্দ্র দিল্লীতে নাকি এত বড় হল নাই যাহাতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিবার স্থান সংকুলান হইতে পারে। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মান্দ্রাজ বোম্বাই নাগপুর কলিকাতা পাটনা এলাহাবাদ লাহোর প্রভৃতি শহরেও কি যথেষ্ট বড় হল নাই? এইগুলার কোন এক একটা শহরে প্রতি বৎসর কেন্দ্র করিলেই ত হয়। আর একটা কারণ এই দেখান হইয়াছে যে, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয় ও তাহাদের অভিভাবকদের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়। তাহার ভাবনা দরদী সরকার না ভাবিয়া অভিভাবকদিগকেই ভাবিতে দিলে কি ক্ষতি হইত?

পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা বাঁধিয়া দিয়াই গবর্ন্মেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই। কোন্ প্রদেশ কত পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় পাঠাইতে পারিবে, তাহাও বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষ্যার আর একটি কারণ বাড়ান হইল—এখন বোধ করি যথেষ্ট কারণের অভাব আছে বলিয়া! একটি দৃষ্টান্ত লউন। পঞ্জাবকে ৪৮ জন পরীক্ষার্থী পাঠাইতে দেওয়া হইবে, বোম্বাইকে ২২। সিন্ধুদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে বাহির করিয়া লইবার পর ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে তাহার লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ, এবং পঞ্জাবের দু-কোটি চল্লিশ লক্ষ। লোকসংখ্যা অনুসারে পঞ্জাব যদি পায় ৪৮, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের

পাওয়া উচিত ৩৬; কিন্তু তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ২২। গবর্ন্মেণ্ট পঞ্জাব হইতে খুব বেশি পরিমাণে সিপাহী লইয়া থাকেন। সেই কারণে সিবিলিয়ানও কি বেশি পরিমাণে সেখান হইতে লইতে হইবে? নতুবা বোম্বাইয়ের লোকদের চেয়ে পঞ্জাবের লোকদের বুদ্ধিবিদ্যা ও সিবিলিয়ানি কার্য-দক্ষতা স্বভাবতই বেশি, এরূপ মনে করিবার ত কোন কারণ নাই।

আমেরিকার ঋণ ও ইজারা বিল পাস

যাহাতে ব্রিটেনকে বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকা নানা প্রকারে যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারে, সেই জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসে "ঋণ ও ইজারা বিল" নামক এই বিল তথাকার গবর্ন্মেণ্ট পেশ করেন। বহু তর্কবিতর্কের পর উহা আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি।

ব্রিটেনকে আমেরিকা কত বেশি পরিমাণ সাহায্য করিবে, তাহা কেবল এই একটা তথ্য হইতেই বুঝা যাইবে, যে, "ঋণ ও ইজারা আইন" পাস হইবার পর রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ঋণ ও ইজারা দান বাবতে একটি বরাদ্দ কংগ্রেসে মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন; উহার পরিমাণ ৭০০,০০,০০,০০০ (সাত শত কোটি) ডলার, অর্থাৎ একুশ শত কোটি টাকা।

আমেরিকা যে ব্রিটেনকে তাহার নিজের আইন অনুসারে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহা সন্তোষের বিষয় এই জন্য যে, আমেরিকার সাহায্য ব্যতিরেকে ব্রিটেন বর্তমান যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিতে সম্ভবতঃ সমর্থ হইত না। ব্রিটেনের পরাজয় মানে ব্রিটেনের স্বাধীন দেশরূপে অস্তিত্ব লোপ। পৃথিবীতে ব্রিটেন স্বাধীন না থাকিলে তাহা জগতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের প্রতি ব্রিটেনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহার যাহাই হউক, আমরা ইচ্ছা করি ব্রিটেন স্বাধীন থাকুক। পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের সংখ্যা যত বেশি থাকে, যত বেশি বাড়ে, যত বেশি হয়, মানব জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

এই জন্য, যেহেতু ব্রিটেন ভারতবর্ষকে অধীন করিয়াছে ও রাখিয়াছে, অতএব ব্রিটেনও কাহারও অধীন হউক, এরূপ কোন প্রতিহিংসার ভাব আমাদের নাই।

কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, আমাদের পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান আমরা অনুভব করি না ও স্বাধীন হইতে চাই না। পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান আমরা অনুভব করি এবং স্বাধীন হইতেও চাই। কিন্তু অন্য কোন দেশ অধীন হইলে—ব্রিটেন অধীন হইলে—তবে ভারত স্বাধীন হইবে, ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে। কাহারও অমঙ্গলচিন্তার পথে আমরা আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করি না। আমাদের প্রকৃত কল্যাণের সহিত জগতের—জগতের কোনও অংশের—কল্যাণের অসামঞ্জস্য নাই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আমাদের জন্মের আগে আমাদের পূর্বজ ও অগ্রজেরা আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের জীবিতকালে তাহা চলিতেছে, এবং আবশ্যক হইলে আমাদের পরবর্তীরা ইহা চালাইতে থাকিবেন।

আমেরিকা জগৎস্বাধীনতাকামী হইলে কি করিতে পারিত

নিজেদের ছাড়া অন্য কাহারও স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা উদ্বিগ্ন নহে, এমন নয়। আমেরিকা যে ব্রিটেনের সাহায্য করিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই কতকটা ব্রিটেনের এবং পরোক্ষভাবে জার্মানবিজিত দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য; কিন্তু কতকটা, যাহাতে নিজে বিপন্ন না-হয়, সেজন্যও বটে। ইহা আমাদের অনুমান নয়। গত কয়েক মাসে রুজভেল্ট যে-সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মধ্যেও আমেরিকার জার্মেনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কার কথা আছে।

আমেরিকা যে ব্রিটেনের সাহায্য করিতেছে, তাহার প্রকৃত ও প্রধান কারণ ঐ। কিন্তু আমেরিকা বিশ্ব-স্বাধীনতা ও সারা জগতে গণতন্ত্র চায়, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং অন্য কোন কোন আমেরিকান নেতা এরূপ কথাও বার বার বলিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কপট কথা বলিয়াছেন কেমন করিয়া বলিব? বিশ্বের স্বাধীনতা এবং সকল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁহাদের মনে উদিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা তাঁহাদের প্রধান ও গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের কথা ভাবিতেন।

ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন থাকায় ব্রিটেনের ঐশ্বর্য ও শক্তি বাড়িয়াছে এবং তাহার সাম্রাজ্য বিশাল হইয়াছে। এই কারণে ব্রিটেন অন্য অনেক জাতির ঈর্ষ্যার পাত্র। ব্রিটেনের দেখাদেখি তাহারাও সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে চায়। পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যলিপ্সার উচ্ছেদ করিতে হইলে সাম্রাজ্যস্থাপনে পথপ্রদর্শক ব্রিটেনের অধীন প্রধান দেশ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা আবশ্যক। এই কথা দশ বৎসরেরও আগে মডার্ণ রিভিয়ুতে স্বর্গত আচার্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ড বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

অতএব সত্যই জগৎস্বাধীনতাকামী কোন দেশ যদি ব্রিটেনের সাহায্য করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এইরূপ ভাবা অনিবার্য, "আমরা জগতের স্বাধীনতা চাই, ব্রিটেনকেও স্বাধীন রাখিতে চাই; কিন্তু দেখিতেছি ব্রিটেন নিজেই অন্য কতকগুলা দেশকে—তন্মধ্যে ভারতের মত প্রাচীন সভ্য ও বৃহৎ দেশকে—নিজের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব ব্রিটেনকে আমাদের বলা উচিত, 'তোমাকে আমরা স্বাধীন থাকিতে সাহায্য করিতে চাই, কিন্তু তোমারও অন্য পরাধীন দেশকে স্বাধীন হইতে ও থাকিতে সাহায্য করা উচিত। দেখিতেছি তুমি স্বয়ং ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখিয়াছ; তাহাকে স্বাধীন হইতে দাও।'" কিন্তু আমেরিকা এরূপ কিছু করে নাই। বস্তুতঃ সে-দেশ গভীর ভাবে ও প্রকৃতই জগৎ-স্বাধীনতাকামী হইলে সে ব্রিটেনকে সাহায্য দিবার এই একটি সর্ত করিত, "তুমি ভারতকে স্বাধীন হইতে দাও, অন্ততঃ যুদ্ধশেষে তাহাকে স্বাধীনতা দিবে তোমার পার্লেমেণ্টের দ্বারা এইরূপ পাকা কথা দাও, তবে আমার সাহায্য পাইবে, নতুবা পাইবে না।" আমেরিকা এরূপ সর্ত করিলে ব্রিটেন এই সঙ্কটকালে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইত।

কিন্তু আমেরিকা ওরূপ কিছু সর্ত করে নাই। কেন করে নাই? করে নাই প্রধানতঃ এই জন্য যে, জগতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা তাহার একটা প্রধান ও গভীর ইচ্ছা নহে। কিয়ৎপরিমাণে আর একটা কারণও বিদ্যমান থাকিতে পারে। অনেক দিন হইতে আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভাড়াটিয়া রাজনৈতিক ইংরেজ প্রচারকেরা ভারতবর্ষের নিন্দা কুৎসা ও ভারতে ব্রিটেনের মহৎ মিশন ও কাজের কথা রটাইয়া আসিতেছে। এখনও সে-কাজ চলিতেছে। এখন শুধু ইংরেজ প্রচারক নহে, বিলাত হইতে আমেরিকায় গিয়া কয়েক জন ভাড়াটিয়া ভারতীয়ও এই কাজ করিতেছে। অন্য দিকে ভারতবর্ষের পক্ষের কথা কে বলে? বহু বৎসর পূর্বে আচার্য স্যাণ্ডারল্যাণ্ড যখন তাঁহার "শৃঙ্খলিত ভারত" ("India in Bondage") বহি আমেরিকায় ছাপাইতে চান, তখন ব্রিটিশ প্রভাবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত তিনি প্রকাশক পান নাই, অনেক হাজার ডলার খরচ করিয়া তবে তিনি এক জন প্রকাশক পাইয়াছিলেন। কোন সময়েই ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা আমেরিকায় হয় নাই। এখন সে দেশে ভারতবর্ষের কথা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা, জানাইবার লোক নাই। ভারতের স্বাধীনতাবাদী কাগজ-গুলিকে—তাহার মধ্যে মডার্ন রিভিয়ুও আছে—আমেরিকায় পাঠাইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং এখন সম্ভবতঃ ব্রিটিশ প্রচারের ফলে আমেরিকার লোকেরা বুঝিয়া বসিয়া আছে, যে, হতভাগা ভারতীয়গুলার স্বদেশের কাজ চালাইবার যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাহাদিগকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং পরে (কোনও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে!) আরও দিবে।

সুতরাং ব্রিটেনকে আমেরিকার সাহায্যদান ভারত-বর্ষের স্বাধীনতালাভসাপেক্ষ, আমেরিকা এরূপ সর্ত কেন করিবে?

দাঙ্গায় বিপন্ন লোকদের সাহায্য

বাংলা দেশের অনেকগুলি জায়গায় দাঙ্গায় অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। তাহারা যে-যে স্থলে আপন পরিবার-বর্গের একমাত্র বা অন্যতম উপার্জক ছিল, সেই সকল স্থলে সেই সব পরিবারের লোকের সাহায্যের একান্ত আবশ্যক; যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের পরিবারবর্গেরও সাহায্য আবশ্যক; বিশেষতঃ যাহারা গরীব। অনেক গৃহস্থের ঘরবাড়ী সর্বস্ব ভস্মীভূত হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সঙ্গতিপন্ন অনেক ব্যবসায়ীর দোকানপাট ভস্মীভূত হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য যত সাহায্য-কমীটি গঠিত হইয়াছে, সর্ব-সাধারণ নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে তাহাদিগকে সাহায্য প্রেরণ করুন, আমাদের এই প্রার্থনা।

অন্ধদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা

অন্ধ বিদ্বান্ ডক্টর সুবোধচন্দ্র রায় পাশ্চাত্য বহু দেশের অনুকরণে এ দেশের ত্রিশ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধদের শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে অন্ধদিগকে সাধারণশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও সংগীতশিক্ষা দেওয়া হইবে। বঙ্গে যে ১৭৯ জন অন্ধ বধিরমূক আছে, তাহাদিগকেও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে। অন্ধদের বহি ছাপিবার উপযোগী একটি ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

এই উদ্যমের সাফল্য প্রার্থনীয়।

আমরা "দাসী" পত্রিকার প্রথম বৎসরে, বোধ হয় বাংলা ১২৯৮ বা ১২৯৯ সালে অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া-

ছিলাম, এবং তাহাতে অন্ধদের ব্রেল বর্ণমালা বাংলায় কিরূপ হইতে পারে, তাহাও দেখাইয়াছিলাম। ডক্টর সুবোধচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, যাহা বাংলা "শাহা ব্রেল" ("Shaw Braille") নামে পরিচিত, তাহা ইহার কয়েক বৎসর পরে রচিত হয় এবং তিন-চারিটি অক্ষর ছাড়া আমাদের ব্রেল ও শাহা ব্রেল একই রকম। অবশ্য, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে যে, শাহা মহাশয় স্বাধীনভাবে তাঁহার বর্ণমালাটি রচনা করেন নাই। কেবল সামান্য ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে উপরের কথাগুলি লিখিত হইল।

—

দাসাশ্রমের স্থাপনকর্তা কাহারা

"দাসী" পত্রিকার কথায় মনে পড়িয়া গেল যে, আমরা কিছু কাল হইল লিখিয়াছিলাম, পরলোকগত হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। প্রকৃত তথ্য এই যে, দাসাশ্রম তাহার প্রতিষ্ঠা-স্থান জালালপুর হইতে যখন কলিকাতায় লইয়া আসা হয়, তখন তাহার যে কমীটি গঠিত হয়, শরৎবাবু তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। জালালপুরে ঐ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের বৃত্তান্ত "দাসী" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আছে।

—

হক-মন্ত্রিমণ্ডলী ও বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক ২ নং বিলের প্রতিবাদকল্পে গত ২২শে চৈত্র কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের একটি সম্মিলিত সভার অধিবেশন হয়। প্রধানতঃ বহু মুসলমান নেতা নেতৃত্ব করেন এবং সংশোধক বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা পৃথক্ নির্বাচন প্রথা রদ করিয়া মিশ্র নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জ্ঞাপন করেন। সৈয়দ হবিবুর রহমান সাহেব এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অংশতঃ বলেন :—

আজ বাংলার দিকে তাকাইলে গভীর নৈরাশ্য ও বেদনায় মন ভরিয়া উঠে। যে বাংলা এক দিন স্বাদেশিকতার মহামন্ত্রে সমগ্র ভারতে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল, আজ সেই বাংলা কোথায়? কোথায় সেই স্বাধীনতার পূজারী বাংলার যুবশক্তি? যে বাঙালী এক দিন আপন বুদ্ধিমত্তার জন্য মনে মনে গৌরব বোধ করিয়াছে, আজ তাহাদের সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখিলে কে তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া ভ্রম করিবে? আজ বাংলার আকাশ ও বাতাস সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বঙ্গ-ভূমির রসে হিন্দু মুসলমান সমান ভাবে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পাশাপাশি ঘর বাঁধিয়া যে ভূমিতে হিন্দু মুসলমান বসবাস করিয়া আসিয়াছে, আজ সেখানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অসহ্য তিক্ততা কেন?

যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত নহেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই রোগের মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন। আজ আর এ কথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে অশুভক্ষণে ধর্ম্মের জিগীর তুলিয়া, ইসলাম রক্ষার জন্য সংগ্রামের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইক্ষণ হইতেই সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, মন্ত্রিমণ্ডলী আজ নিজ মসনদ রক্ষার জন্য ধর্ম্মের নামে সাধারণ লোককে ধাপ্পা দিয়া চলিয়াছেন। যে বিষবৃক্ষ তাঁহারা রোপণ করিয়া চলিয়াছেন তাহার ফল স্বরূপ আজ অরাজকতা বাংলার প্রগতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবনে উপদ্রবের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আদমসুমারীর পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রীর লেখনী হইতে যে-বিষ উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহা কোন দায়িত্বসম্পন্ন জননেতার মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। বাংলার যখন এই অবস্থা, তখন কলিকাতা কর্পোরেশন সংশোধন আইন এক নূতন উপদ্রব রূপে কলিকাতার নাগরিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সর্ সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত চেষ্টায়, বাঙালীর শতাব্দীব্যাপী সাধনায় কলিকাতা কর্পোরেশনে যে স্বায়ত্তশাসন আসিয়াছিল, বর্ত্তমান মন্ত্রীরা অ-বাঙালী মুসলমানের সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করিবার জন্য সেই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানটি আমলাতন্ত্রী গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ কর্পোরেশনে বাঙালী মুসলমানের স্থান নাই, সব অ-বাঙালী মুসলমান কর্পোরেশনের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। বাংলায় আজ বাঙালী মুসলমানের স্থান নাই—ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়? কর্পোরেশনকে হাত করিবার জন্য আজ রব উঠান হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের দুর্নীতি নিবারণের জন্য সরকারী আধিপত্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে! উদ্দেশ্য যেখানে মন্দ, সেখানে অজুহাতের অভাব হয় না।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করাও যায় যে, কর্পোরেশনের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তথাপি রোগ সারাইবার অছিলায় রোগীকে মারিয়া ফেলিবার যুক্তি যেমন অদ্ভুত, দুর্নীতি নিবারণের অছিলায় একটি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী আয়ত্তে আনিবার যুক্তিও তেমনি অদ্ভুত। যখন মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা উঠাইয়া পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, কর্পোরেশনে বাঙালী মুসলমানের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। এত দিনে মন্ত্রিগণের সুব্যবস্থায় সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। মন্ত্রিমণ্ডলী বলিয়া থাকেন যে, বাঙালী মুসলমানের জন্য তাঁহাদের চক্ষুতে নিদ্রা নাই। যদি তাহা সত্য হইত, তবে কর্পোরেশনের বাঙালী মুসলমানের জন্য চাকুরীর কোন ব্যবস্থা না করিয়া অবাঙালী মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া চাকুরী দেওয়া হয় কেন? কেন কাউন্সিলারদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ইহার একমাত্র কারণ মন্ত্রীদের স্বার্থ।

আজ বাঙালী মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অত্যাচার ও অনাচার নিবারণের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। কর্পোরেশন-সংহারক যে-বিল আজ বাঙালী মুসলমানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিতে উদ্যত, বাঙালী মুসলমানকেই তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে।

সভাপতি ভিন্ন মিঃ এম্ এ জামান এম্-এল-এ, মৌলবী

আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী, মৌলবী আবদুল মালেক, মৌলবী হাতেম আলী নওরোজী প্রভৃতি কর্পোরেশ্যন সংশোধক ২ নং বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন।

নববর্ষ উৎসব

কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্য নানা স্থানে ১লা বৈশাখ নববর্ষারম্ভ উপলক্ষ্যে ব্যায়াম ও কুচ কাওয়াজ প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও হইবে। ইহাতে যত অধিকসংখ্যক বালকবালিকা ও যুবজন যোগদান করেন, ততই মঙ্গল। তাঁহাদের নেতৃবর্গের মনঃপূত হইলে ঋগ্বেদের নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি আবৃত্তি বা গান করা যাইতে পারে। এগুলি সকল-ধর্মাবলম্বী লোকদেরই উপযোগী।

> "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
> সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃসহচিত্তমেষাং।
> সমানী ব আকুতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
> সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

"তোমরা মিলিত হও; মিলিত হইয়া বাক্য বল; মিলিত হইয়া একে অন্যের মন জান। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক; তোমাদের চিত্ত (বিচার, মীমাংসা) ও মন এক হউক। তোমাদের অধ্যবসায় এক হউক, হৃদয় এক হউক। তোমাদের মন এমন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জয়ন্তী

গত ২২শে চৈত্র কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসবে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সভাপতির কাজ করেন এবং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাসেম ফজলল হক প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ আমদানী করার দোষ না ধরিতে তিনি লোকদিগকে অনুরোধ করেন। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, যদি বিদেশী ভাষাসমূহ হইতে শব্দ ও শব্দসমষ্টি বাংলা ভাষায় আনা যায়, তাহা হইলে বাংলা ভাষা উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবে। অতএব তাঁহার মতে মুসলমান লেখকেরা যে বাংলা ভাষায় উর্দু আরবী ও ফারসী অনেক শব্দ আমদানী করিতেছেন, তাহা একটা দুঃখকর ব্যাপার মনে করা অনুচিত। হক সাহেব দাবী করেন যে, কার্য্যতঃ মুসলমানেরাই বাংলা ভাষার স্রষ্টা, তাহারা ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই জন্য, কোনও মা তাহার সন্তানকে মারিয়া ফেলিতে চায় ইহা মনে করা যেমন অসম্ভব, তেমনি ইহা মনে করাও অসঙ্গত যে, মুসলমান লেখকেরা এমন কিছু করিতে পারে, যাহাতে বাংলা ভাষার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়াইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

হক সাহেব তাঁহার বক্তৃতা বাংলা না ইংরেজী কোন্ ভাষায় করিয়াছিলেন জানি না। আমরা তাঁহার বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী রিপোর্টের তাৎপর্য উপরে বাংলায় দিলাম।

তিনি ইতিপূর্বে অন্যত্র বিদেশী শব্দ আমদানী দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন সে-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। হক সাহেব বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও গড়িয়া তোলা বিষয়ে মুসলমানদের পক্ষে যে দাবী করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা অনাবশ্যক। মুসলমান জনসাধারণ কিম্বা কয়েক জন মুসলমান রাজা বাংলা ভাষার জন্য কিছুই করেন নাই এমন নয়। কিন্তু হক সাহেবের উক্তি নিতান্তই অত্যুক্তি।

মানুষের স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও ক্ষুদ্রাশয়তাবশতঃ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, নেশ্যনে নেশ্যনে যে ভেদ জন্মিয়াছে ও যাহার ফলে ভ্রাতৃহত্যাবৎ যুদ্ধ ও জগদ্ব্যাপী অগ্নিকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, সভাপতি কবি নজরুল ইসলাম তজ্জনিত মানবজাতির দুঃখ দুর্দশায় তাঁহার হৃদয়বেদনা জ্ঞাপন করেন। কবিকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক মনে না করিতে তিনি শ্রোতাদিগকে অনুরোধ করেন;—তিনি তাঁহাদিগকে ইহাই মনে করিতে অনুরোধ করেন যে, জাতিধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে আনন্দদান কবির জীবনের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বলেন, তাঁহার সকল গানের অনুপ্রাণনা তিনি নিজের অন্তরাত্মা হইতে পাইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার আত্মিক জীবনে ক্রমবিকাশ চলিতেছে; যদি তিনি তাহার ফলে শক্তি পান, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এমন সকল গান রচনা করিবেন যাহা হইতে লোকে আনন্দ লাভ করিবে।

সভাপতির বক্তৃতার তাৎপর্যও আমরা একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী রিপোর্ট হইতে দিলাম।

বাঙালী মুসলমানদের একটি আলাদা বাংলা সাহিত্য-সমিতি করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু তাঁহারা যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিবার জন্য সমিতি গড়িয়াছেন ইহা সন্তোষের বিষয়। এক সময়ে উর্দুকে বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন

করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক। বাংলাই যে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা, তাহার একটা প্রমাণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৎসরকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নপত্র ছাড়া এই বৎসর হইতে অন্য সব প্রশ্নপত্রের উত্তর পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষায় দিবার নিয়ম হইয়াছে। এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩৩৩২। তাহার মধ্যে ৩০১৫৩ জন বাংলায় উত্তর দেয়, উর্দুতে উত্তর দেয় কেবল ৪৭৭ জন; তাহারা খুব সম্ভব অ-বাঙালী মুসলমান। মোট মুসলমান পরীক্ষার্থী ছিল কয়েক হাজার।

যে-সব মুসলমান কবি ও অন্য মুসলমান লেখক ভাল বাংলা লেখেন, তাঁহাদের লেখা উপেক্ষিত হয় না। তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। দেড় মাস আগে এলাহাবাদে যে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার উদ্বোধক বক্তৃতা করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত অমরনাথ ঝা। তিনি বাঙালী নহেন, মৈথিল ব্রাহ্মণ; বাংলা তাঁহার মাতৃভাষা নহে। তিনি বাংলা শিখিয়া কেবল প্রধান প্রধান হিন্দু বাঙালী লেখকদের বহিই পড়িয়া যে ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; মুসলমান বাঙালী কবিদের লেখাও পড়িয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ মুসলমান কবিদের লেখা ও প্রবাসী বাঙালী কবিদের রচনা। তাঁহার বক্তৃতাটি এপ্রিল মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে বাহির হইয়াছে। তাহাতে পাঠকেরা অনেক বাঙালী মুসলমান কবির নামের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন এবং দুই এক জনের কবিতা উদ্ধৃতও দেখিতে পাইবেন।

—

কলেজে বাংলা-অধ্যাপকদের মর্য্যাদা

আমরা বাল্যকালে দেখিতাম ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষকেরা অন্য শিক্ষকদের মত বেতন পাইতেন না। সাধারণতঃ ছাত্রদের কাছে তাঁহাদের সম্মানও অন্য শিক্ষকদের মত ছিল না। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে সুখের বিষয়। আমরা সৌভাগ্যক্রমে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার পণ্ডিত ব্রজনাথ গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম—তিনি পরে মেদিনীপুর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। তাঁহাকে ছাত্রেরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে পারিত না। তিনি সংস্কৃত ছাড়া গণিতে ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন ও রাশভারী লোক ছিলেন।

এরূপ অভিযোগ শুনিয়াছি যে, আগে ইংরেজী ইস্কুলে পণ্ডিত মহাশয়দের যে অবস্থা ছিল, আজকাল অনেক কলেজে বাংলার অধ্যাপকদিগের অবস্থা সেইরূপ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলায় এম-এ পাস করিয়াছেন। তাহা করিতে পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও বুদ্ধিবিদ্যার আবশ্যক হয়। বাংলা অধ্যাপকদিগের সাংসারিক প্রয়োজনও অন্য অধ্যাপকদের চেয়ে কম নয়। সুতরাং তাঁহাদের বেতনের হার অন্য অধ্যাপকদের মতই হওয়া উচিত।

ছাত্রেরা বেতন অনুসারে অধ্যাপকদের সম্মান করে, ইহা বলিলে ঠিক বলা হইবে না। কিন্তু কম বেতনের লোকদের সম্মান একটু কম হইবারই কথা, সংসারের ভাবগতিক এইরূপ—ইহা বলিলে খুব ভুল হইবে না। অধ্যাপকদের কার্যকারিতা তাহাদের প্রতি ছাত্রদের সম্মানের উপরও কতকটা নির্ভর করে। ইহা বিবেচনা করিয়াও বাংলা-অধ্যাপকদের বেতন সম্বন্ধে সর্বত্র বিবেচনা করা উচিত।

—

কয়লা হইতে উপোৎপন্ন নানা দ্রব্যের ব্যবসা

গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা শ্রীহট্টের সিংহ ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীর কয়লার কোন কোন বাই-প্রডাক্টের কারখানা সম্বন্ধে একটি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা অন্য কাগজপত্রের মধ্যে চাপা পড়িয়া থাকায় এত দিন সে-বিষয়ে কিছু লিখিতে পারি নাই। তাঁহাদের চিঠির দরকারী অধিকাংশ নীচে দিতেছি।

১৩৪৬ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে "দেশ-বিদেশের কথা" প্রসঙ্গে "বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতের রঞ্জনশিল্প" সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভূপেশলোচন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। কয়লার বাই-প্রডাক্ট সংক্রান্ত রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাই আমরা আজ একাদশ বৎসর কাল যাবৎ বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রমে বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষমতানুযায়ী সাফল্যের সহিত পরিণত করিতে পারিয়াছি।

বিগত ১৯২৯ সালে আমরা একটি কয়লার উপোৎপাদন কারখানা (Coal by-product Plant) শ্রীহট্টে স্থাপিত করিয়াছি। উহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কয়লা হইতে কোক, আলকাতরা, ক্রিয়সোট তৈল ও বেনজল বাহির করা হয়, এবং তদনুসঙ্গীয় গ্যাস দ্বারা চূণ পুড়ানি করা হয়।

উক্ত কারখানা স্থাপনের পর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কয়লার চাহিদা সংকুলান জন্য মহামান্য আসাম গবর্ণর বাহাদুর উক্ত উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশে খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত একটি কয়লার খনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য স্থানের কয়লা অপেক্ষা এখানের কয়লা উপরোক্ত উপাদান-সমূহের জন্য অধিকতর উপযোগী। এতদ্ব্যতীত সিলেট চূণ সর্ব্বত্রই সুপরিচিত।

যুদ্ধের ফলে শিল্পবাণিজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি সময়োপযোগী করিয়া ব্যাপকভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে ইহাকে কিয়ৎ পরিমাণে দেশের সেবায় নিয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করি। অতএব এ সুবর্ণসুযোগ হারাইবার নয়।

বলা বাহুল্য, ইহার সমধিক উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ মূলধন বর্দ্ধিত করা হইবে, তদনুরূপ ফলও অবশ্যম্ভাবী। যদিও আজকাল সৌভাগ্যক্রমে দেশে ধনিক ও বিশেষজ্ঞগণের অভাব নাই কিন্তু তৎসঙ্গে দেশকালের সমাবেশ প্রায়ই দুর্লভ।

আজ অনুকূল আবহাওয়ায় আমরা এই ক্ষুদ্র সম্বলটুকু লইয়া দেশের যোগ্যতর কর্ম্মীর সহযোগিতা আহ্বান করিতেছি। এ কার্য্যে মহাশয়ের সহানুভূতি ও উপদেশ একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি।

ইঁহারা এই চিঠির সঙ্গে যে-সব কাগজপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি, ইঁহারা যথেষ্ট মূলধন ও বিশেষজ্ঞ কর্মীর সাহায্য পাইবেন।

সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবকামী ছাত্রদল

বঙ্গের যে-যে জেলায় সম্প্রতি সাংঘাতিক দাঙ্গা ও ভীষণ গৃহদাহ ইত্যাদি হইয়াছে, কতকগুলি মুসলমান ও হিন্দু ছাত্র তাহার কোন কোন স্থানে গিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা ও স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তাহার সফলতা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব সম্বন্ধে পঞ্জাব সরকারের কার্যপদ্ধতি

হিন্দু ও মুসলমান এবং মুসলমান ও শিখদিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং যে-যে স্থলে তাহার হ্রাস বা বিনাশ হইয়াছে তথায় তাহা পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্জাবের মন্ত্রীরা একটি কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই অনুসারে কাজ করিবার নিমিত্ত এই বৎসরের বজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিটির কতকগুলি দফায় আপত্তি করিবার কিছু নাই—সেগুলি অনুমোদনযোগ্য। যথা—(১) অতীত ও বর্তমান কালের ইতিহাস হইতে হিন্দু মুসলমান ও শিখ নৃপতিদিগের অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ঔদার্য ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ; (২) সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব সম্বন্ধে বিখ্যাত নেতাদের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা; (৩) সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব সম্বন্ধে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদান; (৪) কতকগুলি সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উৎসবের অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান; (৫) নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মেরও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান; (৬) সকল ধর্মের প্রবর্তক ও মহাপুরুষদের জন্মোৎসব সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান।

আগে আগে আমরা মুসলমানদের মহরমে হিন্দুদিগকেও কোথাও কোথাও যোগ দিতে দেখিয়াছি। হিন্দুদের পূজা পার্বণেও মুসলমানদিগকে যোগ দিতে দেখা যাইত।

সকল ধর্মের শাস্ত্র অবশ্যপঠনীয়। আধুনিক যুগে রামমোহন রায় এ-বিষয়ে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক। সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ নানা শাস্ত্রের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন প্রথম করান।

পঞ্জাবের পদ্ধতিটির নিম্নলিখিত দফাটির অর্থ স্পষ্ট নহে;—উচ্চাঙ্গের যে-সকল সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ইচ্ছাপূর্বক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে নিবৃত্ত থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ দান।

"সাম্প্রদায়িক রাজনীতি"র মানে কি? পঞ্জাবের মন্ত্রীরা বা বাংলার মন্ত্রীরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত রকম আইন ও হুকুম করিয়াছেন, করাইতেছেন ও করিবেন, সেগুলার সমালোচনা কি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি?

আমাদের বিশ্বাস সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা ও পৃথক্ নির্বাচন এবং তাহার অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত-প্রসূত অন্য নানা নিয়ম হুকুম প্রভৃতি থাকিতে এবং পঞ্জাব বাংলা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান প্রদেশের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রীদের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক পলিসি থাকিতে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব রক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দুর্ঘট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সদ্ভাববর্দ্ধক কাজ করিয়া ভারতবর্ষের একতার ও স্বাধীনতার বিরোধীদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"সমগ্রভারতীয় ভাষাত্রয়"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এই অনুরোধ জানান যে, "ইণ্ডিয়ান ইনফর্মেশন" নামক যে সরকারী সমাচারপত্র ইংরেজী হিন্দী ও উর্দুতে বাহির করা হয়, তাহা যেন বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষাতেও প্রকাশিত হয়। উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে বলা হয় যে, ইংরেজী হিন্দী ও উর্দু সমগ্রভারতীয় ভাষা বলিয়া ঐ তিন ভাষায় কাগজটি বাহির করা হয়, বাংলা প্রভৃতি তিনটি ভাষায় ছাপিতে গেলে প্রত্যেক ভাষার জন্য প্রথমেই এককালীন ৩০০০০ টাকা করিয়া খরচ হইবে, ইত্যাদি।

ইংরেজী শাসকজাতির ভাষা বলিয়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে কতকগুলি লোক বুঝে। সে হিসাবে উহা সমগ্র-ভারতীয় ভাষা বটে। কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক বাংলা পড়ে, বুঝে ও বলে—বঙ্গের বাহিরেও বুঝে, পড়ে, বলে।

হিন্দী ও উর্দুকে সমগ্রভারতীয় ভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু ঐ দুটি ভাষা ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে প্রচলিত, ইহা সত্য নহে। বিশেষতঃ, উর্দু সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে। তাহার প্রধান আড্ডা যুক্তপ্রদেশ। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব তাঁহার "ভারতের জাতীয় ভাষা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ঐ প্রদেশেও উর্দুর প্রভাব ও প্রচার কমিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

সে-ভাষা দেশের মৃত্তিকা হইতে জীবনের পোষণকারী রস সংগ্রহ করিতে পারে না, সে-ভাষার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহাকে কোনও প্রকারেই বাঁচাইয়া রাখা যায় না। উর্দু যে মরণোন্মুখ ভাষা, হিন্দীতে ও উর্দুতে প্রকাশিত পুস্তকাবলির কয়েক বৎসরের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮৮৯-১৮৯৯ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে যুক্ত-প্রদেশে শতকরা ৩৮.৮ হিন্দী ও ৬১.২ উর্দু বই প্রকাশিত হয়; ১৯৩৫-১৯৩৬ মধ্যে ২১৩৫ হিন্দী ও কেবল ২৫২ উর্দু পুস্তক বাহির হয়; অর্থাৎ শতকরা ৮৯.৫ হিন্দী, শতকরা ১০.৫ উর্দু।

অমরেন্দ্রবাবু ও লক্ষ্মীকান্তবাবুর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ৮ কোটি লোক বাংলা বুঝে। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় কানাড়ী (কন্নাড) ভাষাও অনেকে বলে। কিসে আর কিসে! আমরা কন্নাড ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এবং ভারতবর্ষের অন্য কোনও ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করি না। কিন্তু ভাষীর কথা তুলিলে বলিতে হয়, ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে কন্নাড-ভাষী লোকের সংখ্যা ছিল ১,১২,০৬,০০০। এই সংখ্যার সহিত বাংলাভাষীদের সংখ্যার তুলনা করা অসঙ্গত।

বস্তুতঃ, কোন্ কোন্ ভাষা সমগ্রভারতীয়, বিচার্য বা জিজ্ঞাস্য বিষয় তাহা ছিল না। বঙ্গের প্রতিনিধিদ্বয় কেবল ইহাই চাহিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান ইনফর্মেশন কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহা যেন বাংলা, ওড়িয়া ও অসমিয়ার পাঠকেরাও জানিতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলে অন্ততঃ উর্দু পাঠকদের চেয়ে বেশি বাংলা পাঠক জুটিত, এবং কাগজটির উদ্দেশ্য অধিকতর সাধিত হইত।

—

"ভারতের জাতীয় ভাষা"

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেবের এই বিষয়ের যে প্রবন্ধটির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে গত মার্চ মাসে পড়া হয়। উহা বঙ্গের কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য 'প্রবাসী'তেই উহা মুদ্রিত হইতে পারিত এবং তাহাতে প্রবাসী সমৃদ্ধও হইত। কিন্তু তাহা হইলে সেটি দৈনিক-গুলিতে উদ্ধৃত হইত না, এবং দৈনিকগুলিতে মুদ্রিত হওয়ায় উহার যত পাঠক সম্ভবতঃ সদ্যসদ্য জুটিয়াছে তত জুটিত না। সেই কারণেই আমরা উক্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগকে উহা কম্পোজ করাইয়া কয়েক কাপি কলিকাতায় পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। তাঁহারা তাহা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমরা উহার ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া "ভারত" দৈনিকে এবং ভবানীপুরের জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মারফৎ আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও বসুমতীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

অধ্যাপক দেবের প্রবন্ধে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পাদরী উইলিয়ম কেরী সাহেবের শতাধিক বৎসর আগেকার মত এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত বাংলা-অধ্যাপক ডক্টর জে. ডি. এণ্ডার্সনের মত প্রথমে 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। পরেও তাহা 'প্রবাসী'তে কয়েক বার উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হউক বা না-হউক, উহাকে ও উহার সাহিত্যকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার সকল রকম চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। এবং অ-বাঙালীরাও উহার চর্চা করিলে লাভবান হইবেন। তাঁহাদিগকে, এবং বাঙালীদিগকেও, এ বিষয়ে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রবেশিকা ও বিশারদ এই দুটি বাংলা পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এলাহাবাদের এলেনগঞ্জস্থিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন আফিসে সম্পাদককে পাঁচ পয়সার স্ট্যাম্প সহ চিঠি লিখিলে এ বিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

—

"ছাত্রসমাজ"—হীরক জয়ন্তী

"ছাত্রসমাজ" তাঁহার হীরক জয়ন্তী উৎসব করিবেন, এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির নিকট যৌবনকালে আমাদের হৃদয়মনের জাগৃতির জন্য গভীর ভাবে ঋণী।

এই জয়ন্তীর উদ্যোক্তাগণ লিখিয়াছেন :—

উনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত স্মরণীয় জাতীয় আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশ সমগ্রভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং যে সকল শক্তিশালী আন্দোলনের দৃঢ় ভিত্তির উপরে আজ বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ নব মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছাত্র আন্দোলন তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য দেশেও যেমন, এদেশেও তেমনই, ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নিকটেই জাতীয় জাগরণের গভীরতম ঋণ।

কংগ্রেস-জন্মের পূর্বে, দশ বছরের মধ্যে, এক দিকে যেমন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির হাতে ১৮৭৬ সালে কংগ্রেসের অগ্রদূত 'ভারত সভার' জন্ম, তেমনই তাঁদেরই হাতে জন্ম নিয়েছিল ১৮৭৯ সালে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে **ছাত্রসমাজ**। এই ছাত্র আন্দোলনকে আশ্রয় ক'রেই স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় নেতৃজীবনের সুরু। পরবর্তী কালে শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারে, রাষ্ট্রনীতিতে যে সকল স্মরণীয় ও বরণীয় নেতার উদ্ভব হয়েছিল, বাংলাদেশের সুবিখ্যাত 'স্বদেশী আন্দোলনে' যাঁরা স্বর্ণাক্ষরে বাংলার নবীন ইতিহাস লিখে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন এই **ছাত্রসমাজের** সভ্য অথবা চালক।'

এই উৎসবের সাফল্য কামনা করিতেছি। আশা করি, "ছাত্রসমাজ" তাহার প্রারম্ভিক শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আবার কর্মিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

নারীশিক্ষা সমিতি

নারীশিক্ষা সমিতির একবিংশতিতম বার্ষিক রিপোর্ট দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। লেডী অবলা বসু মহোদয়া ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সম্মানিতা সম্পাদিকা। রিপোর্টে ইহার উদ্দেশ্য ও বিভাগগুলির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে,

উদ্দেশ্য :—নারীশিক্ষা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বঙ্গদেশে, বিশেষভাবে পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা করা যাহাতে বালিকারা সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারে; পুরস্ত্রী ও বিধবাগণ নিজ বাসগৃহকে শান্তির আলয় করিতে পারে; এবং প্রয়োজনমত শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতি কাজের দ্বারা এবং শিল্প চর্চ্চার দ্বারা জীবনোপায় করিতে পারে।

বিভাগ :—এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নারীশিক্ষা সমিতির কাজের তিনটি ধারা রহিয়াছে, শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা এবং আর্থিক উন্নতিসাধন।

বালিকা বিদ্যালয় :—শহরে ও গ্রামে, বিশেষভাবে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন :—শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য এই নামে একটি বিধবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

এখানে হিন্দু বিধবাগণকে তাহাদের আচার পদ্ধতি অনুসারে বিনা খরচায় চার বৎসর রাখিয়া যাবতীয় শিল্পকার্য্য ও মধ্য-ইংরাজী মান পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া নানারূপে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

মহিলা শিল্পভবন :—অবৈতনিক শিল্প-বিদ্যালয়, ইহাতে সধবা, বিধবা ও কুমারী ছাত্রী ভর্ত্তি হইতে পারে, মুদ্রিত ফারমে পূর্ব্বে আবেদন করিতে হয়, ইহাতে থাকিবার বোর্ডিং নাই, বাড়ী হইতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়।

বাণী-ভবন জুনিয়ার ট্রেনিং বিদ্যালয় :—শিক্ষকতার কার্য্যে বাণী-ভবনের ছাত্রীদিগের জন্য বিশেষভাবে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই বিভাগটি খোলা হইয়াছে।

ট্রেনিং পড়িবার সুবিধার জন্য বাহিরের মেয়েরাও এখানে আসিয়া পড়িয়া যাইতে পারিবে। এজন্য তাহাদিগকে মাসে ৫৲ টাকা বেতন এবং ভর্ত্তি ফি ২৲ দিতে হইবে। বিশেষ বিবরণ সমিতির অফিসে জানা যাইবে। বাহিরের ছাত্রীদের প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যে সমিতির মুদ্রিত ফারমে আবেদন করিতে হইবে। ৩০শে আগষ্টের পর আবেদন করিলে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ইহার নিজের বা ইহার সংশ্রবে স্বাধীনভাবে পরিচালিত মোট ৫৬টি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। ঝাড়গ্রামে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের একটি শাখা আছে। তাহাতে ৩০টি বিধবার থাকিবার ও শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা আছে। নারীশিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রশংসনীয়।

বোম্বাইয়ে বেদল নেতাদের কন্‌ফারেন্স

বোম্বাইয়ে গত মাসে কতকগুলি বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় নেতার কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ইহাকে ইংরেজী খবরের কাগজগুলিতে "নন্‌-পার্টি লীডার্স কন্‌ফারেন্স" বলা হইয়াছে। নামটি ঠিক্ প্রয়োজ্য নহে, কারণ ইহাতে কোন-না-কোন দলের সহিত যুক্ত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যেমন উদার-নৈতিক দলের ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে, ও সর্ চিমনলাল সেতলবাদ, হিন্দু মহাসভার বিনায়ক দামোদর সাভরকর, ডাঃ মুঞ্জে ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি। তবে ইহা ঠিক্ বটে যে, সভার কাজ বিশেষ কোন দলের পলিসি অনুসারে চালিত হয় নাই। তবু ইহাও বলিতে হইবে যে, কন্‌ফারেন্স কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাকে সে-অর্থে পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেসবিরোধী কন্‌ফারেন্সও বলা যাইতে পারে।

এই কন্‌ফারেন্সের গুরুত্ব আছে। সেই জন্য ইহার একটি মাত্র দীর্ঘ প্রস্তাব এবং বক্তৃতাদির তাৎপর্য আমরা মডার্ন রিভিয়ুতে ছাপিয়াছি। কিছু টিপ্পনীও করিয়াছি। এখন প্রবাসীতে সেরূপ কিছু করা অনাবশ্যক; এবং অ-সময়োচিত হইবে এই কারণে যে, ঐ কন্‌ফারেন্সের ফল ও জের স্বরূপ উহার সভাপতি সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর সহিত বড়লাটের কথাবার্তা চলিতেছে (২৪শে চৈত্র ইহা লিখিত) এবং পরে অন্য কোন কোন নেতার সহিতও বড়-লাটের কথাবার্তা চলিবে। সেই সমুদয় সম্বন্ধে খবরের

কাগজে কি বাহির হয়, তাহা না দেখিয়া মাসিক কাগজে কিছু লেখা উচিত নয়। এবারকার বিবিধ প্রসঙ্গের শেষ লেখা ২৬শে চৈত্র ছাপা হইবার কথা। সেই জন্য আগে হইতে লিখিতেছি।

এই কন্‌ফারেন্স বা কোন কন্‌ফারেন্স দ্বারাই যে ভারতের জটিল সমস্যার সমাধান হইবে, আমরা এরূপ আশা করি না। কিন্তু জটিলতা কিছু কমিতে পারে। তাহা হইলে তাহাও সন্তোষের বিষয় হইবে।

ভূতপূর্ব সিন্ধু-গবর্ণরের উক্তি

সিন্ধুর ভূতপূর্ব গবর্ণর সর্‌ ল্যান্সলট গ্রেহাম এক জন প্রেস-প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, এদেশে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট পাকিস্তান প্রস্তাবের সপক্ষে কিন্তু তাহা ভুল। কোনও একটি ব্যক্তি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নহে; অনেকগুলি বিখ্যাত লোককে লইয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট। তাঁহারা এ পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে কিম্বা একা একাও পাকিস্তান সম্বন্ধে হাঁ না কিছুই বলেন নাই। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট উহার সপক্ষে বা বিপক্ষে, ঠিক্‌ করিয়া কিছু বলা যায় না। বিপক্ষে নহেন এরূপ ধারণা হইবার দুইটা কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাক্তার মুঞ্জের সহিত বড়লাটের যখন কথাবার্তা হয়, তখন বড়লাট বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান প্রস্তাবটা "ক্যানট্‌ বি রুল্‌ড্‌ আউট য়্যাট দিস স্টেজ", "এখন উহাকে বিবেচনার বাহিরে কেলা যায় না"। এই কথা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। ইহার কোন সরকারী প্রতিবাদ হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের কাছে এই দুটা প্রতিশ্রুতি ৩১শে মার্চের মধ্যে চাহিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দেওয়া হইবে, এবং পাকিস্তান প্রস্তাব তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন বিষয়েই পরিষ্কার কিছু এ পর্যন্ত বলেন নাই।

তথাপি ইহা সত্য হইতে পারে যে, পাকিস্তান প্রস্তাবটা ব্রিটিশ সরকারের পছন্দসই নয়। হইতে পারে যে, ওটাকে প্রকাশ্যভাবে নামঞ্জুর করার কারণ দুটা;—এক, মুসলিম লীগকে হাতে রাখা ও হাত-ছাড়া না-করা; দুই, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে পরোক্ষভাবে শাসান, "তোমরা যদি বাগ না মান ও বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি পাকিস্তান লেলাইয়া দিব।"

সর্‌ ল্যান্সলট গ্রেহাম এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, যে, সিন্ধুদেশের অন্যতম মুসলমান নেতা সর্‌ আবদুল্লা হারুনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দু, অথচ তিনি পাকিস্তানের সমর্থক। কথাটা সত্যি। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানই ত হিন্দুর বংশজাত। তাহা হইলেও যাঁহারা ও যাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা হয়ত মেদিনীপুরের লোক, তাঁহারা হইয়া গিয়াছেন মেদিনা মক্কার।

সর্‌ ল্যান্সলট নিজেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষপাতী বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহার কার্যকালে এই ঐক্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশে মিলিত নির্বাচন

সিন্ধুদেশের শহরগুলির মিউনিসিপালিটিতে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত নির্বাচন প্রবর্তনের আইন ১৯৪০ সালে তথাকার আইনসভায় পাস হয়। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এখন মিলিত নির্বাচন নাই। শিকারপুর শহরে প্রথম মিলিত নির্বাচন হইবে; ভোট লওয়া হইবে ২৫শে—২৬শে এপ্রিল। মুসলিম লীগ ইহা বয়কট করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১২টা আসনের মুসলমান প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন ১৭ জন। ইহার পর সক্কর, হায়দরাবাদ, জ্যাকোবাবাদ, মীরপুর খাস প্রভৃতি মিউনিসিপালিটিতে মিলিত নির্বাচন হইবে।

মিলিত নির্বাচনের গুণ এই যে, প্রার্থী যে সম্প্রদায়েরই হউন তাঁহাকে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদ্ভাব ও সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতে হয়।

সিন্ধুদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে খুবই বেশি, বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যায় তত তফাৎ নাই। সাম্প্রদায়িক কারণে নরহত্যা, জখম, লুটতরাজ, ঘর পোড়ান, নারীর উপর অত্যাচার সিন্ধু অপেক্ষা বঙ্গে অনেক বেশি। অথচ এখানে মিলিত নির্বাচন হয় না। মন্দের ভাল এই যে, কতকগুলি বাঙালী মুসলমান মিলিত নির্বাচনের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বঙ্গের লাটপ্রাসাদে কন্‌ফারেন্স

বাংলার সাম্প্রদায়িক সাংঘাতিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে লাটসাহেব কতকগুলি নেতার সহিত একাধিক বার গুফ্‌তগু করিয়াছেন, খবরের কাগজে এইরূপ দেখিয়াছিলাম। ফল অপ্রকাশিত, কিন্তু অননুমেয় নহে।

"হরিজন" প্রকাশিত হইল না

ভারত-রক্ষা আইন অনুযায়ী নিয়ম প্রভৃতি মানিয়া

লইয়া ইংরেজী "হরিজন" ও তাহার হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণগুলি চালান যায় না বলিয়া মহাত্মা গান্ধী সেগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মার্চ মাসে খবর বাহির হয় যে, গান্ধীজী সেগুলি আবার বাহির করিবেন, এমন কি প্রকাশের দিনও ঘোষিত হয়। কিন্তু পরে গান্ধীজীর সেক্রেটরী মহাদেব দেশাই জানাইয়াছেন যে, কাগজগুলি বাহির করা হইবে না, কিন্তু কারণ প্রকাশ করা চলিবে না।

প্রকাশ করিলে হয়ত পূর্ণ স্বাধীনভাবে লেখা প্রকাশ করা চলিত না এরূপ সর্ত মানিতে হইত, কিম্বা প্রকাশ করিবার পূর্বেই জামিন-দেওয়া বা অন্য আত্মসম্মানঘাতী সর্ত মানিতে হইত—এইরূপ কিছু কারণ থাকিতে পারে। সেরূপ কারণে প্রকাশিত না হইয়া থাকিলে তাহা সন্তোষের বিষয়। সারা ভারতে অন্ততঃ একখানা কাগজও যদি আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে বন্ধ থাকে, তাহা আশার কথা।

নতুবা "হরিজন"এর অপ্রকাশ ভারতবর্ষের ও জগতের পক্ষে ক্ষতির কারণ। মহাত্মাজীর সব চেয়ে বড় কথা যে সকল অবস্থায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অহিংসা, তাহার সহিত তাল রাখিতে না পারিলেও, তাহার মূল্য কিছু বুঝিতে পারি। তাঁহার অন্য অনেক বাণীও মূল্যবান্। সেইগুলি, ও জগতের বর্তমান অবস্থায় ও নানা সমস্যায় তাহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে না-পারা কম ক্ষতি নয়।

—

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির

আবেদন

"হুগলী জেলার আরামবাগ এবং জাহানাবাদের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে, রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দিরটি বহুদিন যাবৎ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্মৃতিমন্দিরটি এখনও বিশেষ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় নাই। সত্বর সংস্কার না করিতে পারিলে ইহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা যাইবে না।

"উক্ত মন্দিরটি দরিদ্র পল্লীবাসীর পক্ষে সংস্কার করা মোটেই সম্ভব নহে বলিয়া অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। যে ভদ্রলোক এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতে প্রাণপাত করিয়াছিলেন, তিনি আজ ইহলোকে নাই। তাঁহার অভাবে আজ হুগলী জেলা হইতে রাজা রামমোহনের স্মৃতি লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"যে বঙ্গদেশে ধনীর অভাব নাই, যে বঙ্গদেশে দাতার অভাব নাই, সেই বঙ্গদেশে রাজা রামমোহনের স্মৃতিমন্দিরটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া যদি কালক্রমে বিলীন হইয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে।

"সহৃদয় দেশবাসীর নিকট, হুগলী জেলা বোর্ডের নিকট, ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা, মন্দিরটি সংস্কার করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করুন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রালাপ করিলে উপকৃত হইব। রাধানগর পল্লী সমিতি, রাধানগর, হুগলী, অথবা সম্পাদক পল্লীমঙ্গল সমিতি, পোঃ দ্বারহাট্টা জয়রামপুর, হুগলী। নিবেদক (স্বাঃ) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক, পল্লীমঙ্গল সমিতি, জয়রামপুর।"

এই আবেদনটির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সকল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার স্মৃতিমন্দির সম্পূর্ণ না-হওয়া ও সুরক্ষিত না-হওয়া আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়।

—

"জাতীয় সপ্তাহ"

এবার "জাতীয় সপ্তাহ" বাংলা ১৩৪৭ সালের শেষ সপ্তাহে পড়িয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ঐ সপ্তাহটি যে ভাবে উদ্‌যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভাবে তাহা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকিলে দেশ সদ্য সদ্য স্বাধীন না হউক, দেশের অন্য মহৎ কল্যাণ যে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

জাতিধর্মপ্রদেশ নির্বিশেষে সিপাহী সংগ্রহ

এমন কোন প্রদেশ নাই যে-প্রদেশ হইতে কোন-না কোন সময়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সিপাহী সংগ্রহ না-করিয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার না-করিয়াছেন। যে-পঞ্জাব হইতে অধুনা বহু বৎসর সর্বাপেক্ষা বেশী সিপাহী সংগৃহীত হইতেছে, তাহাও ইংরেজরা অধিকার করে অ-পঞ্জাবী সিপাহীদের সাহায্যে। কিন্তু অধুনা বহু বৎসর হইতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ ও অঞ্চল ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মতে অ-যোদ্ধা জাতিদের বাসভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সিপাহীদের মধ্যে পঞ্জাবীদের সংখ্যা খুব বেশী; তাহাদের মধ্যে আবার মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী। এই রীতি পরিবর্তন করিয়া সকল প্রদেশ, ধর্মসম্প্রদায় ও জা'ত (caste) হইতে সিপাহী সংগ্রহের রীতি প্রবর্তন করাইবার পক্ষে আন্দোলন অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই রীতি চালাইবার সপক্ষে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহার সংশোধন করিয়া নূতন প্রধান সেনাপতি এই মর্মের প্রস্তাব করেন যে, এখন সদ্য সদ্য যত নূতন সিপাহী চাই, তাহা চলিত রীতিতেই সংগ্রহ করা হউক, কিন্তু জাতিধর্মপ্রদেশ নির্বিশেষে সর্বত্র হইতে সিপাহী লইবার একটি পদ্ধতি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ করা হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সমস্তই নির্ভর করে এই "শীঘ্র" কথাটির মানের উপর।

ভারতসচিব সব ভারতীয়ের সহযোগিতা চান !

ভারতসচিবের উক্তির বার-বার সমালোচনা করা ক্লান্তিকর। কিন্তু না-করিলেও নয়; কেন না, তিনি মানবিক হিসাবে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা—অন্তত: ইংরেজরা তাই মনে করে।

গত ২৬শে মার্চ তাঁহাকে পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দলের লোকদের সহযোগিতা পাইবার নিমিত্ত আরও কিছু চেষ্টা করিবেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, এ রকম সহযোগিতা পাইতে গবর্ন্মেণ্ট খুব বেশি আগ্রহান্বিত (most anxious), ইত্যাদি। অতঃপর টোরি সদস্য সর্ আলফ্রেড নক্স মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলেন, ইহা কি সত্য নহে যে, যে-সব ভারতীয়ের সহযোগিতা মূল্যবান তাহারা সবাই যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করিতেছে? তাহাতে প্রথম প্রশ্নকর্তা শ্রমিক সদস্য গর্ডন ম্যাকডন্যাল্ড প্রশ্ন করেন, ইহা কি সত্য নহে যে, ভারতবর্ষে এমন অনেক লোক কারারুদ্ধ রহিয়াছেন যুদ্ধোদ্যমে যাঁহাদের সহযোগিতা মূল্যবান হইবে? ভারত-সচিব উত্তর করেন, "আমরা সকল ভারতীয়েরই সমর্থন পাইবার আশা করি।" এই উত্তরে আশান্বিত হইয়া কিনা জানি না, বিখ্যাত শ্রমিক সদস্য সোরেনসেন সাহেব প্রশ্ন করেন, "মিঃ এমারি ঐ সব ভারতীয়দিগকে খালাস দিবার বিষয়টা বিবেচনা করিবেন কি?" ইহাতে ভারত-সচিব একদম অ-বাক্ হইয়া গেলেন!

ভারতসচিবের সহযোগিতা পাইবার প্রণালীটা চমৎকার। গত বৎসর আগস্ট মাসে গবর্ন্মেণ্ট একটা 'অফার' (offer) করেন, তাহাতে ভারতকে কিঞ্চিৎ "রাষ্ট্রীয় অধিকার" (?) দিবার প্রস্তাব করেন। যখন এই প্রস্তাব করেন, তখন ইহাও বলেন যে, কোন দলের লোক সহযোগিতা করিতে নারাজ হইলে এই অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা হইবে না। অথচ পরে উক্ত প্রস্তাব অনুসারে গবর্ন্মেণ্ট কাজ করিতে অসম্মত হন এই অজুহাতেই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত দুটা গুরুত্বপূর্ণ দল সহযোগিতা করিতে চাহিতেছে না। যখন ভারতবর্ষকে কিছু না দিবার একটা অছিলা দরকার হয়, তখন সরকার বলেন, "কংগ্রেস ভারি জবর দল; ওরা রাজী না হ'লে কি করা যায় বল।" কিন্তু যখন জগতের কাছে বড়াই করা দরকার হয় যে, সমগ্র ভারত ব্রিটেনের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমর্থন করিতেছে, তখন কংগ্রেসের এ বিষয়ে অ-সহযোগিতা ও বিরোধিতা নগণ্য বিবেচিত হয়—কংগ্রেসকে উল্লেখযোগ্যও মনে করা হয় না! কংগ্রেসের প্রতি গবর্ন্মেণ্টের আস্থা ও শ্রদ্ধা এত বেশী যে, তাহার প্রধান প্রধান নেতা ও উপনেতা সমেত কয়েক হাজার কংগ্রেসীকে জেলে পুরা হইয়াছে। অথচ এমারি সাহেব সব্বাইকারই সহযোগিতা চান!

মুসলিম লীগের সহযোগিতা-অসহযোগিতার কথা নাই তুলিলাম। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি! ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভাবিতেছেন, মুসলিম লীগকে "বিড়ালের থাবা" করিয়া স্বরাজ-দাবী প্রত্যাখ্যান বা বিলম্বন রূপ স্বকার্য স্বাধীনতা-আন্দোলনের আগুন হইতে উদ্ধার করিবেন আবার মুসলিম লীগের নেতা জনাব জিন্না ভাবিতেছেন, কংগ্রেসবিরোধিতা করিয়া পাকিস্তান আদায় করিবেন।

মাঝখান থেকে যে-সব বেচারা গবর্ন্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া বিস্তর টাকা মালমশলা এবং সিপাহী সংগ্রহ করিয়া দিতেছে, তাহারা কেবল ব্রিটিশ বড়াইয়ের বেলা হইতেছে নিখিল-ভারত (All-India), কিন্তু কাজের বেলা উজীরি দেওয়ানি ফৌজদারি কিছুই পাইতেছে না! বলিহারি চালবাজি!

ভারতসচিবের ২রা এপ্রিলের উত্তর

গত ২রা এপ্রিল ভারতসচিবকে এক জন পার্লেমেণ্ট-সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে "জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের" সহযোগিতা করিবার সপক্ষে যে ক্রমবর্ধমান মনোভাব ও বর্তমান প্রভাবশালী প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহাকে উৎসাহিত করিবার এবং ব্রিটেন ও ভারতের কাজে লাগাইবার নিমিত্ত ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। মিঃ এমারির "ভদ্রলোকের এক কথা"! তিনি একটি লিখিত উত্তরে ("লিখিত" কেন?) সেই বিশ্ববিশ্রুত, দেশে-কালে-সুদূর-প্রসারী গত আগস্ট মাসের "অফারে"র উল্লেখ করেন। আমরাও তাঁহার চেলা হইব মনে করিতেছি। আমরা তাঁহার ঐরূপ উক্তির বহুৎ, শুধু লিখিত নয়, মুদ্রিত সমালোচনা করিয়াছি। আমাদেরও সেই এক কথা।

সত্যাগ্রহ

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় কংগ্রেস-সভ্যদের দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে সত্যাগ্রহ চলিতেছে।

ঢাকায় উপদ্রব সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিবৃতি

ঢাকায় উপদ্রব সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদবাবুর একটি বিবৃতি বঙ্গীয় আইনসভায় পঠিত হয়। তাহা যাহাতে বাংলা মুলুকের কোন কাগজে বাহির না-হয়, সেই জন্য উহার পাঠের সময় সভাগৃহ হইতে দর্শকশ্রোতা এবং প্রেস-প্রতিনিধিদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার বঙ্গের বাহিরের কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছে, এবং সেই সকল কাগজ অবাধে সরকারী ডাক-বিভাগ বিলি করিতেছে।

মন্ত্রীদের লম্বা লম্বা বিবৃতি কাগজে বাহির হইতেছে ;—শ্যামাপ্রসাদ বাবুর অপরাধ ?

দাঙ্গা সম্বন্ধে মুলতুবি প্রস্তাব

সোমবার ২৪শে চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবে ঢাকা জিলার রায়পুরা ও শিবপুর থানার অন্তর্গত ত্রিশটির উপর গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদের গৃহে ও বাজারে দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীগণ গত ১লা এপ্রিল হইতে ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত যেভাবে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডার দল এই যে অত্যাচার চালাইতেছে তাহার প্রতিরোধ করিতে পুলিস ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়।

সভাপতি মঙ্গলবার ব্যবস্থাপক সভায় এই মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীযুত দত্ত মুলতুবী প্রস্তাবে আরও বলেন যে পুলিসের ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নির্যাতিত হিন্দুদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করার অক্ষমতার জন্য সেখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস নিম্নলিখিত মর্ম্মে অপর একটি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন :—

"ব্যবস্থাপক সভা জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ জরুরী একটি বিষয়ের আলোচনার জন্য উহার কার্য্য বন্ধ রাখিতেছেন। রায়পুর, হরিপুর, কেয়াউলী, শ্রীরামপুর, নেপিকান্দি, ব্রাহ্মণদি, রাধাগঞ্জ বাজার, রহিমাবাদ প্রভৃতি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার (ঢাকা) প্রায় ৪০টি গ্রামের অমুসলমান অধিবাসীদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থায় সরকার অকৃতকার্য্য হওয়ায় যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে তদ্বিষয় অলোচনা করা সঙ্গত হইবে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ঐ সকল গ্রাম হইতে বর্ত্তমান মাসের প্রথমাবধি সঙ্ঘবদ্ধ লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, জোর করিয়া মুসলমান করণ, হিন্দু নারীর শ্লীলতা হানি, আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। ঐ অঞ্চলের বহু লোক তাহাদের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে ও উহাদের মধ্যে বহু সহস্র লোক বৃটিশ ভারত পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরার মহারাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আগরতলায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে।"

ঢাকা জেলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাদি সম্পর্কে গত ২৪শে চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

মুলতুবী প্রস্তাবটি এইরূপ :—"সম্প্রতি ঢাকা জেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা, অগ্নিদাহ ও অরাজকতার যে পুনরনুষ্ঠান ও বিস্তৃতি লাভ হইয়াছে এবং উহার প্রতিকার ও ঐ জেলায় জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট যে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সেই জরুরী বিষয়ের আলোচনার জন্য পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হউক।"

শ্রীযুত রায় চৌধুরীর উক্ত মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং স্পীকার স্যার আজিজুল হক আগামী বুধবার পৌনে ছয় ঘটিকায় ঐ মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা হইবে বলিয়া স্থির করেন।

মুলতুবী প্রস্তাবের উত্থাপনে অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা কালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ঢাকার হাঙ্গামা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন।

৪০ বৎসরের প্রবাসীর লেখক তালিকা

গত চৈত্রের প্রবাসীতে মুদ্রিত ৪০ বৎসরের লেখক-তালিকা যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা ঐ তালিকার উপরে এবং বিবিধ প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল। এই অসম্পূর্ণতা ইচ্ছাকৃত না হইলেও ইহার জন্য আমরা দুঃখিত। যে-সকল নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি লিখিত হইতেছে :—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ ও গুহজায়া, শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার। আমরা সকল লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রথম হইতে প্রবাসীর গ্রাহক

যাঁহারা প্রথম সংখ্যা হইতে প্রবাসীর গ্রাহক তাঁহাদের কয়েক জনের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি :—

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, বিদ্যাভূষণ, দিনাজপুর ; রায় বাহাদুর দীননাথ দে, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেশন্স জজ, মধুপুর ; চন্দননগরের ডাক্তার আশুতোষ দত্ত ; জিতেন্দ্রলাল দত্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা প্রভাময়ী মিত্র জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পরিবারে প্রবাসী বরাবর গৃহীত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে ; জামশেদপুর হইতে প্রমথনাথ ঘোষ ও অনাথনাথ ঘোষ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতা ৺অতুলচন্দ্র ঘোষ (ছদ্মনাম "বীরেশ্বর গোস্বামী") প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক ছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহাদের পরিবারে প্রবাসী বরাবর লওয়া হইতেছে ;

এবং ডেরাদূন হইতে বিমলাচরণ সোম লিখিয়াছেন যে তথাকার "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি" বরাবর প্রবাসীর গ্রাহক।

পত্রলেখকদিগের প্রতি

আমাকে অনেকে চিঠি লিখিয়া থাকেন। যে চিঠিগুলি মডার্ন রিভিয়ু বা প্রবাসীর কিংবা প্রবাসী প্রেসের কোন বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে, সেগুলি উত্তর দিবার নিমিত্ত পত্রিকা দুটির বা প্রেসের কর্মচারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়া থাকি। যে চিঠিগুলি পত্রিকা দুটির সম্পাদকীয় কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে, সেগুলির উত্তর দিবার ভার সহকারী সম্পাদকদিগকে দিয়া থাকি। কখন কখন এই উভয় প্রকার চিঠির মধ্যে অন্য কথাও থাকে। তাহারও উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়।

পরিচিত ও অপরিচিত অনেকের নিকট হইতে আমার ছাপাখানা বা পত্রিকাদ্বয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, এরূপ বিষয়ে চিঠি এবং ব্যক্তিগত চিঠিও অনেক আসে। সেইগুলি পড়িয়া সবগুলির উত্তর যথাসময়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমার কোন সেক্রেটরী নাই। সুতরাং এরূপ যত চিঠির উত্তর দিয়া থাকি, সমস্তই নিজে পড়িয়া স্বহস্তে উত্তর দিতে হয়। আমার কাজ অনেক, অবসর কম, শক্তি হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। এই জন্য যথাসময়ে অনেক চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। অনেক স্থলে এত বিলম্ব হয়, যে, তখন উত্তর দিবার কোন সার্থকতা থাকে না, বরং তাহা অসৌজন্যই মনে হইতে পারে। এই সকল স্থলে উত্তর দেওয়া হয় না। অনেক চিঠির উত্তর অত্যন্ত বিলম্বে যায়।

চিঠির উত্তর দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধীয় সমুদয় দোষ-ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চাহিতেছি।

যাঁহাদের সহিত আমার প্রীতি ও স্নেহের সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকে কিছু বলা অনাবশ্যক—তাঁহাদের ক্ষমা আমি পাইয়াই আছি।

আমাকে যাঁহারা যে-কোন রকমের চিঠি বাংলায় বা ইংরেজীতে লিখিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া গাঢ় কাল কালিতে স্পষ্ট অক্ষরে কিঞ্চিৎ ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিলে উপকৃত হইব।

প্রবন্ধাদিপ্রেরকদিগের প্রতি

যাঁহারা মডার্ন রিভিয়ু বা প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার রচনা প্রেরণ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গাঢ় কাল কালিতে স্পষ্ট অক্ষরে তাহা লিখিলে উপকৃত হইব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিলে তাহা পড়িতে আমার অসুবিধা হয়। যাঁহারা ইংরেজী প্রবন্ধ টাইপলিখন যন্ত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠান, তাঁহারা কাল কিংবা নীলাভ গাঢ় কালি ব্যবহার করিলে অনুগৃহীত হইব ;—আমার সুবিধার প্রতি যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি রাখিতে চান, তাহা হইলে লাল বা রক্তাভ কালি বর্জন করাই শ্রেয়ঃ জানিবেন।

মক্তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা

গত চৈত্রের প্রবাসীতে, ৮৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায়, ১৯৩৮ সালের বলিয়া যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৯৩৭ সালের। দৈনিক কাগজগুলির ভুল প্রবাসীতে অনুসৃত হইয়াছিল।

জগৎ-তারণ বিদ্যালয়ের বিল্ডিং ফণ্ডে মেজর বসুর দান

গত চৈত্রের প্রবাসীর ৭৯৯ পৃষ্ঠায় জগৎ-তারণ বিদ্যালয়ের বিল্ডিং ফণ্ডে মেজর বসুর দান ৫০০০ টাকার পরিবর্তে হইবে, "তাঁহার পুত্রের ও দুই ভ্রাতৃজামাতার নামে তিন হাজার।"

নূতন বউ অলকা—

শ্রীমনোজ বসু

ছেলে বলল—আপনার সঙ্গে কথা আছে, বাবা।

—কলেজের বই, না টেনিসের র‍্যাকেট ?

—সে-সব কিচ্ছু নয়।

মুখের চুরুটটি হাতে নিয়ে নৃত্যলাল বললেন—তবে আবার কি ? বেশ, বলে ফেল—

—অলকাদের সম্বন্ধে বলছিলাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে নৃত্যলাল বললেন—অলকাটা কে হে ?

প্রতুল বলে—আপনি জানেন না বুঝি! ছোট মামীর ভাইয়ের মেজ মেয়ে, সেই যে গেল-বছর স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করল।

—ওঃ! তা অলকা বোঝা গেল, কিন্তু তাদের মানে আর কে কে ?

প্রতুল রাগ করে বলে—তার বাবা, মা, ভাই, বোন··· আর ওদিককার ছোট মামা, ছোট মামী—

—সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাবে—হ্যাঁ ? ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন—খুব সংক্ষেপে সারো। আমার কাজ আছে।

প্রতুল বলে—অলকাকে আমি দেখেছি।

—ভাল।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি···ধরুন, এক রকম মত দিয়েই ফেলেছি।

চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নৃত্যলাল বললেন—মনস্থির আমিও করেছি। আজ নয়—অনেক দিন, তোমার জন্মের আগে থেকেই। কাজেই এ বিয়ে হবে না, তোমার ছোট মামা যতই বলুক।

প্রতুল বলে—অলকা দেখতে খারাপ নয়।

—যদি খারাপই হয়। তুমি কী এমন লাটসাহেবের বেটা যে স্বর্গের অপ্সরী নইলে ঘরে মানাবে না। খারাপ চেহারার মেয়ের বিয়ে হয় না, বলি খারাপগুলো পড়ে থাকে নাকি ?

—তবে আপত্তি কেন ?

—তুমি পছন্দ করবে, আমি ঘাড় হেঁট করে তাই মেনে নেব—এইটে উচিত, না আমার পছন্দ তুমি মানবে এইটে উচিত ? জিজ্ঞাসা করি, নৃত্যলাল প্রতুলচন্দ্রের বাবা—না প্রতুল নৃত্যলালের বাবা ?

প্রতুল বলে—আজ নূতন কথা বললে হবে কেন, বাবা ? বরাবর বলেছেন, আমাদের স্বাধীন মত জেগে উঠবে—আপনি তাই চান।

নৃত্যলাল বললেন—একশো বার চাই। ভেড়ার পালের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ জন্মাক, কে চায় না শুনি ?

—তা হলে ?

—এ ত তোমার একলার কোন ব্যাপার নয়, বাপু। তোমার বিয়ে দিয়ে যাকে আনব, সে কেবল তোমার বউ হবে না—আমাদের হবে পুত্রবধূ, তোমার বোনেদের হবে ভাজ, এত বড় সংসারের হবে অন্নপূর্ণা। তা হলে, একলা তোমার মত থাকলে কি হবে ? সকলের মতামত চাই।

সুহাসিনী ঘরে ঢুকে বললেন—কি তোমাদের বচসা হচ্ছে ? ও খোকা, বলছিস কি ?

প্রতুল বলে—আমার আজই বোর্ডিংএ ফিরতে হবে, তাই বলছি। ভোট নিয়ে বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।

জোরে জোরে পা ফেলে সে বেরিয়ে গেল। নৃত্যলাল হেসে উঠলেন।

সুহাসিনী বললেন—কি হয়েছে ?

নৃত্যলাল বললেন—যে বয়সের যে পাগলামি। আমি করেছিলাম, ও করবে না কেন ? আমিও বাবাকে গিয়ে বলেছিলাম, শিবানীর সঙ্গে বিয়ে না দেন ত সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

সুহাসিনী কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি বললেন ?

—তিনি হলেন মুকুন্দ রায়, সোঁদরবনের বাঘ—আমার মতো এই রকম আধঘণ্টা তর্কাতর্কি করবার মানুষ তিনি! সংক্ষেপে বললেন—তাই যাস। মাস খানেকের মধ্যে দেখি, আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি বোঝাই, রসুনচৌকি বাজছে। গোয়াল বাড়ির পাশে ঐ খানটায় হাঙর-মুখো

পালকি এলো। বাবা বললেন—ভালয় ভালয় উঠে বসবি, না এত লোকের মধ্যে কানে হাত দিতে হবে ? উঠে বসলাম,…তার পর চিত্তির-করা পিঁড়ির উপর বসে ভয়ে ভয়ে মন্তোরও পড়লাম।

সুহাসিনী বললেন—কিন্তু সেই শিবানীর সঙ্গে বিয়ে হলেই হয়ত ভাল হ'ত।

নৃত্যলাল আগুন হয়ে বললেন—কোন শত্তুর একথা বলেছে, জিজ্ঞাসা করি ? আমার যা ভাল হয়েছে, তোমার ঐ তেজীয়ান ছেলের ভাগ্যে তার সিকির সিকি হোক দিকি ! তাইত ঠিক করেছি, আর দশটা কাজে যা-ই হোক, বিয়ে-থাওয়া হবে বুড়োদের কথায়। দেখ ত অন্যায়টা… জল-জ্যান্ত একটা বউ ধরে এনেছি, তিরিশ বছর তার সঙ্গে সংসার করে ঝুনো হয়ে গেলাম। আমি মেয়ে বাছতে পারব না, পারবেন উনি আর ওঁর বন্ধুবান্ধবের দল !

দিন কুড়িক পরে নৃত্যলাল দুপুরবেলা দোতলার ঘরে শুয়ে চোখ বুজেছেন, এমন সময় সুহাসিনী গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত নেড়ে চুড়ি বাজিয়ে তিনি শব্দ-সাড়া দিলেন। জড়িত স্বরে কর্ত্তা বললেন—কি ?

—চিঠি এসেছে।

—এখানে রাখ কোথাও।

সুহাসিনী বললেন—কালীপদ লিখেছে, খবর আছে।

কর্ত্তা চোখ খুললেন।—চিঠি যখন এসেছে, খবর ত আছেই। তার পর স্ত্রীর মুখ-চোখের দিকে চেয়ে বললেন—জরুরি খবর ?

সুহাসিনী বললেন—খোকার বিয়ে, পঁচিশে তারিখ।

নৃত্যলাল বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসলেন।—দয়া করে খোকার ছোট মামা তাই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে ? পড় দিকি শুনি।

সুহাসিনী চিঠিখানা ছুঁড়ে দিলেন, চোখ ভরে জল এল। বললেন—আমি পারব না, তুমি পড়গে। পেটের ছেলের বিয়ে, পর-অপরের মত খবর দিয়েছে, দেখ।

কর্ত্তা চশমা চোখে দিয়ে গম্ভীর ভাবে চিঠির আগাগোড়া পড়লেন। তার পর আরও একবার পড়লেন। সুহাসিনী বললেন—এখন কি করবে ?

—যেতেই হবে, খোকার বিয়ে যখন। গিন্নির মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—রাগ করছ কেন, তোমারই ভাই লিখেছে। রাগ করলে কুটুম্বিতে চটে যাবে।

সুহাসিনী বললেন—বয়ে গেল। পেটের সন্তানের চেয়ে আর কেউ আপনার নয়। তাকে যে পর করে নিয়ে গেল, সে ভাই নয়—শত্রু।

কর্ত্তা উঠে দাঁড়ালেন।

—কোথায় চললে ?

—নবীনকে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিই।

—কেন ?

—ছেলের বিয়ের বরযাত্রী যেতে হবে না ? নৃত্যলাল ম্লান হাসি হাসলেন। বলতে লাগলেন—মাঝে চারটে পাঁচটা দিন আছে। ধোপা কালই কাপড় দিয়ে যাবে। অন্তত পক্ষে পরশু সকালে রওনা হতে হবে। দু-এক দিন আগেই যাই।

নিজের ঘরে গিয়ে সুহাসিনী চোখা চোখা কথায় ভাইকে চিঠি লিখতে বসলেন।

…তোমার সন্তান নাই, সেই জন্য খোকাকে তোমাদের ওখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে দিই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ছেলে বিলাইয়া দিই নাই। আমাদের প্রথম সন্তানের বিবাহ—বাড়ির প্রথম কাজ, মনে মনে কত সাধ-বাসনা ছিল। এই বিবাহ সম্পর্কে আমাদিগকে তুমি একটা কথাও জানাও নাই, অধিকন্তু সাধারণ নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া অপমান করিলে। মানী লোককে এই ভাবে অকারণে অপমান করিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। সেই লোক ঘাড় হেঁট করিয়া তোমাদের ওখানে বরযাত্রী চলিয়াছেন, কত বড় আঘাত পাইয়া যে যাইতেছেন, তাহা কেবল আমিই জানি। তোমার এই অপরাধ আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।…

চিঠি ডাকে পাঠিয়ে তার পর যেন সুহাসিনী একটু ঠাণ্ডা হলেন।

সদর উঠানে পালকি এসেছে, বেহারারা তামাক খাচ্ছে। নৃত্যলালের সঙ্গে জিনিষপত্র বেশী কিছু যাবে না। সুহাসিনী জামা-কাপড় ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি করে দিচ্ছিলেন, বললেন—না গেলেই ভাল হ'ত কিন্তু।

—কেন ?

—দেখ, কাটা-কান চুল দিয়ে ঢাকতে হয়। মামা-ভাগনেয় ষড়যন্ত্র করে কাণ্ডটা করলে—তার পর তুমি যাবে সেখানে…লোকে হাসাহাসি করবে, আঙুল দিয়ে দেখাবে—

নৃত্যলাল ভ্রূকুটি করে বললেন—সেই ভয়ে খোকার বিয়ে দেখব না ? কি যে বলো তুমি !

সুহাসিনী বললেন—না, যাওয়া উচিত নয়। একা একা গিয়ে অপমানিত হবে, আমি কিছুতে শান্তি পাব না।

নবীন লম্বা একটা কাঠের বাক্স এনে রাখল।

সুহাসিনী শিউরে বললেন—বন্দুক নিয়ে যাচ্ছ নাকি—কেন?

নৃত্যলাল বললেন—একা যেতে মানা করছিলে—একা আমি যাব না, ইনিই সঙ্গে যাচ্ছেন।

সুহাসিনী ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—বন্দুক কি হবে? না…না…তোমার যা রাগ, কার বুকে গুলি বসাবে বলো।

—আর কাউকে না পাই, নিজের বুকটা রয়েছে ত! তুমি নিশ্চিন্ত থাক গিন্নি, অপমানিত আমি হব না।

আধ-গোছানো ট্রাঙ্ক ঠেলে ফেলে সুহাসিনী রাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

—তোমার যাওয়া হবে না।

—তার মানে?

—হ্যাঁ, তোমায় যেতে দেবো না…যাও দিকি কেমন? বন্দুকের গুলি আগে আমার বুকে বসাবে, তার পর যাবে।

উত্তেজনা দেখে নৃত্যলাল হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—সে হবে না তা তুমি জানো, আমিও জানি। তা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ভেবে চিন্তে বলো—

—তবে বন্দুক থাক, আমি যাচ্ছি।

নৃত্যলাল বিব্রতভাবে বললেন—কিন্তু পালকি একখানা এসেছে।

—দুখানা লাগবে। নবীন, আর একখানা পালকি আনতে হবে যে, বাবা।

নবীন বলে—এক্ষুনি কি করে হয়?

—বিকেলে ত হবে!

নৃত্যলাল বললেন—বিকেল হ'লে পৌছতে কত রাত্রি হয়ে যাবে, জানো?

সুহাসিনী বললেন—তাতে তোমার নেমন্তন্ন ফসকে যাবে না গো…বরবিদায় আজ নয়, কালকে।

নৃত্যলাল ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলেন—এতক্ষণে বোঝা গেল গিন্নি, নেমন্তন্নের লোভ একলা আমার নয়। ছেলের বিয়ে দেখবার জন্য তুমিও মনে মনে মতলব পাকাচ্ছিলে, মুখ ফুটে বলো নি। যা রে নবীন, আর একখানা পালকি দেখ। মেয়েমানুষের বাপের বাড়ির টান—কিছুতে ঠেকানো যাবে না।

মেল-গাড়ি রাত আড়াইটেয় যশোহর আসে। সেই গাড়ী থেকে প্রতুল নূতন বউ নিয়ে নামল। সঙ্গে জন চারেক বরযাত্রী আর গোটা দুই-তিন বাক্স।

প্রতুল বলে—দেখ ত হে, মোটর আছে কি না?

—রিজার্ভ-করা গাড়ি, থাকবে না কি রকম?

সন্ধ্যার দিকে ভয়ানক ঝড়জল হয়ে গেছে, এখন জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার উপর কয়েকটা বড় ডাল ভেঙে পড়েছিল, সেসব ইতিমধ্যে সরিয়ে পথ করা হয়েছে। নালা দিয়ে কল-কল শব্দে জল যাচ্ছে…

—ও গাড়ি? বলি, কেশবপুরের গাড়ি রয়েছে কোন্ দিকে?

শব্দ-সাড়া নেই। নূতন বউ সপ্রতিভ খুব। সে-ও দু-এক পা এগিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। প্রতুল বলে—তুমি ঐ বাক্সের উপর চুপ করে বসে থাক। তুমি গাড়ি খুঁজবে …হয়েছে আর কি!

অলকা বলে—বসতে ভাল লাগছে না, এই এতক্ষণ বসে এলাম। আমি কি কাপড়ের বাণ্ডিল যে বসিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও?

প্রতুল বলে—বাণ্ডিলের একটা গুণ, ফেলে রাখলে ঠিক থাকে। তোমরা আবার নিজের বুদ্ধিতে নড়ে চড়ে মুস্কিল বাধাও কি না?

—মুস্কিল বাধাই না মশায়, মুস্কিলের আসান করি। উ-ই দেখ গাড়ি। গাছের তলায় দেখতে পাচ্ছ না?

ডালপালা-সমাচ্ছন্ন বাদাম গাছ, তার নিচে এক টিনের ঘরে হোটেল খুলেছে। এই রাত্রে হোটেলের অবশ্য ঝাঁপ বন্ধ, দূরে একটা টিমটিমে কেরোসিনের আলো থাকায় জায়গাটা আলো-আঁধারি হয়েছে। হোটেলের পাশে অলকা আঙুল দিয়ে দেখাল, সেটা খড়ের গাদা হওয়াই সম্ভব। কাছে গিয়ে দেখা গেল—না, মোটরগাড়ি।

অলকা বলে—ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রতুল বলে—না, মরে গিয়েছে। কিন্তু এত চীৎকারে মরা মানুষেরও নড়ে বসবার কথা।

তার পর হর্ন বাজানো, পা ধরে নাড়ানাড়ি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার পর ড্রাইভার উঠে বসল।

বরযাত্রীদের শহরেই বাড়ি, প্রতুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁরা বিদায় হবেন এইবার।

—নমস্কার, বৌদি। সংসার গুছিয়ে নিনগে, তার পর জ্বালাতন করতে যাব।

অলকা হেসে বলে—কথার ঠিক থাকে যেন। চিঠি লিখে আপনাদের আবার জ্বালাতন করতে না হয়।

—হ্যাঁ, উদ্যুগ করে চিঠি লিখবেন আবার। গিয়ে পড়লে তখন চিনতেই পারবেন না।

অলকা বলে—গিয়েই পরখ করবেন। যাবেন ত সত্যি?

—ও প্রতুল, যাব নাকি?

—যাবেন···যাবেন। আমি বলছি, উনি তার কি বলবেন। ধরুন, এর পরের শনিবারে? কি বলেন?

গাড়ি ছাড়ল।

প্রতুল বলে—নিমন্ত্রণ করলে অলকা, কিন্তু শনিবার নাগাত নিজেদের কি হয়, দেখ।

অলকা রাগ করে বলে—ভয় দেখিও না। চারদিকে এই ঝোপ-জঙ্গল···ভাবছি, কতক্ষণে বাড়ি পৌছে আরাম করে বসব, উনি আবার বাড়ির ভয় দেখাতে লাগলেন।

—বাবাকে ত জান না!

অলকা বলে—এখন থেকে জানব। শনিবারের এখনও পাচ-ছ দিন বাকি, তার মধ্যে জানাশোনা হয়ে যাবে।

—অত সোজা নয় অলকা, আমায় দেখে মনে কোরো না আমার বাবাও ঠিক এইরকম।

—নয়ই ত। এদ্দিন ধরে তোমায় দেখছি, বাবার গল্প কম শুনি নি। তোমায় জানতে যদি দু'বছর লেগে থাকে, বাবাকে জানতে দুটো দিনও লাগবে না, এই বলে দিলাম।

প্রতুল কি বলতে যাচ্ছিল, তর্জ্জনী তুলে অলকা বলল—চুপ···আর কথা নয়। তোমার হ'ল কি, সমস্ত রাত এই রকম বকবক করবে নাকি? আমার ঘুম পাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে প্রতুল বলে—চুরুটের কৌটো স্যুটকেসে পুরলে···দাও না একটা গো। চুরুটে আটকা থাকলে মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।

—সে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। চুরুট পাবে না, আর কথাও বলতে পাবে না। অলকা দেবী ঘুমুবেন, তাঁর বরের ঠোঁটে এই দেখ চাবি পড়ে গেল।

কোমল হাতখানি প্রতুলের মুখে চাপা দিয়ে ঝুপ করে অলকা তার কোলের উপর শুয়ে পড়ল।

মোটর ছুটেছে, চারিদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, ভিজে গাছপালা জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করছে।

—অত জোরে চালিও না হে···শুনছ?

—আজ্ঞে? ড্রাইভার চোখ রগড়াতে রগড়াতে পেছন দিকে চায়।

—এই যাচ্ছেতাই রাস্তা, তার উপর ফুলস্পীডে চালিয়েছ। তোমারও দেখছি ঘুম ধরেছে। আজ একটা কাণ্ড বাধাবে।

ড্রাইভার হেসে বলে—কিচ্ছু হবে না সার, ঠিক বাড়ি পৌছে দেব।

প্রতুল বলে—পৌছে ত দেবে, তবে যমের বাড়ি কি না তাই ভাবছি। তুমি বাপু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালাও—বছরে কতগুলো ঘায়েল কর বল দিকি?

ঘাড় নেড়ে লোকটি বলে—ঐ কথাটি বলতে হবে না সার। সেবার খেজুর গাছে বেধে গাড়ি চিৎ হয়ে উলটে গেল, কিন্তু প্যাসেঞ্জারেরা তক্ষুনি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর একবার হয়েছে কি—

—আর একবারের কাজ নেই হে, তুমি এদিকে ফিরে গল্প ক'র না। ভাল বিপদ দেখছি, যতক্ষণ জেগে থাকবে পিছন ফিরে গল্প করবে, আর সামনে ফিরবে ত চোখ বুজবে।

ড্রাইভার সগর্ব্বে বলে—চোখ বুজলে কি হয়, রাস্তা মুখস্থ হয়ে গেছে।

এই সময়ে উঁচু-নীচু একটা বাঁক, গাড়ি হঠাৎ যেন লাফাতে লাগল, জোর হাতে ড্রাইভার স্টিয়ারিং চাকা চেপে ধরেছে। প্রতুল ডাকে—গতিক ভাল নয় অলকা, উঠে ব'স শীগ্‌গির।

ঘুমচোখে অলকা বলে—বাড়ি এসে গেল?

—যা ব্যাপার ওদের, বাড়ি যাবে ত বিশ্বাস হয় না।

গাড়ি আবার ভাল রাস্তায় এসেছে। প্রতুল বলল—আর আমরা বাড়িতেই যাচ্ছি নে মোটে।

অলকা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে—বাড়ি নয়, কোথায় যাচ্ছ তবে?

—মামার বাড়ি।

—কেন?

প্রতুল জবাব দেয় না। অলকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—বাবা মারুন আর কাটুন, নিজেদের বাড়ি-ঘরে যা ঘটে ঘটবে। আর এক জায়গায় উঠে, আত্মীয়-কুটুম্বের মাঝখানে···ছি-ছি এ তুমি কি করেছ! আমাকে একবার বললে না।

কুণ্ঠিত স্বরে প্রতুল বলে—আমার সাহস হয় না।

—আমার পিছনে থেকো। ড্রাইভারকে বলে গাড়ি ফিরিয়ে নাও।

—বাবা কি বাড়ি আছেন, এতক্ষণ কোন্ কালে মামাদের ওখানে রওনা হয়ে গেছেন। আর এক কাণ্ড করে বসেছি, ছোট মামার নাম করে এক নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছি, তাতে বিয়ের তারিখ দিয়েছি পাঁচ দিন পরে।

—তাতে কি হবে?

—বাবাকে ত জানি, তিনি বিয়ে বন্ধ করতে ছুটে যাবেন। গিয়ে পড়েছেন হয়ত। এদিকে আমরাও যাচ্ছি। মামার বাড়ি চার মামা, দিদিমা আর মামীরা সব রয়েছেন। সকলে ধ'রে পেড়ে মিটিয়ে দেবেন। আর ছোট মামা আমায় বড্ড ভালবাসেন কি না।

অলকা বলে—বাবা-মার চেয়ে নয়। আমি জানলে এই সব জুয়াচুরি করতে দিতাম না।

তার পর চুপচাপ। অলকা বলে—কি ভাবছ ?

—যত এগুচ্ছি, ততই ভাবনা হচ্ছে অলকা। বাবা রাগী মানুষ, রাতটা পোহালে কি যে হবে !

রাস্তার পাশে খোড়ো ঘর। ছেলে কাঁদছে, টেমি হাতে কে এক জন বেরিয়ে এল। বেগুন-ক্ষেত, পাশাপাশি দুইটা বটগাছ··গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি মাঠের মধ্যে এল, জোলো হাওয়া বইছে, মাঠের জলে ঢেউ উঠেছে, রাস্তার গায়ে ছলছল করে ঢেউ এসে লাগছে।

অলকা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—তাই ত বলি। এমন ভাল ছেলে হয়ে ব'সে রয়েছ তুমি !

প্রতুল বলে—ঘুমুই নি

—তবে মাথা ঝুঁকে পড়ছে কেন ? ভাবনার ভারে ?

—কেন পড়ছে, শুনবে ? উঃ—কি হাওয়া ! মুখটা আন ইদিকে, কানে কানে বলছি।

অলকা বলে—ইস্ ! মাথা তুলবার জো নেই, দুষ্টু মিটুকু আছে।

পশ্চিমে চাঁদ নিচু হ'য়ে এসেছে, তার পর অনেক দূরে ঝাপসা গাছপালার আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। রহস্য-মধুর অন্ধকার।

এক সময়ে প্রতুল ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

—জল কেন ? গাড়ির মধ্যে জল থই-থই করছে ? অলকা—অলকা—

ড্রাইভার আগেই নেমে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়েছে, টর্চ জেলে দেখছে। ঘাড় নেড়ে সে বলল—গাড়ি আর যাবে না, আপনারা নামুন।

প্রতুল তিক্ত স্বরে বলে—সমুদ্রের মাঝখানে এনে বলে 'নামুন'। গাড়ি চলবে না বললেই হ'ল ?

—ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে, চলবে কি করে।

—বলি, রাস্তা থেকে বিলে নামলে কেন ?

—আঁধারে দেখা যায় বুঝি !

—হেডলাইট আছে কি করতে ?

ড্রাইভার রেগে গেছে। ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে—কোথায় আছে, দেখুন না। টর্চ ফেলে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলে—মিছে কথা বলছি নাকি ? সে ঘোড়ার ডিম জখম হয়ে আছে আজ তিন বচ্ছর।

অলকা বলল—শীতে কাঁপ ধরে গেছে। আর সওয়াল ক'রো না, ডাঙায় চলো—

—এই সব লটবহর ?

ড্রাইভার এদিকে লোক ভাল। বলে—ও বাক্স-বিছানা আমিই রাস্তায় তুলে দিচ্ছি···আর রাস্তাই বা কেন, সামনে তোফা ডাক-বাংলা রয়েছে, আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ুন গে।

অলকা উৎসাহিত হয়ে বলে—সেই ভাল। আমার খুব মজা লাগছে। চলো, এই ফ্লাস্ক-ট্রাঙ্কগুলো আমি নিচ্ছি—

খুচরো দু-একটা জিনিষ ছিল, তৎক্ষণাৎ সে হাতে টেনে নিল।

বোঝা মাথায় নিয়ে জল ছপ-ছপ করে ড্রাইভার এগিয়ে চলেছে। প্রতুল বলে—কই, তুমি নেমে এসো।

অলকা বলে—পায়ে জুতো, যাই কি করে !

—জুতো হাতে নেও, এই যেমন আমি নিয়েছি—

—আর যে আলতা পরা রয়েছে···কাদা লেগে সব বিচ্ছিরি হয়ে যাবে। আমি এত জিনিষ নিয়েছি, তুমি কিচ্ছু নিলে না। তুমি আমাকে নাও।

প্রতুল বলে—বা রে ! তোমার ভার আর তোমার ঐ সব জিনিসের ভার—সমস্ত পড়বে আমার উপর।

অলকা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—এরই মধ্যে ভার-বোঝা হয়ে গেলাম বুঝি। এই ত ক'টা দিন—

এ এক বিচিত্র অনুভূতি, ক'দিন মাত্র আগে কত দূরে ছিল এই একেবারে আপনার মানুষটি ! অলকা বলে—ধ্যেৎ, দেখ দিকি···ড্রাইভার বেটা আবার পিছনে ফিরে চায়। কি ভাবছে বল ত। আর তুমিও চলেছ টিমিয়ে টিমিয়ে—

গভীর স্নেহে প্রতুল তাকে নিবিড়তর বন্ধনে বেঁধে ফেলে। খোঁপা খুলে বিনুনি জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। অলকা বলে—দেখ কাণ্ড···না, তোমার জ্বালায়···এ কি, কপালের টিপটা ফেলে দিলে ত !

প্রতুল ভয় দেখায়—ঝগড়া করবে ত দেবো এই শোলাবনের মাঝখানে ফেলে। দেব ? দিই ?

ডাক-বাংলোয় এক চৌকিদার আছে। ড্রাইভার

বলে—তাকে পাবেন না সার। পান-সুপারির ব্যবসা করে কিনা, দিনমানেই ফুরসৎ হয় না। এমন-তেমন মানুষ এলে ইঁদুরে-কাটা পাগড়িটা পরে তখনই কেবল সেলাম করে দাঁড়ায়।

একটিমাত্র কামরা, ভিতর থেকে বন্ধ। ড্রাইভারের টর্চটা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পিছনের বারান্দায় দেখা গেল, খানিকটা ঘেরা মতো জায়গা; সেখানে চার-পাঁচ খানা বেঞ্চ আছে, হাতা-ভাঙা চেয়ার আছে, এখানে পাঠশালা বসে থাকে তার চিহ্ন রয়েছে। একটা বেঞ্চিতে গড়িয়ে পড়ে অলকা সদুপদেশ দেয়—তুমিও ঐখানে শোও—

প্রতুল বলে—শুয়ে পড়লে···তোমার কাপড় ভিজে জবজবে, ছাড়তে হবে না?

ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে অলকা নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুঁজল।

প্রতুল বলে—কি হয়েছে দেখ। ট্রাঙ্কের ভিতর অবধি জলের পাথার। শাড়ি ধুতি একটাও শুকনো নেই। কি হবে?

মধুর হেসে অলকা বলে—হবে আবার ছাই। শুয়ে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে প্রতুল বলে—তুমি মানুষ নও।

—নই-ই ত। তুমি যে কত কি বলে থাকো। ওগো বলো না, শুনি···মানস-কমল, সোনার পরী—আর কি কি সব ভাল ভাল কথা?

প্রতুল বলে—পরী না আরও কিছু। তুমি একটি গাধা। ভিজে কাপড়ে থাকলে নিমোনিয়ায় ধরবে, এই বুদ্ধিটুকু নেই।

মাথায় এক মতলব এল প্রতুলের। কাপড় হাতে করে এসে বলে—ওঠো দিকি, উঠে দয়া করে শুকনো কাপড় পরে আমায় কৃতার্থ করো।

চোখ মেলে অলকা বলে—এই যে বললে সমস্ত ভিজে গেছে। কি মিথ্যুক তুমি গো—

—বাইরে কাপড় মেলা আছে কতকগুলো, ওঁরাই মেলে রেখেছেন।

অলকা বলে—তাই অমনি নিয়ে এলে? পরের কাপড় পরতে আমার ঘৃণা হয়।

—কাদা-মাখা নোংরা কাপড় পরে আছ, তাতে ঘৃণা হচ্ছে না? এ ত দিব্যি গরদের শাড়ি। আসল কথা, উঠতেই আলসেমি। সে আমি শুনছি না, ভিজে কাপড় পরে থাকতে আমি দেবো না তোমায়।

—বাবা রে বাবা। তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? অলকা উঠে গিয়ে কাপড় বদলে এল। বলে—সকাল বেলা উঠে ওঁরা কি ভাববেন!

—উঠবার আগেই যেমনকার কাপড় তেমনি মেলে রেখে দিও। তোমার কাপড়ও একখানা শুকোতে দিয়ে এলাম, ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

ভাল করে ভোর হয় নি, কাক ডাকতে সুরু করেছে সবে। ড্রাইভার এসে ডাকতে লাগল—শুনছেন সার?

প্রতুল উঠে দেখে, অলকা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখলে মায়া হয়···একেবারে ছেলেমানুষটি, বয়সের তুলনায় আরও যেন ছেলেমানুষ···অজানা জায়গা, তা বলে একটু-খানি হুঁশ নেই, কেমন করে ঘুমুচ্ছে দেখ। আহা, ঘুমোক!

ড্রাইভার বলে—আমার ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিন, আমি যশোর ফিরছি। পায়ে হেঁটে যেতে হবে, সকাল সকাল রওনা না হ'লে কষ্ট হবে!

—তোমার গাড়ি?

—গাড়ি থাকবে এই রকম। রাস্তায় এসে দেখে যান না।

বিলের জল ছাপিয়ে রাস্তার উপর দিয়ে গড়াচ্ছে, খানিকটা জায়গা ভেঙেও গেছে। ভাঙা জায়গার মুখে এসে মোটর দাঁড়িয়েছে। চাকার অর্দ্ধেকটা তখনও ডুবন্ত।

ড্রাইভার বলে—খামোকা বকাবকি করলেন। আমিও আঁধারে ঠাহর পেলাম না—ভাবলাম, সত্যি বুঝি বিলে নেমেছি! ঘুমুলেও কি রকম হুঁশ থাকে দেখলেন, এই গোটা রাস্তা আমার মুখস্থ। ভাড়ার টাকা কিন্তু পুরোপুরি চাই সার।

—বাড়ি পৌঁছলাম না, পুরো ভাড়া কি রকম?

—মনিব শুনবে না, আর আমার যখন দোষ নেই—

—তা বটে! রাস্তা ভেঙেছে, তার দোষ আমার। গাড়ি জল থেকে তুলে আর কোন পথে যাবার জোগাড় দেখ না!

—সেই জন্যেই ত যাচ্ছি, ভাড়াটা মিটিয়ে দিন। এঞ্জিনে জল ঢুকেছে, দিনসাতেক এখন এক দম আর নড়াচড়া করবে না। এদ্দিন ত বসে থাকতে পারবেন না, আপনি পালকি-টালকি করে চলে যান।

পুকুরধারে পালকি দেখা যাচ্ছিল। প্রতুল বলে—ঐ যে রয়েছে, ঠিক করে দাও না।

—ভাড়া-করা পালকি সার। বেহারার সঙ্গে তামাক খেয়ে এলাম। কাল রাত্রে এঁরা যাচ্ছিলেন, ঝড়-জল দেখে ডাক-বাংলায় নেমে পড়েছেন, এক্ষুনি উঠে রওনা হবেন। আপনি গাঁয়ে চলে যান্ না, দু-খানা কেন—দশখানা পালকি পেয়ে যাবেন।

ঘুমের ঘোরে অলকা শুনছে, কর্ত্তা-গিন্নীতে বচসা হচ্ছে। কর্ত্তা রাগত স্বরে বললেন—চুরুট নেই, তা তুমি এসেছ কি করতে?

গিন্নি বলছেন—আমি কি তোমার নবীন খানসামা, চুরুট হাতে পিছন পিছন ছুটতে হবে?

—চুরুট আনলেই অমনি খানসামা হয়ে গেলে। আমি তোমার জন্যে কি না করেছি! তুমি পানে দোক্তা খেতে, আমি পানই খেতাম না। শেষে তোমার খাতিরে দোক্তা অবধি অভ্যাস ক'রে ফেললাম।

—আমাকেও চুরুট অভ্যাস করতে বল নাকি?

—তাই বলছি বুঝি। একটা চুরুট দিতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ভুলে যান, উনি করবেন চুরুট অভ্যাস! জ্ঞান তো সকালবেলা ধোঁয়া না হ'লে মন আমার খিঁচড়ে থাকে, কোন কিছু ভাল লাগে না।

হাসি পায় অলকার। সব পুরুষ এক রকম। এঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে, পুরুষেরা চুরুট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, তা নইলে তারা নড়তে পারে না।···তার পর আবার ঘুম একটু গাঢ় হয়েছে, হঠাৎ সে ধড়মড়িয়ে উঠল। এবার কথা কাটাকাটি নয়, রীতিমত সোরগোল। ওঁরা বাইরে চলে এসেছেন। গিন্নি উত্তেজিত স্বরে বলছেন—শাড়ি চুরি হয়ে গেছে। একশ' বার বললাম, ঘরের মধ্যে যদ্দূর শুকোয়—শুকোক, চোর-ছ্যাচোড়ের দেশ। তুমি শুনলে না। গরদের ভাল শাড়িখানা আমার—

অলকা উঠে দাঁড়িয়েছে। সর্ব্বনাশ, ওঁরা এই বারান্দার দিকে আসছেন, শাড়ি তার এখনও পরা রয়েছে। এমনি রাগ হতে লাগল প্রতুলের উপর! বেশ মানুষটি···নিজে ঘোর থাকতে উঠে গেছে, তাকে একটু ডেকে দিয়ে যেতে হয়!

অলকার সামনে এসে গিন্নি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—তুমি কে বাছা?

অলকা হাসবার মতো ভাব করল। বলে—পথ-চলতি মানুষ মা, আপনারা যেমন এখানে এসে পড়েছেন, আমরাও তেমনি।

গিন্নি বললেন—তা ত হ'ল। কিন্তু আমি ঐ কাপড় পরে ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করি। বলা নেই, কওয়া নেই—কোন্ জাতের মেয়ে তুমি ঠিক-ঠিকানা নেই—তুমি যে বাছা কাপড় পরে দুর্গা-ঠাকরুণ হয়ে আছ—

কথা শুনে এমন অবস্থায়ও হাসি আসে। অলকা বলে—আমি মুচির মেয়ে, চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? ফাঁকতালে আপনার কাপড় পরে নিলাম।

—কাপড় পেয়ে গেছ? কার সঙ্গে কথা হচ্ছে? কর্ত্তাও চলে এলেন। তিনি বলতে লাগলেন—তাই ত বলি, কে আবার চুরি করবে! সেই সেই পেলে, মিছামিছি খানিক চেঁচালে।

গিন্নি বললেন—ঐ কাপড় আমি ছোঁব নাকি? উঠানের কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। চুরি আর কাকে বলে?

এই বার—বোধ করি পুরুষমানুষের সামনে হচ্ছে বলেই—অলকার চোখে-মুখে যেন আগুন ধরে গেল। বলে—আপনার ফেলতে হবে না, আমিই ফেলে দিচ্ছি।

ছুটে ওধারে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে আগের দিনের কাদামাখা কাপড়খানা পরল, বাক্স খুলে এক মুঠো টাকা নিয়ে ঝন্‌ঝন্ করে সিমেণ্টের বারান্দায় ছুঁড়ে দিল। বলে—ক'টাকা দাম, নিয়ে নিন। আরও লাগবে? বলুন—বলুন—

কর্ত্তা-গিন্নি দু-জনে হতভম্ব হয়ে রইলেন। শেষে কর্ত্তা বললেন—এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি। চুরি করবে, আবার চোখ রাঙাবে। এক সঙ্গে দুটো হওয়া কি উচিত?

অধীর কণ্ঠে অলকা বলে—একশো বার বলছি চুরি করি নি—

—কিন্তু 'না বলিয়া লইলে'—প্রথম ভাগের কথা!

অলকা বলে—দরজায় খিল এঁটে আপনারা নাক ডাকছিলেন, বলি কি ক'রে? আর আমরা রাত দুপুরে ভিজে কাপড়ে হি-হি করে মরি। তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল, বলে—ঐ ভাবে থাকলে ঠিক হত, রাতের মধ্যে নিমোনিয়া ধরত। আমার ত মা-বাপ কেউ দেখবার নেই—দিব্যি হ'ত!

কর্ত্তা বিচলিত হয়েছেন, ভাবে বোঝা গেল। বললেন—যাই বলো গিন্নি, না জেনে ও রকম করা তোমার ঠিক হয় নি।

গিন্নি ভয়ে ভয়ে একবার অলকার দিকে তাকালেন; তখনও তার গালের উপর অশ্রু বেয়ে পড়ছে। বললেন—তুমি ত আমারই দোষ দেখবে, আমায় কি কিছু খুলে বলেছে? কেবল তোমার কাছে গালি খাওয়াবার মতলব।

কর্ত্তা বিব্রত ভাবে বললেন—গালি আবার কখন দিলাম। এই দেখ···বললাম যে, মন খিঁচড়ে আছে—সুবিধে হবে না আজ। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গিয়েও প্রলয় বাধবে দেখছি।

অলকা স্যুটকেস থেকে চুরুটের কৌটা নিয়ে এসে ঠক করে জানলার উপর রাখল। বলে—এই নিন, আর প্রলয়ে কাজ নেই—মন ঠাণ্ডা করুন গে।

চুরুট দেখে কর্ত্তার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

—বাঃ বাঃ—একেবারে খাঁটি জিনিষ। বাঁচালে, মা··· কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে এ নইলে আমার এক দণ্ড চলে না! আর হঠাৎ তুমি পেলেই বা কোথায়?

মহানন্দে একটি ধরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন—দেখ গিন্নি, তিরিশ বছর ঘর করছি—তোমার মনে থাকে না, আর—

শান্তকণ্ঠে অলকা বলে—আর ঝগড়ায় দরকার নেই। যান, ঠাণ্ডা মনে ভাবুন গে, একটা গরদের কাপড়ের দাম কত হওয়া উচিত।

ইজি-চেয়ার ছিল একখানা, তার উপর গড়িয়ে পড়ে কর্ত্তা মিনিট কয়েক চুপচাপ ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন।

—ওরে কানাই, গুছিয়ে নে—রওনা হওয়া যাক এবার।

সর্দ্দার-বেহারা কানাই বলল—হুজুর, হয়ে হয়েছে। ওরা সব বলল, গাঁয়ে স্বজাতি রয়েছে—তাদের ওখানে গিয়ে আরামে শুইগে। পালকি আমার জিম্মায় রেখে রাত্রেই তারা গাঁয়ে গেল। এখন ফেরে না—সন্দ হয় ব্যোম ভোলানাথ হয়ে কোথায় পড়ে আছে। আমি না হয় ছুটে দেখে আসি।

—তুই আবার কোথাও পড়ে থাকবি নে ত?

কর্ত্তা একটা চুরুট শেষ করে দু'নম্বর ধরালেন। তার পর ডাকতে লাগলেন—মা লক্ষ্মী, এদিকে আসবে একটু?

অলকা এসে দাঁড়াল।

—তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছে? মানে, আর কাউকে দেখছি না যে!

—তিনি পালকির চেষ্টায় গেছেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, তাই এখানকার চৌকিদারকে বলে গেছেন। দেখুন না, আমাদের মোটর ঐ জল খাচ্ছে।

অলকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্ত্তা মৃদুকণ্ঠে বললেন—এমনি ত খাসা মানুষ···বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সব আছে। রাগটা একটু কম কোরো··· বুঝলে মা, সুখে থাকবে।

দরজার ওদিক থেকে গিন্নি বলে উঠলেন—আর তুমি নিজেও। তোমার জন্যে ত এই সমস্ত দুর্ভোগ। নিজের পেটের মেয়ের মতো···সে-ই কি না মুখের উপর টাকা ছড়িয়ে দেয়, গরদের শাড়ি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে।

কর্ত্তা বললেন—কিন্তু আমি কি করলাম?

—তুমি কর নি? ছেলে বিয়ে করবে, তা বন্দুক নিয়ে চললে কোন্ লজ্জায় শুনি। আমি তখন কি করি···নইলে বয়ে গেছে আমার আসতে।

অলকা চমকে যায়। জিনিষপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বারান্দায় বের করা হয়েছে। দেখে, হোল্ড-অলের উপর নাম লেখা আছে, নৃত্যলাল রায়।

—ছেলে আপনাদের অমতে বিয়ে করছে বুঝি!

নৃত্যলাল বললেন—মত কি অমত ভাল ক'রে তার খোঁজ নিল কি হতভাগা? পাছে অমত করি, তাই মামার সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। হুঁঃ—মেয়েটা একবার দেখতে দিলেও শ্রীমানের স্বাধীন মতবাদ উড়ে পালাত!

গিন্নি বললেন—আর সেই জন্যে বাবুর বন্দুক নিয়ে গুলি করতে যাওয়া হচ্ছিল।

নৃত্যলালের দিকে চেয়ে লঘু কণ্ঠে অলকা জিজ্ঞাসা করে—গুলি কাকে করতেন? বলুন না। মেয়েটাকে—না? পরের মেয়ে—সেই সুবিধে—নিজেদের ত নয়!

গিন্নি বললেন—রাগ হ'লে উনি সব পারেন মা, সে চেহারা ত দেখ নি। আমি কেবল সারা জন্ম ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে গেলাম। তোমার মত একটি রণরঙ্গিনী ঘরে আনতে পারতাম, সেই ওঁকে জব্দ রাখতে পারত। দেখলে না, চুরুট নিয়ে কি রকম সুড়সুড় করে এখানে এসে বসলেন।

কানাই আর ফেরে না। বেলার দিকে চেয়ে কর্ত্তা-গিন্নি দু-জনেই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আবার অলকা এল, হাতে দু'টা বাটি আর কেটলি, কেটলির নল দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে।

কর্ত্তা সভয়ে বললেন—আমি চা খাই নে···তুমি ভাববে, হাতে খেতে চাচ্ছি নে। সে সব কিছু নয়, সত্যি চা খাই নে।

অলকা বলে—চা নয়, দুধ। পাশে গোয়ালবাড়ি, চৌকিদারকে দিয়ে দুধ আনিয়েছি, কেটলি-বাটি খুব ভাল ক'রে মেজেছি।

নৃত্যলাল একগাল হেসে হাত বাড়ালেন।—দাও, দাও, আর বলতে হবে না—অমৃতে আবার অরুচি! আচ্ছা মা, কি ক'রে তুমি টের পেলে এখানে পেটুক-দাস এসেছে, সকালে যতক্ষণ পেটে কিছু না পড়বে, মনটা খালি আইঢাই করবে।

অলকা হেসে বলে—আমি হাত গুণতে পারি। আর এক বাটিতে দুধ ঢেলে গিন্নিকে বলল—আপনি খাবেন না? আমি মুচির মেয়ে নই—সত্যি বলছি—

গিন্নি গম্ভীর মুখে বললেন—দাও। 'না' বললে এখনি বাটি সুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেবে ত! তার কাজ নেই।

কর্ত্তা-গিন্নি কথাবার্ত্তা বলছেন, অলকা ওদিকে গেছে। কর্ত্তা বার বার রাস্তার দিকে তাকান।

—কি?

—সাইকেল ঘাড়ে করে জলের উপর দিয়ে কে যায়, দেখ ত। কালীপদ না? হুঁ—সে-ই। কালীপদ, ও কালীপদ? ...ফূর্ত্তি করে তোমার ভাই বিয়ের বাজার করতে ছুটেছেন—বুঝলে? দাঙ্গা করতে বাড়ি যাচ্ছিলাম, পথেই পেয়ে গেছি।

কালীপদ এসে পায়ের ধুলো নিল। সুহাসিনী পা সরিয়ে নিলেন। কর্ত্তা বললেন—এস দিকি, কাছে এগিয়ে এস—এখান থেকেই কান মলতে সুরু করি।

কালীপদ বলে—আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে বড়দিদি, কেন মিছে রাগ করছ। কাল বিকালবেলা তোমার আর প্রতুলের চিঠি এক সঙ্গে পেলাম। পেয়ে ছুটে যাচ্ছি তোমাদের কাছে।

চিঠি বের করল। বলে—এই দেখ, সমস্ত কথা খুলে লিখেছে, বিয়েও হয়ে গেছে।

—সে কি, এর মধ্যে হয়ে গেল?

—এই দেখুন না। বিশে হয়ে গেছে। বউ নিয়ে সে যাচ্ছে আমাদের ওখানে। সেখান থেকে বাড়ি যাবে।

নৃত্যলাল বোমার মতো ফেটে পড়লেন।—বাড়ি গেলে জুতো মেরে বউসুদ্ধ তাড়িয়ে দেবো।

প্রতুল গ্রাম থেকে কখন ফিরেছে। দ্রুতপায়ে সে সামনে এল। অলকাও পিছনে। বলে—জুতো মারতে হবে না বাবা, এখান থেকেই বিদায় হচ্ছি। আপনার বাড়ি আমরা ঢুকবো না।

—আমরা মানে? নৃত্যলাল সবিস্ময়ে বললেন—এই মেয়ে বিয়ে করেছ?

এবার সুহাসিনী রেগে উঠলেন।—কোথায় যাবি তোরা? ইঃ—যাবো বললেই হ'ল! আমি সঙ্গে এসেছি কি করতে? জানি, এই রকম হবে। আমার ছেলে-বউ আমি বাড়ি নিয়ে তুলব, জোর করে পালকি পুরে নিয়ে যাব, কে তাড়িয়ে দেয় দেখি।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সুহাসিনী বাঁ হাতে অলকাকে বেষ্টন করলেন।

নৃত্যলাল নরম হয়ে গেছেন, সভয়ে অলকার দিকে তাকিয়ে মুখভাব দেখছেন। অথচ রণরঙ্গিনী মেয়ে এখন নিঃশব্দে হাসছে। বলে—বাবা, দিন তাড়িয়ে ওকে। তার পর আমরা সব পালকি করে বাড়ি গিয়ে উঠি। আপনার মতো মানুষ—তাঁর সম্বন্ধে কত কি মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে জানেন? বলে—রাগী মানুষ, মারবেন, কেটে ফেলবেন—হেনো-তেনো কত কি! এখন আবার বাহাদুরি হচ্ছে, বাড়ি ঢুকবো না—বিদায় নিয়ে চললাম।

নৃত্যলাল হো-হো করে হেসে উঠলেন।

—বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। স্বাধীন মতের খাণ্ডব দাহন হবে। আমার কি—সকালে উঠে চুরুট পাবো, গরম দুধ পাবো। আমি দেখি নি, শুনি নি...কিচ্ছু জানি না, নিজে দেখেশুনে করেছ বাপু।

কালীপদ বলে—নিজে দেখেশুনে করেছে, আপনি চটেন নি?

নৃত্যলাল বলেন—আর চটি নে। আমার একটা ধারণা ছিল বটে, কিন্তু দেখলাম, মেয়েরা সব ভাল। আমি বাবার কানমলার ভয়ে তোমার বড়দিদিকে না এনে—ধরো যদি শিবানীকেই বিয়ে করে বসতাম, কিছু ইতরবিশেষ হ'ত না। কিন্তু সে যাই হোক, আমরা বাড়ি যাচ্ছি— তুমি সঙ্গে চলো কালীপদ, বউ-ভাতের পর ফিরবে।

"সাম্প্রতিক" দল

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বঙ্গদেশে এরা "সাম্প্রতিক,"
বাঙালার সংস্কৃতির সভ্যতার ধারক বাহক,
ভবিষ্যৎ ভারতের কাঞ্চন-চন্দ্রিকা দল এরা—
এদেরি রাজত্ব আজ চলিতেছে প্রগতি-মূলক।
এর পূর্বে—ইতিহাসে লেখে—রাজ্য ছিল "কচি"দের হাতে
বাঙালা ও বাঙালীর শিল্পকলা সংস্কৃতি ও সভ্যতায়
তাহারাই আছিল ঋত্বিক।
বিগলিত ব্যানার্জি ও শিহরণ সেন
আর লালিমা পালেরা (পুং) মিলি
বাঙালীর জীবনেরে ক'রে তুলেছিল—শুনি—
শিল্পের বিটপী আর আর্টের অটবী :
তারা মানে বিগলিত ব্যানার্জি ও শিহরণ সেন
আর লালিমা পালেরা (পুং)—
ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলনের ঢঙে
হেঁটে চলে যেত যবে
শাড়ির আঁচল—থুড়ি—ধুতির কোঁচারে দুলাইয়া,
মনে হ'ত—আর্টের নায়গ্রা বুঝি এলো নেমে কোন্
আধুনিকা উর্বশীর বব্-ক'রে-ছাঁটা খাটো চিকুর বহিয়া :
তারা—মানে বিগলিত ব্যানার্জি ও শিহরণ সেন
আর লালিমা পালেরা—
যবে টেনে টেনে আধ আধ—গদ্যময় কথা নয়—পদ্যময়ী
বাণী
নভেলিয়ানার ছন্দে করিত প্রকাশ
মনে হ'ত—
আহা! কী যে মনে হ'ত তাহা নহে বলিবার,
সে-কথার ভাষা নাই
সে-কথা বলিতে গেলে যেই সুর যেই ছন্দ যে-সঙ্গীত লাগে
তাদের সৃজন কোথা হয় নি আজিও :
তারা—মানে বিগলিত শিহরণ লালিমারা—যবে
অপাঙ্গে নয়ন হানি'
ওষ্ঠাধর ফিক্ ফিক্ হাসিতে রঞ্জিয়া
হেসে হেসে দেশে দেশে চ'লে যেত ভেসে
মনে হ'ত—
আহা! মনে হ'ত বাঙালার বাঙালীর আর কিছু নাহি
চাহিবার,
বাঙালা ও বাঙালীরা আজ যদি ম'রে যায় নাহি ক্ষোভ তায়—
সকল আশার আর সকল ভাষার
সকল প্রাণের আর সকল গানের
সর্বশেষ আর সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা
মূর্তিমান হ'য়ে যেন ফুটিয়াছে "কচি"দের জীবন-লীলায়,
বিধাতার সব ঋণ বাঙালীর হয়ে গেছে শোধ,
নির্বাণেও নাহি ক্ষোভ আর।
নির্বাণ হ'ল না তবু বাঙালী-জীবন,
"কচি"দের রাজ্য শুধু গেল অবশেষে
একটি রজনী অবসানে,
বুঝি রাজশেখরের ঝরণা-পেনের সোনা-নিবের খোঁচায়।

আজি শুনি বঙ্গদেশে রাজ্য করে "সাম্প্রতিক" দল
দুর্বার প্রভাবে।
"কচি"র কেতন ছিল আর্টের প্রতীক,
"সাম্প্রতিক" দল আজি উড়াইছে "প্রগতি"-পতাকা—
এই 'প্রগতি'র মূল্য বোঝে না যাহারা
নিবিড় তিমির-কূপে তারা নিমজ্জিত।
কালস্রোতে ভেসে চলে এ-পৃথিবী বিবর্তন-পথে
যুগ হ'তে যুগান্তরে ঊর্ধ্ব হ'তে ঊর্ধ্বতর লোকে,
অতএব—
যেহেতু এ "সাম্প্রতিক" সভ্যদের জন্মের তারিখ
সবাকার শেষে—মানে ঘটিয়াছে অতীব সম্প্রতি,
সেই হেতু এদের মগজে
যেই চিন্তা যেই ভাব যেই ইচ্ছা যে কামনা বাঁধিয়াছে বাসা
আর ধরিতেছে ভাষা
তাহাই 'প্রগতি',
আর বিশ্ব-বাঙালার তাহাই সুগতি।
নভেল কন্টিনেণ্টাল, ফ্রয়েডী থিয়োরি আর লেনিনী প্রবন্ধ,
এর মাঝে পাইয়াছে এরা এক অদ্ভুত বিলাস,
এরি মাঝে হেরিয়াছে এরা যেন এ-সৃষ্টির রহস্য সকল,

মানুষের যাহা কিছু চরম পরম তার গোপন বারতা।
এর পর যদি কিছু সংশয়ের থেকে থাকে লেশ
এলিয়ট্ পাউণ্ডের গদ্য কবিতার জাদু লেগে
একেবারে গ'লে তাহা হ'য়ে গেছে জল।
তার পর আর কোনো দ্বিধা নাই দ্বন্দ্ব নাই নাই কোনো
অগ্র ও পশ্চাৎ
এরা হয়ে পড়িয়াছে দিব্যদৃষ্টি সর্বদর্শী মহাজ্ঞানিদল—
ইহারাই—ইহাদেরি চিন্তারাজ্য আজ
উদ্ধার করিবে যত বঙ্গের সন্তানে আর বিশ্বমানবেরে,
মানুষের যাহা কিছু—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
শিল্পকলা কাব্য ও সঙ্গীত
এদেরি বচন আশে রহিবে ঝুলিয়া
অনাগত যত শতাব্দীতে।

আসল কথাটা কিন্তু এই—
ইহারা সামর্থ্যহীন।
মানুষের যে-সামর্থ্য ডাকে গভীরেরে
গভীরের স্পর্শে পায় আত্মবিনোদন
সে-সামর্থ্যে ইহারা বঞ্চিত।
ইহারা সামর্থ্যহীন—তাই প্রাণ ইহাদের
গভীরের স্পর্শে পায় দারুণ বেদনা;
তাই প্রাণপণে এরা গভীরেরে করি' অস্বীকার
বাহিরের জীবনেরে, সুপারফিশ্যাল এক জীবনেরে বরি'
আত্মবঞ্চিতের এক পরম সান্ত্বনা
'প্রগতি'রে করিয়াছে খাড়া;
তাই এরা রহিয়াছে স্নায়বিক পুলকের রসের ব্যাপারী
আর আত্ম-অভিমানে ভাবিতেছে ইহাই প্রগতি,
তাই ইহাদের
প্রেম চেয়ে কাম সত্য,
আস্তিকতা চেয়ে সত্য শূন্য নাস্তিকতা,
তাই পদ্য কবিতার চেয়ে বিলাস এদের যত গদ্য কবিতায়।
অসামর্থ্য মোহ আর আত্মপ্রবঞ্চনা
তার সনে মিশাইয়া আত্ম-অভিমান
সৃষ্ট বাঙালার এই সাম্প্রতিক দল—
অন্ধ ও অজ্ঞানী আজি এই বিশ্বে যদি কেহ থাকে
তারা এই আজিকার বঙ্গে সাম্প্রতিকের দঙ্গল।
রুগ্ন এরা, রুগ্ন ইহাদের যত স্নায়ু-তন্ত্রী দেহে,
তাই এরা ছড়াইছে রুগ্ন বীজ যত,
অসত্য চিন্তার বীজ
দুর্বল ভাবের বীজ
বিকৃত রুচির বীজ
তাই এরা ছড়াইছে স্বদেশের আকাশে বাতাসে,
স্বজাতির নাড়ীতে নাড়ীতে,
এইমাত্র ইহাদের সত্য আর ক্ষুদ্র ইতিহাস,
ইহাদের আত্মার নিশানা।
খ্রীষ্টের নিধনকারী জু-দিগের মতো
ইহারা সম্বিত-হারা, নাহি জানে নাহি বোঝে কি যে
করিতেছে।

মানব-জীবনে কভু—অগ্রগতি নহে—মাত্র অগতি ইহারা,
ইহাদের স্বল্প মন ও ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা।

সামর্থ্যবিহীন এরা,
তাই এরা—ভারত-সন্তান—ভারতেরে নাহি জানে,
চিনিবারো শক্তি নাহি ধরে।
যে-এক সম্পদ আছে রক্ষিত এ-ভারতের বুকে,
যে-এক তপস্যা আছে পরম আশ্চর্য
তার তরে ইহাদের মনে নাহি জাগে
কোনো প্রশ্ন কোনোই জিজ্ঞাসা!
তাই এরা ফ্রয়েড লেনিন
কে কোথায় তৃতীয় শ্রেণীর সত্য করি' আবিষ্কার
সাজিয়াছে ঋষি,
তারি পিছে ছুটিতেছে রুদ্ধ-হিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পড়ি কিম্বা মরি,
তাই বুঝি এরা ভাবিতেছে এ-ভারত যদি কোনো মতে
হ'তে পারে রুশ ঋক্ষ-লাঙ্গুলের অনুরূপ কিছু
জীবনের আর কিছু নাহি রবে বাকি—
পরাধীন ভারতের বুকে
প্রতিটি দশকে
বারবার উঠিতেছে ভেসে ওই কথা—
"আমরা কিছুই নহি,
মোরা শুধু য়ুরোপের তল্পির বাহক আর কল্কির পিয়াসী।"
ওরি মোহে সম্মোহিত দেশে আজ যত 'সাম্প্রতিক',
তবু মিথ্যা ভাবিতেছে—দেবীর বাহন ওরা শ্বেতহংসদল
চঞ্চুপুটে আছে ধরি' প্রগতি-মৃণালে।

উহারা সামর্থ্যহীন—
যে-সামর্থ্যে মানুষের মনের জিজ্ঞাসা
গভীর গভীর অতি গভীরে পৌছায়,
যে-সামর্থ্য মানুষের চরম আনন্দ
খুঁজে ফেরে চেতনার সত্তার গভীরে,
যে-সামর্থ্য মানবত্ব অঙ্গীকার করি' এই মাটির মানুষ

নিজেরে ছাড়ায়ে যায় তারাদের সঙ্গীতে সঙ্গীতে,
মনের দিগন্তপারে যে জ্যোতিঃ-সমুদ্র আছে জাগি'
ছলো ছলো আনন্দ-লহরী যেথা ডাকিতেছে মানব-
আত্মারে
সে-সমুদ্রে অবগাহি নিজেরে অমৃত বলি' জানে,
সে-সামর্থ্যহীন এরা—
নাস্তিক সিনিক আর স্বকীয় প্রেমিক
তাই এরা সাজিয়াছে—এই মহাবীরের দঙ্গল,
'প্রগতি'র পুরোহিত চমূ।

এ-সৃষ্টির অন্তিম রহস্য
মানুষের চরম সত্যেরে
যুগে যুগে এ-ভারত আছে ধরি আপনার গোপন অন্তরে,
আপনার তপস্যার বলে সে জেনেছে
মানুষের পরম চরম এক অনির্বচনীয়
আনন্দ-জগৎ,
পেয়েছে সে আপনার অমৃত-নিশানা—
এর কাছে লেনিন স্ট্যালিন মার্ক্স ফ্রয়েডাদি মহাঋষিকুল
রবি-রশ্মি কাছে যেন খদ্যোতের প্রায়,
তাদের জ্ঞানের বাণী শিশুর কাকলি মাত্র—আর কিছু
নয়।
ভারতের এই জ্ঞান—এ-জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে
হ'তে পারে এ-পৃথিবী শান্তির আলয় আর ভদ্রের আবাস,
অন্য কোনো পন্থা নাই, নাই অন্য কোনোই কৌশল।
সকল জ্ঞানের ভাষা সকল প্রগতি
সকল প্রাণের আশা সকল সুগতি
সবেরি সরণি ওই জ্ঞান আর অমৃতের পরম নিলয়ে—
যান্ত্রিক সভ্যতা মাত্র জড়ের বাহন
বৈশ্যের সভ্যতা শুধু ক্ষুধার উল্লাস,
মানব-আত্মার সেথা নিত্য পরাজয়
বিষণ্ণ বিবর্ণ সেথা অমৃতের বাণী।

অমৃত বাণীর সেই মহা অবদান
অন্তরে পালন করি' এ-মহাভারত
জন্ম জন্ম যুগ হ'তে যুগান্তরে আছে অপেক্ষিয়া—
নিরুদ্দিষ্ট পুত্রহারা মাতা যথা রহে
নিভৃত কুটীরে তার প্রতি সন্ধ্যাবেলা জ্বালি'
সান্ধ্যদীপখানি
আপনার পুত্রের আশায়—
দানবীয় ক্ষুধা-ক্লান্ত ক্লিষ্ট আসুরিক যত লোভ মোহ মদে
বিশ্বের মানব কভু ফিরিবে কি সে- কুটীরদ্বারে
আকুল অন্তরে আর আত্মনিবেদনে?
তারা কি তৃষিত হবে অমৃতের লাগি'?

ঐক্যের আহ্বানে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা কখনো দানের বস্তু হ'তে পারে না। ভিক্ষার পথে কখনো মুক্তি আসে না। মুক্তিকে অর্জ্জন করবার একটি মাত্র পথই আছে আর সে পথ হোলো শক্তির পথ। শক্তি আসে ঐক্যের সাধনা থেকে। যারা শতধা বিভক্ত তারা চিরকালই বলহীন থেকে যাবে। একজনের জন্য যেখানে হাজার জন তাদের জীবন বলি দিতে উদ্যত সেখানে মুক্তির আসনকে কে বিচলিত করতে পারে? **The dependence of Liberty shall be lovers—** হুইটম্যানের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

স্বাধীনতা কেন এখনো আমাদের নাগালের বাইরে রয়েছে? আমরা শক্তিহীন ব'লে। কেন আমরা শক্তিহীন? যেহেতু ভালোবাসার টানে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারছি নে সেই হেতুই আমরা শক্তিহীন। আমরা মিলতে পারছি নে কেন? কারণ আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আছে, মূঢ়তা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। ম্যাকিভারের একটা কথা আমার কাছে বড়ো সত্য লাগে—

The primitive and the superficial intelligence see

only difference where the widened mind sees the vaster likeness.

বুদ্ধি যেখানে ভাসা-ভাসা সেখানে পার্থক্যটাই উগ্র হয়ে দেখা দেয়—মন যেখানে ঔদার্য্য লাভ করেছে সেখানে বিশালতর ঐক্যটাই বেশী ক'রে চোখে পড়ে। আমাদের বুদ্ধি এখনো পরিণতি লাভ করেনি ব'লেই মিলবার এত বড়ো কারণ থাকতেও আমরা আজ মিলতে পারছি নে—আমরা পরস্পরের মাঝে এখনও ভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকে খাড়া ক'রে রেখেছি—পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখছি। আমরা যেখানে একান্তভাবে হিন্দু সেখানে মুসলমান থেকে আমরা তফাৎ। কিন্তু এই তফাৎটাই কি একমাত্র সত্য? আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী একই ভারতবর্ষের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেছি, একই ভূমিজাত শস্যে আমাদের উভয়ের দেহ পুষ্ট হচ্ছে, একই নদীর জল আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে, একই আকাশে আজানের ধ্বনি এবং কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ প্রতি সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাচ্ছে, সর্ব্বোপরি আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে একই সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য পাশে বেঁধে রেখেছে এবং সেই শৃঙ্খলকে না ভাঙতে পারলে আমাদের কারও কল্যাণ নেই—এতগুলো ঘটনার মধ্যে ঐক্যকে উপলব্ধি করবার মতো কি কিছুই নেই? আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা কমিউনিস্ট, আমরা গান্ধীবাদী, আমরা মডারেট আমাদের এই সব পরিচয়ই কি একমাত্র পরিচয়? আমরা হিন্দু হই আর মুসলমান হই, কমিউনিস্টই হই আর মডারেট হই—সবাই আমরা ভারতবাসী এবং আমাদের সকলেরই মঙ্গলের পথে বাধা হয়ে রয়েছে একই সাম্রাজ্যবাদের জগদ্দল পাথর যাকে অপসারিত না করতে পারলে কারো কল্যাণ নেই—আমাদের এই পরিচয়ই হোলো সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয়। আমাদের নিজেদের কাছে এই পরিচয় যত সত্য হয়ে দেখা দেবে—আমাদের মিলনের পথ ততই প্রশস্ত হবে। আমরা যত মিলতে পারবো আমাদের শক্তিও তত বেড়ে যাবে, আমাদের শক্তি যত বাড়তে থাকবে—স্বাধীনতার প্রভাত ততই নিকট থেকে নিকটে আসবে। দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাসে ঔরংজীব জিজ্ঞাসা করছে, হিন্দু মুসলমান এক হবে, দিলীর খাঁ? দিলীরের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, 'কেন হবে না সম্রাট? তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন ক'রে, একই জল পান ক'রে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয় নি? তারা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে করজোড়ে ভক্তিবাষ্পগদ্গদস্বরে এই সুজলা-সুফলা জন্মভূমিকে একবার প্রাণ ভ'রে মা ব'লে ডাকুক দেখি, সম্রাট!' আনন্দমঠে মহেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করল, 'মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?' ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে। সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।' দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রতিধ্বনি। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক। দুজনেরই মন্ত্র স্বাধীনতার মন্ত্র, জাতীয়তার মন্ত্র এবং সেই জন্যই ঐক্যের মন্ত্র।

ঐক্যের উপলব্ধির মধ্যেই শক্তি আর এই উপলব্ধির মূলে রয়েছে **nationality**—আমরা সবাই ভারতবাসী আর ভারতবর্ষকে শাসন করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কেবল ভারতবাসীরই—এই বোধ। এই বোধকে আচ্ছন্ন করবার জন্যই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি—যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের ভেদবুদ্ধিকে উগ্র ক'রে তোলে তাদের রাতারাতি আমদানি। এ সবের প্রভাব দেশে যত বেশী বাড়বে—আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের চক্ষু আনন্দের আতিশয্যে তত বেশী বিস্ফারিত হ'য়ে উঠবে, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ভেদবুদ্ধিকেই শাণিয়ে তুলছে। আমি মুসলমান—এই বোধের অস্বাভাবিক তীব্রতা স্বজাতি-প্রীতির অনুশীলনের পথে যে অন্তরায় এতে কোনোই সন্দেহ নেই। স্বজাতি-প্রীতির আতিশয্যের মধ্যেও বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। স্বাজাতিকতার উপরে যেখানে আমরা বড্ডো বেশী জোর দিই সেখানে সার্ব্ব-লৌকিক প্রীতির আদর্শ ম্লান হয়ে পড়ে। আমি এক জন মানুষ এবং সমস্ত বসুধা আমার আত্মীয়—এ আদর্শের চেয়ে বড়ো আদর্শ আর নেই। মানুষের মনে এই আদর্শ ম্লান হয়ে গেছে ব'লেই আজ জাতিতে জাতিতে এই সংগ্রাম।

কিন্তু যেখানে আমরা শৃঙ্খলিত সেখানে শিকল ভাঙার জন্য স্বজাতি-প্রীতির অনুশীলন অপরিহার্য্য। পরাধীন দেশে এমন একটা ক্ষেত্র তৈরির প্রয়োজন যেখানে শৃঙ্খলিতেরা সবাই মিলতে পারে একযোগে কাজ করবার জন্য। আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি এক এবং ভারতীয় মহাজাতির নিজেকে শাসন করা উচিত, এই বোধ সবাইকে একই পতাকার তলে মেলাবার পক্ষে বড়ো অনুকূল। পরাধীনতার শিকল ভাঙতে হ'লে মহাজাতিত্বের মতো এমন অনুপ্রাণনার উৎস আর নেই। আধুনিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি। ম্যাট্সিনির ইটালি, ডি ভ্যালেরার আয়র্ল্যাণ্ড, বিসমার্কের জার্ম্মানী, কামালের তুরস্ক, জগলুলের মিশর প্রচণ্ড শক্তি

হের্‌ৎসেগোবিনার মোষ্টার নগরী

শ্লোভেনিয়া রমণী, উৎসববেশে
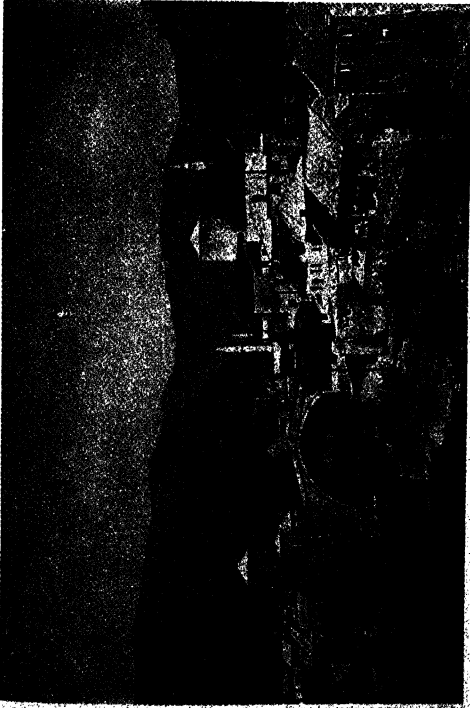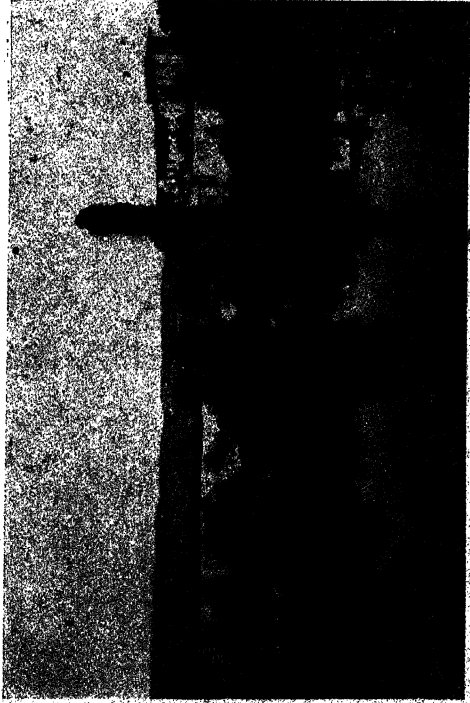
মাসিদন অঞ্চলে ওখ্‌দা হ্রদ ও শ্বেতী নাউম মঠ

আড্রিয়াটিকের কোটোর বন্দরে হের্‌ৎসেগোবিনার কৃষক রমণীদল
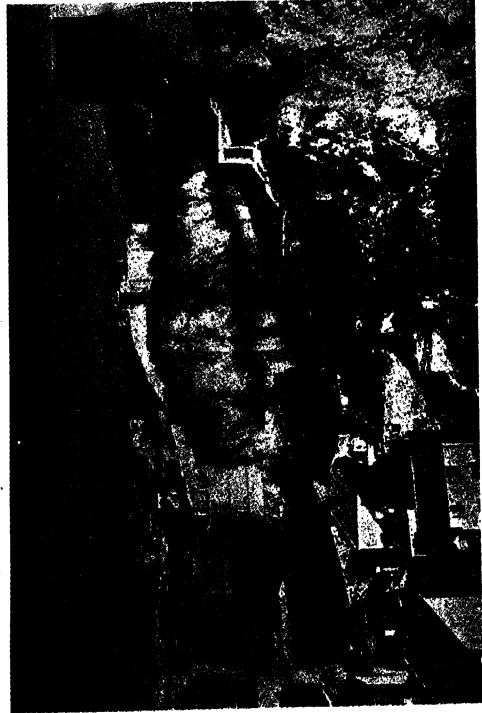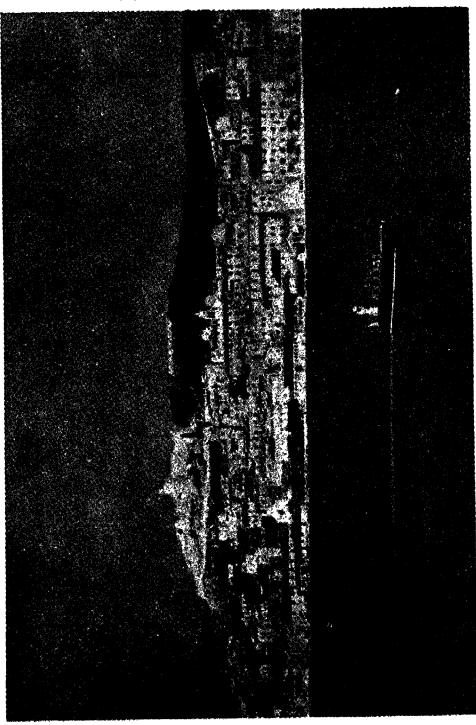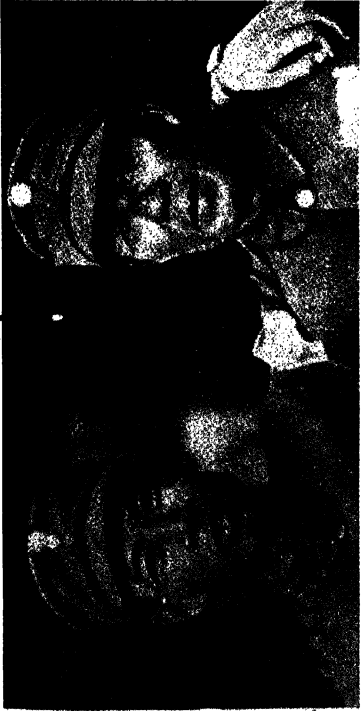
চীন। বিজয়ী চীন রণনায়কদ্বয়, জেনারেল ওয়াং টে চুয়ান ও জেনারেল কুয়ানউই

চীন। বিজয়ী চীন সেনার এক দল

যুগোশ্লাভিয়া। সার্ব্বিয় কৃষক যুবক ও রমণীদল

যুগোশ্লাভিয়া। মোনাষ্টিরের পথে সার্ব্বিয় মুসলমান রমণীদিগের পথযাত্রা

বর্ম্মা-চীন পথ। চিত্রের ভিতরে, (উপরে) পথপৃষ্ঠের দৃশ্য, (নীচে) মেকং নদের প্রসিদ্ধ সেতু
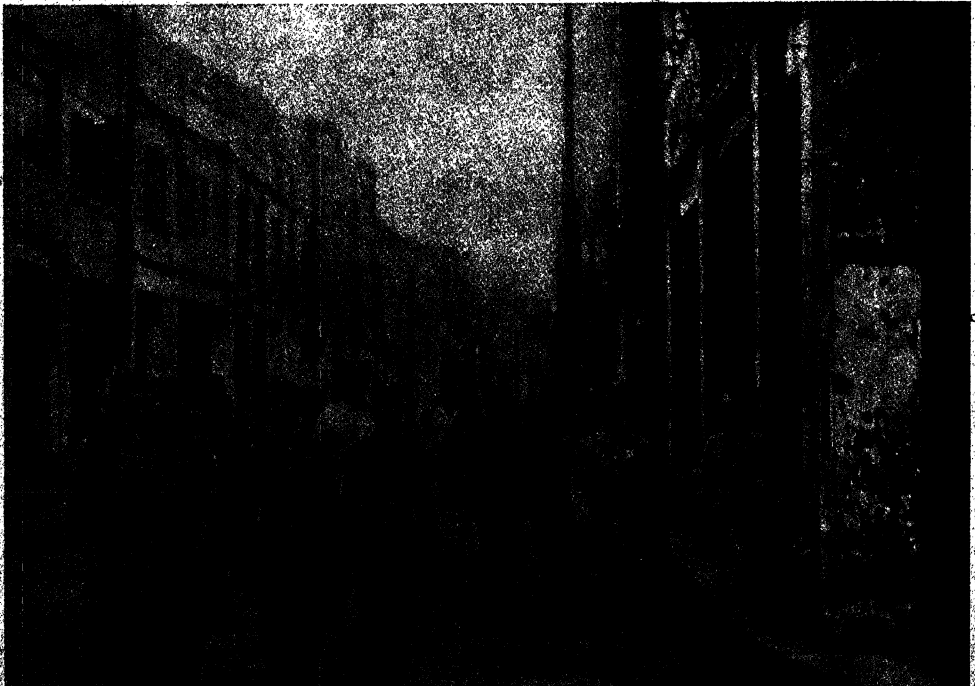
চীন রাষ্ট্রে প্রথম জয়লাভ। নানিং নগরে চীনা সেনানায়কগণের প্রবেশ

অর্জ্জন করেছে স্বজাতি-প্রীতির সাধনা করে। সুতরাং স্বজাতি-প্রীতির আদর্শকে সঙ্কীর্ণ ব'লে আমরা কোনোক্রমেই বর্জ্জন করতে পারি নে। জাতি যত দিন পরাধীন থাকবে ততদিন স্বজাতি-প্রীতিই একমাত্র ধর্ম্ম ব'লে তার কাছ থেকে পূজা পেয়ে আসবে। পরাধীনতার রাত্রি অবসান হ'য়ে স্বদেশের দিগন্তে যখন স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় হবে তখনই আসবে স্বজাতি-প্রীতির আদর্শের জায়গায় 'স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্' অথবা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই বিশাল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুপ্রভাত। ম্যাকিভারের (Maciver) ভাষায়—

When the principle of National liberty has been achieved, the true inspiration of nationality is fulfilled, and nationality having become the basis of community must cease to be also its ideal.

জাতীয় স্বাধীনতা যখন পেয়ে গেলাম তখন স্বজাতি-প্রীতির প্রেরণার আর কোনো প্রয়োজন রইলো না। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তো আর স্বজাতি-প্রীতির প্রেরণার প্রয়োজন হয় না। যে কোনো বড় সাহিত্য পড়, দেখবে সেখানে যে-সব সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে তারা সমস্ত মানুষেরই সমস্যা—প্রেমের সমস্যা, নীতির সমস্যা, মৃত্যুর সমস্যা, আর্টের সমস্যা। ইংরেজরা যখন কারখানা আইন (Factory Act) তৈরি করেছে তখন স্বজাতি-প্রীতির প্রেরণায় নিশ্চয় তা করে নি। ইংরেজের ছেলেদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটে কারখানায় অনেকক্ষণ কাজ করলে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নির্ম্মল বাতাস ইংরেজ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের-পক্ষে অনুকূল—কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে ইংরেজ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা পাওয়া উচিত—নিশ্চয়ই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপরে এই রকম দৃষ্টি রেখে Factory Act তৈরী হয় নি। সেগুলো তৈরী হয়েছে শ্রমিকদের কল্যাণ-কামনা থেকে। তার পর যত দিন সকলের সঙ্গে মিলিত হবার কোনো বৃহৎ ক্ষেত্র ছিল না—এমন কোন পতাকা ছিল না যার নীচে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা মিলতে পারি তত দিন আদর্শ-হিসাবে স্বজাতি-প্রীতির একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা ছিল। অখণ্ড জাতি যখন তৈরি হয়ে গেল তখন স্বদেশ-প্রীতির আদর্শেরও আর কোনো প্রয়োজন রইল না। সার্ব্বলৌকিক প্রীতিকে মর্ম্মের মন্দিরে বসিয়ে পূজা করবার দিন এলো। আমাদের এই দুর্ভাগা পরাধীন দেশে একমাত্র স্বজাতি-প্রীতির আদর্শই বরণীয় আদর্শ। আর সব আদর্শের পূজা হৃদয়ের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। পরাধীন দেশের কণ্ঠে বিশ্বপ্রেমের মতো বড়ো বড়ো আদর্শের জয়গান কেমন যেন খাপছাড়া শোনায়। সুতরাং মহাজাতিত্বের আদর্শ আমাদের হৃদয়ে এখন অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য করুক। যা কিছু আমাদের স্বজাতি-প্রীতিকে ম্লান করবে তাকে কিছুতেই এখন আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি নে। কংগ্রেসকে কেন আমরা হৃদয়ের মধ্যে বরণ ক'রে নিয়েছি? কারণ কংগ্রেস আমাদের চেতনাকে সমগ্র দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হবার সুযোগ দিয়েছে—কংগ্রেস বহু বৎসরের সাধনায় এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছে যেখানে আমরা সকলের সঙ্গে মিলতে পারি ভারতবাসী হিসাবে। কংগ্রেসের তোরণ-দ্বার হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আমরা ভারত-বাসী—এই সত্যই কংগ্রেস হৃদয়ে হৃদয়ে জাগিয়ে রাখতে চায়। আমরা যেখানে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র—সেখানটাতে জোর দিচ্ছে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। আমরা যেখানে হাজার রকমের বৈচিত্র্য নিয়েও এক সেইখানটাতে জোর দিচ্ছে কংগ্রেস।

ঐক্যের মধ্যেই শক্তির বীজ—একথা যদি সত্যি হয় তবে কংগ্রেসের কাছে আমাদের তনুমনধন নিবেদন করতেই হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তা হ'লেও কংগ্রেসই আমাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত—কারণ কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে সফলকাম হতে পারি নে তার কারণ আমাদের উদ্যমের অপচয়, আমাদের মধ্যে কো-অপারেশনের অভাব। স্বাধীনতা যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে মহাজাতিত্বের আদর্শকে সর্ব্বগ্রাসী আদর্শ ক'রে তুলতে হবে। মহাজাতিত্বের আদর্শকে সর্ব্বগ্রাসী আদর্শ ক'রে তুলতে হ'লে কংগ্রেসের পতাকাতলে সবাইকে টেনে আনতে হবে, সারা দেশ ছেয়ে ফেলতে হবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে। কংগ্রেসকে আমরা যত বেশী শক্তি-শালী ক'রে তুলতে পারবো স্বজাতি-প্রীতির আদর্শ জন-সাধারণের মনে তত বেশী বদ্ধমূল হবে। কিন্তু কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হ'লে চাই কংগ্রেসের মধ্যে সংহতি। পাঁচ শো লোকের জনতাকে পঞ্চাশ জন সৈনিক যে ছত্রভঙ্গ করতে পারে—তার কারণ জনতার মধ্যে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব কিন্তু সৈনিক দল বিশৃঙ্খল নয়। জনতা পালায়—সৈনিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে পারে। মরবার এই ক্ষমতা তাকে দেয় সংঘজীবনের শৃঙ্খলা। কংগ্রেসের শক্তিকে দুর্জ্জয় ক'রে তুলতে হ'লে তার মধ্যে চাই সৈনিকবাহিনীর শৃঙ্খলা। কংগ্রেসের নির্দ্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। কংগ্রেস বলেছে সভ্য সংগ্রহ করতে সদস্যকে কংগ্রেসের আদর্শ বুঝিয়ে দিয়ে এবং

তার কাছ থেকে চারি আনা পয়সা নিয়ে। সদস্যের কাছ থেকে পয়সা না নিয়ে, সদস্যকে কংগ্রেসের আদর্শ বুঝিয়ে না দিয়ে যদি কংগ্রেসের মেম্বারের সংখ্যা বাড়াতে থাকি তবে কংগ্রেসের শৃঙ্খলা যে পরিমাণে নষ্ট হ'তে থাকবে কংগ্রেসের শক্তিও সেই পরিমাণে হ্রাস পাবে। আর একটা কথা। এত দলাদলি যেখানে সেখানে কখনো শৃঙ্খলা থাকতে পারে? সিপাহীরা জনে জনে সেনাপতি নয়। তাদের সেনাপতি এক জনই আর সেই সেনাপতির আদেশ তারা নির্ব্বিচারে পালন করে। এক জনের নির্দ্দেশকে নির্ব্বিচারে পালন করবার এই যে ক্ষমতা এই ক্ষমতার মধ্যেই শৃঙ্খলার প্রাণ আর শৃঙ্খলার মধ্যেই সৈনিকবাহিনীর শক্তির বীজ। কংগ্রেসের মধ্যে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। সেখানে ভীড় ক'রে আছে অনেকগুলি দল এবং উপদল। এক এক দলে এক এক জন নেতা। নেতাদের পরস্পরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। তাদের চেলারা গুরুদেরও ছাড়িয়ে যায়। এক দল যদি চরকা কাটে আর এক দল চরকাগুলোকে সতরঞ্চি চাপা দেয়। এক দল বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলে আর এক দল মাইক্রোফোন ভাঙে। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র প'ড়ে থাকতেও একই জায়গায় এসে সবাই গুঁতোগুঁতি করে। দলের সঙ্গে দলের পার্থক্য যে অল্পই—ঐক্যটাই যে বেশী—নেতাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে এই সহজ কথাটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই দলাদলির এত পঙ্কিলতা। দলের গণ্ডী ছেড়ে কোনো নেতাই বাইরে আসবে না—অন্য দলের ছোঁয়াচ লাগলে 'সতীত্ব' বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে!

এই দলাদলির ভূত কবে যে আমাদের ঘাড় থেকে নেমে যাবে! নামবে না যদি দলের মোহ আমরা ত্যাগ করতে না পারি। দলপ্রীতির আতিশয্যের মধ্যে একটা বর্ব্বরসুলভ সঙ্কীর্ণতা আছে। দলের মোহে আমরা সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আজকের দিনে প্রয়োজন হচ্ছে গণ্ডী ভেঙে সকলের সঙ্গে মিলবার—হাতে হাত দিয়ে, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, তালে তালে পা ফেলে স্বাধীনতার পথে আগিয়ে চলবার। এই গণ্ডী ভাঙা সম্ভব হবে যদি একের নেতৃত্বকে আমরা মেনে চলতে পারি। যে-সংসারে শাশুড়ী এবং বধূ দু'জনেই কর্ত্রী সে-সংসারে চলে ভূতের নৃত্য। যে দেশে নেতা একাধিক সে দেশে গৃহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য্য আর গৃহ-বিচ্ছেদ যেখানে অনিবার্য্য সেখানে স্বাধীনতা অসম্ভব।

লড়ায়ের তূর্য্য যখন বেজে উঠেছে—স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন এক নেতৃত্ব ছাড়া উপায় নেই। তখন বহুর শাসনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য এবং বিশৃঙ্খলা মানে পরাজয়। যুদ্ধের সময় চাই এক জনের নির্দ্দেশ। নির্ব্বিচারে সেই নির্দ্দেশ পালন করতে হবে—প্রশ্ন করবার তখন সময় নয়।

> There's not to reason why,
> Their's not to make reply,
> There's but to do and die,
> Into the valley of death
> Rode the six hundred.

অস্তরাগ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

দেখেও না ভালো করে দেখা গেল প্রথম দেখাতে;
মনে এনে দেয় ছবি চিবুকের বাঁকা সে রেখাতে।
মাথায় বেড়েছে কিছু, ভরা তনু বঙ্কিম কোমল,
কপোলের টোলটিতে সে গরিমা তেমনি অটল।
স্নিগ্ধশ্যাম অঙ্গরাগ নব বরষার বনচ্ছায়া,
যৌবনের আভা তাহে মাখায়েছে প্রাতঃসূর্য মায়া;
বেশবাসে কেশপাশে আজ সে রহস্যময়ী আরো,
আয়ত আঁখির দৃষ্টি এমনটি নাই বুঝি কারো;
বিস্ময়ের ছাপ মুখে,—এত দিনে এত দূরে মেলা!
আলাপে সতর্ক হোক বোঝা যায় অন্তরে একেলা।
অপরিচয়ের দেশ, সময়েরও এত অজস্রতা,
মন চায় চেনা মুখ, যা হোক মুখের দুটি কথা।
সুধায়—এ পথে বুঝি আসা-যাওয়া আছে মাঝে মাঝে?
—বলিতে অধরপ্রান্তে খুশির-ছায়াটি ক্ষণ রাজে।—
তটলগ্ন বটমূলে বাজে এসে তরঙ্গিনী ধারা,
পরিচিত প্রিয় স্বর পুরুষের বক্ষ দেয় নাড়া।
মনে হয় এত কাল সৃষ্টি যেন ছিল বাণীহীন
আজো শুধু ধ্বনি এল অর্থ যার নাই কোনদিন।
কত দিন পরে দেখা, মোটামুটি হোলো পরিচয়,
প্রবাসে যা এই বেশি;—কিছু তো হবারই কথা নয়।
সকলি তলায়ে গেছে অভ্যাসে রয়েছে ভাসা হাসি;
সেটুকুই দেখা গেল, বলা গেল "আজ তবে আসি।"
প্রথম জানার দিনে মন খোঁজে মনের কিনারা—
সেদিন কঠিন ছিল এমন সহজে দেখা সারা।
মুখের কথায় ভাসে আবছা আজ জানাজানি-সীমা,
ফেরা পথে দেখি দোঁহে অস্তশেষ দিগন্ত রঙিমা॥

যুগোশ্লাভিয়

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুশ সম্রাট্ পিটার তাঁহার সাম্রাজ্যকে পাশ্চাত্য জগতের পংক্তিতে আনিবার জন্য "ইয়োরোপীয় জানালা" খুঁজিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে সেণ্ট পিটার্সবর্গ—পরের পেট্রোগ্রাড এবং আধুনিক লেনিনগ্রাড—স্থাপিত হয়। এই সেণ্ট পিটার্সবর্গ স্থাপনের জন্য সম্রাট্ পিটার, বহু দেশ জয় ও বহু জাতির স্বাধীনতা লোপ করিবার পর, তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ জাতি, দেশ, নগর ও জনপদ গঠনের চেষ্টা আজীবন কাল করিয়া যান এবং তাঁহার বংশধরগণকেও সেই ব্রতে দীক্ষা দিয়া যান। তাঁহার বংশ লোপ হইয়াছে কিন্তু রুশ জাতির নূতন পথের নায়ক ষ্টালিন সেই ব্রতই উদ্‌যাপন করিতেছেন।

জার্ম্মান সম্রাট্ বিলহেলম্ প্রাচ্য জগতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া "ড্রাং নাথ ওষ্টেন"—অর্থাৎ পূর্ব্বদ্বারে প্রচণ্ড আঘাত—কথার সৃষ্টি করিয়া যান। এক কথায় পিটার ও বিলহেলম্ দুই জনেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল দিগ্বিজয়ের, দুই জনেরই অভিলাষ ছিল প্রাচীন জগতের মহাদেশগুলিতে একচ্ছত্র অধিপতি হইবার। বিলহেলম্ এখন "গতগৌরব হৃতআসন" অবস্থায় হলাণ্ডে রহিয়াছেন কিন্তু জার্ম্মান জাতি, "নূতন পথের" নেতা হিট্‌লারের ইঙ্গিতে, সেই পুরাতন পথেই চলিয়াছে।

জার্ম্মানির এই "ড্রাং নাথ ওষ্টেন" অভিযানের পথ ভূমধ্যসাগরের কূল দিয়া গিয়াছে এবং ভূমধ্যসাগর যাইবার পথ জার্ম্মানির তিনটি মাত্র আছে। প্রথম পথ দীর্ঘতম, কিন্তু এ পথে লাভের আশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই পথ ডানিয়ুব নদ। দ্বিতীয় পথ আড্রিয়াটিক সমুদ্রের পথে ইজিয়ান সমুদ্র বাহিয়া, সালোনিকি বন্দর পার হইয়া তবে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছায়। এ পথ সহজ করিতে হইলে জাহাজ চালাইবার খাল কাটিয়া তবে দুই-তিনটি নদী বাহিয়া অষ্ট্রিয়া হইতে ইজিয়ান সমুদ্রে পৌঁছানো যায়। ফিয়ুম প্রদেশের বন্দর ট্রিয়েস্ট এখন ইটালীয়, সুতরাং জার্ম্মানির বিজয়-অভিযানের গতিপথের বাহিরে। তৃতীয় পথ রেলপথ, যাহা ভিয়েনা হইতে জাগ্রেব এবং জাগ্রেব হইতে সুশক বন্দরে (ফিয়ুম অঞ্চল, আড্রিয়াটিক কূলে) গিয়াছে।

এই তিনটি পথই যুগোশ্লাভিয়ার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

* * *

উত্তরে জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া, পশ্চিমে ইটালী ও ইটালীয় আড্রিয়াটিক সাগর এবং আলবানিয়া, দক্ষিণে গ্রীস, পূর্ব্বে রুমানিয়া ও বুলগারিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্বে হাঙ্গেরী, ইহা যুগোশ্লাভিয়ার চৌহদ্দি। সুতরাং এই দেশের তিন দিক রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ডে আবদ্ধ, একমাত্র দক্ষিণ দিক মুক্ত, এবং সেদিকেও সালোনিকির ক্ষীণ রেলপথই ভরসা। গত মহাযুদ্ধে এই সালোনিকির পথেই সার্ব্বিয় ও মণ্টিনেগ্রীয় যোদ্ধাগণ স্বদেশের পুনরুদ্ধারের জন্য রাজকুমার এলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে অভিযান করেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেও সালোনিকির রেলপথ ভিন্ন অন্য কোনও পথে আধুনিক সংগ্রামের বিপুল রণসম্ভার লইয়া যাওয়া দুরূহ। যদিও আড্রিয়াটিকের কূলে যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান বন্দর কাটারো রহিয়াছে এবং সুশক হইতে রেলপথও আছে, কিন্তু সে সকল দিকই এখন শত্রুব্যূহে আচ্ছন্ন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুগোশ্লাভিয়া এক দিকে যেরূপে জার্ম্মানি ও ইটালীর পূর্ব্বদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে অন্য দিকে রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ডও যুগোশ্লাভিয়াকে তিন দিকে কারাগারের প্রাচীরের ন্যায় ঘেরিয়া আছে। গত মহাযুদ্ধে, এক বৎসরের উপর বীরবিক্রমে লড়িবার পর, সার্ব্বিয় ও মণ্টেনেগ্রীয় সেনাদল যখন ম্যাকেনসেন-চালিত বিপুল জার্ম্মানবাহিনীর প্রচণ্ড চাপে পিছু হটিতে থাকে তখন তাহাদের আলবানিয়ার পথে আড্রিয়াটিক কূলে আসিয়া মিত্রশক্তিদলের নৌবাহিনীর আশ্রয় লইতে হয়। এবার সেপথ শত্রুহস্তগত।

সার্ব্ব, ক্রোট ও শ্লোভিন যুক্তরাষ্ট্র, যাহা গত মহাযুদ্ধের শেষে পুরাতন সার্ব্বিয়ার সহিত অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কয়েকাংশের যোগ করিয়া গঠন করা হয়—মণ্টেনেগ্রো আরো পরে যুক্ত হয়—বহির্জগতের নিকট যুগোশ্লাভিয়া নামে পরিচিত। এই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নাম ক্রাল্যোভিনা স্রবা, খ্‌বাটা, ই শ্লোবেনসা। যুগোশ্লাভ শব্দের অর্থ যদিও দক্ষিণ অঞ্চলের শ্লাভ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যুগোশ্লাভিয়া অনেকগুলি অসদৃশ জাতির সমষ্টি যাহাদের মধ্যে সার্ব্বগণ

সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং সংখ্যায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক। কিন্তু ক্রোটগণ শিক্ষাদীক্ষা এবং সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ যদিও সংখ্যায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র।

যুগোশ্লাভিয়ার ৯৬,০০০ বর্গমাইল আয়তন এবং লোক-সংখ্যা ১৪০,০০,০০০। ইহা নিম্নলিখিত সাতটি জনপদের সমষ্টি, যথা :—(১) সার্ব্বিয়া, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বুকারেষ্ট সন্ধি গঠিত; (২) ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মণ্টেনেগ্রো; (৩) বসনিয়া ও হের্ৎসেগোবিনা; (৪) ডালমাসিয়া, যাহা হইতে জারা নগর এবং লাগোষ্টা ও পেলাগোসা দ্বীপদ্বয় বিচ্যুত; (৫) ক্রোয়াসিয়া-শ্লাভনিয়া, ফিয়ুম বাদে; (৬) শ্লোভেনিয়া; (৭) ভয়ভডিনা অর্থাৎ সামন্ত রাজ্য। এইগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি স্বাধীন দক্ষিণ শ্লাভিয় দেশ ছিল, ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধের শেষ পরিণতির ফলে সার্ব্বিয়ার আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি এবং লোকসংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উক্ত দুই অঞ্চলে সিরিলিক লিপি ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ লোকই অর্থডক্স-খৃষ্টমতাবলম্বী, কিন্তু বলকানযুদ্ধে প্রাপ্ত সার্ব্বিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে অনেক মুসলমানের বসতি আছে, বিশেষে মাসিদনিয়ায়। বস্নিয়া ও হের্ৎসেগোবিনা ১৮৭৮ খৃঃ হইতে অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং এই অঞ্চলে বিশেষতঃ বস্নিয়ায় বহু মুসলমানের বাস। ডালমাসিয়া খাঁটী অষ্ট্রিয় প্রদেশ, দেশের অধিকাংশ ক্যাথলিক, এবং তাহারা রোমক লিপি ব্যবহার করে। ক্রোয়াসিয়া শ্লাভনিয়া পূর্ব্বকালে হাঙ্গেরির অংশ ছিল যদিও ক্রোট জাতি তাহার বৈশিষ্ট্য বরাবরই রাখিয়া আসিয়াছে। ইহারা ডালমাসিয়ার শ্লাভদিগের ন্যায় ক্যাথলিক ও রোমক লিপি লেখক। মধ্যযুগের পর ইয়োরোপে শ্লোভিন রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না, অষ্ট্রিয়ার কয়েকটি অংশবিশেষে শ্লোভিন জাতির লোকের বসতি ছিল, সুতরাং উক্ত সাম্রাজ্যের কয়েকটি খণ্ড কাটিয়া জুড়িয়া যুগোশ্লাভিয়াকে দান করা হয়। শ্লোভিনগণ ক্যাথলিক এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় উচ্চশিক্ষিত। সর্ব্বশেষে ভয়ভডিনা বা সামন্তরাজ্যের অস্তিত্ব যুগোশ্লাভিয়া গঠনের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ইহার অধিবাসিগণ নানা জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী এবং আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার এই প্রদেশও বিভিন্ন হাঙ্গেরীয় অঞ্চল হইতে নানা খণ্ডের অসম-যোগে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মান, ম্যাজিয়ার, রুমানিয়, সার্ব্ব ইত্যাদি নানাজাতি বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতেছে।

মহাযুদ্ধ-বিজেতাগণের সৃষ্টি এই যুগোশ্লাভিয়া দেশ। ইহার "যুগোশ্লাভিয়া" রূপে কোনও অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বে ছিল না, সুতরাং ইতিহাসও নাই। সার্ব্বিয়ার ইতিহাস যোদ্ধাজাতির ইতিহাস। তাহার মধ্যে রাজত্ব বিস্তার বা সমৃদ্ধিলাভের কলুষ বহু পরে আসিয়াছে।

* * *

খৃঃ সপ্তম শতকে সার্ব্বজাতীয় শ্লাভগণ খণ্ড খণ্ড উপজাতিরূপে বিভিন্ন সর্দ্দারের নেতৃত্বে কৃষ্ণসাগরের কূল হইতে ডানিয়ুব নদের বাম তীর ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া বলকান অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে আসিয়া বসবাস করে। সম্রাট্ হেরাক্লিয়াস ইহাদের সহিত সন্ধি করিয়া উক্ত ভূমিখণ্ডে প্রজারূপে বাসের অধিকার দান করেন। কিন্তু তখন প্রত্যেক উপজাতি নেতা ("ঝুপান") অন্য উপজাতিকে ("ঝুপা") বশীভূত করার চেষ্টা করিত এবং সর্দ্দারের মৃত্যুর পর তাহার আসন অধিকার কে করিবে তাহা লইয়াও চক্রান্ত, যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। অন্য দিকে গ্রীক (বাইজান্টিয়) সম্রাটগণ ও রোমান ক্যাথলিক শক্তিগণ (ভেনিস ও হাঙ্গেরি)-ও ক্রমাগত চেষ্টা করিতেন এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাজাতিপুঞ্জকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে। বিশেশ্লাভ বংশীয়গণ প্রথমে এই বিভিন্ন উপজাতির কয়েকটিকে একত্র করিয়া রাষ্ট্র গঠন করেন। ইহাদের প্রথম ঝুপান বিশেশ্লাভ, কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্র ভ্লাস্টিমিরই সার্ব্বগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করেন। ইহার কিছুকাল পরে সার্ব্বগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং গ্রীক বাইজান্টিয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করে (৮৯০ খৃঃ)। তাহার পর পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক বুলগার ও সার্ব্বগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্তর্বিপ্লব চলে। ১৩৭৪ খৃঃ সার্ব্ব অধিপতি লাজার হ্রেবেল্যানোভিচ্ তুর্কদিগের দিগ্বিজয়-অভিযান রোধের জন্য খৃষ্টান সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা করেন। তুর্ক সুলতান প্রথম মুরাদ এই কারণে সার্ব্বরাষ্ট্র আক্রমণ করেন। ১৩৮৯ খৃঃ ১৫ই জুন তারিখে কোসোভো যুদ্ধক্ষেত্রে সার্ব্বগণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধে সার্ব্বজাতির সকল নেতা ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—নৃপতি লাজারের সহিত প্রাণ আহুতি দেয়, অন্য দিকে তুর্ক সুলতান মুরাদ ও অগণিত তুর্কও নিহত হয়। ইহার পর চারি শত বৎসর ধরিয়া সার্ব্বজাতি তুর্ক সাম্রাজ্যের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। ইহার মধ্যে যখনই আশপাশের খৃষ্টান রাষ্ট্রপতি ও সম্রাট্গণ তুর্কদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে, সার্ব্বগণ তাহাদের প্রাণপণ সাহায্য করিয়াছে এবং তাহার ফলে তুর্কদিগের ক্রোধের পাত্ররূপে দারুণ ফলভোগ করিয়াছে।

* * *

১৮০৪ খৃঃ তুর্কি জানিসারিগণ কর্তৃক সার্ব্ব নেতৃবর্গের হত্যার পর পেট্রোভিক কারাজর্জ্জ নামক অষ্ট্রিয় সেনাদলের এক ভূতপূর্ব্ব সার্ব্ব সৈনিক বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। রুশ সম্রাটের সাহায্যে সাময়িক জয়লাভের পর কারাজর্জ্জ পরাজিত ও বিতাড়িত হন। তুর্ক সুলতান অতি নিষ্ঠুর ভাবে সার্ব্বনেতা ও অভিজাত বর্গের ২০০ জনকে শূলবিদ্ধ করিয়া মারায় ১৮১৫ খৃঃ সার্ব্বগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রাণের আশা ছাড়িয়া লড়িতে থাকে। তুর্ক সুলতান ইহাদের নেতা মাইলস ওব্রেনোভিচ্‌কে সার্ব্বগণের অধিপতি বলিয়া সামন্তরূপে গ্রহণ করেন। মাইলস ইতি-মধ্যে চক্রান্ত করিয়া কারাজর্জ্জকে হত্যা করেন। ইহার ফলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে মাইলস এবং পরে তাহার পুত্রদ্বয় বিতাড়িত হয় এবং ১৮৪৩ খৃঃ কারা-জর্জ্জের পুত্র এলেকজাণ্ডার সার্ব্ব অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু মাইলস দক্ষ চক্রান্তকারী ছিলেন, সুতরাং ১৮৫৮ খৃঃ তিনি এবং তাঁহার পর ১৮৬০ খৃঃ তাঁহার পুত্র মাইকেল সার্ব্ব অধিপতি হইয়াছিলেন। মাইকেল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তায় তুর্ক সুলতানের শাসন শৃঙ্খল শিথিল করিয়া দেশকে প্রায় স্বাধীন করেন কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ কারাজর্জ্জের দলের গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হওয়ায় তাঁহার স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নের শেষ হয়। ইহার পর ইয়োরোপীয় মহাশক্তিগণের ইচ্ছামত বল্‌কানের ভবিষ্যৎ রেখা অদল-বদল চলিতে থাকে এবং রুশ সম্রাটের ও অষ্ট্রিয় সম্রাটের ইচ্ছায় নানা প্রদেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়।

১৮৮২ খৃঃ সার্ব্বিয়া স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু রাজ্যের ভিতর ওব্রেনোভিচ ও কারাজর্জ্জেভিচ বংশের পরস্পর বিদ্বেষী চক্রান্ত চলিতে থাকে যাহার ফলে ১৯০৩ খৃঃ শেষ ওব্রেনোভিচ নৃপতি এলেকজাণ্ডার ও রাণী দ্রাগাকে বিপক্ষদল নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ইহার পর ১৯১২ পর্য্যন্ত দেশে শান্তি ছিল।

১৯১২ সালের অক্টোবরে প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৩ খৃঃ ৩০শে মে-তে পরাজিত তুর্কদিগের সহিত লণ্ডনে সন্ধি হয়। ১৯১৩ খৃঃ ২৯শে জুনে যুদ্ধজয়ে প্রাপ্ত ভূমির বণ্টনে মতভেদের ফলে সার্ব্ব ও গ্রীকদিগের সহিত বুলগারদিগের যুদ্ধারম্ভ হয় এবং রুমানিয়া যোগদান করায় বুলগারগণ পরাজিত হয়। ইহাতে সার্ব্বিয়া বিশেষ লাভবান হয়। ১৯১৪ খৃঃ মহাযুদ্ধের আরম্ভ হয় সার্ব্বিয়ায়। ১৯১৪ সালের ২৫শে জুলাই হইতে ১৯১৫ সালের ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বীরবিক্রমে লড়িয়া অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সেনাদলকে বারম্বার পরাজিত করিবার পর, সার্ব্বিয়গণ জার্ম্মান জেনারেলশ্রেষ্ঠ ম্যাকেন্‌সেনের প্রচণ্ড আক্রমণে পরাস্ত হয়। এত দিন ইহারা একেলাই লড়িয়াছিল। মহাযুদ্ধ জয়ের পর সার্ব্বিয়াকে যুগোশ্লাভিয়ায় পরিণত করা হয়।

বর্ত্তমান যুগোশ্লাভিয়ার সহিত কোনও বহিঃশক্তির বিশেষ সংযোগ না থাকায় তাহার সেনাদলের উৎকৃষ্ট বিশেষ কিছু যুদ্ধসরঞ্জাম নাই। তবে এই রাষ্ট্রের তিন দিক প্রাকৃতিক রক্ষাবেষ্টনীতে ঘেরা, কেবলমাত্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক অরক্ষিত। দক্ষিণ শ্লাভদিগের যুদ্ধক্ষমতা ও শৌর্য্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

গান্ধীজী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বর্ব্বরতা বিজ্ঞানেরে করিয়া কিঙ্করী
দিগন্ত ব্যাপিয়া তোলে রক্তের লহরী,
পৃথিবী জুড়িয়া চলে মৃত্যুর শাসন,
শক্তি আসি কাড়িয়াছে ন্যায়ের আসন।
আলোহীন আশাহীন শতাব্দীর কানে
তুমি দিলে প্রেমমন্ত্র। তোমার আহ্বানে
সেই প্রেম—বিশ্বে যাহা একান্ত নির্ভয়,
বীর্য্যের আগুনে যাহা চিরদীপ্তিময়।
মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা তুমি দিয়েছো জাতিরে ;—
প্রাণ—সে তো মরণেরই আসে বক্ষ চিরে।
মানুষেরে ভালোবাসো—সাম্যবাদী তাই,
যেখানে শোষণ, জানো, প্রেম সেথা নাই।
সর্ব্বহারাদের লাগি তোমার স্বরাজ ;
তুমি, তাই, ভারতের গান্ধী মহারাজ।

মক্তব ও পাঠশালার পাঠভেদ কি উঠিয়া গিয়াছে ?

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বেঙ্গল এসেম্ব্লির এক বৈঠকে (১৭।৩।৪১) বজেট আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর উক্তির উত্তরে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি (শ্রীফজলুর রহমন) বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে মক্তবের ও পাঠশালার পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যবিষয় এক। ইহা দ্বারা তাঁহারা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মক্তব ও পাঠশালার পাঠভেদ উঠিয়া যাওয়াতে, হিন্দু ছাত্রদের মক্তবে পড়ায় কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। বাস্তবিক ঐ পাঠভেদ উঠিয়া গিয়াছে কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে এই প্রবন্ধে "পাঠশালা" কথাটি "প্রাইমারী স্কুল" অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। সরকারী পাঠ্যবিষয় তালিকায় এবং পাঠ্যপুস্তক তালিকায়ও "প্রাইমারী স্কুল" কথাই ব্যবহার করা হইয়াছে।

সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের আদেশে মক্তব ও পাঠশালার নূতন পাঠবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুইটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য। প্রথমটি ১৯৩৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয় (Notification No. 683 T. Edn.—10th June, 1938)। ইহাতে নূতন পাঠ্যবিষয় (**Revised** Curriculum for Primary Schools in Bengal) নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিটি ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় (Notification No. 5 T. B.—30th November, 1939)। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিটির সঙ্গে **মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলসমূহের** ব্যবহারের জন্য (for use in all classes of Primary Schools and Maktabs in the Presidency of Bengal) পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়। উভয় বিজ্ঞপ্তিতেই একটি উক্তি আছে যাহা প্রণিধানযোগ্য। ঐ উক্তিটির বাংলা অর্থ মোটামুটি এই :—

"প্রাইমারী স্কুল ও মক্তব সকলের জন্য সাধারণ পাঠ্য-বিষয় একই হইবে এবং এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে মূলগত কোন পার্থক্য থাকিবে না।"

(" **There shall be the same general curricula for** primary schools and Maktabs and no essential difference in the standard of secular education in these two classes of schools.")

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে "**প্রাইমারী স্কুল এবং মক্তব**" এই ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণতঃ, "এবং" দিয়া দুইটি ভিন্ন পদার্থকেই যুক্ত করা হয়। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ বলিতে পারেন—ঐ ভিন্নত্ব কেবল নামের, সুতরাং, প্রভেদ কেবল নামেরই কিনা পরীক্ষা করা দরকার।

যে নূতন পাঠবিধান (curricula) এবং পাঠ্যপুস্তক ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে (অন্ততঃ প্রচলিত হইবে বলিয়া শিক্ষা-বিভাগ আদেশ দিয়াছেন) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমতঃ মনে হয় যে পাঠ্যবিষয় তো মক্তব ও পাঠশালা এই উভয়বিধ বিদ্যালয়ে একই। যথা :—

(১) মাতৃভাষা পঠন ও লিখন, (২) অঙ্ক, (৩) ভূগোল, (৪) প্রাথমিক বিজ্ঞান, (৫) খেলা ও ব্যায়াম, (৬) হাতের কাজ, (৭) ধর্ম্মশিক্ষা।* এই বিষয়গুলি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়ান চাই, (should be compulsorily taught)।

সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে মক্তব ও পাঠশালার পাঠ্যবিষয়ে প্রভেদ তো উঠিয়াই গিয়াছে! আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে, পুরাতন পাঠ্যবিষয় (curricula) সম্বন্ধেও বলা যায় যে উহাও মক্তব ও পাঠশালায় একই রকমের ছিল। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত পাঠশালার পাঠ্যবিষয় তালিকা এই—

(১) পঠন (২) লিখন (৩) অঙ্ক (৪) ভূগোল (৫) ইতিহাস (৬) স্বাস্থ্য (৭) পর্য্যবেক্ষণ (৮) ড্রিল (**Notification No. 1665 Edn.—16th November, 1920**)। মক্তবের যে পাঠ্যবিষয় ১৯৪০ পর্য্যন্ত প্রচলিত

* পূর্ব্বে পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষা ছিল না। মক্তবের মুসলমান ছাত্রেরা প্রাইমারী পরীক্ষায় কোরাণ, উর্দ্দু এই সব বিষয়ে পরীক্ষা দিত। ইহার মধ্য দিয়া যে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব করা হইত, তাহার কথা এখানে বলার দরকার নাই। এখন ধর্ম্মশিক্ষা পরীক্ষার বিষয় নহে। ইহা ভালই। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা স্কুলে পড়োনো হইবে। যাঁহারা বলিতে চাহেন যে এখন আর হিন্দু ছাত্রদের মক্তবে পড়ার বাধা নাই, তাঁহারা কি মৌলবী দিয়া হিন্দু ধর্ম্ম পড়াইবেন ?

ছিল তাহা "ড্রিল" ব্যতীত* পাঠশালার পাঠ্যতালিকার হুবহু নকল। সুতরাং, উভয় তালিকাই এক, অন্ততঃ প্রায় একই, ইহা বলিবার সুযোগ পাইয়াও কর্তৃপক্ষ কেন যে উহা বলিলেন না, বুঝা যায় না। কিন্তু সরকারী রিপোর্টে (পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট) ইহার পূর্ব্বে কর্তৃপক্ষ "সাধু" সাজিবার চেষ্টা যে না করিয়াছেন তাহা নহে। উক্ত রিপোর্টগুলিতে একাধিক বার বলা হইয়াছে যে, মুসলমানী প্রাইমারী স্কুলগুলির নাম মক্তব—কেবল বেশীর ভাগ এই যে উহাতে মুসলমান ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষকেরা প্রধানতঃ (?) মুসলমান।

কিন্তু আমরা জানি যে মুসলমান ধর্ম্মশিক্ষা এবং শিক্ষকগণ মুসলমান—এই দুই বিষয় ব্যতীত আরও দুইটি বিষয়ে মক্তবে ও পাঠশালায় প্রভেদ ছিল। এই দুইটি বিষয় হইতেছে বাংলা ভাষা ও ইতিহাস। মক্তব ও পাঠশালার মারাত্মক পাঠভেদ ছিল এইখানে। অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে মক্তবী পুস্তক লেখকেরা সৌভাগ্যক্রমে এখনও হিন্দুর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন নাই। হয়ত "পাকিস্থানী" মনোবৃত্তির পূর্ণ প্রসার হইলে ঐরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইবে। তাহা হইলে, যেহেতু হিন্দুর অঙ্কপুস্তকে ২ আর ২ এ চার হয়, সেই জন্যই মক্তবী অঙ্কপুস্তকে "২ আর ২ এ পাঁচ হয়" লিখিতে হইবে, হিন্দুর পুস্তকে যদি থাকে যে ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, তবে সেই জন্যই অপরেরা লিখিবেন, হিমালয় ভারতের দক্ষিণে, এবং হিন্দুরা যদি স্বাস্থ্যপুস্তকে লেখে যে পরিষ্কার জলপান করা উচিত, তবে মক্তবীরা পাল্লা দিয়া লিখিবেন, 'অপরিষ্কার পানি পান করিবে।' যাহা হউক, এখনও সেদিন আসে নাই।

কিন্তু বাংলা ভাষা শিক্ষা ও ইতিহাস এই দুই বিষয়ে যে গুরুতর পার্থক্য ছিল, তাহা চাপা দিবার জো নাই। এই দুই বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের আদেশ ছিল যে, কেবল মুসলমান লিখিত বাংলা পুস্তকই মক্তবে ব্যবহৃত হইবে

*মক্তবে, ড্রিলের পরিবর্ত্তে কোরাণ পাঠ, ইসলাম অনুষ্ঠানরীতি ও উর্দ্দু (Koran, Ritual of Islam and Urdu) নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শ্রীঘৃত

সম্বন্ধে

স্যার হরিশঙ্কর পালের

অভিমত ঃ—

"শ্রীঘৃত আমার বাটীতে নিয়মিত ব্যবহার হয়, এবং ইহার সম্বন্ধে লিখিতে আমি নিতান্ত আনন্দবোধ করিতেছি। ইহা আমাদের সকলকে তৃপ্তিদান করিয়াছে এবং আমার মতে ইহা বাজারের অন্যান্য মার্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইহার লোকপ্রিয়তা, ইহার বিশুদ্ধতারই পরিচায়ক।"

শ্রীহরিশঙ্কর পাল

গ্রীষ্মের দিনে—
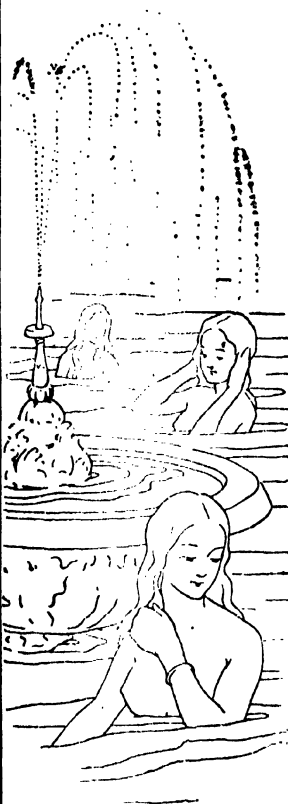
স্নানে ও প্রসাধনে
একমাত্র প্রীতিকর
— এই —

ক্যালকেমিকোর
জান্তব চর্ব্বিবর্জ্জিত
নিমের স্নিগ্ধ-মধুর
সুগন্ধি
টয়লেট সাবান

মার্গোসোপ

দেহ নির্ম্মল ও অঙ্গ শীতল রাখে তনুর কমনীয়তা বৃদ্ধি পায় ত্বকের বর্ণ ও সুষমা সমুজ্জ্বল করে। শিশু ও নারীর কোমল অঙ্গে নিত্য ব্যবহারোপযোগী নির্দ্দোষ সাবান।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এবং মুসলমান লিখিত ইতিহাস পুস্তক বেশী আদর পাইবে (will have preference)। এ বিষয়ে ১৯২৫ সালের ৯ই জানুয়ারীর সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য (Notification No. 1 T. B.—9th January, 1925)। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে বাংলা সাহিত্যপুস্তক (Primer and Reader) মুসলমানের লেখা বলিয়াই আপত্তিকর হইত না, যদি পুস্তকের বাংলা ভাষা **"আরবী বাংলা"** না হইত। ইতিহাস সম্বন্ধেও সেই কথা; অধিকন্তু মক্তবী ইতিহাসে হিন্দু যুগের কয়েকটি ভাল ভাল বিষয় বাদ দেওয়া হইত। নিম্নে মক্তব ও পাঠশালার ইতিহাসের পঠিতব্য বিষয়ের তালিকা দেওয়া গেল, পাঠক নিজেই পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। এই তালিকা ৩য় শ্রেণীর (class III); ৪র্থ শ্রেণীর বিষয় তালিকা মক্তব ও পাঠশালায় এক। বাবরের সময় হইতে দিল্লী দরবার (পঞ্চম জর্জ্জ) পর্য্যন্ত ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। ৩য় শ্রেণীতে প্রাচীন হিন্দুদের সম্বন্ধে পঠনীয় বিষয় পাঠশালার জন্য একটু বেশী, মক্তবে উহা সংক্ষিপ্ত করিয়া একেবারে কঙ্কালে পরিণত করা হইয়াছিল।

পাঠশালার পাঠ্য

The aborigines of India. The coming of the Aryans and their settlement in various parts of India. Stories of some of the chief Hindu Kingdoms. A dialogue about the society, religion and learning of the Aryan Hindus.

The story of Buddha and the spread of his religion, of Mahavir and the Jainas. The The story of Bijoy Singha. Alexander's invasion. The Mouriya Kings—Chandra Gupta, Asoka. Anecdotes of Vikramaditya, Harsa Vardhana. A dialogue about the social and political condition of the people during the Buddhistic period.

The pricipal Kingdoms in India just before the Muhammadan invasion. Stories of the Pal and Sen Kings of Bengal. Muhammadan conquest. A dialogue regarding the condition of Bengal under the Pathans. Chaitanya, Kabir, Ramananda and Nanak.

মক্তবের পাঠ্য

Social and political life of early Hindus. Stories of some of the chief Hindu Kingdoms.

The story of Buddha and the spread of his religion. Alexander's invasion. A dialogue about the social and political condition of the people during the Budhistic period.

The pricipal Kingdoms in India just before the Muhammadan invasion. Muhammadan conquest. Spread of Islam. Kingdom of Ghazni and Ghor. Pathan empire, its rise and decline. Timur's invasion.

দুইটি তালিকা তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় প্রাচীন হিন্দু (আর্য্য)দের সম্বন্ধে, এবং বিজয়সিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য এই সকল হিন্দু রাজাদের

সম্বন্ধে কিছু পড়ানো মক্তবের পৃষ্ঠপোষকেরা আবশ্যক মনে করেন নাই (Notification No. 3730 Edn.—8th Dec. 1924)।

এই দিক দিয়া দেখিলে নূতন (১৯৪১ সাল হইতে প্রচলিত) ইতিহাস-বিষয়-তালিকা উৎকৃষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর তালিকায় ১৩টি বিষয় আছে:—মোহেঞ্জোদড়ো, কোন একটি বৈদিক ঋষির জীবনী, রাম, কুরু ও পাণ্ডব, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন ইত্যাদির সঙ্গে আরও চারিটি—হজরত মহম্মদ, খোজা মৈনুদ্দীন চিস্তি, রেজিয়া ও নাসিরুদ্দীন। এইগুলির নাম হইয়াছে "ঐতিহাসিক গল্প" (historical tales) এবং স্বতন্ত্র ইতিহাসপুস্তক পাঠ্য না করিয়া এই গল্পগুলিকে বাংলা সাহিত্যপুস্তকের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ঐ গল্পগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে প্রশ্ন না করিয়া (যথা—ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় যিনি প্রাণ দিয়াছেন সেই পৃথ্বীরাজের কথা না দিয়া, তৎকালে ভারতের মুসলমান বিজয়ের সাহায্যকারী মৈনুদ্দীন চিস্তির কথা কেন দেওয়া হইল), এইটুকু বলিয়া দেওয়া দরকার যে সাহিত্য পুস্তকের অন্তর্গত হওয়ায় ঐতিহাসিক গল্পের কোনটা পড়া বা না পড়া শিক্ষক ও ছাত্রের ইচ্ছাধীন হইল। মুসলমান-প্রধান বিদ্যালয়ে কেবল শেষের চারিটি গল্প পড়াইয়া বাকী সব বাদ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, পুরাতন পাঠবিধি অনুসারে মক্তব-পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু যুগের যে সব বিষয় বর্জ্জিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান পাঠবিধি দ্বারা সে সকল বিষয় পুস্তকে দেওয়া থাকিলেও পড়াইবার সময় বাদ দেওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। **পুরাতন পাঠ-বিধিতে ইতিহাস বিষয়ে যে মক্তবী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, নূতন পাঠবিধিতেও সেই মনোবৃত্তিকে প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে,** এরূপ সন্দেহ করার কারণ আছে।

এ-তো গেল কেবল বিষয়বস্তুর কথা। পূর্ব্বোক্ত "ঐতিহাসিক গল্প"গুলি লিখিবার ভঙ্গীও বিবেচনা করিতে হইবে। বঙ্গদেশের পুস্তকনির্ব্বাচন সমিতি (Text-Book Committee) অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িকতাপ্রবণ হইয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমিতি কি প্রকৃতির পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা না বলিলেও লোকে বুঝিতে পারে। মুসলমান লেখকেরা তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যপুস্তকে "মৈনুদ্দীন চিস্তি"র প্রসঙ্গে মহারাজ পৃথ্বীরাজকে কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

মৌলবী আবুল হুসেন, এম. এ., এম. এল. প্রণীত **সুকোমলপাঠ** তৃতীয় ভাগে—

"পৃথ্বীরাজের রাজত্বে মুসলমানদের উপর খুব অত্যাচার হইতেছিল। তাহার প্রতিকারের জন্য খাজা সাহেব তাঁহার রাজধানী আজমীরে উপস্থিত হন।"

"পৃথ্বীরাজ খাজা সাহেবের উপরও অত্যাচার করিতে চেষ্টা করেন।" (পৃঃ ১১৬)

কবি গোলাম মস্তাফা প্রণীত **আলোক মালা** ৩য় ভাগে—

"নানারূপে অত্যাচরিত হইয়া এক দিন তিনি পৃথ্বীরাজকে অভিশাপ করেন—'পৃথ্বীরাজ, তোমার দিন ফুরাইয়াছে; ভারতে শীঘ্রই মুসলমান রাজত্ব শুরু হইবে।"

(পৃঃ ৯১)

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মুসলমান লেখকেরা খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির গল্পটি এমন ভাবে সাজাইয়াছেন যে উহা হইতে বালকদিগের মনে এই ধারণা জন্মিবে যে তুর্কী মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয় পৃথ্বীরাজের দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি! মুসলমান লেখকেরা ও মক্তবের

টেলিফোন:— হাওড়া ৫৩২, ৫৬০

টেলিগ্রাম:— "গাইডেন্স" হাওড়া।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—দাশনগর, হাওড়া।

ব্রাঞ্চ— বড়বাজার—৪৬নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
নিউ মার্কেট—১নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কুড়িগ্রাম (রংপুর)

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি

কারেণ্ট একাউণ্ট—½%

সেভিংস ব্যাঙ্ক—২%

ফিক্সড্ ডিপোজিটের হার আবেদন সাপেক্ষ।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ছাত্রেরা (যাহাদের প্রত্যেকেই হয়ত সেই হিন্দুদের বংশধর, যাঁহারা পৃথ্বীরাজের সময় তুর্কীদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন) হয়ত খুব উল্লাসের সহিত এই গল্প পাঠ করিবেন, কিন্তু হিন্দুদের প্রাণে দারুণ ব্যথা দেওয়া হইবে। খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির গল্প খাঁটি মক্তবী ঢঙের "ঐতিহাসিক গল্প" (উহার ঐতিহাসিক সত্যতার কথা নাই বলিলাম)। পুরাতন পাঠবিধিতে ঐরূপ "ঐতিহাসিক" ব্যাপার মক্তবেই সীমাবদ্ধ থাকিত, এখন হিন্দু ছাত্রেরাও উহা পড়িতে বাধ্য হইবে। কারণ, প্রধান মন্ত্রীর ভাষায় "মক্তব ও পাঠশালার পাঠভেদ উঠিয়া গিয়াছে," এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মুসলমান স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারীদের প্রভাবে হিন্দুপ্রধান বিদ্যালয়গুলিতে ঐ "মক্তবী" প্রকৃতির পাঠ্যপুস্তকও অবশ্যপাঠ্য হইতেছে। "পাঠভেদ উঠিয়া গিয়া" লাভ হইয়াছে এই যে পাঠশালাগুলিও এক প্রকার মক্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে !

এক্ষণে, নূতন পাঠবিধির আর এক দিক দেখা যাউক। শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিলে একটি বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—উহা মুসলমানলিখিত পুস্তকের সংখ্যাধিক্য। যে পাঠবিধি উঠিয়া গেল তাহার মধ্যে একটি সরকারী নির্দ্দেশ ছিল ; যথা—মক্তবে মুসলমানলিখিত পুস্তক পড়াইতে হইবে। নূতন পাঠবিধিসংক্রান্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঐ রকম কোন নির্দ্দেশ নাই, কারণ বোধ হয় এই যে ঐ রকম আদেশ এখন হইতে লিখিত (বা প্রকাশিত) না থাকিলেও, টেক্সট-বুক কমিটির উপর ঐ নীতি অনুসারে কাজ করার ভার দিয়া শিক্ষাবিভাগ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ফলে, উক্ত কমিটি মুসলমান লেখকদের প্রতি অতিরিক্ত সদয় হইয়াছেন। নিম্নের তালিকা হইতে এই ব্যাপার ভাল বুঝা যাইবে।

শ্রেণী	মোট অনুমোদিত বইয়ের সংখ্যা	হিন্দু লেখক	মুসলমান লেখক
১ম	৭৫	৩২	৪১
২য়	৫৯	২৫	২৯
৩য়	৪৩	১৯	২১
৪র্থ	৬০	২৯	২৩

হিন্দু ও মুসলমান একাধিক লেখক মিলিয়া ৪র্থ শ্রেণীর ৮খানি, ৩য় শ্রেণীর ৩খানি, ২য় শ্রেণীর ৫ খানি, এবং ১ম শ্রেণীর ২ খানি বই লিখিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ "গোড়া বাঁধিয়া" কাজ করিয়াছেন ; ১ম শ্রেণী হইতেই যাহাতে শিশুরা "মুসলমানী" বাংলায় অভ্যস্ত হইতে পারে, সে জন্য ১ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান লেখকের বই মনোনীত হইয়াছে। বহু মুসলমান লেখকের বই হিন্দুর পাঠশালায়ও পড়ানো হইতেছে। এই সকল বই দ্বারা শুদ্ধ বাংলা ভাষার সঙ্গে "মক্তবী বাংলা" ভেজাল দিয়া হিন্দু ছাত্রগণকেও "পাকিস্থানে"র প্রজা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে (উদাহরণ—কবি গোলাম মুস্তাফার **আলোক মালা** ১ম ভাগ)।* কেবল ভাষার দ্বারা নয়, ব্যক্তির নাম ও স্থানের নাম দ্বারাও অনেক পুস্তকে "পাকিস্থান" প্রচার হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। ধরুন, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন প্রণীত **বাংলা প্রথমপাঠ**। বইখানি বঙ্গদেশের যাবতীয় পাঠশালার ১ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

বালিকাটির নাম নুরু। এর বাড়ী নূরপুর। নুরু কলসী পুরিয়া জল লয়। হুমায়ুন খায়, আমিও খাই।

(পৃঃ ১৩)

ছেলেটি কাসেম। আর মেয়েটি হেনা। উহাদের দেশ শেখেরনগর। (পৃঃ ১৫)

খালেদা আর আরেফিন। ওরা দুই ভাই বোন।

(পৃঃ ২১)

অবশ্য, এই হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পাঠ্যপুস্তকে "সত্যব্রতের কাহিনী" "আশুতোষ" "রুস্তম ও সোহ্‌রাব"—এ সবও আছে।

যাঁহারা বলিতেছেন যে "মক্তব ও পাঠশালার পাঠভেদ উঠিয়া গিয়াছে", তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়টিকে কি প্রকারে উড়াইয়া দিতে পারেন ? প্রত্যেক শ্রেণীর পুস্তক তালিকার মধ্যে কয়েকটি তারামার্কা বইয়ের নাম আছে এবং সরকারী তালিকার পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে ঐ বইগুলি "মক্তব ও মুস্‌লিম প্রাইমারী স্কুলের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত" (Books marked with stars have specially been written for use in Maktabs and Muslim Primary Schools)। ইহাদের সংখ্যাও একেবারে কম নহে। ১ম শ্রেণীর জন্য ১৭, ২য় শ্রেণীর জন্য ১২, ৩য় শ্রেণীর জন্য ১০, এবং ৪র্থ শ্রেণীর জন্য ৮ খানি ঐ প্রকারের "বিশেষ ভাবে লিখিত" পুস্তক আছে। ১৯৪১ সালে প্রবর্ত্তিত সব বই ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) পুরাতন পাঠবিধিতে মক্তবের ইতিহাসে যে,

* সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস—দ্রষ্টব্য (প্রবাসী মাঘ, ১৩৪৭)।

সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ছিল, নূতন পাঠবিধিতেও প্রকারান্তরে তাহা বহাল থাকিল। অধিকন্তু উহা পাঠশালার উপরও চাপাইয়া দেওয়া হইল।

(২) পুরাতন পাঠবিধিতে যে অদ্ভুত "মক্তবী বাংলা" মক্তবে পড়ানো হইত, নূতন পাঠবিধিদ্বারা "বিশেষভাবে লিখিত" কতকগুলি পুস্তক পাঠ্য করিয়া, সেই সাম্প্রদায়িক ভাষা শিক্ষা বজায় থাকিল। অধিকন্তু এক শ্রেণীর মুসলমান লেখকের বই পাঠশালার জন্য পাঠ্য করিয়া "মক্তবী বাংলা" অল্প অল্প করিয়া পাঠশালাতেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মক্তবী বাংলা কি প্রকারের ভাষা তাহা "প্রবাসী"তে একাধিক বার আলোচনা করিয়াছি। নূতনবিধানে "মক্তবের জন্য বিশেষভাবে লিখিত" পুস্তকের ভাষাও যে সেই একই রকমের, তাহা বলাই বাহুল্য। "সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস" প্রবন্ধে উহার বহু উদাহরণ দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও দু-একটি দিতেছি—

খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশিদ বি. এ প্রণীত **মক্তব সাহিত্যশিক্ষা**—১ম ভাগ—

আল্লাহ মেহেরবাণ (মূর্দ্ধণ্য "ণ")। (পৃঃ ৫)

উষ্ণ পানি খাই না। (ঐ)

তাঁহাকে কেহ পয়দা করে নাই। তিনি সকলকে পয়দা করিয়াছেন। (পৃঃ ২২)

মানব জাতিকে গুনাহ হইতে বাঁচাইবার জন্য…এক এক জনকে নবী করিয়াছেন। (পৃঃ ২৭)

খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশিদ বি. এ. প্রণীত **মক্তব সাহিত্যশিক্ষা** ২য় ভাগ—

"মৃত্যুর পর হাশরের দিন পুনর্জ্জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিবে।" (ঈমান গল্প হইতে)

"এরূপ সুখস্বচ্ছন্দে থাকিলে কেনা এমন এবাদত বন্দেগী করিতে পারে।" (পৃঃ ৫)

আর একখানি পুস্তক হইতে একটি উদাহরণ দিয়া

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাক্‌তেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে। এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাড্‌কোভাইন" সেবন করা কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা করে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাড্‌কোভাইন
মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে
লিষ্টার এণ্টিসেপ্টিক্‌স্‌ ∴ কাশীপুর, কলিকাতা

প্রবন্ধ শেষ করিব। বেগম সামসুন নাহার (লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা) ও আনোয়ারা চৌধুরী প্রণীত **সবুজপাঠ** সকল প্রাইমারী স্কুলের (অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ ছাত্রের জন্য) পাঠ্য। উহার ৩য় ভাগে—

"অতঃপর বোগদাদে গিয়া খোদাপ্রাপ্তি বিষয়ে সাধনা করিতে লাগিলেন।" (খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি গল্পে)

অতঃপর কোন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যদি লিখেন **গড সাধনা** (God-সাধনা) কিম্বা "অমুকের স্যালভেশন (salvation) লাভ হইল" এবং দাবী করেন যে ঐরূপ বাংলা না লিখিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? বিদেশী শব্দ আরব দেশের হইলে আদরণীয় আর ইউরোপের হইলে দূষণীয়, এ কথা যুক্তিসহ নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

কর্ত্তৃপক্ষ বলিতে চাহেন যে এখন মুসলমান লেখকেরা যে বই লেখেন তাহা হিন্দুর চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। সকল হিন্দু সকল মুসলমানের চেয়ে ভাল বই লেখেন, একথা আমরা বলি না। তবে, যে সম্প্রদায় বাংলার উচ্চশিক্ষিত সমাজে শতকরা ১৪।১৫ জনের বেশী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ এত অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট বাংলা লেখক দেখা দেওয়া কিছু বিস্ময়ের বিষয় বটে। আবার রুচির কথাও আছে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বটতলার বই কেহ কেহ ভালবাসেন।

দেশ-বিদেশের কথা

নার্সিং শিক্ষায় বৃত্তি

নার্সেস ইউনিয়নের অধিনায়িকা শ্রীমতী তরু ঘোষ মেয়েদের সেবাধর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য দুইটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। নার্সিং কিম্বা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী মেয়েরা এই প্রতিষ্ঠানে আবেদন করিলে সিষ্টার তরু ঘোষ তাহাদের বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল কর্ত্তৃক অনুমোদিত কোন হাসপাতালে ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শিক্ষাকালে নার্সিং-শিক্ষার্থিনীকে চার বৎসরের জন্য বাৎসরিক এক শত টাকা হিসাবে ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষার্থিনীকে এক বৎসরের জন্য পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস কলেজ স্কোয়ার ও শাখা অফিস ৭।২এ, রসা রোড, কলিকাতা।

কৃতী যুবক শ্রীভক্তেশ্বর সিংহ

শ্রীযুত ভক্তেশ্বর সিংহ বি এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর বর্দ্ধা নিখিল-ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সংঘের শিক্ষাকেন্দ্রে ডাঃ জে. সি. কুমারাপ্পার অধীনে হাতে কাগজ তৈরি, মধুমক্ষী পালন ও উন্নত প্রণালীতে ঘানিতে তৈল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি বর্দ্ধাতেই শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবের নিকট বিভিন্ন প্রকারের সুতাকাটা অভ্যাস করেন। অতঃপর তিনি সোদপুর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের তত্ত্বাবধানে মগন চরখায় সুতাকাটা শিক্ষা করেন। ভক্তেশ্বর সুতা কাটায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিন মাস যথারীতি সুতা কাটা অভ্যাস করিলে দৈনিক আট ঘণ্টা কার্য্য করিয়া দুই দিনে একখানা ধুতি বা শাড়ীর প্রয়োজনীয় সুতা অর্থাৎ প্রায় পনর হাজার গজ কাটা যায়। এই সুতা মিলের সুতার চেয়ে কোনক্রমেই নিকৃষ্ট নয়। মগন চরখার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দুই হাতে এক সঙ্গে সুতা কাটা যায়।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
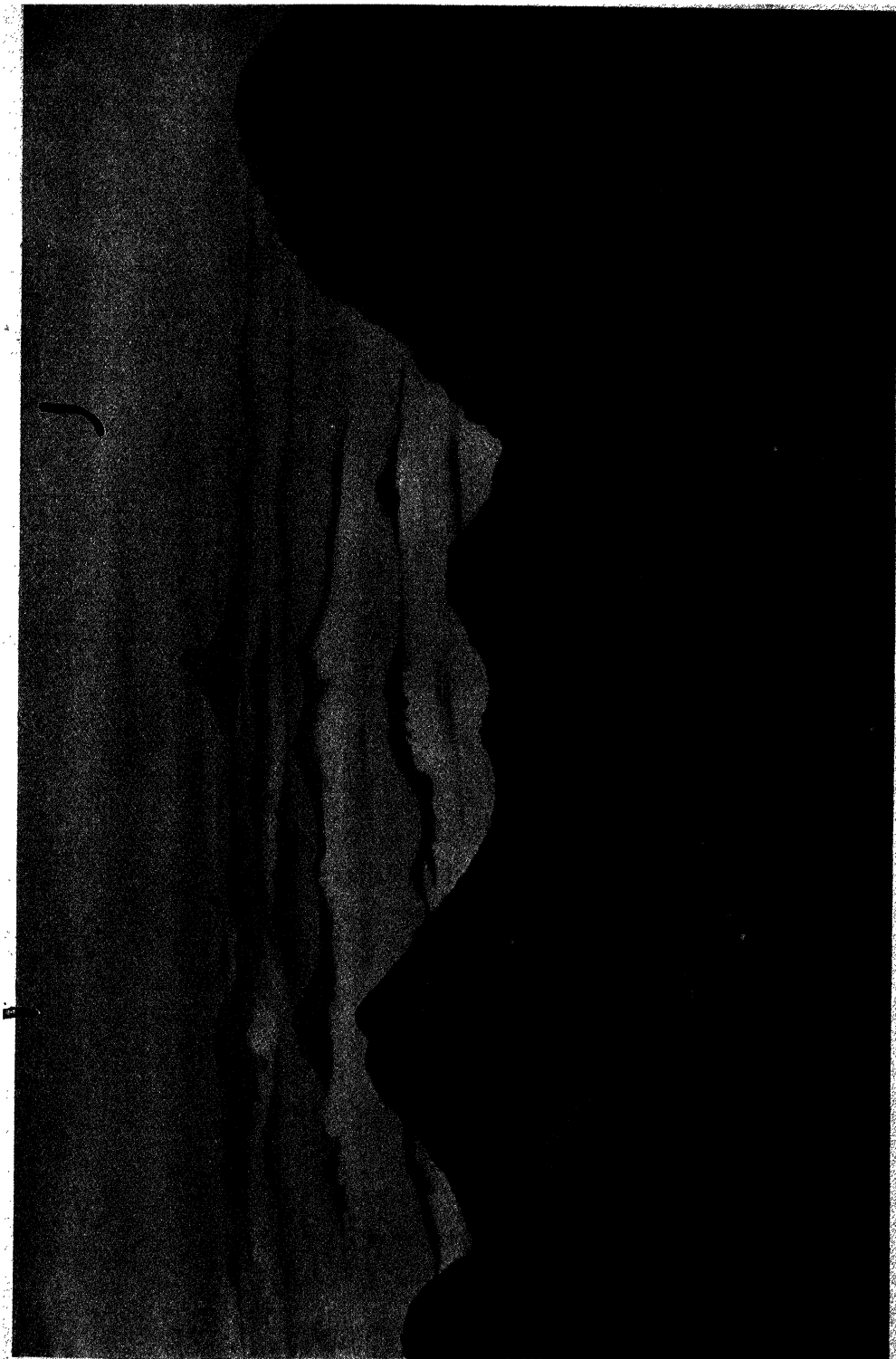
পেডরুর শিখর হইতে এডাম্‌স্‌ শৃঙ্গ, সিংহল
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী
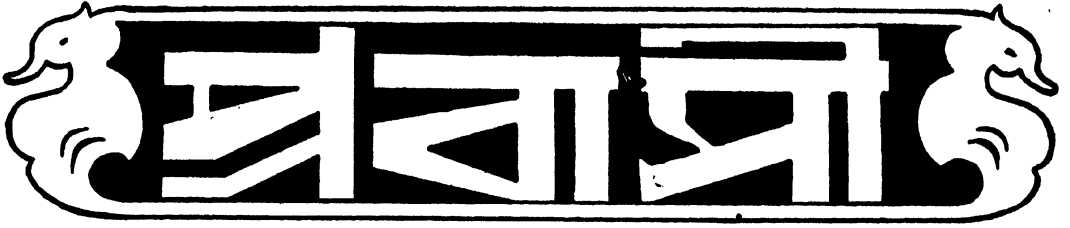
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ, ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ | ২য় সংখ্যা

জীবন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।
প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তা'রে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেক ধারা,
সে জীবন বাণী দিল দিবস রাত্রিরে,
রচিল অরণ্য ফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে।
চিত্ত তারে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা।
প্রত্যহের সব ভালোবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া

প্রিয়ারে বেসেছি ভালো,
বেঁসেছি ফুলের মঞ্জরীকে ;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে।
জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি
ধ্রুব তারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা॥

উদয়ন
২৫।৪।৪১

পঞ্চম বার্ষিকী

(কল্যাণীয়া নন্দিতার বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্য ভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরী হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
সুবর্ণ বিভায় ব্যাপ্ত করে।
সংবৃত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে

সংযত শোভায়
পথিকের নয়ন লোভায়।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি';
মধু সঞ্চয়ের পর
মধুপেরে করিল মুখর।
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে
আসন পাতিয়া দিল রবাহূত অনাহূত জনে।
বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
সাহানায় বেজেছিল বাঁশি,
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি,
আজ স্মিত হাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে।
বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগম্ভীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে॥
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখস্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।
বসন্ত পঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি,
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি
পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্ত রাগ উঠিতেছে কেঁপে॥

উদয়ন
২৬ এপ্রেল, ১৯৪১
সকাল।

সভ্যতার সংকট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হ'ল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানব-বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হ'ল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চ শিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন ক'রে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা-প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে, নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রণের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্ব মানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেন না এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্য-মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম, তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হ'তে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয় শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

"সিভিলিজেশন," যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন— সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোল খণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত ক'রে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোক-ব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হ'ল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হ'তে এক দিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এত বড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি এক দিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা ক'রে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, দেখেছিলেম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের

মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সভ্য ভূমিকা। বহু সংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ 'প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে,—এক ইংরেজ আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত ক'রে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি—এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এই রকম গভর্ণমেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্য দেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে কেমন ক'রে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্য শাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ সভ্যতা-গর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজো অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে মুক্তির পথে অগ্রসর হ'তে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে, ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি-প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ ব'লে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্ণমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র ক'রে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি এক দল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী ক'রে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হ'ল। সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের উর্ধ্ব-স্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত তাহলে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য

পরিণাম ঘটতে পারত না যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই। ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ-শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি এ'কে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। অথচ আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি, তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে যথার্থ খ্রীস্টানকে যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজী সাহিত্যের পরিবেশনের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণ চিত্তে নিবেদন করেছিলেম আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্কমোচনে সহায়তা ক'রে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু ব'লে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু ব'লে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকল প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্ত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ ক'রে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত ক'রে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥

উদয়ন
১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

তৃতীয় পাণিপথ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমি এক বার সিমলে পাহাড় থেকে দিল্লী আসছিলুম। ট্রেনে চড়ি কাল্‌কায়। পথিমধ্যে একটি স্টেশনের নাম শুনে চমকে উঠলুম।

কারণ এইখানেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল আর ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হয়েছিল। তার পর এই ক্ষেত্রেই বাবর দিল্লীর পাঠান বাদ্‌শা ইব্রাহিম লোদিকে পরাভূত ক'রে মোগল বাদশাহীর গোড়াপত্তন করেন। আর এই ক্ষেত্রেই আমেদ শা আবদালী মারাঠাদের বিধ্বস্ত ক'রে তাদের ভারতবর্ষে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবার আশা বিলুপ্ত করেন।

আমি এ নাম শুনে চমকে উঠলুম এই কারণে যে, পাণিপথে আমার স্কুলে-পড়া সব পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনকে আকুল করল। জাতিস্মর হবার লোভ আমাদের সকলেরই মনে অল্পবিস্তর আছে। আর ইতিহাস আমাদের জাতির অতীতের স্মৃতি সব ধ'রে রাখে। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কথা হিন্দুদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়। আর যেহেতু আমি হিন্দু, আমার মনেও এ ঘটনার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে। এর পর পাণিপথের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলুম, কেন-না মনে ক'রে রাখবার কোনও কারণ ছিল না।

গত বৎসর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী'তে উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে মনে হ'ল, এর গায়ে সত্যের ছাপ আছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এ যুদ্ধের কারণ ও তার পরিণতির কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোন্ কোন্ মারাঠা সর্দ্দার ছিলেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কথা কত দূর সত্য জানবার জন্য আমি মারাঠা ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির পাতা উল্টে গিয়েছি এবং এই আবিষ্কার করেছি যে, পণ্ডিত মহাশয়ের বিবরণ মোটামুটি সত্য।

'রাজাবলী' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। তিনি কোথা থেকে এ বিবরণ সংগ্রহ করলেন বুঝতে পারি নে। কেন না, তিনি গ্রন্থারম্ভেই বলেছেন তিনি প্রামাণ্য পুস্তক থেকে এবং প্রামাণ্য লোকের মুখে শুনে এ বিবরণ লিখেছেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি মাত্র ফারসী ভাষায় লিখিত পুঁথি এবং সেই পুঁথির ইংরেজী অনুবাদ ছিল কিন্তু পুস্তক দুখানি সেখানে দুষ্পাপ্য ছিল।

'রাজাবলী' হইতে উদ্ধৃত :—

এই আলমগীরসানী বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে ১৮১৫ আঠার শ পনর সম্বতে ১১৬৪ এগার শ চৌষট্টি বাঙ্গালা সনে হিন্দু ও মুসলমানের অতি বড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই।

মথুরাতে আবদালী সসৈন্যে আসিয়া কতলাম করিল তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হইলেন। ইহাতে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়া ও সাহু মহারাজের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা মথুরাস্থ ব্রাহ্মণ আমাদের অনেক জ্ঞাতি ও বন্ধু ও পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে আবদালী নিরপরাধে নষ্ট করিল আপনি ব্রাহ্মণদের প্রিয়পাত্র অতএব আবদালীর বিহিত প্রতিকার করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের রক্ষা করুন নতুবা আমরাও প্রাণত্যাগ করিব। ইহাতে পেশোয়া ও সাহু মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনি উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্যকৌশলে ব্রাহ্মণদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন সৈন্যদিগকে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। সে সৈন্যেতে যেং প্রধান সরদারেরা ছিল তাহাদের নাম এই। চিমাজি আপার পুত্র সদাশিব রাও ভাউ সাহেব এ অষ্টপ্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান ছিল। আর বালারাও নানাসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও ইহার এই যুদ্ধ সময়ে ২১ একুশ বৎসর বয়স ছিল এবং এ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অতি বড় সুন্দর ও মহাবল পরাক্রম ছিল ও জনকোজি সিন্ধিয়া ও এব্রাহিম খাঁ গারদী ও হোলকর ও পট্টবর্দ্ধন ও গুজরাত ও রূপমাজী গায়কবাড় ইত্যাদি অনেকং মহারাষ্ট্রীয় সরদারেরা আর অনেক হিন্দু রাজারাও ছিল। যবনপক্ষে আবদালী ও বাদশাহী অনেক ওমরা ও শুজাওদ্দোলা প্রভৃতি অনেক প্রধানেরা ছিল। এই উভয়পক্ষে অতিবড় যুদ্ধ হইল এ যুদ্ধে ৩০০০০০ তিন লক্ষ লোক মরে। বিশ্বাস রায়ের কপালে গুলি লাগিল তাহাতেই বিশ্বাস রাও মরিল বিশ্বাস রা এমন সুন্দর পুরুষ ছিল যে তাহার মরাতে বিপক্ষপক্ষীয় লোকেরাও শোকান্বিত হইল। সদাশিবরাও ভাউ সাহেব বিশ্বাস রায়ের মরণনিমিত্তক শোক ও লজ্জাতে এমন অনুদ্দেশ হইল যে তাহার অদ্যাবধি উদ্দেশ হয় নাই। এইরূপে বিশ্বাস রায়ের মরাতে আরং প্রধানেরা সকলেই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল। আবদালী তএমুর শাহ নামে আপন পুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়া সেইদেশে রাখিয়া আপনি পেশোয়ার দেশে গেল। পরে মহারাষ্ট্রেরা ও শিক্ষেরা ও দিনাবেগ খাঁ ইহারা সকলে একত্র হইয়া তএমুর শাহের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সে দেশ হইতে উদস্ত করিয়া দিল তএমুর শাহ স্বদেশে পলাইল। মহারাষ্ট্রেরা কিছুদিন লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল। পরে শিক্ষেরা মহারাষ্ট্রেরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনারা লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল তদবধি লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ শিক্ষেরদের অধিকার হইয়াছে। আর নাদরশাহী কতলামের পর দিল্লীর বাদশাহেরদের দিনেং

শৈথিল্য হওয়াতে মহারাষ্ট্রেরদের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহারও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তারপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীগওহর বাদশাহ হইয়া আছেন। তাঁহার জলুসী নাম শাহ আলম।

এ যুদ্ধের কারণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যা বলেছেন তা সম্ভবতঃ সত্য। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে 'অলকা' পত্রিকায় আমার মত প্রকাশ করেছি। তবে পাণিপথের যুদ্ধ যে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা গ্রাণ্ট ডাফ্‌ও (Grant Duff-ও) বলেছেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে-সব প্রধান সর্দ্দারদের নামোল্লেখ করেছেন, সে-সব নামও নির্ভুল। একমাত্র দামাজি গায়কোবাড়কে তিনি কৃষ্ণজি গায়কোবাড় বলেছেন। এ মারাত্মক ভুল নয়, কেন না একই ব্যক্তি সম্ভবতঃ উভয় নামেই পরিচিত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এ সব তথ্য কোথা হ'তে সংগ্রহ করলেন জানি নে।

আমি পূর্ব্বে একখানি ফার্সি পুস্তিকার কথা বলেছি। এ পুস্তিকার লেখক কাশীরাজ পণ্ডিত জনৈক মরাঠা ব্রাহ্মণ, ও তিনি আউধের নবাব শুজাউদ্দৌলার মুৎসুদ্দি ছিলেন এবং তিনি নিজের মনিবের সঙ্গে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এবং নিজে যা চোখে দেখেছিলেন তাই লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। ব্রাউন (Browne) নামক জনৈক পল্টনী সাহেব উক্ত পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ করেন, কিন্তু সে অনুবাদ বহুকাল চাপা পড়ে ছিল আর মূল ফার্সি পুস্তিকা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সেটি উদ্ধার করেছেন। পণ্ডিত মহাশয় ইংরাজীও জানতেন না, ফার্সিও জানতেন না। তিনি কোন প্রামাণ্য লোকের মুখে শুনে এ বিবরণ লিখে নেন।

এই সময় পেশোয়া প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং অন্যান্য মরাঠা সরদাররা তাঁর বশবর্ত্তী হয়েছিলেন। এবং সমস্ত মরাঠা কনফেডারেসি (confederacy) এ যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মরাঠাদের যে সকল নায়ক ও উপনায়কদের উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে দেব। তিনি বলেছেন অন্যান্য হিন্দুরাজারাও এ যুদ্ধে যোগ দিতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু মরাঠাদের দিল্লী লুঠ করবার পদ্ধতি তাঁদের অনুমত না হওয়ায় তাঁরা মরাঠাদের ত্যাগ করেছিলেন। রাজপুতরা, কচ্ছি রাজপুতরা ও ভরতপুরের রাজা সুরজমল জাঠ প্রথমে মরাঠাদের সহায় ছিলেন। তাঁরা এ যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য দু-কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু মরাঠারা যখন দিল্লীর প্রাসাদ, মসজিদ, পীরের আস্তানা সব লুঠ করতে সুরু করলে, তখন তাঁরা সব পশ্চাৎপদ হলেন। এ-কথা গ্রাণ্ট ডাফ্‌ও বলেছেন। সদাশিব রাওয়ের এ হেন লুণ্ঠন অধর্ম্ম মনে ক'রে তাঁর সঙ্গ তাঁরা ত্যাগ করেন।

পাণিপথের যুদ্ধের নায়ক এবং উপনায়কদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই। এ যুদ্ধে সৈন্যদের প্রধান নায়ক ছিলেন সদাশিব রাও ভাও।

প্রথম পেশোয়া ছিলেন বালাজি বিশ্বনাথ। তাঁর দুটি পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও, আর কনিষ্ঠ পুত্র চিমনাজি আপ্পা; ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। সদাশিব রাও ছিলেন তাঁর পুত্র।

বাজিরাওয়ের পুত্র বালাজি বাজীরাও তৃতীয় পেশোয়া হন। এবং তাঁর পুত্র বিশ্বাস রাও। বিশ্বাস রাওই নামে প্রধান সেনাপতি ছিলেন কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বৎসর, সে কারণ প্রকৃতপক্ষে সদাশিব রাও ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ। পেশোয়ার বংশ ছিল চিৎপাবন ব্রাহ্মণবংশ। মলহার রাও ছিলেন একজন প্রধান সরদার। তাঁর বংশধর এখন ইন্দোরের মহারাজা। ইনি জাতে ছিলেন পশুপালক।

জানকোজি সিন্ধিয়া ছিলেন অপর জনৈক সরদার। এখন এই সিন্ধিয়া-পরিবারের বংশধর হচ্ছেন গোয়ালিয়রের মহারাজা। এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়।

গাইকোয়াড় ছিলেন অপর আর একটি সরদার। আজও এই বংশের লোকই গাইকোয়াড়ের মহারাজা। গাইকোয়াড় ছিলেন শূদ্রবংশজাত।

পটবর্দ্ধনরা ছিল একটি বিখ্যাত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-পরিবার। তাঁরা পূর্ব্বে মরাঠাদের স্বরাজ্য গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছেন এবং যুদ্ধেও পরাঙ্মুখ হন নি। এখন সাংলিয়ার চীফ (chief) জনৈক পটবর্দ্ধন।

বলবন্ত রাও মহেন্দালে ছিলেন সদাশিব রাওয়ের শ্যালক এবং তিনি পাণিপথের প্রথম এক যুদ্ধে প্রাণ হারান।

সমশের বাহাদুর ছিলেন বাজিরাওয়ের 'মস্তানী' নামক মুসলমান পত্নীর পুত্র, অর্থাৎ বালাজি বাজিরাওয়ের বৈমাত্রেয় ভাই। বাজিরাও তাঁকে হিন্দুসমাজভুক্ত করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সমাজের বিরোধিতায় তা করতে কৃতকার্য্য হন নি।

মস্তানী কোনও হিন্দুরাজার মুসলমান পত্নীর কন্যা। তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। মরাঠা ব্রাহ্মণরা তাঁকে হিন্দু ব'লে স্বীকার করেন নি; কিন্তু তিনি বাজিরাওয়ের সহমরণ করেন।

ইব্রাহিম খাঁ গারদি ছিলেন একটি বড় মুসলমান ঘরের ছেলে। তিনি ফরাসীদের অদ্ভুতকর্ম্মা সেনানায়ক বুসীর (Bussyর) কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং পরে একটি সেনাদল গঠন করেন। এবং সদাশিব রাওয়ের অধীনে সদল চাকরি নেন।

পাণিপথে সদাশিব রাওয়ের সৈন্যের অভাব ছিল না, অসীম সাহসী যোদ্ধার অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু খাদ্যের। উপবাসী মরাঠা সৈন্যেরা সব গৈরিক বসন ধারণ ক'রে প্রাণপণ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং প্রথম আমেদ শা আবদালীর সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করেছিল। পরে আবদালীর ১০,০০০ নূতন সৈন্যের আক্রমণে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল। তার পরই কতলাম। অর্থাৎ নির্ম্মম কাফের হত্যা।

হোলকার এই ভাঙা দলকে এবং বহু স্ত্রীলোককে যত দূর সম্ভব রক্ষা ক'রে ভরতপুরে নিয়ে আসেন। এবং সুরজমল জাঠ ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাদের দেশে ফিরে পাঠান। আমি এ যুদ্ধ সম্বন্ধে রলিন্‌সন্ (Rawlinson) সাহেবের মত গ্রাহ্য করি।

পাণিপথের যুদ্ধে মরাঠা-শক্তি ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সদাশিব রাও কেন পরাস্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে বহু ঐতিহাসিক বহু জল্পনা-কল্পনা করলেও তাঁদের মতামত বিনা বাক্যে গ্রাহ্য নয়।

হোলকার প্রভৃতি সরদাররা নাকি ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সহ্য করতে পারেন নি। মলহার রাও হোলকার অবশ্য পাণিপথের বড় যুদ্ধে নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করেন নি। এর কারণ বোধ হয় সদাশিব রাও হোলকারকে তাঁদের সঙ্গী স্ত্রীলোকদের রক্ষা করতে আদেশ করেছিলেন।

মলহার রাও সম্মুখ-সমরের বিরোধী ছিলেন এবং মরাঠাদের অভ্যস্ত guerilla যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। পাণিপথের সমতলক্ষেত্রে ও জাতীয় যুদ্ধ অসম্ভব জেনে সদাশিব রাও ইব্রাহিম খাঁ গারদি প্রস্তাবিত সম্মুখ সমরই গ্রাহ্য করেন। ইব্রাহিম খাঁ গারদি গুলি ও গোলার উপরেই ভরসা রাখেন। আর তিনি এ যুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করেন।

সুরজমল জাঠ রাও সাহেবকে স্ত্রীলোকদের ভরতপুরে রেখে যেতে বলেন। এত স্ত্রীলোক ও লট-বহর নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা যুদ্ধে জয়লাভ করার বাধা হয়েছিল। সদাশির রাও নাকি তাঁর স্ত্রী পার্ব্বতী বাইয়ের প্ররোচনাতেই আবদালীর সৈন্যদের আক্রমণ করেন এবং এই রণক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মরাঠাদের সেকালে শৌর্য্য, বীর্য্য ও রণদক্ষতার যে কখনও অভাব ছিল না, তার প্রমাণ বলবন্ত রাও মহেন্দলে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে আবদালীর সৈন্যদের আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। তবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফেরবার পথে তিনি একটি বন্দুকের গুলিতে মারা যান।

পাণিপথের বড় যুদ্ধে বিশ বৎসরের ছোকরা বিশ্বাস রাও একটি গুলি কিংবা অস্ত্রাঘাতে বিপন্ন হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন, আর পরক্ষণেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সংবাদে সদাশিব রাও হাতী থেকে একটি আরবী ঘোড়া চড়ে রণক্ষেত্রে বহু আবদালী-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সিন্ধিয়া বীরপুরুষের মত যুদ্ধ করে অবশেষে বন্দী হন। এবং বিপক্ষদলের নাজিরউদ্দৌলা নামক রোহিলা সরদারের আদেশে হত হন।

দামাজি গাইকোয়াড় ইব্রাহিম খাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষত শরীরে আপনার প্রাণরক্ষা ক'রে স্বদেশে ফিরে যান।

সমশের বাহাদুরও ক্ষতবিক্ষত শরীরে সুরজমলের রাজধানীতে এসে মারা যান।

ইব্রাহিম খাঁ নিজের সম্বল নিয়ে আবদালী সৈন্যদের আক্রমণ করেন। শেষটা নানা অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে বন্দী হন। এবং তাঁকে বিষ খাইয়ে মারা হয়।

যশোবন্ত রাও পাওয়ার এবং বিনোজী যাদব নামক অপর দুটি মৃতদেহ পাণিপথের রণক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

এর থেকে জানা যায় যে উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও মরাঠা সরদার রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন নি। সকলেই আমরণ যুদ্ধ করেছিলেন।

এই কারণে কাশীরাজ পণ্ডিতের পুস্তিকার ব্রাউন সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত ও রলিন্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিবরণও সত্য।

রলিন্‌সন সাহেব মন্তব্য করেছেন,—

"A defeat is under some circumstances, as honourable as a victory, and never in all their annals did the Marhatta armies cover themselves with greater glory than when the flower of the chivalry of the Deccan perished on the stricken field of Panipat fighting against the enemies of their creed and country."

এ কথায় আমিও সায় দিই।

শেষের পরিচয়

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

রাঁচি ডুরাণ্ডায় কালীপদ গুপ্তের সুদৃশ্য বাড়ীখানার অভ্যন্তরে সুখ শান্তিরও অভাব ছিল না। কালীপদবাবুর পিতামহ রাঁচিতে আইনব্যবসায়ী ছিলেন, পিতাও পিতৃব্যবসায়ের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কালীপদবাবুও পিতা, পিতামহের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাঁচিতেই রহিয়া গিয়াছেন। তিন পুরুষ হয় তাঁহারা রাঁচিতে বাস করিতেছেন, দেশের সহিত সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। দীর্ঘকাল বাংলা দেশ ছাড়িয়া ছোটনাগপুর অঞ্চলে বাস করিয়া ইঁহাদের আচার-ব্যবহার কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে মেয়েদের পর্দ্দাপ্রথা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাঙালী মেয়েদের মত অহেতুকী ভীতি, অকারণ লজ্জা ও কুণ্ঠা ইঁহাদের একেবারেই নাই। ভাত অপেক্ষা রুটিই ইঁহারা অধিক পছন্দ করেন, বাংলা কথা অপেক্ষা হিন্দী বলিতেই ইঁহারা আমোদ পান বেশী।

কালীপদবাবুর পিতা, পিতামহ বাস করিতেন রাঁচি শহরে, কিন্তু ডুরাণ্ডার নির্জ্জনতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কালীপদবাবু বাস করিবার মত ছোট একখানা বাড়ী করিয়া ডুরাণ্ডাতেই বাস করিতেছেন।

পরিবার তাঁহার বৃহৎ নয়; পত্নী, তিনটি কন্যা ও পুত্র একটি। বড় দুটি কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহারা শ্বশুরালয়ে আছে, তৃতীয়া বা কনিষ্ঠা কন্যা কেয়াও বিবাহ-যোগ্যা। সে ম্যাট্রিক পাস করিয়া প্রাইভেটে আই-এ. পড়ে। পুত্রটিও কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া বি-এ. পড়িতেছে। গৃহিণী মণিকা কন্যার বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে তাড়া করিলে কালীপদবাবু নিরুদ্বিগ্নভাবে বলেন, দুটো তো পার হয়ে গেছেই, বছরে একবার চোখেও একটু দেখতে পাই নে। দু-দিনের জন্য যদি আসে, বাবাজীরাও লাল পেয়াদার মত পেছনে পেছনে ছুটে আসেন। একটা আছে, যদ্দিন থাকে, থাক না! তাড়াহুড়োর দরকার কি? গেলেই ঘর খালি হয়ে গেল।

বাড়ীখানা বাংলো ধরণে তৈরি; তিন দিকেই একটু করিয়া বাগান। একখানা বাগানে দেশী, বিলাতী নানা রকমের ফুল বার মাসই ফুটিয়া থাকে; একখানাতে লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, ডাটা প্রভৃতি তরকারী ও সব্জী হয়, অন্য খানাতে আম লিচু প্রভৃতি ফলের চারা লাগানো হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের বাগানের মাঝখান দিয়াই বাহিরে যাইবার পথ, লাল কাঁকর ফেলা ছোট এক ফালি রাস্তা। গেটের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে কে. পি. গুপ্ত।

শুধু উত্তর দিক ঘেঁষিয়া একখানা বাড়ী। রাঁচিতে লাট সাহেবের কর্ম্মচারীদের থাকিবার জন্য যে-সব কোয়ার্টার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই একখানা বাড়ী। বাড়ীখানা প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকে, কালেভদ্রে কোনো স্বাস্থ্যান্বেষী পরিবার ভাড়া লইয়া দুই-চার মাস সে বাড়ীতে আসিয়া থাকে। কালীপদবাবুর উত্তর দিকের ঘরের জানালা দিয়া বাড়ীটার সম্পূর্ণ একখানা ঘর ও বাড়ীর অন্যান্য অংশ কিছু কিছু দেখা যায়। নূতন প্রতিবেশিনী আসিলে কেয়া ও মণিকা প্রথমে সেই জানালা-পথেই পরিচয়ের সূচনা করে। ঘরের দরজা খুলিলেই ওবাড়ীর দরজা, সুতরাং গিয়া উপস্থিত হইতেও সময় লাগে না। সদ্য-বিদেশাগত বিপন্ন প্রতিবেশীকে নানারূপে তাহারা সাহায্য করে। 'মজুরনী চাই? আমাদের মজুরনীর বোনটাতো বসে আছে, বিকেলে ডেকে আনবে'খন' 'কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে গেছে? আমাদের ধোপা বেশ কাপড় কাচে, ভজুয়া গিয়ে ডেকে আনুক, ওরা কি ভাই তোমার কথা বুঝবে? তুমিই কি ওদের কথা বুঝবে, ওদের যে দেবনাগরী ভাষা! আমি বুঝিয়ে বলছি' 'বাবুর হজম হয় না, ভয় কি ভাই? এখানকার জলহাওয়ায় সব সেরে যাবে।' 'কাঁচা উনুন আজ নেই জালালে ভাই, এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ো'খন' এই ভাবে তাহারা নূতন প্রতিবেশীকে আপনার করিয়া লয়, কিন্তু আত্মীয়তার ভিত্তি পাকা হইবার পূর্ব্বেই তাহারা চলিয়া যায়, শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া তাহাদের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

কেহ বা যে রোগীকে লইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য কুড়াইতে আসেন, চিরদিনের জন্য তাহাকে এখানেই রাখিয়া যান, মণিকা সেই বিপন্ন পরিবারের দুঃখের মাঝখানে গিয়া সমস্ত ব্যথার অংশ গ্রহণ করেন, কাছে বসিয়া চোখের জল ফেলেন,

মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দেন, জোর করিয়া শোকার্ত্ত মাতা পত্নীর মুখে আহার্য্য গুঁজিয়া দেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেয়াও মাকে সাহায্য করে।

সেবার শীতের প্রারম্ভে কুয়াশায় চারিদিক যখন ধূসর হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় এক ঘর গৃহস্থ সেই শূন্য ঘর অধিকার করিতে আসিল। তৈজসপত্র অতি সামান্য, মনে হয় দুই-এক জনের বেশী কেহ সেখানে বাস করিতে আসে নাই।

কেয়াদের বাড়ী হইতে যে জানালা দিয়া ও-বাড়ীর ভিতরটা দেখা যাইত, কেয়া ও মণিকা বার বার সেখানে আসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের দেখিতে পাইয়াও কেহ তাহাদের কাছে কোনোরূপ সাহায্যপ্রার্থী হইল না, চাকরবাকরের কোলাহল ও এক জন বর্ষীয়সী মহিলার তীক্ষ্ণ অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতে লাগিল।

জানালা হইতে যে ঘরখানা স্পষ্ট দেখা যায়, সেখানা দক্ষিণ-খোলা না হইলেও পুব-খোলা ছিল, আর বাড়ীর মধ্যে সেই ঘরখানাই সবচেয়ে বড়। সেই ঘরে যে এক জন মনুষ্য বাস করিতে আরম্ভ করিল, অনুমান হয় সেই-ই রোগী, তাহারই ভগ্ন স্বাস্থ্যের সন্ধানেই তাহাদের রাঁচি আগমন হইয়াছে। একখানা নাতিপ্রশস্ত খাটের উপরে তাহাকে নির্জ্জীব ভাবে সব সময়েই শুইয়া থাকিতে দেখা যায়, এবং সকালে বিকালে ম্লানমুখে নিজেই নিজের দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখে তাহাও দেখা যায়। লোকটি যুবক, বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, রোগে ভুগিয়া দেহের সৌকুমার্য্য অনেক ম্লান হইলেও দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু তাহার লুপ্ত সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। গায়ের বর্ণ গৌর কিনা ঠিক বলা যায় না, কারণ রক্তহীনতায় তাহা একটু পাণ্ডুর দেখা যায়।

জানালা দিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল না দেখিয়া মণিকা অবশেষে দরজা খুলিয়া ও-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বর্ষীয়সী মহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের সহিত তিনি পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন, আলাপ করিয়া জানিলেন তিনিই বাড়ীর গৃহিণী, নাম প্রমদা। ইঁহার স্বামী কলিকাতার এক জন ধনী এডভোকেট। সপত্নী-পুত্র হরিৎকে লইয়া তিনি রাঁচিতে আসিয়াছেন, ডাক্তার তাহার বায়ুপরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার বিরাট সংসার, সেখানে এক দণ্ড না থাকিলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ! কি করিবেন সতীনের ছেলে, পেটের ছেলে তো নয়, না আসিলে লোকে কত কথার সৃষ্টি করিবে, তাই বাধ্য হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিবেন না, রোগী রাখিয়া তাঁহাকে সত্বরই ফিরিয়া যাইতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণিকা বলেন, সে তো সত্যি কথা! কি অসুখ ভাই?

প্রমদা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে বলেন, কে জানে বাপু, একটু একটু জ্বর, কাসি আছে, মাঝে গলা দিয়ে একটু রক্তও পড়েছিল। কত চিকিৎসে হ'ল, টাকার শ্রাদ্ধ, এখন রক্ত পড়ে না। রোগ সারে নি, কিছু দিন ভাল জায়গায় থাকলে নাকি সারবে। এম এ পড়ত, পড়াশুনো গেল চুলোর দোরে, এখন কেবল রোগের সেবা! হাড় জালাতন!

মণিকা শিহরিয়া উঠিল, সেই যে সুদর্শন যুবকটিকে তিনি জানালার পর্দ্দার আড়ালে দেখিতে পান, তাহার বক্ষে কালকীট বাসা বাঁধিয়াছে! অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল 'আহা বাছা রে! ভগবান্ যেন মুখ তুলে চান, বাছা যেন সেরে ওঠে।'

মুখ বাঁকাইয়া প্রমদা বলিলেন—এ কি আর সারবার রোগ দিদি! কেবল আমার ভোগান্তি আর অর্থবৃষ্টি!

কেয়া জানালা দিয়া দেখিতে পাইত, কখনও হরিৎ ক্লান্ত ভাবে শুইয়া আছে, কখনও দুই-একখানা বই পড়িবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া, অবশেষে বন্ধ করিয়া পার্শ্বেই রাখিয়া দিয়াছে। তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য এক জন ভৃত্য নিয়োজিত আছে। বিমাতা কখনও কখনও যথাসম্ভব বস্ত্রাদি গুটাইয়া ও স্পর্শ এড়াইয়া ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া তদারক করিয়া যান। রোগীর রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখ ও অসহায় দৃষ্টি দেখিয়া কেয়ার মন মমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। এই বাড়ীতে অনেক বার অনেক রোগী আসিয়াছে, সে ও তাহার মা, রাতদিন জাগিয়া তাহাদের কত শুশ্রূষা করিয়াছে। কিন্তু এই কোপন-স্বভাবা স্ত্রীলোকটির সান্নিধ্যে যাইতেই তাহার কেমন ভয় ভয় করে। সে জানালার গরাদে ধরিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর দিকে চাহিয়া থাকিত, কখনও কখনও হরিৎও তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহার নিষ্প্রভ নয়ন যেন ক্ষণকালের জন্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিত।

এক মাস পরে প্রমদা চলিয়া গেলেন, দুই জন ভৃত্য ও এক জন পাচক হরিতের শুশ্রূষার জন্য রহিল। যাইবার সময় তিনি মণিকাকে বলিলেন, যে রোগ, কাউকে তো কিছু বলতে পারি নে ভাই, তবু ছেলেটা রইল, একটু-আধটু দেখ ভাই!

মণিকা চোখ মুছিয়া বলিলেন—সে আর বলবার দরকার কি দিদি! পেটে না ধরলেও, ও আমার 'পেটেরই ছেলে, কিচ্ছু ভেবো না।

প্রমদা চলিয়া গেলে সেই রুগ্ন ছেলেটির জন্য মণিকার উদ্বেগের সীমা রহিল না, আহা এই রোগা ছেলে একলাটি ঘরে প'ড়ে থাকে, সৎমা তাই, মা হ'লে কি আর ফেলে যেতে পারত? ছেলের চেয়ে সংসার কি বেশী?

রোজই তিনি রোগীর জন্য দুই-একটা লঘুপাচ্য তরকারি রন্ধন করিয়া নিজে সম্মুখে বসিয়া রোগীকে খাওয়াইতেন, ঐ ঠাকুরের রান্না কি রোগা মুখে ভাল লাগে? যে রান্নার ছিরি! 'ঐ আমসত্ত্বের অম্বলটুকু দিয়ে দুটি ভাত মেখে নাও বাবা! মুখে রুচি আসবে।'

নিঃসঙ্গ রোগশয্যাতেও মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া হরিতের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ দেখা দিল।

২

দ্বিপ্রহরে কেয়া বসিয়া একটা সোয়েটার বুনিতেছিল, বাড়ী নিস্তব্ধ, অন্য ঘরে মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, বাবা আপিসে, পাচক ভৃত্য সকলেই বিশ্রাম করিতেছে। সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে রোগীর কাতরোক্তি আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া কেয়া দেখে, চক্ষু বুজিয়া হরিৎ শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে কাতরোক্তি করিতেছে। ভৃত্য কেনারাম শিয়রে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া নাসিকাগর্জ্জনে গৃহখানাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

হরিতের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া কেয়া হয় তো একটু দ্বিধা করিল, হয় তো করিল না, খুট্ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইল, তার পর হরিতের ঘরের ভেজান দরজা খুলিয়া একেবারে তাহার শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। হরিতের কপালে একখানা জলের পটি জ্বরের তাপে তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। কেয়া ধীরে ধীরে পটিখানা উঠাইয়া নিজের শীতল করতল কপালের উপরে রাখিল। সহসা চম্‌কাইয়া বলিল—একি হরিৎবাবু, আজ আপনার জ্বর খুব বেড়েছে?

ধীরে ধীরে হরিতের রক্তিম চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত হইল, তার পর সে ব্যগ্র ভাবে বলিল—আপনি? আপনি এখানে এসে আমাকে ছুঁচ্ছেন কেন? জানেন তো আমার ছোঁয়াচে রোগ—।

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার চক্ষুর কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

কেয়া এবার বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—তা হোক্, ভাইয়ের যদি ছোঁয়াচে রোগ হয়, বোন কি সেবা করবে না?' বলিয়া শীতল জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া কপালে জলের পটি দিতে গেল। হরিৎ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, জলপটি থাক্, আপনার হাতই বেশ ঠাণ্ডা। —বলিয়া কেয়ার হাতখানা কপালে চাপিয়া ধরিল।

সমস্ত দুপুর হরিৎ চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল আর কেয়া তাহার কপালের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিলে মা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেছিলি মা? এত রোদে বাগানে?

কেয়া বলিল—না মা, ও-বাড়ীর হরিৎ বাবুর আজ জ্বর খুব বেড়েছে, উনি একা শুয়ে খুব কাৎরাচ্ছিলেন, তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই ডাকি নি, তাঁর কাছেই ছিলাম।

মা বলিলেন—আহা, বাছার কি কষ্ট! তা আমাকে ডেকে দিলেই পারতিস। গিয়ে ভালই করেছিলি, রোগীর সেবা, সে তো মেয়েদের ধর্ম্মই। কিন্তু যে রোগ, তাই ভয় করে—কাপড়চোপড়গুলো ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দে, আর লাইসল্ দিয়ে হাত পা ধুয়ে ফ্যাল।

কিছু দিন পর্য্যন্ত হরিতের প্রবল জ্বর চলিল, কাসিও বাড়িল, সমস্ত দুপুর কেয়া অথবা মণিকা তাহার কাছে থাকিতে লাগিল। কোনো কোনো দিন মণিকা রাত্রেও থাকিতে লাগিল। মণিকার কোলের উপর হাতখানা রাখিয়া কষ্টে শ্বাস টানিয়া হরিৎ বলিত, 'রোগ আমার সার্থক হয়েছে, মা হারিয়েও আপনার মতন মা, আর কেয়ার মত বোন পেয়েছি।'

মণিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া নেয়।

কেয়াই দুপুরবেলাটা প্রায় থাকিত, খাওয়ার পর মা একটু না গড়াইয়া পারে না, তাই সে সময় কেয়াই গিয়া কাছে বসিত। সেই সময়টির আবির্ভাবের আশায় হরিৎ বার বার ঘড়ির দিকে তাকাইত, কেয়া আসিয়া কপালে হাত দিলে তাহার আর মৃত্যুভয় থাকিত না, রোগযন্ত্রণাও কমিয়া যাইত।

৩

হরিৎকে মাঝে মাঝে হরিতের পিতা শরৎচন্দ্র দেখিতে আসেন, কখনো আসেন পিতৃব্য। সবচেয়ে বেশী আসে সরিৎ, হরিতের বৈমাত্রেয় ভাই।

এক মাতৃগর্ভজাত না হইলেও দুই ভাইয়ের অদ্ভুত

সাদৃশ্য, দুই ভাই-ই পিতার সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইয়াছে।

সরিৎ উচ্চশিক্ষিত উদার যুবক, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সংক্রামক রোগ ঘাঁটিয়া নিজের অপকার করিয়া কোনো লাভ নাই, ইত্যাদি মায়ের সদুপদেশ তাহার জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। পড়াশুনাও শেষ হইয়া গিয়াছে, হরিৎও এখানে একা আছে এই জন্য মায়ের জেদে সর্ব্বদা না থাকিতে পারিলেও সরিৎ মাঝে মাঝে ভাইয়ের কাছে আসে, আর ঐকান্তিকতার সহিত তাহার শুশ্রূষা করে। মণিকা বলেন, দেখেছিস কেয়া, কি মায়ের পেটে কি ছেলে, যেন গোবরে পদ্মফুল! ভায়ের জন্য যেন প্রাণ দিচ্ছে! আর কে বল্‌বে দুই মায়ের পেটের দু-জন! দুটি ভাই যেন রামলক্ষ্মণ!

এই সুদর্শন যুবকটিকেও মণিকা পুত্রস্নেহে কাছে টানিয়া লইলেন ও দুই বেলা নানারূপ সুখাদ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। সরিৎও মাসীমা বলিয়া তাহার কাছে নানা-রূপ আবদার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সরিতের সঙ্গে কেয়ার পরিচয় হইল হরিতের শয্যাপার্শ্বে; তাহার সেবার নিপুণতা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইত, মাঝে মাঝে নিজের অজ্ঞাতেই যেন বলিয়া উঠিত, 'এইটুকু বয়সেই আপনি এত সেবা কি ক'রে শিখলেন? কোনো বুড়োর চেয়ে আপনি কম নন।'

কেয়া সলজ্জে হাসিত, হরিৎ বলিত—ওর সেবায় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে সরিৎ!

সরিৎ যত দিন থাকিত, কেয়া ও-বাড়ীতে বড় একটা যাইত না, মণিকাও নিষেধ করিতেন, 'এখন তো ভাই রয়েছে, আমাদের সর্ব্বক্ষণ থাক্‌বার দরকার নেই কেয়া। একা থাকলে, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, যেতেই হ'ত। চোখের সামনে একটা লোক কাৎরে মরবে, সে কি ধর্ম্মে সইবে?'

৪

হরিৎ একটু ভাল হইয়া উঠিল, তাহার জর বন্ধ হইল, কাসি কমিয়া ওজনও একটু বাড়িল। রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখে একটু রক্তের আভাস দেখা গেল।

বিকালে সে উঠিয়া বারাণ্ডার ইজিচেয়ারে বসে, কেয়া বড় বড় দুটো ফুলের তোড়া আনিয়া তাহার সম্মুখের টেবিলে ফুলদানীতে রাখে। 'এত ফুল কোথায় পেলে কেয়া? তোমাদের বাগানে এত ফুল ফুটেছে?'

'হ্যাঁ, দেখেছ বেলফুলের কি গন্ধ বেরুচ্ছে?'

সব ফুল আমাকে দিয়ে গেলে, তোমার ঘরের ফুলদানী যে খালি রইল।'

'তা থাক, তুমি যে ফুল ভালবাস।'

দুষ্টুমি করিয়া হরিৎ বলে, 'ফুল ছাড়াও তো কত জিনিষ ভালবাসি, পাচ্ছি কই?'

'কি চাই বল?'

'আমি মৃত্যুর দরজায় অতিথি, আমার কি কোনও সাধ করা সাজে কেয়া?'

রাগ করিয়া কেয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, 'চললুম আমি, ঐ সব কথা আমি শুনতে চাই নে।'

হরিৎ তাহার হাত ধরিয়া বলে, 'রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি! আর বলব না।'

•

কেয়া ফিরিয়া আসিলে মা বলেন, 'কেমন আছে হরিৎ? ওজনটা আজ নিয়েছিলি? নেওয়া হয় নি? যা মা, আর একটু কষ্ট ক'রে গিয়ে তার ওজনটা নিয়ে আয়।'

•

হরিৎ আস্তে আস্তে বাগানে একটু পাইচারি করিতে আরম্ভ করিল, কেয়া আসিয়া বলে, 'থাক থাক, বেশী বাহাদুরিতে কাজ নেই, অত হাঁটতে হবে না, এখন এই চেয়ারখানায় ব'সো, মা গরম হালুয়া পাঠিয়েছেন, খেয়ে নাও।'

হরিৎ হালুয়া খাইতে খাইতে বলিল, 'সরিৎ এসেছে।'

সরিৎ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কেমন আছ দাদা? কি খাচ্ছ? গরম হালুয়া? এমনি সেবা-যত্ন পেলে আমি বারমেসে রোগী হয়ে থাকতে পারি।'

কেয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হরিৎ বলিল, 'বেয়ারাকে বল্ একখানা চৌকি তোকে এনে দিক্।'

চকিতে কেয়ার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া সরিৎ বলিল, 'আমি যাই, স্নান ক'রে আসি।'

কেয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমি যাই, আপনি এই চৌকীতে বসুন।'

সরিৎ বলিল, 'আপনি বসুন, আমি মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে গরম হালুয়ার অংশ নিয়ে আসি। রোগী নই ব'লে কি সব সেবা থেকেই বঞ্চিত থাকব?'

কেয়ার মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল।

সাত দিন পরে সরিৎ চলিয়া গেল, এ সাত দিন কেয়া একবারও হরিৎকে দেখিতে আসে নাই। সরিৎ চলিয়া গেলে দুপুরে গিয়া হরিতের শিয়রে দাঁড়াইল। হরিৎ তাহার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, 'এসেছ কেয়া, কত দিন

তোমায় দেখি নি। আমার সামনে এসে ব'স। তোমাকে এ ক'দিন দেখি নি ব'লে আমার অসুখ বেড়েছে। তুমি সব সময় কাছে থাকলেই আমি সেরে উঠব।'

কেয়া কপালে হাত রাখিয়া বলিল, 'কেন একটু জ্বর হ'ল হরিৎ-দা, নিশ্চয়ই কোন অনিয়ম করেছ?'

'তুমি যে কাছে আস নি, এই কি যথেষ্ট অনিয়ম নয় কেয়া? কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীর এই দুরাকাঙ্ক্ষাকে কি তুমি ক্ষমা করবে? যদি পার ক'রো। মৃত্যুর পরে স্পর্দ্ধিত, দুরাকাঙ্ক্ষী ব'লে ঘৃণা ক'রো না, অসহায় অক্ষম ব'লে ক্ষমা ক'রো।

পলকে কেয়ার মুখ রাঙা হইয়াই ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। আঁচলে হরিতের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'স্পর্দ্ধা তোমার একটুও নয়, রোগের সময় সেবা পেতে সকলেরই ভাল লাগে। যোগ্য সেবা না পেলে রোগ বাড়বে বই কি?' সাশ্রু নয়নে হরিৎ বলিল, 'কেন তুমি আমার জন্য এত করছ কেয়া? আমি মৃত্যুপথযাত্রী, প্রতিদানে তোমাকে যে কিছুই দিতে পারব না।'

হরিতের মুখে হাতচাপা দিয়া কেয়া বলে, 'মিথ্যে কেন ব'কচ! মরতে তোমায় দিচ্ছে কে? রোগ কি কারু হয় না? আর তুমি তো ভালই হ'য়ে গেছ, এক মাস পর আজ সামান্য একটু গা গরম হয়েছে বই তো নয়। ওজন বেড়েছে, মুখেও রুচি হয়েছে, ধরতে গেলে তুমি সেরেই গেছ। তবে ঐ সব ছাই মাটি কথা কেন বল? আর প্রতিদানের জন্যেই বুঝি সকলে রোগীর সেবা করে? ভারী দুষ্ট, তো তুমি!'

আজকাল কেয়া এত বেশী সময় হরিতের কাছে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে যে মণিকা কন্যার জন্য শঙ্কিতা হইলেন, 'ছেলেটার ঘুরে আবার জ্বর হ'ল। নিজের লোক যারা, তারা তো মাইনে-করা চাকর-বাকরের উপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে গেল। একা ঘরে পড়ে কাৎরায়, আমি তো সব সময় যেতে পারি নে, তোকেই যেতে হয়। রোগীর সেবা করা সে তো ভালই, কিন্তু রোগটাতো ভাল নয়, তাই ভয় করে, খুব সাবধানে চলিস মা!'

রোগের বীজ কন্যার দেহে বিস্তার লাভ করিবে ভাবিয়াই মাতা শঙ্কিতা হইলেন, কিন্তু এই মৃত্যুপথযাত্রীর মনের রোগও যে কন্যার দেহে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না।

৫

বসন্তের হাওয়া বহিতেই হরিৎ বেশ ভাল হইয়া উঠিল, তাহার শারীরিক উন্নতি দেখিয়া সকলেই খুব খুশী হইল। সরিৎ মণিকাকে বলিল, 'দাদার জীবন তুমি আর কেয়াই এবার বাঁচালে মাসিমা! এই ক-মাসের মধ্যে নইলে রাঁচির হাওয়ার সাধ্য ছিল না এতটা উন্নতি ঘটাতে!'

কেয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করে, মণিকা বলেন, 'যে জন্যেই হোক্ বাছা আমার সেরে উঠুক। আহা, এই বয়েস, মুখখানা চূণ ক'রে বিছানায় প'ড়ে থাকে, দেখে বুক ফেটে যায়।'

সরিৎ বলে, 'মাসিমা, আমারও আজ সর্দি হ'য়েছে, মুখটি চূণ করে সারাদিন বিছানায় ব'সে নাক ঝেড়েছি। চল, আমার কাছে ব'সে 'বাবা', 'বাছা' ব'লে মাথায় হাত বুলোবে চল। আর কেয়াকেও বল, ব্যস্ত হ'য়ে আদার চা ক'রে আনুক।' মণিকা হাসিয়া বলেন, 'পাগলা ছেলে।'

সরিৎ চলিয়া গেলে শরৎবাবু আসিয়া কয়েক দিন ছেলের কাছে রহিলেন এবং স্থির করিয়া গেলেন যে, চৈত্রের শেষে হরিৎকে একবার কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে, তাহার বুকের একটা এক্সরে নেওয়া প্রয়োজন। তাহার পর আরও কয়েকটা ইঞ্জেক্শন্ দিয়া তাহাকে সমুদ্রের ধারে পাঠাইতে হইবে।

শরৎবাবু চলিয়া গেলে সরিৎ আবার আসিল। অপরাহ্নের পরে মণিকা ও কেয়া হরিৎকে দেখিতে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলিয়া মণিকা চলিয়া আসিলেন, কেয়া বলিল, সে হরিৎ-দার ছ-টার ওষুধ ও পথ্য দিয়া শীঘ্রই আসিতেছে।

মণিকা চলিয়া গেলে হরিৎ বলিল, 'আর ক-দিন আমাকে পথ্য খাওয়াবে কেয়া? এই পৃথিবীতেই বা ক-দিন আছি, তাও যে-ক'দিন আছি, কলকাতায় একাই থাকতে হবে। শীগ্গিরই তো কলকাতায় যাচ্ছি, শুনেছ বোধ হয়।'

কেয়া শুনিয়াছে বটে, কিন্তু কথাটা তলাইয়া ভাবে নাই, এখন ব্যাপারটা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তার বুকের রক্তস্রোত যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। ম্লানমুখে সে বলিল, 'সত্যি যাবে? সরিৎবাবু বুঝি তোমাকেই নিয়ে যেতে এসেছেন?'

ম্লান হাসিয়া হরিৎ বলিল, "হ্যাঁ, সত্যি যেতে হবে। বুকের একটা এক্সরে নিতে হবে।'

সহসা কেয়া হরিতের একখানা হাত ধরিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'এখানে তুমি এমনি ভাল হ'য়ে যাবে, কেন যাবে, যেও না।'

তাহার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে হরিৎ

বলিল, 'ডাক্তার বলেছেন, বাবা এসে সব ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।'

'তবে এক্সরে ক'রে আবার আসবে?' কেয়ার কণ্ঠে মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

'আর এখানে আসা হবে না, সমুদ্রের ধারে যেতে হবে।'

'তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল', কেয়া দুই হাতে হরিতের হাত চাপিয়া ধরিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হরিৎ বলিল, 'সে কি হয় পাগলি! সে অসম্ভব!'

'তোমার কাছে থেকে আমার এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে তুমি চলে গেলে আমি কিছুতেই বাঁচব না'—কেয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল।

হরিৎ তাহার অশ্রুসজল চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কলকাতায় গেলে আমিও বেশী দিন বাঁচব না, কেয়া! এখানে যে ভাল আছি সে কেবল তোমার আর মা'র সেবার গুণে।'

ব্যগ্র কণ্ঠে কেয়া কহিল, 'তবে তোমার কাছে থাকবার কোনই কি উপায় নেই?'

'না—কোনও উপায় নেই, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে গেলেই আমার অসুখ বাড়বে, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না, তা সে গোপালপুরই যাই, আর অমরাবতীতেই যাই।'

চোখ মুছিয়া কেয়া বলিল, 'থাক্ থাক্ অত আর জ্যোতিষগিরি ফলিয়ে কাজ নেই। ভাল তো হয়েই গেছ, আর কি! কিন্তু আই-এ না পড়ে আমি যদি নার্সিং পড়তাম, বেশ হ'ত না? তুমি বলতে আমার জন্য এক জন নার্স চাই, আমিই যেতাম তোমার নার্স হয়ে। বেশ হ'ত। কিন্তু এখন কি ক'রে নার্স হওয়া যায়?'

'হ'তে পারলেই তোমার মা বাবা তোমাকে নার্স হ'তে দিলেন আর কি? কিসের দুঃখে তুমি নার্স হবে কেয়া? আমার মত একটি হতভাগাকে সেবা ক'রে বাঁচাবার জন্যে?'

কেয়ার চোখের জল গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সে আঁচলে হরিতের চক্ষু মুছাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিতেই কেয়া উঠিয়া হরিতকে ওষুধ পথ্য খাওয়াইল।

কেয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, সরিৎ তখন বাথরুম হইতে স্নান করিয়া তোয়ালে দিয়া মাথা ঘষিতে ঘষিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সরিতের আহ্বান শুনিয়া কেয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলে সরিৎ একখানা চেয়ারে বসিয়া সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিবার জন্য কেয়াকে অনুরোধ করিল। কেয়ার তখন সমস্ত অন্তর বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল। অকারণেই চোখে জল আসিতেছিল, তবু ভদ্রতার খাতিরে তাহাকে বসিতে হইল।

সরিৎ প্রথমতঃ দাদার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা তুলিল, রাঁচিতে আসিয়া প্রথম একটু জর বাড়িলেও ইদানীং দাদার অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে; কাসি কমিয়াছে, ওজন বাড়িয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার পরেই রাঁচির গরমের আলোচনা তুলিল, সারা দুপুর কেমন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইতে হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত একটু বর্ণনা দিবার পর দেখিল কেয়া উঠি-উঠি করিতেছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া সরিৎ বলিল, 'জানেন বোধ হয় দাদাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছি এখান থেকে!'

কেয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে জানে। সরিৎ বলিল, 'হয়ত বলবার আর সুযোগ পাব না, তাই আজ আপনাকে একটা কথা বলব।' কেয়া তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সরিৎ বলিল, 'আপনাদের পরিবারের, বিশেষ আপনার মহাপ্রাণতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি; এক জন অনাত্মীয়ের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেও যে কেউ এত করতে পারে, এ আদর্শ আমার চোখে এখন পর্য্যন্ত পড়ে নি।'

তপ্ত নিদাঘের দীর্ঘ বেলার অবসান ঘটিতেছিল, চারি দিকে একটা ক্লান্তির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল, ক্লান্তিতে কেয়ারও যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সরিৎ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের এই আত্মীয়তাকে আমি স্থায়ী করতে চাই, আপনি কি তাতে মত দেবেন?'

কেয়ার বুকের রক্তস্রোত থামিয়া গিয়া আবার প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। নাক মুখ দিয়া তপ্ত অগ্নিশিখা বাহির হইয়া সমস্ত মুখখানাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, তাহার ঠোঁট দুখানা একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করিল না।

সরিৎ মিনতি করিয়া বলিল, 'দয়া ক'রে আসবেন আমাদের ঘরে? বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত গৃহ আমাদের আপনাকে পেয়ে শুচি হয়ে উঠবে!'

কেয়ার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, চারি দিকে সন্ধ্যার ম্লানছায়া ঘনাইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া অধীর কণ্ঠে সরিৎ বলিল, 'মাপ করবেন, আমার স্পর্দ্ধিত আশার যোগ্য শাস্তিই হয়েছে। শিগ্‌গীরই আমরা চলে যাব। আশা করি এই অপরাধ ভুলে যাবেন। হয়ত জীবনে আর দেখা হবে না।'

কেয়ার বুকের রক্ত চন্‌ চন্‌ করিয়া উঠিল, হরিতের সেই কাতরোক্তি, 'আর দেখা হবে না' তার সেই বিচ্ছেদ-কাতর বিবর্ণ মুখ মনে পড়িয়া তাহার মুখ কালি হইয়া গেল। কম্পিত ওষ্ঠাধর কি যেন উচ্চারণ করিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

সরিৎ আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভেবেছিলাম আপনাকে পেলে হয়ত দাদাকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারব, কিন্তু—সবই ভবিতব্য; খণ্ডন করবার উপায় নেই।'

সহসা কেয়ার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আলোকের ক্ষীণরেখা দেখিতে পাইল, মৃদুস্বরে বলিল, 'এ তো আমার সৌভাগ্য।'

'সত্যি? সত্যি বলছ কেয়া, সত্যি তোমার এতে মত আছে? আসবে আমাদের ঘরে?'

উদ্গত অশ্রু কোনোমতে রোধ করিয়া 'আমার খুব মত আছে' বলিয়াই কেয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কেয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। সেদিন বুকফাটা চোখের জলে সেই খেয়ালী সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে তাহার কি প্রার্থনা নিবেদিত হইল, কে বলিবে?

সমস্ত রাত্রি কোন মতে কাটাইয়া পর-দিন সকাল-বেলাই সরিৎ কালীপদবাবুকে তাহার প্রার্থনা জানাইল। সরিৎ রূপবান্‌ শিক্ষিত যুবক, তাহার পিতারও অর্থের অপ্রতুল নাই, বিশেষতঃ ইহারা পাল্‌টা ঘর, সুতরাং কালীপদবাবুর অসম্মতির কারণ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কেয়ার মত নেওয়া দরকার, এই প্রস্তাব করিতেই সলজ্জ হাসিয়া সরিৎ বলিল, 'এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, তাঁর সম্মতি আছে।'

মণিকা বলিলেন, 'সব ভাল তো বুঝলুম, যে দজ্জাল শাশুড়ী, মাগো!'

কালীপদবাবু বুঝাইলেন যে সতীনপোর সঙ্গে ঐ রকম করে ব'লেই কি আর নিজের ছেলের বৌকে কষ্ট দেবে? বিশেষ মেয়ের যখন ইচ্ছে, তখন আমাদের অমত করা কি ঠিক হবে?'

সরিৎ বলিল, 'আমার মা বাবার সম্মতিও আমি নিয়ে এসেছি, তাঁদের খুব সম্মতি আছে। এ বিষয়ে আপনি বাবার কাছে একখানা চিঠি লিখবেন। আমি কালই এক বার কলকাতা যাব, দিন-দশেক বাদে এসে দাদাকে নিয়ে যাব।'

এই বিবাহের কথা লইয়া দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে খুব আলোচনা চলিল। সরিৎ বলিয়াছে কেয়ার এই বিবাহে খুব মত আছে, সুতরাং এ বিষয়ে তাহাকে কেহই কিছু বলিল না, নতুবা তাহার মুখের দিকে একটু ভাল করিয়া তাকাইলে তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত। মা ভাবিলেন, সরিতের উপর প্রাণের টানেই মেয়ে হরিতের অত সেবা যত্ন করিয়াছে। কিন্তু কি চাপা মেয়ে, একটুও কি বুঝিবার উপায় আছে? মণিকা মনে মনে হাসিলেন।

কেয়া বিবাহের এই আন্দোলনের কোন অংশ গ্রহণ করিল না, নিজের ঘরে যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়া রাখিল। এমন কি কয়েক দিন পর্য্যন্ত সে হরিৎকে পর্য্যন্ত দেখিতে গেল না। বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়া মেয়ে এমন ভাবে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, ভাবিয়া মণিকাও তাহাকে বিশেষ কোন কাজে ডাকিতেন না।

সেদিন বিকালে মণিকা ডাকিয়া বলিলেন, 'যা তো কেয়া কচুরি দুখানা হরিৎকে দিয়ে আয়, আমার যেতে দেরি হবে, ততক্ষণে জুড়িয়ে যাবে।'

অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কেয়া খাবারের থালা লইয়া হরিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিৎ চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, ঠক্‌ করিয়া খাবারের থালাখানা টেবিলের উপরে রাখিতেই চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কেয়াকে দেখিয়া কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিল না, ক্লান্তিভরে আবার তাহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল।

হরিৎ আজকাল সব সময় শুইয়া থাকে না, বিকাল বেলা প্রায়ই বাগানে একটু বেড়ায়। আজ এ সময় তাহাকে নির্জ্জীব ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ও তাহার ভাবলেশহীন মুখের দিকে চাহিয়া কেয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। দেখিল সেই শীর্ণ দেহ অধিকতর শীর্ণ হইয়াছে, রক্তহীনতায় মুখখানা যেন পাণ্ডুর বিশুষ্ক।

বেদনায় কেয়ার বুকটা ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া সে বলিল, 'কেমন আছ হরিৎ-দা?'

সংক্ষেপে হরিৎ বলিল, 'ভাল।'

কেয়া ধীরে ধীরে হরিতের একখানা হাত হাতে তুলিয়া

লইল, অকস্মাৎ হরিৎ চমকিয়া চাহিল, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার হাতের উপরে পড়িয়াছে। হরিৎ দেখিল কেয়া কাঁদিতেছে।

নিস্তব্ধ গৃহ, ঘরের মধ্যে ঘড়িটা কেবল টক্ টক্ করিয়া সময় মাপিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে হাত টানিয়া লইয়া হরিৎ বলিল, 'আনন্দের দিনে তুমি কাঁদছ কেন কেয়া? শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি, কিন্তু রুগ্ন শরীর ব'লে আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি নে। সরিৎ খুব ভাল ছেলে, তুমি সুখী হবে।'

কেয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

হরিৎ আবার বলিল, 'কিন্তু আমার তো বেশী দিন দেরি নেই, সে ক'টা দিন কি তোমরা অপেক্ষা করতে পার না কেয়া? ঘরের মধ্যে মরণোন্মুখ রোগী রেখে আনন্দোৎসব কি সম্পূর্ণ হবে?'

কেয়া চোখ মুছিয়া বলিল, 'আমাকে বেদনা দিয়েই বুঝি তোমার আনন্দ?'

হরিৎ মৃদু হাসিল, কথা কহিল না।

অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়া কেয়া বলিল, 'কেমন হ'ল বল ত? নার্স না হয়েও সব সময় তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করতে পারব। তুমিও ক্রমে ভাল হয়ে উঠবে, কেমন ভাল হবে না?'

বলিতে বলিতেই তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। 'তোমাকে সব সময় কাছে পেয়ে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তোলবার এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বল? সরিৎবাবু তোমাকে ভালবাসেন, তিনি উদার মহৎ, তোমার সেবার অধিকার থেকে তিনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।' বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হরিৎ এ কয় দিন কত কথাই চিন্তা করিয়াছে। সরিতের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে কেয়া সানন্দে সম্মতি দিয়াছে, বিবাহও প্রায় স্থির হইয়া আসিল শুনিয়া প্রথমে বিস্ময় পরে বেদনায় সে অভিভূত হইয়াছিল। পরে তাহার চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক হইয়া আসিল। তাহার এ বেদনা কেন? কিসের এ অতৃপ্তি? সে এ কি চিন্তা করিতেছে? এই যে তরুণী, পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী যাহার দেহমনের কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সে কি তাহার মত এক জন মৃত্যুপথযাত্রীকে ভালবাসিতে পারে? জীবনে কেয়াকে সে কি দিতে পারিবে? তাহার জীবনে তো মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, জীবনে লেন-দেন মিটাইয়া দিবার তাহার তো আর বিলম্ব নাই। তাহার এই স্বল্পপরিসর জীবনের সঙ্গে অন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনের মিলনাকাঙ্ক্ষা কি তাহার বাতুলতা নয়? এই ঠিক, এই স্বাভাবিক, এই কল্যাণ হইয়াছে! সরিৎ বড় ভাল ছেলে, কেয়া তাহাকে পাইয়া সুখী হইবে, আর সে-ও জীবনের বাকী কয়টা দিন কেয়াকে চোখে দেখিতে পাইবে, তাহার মত নিরানন্দ জীবনের এই কি যথেষ্ট লাভ নয়?

সে কেয়ার হাত ধরিয়া বলিল, 'তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী হব কেয়া!'

'হাঁ, আমি সুখী হব। তোমাকে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলতে পারলেই আমি সুখী হব। আমি তো জানি, সেখানে তোমাকে মমতা করবার কেউ নেই, আমি কাছে না থাকলে তোমাকে দেখবে কে?'

এতক্ষণে হরিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'তা হ'লে তুমি আমাদের একান্ত আপন হবে কেয়া! আমাদের ঘরের বউ হবে তুমি! আমার কত আদরের জিনিস হবে!'

কেয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, হরিৎ স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ও সরিতের সম্মতি জানাইয়া কালীপদবাবু শরৎবাবুকে চিঠি লিখিলেন, শরৎবাবুও সাগ্রহে বিবাহে মত দিলেন। দেনা-পাওনার গোলমাল মিটিয়া গিয়া বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বৈশাখ মাসের শেষ ভাগেই বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। ইহার দুই-চারি দিন পরেই সরিৎ হরিৎকে নিতে আসিল। তাহাদের যাত্রার তোড়-জোড় আরম্ভ হইল। জিনিসপত্র প্যাক করিবার ঠুক্ ঠাক্ শব্দ কেয়ার বুকে আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল। সে আজকাল ও-বাড়ীতে বড়-একটা যাইত না, মাঝে মাঝে জানালা খুলিয়া দেখিত, হরিৎ ইজিচেয়ারে বসিয়া জানালার দিকে চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িতেই কেয়া মুখ ফিরাইয়া লইত, হরিতেরও বুক কাঁপাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত।

যাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তোলা হইল। সদর দরজার পর্দ্দা সরাইয়া কেয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কালীপদবাবু ও মণিকা গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। 'ফ্লাস্কে গরম দুধ আছে, এক ঘণ্টা পরে হরিৎকে এক গ্লাস খেতে দিও; বেদানা আঙুর ওই ঝুড়িটায় আছে।

বিস্কুটের বাক্স বাস্কেটের মধ্যে আছে, ওর যেন কষ্ট না হয় সরিৎ, সব দেখেশুনে নাও।'

হরিং তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইয়া গাড়ীতে উঠিল, 'নিরোগ দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া মণিকা তাহার চিবুক চুম্বন করিলেন।

বাড়ীখানা আবার শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করে, কখনো দম্‌কা হাওয়ায় দরজা জানালাগুলো যেন কিসের বেদনায় মাথা খুঁড়িতে থাকে। মণিকার কানে যেন হরিতের বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্বর প্রতি মুহূর্ত্তে আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে, 'আর ত ওদিকে চাইতে পারি নে কেয়া, কি মায়াতেই বাছা বেঁধে রেখে গেছে! ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন, তবে তো আবার দেখব।'

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি তাঁহার মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিতেন সে হয়ত তখন বাগানের এক পাশে বসিয়া গোপনে চোখের জল ফেলিত।

মণিকার অবসরকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, বিবাহের গোলযোগ লাগিয়া গেল। আত্মীয়কুটুম্ব আসিয়া গৃহ পূর্ণ হইল। কর্ম্মব্যস্ত মণিকার মন হইতে হরিতের অনুপস্থিতির বেদনা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। তবু তিনি যখন-তখন মেয়েকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে শাশুড়ী তার বড় দজ্জাল,' সতীনপো ব'লে হরিৎকে বড় হেনেস্তা করে, কেয়া যেন তার যত্ন করে, কখনো যেন বাছার অযত্ন না হয়।

বিবাহের দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, বিবাহের আয়োজন যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, কেয়ার অন্তর ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কেন তাহার এ ব্যাকুলতা? বিবাহে ত সে স্বেচ্ছায় মত দিয়াছে! তবে সেই বিবাহের আয়োজন দেখিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া পড়ে কেন? তবে সে কি চাহিয়াছিল? সে কি ইহা চাহে নাই? অন্তরের নিভৃত স্থানে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কেয়া শিহরিয়া উঠে, না—না—না, সে ইহা চাহে নাই, তাহার কণ্ঠ যেন সমস্ত জগতের সম্মুখে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে চায়, সে ইহা চাহে নাই। তবে সে কি চাহিতে কি চাহিয়াছে? তাহার জীবনে সে এ কী ভুল করিয়া বসিল? এ ভুলের পরিসমাপ্তি কোথায়? জীবনের এই ভুল পথ, পথ দেখাইয়া তাহাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? না না, সে এ ভুল পথ ধরিয়া চলিবে না, সে তাহার পথের পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? ওগো, কে বলিয়া দিবে সে যাহা চায়, কেমন করিয়া তাহা পাইবে? কেয়ার সম্মুখেই সরিতের লেখা একখানা চিঠি পড়িয়া আছে, কলিকাতায় গিয়া হরিতের জর কাসি দুই-ই বাড়িয়াছে, সে আবার শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। চিঠিখানার উপর চোখ পড়িতেই কেয়ার দুই চোখ জলে ঝাপসা হইয়া আসিল। এ ত সে জানিত, হরিৎও কত বার বলিয়াছে, কেয়ার কাছ ছাড়া হইলে সে বাঁচিবে না। তবে? তবে—কেয়া ত ভুল করে নাই, ইহাই সে চাহিয়াছিল। জীবনে যত ক্ষতিই আসুক, হরিৎকে সে হারাইতে পারিবে না। পৃথিবীর বুক হইতে কিছুতেই সে তাহাকে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে দিবে না।

অসুখ তাহার বাড়িয়াছে, খালি ঘরে পড়িয়া সে ছটফট্ করিতেছে, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ দিনটিকেই কেয়া একান্ত মনে আরাধনা করিতে লাগিল। সেদিন যাতনায় তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া যদি বন্ধ হইয়া যায়, যাক্—তবু সেই দিনটিই তার বাঞ্ছিত, সে আর দেরি করিতে পারে না। আজ এই এখনই যদি সে শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, কেয়ার মনে এতটুকু দ্বিধার উদয় হইবে না। হরিতের কাছে গিয়া সে তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিবে, 'ভয় কি? এই যে আমি আসিয়াছি, এখন তুমি আবার ভাল হইয়া যাইবে—'

অভিমান করিয়া হরিৎ যদি বলে 'এত দেরি করিয়া আসিয়াছ কেন? আমার ত মহাযাত্রার আর বিলম্ব নাই—'

কিন্তু এক পা বাড়াইবার উপায় নাই, তাহার বুকখানা কাঁপিয়া ওঠে। ভগবন্, এই বেপথুমতি বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য জগতে কোনো উপায়ই কি সৃষ্টি হয় নাই?

* * *

বিবাহের দিন আসিল। যে-বাড়ীতে হরিৎ আসিয়াছিল, বরযাত্রী সে-বাড়ীতেই আসিয়া উঠিল। কালীপদ বাবু ভালরূপ চূণকাম করাইয়া ও ওষুধপত্র দিয়া ধোয়াইয়া বাড়ী বিশোধিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সালঙ্কারা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য যখন সভায় লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে মুখে যেন প্রাণচিহ্ন ছিল না, শবের মত সে মুখ একেবারে ভাবলেশহীন দেখাইতেছিল। বিবাহ হইয়া গেল, বাসরঘরে প্রবেশমাত্র চেতনা হারাইয়া কেয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

অনেক কষ্টে তাহাকে খানিকটা সুস্থ করিয়া তোলা হইল। বাসরঘরের সমস্ত আমোদ-প্রমোদ মাটি হইয়া গেল। সরিৎ পাখা-হাতে সমস্ত রাত্রি তাহার শিয়রে বসিয়া রহিল।

সরিৎ সেই বেদনা-কাতর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। কতবার তাহার মনে হইল যে চুম্বনে চুম্বনে সেই সংজ্ঞাহারার বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে সে রক্তসঞ্চার করিয়া দিবে, গভীর আলিঙ্গনে সেই চেতনাহীন দেহে চেতনা সঞ্চার করাইয়া দিবে, কিন্তু সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করিয়া সে রোগিণীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল।

পরদিন বরকনে কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও কেয়াকে যাইতে হইল। একেই কোলের মেয়ে কেয়া চলিয়া যাইতে মণিকার খুব কষ্ট হইল, তাহার উপর তাহার এই অসুস্থতায় তাঁহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। যুক্তকরে তিনি ভগবানের চরণে কন্যার কল্যাণ কামনা করিলেন।

৮

কলিকাতায় শরৎবাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকা নানা বর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর মত শোভা পাইতেছিল। ফটকের সম্মুখে নহবৎ বসিয়াছে, নানারূপ পত্রপুষ্পে ফটকটি সাজানো হইয়াছে। সেখানে বিচিত্র বর্ণের আলোকমালায় 'আসুন' লেখা হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন দাসদাসীতে বাড়ী একেবারে গমগম্ করিতেছে।

এই আনন্দোৎসবে হরিৎ যে বাড়ীতে আছে, ইহা প্রমদার একেবারেই সহিতেছিল না। এ বিষয়ে স্বামীর উপর তাঁহার অভিযোগের অন্ত ছিল না—'এই হৈচৈতে কি আর রুগী থাকতে পারে গা? ক'দিন থেকে ওর অসুখও তো বেড়েছে। ছিষ্টির লোকই এ সব রোগ হ'লে হাসপাতালে যায়। ওকেও হাসপাতালে পাঠালে কি এমন ছিষ্টিছাড়া কাজ হ'ত? ও-ও ভাল থাকত, আমরাও নিশ্চিন্দি হতুম। কিন্তু আমার কথা ত তুমি শুনবে না, আমি সৎমা, ওর শত্তুর; কিন্তু চিরটা কাল ওর জন্য খেটে খেটে দেহ আমার কালি হ'ল।' বলিয়া তিনি চোখে আঁচল দেন।

শরৎবাবু বলেন, 'জানোই ত হাসপাতালে যেতে ওর কত আপত্তি; এই রোগী, যে যেতেই বসেছে, তাকে জোর ক'রে কি ক'রে হাসপাতালে পাঠাই বলতো? ডাক্তার বলেছিলেন গোপালপুর পাঠাতে, তুমিই তো মত করলে না, বললে অত টাকা খরচ ক'রে কি হবে, এ রোগ তো সারবার নয়। এ রোগী আর বেশী দিন নেই গো নেই, একটা লাঙ্গস্ তো গেছেই, আর একটাও ধরেছে ডাক্তার বললেন।' বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে সরিয়া যান।

'তাঁহার কপালই মন্দ' এই অনুযোগ করিতে করিতে স্থানান্তরে গিয়া প্রমদা ছোট-জাকে লইয়া পড়েন, 'হ্যাঁ লা মিনি, এই কি আলপনার ছিরি হ'ল? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে আমার, তার বিয়েতে একটু ভাল ক'রে আলপনাও কি দিতে নেই?'

সেখান হইতে আগুন হইয়া আর দুই-চারি পা অগ্রসর হইতেই আর এক অনাচ্ছিষ্টি ব্যাপার তাঁহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল তিনি কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া দাসদাসীকে বকাবকি করিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিলেন। ভৃত্য কেনারাম আসিয়া তাঁহার ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিল। 'বড় দাদাবাবুর জন্য ডাক্তার এসেছে, ছোটদাদা বাবু ভিজিটের ৩২৲ টাকা চাইলেন।'

পরম ছাড়িয়া কণ্ঠ চরমে উঠিল, 'কি গেরোই হয়েছে আমার! এ আপদ মরেও না, তরেও না। বাঁচবেই না ত জানা, অত টাকা ঢালাই বা কেন বাপু? সরিৎকে আমার পথে না বসিয়ে ও কি আর চোখ বুজবে? সাত জন্মের শত্তুর।'

ভৃত্যের দেরি দেখিয়া সরিৎ আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'ছিঃ মা, দাদার জীবনের চেয়ে কি টাকা বড়?'

ক্রুদ্ধ হইয়া মা বলেন, 'এই তো রাঁচি নিয়ে গিয়ে এক কাঁড়ি টাকা ঢেলে এলে, রোগ কি সারল? দেবের অসাধ্যি রোগ, মিথ্যে কেন টাকা নষ্ট?'

'তবু তো চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে মা?'

'পরশুই তো ডাক্তার এসেছে, আবার আজ কেন? ডাক্তার বেটে খাওয়ালেই রোগ সারবে?'

'বাবা, কাকা, আমি সব আজ রাঁচি চলে যাচ্ছি··· যাবার আগে একবার ডাক্তার দেখানো ভাল। বিশেষ জ্বরটা বেশী, ১০৪ দেখে এলুম।'

আঁৎকাইয়া উঠিয়া প্রমদা বলে 'অ্যাঁ! তুই আবার সে ঘরে গিয়ে রুগী ঘাঁটছিস্। কিছুতেই কি আমার কথা শুনবি নে? আমায় ধনে প্রাণে শেষ করলে গো! যা, যা, এক্ষুণি চান ক'রে আয়। আজ তুই যাবি বিয়ে করতে, আজ গেছিস্ কিনা ঐ রোগীর সেবা করতে!'

* * * *

যেদিন সন্ধ্যায় বরকনে ফিরিয়া আসিবার কথা, শরৎবাবুর বাড়ীতে বধূবরণের নানারূপ আয়োজন হইতে লাগিল। সন্ধ্যা আসিবার পূর্ব্বেই প্রমদা তাহার ভারী ভারী গহনায় ভারী দেহ আরও ভারী করিয়া তুলিলেন। হাত-কাটা সাটিনের জামা ও বেগুনে বেনারসী শাড়ী

পরিয়া পিঁড়ির উপর বসিয়া বরকনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকম মেয়ে নানান্ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রঙীন প্রজাপতির মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দূরে ব্যাণ্ডের বাজনা শুনা গেল। 'বৌ এসেছে' 'বৌ এসেছে' বলিয়া চারি দিকে সোরগোল পড়িয়া গেল। 'উলু দে' 'শাঁখ বাজা' 'বরণডালার পিদ্দিমটা একটু উস্কে দে না ভাই' 'উনুনে হাওয়া দে, দুধ যেন ঠিক্ সময় উৎলায়' 'ও খেন্তি, বাজনাওলাকে একটু ভাল ক'রে বাজাতে বল্ না,' এই সব কোলাহলের মধ্যে বউ আসিয়া পৌঁছিল।

টোপর-মাথায় সরিৎ পশ্চাতে গাঁটছড়া-বাঁধা বধূকে লইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। 'বেশ বউ হয়েছে' 'সরিতের তুলনায় আরেকটু ছোট হ'লে ভাল মানাত' 'ঠিক্ সময় দুধ উৎলিয়েছে, বউ তোমার পয়মন্ত হবে খুড়ি,' 'বউ এত বেজার কেন গো? বাপ মা ছেড়ে এসেছে ব'লে বুঝি? তা' বাছা ছোট মেয়ে ত নও যে এখনো বাপ মার কোলে থাক্‌বে' 'রাঁচি ত এই কাছের গোড়ায়, যাবে বইকি মায়ের কাছে, এই ত জোড়েই যাবে', এই সব অনুকূল, প্রতিকূল মন্তব্যের মধ্যে বধূবরণ হইয়া গেল।

তখন বউ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ দিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু সরিৎ বলিল, বধূর শরীর ভাল নয়, তাহাকে এখন কিছু আহার করাইয়া বিশ্রাম করিতে দিলে ভাল হয়। অবশিষ্ট ব্যাপার কাল সকালে সম্পন্ন করিলেই চলিবে।

প্রবীণারা বধূর প্রতি ছেলের এই কারুণ্যে অসন্তুষ্ট হইয়া মুখ বাঁকাইল। কিন্তু ছুক্‌রী মেয়ের দল খুশী হইয়া বধূকে ছোঁ মারিয়া বৃদ্ধাদের আবহাওয়া হইতে দূরে লইয়া গেল।

'ওই যে কাপড় ছাড়বার ঘর নতুন বৌদি, ওখানেই তোমার তোরঙ্গ আছে, এই নাও চাবি। ওর পাশেই গোসলখানা, তুমি চান্ ক'রে কাপড় বদ্‌লে এস, আমরা এখানেই রইলুম।' বধূকে ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া তাহারা দরজা টানিয়া দিল।

৯

শ্বশুরবাড়ীতে পা দিয়াই হরিতের সংবাদ জানিবার জন্য আর তাহাকে দেখিবার জন্য কেয়ার সমস্ত মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কাপড় ছাড়িবার ঘরে ঢুকিয়া ঘোম্‌টার সেপটিপিনে হাত রাখিয়া সে কি ভাবিল, তার পর পাশের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সে দিকটা বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগ, সেখানে ঝিয়েরা বসিয়া বাসন মাজে, দিনের বেলাতেই সেখানে জনসমাগম কম হয়, এখন ত একেবারেই নির্জ্জন ছিল। প্রচুর জন-সমাগম হইতে একান্তে এই খোলা হাওয়ায় আসিয়া সে যেন প্রচুর শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবনীশক্তি ফিরিয়া পাইল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, তেতলার ছাদে এক পাশের একখানা ঘরের উন্মুক্ত জানালা দিয়া ক্ষীণ নীল আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সে লোহার সিঁড়ি বাহিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল।

তাহার অনুমান সত্য, সেই ঘরেই হরিৎ শুইয়া আছে, যে ভৃত্যটি তাহার সেবা করে, বধূবরণের আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে সে-ও বাহির হইয়া গিয়াছে। কেয়া গিয়া হরিতের কাছে বসিল। দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। দু-কশ বাহিয়া দু-ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের জলে কেয়ার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। প্রায় এক মাস আগে এক রকম সুস্থ অবস্থায় যাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছে আজ তাহার এই অবস্থা!

কিন্তু আর ভয় নাই, সে আসিয়াছে, এখন হরিৎ আবার ভাল হইয়া উঠিবে। তাহার জীবনে যাহা সে ভুল করিয়াছে ভাবিয়া তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে-ছিল, তাহা ভুল নয়, তাহা সত্য, একান্ত সত্য, তাহাতে ভুলের বাষ্প পর্য্যন্ত নাই।

বেনারসীর আঁচল দিয়া সে হরিতের ঠোঁটের রক্ত ও কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। হরিৎ চক্ষু চাহিয়া দেখিল। নীরবে তাহার হাতখানা হাতে তুলিয়া লইল।

এ-দিকে নূতন বধূর লোভনীয় সঙ্গ লাভের আশায় চ্যাংড়া মেয়ের দল সেই স্নানের ঘরের সম্মুখেই ঘুর্ ঘুর্ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অতীত হইলেও বধূ যখন বাহির হইল না তখন দরজা ঠেলিয়া তাহারা দেখিল অন্য দিকের দরজা খুলিয়া বধূ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

তাহারা তীর্থকাকের আশায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছে আর বধূ হয় ত এতক্ষণ প্রবীণাদের হাতে পড়িয়া এই গরমে একগলা ঘোমটা টানিয়া কত নিগ্রহই ভোগ করিতেছে ভাবিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহারা বধূকে খুঁজিতে গেল।

কোলাহলময় প্রকাণ্ড বাড়ীতে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা বধূকে যেখানে পাইল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তেতলায় একটেরে একখানা ঘরে, রঙীন কাগজের শেড দিয়া আলো কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে,

মাথার উপরে আস্তে আস্তে পাখা চলিতেছে, সেই প্রায়ান্ধকার গৃহে বিশৃঙ্খল শয্যায় হরিৎ চক্ষু বুঝিয়া শুইয়া আছে, আর লাল বেনারসী পরিহিতা, সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারভূষিতা কনেবউ তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার কপালের সিন্দুরের ফোঁটা ও সজ্জিত চন্দনবিন্দু জল জল করিতেছে, কিন্তু চোখের জলেই বোধ হয় গণ্ডের চন্দনবিন্দু মুছিয়া গিয়াছে। মাথার মুকুট এক পাশে হেলিয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় এখনই খসিয়া পড়িবে, গলার ফুলের মালা কেমন করিয়া ছিন্ন হইয়া হরিতের বালিশের উপরে লুটাইতেছে।

ঘরে দস্তুরমত জনতা জমিয়াছে, যেন সেখানে কৌতুকাবহ কোন দর্শনীয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রমদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, 'যত সব অলক্ষ্ণে কাণ্ড! বিয়ের কনে, সকলে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে বউ দেখবে ব'লে, বউ এসে বসেছে এক ঘাটের মড়ার কাছে। যেমন আমার বরাৎ—'

খুড়ি, মাসী, মামী যাহারা আসিয়াছিল সকলেই তাঁহার মন্দ ভাগ্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

সকলের শেষে আসিয়াছিল সরিৎ, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কি একটা অঘটন ঘটিয়াছে ভাবিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেয়ার সেই আনত, অশ্রুকলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে কি বুঝিল সে-ই জানে, কিন্তু মা'কে বাধা দিয়া বলিল, 'কেন বকাবকি করছ মা! দাদাকে প্রণাম করতে আমিই ওকে পাঠিয়েছি। দাদা উঠে যেতে পারেন না, ওর কি এটা কর্ত্তব্য নয়?'

কেয়া এতক্ষণ যেন নিবিড় অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন সেখানে জনতার সৃষ্টি হইল ও বধূর এই কার্য্যের উপর তাহারা অসংযত ভাবে নিজেদের রসনা চালাইয়া দিল, তখন কেয়া ভয়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিবার তাহার কিছুই নাই, তাই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, মনে হইতেছিল কোন্ মুহূর্ত্তে সে সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া যাইবে।

সরিতের কণ্ঠস্বরে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, এই সঙ্গীন অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইল দেখিয়া সরিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ পরে সে তাহার অশ্রুসজল আনতনেত্র তুলিয়া সরিতের মুখের দিকে চাহিল।

সরিৎ আবার কিছুক্ষণ তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর 'রোগীর ঘরে এত ভীড় কেন' বলিয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। বিয়ে হইতে না-হইতেই সরিৎ যে আস্ত ভেড়া বনিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া, প্রকাশ্য ভাবে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তাহারা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সরিৎ কেয়ার কাছে গিয়া বলিল, 'উঠে এস কেয়া, গরম শাড়ীগুলো ছেড়ে চান্ ক'রে কিছু খেয়ে নাও, তার পর তুমি আর আমি এসে দাদার কাছে বসব।' কেয়া নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল, তেমনই নিঃশব্দে সরিতের বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

১০

স্নানাহারের পরে সরিৎ কেয়াকে সঙ্গে লইয়া হরিতের ঘরে আসিয়া বলিল, 'তুমি দাদার কাছে বোস, আমি ডাক্তারকে কাল সকালে আসবার জন্য ফোন ক'রে আসছি।'

কেয়া ফলের রস করিয়া একটু একটু রোগীর মুখে দিতে লাগিল, সরিৎ বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত রাত তাহারা হরিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল, এবং দুই জনের সহযোগিতায় দুই জনে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'বড্ড তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে যাচ্ছে। রাঁচি থেকে যখন এসেছিলেন, সে অবস্থার সঙ্গে এখন তুলনাই হয় না। রোগীর শেষ হ'তে বিশেষ দেরি নেই, বিশেষ সতর্ক থাকবেন।'

সরিৎ কেয়াকে সব খবর জানিতে দিল না, বলিল, 'ভাল হয়ে যাবেন, ভয় নেই কিছু।' কিন্তু সে বাড়ীর আনন্দ-কোলাহল একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। পরের দিন ফুলশয্যার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল ও বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সরিৎ সে উৎসবও বন্ধ করিয়া দিল। প্রমদার চোখের জল, মুহুর্মুহু কপালে করাঘাত, করুণ বিলাপধ্বনি, এরূপ দুরদৃষ্ট সৃজনের জন্য বিধাতাকে বিধিমত নিন্দা, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল, সরিৎ কোন আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে সম্মত হইল না। বলিল, 'দেখছ মা, পরের মেয়ে যার সঙ্গে দাদার এতটুকু রক্তের সম্পর্ক নেই, তাদের বাড়ীর কাছে দু-চার মাস থাকার জন্য যে সামান্য পরিচয়, তাইতেই কর্ত্তব্যবোধে সে দাদার জন্য কত করছে, আর এক পিতার সন্তান

হয়ে আমি এত দিন কি করেছি? আমাদের অবহেলার জন্যই কি দাদা এত বেশী কাতর হয়ে পড়েন নি? দাদার জীবন থাকতে এ গ্লানি মুছে ফেলতে দাও মা, নয় ত চির-জীবন অনুতাপ ভোগ করতে হবে, জীবনেও শান্তি পাব না মা!'

ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমদা একটা কুমড়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন, আর তার অমন সোনার ছেলেকে বেয়ান মাগী এই ক'দিনে যে তুক্ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিয়া মনের ঝাল মিটাইবার চেষ্টা করেন। অন্যতম আসামী পোড়া বিধাতাও তাঁহার কোপানলে অহর্নিশ দগ্ধ হইতে লাগিল।

ম্লানমুখে আত্মীয়-স্বজন স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। ফুলশয্যা-উৎসবের জন্য সংগৃহীত স্তূপাকার মাটির গেলাস খুরি দু-একটা করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল—রাশীকৃত কলা-পাতা শুষ্ক হইয়া চারি দিকে উড়িতে লাগিল।

ননদেরা বউকে ছাঁকিয়া ধরিল, তোমাদের ত ভাই ফুলশয্যাই হ'ল না। কোথায় কি ক'রে ভাবটাব করলে বলই না একটু।'

কেয়ার মুখের ম্লান হাসিটুকুও নিবিয়া যায়, সে বলে, 'ভাব ত ভাই আগেরই ছিল, নতুন দেখা ত নয়।'

বধূর অরসিকতা দেখিয়া ননদেরা মুখ টিপিয়া হাসে, 'কি ন্যাকা তুমি নতুন বৌদি! জান বুঝি কেবল যক্ষ্মারোগীর সেবা করতে আর ডুবে ডুবে জল খেতে।'

হরিৎকে লইয়া জীবনমৃত্যুর একটা সংগ্রাম চলিতে লাগিল। স্নানাহার ভিন্ন সরিৎ ও কেয়া সমস্তক্ষণ সেই ঘরে কাটাইতে লাগিল। সমস্ত প্রাণের মমতা, ব্যগ্রতা ঢালিয়া কেয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সরিৎ তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

কখনও ক্ষীণকণ্ঠে হরিৎ ডাকে, 'সরিৎ!' সরিৎ মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলে, 'কেন দাদা?'

'কেয়া ছেলেমানুষ, সব সময় এ ঘরে রোগীর সেবা নিয়ে থাকলে ওর শরীর ভাল থাকবে কেন? ওকে একটু খোলা জায়গা থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আয়।' কেয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়, সরিৎ বলে, 'তুমি একটু ভাল হলেই ও বেড়াতে যাবে দাদা! তুমি ভেবো না।' 'ভাল কি আমি হব?' হরিতের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে; চকিতে কেয়ার দিকে তাকাইয়া সরিৎ বলে, 'নিশ্চয়ই হবে, আর একটু ভাল হলেই তুমি আমি আর কেয়া ওয়ালটেয়ার চলে যাব। কেয়া সব সময় তোমার কাছে থাকবে, তোমার খুব ভাল লাগবে না দাদা?'

'হ্যাঁ, বলিয়া ক্লান্তিতে রোগীর চক্ষু মুদিয়া আসে। জামাই মেয়েকে জোড়ে পাঠাইবার জন্য কালীপদবাবু শরৎ-বাবুকে ও মণিকা প্রমদাকে চিঠি লিখিলেন। প্রমদা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, 'সংসারের কথায় আর আমাকে কেন, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি দাসীবাঁদী বই ত নই।'

সরিৎ কেয়াকে বলিল, 'কি করবে কেয়া, যাবে?' কেয়া অসহায় দৃষ্টিতে সরিতের মুখের দিকে চাহিল, সরিৎ তাড়া-তাড়ি বলিল, 'না—না, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে যেতে বলছে না। এই ত সবে মা বাবাকে ছেড়ে এসেছ, হয়ত মন কেমন করে, তাই বলছিলাম দু-এক দিনের জন্য গিয়ে ঘুরে আসবে কি?'

কেয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'না থাক্।' তার পর হঠাৎ বলিল, 'তুমি বরং এক বার গিয়ে ঘুরে এস।'

সরিৎ হাসিয়া বলিল, 'আমাকে দেখলে কি আর তাঁরা তেমন খুশী হবেন? তোমাকে দিয়েই না আমার সঙ্গে সম্পর্ক?'

সহসা কেয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সরিৎ থামিয়া যায়, তাহার উজ্জ্বল মুখের উপর যেন বিপদের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, সরিতের মুখের হাসি মিলাইয়া যায়, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া যায়।

১১

সরিতের বিবাহের পরে প্রায় পনর দিন চলিয়া গিয়াছে। সরিৎ বলিয়াছিল হরিৎ একটু ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো উৎসব হইবে না, কিন্তু হরিতের পীড়ার উপশম হওয়ার কোনোই লক্ষণ দেখা গেল না।

প্রমদা ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। সরিৎ বলিল, 'কেন এত তাড়াহুড়ো করছ মা! বউ-ও রয়েছে, কলকাতার দোকানে ফুলেরও কোনো অভাব নেই। একদিন হ'লেই হবে। যাকে ঘরে আন্‌বার জন্য তাড়া ছিল, সে ত এসেই গেছে।'

অবশেষে এই স্থির হইল, উৎসব-আয়োজন কিছুই হইবে না, শুধু অনুষ্ঠানটুকু বজায় রাখিয়া উহাদের ফুলশয্যা হইয়া যাইবে। অগত্যা সরিৎ সম্মতি না দিয়া পারিল না।

প্রমদা কোনা বাধা না মানিয়া রাশি রাশি ফুল আনিয়া ফেলিলেন। আমোদের গন্ধ পাইয়া যুবতী কুটুম্বিনীগণ আসিয়া জুটিল। তাহারা রোগীর ঘর হইতে কেয়াকে
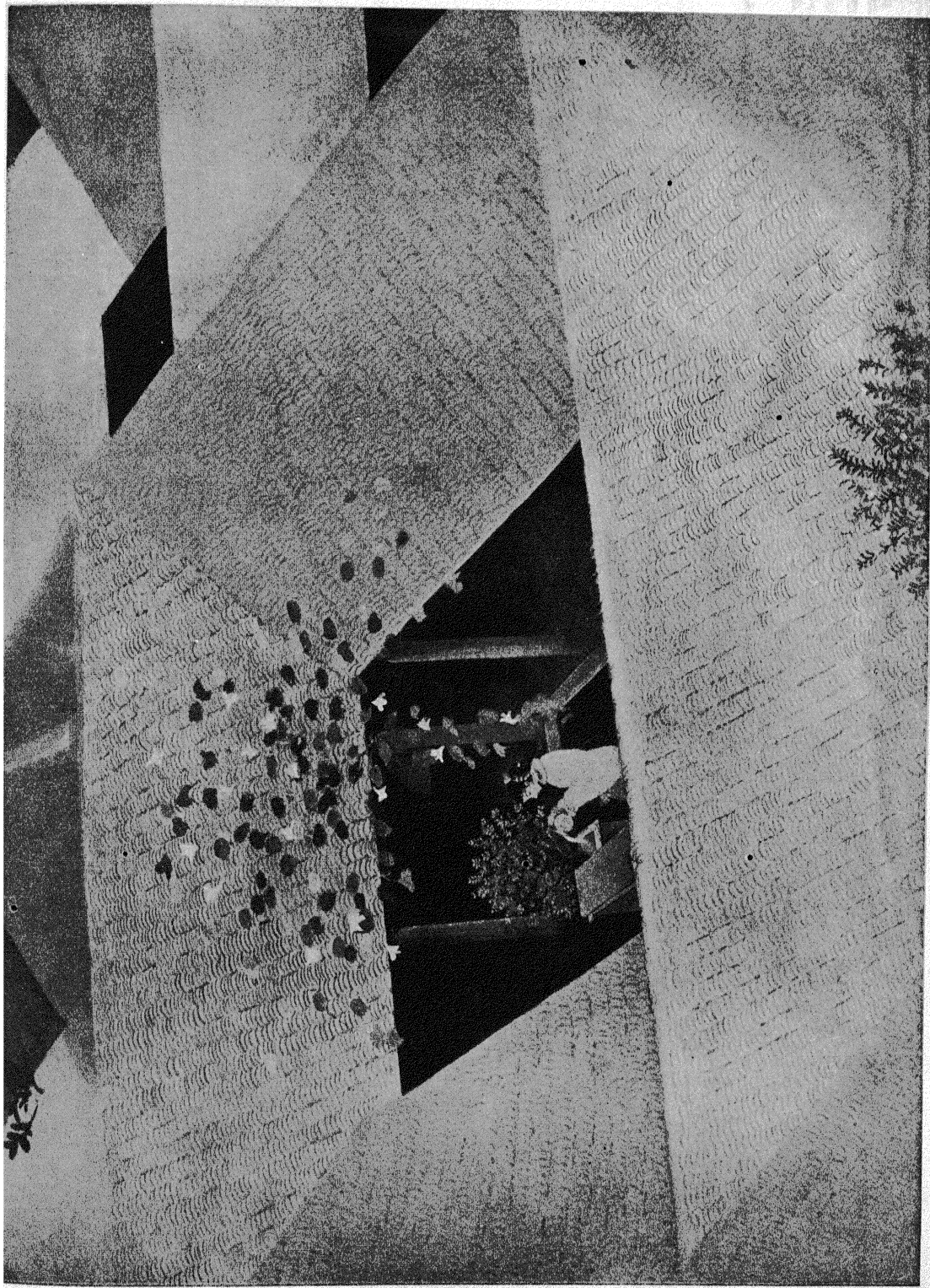
তুলসী মূলে
শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা,

টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, তাহাকে স্নান করাইয়া চুল বাঁধিয়া দিল। কেউ পায়ে আলতা পরাইয়া দিল, কেউ চন্দন ঘষিয়া ললাট সজ্জিত করিয়া দিল। কেহ কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়া মুখখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল, 'সাধে কি আর সেজ-দা ভেড়া বনেছেন? আমরাই যে ভেড়ী বনতে পারি।' কেয়ার বিরস মুখের উপর ঠোনা মারিয়া কেহ বলিল, 'থাক্, থাক্ আর অত নকল গাম্ভীর্য্যের কাজ নেই। এই দিনটির জন্য যে ঘণ্টা গুনছিলে, সে সবাই জানে।'

এই সব রহস্যালাপের মধ্যে তাহারা কেয়াকে বেনারসী পরাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা পরাইয়া দিল। ফুল দিয়া বিছানা ও গৃহ সজ্জিত করিল। তার পর কেয়াকে বিছানার উপরে বসাইয়া তাহারা সরিৎকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। সরিতের সমস্ত ওজরআপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই নারীসৈন্যদল তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া চন্দনে ললাট সজ্জিত করিয়া দিল। তার পর দু-জনকে পাশাপাশি বসাইয়া যখন তাহারা আতর ছিটাইয়া দিতেছিল, সেই সময় একটা আতঙ্কের কোলাহল শোনা গেল। হৈ-চৈ কোলাহলের মধ্য হইতে এইটুকু বোঝা গেল যে হরিতের প্রবলভাবে রক্ত বমি হইতেছে। তাহার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।

কেয়ার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল, কিন্তু পারিল না। টলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সরিৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তার পর কেয়াকে সযত্নে ধরিয়া রোগীর ঘরের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। কেয়ার বেনারসীর সোনালী আঁচল ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চলিল। ফুলের গহনা হইতে দুই-একটি ফুল টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সরিৎ কেয়াকে লইয়া হরিতের গৃহে গিয়া দেখিল, পূর্ব্বেই গৃহে ভীড় হইয়াছে। হরিতের শয্যার সম্মুখে এক ডাবর টাটকা রক্ত টক্ টক্ করিতেছে। দুই কশ বাহিয়াও রক্ত পড়িতেছে। চক্ষু বুজিয়া হরিৎ পড়িয়া আছে। সম্মুখের লোক সরাইয়া দিয়া সরিৎ কেয়াকে হরিতের সম্মুখে বসাইয়া দিয়া ডাক্তারকে ফোন করিতে গেল।

ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরিয়া গেল। একটি ঘরের একটি বাতিও নিবিল না, একটি প্রাণী চক্ষু বুঝিতে পারিল না, সমস্তটা বাড়ী যেন আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়া থম্ থম্ করিতে লাগিল।

পরদিনও সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। কেয়াকে স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিতে আসিলে সরিৎ বাধা দিয়া বলিল, 'থাক্—ও যখন প্রয়োজন বুঝবে আপনিই উঠে যাবে।'

সন্ধ্যা আসিল, ঘরে ঘরে আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বিপদও যেন সহস্র বদন ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিল।

প্রতিমার মত কেয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না, মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তন হইল না। পরিধানে তাহার সেই রক্তবর্ণ বেনারসী, সর্ব্বাঙ্গ ফুলসজ্জায় সজ্জিত। ফুলশয্যা-রজনীর জন্য সে যেন প্রস্তুত হইয়া আছে, শুভ লগ্ন আসিলেই প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য উঠিয়া যাইবে।

সহসা হরিৎ চমকিয়া চাহিল, তার পর নিকটে উপবিষ্টা কেয়ার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সরিৎ ছুটিয়া আসিয়া কেয়ার কম্পমান দেহ ধরিয়া ফেলিল।

১২

চিতা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। গভীর রাত্রি, নিবিড় অন্ধকার, তাহার উপরে আকাশে মেঘ করিয়াছে, সেই মেঘের বুক চিরিয়া যে একটু আধটু বিজলী ঝলক দিতেছে, অন্ধকার দূর করিবার পক্ষে সে অতি সামান্য। চাঁদ তারা সবই মেঘের আড়ালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্তব্ধ শ্মশানভূমি, অদূরে শুধু গঙ্গার জলে স্নানার্থীদের দু-একটু শব্দ শোনা যাইতেছে।

শ্মশানযাত্রিগণ সকলেই গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছে, চিতা ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে সরিৎ আর পাশে দাঁড়াইয়া আছে কেয়া। তাহার পরিধানে ফুলশয্যার রাঙা বেনারসী, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। কপালের চন্দনরেখাও অশ্রুজলে পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে। পা দু'খানিতে অলক্তরাগ শুধু জল জল করিতেছে।

সহসা দমকা হাওয়ায় চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশাচর পক্ষী মাথার উপরে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সরিৎ ডাকিল, 'কেয়া!'

কেয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চিতার আগুন দেখিতেছিল, দৃষ্টি উঠাইয়া সরিতের মুখের দিকে চাহিল। অন্ধকারে সে দৃষ্টি দেখা গেল না।

সরিৎ আবার ডাকিল, 'কেয়া!'

কেয়ার কণ্ঠ আজ দুই দিন পর শব্দ উচ্চারণ করিল,

'চিতা তো নিবে এল, এখন কি করব?' সে কণ্ঠস্বর যেন কেয়ার নয়।

সেই অকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরিৎ চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই স্বল্পালোকিত শ্মশানভূমিতে আলোছায়ার যে লুকোচুরি চলিতেছিল তাহাতে মুখ ভাল দেখা গেল না, তাহার নেক্‌লেসের হীরকখণ্ড শুধু ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। সরিৎ বলিল, 'হাঁ চিতা নিবে এল, কিন্তু করবার কিছুই নেই।'

আবার দুই জনে চুপ করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া সরিৎ বলিল, 'আমাকে তোমার কিছুই কি বলবার নেই কেয়া?'

কেয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমার যে পরিচয় আপনি পেয়েছেন, সে আমার যথার্থ পরিচয় নয় সরিৎবাবু, আপনার কাছে আমি অপরাধিনী, আপনি মহৎ, আমি জানি আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।'

'অপরাধ তোমার নয় কেয়া, অপরাধ আমার অন্ধ দৃষ্টির। তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।'

'আপনি জ্ঞানী, আগে বলুন বিবাহের মন্ত্রের বন্ধন বড়, না প্রাণের বন্ধন বড়?' কেয়ার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সরিৎ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বড় শক্ত প্রশ্ন কেয়া, কিন্তু আমার মনে হয়, প্রাণের বন্ধনের চেয়ে বড় জগতে কিছু নেই। মন্ত্র মুখের ভাষা, তার যত বড় শক্তিই থাক, তাতে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হ'তে পারে, কিন্তু প্রাণের বন্ধন দৃঢ় হয় না। মন্ত্রের বন্ধনকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু প্রাণের বন্ধনকে উপেক্ষা করা যায় না।'

দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া চিতা নিবিয়া গেল। সেই নির্ব্বাপিত চিতার দিকে কেয়া একাগ্রে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অন্য এক জনের প্রাণে যে চিতাগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কেয়া বলিল, 'তবে—'

বাধা দিয়া সরিৎ বলিল, 'তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি। আর এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই; যে প্রশ্ন তুমি আজ আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এর উত্তর এক দিন তুমি তোমার নিজের কাছেই পাবে। কিন্তু এখন কি করবে? রাঁচিতে মায়ের কাছে যাবে? আমি নিজে গিয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ব।'

'রাঁচি?'—শিহরিয়া কেয়া বলিল, 'না রাঁচিতে আমি যাব না।'

'আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে? আমার দ্বারা তোমার এতটুকু অমর্য্যাদা হবে না, বিশ্বাস করবে আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—'

তখন পূর্ব্বাকাশে দিনের চিতা জ্বলিবার পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছিল। উষার শীতল সমীর উভয়ের ললাট চুম্বন করিল।

'তবে আমার সঙ্গেই চল' বলিয়া সরিৎ সযত্নে কেয়ার হাত ধরিল।

ওরে পাখী প্রাণভরে কাঁদ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিদ্বেষের গৃধ্নু তার শেষ হবে কোথা কোন্‌খানে?
দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিজড়িত দীনতার বিক্ষুব্ধ হতাশে—
রুধিরাক্ত আবর্ত্তের পথে চলা আহত নিঃশ্বাসে
থামিবে কোথায়! নীড়হারা বিহঙ্গম, তোরি গানে
ক্ষণে ক্ষণে জাগিল যে বিস্মৃতির পথ-পরিচয়।
মনে হয় এক দিন ছিলি তুই আর ছিনু আমি,
আনন্দের সমারোহে। অনুৎকণ্ঠচিত্ত দিবাযামী
তৃণাঙ্কিত প্রান্তরের প্রেমপুষ্প করেছে সঞ্চয়।

সেদিন উঠেছে চাঁদ স্পন্দমান সন্ধ্যাতারা সনে,
বনে বনে প্রভাতের একতারা বাজাতো বৈরাগী,
দুর্য্যোগের বজ্ররবে তারা আজ হয়েছে বিবাগী,
অন্ধকারে পথচলা কত দিন হবে সঙ্গোপনে!
বিক্ষোভের বাষ্পপুঞ্জে বাঁচিবার কেন এত সাধ?
মুমূর্ষু বিশ্বের পথে ওরে পাখী প্রাণভরে কাঁদ।

আরামবাগের উদ্ধারকল্পনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আরামবাগের মেলেরিয়া ও অন্নকষ্ট নিবারণ, দুইই গুরুতর সমস্যা। এই দুই সমস্যা দেশের বহুস্থানেই আছে। কিন্তু সকল স্থানেই সমস্যার পূরণ এক প্রকারে হইতে পারে না। আমি এখানে আরামবাগের দুঃখের প্রতিকার চিন্তা করিতেছি।

সমস্যা গুরুতর। এই কারণে গুরুতর প্রযত্নও করিতে হইবে। যে প্রযত্নদ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়, তাহার নাম উপায়। সে উপায় সুচিন্তিতপূর্ব হইলে কার্যসিদ্ধি হয়, নচেৎ অর্থব্যয় ও কালক্ষেপ অকারণ হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও পরীক্ষা, এই তিনের সাহায্যে উপায় নির্দেশ কর্তব্য।

ভূমি-পৃষ্ঠ

জেলাভাগ ও মহকুমাভাগ প্রায়ই কৃত্রিম। কোথাও পুরাতন ইতিহাস, কোথাও শাসন-সৌকর্য, এই বিভাগের মূল। আরামবাগ মহকুমা-বিভাগ এই দুই মূলের বহির্ভূত। মেলেরিয়া জেলাভাগ ও মহকুমাভাগ মানে না, অন্নকষ্টও মানে না। অতএব উপায় চিন্তা করিতে হইলে ভূখণ্ড নিরীক্ষণ কর্তব্য।

উত্তরে ও পূর্বে দামোদর, দক্ষিণে শিলাই, ও পশ্চিমে কোতলপুর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে রেখা করিলে উত্তর-দক্ষিণে ৪০ মাইল, পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল হয়। এই সহস্র বর্গমাইলের সর্বপ্রকার অবস্থা প্রায় একই। আরামবাগ নগর এই ভূখণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে। ইহাকে আরামবাগ বলা যাউক।

আরামবাগের মৃত্তিকা বহু পুরাতন। এত পুরাতন যে ভাগীরথীর পূর্বপারের বঙ্গকে শিশু বলিলেও চলে। মাটি এঁটেল, নদী-বাহিত পলি নয়। দ্বারকেশ্বরের খাত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, নদীটি সহজে পথ করিতে পারে নাই। বাঁকিয়া বাঁকিয়া উত্তরে চাঁপাই নাম পাইয়াছে। পূর্ব দিকে যাইতে না পাইয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। ইহার পুরাতন খাত এখন 'কানা দ্বারকেশ্বর' খানাকুল দিয়া দক্ষিণে গিয়াছে। দামোদরেরও সেই অবস্থা। পূর্ব দিকে যাইতে যাইতে পথ না পাইয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। ইহার প্রাচীন খাত এখন 'কানা দামোদর' হাওড়া জেলা দিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। শিলাই নদী পূর্ব দিকের পথে বাধা পাইয়া উত্তর মুখ হইয়াছে। বোধ হয় পূর্বকালে বঙ্গসাগরের এক শাখা ঘাটাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই কারণে ঘাটাল নাম হইয়াছে। ঘাটাল নামের অর্থ ঘাটবিশিষ্ট। ইহার দুই ক্রোশ দক্ষিণে 'বন্দর' নামে গ্রাম আছে। খানাকুল ও বীরসিংহের দক্ষিণাংশের সমুদ্রশাখা ভরাট হইয়া এখনও নিম্নজলাভূমি হইয়া রহিয়াছে। মুণ্ডেশ্বরী, কানা দ্বারকেশ্বর, আমোদর ও তারাজুলী নদীর পথ দেখিলেই বুঝা যায় দেশটি দক্ষিণ-পূর্বপ্লব।

পূর্বকালে দেশটি বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। বর্দ্ধমান নগর অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতার কূর্মবিভাগে বর্দ্ধমানের নাম করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্ট পঞ্চম শতাব্দে ছিলেন। কূর্মবিভাগ তাঁহার বহু পুরাতন। অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন, অনায়াসে বলিতে পারা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের নাম-অনুসারে এই নগরের নাম হইয়াছে। তখনও দামোদর বর্তমান পূর্বগামী খাতেই বহিত।

মেলেরিয়ার উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি

ইং ১৮৬৯ সালে বর্দ্ধমান হইতে মেলেরিয়া আরামবাগে প্রবেশ করে। বর্দ্ধমান-আরামবাগ পথ ধরিয়া আসে। শীতকালে আসে। পথের দুই পার্শ্বের গ্রাম প্রথম আক্রান্ত হয়। তাহার পর রোগটি পশ্চিমে ও পূর্বে ছড়াইয়া পড়ে। পশ্চিম দিকে ছড়াইতে কাল-বিলম্ব হইয়াছিল। মহামারি মেলেরিয়া গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ-মুখে ধাবিত হইয়াছিল। নদী-নালা বুজে নাই, রেল ও খাল হয় নাই। বর্ষাকাল নয়, শীতকাল। বোধ হয় বর্দ্ধমান হইতে মেলেরিয়া-রোগীর দেহে রোগ-বীজ আসিয়াছিল। রেলগাড়ীর কামরায় এবং নৌকা ও ষ্টীমারের খোলে মশা থাকে। কিন্তু এই দেশে রেলগাড়ী ছিল না, এখনও নাই। নৌকা কলিকাতা যাতায়াত করিত। কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় মেলেরিয়া ছিল না।

দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদীর তীরে বাঁধ ছিল। কিন্তু সে বাঁধ মহামারির পূর্ব হইতেই ছিল। ইং ১৮৫৫ সালের পূর্বে এখানে সেখানে বাঁধ ছিল। ইহার পরে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ নির্মিত হইয়া জল-নিকাশে বাধা হইয়াছিল। কিন্তু সে বাধা রোগের নিদান নয়।

মেলেরিয়া-প্রাজ্ঞেরা বলেন, মেলেরিয়া-বীজ যে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে, তাহার জর হয়। অর্থাৎ মেলেরিয়া আগন্তু জর। কিন্তু দেখা যায়, মেলেরিয়ার দেশের সকলেই মেলেরিয়ায় আক্রান্ত হয় না। ক্ষেত্র অনুকূল না হইলে বীজ নিষ্ফল হয়। মহামারির সময়েও দেখা গিয়াছিল, সকলেই মেলেরিয়ায় আক্রান্ত হয় নাই। আরও দেখা গিয়াছিল, নারী ও শিশু অধিক মারা পড়িয়াছিল। এক এক পরিবার নারীশূন্য হইয়াছিল, পুরুষদিগকে রাঁধিতে হইত। নারী ও শিশু দুর্বল। তাহারা সমুচিত আহার পাইত না। অতএব মেলেরিয়া-বীজই যে জরের কারণ, তাহা বলিতে পারা যায় না। অপর কারণ প্রতিরোধক শক্তির অভাব। সে কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি কোন আগন্তু রোগের হয় নাই।

মেলেরিয়া-প্রাজ্ঞেরা আরও বলেন, মেলেরিয়া-বীজ স্বয়ংভব নয়। ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে যায়। মশা বীজের বাহন। মশা নানা জাতি আছে। কোন কোন জাতি কেবল মানুষের রক্ত পান করে। অনেক জাতি মানুষ ও গোরুর রক্ত পান করে। সকল অঞ্চলে একই জাতি মেলেরিয়াবাহী নয়। আরামবাগে কোন্ কোন্ জাতি মেলেরিয়াবাহী, তাহা নির্ণয় হয় নাই। গবর্মেণ্ট দুই-তিন বৎসরের জন্য আরামবাগে এক মেলেরিয়া-প্রাজ্ঞ নিযুক্ত করিলে, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। সে মশার স্বভাব ও গতিবিধি জানিয়া কি করিলে মশাবৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহার উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন।

যদি মেলেরিয়া-রোগী না থাকে, তাহা হইলে মেলেরিয়া-বাহী মশা থাকিলেও কাহারও জর হইবে না। যদি শরীরে এমন রক্ত থাকে যাহাতে মেলেরিয়া-বীজ প্রবেশ করিলে বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে মশা সত্ত্বেও মেলেরিয়া ব্যাপ্ত হইবে না। অন্য দিকে যদি মেলেরিয়া-বাহী মশা না থাকে, তাহা হইলে রোগী থাকিলেও অন্যের হইবে না।

অতএব মেলেরিয়া দমনের তিন উপায়। (১) মেলেরিয়া রোগীর সদ্যঃসদ্যঃ চিকিৎসা। (২) মানুষের খাদ্যে পুষ্টিকর, বলকর ও ওজোস্কর পদার্থ থাকিবে। আর সেই বিশেষ পদার্থ, যদ্দ্বারা মেলেরিয়া-বীজ ধ্বংস হইতে পারে। (৩) মেলেরিয়াবাহী মশার ধ্বংস।

মেলেরিয়া বিনা যত্নে আপনা আপনি অদৃশ্য হইবে, ইহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। রঙ্গপুরে, যশোরে, বর্দ্ধমানে, আরামবাগে মহামারি হইয়াছিল, এখন হয় না। ইহার কারণ এমন নয়, সে সে অঞ্চল হইতে মেলেরিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। কেহ বলিতে পারে না মৃদু প্রবল হইতে পারে না, মহামারি হইতে পারে না। এবারের লোক-গণনায় আরামবাগের প্রজাবৃদ্ধি দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় না, মেলেরিয়া অদৃশ্য হইয়াছে কিংবা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখিয়া উন্নতি অবনতি বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্বেদ বলেন, শরীরানুরূপ কর্ম, আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যদি আরামবাগে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উন্নতি হইয়াছে, অন্যথায় নয়। ক্ষীণজীবী মনুষ্যের বৃদ্ধিতে মঙ্গল নাই।

মেলেরিয়া শান্তির পরীক্ষা

কয়েক বৎসর পূর্বে বর্দ্ধমান জেলার মেমারি অঞ্চলে মেলেরিয়া দমনের প্রথম দুই কল্প অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েকখানা গ্রামের মেলেরিয়া-রোগীর বিধিমত চিকিৎসা ও অপর সকলকে মেলেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল। ফলে মেলেরিয়া প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, এই উপায়ে স্থায়ী ফল হয় না। তিন চারি বৎসর ধরিয়া ঔষধ সেবন করাইলেও অন্য গ্রাম হইতে মেলেরিয়া আসিতে কতক্ষণ?

নদীয়া জেলায় বীরনগর (চলিত নাম, উলা) মেলেরিয়া প্রবেশের পূর্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল। তথাকার কয়েকজন উৎসাহী, বিদ্বান্ ও ধনবান্ বীরনগর হইতে মেলেরিয়া দূর করিতে ইং ১৯২৪ হইতে ১৯৩৫ সাল, এই বার বৎসর যুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা তিনটি কল্পই অবলম্বন করিয়াছিলেন। মেলেরিয়া-প্রকোপ অবশ্য হ্রাস হইয়াছিল। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই, প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করাইয়া মেলেরিয়া দমন অসম্ভব। মেমারির পরীক্ষাতেও তাহা স্পষ্ট হইয়া ছিল। তাঁহাদের মতে মশার ক্রিমিনাশ দ্বারা বিশেষ ফল হইয়াছিল।

কিন্তু বিষাক্ত ঔষধ নিক্ষেপ দ্বারা পুকুর, ডোবা, খাল, বিলের ক্রিমিনাশ অতিশয় ব্যয়সাধ্য। আমি বুঝিতে পারি না, জলে কেরোসিন কিংবা ক্রিমিনাশক ঔষধ নিক্ষেপ

করিয়া কিরূপে গ্রামকে গ্রাম, মাঠকে মাঠ মশাশূন্য করা যাইতে পারিবে। গ্রামে বসতির পাশেই ধানের ক্ষেত। গ্রামের লক্ষণই এই। শস্যক্ষেত্র না থাকিলে নগর। যাহা গ্রামে সাধ্য, তাহা নগরে নয়; যাহা নগরে সাধ্য তাহা গ্রামে নয়। ধানক্ষেতে জল রাখিতেই হইবে। অতএব শত শত বর্গমাইলের জলের ক্রিমিনাশ কার্যতঃ অসম্ভব। ভাসা মাছে ক্রিমি খাইয়া ফেলে। আরও কেহ কেহ বলেন পুকুরে টোকাপানা থাকিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। অর্থাৎ পুষ্করিণীর পানা সরাইবে না। আমার সামান্য বিবেচনায় এইরূপ টোটকা-টুটকি দ্বারা বিস্তীর্ণ দেশের সমস্যার পূরণ হইবে না। এতদ্দ্বারা মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া হয়। মশারির ভিতরে শুইলে, অভাবে মুখে হাতে পায়ে সরিষাতেল মাখিয়া শুইলে মশা কামড়াইতে পারে না। কুইনিন বিতরণ কিম্বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিলে অধিক ফল হইতে পারে। নিমপাতা, নালিতা (তিক্ত পাটশাক), চিরতা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ মেলেরিয়া প্রতিষেধক হইতে পারে কি না, তাহা দেখা হয় নাই। গ্রামে অনেক কৃতবিদ্য ডাক্তার আছেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মেলেরিয়ার বিপ্রকৃষ্ট কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন। বর্ষে বর্ষে মিলিত হইয়া লব্ধজ্ঞান বিচার দ্বারা অক্লেশে হিতসাধন করিতে পারেন।

ইং ১৯১৫ সালে (বাং ১৩২১। চৈত্র) বর্দ্ধমানে মহারাজার নিমন্ত্রণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল। আমি বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলাম, "নদীমাতৃকা ভূমি, যে ভূমি নদীর পলিহেতু মাতৃস্বরূপা হইয়া শস্যদ্বারা প্রজাপালন করে, তাহার গুণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। আমরা নদীর দুই পাশে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া উর্ব্বরতাশক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছি। * * * নদীর পলি খাল ডোবা বুজাইয়া দেশ ভরাইয়া উচা করে। যে মেলেরিয়া পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন করিতেছে তাহার নাকি প্রতিকার করে।" ইহার পূর্বে ইং ১৯১৩ সালে দামোদরের বাঁধ ভাঁগিয়া বর্দ্ধমান ও তারকেশ্বর অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হইয়াছিল, লোকের দুঃখের একশেষ হইয়াছিল। কিন্তু মেলেরিয়ার প্রকোপ হয় নাই। যে বৎসর দামোদরের পশ্চিম পার্শ্বের বাঁধের বেগুয়ার হানা দিয়া মলয়পুর নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়, সে বৎসর মেলেরিয়া প্রায় থাকে না। এই কার্যকারণ স্পষ্ট, তদ্দেশবাসী সকলেই জানে। সেই অবধি আমি নদীর পাশের অবিচ্ছিন্ন বাঁধে ইষ্ট না দেখিয়া অনিষ্টই দেখিয়া আসিতেছি। ইং ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় আটটি পত্রে অবিচ্ছিন্ন বাঁধের দোষ দেখাইয়াছিলাম।
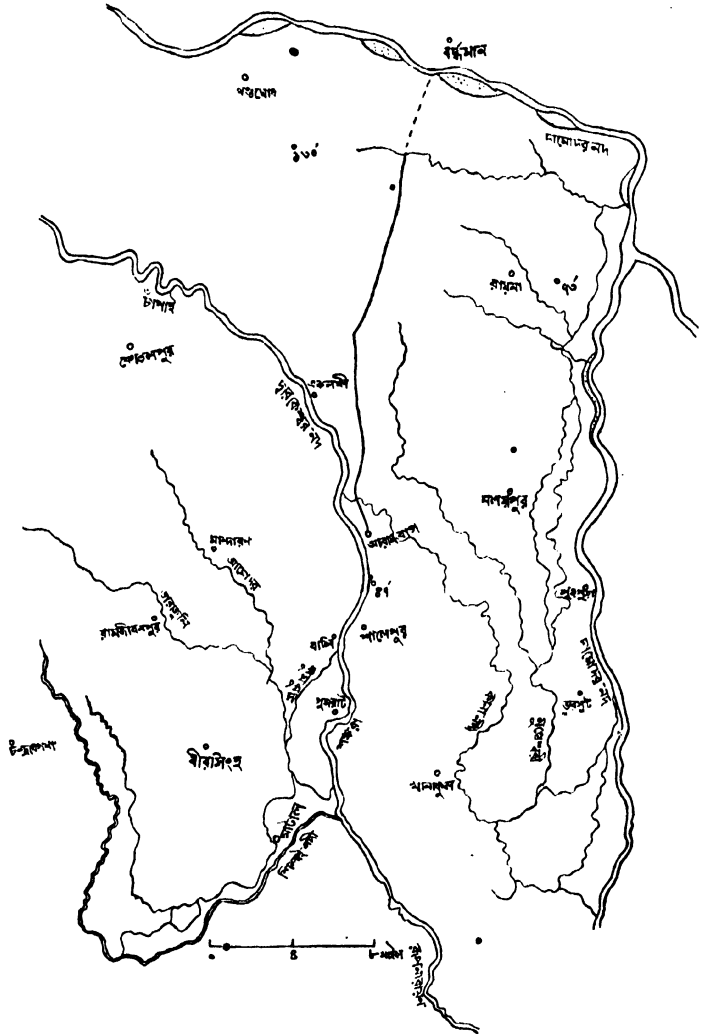
কিন্তু বাঁধ না থাকিলে লোকের ঘর-দ্বার নষ্ট হয়, জমি বালি-পতিত হয়। ইহার প্রতিকার চাই।

বন্যার উপরের জলে বালি থাকে না। সূক্ষ্ম মৃত্তিকা ও বালি থাকে। ইহাই পলি। যদি বাঁধের উপর দিয়া লাল ঘোলা জল উপচাইয়া আসিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে গ্রামের ভিতরে ও মাঠে তেজস্কর পলি পড়িবে, নদীর বালি আসিতে পারিবে না। বন্যার উর্দ্ধসীমা হইতে দুই তিন ফুট নীচু করিয়া বাঁধ কাটিয়া ও বাঁধের বাহিরের দিক ইটে বাঁধিয়া বান-জাঅনা করা যাইতে পারে। পাঁচ মাইল কি দশ মাইল দূরে দূরে দুই তিন শত হাত বান-জাঅনা করিয়া দিলে হানা পড়িবার আশঙ্কাও থাকে না। বন্যার লাল ঘোলা জলে পুকুর, ডোবা, মাঠ, ঘাট সব বর্ষে বর্ষে ধৌত হইতে পারিবে। তেজস্কর পলি পড়িবে, আর মশার ক্রিমি বিনষ্ট হইবে। মেলেরিয়া-প্রাজ্ঞেরা দেখিয়াছেন নদীর লাল ঘোলা জলে মশার ক্রিমি বাঁচে না।

ইং ১৯২৬ সালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ কালীনদীর বানে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে সময়েও আমি "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় তিন চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছিলাম মেদিনীপুরের নিম্নভূমির লোকেরা চক্রবাঁধ করিয়া এক এক গড় নির্মাণ করিয়াছে। 'গর্ত' শব্দ হইতে 'গড়' শব্দ হইয়াছে। চারিদিকে বাঁধ, ভিতরে গর্ত। কাজেই গড়ের ভিতরে মেলেরিয়ার খনি। বন্যার সময় গড়ের জল নিকাশ হইতে পারে না, আর বাঁধ ভাঙিলে শোচনীয় অবস্থা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে চলিলে এই বিপদ ঘটে না। পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলা বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়। কিন্তু সেখানকার লোকে তদনুরূপ ঘরদ্বার নির্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করে। বানের দেশে মাটির ঘর টিকে না। এই কারণে সে দেশে বাঁশের বেড়ার ঘর। বাঙ্গালা দেশে যদি কোথাও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি থাকে তাহা পূর্ববঙ্গে।

কিন্তু মেদিনীপুরের চক্রবাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া দিলে অবস্থা ভয়ানক হইয়া পড়িবে। তাহার পরিবর্তে চক্রবাঁধের স্থানে স্থানে নীচু করিয়া বানের জল ঢুকিবার ও অপর দিকে বাহির হইবার পথ করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ। গড় বর্ষে বর্ষে ধুইয়া যাইবে, পলি পড়িয়া উঁচু হইতে থাকিবে, ভবিষ্যতে বাঁধ ভাঙার আশঙ্কা থাকিবে না।

ইহার এক বৎসর পরে প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেণ্টলি সাহেব মেলেরিয়া-নাশের এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের যে যে গ্রাম বর্ষাকালে ভাসিয়া যায়, তিনি দেখিয়াছিলেন সে সে গ্রামে মেলেরিয়া হয় না। তিনি নদীর পলির গুণও গাহিয়াছিলেন। ইং ১৯৩০ সালে ঈজিপ্টের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার উইলকক্স্ সাহেব বঙ্গদেশের নদীনালা পরিদর্শন করিয়া বেণ্টলি সাহেবের প্রকল্প সমর্থন করিয়াছিলেন। এখন মেলেরিয়া-প্রাজ্ঞেরা তাঁহার মত মানিয়া লইয়াছেন।

মেলেরিয়া শান্তির প্রকল্প

(১) সৌভাগ্যের বিষয়, আরামবাগের সহস্র বর্গ মাইল স্থানে বিনা ব্যয়বাহুল্যে এই উপায় প্রয়োগের সুবিধা আছে। বুদ্ধি যোগ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি অবশ্য হইবে। আরামবাগের উত্তরে দামোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁধ নাই। উত্তর পার্শ্বে বর্দ্ধমান ও রেল লাইন রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁধ রাখা হয় নাই। ইহার দ্বারা কিন্তু আরামবাগের উপকার হইয়াছে। মানচিত্রে তিনটি স্থানের উচ্চতা দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডঘোষের নিকটে ৮০ ফুট, রায়নার নিকটে ৭৩ ফুট, আরামবাগ ও শালেপুরের মধ্যে ৪৭ ফুট। খালের পথ দেখিলেই বুঝা যায় খণ্ডঘোষ অঞ্চলের জল পূর্বদিকে যায়, ও রায়না অঞ্চলের জল দক্ষিণ দিকে বহে। বর্দ্ধমান-আরামবাগের পথে বর্দ্ধমানের নিকটে এক দীর্ঘ সেতু আছে। এখন বর্দ্ধমান-আরামবাগ পথ ও দ্বারকেশ্বরের পূর্বভাগে বন্যাপ্লাবন আপনি হইতেছে। বর্ষাকালে দামিন্যা ও মলয়পুর দ্বীপে পরিণত হয়। কিন্তু পশ্চিমভাগে বন্যাপ্লাবন হয় না। ইঞ্জিনিয়ারেরা বন্যাপ্লাবনের উপায় করিয়া দিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, বর্দ্ধমান-আরামবাগের পথে বর্দ্ধমানের নিকটস্থ সেতু বন্ধ করিয়া দিলে খণ্ডঘোষ অঞ্চলের জল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর পর্যন্ত পঁহুছিতে পারিবে, এবং একলক্ষীর নিকটে দ্বারকেশ্বরে নীচু পাকা বাঁধ করিলে তাহার দক্ষিণাংশ বন্যাপ্লাবিত হইতে পারিবে।

কেবল মশা-নাশ ও ক্ষেতে পলি-সঞ্চয় নয়। হড়কা বান আসিলে ও বাঁধে হানা পড়িলে লোকের যে দুর্গতি হয় তাহাও চিন্তনীয়। নদীগর্ভ উচ্চ হইতেছে। বাঁধও তদনুরূপ উচ্চ করিতে হইতেছে। কিন্তু যত উচ্চ হইতেছে বাঁধে হানা পড়িবার আশঙ্কাও তত বাড়িতেছে। নদীর বাঁকমুখে বাঁধ যত ভাঙে, সোজামুখে তত ভাঙে না। দ্বারকেশ্বর কূলে শালেপুর ও বালি ইহার সাক্ষী। এই দুই স্থানের বাঁধ কতবার ভাঙিয়াছে, কতবার গড়া হইয়াছে। দক্ষিণে শিলাই ও রূপনারায়ণ পূর্বের মত গভীর নাই। সকল নদীর মুখই অল্পে অল্পে বুজিয়া যায়।

এই কারণে বর্ষে বর্ষে বানের বৃদ্ধি মনে হয়। তুনিবার প্রকৃতির সহিত লড়াই না করিয়া নদীর কাজ নদীকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু এতকাল যাহা বদ্ধ ছিল, তাহাকে হঠাৎ মুক্ত করিলে বিষম বিপদ হইবে। বর্তমানে দামোদরের অত্যধিক জল পশ্চিম পার্শ্বে চলিয়া নূতন খাত করিতেছে। নিকটে দ্বারকেশ্বর। সমান্তরাল দুই নদীতে মঙ্গল নাই। অতএব দামোদরের পূর্বদিকের বাঁধে এবং দ্বারকেশ্বরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের বাঁধে বান জাঅনা করিয়া দিতে হইবে। বন্যাপ্লাবনে আপাততঃ লোকের কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু নির্ভয়ে বাস, মেলেরিয়া নাশ ও ক্ষেতে পলি সঞ্চয়, এই তিন হিত চিন্তা করিলে সে কষ্ট কিছুই নয়।

(২) আরামবাগকে লইয়া এই সহস্র বর্গমাইল স্থানে গবর্মেণ্ট কৃষিবিভাগের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কেহ দ্বারকেশ্বর ও আরামবাগ-বর্দ্ধমান পথের পশ্চিম ভাগের মাটি দেখেন নাই, পরীক্ষা করেন নাই। অনেক স্থানে কৃষি-শিক্ষাক্ষেত্র আছে। দক্ষিণে খিরপাইয়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় দুই সহস্র বর্গমাইল স্থানে একটি কৃষিশিক্ষা-ক্ষেত্র নাই! মাটি কেন নিস্তেজ হইয়াছে, কেহ অনুসন্ধান করেন নাই। দেখা যায় পুরাতন এঁটেল মাটি বর্ষায় ধুইয়া ধুইয়া উপরে বালি সরিয়াছে। বালিহেতু মাটি বরং দোআঁশ হইয়াছে। বোধ হয় নাইট্রোজেন ও ফসফরসের ন্যূনতা ঘটিয়াছে। এইহেতু প্রচুর গোবরযোগ ও রেড়ির খইল আবশ্যক হয়।

(৩) বানের জল ও পলির গতি চিন্তা ব্যতীত এক দারুণ চিন্তা আছে। বালির গতি কি হইবে? এই বালি নদীগর্ভে ও নদীমুখে সঞ্চিত হইতেছে, আর নদীকূলে জমিয়া মাটি কৃষির অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এই কারণে নদীকূলের জমির আদর নাই। কিন্তু সেখানে অরণ্য করা যাইতে পারে। দক্ষিণ রাঢ়ে অরণ্যের অভাবে গৃহনির্মাণের কাঠ দুর্মূল্য। জ্বালানি কাঠ দুষ্প্রাপ্য। কৃষক জানে গোবর জমির সার। সে জ্বালানি কাঠের অভাবে গোবর পোড়ায়। উত্তরে দামোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘ বালি-পতিত জমি আছে। দ্বারকেশ্বরের দুই কূলেই অনেক বালি-পতিত জমি আছে। যদি বিস্তারে দুই তিন বিঘা করিয়া এই সকল বালি-পতিত জমিতে অরণ্য করা যায়, তাহা হইলে পাঁচটি সুফল লাভ করা যাইবে। (১) নদীর বালি কূলে কূলে জমা হইবে। (২) নদীর বান অরণ্য দিয়া বহিবার সময় তাহার গতি মৃদু হইবে। সেখানে মোটা বালি সঞ্চিত হইয়া সরু বালি ও পলি মাঠে আসিয়া পড়িবে। (৩) পাতাপচানি মাঠে পড়িলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। (৪) গৃহনির্মাণের উপযোগী কাঠ ও ছোট ছোট অরণ্যে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যাইবে। (৫) অরণ্যের পাতা অরণ্যে পচিয়া গদির মত হইলে বৃষ্টির অধিকাংশ জল সেইখানেই থাকে, নীচের দিকে অল্প বহিয়া যায়। ফলে অরণ্যভূমি বৃষ্টির জলের বিস্তীর্ণ আশয় হয়। সেই জল অল্পে অল্পে নিম্নস্রোতে বহুদূর বহিয়া আসিয়া মাটিকে সরস রাখে। এইটি অরণ্য রক্ষার বিশেষ ফল। এখন যে বিস্তীর্ণ মাঠে একটি ফসল হয়, তখন দুইটি হইতে পারিবে।

ইং ১৯৩৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের অরণ্যরক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় নির্দারণ করিতে গবর্মেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা অরণ্য-রক্ষণ ও বর্দ্ধনের যাবতীয় গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নূতন অরণ্য নির্মাণের প্রয়োজন চিন্তা করেন নাই। নূতন অরণ্যের আরম্ভ করিতে হইলে নদী কূলে কূলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। শুধু অরণ্য ধ্বংস নিবারণ নয়, অরণ্য-নির্মাণ আবশ্যক হইয়াছে। এক শত বিঘা জমিতেও অরণ্য করা যাইতে পারে। দুই শত বৎসর পূর্বেও এই দক্ষিণ রাঢ়ে গ্রামান্তরে ছোট ছোট অরণ্য ছিল। এখন গ্রামে গ্রামে বন আছে বটে, কিন্তু সে বনে জ্বালানি কাঠও মিলে না। দামোদরের দক্ষিণ কূলের অরণ্যে নারিকেল ও গুআর বাগান করিতে পারা যায়। সাল, সেগুন, পিয়াসাল, কেলিকদম, পলাশ প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ সেখানে ও দ্বারকেশ্বরের কূলে করিতে পারা যায়। বর্দ্ধমান হইতে আরামবাগ ২৪ মাইল। এই দীর্ঘ পথের পূর্বধারে আর কিছু না হউক পলাশ ও খেজুর রোপণ করিলে তদ্দেশবাসীর একটা জীবিকার উপায় হইতে পারিবে। অরণ্যবিভাগের প্রাজ্ঞদের উপদেশ অনুসারে এই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অরণ্য-নির্মাণে গবর্মেণ্টের মনোযোগ আবশ্যক। কে এই সকল অরণ্য করিবে, কে রক্ষা করিবে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন আছে। গবর্মেণ্টের যত্ন ব্যতীত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। গবর্মেণ্ট ব্যতীত কেহ মেলেরিয়া দমন-উপায় গ্রহণ করিতে পারে না। নদীর বাঁধে বান-জাঅনা নির্মাণ, বানের লাল ঘোলা জলে বর্ষে বর্ষে দেশটিকে ধৌত করা, এ সব গবর্মেণ্টের কার্য। গবর্মেণ্টের অর্থ আছে। ঔদাসীন্য কাটিয়া উঠিতে পারিলে অর্থ আপনি জুটিবে।

উপরে চারিটি বিষয়ে গবর্মেণ্টকে মনোযোগ করিতে বলা হইয়াছে। যথা, (১) মেলেরিয়ার হ্রাসবৃদ্ধি ও মেলেরিয়া মশা নিরীক্ষক ডাক্তার, (২) বন্যাপ্লাবনের উপায়

নির্ধারণের নিমিত্ত এক ইঞ্জিনিয়র, (৩) জমির তেজ বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ নিমিত্ত এক কৃষিবেত্তা, (৪) নূতন অরণ্য নির্মাণের নিমিত্ত এক অরণ্য-প্রাজ্ঞ।

উৎসাহী, বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান যুবাকে নিরীক্ষক নিয়োগ করিলে চলিবে। ইঁহারা স্ব স্ব বিভাগের প্রাজ্ঞদের উপদেশানুসারে কার্য করিতে পারিবেন। মাসিক ব্যয় এক হাজার টাকা। বোধ হয় এক বৎসর ইঁহাদের নিরীক্ষণ-ফল বিচার করিয়া গবর্মেণ্ট দ্বিতীয় বর্ষে কার্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

দারিদ্র্যমোচন

গত বৎসরের পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের আটটি কারণ নির্দেশ করিয়াছি। যথা, বৃত্তিহানি, প্রজাবৃদ্ধি, স্বেচ্ছাবৃদ্ধি, অসত্যবৃদ্ধি, মেলেরিয়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি। এই আট কারণের মধ্যে অতিবৃষ্টি দৈবাধীন। অনাবৃষ্টিও দৈবায়ত্ত বটে কিন্তু জলাশয়-নির্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টির প্রতিকার করা যাইতে পারে। মেলেরিয়া দমন রাজার কার্য। নূতন নূতন বৃত্তি স্থাপন দ্বারা বৃত্তি-হানির পূরণ হইতে পারে। ইহাও রাজার কার্য। কারণ রাজাই প্রজার ইচ্ছা বুদ্ধি সামর্থ্য ও অর্থের সমষ্টি। প্রজা-বৃদ্ধি, স্বেচ্ছা-বৃদ্ধি ও অসত্য-বৃদ্ধি, এই তিন দোষ প্রজা নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু যোগ্য উপদেষ্টা চাই।

মেলেরিয়ার দেশে প্রজাবৃদ্ধি হয় না, প্রজাহ্রাস হয়, চাষের জমি পতিত থাকে। পূর্বে দুই এক কাঠা জমির জন্য মারামারি লাঠালাঠি হইত। এখন বিঘাকে বিঘা পড়িয়া আছে, চাষের মানুষ নাই। এইরূপ কামার, কুমার, ধোবা, নাপিত, তাঁতি প্রভৃতি কয়েকটি জাতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রজাহ্রাস হেতু জীবিকা উপার্জনের পথ সুগম হইয়াছে। এই সময়ে যদি লোকে সুখ-লালসা ত্যাগ করিতে পারে এবং ধর্মের সহিত কর্মের ও কর্মের সহিত ধর্মের যোগসাধনা করিতে পারে, তাহা হইলে সকল লোকে স্বচ্ছন্দে ও সন্তোষে কালযাপন করিতে পারে। নিরলস মানুষ নানাভাবে আয়বৃদ্ধি করিতে পারে। ঘরদ্বার ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখিতে এবং ঘরের পাশের বনঝোপ কাটিয়া জালানি করিতে পারে। পুকুরের পানা তুলিয়া মাছ জন্মাইতে পারে। ভিটার ধারে কলাগাছ ও দশটা বেগুন গাছ ও উঠানে দুই-চারিটা ফুলের গাছ করিতে পারে। তাহার কাজের শেষ হয় না। তাহাকে বলিয়া দিতেও হয় না। তখন তাহার বাড়ীর কাছে গেলে বুঝি লোকটি শ্রীমন্ত। আর ব্যবহারেও দেখি লোকটি বিনীত ও সরল। তাহার কুচিন্তার অবসর নাই। যদি রাম-কাপাসের গাছ থাকে, চরকায় সুতা কাটিয়া কাপড়ের যোগাড় করিতে পারে। যদি পুরুষ সামর্থ্য সত্ত্বেও আলস্যে দিন কাটায়, নারী অবসর পাইলেও কাজ না করে, তাহার দিন দুঃখেই কাটে। চরকায় সুতা কাটিলে মাসে তিন-চারি টাকা আয় হয়।

ধর্ম ও কর্ম পৃথক নয়। কৃষক লাঙ্গল করে, কারণ ইহাই তাহার ধর্ম। না করিলে গৃহস্থ-ধর্ম প্রতিপালিত হয় না। সে না করিলে আর কে করিবে? ভিক্ষুক আসিলে কে ভিক্ষা দিবে? আর, নিজের শরীর রক্ষা না করিলে তাহার কোন ধর্ম পালন হয় না। কেহ একা একা টিকিতে পারে না। সে ও তাহার পরিবার অপরের সাহায্যে টিকিয়া থাকে। যদি তাহার সাহায্য চাই, তাহা হইলে তাহাকেও সাহায্য করিতে হইবে। এইরূপ পরস্পর সাহায্য দ্বারা সংসার চলিতেছে। রামের ধন হইলে শ্যামও সে ধনের ভাগ অবশ্য পায়।

সত্য ব্যতীত সমাজস্থিতি হয় না। সত্যে জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই কারণে সকল ধর্মশাস্ত্রে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। সত্যে নির্ভর করিলে দেশের দারিদ্র্য বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। সত্য পালনে যে সন্তোষ জন্মে, তাহা ধনের বিনিময়ে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক গ্রামেই দুই-পাঁচ জন সেবাধর্ম বুঝে। এক মুখ্য এই সকল গ্রাম-সেবককে লইয়া গ্রামের অনেক হিতকর কর্ম করিতে পারেন। যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি মুখ্য হইবার যোগ্য। তাঁহার নিকট সকলেই আপনার জন। পথ ঘাট পরিষ্কার রাখিতে, গ্রামের জল নিকাশের পথ করিতে বেশী সময় লাগে না। সেবাধর্ম-পালন সংক্রামক। পাঁচ জনের দেখিলে অন্যে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। আর, এই যে সংহতি-সে সংহতি কার্য-সাধিকা। ভয় দেখাইয়া কিম্বা পারিতোষিকের লোভ দেখাইয়া লোক জমা করা যাইতে পারে। কিন্তু যখনই এই দুয়ের অভাব পড়ে, তখনই কাজ বন্ধ হয়।

কোন কোন গ্রামে হনুমানের উপদ্রবে আলু কলাই শসা প্রভৃতি শস্য, আম কলা পেঁপে প্রভৃতি ফল রাখিতে পারা যায় না, খড়ের ও টিনের চাল টেকে না। উদ্যোগের অভাবে লোকে ক্ষতি সহ্য করে। হনুমান ও মর্কট দুইই বনচর। অরণ্যের অভাবে তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীর খাদ্যে ভাগ বসায়। গুলতই ও বাটুল লইয়

গ্রামবাসী হনুমানের পাল তাড়াইয়া দিতে পারে। গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী থাকিলে পালকে পাল দেশছাড়া করিতে পারা যায়। অলস বলে, তাহার সময় নাই। গ্রাম-রক্ষী বলে, তাহারা রক্ষা না করিলে আর কে করিবে, বিপদের সময় কে আগুয়ান হইবে।

আহারের দোষে ও ব্যায়ামের অভাবে বাঙ্গালীর দেহ শীর্ণ, দুর্ব্বল, শ্রমকাতর। শাগ ভাত খাইয়া, কিম্বা শাগ ভাত মুড়ি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়। পরিমাণ অল্পে অল্পে কমাইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়। অর্থাভাবে অধিকাংশ লোকের এই দশা হইয়াছে। ভাত মুড়ি খই চিড়া, যাহাই খাই, শ্রমশীল বয়স্কের দৈনিক আহারে আধ সের চাল যথেষ্ট। ইহার সহিত ডাল এক ছটাক, কোটা মাছ দেড় ছটাক, ঘি ও তেল চারি তোলা, চিনি আধ ছটাক, দুধ এক পোয়া ও কোটা আনাজ দেড় পোয়া হইলে দেহ পুষ্ট বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ হয়। নিরামিষাশীর পক্ষে ডালের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। অথবা একবেলা ভাত আর বেলা গমের কিম্বা যবের রুটি। গ্রামে গৃহস্থের গাই রাখা কঠিন নয়। ফলাহার আবশ্যক বলিয়াই ফলাহারের নিমন্ত্রণ করা হইত। এটেঁল মাটিতে ফলের গাছ সহজে বাড়ে না, ফলে না। মাটির আঠা হেতু বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, জল প্রবেশ করিলে শীঘ্র শুখায় না, আর যখন শুখায় মাটি ফাটাইয়া দেয়, গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া যায়। ক্ষেতের মাটি এক ফুট ফাঁপা থাকিলেই ফসল হয়। এঁটেল মাটির গুণও আছে। ইহা কভু নিস্তেজ হয় না, ইহার শস্য কভু পানিসা হয় না। রাঢ়ের চাল ডাল আলু পটোল মাছ প্রভৃতি সুস্বাদু। মাটি পোড়াইলে কিম্বা দুই এক বছর রোদ জল খাওয়াইলে আঠা মরিয়া যায়। গভীর গর্ত্তে পোড়া মাটি, পুকুরের পাক মাটি, পচা গোবর ও টুকরা টুকরা হাড় মিশাইয়া ফলের চারা রুইলে গাছ বাড়ে, ফলে। কলা, পেঁপে, কাগজি, পেয়ারা, জাম প্রভৃতি ফলকর গাছ অক্লেশে করিতে পারা যায়। কৃষক গোবর সারের গুণ জানে। হাড়ের গুণ লক্ষ্য করে নাই। করিলে গবাদি পশুর একখানি হাড় স্থানান্তরিত হইতে দিত না। মুচি সে হাড় ঢেঁকিতে টুকরা করিয়া দিত, কলিকাতায় হাড়গুঁড়া ৫৲ টাকা মণ কিনিতে হইত না। যাহার গোরু পড়ে, মৃতদেহ তাহারই ধন। সে মুচিকে দিয়া চর্ম্মের বিনিময়ে ঢেঁকিতে কোটা হাড় লইতে পারে। হাড়ে ফস্‌ফরস আছে। ইহার অভাবে ফল ও বীজ হয় না।

অর্থাগমের তিন উপায়, কৃষি, কলা, ক্রয়বিক্রয়। এই তিন ক, অন্নবস্ত্রলাভের তিন পদ। চাকরি ও বহনি দুই উপ-পদ। তিনটি পদেরই ফল অনিশ্চিত। কৃষিকর্ম্মে অকালে বৃষ্টি, সকালে অনাবৃষ্টি, কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না, এই কারণে চক্ষুষ্মান্ কৃষক নানা প্রকার ফসল করে। একটায় ক্ষতি অন্যটায় লাভ হয়। গম যব তিল সরিষা শণ কাপাস হলুদ চাষে প্রায় ক্ষতি হয় না। পান চাষে প্রচুর লাভ হয়। পাট চাষে আর লাভ হইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে আমাদের পুরাতন পাট চাষ কর্ত্তব্য। ইহার নানা নাম ছিল, বেরাল পাট, পাটশণ, মেস্তাপাট বা মেস্তা। উচা জমিতে হয়। কাপাস চাষের জমিও পর্যাপ্ত না থাকিলে চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর বালি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত হইত না। কত বালি-পতিত জমি, কত পগার পড়িয়া আছে। ভূমিই ধন, উপযুক্ত প্রয়োগ অভাবে নিষ্ফল। বালিকূড়ে আকন্দ গাছ স্বচ্ছন্দে জন্মে। আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক আর এক নাম মন্দার। মন্দার-অরণ্য পরে মান্দারণ নাম পাইয়াছে। অর্কের অংশু অর্কাংশু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। এমন মিহি, চিক্কণ, টান অংশু অল্পই আছে। দুই হাত দূরে দূরে আকন্দ গাছ করিলে এক বিঘা জমিতে আড়াই মণ তিন মণ আঁশ পাওয়া যায়। উত্তম কাপাস তুলার দরে অর্কাংশু বিক্রি হইতে পারে। এইরূপ, পগারে মূর্ব্বা রুইলে ইহার অংশুতে শক্ত দোড়ী হইতে পারে। পূর্ব্বকালে এই দুই অংশুতে ধনুর গুণ হইত।

আরামবাগের পূর্ব্বাংশে দামোদরের পলিতে রবি ফসল অপর্যাপ্ত জন্মে। লঙ্কা ধনিয়া মউরি জিরা জোয়ান মেথি চাষ করিলে কলিকাতা হইতে আনিতে হয় না। ভাল জাতের তামাক স্বচ্ছন্দে জন্মে। পাকাইবার গুণে তামাকের গুণ বাড়ে। গবর্মেণ্ট কৃষিবিভাগকে লিখিলে উত্তম জাতের বীজ ও পাতা পাকাইবার প্রণালী জানিতে পারা যায়।

গ্রামে গ্রামে অনেক পুকুর ডোবা আছে। মাছচাষ লাভজনক। যদি মাছচাষের অংশী করিয়া পুকুরে মাছের আবাদ করা হয়, তাহা হইলে পুকুরগুলি পানায় ভরিয়া থাকে না, অকারণ পড়িয়াও থাকে না। গ্রামে এই এক ব্যবসায় আছে যাহা অক্লেশে চালাইতে পারা যায়। আরও উদ্যোগী হইলে দীঘিতে পোনা মাছের ডিমও পাড়াইতে পারা যায়। মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতার নিকটে দীঘির মাছে ডিম ধরা হইতেছে।

মাছ-চাষ অপেক্ষা ছাগলচাষ লাভজনক। এখানেও অংশী লইয়া ছাগলচাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে। বনের ধার না হইলে ছাগলচাষ হয় না ইহা ভুল বিশ্বাস, বনের

পাতায় পুষ্টিকর পদার্থ নাই। দশ বিঘা জমিতে ধান-চাষ করিয়া যে লাভ হয়, সেই দশ বিঘা জমির উৎপুন্নে অনেক ছাগল পুষিতে পারা যায়।

কলা শব্দের অর্থ করা, গড়া, প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের রূপান্তর করা। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, সুতা ও কাপড় রঙ্গানা, এক এক কলা। গ্রামোৎপন্ন দ্রব্যের কলা, গ্রাম-কলা। কলাজীবী স্বাধীন, নিজের অল্প ধনে ব্যয় নির্বাহ করে। যে কলা চালনায় মহাজন কার্মিক নিযুক্ত করে, তাহা গঞ্জকলা। যেমন, পিতল কাঁসার তৈজসপত্র নির্মাণ। হাটে ও বাজারে গিয়া দেখ, কি কি জিনিস বিক্রি হইতেছে। মাতৃকা কি, সে মাতৃকা নিকটে পাওয়া যায় কি না, যে জিনিস দূর হইতে আসিতেছে, সেটা তুমি করিতে পার কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধি আপনি খুলিবে। কোন কলা তুচ্ছ নয়। উত্তম ঝাঁটা নির্মাণ দ্বারাও অর্থাগম হইতে পারে। নানাবিধ মাতৃকার ঝাঁটা হয়, নানাবিধ মাতৃকার হাত-পাখা হয়। সব সুন্দর। মাতৃকা প্রচুর পরিমাণে না পাইলে কোন কলা চলে না। যাহাকে বলিয়া দিতে হয়, তুমি এই কলা ধর, সে পারিবে না। প্রথমে নিজের উদ্যম, তাহাতে না পারিলে গবর্মেণ্ট শিল্প বিভাগের উপদেশ চাও। দেশের চর্ম কেন কলিকাতা যাইতেছে? মোটা কষ করাইলেও মুচিরা বাঁচে।

অন্য দেশ হইতে আনীত মাতৃকা লইয়াও গ্রামকলা চলিতে পারে। যেমন, লোহা পিতল। এখানে কারু প্রধান। বালি কুমরগঞ্জ খড়ার পিতল কাঁসার গঞ্জ। গৌরহাটির চাবি তালা বহুকাল হইতে বিখ্যাত। কারু আছে, নূতন কারু শিখাইয়া লইতে পারা যায়। কলের ভয় করিও না, কল দূরে, বহনি খরচ আছে। বিশেষতঃ হাতে গড়া জিনিসের আদর বেশী। কলে কাগজ হয়, কিন্তু হাতের কাগজ দামী। প্রথম "স্বদেশী"র সময়ে ঘাটালে দিয়াশলাই হইত। বাঁশের খোলের বাক্স, বাঁশের কুঁচির কাঠি। চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, বুদ্ধি চালনা কর। রাতারাতি ধনী হইতে গিয়া সত্যভ্রষ্ট ব্যবসায়ী আপনি ডুবিয়াছে পরকে ডুবাইয়াছে। ব্যবসায়ে সত্যপালন টাকা অপেক্ষা মূল্যবান্।

ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্য। ইহা অল্প লোকের সাধ্য। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধির আধিক্যহেতু বাণিজ্য চালাইতে পারে না। পূর্বে মারবাড়ী ছিল না, বাঙ্গালীই যাবতীয় ছোট বড় বাণিজ্য করিত। মারবাড়ী যে পুত্রকে ব্যাপারী করিতে চায়, তাহাকে অল্প বয়সেই ব্যাপারে বসায়। সকল কলা, সকল বাণিজ্যের মূল নীতি এই। কলা-শালায় কারু, বাণিজ্য-শালায় বণিক্ উৎপন্ন হয়। পিতা খুড়া, মামা, ইহারাই শিক্ষক হইয়া দেশের কলা ও বাণিজ্য চালাইতেছেন। কিন্তু ইদানী নগরের ধনিক গ্রামকলা ধরিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, কল ও পথ। গ্রামে পথ থাকিলে হস্তসিদ্ধি টিকিয়া থাকিতে পারে। তথাপি গবর্মেণ্টের সজাগ দৃষ্টি ব্যতীত কোন কলা, কোন বাণিজ্য টিকিতে পারে না। কলিকাতা ও অন্য নগর হইতে সরিষাতেল গ্রামে আসিবে কেন? কলে ধুতি শাড়ী বোনা নিষিদ্ধ হইলে গ্রামে গ্রামে আবার তাঁত চলিতে থাকিবে।

বঞ্চনা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঘন বনে শুধু ঝিল্লীর ঝঙ্কারে
মর্মর শুক্‌নো পাতার ভীড় ;
তব চরণের চুম্বনঘন ক্ষণে
বাজায়ো না আর কঙ্কণ অস্থির।

আজ বাতাসের বেদনার মঞ্জরী
ভুলে গেছে বুঝি ফসলের মৃদু গান ;
এই মর্মরে অস্থির বনচারী
পাও নি এখনো জীবনের সন্ধান।

দিনরাত্রির খোসায় জড়ানো আমি
কখনো দেখেছি স্বপ্নের উপহাস,
শুধু চেয়ে চেয়ে কেটে গেছে কতখানি
উড়ে গেছে কবে আকাশের বুনো হাঁস।

কারো কঙ্কণে হঠাৎ চমক আনে,
কেউ বা শ্রাবণ-ইন্দ্রধনুর মত,
কারুর অধরে সুদূরের মৌ-বন
হঠাৎ দেখেছি যৌবনে উদ্ধত।

আত্মায় কারো পাকধরা দাগ লাগা
ভার বয়ে বয়ে কারো পিঠ গেছে বেঁকে,—
এই পৃথিবীর নিদারুণ বঞ্চনা
নিষ্ঠুর হাতে নিজেকে দিয়েছে এঁকে।

হতভাগা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

তারও এক দিন সুসময় গেছে। পনর বছর বয়স যখন তার, তখন এক দিন হঠাৎ গাড়ী চাপা প'ড়ে দুখানা পা-ই ভেঙে অকেজো হয়ে যায়—সেই থেকে দুই বগলে দুই লাঠিতে ভর ক'রে কোনমতে দেহটাকে টেনে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে ফিরত। বগলে লাঠি নিয়ে চলতে চলতে তার কাঁধ দুটো কানের বরাবর উঁচু হয়ে উঠেছিল, মনে হ'ত যেন তার মাথাটা দুই পাহাড়ের মাঝখানে চাপা পড়েছে।

গাঁয়ের জমিদার-গিন্নী তাঁর গোলাবাড়ীর এক কোণে তার থাকবার জন্যে একটু স্থান দিয়েছিলেন, আর দুর্ভিক্ষের দিনে দিনান্তে এক টুকরো রুটির ব্যবস্থাও করেছিলেন—কিন্তু বরাত এমনি যে বুড়ী গেলেন মরে—সঙ্গে সঙ্গে গেল তার থাকবার জায়গা আর খাবার রুটি।

আশপাশের তিন-চার খানা গাঁ ছিল তার খানা। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে সে কখনো যায় নি। এ ছাড়া পৃথিবীতে যে আরও স্থান আছে সে খবরও সে রাখত না। এই ক'খানা গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী লাঠি ভর ক'রে সে তার পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে বেড়াত—বিশেষ কিছুই মিলত না, কারণ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তার এই ভিক্ষার উপদ্রব চলেছে—লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোন কোন দিন কেউ হয়ত তাকে বলত—"ওরে বাপু! আর কোথাও কি যেতে নেই? রোজ রোজ এখানেই পড়ে মরছ কেন?"

এ কথার উত্তর সে কোন দিন দিত না। নিঃশব্দে চলে যেত। আর কোথাও যাবার কথাতে সে একটা অস্পষ্ট ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ত, অচেনা মুখ, সন্দেহের দৃষ্টি, প্রহারের সম্ভাবনা, পুলিসের পাগড়ি ইত্যাদি অনেক গুলো জিনিস একসঙ্গে জড়িয়ে একটা দুঃস্বপ্নের মত তার মনে জেগে উঠত।

পুলিসকে তার সবচেয়ে বেশী ভয়—দূর থেকে তাদের একজোড়াকে দেখতে পেলেই সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আত্মগোপন করবার ব্যবস্থা করে নিত। লাঠি দুখানা ফেলে দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তালগোল পাকিয়ে সে ছোট্টটি হয়ে খরগোশ যেমন ক'রে মাটির সঙ্গে মিশে যায় ঠিক তেমন করেই মাটির সঙ্গে মিশে যেত। তার ময়লা ছেঁড়া পোষাকটা পর্য্যন্ত মাটির রঙের সঙ্গে মিলে যেত।

পুলিসের সঙ্গে কোন দিনও তার কোন কারবার হয় নি। এই যে ভয়ঙ্কর ভয়, সম্ভবতঃ এটা তার রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল, সম্ভবতঃ এটা তার-বাপ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

ঘরবাড়ী বা আশ্রয় ব'লে কোন জিনিস তার ছিল না। গ্রীষ্মকালে যেখানে খুশী পড়ে সে ঘুমতো—শীতকালের রাত্রে আশ্চর্য্য কৌশলে সে কোন-না-কোন আস্তাবলে ঢুকে পড়ত এবং ভোরবেলা লোক আসবার আগেই সরে পড়ত। কোন পোড়ো বাড়ীর বা আস্তাবলের দেয়ালে কোথায় প্রবেশের উপযোগী ফুটো আছে—এ খবর তার

নখদর্পণে থাকত। তা ছাড়া খড়ের মাচাগুলো তার অনেক কাজে আসত। লাঠি ভর ক'রে চলতে চলতে তার দুই হাতে অপরিসীম শক্তি হয়েছিল—মাচার কাঠ ধরে অক্লেশে সে উপরে উঠে পড়ত এবং পরম আরামে খড়ের বিছানায় নিদ্রা যেত। আর যদি কখনো কিছু বেশী খাবার সঞ্চয় করবার সৌভাগ্য তার হ'ত তখন এক নাগাড় তিন-চার দিনও সে সেইখানে বসে কাটিয়ে দিত।

মানুষের সমাজে সে একটা বনের পশুর মতই বাস করত। কারু সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না—কারু সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল না। লোকসমাজ তাকে পরম অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষেই দেখত এবং নিরুপায় হয়েই তাকে সহ্য করত। দুটো লাঠির মাঝখানে ঘণ্টার মত ঝুলে ঝুলে চলত বলে সবাই তার নামকরণ করেছিল "ঘণ্টা"।

দু-দিন হ'ল তার আহার জোটে নি। কেউ আর তাকে ভিক্ষা দেয় না। যদি কেউ দেখে যে সে আসছে তাহলে দূর থেকেই তাকে বিদেয় ক'রে দেয়—বলে "এই ত সে দিন কত কি দিয়েছি, আজ কিছু হবে না—পালা।" বেচারা লাঠি ভর ক'রে মুহূর্ত্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়, তার পরে পাশের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। সেখানেও সেই একই প্রকার অভ্যর্থনা! মেয়েরা বলাবলি করে "মিন্‌সেকে চিরটাকাল কে আর খাওয়াবে বলো!"

অথচ মুশকিল এই যে, মিন্‌সের পক্ষে খাওয়াটা প্রতিদিনই দরকার।

একখানা বাদে আর সব-কখানা গ্রাম ঘোরা হয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা বা এক-টুকরো বাসি রুটিও জোটে নি। ভরসা একখানা গ্রাম কিন্তু সেও ত কাছে নয়—পুরো আড়াই মাইলের পথ। এদিকে দু-দিন ধরে পেটে কিছু নেই, ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—পথ চলা যেন অসম্ভব।

তবু চলতে হচ্ছে।

ডিসেম্বর মাস, ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—পাতাশূন্য গাছের ডালে লেগে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। রাশি রাশি সজল মেঘ আকাশের এক দিক থেকে আর এক দিকে বেগে ছুটে চলেছে। ঘণ্টা চলেছে—মন্থর গতিতে—থেমে থেমে কখনো ব'সে জিরিয়ে। প্রবল ক্ষুধায় তার দেহ এবং মন একটা অস্পষ্ট অথচ গভীর যাতনা অনুভব করছে। একমাত্র চিন্তা তার মনে "খেতে হবে"—কেমন ক'রে খাদ্য সংগ্রহ হবে তা সে জানে না।

বহু কষ্টে ঘণ্টা-তিনেক ধরে চলবার পর দূরে গ্রামের গাছপালা তার দৃষ্টিগোচর হল—তার চলার বেগও একটু বাড়লো।

গ্রামে ঢুকে প্রথম যে লোকটির কাছে সে হাত পাতলো তার কাছ থেকে সে জবাব পেলো "আবার এসেছিস—তোর হাত থেকে কি অব্যাহতি পাব না?"

সে এগিয়ে চলল। দরজায় দরজায় সে ঘুরল—ভিক্ষে পেল না, লাঞ্ছনা পেল। তবু সে গোঁ-ভরে চলল আর এক বাড়ী, তার পরে আর এক বাড়ী। কিন্তু জুটলো না কিছুই। দিনটাই খারাপ, ঠাণ্ডায় মানুষের মন পর্য্যন্ত যেন অসাড় হয়ে পড়েছে—দয়ামায়াও লোপ পেয়েছে।

ক্রমশঃ শরীর অবশ হয়ে আসে, চলা দায়, লাঠি দুখানা যেন দু-মণ বোঝা—তোলাই কষ্টকর।

মণ্ডলের গোলাবাড়ীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে সে আর চলতে পারল না—হাতার এক পাশে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। সেইখানে সে অনেকক্ষণ মড়ার মত পড়ে থাকল।

পশু যেমন তার কষ্টটাই বোঝে, অবস্থাটা বোঝে না, সেও তেমনি নিজের অসহায় শোচনীয় অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারল না, কেবল একটা যাতনা অনুভব করতে

লাগল। কিসের আশায় সে সেখানে পড়ে থাকল কে জানে—হয়ত সেই অস্পষ্ট আশা যা চিরকাল মানুষের বুকে বাস করে, মানুষকে সাহস দেয়। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসে প'ড়ে প'ড়ে সে বোধ হয় মনে করছিল সাহায্য সে পাবে—কেমন ক'রে তা সে জানে না—হয়ত আকাশ থেকে সে সাহায্য আসবে—হয়ত মানুষেরই হাত থেকে সে সাহায্য আসবে। এক দল কালো কালো মুরগি খাদ্য খুঁজে খুঁজে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। মাঝে মাঝে তারা এক একটা শস্যের দানা বা পোকা ঠোঁটে করে খুঁটে খাচ্ছে, ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে তারা তাদের আহার্য্যের সন্ধান করছে এবং পাচ্ছে।

ঘণ্টা চেয়ে চেয়ে দেখল—দেখতে দেখতে কি যেন অস্পষ্ট খেয়াল মনে জেগে উঠল, ঠিক যেন মনে নয়—যেন তার খালি পেটে।

কিছু না ভেবে-চিন্তেই একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ এমন জোরে ছুঁড়ে মারলো যে সামনের মুরগিটা কাত হয়ে পড়ে ডানা ঝট্‌পট্ করতে লাগল। আরগুলো তাদের সরু সরু পায়ের উপর ভর ক'রে এঁকে বেঁকে ছুটে পালিয়ে গেল। ঘণ্টা তাড়াতাড়ি তার লাঠিদুটো হাতড়ে নিয়ে উঠে পড়লো এবং মুরগির মতই এঁকে বেঁকে শিকারের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু যখন সে রক্তাক্ত কালো মুরগিটাকে হাতে ক'রে তুলতে যাবে তখন হঠাৎ পেছন থেকে খেলো এমন এক ধাক্কা যে হাতের লাঠি ছুটে গেল—সে হুড়মুড় ক'রে দশ-বার পা সামনে গিয়ে পড়ল। মণ্ডল যেন ক্ষেপে গিয়ে তাকে মারতে লাগল—কখনো হাত দিয়ে কখনো পা দিয়ে। সে নির্দ্দয় প্রহার থেকে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা ঘণ্টার আদপেই ছিল না। আশপাশ থেকে যারা এলো তারাও ঘা-কতক ক'রে দিতে ছাড়ল না। অনেকক্ষণ মারধর করবার পর ঘণ্টাকে ঠেলেঠুলে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তারা গেল পুলিসে খবর দিতে।

একে ত খিদেয় আধমরা, তার উপর এই ভীষণ প্রহার—ঘণ্টা রক্তাক্ত দেহে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যা কেটে গেল, রাতও কেটে গেল, সকাল হ'ল—তার ভাগ্যে আহার জুটলো না।

দুপুর বেলা পুলিস এসে খুব সাবধানে দরজা একটু ফাঁক ক'রে তাকে দেখল কারণ তারা মণ্ডলের কাছে ইতিপূর্ব্বেই শুনেছিল যে ঘণ্টা লোক ভয়ঙ্কর এবং মণ্ডলকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

ঘণ্টাকে শুয়ে পড়ে থাকতে দেখে পুলিসের একটু ভরসা হ'ল, দরজা আর একটু ফাঁক ক'রে পুলিসের হাবিলদার হুকুম করল "বেরিয়ে আয়।" কিন্তু বেরিয়ে আসাটা ঘণ্টার পক্ষে খুব সহজ হল না, চেষ্টা করেও সে খাড়া হ'তে পারল না। পুলিসেরা ভাবল ব্যাটা বদমায়েস, ইচ্ছে ক'রে উঠছে না, দু-জন পুলিস চট্ করে ঘরে ঢুকে পড়ে ঘণ্টার কাঁধ ধরে ভীষণ এক ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুলে লাঠির উপর দাঁড় করিয়ে দিল।

হঠাৎ চিরদিনের সেই পুলিসভীতি ঘণ্টার মনকে আচ্ছন্ন করল। শিকারীকে দেখলে শিকারের মনে যে ভয় হয়, বেড়ালকে দেখলে ইঁদুরের মনে যে ভয় হয়—এ সেই ভীষণ ভয়। একটা অমানুষিক চেষ্টায় সে খাড়া হয়ে থাকল। হাবিলদার হুকুম করল "চলো।" সে চলল। মেয়েরা আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলাবলি করতে লাগল, পুরুষেরা অজস্র গালাগালি দিল। এত দিনে পাপ বিদেয় হ'ল!

ঘণ্টা চলেছে—তার দু-পাশে চলেছে দু-জন পাহারা। ভয় তাকে আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন করেছিল। পথের শেষ নাই, অভিভূতের মত সে চলেছে। পথের লোক তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—দেখবার জিনিস বটে!

সন্ধ্যার কাছাকাছি তারা শহরে এসে পৌঁছল। এত দূর ঘণ্টা কখনো আসে নি, কি যে ঘটছে—কি যে ঘটবে—তা বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না। অচেনা মানুষ, দালান কোঠা, ঘটনার পর ঘটনা তাকে স্তম্ভিত ক'রে ফেলেছিল।

একটা কথাও সে বলে নি, কথা বলা তার অভ্যাসও নয়। অনেক কাল সে কারু সঙ্গে কথা কয় নি—হয়ত সে ভাষাই ভুলে গেছে, হয়ত তার চিন্তা এত এলোমেলো যে তা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শহরের গারদে তাকে আটকে রাখা হলো। পুলিসেরা একবার ভাবলেও না যে তার খাদ্য পানীয়ের কোন প্রয়োজন আছে। সকাল পর্য্যন্ত সে আটক থাকলো।

সকাল বেলা গারদের দরজা খুলে যখন তাকে বার করতে গেল তখন তারা দেখলো সে মরে মাটিতে পড়ে আছে।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!*

* গি দ মোপাসাঁ'র মূল ফরাসী হইতে।

ভারতীয় নৃত্যে রূপ-রীতি, ধর্ম্ম ও সঙ্গীত

শ্রীমণি বর্দ্ধন

ছন্দময় এ সংসার। জীবনে জীবনে—গ্রহে উপগ্রহে—অণুতে পরমাণুতে—সর্ব্বত্রই ছন্দের লীলা। বিশ্বে ছন্দহীন কোথাও কিছু নাই। গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিতেছে—নক্ষত্র হিসাবে সূর্য্যও আবার স্বীয় পরিজনসহ অপর কোন বৃহত্তর নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—সে নক্ষত্রও তেমনি আপন সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান। সর্ব্বত্রই ছন্দায়িত গতি। যে-বিশ্বের মূলেই ছন্দ, সেই বিশ্বের অধিবাসী মানুষের রক্তে ধমনীতে যে ছন্দেরই নেশা থাকিবে—তাহাতে বিচিত্র কি। বৈচিত্র্যময় জীবনের কার্য্য-কলাপের মধ্যেও অন্তর্নিহিত ছন্দ বিদ্যমান। পৃথিবীর বুকে খেলা চলে ষড়ঋতুর; প্রকৃতি সাজে নব নব রূপে—সেও ছন্দোবদ্ধ; ব্যতিক্রম কোথাও ঘটে না। ফুল ফোটে, ফল হয়, বীজ ঝরে, গাছ জন্মায়—একই ছন্দে ঘুরিয়া আসিতেছে বার বার—ছন্দের স্রোতে ভাসিয়া চলে সকলেই। বিশ্বের মূলে গতি, সেই গতি ছন্দময়; ছন্দহারা গতি সৃষ্টিস্থিতির পক্ষে অনুকূল নয়।

মানুষ অন্তরমধ্যে সত্য সুন্দরকে উপলব্ধি করিয়া সেই অব্যক্তকে রূপায়িত করিয়াছে, ছন্দরূপে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে—চিত্রে। ধ্বনি সঙ্গীতের প্রাণ। ধ্বনিও কিন্তু শব্দতরঙ্গ ব্যতীত কিছুই নয়। সেই শব্দতরঙ্গ ছন্দের হিল্লোলে হিল্লোলিত হইলে আমরা বলি সুর—যখন সুর-তরঙ্গে ছন্দের বৈষম্য ঘটে ধ্বনি হয় তখন বেসুরা। সোজা কথায়, সঙ্গীত ছন্দায়িত শব্দতরঙ্গেরই নামান্তর মাত্র। সেইরূপ গতিমূলক ছন্দায়িত দেহভঙ্গীর নাম নৃত্য—তুলির রেখায় রঙে শিল্পী-মনের ছন্দ যখন ধরা পড়ে—বলি চিত্র, বাক্য ছন্দিত হইয়া অন্তরে যখন গতির অনুভূতি জাগায়—বলি কাব্য। ছন্দই ইহাদের প্রাণ—সেজন্য ইহারা এত মধুর, এত মর্ম্মস্পর্শী। ছন্দ ব্যতীত নৃত্য গীত বাদ্য কাব্য চিত্র কিছুই সম্ভব নয়।

মানব জাতির তথা সভ্যতার বয়স পৃথিবীর বয়সের তুলনায় বেশী দিনের নয়; মাত্র কয়েক সহস্র বৎসরের; এত অত্যল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে কত সভ্যতা ভাঙ্গিয়াছে গড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিওলিথিক, ব্যাবিলোনিয়ান, এসিরিয়ান, গ্রীক, রোমান, দ্রাবিড়, আর্য্য, ইসলাম প্রভৃতি সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে; বহু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সভ্যতার কখনও হইয়াছে অগ্রগতি, কখনও বা অবনতি। কোন কোন সভ্যতা ইতিমধ্যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মনের রং, রুচিবোধ, সংস্কার, কৃষ্টির ছাপ রহিয়াছে সেই সব জাতির শিল্পীদের কল্যাণে গুহাগাত্রে, তাহাদের অঙ্কিত চিত্রে, লিপিমালায়। সেই যুগেও মানুষ পশুশিকারের জন্য পাথরের যে বর্শা ব্যবহার করিত, অবসর সময়ে মাজিয়া ঘষিয়া তাহা সুরূপ করিয়াছে; শিকারের পর মনের রঙে রাঙাইয়া শিকার-দৃশ্য গুহাগাত্রে অঙ্কিত, করিয়া রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়াছে। দেহের ক্ষুধা মিটাইয়াই তৃপ্ত থাকে নাই, প্রকাশের ক্ষুধাও তাহাদের

ছিল। প্রকাশও করিয়াছে—অদ্যাবধি যার নিদর্শন রহিয়াছে যোগা, আল্টিমেরা প্রভৃতি গুহাতে। মনের আনন্দে মানুষ গান গাহিয়াছে—নৃত্য করিয়াছে। কোন কোন গোষ্ঠী নৃত্য করিত দলপতির গৃহে, উৎসবে—কোন কোন গোষ্ঠী নৃত্য করিয়াছে মন্দিরের সম্মুখে, কেহ বা করিয়াছে অপদেবতার রোষ-প্রশমনের জন্য। কে কোন্ দলভুক্ত, কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বুঝিবার সহজ উপায় ছিল নৃত্য—এই বিংশ শতাব্দীতেও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে পরিচয়ের প্রথম প্রশ্ন হয়—তোমার নৃত্যরীতি কি? প্রাণিজগতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বসন্ত-সমাগমে পাখীরা গান গায়; মুগ্ধ করার জন্যে একে অপরের সম্মুখে নৃত্য করে। নৃত্যের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক সুস্পষ্ট ইতিহাস না থাকিলেও ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মানুষের ভাষার সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তির বহু পূর্ব্বেই মানুষের মনের ভাবের আদান-প্রদানের বাহন হিসাবে আঙ্গিক অভিনয় সাহায্য করিয়াছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আঙ্গিক অভিনয় ও হস্তমুদ্রার ব্যঞ্জনা ধ্বনিজ ভাষার চেয়েও অর্থপ্রকাশে অধিকতর কার্য্যকরী ও ব্যাপক হইয়াছে। আদিম যুগে গণনৃত্য ছিল সহজ সরল আনন্দের অভিব্যক্তি—ক্রমে ক্রমে যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট মনের রুচি, ধর্ম্ম, সংস্কার ও সৌন্দর্য্যবোধে আসিল পরিবর্ত্তন—ফলে নৃত্যে আসিল বৈচিত্র্য, ভিন্ন দেশীয় শিল্পীদের স্বকীয়তার ছাপে ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে নানা দেশীয় নৃত্য নানা রূপ ধারণ করিল। কোন কোন দেশের শিল্পীর দৃষ্টি হইল বহির্ম্মুখী—ইন্দ্রিয়জগৎ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িল; বস্তুজগতের আকার ও রূপের রসসৃষ্টিতে যত্নবান হইল। আবার কোন দেশের শিল্পীর দৃষ্টি হইল অন্তর্ম্মুখী—নৃত্যের বিষয়বস্তুর ছন্দায়িত রূপে দর্শকের মনে অসীমের অনুভূতি জাগাইতে চাহিল। কেহ চাহিল পাদকর্ম্ম ও দেহকর্ম্মের নানা কৌশলের দুরূহ আয়াসসাধ্য কসরৎ দেখাইয়া মানুষকে বিস্মিত করিতে এবং কোন কোন দেশের শিল্পী নৃত্যচ্ছন্দে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সহজ সরল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিল এবং নৃত্যকে গ্রহণ করিল ধর্ম্মের সঙ্গে মনোজগতের যোগাযোগ নিবিড় করিবার বাহনরূপে। ভারতের 'মার্গ'নৃত্য ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এ-ভাবেই গড়িয়া উঠিল। পৌরাণিক উপাখ্যানের গল্পও নৃত্যবিষয়বস্তু হইল। ছন্দে গীতে, ধর্ম্মের জটিল তত্ত্বে, আনন্দ বেদনার মধ্য দিয়া সাধারণের কাছে শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য হইয়া উঠিল—ক্রমে আসিল বিধিবিধান। রুচিভেদে ও সৌন্দর্য্যবোধভেদে নৃত্যরীতি, রূপবন্ধ প্রকাশভঙ্গী ও দৃষ্টিতে আনিল ভেদ—সৃষ্টি হইল বিভিন্ন দেশীয় নৃত্য।

প্রাচীন ভারতে নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির বিভিন্নতা হেতু একাধিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্য এবং কোন সম্প্রদায় যে নৃত্যের রীতি ও রূপবন্ধের বহিরঙ্গ খুঁটিনাটির উপর বেশী জোর দিয়াছিল অন্য সম্প্রদায় সে নৃত্যের অন্তরঙ্গ রসস্ফূর্ত্তির বিকাশের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু অভিনয় বলিতে সকলেই বাচিক, আঙ্গিক আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ই বুঝিতেন। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে পদ্মযোনি ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে যথাক্রমে পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মকামার্থমোক্ষপ্রদ এই নৃত্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। নাট্য ছিল রসাশ্রয়—নৃত্য ভাবাশ্রয় এবং নৃত্ত ছিল তাললয়াশ্রয়। নৃত্য ও নৃত্ত ছিল দ্বিবিধ প্রকার—মধুর অর্থাৎ লাস্য, উদ্ধত অর্থাৎ তাণ্ডব। তাণ্ডবের ছিল ত্রিবিধ ভেদ—যথা চণ্ড, প্রচণ্ড, উচ্চণ্ড। এবং লাস্য নৃত্যের ছিল চতুর্ব্বিধ ভেদ; যথা—লতা, পিণ্ডী, ভেদ্যক ও শৃঙ্খলা। নটের কর্ম্ম ছিল নাট্য এবং নর্ত্তক-কর্ম্ম ছিল লয় তাল সমন্বিত অঙ্গ উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমূহের দ্বারা পদার্থাভিনয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির লয়তালবিহীন বিক্ষেপাত্মক অভিনয়কে নাট্য বলা হইত। ভাবাশ্রয় নৃত্যকে বলা হইত "মার্গ" নৃত্য এবং ভাবরহিত নৃত্যকে বলা হইত "দেশী" নৃত্য। "দেশী" নৃত্যে থাকিত অঙ্গবিক্ষেপের বাহুল্য। এই নৃত্যরূপবন্ধের রীতিপদ্ধতিই কালক্রমে বিভিন্ন দেশে রুচি অনুযায়ী অলঙ্কৃত ও বর্জ্জিত হইয়াছে এবং ভিন্ন পদ্ধতির নৃত্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতা হেতু মতদ্বৈধ হওয়ায় ভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের নৃত্যরীতির পরিচয় যে কয়খানি গ্রন্থে পাওয়া যায়, সব কয়েক জন গ্রন্থকর্ত্তার মধ্যেই নৃত্যরীতি রূপবন্ধ সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। ভরতমুনি-কৃত 'নাট্যশাস্ত্রে' শিরঃ কর্ম্মের বিধান তের প্রকার; নন্দীকেশ্বর-কৃত 'অভিনয় দর্পণে' শিরঃকর্ম্ম পাই নয় প্রকার; আবার শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকরে' ঊনিশ প্রকার দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত গ্রীবাকর্ম্ম, দৃষ্টি, অসংযুত হস্ত, সংযুত হস্ত, নৃত্তহস্ত, মণ্ডল, চারী প্রভৃতিতেও মতভেদ অল্পবিস্তর। 'অভিনয় দর্পণে' ভিন্ন প্রকার হস্তকর্ম্ম, উৎপ্লবন, ভ্রমরী প্রভৃতি পাদকর্ম্মের রূপরীতি যেমন পাওয়া যায়, তেমন ভরতমুনি-কৃত 'নাট্যশাস্ত্রে'ও করণ, অঙ্গহারের ভিন্ন প্রকার নৃত্যবিধি পরিলক্ষিত হয়, আবার শার্ঙ্গদেবের পুস্তকে বর্ত্তনা ও চালক ইত্যাদিতে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা

শুধু অঙ্গ, উপাঙ্গ, করণ, স্থানক, মণ্ডল, চারী সম্পর্কে লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; এমন কি সভানায়ক যিনি হইবেন তাঁহার কি গুণ ও লক্ষণ থাকিবে এবং পাত্রলক্ষণ কি এবং কিঙ্কিণী (নূপুর, মল) যে কাংস-নির্ম্মিত, সুস্বর স্বরূপ হওয়া দরকার এবং নীলসূত্রে গ্রথিত থাকিবে তাহারও নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ('অভিনয় দর্পণ' ২৯-৩০ শ্লোক)। নৃত্য প্রয়োগকালে দেশ কাল পাত্রের রুচি ও সৌন্দর্য্য-বোধ যে বিস্মৃত হইলে চলিবে না, এবং বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তায় অভিনবত্বে স্বীয় উপলব্ধ সত্য সুন্দরের রূপ প্রকাশের সময়েও যে শিল্পীকে তৎতৎ দেশীয় রীতিনীতি, ধর্ম্ম, সংস্কার ও রুচিসৌন্দর্য্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত দিতে গিয়া রসপরিবেশনকালীন বৃত্তি সম্পর্কে অনেক কথা সে যুগেই মহামুনি ভরত বলিয়া গিয়াছেন। সেই যুগেও যে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন "বৃত্তি" রুচি অনুসারে প্রয়োগ করা হইত, ভরতমুনি-কৃত 'নাট্যশাস্ত্রে' উক্ত "দাক্ষিণাত্যা", "পাঞ্চালী", "উড্রমাগধী", "আবন্তী" প্রবৃত্তির বিধান হইতেই স্পষ্ট অনুমিত হয়। প্রবৃত্তির উপরোক্ত নামগুলি দেশের নাম অনুসারেই হইয়াছিল। যেহেতু আবন্তী প্রভৃতি দেশের নাটকীয় অভিব্যক্তির এক একটি বিশেষ ধারা ও ভঙ্গীর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহার মূলে ছিল সর্ব্বসাধারণের কতকগুলি মৌলিক মনোবৃত্তির প্রাধান্য। কাজেই ঐ বিশেষ সুর ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তাহাদের নৃত্য ব্যঞ্জনা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই স্বাতন্ত্র্যই অবন্তীয়দিগের বৈশিষ্ট্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীতে যাহাদের সহিত তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা আছে, তাহাদের নৃত্যরীতির প্রতীক এই "আবন্তি প্রবৃত্তি"। অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্পর্কেও এই কথাই খাটে। "দাক্ষিণাত্যা" প্রবৃত্তির মধ্যে শৃঙ্গার, বহুল নৃত্য-গীত বাদ্যাদির এবং চতুর, ললিত, মধুর অঙ্গাভিনয়ের প্রাচুর্য্যহেতু কৈশিকীবৃত্তি প্রধান ছিল। "আবন্তী" প্রবৃত্তিতে শৃঙ্গার থাকিলেও ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা প্রবল ও প্রধান ছিল বলিয়া "সাত্বতী" বৃত্তি প্রধান ছিল। "উড্রমাগধী" প্রবৃত্তিতে আড়ম্বর জাঁকজমক কোলাহল যুদ্ধবিগ্রহ হিংসাদি প্রবল বলিয়া "ভারতী" ও "আরভটী" বৃত্তি প্রধান ছিল এবং "পাঞ্চালী" প্রবৃত্তিতে ভারতী ও আরভটী বৃত্তি থাকিলে "কৈশিকী" বৃত্তির মিশ্রণ থাকিবে,—এই নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল। এই প্রকার ভেদ ও সাদৃশ্য থাকার জন্য দেশকালোপযোগী ভাবে শিল্পীকে "ভারতী", "সাত্বতী", "কৈশিকী" ও "আরভটী" এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিতে অভিনয় করিতে ভরতমুনি বলিয়া গিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রধানভাবে অনুসরণ করিতে হইবে তাহারই একটা বিস্তৃত তালিকা মহামুনি ভরত 'নাট্যশাস্ত্রে' দিয়াছেন (৩৯-৫০ শ্লোক, ১৩শ অধ্যায় নাট্যশাস্ত্র)। শুধু তাহাই নহে, তিনি নৃত্যগতির রস সম্পর্কে শান্তরসপ্রধান গতিতে বণিকের ও সচিবের গতি, এবং যতি, শ্রমণ, তপস্বী এবং অন্ধকারে পথচারীর গতিতেও কি ভেদ থাকিবে এবং হাস্য-রসমূলক ও অন্যান্য রসমূলক গতি কি প্রকার হইবে; এমন কি অভিনয়কালীন কোন্ চরিত্রাভিনেতা কি ভাবে কোন্ দ্বার দিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তাহারও খুঁটিনাটি বিবরণ নিখুঁতভাবে শত শত বৎসর পূর্ব্বেই 'নাট্যশাস্ত্রে' এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহা হইতে তদানীন্তন নৃত্যের ও অভিনয়ের উৎকর্ষ স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, শঙ্কিতা, বিষণ্ণা, মুকুলা প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিতে—তারা কর্ম্ম, অক্ষিপুট কর্ম্ম কিরূপ হইবে এবং নয়নের প্রান্তভাগ কখন মালিন্য ও কখন ক্ষীণ অবসাদযুক্ত হইবে তাহারও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। রসদৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধ প্রভৃতি আট প্রকার স্থায়ী রসদৃষ্টি এবং শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা প্রভৃতি বিংশতি প্রকার সঞ্চারী রসদৃষ্টি সম্পর্কে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—রসদৃষ্টি প্রসঙ্গে অনুভাব, বিভাব ও স্থায়ীভাব প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষের নানারূপ রীতিবিধানের ব্যাখ্যাও করিয়া গিয়াছেন। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় ইত্যাদি স্থায়ীভাবের উদ্বোধক বা কারণকেই বিভাব বলে। বিভাবও আবার দুই প্রকার—(ক) আলম্বন অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসসৃষ্টি হয়, এবং (খ) উদ্দীপন—অর্থাৎ যাহা রসকে উদ্দীপিত করে—যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এবং এই আলম্বন ও উদ্দীপন দ্বারা সৃষ্ট ঐ স্থায়ী-ভাবসমুদয়ের বহিঃপ্রকাশ-কার্য্যের নাম অনুভাব। এবং যে সমস্ত গতিশীল ভাব কখনও আবির্ভূত, কখনও বা নিমজ্জিত হইয়া স্থায়ীভাবের রসপুষ্টির জন্য মনে আনাগোনা করে তাহাকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে। গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া ইত্যাদি তেত্রিশটি উপরোক্ত সঞ্চারী ভাবের সৃষ্টি কি ভাবে করিতে হইবে, তাহারও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উরঃকর্ম্ম, পার্শ্বকর্ম্ম, জঠরকর্ম্ম, কটিকর্ম্ম, জঙ্ঘাকর্ম্ম প্রভৃতির প্রকার-ভেদও উক্ত 'নাট্য-শাস্ত্রে' আমরা দেখিতে পাই। এই সকল রূপবদ্ধ ও

বলীদ্বীপের নৃত্য
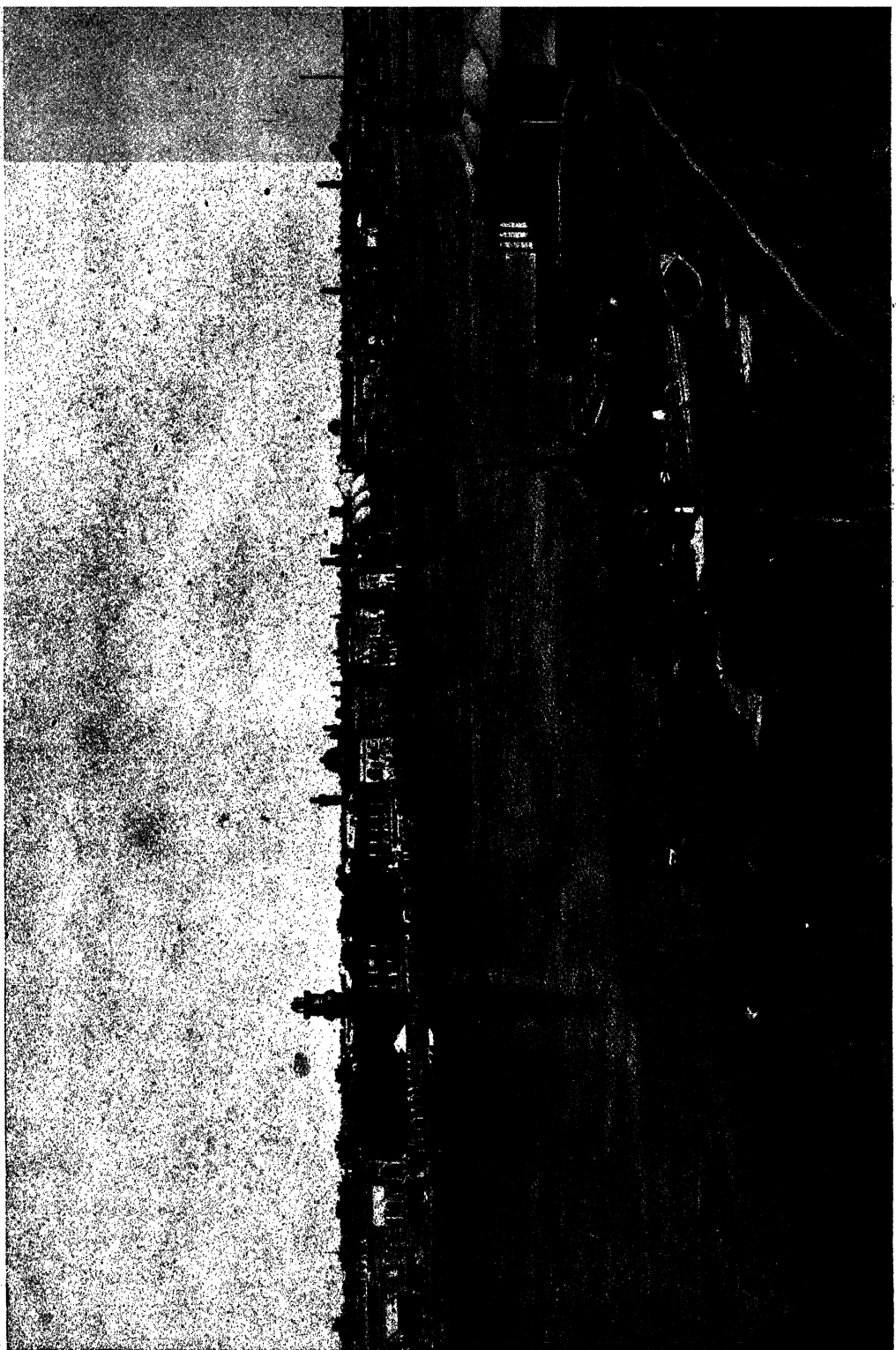
বাগদাদ ও টাইগ্রিস নদী। ইরাকের এই অঞ্চলে ব্রিটিশ ও ইরাকীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে

রূপরীতিপদ্ধতি যে দীর্ঘকালের কত সাধনায় পুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং নৃত্যকলা যে তদানীন্তন সময়ে কত দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে!

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের আংশিক নৃত্যবিধি ও রীতি গ্রহণ করিয়া নানা যুগে নানা দেশের শিল্পীমনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া রূপে রসে স্বকীয়তায় নৃত্যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়ায় পুষ্ট মানুষের মনের রূপ ও রুচিবোধ এক হইতে পারে না—কাজেই প্রকাশভঙ্গী ও রূপব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য আসিয়াছে, ফলে দক্ষিণী, কথাকলি, কথক, মণিপুরী প্রভৃতি নৃত্যের বিভিন্ন নৃত্যরীতি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রকার নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সে জন্যই রীতিপদ্ধতিতে এত প্রভেদ। তদুপরি শিল্পীমনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেশের ধর্ম্ম, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। মণিপুরের ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শান্তিকামী, ভক্তিপ্রবণ বৈষ্ণবশিল্পীর রূপসৃষ্টিতে যে তাহার অন্তরের ছাপ জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতেই হউক থাকিয়া যাইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক; তাই মণিপুরী নৃত্য ভক্তি ও শান্ত রস মূলক। মণিপুরী নৃত্য-শিল্পীর ভক্তিনম্র চিত্তের সুগভীর ছাপ মণিপুরী রাসনৃত্য ও খোবাক-ঈশেই নৃত্যে। ঠাকুরঘরের সম্মুখে নৃত্যের আয়োজন, অন্তরের আনন্দে ও ভক্তির প্রেরণায় দেবপ্রীতির জন্য তাহাদের নৃত্য! তাই নৃত্য-বাসরের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় জাঁকজমক বা অনাবশ্যক কৃত্রিম আড়ম্বরের বালাই নাই; রং-বেরঙের আলোকসম্পাত ও অঙ্গরাগ নাই। এমন কি পাছে রসসৃষ্টিতে আবিলতা আসে, সেজন্য ভ্রূভঙ্গী, অক্ষিপুটকর্ম্ম ইত্যাদিও স্থান পায় নাই। শিল্পীর নৃত্যকালে সমাহিত শান্ত মুখমণ্ডলে তাহার অন্তরের আবেগ ও ভক্তি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। শিল্পী যখন তাহার হাইবা (পাশে হাত নেওয়া), লোংলৈ (চিৎ হয়ে ঘুরা), চোংবা (লাফ দেওয়া) ইত্যাদি বিচিত্র মণিপুরী অঙ্গহারে একটির পর একটিতে ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলে তাহার দেহরেখায়—তখন মনে হয় যেন ইহাদের অন্তরেই আছে মূল উৎসটি—স্বতঃস্ফূর্ত্ত বহিঃপ্রকাশ হইতেছে মাত্র! অন্তরের বক্তব্য অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া সহজ নৃত্যচ্ছন্দের মধ্য দিয়া অপরূপ দেহভঙ্গিমায় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু সেই মণিপুরেই যখন তাহাদের মৈরাং অঞ্চলে অধুনা-প্রচলিত নৃত্য—"লায়হরাওবা" নৃত্য দেখি, তখন স্বতঃই দক্ষিণ-ভারতের শিবমন্দিরের সম্মুখে নাট্যশাস্ত্রোক্ত করণ

মণিপুরী রাসনৃত্যে রাধাকৃষ্ণ

অঙ্গহার সমন্বিত ভারতীয় নাট্যম্ বা দক্ষিণী নৃত্যরীতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কারণ "লায়হরাওবা" নৃত্য অতি প্রাচীন কালের নৃত্য, যখন মণিপুরবাসীরা শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলনের সঙ্গে মণিপুরে রাসনৃত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। একই দেশে তাই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শিল্পীর মনের ছাপ ও বৈচিত্র্য উপরোক্ত দুই প্রকার নৃত্যরীতিতে দেখিতে পাই।

মণিপুরে কীর্ত্তন গানের সঙ্গে নৃত্যের প্রথা। গানের অর্থ ও ভাব দেহভঙ্গীতে ব্যক্ত করাই শিল্পীর লক্ষ্য। সে জন্যই শিল্পীর দৃষ্টি কেবল পাদকর্ম্মে বা কোন এক অঙ্গবিশেষে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরাধিকা বা বিশাখা প্রভৃতি অন্যান্য কাহারও পায়েই নূপুর কিঙ্কিণী বা মলের ব্যবহারের রীতি মণিপুরে আমি দেখিতে পাই নাই। বরং উত্তর-ভারতের লক্ষ্ণৌ অঞ্চল হইতে গৃহীত নৃত্যরীতির সঙ্গে মণিপুরের নৃত্যরীতি মিশ্রণে মণিপুরে অধুনা-প্রচলিত বাইজীর অনুকরণে যে "লাইছবী" নৃত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঘুঙুরের প্রচলন এবং কথক নৃত্যের বোল তোড়ার ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অপর পক্ষে ভিন্ন যুগে বিভিন্ন আবহাওয়ায় পুষ্ট ও পারিপার্শ্বিকতার জন্য একই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও উত্তর-ভারতের "কথক"

মণিপুরী লোকনৃত্য "লায়হরাওবা"

নৃত্যের রূপরীতি অন্য প্রকার হইয়াছে। উভয় দেশের নৃত্যই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক; কিন্তু রূপরীতি ও ভাবব্যঞ্জনায় দুই প্রদেশের নৃত্য দুই প্রকার, মোটেই সাদৃশ্য নাই—যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ভিন্ন আবহাওয়ায়—বিভিন্ন কালের পারি-পার্শ্বিকতায় পুষ্ট মনের চিন্তার ধারা ও রসবোধ এক প্রকার নয় বলিয়াই শিল্পীর প্রকাশের রূপরীতিপদ্ধতি ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। "কথক" নৃত্যের সৃষ্টি মধ্যযুগে। প্রথম অবস্থায় নৃত্য হইত পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে, পরে "কথক" নৃত্যবিদ্‌গণ পাখোয়াজের পরিবর্ত্তে তবলার সূক্ষ্ম বোলের সঙ্গেই নৃত্য প্রবর্ত্তন করিলেন। তবলার সূক্ষ্ম ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া শিল্পী তাহার সমগ্র সাধনা নিয়োজিত করিলেন বিভিন্ন প্রকার তালে লয়ছন্দে ও পাদকর্ম্মে। ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্য এবং তবলার বোলের বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্মধ্বনি ও ছন্দ পায়ের নূপুরের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়া দ্রষ্টার মন রসসিক্ত করিবার চেষ্টায় কথক শিল্পীরা সমস্ত শ্রম ঢালিয়াছেন এবং শুধু পাদকর্ম্মে একাগ্রচিত্ততা হেতু অন্যান্য অঙ্গ, উপাঙ্গ সম্বন্ধে শিল্পী যথেষ্ট যত্নবান্ হইতে পারেন নাই, সেই জন্য "কথক" নৃত্যে দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্য কম, ফলে আসিয়াছে একঘেয়েমি, কিছুক্ষণ দেখার পরেই চক্ষু পীড়িত হয়, মনে আনে অবসাদ। কথক নৃত্যের ছন্দে, তালে, লয়ে যত অভিনবত্বই থাকুক না কেন, যত সূক্ষ্ম পাদচালনা এবং আয়াসই থাকুক না কেন, দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও মূর্চ্ছনার অভাবে দ্রষ্টার মনে ও চোখে অবসাদ আনিবেই। শুধু নূপুরের ছন্দ ও তালের বৈচিত্র্যই নৃত্য নয়—নৃত্য দেখারও জিনিস। কথক নৃত্যের 'চক্করদার' বোলের সঙ্গে একই স্থানে বহুবার ঘুরিয়া, আড়ি কুআড়ি ছন্দে, এক শত আটাশ মাত্রার পর এক শত উনত্রিশে তেহাই দিয়া সমে আসিয়া পৌঁছাইতে সত্যই সাধনার প্রয়োজন, এবং কসরৎও আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া শক্ত, বরং স্তম্ভিত বিস্মিত হইতে পারি এবং শিল্পীর ভাবব্যঞ্জনায় স্বকীয়তা ও সৃষ্টি কতটুকু চিন্তা না করিয়া শুধু শিল্পীর আশ্চর্য্য দম দেখিয়া উল্লসিত হইতে পারি এবং ক্লাসিকেল নৃত্য দেখিতেছি ভাবিয়া নিজকে সান্ত্বনা দিতে পারি! কিন্তু তাহাতেও "কথক" নৃত্যকে ক্লাসিকেল নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না—এই "কথক" নৃত্যকে প্রাচীন ভারতের নৃত্য-ব্যাকরণানুসারে নৃত্ত বলা চলে। এতদ্ভিন্ন "কথক" নৃত্যে শৃঙ্গার ও করুণ রস ব্যতীত অন্যান্য রসস্ফুরণের সম্ভাবনা নাই, যদিও কৃষ্ণতাণ্ডব নামে "কুকু থব্‌রি, দিগন্না থব্‌রি" এই বোলের সঙ্গে তাণ্ডবের রূপ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের বিশ্বসংহারকর্ত্তা শিবের তাণ্ডব নৃত্যের তাণ্ডব ব্যঞ্জনার পার্শ্বে ইহা নিষ্প্রভ। কারণ দেহের অতিভঙ্গ রেখাতে তাণ্ডবের যে ব্যঞ্জনা আসে, সে ক্ষেত্রে "কথক" নৃত্যের দেহরেখাতে সাময়িক "অতিভঙ্গ" দেহ-রেখা আনিয়া সশব্দে বোলের সঙ্গে নৃত্য করিয়া তাণ্ডব নামাকরণ করিলেই চলিবে কেন! দেহের ব্যঞ্জনায় বীর ও রৌদ্র রস ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ছন্দ বজায় রাখিয়া, তবলাদারকে পরাস্ত করিয়া সমে আসাতে বাহাদুরি থাকিতে পারে, কিন্তু ললিতকলা-ক্ষেত্রে "কথক" নৃত্য আদর্শস্থানীয় এবং ক্লাসিকেল হওয়ার যোগ্য আমি মনে করি না। মনের রং ফলাইতে রূপবন্ধ বাহন হইতে পারে, কিন্তু শুধু রূপবন্ধই নৃত্য হইতে পারে না। রূপবন্ধ নৃত্যের ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। যেমন সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রয়োজন আছে কিন্তু ব্যাকরণ ও অভিধানই সাহিত্য নয়, কাব্যও নয়,—সহায়ক মাত্র; তেমনি নৃত্যেও বোল, ছন্দ, লয়, আঙ্গিক অভিনয় ও পাদকর্ম্ম শিল্পীকে রূপসৃষ্টিতে বাহন হিসাবে সাহায্য করে। তবুও অনেকে একমাত্র এই আয়াসসাধ্য "কথক" নৃত্যকেই ক্লাসিকেল-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। কারণ সমে আসিতে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয় এবং যাহা খুব শক্ত তাহাকে আমরা ক্লাসিকেল-পর্য্যায়ভুক্ত করি—অনেক সময় বিশুদ্ধ রাগিণীতে গীত গান মিষ্ট ও সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইলে

ক্লাসিকেল বলিতে আমরা ইতস্ততঃ করিয়া থাকি, কিন্তু হলপ্‌তান ছুটতান দিয়া বিভিন্ন লয়ে রাগভ্রষ্ট ও সুর-ভ্রষ্ট হইয়াও সমে আসিলেও কিন্তু একসঙ্গে সকলে মাথা নাড়িয়া শিল্পীর প্রতিভা স্বীকার করি এবং ক্লাসিকেল-পর্য্যায়-ভুক্ত করি। গোষ্ঠীর বা জাতির সংস্কৃতির ছাপ না থাকিলেও শুধু আয়াসসাধ্য হওয়ার গুণেই আমাদের দেশে ক্লাসিকেলের দাবী চলে। কথক নৃত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেকে বলেন যে, কথক নৃত্যে অভারতীয় নৃত্যরীতির মিশ্রণ রহিয়াছে অর্থাৎ মোগল ও পারস্যের নৃত্যে কৃষ্টির ছাপ আছে একথা হয়ত মিথ্যা নয়। কারণ মোগল যুগেই দরবারে এই নৃত্যের সৃষ্টি—ইহা প্রথমে দরবারী নৃত্য ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে বিশেষ করিয়া মেয়েরাই এই নৃত্যচর্চ্চা করিত। এই কথক নৃত্যপ্রথাকে অবলম্বন করিয়াই বাইজী-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—যার ফলে এই নৃত্যে "ভাও বাংলান" ও শৃঙ্গাররসাত্মক বহুল দেহভঙ্গী স্থান পাইয়াছে। পরে কালক্রমে প্রতিভাবান শিল্পীর প্রচেষ্টায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যানকে ভিত্তি ও নৃত্যবিষয়বস্তু করিয়া অধুনা-প্রচলিত "কথক" নৃত্যরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নব রসে পরিবেশন করিয়া শিল্পীর মনের রূপ রং ফলাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। "কথক" নৃত্যে না থাকিলেও ছন্দ, লয় ও তাল ও পাদকর্ম্মের বৈচিত্র্যে কথক নৃত্যই যে অতুলনীয় সে-কথা স্বীকার্য্য। তাল, লয়, ছন্দরূপ রূপবন্ধের শক্ত বাঁধুনির ফলে এবং "কথক" শিল্পিগণ অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল বলিয়া শিল্পীর অন্তরের ধ্যানঘন রূপকে স্বকীয়তার ছাপে, বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গীতে যেমন রাগের ধ্যানশুদ্ধ ভাবরসটিকে সুরে প্রকাশ না করিয়া, শুধু তানের বাট—ছন্দের বৈচিত্র্য এবং গতির চমক ও বেগোছালতায় রাগকে পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব এবং "ক্লাসিকেল" সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত করা অসমীচীন, তেমনি "কথক" নৃত্যের বিচিত্র ছন্দ-প্রবাহের তান কর্ত্তবে বিস্মিত হইলেও ক্লাসিকেল নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। ক্লাসিকেল হইতে হইলে জাতির কৃষ্টির অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করিতে হইবে সৌকুমার্য্যে হৃদয়ালুতায় ও সংযমে। কথক নৃত্য যেন অনেকটা সুরবিহীন, তান কর্ত্তবে পূর্ণ, খেয়াল গানের মত যদিও তাহাতে বেলা, পরণ, ঝুম গৎএর পাদকর্ম্মের বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব যথেষ্টই আছে। সুরই রাগের প্রাণ, তান কর্ত্তবের ছন্দবাট তার আভা মাত্র। তবে "ভাও বাংলানে" ভাবব্যঞ্জনা আছে সত্য কিন্তু বসা অবস্থায় ভাবাভিনয় করে বলিয়া "ভাও বাংলানে"র রস-

মণিপুরী নৃত্য "তা খোসবা" বা শূলনৃত্য

ব্যঞ্জনা এখনও নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং নৃত্যকে সাহায্য করে নাই। দক্ষিণ-ভারতের অধুনা-প্রচলিত "ভারতীয় নাট্যম্‌" বা দক্ষিণী নৃত্যে 'নাট্যশাস্ত্রের' বিধিবিধান বিশেষভাবে মানিয়া চলিতে দেখা যায়। যদিও 'কথাকলি নৃত্য' দক্ষিণ-ভারতেরই কিন্তু "কথাকলি নৃত্য" অভিনয়প্রধান বলিয়া তাহাদের আঙ্গিক অভিনয়ে—মণ্ডল, চারী, করণ, অঙ্গহারের প্রয়োগ কম দেখা যায়। অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে বহুবিধ মুদ্রা ও হস্তভেদের প্রয়োগই তাহারা অধিক করিয়াছে।

"ভারতীয় নাট্যম্‌" বা "দক্ষিণী" নৃত্যরীতির জন্ম দক্ষিণ-ভারতের মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর প্রভৃতি অঞ্চলে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেশে। তাই এ নৃত্যগীতিতে বীর, রৌদ্র, বীভৎস রসের প্রভাব অধিক। তবে অন্যান্য রসস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনাও যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু মালাবারের "কথাকলি" নৃত্য অভিনয়প্রধান বলিয়া রসপ্রকাশে ভাব-ব্যঞ্জনায় ও মুদ্রা-বাহুল্যে অধিকতর পুষ্ট, কিন্তু তাহারা নৃত্যপ্রথা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল। ভারতের নৃত্য সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া যে এক সময়ে বহির্ভারতেও স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার ছাপে বিবিধ নৃত্যরীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশে এখনও

মণিপুরী নাগানৃত্য

বিদ্যমান। যবদ্বীপের ও বলিদ্বীপের নৃত্যপদ্ধতি ও মুদ্রায় দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের প্রভাব অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। তাহাদের দেহভঙ্গীতে যে রূপ ফোটে, তাহাতে দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের কথা স্বতঃই মনে পড়ে; এতদুভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। তাহাদের নৃত্যনাট্যের অধিকাংশ বিষয়বস্তুই আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান হইতে গৃহীত। তবে তথাকার প্রথা, সংস্কার, ধর্ম্ম, রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের বিভিন্নতাহেতু ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। শিল্পীর উপলব্ধ সত্য সুন্দরের রূপ প্রকাশে দেশে ধর্ম্ম, সংস্কার, রীতি নীতি প্রথার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতির কাঠামোই নানা যুগে জাভা, বালি, শ্যাম, কাণ্ডী প্রভৃতি দেশে যাইয়া অলঙ্কৃত হইয়া নানা রঙে বৈচিত্র্যে বিভিন্ন রূপ পাইয়াছে।

শিল্পীর ধর্ম্ম সৃষ্টি করা। ঘটনার বাস্তব জগতের রূপ বর্ণনা না করিয়া স্বীয় বুদ্ধি ও কল্পনায় তাহাকে বিচিত্র রঙে অঙ্কন করিয়া, এক কথায় জীবনের নিছক প্রতিরূপ না আঁকিয়া, তাহাতে নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতনতর মর্য্যাদা অর্পণ করাই শিল্পীর ধর্ম্ম। নৃত্যরীতি সম্পর্কে করণ, অঙ্গহার, বর্ত্তনা ইত্যাদির সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ থাকিলেও প্রাচীন কালেও ভারতের শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার প্রকাশের ধারায়, শিল্পীকে তাহার রূপসৃষ্টিতে স্বকীয়তার ছাপে—তাহার অভিনীয়মান ঘটনাতে শিল্পীর কাম্য রূপের আদর্শ স্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হইত। প্রাত্যহিক জীবনের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনাকে যখন শিল্পী প্রতিভায়, ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে—বিচ্ছিন্নতা হইতে সমন্বয়ে—এবং বিক্ষিপ্ততা হইতে সঙ্গতিতে উন্নীত করিয়া, বৃহত্তর পরিণতির দিকে—শিল্পীচিত্তের সহিত দর্শকচিত্তকে এক অমোঘ দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেন এবং তদ্দ্বারা অখণ্ড আনন্দের সৃষ্টি করিতেন, সেই প্রকাশভঙ্গী ও সৃষ্টির রীতিকে মহামুনি ভরত "নাট্যধর্ম্মী" প্রবৃত্তি বলিয়া তাঁহার "নাট্যশাস্ত্রে" উল্লেখ করিয়াছেন। আবার শিল্পী যখন স্বভাবানুগত অর্থাৎ অভিনীয়মান চরিত্রের সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রণালীর অবিকল অনুকরণ করিয়া, লোকের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মনোভাব রসানুপ্রাণিত করিয়া যথাযথভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন তখন ঐ অভিনয়-প্রক্রিয়া হয় লোকবার্ত্তানুসারী স্বভাবানুগত লোক-ধর্ম্মীর অন্তর্গত। প্রয়োজনানুসারে যে নাটকোচিত নির্দ্দেশকেও অতিক্রম করা যায় এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত রসসৃষ্টিনৈপুণ্যে বিলাসবহুল ও মাধুর্য্যব্যঞ্জক হইয়া উঠে তাহারই ইঙ্গিত মহামুনি ভরত শত শত বৎসর পূর্ব্বে (ম্যাকডনেল সাহেবের মতেও এই নাট্যশাস্ত্র রচনার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ সাল—যদিও এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে) তাঁহার "নাট্যশাস্ত্রে" লিখিয়া গিয়াছেন।

শিল্পী স্বীয় প্রতিভাবলে নব রসে নব রূপে ক্ষুদ্র ঘটনাতে বৃহত্তর জগতের সন্ধান দিবার অধিকারী হইলেও তাহাকে নৃত্যবিধির সাধারণ রূপবন্ধের বিভিন্ন প্রকারের লীনম্, সমএথম্ প্রভৃতি নৃত্য "করণ"—সূচীবিদ্ধ অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক প্রভৃতি "অঙ্গহার", বিভিন্ন প্রকারের "গতি" "স্থানক", "ভ্রমরী", "উৎপ্লবন", "মণ্ডল"হস্ত, গ্রীবা, শিরঃকর্ম্ম, জঠর কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রূপরীতি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং খুশীমত রূপরীতির নির্দ্দেশ অতিক্রম না করিয়া, রূপবন্ধ বজায় রাখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে অলৌকিক মাধুর্য্যব্যঞ্জক নৃত্যাভিনয়ে নবরূপ সৃষ্টি করিয়া দর্শকচিত্ত রসসিক্ত করিতে হইবে।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে-দেশে নৃত্যশাস্ত্রের ও রসচর্চ্চার রীতি রূপবন্ধ সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়াছিল, সেই দেশের অধিবাসী আমরা আজ সাধনাবিমুখ বলিয়া চর্চ্চার অভাবে প্রকৃত রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি। বরং সুবিধামত সমালোচক সাজিবার লোভে মাঝে মাঝে

পুঁথি হইতে নৃত্যের সংজ্ঞার দুই-চারিটি শ্লোক আওড়াই মাত্র। বড়-জোর অবকাশমত 'ওরিয়েণ্টাল' নৃত্যচর্চ্চা করিয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করি ও দর্শকচিত্ত রসাপ্লুত করি। কারণ অধুনাপ্রচলিত ওরিয়েণ্টাল নৃত্য সহজ, নৃত্যরীতি রূপবন্ধের বালাই নাই। কাজেই সাধনাও প্রায় নিষ্প্রয়োজন; সুযোগ মত নাচিলেই হইল। নৃত্যাভিনয়ে দর্শকচিত্ত মুগ্ধ করিতে চাই—কিন্তু আহার্য্য অভিনয়, সাত্ত্বিক অভিনয়, আঙ্গিক অভিনয়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলেও চলে! উর্ব্বশী নৃত্য, দেবদাসী নৃত্য, শ্রীরাধিকা নৃত্যে পরিচ্ছদে একটু পরিবর্ত্তন করিলেই চলে—নৃত্যের অঙ্গ-চালনা একই থাকে। নৃত্যের চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব ও রূপ পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস নাই; শুধু অর্থহীন অঙ্গবিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট—এবং এই নৃত্যরীতিকে কখনও "ভাবনৃত্য" বলি, কখনও বা বলি ওরিয়েণ্টাল, যেন ওরিয়েণ্টাল বলিলেই নৃত্যরীতি বিধান অতিক্রম করিবার অধিকার জন্মায়। ওরিয়েণ্টাল শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ না জানিয়াও প্রয়োগ করা অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে, যদি আমরা ওরিয়েণ্টাল শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানিতাম তাহা হইলে ওরিয়েণ্টাল শব্দটির এইরূপ অপপ্রয়োগ করিবার দুঃসাহস হইত না। যাহা কিছু পাশ্চাত্যের সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র ভিন্ন প্রকৃতির, ইউরোপ তাহারই নামকরণ করিয়াছিল ওরিয়েণ্টাল বা প্রাচ্য এবং যুগে যুগে প্রাচ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞাও হইয়াছে! পাশ্চাত্য কখনও ভাবিয়াছে প্রাচ্য ক্রীতদাসের দেশ, অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী রাজার দেশ—কখনও ভাবিয়াছে প্রাচ্য মণিমুক্তা হীরা জহরৎ প্রসাধন সম্ভারের দেশ—কখনও ভাবিয়াছে অধ্যাত্ম সাধনমার্গীর দেশ—কখনও ভাবিয়াছে প্রাচ্য খৃষ্টশত্রুর দেশ! আবার এই সয়তানের রাজ্যের সভ্যতাই ইউরোপের চক্ষে অপরূপ হইয়া উঠিল; ক্রুসেড-যুদ্ধ উপলক্ষ্যে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যেদিন সাক্ষাৎ ঘটিল। কাজেই দেখি উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য হইতে বিভিন্ন। যে ইউরোপ এক সময়ে প্রাচ্যকে অসঙ্গতির দেশ—বর্ব্বরের দেশ বলিয়া অবজ্ঞায় হাসিয়াছিল, আজ সেই প্রাচ্যের ভাব-সম্পদ, তত্ত্ব ও সুমার্জ্জিত সুপ্রাচীন সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া প্রতীচ্যের সুধী ও রসিক সমাজ শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করেন। যে-প্রাচ্য ছিল স্বপ্নবিলাসী, সংসার-বিমুখ সেই প্রাচ্য আজ তাহাদের চক্ষে তত্ত্বান্বেষী ধ্যাননিমগ্ন জাতি, আজ প্রতীচ্য প্রাচ্যের নিকট নূতন তত্ত্বের নূতন বাণী শুনিতে চায়।

যখন প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের এই উচ্চ ধারণা বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে, আমরা প্রাচ্যবাসী হইয়া

কথক নৃত্য

সেই প্রাচ্যের গভীর তত্ত্ব লইয়া তখন ছেলেমানুষি সুরু করিয়াছি। যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধ ছিল মনোজগতের ভাব-সম্পদে, যাহার লীলা ছিল তত্ত্ব লইয়া রূপ সৃষ্টি করা, সেই প্রাচ্য কৃষ্টির এতটুকুও না জানিয়া এবং তত্ত্ব রূপায়িত করিবার চেষ্টা না করিয়াও আমরা প্রাচ্য নৃত্য করি। যে-প্রাচ্যের তাত্ত্বিক রূপ সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ঋষিশিল্পী "শ্রীদুর্গা" রূপকল্পনায় দানবের সহিত সিংহ-বাহিনীর রণের মধ্য দিয়া অব্যক্ত এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সুমহান্ তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াও আজ দেবীদূত "শ্রীদুর্গাকে" পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চের নৃত্যপরিকল্পনায় আনিয়া নৃত্য প্রচেষ্টায় যে দুর্গার ধ্যানকে এবং ঋষিশিল্পীকে কতটা অবমাননা করিয়াছি আমরা জানি না। ঋষির ধ্যানরূপ সম্বন্ধে এতটুকু শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাদেরই এই ছেলেমানুষি করিতে রুচিতে বাধিত। ঐশ্বর্য্যদাত্রী লক্ষ্মী এবং বিদ্যাবুদ্ধিদায়িনী সরস্বতী, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, গজানন, এমন কি দেবারি অসুরের যে রূপ কল্পিত হইয়াছে—রঙ্গমঞ্চে ঐ চরিত্রানুযায়ী ভাবের কোন ব্যঞ্জনাই থাকে না—দেবারি অসুর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দেব-সেনাপতির গতি, চারী, করণ, অঙ্গহারের কোন তারতম্যই রাখার প্রয়োজন মনে করি না! শুধু পরিচ্ছদ চরিত্রানুযায়ী হইলেই যথেষ্ট হইল মনে করি। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ বরং আমরা সিংহের নৃত্য দেখিতেই উৎসুক হইয়া পড়ি—

কাণ্ডীদেশীয় নৃত্য

শ্রীদুর্গাকে দেখি শূলহস্তে দেবারি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আর দেখি বাদ্যের তালে তালে সিংহের কখনও অগ্রসর কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, সময়ে অসময়ে নখরাঘাতে অসুরকে জর্জ্জরিত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস। আমরা হাসিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাই—ভাবি ওরিয়েণ্টাল নৃত্য দেখিতেছি এবং আমরা অনেকেই ভাবি যে দুর্গাতত্ত্বের প্রায় সমস্ত রহস্য আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এবং তৃপ্তিলাভ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। এমন কি, দেব-সেনাপতিকে বাইজীসুলভ লালসাব্যঞ্জক গ্রীবা ও ভ্রূকর্ম্ম করিতে দেখিলেও দোষাবহ মনে করি না যদিও তিনি দেব সেনাপতি—এই ত রুচিরসবোধ! "শ্রীদুর্গা" রূপকল্পনায় এই লোকহাসানকেই, আমাদের মধ্যে অনেকেই মূর্ত্তিবাদের চরম সার্থকতা বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছি। যে-ভারতে ঋষিশিল্পী অনাদি অনন্ত কাল প্রবাহের ছন্দকে সহজ সরল ভাবে সাধারণের বোধার্থে 'কাল ও কালীমূর্ত্তির রূপকের সহায়তায় রূপঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং যে ভারতের "নটরাজের" নৃত্যমূর্ত্তির পরিকল্পনায় আজও সমস্ত বিশ্ব মুগ্ধ ও বিস্মিত, সেই দেশেই শিল্পীরা সুমহান্ রূপের অবমাননা করে, খুব দুঃখের কথা নয় কি! অনধিকারীর হাতে পড়িয়া দুর্গাতত্ত্বের এই বীভৎস রূপ পাইয়াছে। তাই প্রাচীন ভারতের জ্ঞানী বলিয়াছিলেন—"পাইতে হইলে সশ্রদ্ধভাবে পূর্ব্বে তোমাকে অধিকারী হইতে হইবে।" শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

ভারত ধর্ম্মের দেশ—দৃষ্টি তাই অন্তর্মুখী। ইন্দ্রিয় জগতকে উপেক্ষা করিয়া ভারত অন্তর্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত। আত্মোন্নতির সোপানরূপে ভারত ধর্ম্মকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া আছে। দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে সেজন্যই ধর্ম্মের ছাপ সুপরিস্ফুট। আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব শিল্পীর মনে যা ক্ষণিকের জন্য ধরা দেয়, শিল্পী সেই সত্যকে ছন্দে, রূপে, সাধারণের বোধার্থে তুলিয়া ধরিয়াছে সহজ সরল ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া। সে অরূপকে রূপায়িত করিয়াছে। অঙ্কনবিদ্যায় শুধু পারদর্শী হইলেই ভারতের শিল্পী হওয়া যায় না—যিনি তাহার রূপ-সৃষ্টিতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস দর্শকচিত্তে জাগাইতে পারেন, তিনিই ভারতের যথার্থ শিল্পী। ভারতের শিল্পী ছিল সাধক। ভারতের জলহাওয়ায় পুষ্ট ভারতবাসীর মনও ছিল ধর্ম্মের সুরে বাঁধা। লোকপর্ব্বে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ছাপ গভীর ছিল।

প্রতীচ্য জগৎ ইহার বিপরীত। প্রতীচ্যের দৃষ্টি বহির্মুখী। ভারত যেখানে মনের চোখে দেখিয়া তৃপ্ত, প্রতীচ্য সেখানে বহিরিন্দ্রিয়ে বস্তুজগতের বহিঃরূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট—বিশেষতঃ নৃত্যকলা-ক্ষেত্রে।

ভারতীয় নৃত্যের বিষয়বস্তুর ছন্দায়িত রূপ মনে যাইয়া রেখাপাত করে, দর্শকের মনে অসীমের অনুভূতি জাগায়; কিন্তু পাশ্চাত্যের নৃত্যবিষয়বস্তু দর্শকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সাময়িক আনন্দ দিয়া বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যায়। সে দেশে নৃত্য বিস্ময় জাগায় সত্য, কিন্তু ভারতীয় নৃত্য মুগ্ধচিত্তের বাক্‌রোধ করে, পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলাইয়া দর্শকচিত্তকে এক অজানা রাজ্যে লইয়া যায়। পাশ্চাত্যের নৃত্যের সার্থকতা অসাধ্য সাধনে। সেই দেশের নৃত্যব্যাকরণেও তাই নানা কৌশল, কি উপায়ে পাদকর্ম্ম কত অল্পায়াসে করা যায় এবং এক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত দেহ ভূমির সমান্তরালে রাখা সম্ভব হয় কিরূপে, সে সমস্ত নানা আয়াসসাধ্য কসরৎ সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রদর্শন করিবার পন্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের নৃত্যে সে সমস্ত প্রয়াস মোটেই নাই—বরং প্রতি দেহভঙ্গীতে, এমন কি বিশেষ একহস্ত মুদ্রায় পর্য্যন্ত এক অজানা রাজ্যের ইঙ্গিত, বৃহত্তর জগতের সন্ধান। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা বিস্মরণের আবরণে আবৃত হয় তাহা ভারতীয় নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না—ভারতের বৈশিষ্ট্যই এইখানে।

সঙ্গীত রত্নাকরে আছে নৃত্য বাদ্যকে মানিয়া চলিবে—বাদ্য চলিবে গীতের অনুসরণ করিয়া। শাস্ত্রে যাহাই থাকুক, এ কথা সত্য যে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্যের যোগ নিবিড়। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সঙ্গীত নৃত্যোপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নৃত্যের ভাবব্যঞ্জনা আরও পরিস্ফুট করিয়া তোলে। সে জন্যই প্রাচীন ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যে, 'দক্ষিণী' নৃত্যে

এবং 'মণিপুরী' নৃত্যে ভাবব্যঞ্জনার জন্য কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান ছিল এবং এখনও আছে। রঙ্গমঞ্চে যে চরিত্র যাহা অভিনয় করিবে তাহাই পূর্ব্বে শ্লোকে সুরে গীত হয় এবং মণিপুরেও কীর্ত্তন গানের সঙ্গে নৃত্য হইয়া থাকে। নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত নৃত্যোপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। অসিনৃত্যে যখন বীররসের বাদ্য বাজে, তখন দর্শকের মনে স্বতঃই যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি ভাসিয়া উঠে। তৎসঙ্গে অসিনৃত্যের প্রতি পাদক্ষেপ দেহভঙ্গীর অঙ্গ উপাঙ্গ কম্প সম্পূর্ণরূপে রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে কিন্নর কিন্নরী যখন নৃত্য করিতে করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়—আবহ যন্ত্রসঙ্গীতেই দর্শকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে পূর্ণিমা রজনীর শান্ত, নিস্তব্ধ, হাস্যময়ী রজনীর রূপ তুলিয়া ধরিতে পারে। দর্শকচিত্তকে সময়োপযোগী রঙে রাঙাইয়া দেয় আবহ সঙ্গীতই। সঙ্গীত নৃত্যের ভাষার কাজ করে। পাশ্চাত্য দেশীয় নৃত্যেও যন্ত্রসঙ্গীতের উপযোগিতা অপরিহার্য্য। তবে পাশ্চাত্যের নৃত্যসঙ্গীত শিল্পী সৃষ্টি করেন নিজ কল্পনার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে নিজের খুশীমত, কিন্তু ভারতে তাহা করিবার উপায় নাই। ভৈরব, ইমন, মালকোষ ইত্যাদি বাঁধা রীতির উপরই এ দেশের সুরশিল্পীকে আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। রাত্রির আবহাওয়া সৃষ্টিতে এ দেশে ভৈরব রাগ অচল, তেমনি দিবা-বিষয়ক আবহসঙ্গীত সৃষ্টিতেও ইমন বা মালকোষ অচল। কারণ এদেশে বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ ভাব জাগা এরূপ সংস্কারে দাঁড়াইয়াছে এবং এই রূপসৃষ্টি শিল্পীর নিছক খেয়ালে এক দিনেই হয় নাই, দীর্ঘ কালের সাধনা তাহাতে আছে এবং তাহা সুদীর্ঘ কাল যাবৎ এ দেশের জলহাওয়া, ধর্ম্মে, চিন্তায় পুষ্ট মনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভাবের সঙ্গে নিবিড় ভাবে বিজড়িত থাকিয়া সংস্কারে দাঁড়াইয়াছে। এ কথা সত্য যে ক্ষেত্র-বিশেষে রূপের চেয়ে ধ্বনির আবেদন অধিকতর ব্যাপক, তাই মনোজগতের দুর্গম রাজ্যে রূপ যখন পথপ্রদর্শনে অক্ষম হইয়া পড়ে, সঙ্গীত তখন নৃত্যকারের ভাষার কার্য্য করিয়া দেয়—নৃত্যকারের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী যোগ যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সোমদেব-নৃত্যে মণি বর্দ্ধন

প্রাচীন ভারতের রূপবন্ধ ও রূপরীতিকে ভিত্তি করিয়া দেশের শিল্পীকে যুগধর্ম্মের উপযোগী নৃত্য রূপরীতি আজ সৃষ্টি করিতে হইবে। নৃত্যবিষয়বস্তুতে রাখিতে হইবে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিকতার ছাপ। ধ্রুপদ গানের ধ্যানগম্ভীর রূপ, খেয়াল গানের ছন্দবাট গতি চমকে ও সচ্ছলতায়, ঠুংরীর মেজাজ ও মূর্চ্ছনা মীড়ের মত রূপ রস দেহভঙ্গীতে ফুটাইয়া নৃত্যকে অনবদ্য অপরূপ করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির কৃষ্টি বজায় রাখিয়া স্বকীয়তার ছাপে তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া দেশের জন্য দশের জন্য নৃত্যে এমন রূপ দিতে হইবে যাহাতে থাকিবে মানব মাত্রেরই সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ভয়-আশার আদর্শ রূপ। কোন এক বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি লইয়া আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২

এক বৎসর পরে কোন এক শুভ লগ্নে যোগমায়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ি আসিল। এক বৎসর বড় কম সময় নহে। মাতার উপদেশে ও গৃহকর্ম্ম শিখিবার তাড়নায় বালিকা গৃহিণীত্বের প্রথম ধাপে যেন পদার্পণ করিয়াছে। স্বাভাবিক চাঞ্চল্যও তাহার কিছু কমিয়াছে। হাতে নোয়া, মাথায় সিঁদুর আর ঘোমটা—অনভ্যস্ত বালিকাকে বধূজীবনের প্রথম দীক্ষা দিয়াছে। দেহের পানে চাহিলে বোধ হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা গড়ার কাজেও মনোযোগ দিয়াছেন।

এবার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যোগমায়ার আর তেমন ভয় ভয় করিল না। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ছায়াশীতল উঠানটি মনোরমই যেন। তা ছাড়া আসল ভয়ের যা কারণ—তা ঘুচিয়াছে। ও পাশে কায়েতদের প'ড়ো বনভিটার সীমান্তে প্রাচীর উঠিয়াছে। খণ্ডিত বাড়িটাকে খানিকটা সংযত ও শ্রীমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে। বেশ পরিষ্কার নিকানো উঠান। পূবদিকের কোণে দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি তুলসী-মঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছে; মঞ্চের উপরিভাগে শাখা-সমৃদ্ধ এক তুলসীবৃক্ষ। মঞ্চের আশেপাশে কয়েকটি বেলা, জুঁই, হলুদ রঙের ঝুঁটি ও লাল রঙের জবা ফুলের গাছ। প্রাচীরের কোণের দিকের স্থলপদ্মের গাছটিও বেশ সতেজ। বৈশাখের প্রথম বলিয়া দুই একটি ফুলও যেন তাহাতে ফুটিয়াছে। আর প্রচুর ফুল ফুটিবে শরৎকালে। উঠানের বাতাবীলেবু গাছটা ঝাঁকড়া হইয়াছে ও অসংখ্য ছোট ছোট ফল কালো পাতার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাঁঠালগুলি এত নীচেয় ফলিয়াছে যে হাত দিয়া ছুঁইতে পারা যায়। এবার আম হয় নাই বলিয়া শাশুড়ী বার কয়েক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

প্রতিবেশিনীরা আসিলেন।

লগনে ঘর করতে কি দিলে গা, রামের মা? দু'হাঁড়ি রসকরা পাঠিয়েছে? তা বেশ। এই যে ধনে হলুদ থেকে সব রকম মশলাই বেয়াই দিয়েছেন! বেশ মাছটি। ও টিনের বাক্সটা বুঝি কাপড় রাখবার? এক গামলা তেল—তা পাঁচ সেরের কম হবে না। বউ তোমার আরও সুন্দর হয়েছে, দিদি।

আশীর্ব্বাদ কর—বেঁচেবর্ত্তে থেকে মনের সুখে ঘরকন্না করুক। তিনি হাসিলেন।

কমলা আসিয়া বলিল, মাছটা আমি কুটব, মা?

মা বলিলেন, তুই পারবি নে। বড় বড় দাগা করে কুটতে হবে। পাড়ার সকলের বাড়ি তেল আর মিষ্টি দিতে হবে। তুই বরঞ্চ বিলোবার ব্যবস্থা করিস। আর শোন, বেয়াই-বাড়ি থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁরা না খেয়ে এখান থেকে যেতে পারবেন না—বলে দে।

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তুমি বরঞ্চ মাছ বিলোবার ব্যবস্থা খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর, আমি বৌদির সঙ্গে একটু গল্প করি।

কথা শেষে সে যোগমায়ার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল।

তারপর, কেমন ছিলি ভাই, বউ? ফিক্ করে হাসলে হবে না, জবাব চাই।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, আপনি কেমন ছিলেন?

ইস্—আপনি! ভা-রী মান্য করে কথা কইতে শিখেছিস যে? মা শিখিয়ে দিয়েছেন বুঝি?

যোগমায়া নিঃসঙ্কোচে ঘাড় নাড়িল।

কমলা হাসিয়া বলিল, তা ওঁরা এ রকম শিখিয়ে দেন। কিন্তু আমাকে তুই আপনি বলে ডাকলে তোর কথার উত্তরই দেব না!

কি বলে ডাকবো আপনাকে? দ্বিধাভরে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

বলবি কমলি। কমলি দিদি। না হয় কমল ঠাকুরঝি। আর তাও যদি না পারিস—বলবি তুমি। বলিয়া কমলা হতচকিত বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল!

অন্তরঙ্গতা জমিল।

কমলা বলিল, দাদা তোকে চিঠি লিখতো তো? লিখতো না? ও মা, আমার কি হবে! বলিস কি?

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, একখানা চিঠি লিখেছিলেন।

কমলার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ঘাড় কাত

করিয়া বলিল, মাত্তর একখানা। এক বছরে মাত্তর এক—খানা। খানিক পরে বলিল, আমার তো আসে সপ্তাহে একখানা। বলেন, রোজ একখানাও লিখতে পারি। কিন্তু আমি বারণ করে দিয়েছি।

কেন বারণ করলে? যোগমায়া মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল।

লজ্জা করে না বুঝি? মা কি বলবেন, পড়শীরা কি ভাববে?

কমলার যে লজ্জা করিতে পারে—তাহা যোগমায়ার বুদ্ধির অগোচর। তাই সে মূঢ়ের মতই পুনরায় প্রশ্ন করিল, লজ্জা করে কেন?

কমলা তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, দিনকতক যাক, বুঝবি কেন। একটু থামিয়া বলিল, তা তুই ক'খানা চিঠি লিখেছিলি?

কেন, একখানা।

তুইও একখানা? বাঃ রে! নিজে লিখেছিলি, না আর কেউ লিখে দিয়েছিল?

যোগমায়া অসঙ্কোচে বলিল, মা লিখে দিয়েছিলেন।

সত্যি? তা তুই লিখলি নে কেন?

আমি নিজে অত গুছিয়ে লিখতে পারি বুঝি?

কি লিখেছিলি? বলবি নে একটুও?

মনে নেই।

তাহলে দাদার চিঠিখানাই না হয় দেখা।

সে তো নেই।

হারিয়ে ফেলেছিস? দূর বোকা, প্রথম চিঠি হারাতে নেই। কোথায় ফেলেছিলি?

যোগমায়া বলিল, মা-ই তো আমার হাত থেকে নিয়ে পড়লেন। তার পর অপর্ণা, কুমুদিনী, হরি পিসিমা, ক্ষান্ত-মাসী সবাই পড়লেন—আর খুব হাসলেন।

তাহলে খুব হাসির কথা লিখেছিল, দাদা? বাঃ রে, আবার বলা হয়—

কমলি, একটা পান দে তো। বলিয়া কমলার দাদা শ্রীমান্ রামচন্দ্র সশরীরে দেখা দিলেন।

কমলা দুষ্টামি করিয়া বলিল, দে না লো একটা পান সেজে। পান সাজতে পারিস ত?

কে উত্তর দিবে! ঘোমটা টানিয়া যোগমায়া ততক্ষণে নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত হইয়াছে। অগত্যা কমলাই পান দিল।

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, পান চাইবার ছুতো ক'রে তোকে দেখতে এসেছিল, ভাই।

ঘোমটা খুলিতে দেখা গেল যোগমায়াও হাসিতেছে। এ কৌতুক মন্দই বা কি। বাড়িশুদ্ধ লোকের সঙ্গে দিনের বেলায় কথা কহিতে দোষ নাই, শুধু যে লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগে না, ভাব করিবার জন্য কত ছল ছুতাতেই যে এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহার সঙ্গে কথা বলাই নিষেধ! লজ্জা যোগমায়ারই কি ছিল, মা এবং প্রতিবেশিনীরা যে রকম নিন্দার ভয় দেখাইয়া তাহার লজ্জা আনিয়া দিয়াছেন!

শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, বসে বসে গল্পই ত করছিস, কমলি। বউকে কাপড় ছাড়িয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে ঠাকুর-দেবতা প্রণাম করিয়ে আন। তার পর জল খেতে দে। গল্প করলে কি পেট ভরবে?

কমলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চল বৌদি, চটপট।

গৃহদেবতা নারায়ণ শিলা ও তুলসীমঞ্চে প্রণাম করিয়া তাহারা ও-বাড়ির শিবমন্দিরে আসিল। সে-কালের ভাঙ্গা মন্দির। ছাদটা যে-কোন সময়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পারে। ছাদের কার্ণিশে গোটাকতক ডুমুর ও অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে, মন্দিরের মধ্যে খানিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চিঁ চিঁ শব্দ ও একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। শিব-ঠাকুর কিন্তু ঘৃত জলসিক্ত হইয়া দিব্য চক্ চক্ করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া ইহারা প্রণাম করিল।

কমলা বলিল, জেঠামশাইদের শিব, অনেক কালের বুড়ো শিব। শিবরাত্তিরে যা ধুম হয়, সারারাত জেগে পুজো। গাঁয়ের কত লোক আসে।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, জেঠামশাইদের বাড়ি কই?

উই যে—মন্দিরের গায়েই। ওদের বাড়ি থেকে দরজা আছে, আমাদের বাড়ি থেকেও; মন্দিরটা মাঝখানে কিনা।

দুপুরবেলা কমলা পান সুপারির ডাবর, বাটা ও জাঁতি যোগমায়ার কোলের কাছে রাখিয়া বলিল, নে—সাজ দেখি পান। এমন পান সাজবি—যা খেয়ে দাদার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

যোগমায়া ক্ষিপ্রকরে পান সাজিতে বসিল।

কমলা বলিল, দে দেখি আমায় একটা। মুখ চুণে পোড়ে কি খয়েরে তেতো হয়—আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক। বাঃ, বেশ তো তোর হাত, চুণ খয়ের সমান হয়েছে। আমি ভাই ভাল পান সাজতে পারি নে। কেবলই ভয় হয়, বুঝি চুণ বেশি হলো! তোর ঠাকুর-জামাই বলেন, পান না দিয়ে এক ডেলা কুইনিন দিলেও তো পার। শুনলি ভাই কথা!

যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া কহিল, কুলিয়ান ! যা জ্বর হ'লে খায় ?

হাঁ লো। কিন্তু কুলিয়ান নয়—কুইনিন। তোর ঠাকুর-জামাই লেখাপড়া জানা লোক কিনা, তাই কুলিয়ান বললে রাগ করেন।

ঠাকুরজামাই তোমায় বকেন ?

হুঁ—বেজায়। গম্ভীর ভাবে কমলা বলিতে লাগিল, তাঁর বকুনির চোটে এক দিন এমন রাগ করলাম যে, বেচারা রাত ভোর আমায় সেধে কুল পায় না। কথা শেষে কমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিল। এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, না রে—নেকু, তিনি আমায় মোটেই বকেন না। ক—ত আদর করেন—ভালবাসেন। কত জিনিস এনে দেন।

কি জিনিস দেন ?

ফুলেল তেল, ফিতে, চুলের কাঁটা, পুতুল

তোমার ক'টা বড় পুতুল আছে, ঠাকুরঝি ?

তিন-চারটে হবে। একটু থামিয়া রহস্যের ভঙ্গিতে বলিল, একটা কিন্তু খুব বড়।

খু—ব ! চক্ষু বিস্তৃত করিয়া যোগমায়া বলিল, কত বড় ঠাকুরঝি ?

এই তোর মত, আমার মত। না না, আমার চেয়েও বড়। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

শাশুড়ী ডাকিলেন, কমলি, বৌমাকে নিয়ে খাবি আয়। বেলা অনেকখানি হ'ল মা।

যাই মা। চল, খেয়ে আসি। আবার ও-বেলা গল্প করব। একটু গা গড়িয়ে বিকেলে তোর গা ধুইয়ে, চুল বেঁধে, ভাল কাপড় পরিয়ে, টিপ দিয়ে সাজাতে হবে। সবাই দেখতে আসবেন কি না।

পিসিমা আপনার ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিলেন, আহারান্তে কমলা যোগমায়াকে লইয়া সেইখানে গিয়া বসিল।

কি হচ্ছে, পিসিমা ? পৈতে তৈরী হচ্ছে ?

পিসিমা অভ্যাসবশতঃ ঘোমটাটা টানিয়া সংযত হইয়া বসিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, হাঁ মা। এক কুড়ি পৈতে বারন্দবাড়ির ঠাকুরঝি নেবেন বললেন। অক্ষয়তৃতীয়ার ব্রত আছে তাঁর—কালই চাই।

তা তিন চারটে করে পয়সায় পৈতে বেচে তোমার কি হয় পিসিমা ! খালি হাত ব্যথা।

না রে, হাত ব্যথা নয়। পাঁচ গণ্ডা কড়ি একটা পৈতের দাম। কমই বা কি ! পিসিমা হাসিলেন।

তোমার সঙ্গে যে গল্প করতে এলাম। তা তুমি ঘ্যানর ঘ্যানর তো ছাড়বে না।

কাজ করতে করতেই তো গল্প করবি, মা।

পিসিমার ঘরখানি ছোট। ইটের দেওয়াল, কিন্তু ছাউনি খড়ের। বৈশাখের রৌদ্রতাপে ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা বলিয়াই বোধ হয়। এক কোণে মাদুরটা গুটান রহিয়াছে। একটা কাঠের সিন্ধুক—সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটায় বিচিত্রিত। বাঁশের আলনার একধারে থান-দুই থান কাপড়, একখানি পাটের কাপড় ও নামাবলী এবং অন্য ধারে শীতকালের জন্য কাঁথা প্রভৃতি রহিয়াছে। ছোট একখানি জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার কয়েকখানি বাসন রহিয়াছে। দেওয়ালে একখানি অন্নপূর্ণা ও একখানি কালীর ছবি। গৃহসজ্জা যৎসামান্য, কিন্তু ঘরখানি ঝরঝরে। বিধবা-পিসিমার বাহুল্য-বর্জ্জিত দেহের মতই শুচিশুভ্রতায় কমনীয়।

কমলা বলিল, নতুন বউকে ঘর করতে কি দিলে—একবার দেখলে না ?

পিসিমা বলিলেন, ওমা, সে কি কথা ! তেল, ঘি, নুন থেকে যত রকম মশলা সবই তো খুঁটিয়ে দিয়েছেন দেখলাম। বেয়াই দিয়েছেন-থুয়েছেন ভাল।

তোমাদের কালে এই সব দিত, পিসিমা ?

দিত বৈ কি। তবে একালে কিছু বেড়েছে। ঐ টিনের পেটরা তখন দিত না, দিত কাঠের সিন্ধুক কি বাক্স। মাথা ঘষার অনেক মশলা দিত—গন্ধ তেল তো আর বেরয় নি।

কমলা অনেকক্ষণ সেকালের গল্প করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, যাই, মা'র হুকুম তামিল করি গে। বউকে গা ধুইয়ে কাপড় গহনা পরিয়ে দিই গে। লোকে আবার দেখতে আসবে।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হরিশ যে এবার এলেন না ?

চঞ্চলা কমলা সহসা ব্রীড়াবনতমুখী কিশোরীতে পরিণত হইয়া হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

পিসিমাই বলিলেন, ছুটি পায় নি বুঝি ?

কমলা কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া বধূকে লইয়া পলাইয়া আসিল।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, হরিশবাবু কে, ঠাকুর-ঝি ?

কমলা রহস্য করিয়া কহিল, রামচন্দ্র তোমার কে ভাই—সীতা ?

ওঃ ঠাকুরজামাইয়ের নাম। তা তুমি পিসিমার সামনে অতটা লজ্জা করলে কেন ?

গুরুজনদের কাছে লজ্জা হবে না তো মুখে খই ফোটাব বুঝি ? নে চল্।

রাত্রির তখন মধ্যযাম। ফুলশয্যার রাত্রিতে যেমন অসীম ক্লান্তি আসিয়া চক্ষুকে নিদ্রাভারাতুর করিয়া তুলিয়াছিল, খাইতে বসিয়া আজও যোগমায়ার দু'টি চোখ তেমনই বুজিয়া আসিতেছিল। মধ্যরাত্রির প্রহর ঘোষণা করিয়া শিবাদল কখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। পঞ্চমীর চাঁদ রান্নাঘরের ও-পাশে জাম গাছটার আড়ালে মুখ লুকাইয়াছে। গভীর রাত্রির একটা গাম্ভীর্য কানের মধ্যে সাঁ সাঁ করিতেছে। নূতন বধূর আগমন উপলক্ষ্যে এ-বাড়িতে কিছু কুটুম্ব সমাগম হইয়াছে এবং সেই জন্য মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত আহারাদি চলিতেছে। অন্য বাড়িতে নিশুতি রাত্রি। রামচন্দ্রের খাওয়া অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সে বেচারা বিছানায় শুইয়া জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে ? কমলা তাহার হাত ধরিয়া এ-ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার কালে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, দোরে খিল দে। খবরদার ঘুমোস নে, খুব বকিয়ে মারবি দাদাকে।

যন্ত্রচালিতের মত যোগমায়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। দুয়ারটা সন্তর্পণে ভেজাইয়া খিল আঁটিয়া দিল। ঘরের এক প্রান্তে রেড়ির তেলের প্রদীপটা নিবু নিবু হইয়া আসিতেছে। এত রাত্রিতে ওটিকে উস্কাইয়া দেওয়া উচিত কিনা—হয়ত একবার ভাবিল। তারপর ধীরপদে মাইপোষের নিকট আগাইয়া আসিয়া নিদ্রিত লোকটির পানে একবার চাহিল। লোকটি সুন্দর, কিন্তু শুইবার ধরণটি উঁহার সুবিধার নহে। এমন আড়ভাবে শুইয়াছেন যে, বিছানার একাংশে শুইবার সুবিধাটুকুও নাই। ঘুমে যোগমায়ার চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, তবু ঘুমের নেশাকে জয় করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অল্প পরিচিত সুন্দর লোকটির পানে চাহিয়া রহিল। ঘুমের ঘোরে যদি সে পাশ ফেরে তো একটুখানি স্থান হয়ত বিছানায় মিলিতে পারে। কি গভীর নিদ্রা !

খানিকটা দাঁড়াইয়া যোগমায়া ফিরিয়া চলিল। ঐ কোণে একটা মাদুর রহিয়াছে না ? বালিশের প্রয়োজন নাই। যা ঘুম পাইয়াছে যোগমায়ার।

মেঝেয় মাদুর পাতিবার কালে শব্দ হইয়াছিল বৈকি ? বিস্মিত যোগমায়াকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া রামচন্দ্র জাগিয়া উঠিল। শুধুই জাগিয়া উঠিল না, একেবারে বিছানায় সোজা হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে শোবে নাকি ?

যোগমায়া লজ্জায় সঙ্কুচিতপ্রায় হইয়া দেওয়ালের গায়ে মিশিয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। মনে হইল, এক ঘটি জল খাইলে মুখের শুষ্কতা বুঝি ঘুচিতে পারে।

রামচন্দ্র মাইপোষ হইতে নামিয়া আসিল। ধীরে ধীরে যোগমায়ার কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, ভয় কি, এস শোবে এস।

বিছানায় উঠিবার কালে হাতের ঝাপ্টা মারিয়া আয়ুক্ষীণ দীপ শিখাটিকে সে নিবাইয়া দিল।

খোলা জানালা দিয়া বাহিরের খানিকটা দেখা যাইতেছিল। বাহিরে অন্ধকার গাঢ়; উঠানের গাছ-পালার ঝোপে তার গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর আকাশের নক্ষত্রগুলিকে জোনাকী পোকার মত বোধ হইতেছে। গভীর রাত্রি—সাঁ সাঁ করিতেছে। কোথাও একটি পাতা নড়িতেছে না; কায়েতদের প'ড়ো ভিটার জামগাছের ডালে বসিয়া একটা রাত্রিচর পাখী—পেঁচাই হইবে হয়ত—বিশ্রীস্বরে রাত্রির শুব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন কর্কশ বিশ্রী ডাক পাখীটার—যোগমায়া সভয়ে রামচন্দ্রের পিঠের দিকে ঘেঁষিয়া শুইল।

আদর রামচন্দ্র তাহাকে যথেষ্টই করিল। কতক যোগমায়া বুঝিল, কতক বা বুঝিল না। আদর আর কাহার না ভাল লাগে, কাহারই বা অন্তরঙ্গ হইবার ইচ্ছা না জাগে। যোগমায়া মনে মনে প্রসন্ন হইয়া আপন মনেই বার বার উচ্চারণ করিল, লোকটি বেশ।

আদরের পালা শেষ করিয়া লোকটি যোগমায়ার এক-খানি হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, এখানে কেমন লাগছে তোমার ?

ভাল। অস্ফুটস্বরে যোগমায়া জবাব দিল।

খুব ভাল নয় বোধ হয় ?

যোগমায়া উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। ভাল লাগার কম বেশি জিনিসটা কি—তাহার বোধগম্য হইল না।

রামচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ঠিক করে বল দেখি—তোমাদের গাঁ ভাল, না আমাদের গাঁ ভাল ?

এবার যোগমায়া নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, আমাদের গাঁ।

তোমাদের গাঁ ? তাহলে তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না ?

যোগমায়া পুনরায় কোন জবাব দিল না।

রামচন্দ্র তাহার হাতে দোলা দিয়া বলিল, বললে না? বললে না?

যোগমায়া বলিল, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে যে।

আর আমাকে? কৌতুকভরে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল।

যোগমায়া পুনরায় নিশ্চল হইয়া রহিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আর ক'টা দিন যাক, আমি নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আসব।

যোগমায়া খুশীভরা কণ্ঠে বলিল, আপনি রেখে আসবেন?

হুঁ—নিশ্চয়। ভাবছ মা না বললে আমি যেতে পারি না? জান, আমি বললে মা কিছুতেই বারণ করবেন না। আপনার পদমর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্যে রামচন্দ্রের গলার স্বরটি শেষের দিকে প্রভুত্বব্যঞ্জক শুনাইল।

পুলকিত কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, আপনি যখন আমাদের দেশে যাবেন, আপনাকে বৈঁচি বনে নিয়ে গিয়ে পাকা বৈঁচি খাওয়াবো।

খাওয়াবে? বাঃ—ভারি লক্ষ্মী তো তুমি। আর এক প্রস্থ আদর করিয়া রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল, আমার মাকে কেমন লাগলো?

ভাল।

খুব?

হুঁ। বাড়ি যাইবার আনন্দে যোগমায়ার ক্ষুদ্র অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সব কিছু তখন তাহার মনে বা চোখে সুন্দর বলিয়াই বোধ হইতেছে। নতুবা আজ বৈকালে শাশুড়ী যখন নির্ব্বিবাদী পিসিমাকে কয়েকটি কটুকথা বলেন, তখন যোগমায়ার মনে শাশুড়ী-সম্বন্ধে একটি প্রতিকূল ভাবধারা জন্মলাভ করিয়াছিল। কত তুচ্ছ কারণে মানুষ রাগিয়া উঠে! জলের ঘটিটি কাপড় কাচার পর পিসিমা না মাজিয়াই নাকি দাওয়ার উপর রাখিয়াছিলেন, এবং সেটি উপুড় করিয়া রাখেন নাই। শুদ্ধাচারের দিক্ হইতে ইহাকে যথেষ্ট ত্রুটি বলা যায়। বাসি কাপড় কাচার জল ঘটির মধ্যে কয়েক বিন্দু থাকিলেও যে কাচা কাপড় পরিয়া সে ঘটি ছোঁয়া চলে না। পিসিমা চোখের জল ফেলিয়া সেই ঘটি মাজিয়া পুনরায় গা ধুইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার ক্ষুদ্র মনে তাঁহার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি জমা হইয়াছে। অন্য সময় হইলে শাশুড়ী সম্বন্ধে সে নিরুৎসাহিত কণ্ঠেই হয়তো বলিত, ভাল। অবশ্য মন্দ বলিতে তাহার শিক্ষায় বাধিত।

রামচন্দ্র অনেকগুলি প্রশ্ন করিল, পিসিমা?

উনিও ভাল / ভারি ভাল। এই উচ্ছ্বাসের মূলে অপরাহ্লসঞ্জাত প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অনেকখানিই ছিল।

কমলাটা ভারি দুষ্টু, নয়?

না, উনিও তো ভাল।

তাহ'লে মেনি বেড়ালটাও ভাল বল!

যোগমায়া হাসিল।

কেবল এক জন এ-বাড়িতে আছে—যে ভারি দুষ্টু।

সভয়ে যোগমায়া প্রশ্ন করিল, কে, কে?

বল দেখি—কে?

যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইল না। শেষে ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, আমি তো ঠিক করতে পারলাম না।

আর একটু ভেবে বল।

না, আপনি বলুন?

কেন, আমি। দুষ্টু নয়?

যান। বলিয়া যোগমায়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

রামচন্দ্র আদর করিয়া বলিল, দুষ্টু, নয়? এত রাত জাগিয়ে তোমায় কষ্ট দিচ্ছি।

যোগমায়া কোন কথা বলিল না।

রামচন্দ্র বলিল, বল না, দুষ্টু নয়?

না। ছোট্ট একটা না বলিয়া যোগমায়া মৃদু হাসিয়া এই দিকেই মুখ ফিরাইল।

আনন্দে রামচন্দ্র বলিল, তুমি আমাকে ভালবাস?

যোগমায়া কথা কহে না দেখিয়া রামচন্দ্র জিদ ধরিল, না বললে তোমায় ঘুমুতে দেব না সারারাত। বল আগে?

অগত্যা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া ভীরু-কণ্ঠে বলিল, হুঁ।

হুঁ—কি? ভালবাস কিনা বলতে হবে। না বললে কাতুকুতু দেব।

যোগমায়া সশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, উঃ, পায়ে পড়ি আপনার। আঃ, মা শুনতে পাবেন।

বল আগে?

চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া যোগমায়া বলিল—বাসি—বাসি। হলো তো?

ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

না। যোগমায়া যেন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে।

না, ঘুমোও—আমিও ঘুমুবো। ঐ দেখ পোয়াতে তারা উঠেছে, রাত শেষ হয়ে এলো।

আশ্চর্য্য বালিকার মন। পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমশঃ

সাহিত্যের মূল্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম ; সেই সঙ্গে বলেছিলেম যে ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার তারতম্য ঘটে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতার কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষ ভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্ক নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এই জন্য রসের ব্যবসা সর্বদা ফেইল হবার মুখেই থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম- -'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দু'টি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতি মাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এই জন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড় রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে সেক্সপিয়ারের Lucrece এবং Venus and Adonisএর কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে সেকথা সাহস করে বলি বা না বলি ; কিন্তু Lady Macbeth অথবা King Lear অথবা Anthony ও Cleopetra সম্বন্ধে এমন কথা কেউ যদি বলে তাহ'লে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সেক্সপিয়ার মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি "কুমারসম্ভব"এর হিমালয় বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-মর্যাদা হয়তো আছে তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই। কিন্তু সখীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোন যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে, মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি সাহিত্যের আসরে এইরূপ সৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইলো তার ভাঁড়ু দত্ত। Midsummer Night's Dream নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে কিন্তু Falstaffএর প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহা শিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য তবুও বহু শত আছে, যা প্রত্যক্ষ—ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে

তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই রকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য Don Quixote ধন্য Robinson Crusoe। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবন শিল্পীর রূপ, রচনা। কোনো কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত। আবার কোনো কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায় –যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

"চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে"—

এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে "তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি।" এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদয়ন
২৫।৪।৪১
দুপুর

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আজ সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন এমন সময়ে সেখানে এলেন রামানন্দবাবু। তাঁদের সেদিনকার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল হেনরী মর্লির শিক্ষাদানের প্রণালী। কথায় কথায় রামানন্দবাবু বলেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি গৌহাটীতে যে সভায় কবির সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাতে ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, ১৭-১৮ বৎসর বয়সে যখন কবি কিছু দিনের জন্য লণ্ডনে ছিলেন, সেই সময় তাঁর একটি ইংরেজী প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর এবং ভাষার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন হেনরী মর্লি। হেনরী মর্লির সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার জন্যে রামানন্দবাবু কৌতূহল প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন—বিলেতে লণ্ডন ইউনিভারসিটির মর্লি সাহেবের সাহিত্যের ক্লাসে যোগ দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ছাত্রদের শিক্ষাদানে মর্লি সাহেবের সহৃদয়তা প্রকাশ পেত। তিনি সাধারণ সকল মাষ্টারের মত বই ধরে নোট মুখস্থ করবার মতন ছাত্রদের পড়াতেন না, কিংবা যে শব্দের অর্থ সহজেই অভিধান দেখে ছাত্রেরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারে, সে সব শব্দের অর্থ বুঝিয়েও ক্লাসে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি সুন্দর ভাবে পড়তেন। তাঁর আবৃত্তির গুণেই বোঝবার বিষয়গুলি সহজ হয়ে ধরা দিত ছাত্রদের মনে। শিক্ষাদানের তাঁর বিশেষ একটি প্রণালী ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ছাত্রকে পালাক্রমে তার স্বনির্ব্বাচিত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ, লেখকের নাম না দিয়ে, তাঁর দেরাজের মধ্যে রেখে যেতে হ'ত,—একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে মর্লি সাহেব ঐ প্রবন্ধের বিচার করতেন ক্লাসে সকলের সামনে। তন্ন তন্ন ক'রে প্রবন্ধের সব বিষয়ের আলোচনা করতেন। তার প্যারাগ্রাফিং, কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ, সব কিছুর

চুলচেরা রকমের বিচার করতেন ; কোথাও ফাঁক রাখতেন না তাঁর সমালোচনায়। কিন্তু কবি অনেক দিন পর্যন্তই তাঁর কোন রচনা মর্লি সাহেবের দেরাজে রাখেন নি, কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল না যে, তাঁর ইংরেজী লেখা ভালো হ'তে পারে। ক্লাসে এক দিন একটা কাণ্ড হ'ল। একটি ভারতবর্ষীয় ছাত্র "আফটার ডিনার্ স্পীচ" নাম দিয়ে তার একটি লেখা যথারীতি অধ্যাপকের দেরাজে রেখে দিয়েছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্লাসে সকলের সামনেই অধ্যাপক মর্লি প্রবন্ধটির তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি প্রবন্ধটি প'ড়ে বিশেষ রূপে বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রবন্ধটিতে ছাত্রটি ইংরেজী সভ্যতার প্রচুর প্রশংসা কীর্ত্তন ক'রে তার তুলনায় স্বজাতির অসভ্যতার প্রভূত নিন্দে করেছিল। মর্লি সাহেব লেখককে ভর্ৎসনা ক'রে বলেছিলেন যে, সে ইংরেজদের অতিথি ব'লে হয়ত তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যেই এমন করে ইংরেজদের চাটুক্তি করেছে। সত্যিকার সভ্য ইংরেজ কখনই এমন চাটুক্তি পছন্দ করতে পারে না। কারণ সেটা তার পক্ষে অসম্মানকর। মর্লি সাহেব সেদিন বিরক্তিবশতঃ প্রবন্ধের ভাষার শৈথিল্য এবং অন্যান্য ত্রুটি বিষয়েও নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। এ রকমের কড়া সমালোচনা তিনি সাধারণতঃ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রেরা মর্লি সাহেবের উক্তি শুনে বিশেষ লজ্জা অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, হয়ত অন্য ছাত্রেরা (অ-ভারতীয়রা) মনে করছে যে তাঁরাই মর্লি সাহেবের ঐ তীব্র উক্তির লক্ষ্যস্থল। ক্লাসে সেদিন ঐ রকমে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মৌন রক্ষা করা আর সম্ভব হ'ল না। তাঁর ইংলণ্ডে যাবার কিছু দিন পূর্ব্বে 'ভারতী'তে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ আর বিলম্ব না ক'রে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ যথারীতি অধ্যাপকের দেরাজে পেশ ক'রেছিলেন। তাতে তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ বিচার করেছিলেন এবং তাতে সম্ভবতঃ ইংরেজের বিরুদ্ধে নালিশের মাত্রা বাংলা প্রবন্ধের সীমাকে অতিক্রম করেছিল। ক্লাসে ঐ প্রবন্ধ মর্লি সাহেব কর্ত্তৃক বিচারের দিনে রবীন্দ্রনাথ ভয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলেন, পাছে কোনো রকম কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু ক্লাস-শেষে লোকেন পালিত মহাশয় প্রবল উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকেই তাঁর পিঠে এক চাপড় মেরে বললেন, "তোমার জয় হয়েছে।" পরে জানতে পারা গেল, মর্লি সাহেব রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষার এবং বিষয়বস্তুর প্রশংসা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঐ প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য ক'রে ক্লাসে উপস্থিত ইংরেজ ছাত্রদের বলেছিলেন যে, তোমরা অনেকেই ভারত-শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হবে জানি। তখন এই প্রবন্ধের কথা স্মরণ ক'রো। ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ এবং সংস্রবকে কদাচ অগৌরবের বিষয় ক'রো না।"

এর পর উঠিল বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বঙ্কিম ছিলেন তৎকালের বঙ্গসাহিত্যের একছত্র সম্রাট্। তাঁর সাহিত্য-বিচারকে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করত, ভয়ও করত তাঁর তীব্র সমালোচনাকে। সাহিত্যের বিচারকের আসনে তিনিই দিতেন দণ্ড এবং পুরস্কার। আমার সম্বন্ধে তাঁর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। রমেশ দত্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেম। সেখানে বঙ্কিমও উপস্থিত ছিলেন। রমেশবাবু তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা করতেই বঙ্কিম ঐ ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে রমেশবাবুকে বললেন— "আমাকে কেন, ঐ যুবকটি এই মাল্যের উপযুক্ত। এঁকে চিনে রাখ। উনি 'সন্ধ্যা'র উপর যে কবিতা লিখেছেন তা কলিন্সের সন্ধ্যা-সম্বন্ধীয় কবিতার চেয়ে ঢের ভাল।" কিছুক্ষণ থেমে কবি পুনরায় বললেন, "আমি তখন বালক বললেই হয় ; সেই সময় আমার লেখা 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প'ড়ে বঙ্কিমের ভালো লেগেছিল। তিনি সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ইংরেজী ভাষায় লিখিত একটি চিঠিতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' সত্যিকার সাহিত্যসম্পদ আছে এবং তাতে তিনি আমার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর চিঠিটা আমার কাছে মূল্যবান্ সামগ্রীরূপে ছিল, কিন্তু জীবনে যেমন অনেক মূল্যবান্ জিনিস পেয়েও হারিয়েছি, তেমনি করেই তাঁর চিঠিটাও হারিয়েছি। যিনি আমার অধ্যাপক মর্লির দ্বারা প্রশংসিত ঐ ইংরেজী প্রবন্ধটি লোপ ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর হাতেই এই চিঠিটাও অবলুপ্ত হয়েছে।"

২রা বৈশাখ,
১৩৪৮।

অসাধারণ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

চিঠিখানি হাতে আসিয়া পড়িতেই নরেন ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া ঢুকিল।

মা কুটনা কুটিতেছিলেন। ছোট বউ উনুনে ভাত চাপাইয়া ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল। বোন নন্দা মায়ের পূজার ব্যবস্থা করিতেছিল। দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া আভা নরেনের বড় ছেলে ভানুকে পড়াইতেছিল।

নরেন আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, দাদা আসছে, আজকেই।

মা কুটনা রাখিয়া সহাস্য মুখে তাহার কাছে আগাইয়া গেলেন। ছোট বউ, নন্দা, আভা, ভানু সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নরেন পড়িতে লাগিল,—শ্রীচরণকমলেষু, মা, আমি এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী যাইতেছি। অদ্য রওনা হইয়া কল্য সকালে বাড়ী পৌছাইব। বিস্তারিত সাক্ষাৎ মত বলিব ও শুনিব। ইতি প্রণতঃ সেবক বীরেন।

বহুদিন পরে বীরেন গ্রামে ফিরিতেছে।

মা বলিলেন, বড্ড খুশী হলুম। আহা, কত দিন বাদে বাছা আমার কোলে আসছে।

আভা ব্যগ্র হইয়া বলিল, সকালের গাড়ী ত পৌছবে ন-টায়, না কাকাবাবু?

ভানু লাফাইয়া বলিল, জ্যেঠা আমার জন্যে ঘোড়া আনবে দেখো! এই হট্, হট্।

শূন্যের উপর ভঙ্গি করিয়া ভানু ঘোড়া-চাপার মহলায় লাগিয়া গেল।

বীরেনের আগমনবার্তা কাহারও শুনিতে আর বাকী রহিল না। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই শুনিল। কিন্তু যাহার এই সংবাদটি সকলের পূর্বে পাওয়া উচিত ছিল, ভাগ্যদোষে সে কিছুই জানিতে পারিল না। বাঁচিয়া থাকিয়াও সে আজ সকলের নিকট মৃত। এত দিনে যে বাড়ীর সর্বময়ী কর্ত্রী হইতে পারিত, সে আজ নিতান্ত অনাবশ্যক আবর্জনার মত অবহেলিত। তাহার কথা কেহই ভাবিয়া দেখিল না।

বীরেনের আসিবার সংবাদে সমগ্র বাড়ীটা যেন মুখর হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে বাপকে কাছে পাইবার আনন্দে আভা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু মায়ের কথা মনে মনে পড়িয়া মনটা যেন কেমন করিয়া উঠে!

সকলের অসাক্ষাতে চুপি চুপি চোরের মত সে মায়ের খোঁজে চলিল। এই বাড়ীতে মায়ের খোঁজ করাটা কেবল মাত্র অত্যধিক বাড়াবাড়ি নহে, পরন্তু নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার। বৃহৎ অট্টালিকায় যথেষ্ট স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিলেও মায়ের স্থান সেখানে হয় নাই। বাড়ীর পিছনের ছোট টিন-ছাওয়া ঘরটায় তাহাকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

আভা গিয়া ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া চুপিচুপি ডাকিল, মা, ওমা।

বিনোদিনী পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল। আভার ডাকে সে কোন সাড়া দিল না। এমনই তাহার স্বভাব। কাহারও সহিত সে কথা কহিবে না। মাঝে মাঝে হয় সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিবে, না হয় ভূতের মত অট্টহাস্য করিতে থাকিবে।

আভা ডাকিল, মা, মাগো—

হঠাৎ বিনোদিনী আজ জানালার ধারে উঠিয়া আসিল। স্থির দৃষ্টিতে সে আভার মুখের পানে চাহিয়া রহিল যেন কত যুগ পরে সে তাহাকে দেখিতেছে!

পরে শীর্ণ হাত দুইটি জানালা দিয়া গলাইয়া দিয়া সে আভাকে কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল।

মায়ের ব্যবহারে আজ নূতনত্ব আছে। মাকে আজ সে ভয় করিল না। মায়ের বুকের কাছে যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে আভার অদম্য ইচ্ছা জাগিল। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে সুদৃঢ় ব্যবধান। ঘর খুলিয়া ভিতরে যাইবার উপায় নাই। তালার চাবি রহিয়াছে কাকাবাবুর জিম্মায়।

মায়ের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া আভা বলিল, বাবা যে আজ আসছে মা!

বিনোদিনী কোন জবাব দিল না, অপলক দৃষ্টিতে সে আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আভা ডাকিল, মা!

অকস্মাৎ বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, আমায় ডাকছিস খুকু ?

আভার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মায়ের মুখে এমন ডাক সে যে কতকাল শুনে নাই! ধরা গলায় সে বলিল, বাবা আজ আসবে মা।

বিনোদিনী চুপি চুপি বলিল, কার বাবা? তোর? তাতে আমার কি রে!

মায়ের কথা শুনিয়া আভা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ও-পাশের বারান্দা হইতে তীক্ষ্ণস্বরে নরেন প্রশ্ন করিল, কে ওখানে? কে কাঁদে?

ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে আভা নিঃশব্দে ঘরের পিছন দিয়া পলাইয়া গেল। মাকে তাহার আর কিছু বলা হইল না। যাইতে যাইতে শুনিল কাকাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা বলিতেছে, কে আবার কাঁদবে। পাগলীটাই বোধ হয়।

পাগলী নিরর্থক হাসে, কাঁদে। সে যে কেন কাঁদে, সে খোঁজ লইবার মত অফুরন্ত সময় কাহারও নাই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

বীরেন যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। কুশল প্রশ্নাদি লইতে সকলে তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। অত্যধিক আদর-আপ্যায়নে সকলে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল আভা। বাপের কাছে সহজ ভাবে সে আগাইয়া যাইতে পারিল না।

হঠাৎ তাহার দিকে ঠাকুরমার দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বলিলেন, ও কি লা? আয়, বাপের কাছে এসে ব'স।

আভা কোন কথা না বলিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি রহিল।

নন্দা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, ছিঃ, এস।

আভাকে ধরিয়া আনিয়া সে তাহাকে বীরেনের সামনে বসাইয়া দিল।

বীরেন মাকে বলিল, গাড়ীতে সমস্ত রাতটা ব'সে কাটিয়েছি। শরীরটা আজ বড্ড খারাপ লাগছে।

মা বলিলেন, আহা, তা ত লাগবেই! ওরে নন্দা, ছোট বউকে বল একটা বিছানা ক'রে দিয়ে যাক।

ছোট বউ পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ছুটিয়া গিয়া সে বিছানা লইয়া আসিল। নন্দা গিয়া জলখাবার লইয়া আসিল।

মা বলিলেন, ঐটুকু মুখে দিয়ে শুয়ে পড় বাবা।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বীরেন বলিল, স্নান করেই একেবারে খাব। এখন এ-সব থাক।

মা বলিলেন, তা হ'লে ওটা ঢেকে রাখ্ নন্দা। পরে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, নাও, এখন সব চল। ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

সকলে উঠিয়া আসিল কিন্তু আভা উঠিল না। তাহার দিকে চাহিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, আয় রে আভা, বাপের কাছে পরে বসিস।

বাধা দিয়া বীরেন বলিল, ও আমার কাছে একটু থাক মা।

মা বলিলেন, বেশ, তা থাক না!

সকলে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে বীরেন আভার হাত ধরিয়া বলিল, আমার কাছে আয় খুকু।

আভা বাপের কোলের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বীরেন বলিল, ছিঃ, কাঁদতে নেই, ওঠ।

পরে ইতস্ততঃ চাহিয়া বীরেন বলিল, তোর মা কেমন আছে রে খুকু? আজও কি সে তেমনি ক'রে কাঁদে?

ছোট ঐ ঘরে বসিয়া একেলা বিনোদিনী কাঁদিয়া মরে। পাগ্‌লীর কান্না কেহ বা শুনিতে যায়! নরেন ধমক দিয়া আসে। না থামিলে, মারপিট করে। পাগ্‌লী চুপ করিয়া যায়।

বাপের প্রশ্নের উত্তরে আভা শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কতকটা সময় দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে বীরেন বলিল, আমার ঐ সুটকেসটা নিয়ে আয় ত মা।

আভা সুটকেস আনিয়া বাপের সামনে রাখিল।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সকলেরই জন্য কিছু-না-কিছু আসিয়াছে। তবে বিনোদিনীর জন্য আনা জিনিসেরই সংখ্যা বেশী। তাহার জন্য কাপড়, সাবান, সুগন্ধি তেল, কয়েকটা ভাল ভাল খাবার আসিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি দামী ঔষধও বীরেন তাহার জন্য আনিয়াছে। বিনোদিনী পাগল হইয়া গেলেও স্ত্রীর মর্য্যাদা হারায় নাই।

তেলের শিশিটা হাতে তুলিয়া বীরেন বলিল, তোর মার জন্য আনলেম এটা। চমৎকার তেল, বেশ মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

আর সকলের মত বাবা যে মাকে ভুলিয়া যায় নাই, ইহা ভাবিয়া আভার মনটা খুশীতে ভরিয়া উঠিল। উল্লসিত হইয়া সে বলিল, বেশ ভালই হয়েছে বাবা! মাকে আমি রোজ তেলটা মাখিয়ে দেব।

কাপড়খানি হাতে লইয়া বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই কি ভাবিয়া বলিল, শেকল-টেকল দিয়ে বেঁধে রাখে নি ত রে?

আভা বলিল, না, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে রেখেছে।

বীরেন বলিল, তবে চাবিটা আমায় এনে দে খুকু!

চাবি আনিতে আভা বাহির হইয়া গেল।

চাবি লইয়া নন্দা নিজে আসিল। বলিল, চাবি তুমি চেয়েছ বড়-দা? এখনি ওঘরে যাবে?

বীরেন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, এক বার দেখে আসি। আজও ত সে বেঁচে আছে!

বীরেনের কথা শুনিয়া নন্দা মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন জবাব দিতে পারিল না।

চাবি লইয়া চলিতে চলিতে বীরেন ডাকিল, আয় আভা।

তালা খুলিয়া বীরেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

বিনোদিনী ঠিক্ তেমন করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল।

বীরেন ডাকিল, বিনু!

বিনোদিনী আড়চোখে তাহার দিকে এক বার চাহিল।

আভা গিয়া তাহাকে বলিল, মা, বাবা এসেছে!

বিনোদিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, এসেছে তা বসতে দে না।

বীরেন তাহার পাশে বসিতে বসিতে বলিল, হ্যাঁ, এই যে আমি বসছি।

পরে কাপড়খানি তাহার সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তোমার জন্য কাপড় এনেছি বিনু।

কাপড়ের দিকে চাহিয়া বিনোদিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পাগল হইয়া গেলেও হাসিটি তাহার ঠিক আছে। সেই দুষ্টুমি-ভরা হাসি।

বীরেন বলিল, পরবে কাপড়খানা?

কথা শুনিয়া বিনোদিনী যেন চমকাইয়া উঠিল। কাপড়খানি হাতে লইয়া সে বীরেনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বীরেন ভগ্নস্বরে বলিল, আমাকে চিনতে পারছ না তুমি!

আভা কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবাকে তুমি চিনতে পারছ না মা!

বিনোদিনী বীরেনের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি এনেছ কাপড়?

বীরেন বলিল, হ্যাঁ, আমি। কৈ, আমি কেমন আছি সে ত তুমি জিজ্ঞাসা করলে না?

বিনোদিনী বলিল, তুমি? তুমি ভাল আছ—বেশ আছ। আমিও ভাল আছি।

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, নাও, আর রাগ করতে হবে না। কাপড় আমি পরব, মাথায় গুঁজবো ফুল। ওরে তোরা শঙ্খ বাজা, উলুধ্বনি দে। আমার সংসার আমিই দেখব, তোরা আর সর্দারি করিস না। ওগো তুমি ব'স। খুকু দৌড়ে যা ত মা, দেখ ত ঘরে কি আছে। আজ কত কি যে আমি রান্না করব। সব তোমাকে খেতে হবে কিন্তু, কিচ্ছুটি ফেলতে পারবে না!

মৌনমুখী উন্মাদিনী কিসের পরশে আজ হঠাৎ এমন মুখরা হইয়া উঠিল!

মা যে এমন করিয়া এত কথা বলিতে পারে আভা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। অবাক্ বিস্ময়ে সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল মা যেন আজিকেই সুস্থ হইয়া উঠিবে।

বীরেনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর কথায় বহু দিনের হারান সেই প্রিয়তম স্বর সে যেন খুঁজিয়া পাইল।

কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বীরেন আসিয়া তাহার মাকে বলিল, যে ক'টা দিন বাড়ীতে আছি ও ঘরের দরজাটা খোলাই থাক মা।

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বৌয়ের ঘরের কথা বলছ? কিন্তু খোলা ঘরে—

বাধা দিয়া বীরেন বলিল, বারান্দার এক পাশে আমি থাকব। আর তা ছাড়া মার-ধর ত কাউকে করে না।

মা বলিলেন, না না, বারান্দায় তুমি থাকবে কি ক'রে! আমি না হয় রাখুর মাকে বলছি, সে একটু নজর-টজরও রাখতে পারবে।

বীরেন একটু হাসিয়া বলিল, গরম কাল। কোন কষ্টই আমার হবে না। আমিই থাকব মা।

বীরেনের এই ব্যবহারে বাড়ীর সকলেই অসুখী হইল, কিন্তু কেহ তাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পূর্বে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভিজা কলাপাতার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক চিক করিতেছে। ছোট টিনের ঘরের দাওয়ার উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের পিছনে কনকচাঁপা গাছে অজস্র ফুল

ফুটিয়া সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইতেছে। রাত্রি অধিক হইলেও বীরেনের আজ আর ঘুম আসিতেছে না।

হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনোদিনী তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে তাহার নূতন শাড়ী, মুখে তাহার চিরমধুর সেই হাসি। বাহিরের মৃদু জ্যোৎস্নার আলোকে বিনোদিনীকে আজ আর পাগল বলিয়া মনে হইল না। হাসিমুখে বীরেনকে সে প্রশ্ন করিল, কেমন সেজেছি আজ বল ত?

সহসা বীরেন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের পানে সে চাহিয়া রহিল।

বিনোদিনী বলিল, পছন্দ হয় নি বুঝি!

নিজেকে সংযত করিয়া বীরেন হাসিয়া বলিল, চমৎকার! ঠিক যেন আকাশপরী!

বিনোদিনী তাহার হাত ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল, চাঁপার গন্ধ? না? দাও না এনে দুটো, মাথায় গুঁজবো আমি!

বীরেনের জীবন হইতে যেন দশটা বৎসর নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। সব সে ভুলিয়া গেল। চাঁপাতলা হইতে ফুল কুড়াইয়া আনিয়া নিজে সে বিনোদিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিল।

বিনোদিনী কোন কথা বলিল না। বীরেনের বুকের মাঝে মুখ গুঁজিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

সেদিনও বিনোদিনী ফুল আনিয়া খোঁপায় গুজিত। মালা গাঁথিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিত। সকলের অলক্ষ্যে চুপিচুপি দুই জনে ছাদের উপর উঠিয়া আসিত। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত নীলাকাশের পানে চাহিয়া তাহারা দুই জনে জীবনের কত রঙীন স্বপ্নই না দেখিত! বিনোদিনী ছিল সেদিন বাপমায়ের আদরিণী পুত্রবধূ। নরেন, নন্দার বৌদিকে সামনে না পাইলে পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। নরেনের পরীক্ষার ফিস্ পাঠাইতে হইবে, নন্দার শ্বশুর-বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে, বাবার চোখে ছানি পড়িয়াছে, তাঁহাকে শহরের হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে, মায়ের পঞ্চমী ব্রতে কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এই সকল বিনোদিনীরই কাজ। সকলের সকল পরামর্শে ডাক পড়িবে বিনোদিনীর। সেদিন সে ছাড়া যেন সংসারটা অচল হইয়া পড়িত। সংসারে কয়েকটা দিনের জন্যও তাহার অনুপস্থিতি কেহ সহ্য করিতে পারিত না। কত দুঃখে কষ্টে বিনোদিনীর সান্ত্বনা তাহার মনে কত বলেরই না সঞ্চার করিত।

তাহার পর অকস্মাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত সংসারে বিশৃঙ্খলা আনিয়া দিল। সেদিনকার সে রাত্রির কথা স্মরণ করিলে আজিও সে শিহরিয়া উঠে! মৃত শিশু প্রসব করিয়া বিনোদিনী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। জ্ঞান আর কিছুতেই আসে না। অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক দিন কাটিয়া গেল। পরে জ্ঞান সে ফিরিয়া পাইল বটে কিন্তু সুস্থ হইয়া উঠিতে সে আর পারিল না। কত রকমের চিকিৎসা আরম্ভ হইল, ভাল ভাল ডাক্তার দেখানোর কোন ত্রুটিই থাকিল না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিনোদিনী পাগল হইয়াই রহিল।

বিনোদিনীর কথা মনে পড়িলে বীরেনের আর বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইত না। মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসিলে কেবল মনকষ্টই বাড়িত। আত্মীয়-স্বজন আসিয়া বলিত, আবার বিয়ে ক'রে সুখী হও। পাগল নিয়ে কি ঘর করা যায়! মা কাতর হইয়া বলিতেন, তাই কর বাবা!

তাহাদের কথা শুনিয়া চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিত। যাহাকে মনে প্রাণে সে জীবনের সাথী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, বহু বৎসর ধরিয়া যে সেবা ও ভালবাসা দিয়া সকলের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, দৈবদুর্বিপাকে সে যখন অসুস্থ তখন তাহাকে অশ্রদ্ধা করিলে, তাহাকে নির্বিবাদে ত্যাগ করিলে বিবাহের ধর্মানুষ্ঠানে সত্য থাকিল কোথায়, মনুষ্যত্বেরও বা মূল্য কি রহিল! কিন্তু একথা কেহ বুঝিত না। তাহাদের অন্যায় অত্যাচারে সে ক্ষোভে, দুঃখে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত আর সে বাড়ী ফিরিবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিতে পারিত না। বিনোদিনী পাগল হইয়া গেলেও তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গত রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া বীরেনের মনে আশার একটা ক্ষীণ আলোক জাগিয়াছিল কিন্তু পরদিন বিনোদিনীর ঘরে ঢুকিয়া সে ভ্রম তাহার দূর হইল। কাল রাত্রে যে নূতন শাড়ীখানি পরিয়া বিনোদিনী তাহার সহিত স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিয়াছিল, আজ তাহা শত ছিন্ন অবস্থায় ঘরের এক কোণে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। বীরেনের শত সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও বিনোদিনী না বলিল একটি কথা, না মুখে তুলিল সামান্য খাদ্যকণা! এমন করিয়া কয়েকটি দিন সে নির্বিবাদে অনশনে কাটাইয়া দিল। উৎকণ্ঠায়, অশান্তিতে বীরেনের রাত্রে আর ঘুম হয় না।

পূর্বের মত বিনোদিনী আবার বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রে কাহারও আর ঘুম

হইবার উপায় নাই। নরেনের শরীরটা ভাল ছিল না। দাদার উপস্থিতিতে প্রথম প্রথম সে কিছু বলে নাই। বিরক্ত হইয়া আজ লাঠি লইয়া আসিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, কান্না থামাও, নইলে মেরে ঠিক ক'রে দেব।

তাহার কথা শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নরেন প্রবল বিক্রমে লাঠি বাগাইয়া ধরিল। পিছন হইতে বীরেন আসিয়া বাধা দিয়া কহিল, থাক, থাক নরেন, পাগলের কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে রে!

এই কয়েক দিন বীরেনের অনেক বাড়াবাড়ি তাহারা সহ্য করিয়াছে। আজ মেজাজও তাহার খারাপ ছিল। বীরেনের কথার উত্তরে সে বলিল, পাগলকে কি ক'রে সায়েস্তা করতে হয় তুমি তা জান না। শান্ত কথার মানুষ ওরা নয়।

নরেনের চীৎকারে বাড়ীর সকলে আসিয়া হুলুস্থূল বাধাইয়া দিল। বীরেন তাহাদের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে কহিল, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও তোমরা!

তাহার কথায় সকলেই রুষ্ট হইল। নরেনও জোর গলায় কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মা বাধা দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আর অন্ত থাকিল না। মায়ের খাবার সে নষ্ট করিয়াছে, ছোট বউয়ের চুল ধরিয়া টানিয়াছে, নরেনের ছেলের পুতুলটা আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়াছে, আভাকে মারিয়াছে। তাহার উপদ্রবে, চীৎকারে পাড়ার লোকেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যাহার নিকট এই অভিযোগ সে চুপ করিয়া রহিল। বিনোদিনীকে শাসন সে করিল না বরং কিসে সে শান্ত হয় তাহারই চেষ্টায় সে দিবারাত্র কাটাইল।

বীরেন বাড়ীতে আসিয়া অবধি পাগল বউ লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে! অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টি দিবার তাহার অবসর নাই। ইহার জন্য বাড়ীর সকলের মনে ক্ষোভের আর সীমা ছিল না। ছেলের ব্যবহারে মা বিদেশে যাইবার জন্য তল্পিতল্পা গুছাইতে বসিলেন। নরেন শাসাইয়া বলিল, এমন অবস্থা থাকিলে এই সংসারে সে থাকিবে না। পাড়াপ্রতিবেশী আসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে থেকে থেকে ওকি পাগল হয়ে গেল না কি! বউকে সবাই ভালবাসে, তাই ব'লে পাগলীকে কি অত আস্কারা দিতে আছে! লোককে ধরে ধরে মারবে, চীৎকার ক'রে কাউকে ঘুমুতে দেবে না, তবু তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না, অবাক্ করলে যাহোক!

বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে এই অসন্তোষ ও অভিযোগে বীরেনের মন অসুস্থ হইয়া উঠিল। শত চেষ্টা করিয়াও সে বিনোদিনীকে শান্ত করিতে পারিল না। তাহার উপদ্রব বাড়িয়াই চলিল।

পাশের বাড়ীর মেয়ের বিবাহ কাল হইয়া গিয়াছে। পরদিন বরবধূর যাত্রার প্রাক্কালে হঠাৎ একটা হুলস্থুল বাধিয়া গেল।

বীরেন বেড়াইতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই নন্দা আসিয়া হাঁপাইয়া বলিল, বৌদি ওদের বাড়ীতে গিয়ে বিয়ের পালকীতে চেপে বসেছে। কিছুতেই উঠতে চায় না!

মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, এক হাট লোকের মাঝে কি কাণ্ডটাই না বাধিয়েছে! ভগবান্, আমার মরণ কেন যে হয় না!

আভাকে টানিয়া আনিতে আনিতে হুঙ্কার দিয়া নরেন বলিল, এক-শ বার বলেছি ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখ তা ত শুনবে না! মেয়েটার কি দশা হয়েছে দেখ দেখি? বাড়ী ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল, মেরে কামড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বীরেন স্থির হইয়া সব শুনিল। কাহাকেও কিছু বলিল না। গম্ভীর হইয়া নিজের ছড়িগাছটা হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী পালকীর মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়া ছিল। বিবাহবাড়ীর ছেলে বুড়ো আসিয়া পালকীর চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছিল।

ভীড় ঠেলিয়া পালকীর সামনে গিয়া কঠোর স্বরে বীরেন বলিল, বেরিয়ে এস।

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, বেরবো কি গো, তুমিও এস! বা—রে, যাবে না বুঝি!

বীরেন পুনরায় বলিল, বেরিয়ে এস বলছি!

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিনোদিনী বলিল, ওরে তোরা উলুধ্বনি দে, শাঁখ বাজা, আমার যে বিয়ে!

আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা তাহার কথা শুনিয়া সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বীরেন নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না। বিনোদিনীর হাত ধরিয়া প্রবল বেগে সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

বিনোদিনী পালকীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষোভে, অপমানে বীরেন তখন পশু হইয়া উঠিল।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ম্মম ভাবে সে বিনোদিনীকে প্রহার করিয়া চলিল।

বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ কাটিয়া রক্তাক্ত হইল। বিবাহ-বাড়ীর কর্তা আসিয়া বীরেনকে ধরিয়া বলিলেন, থামুন, থামুন, বীরেনবাবু, যথেষ্ট হয়েছে!

সকলে ধরাধরি করিয়া বিনোদিনীকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

বাড়ীর সকলে তখন ঘুমে অচেতন। বীরেন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। বৈকালের ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায়, অনুশোচনায়, তাহার অন্তর পুড়িয়া খাক হইতেছিল। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিবার মত পৈশাচিক মনোবৃত্তি তাহার আসিল কি করিয়া তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। উন্মাদিনী নারীর অশোভন ব্যবহারের অজুহাতে সে তাহার অপরাধ খণ্ডন করিতে পারিল না। কিছুতেই সে ভুলিতে পারিল না যে যাহাকে সে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিয়াছে, সে পাগল হইয়া গেলেও তাহারই প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী, সুখে-দুঃখে যে তাহার জীবনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে!

বিনোদিনীর ঘর হইতে কোন সাড়াশব্দ আসিল না। বীরেন তালা ভাঙিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আলো জ্বালিয়া সে বিনোদিনীর পাশে গিয়া বসিল।

বিনোদিনী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল। আঘাত পাইয়া সমস্ত দেহ তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছিল অথচ যন্ত্রণার টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত সে করিল না। কেবল তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অনর্গল জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

বীরেন নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত সে কাঁদিয়া ফেলিল!

পরে চক্ষু মুছিয়া ডাকিল, বিনোদিনী,—বিনু!

বিনোদিনী মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার দিকে এক বার ফিরিয়াও চাহিল না।

বিনোদিনীর পাশে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন ভোর হইতে সামান্য বিলম্ব আছে। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে চোখ মেলিয়া চাহিতেই সে চমকাইয়া উঠিল। তাহার পাশে বিনোদিনী নাই!

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—বিনোদিনী!

কোন উত্তর পাইল না।

অস্থির হইয়া বীরেন বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া তুলিল। ছুটাছুটি করিয়া গ্রামময় সকলে ঘুরিয়া বেড়াইল কিন্তু বিনোদিনীর সন্ধান মিলিল না।

আশেপাশের গ্রামেও খোঁজ করা হইল।

কেহ আসিয়া কহিল, গভীর রাত্রে কাহার দ্রুত পায়ের শব্দ তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল। কেহ বা বলিল, হাট হইতে ফিরিবার মুখে নৌকায় বসিয়া নদীবক্ষে অস্পষ্ট নারীকণ্ঠ তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু ইহার অধিক কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাগল ছাড়া পাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে কৈফিয়ৎ কে দিবে! হয়ত বা বাঁচিয়া আছে, হয়ত বা নাই! পাগল পাগলই, তাহার কথা এত করিয়া ভাবিবার কি অর্থ আছে। বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার নিজের ও তাহার স্বামীর জীবন দুর্বিষহ করিয়া মিথ্যা সংসারে অশান্তি আনিয়া লাভ কি? মরিয়া থাকিলে সেও শান্তি পাইবে এবং অন্য সকলকেও মিথ্যা ভাবনা হইতে মুক্তি দিবে।

তথাপি দু-চার জন আত্মীয়-স্বজন বীরেনকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন।

কিন্তু বীরেন কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না। মনের মধ্যে তখন তাহার ঝড় বহিতেছিল। সকলের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া একা ঘরে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বারে বারে ঐ এক প্রশ্ন তাহার মনের মাঝে আসিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল!

বাহ্যজ্ঞানহীনা উন্মাদিনীরও কি অতি সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ থাকিতে পারে? অভিমান করিয়া তাহারাও কি মানুষের চিত্তকে এমন করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে? পূর্ব্বেও ত কত বার সে নরেনের হাতে মার খাইয়াছে, কই, মুখ ফুটিয়া সে ত একটি কথাও বলে নাই। তবে কি গত রাত্রে তাহার চোখের জলের ভাষা আছে?

কিন্তু তাহার সকল প্রশ্ন প্রশ্নই থাকিয়া গেল। মনের মাঝে কোন উত্তরই সে খুঁজিয়া পাইল না! অন্ধকার ঘরে বসিয়া বীরেন চীৎকার করিয়া উঠিল!

বাঙালীর খাদ্যসংস্কার

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, ডি. টি. এম্

আগেকার দিনে আমাদের খাবার বিষয় নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবতে হয় নি, কিন্তু এখন এ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে চিন্তা করবার দিন এসেছে। তখনকার দিনে খাবার জিনিষ এমন দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য ছিল না, আর তখনকার দিনে খাবার জিনিষের এমন রকমারিও ছিল না কিংবা এত ভেজালও ছিল না। তখন যার যেমন খুশী সে তেমন খাদ্যই খেতো বটে, কিন্তু তখন খাদ্যবস্তুই ছিল নির্দিষ্ট-সংখ্যক, আর প্রস্তুতপ্রণালীও ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। সুতরাং তখন বাধ্য হ'য়ে সকলকে খাদ্য সম্বন্ধে খানিকটা অল্পসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হতো। প্রত্যেক মানুষকে তখন নিজের খাদ্য নিজেকে কষ্ট ক'রে আহরণ ক'রে আনতে হতো এবং নিজেকে কষ্ট ক'রে বানিয়ে নিতে হতো। কাজেই এর মধ্যে আর কতই বা বৈচিত্র্য থাকবে, আর কতই বা তাই নিয়ে চিন্তা করবার দরকার হবে? কিন্তু এখনকার দিনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন এক দিকে যেমন খাদ্যবস্তুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, আর সেগুলো যেমন সংগ্রহ করাও হ'য়ে গেছে সহজ, অর্থাৎ পয়সা ফেললে এখন নানা রকম জিনিষই অতি সহজে সর্বত্র পাওয়া যেতে পারে,—অন্য দিকে তেমনি পয়সাই হ'য়ে গেছে অত্যন্ত দুর্লভ। সুতরাং পয়সা ফেললেই যদিও সব জিনিষই এখন জুটতে পারে, কিন্তু খুব কম লোকের ভাগ্যেই তা জোটে, কারণ অধিকাংশ লোকের পক্ষেই দুবেলা উপযুক্ত প্রকারের ও উপযুক্ত পরিমাণের খাদ্য কিনে খাবার সামর্থ্য নেই। এই জন্যই এখন অনেককে রীতিমত ভাবে চিন্তা করতে হয় যে কি খাবো। পয়সার অভাবে লোকে স্বভাবতই খোঁজে—যাতে যথাসম্ভব অল্প পয়সায় যথাসম্ভব পেটভরা খাদ্য কিনে খেতে পারা যায়। এই চেষ্টার ফলে আমাদের খাদ্যরীতিও অনেক বদলে গেছে। আমরা এখন আর শরীরের প্রয়োজনের কিংবা স্বাস্থ্যোন্নতির প্রেরণার দিকে চেয়ে বাজার-হাট করি না, আমরা বাজার ক'রে আনি পকেটের পয়সা গুনে গুনে। তার পর খাবার সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই আমাদের পরের উপর নির্ভর করতে হয়। এইটাই এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে আমরা অনেক ভুল ক'রে ফেলেছি। প্রথমত, আমরা সস্তা জিনিষ চাই দেখে ব্যবসায়ীরা খাবার জিনিষে ভেজাল মিশিয়ে তা সস্তা ক'রে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত, আমরা পেট ভরাবার জন্য যে জিনিসটা দেখছি সস্তা, সেটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ক'রে খাচ্ছি, আর যেটা দেখছি দুর্মূল্য সেটা কম ক'রে খাচ্ছি কিংবা একেবারেই খাচ্ছি না। আমরা ভাবি কোনও রকমে খেয়ে পেট ভরালেই হলো। সুতরাং দুর্মূল্য জিনিষগুলোকে আমরা পারতপক্ষে এড়িয়ে যাই আর সুলভ জিনিস দিয়েই আমাদের পেট ভরাই। যদিও আমরা বুঝতে পারি না যে এতে কোথায় আমাদের অন্যায় করা হচ্ছে, কারণ যেমন করেই হোক পেট তো আমাদের নিত্যই ভরছে,—কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে আগেকার লোকদের চেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেহে আর তেমন শক্তি নেই, মনে তেমন উৎসাহ নেই, আর আমাদের আয়ুর পরিমাণও ক্রমশ কম হয়ে যাচ্ছে। এর থেকেই সাধারণ বুদ্ধিতেও এইটুকু বোঝা যায় যে আমাদের খাদ্যরীতির মধ্যে নিশ্চয় কিছু দোষ হচ্ছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চাইলে আগে তার সংশোধন করা দরকার। তাই এখন বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন এবং তার ফলে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক প্রাকৃতিক সত্যের আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

বর্তমানে খাদ্যবিজ্ঞান আমাদের এই কথা শিখিয়ে দিয়েছে যে কোনও রকমে পেট ভরালেই শরীর রক্ষা করা হয় না। শরীরের পুষ্টির জন্য কোন্ জিনিষ কতটা খাওয়া দরকার তার একটা সঙ্গতিমূলক হিসাব আছে। আমাদের খাদ্যবস্তুগুলির ভিন্ন ভিন্ন রকমের গুণ আর ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রিয়া। যে কাজের জন্য যে খাদ্যটির দরকার সে কাজ অন্য খাদ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। সুতরাং আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার উপযোগী বিভিন্ন খাদ্যগুলি সবই খাওয়া চাই। শুধু তাই নয়, সমস্ত খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলা চাই, নইলে স্বাস্থ্যের হানি হবে। একটা খাদ্য খুব বেশি পরিমাণে খেয়ে নিলুম, অতএব অন্য খাদ্যটা না খেলেও

চলবে,—এ-রকম মনগড়া ব্যবস্থা করতে গেলেই অনিষ্ট হবে। অথচ সেই ভুলই আমরা এখন ক্রমাগত করছি।

কিন্তু এই ভুল কেমন ক'রে সংশোধন করা যেতে পারে? সে কথা বলতে গেলে খাদ্যবস্তুগুলোকে আগে মোটামুটি কয়েকটা বিভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া দরকার। নইলে বোঝা যাবে না যে; কোন্ রকমের জিনিষ আমরা কম খাচ্ছি আর কোন্ রকমের জিনিষ বেশি খাচ্ছি, আর কোথায়ই বা খাদ্যের সামঞ্জস্যের অভাব হচ্ছে। এখানে উৎপত্তি অনুসারে, কিংবা আস্বাদ অনুসারে, কিংবা ব্যক্তিগত রুচি অথবা প্রথা অনুযায়ী ভাগ করতে গেলে চলবে না,—এখানে খাদ্যকে ভাগ ক'রে নিতে হবে তার নির্দিষ্ট ক্রিয়া অনুসারে। বিপরীত স্থান থেকেই আসুক কিংবা বিপরীত রকমের আস্বাদই তার থাকুক, যে সকল খাদ্য আমাদের পেটে গিয়ে একই রকম ভাবে হজম হয় আর একই রকমের প্রয়োজনে লাগে, সেগুলোকে আমরা একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলবো। কারণ বাইরের দিক্ থেকে বিভিন্ন দেখালেও কার্যস্থলে গিয়ে সেগুলো বিভিন্ন নয়।

এই নিয়ম অনুসারে বাছাই ক'রে নিয়ে আমাদের সমস্ত রকমের খাদ্যকে মোট ছয়টি কোঠার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। তার নামগুলো দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক ভাষায়, আমরা এখানে সেই বৈজ্ঞানিক ভাষাটুকুই বজায় রেখে দিচ্ছি।

একটা পর্যায়ের নাম **কার্বোহাইড্রেট।** রাসায়নিক বিশ্লেষণ অনুসারে এই পর্যায়ের ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পড়ে নানা রকমের ক্ষেত্রজ ফসল—যেমন, ধান, যব, গম, ভুট্টা, জওয়ার, জৈ প্রভৃতি—অতএব এই সব ফসল থেকে আমরা যেসব খাদ্য প্রস্তুত ক'রে খাই, যেমন, ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা, এরারুট, বার্লি, সাগু—এই সমস্তই কার্বোহাইড্রেট জাতের খাদ্য। তা ছাড়া আরও আছে। মিষ্ট জিনিস মাত্রেই কার্বোহাইড্রেট। গুড়, মধু, চিনি—এগুলো সব কার্বোহাইড্রেট। আবার মাটির নীচে কন্দের মত যেগুলো জন্মায়, যেমন আলু, কচু, ওল, মান—এগুলিও কার্বোহাইড্রেট। এই তালিকার মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলোর একই রকম ক্রিয়া। কার্বোহাইড্রেট মাত্রেই শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি উৎপাদন করে আর দেহের উত্তাপ রক্ষা করে।

তার পর অপর একটা পর্যায়ের নাম **প্রোটিন।** এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, ছানা। আবার আধাআধি ভাবে ডাল, শুঁটি, বরবটি, বিন, মটর, এগুলোও এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। প্রোটিন মাত্রেরই কাজ শরীরের মাংস প্রভৃতি তৈরি করা, অর্থাৎ শরীরের উপাদানবস্তুগুলির গঠন আর মেরামত করা।

আর একটা পর্যায়ের নাম **ফ্যাট।** তেল, ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি এই পর্যায়ের মধ্যে। এই পর্যায়ের খাদ্যগুলির প্রধান কাজ শরীরের মধ্যে উত্তাপ সঞ্চয় করা।

চতুর্থ একটি পর্যায়ের নাম **ভিটামিন।** ভিটামিন বলতে খাদ্যের এমন একটি সূক্ষ্ম উপাদান বোঝায় যা কেবল টাটকা দুধ ঘি, টাটকা ফলমূল, এবং টাটকা শাকসব্জির মধ্যেই থাকে। এখানে আমরা টাটকা কথাটাই বারে বারে ব্যবহার করছি, তার কারণ ঐ সকল খাদ্যের কেবল টাটকা অবস্থাতেই এই জিনিসটি পাওয়া যায়। বাসি হ'লেও এই জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, আর আগুনে বেশিক্ষণ সিদ্ধ করলেও এই জিনিস নষ্ট হ'য়ে যায়। ভিটামিন বহু রকমের আছে, তার গুণও বহু রকমের আছে, কিন্তু উপস্থিত তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার আমাদের প্রয়োজন নেই। মোট কথা এইটুকু আমাদের জেনে রাখা দরকার যে শরীরের ভিতরকার নানা রকম সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণ আর সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য আমাদের ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন।

বাকি দুটি পর্যায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে Mineral foods অর্থাৎ **লবণাদি ঘটিত** খাদ্যের পর্যায়। আমাদের শরীরে অনেক রকমের ধাতব লবণের দরকার, যেমন ক্যালসিয়ম, পটাসিয়ম, আইরন, আইওডিন প্রভৃতি। এইগুলি আমরা দুধ, মাংস, শাকসব্জি প্রভৃতি নানা রকম খাদ্যের মধ্যে পাই।

শেষের পর্যায়ের নাম দেওয়া যেতে পারে **আনুষঙ্গিক খাদ্য।** হলুদ, ধনিয়া, লঙ্কা, জিরা প্রভৃতি এই পর্যায়ের মধ্যে। আবার চা, কফি প্রভৃতিকেও এই পর্যায়ে ধরা হয়। একে চাট্‌নি পর্যায়ও বলা যেতে পারে। খাদ্যে বৈচিত্র্য এনে তাকে সুস্বাদু এবং মুখরোচক করবার জন্যে যা কিছু দরকার সবই এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

আমরা ছয় রকমের খাদ্যবস্তুর একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলাম। এই ছয় রকমের খাদ্যই আমাদের খাওয়া চাই, কোনটি বাদ দিতে গেলে চলবে না, কারণ প্রত্যেকটির জন্য প্রকৃতি স্বতন্ত্র রকমের কর্তব্য নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। এইগুলির যথোচিত সামঞ্জস্য বজায় রেখে খেলেই আমাদের উপকার হবে, নইলে অনিষ্ট হবে। এখন

দেখা যাক যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা অনুসারে কি ভাবে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যেতে পারে এবং কি ভাবে চললে আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক কার্বোহাইড্রেটের কথা। ভাত এবং রুটি, এই দুটি আমাদের প্রধান কার্বোহাইড্রেট খাদ্য। প্রকৃত পক্ষে আমরা বাংলা দেশের লোক, বেশির ভাগ ভাত খেয়েই বেঁচে থাকি, তার সঙ্গে আর যা কিছু খাই সে এক রকম নাম মাত্র। কিন্তু ভাতই কি আমরা যথোচিত ভাবে খাই, অর্থাৎ ভাতের যতটা গুণ আছে সবটাই কি আমরা গ্রহণ করতে পারি? যে চাল থেকে আমাদের ভাত হয় তার সবটুকুই কার্বোহাইড্রেট বটে, কিন্তু চালের অন্যান্য যে সকল উপাদান আছে সেগুলা চালের ভিতর দিকে থাকে না, সেগুলা থাকে তার উপর দিকে, যেখানে কুঁড়ো লাগানো থাকে তারই কাছাকাছি। আগেকার দিনে যখন আমাদের ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে চাল ছাটাই করা হ'ত, তখন কতক কতক কুঁড়ো চালের গায়ে লেগে থাকত এবং চালের মূল্যবান্ উপাদানগুলো কিছুমাত্র নষ্ট হ'ত না। সেই চালের ভাত খেতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন চাল ছাটাই হয় কলে, প্রত্যেক চালটিকে এখন মেজে ঘষে পরিষ্কার ধবধবে ক'রে ফেলা হয়, তাতে অধিকাংশ স্থলে কুঁড়োও লেগে থাকে না, আর ভিটামিন ও ধাতব লবণ প্রভৃতি সারপদার্থগুলোও লেগে থাকে না। তার পর যদিও বা কিছু লেগে থাকে, কিন্তু আমরা ভাত রাঁধবার পূর্বে চাল ধুয়ে ধুয়ে তার অনেকখানি নষ্ট ক'রে ফেলি। আমরা মনে করি যে চালটা রাঁধবার আগে উত্তমরূপে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া উচিত। কিন্তু ধাতব লবণাদি পদার্থ জল দিয়ে বেশি ধুতে থাকলেই ক্রমশ গলে বেরিয়ে যায়, সুতরাং চালের অনেক সারবস্তু ধোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নষ্ট ক'রে ফেলি। চালের উপরে ভূষির সঙ্গে থাকে ভিটামিন বি আর ফস্‌ফরাস, চালকে বেশি রকম ভাবে ধুলে আর মাজলে ঐগুলো বাদ পড়ে যায়, আর ঐগুলোর অভাবে আজকাল আমরা স্নায়ুদৌর্বল্য ও নানা রকম স্নায়ুঘটিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকি। আগেকার কালে আমাদের এই সকল স্নায়ুর ব্যারাম ছিল না, আজকালই দেখা যাচ্ছে। বস্তুত চাল বেশি কচ্‌লে কচ্‌লে ধোওয়া মোটেই উচিত নয়, দু-একবার মাত্র জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট। যখন সেটা অনেকক্ষণ যাবৎ আগুনে সিদ্ধ হবে তখন অত ধোওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তার পর মেজে এবং ধুয়ে তো ওর অনেকখানি বস্তু বাদ পড়ে যায়, শেষে যেটুকুও বা থাকে তারও অনেকখানি বেরিয়ে যায় ফেন গালবার সময়। ভাত সিদ্ধ হ'তে অনেক সময় লাগে, ততক্ষণে চালের উপরকার অনেক জিনিস চাল থেকে ছেড়ে ফেনের মধ্যেই বেরিয়ে আসে। এই ফেন যখন আমরা গেলে ফেলে দিই, তখন তার সঙ্গে ঐগুলোও ফেলে দিই। ভাতের ফেন গালবার রীতিটা আমাদের অত্যন্তই ভুল রীতি। এই রীতিটা বোধ হয় পূর্বে করা হয়েছিল কেবল তখনকার জন্য—যখন ভাত রাঁধতে গিয়ে দৈবাৎ চালের সঙ্গে জলের মাত্রাটা বেশি হ'য়ে যেত। কিন্তু তার পর থেকে ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণটা বেশি ক'রেই দেওয়া এবং সেটা ফেন গেলে ফেলে দেওয়া একটা অবশ্য করণীয় রীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এটা মোটেই অবশ্যকরণীয় প্রক্রিয়া নয়। এমন ভাবেই আমাদের ভাত রাঁধার নৈপুণ্য আয়ত্ত করা উচিত, যাতে যতটুকু জল দেওয়া হবে, ভাত সিদ্ধ হয়ে গেলে তার সবটুকুই ভাতের মধ্যে চলে যাবে, গালবার উপযুক্ত ফেন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ জল এত কমও দেওয়া হবে না যাতে হাঁড়ির তলায় ভাত ধ'রে যায়। এটুকু নৈপুণ্য আয়ত্ত করা কেবলমাত্র অভ্যাসসাপেক্ষ, দু-চার দিন চেষ্টা করলেই এটা অনায়াসে হ'তে পারে। এই রকম ভাবে যদি ভাত রাঁধা হয়, তাহলে সেই ভাত খেয়ে দেখা যাবে যে আগের চেয়ে অনেক কম পরিমাণ খেয়েই আমাদের পেট ভরে যাচ্ছে, চালের খরচ আগের চেয়ে অনেক কমে যাচ্ছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, সার পদার্থ খেলে অতি কম পরিমাণেই তার কাজ হয়ে যায়, কিন্তু অসার পদার্থ খেলেই তার অনেকখানি পরিমাণের প্রয়োজন হয়। ভাত সম্বন্ধে আমরা যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলি যদি আমরা সংশোধন ক'রে নিতে পারি তাহ'লে আমাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে, আর খরচও অনেক বেঁচে যাবে।

অনেকে ভাতের বদলে রুটি খান। অনেকে এক বেলা ভাত আর এক বেলা রুটি খান। এও বেশ উত্তম ব্যবস্থা। তবে রুটি খেতে গেলে রুলের ফাইন ময়দার রুটি খেয়ে লাভ নেই, গম থেকে যাঁতায় ভাঙা চোকড় সমেত যে আটা তৈরি হয়, তারই রুটি ক'রে খাওয়া উচিত। আমাদের খাদ্যবিভাগ অনুসারে চালও যা আর গমও তাই বটে, কিন্তু গমেতে উপরন্তু গ্লুটেন নামক এক রকম প্রোটিন আছে তাতে শরীরের তাগৎ হয়। কিন্তু গম ভাঙা আটাকে আমরা চালুনিতে ছেঁকে ছেঁকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে ফেলি। সূক্ষ্ম চালুনিতে ছেঁকে প্রথমেই
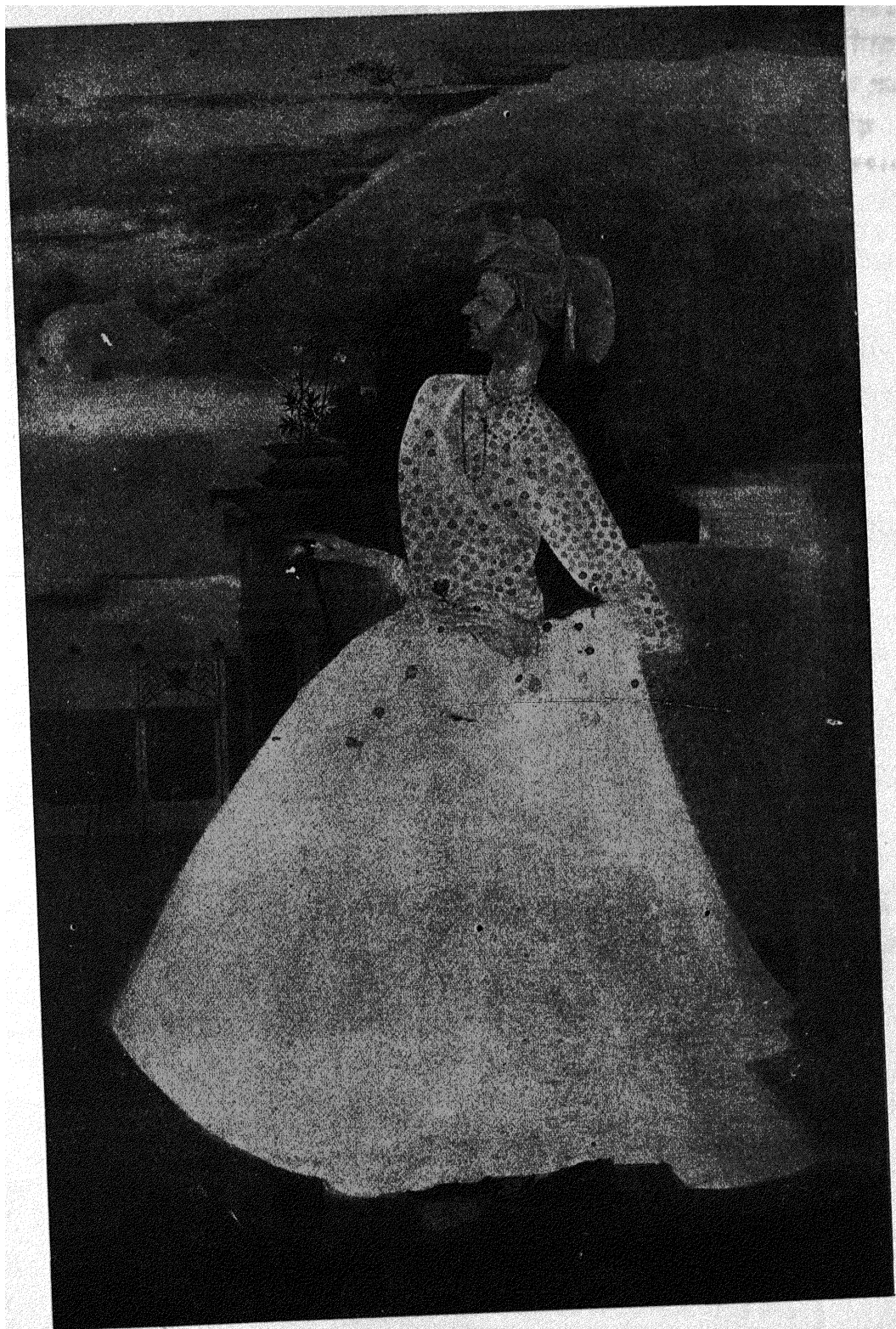
মোগল বাদশা

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাত

যে ফাইন গুঁড়োটা বেরিয়ে আসে তাকেই আমরা বলি ময়দা, তার মধ্যে গমের চোকড়ও নেই, আর ভিটামিনও নেই। তার পর আরও মোটা চালুনিতে ছেঁকে যেটা পাই তাকে বলি আটা, আর অবশিষ্ট মোটা মোটা দানা-গুলোকে বলি সুজি। কার্বোহাইড্রেট ছাড়া গমের আর যা-কিছু সারবস্তু, তা সব ঐ সুজির মধ্যেই থেকে যায়। সুজি খুব ভাল জিনিষ, যদি টাটকা তৈরি করা হয়। কিন্তু সুজি আমরা সাধারণত রুটির জন্যে ব্যবহার করি না, ওটা ব্যবহার করি রোগীর পথ্য স্বরূপে। সুতরাং এই রকম ভাগাভাগির ব্যবস্থা না ক'রে পশ্চিম দেশের মত আমাদেরও গম ভেঙে নিয়ে সেটা আর চালুনিতে না ছেঁকে ঐ চোকড় সমেত আটাই সরাসরি ব্যবহার করা উচিত।

রুটি খাবার আর একটি মস্ত গুণ আছে এই যে, রুটি খেতে গেলে আমাদের অনেকক্ষণ ধ'রে চিবোবার প্রয়োজন হয়, ভাতের মতো রুটি নরম জিনিষ নয়, সুতরাং মুখে দিয়েই অমনি গেলা যায় না। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাদের চিবোতে হয়। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যমাত্রই ভাল ক'রে চিবিয়ে খাওয়ার একটা বিশেষ ফল আছে। আমাদের লালার মধ্যে থাকে এক রকমের জারক রস, যা কার্বো-হাইড্রেট খাদ্যকে খুব হজম করাতে পারে। ভাত কিংবা রুটি উত্তমরূপে চিবিয়ে না খেলে ঐ রস তার সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় না, তাতে হজমের বিঘ্ন ঘটতে পারে। যাদের দেশের প্রধান খাদ্য ভাত আর রুটি, তাদের এই কথাটি বিশেষ ক'রে মনে রাখা উচিত। এই চিবোবার প্রয়োজনের দিক থেকেই বলছি যে ভাতের চেয়ে মোটা আটার রুটি খাওয়া ভাল, আর মিহি চালের বদলে মোটা চাল খাওয়া ভাল। অনেকে হয়তো বলবেন যে মিহি চালটাই আমাদের সহ্য হয়, মোটা চালটা তেমন সহ্য হয় না। কিন্তু এটা নিতান্তই অভ্যাসের ফল, আর কিছুই না। চিরকাল ধ'রে মিহি চালের ভাত অল্প চিবিয়ে বা না-চিবিয়ে গিলে খাওয়া যাঁরা অভ্যাস করেছেন, তাঁরা মোটা চাল ঐ রকম ভাবে গিলে খেয়ে সহজে হজম করতে পারবেন না। কিন্তু মোটা চাল উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবার অভ্যাস করে দেখুন, কিছু দিন পরে দেখবেন সেটা খেতেও মিষ্ট লাগে, আর হজমও বেশ হয়। মিহি চালের অপেক্ষা মোটা চালে গায়েও বেশি জোর হয়, এটাও সত্য কথা।

ভাত রুটি ছাড়া আমরা যে সব মিষ্ট জিনিষ খাই সেগুলোও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট মাত্রকেই চিনি বলা চলে, কারণ পেটের ভিতর গিয়ে এই জাতীয় সমস্ত খাদ্যই সেই চিনিতে পরিণত হয়, যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক-ভাষায় বলি গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজই আমাদের পরিশ্রমের ইন্ধন জোগায়, সুতরাং পরিশ্রম করবার ক্ষমতা আমরা এই কার্বোহাইড্রেট বিভাগের খাদ্য থেকেই পাই। অতএব ভাত এবং রুটি প্রভৃতির দ্বারা যে কাজ হয়, চিনি গুড় ও মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারাও সেই কাজই হয়। তা হ'লেই বুঝে দেখুন, যাঁদের সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ যাঁরা রীতিমত ভাতও খান এবং রীতিমত মিষ্টিও খান, তাঁরা সবশুদ্ধ কতখানি কার্বোহাইড্রেট খান। অথচ তাঁদের এতটা কার্বোহাইড্রেট খাবার প্রায়ই কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণী হচ্ছে ভদ্রলোক, আর এক শ্রেণী গরীব মুটে মজুর চাষী। যারা ভদ্রলোক তাদের শারীরিক পরিশ্রম খুব কমই হয়, সুতরাং তাদের কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের প্রয়োজনও সেই অনুসারে কম হয়। কিন্তু তাদের সামর্থ্য আছে, সুতরাং ভাত রুটি প্রভৃতিও তাদের জোটে, আবার চিনি গুড় মিষ্টান্ন প্রভৃতিও জোটে। কিন্তু যারা গরীব মুটে মজুর তাদের শারীরিক পরিশ্রম ভদ্র-লোকদের চেয়ে অনেক বেশী, সুতরাং তাদের কার্বো-হাইড্রেটের প্রয়োজনও অনেক বেশী, কিন্তু দু-বেলা তারা পেটভরা ভাতই খেতে পায় না, মিষ্ট দ্রব্য তাদের জুটবে কোথা থেকে? অথচ এই সকলের প্রয়োজন তাদেরই অধিক। এই বৈষম্যের সপক্ষে সাংসারিক যুক্তি যতই থাক, স্বাস্থ্যের আইন অনুসারে এটা অবিচার। এখানে কি করা উচিত? গরীব লোকেরা যতটা পরিমাণে ভাত রুটি খায় তা খাক, তাতে তাদের কোন অনিষ্ট হবে না, কারণ পরিশ্রমের দ্বারাই সব খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু ভদ্র-লোকদের উচিত, হয় পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া, না-হয় ভাত এবং মিষ্টদ্রব্যের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া। ভাত এবং মিষ্টদ্রব্য যথেষ্টই খাব অথচ কোন পরিশ্রম করব না, তার ফলে কি হবে? সেগুলো খরচ হ'তে না পেয়ে ক্রমাগতই শরীরে গিয়ে জমতে থাকবে, তাতে হয় আমরা মোটা এবং অথর্ব হয়ে পড়ব, নয়তো আমাদের ডায়েবিটিস রোগে ধরবে।

কার্বোহাইড্রেটের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার ধরা যাক প্রোটিনের কথা। কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে যে-কথা বলেছি প্রোটিন সম্বন্ধে সে-কথা কখনই বলা চলবে না। কারণ প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যে কেবল পরিশ্রমেরই সম্পর্ক, তা নয়। প্রোটিন দেহগঠন করে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্য ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন।

বাহ্যিক পরিশ্রম যার যতটুকুই হোক, শরীরের অণুপরমাণুর ক্ষয় প্রতিনিয়ত সকলেরই হচ্ছে। আমাদের, শরীরের কারখানার কাজ এক মুহূর্তও বন্ধ যায় না, ঘুমের সময়েও ভিতরকার কারখানার কাজ চলছে। সুতরাং শরীরের মাংস এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ভাঙাচোরা এবং ক্ষয় নিত্যই কিছু কিছু হচ্ছে। সেগুলোকে মেরামত ক'রে নিত্য নিত্য ক্ষয়ের পূরণ করবে কে? সে ঐ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য। এ খাদ্য সকলেরই অবশ্য খাওয়া চাই, নইলে শরীর অপটু হ'য়ে যাবে। কিন্তু এই দিক্ দিয়েই আমরা আর একটি মস্ত ভুল করি। প্রোটিন খাদ্য আমরা কতটুকু পরিমাণে খাই? কার্বোহাইড্রেট যদি খাই ৬ ছটাক, তাহলে হিসাব মত প্রোটিন খাওয়া উচিত অন্তত ২ ছটাক, অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটের তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই খায় না। প্রথমত আমরা স্বভাবতই মাংসাশী নই। প্রোটিন হিসাবে মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য, আর আমাদের দেশেও চলিত কথায় যে বলে—"মাংসে মাংস বৃদ্ধি,"—এ কথা খুবই ঠিক। মাংস খেলে শরীরের সতেজ গঠন হয় আর শরীর দৃঢ় হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। যে সকল দেশের লোক নিয়মিত মাংস খায় তাদের দেহের আকৃতির সঙ্গে বাংলা দেশের লোকের আকৃতির তুলনা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু যে কারণেই হোক বাংলা দেশের লোক মাংস খেতে তেমন অভ্যস্ত নয়। এখানকার সচ্ছল অবস্থার ভদ্রলোকেরাও কালেভদ্রে মাংস খায়। শহর ছাড়া অন্য কোথাও মাংস রোজ পাওয়া যায় না আর খাওয়াও চলে না। তা ছাড়া সামাজিক রীতি অনুসারে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। তা হোক, কিন্তু মাংস ছাড়াও প্রোটিন খাদ্য আরো অনেক রকমের আছে। ডিমও খুব উৎকৃষ্ট প্রোটিন খাদ্য, কিন্তু ডিম আমরা কখনো নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ খাই না। ওটা আমরা সৌখিন খাদ্য বলেই মনে করি, যেদিন খুব সখ হ'ল সেদিন দুটো ডিম রেঁধে খাওয়া গেল। কিন্তু তাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটে না। তবে মাছটা আমরা প্রত্যহ খাই বটে। মাংসের চেয়ে মাছ কিছু নিকৃষ্ট প্রোটিন নয়। লোকে বলে বাঙালী মাছের বড় ভক্ত, একটু মাছ না হ'লে তাদের ভাত খাওয়া হয় না। কিন্তু অনুসন্ধান ক'রে দেখুন, মাছই বা আমরা কতটুকু খাই? আধসের মাছ এলেই আমাদের একটা বড় সংসারের চলে যায়, প্রত্যেকের পাতে এক আধ টুকরা মাছ দিতে পারলেই মনে করি যথেষ্ট হোলো, তাতে জনপিছু আধ ছটাক হয় কি না সন্দেহ। এইটুকু মাছে কখনো প্রোটিনের প্রয়োজন মেটে না। আর গরীবদের কথা তো ছেড়েই দিলুম, তারা মাসের মধ্যে কয়দিনই বা মাছের সাক্ষাৎ পায়? অথচ প্রকৃতি আমাদের জন্য মাছের ব্যবস্থা করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করে নি। বাংলা দেশ যেমন নদীবহুল, তেমনি পুষ্করিণীবহুল, তা ছাড়া খালবিল তো যথেষ্ট আছে। লোকে একটু চেষ্টা করলেই এখানে মাছের সংখ্যা বাড়াতে পারে, মাছ এদেশে যথেষ্টই সস্তা হতে পারে, আর গরীব লোকেরাও রুই কাৎলা না হোক, অন্তত চুনা মাছ খেয়েও প্রোটিনের অভাব পূরণ করতে পারে। আর আমাদের সকলেরই ছেলেবেলা থেকে এমন অভ্যাস করা উচিত যাতে আমাদের মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যের দিকে বেশি ঝোঁক না হ'য়ে মাছ মাংসের দিকেই একটু বেশি ঝোঁক হয়। এটা অনেকটা অভ্যাসের ব্যাপার, ছেলেবেলা থেকে যেমনভাবে অভ্যাস করানো যাবে সেই ভাবেই আমাদের খাবার ঝোঁক হবে।

অনেকে হয়তো বলবেন, মাছমাংস না খেলে কি শরীর সুদৃঢ় হয় না? তাঁরা হয়তো পশ্চিম দেশের লোকের তুলনা দিয়ে বলবেন যে ওরা তো পুরাদস্তর নিরামিষাশী, তবে ওদের দেহের শক্তি আর গঠন আমাদের চেয়ে ভাল হয় কিসে? কিন্তু মাছমাংস না খেলেও ওরা অন্যান্য রকমের প্রোটিন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খায়, সেটা হিসাব ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমত, ওরা ভাত খায় না, রুটি খায়,—ঐ আটাতে কিছু প্রোটিন আছে। তার পর ওরা আমাদের মতো পাতলা ডালের ঝোল রেঁধে খায় না, ওরা দস্তরমত ঘন ডাল রেঁধে খায়, তাতেও খানিকটা প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া ওরা কাঁচা ছোলা খায় এবং ছাতু খায়, তাতেও বেশ প্রোটিন আছে। ছোলা নিতান্ত সামান্য খাদ্য নয়, ছোলা খেয়ে ঘোড়ার গায়ে কত জোর হয় তা সকলেই জানেন। আর সব চেয়ে বেশি প্রোটিন ওরা পায় দুধ থেকে। পশ্চিম দেশের লোকে প্রায় সকলেই ঘটি ঘটি কাঁচা দুধ খেয়ে ফেলে। পাঞ্জাবে যারা মেথরের কাজ করে তারাও দুধ খায়। এক ঘটি দুধ আর খানিকটা ছোলা, এই ওদের স্বাভাবিক জলখাবার, এই খেয়ে ওরা কাজে বেরিয়ে যায়। দুধে আর ছোলাতে যে প্রোটিন আছে তা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট, সুতরাং দু-চার টুকরা মাছমাংস নাই বা খেলে, তাতেই বা ওদের স্বাস্থ্যের হানি কেন হবে? কিন্তু আমাদের দেশে দুধকে আমরা কেবল শিশুর খাদ্য বলেই মনে করি, আমরা দুধের জায়গায় খাই চা। এদিকে আমরা দুধও খাব না, ছোলাও খাব না, আর ওদিকে মাছ-মাংসের বেলা এক আধ টুকরার বেশী আমাদের জুটবে না।

এইতেই আমাদের প্রোটিনের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা কম হ'য়ে যায়। প্রোটিন সম্বন্ধে আমাদের খাদ্যরীতির সংস্কার করা বিশেষ দরকার, এবং প্রোটিনের মাত্রা আমাদের অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। যাঁদের নিরামিষ খেতে হবে তাঁরা দুধ খান, ছানা পনির খান, ছোলা খান, নানা রকম ডাল খান, শুঁটি বরবটি বিন প্রভৃতি খান। আর যাঁরা আমিষ খাবেন তাঁরা মাছমাংসের মাত্রা বাড়িয়ে দিন। যেমন ভাবেই হোক, বাংলা দেশের লোকের প্রোটিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। অন্যান্য সকল দেশের তুলনাতেই আমাদের প্রোটিন খাদ্য খুব কম খাওয়া হচ্ছে।

প্রোটিনের পরে ধরা যাক **ফ্যাট** বা চর্বিজাতীয় খাদ্যের কথা। ফ্যাট দুই রকমের হ'তে পারে। জন্তুজানোয়ারের শরীর থেকে এবং মাছ থেকে যে চর্বি পাওয়া যায় সেটাও আমাদের ফ্যাট-হিসাবের খাদ্য, আর নানা রকম তৈলাক্ত উদ্ভিজ্জ বীজ থেকে যে তেল বেরোয় সেও আমাদের ফ্যাট-হিসাবের খাদ্য। এই দুইয়েরই এক রকমের ক্রিয়া, শরীরের উত্তাপ সৃষ্টি করা। শীতপ্রধান দেশের লোকের এই খাদ্যের প্রয়োজন বড় বেশি, কারণ, তাদের শরীর নিত্যই গরম রাখার দরকার। মেরুপ্রদেশের লোকে যে পরিমাণ চর্বি খায় তা শুনে আপনারা আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন। আমাদের দেশে চর্বিখাদ্যের প্রয়োজন ওদের তুলনায় খুবই কম, তথাপি কিছু প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। আমরা জান্তব ফ্যাট খাই সাধারণত ঘি আর মাখন, এবং উদ্ভিজ্জ ফ্যাট খাই সরিষার তেল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সরিষার তেলের বদলে অন্যান্য রকমের তেল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাংলা দেশে সরিষার তেলই প্রশস্ত, কারণ এখানে সরিষার চাষও যথেষ্ট হয় এবং তার থেকে তেলও অনায়াসে পাওয়া যায়। সরিষার তেলের আর একটি গুণ এই যে এর দ্বারা খাদ্যে একটা সুস্বাদ এবং সুগন্ধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সরিষার তেলেও আজকাল ভেজাল দেওয়া হচ্ছে, এবং তার ফলে এপিডেমিক ড্রপসি প্রভৃতি রোগ বাংলা দেশ ছেয়ে ফেলছে। এই ভেজাল আমাদের সমবেত চেষ্টায় বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত, এবং তা যদি সম্ভব না হয় তবে সরিষার তেল বন্ধ ক'রে দিয়ে আমাদের অন্য রকম তেল খাবার ব্যবস্থা করা উচিত।

শেষকালে **ভিটামিন** জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে আমরা গুটিকতক কথা বলতে চাই। শরীরকে নীরোগ রাখতে হ'লে আমাদের সকল রকম ভিটামিনই কিছু কিছু খাওয়া চাই। তবে তার জন্য বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র আয়োজন করবার দরকার নেই, টাটকা শাকসব্‌জি ও তরকারী এবং ফলের মধ্যে যথেষ্ট ভিটামিন আছে। ঐগুলো একটু বিবেচনা ক'রে খেলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তরকারী বেশী ক'রে পরিচ্ছন্ন ভাবে কুটবার দরকার নেই, একটু একটু ছাল লেগে থাকা ভাল। তরকারী কুটবার পূর্বে ভাল ক'রে ধুয়ে নেওয়া উচিত, কিন্তু কুটবার পরে আর ধোবার দরকার নেই। তরকারী বেশি ক'রে সিদ্ধ ক'রে গলিয়ে ফেলবার দরকার নেই; সিদ্ধ তরকারী ছাড়াও কিছু কিছু কাঁচা শাক, কাঁচা ছোলা, কাঁচা টোমাটো, এগুলো খাওয়া ভাল। ভিটামিন খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে আর একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাদের বলে দিই। প্রত্যহ আপনারা পারতপক্ষে নিজেরাই বাজার করে আনবেন, এবং টাটকা দেখে আনাজ তরকারী কিনবেন। নিজে বাজার করা খুব ভাল, এতে ভাল জিনিষ বেছে নিতে শিখবেন এবং ভিটামিনের কখনো অভাব আপনাদের খাদ্যে হবে না। বাজার করতে করতেই অনুসন্ধিৎসা আসবে, তখন আপনিই বুঝতে পারবেন কোনটা গ্রহণ এবং কোনটা বর্জন করা উচিত। আনাজ তরকারীর মধ্যে আমরা আলুই খাই বেশি, কিন্তু আলু প্রধানত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য। আমরা একেই তো কার্বোহাইড্রেট যথেষ্ট খাই, আর বেশি আলু খাবার দরকার কি? আনাজ তরকারীর মধ্যে কোনগুলোর দিকে বেশি ঝোঁক দেবেন তাও বলে দিই। কপি, কড়াইশুটি, সয়াবিন, বরবটি, সীম, টোমাটো, পালং শাক, শালগমের শাক, এই গুলোতেই ভিটামিন বেশি থাকে, এইগুলো বেছে বেছে খাওয়া উচিত। কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, পটোল, এগুলো খেতে উৎকৃষ্ট হ'লেও ভিটামিনের পরিমাণ ওতে খুব কম। সবই অবশ্য খাওয়া চাই, কিন্তু ভিটামিনযুক্ত খাদ্য যতটা পারা যায় ততটা বেছে নেওয়া ভাল।

সর্বশেষে **আনুষঙ্গিক খাদ্য** অর্থাৎ মশলাপাতির কথা কিছু বলি। মশলাজাতীয় দ্রব্য অভ্যাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে ভিন্ন ভিন্ন রকম খায়, এর কোনো মাপ-জোখ নেই। তবে মশলা খাওয়ার অভ্যাসটা যত কম হয় ততই ভাল। আপনারা সকলেই জানেন,—চায়ে চিনি, ব্যঞ্জনে নুন, চচ্চড়িতে ঝাল, আর পানে চুণ,—এর কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না, যতই বাড়াবেন ততই বেড়ে যায়। এগুলো অনর্থক বাড়িয়ে কোনো লাভ আছে কি?

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২

সেই ছোট বারান্দাটিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি। চোখের সামনে এক এক বার অতিমাত্র স্পষ্ট হইয়া দৃশ্যগুলা জীবনের চাঞ্চল্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; এক এক বার মিলাইয়া যাইতেছে,—মনটা লিণ্ডসে ক্রিসেণ্টে ফিরিয়া আসিতেছে—সম্মুখের রাস্তা, রাস্তার ওধারে বাড়ীর শ্রেণী, তাহার পিছনে গাছের জটলা জমিয়া উঠিতেছে।··· মনটা হুহু করিয়া উঠিতেছে; আমি যে এখানে আছি, অনেক দিন থেকে আছি এবং আরও অনেক দিন থাকিতে হইবে এই চিন্তাটা যেন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আমি ঠিক এখানকার মানুষ নয়, কলিকাতার নয়, লিণ্ডসে ক্রিসেণ্টের তো একেবারেই নয়।···কি অসহ্য কাটাছাঁটা, মাপাজোখা ব্যাপার! কি অসহ্য রকম মানানসই করিয়া তৈয়ারি সব! এক ইঞ্চি অপব্যয় নাই, এক ইঞ্চি অতিরিক্ততা নাই—রাস্তাই বল, বাড়ীই বল, বাগানই বল, কড়া হিসাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অসহ্য শুভঙ্করের রাজ্যে মানুষগুলা পর্যন্ত যেন এক একটা অঙ্ক, তাদের বাঁধা প্রসেস্ বা পদ্ধতির মধ্য দিয়া এক একটা অমোঘ পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক চুল এদিক ওদিক হইলে অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে।···রাজু বেয়ারা পর্যন্ত যেন একটা এ্যালজেব্রার ফরমূলা। সামনে দিয়া দোল-উৎসব গেল, আশা করিয়াছিলাম অন্তত বেহারী চাকরটা আউট্ হাউসে ভুলিয়াও একটা ছাপরেয়ে তান্ ধরিয়া বসিবে। কিছু করিল না;—সমীচীনতার তাসের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে যে!

মিস্টার রায় চমৎকার, অপর্ণা দেবী আরও চমৎকার—কিন্তু এখন অনুভব করিতেছি আমার সঙ্গে মিল নাই; শ্রদ্ধা করি কিন্তু যেন মনে হইতেছে অনেক দূর থেকে।··· সবচেয়ে আত্মীয়া মীরা—তাহার প্রাণের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে বসিয়াছি, কিন্তু কোথায় তাহার প্রাণ?—আছে কি? পাওয়া যাইবে কি কখনও? এই কি ভালবাসিতেছি? না, খুব বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকের লেখা একটা উপন্যাস পড়িয়া যাইতেছি মাত্র? অশ্রুবিন্দুটি পর্যন্ত যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই—যেখানে দুইটি মানায় সেখানে তিনটি বিন্দু গড়াইয়া পড়িবে না।

এর চেয়ে সেই চিত্র—সদ্য পানফল চাহিয়াছে, ঠিক দুপুরের সূর্যের অভিশাপকে আশীর্বাদ করিয়া লইয়া আমি আর অনিল দুজনে বসিয়া আছি, যদি ধরা পড়ি কপালে আছে তারিণী জেলের লগুড়। কি রকম স্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ একটা ব্যাপার, এক দিকে কত বড় উল্লাস আর অপর দিকে কি ভীষণ পরিণাম! রাজকন্যার জন্য সোনার গাছে মুক্তার ফল আহরণ করার অভিযান থেকে কিসে কম?

না, হে ভগবান, আমায় ঐ রকম করিয়া ভালবাসিতে দাও, তাহাতে আসুক মুক্তি, আসুক প্রসার। অম্বরীর মত, আমাকেও যে ভালবাসিবে তাহার প্রাণে একটা খুব বড় রকম মিথ্যার বাহুল্য থাকুক,—সে আমায় বলুক জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সে আমার সামান্য খুঁটিনাটির দিকে পর্যন্ত চোখ নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবে। আর আমি মুগ্ধ বিশ্বাসে সেই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুকে ধরিয়া রাখি।

অনেকক্ষণ পরে চিন্তায় একটা অবসাদ আসিল। কলিকাতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থির চিন্তার দ্বারা মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন্ ঊর্ধ্বলোকে যেন উঠিয়া গিয়াছি, ধীরে ধীরে আবার নামিয়া কঠিন মাটির স্পর্শ অনুভব করিলাম। অনিলের হাতের লেখাটা পুরান স্মৃতিকে ঘাঁটাইয়া মনটাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।···না, এটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা নয়। মন আমার শান্ত হোক; যেন রূঢ় সত্য এই জীবনের দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পারার শক্তি না হারাই। আমার এখান থেকে যাইলে চলিবে না এখন। কলিকাতাও সত্য, মীরাদের দেওয়া টাকাটা আরও সত্য। ভাগ্যে মীরাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা কাটাইয়া দিয়া আসি নাই। আমি আজ একজন উদীয়মান ছাত্র, আমার আলোচনা ছাত্রমহলের একটা বড় প্রসঙ্গ, প্রফেসাররা আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। মীরার দেওয়া এই টুইশ্যনই তো সবার মূলে।

আশ্চর্য, অনিলের চিঠিটা এখনও পড়াই হয় নাই; এত ছবি, এত কথা মনে ভিড় করিয়া আসিলই বা কোথা থেকে?

খাম খুলিয়া অনিলের চিঠিটা পড়িলাম।

অনিলের লেখা ঠিকানায় একটু ভুল ছিল। লিণ্ডসে ষ্ট্রীট লেখা ছিল, তিন দিন ঘুরিয়াছে চিঠিটা। এখানে ঐ ব্যাপার লইয়া বেশ একটু গোলমাল হয় মাঝে মাঝে। লিণ্ডসে ষ্ট্রীট আছে, লিণ্ডসে টেরাস্ আছে, লিণ্ডসে ক্রিসেণ্ট আছে, আবার লিণ্ডসে হাউস বলিয়া একটা বড় কারখানা আছে; সেখানে একবার ঢুকিলে তাহাদের নানা ডিপার্টমেণ্টে ঘুরিতেই কখন কখন চিঠির দুইটা দিন কাটিয়া যায়। ব্যাপারটা আগে আমি জানিতাম না। সবে কাল রাত্রে আহারের সময় মিস্টার রায়ের একটা চিঠি গোলমালের প্রসঙ্গে আমার সামনে কথাটা প্রথম আলোচনা হইল। আমি এখানে আসিয়া অবধি তিনখানা পত্র দেওয়ার পর অনিলের এই পত্র পাইয়াছি। রহস্যটা পরিষ্কার হইল।

অনিল অত্যন্ত চটিয়াছে। আমার প্রথম পত্রের উত্তর ও দিয়াছিল, দুইখানি। দ্বিতীয় চিঠি ও পায় নাই; আদৌ বিশ্বাস করে না যে আমি লিখিয়াছি—একটা ভাঁওতা আমার। তৃতীয় পত্র পাইয়াছে; কিন্তু এই দুইখানি পত্রের কোনখানিতেই ঠিকানা দেওয়া নাই। প্রথম দুইখানি চিঠি ও আমার আগেকার বাসার ঠিকানায় দিয়াছিল, আশা করিয়াছিল সেখান থেকে রিডাইরেক্ট হইয়া আমার হাতে পঁহুছিবে। আমার পত্র পাইয়া বুঝিল পৌঁছায় নাই। আমার পুরান বাসায় লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পত্র দিল। কর্তাকে পত্র দিয়াছিল, তিনি ছেলেদের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া পাঠাইয়াছেন, লিখিয়াছেন ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।

নূতন জায়গায় গিয়া ঠিকানা না দিয়া পত্র দেয় এমন লোকের মস্তিষ্ক নিজের ঠিকানায় আছে কি না অনিল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। একটি মাত্র ছাত্রী পড়ানয় আরাম আছে স্বীকার করে অনিল, কিন্তু একটা কথা—যখন প্রতিদিন গড়পড়তা দশটি বারোটি করিয়া ছেলেমেয়ে পড়াইয়াছি তখন আমার চিঠি পড়িয়া কখনও মারাত্মক রকম ভ্রান্তি বা জটিলতার সন্ধান পায় নাই। চিন্তিত আছে।

অনিলের নিজের অত হিসাব থাকে না, অম্বুরী খুকীর জন্মতারিখ থেকে গুনিয়া বলিতেছে ঠিক ছ-মাস সতের দিন আমি সাঁতরামুখো হই নাই। এই ছ-মাস সতের দিনে আমার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে—আমাকে আর ওদের কাছে যাইতে বলা চলে কি না অনিল ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না, তাই শুধু অবস্থাটা জানাইয়া দিল মাত্র।

ওর ছেলের কথা লিখিয়াছে; বয়সের অতিরিক্ত পাকা হইয়া উঠিতেছে। এদিকে জিবের আড়টা এখনও ভাঙে নাই, ট বর্গের উপর 'পক্ষপাতিত্ব' বেশী। সবচেয়ে দুর্বোধ্য ওর ব্যাকরণটা,—'ক' উচ্চারণ করিতে পারে কিন্তু 'কাকা' বলিতে পারে না। আমার প্রসঙ্গ উঠিলে বলে 'শৈল টাকা'। এ শব্দতত্ত্বের রহস্য ভেদ করিবার জন্য আর একজন পাণিনির দরকার।

অনিলের মা এমনই ভাল আছেন, তবে কানটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

চিঠিটা মুঠার মধ্যে লইয়া আবার বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলাম। মনের কোথায় বিদ্রোহ উঠিয়াছে, আমি প্রাণপণে লিণ্ডসে ক্রিসেণ্টের যশোগান করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। মন বসাইবার জন্য সাড়ম্বরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। ঠিক হইয়া গেল ছাড়িব না।

তাহার পর কি করিয়া কি হইল বলিতে পারি না; শুধু বুকের মধ্যে একটা প্রবল ব্যাকুলতা...একটু মুক্তি দাও আমায়; কলিকাতার এই ইঁটের পাঁজার মধ্যে থেকে মুক্তি চাই সাঁতরার শ্যামল কোলে; অন্তত একটু দেখার মুক্তি...কয়েদী যেমন জানালার গরাদটা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের খণ্ডিত দৃশ্যের পানে চাহিয়া থাকে।

ফিরিয়া আবার মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। মুঠার মধ্যে কপালটা চাপিয়া সামান্য একটু চিন্তা করিলাম, তাহার পর প্রবেশের অনুমতি চাহিব, কণ্ঠস্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল। পরিষ্কার করিতে গিয়া একটু শব্দ হইতেই মীরা ডাকিল—"কে? এস।"

মীরা জানালার গরাদে হাত দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফিরিয়া আমায় দেখিয়া অপ্রতিভ আর বিস্মিত হইয়া যেন হঠাৎ কেমন ধারা হইয়া গেল। ওর ডাকিবার ভাষাতেই বুঝিয়াছিলাম, এবারেও আমি আসিতেছি ভাবিতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কাজটা সারিয়া লইবার জন্য বলিলাম—"আমি কটা দিনের ছুটি চাইতে এলাম। একবার ঘুরে আসব, মাসপাঁচেক যাই নি।"

মীরা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না সে একটা প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। স্থির, কতকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"এই বললেন যে থেকে যাবেন, এর মধ্যেই কি হ'ল আবার?"

বেশ মজার ব্যাপার। মীরা আমায় অপ্রকৃতিস্থ ভাবিতেছে বোধ হয়, অথচ তাহার নিজের কথাই, প্রকৃতিস্থ নয়। বলিলাম, "আমি তো ছেড়ে যাবার কথা বলছি না মীরা দেবী।"

"তবে?"

"ক'দিনের ছুটি চাইছি মাত্র।"

"ও! বাড়ী যাবেন?"

"না, বাড়ী আমাদের পশ্চিমে, অল্পেই যাওয়া আসা চলে না, আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাব, কাছেই।"

অনিলের মায়ের কানের কথা লইয়া একটা মিথ্যা রচনা করিয়া ফেলিলাম—"লিখেছে তার মায়ের অবস্থা বড্ড খারাপ, তাই···"

"ও! তা বেশ, যাবেন। ক'দিনের জন্যে?"—দুর্বলতায় মীরার স্বরটা মনিবের মত হইয়া গেছে, অর্থাৎ ও অধিকারের জোর খাটাইতে চায়।

বলিলাম—"হপ্তাখানেকের জন্যে; ক্ষতি হবে?"

মীরা ধীরে ধীরে বলিল, "বে—শ।···না, ক্ষতি কিসের?"

নামিয়া আসিতেছি, সিঁড়ির মোড় ঘুরিব, মীরা উপর হইতে ডাকিল। দেখি রেলিঙের উপর ভর দিয়া নিম্নমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, "শৈলেনবাবু, একটা কথা···"

আমি দুই ধাপ উঠিয়া আসিয়া বলিলাম, "কি বলুন।"

মীরা একটু মুখটা ঘুরাইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বেশ শান্ত, স্থির কণ্ঠে বলিল, "মাফ করবেন, তরুর ক্ষতি হবে বলে কথাটা বাধ্য হ'য়ে জিগ্যেস করতে হ'ল, অনুচিত জেনেও—মানে, আমার আর টিউটারের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তো?···কথা হচ্ছে, অনিশ্চিতের মধ্যে না পড়ে থাকতে হয়—তাই···"

আমার মনটা অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল,—এই নিরুপায় নারীকে কি করিয়া বিশ্বাস করাই ওর আশঙ্কা মিথ্যা?

শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, অযথা একটা প্রবঞ্চনা করে যাব আমায় এমন ভাবলেন কেন? আমি যে নিজের তাগিদেই থেকে গেলাম এটা কি আপনি টের পান নি? বলুন?"

"নিজের তাগিদ" যে কোথায় মীরা আশা করি বুঝিল, বুঝিবে বলিয়াই বলা, তবু এর মধ্যে অর্থ-উপার্জনের কথাও যে আসিতে পারে এই সম্ভাবনার সূক্ষ্ম একটা অন্তরাল রহিল।

হয়ত আমার দেখার ভুল, কিন্তু মনে হইল মীরার সন্দেহক্লিষ্ট মুখটায় এক মুহূর্তের জন্য আশ্বাসের সঙ্গে লজ্জার একটা ক্ষীণ আভাস খেলিয়া গেল।

৩

মীরার কাছে ছুটি লইয়া নিজের ঘরে আসিয়া আমার একটা মজার কথা মনে পড়িল,—আমি মীরার কাছে ছুটি চাহিতে গিয়াছিলাম কেন? মীরা ছুটি দেওয়ার কে? মীরার মা অবশ্য এ সব কথার মধ্যে বিশেষ থাকেন না, কিন্তু মিস্টার রায় তো রহিয়াছেন এখন এখানে। না, আমার নিজেরই দোষ, আমি নিজেই মীরাকে মাথায় তুলিয়াছি। ও হুকুম দিবে তবে আমি যাইব! চমৎকার অবস্থা দাঁড় করাইয়াছি তো!

তরু আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী-পাঠশালার শাড়ী ছাড়িয়া লরেটোর জন্য তৈয়ার হইয়াছে,—খাটো ইজের, ধবধবে শাদা ফ্রক, বাঁ ঘাড়ের কাছে একটা আসমানি রঙের সিল্কের ফুল; এতক্ষণ ঘাড়ের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেড়া-বেণী ছিল, খুলিয়া দিয়াছে, এখন পিঠের দুই প্রান্তে দুই সুরচিত বেণী দুলিতেছে; প্রান্তভাগে চওড়া রাঙা-ফিতার তৈয়ারী দুইটি ফুল। পায়ে মোজা আর ষ্ট্র্যাপ দেওয়া জুতা।

গতিটাও বদলাইয়া গেছে। জুতা ঘষিতে ঘষিতে কতকটা লাফাইতে লাফাইতেই আসিয়া বলিল, "দিদি দিলে ছুটি মাস্টার মশাই, কিন্তু আমার পদ্য না লিখে দিলে বলব বন্ধ ক'রে দিতে।"

টাটকা এই চিন্তাই করিতেছিলাম বলিয়া কথাটা অত্যন্ত তিক্ত লাগিল। "তোমার দিদি কি আমার···?"—বলিয়া থামিয়া গেলাম। বলিতে যাইতেছিলাম তোমার দিদি কি আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক না কি যে তিনি ছুটি দিলে তবে আমি যাব?"

ঠিক সময়েই কিন্তু হুঁস্ হইল যে ছেলেমানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করা বড় বেমানান হইবে। হাসিয়া কথাটাকে হাল্কা করিয়া দিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি কি তোমার মাস্টার মশাইয়ের মাস্টার মশাই না কি যে ছুটি দেবেন আমায়?"

তরু প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মুখের পরিবর্তিত ভাবে আবার আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বাঃ, তবে যে দিদি বললেন—তরু, তোমার মাষ্টার মশাই ছুটি নিয়ে গেছেন, কিন্তু পদ্যটা না লেখা পর্যন্ত ছেড় না যেন?"

আমার মুখটা আবার বোধ হয় একটু গম্ভীর হইয়া গিয়া থাকিবে, আবার সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আসল জায়গায় ছুটি নেওয়া তো বাকিই আছে; তোমার বাবাকে, তোমার মাকে বলতে হবে না?"

তরু যেন একটু ফাঁফরে পড়িয়াছে, একটা বেণী সামনে ঘুরাইয়া আনিয়া তার ফুলটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সাহস দেওয়ার ভঙ্গিতে আমায় বলিল—"সে আর আপনাকে ভয় করতে হবে না; মাস্টার মশাই, দিদি যা বলবেন তা বাবাও কাটবেন না, মা তো নয়ই। দিদির কাছে যখন ছুটি পেয়েছেন, তখন আর আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"

আমার কথার এ রকম উল্টা পরিণতি দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত হাসি পাইল। হাজার চেষ্টা করিয়াও মীরাকে তাহার কর্তৃত্বের আসন থেকে নামাইতে পারিতেছি না, যেন বনেদী হইয়া গিয়াছে। আমি চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিলাম, "ও ব্বাবা! তোমার দিদি এত বড় মহাপুরুষ! —জানতাম না তো আমি। তা বেশ, চল তোমার মার কাছে, বরং বলা যাবে'খন—হাইকোর্টের ছাড়পত্র পেয়েছি, তুমি বরং বেশ সাক্ষীও দিতে পারবে, চল।"

তরু হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে আমার আগমন বার্তা জানাইতে লঘুগতিতে আগাইয়া গেল।

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখি তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উপস্থিত হইতেই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও অগ্রদূত পাঠিয়ে দেখা করতে আসবে শৈলেন? চল, ভেতরে চল।"

নিজে প্রবেশ করিয়া পর্দাটা বাঁ-হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"এস।"

আমিও পর্দাটা ধরিয়া লজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলাম। এই ছোটখাট সৌজন্যে এত অপ্রস্তুত করিয়া দেন উনি। প্রবেশের সময় পর্দা তুলিয়া ধরিলেন, আহারের সময় জলের গেলাসটা বোধ হয় সামান্য একটু দূরে পড়িয়াছে, উঠিয়া আগাইয়া দিয়া আসিবেন; মোটর থেকে যদি আগে নামেন, দোরটা টানিয়া ধরিয়া প্রতীক্ষাও করিয়াছেন। অনেক বার বলিয়াছি, কিন্তু ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। বলেন, "এগুলো ভদ্রতা বা কার্টসি নয় শৈলেন, এগুলো ছোটখাট সেবা, শিভ্যাল্‌রির নাম দিয়ে আমরা আজকাল তোমাদের কাছ থেকে এগুলো আদায় করছি, কিন্তু আসলে এগুলো আমাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য।"

আপত্তিস্বরূপ কিছু বলিবার পূর্বে উত্তর পাইয়াছি—"না হ'লে মা-বোনের জাত ব'লে আমাদের গুমোর বাড়াও কেন? আমরা যদি পাই এতে তৃপ্তি···"

হাসিয়া বলিয়াছি, "আমাদের লজ্জা দিয়ে তৃপ্তি পাবেন?"

জবাব পাইয়াছি—"আমরা তৃপ্তি পেলে লজ্জাটা না হয় সয়ে নিলে একটু।"

আর ওঁকে কিছু বলি না।

আমি প্রবেশ করিলে পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি ব'স এইটেতে।"

নিজে টেবিলের সামনে একটা হেলান চেয়ারে বসিলেন।

প্রসঙ্গের জের ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "মায়ের কাছে যে নোটিস্ দিয়ে আসতে হয় না আপনার বুড়ো ছেলে এ-কথাটা জানে, এই সায়েবী কায়দার জন্যে একজন লরেটোর ছাত্রী দায়ী।"—বলিয়া সহাস্যদৃষ্টিতেই তরুর দিকে চাহিলাম।

তরু অপর্ণা দেবীর গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অপর্ণা দেবী যে আগ্রহসহকারে দুই পা বাহিরে গিয়া আমায় লইয়া আসিয়াছেন এটা বোধ হয় ওর খুব মনে ধরিয়াছিল, ওর মাস্টার মশাইয়ের বেশ খাতির হয় এটা ও মনে প্রাণে চায়। বলিল, "বা রে! না আগে-থাকতে বললে মা উঠে এগিয়ে যেতে পারতেন?"

আমি বলিলাম, "তাই তো, ব'সে ব'সে কি মা হওয়া চলে? দেখুন তো!"

দুজনেই হাসিয়া উঠিতে তরু লজ্জিত ভাবে মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া বলিল—"যান্।"

ঘরের মধ্যে আর একটি মানুষ ছিল, সেই ভুটিয়ানী পার্টির দিন সে খানিকক্ষণ গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া তামাশা দেখিতেছিল; সেই দিনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার চেহারা আর পোষাকে—বিশেষ পোষাকে পরিবর্তন হইয়াছে। ঘরের একটা কোণের দিকে একটা আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। হাতে একটা স্ফটিকের মালা, সামনে একটা নীচু টেবিলে পিতলের বেশ একটি মাঝারি সাইজের বুদ্ধমূর্তি। বৃদ্ধা বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের হাসির শব্দে নড়িয়া চড়িয়া উঠিতে যাইতেছিল, অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া, বুকের কাছে ঝুঁকিয়া বলিলেন—"বৈঠো; ক্যা হায়, বুড়হী মাঈ?"

বুড়ী বিহ্বলভাবে তাহার ছানিপড়া চক্ষু তুলিয়া অপর্ণা দেবীর মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল। কি যেন

একটা গোলমাল হইয়া গেছে। তাহার পর মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া, কপালের উপরে গোটাকতক্ টোকা মারিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল—"না…বেটা, বেটা…"

অপর্ণা দেবী তাহার কপালে বাঁ-হাতটা বুলাইয়া বলিলেন, "বেটা আবেগা। বুদ্ধ্য, বুদ্ধ্য বোলো।"

ভুটানী স্ফটিকের মালাসুদ্ধ হাতটা ধীরে ধীরে আগাইয়া বুদ্ধমূর্তি স্পর্শ করিয়া আবার হাতটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মালা জপিতে লাগিল। একটু পরে ধীরে ধীরে দুইটি ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁপা ঠোঁটে খুব অস্পষ্টভাবে কি গোটাকতক কথা দ্রুত উচ্চারণ করিয়া যেন আবেগটা আবার সামলাইয়া লইল।

অপর্ণা দেবী আসিয়া আবার উপবেশন করিলে প্রশ্ন করিলাম, "কেমন আছে আজকাল?"

বলিলেন, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঐ বুদ্ধমূর্তিটা আনিয়ে দিয়েছি, চেষ্টা করছি মনটা ধর্মের দিকে আকর্ষণ করবার। কতটা কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এইটে লক্ষ্য করেছি বাইরে বাইরে আর ততটা উতলা ভাব নেই, চুপ ক'রে জপ নিয়েই থাকে যেন। তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লে পরে কখন কখন ঐ রকম ক'রে ওঠে, বিশেষ করে কারুর পায়ের শব্দে বা অন্য রকম ভাবে যদি টের পায় কেউ ভেতরে এসেছে। এ দিক দিয়ে ওর অনুভূতিটা আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ, প্রায় অসম্ভব রকম। সেটাকে ওর সিক্স্থ সেন্স বা তৃতীয় নয়ন বলা চলে। এই এত মোটা কার্পেট দিয়েছি ঘরে তো? ও ঠিক টের পাবে কেউ এলে। জেগে থাকলে হঠাৎ একটু সতর্ক হয়ে ওঠে, তখনি বুঝতে পেরে আবার কতকটা নিরাশ হয়ে মালা জপতে সুরু ক'রে দেয়। কিন্তু যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গোলমাল। ঐ যে কপালে হাত দিয়ে 'বেটা-বেটা' করলে, ওর মানে স্বপ্ন দেখেছিল ব্যাটা এসেছে। ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না;—বাস্তবের দিকে ঐ পায়ের শব্দটুকু নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন মগজের মধ্যে একটা ধারণা গ'ড়ে ওঠে। বড্ড ব্যাকুল হয়ে ওঠে, স্বপ্নের মধ্যে একটা পুরো ছবি ফুটে ওঠে কি না…"

প্রশ্ন করলাম, "মনটা ক্রমে ক্রমে পুরোপুরি ধর্মের দিকে এসে পড়ছে ব'লে আশা করেন কি?"

প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয় নাই। ঠিক এই রকমেরই একটা পরীক্ষা যে তাঁহার নিজের জীবনে চলিতেছে সেটা আমার টের পাওয়া উচিত ছিল। অপর্ণা দেবী জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খানিকটা যেন আত্মস্থ হইয়া রহিলেন, পরে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—

"কি বলছিলে?…ও!…ঠিক বলতে পারি না, তুমি সাইকলজির ছাত্র, জানই তো মনের গতি বড় অদ্ভুত—যাকে বলা যায় ইনস্ক্রুটেব্‌ল। যখন ভাবা যাচ্ছে বহির্মুখী হ'য়ে সে কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় করছে, আসলে তখন হয়ত নিজের চিন্তা নিয়ে নিজের অতলে ডুবে যাচ্ছে। ভুটানীর ব্যাপারে যদি তাই হয়ত বড় সাংঘাতিক, তাহ'লে ওর আর বেশী দিন নয়, ও ভেতরে ভেতরে ধ্বসে যাচ্ছে।"

চুপ করিয়া অপর্ণা দেবী চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িলেন, যেন বড় বেশী ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। শয়ান অবস্থাতেই ধীরে ধীরে, যেন আপন মনেই বলিলেন, "যাক্, বেঁচে থেকেই বা কি করবে?"

আমার সমস্ত মনটা অনুশোচনায় খাক হইয়া গেল,—কি অন্যায়ই করিয়াছি অবুঝের মত প্রশ্নটা করিয়া! খানিকক্ষণ নিজেকে বিশ্বাস করিয়া মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না।…ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী এক-এক বার মালা ঠিক করিয়া লইতে স্ফটিকে স্ফটিকে লাগিয়া এক একটা কিট্ কিট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে। তরু ছেলেমানুষ হইলেও কথাটা যে কোথা থেকে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়াছে যেন। অপর্ণা দেবীর কথায় বলিতে গেলে তাঁহার এ দুর্বলতা সম্বন্ধে বাড়ীর সবারই একটা তৃতীয় নয়ন আছে; কাহারও বয়স্থ ছেলে লইয়া কোন কথা উঠিলে অপর্ণা দেবীর সম্বন্ধে সবাই সশঙ্কিত হইয়া ওঠে।

অপর্ণা দেবীই আবার প্রথমে কথা কহিলেন, "মুশকিল হয়েছে ওর ছেলে এখানে নেই শৈলেন। আমি ওঁকে ব'লে পুলিস সাহেবের সাহায্য নিয়ে ঢের খোঁজ করেছি, যেখানে যেখানে ভুটিয়াদের আড্ডা, ওকে নিয়ে গেছি—; ওর ছেলে কলকাতায় আসে নি। আর গরম পড়ে গেছে—নতুন ভুটিয়া আসছেও না এ বছর। ওদিকে পুলিস কমিশনারের আপিস থেকে ভুটান গবর্ণমেণ্টকেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল, টের পাওয়া গেছে ওর ছেলে বাড়ীতেও ফিরে যায় নি।…চারি দিকে চেষ্টা করছি, কিন্তু…"

হঠাৎ একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "একটা মহাপাতকও করেছি ওর জন্যে শৈলেন, আর কি করব?"

ইচ্ছা ছিল না, তবুও ভাবপরিবর্তনে একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, "কি?"

"এক দিন একটা ভুটিয়া ছেলেকে দেখেছিলে তো এখানে? না, সেদিন তুমি ছিলে না, আমি তোমার এক বার খোঁজ নিয়েছিলাম—তুমি আগে যেখানে টুইশুন

করতে তাঁদের মেয়ে না ছেলের বিয়েতে সমস্ত দিন সেখানে ছিলে।···সেই ছেলেটাকে বুড়ীর ছেলে ব'লে বুড়ীকে স্তোক দিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। বুড়ীর ছেলের নাম, ওদের গাঁয়ের নাম আরও মোটামুটি কিছু খবর জোগাড় ক'রে ছেলেটাকে তালিম দিয়ে দিলাম। ভাল দেখতে পায় না চোখে, সমস্ত দিন বুড়ী ছেলে পেয়ে সে যে কি আহ্লাদ! —যদি দেখতে!···সন্ধ্যের সময় প্রবঞ্চনাটা ধরা পড়ল। পরে টের পেলাম ওর ছেলে সমস্ত দিন খেলা, শিকার—এই সব নিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেড়ালেও সন্ধ্যে থেকে একেবারে মাকে ধেরে থাকত। রাত্রিতে দু-একটা বুড়ীকে মরতে দেখে তার কেমন একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, রোজ রাত্তিরেই ওর মা ওকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। দামাল ছেলে ভয়ে যেন একেবারে অসহায় হয়ে থাকত। ছেলের এই শিশুভাবটা ছিল বুড়ীর সম্পত্তি,—সব মায়েরই এইটে সবচেয়ে বড় সম্পত্তি শৈলেন। ভুটিয়া ছেলেটার মধ্যে বুড়ী এইটে না পেয়ে খাঁটি-মেকির তফাৎটা ধরে ফেললে।···শৈলেন, এসব পাড়ায় যে হিন্দুস্থানী গয়লারা গরু নিয়ে বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়ে যায় দেখেছ?—বাছুর মরে গেলে তার চামড়ার মধ্যে খড় ভ'রে কাঁধে ক'রে নিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মার সামনে সেই কুশ-বাছুর দাঁড় করিয়ে দুধ আদায় করে···"

হাতটা ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখটা যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ওঃ, কি অন্যায় করেছিলাম!—পারলাম কি ক'রে বলত···মা হয়ে?"

কি মুশকিলে পড়িয়াছি! কি করিয়া বদলাই আলোচনাটা? বলিলাম, "আপনি মিথ্যা নিজেকে দোষী করছেন। ভুটানীর সঙ্গে ব্যবহারটা বাইরে দেখতে প্রবঞ্চনা হ'লেও সত্যিই কি প্রবঞ্চনা ছিল?···ধরুন, এই তরুকে ছেলেবেলা থেকে কি বরাবরই সত্যি কথা ব'লে মানুষ ক'রে এসেছেন?—সত্যি কথা ধ'রে ব'সে থাকলে কি হ'ত মানুষ? আমার তো বিশ্বাস মায়ের শুদ্ধ মনের জন্যে ভগবানের বিশেষ মার্জনার ব্যবস্থা আছে। শুধু মার্জনার কথা বললে মায়ের প্রবঞ্চনাকে খাটো করা হয়, বরং বলব সেই প্রবঞ্চনার জন্যে তাঁর বিশেষ পুরস্কারেরই ব্যবস্থা আছে।"

অপর্ণা দেবী শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন, মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল—ঠিক মায়ে যে প্রশ্রয়ের হাসিতে অবোধ শিশুর মুখে ভারিক্কে কথা শুনিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখে।···সত্যই ত, এই প্রতিভাময়ী নারীকে একটা তুলনা দিয়া ভুলাইতে গিয়াছিলাম! লজ্জায় আমার দৃষ্টি যেন আপনিই নত হইয়া পড়িল।

যা হোক একটা ভাল হইল। অপর্ণা দেবী বুঝিয়াছেন আমিও ওঁর সঙ্গে অন্তরে অন্তরে বেদনাতুর হইয়া পড়িয়াছি, প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। বলিলেন, "কোন কাজ আছে শৈলেন তোমার? এই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে আমি একটু শুনো বলে তরু কখন কখন আমি ডাকছি বলে, মীরাকে, এমন কি ওকে পর্যন্ত ডেকে এনেছে। তোমাকেও তেমনই করে ডেকে আনে নি ত?"

তরুকে বুকের কাছে চাপিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার মা কি না, তাই মিথ্যা কথা ব'লে আমার ভাল করবার চেষ্টা করে।···ভয় নেই, এ মিথ্যে তোমার শিক্ষা নয়, তুমি আসবার আগে থেকেই ওর এ-বুদ্ধি হয়েছে।"

ঘরের গুমোটটা কাটিয়া গিয়া একটা লঘু হাস্যের স্রোত বহিল। আমি বলিলাম, "নয়ই ত আমার শিক্ষা; ওটা নিতান্ত মায়ের জাতের শিক্ষা, আমার কাছে কি ক'রে পাবে?—আপনি ভিন্ন আর কারুর কাছে পেতেই পারে না ও। মিথ্যের রাঙকে সোনায় পরিণত করতে পারে সে-পরশ-শক্তি ভগবান্ মা ভিন্ন আর কারুর হাতে দেন নি ত।"

অপর্ণা দেবী প্রশংসাটা তরুর ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছাত্রীও এক দিন মা হবে, তাকে বড় করতে চাইছ, সুতরাং আর আপাতত প্রতিবাদ করলাম না।···কি দরকার তোমার শৈলেন?"

বলিলাম, "আমি ক-দিনের জন্যে ছুটি নিতে এসেছি।"

অপর্ণা দেবীর মুখের হাসিটা যেন নিবিয়া গেল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ ছুটি নিচ্ছ যে, বাড়ী যাবে?"

বলিলাম, "না, বাড়ী যাওয়া এখন হয়ে উঠবে না, দিন-পাঁচ-ছয়ের ছুটি নিয়ে একটু কাছাকাছি থেকে ঘুরে আসব।"

হাসিয়া বলিলাম, "জানেনই তো, বাংলা আমার প্রবাসভূমি; সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে নিজের দেশে যেতে হ'লে অত অল্প অল্প ছুটিতে হবার নয়, তাতে গায়ের ব্যথাই মরবার সময় পাওয়া যায় না।"

অপর্ণা দেবী কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না। যেন কি একটা বলিতে চান, বাধা রহিয়াছে। বাধা বোধ হয় তরু, তাই আমি বলিলাম, "তরু, তোমার বোধ হয় এবার লরেটোয় যাবার সময় হ'ল।"

ঘড়িটার পানে চাহিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আর দেরি নেই বেশী ; খাওয়া হয়েছে তোমার ?"

এ সব বাড়ীর মেয়েরা এ ধরণের ইসারাগুলা বেশ টপ্ করিয়া বুঝিয়া লয়। শুধু বুঝিয়া লওয়া নয়, তক্ষ খানিকটা মানাইয়া লইবারও চেষ্টা করিল। বলিল, "এখনও একটু দেরি আছে, তেমনি আবার বইটই গুছিয়েও নিতে হবে ত ?"

যাইতে যাইতে দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া বলিল, "আমার পড়া শেষ না ক'রে গেলে কিন্তু চলবে না মাস্টার মশাই, তা ব'লে দিচ্ছি।"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "যাতে বিয়েই অচল হয়ে যাবে এমন ভুল আমি করতে পারি কখনও ? তোমার গুরুমার সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা বল ?"

অপর্ণা দেবী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিয়ের প্রীতি-উপহার বুঝি ? বলছিল বটে ওর মেজগুরুমার বিয়ে।"

(ক্রমশঃ)

অসময়

শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম.এ.

"রণছোড়"-দেব-মন্দির তলে—দেবপূজনের লাগি,
আজি মিলিয়াছে অনেক ভক্ত শাশ্বত তাঁরে মাগি ॥
মীরার ভজনে মীরার পূজনে প্রেমের বন্যা বয়।
নামে, কীর্ত্তনে রাজ-অঙ্গন হরিনামে মধুময় ॥
চিতোরের রাণী আজ ;—
সাধারণ সাথে হরিনামে মাতে ভুলি রাজোচিত লাজ ॥
পরম-পতির স্মরণ লইয়ে ভুলে গেছে নিজ স্বামী।
রণছোড়-দেবে অনুখন মীরা—সেবিছে দিবস-যামী ॥

যারা আসিয়াছে—তাহাদেরি মাঝে,
অতি দীন বেশে হায় !
ম্লান-মুখ এক বিধুর যুবক চেনা তাঁরে নাহি যায় ॥
গৌর-বর্ণ, লম্বিত-বাহু, স্ফীত বক্ষ তাঁর।
উন্নত-নাসা, দীরঘ-কায়ী মদন মেনেছে হার ॥
অশ্রুপ্লাবিত, শুষ্ক বয়ান, নীরবেতে এক কোণে,
নতমুখে সে যে দাঁড়ায়ে রয়েছে—দুঃখ-ক্ষুব্ধ-মনে ॥

কীর্ত্তন শেষে ভোগ নিবেদন পরে—
প্রসাদ লইয়া একে একে সবে ফিরিয়া চলিল ঘরে ॥
কীর্ত্তন শেষে ক্ষীণ অঙ্গন ; ক্ষীণতর হ'লো দিবা—
মীরা দেখিয়াছে—দেবের প্রসাদ স্পর্শ করেনি যুবা।
অভুক্ত রূপে বুঝি গৃহ হ'তে অতিথি ফিরিয়া যায়—
চিতোরের রাণী চঞ্চল-চিতে প্রমাদ গণিল হায় ॥
"হে বীর শান্ত, অতি-উদাত্ত ! কে সৌম্যযুবা তুমি ?"
নতশিরে যুবা করে উত্তর, "মন্দার-রাজ আমি।"
চমকিলো মীরা, দ্রুত পিছু হ'টে,—পুনঃ আগমিল কাছে
জিগাসিল তাঁরে "কিবা সমাচার ? কেন এলে পুরীমাঝে ?
চিতোরের মানী, অতিথি হে তুমি ! কেন দীন-সাজে আজ,
প্রসাদ অবধি স্পর্শ না করি—দিতেছো গভীর লাজ ?"
মন্দার-রাজ অশ্রুসিক্ত নতমুখে কহে তাঁরে,
"দেবি ! দয়া করি বাঁচাও আমারে—দর্শন দিয়া তাঁরে !

যে তোমার, মোর, উভয়ের সুখ হরিয়াছে চিরতরে—
সেই বালা আজ আলো করি শোভে চিতোরের রাজ-ঘরে।
কুম্ভের রাণী আজ—
ভুলিয়াছে বুঝি প্রেম-অবনত ভিখ্ মন্দার-রাজ।"
প্রেমের দুলালী মীরার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল ডরে।
বুঝিল সকলি ; দৃঢ় করি মন অতিথির মান তরে—
লয়ে গেল তাঁরে অতি গোপনেতে, অতি—অতি—অতি ধীরে,
রাণা কুম্ভের দ্বিতীয়া মহিষী কৃষ্ণাকুমারী-পুরে ॥

কৃষ্ণা চমকি ফিরে চাহি দেখে সম্মুখে যুবরাজ,
কি করিবে ভাবি না পাইল কূল ত্রস্ত হইল আজ ॥
যাঁহারে একদা জীবনের সাথে অতি নীরবেতে, সুখে,
জড়াইয়া ছিলো আপনার হাতে, আজি ছাড়িয়াছে দুখে।
সে কুমার আজ ভিক্ষুর সাজে উপনীত নতশিরে—।
চঞ্চল হ'লো কৃষ্ণার মন তাঁর মঙ্গল তরে ॥
উত্তল হ'লো রমণী-হৃদয়, দূরে গেল সব সুখ।
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ বেতসী লতার কাঁপিয়া উঠিল বুক ॥
"কুমার ! হে দেব ! কেন আজি এলে কুম্ভের পুরী মাঝে ?
চিতোরের রাণী কামনা করা কি তব দেব আজি সাজে ?"

এমন সময়, অতি অসময়, কুম্ভ সহসা আসি,
নব বধূ সাথে প্রেম আলাপিতে প্রবেশিল গৃহে হাসি ॥
গৃহমাঝে সাপ হেরি অকস্মাৎ নিষ্কাশিল ক্রোধে অসি—
মন্দার-রাজ-মস্তক, হায় ! ভূতলে পড়িল খসি ॥
কৃষ্ণা-কুমারী পদতলে, হায় ! লুণ্ঠিত হ'লো শির,
বীর প্রেমিকের হৃদি আলোড়ন চিরতরে হ'লো স্থির ॥
প্রেমিকের হৃদিরক্তালক্তে রক্তিমা হ'লো পদ—
হেরি কৃষ্ণার পরাণ-প্রদীপ হইল নির্ব্বাপিত ॥

[মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয় বিদুষী"র একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত]

মানুষ কি অতঃপর ঘাস খাইবে?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কথাটা শুনিতে খারাপ লাগিলেও ইহার মধ্যে কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিশয়োক্তি নাই। কিন্তু সেজন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, ঘাস খাইবার জন্য গরু, ঘোড়ার মত অতঃপর আমাদিগকে মাঠে মাঠে চড়িয়া বেড়াইতে হইবে। অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলে এমন একটা অদ্ভুত অথচ সহজলভ্য জিনিষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার সাহায্যে বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথ বহুলাংশে সুগম হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। জিনিষটা আর কিছুই নহে—পশুর খাদ্য সাধারণ ঘাস। ঘাস হইতে প্রোটিন সিন্থেসিসের কথা হইতেছে না, সাধারণ ঘাসকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মানুষের খাদ্যে রূপান্তরিত করিবার কথাই বলিতেছি। বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধিত হইবার পর ঘাসকে ঘাসের মত রাখিয়াই হউক অথবা চূর্ণ করিয়াই হউক, যে কোন ভাবেই খাওয়া চলিবে। অবশ্য চিরপোষিত ধারণা বশে ঘাস খাওয়াটা মানুষের পক্ষে গ্লানিকর বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে—ঘাস খাওয়ার ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে একেবারে অভিনব নহে। পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রায়ই আমরা বিচিত্র রকমের ঘাসজাতীয় পদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকি। অবশ্য সেই ঘাসকে আমরা ঘাস বলি না, বলি—শাক-সব্জী। কাজেই কেবল নামমাহাত্ম্যেই এই অভিনব বস্তুটা খাদ্য হিসাবে অনেকের নিকট প্রীতিপ্রদ না-ও হইতে পারে। সেজন্য এই খাদ্যোপযোগী ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ করা হইয়াছে—সেরোফিল। শীঘ্রই হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় ঘাস একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকার কোন কোন স্থানে রুটি, মাখম, দুধ, আইসক্রীম ও দুগ্ধজাত বিবিধ পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস মিশ্রিত করিয়া খাওয়ার টেবিলে ব্যবহৃত হইতেছে। জৈব-রাসায়নিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ঘাসজাতীয় বিভিন্ন পদার্থের কচি পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-প্রাণ ভিটামিন রহিয়াছে। এই ভিটামিন অবিকৃত রাখিয়া ঘাস সংশোধন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহা দ্বারা মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সকলেরই খাদ্যসমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে। এমন কি চিকিৎসকের ব্যবস্থামত

কচাইবার জন্য ঘাসগুলিকে কাটা-কলে ফেলা হইতেছে। কুচানো ঘাস ঘূর্ণায়মান ড্রামে ভরিয়া ক্ষণস্থায়ী উচ্চ তাপে শুষ্ক করা হইবে।

রোগীর পথ্যরূপেও ইহা ব্যবহার করা চলিবে। বহুবিধ পরীক্ষার ফলে অখাদ্য ঘাস আজ সুখাদ্যে পরিণত হইয়াছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক হইতে ঔৎসুক্যের সহিত এই অভিনব আবিষ্কারের পরিণতি লক্ষিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ইহার অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের মতে দুধ, শাকসব্জী এবং তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণ ফলমূল আহার করা উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহার প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যেই শরীরপোষণোপযোগী বিভিন্ন বস্তু এবং তদুপরি যথেষ্ট ভিটামিন রহিয়াছে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সংযুক্ত উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্যই নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুষ্টিমেয় সঙ্গতিশালী লোকছাড়া অধিকাংশ ব্যক্তিরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যাহা আহার করিয়া থাকে তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত তো নয়ই অধিকন্তু ভিটামিনের অভাব হেতু নানা প্রকার রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। সস্তা খাদ্যের মধ্যে
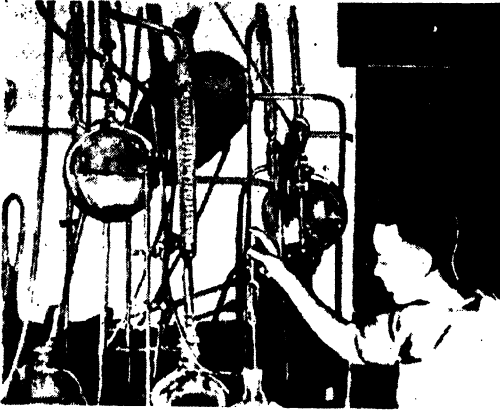
ঘাস শোধিত করিয়া মনুষ্য-খাদ্যে পরিণত করিবার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা চলিতেছে।

যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন পাওয়া সম্ভব নহে। আর্থিক ব্যবস্থার সমতা সাধিত হইলেই যে প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনসংযুক্ত খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা হইবে তাহাও বলা চলে না। মোটের উপর যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন আহরণ বা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। এমতাবস্থায় অধিকতর কার্য্যকরী কোন পদার্থের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘাসের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কচি ঘাস-পাতার মধ্যে শরীরপোষণোপযোগী বিবিধ খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন রহিয়াছে। অল্প মূল্যের খাদ্যের সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে যেমন খরচও বিশেষ কিছু বাড়িবে না তেমনই আবার উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনের দরুন স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে। আমেরিকার মত স্থানের লোকেরাই যখন খাদ্য-সমস্যায় বিব্রত হইয়া ঘাসের খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এই অভিনব খাদ্য যে অধিকতর সুবিধা-জনক বিবেচিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। খাদ্যোপযোগী ঘাস বাছাই করিয়া আহরণ করা প্রয়োজন। যব, গম, বার্লি প্রভৃতির চারাগাছের গাঁট জন্মিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ রোপণ করিবার পর প্রায় ১৭।১৮ দিনের মধ্যেই পাতাগুলি কাটিয়া লইতে হইবে। এই সময়েই চারা গাছের পাতায় ভিটামিন জাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ কচি পাতায় শক্ত আঁশ না থাকায় মানুষের পক্ষে হজম করা সহজ। শক্ত আঁশযুক্ত ঘাস পাতা ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জীব জন্তুরা হজম করিতে পারিলেও মানুষের পক্ষে তাহা দুষ্পাচ্য। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাতার আঁশও ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে এবং তদনুপাতে তাহার প্রোটিন, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। ঘাসের কচি পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ঘাসের খাদ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যন্ত্রসাহায্যে জমি হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া সেগুলিকে কাটাই-যন্ত্রে ফেলিয়া ইচ্ছামত কুচাইয়া লন। পরে কুচানো ঘাসগুলিকে বিরাট একটা ঘূর্ণায়মান ড্রামের মধ্যে পুরিয়া হঠাৎ উৎপাদিত উচ্চ তাপে অতি দ্রুত শুষ্ক করা হয়। শুষ্ক হইবার পর পরিষ্কার করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্যাকিং হইবার পর বাজারে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য সবুজ রং বর্জ্জন করিয়া গুঁড়া করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ঔষধ ও পথ্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঘাসগুলিকে শুষ্ক করিবার পর চূর্ণ করিয়া, বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ আবদ্ধ কৌটায় নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাখা হয়। এই উপায়ে ঘাসের ভিটামিনকে অবিকৃতভাবে বহু দিন স্থায়ী রাখিতে পারা যায়। আমেরিকার অণ্টেরিও ও টেক্সাস্ প্রভৃতি স্থানে পূর্ণোদ্যমে এই ঘাসের খাদ্য উৎপাদন চলিতেছে। জমিতে একবার বীজ বুনিয়া তাহা হইতে কয়েক বার ঘাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহাতে যথেষ্ট ঘাসও সংগ্রহ হয় অথচ ফসল পাইতেও অসুবিধা ঘটে না। চারা গাছগুলি গজাইবার ১৬।১৭ দিন

ডিম উৎপাদনের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিবার জন্য মুর্গীগুলিকে শুষ্ক ঘাস বা সেরোফিল খাওয়ানো হইতেছে।

ঘাসের মধ্যে 'ভিটামিন—সি'র পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা হইতেছে।

পরে একবার কাটিয়া লওয়া হইলে আবার নূতন পাতা গজাইতে থাকে। আবার সেগুলিকেও কাটিয়া লওয়া হয়। বার তিনেক এই ভাবে কাটিয়া লওয়ার পর গাছগুলিকে বাড়িতে দেওয়া হয়। তখন সে গাছগুলি বড় হইয়া শস্য উৎপাদন করিতে পারে।

• ভিটামিন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক নূতন কোন আবিষ্কার সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকেরই একটা সন্দেহের ভাব থাকে যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইবে কি না? বিশেষতঃ ভিটামিনসংক্রান্ত ব্যাপারে ঘাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সেই সন্দেহ একটু অধিক হইবারই কথা। কিন্তু যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে এই সন্দেহ অমূলক বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে শরীরপোষণোপযোগী যাবতীয় ভিটামিন সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন সংগ্রহের উপায় নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই শোধিত ঘাস জনসাধারণের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ইহার ফলে একমাত্র ভিটামিন-ডি ছাড়া অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অন্যান্য ভিটামিন সহজলভ্য হইবে।

খাদ্যদ্রব্যে সবুজ রংটা সাধারণতঃ অনেকেই পছন্দ করেন না। রাসায়নিকেরা ঘাসকে খাদ্যোপযোগী করিয়া তুলিবার সময় এই রঙের সমস্যাও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুটীর সঙ্গে ঘাসের গুঁড়া মিশ্রিত করিবার ফলে রুটীর বর্ণ হইল সবুজ। এই সবুজ রুটী অনেকের নিকট প্রীতিকর হইল না। তখন তাহারা ঘাস হইতে সবুজ রঙের ক্লোরোফিল কণিকাগুলি বাহির করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। ক্লোরোফিল বর্জ্জিত ঘাসের গুঁড়া দেখিতে কতকটা 'মল্টেড্-মিল্কে'র মত এবং খাইতেও 'মল্টেড্-মিল্কে'র মত সুস্বাদু। অধিকন্তু ইহাতে খাদ্যপ্রাণ পদার্থের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। ক্লোরোফিল বর্জ্জিত ঘাসের গুঁড়া মিশাইবার ফলে সাদা রুটী সোনালী বর্ণ ধারণ করে এবং খাইতেও তৃপ্তিকর।

কাজেই শীঘ্রই হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন ঘাসকেই আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্যরূপে বাছিয়া লইব। খাদ্য-সমস্যার সহিত ভিটামিন-সমস্যার জটিলতা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই ঘাসের খাদ্য—সেরোফিল হয়তো খাদ্য, অর্থ ও ভিটামিন—একাধারে এই ত্রিবিধ সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবে—ইহাই বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, অশেষবিধ রসনা-তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর পদার্থ থাকিতে অবশেষে বৈজ্ঞানিকদের ঘাসের মত একটা অকিঞ্চিৎকর
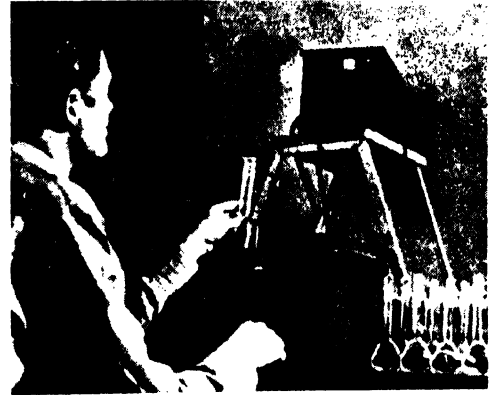
গ্যালভ্যানোমিটারের সাহায্যে ঘাসের ক্যারোটিনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতেছে।

সমবয়স্ক ইঁদুর দুইটিকে একই খাদ্য দেওয়া হইলেও একটিকে অতিরিক্ত ঘাসের খাদ্য দেওয়ার ফলে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে।

পদার্থের উপর নজর পড়িল কেন? ঘটনাটা কতকটা আকস্মিক। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য যেমন আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাও কতকটা সেইরূপ।

প্রায় বছর-বারো পূর্ব্বে চার্লস স্ক্যাবেল নামে জনৈক জৈব-রাসায়নিক তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মীকে লইয়া ডিম উৎপাদনের জন্য একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ডিম-উৎপাদন সম্পর্কিত সমুদয় কার্য্যই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইত। অতি সতর্কতার সহিত বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হইলেও কিছু দিন পরে দেখা গেল—ডিম পাড়িবার পর প্রায় একই সময়ে হাজার-পাঁচেক মুর্গী অসুস্থ হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইল যে অতঃপর আর কারবার না গুটাইয়া উপায় রহিল না। এই অবস্থায় অন্যান্য সকলে আশা ছাড়িয়া দিলেও স্ক্যাবেল কিন্তু কিছুতেই দমিলেন না। তিনি এই মড়কের কারণ অনুসন্ধানে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার ধারণা হইল যে, উপযুক্ত পরিমাণ শরীরের রক্তকণিকা উৎপাদক পদার্থের অভাবই এই মড়কের প্রধান কারণ। কাজেই রক্তকণিকা-উৎপাদক পুষ্টিকর পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াইতে পারিলে নিশ্চয়ই এই মড়ক নিবারিত হইবে; অধিকন্তু ডিমের উৎকর্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিও অসম্ভব নহে। উদ্ভিদের সবুজ পত্রাদির মধ্যে যে রক্তকণিকা-বৃদ্ধির উপাদান রহিয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত নহে। স্ক্যাবেল পাখীর মড়ক প্রতিরোধকল্পে উদ্ভিদের সবুজ পত্র খাওয়াইতে মনস্থ করিলেন। আল্‌ফাল্‌ফা নামক ঘাসের সবুজ পত্রই এই পরীক্ষায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল। পরীক্ষার ফলে কিছু দিন পরে দেখা গেল—যে মুর্গীগুলিকে খাদ্যের শতকরা দশ ভাগ পরিমিত ঘাস প্রদান করিয়াছিলেন তাহাদের বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও মোটামুটি তাহারা সুস্থ রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা শতকরা দশ ভাগের বেশী ঘাস উদরস্থ করিয়াছে তাহাদের উন্নতি তো দূরের কথা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া মুর্গীগুলিকে প্রায় ২০ রকমের বিভিন্ন ঘাস পাতা খাওয়াইয়া তিনি এক রকম হতাশভাবেই তাঁহার মতবাদ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন এমন সময়ে যব, ভুট্টা, বার্লি প্রভৃতি কচি গাছের সবুজ পত্র ব্যবহারের ফলে কতকগুলি মুর্গীর আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষ্য করিলেন। এই নূতন খাদ্য খাওয়াইবার ফলে পরবর্ত্তী ছয় মাসের মধ্যে পাখীগুলি যে কেবল সুস্থ সবলই হইয়া উঠিল তাহা নহে, পরন্তু অধিক-সংখ্যক উৎকৃষ্ট ডিম প্রসব করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া পর বৎসর আবার অনুরূপ পরীক্ষা সুরু করিলেন। এবারও ঠিক পূর্ব্ব বৎসরের মতই ফল লাভ করিয়া ঘাসের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ

আভ্যন্তরীণ উপাদান সংগ্রহার্থ রাসায়নিক পরীক্ষা।

ক্লোরোফিল বর্জ্জিত ঘাস হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে; এই হলুদবর্ণের ঘাসের গুঁড়া মিশাইয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে।

হইলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি আর্থিক অনটনের দরুন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। স্ত্রীপুত্র সমেত আটটি প্রাণীর উপযুক্ত আহার্য্য সংগ্রহ করাই কষ্টকর হইয়া উঠিল। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে আহার্য্য সংগ্রহ করেন তাহাতে কোনরকমে উদরপূর্ত্তি হয় বটে; কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না। এই অবস্থায় এক দিন হঠাৎ তাহার মনে হইল—কচি ঘাসপাতা যদি হাঁস, মুর্গীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইতে পারে তবে তাহা মনুষ্যশরীরেও উন্নতিসাধন করিবে না কেন? কথাটা মনে হইতেই তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। ঘাসের কচি-পাতা শুষ্ক করিয়া সরে ভিজাইয়া রোজই তাহা পরিবারের প্রত্যেকের জন্য খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ভাবে ক্রমাগত তিন বৎসর ঘাসের সাহায্যে ভিটামিনের অভাব পূর্ণ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—তাহাদের প্রত্যেকেরই চমৎকার স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়াছে।

ইতিমধ্যে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। উইস্‌কন্‌সিন্ ইউনিভার্সিটির জর্জ কোহ্‌লার নামক একজন নবীন গবেষণাব্রতী বিখ্যাত জৈব-রাসায়নিক প্রোফেসর হার্ট এবং ডাঃ এল্‌ভেজেমের পরিচালনাধীনে খাদ্যতত্ত্ব সম্পর্কিত রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। গবেষণার কার্য্য চলিবার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সে সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ঘটনাটা এই:—যে ইঁদুরগুলির উপর পরীক্ষা চলিতেছিল সেগুলিকে সারা বৎসর নির্দ্ধারিত পরিমাণে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই রকম নুন, জল, দুধ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইত। তথাপি কিন্তু শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তাহাদের বৃদ্ধির দ্রুততা এবং শারীরিক উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হইত। একমাত্র দুধ ছাড়া অন্য কোন জিনিষেই পরিবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই দুধও সারা বৎসর নির্দ্দিষ্ট এক স্থানের একই জাতীয় গরু হইতে সংগৃহীত হইত। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের দুধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা পরীক্ষা করা হউক। ডাঃ কোহ্‌লার এই অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিবার জন্য পরীক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের দুধের তুলনামূলক পরীক্ষা সময়-সাপেক্ষ বলিয়া তিনি ইতিমধ্যে অন্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন—মাঠে সবুজ ঘাস খাইয়া বেড়ায় এরূপ গরুর দুধে শরীরের বৃদ্ধি উৎপাদক এক প্রকার উপাদান রহিয়াছে; কিন্তু যে সকল গরু খড় বা বিচুলি খাইয়া

রিফ্রিজারেটারে রাখিবার জন্য ঘাসের গুঁড়া বস্তাবন্দী করা হইতেছে

থাকে তাহাদের দুধে সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। নিশ্চয়ই সবুজ ঘাসের রস হইতে এই উপাদান দুগ্ধে সঞ্চিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে ইহার সত্যতা সমর্থিত হইল। কচি বা বাড়ন্ত ঘাসের রস শীতকালের দুধে মিশাইয়া ইঁদুরগুলিকে খাওয়াইয়া দেখা গেল যে সেগুলি গ্রীষ্মকালের মতই দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং গ্রীষ্ম-কালের অন্যান্য লক্ষণও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তখন ঘাসের রসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্ক্যাবেলের আবিষ্কৃত তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত হইবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, কিছু কাল রাখিয়া দিলেই শুষ্ক ঘাসের ভিটামিন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, কাজেই ঘাসের মধ্যে ভিটামিনকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে বিশেষ কিছুই সুবিধা হইবে না। এই জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রণালীতে ঘাস শুষ্ক করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ডেয়ারী সম্পর্কিত কোন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শুষ্ক করিবার একটি বিরাট যন্ত্র অনেক দিন হইতেই অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। খবর পাইয়া তিনি যন্ত্রটি ধার করিবার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রেসিডেন্ট, স্ক্যাবেলের নিকট ঘাসের অদ্ভুত প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হইয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত একযোগে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল ঘাসের চূর্ণগুলিকে দুধের সহিত মিশ্রিত করিবার পর যদি কাইয়ের মত ঘন করিয়া লওয়া যায় তবে ঘাসের ভিটামিন অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে থাকিতে পারে। কারণ 'ভিটামিন-এ'কে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত ক্যারোটিন নামক অগ্রবর্ত্তী পদার্থ (precursor) রৌদ্র অথবা বাতাসে থাকিলে শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু চর্ব্বিজাতীয় কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহা অক্ষুন্ন ভাবেই থাকে। তাঁহারা ঘাসের ভিটামিন অক্ষুণ্ণ ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার সাহায্যে হাঁস, মুর্গী প্রভৃতির উপর পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। ফলে শীঘ্রই সেরোফিলের নূতন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিল। সেরোফিলের মধ্যে যে কেবল 'ভিটামিন-এ'ই রহিয়াছে তাহা নহে—ইহাতে ভিটামিন-বি, সি, জি এবং শরীরপোষণোপযোগী অন্যান্য অনেক পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

নববর্ষের প্রণাম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নববর্ষে পাদ-পদ্মে রাখিলাম প্রাণের প্রণাম।
ওগো মহারথী, তুমি আজীবন করিলে সংগ্রাম
সত্য আর স্বাধীনতা এই দুটি আদর্শের লাগি।
জাতির শিয়রে তব নিদ্রাহীন চিত্ত আছে জাগি
মহান্ প্রহরীসম। যা-কিছু করেছে অপমান
মানব-আত্মারে—তারে হানিয়াছ নির্দ্দয় কৃপাণ।
ঐশ্বর্য্যের পদতলে আদর্শেরে দাও নাই বলি;
বলের স্পর্দ্ধার কাছে কোনোদিন পাতো নি অঞ্জলি
যা-কিছু কল্যাণ ব'লে করিয়াছ অন্তরে বিশ্বাস—
অগ্নিগর্ভ লেখনীর মুখে তারে করেছ প্রকাশ।
ইস্পাত-কঠিন তব সংকল্পের দুর্জ্জয় শক্তিরে
ঈর্ষ্যা করি। দাও ভরি ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলিরে
আশীর্ব্বাদ দিয়ে। সত্যে মতি যেন থাকে চিরদিন।
যে নিশান হাতে দিলে তারে যেন না করি মলিন
ভীরুতার কালিমায়। যত ক্ষতি আসুক জীবনে—
সত্য থাক্ অবিচল হৃদয়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে॥

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

[রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি তারিখ অনুসারে পরে পরে ছাপা হচ্ছে। এ মাসে এই ধারার ব্যতিক্রম ক'রে আধুনিক তিনটি চিঠি গোড়াতেই ছাপা হ'ল]

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
২৯।৩।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বিলাত থেকে আপনাকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম তাদের মধ্যে অতর্কিত অহমিকা এসে পড়েছে। সে জন্যে লজ্জিত আছি। যদি আমার পক্ষে তখন চিত্তসংযম সম্ভবপর হতো, যদি সকল পত্রে নিজের অগোচরে অনেক অত্যুক্তি প্রবেশ না করত, তা হলে ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য বিশুদ্ধ হতে পারত। অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে অভাবনীয় প্রশংসা লাভে নূতন যশস্বীর অনিবার্য চিত্তচাঞ্চল্য মনস্তত্ত্বের ইতিহাস হিসাবে উপাদেয় হতেও পারে। এই জন্য স্বকৃত কর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি নি।

পাঠকেরা এই চিঠিগুলির মধ্য থেকে অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন স্বাদ মার্জনা করে নেবেন এই আশা করি।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙঁ

[২৩শে চৈত্র, ১৩৪৭]

প্রিয়বরেষু,

একদা য়ুরোপ থেকে আপনাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেম সে সম্বন্ধে সেদিনকার চিঠিতে আমার মন্তব্য কিছু বলেছি, সেটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে না বললে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে। সেই একটি সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত জন-মনে আমাকে উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়; বোধ হয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতী পুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি। তখনকার মহাযুদ্ধের পরবর্তী য়ুরোপে মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল প্রাচ্য দেশের এই কবির অভ্যর্থনার ভূমিকা ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ যাই হোক ঘটনাটা ছিল অচিন্তনীয় সুতরাং নিজের মুখে তার আভাস মাত্র দেওয়া অত্যন্ত সঙ্কোচজনক। এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। মনে আছে এই সময় কৌতূহল বশত লর্ড সিংহ এক বার আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন, জানি তিনি বলেছিলেন যদি তাঁর এ রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না ঘটত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়

রথীন্দ্রনাথ বার্লিনে আরোগ্যশালায় শয্যাগত ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করবার শুভ অবসর হারিয়ে গেল। আর আমার অন্য স্বদেশবাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর কোনো ভারতবাসী এত অন্তরঙ্গভাবে করতে পারে নি। উপযুক্ত সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই বরাবর শোভন মনে করেছি। এই রকম নীরবতার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ সেদিন আমার যাত্রাপথে পদে পদে যে প্রবল উত্তেজনা জাগ্রত হয়ে উঠছিল তার মধ্যে সমগ্র ব্যাপারের একটা স্পষ্ট দৃশ্য দেখতে পাওয়া এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে বলা দুঃসাধ্য ছিল।

আমার জীবনের সেদিনকার এই যে আশ্চর্য ঘটনা সহসা অত্যুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আমি কে? আমিই তো ছিলেম সেই ব্যাপারের উপলক্ষ্য, আমিই তো ছিলেম তার কেন্দ্রস্থলে। এস্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র আভাস আমার তরফ থেকে দেওয়ায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ হবার আশঙ্ক আছে। অতএব একদিন কোন মহালগ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল। হয়তো তাই থাকাই ভালো। আমি এ সম্বন্ধে কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করতে একান্ত অনিচ্ছা বোধ করি। কেন না সেদিনকার সেই ভ্রমণ ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গ সহায়তা পেয়েছিলুম তাঁদের অক্লান্ত সেবা ও সতর্কতা নিরন্তর না পেলে আমার পক্ষে এক পা চলা অসম্ভব হতো। তাঁদের কাছে থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুশ্রূষা পেয়েছিলুম তা অত্যন্ত মূল্যবান, তাঁরা যদি য়ুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির ছিন্ন চিহ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে না সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি। বস্তুত আমি জানি সেদিনকার সেই খ্যাতির কোনো স্থায়ী মূল্য নেই কারণ সম্পূর্ণ জানার মধ্যে তার মূল ছিল না। এখনি তা অনুজ্জ্বল এবং লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে কিছু দিন পরে তা সুদূর স্মৃতিরূপে হয়তো অস্পষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু যত্ন ও ভালোবাসা সত্যকার জিনিস অন্তরের ভিতর থেকে জীবনকে তা পূর্ণতা দান করে, কোনো কালে তার ক্ষয় নেই। সেদিন য়ুরোপও আমার বাহিরের সংস্রব থেকে জানি না কী কারণে আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছিল সেই অহৈতুক মানব প্রেম আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বাহিরের কোনো বিস্মৃতি আর তাকে অপহরণ করতে পারবে না। আমার সৌভাগ্য এবং আমার গৌরব এই প্রীতিতেই, খ্যাতিতে কদাচিৎ নয়। সেই জন্য আমার সেই ভ্রমণ ব্যাপারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই দৈনন্দিন সেবার ধারাসূত্র সকলের চেয়ে সত্য হয়ে আমার মনের মধ্যে আজো রয়ে গেছে আর বাকি বাহিরের সমস্ত দান প্রতিদান আমার মন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেজন্য আক্ষেপ না করাই আমি শ্রেয় মনে করি। ঈশোপনিষৎ মানুষকে তার জীবনান্তকালের এই মন্ত্র দিয়েছেন "ওম্ কৃতং স্মর", নিজে যা করেছ তাই স্মরণ কর, আর সমস্ত কথা নিয়ে যেন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে, লোকের মুখের কথা লোকের মুখেই রইল। কিন্তু অন্তরের সম্পদ জীবনের কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার শেষ পুরস্কার অর্পণ করবে সেই পুরস্কারকেই আমি বলি শান্তি।

আমাদের দেশে সামান্য কারণেই লোকে আধ্যাত্মিক শক্তির অতিমানবিক প্রভাব কল্পনা করে থাকেন, আপনি জানেন এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে কোনো ঘোষণা কোনো দিন প্রকাশ পায় নি কারণ আমি তা বিশ্বাস করি না। এ জীবনে যে মূলধনটুকু নিয়ে জনতার হাটে প্রতিপত্তির কারবার করে এসেছি সে আমার কবিত্বশক্তি মাত্র। সেই দান যে আমি ভাগ্যের হাত থেকে গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছিলেম একথা অস্বীকার করলে কিংবা কম করে বললে যে কৃত্রিম বিনয়

প্রকাশ করা হবে সেটা মিথ্যে অহংকারের চেয়েও ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু আমার এই কবিত্বের পরিমাণ বা গুণ যতই হোক এবং যাই হোক তা যথার্থ ভাবে জানবার কোনো সুযোগ য়ুরোপীয়ের ঘটে নি, তাঁরা সেটা হয়তো আন্দাজে ধরে নিয়ে থাকবেন। এই আন্দাজের মধ্যে সহজেই অতিকৃতি এসে পড়ে সুতরাং যে আদর্শে তাঁরা সেদিন আমাকে বিচার করেছিলেন সে ছিল তাঁদের নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি তাতে তাঁরা আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন এজন্য নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আপনারা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন এমন কি বিরক্ত হতেও পারেন যে সেদিন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ আমাকে যে সমাদরের আসন দিয়েছিলেন তা তৎপূর্বে আমার দেশে আমার জন্য তেমন প্রশস্তভাবে কখনো পেতে দেওয়া হয় নি।

আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে। খ্যাতি সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রীতির সঙ্গে সেদিন য়ুরোপ আমাকে যে সম্মান দান করেছিলেন তা আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি আজ পর্যন্ত সাদরে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই খ্যাতির স্থায়িত্বের মূল্য সম্বন্ধে আমার কোনো অত্যাশা নেই, অথচ এই প্রীতির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মাত্র করি নে।

আর বেশি বলবার শক্তি আমার নেই, লোকালয়ের রাস্তা থেকে কিছু খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম কি না যার মূল্য আছে, বলতে পারি নে। কিন্তু মানুষের প্রীতিলাভ করেছি অজস্র এবং যে হেতুক সে প্রীতি অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি এই জন্যে তাকে আমি সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি।

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ

Santiniketan.

প্রীতিভাজনেষু,

সেদিন আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সে আমার অপটুতাবশত বোধ হয় স্পষ্ট হয় নি এবং সমস্ত চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তার মর্ম্মকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।···সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই ছিল যে একদিন সমস্ত ইয়োরোপের কাছ থেকে আমি যে সম্মান পেয়েছিলুম তা অভাবনীয়, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, সেই জন্য কোনো দিন আমি নিজের মুখে এর কোনো বর্ণনা করি নি। এই ভ্রমণব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হতো। আজ পর্য্যন্ত দেন নি। কিন্তু আমি অনুশোচনা করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি কারণ আমার বয়সে এ অভিজ্ঞতাটুকু পেয়েছি লোকখ্যাতির কোনো স্থায়ী মর্য্যাদা নাই। অদৃষ্টের একমাত্র মূল্যবান দান ভালবাসা। তা যেহেতুক অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে জীবনকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তোলে এই জন্যে বাহির থেকে কাল তাকে অপহরণ করতে পারে না। এই যথার্থ ভালবাসা আমি সমস্ত ইয়োরোপ থেকে এবং আমার ভ্রমণ-সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। এই কৃতজ্ঞতা স্থায়ী ভাবে আমার মনে রয়ে গেল। সাধারণ ভাবে এই কথাটুকু আপনাকে জানাতে চেয়েছিলুম এবং একথা আজ আমি সকলকেই জানাতে পারি।

নিজের অঙ্গুলী চালনা করতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এই জন্য আজ দৈবক্রমে কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীকে নিকটে পেয়ে তার হাত দিয়ে আমার যা জানাবার কথা আপনাকে জানালুম। নিশ্চয় জানবেন এর

মধ্যে আমার কোনোখানে কোনো ক্ষোভ মাত্র নেই। আমি যা পেয়েছি তা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করলুম এবং যা পাই নি তার জন্যে কারু কাছে কোনো নালিশ জানাব না। ইতি ১০ই এপ্রিল ১৯৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan.
Santiniketan.
Benga.

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

নন্দলালরা কলাভবনের নতুন ঘরগুলি সাজিয়ে তোলবার ব্যাপারে নিতান্ত ব্যস্ত। তাই কোনো কাজে হাত দিতে পারচেন না। চেষ্টা করবেন যদি গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকে কন্‌গ্রেস উপলক্ষ্যে বিক্রীর জন্যে পাঠাতে পারেন। একটু বড় সাইজে দেয়ালে ঝোলাবার মতো। আর আর ছবি প্রায় সবগুলিই প্রবাসী মডারণ রিভিয়ুতে ছাপা হয়ে গেচে। সেগুলি বাছাই করে নতুন ব্লকে ছাপানো যেতে পারে কিনা ভাবচেন। ৭ই পৌষের ব্যাপারটা চুকে না গেলে মন স্থির করতে পারচেন না।

আপনি জানেন, জোরোয়াস্ত্রিয় শাখার ব্যাখ্যানকারের নাম আমরা আমাদের বুলেটিন বা কাগজে প্রচার করি নি। করার প্রয়োজন ছিল। তার কারণ বুঝতে পারচেন। তারাপুরওয়ালাকে শাস্ত্রী-মশায় বক্তৃতাগুলি লিখিত আকারে দিতে বলে অকৃতকার্য্য হয়েছেন এই তো জানি। শাস্ত্রীমশায় এলে খবরটা আরো স্পষ্ট করে জানা যাবে। ইতি ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা লিখে পাঠাবার চেষ্টা করব। **Political Philosophy of Rabindranath** নামে যে একটি ইংরেজি বই সম্প্রতি বাহির হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে আপনার নামে প্রবাসী আপিসে পাঠিয়েছিলুম—কোনো এক জন ব্যানার্জ্জি উপাধিধারী "প্রাপ্ত" বলে স্বীকার করেছিলেন। সে লেখা আপনার গোচর হয়েচে কিনা আপনার চিঠি থেকে বুঝতে পারলুম না। বিষয়টা স্বতই উপদ্রবজনক সেই জন্য আপনার বিচারের অপেক্ষা করেছিলুম।

বড়োদায় একটা বক্তৃতার জন্যে আমি আহূত। সেইটি লিখতে হচ্চে। প্রতিদিন অনুভব করচি আমার রচনাশক্তির সহজস্রোত মন্দীভূত হয়ে আসচে। বোধ হয় আমার চিত্ত সেই ধারায় কাজ করতে এখন আর উৎসাহ বোধ করে না। বিশেষত আমার মন ইংরেজি লেখায় অত্যন্ত অনবধান হয়ে পড়েচে। বড় ধীরে ধীরে কলম চলে। এটা প্রত্যেক বারে ঘটে যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসি বোধ হয় যেন ইংরেজি ভাষায় চিন্তা করবার প্রণালীটা এখানে রুদ্ধ হয়ে আসে। অথচ হিবার্ট লেকচার উপলক্ষ্য করে আমার কিছু বলবার আছে। আমি স্বভাবত কুঁড়ে, বাইরে থেকে খুব একটা চাপ না পড়লে আমার অনেক কথাই অকথিত থেকে যায়। তাই আমার ক্লান্ত মনকে এই কাজের জন্যে তাগিদ করচি। দেশে থাকতে এত ছোট ছোট দুঃখ এবং দায় এসে নিরন্তর এত অকারণ আবর্জ্জনায়

আমার দিনগুলোকে ভারাক্রান্ত করে যে, মনে করচি য়ুরোপে কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে আমার লেখাটা শেষ করব। নিজের ভিতরকার যেটা বড়ো দান সেটা বড়ো শান্তি ও অবকাশ ছাড়া যথোচিত-ভাবে উদ্ভাসিত হতে চায় না। সেই শান্তি ও নিরাবিল অবকাশকে আপন অন্তরের জিনিষ করে তোলবার জন্যে একান্ত মনে চেষ্টা করি। যদি সফল হতে পারি তবে নিজের জীবনটাই নৈবেদ্যরূপে রচিত হতে পারবে অন্য কোনো রচনা নাই বা হলো। একটা ইংরেজি লেখা চেয়েচেন। আপনি চাইলে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সহজ হয় না। মুস্কিল এই যে শীতের অনেকটা সময় রেলপথে কাটবে—নিমন্ত্রণ রক্ষায় এবং ভিক্ষা সংগ্রহে। সংগ্রহ বেশী হবে বলে আশা করি নে কিন্তু বাংলার বাহিরে নিগ্রহের আশঙ্কা কম অতএব ঝুলি নিয়ে বেরতে হবে কেন না এই ভিক্ষাটা সাধনারই একটা অঙ্গ—বোধ করি নিরর্থক হলেও তার একটা সার্থকতা আছে। আমার পোলিটিকাল মত সম্বন্ধে প্রবাসীতে যে লেখা লিখেচি সেটা যদি আপনার মনঃপূত হয় তবে সেইটেই কাউকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে পাঠিয়ে দিলে সেটাকে আমি শোধন করে কিছু পরিমাণে তাকে স্বকীয় করে আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আর যদি শতকরা এক শত পরিমাণে আমার কিছু চান তবে সে প্রস্তাবটা মনে রইল কিন্তু অবস্থাগত প্রচুর অনুকূলতার উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে। আপনি বোধ হয় জানেন কিছুদিন থেকে আমার যে কোনো লেখা যে কোনো কাগজে বেরচ্চে সে আমার দীর্ঘকালের পুরোনো লেখা। এত পুরোনো যে পুরোনো বলে ধরা পড়ে না। * * * তার * * * শকটের জন্যে এমনি একটা লেখা জন্ম তারিখ চাপা দিয়ে বোঝাই করবে বলে নিয়ে গেছে। ইতি ১৫ই নবেম্বর ১৯২৯ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কোরীয়-রবীন্দ্র সংবাদ আপনাকে পাঠানো হয়েচে। আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ দেখলুম না। বোধ করি রেজেষ্টি ডাকের গতি বিলম্বিত।

······কে দিয়েচেন আমার লেখা তর্জ্জমা করে দিতে। ফলের আশা ত্যাগ করে যদি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে দিয়ে থাকেন তাহলে দুঃখের কারণ থাকবে না। দান্তের কাব্যে পাপীদের বিশেষ একটি বস্তির দ্বারে লেখা আছে এখানে যারা যায় তাদের ফেরবার আশা নেই। যে রচনাকে চির বিলুপ্তির দণ্ডযোগ্য মনে করেন তাকে ······কে দেবেন। সে আর ফিরবে না।

আমার দুটো ইংরেজি লেখা আপনাকে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলেছি। অপরাধের মধ্যে এরা পুরনো লেখা। কিন্তু অপরিচিত। বালবিধবার মতো। দ্বিতীয়বার পরিণয় প্রথম পরিণয়েরই সামিল। বিশ্বভারতীর পত্রিকায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে ছিল, বহুকাল পূর্ব্বে। আপনি যদি আজ প্রকাশ করেন তবে অপূর্ব্বরূপেই প্রতিভাত হবে। কিছু বাদসাদ দিয়েচি, নামান্তরও ঘটেচে, এখন আপনি যদি গোত্রান্তর করেন, তবে তাদের সদ্গতি হবে। ······ এমনি করেই আমার একটা লেখা বিস্মৃতির ঝুলি থেকে উদ্ধার করেচে। সম্পূর্ণ নতুন বলেই পাঠকেরা তাকে স্বীকার করে নিয়েচে, কেউ তাকে বৈধব্যের খোঁটা দেয় নি। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী"তে যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে "প্রবাসী"র তখনকার সহকারী সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অন্যতম অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, এবং বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কর্মী কালীমোহন ঘোষ পরলোকগত। অন্যেরা শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন, ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত পত্রাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

ক্রমশঃ

আলোচনা

"বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়"

শ্রীভরদ্বাজ

গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৭৫৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম—'বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে জনৈক পত্রপ্রেরক একটি ভুল ধরিয়াছেন। Delisle Burns'র বইখানি ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সুপরিচিত। রেনাঁর একটি উক্তি মূল ফরাসী ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া Burns উহার মর্মানুবাদ করিয়াছেন "A common memory and a common ideal—these more than a common blood make a nation" (p. 178)। অতএব উক্তিটির জনক Burnsকে না বলিয়া রেনাঁকে বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

"প্রবাসীর ৪০শ বর্ষ পূর্তি"

'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়,

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল 'প্রবাসী'র মত জনপ্রিয় মাসিক পত্র একটানা পরিচালন ও পরিবেশন করিয়া আপনি যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত (রেকর্ড) স্থাপন করিলেন, পৃথিবীতে তার সমকক্ষ, সময়ের দিক দিয়া এক-আধটি থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়া দেখিলে, এমনটি আর আছে কিনা সন্দেহ। পনেরো বৎসর পূর্বে আপনাকে ডব্লিউ. টি. ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলাম; আজ আপনি তাঁকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, আপনি সুস্থদেহে আরও কিছু কাল এই ভাবে জনসেবা দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে পত্রখানি পরিচালন করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করুন, তার পরেও নিত্যকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আরও কিছু দিন পরামর্শ দিউন!

'প্রবাসী' পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় একটি সম্মিলিত সূচীপত্র পাইবার দাবী আমি আপনাকে জানাইলে, আপনি লিখিয়াছিলেন, ঐ পরিকল্পনা আপনার মনেও ছিল; এবং পরে তদনুসারে কার্যও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহা বোধ হয় সম্পূর্ণ না হওয়ায় (বা অন্য কারণে) স্থগিত করিয়াছিলেন। এখন ৪০ বছরের প্রবাসীর বৃহৎ সূচী প্রকাশ করা সম্ভব নয় কি? তার পর আর দশ বছর পরে একেবারে ৫০ বছরের সূচী অথবা ঐ দশ বছরের খণ্ড সূচী অতিরিক্ত রূপে হইতে পারিবে।

বর্তমান চৈত্র, ১৩৪৭—সংখ্যায় লেখকবর্গের যে অসম্পূর্ণ তালিকা দিয়াছেন, সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা যেমন মনে হইল লিখিতেছি:—

১। অন্ততঃ একটি নাম (১০১ ও ৩৫২। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) ভুলক্রমে দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে! তালিকায় বর্ণানুক্রম রক্ষা করিলে এইরূপ ভুল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।

২। পুরুষ-স্ত্রীনির্বিশেষে জীবিত ব্যক্তির সম্মানসূচক একই 'শ্রী' উপসর্গ ব্যবহার করায় একটু গোল দাঁড়ায়। আবার মৃত ব্যক্তির সম্মানসূচক চিহ্ন (যথা, ৺) দেওয়া হয় নাই।

স্ত্রীবাচক 'শ্রীমতী' উপসর্গ ভারতে সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে, তাহা ত্যাগ করিয়া পুরুষের সঙ্গে একাকার 'শ্রী' করার সার্থকতা নাই, বরং কদাচিৎ উহা দুর্বোধ্য হয়। হিন্দী অঞ্চলে কেহ কেহ 'সুশ্রী' চালাইবার পক্ষপাতী; কিন্তু 'শ্রীমতী' সর্বত্র চলে।

৩। কিছু কাল ধরিয়া 'শ্রী'তে অনেক মুসলমান আপত্তি তুলিতেছেন বলিয়াই (১৮৮। শ্রীহুমায়ুন কবীর ব্যতীত) মুসলমান নামগুলি শ্রীহীন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এরূপ করা অন্যায় মনে করি; বিশেষতঃ বর্তমান তালিকায় যেন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এক পর্যায়ে জীবিত মুসলমান লেখককে রাখা হইয়াছে। যাহারা সশরীরে বিদ্যমান, এমন মুসলমান লেখকের নামের পূর্বে অগত্যা মিঃ ('মিএা' শব্দের আদ্যাক্ষর, অথবা ইংরেজী 'মিষ্টারে'র) লিখিয়া সম্মান দেওয়া উচিত মনে হয়,—যদি তাঁরা একান্তই অ-মুসলমান ভারতবাসীর সহিত সাধারণ সংযোগ শ্রী বিসর্জন দিতে চাহেন।

ইংলণ্ডের লোকে দেশে, বিদেশে, উপনিবেশে সর্বত্র নামোপসর্গ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে 'মিষ্টার' (Mr. স্ত্রীলিঙ্গে Mrs. ও Miss) ব্যবহার করে; ফ্রান্সে 'মসিয়' চলে; জার্মানীতে 'হ'র' ইত্যাদি। ভারতে 'শ্রী' চলিতেছিল, কিন্তু এদেশটি বোধ হয় সাম্য বা ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশন অনেক ক্ষেত্রেই চায় না, বহু স্থলে অনর্থক বৈশিষ্ট্যের মোহে পড়ে।

৪। স্যার, আচার্য প্রভৃতি ঔপসর্গিক উপাধির সহিতও জীবিত ব্যক্তির সম্মানসূচক 'শ্রী' চলিতে পারে মনে করি, যথা—৩২। আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

৫। অনুবাদক ও সমালোচকদের নামও লেখক-তালিকায় থাকা উচিত। '২২৩। শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ' যে "খদ্দরের কথা" নিবন্ধটির লেখক, তাহা শ্রীমতী গুহ-জায়া মূল হিন্দী হইতে অনুবাদ করিয়া, আমার হাত দিয়া আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন। মূল লেখক প্রথমে জানিতেন না; পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত অনুবাদ দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, অনুবাদ উত্তম এবং যথাযথ ও নির্ভুল হইয়াছে। বাংলায় অনুবাদ-সাহিত্য অত্যল্প বলিয়া আপনি নিশ্চয় এ-কার্যে উৎসাহ দিয়া থাকেন।

৬। বিবিধ প্রসঙ্গে আপনি লিখিয়াছেন "তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। কিছু নাম বাদ পড়িয়া থাকিতে পারে।" (পৃ. ৮৩৫) অনেকের নামই বাদ পড়িয়াছে, মনে হয়। আমি কদাচিৎ লিখিয়াছি, সুতরাং আমার নাম বাদ পড়া স্বাভাবিক। ("টাকাকড়ি" এবং "গ্রন্থাগার-বিদ্যায় কলা-কৌশল" নামক আমার দুইটি নিবন্ধের কথা মনে পড়ে।) প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার ও লেখক শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের নাম বাদ পড়িয়াছে। শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী (দাসগুপ্ত)-ও যেন কিছু লিখিয়াছিলেন মনে পড়ে।

আরো বাদ পড়িয়াছে—[ডক্টর] শ্রীসত্যনারায়ণ [সিংহ], যাঁর ক্ষুদ্র অথচ উৎকৃষ্ট মোলাকাৎ নিবন্ধ "গুরুদেবের ওখানে" এই চৈত্রেই (পৃ. ৭৫৫-৭) বাহির হইয়াছে। যাঁরা কখনো বা ছদ্মনামে লেখেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ 'ভাস্কর' (চৈত্র, পৃ. ৭৫৮-৬৪) উল্লিখিত হন নাই। শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, (চৈত্র, পৃ. ৭৬৪-৬) বাদ

...িয়াছেন; বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামটিও তালিকায় স্থান পায় নাই।

লেখক-তালিকাটিকে পূর্ণাঙ্গ করা যাইতে পারিত; বর্গীকৃত এবং বর্ণানুক্রম সাজানো একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে চলিলেই সম্ভব হইত। এখনো নিখুঁত তালিকা হইতে পারে।

সাধারণ মন্তব্য—'প্রবাসী'র ৫০ বছর পূর্ণ হইলে উহার ১০০ খণ্ড বা ভল্যুম হইবে, তখন 'মডার্ণ রিভিউ'-ও প্রায় ৯০ খণ্ড হইয়া যাইবে, এবং 'বিশাল ভারত'ও ৪৭ খণ্ড হইবার কথা। এই ২৩৭ (অথবা বলা যায়, কিঞ্চিন্যূন আড়াই শত) খণ্ডের একই সম্মিলিত নির্ঘণ্ট, রোমান অক্ষরে এক স্বতন্ত্র ভল্যুমে প্রকাশিত হইলে উহাই আপনার শেষ বয়সের এক অতুলনীয় স্মারক-সঙ্কলন গ্রন্থ হইবে—যাহার উপক্রমণিকায় বা পরিশিষ্টে আপনার সম্বন্ধে বহু লোকের নিবন্ধ থাকিলে সোনায় সোহাগা হয়। এরূপ এক খানি স্মারক-গ্রন্থ (কমেমোরেশন ভলুম) আমার কল্পনায় যে রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা 'মহাভারতের বৃহৎ সূচী'র মত ভূ-ভারতে আদৃত হইবে, মনে করি। এরূপ গ্রন্থ আপনার জীবনকালে আপনার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলে আমরা আপনার কনিষ্ঠেরা এবং বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা সকলে অপার আনন্দ অনুভব করিব, সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর

"জীবনের রহস্য সন্ধানে"

শ্রীশান্তিশঙ্কর দাশ গুপ্ত

গত বর্ষের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে "জীবনের রহস্য-সন্ধানে" নামক প্রবন্ধে গোপালবাবু "ফটো সিন্থেসিস" (photo-synthesis) বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি লিখিয়াছেন, "বৃক্ষের এই খাদ্যপ্রস্তুতপ্রণালীকে 'ফটো সিন্থেসিস' বলা হয়। ফটো সিন্থেসিস অর্থে আলোর সাহায্যে খাদ্য-সংগঠন-প্রক্রিয়া বুঝায়।" ফটো সিন্থেসিসের ঠিক সংজ্ঞা যে ইহা নহে তাহা যে কোন ভাল রসায়নের পুস্তক খুলিলেই বুঝা যাইবে। আলোকের সাহায্যে যে কোন রাসায়নিক সংগঠনই হউক না কেন তাহাই ফটো সিন্থেসিসের উদাহরণ। গঠিত পদার্থ খাদ্য না হইয়া বিষ হইলেও যে-প্রক্রিয়া সাহায্যে সংগঠন-কার্য্য হইল তাহাকে ফটো সিন্থেসিস বলিতে হইবে। আলোকের সাহায্যে বৃক্ষের খাদ্য-সংগঠন প্রক্রিয়া ফটো সিন্থেসিসের একটি উদাহরণ বলা যাইতে পারে মাত্র। গভীর অন্ধকারে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের অণুদল একটি বদ্ধ পাত্রের ভিতর মাখামাখি করিয়া বন্ধুর মত বসবাস করিতে পারে—যেমন বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—কিন্তু একটু আলোকের সন্ধান পাইয়াছে কি ইহারা ভীমবিক্রমে একত্র হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণুদলে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়াটি রসায়নের ছাত্রের নিকট ফটো সিন্থেসিসের একটি বিখ্যাত উদাহরণ।

ইহার পরে গোপালবাবু লিখিতেছেন, "অজৈব **মৌলিক পদার্থ** হইতে একমাত্র উদ্ভিদই খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।" কথাটি যে ভুল তাহা গোপালবাবু প্রবন্ধে যে রাসায়নিক ফরমুলা দিয়াছেন তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ফরমুলায় দেখা যাইবে যে, খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীর প্রথম সোপানে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), জল (H_2O), ক্লোরোফিল ও আলোর সাহায্যে ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইহাদের কোন পদার্থই মৌলিক নহে, সবই যৌগিক। তবুও গোপালবাবু "মৌলিক পদার্থ" কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

প্রবন্ধকার আরও পরে লিখিতেছেন, "ফটো সিন্থেসিসের রহস্য অবগত হইতে পারিলে পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি হাইড্রো-কার্ব্বন-জাতীয় পদার্থ ইচ্ছামত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তাধীন হইবে।" ফটো সিন্থেসিসের রহস্য না জানিয়াও এই ক্ষমতা বহুল পরিমাণে মানুষের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। জার্ম্মানীর নিজস্ব তৈলের খনি নাই। সে বহু কাল হইতেই অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংগঠন ঘটাইয়া পেট্রোল অথবা গ্যাসোলিন তৈয়ার করিতেছে। ইহার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অবশ্য অকিঞ্চিৎকর। যে কোন কৌতূহলী সংবাদপত্র-পাঠক জার্ম্মানীর সিন্থেটিক পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ বিষয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিবেন। বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু কোটি টাকা খরচ করিয়া ইংলণ্ডের বিলিংহাম শহরে রাসায়নিক পেট্রোলের কারখানা খুলিয়াছেন। ইংলণ্ডের চাহিদার তুলনায় ইহার সরবরাহিত মালের পরিমাণ অবশ্য অতি সামান্য। তবুও ইহা যে নব বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে এবং ইহার যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিপুল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রক্রিয়া ফটো সিন্থেসিস না হইলেও এক প্রকারের সিন্থেসিস। কারণ পেট্রোলের ভিতর কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই নাই। এবং এই দুই পদার্থের নানা উপায়ে সংগঠন ঘটাইয়া সিন্থেটিক পেট্রোলিয়াম প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে-কোন আলোক-ঘটিত রাসায়নিক সংগঠনকে ফটো সিন্থেসিস কহে। এইরূপ হাজার-হাজার বিভিন্ন সংগঠন-ক্রিয়া সম্ভব। এবং প্রত্যেকটি ক্রিয়ার স্বতন্ত্র রহস্য থাকাও সম্ভব। সুতরাং বৃক্ষের কার্ব্বহাইড্রেট কি করিয়া প্রস্তুত হয় পুরাপুরি জানিতে পারিলেই যে অঙ্গারের গুঁড়া ও হাইড্রোজেন রৌদ্রালোকে সরাসরি মিশাইয়া কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারিব এমন আশা করা শুধু আরব্য-রজনীর অন্ধকারেই সম্ভব।

"জীবনের রহস্য সন্ধানে"

(উত্তর)

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

Photo-synthesis সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি শান্তিবাবুর মতে তাহা একেবারেই ভ্রমাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত নই; কারণ প্রবন্ধে কেবলমাত্র উদ্ভিদের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। যাবতীয় Photochemical reaction সম্বন্ধে আলোচনা উদ্দেশ্য নহে। প্রবন্ধটি হইতে যে দুটি

লাইন তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। তিনি পর পর দুইটি ল্যাইন উদ্ধৃত করিয়াও একটি মাত্র লাইনকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়াই কদর্থ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কথাটা এস্থলে যাবতীয় Photo Chemical reactionএর সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, পূর্ব্বোল্লিখিত Photo-synthesis কথাটা সম্বন্ধে একটু বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে মাত্র। তাছাড়া আলোর সাহায্যে উদ্ভিদের Carbohydrate উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকেই যে Photo-synthesis বলা হইয়া থাকে তাহা যে কোন Biologyর পুস্তক কেন, সাধারণ একখানা Chambers's Dictionary খুলিলেই বুঝা যাইবে। আলোর সাহায্যে Photochemical Hydrolysis, Photochemical reduction, Photochemical oxidation, Photochemical decomposition, *Photochemical Synthesis* প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় রসায়নশাস্ত্রে তাহা Photochemical reaction নামেই অভিহিত হইয়া থাকে, শান্তিবাবুর নিশ্চয়ই তাহা অজানা নহে। মোটের উপর Photo-synthesis কথায় উদ্ভিদের Carbohydrate উৎপাদনের প্রক্রিয়াকেই বুঝায়, ইহাই প্রচলিত রীতি।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য হইতেছে "মৌলিক কথাটা" ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। কেবলমাত্র "মৌলিক পদার্থ"ই বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে—"অজৈব মৌলিক পদার্থ...ইত্যাদি"। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে "অজৈব" কথাটা এস্থলে বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলেও তিনি বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, সমগ্র লাইনটি উদ্ধৃত করিয়াও তাহা হইতে মাত্র দুইটি শব্দ বাছিয়া লইয়াছেন! Element যেমন বিশেষ অর্থে কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন প্রভৃতি তথাকথিত মৌলিক পদার্থকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, স্থলবিশেষে তেমনই আবার জল, বায়ু প্রভৃতি সাধারণ উপাদান অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি উদ্ভিদের জীবন ধারণের প্রাথমিক বা মূল উপাদান হিসাবে মৌলিক পদার্থ এবং Protoplasmকে যে হিসাবে আদি বা মৌলিক জৈব পদার্থ বলা হয় সেই হিসাবেই তাহা "অজৈব মৌলিক পদার্থ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যথায় মৌলিক পদার্থের পূর্ব্বে "অজৈব" বিশেষণটির প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

সর্ব্বশেষ Hydrocarbon জাতীয় পদার্থের উৎপাদন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—জার্ম্মেনীর Synthetic petroleumএর উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যাহার জন্য Bergius, Nobel Laureate রূপে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন সেই Bergius Process অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচুর পরিমাণে Synthetic Petrol উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল জার্ম্মেনী বা বিলিংহামই নহে—চেকোস্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইউনাইটেড কিংডম, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, হল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, জাপান, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণ Synthetic Motor Spirit প্রস্তুত হইতেছে। এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতেও এই Synthetic Petrol প্রস্তুত করিবার বিষয় কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। বছর তিনেক পূর্ব্বেও Bergius ও Fischer-Tropsch পদ্ধতিতে জার্ম্মেনী ও এষ্টোনিয়ায় সমগ্র চাহিদার যথাক্রমে ৫৪.৫ এবং ৫১.৯ ভাগ Synthetic Petrol উৎপাদিত হইয়াছে।

বহুল প্রচলনের ফলে অনেক দিন হইতেই জনসাধারণ Synthetic Motor fuelএর বিষয় অবগত থাকিলেও অধিকতর সহজ পন্থা উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাপৃত রহিয়াছেন কেন? সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক। মোটের উপর, শান্তিবাবুর বক্তব্যের উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে এই যে, যে হেতু Photo-synthesisএর রহস্য না জানিয়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কয়লা হইতে সরাসরি পেট্রল তৈয়ারী হইতেছে তখন Hydrocarbon জাতীয় পদার্থ ইচ্ছানুরূপ উৎপাদন করিবার জন্য নূতন কোন পন্থার প্রয়োজন তো নাই-ই অধিকন্তু Synthetic petrol নামে যে পদার্থ জার্ম্মেনীতে উৎপাদিত হইতেছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ আরব্য রজনীর গল্পের মত অযথা একটা অলীক কল্পনার অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র। উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিলেও বলিতে হয়—আরব্য রজনীর Flying Carpet, দূরদর্শন স্ফটিক প্রভৃতির কল্পনা কি বাস্তবকে হার মানাইতে পারিয়াছে? Steam, Electricity, Explosive mixtureএর শক্তি কি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে যে, আজকালও আবার বৈজ্ঞানিকেরা Atomic disintegration হইতে উদ্ভূত শক্তি বা সূর্য্যকিরণকে কাজে লাগাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন? সাধারণ Chemical processএর সাহায্যে যে সকল Industry চলিতেছিল তাহার স্থলে Fungus প্রভৃতি জৈব পদার্থের সহায়তায় Fermentation Industryগুলি গড়িয়া উঠিতেছে কেন? Synthetic Petroleum উৎপাদনের ব্যয় বাহুল্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র উপরোক্ত কারণেও Photo-synthesisএর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। যাহারা Photo-synthesis সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাঁহারা ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে মাত্র।

দেউলভিড়া ও একতেশ্বরের বৌদ্ধ মূর্ত্তি

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেউলভিড়া বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটি ইন্দপুর থানার এলাকাধীন ও হাটগ্রামের সন্নিকট। অল্প দূরে অড়কষা নদী। নদীর কিনারে পলাশ ও শাল বনের মধ্যে চারিটি পুরান ইটের ঢিবি—গ্রাম্য

দেউলভিড়ায় আবিষ্কৃত পাষাণচক্রের মধ্যস্থ নটরাজ (?) মূর্ত্তি

দেবতার স্থান। বছর কয়েক আগে ইহারই একটি ঢিবিতে রাখাল বালকেরা মাটি খুঁড়িবার সময় একটি পাষাণ-মূর্ত্তির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে। সংবাদ রাষ্ট্র হইলে গ্রামের রায়দের স্বপ্নাদেশ হয়। এই রায়রা নিজেদের "ছত্রী" বা ক্ষত্রিয় বলে, কিন্তু উপবীত ধারণ করে না। তাহাদের চেষ্টায় সামান্য খননের পর একটি ছোট মন্দিরের নিম্নভাগ, দুই-তিনটা পাথরের দ্বারফলক, ও তিনটি অবিকৃত সুন্দর পাষাণ-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয়। যে-ঢিবিটি খনন করা হয় তাহার ডান দিকের ঢিবিতে বৃক্ষমূলে গ্রাম্য দেবীর আস্তানা। সেখানে মধ্যস্থলে ছিদ্র ও পদ্মদলের মত সাতটি আরাবিশিষ্ট একটি বৃহৎ পাষাণচক্র পড়িয়া আছে। চক্রের পাশেই কোনও পাষাণ-মূর্ত্তির ভূপ্রোথিত একটি হস্তের কতকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্প্রতি প্রাচীন ভিত্তির উপর রচিত একটি নূতন মন্দিরে মূর্ত্তিগুলিকে স্থাপনা করা হইয়াছে। পাল-পার্ব্বণে দেবতারা পূজাও পাইতেছেন।

মূর্ত্তিগুলি কাল পাথরের। প্রত্যেকটি অখণ্ড শিলা হইতে খুদিয়া বাহির করা। কালাপাহাড়ের হাত ইহাদের অঙ্গে পড়ে নাই। দেখিলে মনে হয় আজকালের তৈয়ারী। সব চেয়ে বড় যেটি সেটি একটি দণ্ডায়মান পুরুষ-মূর্ত্তি। উচ্চতায় দুই হাতের কিছু বেশী। মাথার উপরে সাতটি সর্পফণায় রচিত ছত্র। পদতলে বিকশিত শতদল। পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রহস্যময় মূর্ত্তি। দুই পাশে সপত্র বৃক্ষ। মূর্ত্তির মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে হার, বক্ষে যজ্ঞোপবীত ও কটিতে বস্ত্র। অলঙ্কারবিভূষিত দ্বাদশ বাহু। উভয় দিকের ষড়ভুজে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্মকোরক, অভয়মুদ্রা, গদা,

দেউলভিড়ায় আবিষ্কৃত পাষাণচক্রের অপর পিঠে নটরাজ-মূর্ত্তি

দেউলভিড়ায় আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির জন্য নবনির্ম্মিত মন্দির

মূর্ত্তিগুলি কত কালের, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ এগুলিতে কোনও সন তারিখ বা রাজার নাম দেওয়া নাই। তবে বাংলা ও বিহারে প্রাপ্ত পাল-যুগের লেখযুক্ত মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে একতেশ্বর ও দেউলভিড়ার মূর্ত্তিগুলি মহারাজ দেবপালের সময়ের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। সে সময় ধীমান ও তদীয় পুত্র বীতপালের নেতৃত্বে বাংলার ভাস্কর্য্য শিল্প উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। এই শিল্পরীতির প্রভাব সুদূর এলোরা, এলিফ্যান্টা, যবদ্বীপ, এমন কি চীনেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত-যুগের মূর্ত্তিতে যে আড়ম্বরহীনতা, যে শান্তসমাহিত দিব্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, পালযুগের ভাস্কর্য্যে তাহার অভাব হইলেও এ-যুগের মূর্ত্তিতে একটা অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য্য, সতেজ প্রকাশভঙ্গী ও রহস্যময় জীবনচাঞ্চল্য ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এ মূর্ত্তিগুলির আর এক বিশেষত্ব—এগুলির উপর তান্ত্রিক প্রভাব। শাক্ত ও সেবিকার পরিবেষ্টন, বিচিত্র করধৃত প্রহরণ ও মুদ্রা, সর্পছত্র, নাগযজ্ঞোপবীত, পাদপীঠের নীচে রহস্যময় মূর্ত্তি, কোরক ও প্রস্ফুটিত পদ্মের বাহুল্য,—এ সবই তান্ত্রিক প্রভাবের নিদর্শন। নালন্দা ম্যুজিয়মে রক্ষিত দেবপালের সময়ের একটি দ্বিবাহু অবলোকিতেশ্বরের বাম হস্তেও দেউলভিড়ার কুবেরের অনুরূপ একটি সনাল পদ্মকোরক আছে।

এক সময় বৌদ্ধ বজ্রযান প্রভাবান্বিত বঙ্গদেশে সর্ব্বভয়-নিবারণ, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, পরমকারুণিক বোধিসত্ত্ব অব-লোকিতেশ্বরের পূজা সমধিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেউলভিড়ায় অবলোকিতেশ্বর ও কুবেরের মধ্যে নটরাজ কেমন করিয়া আসিলেন? প্রথমে হয়ত ইনি ছিলেন না, পরে আসিয়া জুটিয়াছেন। মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর। সেকালের রাজারা দেবস্থাপনা করিতেন নদীতীরে। মন্দিরের এক দিকে থাকিত নদী, অপর তিন দিক থাকিত গড়বেষ্টিত। মন্দিরের নিকটেই থাকিত সায়ের বা কুণ্ড। একতেশ্বর গড়বেষ্টিত ছিল। নিকটস্থ গড়ের বনেই তার পরিচয়। অড়কষার কিনারে দেউলভিড়ার মন্দির। ইহার মাইল তিন দূরে ভূষণসোলের উত্তরে "গড়বনা" ও গড়পুকুর। কোনও কোনও জায়গায় এইরূপ গড়ঘেরা দেবস্থানের নামের সঙ্গে "গড়" কথা যুক্ত আছে, যথা অম্বিকানগরের নিকটবর্ত্তী কুমারী কিনারে "সারেঙ্গড় বা শ্রীরঙ্গগড়"। বাঁকুড়া জেলার মাত্র দুই স্থানে দ্বাদশ-বাহু অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি থাকায় মনে হয় একই রাজবংশের দুই শাখার এই দুই কীর্ত্তি। যে রাজারা দেউলভিড়ার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইন্দপুরে বা কাছাকাছি কোথাও তাঁদের রাজধানী ছিল। নিকটস্থ এক গ্রামে প্রকাণ্ড হাট বসিত, তাহাতেই "হাটগ্রাম" নাম। অপর শাখার রাজারা দ্বারকেশ্বর-তীরে বীরসিংহপুর বা একতেশ্বর গড়ে থাকিতেন। প্রবাদ আছে, এক সময় ক্ষুদিমন্বন্তরী নামে একতেশ্বরে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যবন ও হিন্দুগণকে এক পংক্তিতে ভোজন করাইয়া এক জাতি করিতে চাহিয়াছিলেন। যে-রাজা জাতিভেদ ঘুচাইতে চাহেন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হওয়াই সম্ভব। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মল্লরাজাদের সহিত একতেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কোনই সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের আবির্ভাব পরবর্ত্তী যুগে। তাঁহারা মাত্র বৌদ্ধপীঠকে শিবতীর্থে পরিণত করিয়া-ছিলেন।

এবার দেউলভিড়ায় প্রাপ্ত পাষাণ-চক্রের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। পাথরের রথচক্র এখানে কেমন করিয়া আসিল? ঠাকুরেরা তবে কি রথে চড়িতেন? বিচিত্র নয়। মেট্যালা ও দেউলভিড়ার মধ্যপথে একটি স্থানকে সেখানকার লোকে "রথঘাটা" বলে। বর্ত্তমানে সেখানে রথের নামগন্ধ নাই;—পুরাকালে রথ চলিত—তারই স্মৃতি। কত কাল আগের কথা? কার রথ? কেউ জানে না। অবলোকিতেশ্বরের রথ নয় ত? মন্দিরের ইট পুরাতন কিন্তু খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। বোধ

রয় পুরাকালে পাষাণ-মন্দির ছিল তাহা ভূমিসাৎ হওয়ায় ইটের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"দেউলভিড়া"র অর্থ দেউলের ভিটা। বহু পূর্ব্বে ঐ স্থানে কোনও প্রসিদ্ধ দেউল ছিল। বাঁকুড়া জেলায় এটি ছাড়া আরও দু-তিনটি "দেউলভিড়া" গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামেও পুরাকীর্ত্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, সকলই অনুমান মাত্র। প্রমাণ-প্রয়োগসহ ইহাদের সঠিক পরিচয় দেওয়া বা কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা লেখকের পক্ষে ধৃষ্টতা ও ও অনধিকারচর্চ্চা। বাঁকুড়াবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী অণিমা চক্রবর্ত্তী গত বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্রী।

শ্রীঅণিমা চক্রবর্ত্তী

পুস্তক পরিচয়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌, বেদান্তরত্ন। প্রকাশক—শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক গবেষণা এবং দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ এক জন অগ্রণী। গীতা, উপনিষদ প্রভৃতির গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজ ভাষায় আর কেহ লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অথচ, ভাষার সারল্যের জন্য তত্ত্বের গাম্ভীর্য্যের কোথাও কিছুমাত্র ক্ষতি তিনি করিয়াছেন, এমন কথা কখনও শুনি নাই।

আলোচ্য গ্রন্থেও হীরেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বার্জ্জিত যশঃ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না—তিনি এক জন উচ্চদরের দার্শনিকও ছিলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের আলোচনা একাধিক নিপুণ হস্ত করিয়াছেন; দার্শনিক বঙ্কিমের ভাবধারার পরিচয়ও আরও কেহ কেহ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যময় গবেষণার সারমর্ম্ম এমন সরল এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া আর কেহ উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষিকে আমরা ঋষি বলিয়াই জানি। পক্ষান্তরে, নানা কারণে সাহিত্যিক বঙ্কিমের উপর সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্বেষেরও অন্ত নাই। কিন্তু দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র জগতের দার্শনিকদের প্রাপ্য সাধারণ সম্মান সকলের নিকটই দাবী করিতে পারেন। এর ভিতর অন্য কোন অবান্তর প্রশ্নের স্থান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই একটা শ্রেষ্ঠ দিক্ সাধারণ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়া হীরেন্দ্রনাথ সমাজের একটি সময়োপযোগী হিতসাধন করিয়াছেন এবং সাহিত্যিক মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

যাঁহারা সত্যই বঙ্কিমের দার্শনিক মত কি, তাহা জানিতে চান, হীরেন্দ্রনাথের এই বই তাঁহাদের সম্বল হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদে আকৃষ্ট হইলেও শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং গীতার ধর্ম্মেই দার্শনিকের চরম লভ্য ও পরম সত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক ভাবধারার ক্রমবিকাশ হীরেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে অতি নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যে কোন পাঠক বইখানি পড়িয়া শিক্ষা এবং তৃপ্তি উভয়ই লাভ করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জন্মদিনে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১ বৈশাখ ১৩৪৮। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের এই নূতনতম কবিতার পুস্তকটিতে ২৯টি কবিতা আছে। সবগুলি পড়িয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত রস ও অনুপ্রাণনা হইতে অন্তরে কিছু আনন্দ ও শক্তি সঞ্চয় করিতে এই লেখকের অধিক সময় লাগে নাই। কিন্তু সমুদয় রস ও অনুপ্রাণনা স্বয়ং উপভোগ ও স্বাঙ্গীকার করিয়া অপরকেও তাহার অংশী করিতে হইলে, যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা ২৯টি কবিতার উপর ২৯টি ছোট বড় প্রবন্ধ লিখিত হওয়া আবশ্যক।

গল্পসল্প—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বৈশাখ, ১৩৪৮। মূল্য এক টাকা।

এই নূতনতম গল্পের বহিটিতে বত্রিশটি ছোট গল্প আছে। গোড়ায় দুটি কবিতা আছে। মধ্যাহ্নবিশ্রামের ব্যাঘাত করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছি।

প্রত্যেক গল্পের শেষে গল্পেরই অংশস্বরূপ কবিতা আছে। কবি অনেক দিন ছোট ছোট গল্প লেখেন নাই। যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মধ্যে তাঁহার গল্পের পাঠক ও শ্রোতার অভাব নাই। এগুলি আবার ছোট ছেলেমেয়েরাও পড়িবে। তিনি গোড়াতেই বলিয়াছেন:—

> আমারে পড়িছে আজ ডাক
> কথা কিছু বলতেই হবে
> বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
> পারো যদি মন দাও, তবে।
> ফিস্ ফিস্ করো যদি ব'সে,
> ঘস্ ঘস্ মেজেতে পা ঘ'ষে,
> অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত
> যেন কিছু হয় নাই থাকি এই মতো।
> গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান,
> শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।"

এই বহিখানি পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে যে ঘুমাইয়া পড়িবে, সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে বোকা কে? যিনি শুধু গল্প চান, তিনি ইহা পড়িয়া খুশি হইবেন; আর, যিনি তত্ত্ব এবং উপদেশও চান, তিনিও কিঞ্চিৎ ডুব দিলে নিরাশ হইবেন না।

ঝটিকার ঊর্দ্ধে। দ্রষ্টার চোখে—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকটির দাম দুই আনা। ১০১।১ বি, আর জি. কর রোড, কলিকাতা, নবজীবন সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত।

যাঁহারা গান্ধীজীর অনুরাগী তাঁহারা এই দুটি পুস্তিকা হইতে তাঁহার মতের সমর্থক যুক্তি পাইবেন। যাঁহারা গান্ধীবিরোধী, তাঁহাদিগকে লেখকের সব কথা খণ্ডন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকেও এই দুটি বহি পড়িতে হইবে। বিজয়বাবু যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ও হৃদয়াবেগের সহিত বক্তৃতা করেন, লেখেনও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এবং ওজস্বিনী ভাষায়।

উপনিষদের মর্ম্মবাণী—প্রথম খণ্ড (১) ঈশা উপনিষদ, (২) কেন উপনিষদ। দ্বিতীয় খণ্ড—(৩) কঠ-উপনিষদ্। প্রণেতা—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট (এক্ষণে আসাম প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর)। প্রাপ্তিস্থান: (১) শ্রীহট্টের পুস্তকালয়সমূহ, (২) শান্তিকুটীর, শিলং। মূল্য যথাক্রমে চারি আনা ও ছয় আনা।

"উপনিষদের মর্ম্মবাণী"র ভূমিকা মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। পুস্তিকা দুটি পড়িলে এই তিনখানি উপনিষদের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে, এবং তাহা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার স্বয়ং কৃতবিদ্য, ধর্ম্মপিপাসু, এবং দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকতা দীর্ঘকাল করিয়াছেন। তিনি মূল শ্লোকগুলিও দিলে ভাল হইত, যদিও অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হইতেই শ্লোকগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। তিনি বর্ত্তমান যুগের চিন্তার আলোকে ও নব্য বঙ্গের ভাষায় ঋষিদের উপলব্ধি শিক্ষিত সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

হালখাতা—(ছোটদের বার্ষিকী)। প্রথম বর্ষ, ১৩৪৮। প্রকাশক—শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅসীম দত্ত। ৪১-ডি, একডালিয়া রোড, কলিকাতা। ডিমাই আট পেজি ১৮০ পৃষ্ঠা, মোটা বোর্ডে বাঁধান, এন্টীক কাগজে সুমুদ্রিত। দাম এক টাকা।

দাম খুব কম রাখা হইয়াছে।

এই বার্ষিকীটির গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট কবিতা আছে। তা ছাড়া অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা আছে। কতকগুলি বিখ্যাত লেখকদের লেখা। কোন কোন লেখা সবটা ছোট ছেলেমেয়েরা সহজে বুঝিতে না পারিলেও বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। যতটুকু বুঝিবে তাহাতে তাহারা লাভবান্ হইবে।

তত্ত্বকৌমুদী—পাক্ষিক পত্রিকা। ১২৮৫ সালে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা। নববর্ষ সংখ্যার মূল্য চারি আনা মাত্র।

'প্রবাসী'র পুস্তকপরিচয় বিভাগে সাধারণত সাময়িক পত্রের পরিচয় দেওয়া হয় না। তত্ত্বকৌমুদী সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম করিবার অন্যতম কারণ, তত্ত্বকৌমুদী একবারও বন্ধ না হইয়া তেষট্টি বৎসর চলিতেছে এবং আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গত সুপণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস প্রভৃতির রচনা আছে। "মহাজনবাণী" প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাসের "রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন" শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইলে আধুনিক কালের ধার্ম্মিক ও সামাজিক নানাবিধ প্রচেষ্টার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত ও বিস্মৃত অংশ সাহিত্যে স্থান পাইবে। তত্ত্বকৌমুদীর এই বিশেষ সংখ্যাটিতে বিশেষভাবে পঠনীয় অনেক প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক দুটির উল্লেখ করিতেছি। একটি "শিক্ষা প্রচারে রামমোহন"। ইহার লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপর ইহা বলা আবশ্যক যে, মেকলে ও তাঁহার দল যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা রামমোহনের চেষ্টার ফলে পারিয়াছিলেন, ইহা কেম্ব্রিজ হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়াতে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীশ্রীপদ বিদ্যাভূষণের লেখা "বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর অধিকার স্থাপনে ব্রাহ্ম সমাজ"।

১। ঝুনুঝুনু, ২। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ছয় আনা।

পুস্তক দুইখানি শিশু ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। প্রত্যেকখানিতে দুইটি করিয়া গল্প ও দুইটি করিয়া কবিতা আছে। শিশুরা স্বভাবতঃই কবিতাপ্রিয়। তাহারা সাগ্রহে কবিতা কয়টি মুখস্থ করিয়া ফেলিবে। গল্পগুলি সকলই সচিত্র। ছেলেমেয়েরা গল্প পড়িয়া ও ছবি দেখিয়াও আনন্দ পাইবে। প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক।

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯+২৭১। মূল্য দুই টাকা।

সম্প্রতি আধুনিক যুদ্ধ, যুদ্ধরীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানিবার ও শুনিবার কৌতূহল খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার রীতি নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে চারি দিকে যেরূপ লড়াই বাধিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ও অজ্ঞ থাকা কোন মতেই সঙ্গত নয়। নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়ত আমরা বাধ্য, কিন্তু এরূপ পুস্তকাদি পড়িয়া এ বিষয়ে আমরা কতকটা জ্ঞানলাভ করিতে পারি, যদিও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে বেশীর ভাগই দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। বর্ত্তমানে যুদ্ধ ও যুদ্ধরীতি সম্বন্ধে যেমন আলোচনা হইতেছে, এ সম্পর্কে দুই-একখানি বইও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বইখানিতে এ বিষয়ের খানিকটা আলোচনা আছে। কিন্তু এখানি নিছক এ সম্পর্কে লিখিত পুস্তক নয়। রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ-মনোবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে ও সমর-রীতিও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লেখক তাঁহার বইয়ে এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, গত মহাযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তরকালের রণসজ্জা, বিভিন্ন দেশের সামরিক বল, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ, পঞ্চমবাহিনী প্রভৃতির বিবরণ পুস্তকখানিতে আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একটি বিশেষ অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখক 'নিবেদন'-এ লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক পাঠে জটিল সমরবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান জন্মিতে পারে; ইহা হইতে বিশেষ জ্ঞানলাভের আশা করিলে নিরাশ হইতে হইবে।" আমরাও লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। বহু চিত্রসংযোগে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

জীব-জন্তুর ঘরকন্না—শ্রীবিমল ঘোষ প্রণীত। বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৪৬ সাল। পৃঃ ৭৮। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে লেখক সরল ভাষায় জীব-জন্তুর চালচলন ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এগারখানা হাফটোন ও ততোধিক রেখাচিত্রে সুশোভিত বইখানি পড়িয়া ছেলেমেয়েরা খুশী হইবে। কিন্তু ইহাতে তথ্যাদি সম্পর্কিত কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধিত হইলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কেদার বদরী কুমাওন (উত্তরখণ্ডের ম্যাপসহ)—শ্রীবিজয়-নাথ সরকার প্রণীত, ১৯৪০। এস্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ১।১।১সি

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মূল্য এক টাকা। পৃ. ।√০+১৩৬+১ মানচিত্র।

পুস্তকখানিতে লেখক স্বীয় তীর্থযাত্রার দিনলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে যাত্রিগণের আবশ্যক দ্রব্যের তালিকা, খরচের হিসাব, তীর্থসংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহা কেদার-বদরীর যাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

নোঙরহীন নৌকা—শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাংলা দেশের পল্লীর সর্ব্বহারা দরিদ্রের কাহিনী। লেখকের সঙ্গে পল্লীগ্রামের যে পরিচয়, তাহা নিবিড়—সৌখীন ভাসাভাসা পরিচয় নহে। ফলে যে কয়টি চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহার প্রায় সবগুলিই স্পষ্ট হইয়াছে।

বইখানির প্রধান চরিত্র এক চালচুলাবিহীন নিরক্ষর যুবক, নিরাপদ। নোঙরবিহীন কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত সে জীবনসমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায় শেষ হইবে কেহ জানে না। অন্য অন্য চরিত্র, বনমালা, কাদন, সুশীলা, সবগুলিই পরিষ্কার ফুটিয়াছে।

কাহিনী অশ্রুসজল—দারিদ্র্য, অনাহার ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া গল্পটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু শেষ অস্পষ্ট। পরিণতি স্বাভাবিক কারণ নোঙরহীন নৌকার পরিণতি নিমজ্জনের আগে আর কোথাও নাই।

গ্রন্থকার সর্ব্বহারার বেদনা লইয়া গল্পরচনা করিয়াছেন, নিরন্নের দুঃখ পাঠকসাধারণকে শুনাইয়া সহানুভূতি জাগরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

রাণুর তৃতীয় ভাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিসিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। ত্রয়োদশটি হাস্যপ্রদীপ্ত ছোট গল্পে "রাণুর তৃতীয় ভাগে"র পৃষ্ঠাগুলি সমুজ্জ্বল। দু-একটিতে করুণ ও ভয়ানক রসের সমাবেশও আছে। "প্রবাসী"র পাঠকের নিকট লেখক সুপরিচিত। কথা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ স্বনামখ্যাত। তাঁহার সাবলীল সুমধুর গল্পগুলি নিজের ধারা অনুসরণ করিয়া চলে। গভীর সুরে গভীর কথা বলিবার জন্য বিভূতিবাবু ব্যস্ত নন। অথচ প্রয়োজন হইলে তেমন কথা তিনি অতি সহজে বলিয়া যান। এই স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার সুমিষ্ট রচনাকে সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিয়াছে। সরস রচনার অন্তরালে মনের গহন—পেলব কুসুমপল্লবে ঢাকা পড়ে, অতলতা অন্তর্হিত হয়। হাসির আবরণে "মধুলিড়"কে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হইলেও গল্পের লক্ষ্যভেদী পরিহাস মর্ম্মভেদী। বিভূতিবাবু সহজে এরূপ অস্ত্র ধারণ করেন না। সাধারণতঃ তাঁহার রচনা রহস্যমধুর, জ্বালাহীন কৌতুক দাহ করে না, হাস্যের প্রলেপ স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়। বিভূতিভূষণের গল্পগুলি লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মত হাসির স্বচ্ছ আলোয় কৌতুকের অনাবিল বাতাসে অনায়াসগতিতে বিচরণ করে, গভীরতার আকর্ষণে সে রচনা ভারী হইয়া উঠে না। দশচক্রে নিরীহের দুর্ভোগ যে কত উপভোগ্য হইয়া উঠে "দ্রব্যগুণ" তাহার উদাহরণ। বিহার অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক "কলতলার কাব্য"টিকে সরস ও বিচিত্র করিয়াছে। লেখকের বিশিষ্ট ভঙ্গী এবং কৌতুকোজ্জ্বল ঘটনাবিন্যাস "রাণুর তৃতীয় ভাগে"র সবকটি গল্পকেই পাঠকের নিকট আনন্দদায়ক করিয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর—এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ভারতচন্দ্রের একখানি শোভন সংস্করণের প্রয়োজন। 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত। উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত, চিত্রশোভিত বিদ্যাসুন্দরের এই সংস্করণ সেই অভাব কতকটা পূরণ করিবে। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন। লোকে সেগুলি ভুলিয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"। ভারতচন্দ্রের প্রতিভা ও রচনাকৌশল বিদ্যাসুন্দরকে নূতন রূপ দান করিয়াছে। সুমুদ্রিত সচিত্র "বিদ্যাসুন্দরে"র এই শোভন সংস্করণ সাহিত্যরসিক ও সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। ইহাতে একটি সুলিখিত ভূমিকা ও ভারতচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রূপরেখা—শ্রীবিনায়ক সান্যাল। বাঙ্গালী বুক ডিপো। ১৬ নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

সুন্দর গীতিকবিতার বই কবিতাগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মনের মাঝে যে ছবি আছে গভীর রঙে লেখা
রাখিনু তারে বালুর 'পরে ক্ষণিক 'রূপ রেখা'।"

বাঙালী মনের বালুবেলায় এ ছবি মুছিয়া যাইবে কি না জানি না, কিন্তু লীলায়িত রেখায় ছবিখানি মনোরম। প্রথম কবিতাগুচ্ছ 'গীতালি' গীতিছন্দে রচিত—মধুর, কোমল, স্বপ্নময়। দ্বিতীয় গুচ্ছ 'মনীষা'—মনীষীদের বন্দনা। তৃতীয় গুচ্ছ 'কল্পনা'—বিচিত্র কবিতার সমষ্টি। ভাবে ও ভাষায় কাব্যলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ।

কংস নদীর তীরে—শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার। চিত্রা পাবলিশিং কোং, ১৪।১, কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

"কংস নদী! গারো পাহাড় হইতে ছোট নদীটি বাহির হইয়া আসিয়াছে।" তাহারই তীরে একটি গ্রামে সীমন্তী, সুমিত, আলতাফ, ফুলকোয়ারা নামিয়াছে দেশের কাজে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহারা ছড়াইয়া দিতে চায় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। মতের পার্থক্য হয়তো তাহাদের মধ্যে আছে, কিন্তু তাহাতে কাজের ব্যাঘাত ঘটে না। ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন ধারা গল্পের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং সকল ধারা যে এক উদ্দেশ্যের অভিমুখী হইয়া চলিতে পারে তাহাও দেখান হইয়াছে। সুমিত ও সীমন্তীর প্রেম মহৎ কর্ম্মের অন্তরালে মৃদুস্রোতে বহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্বচ্ছন্দ হাসি-পরিহাস ও অবাধে একত্র ভ্রমণ আজিও বঙ্গ-পল্লীর আবেষ্টনে স্বাভাবিক হইয়া দেখা দেয় নাই। দুই-এক স্থলে একটু বেশী রং ফলানো অথবা আদর্শ প্রচারের চেষ্টা লক্ষিত হইলেও মোটের উপর উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য এবং সারগর্ভ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্তি

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের পক্ষে অপরিমেয় আনন্দ ও কল্যাণের আকর তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অশীতিতম বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে উৎসব হইয়াছে ও হইবে। আমরা এই উৎসবে যোগ দিতেছি। সকলের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি এবং ভগবচ্চরণে তাঁহার আরোগ্য ও দীর্ঘতর জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

—

বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণ্য করা হউক

রবীন্দ্রনাথের অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে এই প্রস্তাব সকল স্থান হইতে হওয়া উচিত যে, বিশ্বভারতীকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গবর্মেণ্ট গণ্য করুন। ইহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব ভারত-সরকার ইহাকে এই মর্যাদা দিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা পৃথক্ প্রকারের এবং ইহার নিজের বৈশিষ্ট্য আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া উচিত। বিশ্বভারতীকে কেন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করা উচিত এবং এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন দ্বারা গবর্মেণ্টকে কি করাইতে হইবে, তাহা "বিবিধ প্রসঙ্গে" অন্যত্র লিখিত হইল।

রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইবার ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা।

—

ভারতসচিবের বক্তৃতার সমালোচনা ও ভারতবর্ষের আত্মসম্মান

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃত্ব করেন, তাঁহাদিগকে, এবং ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে লণ্ডনস্থ ভারতসচিবের অনেক কথার সমালোচনা করিতে হয়। সেই ছয় হাজার মাইল দূরের একটি মানুষ মুখ খুলিলেন, আর আমরা লাগিয়া গেলাম তাঁহার মুখনিঃসৃত মহামূল্য বাণী হইতে "আশার কথা," "উৎসাহের কথা" সংগ্রহ করিতে; কিম্বা লাগিয়া গেলাম তাঁহার কথার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিতে। আমাদিগকে বার বার ইহা করিতে হইতেছে। আমাদিগকে ইহা যে করিতে হয়, ইহার মধ্যে নিহিত আছে ভারতবর্ষের ঘোরতম অপমান—আমাদের কাজের মধ্যে আছে ঘোরতম আত্মাবমাননা।

এক জন বিদেশী মানুষ কি বলিল, তাহা লইয়া দেশময় আলোচনা পড়িয়া গেল। অথচ নগণ্যতম ভারতীয় হইতে শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় পর্য্যন্ত কাহারও কথায় সেই মানুষের ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই যে সেই বিদেশী মানুষের শ্রীমুখ হইতে এক বার যাহা বাহির হইয়াছে, সেই এক কথার বার বার পুনরাবৃত্তি হইতেছে;—তোমরা যা-ই বল, সেই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর একটুও এদিক-ওদিক হইতেছে না। অথচ সেই বাণীর কোন অংশ হইতে মুসলিম লীগ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিতেছে ও হিন্দুমহাসভা মুষড়াইয়া পড়িতেছে, কিম্বা তাহা মুসলিম লীগের গুমসার কারণ হইতেছে এবং তাহা হইতে হিন্দুমহাসভা ভারতসচিবসোহাগী প্রতীত হইতেছে। ভারতভাগ্যশনি যদি কেহ থাকে তাহা হইলে এই সব দেখিয়া তাহার অপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ ও বাঁকা ঠোঁটে চাপা হাসি দেখা দিতেছে।

আমাদের পরাধীনতা আমাদের এই আত্মাবমাননার কারণ। আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইবার পরে ষাট বৎসর ধরিয়া এই অপমান সহ্য করিয়া আসিতেছি। খবরের কাগজে লিখিতেইছি ত পঞ্চাশ বৎসরের উপর। দুঃখ কিন্তু দূর হইল না। যাঁহারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁহাদিগকে যেন এত দীর্ঘ কাল অপমান ও দুঃখ ভোগ করিতে না-হয়, তাঁহারা যেন অনেক বৎসর স্বাধীনভারতবর্ষে জীবন-যাপন করিয়া স্বাধীন ভারতে দেহাবশেষ রাখিয়া যাইতে পারেন। আমরা বৃদ্ধেরা সে আশা করিতে পারিতেছি না।

আমাদের পূর্বজগণের ও আমাদের নিজের কর্মফলে আমাদিগকে ইংরেজ রাজপুরুষদের বহু অসত্য বাক্যের সমালোচনা চালাইয়া যাইতে হইবে। অপমানবোধে অ-বাক্ হইয়া থাকিতে পারা যাইবে না;—গান্ধীজীও পারেন নাই।

—

ভারতবর্ষ "প্রস্পারাস্" !

ভারতসচিব মিস্টার এমারি পার্লেমেণ্টে তাঁহার গত ২২শে এপ্রেলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ "প্রস্পারাস্", অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী। আমরা জানি, এ কথাটা মিথ্যা। শৈশব থেকে নিত্য দু-বেলা দেশের দারিদ্র্য দেখিয়া আসিতেছি। দেশ যে গরীব, তাহার দারিদ্র্য যে বাড়িয়া চলিতেছে, আমাদের জন্য তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। দাদাভাই নওরোজী হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক নেতা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সম্বন্ধে প্রমাণসহ অনেক কথা লিখিয়াছেন। ভারতীয় বলিয়া যদি তাঁহাদের কথা ইংরেজরা অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি বল, সেটাও কুড়ি-পচিশ বৎসর আগেকার কথা, তার পর ভারতবর্ষ খুব ধনশালী হইয়াছে, তাহা হইলে জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারি সিলেক্ট কমীটির যে রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান ভারতশাসন-আইন রচিত হইয়াছে, তাহার গোড়াতেই দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফেই যে কথাগুলি আছে, সেগুলি ত অগ্রাহ্য করা যায় না। তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "the average standard of living is low and can scarcely be compared with that of the more backward countries of Europe"; অর্থাৎ "ভারতবর্ষের লোকদের চা'ল গড়ে গরীবানা, এবং ইয়োরোপের যে-সব দেশ ধনসম্পত্তিতে অন্য দেশগুলির পশ্চাদ্বর্তী, তাহাদের সঙ্গেও ভারতীয়দের গরীবানা চা'লের তুলনা করা যায় না।" অথচ ধনশালিতায় ইয়োরোপের দেশসমূহের মধ্যে প্রথমস্থানীয় ইংলণ্ডের এক জন মন্ত্রী বলিতেছেন, ভারতবর্ষ শ্রীসম্পৎশালী! আমাদের কথা তাঁহার কানে পৌঁছিবে না। যদি পৌঁছিত, তাহা হইলেও তিনি তদনুসারে কাজ করিতেন না। তথাপি বলি, তিনি ভারতবর্ষের যে-কোন সাধারণ লোকের কুটীরে—বেশীক্ষণ নয়—এক ঘণ্টা মাটিতে কিম্বা ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়া থাকিলে এবং তাহাদের মোটা ভাত বা মোটা বাজরার রুটি খাইলে ভারতবর্ষের ধনশালিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতেন। ইহাও বলিলাম তাহাদের কথা যাহাদের কুঁড়েঘর ও কিঞ্চিৎ অন্নের সংস্থান আছে। কিন্তু অগণিত এমন লোক ভারতবর্ষে আছে, যাহাদের চালচুলা নাই, এক দিনেরও অন্নের সংস্থান নাই।

ভারতবর্ষ যে সমৃদ্ধিশালী তাহার প্রমাণস্বরূপ মিঃ এমারি ভারতবর্ষের ও প্রদেশসমূহের রাজস্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ত উত্তমরূপেই জানেন, যে, দেশের লোকদের প্রতিনিধিরা কোন বজেট, কোন ট্যাক্স, না-মঞ্জুর করিলেও তাহা না-মঞ্জুর হয় না। দেশের শাসন-কার্য নির্বাহের নিমিত্ত, দেশে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক, এই সার্টিফিকেট অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক মন্তব্য দ্বারা বড় লাট সব নামঞ্জুরকে মঞ্জুরে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের দেশের বজেটে যত কোটি টাকা আয় দেখান হয় তাহা আমাদের ধনশালিতার প্রমাণ নহে।

আর একটা প্রমাণ মিঃ এমারি এই দিয়াছেন যে, এ দেশের লোকরা যে যুদ্ধের এরোপ্লেনের নিমিত্ত পনর লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দু কোটি দশ লক্ষ টাকা দিয়াছে, তাহা শুধু রাজামহারাজা ও ধনী কারখানার মালিকেরা দেয় নাই, সাধারণ পাহারাওআলা, সিপাই ও চাষাভুষারাও দিয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তিরা কত দিয়াছে? তাহাদের মধ্যে স্বেচ্ছায় কত জন কত দিয়াছে? আমরা খবরের কাগজে এরূপ অনেক অভিযোগ দেখিয়াছি যে, মফঃস্বলে হাকিম ও পুলিস চাপ দিয়া অনেক স্থলে যুদ্ধফণ্ডে টাকা আদায় করিয়াছেন। কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি যে গত বৎসর পুণায় ২৬শে জুলাই এরূপ আদায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব ধার্য করিয়াছিলেন, মিঃ এমারিকে এখানকার রাজপুরুষেরা বোধ করি তাহা জানান নাই। সেই প্রস্তাবে ইহা উল্লিখিত ছিল, যে, এরূপ আদায় উচ্চ রাজপুরুষদের দ্বারা ঘোষিত সরকারী পলিসির বিরুদ্ধ।

এই সকল তর্ক চাপা দিয়া রাখিয়া মানিয়া লওয়া যাক যে, ভারতবর্ষের লোকেরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য এককালীন দু-কোটি দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে। ব্রিটেনের লোকেরা যুদ্ধের জন্য যত ব্যয় করিতেছে, তাহার সহিত ভারতীয়দের দেওয়া এই টাকার তুলনা করা যাক।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য প্রত্যহ কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। এখন যুদ্ধ ব্যাপকতর হইয়াছে—এসিয়ার ইরাকেও পৌঁছিয়াছে; এখন হয়ত ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয় আরও বাড়িয়াছে। তাহা না ধরিয়া ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয় রোজ কুড়ি কোটিই ধরা যাক। ব্রিটেনের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটি। পাঁচ কোটি লোক যুদ্ধের জন্য **প্রত্যহ** কুড়ি কোটি টাকা খরচ করিতেছে; আর ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোক দু-কোটি দশ লক্ষ টাকা **একবার** দিয়াছে। অতএব মিঃ এমারির মতে ভারতবর্ষের লোকেরা সমৃদ্ধিশালী!

ভারতে ঐক্য চাই, কিন্তু ব্রিটেনে অনৈক্য স্বাভাবিক !

ভারতসচিব বলিয়াছেন, যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের লোকদিগকে এই দেশের শাসনবিধি রচনা করিতে দেওয়া হইবে এবং তাহার দ্বারা তাহারা ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলির সমতুল্য রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আগে ঐক্য স্থাপিত হওয়া চাই, তবেই তাহারা নিজ দেশের শাসনবিধি রচনা করিবার ও তদনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। ব্রিটিশ সরকার এই যে ঐক্যের দাবী করিতেছেন অথচ নিজেদের দ্বারাই প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত অনৈক্যজনক ও অনৈক্যপোষক ব্যবস্থাগুলি রদ না করিয়া কায়েম রাখিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক বার অনেক কথা লিখিয়াছি। সে সমুদয়ের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য একটা কথা এখন বলি।

বিলাতের স্পেক্টেটর একটি অতি পুরাতন ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সংবাদপত্র। তাহার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্প্রতি যাহা লেখা হইয়াছে তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। আজকাল বিলাতী কাগজ এদেশে আসিতে অনেক বিলম্ব হয়। স্পেক্টেটরের বক্ষ্যমান সংখ্যাটির তারিখ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪১।

"After the war," said Mr. Attlee at Oxford last Friday, "we shall again have those healthy differences of opinion which are the life-blood of democracy." We undoubtedly shall, and it was no unreasonable prophecy when he added that we shall have Governments of various complexions facing Oppositions, as in the past. Few would imagine that the differences inherent in intelligent mankind, or even that the differences inherent in existing parties, will be obliterated because there is so large a measure of agreement about national policies during the war.

তাৎপর্য। গত শুক্রবার মিঃ অ্যাটলী (অন্যতম ব্রিটিশ মন্ত্রী) অক্সফর্ডে বলিয়াছেন, "যে-সব স্বাস্থ্যব্যঞ্জক মতভেদ গণতন্ত্রের জীবন-শোণিত, যুদ্ধের পর আবার আমাদের মধ্যে সেগুলি দেখা দিবে।" মতভেদ আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার হইবে; এবং তিনি এই যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহাও অযৌক্তিক নহে, যে, অতীতের মত আমাদের মধ্যে নানারূপধারী নানামতপোষক গবন্মেণ্টের আবির্ভাব পরে পরে হইবে এবং তাহাদিগকে বিরোধী দলসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্তমান যুদ্ধের সময় আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে এত বেশী মতের মিল আছে বলিয়া, কম লোকেই এরূপ কল্পনা করেন যে, বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবজাতির অন্তর্নিহিত চিন্তাভেদ মতভেদ অথবা এমন কি এখনকার দলগুলির অন্তর্নিহিত গরমিলগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে।

স্পেক্টেটর যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। এখন যুদ্ধের চাপে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতিতে তথাকার ভিন্ন ভিন্ন দলের মতভেদ ঢাকা পড়িয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের অবসান হইলে আবার মতভেদ দেখা দিবে। তখন যখন যে-দল প্রবল হইয়া "গবন্মেণ্ট" হইবেন, তখন তাহার বিরোধী দলও দেখা দিবে, এবং বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবসমষ্টির মধ্যে এরূপ হওয়াই ত সুস্থতার লক্ষণ। এখন যুদ্ধের মধ্যেও পার্লেমেণ্টে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে এবং লয়েড জর্জের মত বিচক্ষণ রাজনীতিকও সেদিন বলিয়াছেন, মন্ত্রিসভার আংশিক পরিবর্তন আবশ্যক।

মিঃ এমারি বার বার যাহা বলিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু ভারতবর্ষের কতকগুলি দলের মধ্যে মত-ভেদ আছে, অতএব তাহাদিগকে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতি স্বাধীনতার পথে এক পা-ও অগসর হইতে দিবেন না (যদিও উল্লিখিত মতভেদ বহুলাংশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি, ব্রিটিশ ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ প্রশ্রয় ও উৎসাহ দানের ফল)। মতভেদ ও স্বাধীনতার যদি এইরূপ স্বাভাবিক বিরোধ থাকে, তাহা হইলে মিঃ এমারিকে জিজ্ঞাসা করা যাক্, "যুদ্ধের পর যখন ব্রিটেনে মতভেদ মাথা উঁচু করিবে, তখন ব্রিটেনের স্বাধীন থাকিবার যোগ্যতা লুপ্ত হইবে, অন্ততঃ কমিবে, কি না।" —

ভারতে মতভেদ সম্বন্ধে মিঃ এমারির ভ্রম

ভারতে মতভেদ সম্বন্ধে মিঃ এমারির ধারণাটাকে ভ্রমই বলা যাক—শক্ত কথা না-ই বলা গেল।

মিঃ এমারি না জানুন, কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা সবাই জানি যে, এক জনাব জিন্না ও তাঁহার কতিপয় চেলা ছাড়া, আর সব রাজনৈতিক দল অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনতা চায়—স্বরাষ্ট্রিক স্বাধীনতা চায়। "অন্ততঃ" বলিতেছি এই জন্য যে, কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতা চায়, এবং হিন্দুমহাসভা আপাতত স্বরাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও পরে পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু এখন স্বরাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পাইলে কংগ্রেসও তদনুযায়ী শাসনবিধি চালু করিতে অস্বীকৃত হইবে না। কারণ, তাহা অপেক্ষা অনেক কম ক্ষমতা যে তথাকথিত "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" দিয়াছে, কংগ্রেস তাহাও গ্রহণ করিয়াছিল, এবং গান্ধীজী যে স্বাধীনতার সারাংশ ("সবস্ট্যান্স অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স") গ্রহণীয় মনে করেন, স্বরাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় তাহা আছে।

জনাব জিন্নার ছাড়া আর সব দলের লোকেরা যত দূর পর্য্যন্ত একমত তাহাকে ভিত্তি করিয়া মিঃ এমারি ভারতীয় নেতাদিগকে একটা শাসনবিধি রচনা করিতে আহ্বান করুন না? সম্প্রতি "মডারেট"-শ্রেষ্ঠ মহামাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এক বক্তৃতায় মিঃ এমারির বক্তৃতার

গান্ধীজীর তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "কংগ্রেসীদের জায়গা জেলের ভিতরে নহে, বাহিরে। তাঁহারা দেশশাসনের ভার লইয়া আমাদিগকে (অর্থাৎ ভারতীয়দিগকে) রক্ষা করুন।" ইহা একটা খুব বড় ঐক্যের সংবাদ। এটাও নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সরকারের কর্ণকুহরে পৌছিবে না। তাঁহারা জনাব জিন্নার মত-ভেদটাতে গুরুত্ব আরোপ করেন এই জন্য যে, ভারতবর্ষকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার একটা অছিলা তাহাতে পাওয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু সেটাকে, "কানা গোরুর ভিন্ন গোয়াল", এই বাংলা প্রবাদের একটা দৃষ্টান্তস্থল মাত্র মনে করি।

মিঃ এমারির বক্তৃতার অবাস্তবতা

মিঃ এমারির বক্তৃতাটা এত অসত্য কথায় পূর্ণ যে, সেটা অবাস্তবতার ভিত্তির উপর নির্মিত দুর্গবিশেষ বলিলেও চলে।

তিনি যে দিন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহার আগেই ঢাকার দাঙ্গা খুনাখুনি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, এবং তখনও চলিতেছিল—নোয়াখালি খুলনা প্রভৃতির উল্লেখ নাই করিলাম। আহমেদাবাদের দাঙ্গাও তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অথচ, তিনি যে-প্রদেশগুলাতে মন্ত্রিমণ্ডলের শাসন চলিয়া আসিতেছে এবং যেগুলাতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ বশতঃ গবর্ণরী শাসন চলিতেছে, সবগুলির অবস্থার এমন আভাস দিয়াছেন যেন সর্বত্র প্রবাদবাক্যের 'রামরাজ্য' বরাবর বিদ্যমান। অথচ সিন্ধুর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, পঞ্জাবের ও বঙ্গের আধুনিক ইতিহাস যে জানে সে জানে, এই সব ভূভাগে শান্তি ছিল না, শৃঙ্খলাও ছিল না, এখনও নাই। তিনি বলিয়াছেন তথাকার লোকেরা **স্বায়ত্ত** শাসন **ভোগ** করিতেছে। **স্বায়ত্ত** হউক বা না-হউক, **ভুগিতেছে** বটে, এবং অন্ততঃ বঙ্গের লোকেরা তাহা হইতে মুক্তি চাহিয়াছে। মিঃ এমারি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, গবর্ণররা যে-যে প্রদেশের শাসনভার লইয়াছেন তথাকার লোকেরা বেশ আছে। আহমেদাবাদের, বোম্বাইয়ের, বিহারশরীফের, কাণপুরের,...লোকেরা খুব ভালই আছে বটে!

মিঃ এমারি রাজপুরুষ। তিনি দাঙ্গা খুনাখুনির কথাগুলা জানিয়া থাকিলেও না বলিতে পারেন। কিন্তু পার্লেমেণ্টের যে-সব সদস্য মুখফোঁড় এবং ভারতবন্ধু বলিয়া বিদিত, তাঁহারাও এ বিষয়ে কিছু না-বলায় সন্দেহ হইতেছে যে, খবরগুলা তখনও বিলাতে পৌছায়ই নাই। জালিয়ান-ওআলাবাগের খবর চারি মাস পরে বিলাতে পৌছিয়াছিল—যদিও কোন শ্বেতাঙ্গের দিকে কোন ভারতীয় কটমট করিয়া তাকাইলেও তাহার খবরটা অবিলম্বে সে দেশে পৌছে। সত্যমিথ্যা সংবাদ প্রচার ও সত্য সংবাদ চাপা দেওয়া, উভয় কার্যে ওস্তাদি আধুনিক 'সভ্য' রাষ্ট্রের একটা লক্ষণ।

জনাব জিন্নার যাহা মত, তাহাকেই ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিজ্ঞা বলিয়া ব্যক্ত করা মিঃ এমারির বক্তৃতার আর একটা অবাস্তবিকতা। বস্তুতঃ মোমিন, অহ্‌রর, জামিয়ৎ-উল-উলেমা, শিয়া উপসম্প্রদায়, কংগ্রেসী মুসলমান, প্রভৃতি দল কোন কালেই মিঃ জিন্নার অনুবর্তী ছিলেন না। পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খানের মত অনেক মুসলমানও জিন্নাবাদী নহেন। তাঁহাদের স্বাধীন মত যত প্রকাশ পাইতেছে, মিঃ জিন্না ততই ক্ষেপিয়া যা-তা বলার মাত্রা বাড়াইয়া চলিতেছেন।

ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধিশালী দেশ বলা মিঃ এমারির আর একটা অপ্রকৃত কথা, তাহা আগেই বলিয়াছি।

তিনি বলিয়াছেন, পার্লেমেণ্টে ২২শে এপ্রিলের ভারতীয় বিতর্ক ভারতের প্রতি পার্লেমেণ্টের ভিত্তিগত ও পূর্ণ ("full fundamental") শুভ ইচ্ছার দৃষ্টান্তস্থল এবং এই শুভ ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের পলিসির তলায় বনিয়াদ রূপে অবস্থিত। এই ব্রিটিশ শুভ ইচ্ছা বাঙ্ময়। বাক্য বায়ুতরঙ্গের সমষ্টি। বায়ু আবার কয়েকটি গ্যাসের সমষ্টি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা নানা গ্যাসকে জমাট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষের প্রতি বায়ুতরঙ্গবাহিত বাঙ্ময় গুডউইল অর্থাৎ শুভ ইচ্ছাকে ঘনীভূত করিবার যদি কোন উপায় ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই শুভ ইচ্ছা ভারতবর্ষের স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসনবিধির আকার ধারণ করিতে পারিবে।

মিঃ এমারি বলিয়াছেন, ব্রিটেন ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই! "গল্পসল্প" বহিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ইরুমাসি "আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।" এমারি খুড়োও তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইরুমাসির সঙ্গে আমরাও বলি, "ও বাবা।"

অ-বাক্ হইয়া যাইবার আবেশটা কাটিয়া যাইবার পর মনে হইতেছে, মিঃ এমারি তাঁহার সহকর্মী মিঃ য়্যাটলীর সম্পাদিত "লেবার্স ওএ উইথ দি কমনওএলথ" ("Labour's way with the Commonwealth") বহিখানার

"ইণ্ডিয়া" অধ্যায়টা একবার পড়িলে স্মরণ করিতে পারিবেন, এ যাবৎ কত ব্রিটিশ প্রতিজ্ঞা ধূলিসাৎ হইয়াছে।

মিঃ এমারির আরও একটা অবাস্তবিক কথার দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গটা শেষ করি। কত আর লিখিব?

তাঁহার বক্তৃতাতে "আওয়ার ফ্যামিলি অব ফ্রী নেশ্যন্স" (আমাদের স্বাধীন জাতিসমূহের পরিবার) কথাগুলি আছে। অর্থাৎ কি না তাঁহার মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা একটা স্বাধীন জাতিসমষ্টির যৌথ পরিবার। ঠিক্ এই রকম কথা কিছু দিন আগে ব্রিটেনের বিজ্ঞপ্তি-বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর (Ministry of Information) হইতে প্রচারিত হয়। তাহার সমালোচনা করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার বিলাতী নিউ স্টেটস্‌ম্যান কাগজে যাহা লিখিয়াছিলেন, বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়ায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। বাকী অংশটাও মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে আছে। লর্ড অলিভিয়ার দেখাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকলের চেয়ে জনবহুল অংশ ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে। তদ্ভিন্ন সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সাইপ্রস দ্বীপ, ওএস্ট ইণ্ডীজ্, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মালয় উপদ্বীপ, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়ার কৃষ্ণকায় জাতিরা, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিরা এবং সিয়েরা লিয়োন স্বাধীন নহে।

"বাহির হইতে চাপান মিল টেকে না"

মিঃ এমারি দয়া করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাহির হইতে যদি কোন "মিলন" বা চুক্তি ("agreement") ভারতের বিভিন্নমতাবলম্বী দলগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইবে না—যে-শক্তি সেই মিলন চাপাইয়া দিয়াছে তাহা অন্তর্হিত হইলে মিলনও অন্তর্হিত হইবে; "(Agreement imposed by us from without cannot survive withdrawal of our power to enforce it.)" এই কারণে তিনি ভারতীয়-দিগকে আপনাদের মধ্য হইতেই মিলন উৎপন্ন করিতে বলিতেছেন।

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকের হিন্দু-মুসলমান-গঠিত আগা খাঁয়ের দল নিজেদের মধ্যে মিল করিয়া কতকগুলি অনুরোধ ব্রিটিশ সরকারকে জানাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাহার প্রত্যেকটি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যদিও জগতে অপ্রত্যাশিত কিছু কিছু কখনও কখনও ঘটিয়াছে, তথাপি ব্রিটিশ সরকার জোর করিয়া আমাদের পরস্পর যুধ্যমান দলগুলির মধ্যে মিলন চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িবেন—এ প্রকার অঘটনঘটনপটীয়সী বলিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে আমরা কখনও কল্পনা করিতে শিখি নাই। আমরা মিঃ এমারির উক্তির উল্টা পিঠটা কল্পনা করিতে পারি। আমরা বলি, আমাদের অনৈক্যের, অমিলের, যে-অংশটা বহিঃশক্তির দ্বারা চাপান, সেই বহিঃশক্তির অন্তর্দ্ধানে অমিলের সেই অংশটাও অন্তর্হিত হইবে।

ভারতসচিব ও কংগ্রেস

ভারতসচিব কংগ্রেস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছেন। তাহা ভারতবর্ষের সমুদয় খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। গান্ধীজীর কেবল দু-একটি কথার এখানে পুনরুল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটেনের দ্বারা ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপনের অহঙ্কার মিঃ এমারি করিয়াছেন; কিন্তু ঢাকা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল? শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল কি? কতকগুলা গুণ্ডার ভয়ে হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইতেছে, ইহা যে-কোন গবন্মেণ্টের পক্ষে লজ্জার বিষয়। আত্মরক্ষা করিতে শিখান ও সমর্থ করা প্রত্যেক গবন্মেণ্টের প্রথম কর্তব্য। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যদি এই কর্তব্য করিতেন, যদি ভারতবর্ষের লোকদিগকে নিরস্ত্র না করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতেন এবং তাহাদের বন্ধুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে ইয়োরোপের কোন জাতি ব্রিটেনকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না।

এই সমস্ত কথাই সত্য।

মিঃ এমারি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের মনের ভাবটা এই যে, তাহার দাবী যতটা সবটা যদি পায় ত লইবে, নতুবা কিছুই লইবে না। মহাত্মাজী তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, ইহা কি সত্য কথা? কংগ্রেস পুণা-প্রস্তাব অনুসারে কেবল বড়লাটের শাসন-পরিষদের পুনর্গঠন দ্বারা "জাতীয়" গবন্মেণ্ট চাহিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীনতা চায় নাই। ইহার মানে কি, হয় সবটা লইব নতুবা কিছুই লইব না? মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "কংগ্রেস যখন বোম্বাইয়ে তাহার পুণা-প্রস্তাব নাকচ করে, তখন আমি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহার ক্ষমতার অধিকারী রূপে বলিয়াছিলাম, ব্রিটিশ

গবর্ন্মেণ্ট এইক্ষণে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না, অতএব আপাততঃ আমাদের কথা বলিবার ও লিখিবার পূর্ণ স্বাধীনতাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।” ইহার মানে কি, “সবটা দাও নইলে কিছু নেব না?” কংগ্রেস যে গবর্ন্মেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া নিজের সংযমের পরিচয় দিয়াছে, মিঃ এমারি তাহা স্বীকার না করিয়া কংগ্রেসকে বিদ্রূপ করিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহে দেশের লোকে আগ্রহের সহিত যোগ দেয় নাই।

ইহা খুবই সত্য কথা যে, গান্ধীজীর ইঙ্গিত মাত্রেই যে-কোন দিন হাজার হাজার লোক সত্যাগ্রহ করিত—তিনিই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যাপকতা লাভে বাধা দিয়া রাখিয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া গেলে সকল দলের লোকেরা বুঝিবে যে, ঐক্য স্থাপনের দ্বারাই তাহাদের সকলের স্বার্থসিদ্ধি হইবে। “হইতে পারে যে, সেই সুবুদ্ধি ও সেই সু-অবস্থায় পৌঁছিবার আগে আমাদিগকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য না লওয়াই স্থির করি, তাহা হইলে এই অন্তর্যুদ্ধটা হয়ত দিন চৌদ্দর বেশী স্থায়ী হইবে না এবং ইয়োরোপে এক দিনে যত মাথা ভাঙা হইতেছে মোট তত প্রাণহানিও ভারতে হইবে না—এবং তাহা সোজা এই কারণটার জন্যে যে ব্রিটিশ শাসনের কৃপায় আমরা অস্ত্রহীন।”

বোম্বাইয়ে নেতাদের কন্‌ফারেন্স

বোম্বাইয়ে দলবিশেষের সম্পর্কহীন ভাবে নেতাদের যে কন্‌ফারেন্স গত মাসে হইয়াছিল, মিঃ এমারি তাহারও সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ কন্‌ফারেন্সের যে স্টাণ্ডিং (স্থায়ী) কমীটি আছে, তাহার সভ্যেরা এলাহাবাদে মিলিত হইয়া ভারতসচিবের সমালোচনার দফা দফা এমন যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়াছেন যে, সত্যবাদিতার সহিত তাহার প্রত্যুত্তর দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বস্তুতঃ ভারতসচিবকে যদি এই স্টাণ্ডিং কমীটির সম্মুখীন হইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষের কাহাকেও বা সকলকেই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না;—তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে এত দিন কবে আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়া যাইত।

সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর জবাব

বোম্বাইয়ের পূর্বোক্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন এলাহাবাদের সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু। কন্‌ফারেন্সের স্টাণ্ডিং কমীটির জবাব ছাড়া তিনি তাঁহার একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খুব বিচক্ষণ এবং মেজাজকে সর্বদা নিজের বশে রাখিতে অভ্যস্ত। এমন লোকের বিবৃতি হইতেও বুঝা যায়, মিঃ এমারির বক্তৃতায় তাঁহারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে ও তিনি চটিয়াছেন। মিঃ এমারি বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের নেতাদিগকে মুরুব্বিয়ানা চা'লে বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চালাইতে থাকেন। সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য বুঝেন এবং কাহারও মুরুব্বিয়ানা বা উৎসাহের প্রত্যাশা না রাখিয়া তাহা করিবেন বিশেষতঃ সেই রকম লোকদের উৎসাহ যাহারা নিজে ঐক্য স্থাপনের জন্য কিছু করে নাই ও করিবে না। মিঃ এমারি একটা কেন্দ্রীয় দল গঠন করিবার পরামর্শ নেতাদিগকে দিয়াছেন। সে বিষয়ে সর্ তেজবাহাদুর বলিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা গঠিত হইলেও তাহার পরামর্শও ত ব্রিটিশ সরকার কোন একটা অছিলায় অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

সর্ তেজ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মিঃ এমারি তাঁহার বক্তৃতাগুলির দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ জাতির সদুদ্দেশ্যে ভারতীয়দের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিতেছেন কি?

এই বিশ্বাস কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বাকী থাকিলে ত দৃঢ়তর হইবে? সর্ তেজবাহাদুরের অন্তরে এখনও এই বিশ্বাস কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আছে কি না, জানি না। অন্য কেহ বলেন নাই যে, তাঁহার মনে একটুও আছে।

“সভ্যতার সংকট”

ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার উপর এক সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের ১লা বৈশাখের “সভ্যতার সংকট” নামক অভিভাষণে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিশ্বাস যে নষ্ট হইয়াছে এবং কেমন করিয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহাও অভিভাষণটিতে আছে। তিনি বলিয়াছেন, “আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।”

দাদাভাই নওরোজী তাঁহার দীর্ঘ জীবন ভরিয়া ইংরেজ জাতির ন্যায়বুদ্ধির প্রতি আবেদন ("appeal to the sense of justice of the British nation") করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর আশাভঙ্গের দিনের জন্য তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের সেই দুঃখকর দিন আসা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি প্রথমতঃ যে আকারে লিখিত ও দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতন কিছু বাক্যও ইহাতে যোগ করিয়াছেন। "প্রবাসী"র এই সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ভাষণ। ইহা আলাদা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বিক্রীর জন্য রাখা হইয়াছে।

ইহার যে ইংরেজী অনুবাদ "Crisis of Civilization" নাম দিয়া দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, কবি তাহারও সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পাঠ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে তাহাও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে কিনিতে পাওয়া যায়।

—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "গীতালি"র গান

রবীন্দ্রনাথের গান শিখাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় "গীতালি" নামক একটি সমিতি আছে। তাহার কার্যস্থান ৯০ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট্। ইহা গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়। তাহার কিছু কাল পূর্বে কবি স্বয়ং "বিচিত্রা" ভবনে তাহার উদ্বোধন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজের গান সম্বন্ধে কিছু বলেন। তার মধ্যে তাঁহার এই একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল যে অনেক সময় স্বরচিত সঙ্গীত পরের মুখে শুনিয়া তিনি নিজের গান বলিয়া চিনিতেই পারেন না। সম্প্রতি কবির অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে "গীতালি" যে রবীন্দ্র-গীতোৎসব করিয়াছেন, তাহাতে গীত গানগুলি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে :—

"কবিবরের এই অভিযোগের নিষ্পত্তি, অর্থাৎ তাঁর গান যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে শেখাবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ গীতালির প্রতিষ্ঠা। এই পথে বাধাবিঘ্ন অনেক তা' যাঁরা এ কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন। কারণ মুখে মুখে গান রচনার ও শেখাবার পদ্ধতি এ দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত থাকায়, কোন এক স্বরলিপিকে অভ্রান্ত বলে' প্রতিপন্ন করা কঠিন। কবির নিজের দেওয়া সুরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে চরম নিষ্পত্তি তাঁর নিজেরই করবার কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে শুচিধর কোনকালেই নন; সুর রচনা করেই খালাস।

"ইতিপূর্বে তাঁর গানের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের উপর তাঁর সুর লিপিবদ্ধ করবার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। এবং এই অফুরন্ত গানের অধিকাংশ সম্বন্ধেই দিনেন্দ্রনাথ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে' গেছেন। তথাপি যেখানে বিবাদের কারণ রয়ে গেছে, যে গান লিপিবদ্ধ করা বাকি আছে, বা নতুন যে গান এখনো রচিত হচ্ছে—সে-সব সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্তগণ তাঁদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করবেন না, এ আশা করা যেতে পারে না কি?

"সেই রকম সঙ্গীতভক্তের একটি কেন্দ্র হওয়াই গীতালির অন্যতম লক্ষ্য। আমরা উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা করেছি এবং কবিবরের নূতনতম সঙ্গীত শেখবার ও শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার আশা রাখি। বলা বাহুল্য, সাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন এ রকম প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়, উন্নতি ত দূরের কথা। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান বোধ হয় কলকাতা সহরে এইটিই প্রথম।"

"গীতালি"র মত একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মফঃস্বলেও যাঁহারা শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করিয়া শিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এইরূপ গান শিখাইবার কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের নানা রকমের শত শত গান যে, বাংলা দেশকে তাঁহার কত বড় দান, তাহা একটু চিন্তা করিলে কিছু বুঝা যায়। ইয়োরোপে সকলের চেয়ে বেশী গান লিখিয়া গিয়াছেন জার্মেনীর শুবার্ট (Schubert)। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা ছয় শত। রবীন্দ্র নাথের রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাহা বাড়িয়া চলিতেছে। তৎসমুদয়ের ভাবের বৈচিত্র্য, গভীরতা, ও সূক্ষ্মতা অসাধারণ। ঠিক্ সুরে গাওয়া না হইলে গানগুলির রস অনুভূত হয় না এবং তাহা হইতে যে অনুপ্রাণনা পাইবার কথা, তাহা পাওয়া যায় না। বিকৃত সুরে গাওয়া গান শুনিলে বিরক্তিই জন্মে—যেমন নানা স্থানে "বন্দে মাতরম্" গানের ভেংচান শুনিবার দুঃখকর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

সাধারণ লোকদের জন্য রবীন্দ্র গীত-সভা

অন্যতম ভূতপূর্ব ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের ভারত-ভ্রমণের বিবরণে এক জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাংলা দেশের এক জায়গায় গ্রাম্য লোকদের একটি মজলিসে গান বেশ জমিতেছিল না, কিন্তু এক জন একটি গান ধরায় বেশ জমাট ভাব আসিল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সেটি রবীন্দ্রনাথের গান।

ইহা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত জ্ঞান এবং মননশীলতা ও ভাবুকতা আবশ্যক। কিন্তু সেই সকল গানের কথা সম্যক্ রূপে বুঝিতে না পারিলেও ঠিক্ সুরে গাওয়া হইলে সেগুলি "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে।

এরূপ গান ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার অন্য এরূপ গানও বিস্তর আছে যাহার কথা ও সুর উভয়ই নিরক্ষর লোকদের পর্যন্ত বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কোন কোন গান ত ঠিক্ চাষীদের জন্যই রচিত। যেমন, "আমরা চাষ করি আনন্দে", "ফিরে চল্ মাটীর পানে", ইত্যাদি।

সেকালে আমাদের যে সব যাত্রার পালা ছিল, তাহাদের অনেক গানে দুরূহ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বও থাকিত। সেগুলি যে নিরক্ষর শ্রোতারা মোটেই বুঝিতে পারিত না, এমন নয়।

২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে "গীতালি"র মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-গীতোৎসব উপভোগ করিবার পর আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহার যে গানের ভোজ তাহা কেবল শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একচেটিয়া থাকা উচিত নহে। তিনি গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও শ্রী ফিরাইয়া আনিয়া সেগুলিকে আনন্দমুখরিত করিবার নিমিত্ত শ্রীনিকেতন স্থাপন করিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোকদের জন্য তাঁহার যে প্রাণের টান, তাহা কত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখনও তাঁহার রচনায় দেখা দিতেছে। তাঁহার খুব আধুনিক কবিতাগুলির মধ্যে "ঐকতান" নামক তাঁহার যে-কবিতাটি গত ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা **"জন্মদিনে"** নামক সদ্যঃপ্রকাশিত পুস্তকে আছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন :—

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল;—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা,
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তাঁরি খোঁজে।

সেই কবির আবাহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

এসো কবি, অখ্যাত জনের,
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ, সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

আমাদের আবেদন এই, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান জানেন, তাঁহারা এই দেশের "গানহীন" "নিরানন্দ" গ্রামে সাধারণ লোকদের মধ্যে তাঁহার গানগুলিকে "সর্বত্রগামী" করুন। তিনি যে তাহাদের কত দরদী, তাহা অনুভূত হউক গানগুলির দ্বারা। গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলির নিমিত্ত এই চেষ্টা বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা করিয়া এই আকারে তাঁহারা কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করুন। তাঁহারা আরম্ভ করিলে কাজটি অন্যত্রও প্রসার লাভ করিবে।

—

রবীন্দ্রনাথ ও মণিপুরী নৃত্য

এই মাসের "প্রবাসী"তে একটি প্রবন্ধে মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে ছবি ও মণিপুরী নৃত্যের কিছু বর্ণনা আছে। ঘটনাক্রমে

রবীন্দ্রনাথের অশীতিপূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয়

ফোটো—শ্রীরামনারায়ণ সিংহ
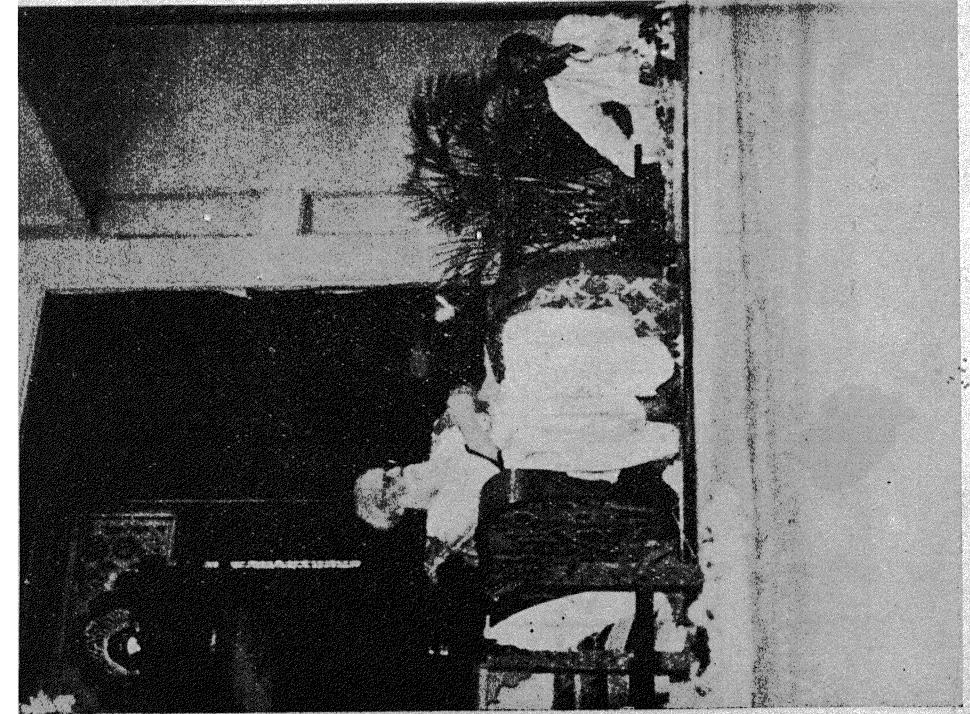
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ
শ্রীরামনারায়ণ সিংহ কর্তৃক ১লা বৈশাখ গৃহীত চিত্র

সূর্য্যোদয়
ফোটো—শ্রীসুশীলবন্ধু ভট্টাচার্য্য

আমাদের হাতে একটি চিঠি আজ ২৬শে বৈশাখ আসিয়াছে যাহাতে রবীন্দ্রনাথের মণিপুরী নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবার কিছু বৃত্তান্ত আছে।

বঙ্গের নানা স্থানে যেমন রবীন্দ্র-জয়ন্তী হইতেছে, শ্রীহট্টেও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে। সেখানে "বাণীচক্র" সাহিত্যসংসদ নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে রীতিমত সাহিত্যচর্চা হইয়া থাকে। তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র (তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে) আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অভিনন্দন-পত্র এবং কবির সঙ্গে আমার আলাপের অংশবিশেষ একত্রে ছাপাইয়া সভায় বিতরণ করা হয়। এই চিঠির সঙ্গে তাহা পাঠাইলাম।" ১৩৪২ সালের শেষের দিকে কলিকাতায় কবির সহিত উহাঁর কিছু কথাবার্তা হয়। তাহার মুদ্রিত অংশটি নীচে দিলাম। কবির জীবনের যাহা কিছু তথ্য যেখানে পাওয়া যায়, সমস্তই সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ আগ্রহ সহকারে কবি জিজ্ঞেস করলেন, "মণিপুরের নৃত্যকলা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে?"

বললাম—"অভিজ্ঞতা কিছুটা আছে, খাস মণিপুর রাজ্যেই আমি মণিপুরী কুমারীদের রাসনৃত্য দেখেছি; কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার রাত্রে। সেদিন এই অপূর্ব-মনোহর নৃত্যকলা দেখে আমার মনে হয়েছিল এ যেন যথার্থই "সঙ্গীতে" ও "ভঙ্গীতে" জীবনদেবতার চরণমূলে আত্মনিবেদন।"

"তুমি কি নিজে নাচ শিখেচ" কবি প্রশ্ন করলেন।

"না, সে সুযোগ আমার হয় নি, আর এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা কতটুকু সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

আমার কথা শুনে কবি মৃদু হেসে খানিক পরে বললেন—"তুমি তো সিলেট থেকে আসচ? চৌদ্দ পোনের বছর আগে যখন সিলেটে যাই, তখন প্রথম দেখেছিলাম মণিপুরী নাচ, সেই নাচ আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর কল্পলোকে, মনে জেগেছিল নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনা। সে যেন আমার মনকে পেয়ে বসেছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৬ সন থেকে ১৩৩৬ সন, এই দশ বছরের মধ্যে তিন তিন বারে সবসুদ্ধ ছয় জন নৃত্যশিক্ষককে আনিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সম্প্রতি আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক নবকুমার। "নটরাজের অভিনয়ে প্রথম সংযোজনা করলুম একটু অদল বদল করে মণিপুরী নাচ। নৃত্য-নাট্যের একটা বিশেষ রস আছে যা..."

দেশী রাজ্যের দ্বারা পুণ্যকর্ম

"দেশী রাজ্যের দ্বারা পুণ্যকর্ম" নাম দিয়া কিছু লিখিতে গিয়াই মনে হইল, নামটার মধ্যেই যেন এই কথাটা উহ্য রহিয়াছে যে ভাল যাহা কিছু হয় তাহা বিদেশী রাজ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের অধীন অংশে, দেশী রাজ্যে সেরূপ কিছু হওয়াটা ব্যতিক্রমস্থল। এইরূপ চিন্তাও অপমানকর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ভারতবর্ষের অনেক দেশী রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও শাসনকার্য ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা বাস্তবিকই নিকৃষ্ট। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কোন কোন বিষয়ে অনেক দেশী রাজ্য ব্রিটিশ-শাসিত ভারত অপেক্ষা উন্নত ও অগ্রসর।

উড়িষ্যার কোন কোন দেশী রাজ্য হইতে অত্যাচরিত প্রজারা পলাইয়া আসিয়া ব্রিটিশ-শাসিত উড়িষ্যায় আশ্রয় লইয়াছিল, ইহা বেশী দিনের কথা নয়। তখন ব্রিটিশ উড়িষ্যা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত হইত।

বাংলা দেশও মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত, কিন্তু ইহারা কংগ্রেসী মন্ত্রী নহেন। এখানে উড়িষ্যার ঠিক বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। এখানে ঢাকা শহর ও জেলায় দাঙ্গা খুনাখুনি ও লুটতরাজ হওয়ায় হাজার হাজার লোক পলাইয়া দেশী রাজ্য স্বাধীন ত্রিপুরায় আশ্রয় লইয়াছিল—এখনও হয়ত অনেক হাজার বিপন্ন পলাতক লোক সেখানে আছে। এই অনেক হাজার লোককে ত্রিপুরার মহারাজা মহাশয় আশ্রয় দিয়া এবং খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নৃপতির যোগ্য কাজ করিয়াছেন।

তাই ভাবিতেছিলাম, ত্রিপুরা রাজ্যটি না থাকিলে এই হাজার হাজার বিপন্ন লোকদের কি দশা হইত। যদি বলেন, তাহারা অন্যান্য ব্রিটিশ-শাসিত জেলায় যাইত। কিন্তু সেখানেও যে গুণ্ডারাজের আবির্ভাব হইত না, তাহার প্রমাণ কি? ব্রিটিশ-শাসিত কোন কোন অঞ্চলে ত দেখিতেছি, এক জায়গার অরাজকতা অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথবা, কি হইলে কি হইতে পারিত, সে বিষয়ে কল্পনা জল্পনার আবশ্যক কি? যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, অনেক হাজার লোক ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের অংশবিশেষে গুণ্ডারাজের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং সেখানে ব্রিটানিকী শান্তি (Pax Britannica) তাহাদিগকে অভয় দিতে ও রক্ষা করিতে না পারায়, একটি দেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইল ও পাইল; ঢাকার অরাজকতার সংক্রামকতা সেখানে পৌঁছিল না। একটি ছোট দেশী রাজ্যের দ্বারা অন্ততঃ এই উপকারটি হইল। অতএব, কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা দেশী রাজ্য মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত তাঁহারা আশা করি তাহাদের উপর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশংসার বিষয়

স্বাধীন ত্রিপুরার যাহা কিছু প্রশংসার বিষয়, তাহার সব

কথা এখানে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি না। কেবল ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যাহা বলা যায়, তাহাই বলিব। •

ত্রিপুরার নৃপতিরা বহুদিন হইতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাংলা সাহিত্যকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। ইহা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু ইহা ত অনেক জমিদার ও অন্য ধনী লোকও করিয়া থাকেন। ত্রিপুরার বিশেষত্ব এই যে, এই রাজ্য অধিকন্তু বাংলা ভাষাকে রাজভাষার মর্যাদা দিয়াছে। এখানকার সমুদয় সরকারী কাজ বাংলায় হয়, বার্ষিক শাসনবিবরণ বাংলায় লেখা ও ছাপা হয়, সেন্সস রিপোর্ট পর্যন্ত বাংলায় লেখা ও ছাপা হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে যে, বাংলা ভাষাতে কেবল যে সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে তাহা নহে, সকল রকম রাজকার্যও বাংলায় হইতে পারে।

যাঁহারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন যে, বাংলায় কেবল যে, আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রিক কার্যও নির্বাহিত হইতেছে।

—

ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বিশেষত্ব তাহার নিম্ন-মুদ্রিত বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

আগরতলা, ৮ই মে

আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে মহা সমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী দরবারের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর চীফ সেক্রেটারী এই উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুরের "রোবকারি" অর্থাৎ ঘোষণাবাণী পাঠ করেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'ভারত-ভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করা হইল এবং প্রার্থনা শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

ত্রিপুরা দরবারের ঘোষণা বাণী

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত;—

যেহেতু মর্ত্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—'মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্' ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃ-প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়—তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরা-রাজের কর্ত্তব্য—"জ্যোৎস্না ভরাহত মহদ্ধ্দয়াঙ্ককারম্"—অতএব এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে "ভারত-ভাস্কর" আখ্যায় ভূষিত করা যায়;—এবং শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

বর্তমান মহারাজের খুল্লতাত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র-কিশোর এই উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে "ত্রিপুরা রাজ্য ও রাজপরিবারের সহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার বিষয় উল্লেখ করেন এবং কবিগুরুর নিজের রচনা হইতে ঐ সম্পর্কে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন।" তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত ইয়োরোপের যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে স্থানীয় সর্বসাধারণের দ্বারা কবির অলোকসামান্য সম্বর্দ্ধনার বিষয়ও বর্ণনা করেন।

—

নিখিলভারত রেডিও ও বাংলা ভাষা

নিখিলভারত রেডিওর (All-India Radio's) ধ্বনি-প্রেরণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাংলার বাহিরের প্রধান কোন কোনটি হইতে যাহাতে বাংলা গান, বাংলা বক্তৃতা প্রভৃতিও ছড়ান হয়, এইরূপ অনুরোধ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জামশেদপুর অধিবেশনে নিখিলভারত রেডিওর কর্তৃপক্ষকে করা হয়। সেই আবেদনের উত্তর প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি বা সম্পাদক এলাহাবাদে এ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন কি না, জানি না। এইরূপ অনুরোধ কলিকাতা-স্থিত নিখিলভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিস্তার সমিতিও করিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিউ দিল্লীস্থিত রেডিও আফিস হইতে সম্প্রতি জবাব পাইয়াছেন। জবাবটা হইতেছে, তাঁহারা কিছু করিবেন না। যে যে কারণ দেখান হইয়াছে, তাহা বাজে। বলা হইয়াছে, মধ্যপ্রদেশে (C. P.তে) কোন ধ্বনিবিস্তার কেন্দ্র নাই। আচ্ছা, সেখান হইতে কিছু হইবে না বুঝিলাম। কিন্তু বিহারে, যুক্তপ্রদেশে এবং

প্রদেশে ত কোথাও না কোথাও আছে। সেই সব কেন্দ্র বা স্টেশন হইতে কেন হইবে না? বলা হইয়াছে, প্রোগ্রামে বাংলা কিছু থাকিলে অন্য ভাষা-ভাষীরাও দাবী করিবে;—যেন অন্য যে-কোন ভারতীয় ভাষার প্রসার ও উৎকর্ষ বাংলা ভাষার সমান। কিন্তু আমরা ত বলিতেছি না যে, মান্দ্রাজ হইতে বাংলা গান ও বক্তৃতা ছড়ান হউক। আমরা বলিতেছি, যে-যে প্রদেশের শহরে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্ বাঙালী অনেক আছেন যাঁহারা রেডিও যন্ত্রের মালিক, সেই সেই প্রদেশের কেন্দ্র হইতে বাংলা গান ও বক্তৃতা ছড়ান হউক। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা যেরূপ, সেইরূপ মর্যাদা অবাঙালী অন্য যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায় কিছু করাইবার দাবী করুন না। তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। অবাঙালীরাও অনেক বাংলা গান শুনিতে ভাল বাসেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার গান ও কবিতার আবৃত্তি ইয়োরোপেও করিতে হইয়াছিল। তাঁহার, "যদি তোর ডাক শুনে কেও না আসে, তবে একলা চল রে," অমরাবতীর মহারাষ্ট্রীয় হনুমান ব্যায়ামমণ্ডল ইয়োরোপেও গাইয়াছিলেন।

নিউ দিল্লীর রেডিও কর্তৃপক্ষের জবাবে আছে যে, প্রত্যেক কেন্দ্রের প্রোগ্রামে তথাকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক (linguistic and cultural) অবস্থা প্রতিধ্বনিত হয়। ভাল কথা। কিন্তু কলিকাতা ও ঢাকাতে হিন্দুস্থানী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক এমন কি আছে, যাহার সমতুল্য বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কিছু পাটনায়, এলাহাবাদে, লক্ষ্ণৌতে, দিল্লীতে ও নিউ দিল্লীতে—বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী প্রদেশে—নাই। বাংলা দেশের কেন্দ্র হইতে যদি হিন্দুস্থানী কিছু ছড়ান হয়, তাহা হইলে উত্তর-ভারতের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে সেই কারণে বাংলা কিছুও ছড়ান উচিত, ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

বাংলা দেশের বাঙালীদের সাহিত্যিক ও অন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ও শিক্ষিত বাঙালীদের এবং বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের—বিশেষ করিয়া বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী প্রদেশের বাঙালীদের—নিখিলভারত রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করা কর্তব্য। নিখিলভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিস্তার সমিতি যে জবাব পাইয়াছেন, তাহাতেই নিরস্ত হইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। জবাবের যুক্তিগুলা খণ্ডন করিয়া আবার চিঠি লেখা হউক। এই সমিতির সভাপতি সুপণ্ডিত ব্যবহারাজীব শৌরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তিনি অনায়াসে কুযুক্তিজাল ছিন্ন করিতে পারিবেন।

—

রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"র প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্রের উল্টা পিঠে এই কয়টি পংক্তি মুদ্রিত আছে:—

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
দেখো না আমায় বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।
* * *
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।"

বড় বড় কবির বড় বড় কাব্যে যে তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। তাঁহারাই আবার কেহ কেহ ছোট ছোট গীতি-কবিতায় বা অন্য ছোট কবিতায় আত্মগোপন করেন না, বরং আত্মপ্রকাশই করেন বলা যাইতে পারে। সেগুলির মধ্যে তাঁহাদের অন্তর্জীবনের সন্ধান ও ইতিহাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি যে-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্জীবনের পরিচয় ব্যতীত কোন কোনটিতে তাঁহার বহির্জীবনের কোন কোন ঘটনাও আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন, "জন্মদিনে" গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটিতে—

"বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্ররূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।" ইত্যাদি

ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয় কবিতায় আছে—

"একদা গিয়েছি চিন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে।" ইত্যাদি

ষষ্ঠ কবিতাটিতে আছে—

"কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনি।" ইত্যাদি।

সপ্তমটিতে—

"অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।" ইত্যাদি।

অষ্টমটিতে—

"আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি'
প্রিয়মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ';
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।"

উনবিংশ কবিতাটি তাঁহার বাল্যকালের আত্মচরিতের একটি অধ্যায়—তাহাতে ছবির পর ছবি, কত ছবি।

এই সকল কবিতাতে কবির বাহ্য জীবনের যে সব ঘটনার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহাই কবিতাগুলির প্রধান বস্তু নহে। সেই সব ঘটনার দিনে ও উপলক্ষ্যে কবি অন্তরে যে সত্য, ভাব, চিন্তা, রস পাইয়াছিলেন, তাহাই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত রত্ন।

অষ্টাবিংশ কবিতার গোড়াতেই তিনি বলিতেছেন, "নদীর পালিত এই জীবন আমার।" ইহার আভ্যন্তরীণ অর্থ কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝা যায়, কিন্তু ইহা তাঁহার বহির্জীবনেরও সত্য বর্ণনা। তিনি এক বার কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি নিজেকে গাঙ্গেয় ব'লে থাকি।"

একবিংশ কবিতাটিতে যুধ্যমান পৃথিবীর ভীষণ ও বীভৎস চিত্রের পরে কবির আশা—তপস্বীবেশী মহামানবের আগমনের আশা—প্রকাশ পাইয়াছে।

"সভ্যতার সংকট" ভাষণে দেশের দারিদ্র্যে কবির যে মর্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বাবিংশ কবিতাটিতেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

—

"গল্পসল্প" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অনেক কবিতাতেই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে, গদ্য কাব্যেও পাওয়া যাইতেছে। যেমন "গল্পসল্প" গ্রন্থটিতে। ইহার সহজ সরল ভাষা ইহার অসাধারণত্ব ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একটি ইংরেজী বাক্য আছে, শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে আর্টকে গোপন করা। কবি তাঁর পদ্য ও গদ্য উভয় কাব্যেরই ভাষা কত সরল সুন্দর অনাড়ম্বর করিয়াছেন কত নৈপুণ্যে ও কত পরিশ্রমে, তাহা "গল্পসল্প" বহির মত বহি পড়িবার সময় মনে হয় না।

ইহার ভাষা যে শুধু ইহার জন্য তাঁহার পরিশ্রম এবং শব্দচয়ন ও শব্দগ্রন্থন কলাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে তিনি যে সোজা কথায় 'ছেলেমানুষি' গল্পের মধ্যে অনেক মহৎ সত্য নিহিত করিয়াছেন, তাহাও ইহার ভাষা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

বড় বড় উপদেষ্টারা বলিয়াছেন, মানুষের মহত্ত্ব ও সাধুতা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব দেশেই পাওয়া যায়। কবি এই সত্যটি সোজা দুই ছত্র কবিতায় বলিয়াছেন,—

"আর শোনো, ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।"

অতি বড় গণতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরাও প্রত্যেক মানুষের অসাধারণত্ব, খুব নগণ্য মানুষেরও অসাধারণত্ব, এমন পরিষ্কার ভাষায় বলিতে পারেন নাই যেমন কবি বলিয়াছেন "গল্পসল্পে"র নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে :—

"বিধাতা লক্ষ কোটি মানুষ বানিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন।"

এই রকম আরও কত বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

কিন্তু আমরা যাহা বলিব বলিয়া এই প্রসঙ্গটার উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা হইতে দূরে আসিয়া পড়িলাম। তাহা এখন বলি।

"গল্পসল্প" বহিতে কবির কিছু কিছু আত্মজীবনস্মৃতি আত্মগোপন করিয়া আছে; যেমন মুনশীর গল্পে, ম্যাজিসিয়ানের গল্পে, গোলাবাড়ির কথাতে, সাতমহল রাজবাড়ির কথায়,...।

—

বিশ্বভারতীর স্বাতন্ত্র্য কেন আবশ্যক

এবারকার বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়ার দিকে বলিয়াছি, বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া সরকারীভাবে মানিয়া লইয়া তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। কেন আবশ্যক, তাহার কিছু আভাস দিতেছি।

এখন বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের ও কলেজ বিভাগের কাজ বহু পরিমাণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসারে ও ফরমাশ মাফিক চালাইতে হয়। তাহার বিদ্যাভবনের (গবেষণা বিভাগের) কাজ অবশ্য স্বাধীন ভাবে চলে; কলাভবন, সংগীতভবন ও শ্রীনিকেতনের কাজও তাই। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়ে। কবির যে নিজস্ব শিক্ষার আদর্শ, তদনুসারে শিক্ষা তাহারা বেশি পায় না। তদ্ভিন্ন, পাঠভবন (বিদ্যালয়), শিক্ষাভবন (কলেজ), বিদ্যাভবন (গবেষণা বিভাগ), চৈনিক সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামিক সংস্কৃতি বিভাগ, কলাভবন, সংগীতভবন, শিক্ষাসত্র, কারুশিল্প বিভাগ, গ্রামোন্নয়ন বিভাগ,—ইহাদের কাজ এখন যেমন অনেকটা বা কতকটা পরস্পরবিচ্ছিন্ন

ভাবে হয়, কবির অখণ্ড শিক্ষা-পরিকল্পনায় তাহাদের স্থান সেরূপ পৃথক্ পৃথক্ নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তাঁহার সমগ্র পরিকল্পনাটিকে তাঁহার আদর্শ অনুসারে বাস্তব রূপ দিতে হইলে, বিশ্বভারতীকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া আবশ্যক;—তাহার কোনও অংশকে অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধীন ও অঙ্গীভূত না-রাখা আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু আমরা সেরূপ কোন সমালোচনা পরোক্ষ ভাবেও না করিয়া এই সকল কথা লিখিতেছি। অন্য অনেক বিষয়ের মত শিক্ষাবিষয়েও কবির প্রতিভা অনেক নূতন পদ্ধতি ও আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে এবং নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে—এখনও করিতে পারে ও করিতেছে। সেইগুলিকে রূপ দিবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি এখনও পান নাই। তাঁহাকে সেই সুযোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

আমরা এক একটি উপলক্ষ্য ধরিয়া বরাবর তাঁহার নামের সংস্রবে আমাদের আত্মাভিমান তৃপ্ত করিতেছি। তাঁহার এই অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করিয়াও আমাদের জাতীয় অহমিকা স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে—"আমরা না-জানি কত বড় জা'ত যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষ জন্মেছেন।" কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এত বড়াই তাঁহার প্রতি কর্তব্য আমরা কতটুকু করিয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখা আমাদের কর্তব্য।

ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত পরস্পরের পরীক্ষা ও উপাধিগুলি সমতুল্য বলিয়া মানিয়া থাকেন। গবর্মেণ্টও তাহাদের এক একটি পরীক্ষা ও উপাধি সরকারী কোন কোন কাজের যোগ্যতার মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করেন। বিশ্বভারতীর নিজের পরীক্ষা ও উপাধিগুলি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ও গবর্মেণ্টের দ্বারা এইরূপ স্বীকৃতি লাভ করুক, আমরা ইহাই চাই। গবর্মেণ্ট আইন করিয়া বিশ্বভারতীর কন্সটিটিউশ্যন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন বা তাহার পরিষদে ও সংসদে সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইবেন বা কোন প্রকারে তাহার কার্য ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ইহা আমরা মোটেই চাই না। ইহার আদর্শ, কন্সটিটিউশ্যন ও নিয়মাবলী রবীন্দ্রনাথ যেরূপ স্থির করিয়া দিয়াছেন ও দিবেন, তাহাই থাকিবে। তাঁহার অবর্তমানে ইহার পরিষদ ও সংসদ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন কর্মিসমষ্টি রূপে (autonomous body রূপে) ইহার সমুদয় ব্যবস্থা ও কার্য নির্বাহ করিবেন। সংক্ষেপে আমাদের ইহাই বক্তব্য। আমরা গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ বিশ্বভারতীতে ত চাই-ই না, শিক্ষা-সংক্রান্ত যে-সব প্রতিষ্ঠানে বা বিভাগে গবর্মেণ্ট টাকা দেন, তাহাতে সরকারী কর্তৃত্ব বা মুরুব্বিয়ানা চাই না। অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বহরমপুরের অভিভাষণে স্বশাসক অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষার কার্যে সরকারী কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের অনিষ্টকারিতা ও অবাঞ্ছনীয়তা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

With the view of increasing the efficiency of the educational system, the Government of Australia where, be it remembered, there is no communal problem, assumed, with the consent of the people, rather large powers of control. The result has been tragic, as will be evident from the following quotation from the "Education Year Book."

"The present system links education far too closely with political events and uncertainties. It does not protect the schools sufficiently against the possibility of ignorance or bias on the part of the Government of the day. Ministerial policy in education is practically determined by the private views on education which happen to be held by the members of the Cabinet, and chiefly by the member of the Government who is given the portfolio of education, the educational system lending itself in the most dangerous way to the machinations of an unscrupulous or partisan Government."

যে-দেশ স্বশাসক ও যেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই, সেখানে গবর্মেণ্ট কর্তৃক শিক্ষানিয়ন্ত্রণের এত কুফল হইতে বঙ্গের মত সাম্প্রদায়িকতা-জর্জরিত মন্ত্রিমণ্ডল দ্বারা শিক্ষানিয়ন্ত্রণের কুফল কত বেশী হইয়াছে ও হইবে, তাহা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের (personalityর) কথা, তিনি মানুষটি কিরূপ, তাহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার কথা, তাঁহার কৃতির কথা, বলিতে গেলে তাহাকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়;—প্রথম, তিনি যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার রচনাবলী (গানগুলি তাহার অন্তর্গত); দ্বিতীয়, বিশ্বভারতী। এই উভয়ের মধ্যে যোগ আছে।

যাঁহারা তাঁহার কৃতির এই দুই অংশেরই গুণগ্রাহী, তাঁহাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী করা বা তাহাতে যোগ দেওয়া পূরা আন্তরিক। যাঁহারা তাঁহার কৃতির মধ্যে অন্ততঃ রচনাবলীর বা অন্ততঃ বিশ্বভারতীর গুণগ্রাহী, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সহিত তাঁহাদেরও যোগ অনেকটা আন্তরিক।

তাঁহার রচনাবলীর গুণগ্রাহিতার প্রমাণ দেওয়া যায় ও পাওয়া যায় যদি আমরা সেগুলি পড়ি, অধ্যয়ন করি। বাস্তব প্রমাণ আরও ভাল করিয়া দেওয়া যায়, যদি ক্রয়-

সমর্থ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ তাঁহার বহিগুলি কিনিয়া বাড়িতে রাখেন ও পড়েন। তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ ও চিত্তোৎকর্ষ হইবে। অনেকে পান তামাক বিড়ি সিগারেট সিনেমায় খরচ করিতে পারেন, কিন্তু কবির পুস্তকগুলি কিনিতে বলিলে কল্পনা করেন তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। অথচ আমরা ইয়োরোপের কোন কোন হোটেলের ভৃত্যদিগকে তাহাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ কিনিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর লইতে দেখিয়াছি।

কবির বহিগুলি ক্রয় করিবার আর এক দিক দিয়া হিতকারিতা আছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সমুদয় লাভ বিশ্বভারতী পান। বিশ্বভারতী যত টাকা পাইবেন, কবির শিক্ষাপরিকল্পনা সেই পরিমাণে বাস্তব আকার ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং যাঁহারা কবির গ্রন্থসমূহ ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতিভার গুণগ্রাহিতার ও তাঁহার কবিত্বের রসজ্ঞতার প্রমাণ দিবেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা বিশ্বভারতীরও গুণগ্রাহিতার প্রমাণ পরোক্ষ ভাবে দিবেন।

বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বলি। গান্ধীজীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ১৯৪০ সালের ২রা মার্চের "হরিজন" পত্রিকায় বাহির হয়। সেই চিঠির মধ্যে কবি বলিয়াছেন, "Visvabharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure," "বিশ্বভারতী একটি নৌকার মত যাহা আমার জীবনের সর্বোত্তম ধনরত্ন বহন করিয়া চলিতেছে।" ইহা কবির একটা খেয়াল নহে। আমরা কখনও ইহাকে সে চোখে দেখি নাই।

বাঙালী জাতির মধ্যে কাহারও রবীন্দ্রনাথের কৃতির গুণগ্রাহিতা নাই, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। অগণিত লোকের আছে। আমাদের আবেদন এই যে, যাঁহাদের আছে তাঁহারা "কেজো" হউন, তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তব রূপ ধারণ করুক। তাঁহারা অনেকেই বিশ্বভারতীর আজীবন বা সাধারণ সভ্য হইতে পারেন, কবির রচনাবলী কিনিতে পারেন, অন্ততঃ প্রতি মাসে তাঁহার একখানি করিয়া ছোট বহি কিনিতে পারেন। যাঁহাদের এরূপ সামর্থ্যও নাই, তাঁহারা তাঁহার কোন-না-কোন আদর্শের সফলতার জন্য পরিশ্রম করুন। আমরা সকলে এই ভাবে কাজ করিলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আন্তরিকতাপূর্ণ ও সার্থক হইবে।

চিয়াং কাই-শেকের অভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথের উত্তর

রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে চীনের প্রধান সেনাপতি ও প্রকৃত রাষ্ট্রপতি মার্শ্যাল চিয়াং কাইশেক তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাহার উত্তরে কবি লিখিয়াছেন :—

আমার জন্মতিথি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আপনার ও চীনের অধিবাসীদের শুভেচ্ছাসম্বলিত বাণী পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি। আমার বিষয় আপনি যে গভীর প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়াছেন উহাই অনুষ্ঠান দিবসের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনার প্রতি এবং আপনি যে জাতির প্রতিনিধি তাহাদের প্রতি আমি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণীর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কবিগুরু অতঃপর জানাইয়াছেন, বাংলা নববর্ষ দিবসে শান্তি-নিকেতনে আমার জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয় এবং উহা ১৪ই এপ্রিল, সুতরাং অতীত ঘটনাবলীর সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইবার সময়। চীনের বীর ও ধৈর্য্যশীল অধিবাসীবৃন্দ এবং তাহাদের অবিরাম দুঃখবহন করিবার সহিষ্ণুতা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। কেবলমাত্র ধন্যবাদ নহে—নববর্ষের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবারও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমি আনন্দিত। যে সকল গুণাবলী দ্বারা মহান্ জাতি গড়িয়া উঠে, উহাদের কার্য্যকলাপ তাহা দ্বারাই মহনীয় হউক। উহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণ নেতৃবৃন্দের শ্রমও যেন ঐরূপ ফল প্রসব করিতে পারে। নির্দ্দোষ জনগণ যাহাতে শান্তিতে আপন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য যেন বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রার্থনার সহিত আপনার মহান্ বাণীর জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—এ, পি

অসঙ্গতি-অপবাদে মহাত্মাজীর উত্তর

মহাত্মা গান্ধী ভারতসচিবের বক্তৃতার যে সমালোচনা করিয়াছেন, বোম্বাইয়ের টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া তাহাতে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তরে গান্ধীজী ঐ কাগজের সম্পাদককে লিখিয়াছেন :

মহাশয়, আপনি লিখ্‌ছেন, "মিঃ এমারি ঠিকই পাল্টা জবাব দিতে পারেন, যে, মিঃ গান্ধী তাঁকে যে অসামঞ্জস্যের অপবাদ দিয়াছেন, 'কংগ্রেস-নেতার (গান্ধীজীর) বিবৃতিতেও তা স্পষ্ট। অহিংসার প্রধান পাণ্ডার মুখে এই দোষারোপ ভারি অদ্ভুত শোনায় যে, ভারতবর্ষকে 'সম্পূর্ণ নিরস্ত্র' রাখবার তথাকথিত ব্রিটিশ পলিসির দরুন দেশটা পৌরুষহীন হয়েছে।"

১৯০৮ সালে, যখন আমি অহিংসারূপ জীবনরক্ষক ও জীবনপ্রদ সত্যের ব্যাখ্যা প্রথম করেছিলাম, তখন আমি লিখেছিলাম নিরস্ত্রীকরণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইতিহাসের কৃষ্ণতম পৃষ্ঠা। আমি ১৯১৮ সালে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলাম যখন আমি ব্রিটিশ সৈন্যদলের জন্যে এত আগ্রহের সহিত রিক্রুট সংগ্রহ করছিলাম যে তাতে আমার গুরুতর পীড়া জন্মে এবং বেশ কতকটা অপ্রিয়ও হয়ে পড়ি স্বদেশবাসীদের নিকট।

তখন আমার কথাগুলা ব্রিটিশ পক্ষের লোকেরা মন্দ ঠাওরান নি—ভালই মনে করে থাক্‌বেন। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি এখন অসঙ্গতিদোষদুষ্ট হয়েছি প্রতিবাদের অতীত একটা ঐতিহাসিক কথা বলায়। আমি বলতে চাই, অহিংসা কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অহিংসা মানুষের অন্তর থেকে উৎপন্ন হওয়া চাই। ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণের ব্রিটিশ ব্যবস্থাটা ব্রিটিশ রাজত্বকে নিরাপদ করবার জন্যে করা হয়েছিল, তাদেরকে অহিংস করবার জন্যে নয়। এতে তাদেরকে অপকর্ম করবার জন্যেও শক্তিহীন করেছে। পৌরুষহীন ভালমানুষরা কোন কাজের নয়। এটা কোন অহঙ্কার বা সুখ্যাতির বিষয় নয় যে, ব্রিটিশ শক্তির প্রতিনিধি একটা কোন মানুষ, ধরুন, হাজার মানুষের একটা গ্রামকে অতিহীন অধীন অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে। আমার অহিংসা এমন লোকদেরও অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে যাদের অস্ত্র আছে ও যারা অস্ত্র চালাতে পারে কিন্তু যারা অহিংস হতে পারে না কিম্বা অহিংস হতে চায় না। আমাকে সহস্রতম বার পুনরাবৃত্তি করতে দিন্ যে, অহিংসা বলবত্তমের গুণ, দুর্বলের নয়। এটি হিংসার চেয়ে একটি প্রবলতর শক্তি, যদিও গুণে ও ফলে এটি হিংসার থেকে আমূল পৃথক্।

—

আত্মরক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

সকল অবস্থায় পুরা অহিংসাবাদী কেমন করিয়া থাকা যায়, আমরা তাহা এখনও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কারণে আমরা কখনও গান্ধীজীকে উপহাস করি নাই—করা অনুচিত হইবে বলিয়া করি নাই।

আমরা বরাবর জানি, গান্ধীজী কাপুরুষতাকে ঘৃণা করেন। এই জন্য দুর্বল কাপুরুষের আত্মরক্ষাচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত থাকাকে তিনি কখনও অহিংসা বলিয়া ভ্রম করেন নাই।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে যে দাঙ্গা ও খুনাখুনি হইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে একাধিক বিবৃতি দিয়াছেন। সেগুলির একটি প্রধান কথা এই যে, আক্রান্ত ও বিপন্নের রক্ষণ চাই। তিনি পুরা অহিংসাবাদী; সুতরাং তিনি যে অহিংস উপায়ে রক্ষণকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক ও ন্যায্য। তাঁহার মতে যাঁহারা অহিংসাবাদী তাঁহারা নিজে আক্রান্ত ও বিপন্ন হইলে কিম্বা অপরকে আক্রান্ত ও বিপন্ন হইতে দেখিলে উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষণচেষ্টা অহিংসভাবে করিবেন। আত্মরক্ষণচেষ্টা ও পররক্ষণচেষ্টা অহিংসভাবে করিবেন। কিন্তু যাহারা অহিংসাবাদী নহে, তাহারা নিজে আক্রান্ত ও বিপন্ন হইলে কি কেঁচোর মত মরিবে? যাহারা দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাহাদিগকে আক্রান্ত ও বিপন্ন দেখিয়া আর্তত্রাণে ও আর্তরক্ষণে সমর্থ ব্যক্তিরা কি পলায়ন করিবে? গান্ধীজীর বিবৃতিগুলি পড়িয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, এই দুটি প্রশ্নের গান্ধীজীর উত্তর নিম্নলিখিত রূপ।

(১) যাহারা অহিংসাবাদী নহেন, তাঁহারা স্বয়ং আক্রান্ত ও বিপন্ন হইলে দৈহিক বল ও অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষা করিবেন। (২) যাঁহারা আর্তত্রাণে ও আর্তরক্ষণে সমর্থ, তাঁহারা দুর্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ কাহাকেও আক্রান্ত ও বিপন্ন হইতে দেখিলে দৈহিক বল ও অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা রক্ষণকার্য করিবেন।

উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষণকার্য সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। সুতরাং গান্ধীজী না বলিলেও তাহা করিবার অধিকার সকলেরই ছিল ও আছে। আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা এরূপ বিষয়ে গান্ধীজীর মনের ভাব ও উপদেশ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য।

—

দাঙ্গার ক্ষেত্রগুলাতে কংগ্রেসের প্রভাবশূন্যতা

দাঙ্গার ক্ষেত্রগুলাতে কংগ্রেসীদের মারফতে কংগ্রেসের কোন প্রভাব কার্যকর হয় নাই, ইহা গান্ধীজী বিষাদের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ সকল জায়গায় এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের প্রভাব কেন লক্ষিত হয় নাই, তাহা কংগ্রেসীরা বিশেষ অভিনিবেশপূর্বক ভাবিয়া দেখিবেন।

ঢাকার মত জায়গায় প্রভাবশালী দুর্বৃত্ত লোকদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা আক্রমণ, হত্যা ও গৃহদাহ আরম্ভ করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আক্রমণের সময় আক্রান্ত লোকদিগকে রক্ষা করিবার ও সাহস দিবার কাজে কংগ্রেসীরা তৎপর হইয়াছিলেন কিনা, হইয়া থাকিলে কে কিরূপ তৎপর হইয়াছিলেন, তাহার কোন বৃত্তান্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

—

মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, লণ্ডন, ঢাকা, আমেদাবাদ

স্পেনের গত যুদ্ধে মাদ্রিদ শহর ও বার্সিলোনা শহরের উপর মাসের পর মাস শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণ ও গোলাগুলি নিক্ষেপ সত্ত্বেও তথাকার অধিবাসীরা হাজারে হাজারে শহর ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। তথাকার গবর্মেণ্ট শিশু নারী ও বৃদ্ধ যাহাদের অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা আগে হইতে করিয়াছিলেন তাহারা শহরে ছিল না বটে। বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের লণ্ডন ও অন্য কোন কোন শহরের উপর শত্রুপক্ষের ভীষণ বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও সেই সকল স্থান হইতে ভয়ে হাজারে হাজারে লোক পলায় নাই।

কিন্তু ঢাকা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি শহরে আকাশ হইতে একটাও বোমা পড়ে নাই, তাহাদের উপর

একটাও কামান দাগা হয় নাই, মেশিন কামানের গুলিবৃষ্টি একটার উপরও হয় নাই। একমাত্র অস্ত্র যাহা শহরগুলার কতিপয় লোকের শরীর বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কতকগুলা গুণ্ডার ছোরা। তাহাতেই হাজার হাজার লোক (তাহার মধ্যে সমর্থ পুরুষজাতীয় মানুষও ছিল) শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এরূপ লজ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল? ইয়োরোপের শহরগুলা হইতে ভীষণ যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও যে মানুষগুলা ভয়ে পলায় নাই, তাহার জন্য প্রশংসার যোগ্য তথাকার লোকেরা যেমন, তথাকার গবন্মেণ্টও সেইরূপ। তথাকার অধিবাসীরা জানিত যে, বিপদ যত ভয়ানকই হউক গবন্মেণ্ট রক্ষার চেষ্টা ও বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা যথাসাধ্য করিবেন, এবং না করিলে গবন্মেণ্টকে জবাবদিহি হইতে হইবে। আমাদের দেশে গুণ্ডারাজ আরম্ভ হইলে গবন্মেণ্ট সম্বন্ধে লোকদের সেরূপ কোন ধারণা ও বিশ্বাস নাই। ইয়োরোপের প্রত্যেক আক্রান্ত দেশের লোকেরা বংশ-শ্রেণী-বাসস্থান-নির্বিশেষে স্বস্বদেশের সৈন্য দলে ঢুকিতে অধিকারী; তথাকার প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে যুদ্ধকালের আক্রমণ করিবার ও সহিবার, মারিবার ও মরিবার, ঐতিহ্য, জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তী আছে। গায়ে আঁচড় লাগা বা লাগান, শরীর বিদ্ধ বা অন্য প্রকারে আহত হওয়া, খানিকটা রক্ত পড়া, সে-সব জায়গায় একটা আতঙ্কজনক অশ্রুতপূর্ব অভূতপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার নহে। অস্ত্রব্যবহারে ও আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত লোক তথাকার প্রত্যেক জায়গাতেই অনেক আছে। সুতরাং সেখানে হত বা আহত হইবার চিন্তাটা মানুষকে দিশাহারা করে না। আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রদেশের অধিকাংশ শহর ও গ্রামের এই প্রকার কোন বর্ণনা করা যায় না—বর্ণনা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত বর্ণনাই করিতে হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামের ও শহরের অবস্থা যদি এইরূপ হইত যে, কোথাও কোন বদমায়েস এক জনকে ছোরা বা লাঠি মারিলে তাহাকে ধরিবার ও ছোরা বা লাঠি কাড়িয়া লইবার জন্য অন্ততঃ ২।৪ জন লোক দৌড়িয়া আসিবে এবং প্রাণভয় করিবে না, তাহা হইলে গুণ্ডারাজের অবসান শীঘ্রই হইত—হয়ত আরম্ভই হইত না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ শহর ও গ্রামের অবস্থা এরূপ নহে। দেশের ব্যাপক পৌরুষ-হীনতার জন্য গবন্মেণ্ট ও দেশের অধিবাসীরা উভয়েই দায়ী। দেশের লোকেরা যে পরাধীন হইয়াছে, তাহার জন্য অবশ্য তাহাদের পূর্বপুরুষদের দায়িত্ব যে খুব বেশী, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু আলোচিত অবস্থার জন্য যে গবন্মেণ্টই প্রধানত দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

"গ্রাম-পুনর্গঠন"

কিছু দিন পূর্বে বঙ্গের সরকারী গ্রাম-পুনর্গঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মহাশয়ের একটি বিবৃতি পাইয়াছিলাম। তাহাতে অনেক ভাল ভাল এবং লম্বাচৌড়া কথা ছিল; কিন্তু ঐ বিভাগ দ্বারা কাজ কী হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা বিবৃতি হইতে বুঝিতে না পারায় সে বিষয়ে কিছু লিখি নাই। সম্প্রতি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এ বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাসমূহ অনুসারে কাজ হইলে দেশের উপকার হইবে।

সম্প্রতি লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক ট্রিবিউনে গ্রাম-পুনর্গঠন বিষয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হইয়াছে। তাহার সর্বস্বত্ব রক্ষিত, নতুবা প্রতিলিপি ছাপা চলিত। ছবিটির একপ্রান্তে একটি ফনেলের মুখে কিছু ঢালা হইতেছে—বোধ হয় সরকারী বরাদ্দ। তাহা নলযোগে বাহিত হইয়া বেতন (salaries) নাম যুক্ত একটা টাঁকিতে (tankএ) পড়িতেছে। সেখান হইতে জিনিসটা যাইতেছে একটা পিপাতে। তাহার গায়ে লেখা আছে বিশেষজ্ঞ ও প্রচার-কর্মিবৃন্দ (experts propagandists)। সেই পিপাটা হইতে নল দিয়া জিনিসটা এ-বিভাগ (this department), ও-বিভাগ (that department), অন্য-বিভাগটা (the other department) ও লাল ফিতা (red tape) নাম যুক্ত নানা পাত্রে যাইতেছে। গ্রামের মেয়ে একটি, গ্রামের প্রতীকরূপিণী, নলের মুখের নীচে কলসী পাতিয়া উর্দ্ধমুখে প্রতীক্ষা করিতেছে উপকারের প্রত্যাশায়। উপকার পড়িয়াছে—একটিফোঁটা!

চিত্রকর বোধ করি এই ছবিটি আঁকিয়াছেন পঞ্জাবের গ্রাম-পুনর্গঠন বিভাগ সম্পর্কে। বাংলা দেশের ভাগ্যের তাহা হইলে জুড়িদার আছে!

ছোট সাহিত্যিক কাজও রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ মনে করেন নাই

রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "প্রবাসী"র জন্য বিলাতী ও আমেরিকান বহু মাসিক পত্রের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোন কোন অংশ শান্তিনিকেতনের

অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকেও কাহাকেও অনুবাদ করিতে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং কোন কোন অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না—তখনও তিনি বিখ্যাত কবি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যখন তাঁহার সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা লিখিত ও কথিত হইতেছে, তখন এই ছোট কথাটি লিখিলাম ইহা দেখাইবার নিমিত্ত যে, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনার্থ কোন কাজকেই তিনি তাঁহার প্রতিভার অযোগ্য তুচ্ছ কাজ মনে করেন নাই। ইহা হইতে কেবল তরুণ সাহিত্যসেবীরাই যে কিছু শিখিতে পারিবেন তাহা নহে, আমরা বৃদ্ধেরাও পারিব।

—

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি

জাপানের মাৎসুওকাকে বিদায় দিবার সময় রাশিয়ার স্টালিন তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছেন, রয়টার এই খবরটা প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই শিবাজী নহেন, আফজল খাঁও নহেন। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে জাপানে রাশিয়াতে যুদ্ধ বাধে, তখন বুঝা যাইবে যে, কোলাকুলিটা শিবাজী ও আফজল খাঁয়ের কোলাকুলির সমশ্রেণীস্থ।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিতালি ও চুক্তি ভারি চমৎকার ব্যাপার – আদার ব্যাপারীদের বুদ্ধির অগম্য। জাপানে রাশিয়ায় এক রকম মিতালি হইয়া গেল, অথচ রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হইতেছে যে, চীনকে রাশিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে থাকিবে।

—

নিখিল বঙ্গ বাঙালী মুসলমান সমিতি

গত ৭ই মে কলিকাতা শহরের ও বাংলা দেশের বাঙালী মুসলমানদের প্রতিনিধিদিগের একটি সভায় মৌলবী সৈয়দ হবিবর রহমান সাহেবকে সভাপতি করিয়া এবং অন্যান্য কর্মী মনোনীত করিয়া নিখিল বঙ্গ বাঙালী মুসলমান সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বাঙালী মুসলমানদের উপকার হইবে। বাংলা দেশের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদিও মুসলমানপ্রধান, তথাপি তাহার দ্বারা বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত না-হইয়া ক্ষতি হইতেছে। নূতন সমিতি বিশ্বাস করেন, "বাংলা বাঙালীদের জন্য। বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুগণই এই প্রদেশের আর্থিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বার্থ রক্ষা করিবে।" মৌলবী সৈয়দ হবিবর রহমান সাহেব ও তাঁহার সহকর্মীরা পৃথক্ নির্বাচনের ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার বিরোধী। তাঁহারা সম্মিলিত নির্বাচন চান। তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গের বাঙালী হিন্দু ও অবাঙালী হিন্দুদের সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন, বিশ্বাস করেন।

> এই সমিতি বাংলার মুসলমানদের পক্ষ হইতে জানাইতেছে যে, মিঃ হক, তাঁহার সমর্থকগণ এবং মন্ত্রিমণ্ডলী—যদিও তাঁহারা বাঙালী ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত—কলিকাতা কর্পোরেশনে অ-বাঙালী মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করিতেছেন—কারণ কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করার ফলে কর্পোরেশনে অ-বাঙালী মুসলমানদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে—ফলে বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ নষ্ট হইতেছে। সুতরাং এই সমিতি অনতিবিলম্বে কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন আইন হইতে উদ্ভূত দ্বিতীয় মিউনিসিপাল সংশোধন বিল প্রত্যাহার করিতে এবং কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন আইনকে সংশোধন করিয়া পুনরায় যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

মৌলবী সৈয়দ হবিবর রহমান সাহেব বাংলা দেশের কৃষক প্রজা দলের নেতা। তিনি ইতিপূর্বে একটি বিবৃতিতে জনাব জিন্নার মান্দ্রাজি বক্তৃতার সমুদয় ভ্রম প্রদর্শন উপলক্ষ্যে দেখাইয়াছেন যে, পাকিস্তান পরিকল্পনা ইসলামবিরোধী; ইসলাম জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমুদয় মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সমর্থক এবং গণতন্ত্রস্থাপক।

নূতন সমিতিটি দেশের উপকারের জন্য মুসলমান ও হিন্দুদিগকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করাইতে পারিলে তাহা সাতিশয় সুখের বিষয় হইবে।

—

"রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী"তে মুদ্রণভ্রম

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী"র শেষ পংক্তিতে "বৈধব্যের গোটা"র পরিবর্তে পড়িতে হইবে "দ্বৈধব্যের খোটা"। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত এবং প্রবাসীর সম্পাদক কর্তৃক সংশোধিত প্রুফে শুদ্ধ পাঠ "দ্বৈধব্যের খোটা"ই ছিল।

—

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়ার রিলীফ কমীটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে বিবৃতি ও আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

> বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ ভাগই পুনরায় দারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী, পাত্রসায়ের এবং ইন্দাস থানার এবং সদর মহকুমার দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই সম্পূর্ণ অজন্মা হওয়ায় এবং যুদ্ধের দরুণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি

পাওয়ায় সর্বশ্রেণীর প্রায় পাঁচ লক্ষ নরনারী একান্ত বিপন্ন অবস্থায় উপনীত।

বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় যাহা করিয়াছেন এবং বেসরকারী যে দুটি সাহায্য-সমিতি সাহায্য দিতেছে, তাহাদের কাজের উল্লেখ করিয়া কমলকৃষ্ণ বাবু গবর্ন্মেণ্টকে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত উপরোক্ত সর্ব্ব উপায় দ্বারা মাত্র কয়েক সহস্র নরনারীর আংশিক সহায়তার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু হাজার হাজার গৃহস্থের অভুক্ত পরিবার ও শিশুসন্ততিগুলি অনাহারে ও কদাহারে দিনের পর দিন দুঃসাধ্য রোগমৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে আমি গভর্নমেণ্টকে অচিরে প্রপীড়িত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বাঁকুড়া জেলায় জলসেচন কাযের স্থায়ী ব্যবস্থা করা যে অত্যাবশ্যক, তিনি অতঃপর তাহা লিখিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমি গভর্ণমেণ্টকে আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বাঁকুড়া জেলায় প্রস্তাবিত সেচ-পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী না করার জন্যই বাঁকুড়া জেলা স্থায়ী দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হইয়া আছে এবং প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন হয়। গত পঁচিশ বৎসরে গভর্ণমেণ্টকে যে পরিমাণে অর্থসাহায্য করিতে হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি 'সেচ পরিকল্পনা' বহুদিন পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যাইত এবং দুর্ভিক্ষের মূল কারণ দূর হইয়া যাইত। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের বৎসরে গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু না কিছু করিতেই হইবে। আমি গভর্ণমেণ্টকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি যে, বাঁকুড়া জেলার জীবন-মরণ সমস্যা সেচের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের যে আন্তরিকতা আছে তাহা বুঝাইবার জন্য অন্ততঃ যে কোন একটি পরিকল্পনাকে—তাহা দ্বারকেশ্বর স্কীমই হউক আর শুভঙ্করের দাঁড়ার স্কীমই হউক কিম্বা অন্য অনুমোদিত যে কোন স্কীমই হউক—তাহার কার্য্য সত্বর আরম্ভ করুন।

অতঃপর তিনি সর্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সহৃদয় গভর্ণমেণ্টেরও সর্ব্বাধিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমি সেইরূপ অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণের এবং বিভিন্ন সাহায্য-সমিতির নিকট আবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য দানে হাজার হাজার সর্ব্বশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতার জীবন রক্ষার সহায়তা করুন। একটি অস্থায়ী জেলা সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যে কোনওরূপ সাহায্য আমার নিকট কিম্বা শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্ত্তী ৪৩।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড অথবা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক, এম এল এ, ৭৬।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, সুট ওয়াই ২—এর নিকট প্রেরিত হইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

আমরা এই আবেদন সমর্থন করিতেছি।

—

প্রবাসীর ৪০ বৎসরের লেখক-তালিকার অসম্পূর্ণতা নির্দেশ

গত চৈত্রের প্রবাসীতে প্রবাসীর ৪০ বৎসরের লেখক-দিগের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নহে বলা হইয়াছিল। তাহাতে ছিল না, এরূপ কয়েকটি নাম গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। এ মাসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ তাঁহার "আলোচনা"য় কিছু অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কেহ কেহ নিম্নলিখিত নামগুলি বাদ পড়িয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী, শ্রীযুগলকিশোর সরকার, স্বর্গতা সরসীবালা বসু, স্বর্গত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

—

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা হইতে যাহারা গ্রাহক আছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম বৈশাখের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। তাহার পর জানিতে পারিয়াছি, বীরভূম জেলার লাভপুরের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীর প্রথম বৎসর হইতে গ্রাহক আছেন, এবং কানপুরের বঙ্গসাহিত্য সমাজের পুস্তকাগারে ১ম সংখ্যা হইতে সমুদয় প্রবাসী আছে।

প্রথম হইতে না হইলেও দীর্ঘকাল গ্রাহক আছেন, এরূপ অনেকের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ দুঃসাধ্য।

—

প্রবাসীর প্রতি শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্রহ্মদেশীয় শাখার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়শরণ কাহালী মহাশয় রেঙ্গুন হইতে লিখিয়াছেন :—

বিগত ৫ই চৈত্র তারিখে অনুষ্ঠিত স্থানীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার কার্য্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের সহিত "প্রবাসী"র চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ব্রহ্মদেশীয় শাখা, আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম প্রকাশ দ্বারা, প্রবাসী বাংলা সাহিত্য, বাঙালী সমাজ, বঙ্গের জাতীয় জীবন ও বাঙালীর চিন্তার ধারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, স্থানীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। স্থানীয় সাহিত্য পরিষৎ "প্রবাসী"র শ্রীবৃদ্ধি ও চিরস্থায়িত্ব কামনা করে।

"জাতির ইতিহাসে প্রবাসী-সম্পাদকের দান চিরস্মরণীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ব্রহ্মদেশীয় শাখা, "প্রবাসী"র বর্ষীয়ান্ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিরাময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে।"

আমি আমার নিজের আন্তরিক শুভ কামনা এই সাথে জানাচ্ছি। আপনি নিজে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশনিবাসী সমুদয় বাঙালীকে, তথাকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে এবং তাহার সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নিউ দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাবের সাহিত্য শাখার সম্পাদক শ্রীযুত হরলাল গুহ লিখিয়াছেন (তাহার পূর্বে এ বিষয়ে টেলিগ্রামও পাঠাইয়াছিলেন):—

বিগত ১লা বৈশাখ, ১৩৪৮, সোমবার, নববর্ষ উপলক্ষে নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে নিউ দিল্লীর প্রবাসী বাঙালীদের একটি মহতী সাহিত্যসভার অধিবেশন হয়। সভায় ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ডি, এস্, সি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সাগ্রহে গৃহীত হয়। "ইয়োরোপা" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাস, আই, সি, এস্ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

"প্রবাসী ও স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমস্যা, কৃষ্টি ও কৃতিত্বের পরিচয় ও পরিচর্য্যায় অক্লান্ত ভাবে নিরত প্রবাসী পত্রিকাকে চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করার জন্য নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন করিতেছে।"

এই প্রস্তাবের মর্ম্মাংশ গত ২রা বৈশাখ, মঙ্গলবার, তারযোগে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিবেন।

নিউ দিল্লীর বাঙালীদিগকে, বেঙ্গলী ক্লাবকে ও পত্রলেখক মহাশয়কে আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীহট্টের "বাণীচক্রে"র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে:—

বাণীচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভা বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাসিক, বাঙালীর জাতীয় সম্পদ প্রবাসীর চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং প্রবাসী যেন জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সেবায় সুদীর্ঘ কাল নিজেকে নিয়োজিত রাখে সেই কামনা প্রকাশ করিতেছে।

এই সভা প্রবাসীর সুযোগ্য সম্পাদক, বিশ্ববিশ্রুত মনীষী, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছে।

শ্রীহট্টের "বাণীচক্র"কে এবং তাঁহাদের উদ্যোগে আহূত সভায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে যে অল্পসংখ্যক ভদ্রমহোদয় প্রবাসীর ও আমার প্রতি প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা জানাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার সশ্রদ্ধ প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"তত্ত্বকৌমুদী," "যুগান্তর", "চিংপটাং," এবং "বেহার হেরাল্ড" পত্রিকাগুলি প্রবাসীর প্রতি প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

—

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী

ভারতবর্ষে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবার ছয় জন বাঙালী যুবক 'উত্তীর্ণ' হইয়াছেন, ইহা সন্তোষের বিষয়।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান অডিট ও একাউণ্ট সার্ভিসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা বিশেষ সন্তোষের বিষয়।

এলাহাবাদের দৈনিক **লীডার** লিখিয়াছেন:—

It will interest readers of the *Leader* to know that of the first six candidates successful in the last I. C. S. examination, four (including the first) are from Allahabad University. Of the first four Muslim candidates two are from this University. This reflects equally high credit on the candidates as well as their University teachers and we heartily congratulate both on the success that has been achieved. Allahabad University has always held a high place among Indian Universities and it gives us so much pleasure that this reputation is being not only maintained but enhanced.

এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কি বক্তব্য আছে, অবগত নহি।

ইয়োরোপের যুদ্ধ

ইয়োরোপের যুদ্ধ ইয়োরোপে সঙ্গীন আকার ধারণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোটের উপর হিটলারেরই জিত হইয়াছে। মুসোলিনি হারিয়াছে। তাহাকে হারিতে দিয়া হিটলার তাহাকে তাহার মূল্য সমঝাইয়া দিয়াছে। তাহার পর যে-গ্রীস ইটালীকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাকে পরাস্ত করিয়া হিটলার নিজের কেরামতি দেখাইয়াছে। উত্তর-আফ্রিকাতে ইটালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিকট পরাস্ত হইতেছিল। সেখানেও হিটলার বহু লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়া ব্রিটিশ সৈন্যদল ও সেনাপতিদিগের জয়যাত্রায় বাধা দিয়াছে।

স্পেনের ভিতর দিয়া জার্ম্মান সৈন্য পাঠাইবার সুবিধা ফ্রাঙ্কোর উপর চাপ দিয়া হিটলার আদায় করিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। ইহাতে ইংরেজদের ঘাঁটি জিব্রাল্টার আক্রমণ করিবার সুবিধা হিটলার পাইবে।

ইয়োরোপের যুদ্ধ এশিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইরাকে যাহা যাহা ঘটিতেছে, দৈনিক কাগজে পাঠকেরা তাহা দেখিতেছেন। সুয়েজ খালও এখন আর নিরাপদ নাই। পশ্চিমে ঐ দুই দিক হইতে ভারতবর্ষের বিপদ আসিতে পারে।

পূর্ব দিক হইতে বিপদ আসিবে কিনা, তাহা চীন-জাপান যুদ্ধের অবস্থা ও গতির উপর নির্ভর করিবে। চীন যদি জাপানকে খুব বিব্রত রাখিতে পারে, তাহা হইলে জাপান ব্রহ্মদেশে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব ও পূর্ব অঞ্চলে হানা দিতে পারিবে, এমন মনে হয় না।

—

আবিসীনিয়ার সম্রাটের স্বদেশ প্রত্যাগমন

বহু দুঃখকর বিদেশী অশুভ সংবাদের মধ্যে সুখকর সংবাদ এই যে, আবিসীনিয়ার সম্রাট আবার সম্রাট রূপে নিজের দেশে

ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন। তিনি কিন্তু যদি নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্য ইয়োরোপীয় কোন শক্তি বা শক্তি-পুঞ্জের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে ঠকিবেন। তিনি নিজের প্রজাদিগকে সকল দিক্ দিয়া উন্নত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিলে এবং স্বদেশের নৈসর্গিক সম্পৎসমূহের সদ্ব্যবহার শীঘ্র শীঘ্র করিলে অনেকটা নিরাপদ বোধ করিতে পারিবেন।

বাঙালী ও অবাঙালীদিগকে বাংলা-সাহিত্যের সংবাদ প্রদান

আমরা বাঙালীরা আমাদের সাহিত্যের গর্ব্ব করিয়া থাকি, এবং চাই যে, অবাঙালীরাও যেন স্বীকার করেন যে, বাংলা-সাহিত্য খুব বড় সাহিত্য এবং তাহার সম্পদ বাড়িয়া চলিতেছে ও সেই কারণে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। অবাঙালীরা যাহাতে বাংলা-সাহিত্যের কিছু আস্বাদ পান, তজ্জন্য আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে বাংলা সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট জিনিযের অনুবাদ. বহু বৎসর ধরিয়া ছাপিয়া আসিতেছি। এখনও বাংলা বহি কত এবং কি প্রকারের বাহির হইতেছে, তাহা বাঙালী ও অবাঙালী সকলকে জানাইবার নিমিত্ত আমরা গত চারি মাস হইতে মডার্ণ রিভিয়ুতে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য সকল অধুনা-প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের তালিকা ছাপিতেছি।

এই তালিকাটি হইতে কেবল যে কৌতূহল তৃপ্ত হইবে, তাহা নহে। বাংলা দেশের যে-সকল সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকাগার বাংলা পুস্তক কিনিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং যে-সকল মহিলা ও ভদ্রলোক নিজ ও পারিবারিক ব্যবহারের নিমিত্ত বাংলা পুস্তক কেনেন, তাঁহারা আমাদের প্রকাশিত তালিকা হইতে বাছিয়া বহি কিনিতে পারিবেন। আমাদের তালিকার প্রথম কিস্তি ফেব্রুয়ারি মাসে বাহির হইবার পর একটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এই কারণে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। প্রবাসীর পুস্তক-পরিচয় বিভাগ হইতেও এইরূপ সাহায্য কিছু পাওয়া যায়।

মাসে মাসে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থসমূহের তালিকা হইতে আরও কিছু তথ্য জানা যায়। সাহিত্যের ও বিদ্যার কোন্ কোন বিভাগে কত বহি বাহির হইতেছে, তাহা হইতে বাঙালী জাতির মনের চাহিদা কিরূপ, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজীবনময় রায়

দেখেছি রজনীগন্ধা অন্ধকারে জেলেছে দীপালী ;
দেখিয়াছি গন্ধরাজ ; কবিপ্রিয় বসোরা গোলাপ ;
নীল সরোবর যেন—নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ
কুমুদে কল্‌হারে পদ্মে ; দেখিয়াছি যূথী, সন্ধ্যামণি,
মল্লিকা, শেফালি—বক্ষে চমকিছে কোটি খদ্যোতিকা ;
কোনো কবি কর্ণিকার অর্ঘ্য দেয় লক্ষ মণি দীপে ;
সুরচিত পুষ্পসজ্জা হেরিয়াছি সুরম্য উদ্যান ;
প্রশান্ত আকাশতলে কোনো কবি গম্ভীর বনানী ;
কেহ বা ঝরণাধারা কলহাস্যে আনন্দ চঞ্চল ;
কেহ বা বন্ধনহারা মুক্তধারা উচ্ছল প্রপাত ;
আবার দেখেছি কারে ধ্যানমুগ্ধ যেন বিন্ধ্যগিরি ;
হেরিয়াছি কত কবি !
আজ হেরিতেছি-স্তব্ধ চিতে
তোমার বিরাট্ বক্ষে বিচিত্রের বিভূতি বিকাশ।
ইন্দ্রের কিরীটদীপ্ত উচ্চশির তুলেছ গগনে—
সৃষ্টির বিস্ময় তুমি, অন্তহীন তুমি হিমাচল।

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা পূর্বেই বলেছি যে সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয়, তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে সব ছবি, তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। তার কোনোটা বা ফিকে হয়ে এসেছে, ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নপত্র তার আপন কালের স্রোতের সীমানায়। তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। আর কতকগুলি আছে চিরকালের মতন সকল মানুষের চোখের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে। আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যে নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হোলে অধৈর্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ অথচ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই,—সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি, তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ওদিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই অথচ কৌরব সভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ প্রতীক মাত্র হয়ে। ওদিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার অথচ অতি সাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এদিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক। এত নিখুঁত যে সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছে যে যদিচ জেনেছে অধর্মের এই পরিণাম তার স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুন শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারে নি। এই হোলো স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি। মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলোনো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিকভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।

রূপ সাহিত্যে তাই যখন দেখি কবি তাঁর নায়কের পরিমাণ বাড়িয়ে বলবার জন্যে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছেন আমরা তখন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাদের সত্যলোকের ভীম কখনই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেন নি। এক গদাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রূপের রাজ্যে মানুষ ছেলে ভুলিয়েছিল, যে-যুগে মানুষ ছেলেমানুষ ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিন্তু কালের হাতে ছাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সত্য রূপটুকু রয়ে গেছে। তাই হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাই নে, কেন না আমাদের দৃষ্টির বদল হয়ে গেছে।

রসের ভোজেও এই কথা খাটে। সেখানে সেই ভোজে যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই। শিশু কৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্য কান্না ধরলে পর যে সাহিত্যে তার সামনে আয়না ধরে তার নিজের ছবি দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিল, সেখানে এই রচনানৈপুণ্যে ভক্তরা যতই হায় হায় করে উঠুক, শিশুবাৎসল্যের এই রসের কৃত্রিমতা কোনো দেশের অভ্যাসের আসরে যদি বা মূল্য পায়, মহাকালের পণ্যশালায় এর কোনো মূল্য নাই। এই কাব্যের কৃত্রিমতার কুস্বাদ যদি বদল করতে চাও, তাহলে এই কবিতাটি পড়ো—

দধি মহ ধ্বনি, শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ, পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ বয়ান॥

কহে শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি॥
দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রাণী,
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
বলরাম দাস কয়, রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥

এ যে আমাদের ঘরের ছেলে—এ চাঁদ তো নয়। এর রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। মা চিরকাল এ'কে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, চাঁদ দেখিয়ে ভোলায় নি।

রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন বলে, "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে", তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হোতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয়, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল", তখন মন বলে, যে-হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ। রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়। আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা করে।

তাই দেখি সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোকখ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায় কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁদের কারো বা নাম জানা আছে, কারো বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখুনি সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার—রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম, কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত, তা হলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হোত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

শূন্য চৌকি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়,
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায় হায়,
কী হোলো যে কেন হোলো কিছু নাহি বোঝে
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারিদিকে খোঁজে।
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশী করুণ কাতর
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদয়ন
২৬ মার্চ, ১৯৪১
বিকাল

বঙ্গলক্ষ্মী]

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

...রোগী রোগের গ্লানিকে ভুলতে চায় আহা, উহু করে, কাতরিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সে বান্দা নন। তাঁর রোগগৃহে সময়টা একঘেঁয়ে হতে পারে না। দুর্বল স্বাস্থ্য আর ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়েই তাঁর ভিতরকার সদানন্দ সদা-রসস্রষ্টা মানুষটি, শুধু রোগীর চিত্ত বিনোদন করে না, তাঁর আশে-পাশে যাঁরা থাকে তাঁদেরও চিত্ত-বিনোদন করে। সে মানুষটি কে? স্বয়ং যাঁকে আমরা বিশ্বকবি বলে জানি। কথায় কথায় ছড়া কাটেন, ছোটখাটো উপলক্ষ নিয়ে।...সেগুলি সত্যিই অমূল্য, কদর তার ঢের বেশী,—যখন দেখি সেগুলি বেরিয়েছে—৮০ বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের রোগগৃহ থেকে।...

তাঁর স্নেহের নাতনীর ডাক নাম বুড়ি। ভালো নাম তার নন্দিতা। নন্দিতা দেবীর নৃত্যকুশলতার প্রশংসা ইতিমধ্যেই প্রচারিত। তিনি নাচেন বেশ সাবলীল ছন্দে অনায়াসে। তাকে উদ্দেশ করে একদিন দিলেন মুখে মুখে ছড়া তৈরী করে—

হে শ্রীমতী নন্দিতা
নাচের ছন্দে ছন্দিতা,
'বুড়ী' তোমায় বলে, জেনো
উল্টে বলার ফন্দি তা।

এমন করে তিনি রোগ গৃহের মধ্যে করেন রসের সৃষ্টি। আর এক দিনের কথা। নাতনী তাঁর ঘরে ঢুকতেই (কারণ এখন তিনিই তাঁর প্রধান শুশ্রূষাকারিণী) কবি সস্নেহ হাসি মিশিয়ে ছড়া কাটলেন—

"ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকাল বেলা মেজাজটা খোস তো?
একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস্ তো
কেন তুই চলে যাস করি নাই দোষ তো?"

আমরা যারা কাছাকাছি থাকি, তাঁর এই মুখ-ঝরা রসের টুকরো-গুলোকে যত্নে কুড়িয়ে রাখি খাতায়। অবসর মত উপহার দিই কবির ভক্তদের। ছাপার অক্ষরে এসব ছড়ার রূপ দেখে তিনি হাসেন। হয়তো বা মনেও করেন, এসব দিয়ে লোকে লোকের মন ভোলায়। এই সব কাণ্ড দেখে, দিলেন মুখে মুখে তৈরী করে ছড়া, নাম দিলেন "হাফ প্রাইস"। সে ছড়াটি এই—

আধেক দরে খাতায় দেখি উঠেছে মোর নাম,
শেষের অঙ্কে তলিয়ে গেছে দাম।
সস্তা মালের খদ্দেরদের হচ্ছে আবির্ভাব,
ভাবছে তারা যা পাই—সেটাই লাভ।
খালাস হয়ে যাবার দিনে মাথা করে নীচু
শ্রদ্ধা বাকী রইবে না আর কিছু।

কবিকে একথা বোঝান শক্ত যে তাঁর এই সব টুকিটাকি ছড়া এবং ছন্দোবদ্ধ হাস্য পরিহাসের মূল্য যথেষ্ট বেশী—'সস্তা' দরের কোঠায় পাঠক এগুলিকে কোনদিনই ফেলেন না।...

বঙ্গলক্ষ্মী]

"সবলা"

শ্রীযুগলকিশোর সরকার, বি-এ

আলোচ্য কবিতাটি কেবল "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নহে, সমগ্র আর্য্য-সাহিত্যের মধ্যে একটি অনুপম, অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হিন্দুকাব্যসমূহের নায়িকার চরিত্রে 'দ্রৌপদী'র ছায়াপাত কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। 'সবলা'কে 'দ্রৌপদী'র আধুনিকতম সংস্করণ বলা চলে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দ্রৌপদী" প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকার চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতাগুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ-স্থলাভিষিক্তা। ... একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সীতা'র সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু 'দ্রৌপদী'র অনুকরণ হইল না।"

কিন্তু আসলে বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র "ভ্রমর" চরিত্রে মহাভারতকারের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি দ্রৌপদীর অনুকরণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার লিখিত "দ্রৌপদী" প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর ভিতর প্রধানতঃ দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—দ্রৌপদীর দর্প ও ধর্ম্ম। তাঁহার "প্রবল ধর্ম্মানুরাগই প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডস্বরূপ।" "ভ্রমর"ও বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত হিন্দুকাব্যসমূহের সাধারণ নায়িকার মত নয়;—ভ্রমরও দর্পিতা, ভ্রমরও তেজস্বিনী। দ্রৌপদীর ভিতর যে ধর্ম্মানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহাতে কোন অস্বাভাবিকতা নাই, উদ্দামতা নাই, ধর্ম্মবোধের কোন উগ্র বিকাশ নাই—আছে ধর্ম্মানুরাগের সহজ, সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক পরিণতি। ভ্রমরের ধর্ম্মানুরাগও ঠিক ঐ প্রকার এবং সকল স্থানেই ভ্রমরের দর্পের আশ্রয় ধর্ম্ম। গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর পঙ্কিল প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন তখন ভ্রমর 'পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, লজ্জাশীলা ও সহিষ্ণু সতীসাধ্বী'র মত কাঁদিয়া কাটিয়া, স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়েন নাই—অধিকন্তু লিখিয়াছেন, "যত দিন তুমি ভক্তিযোগ্য তত দিন আমারও ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। 'সবলা'র ভিতরও অবিকল ঐ সুর ধ্বনিত হইয়াছে;—

> "কভু তা'রে দিব না ভুলিতে
> মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
> বিনম্র দীনতা
> সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,—
> ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জার।"

আবার দ্রৌপদীর মত ভ্রমরের দর্পের আশ্রয়ও ধর্ম্ম। গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন ভ্রমর জোড়হাত করিয়া বিকম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছিল, "তবে যাও—আর আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর, কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। * * * যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।" শুধু এই কয়েকটি কথা হইতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু যে ভ্রমরের দর্পই আছে তাহা নহে—ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা আছে, প্রেম আছে, সতীত্ব আছে, আশা আছে, প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা আছে, বিশ্বাস (Faith) আছে। সবার উপর আছে প্রেমের একটি সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপ যাহার ভিতর দীনাত্মার কাতরতা প্রকাশ পায় নাই, হীন ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায় নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র বহুস্থানে কোথাও সুস্পষ্টভাবে কোথাও ইঙ্গিতে ঐ একই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের অতীত যুগের একটা অপূর্ব্ব আদর্শ বাঙ্গলা দেশের তাৎকালিক সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতীও হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে পাছে তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—"ভ্রমর" তাৎকালিক পরিপ্রেক্ষা ও রুচির সহিত বে-মানান হয় তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ মুক্তভাবে লেখনী চালনা করিতে পারেন নাই, শঙ্কিত মনে করিয়াছিলেন। যে ভাব-শিশু যে অপরিপুষ্ট কল্পনা যে প্রেরণা "ভ্রমর" চরিত্র-সৃষ্টির ভিতর ক্রিয়াশীল দেখিতে পাই, তাহার পূর্ণ পরিণতি দেখি না। ঐরূপ ভাবের পর্য্যাপ্তি ও পূর্ণ পরিণতি, ঐরূপ কল্পনার অকুণ্ঠিত প্রসার, এবং তেজস্বিতার অপ্রতিরোধ্য বিকাশ দেখিতে পাই কবির তেজোময়ী দুলালী এই "সবলা"র ভিতর।

"সবলা"র ভিতর দেখিতে পাই,—

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার,
> হে বিধাতা?
> পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি'
> ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
> দৈবাগত দিনে?
> শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
> সার্থকের পথ?
> কেননা ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ
> দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা পাশে?
> দুর্জ্জয় আশ্বাসে
> দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
> কেন নাহি করি আহরণ
> প্রাণ করি পণ?"

"সবলা"র ভিতর যে-সুর ধ্বনিত হইয়াছে কবির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু কবিতা, গদ্য-কবিতা, কণিকা ও গল্পের ভিতর তাহা দেখিতে পাই

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্ত্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।"

* * *
* * *

"আমাকে তুলে দেননি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক ক'রে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ওপারে বালুডাঙ্গায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপ্‌সা দূরের জগৎ,
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাইনে কিছুই কোনোদিকে।"

"সবলা" প্রার্থনা করিতেছে—

"হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের 'পরে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে
নির্ব্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্ব্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রেমের যে সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপ প্রথমে দ্রৌপদীর পরে ভ্রমরের মধ্যে বিরাজমান দেখিতে পাই তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে কবির তেজোময়ী দুলালী এই "সবলা"র ভিতরে। "সবলা"র উপরোক্ত প্রার্থনা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, 'সবলা'র নারী-প্রকৃতি এক অনাগত কিন্তু অচিরভাবী পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। "সবলা" যেন এখানে মহত্তর এক নবজীবনের নেপথ্য-বিভাগে থাকিয়া তাহার চিরআকাঙ্ক্ষিত চরম ও পরম পূর্ণতাকে সর্ব্বাবয়বে তাহার অন্তর-দেউলে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রতীক্ষমানা। ঐ পরিপূর্ণতার মধ্যে কোন দৈন্য, কোন গ্লানি, কোন অপূর্ণতা থাকিবে না। যে উচ্চাঙ্গের অবস্থা কল্পিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন বৈদিক রমণী-গণের উচ্চাদর্শকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

তবে "সবলা"র আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকুতির ভিতর, "সবলা"র সত্য-প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ প্রেমের ভিতর যদি কেহ কেবল উচ্ছ্বাস আবেগ ও উদ্দামতারই সন্ধান পাইয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে তিনি 'সবলা'র অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পান নাই। 'সবলা'র প্রেম উদ্দাম, ক্ষণস্থায়ী, অন্ধ অনুরাগ মাত্র নহে;—উদ্দামতা এখানে ধ্যানের স্থিতিশীলতা দ্বারা সংহত হইয়া সংযমে, শোভায়, কল্যাণে—এক কথায় সার্থক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে মহীয়সী নারীর সার্থক সারথ্য অর্জ্জুনের ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, যে মহীয়সী নারীর প্রবল প্রেম বনবাসে অবসন্ন ও মুহ্যমান পাণ্ডবকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে মহীয়সী নারী

খাদ্য-প্রাণ

মানুষের দেহে প্রতিক্ষণ যে ক্ষয় চলছে, তার পূরণের জন্য চাই যথোপযুক্ত আহার। তাই বলে' কতকগুলো ফেন গালা ভাত, মশলাবহুল ডাল তরকারি কিম্বা ঝাল-বহুল শাক চড়চড়ি খেলেই হয় না। ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে কি ভিটামিন "এ'র বৈশিষ্ট্য থাকে।

ওষুধ খাদ্যকে replace করতে পারে না কখনই। ওষুধের প্রয়োজন জীবনে কোথাও আসে, কিন্তু সেটা নিতান্ত সঙ্ক্ষিপ্ত বা ক্ষণিক! মানুষের দেহকে পুষ্ট করে আহারেই শেষ পর্য্যন্ত, ওষুধ একটি সহায়ক মাত্র হিসাবে আসতে পারে, কোন কোন অবস্থায়।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে দেহ পুষ্টির জন্য, "ভিটামিন এ" র বিশেষ প্রয়োজন। যে কয় প্রকার ভিটামিন আছে তার মধ্যে ভিটামিন "এ"ই শ্রেষ্ঠ, এবং এ বস্তু মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না, ঘি দুধ প্রভৃতির মধ্যেই থাকে।

আজকের ভারতের গামা, হরবংশ সিং প্রভৃতি বলিষ্ঠ সংগ্রামপটু পুরুষসিংহের কাছেই শুধু নয়, দুধ ঘিয়ের শ্রেষ্ঠতা সেকালে দেবাসুর সংগ্রামেও প্রমাণিত হয়েছিল। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা ত এই ঘৃতেরই রূপক ছন্দ।

খাদ্যে ঘিয়ের ব্যবহার নানা প্রকার। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ঘিয়ের প্রকৃষ্ট ব্যবহার পাতে ঘি খাওয়ায়। ঘি দিয়ে যে ভাত খাওয়া হয়, তার জন্য মশলাও কম ব্যবহার হয়।

ঘিয়ের যা গুণ, তা খাঁটি ঘিতেই সম্ভব, বলা বাহুল্য। 'শ্রী' মার্কা ঘি যে বিশুদ্ধ তার পরিচয় গত অর্দ্ধ শতাব্দী দেশবাসী পেয়ে থাকবেন। এই ঘি তৈরী করবার সময় অতিরিক্ত জাল দিয়ে, তার খাদ্য-প্রাণ নষ্ট করা হয় না।

উদাত্ত স্বরে একদা ঘোষণা করিয়াছিল,—'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিমকুর্য্যাম্'—'সবলা' সেই শ্রেণীর (Type) নারীর সগোত্র। ঐ শ্রেণীর নারীকে উদ্দেশ করিয়া কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা.
হে কল্যাণী তুমি নিষ্কলুষা.
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস।
* * *
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হ'তে লহ জিনি—
চিত্তেরে তুলুক উর্দ্ধে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।"

যুক্তপ্রদেশে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কাশীধামে বাঙালীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা "প্রবাসী"তে কাশীর তিনটি মাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্যগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া গেল। "বাণী বালিকা বিদ্যালয়" নামক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নাম প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে, কিন্তু এই নামের কোন বিদ্যালয় কাশীতে নাই।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির—ময়মনসিংহবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত ১৯২২ সনের ২৪শে কার্ত্তিক কাশীর স্বর্গীয় ডাক্তার নিত্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনের একটি কক্ষে দুইটি মাত্র ছেলে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির স্থাপিত করেন। প্রথমে ইহা জাতীয় বিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয়, পরে ইহাকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। দীনেশবাবুর আজীবন ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিদ্যামন্দির গত ১৯৩৮ সনে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরই বাঙালীদের একমাত্র উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়।

এখানে একটি কথা বিশেষ স্মরণীয়। আজকাল "বিদ্যামন্দির" নামটি সারা ভারতে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। ইংরেজী "স্কুল" শব্দের পরিবর্ত্তে "বিদ্যামন্দির" শব্দটি দীনেশবাবুই সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাকে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটেও "বিদ্যামন্দির" শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে অনাথ ও দরিদ্র বালকগণ বিনা বেতনে পড়িতে পারে। এখানে ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এখানে বাংলা, আসাম, বিহার, মিথিলা, সংযুক্ত-প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ—সব প্রদেশের ছেলেই পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে। বর্ত্তমানে বিদ্যামন্দিরে প্রায় ২৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী অ-বাঙালী।

বিদ্যামন্দির বর্ত্তমানে যে-বাটীতে অবস্থিত তাহার স্বত্বাধিকারী লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বাঙালী শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত এম-এসসি, এলএল-বি মহাশয়। অদূর ভবিষ্যতে তিনি এই বাড়ী ও জমি বিদ্যামন্দিরকেই দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিদ্যামন্দিরের পরিচালনা সমিতির পনর জন সদস্যের মধ্যে তিন জন ব্যতীত আর সকলেই বাঙালী।

২। শ্রীসারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির কর্ত্তৃক পরিচালিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় হিন্দুস্থানী গরীব মেয়েদের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এই বালিকা-বিদ্যালয়টি কাশীর আওরাঙ্গাবাদ মহল্লায় স্থাপিত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষয়িত্রী অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ইতিমধ্যেই ছাত্রীসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে।

৩। বিবেকানন্দ নৈশ-বিদ্যালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির কর্ত্তৃক পরিচালিত। হিন্দুস্থানী "হরিজন" এবং নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত ১৯৩৮ সনে এই নৈশ-বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন। কাজ বেশ ভাল চলিতেছে, অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং করিতেছে।

৪। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বল

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে বিদ্যালয়টি চলিতেছে। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কেবল মাত্র বাঙালী ছেলেরাই এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। মিউনিসিপালিটি হইতে মাসিক কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

৫। হরিহর পাঠশালা—শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর মজুমদার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাশীর বিখ্যাত সাধু হরিহর-বাবার নামে বিদ্যালয়টির নাম রাখা হইয়াছে। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে এবং শুধু বাঙালী বালক-বালিকাই এখানে পড়িয়া থাকে। মিউনিসিপালিটি হইতে মাসিক কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

৬। এডুকেশন সোসাইটি—স্থানীয় হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পাঠশালাটি স্থাপিত করেন। এখানে চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাঙালী বালক অধ্যয়ন করে।

৭। নারী শিক্ষামন্দির—শ্রীযুক্তা উষারাণী সেন নাম্নী জনৈকা বিধবা মহিলার চেষ্টা ও যত্নে প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শুধু বাঙালী মেয়েরাই পড়িয়া থাকে। এখানে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মিউনিসিপালিটি ও সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়।

৮। মাতৃমঠ—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদবাসিনী নিয়োগী নাম্নী জনৈক বিধবা মহিলা বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন। প্রথমে ইহার অন্য একটি নাম ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন ইহার ম্যানেজার ছিলেন তখন তিনি ইহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "মাতৃ-মঠ" নাম রাখেন। বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মাতাঠাকুরাণী ৺ধরাসুন্দরী দেবী মহাশয়া কয়েক বৎসর ইহার সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, সাহিত্যিক ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহ এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় পরিচালন-সমিতির সদস্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদবাসিনী নিয়োগী মহাশয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাভাব হেতু প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা খারাপ হইয়া উঠায় কাশীর মিউনিসিপালিটি বছর-তিনেক পূর্ব্বে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ইহা মিউনিসিপাল বোর্ডের একটি প্রাইমারী

নিদাঘ তাপ প্রশমনে পুরাকালে বরাঙ্গে-চন্দন বিলেপন প্রচলিত ছিল। আজিও যাঁহারা অতীত যুগের সেই সুস্নিগ্ধ চন্দন বিলাসের পক্ষপাতী তাঁরা

ব্যবহার করুন

মলয়

ক্যালকেমিকোর

পবিত্র সুগন্ধি অঙ্গরাগ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চন্দনের সাবান

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এখন ইহাতে বাঙালী, অ-বাঙালী সব মেয়েই অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

৯। দুর্গাচরণ গার্ল্‌স্ হাই স্কুল—বিগত ১৯২৩ সালে বাংলার প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া কাশীতে আসিয়া "নারী-কর্ম্মমন্দির" নামে একটি জাতীয় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। হাড়ারবাগ মহল্লায় মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হয় এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য আরম্ভ হয়। নারী-কর্ম্মমন্দিরে সাধারণ লেখাপড়া ভিন্ন তাঁতের কাজের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বসন্তবাবু স্থানীয় নাগরিকগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জমিদার স্বর্গীয় পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এজন্য ৫০০৲ এককালীন দান করিয়াছিলেন। বসন্তবাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী কংগ্রেসের কার্য্যে যখন এদিকে আসিতেন তখন তাঁহারা কাশীতে আসিয়া নারী-কর্ম্মমন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন এবং ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম ঘোষাল মহাশয় প্রতিষ্ঠানটি দেখাশুনা করিতেন। কিছু কাল পরে বসন্তবাবু একটি পরিচালন-সমিতি গঠন করিয়া ইহার হাতে প্রতিষ্ঠানটির ভার সমর্পণ করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর এই পরিচালনা সমিতিই প্রতিষ্ঠানটির "নারী-কর্ম্মমন্দির" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বিবেকানন্দ বাণীভবন" নাম রাখেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার "শ্রী-ঘৃত" কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কয়েক হাজার টাকা দেওয়ায় পুনরায় "বিবেকানন্দ বাণীভবন" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অশোকবাবুর পিতার নামে প্রতিষ্ঠানটির নাম "দুর্গাচরণ গার্ল্‌স হাই স্কুল" করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দী মহাশয়া যখন নারী-কর্ম্মমন্দির এবং তৎপরে বিবেকানন্দ বাণীভবনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তখন তাঁহার এবং তাঁহার স্বামী ৺বীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতার ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর চেষ্টার ফলেই বিবেকানন্দ বাণীভবন সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটিতে একমাত্র বাঙালী মেয়েরাই পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহাতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত রহিয়াছে এবং প্রায় ২৫০টি মেয়ে পড়িতেছে।

১০। মহাকালী পাঠশালা—হরিশ্চন্দ্র রোডে স্বর্গীয় সবজজ কিশোরীমোহন শিকদার মহাশয় স্বীয় বাসভবনের এক তলায় বাঙালী মেয়েদের জন্য এই পাঠশালাটি স্থাপিত করেন। হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমানে ৪০।৫০টি মেয়ে এখানে পড়িতেছে। মিউনিসিপালিটি হইতে মাসিক কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

কাশীতে বাঙালী চতুষ্পাঠী

১। দেবনাথ চতুষ্পাঠী—১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে হাউস-কটারা মহল্লায় শ্রীমৎ দেবপ্রতিপালক স্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুষ্পাঠীর একটি স্থায়ী ফণ্ড এবং নিজস্ব বাড়ী রহিয়াছে। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা এবং পরিচালক ছিলেন স্বর্গীয় অরবিন্দবন্ধু নাথ, এফ-টি-এস। বর্ত্তমান পরিচালক অরবিন্দবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামগোপাল নাথ মহাশয়। নাথ-সম্প্রদায়ের যে-সব বাঙালী বিদ্যার্থী সংস্কৃত পড়িতে চায় তাহারা এখানে ভোজন ও বাসস্থান পাইয়া থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থিগণকেও গুণানুসারে বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই চতুষ্পাঠীতে ৮টি বিদ্যার্থী রহিয়াছে।

টেলিফোন :— হাওড়া ৫৩২, ৫৬৩
টেলিগ্রাম :— "গাইডেন্স" হাওড়া।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—দাশনগর, হাওড়া।

ব্রাঞ্চ— বড়বাজার—৪৬নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
নিউ মার্কেট—২নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কুড়িগ্রাম (রংপুর)

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি
কারেণ্ট একাউণ্ট—২%
সেভিংস ব্যাঙ্ক—২%
ফিক্সড ডিপোজিটের হার আবেদন সাপেক্ষ।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

২। ভূদেব চতুষ্পাঠী—মানসরোবর মহল্লায় স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক বিগত বাংলা ১৩৪১ সালে ইহা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে এই চতুষ্পাঠীর খরচ দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। শরৎকুমারী সংস্কৃত বিদ্যাশ্রম—গোধূলিয়ার চৌমাথায় প্রকাণ্ড বাড়ীতে এই চতুষ্পাঠী অবস্থিত। গত ১৯২৮ সালে ইহা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত মনোহরলাল শীল মহাশয় ইহার মালিক। তবে অমৃত সমাজের শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টা-চরিত্রেই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্য্যতঃ তিনিই ইহার কর্ণধার। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন (স্বামী অবধূতানন্দ) বিদ্যাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৬০।৭০ জন। তন্মধ্যে অ-বাঙালীর সংখ্যাই অধিক। মেধাবী দরিদ্র বিদ্যার্থিগণকে মাসিক ২৲, ৩৲, ৪৲ এবং ৭৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে এখানে বিদ্যার্থিগণের ভোজন ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা নাই। বিদ্যাশ্রমের ভবনে একটি অবৈতনিক পাঠাগার ও একটি পাঠশালা আছে। পাঠশালাটির জন্য মাসিক ২০৲ টাকা ব্যয় হয় অথচ ছেলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মনে হয়, শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু যদি মাসিক ২০৲ অ-বাঙালীদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য এখানে খরচ করিতেন তবে একটা কাজের মত কাজ হইত।
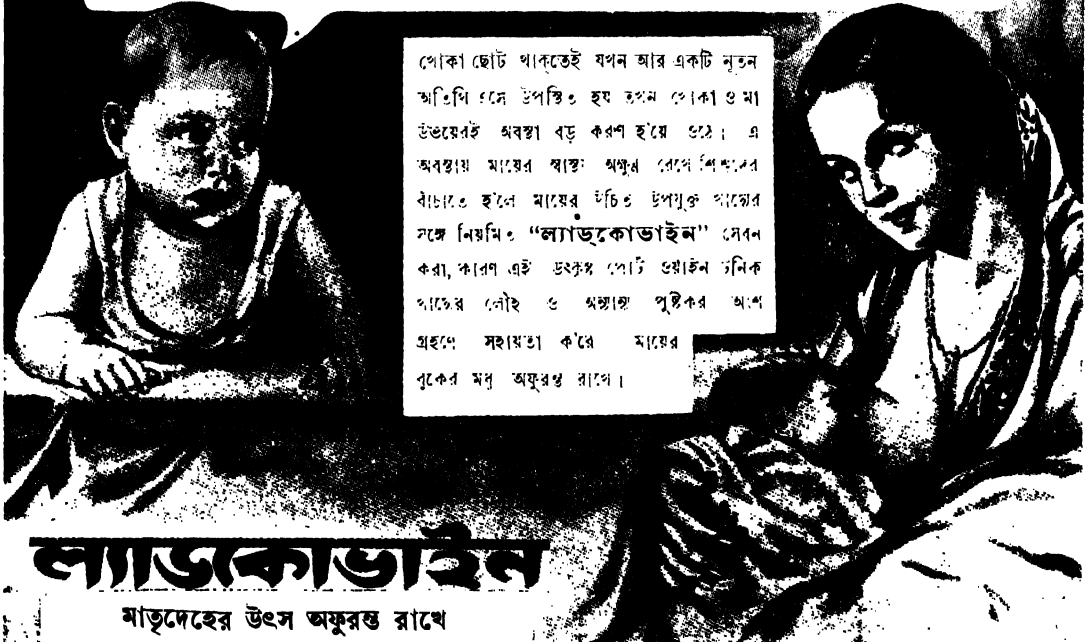
৪। শ্রীকান্ত চতুষ্পাঠী—টাকীর জমিদার ৺শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে ইহা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হাউস-কটারা মহল্লায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ৮।১০ জন বিদ্যার্থী আছে।

৫। বিশ্বেশ্বর চতুষ্পাঠী—খালিশপুরা মহল্লায় প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ১৫।১৬ জন বিদ্যার্থী পড়িতেছে।

৬। সারদেশ্বরী চতুষ্পাঠী—প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫।৬ জন।

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাকতেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে; এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাড্‌কোভাইন" সেবন করা, কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা ক'রে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাডকোভাইন
মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে

লিষ্টার এন্টিসেপ্টিক্‌স্‌ ∴ কাশীপুর, কলিকাতা

৭। যোগমায়া চতুষ্পাঠী—গণেশ মহল্লায় ৺রাখালচন্দ্র দে মহাশয়ের পত্নী ৺যোগমায়া দাসী কর্ত্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ছাত্র সংখ্যা ৭ জন। প্রত্যেকে ৬॥০ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। এই চতুষ্পাঠীর একটি স্থায়ী ফণ্ড রহিয়াছে।

বিন্ধ্যাচলে বাঙালীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ দাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন স্বাস্থ্যের জন্য বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি নিজ ব্যয়ে বিন্ধ্যাচলে একটি পাঠশালা স্থাপনা করেন। পাঠশালার বাড়ী, শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মহেশবাবুই দিয়াছেন। এই পাঠশালায় শুধু অ-বাঙালী ছেলেরা পড়িয়া থাকে এবং শিক্ষকগণ সকলেই অ-বাঙালী।

লক্ষ্ণৌয়ে বাঙালীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

১। লক্ষ্ণৌ শহরের বিখ্যাত ক্যানিং কলেজ অযোধ্যার প্রথম বাঙালী তালুকদার ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কৈসরবাগে স্থাপিত এবং ১৯১০ সালে ইহা বাদশাহ-বাগে স্থানান্তরিত হয়। গত ১৯২২ সালে এই ক্যানিং কলেজই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি স্বর্ণ-পদক ও পুস্তক পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত ৩০০০৲ দান করিয়াছেন। বস্তীর জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত একটি স্বর্ণপদকের জন্য এককালীন এক হাজার টাকা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও ৩০০০৲ (তিন হাজার) টাকা দান করিয়াছেন।

২। কুইন্‌স্ এ্যাংগ্লো-সংস্কৃত হাই স্কুল—এই প্রতিষ্ঠানটি স্বর্গীয় ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী এবং স্বর্গীয় রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুকাল ইহার পরিচালন-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৭৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহার সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক সকলেই বাঙালী।

৩। জুবিলী গার্লস্ হাই স্কুল—সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় বাঙালীর চেষ্টায় 'মহাকালী পাঠশালা' নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে তখন বাঙালী, অ-বাঙালী সব রকম ছাত্র-ছাত্রীই একসঙ্গে পাঠ করিত। কিছু কাল পরে মহাকালী পাঠশালা ভাঙিয়া গিয়া বাঙালী মেয়েদের জন্য "হরিমতী গার্লস্ স্কুল" এবং অ-বাঙালী মেয়েদের জন্য "মহিলা বিদ্যালয়" নামে দুইটি বালিকা-বিদ্যালয় হয়। তার পর হরিমতী গার্লস্ স্কুলের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "জুবিলী গার্লস্ হাই স্কুল" নাম হয়। এই স্কুলের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী এবং পরিচালন-সমিতির সদস্য—সবই বাঙালী।

৪। এংলো-বেঙ্গলী হাই স্কুল—মহাকালী পাঠশালায় প্রথমে যে-সব বাঙালী ছেলে পড়িত তাহাদিগকে লইয়া এংলো-বেঙ্গলী হাই স্কুল ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাতে প্রায় ৪৫০ জন ছেলে পড়িতেছে। তবে ছেলেদের মধ্যে বাঙালী, অ-বাঙালী দুই-ই আছে। বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ১২৫ জন হইবে। ইহার প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন-সমিতির সকল সদস্যই বাঙালী।

৫। বিদ্যান্ত হিন্দু হাই স্কুল—এংলো-বেঙ্গলী হাই স্কুলের ৫ জন শিক্ষক ও কতিপয় ছাত্র লইয়া ১৯৩৮ সালে 'বিদ্যান্ত হিন্দু হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত এবং তদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বিদ্যান্ত মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় হরিপ্রসাদবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত এম. এসসি, এল-এল, বি, মহশায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ তাঁহার এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি সম্প্রতি দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনিই ইহার সম্পাদক। পরিচালন-সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এক জন ব্যতীত আর সবই বাঙালী।

[illegible] রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
[illegible] রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বরষায়
শ্রীতারাপ্রসাদ বিশ্বাস

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী
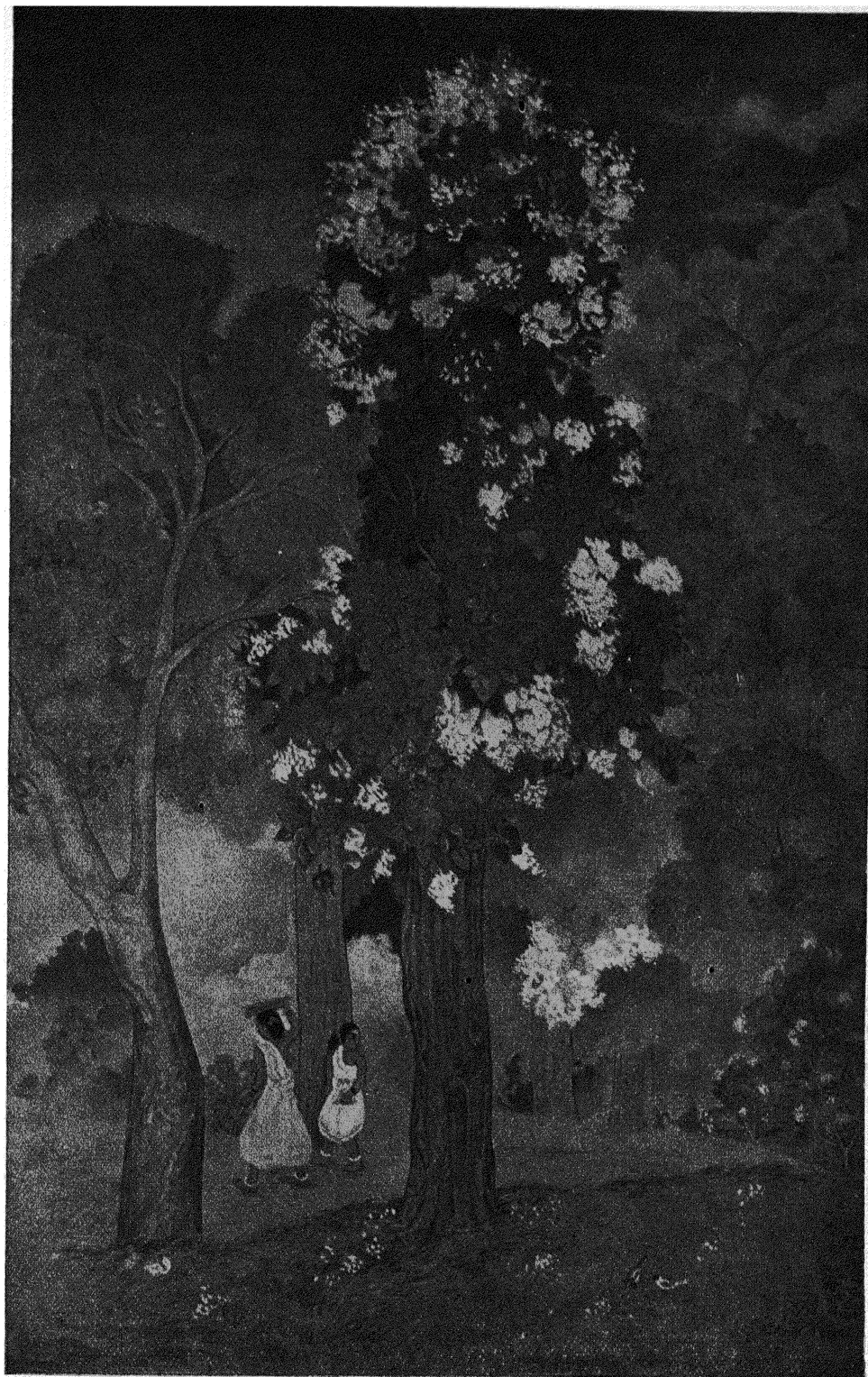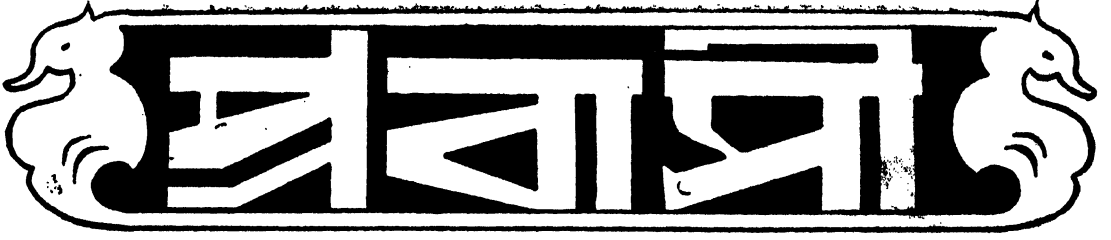
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৮

৩য় সংখ্যা

ধূলি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাণীর মূরতি গড়ি
এক মনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা করে থাকে নিচু
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহু গুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এককালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়,
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে,

কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ দেখা দিল মানবের দ্বারে।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে ॥

উদয়ন
৪ মে, ১৯৪১
সকাল

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

[রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি তারিখ অনুসারে পরে পরে ছাপা হচ্ছে। এ মাসে, গত মাসের মত, এই ধারার ব্যতিক্রম ক'রে একটি আধুনিক চিঠি গোড়াতেই ছাপা হ'ল।]

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

পুরস্কার অনেক সময় সম্মুখে আসে, কিন্তু হাতে পৌঁছয় না। কিন্তু সে পুরস্কার প্রায়ই বাইরের দান। য়ুরোপে যে সম্মান আমাকে আনন্দ দিয়েছিল বস্তুত সে সম্মান নয়, সে অকৃত্রিম প্রীতি। আমার সঙ্গে ইয়োরোপীয় মনের যে সংযোগ ঘটেছিল সে কোন্ সূক্ষ্ম প্রভাবের পথ দিয়ে তা বলা শক্ত। এই জন্যই সে অহৈতুক হৃদয়ের দান আমাকে পদে পদে এতো তৃপ্তি দিয়েছিল নরওয়ে থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্য য়ুরোপ পর্যন্ত। কারণ আমি বার বার আপনাদের বলেছি যে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান আমি তার স্থায়িত্বকে বিশ্বাস করি না। ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা তাদের পরিচিত ভাষা। এই জন্য তার সমাদর প্রথম বিস্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জ্বল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজী ক্ষণকালের জন্য যতই বিস্ময়কর হোক চিরকালের বন্ধনে তার নোঙর আঁকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথা। সেই জন্য এই সদ্যপাতি সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লজ্জা করে। আমার স্বদেশীয়রা যাঁরা ইতিমধ্যে ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁরা আমার এই আশঙ্কার কথা আপনাকে জানাতে পারবেন। এমন কি এই অশ্রদ্ধায় তাঁরাও হয়ত মনে মনে কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি তো বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে কখনো অঞ্জলি পেতে দাঁড়াই নি। আমি যে তাঁদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান নিতে পারি তা আমি কল্পনাও করি নি, প্রত্যাশাও করি নি। সুতরাং এ ব্যাপারটা সব শুদ্ধ একটা দৈবাগত অপঘাত বললেই হয়। কিন্তু য়ুরোপের অন্যত্র আমি যে সমাদর পেয়েছি—সে হৃদয়ের। সে অলক্ষিত পথে আপন রহস্যজালে আকর্ষণ করে, বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যিক নিক্তি দিয়ে তারা স্যাকরার দোকানে দাম যাচাই করে না। দাম তাদের হৃদয়ের নিগূঢ় কক্ষে, এ আমি পদে পদে অনুভব করেছি, ক'রে যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমনি আনন্দ পেয়েছি। বস্তুত এই দানের একমাত্র সাক্ষী আমি নিজে—আমার অন্তরাত্মা। দ্বিতীয় বার য়ুরোপে গিয়ে এই স্নেহলিপির উপরে পুনর্বার যে দাগা বুলোতে পারবো তার সুদূর সম্ভাবনা রইলো না। কারণ য়ুরোপ আজ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। অতএব এ নিয়ে এখন আক্ষেপ করা মিথ্যে এবং পুনর্বার এর সমর্থনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ ছেলেমানুষী। যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন ঘটনাবলীর কোনও উল্লেখ না করেও তাঁরা এই আশ্চর্য মানবহৃদয়ের সম্বন্ধ রহস্য অনুভব করে থাকবেন এবং সেইটুকুই জানবার ও জানাবার কথা। তার বেশী কিছু তন্ন তন্ন করে বিবরণ বলবার ও লিখবার আজ আর কোনও মূল্য নেই। আপনি নেপথ্যে থেকে অল্প যেটুকু আভাস পেয়েছেন সেও এই অকৃত্রিম মানব প্রীতির। এই প্রীতি এতটা বিস্তারিত হয়েছিল যে আমার সঙ্গীরাও পূর্ণ স্বাদ পেয়েছেন এবং আজও তা তাঁরা ভোগ করে থাকেন। এইটিই আমার জীবনের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় কথা। এতে আমার

হৃদয়ের যে প্রসার ঘটেছে সে একটি অপূর্ব শিক্ষা এবং তার জন্য আমি য়ুরোপীয় মহাদেশের কাছে সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ। আমার হৃদয় দিয়ে আমি সেখানে মানবহৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছি। এই হৃদয়ের সংস্পর্শ কখনো বিলুপ্ত হবার নয়। জানবেন এর সমর্থন আমার চিত্তের মধ্যে মানবপ্রেমের উদ্বোধনে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না। দুঃখ করবার কারণ বাইরে পড়ে থাক। আনন্দের ভোজ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতি ৬ মে, ১৯২১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বড়োদার পথে আমেদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনো মতে সাহিত্য সম্মেলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না তখন বহুকষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে একটা লেখা অবনের মারফৎ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল—ক্ষমা পাই নি। শুনলুম ডাক পেয়াদার মারফতে না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এ সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনো দিন লিখি নি— এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।

আপনার শরীর অসুস্থ শুনে উদ্বিগ্ন রইলুম। আমার শরীর এখনও কাজের বার হয়ে আছে। লম্বা চেয়ারে নিষ্কর্ম্ম পড়ে পড়েই দিন কাটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু যথেষ্ট বিশ্রামের সম্ভাবনা বিরল। আপনি ও শান্তা কেমন আছেন কালিদাসকে লিখতে বলে দেবেন। ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

Dartington Hall.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এখনো আপনার প্রেরিত অমৃত বাজারের রিপোর্ট পাই নি। যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করব। কিন্তু যদি হিন্দুমুসলমানে আত্মকলহের বেশী কোনো খবর না পাওয়া যায় তাহলে চুপ করে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পলিটিক্স একটা দ্যূতক্রীড়া। পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা হারজিতের লড়াই। কোনো পক্ষ যদি অন্যায় চাল চালে তবে জগৎসভার কাছে তার নিন্দা প্রচার করা চলে। কিন্তু কে বিচার করবে—এ খেলায় ধর্ম্মের নিয়ম কেউ তো মানে না। আর দয়ার দোহাই কাকেই বা দেব? আয়ার্ল্যাণ্ডে কৃষ্ণপিঙ্গল উপদ্রবের কথা মনে আছে তো? এত বড় নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত য়ুরোপের সামনেই ঘটেচে অথচ তাদের পরস্পরে রক্তের সম্বন্ধ আছে। গবর্মেণ্টকে ঠেলে ফেলতে গেলে গবর্মেণ্ট সনাতন রীতি অনুসারে দ'লে ফেলতে চাইবেই। এই অনিবার্য্য দুঃখ সহ্য করেও যদি মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে পারি তবে জিতে গেলুম। রাষ্ট্রবিপ্লবে যে অস্ত্র দুর্ব্বলের হাতে আছে আমরা তা ব্যবহার করচি আর প্রবল প্রতিপক্ষের হাতে যে অস্ত্র আছে তারাও তা প্রয়োগ করচে * * * * *। একটা কথা বলে রাখি, শুনলুম প্যারিসে আমার কোন্ ইণ্টারভিয়ু অবলম্বন করে সমুদ্রের

এ পার থেকে ওপারে তারযোগে আমার কলঙ্ক প্রচার হয়েচে। কোনো কাগজওয়ালাকে ইণ্টারভিয়ু দিই নি—যারা কাগ্‌জি নয় তাদের কাছেও কোনো মন্দ কথা বলি নি। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়েনে যে প্রসঙ্গ বেরিয়েচে সেটা সমূলক এবং যথাযথ। এ ছাড়া স্পেক্টেটরে একটা লেখা বেরিয়েচে দেখে থাকবেন। নানা হাঙ্গামে লেখা বন্ধ আছে চিঠিপত্রও চলচে না। শরীর মন্দ নেই কিন্তু মন পীড়িত। ইতি ২১ জুন ১৯৩০

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিষ আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে সেই জন্যেই আসল জিনিষকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউবা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে; আমার পথ আমার তীর্থ-দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষ রূপে দেখে তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

ঢাকার উৎপাত সম্বন্ধে স্পেক্টেটরে আমি যে পত্র পাঠিয়েচি তার একটা নকল পাঠাই। আমার এ চিঠি স্পেক্টেটরে স্থান পাবে কি না জানি নে।

আমার এখানকার খবর সত্যমিথ্যা নানা ভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বার বার মনে হয় বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মত ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। যাক্ গে। ইতি ১৬ আগষ্ট ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

অতলান্তিক মহাসাগর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেচি, চলেচি আমেরিকার পথে। রাশিয়া যাত্রায় আমার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কি রকম চলচে আর ওরা তার ফল কি রকম পাচ্চে সেইটে অল্পসময়ের মধ্যে দেখে নিতে চেয়েছিলুম।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্চে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্ব্বল্য, সমস্তই

আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেচে সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায় তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেচে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়, কেবলি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, ক্ষিদে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত—অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপরে দেওয়া চলে না—তারপরে সব শেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি, তাহলে সেটা কেমন হয়? ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েচে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেচে, ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেচে, নিজেরই ধর্ম্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব্ব করে রেখেচে, তা ছাড়া কত অন্ধতা, কত মূঢ়তা, কত কদাচার, মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়—এ সমস্ত দূর হল কি করে? বাইরেকার কোনো কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার সাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েচে, সে হচ্চে ওদের শিক্ষা। জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েচে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে, বর্ত্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেচে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেন না ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি, যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেন না কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েচি। ভারতের উন্নতি সাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রী টম্‌সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে-মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না, উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত। এই তো হল ওদের দশা—বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্য্যশালী নয়, কেবল মাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েচে। রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি—ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা। তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকানরাও গোপনে

ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেচে তার "ডিফিকল্টি" ভারত কর্তৃপক্ষের ডিফিকল্টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো। অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হোত। কিই বা জানি কিই বা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে? আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। Law & Order কি পরিমাণে রক্ষিত হচ্চে বা না হচ্চে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি—শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তিও আছে, বিনা বিচারে দ্রুতপদ্ধতিতে শাস্তি সেও চলে, আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হলো চাঁদের কলঙ্কের দিক কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য—যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেচে। শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেচে—এখানে তাই হলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্চে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাতে হাতিয়ার স্ববশ। আমাদের সম্রাট্ বংশীয় খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকল্টিস যে কি রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচক্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চষমার দরকার করে না। প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হলো। এত কাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েচি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি। কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেচে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েচে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েচি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন, যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সবচেয়ে বাধা দিয়েচে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাধি হলো এই—সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

যাই হোক এ দেশের "এনর্ম্মাস ডিফিকল্টিজে"র কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকল্টিজ অতিক্রমের চেহারা চোখে দেখলুম। বিস্তারিত বিবরণ লেখবার সময় নেই। অন্যদের যে সব চিঠি লিখেচি সেই সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে অনেক কথা জানতে পারবেন। এ সমস্ত সংবাদ দেশের সবাইকে জানানো চাই অতএব ইংরেজীতে তর্জ্জমা করে মডারন রিভিয়ুতে ছাপাবেন।

শান্তিনিকেতনে সুরেন করের কাছে কিছু চিঠি পাবেন, রাণী প্রশান্তকেও লিখেচি—রথীকে লিখেচি—তার কপি হয়ত শান্তিনিকেতনে আছে। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিষ্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কতো আপিল বের করেন; অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি? দেখবেন যেখানে এক নামের বেশী আশা করেন নি সেখানে বহু নামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ তার পরে নাম বৃষ্টি অপরের। কখনো কখনো নাম করবার উদ্যোগ আমরা নিজেই করি। জনরব এই যে রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিজের চেষ্টায় নিজের নাম উঁচু করে তুলচেন। যাতে নাম হয় এমন কিছু কিছু কাজ করেচি,—অবশেষে উনসত্তর বছরের পরে বাংলা দেশে বিস্তর কাঠখড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে এক জয়ন্তী সাজিয়ে নিজের নাম মহিমাকে পাকা করবার জন্যে সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি রেখে গেলুম। যখন আমার জীবনী বের করবেন আমার এই চরম চাতুরীটার কথা উল্লেখ করতে ভুলবেন না—দেশের অনেক চতুর অন্তত মনে মনেও আমাকে বাহবা দেবে। বাংলার ভাবী কবিদের কাছে স্বনামসৃষ্টিপদ্ধতির একটা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া গেল। ইতি ২ পৌষ ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম। দুর্গতির আজ বন্যা বয়েছে পৃথিবীতে, আমার আর বিশেষ করে নালিশ করবার নেই। নিজের সাধ্যসীমার মধ্যে প্রয়োজন সঙ্কোচ করে জীবনধারণ করবার সাধনা ভালোই—আমি তার জন্যে আনন্দে প্রস্তুত হয়েছিলাম। * * *

* * * * * *

দৈন্য পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার সঙ্গে মানুষকে সমান ক্ষেত্রে নাবিয়ে আনে। বস্তুত তাদের চেয়ে জীবিকার সুযোগ আমরা অধিক পেয়েছিলুম দৈবগতিকে, নিজ গুণে নয়। সেইটে বুঝতে পারা ভালো—এবং বুঝতে পেরেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। সকলের চেয়ে দুঃসহ দৈন্য অন্তরের, সেইটে থেকে রক্ষা পেলেই জীবন সার্থক মনে করব।

কেদার এলে তার সঙ্গে ছবির বই ছাপানোর পরামর্শ করতে হবে। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

খড়দহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল এখানে এসেচি। আশ্রমে যাবার পূর্ব্বে যদি এখানে আসতে পারেন তা হলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হতে পারবে। আশ্রমে আশা আছে। সেখানে গেলে আপনার যত্নের ত্রুটি হবে না। মীরাও এখন সেখানেই। সেই ছবির বইয়ের সম্বন্ধে কেদার কি কিছু চিন্তা করচে? ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত বইখানি পেলুম। পৃথিবীতে যুগান্তর এলো। তার লক্ষণ য়ুরোপে দেখা দিচ্চে। কারণ য়ুরোপে মানুষ ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছে সম্পূর্ণরূপে।

অতীত ইতিহাস যদি সন্ধান করি তবে দেখতে পাব, কী আর্থিক কী সামাজিক পদ্ধতি মানব-সংসারে একটানা চ'লে আসে নি। এক মহাভারত আলোচনা করলে তার যত পরিচয় পাই তেমন কোনো একখানা বইয়ে পাওয়া যায় না। যে সব রীতি সব শেষে পরিণত হয়েচে তাই যে সব চেয়ে ভালো আমাদের চার দিকে চেয়ে দেখলে সে কথা মানা যায় না।

মানুষ অনেক প্রথা তৈরি করে তুলেচে যা মোটের উপর কাজ-চালানে, অথচ যা নানা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দুঃখকর, এমন কি, মনুষ্যত্বের অপমানজনক। জীবনযাত্রা যখন সংকীর্ণ পরিধিতে স্তব্ধ হয়ে জটাবহুল ছিল না তখনকার প্রত্যেক রীতিনীতি ধর্ম্মের নামে সনাতন চেহারা ধারণ করবার শান্ত অবকাশ পেয়েছিল। যেখানে অবস্থা আজও প্রায় সেই রকমই অচঞ্চল, নব যুগের আবর্ত্ত যেখানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি সেখানকার স্থাবরতায় পুরাতন নীতির ভিত্তি কাঁপে নি—সেখানে অবস্থান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে পুরাতন অনুশাসনপাশ ছিন্ন হয় নি। সেই অবস্থার ভাষায় অন্য অবস্থাকে বিচার করা চলে না।

য়ুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলেছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেচে গার্হস্থ্যে। গৃহ-যাত্রায় স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকার ভাগ আছে। পুরুষের কর্ত্তব্য ধন আহরণ, মেয়ের কর্ত্তব্য সংসারের প্রয়োজনে তার ব্যয়ের ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতায় পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নম্রভাবে না মেলাতে পারলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে য়ুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসার বিস্তার বেড়ে চলেচে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকা উপার্জ্জনে বাধ্য হয়েচে। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য যে লাভ করে সে স্বভাবতই ভীরুভাবে পরের মন জোগায় না। পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জ্জন রীতির বিপর্য্যয় ঘটাতেই ক্রমশই স্ত্রীধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন স্বতই ঘটে আসচে। এর প্রভাব পুরুষের উপর পড়তেও বাধ্য। তারা অনেকেই গার্হস্থ্যের দায়িত্ব বহন থেকে মুক্ত, অপর পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই নিয়ে সে দেশে আন্দোলনের সীমা নেই।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েচে বিজ্ঞান—বিশেষত মনোবিজ্ঞান। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় সমস্ত আব্রু সে খসিয়ে দিয়েচে, উপন্যাস নাটক রঙ্গভূমি সব জায়গাতেই মানব প্রকৃতি আজ অনাবৃত। মানব ইতিহাসের আদি যুগে দেহ ছিল নগ্ন, আজ মানুষের মনের রইল না বস্ত্র।

এমন সময় য়ুরোপে এল সর্ব্বনেশে এক যুদ্ধ। অতিকায় মৃত্যু এসে মানুষের মনকে দিয়েছে নির্লজ্জ নির্ম্মম করে। সেই কয় বৎসর বহুসংখ্যক মানুষ এমন এক অনিত্যতার মধ্যে দিন যাপন করেছে যেখানে সে আজ আছে কাল নেই। মৃত্যুর ব্যাপারটা যদিও চির সত্য তবু মানুষ যখন সংসারযাত্রা করে তখন মৃত্যু যেন নেই এই ভাবেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মৃত্যুকে কাছে দেখা সত্ত্বেও মৃত্যুকে যদি ভুলে না থাকতে পারে তবে কোনো বিশ্বাস কোনো ব্যবস্থার উপরেই সে বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে এত বৎসর ধরে এত বিরাটরূপেই মৃত্যুকে সামনে রাখতে হয়েছে যে সংসারের সমস্ত স্থিতিপ্রবণ নীতির পরেই তার আস্থা গেছে শিথিল হয়ে। এই সমস্ত কারণ জড়িয়ে মানুষ আজ আপন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একেবারে মূলের থেকে পরখ করে দেখতে প্রবৃত্ত। যখন মানুষের ছিল সম্পন্ন অবস্থা, তার ভোগের অধিকার ছিল ব্যাপক, তখন পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিতে তার ভয় ছিল, পাছে কোনো জায়গায় তার আরামে তার ঐশ্বর্য্যে ভাঙন লাগে—আজ সেই ভয়ের দশা গেছে—যার যার পুরোনো আশ্রয়ের জীর্ণ ভিত্তি থেকে সবাই বেরিয়ে পড়চে। নতুন করে পরীক্ষা করবার ভয় আর রইল না কারো।

য়ুরোপে যে তোলাপাড়া চল্‌চে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে—কেবল বই-পড়া কয়েক জন চষমা-পরা লেখক পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, রুশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আগ্রহ সম্ভবপর হতো না যদি নূতন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্তভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা আর করচে না, কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে। বলা বাহুল্য সেখানেও সনাতনী আছে মানব স্বভাবে। সেও রীতিমাত্রকেই পবিত্র প্রত্যাদেশ বলে মানে। তাদেরকেও সমাজে প্রয়োজন আছে। পরখ করবার দিনে তাদের বিরুদ্ধতাও সত্যের পরিচয়ে সহায়তা করে।

আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বই-পড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখচি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউ বা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বল্‌চে, নিশ্চিত জানি নে মানুষ কী করে আপন অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধান করবে—পাশ্চাত্যে সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উদ্যম চলেচে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবনমৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন ঘটিত। যদি পরজন্ম থাকে তবে পৌত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব। ইতি ২১ এপ্রেল ১৯৩৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্রমশঃ

[এই আষাঢ়ের প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, পাদরী এডওআর্ড টমসন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা দেবী ও শ্রীমতী মীরা দেবী।]

বিবাহ-বন্ধন

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশ

মানুষ জাতির উদ্ভব হইতেই যেমন তাহার সমাজ-বন্ধন, তেমনই তাহার পরিবার-বন্ধন তাহাকে অ-মানুষ হইতে মানুষ করিয়াছে। বন্ধনী হিসাবে গোষ্ঠী বা দল অপেক্ষা একান্নবর্তী পরিবার নানা কারণে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। জন্তুর ক্রমবিকাশে মানুষ যে জীবস্তরের অন্তর্ভুক্ত সেখানে দেখা যায় লেমুর হইতে বানর এবং বানর হইতে শিম্পাঞ্জী ও মানুষের যতই সন্নিকটে পৌছানো যায় ততই দল ও গোষ্ঠী-নির্ভরতা কমে এবং পারিবারিক সম্বন্ধ স্থায়ী ও সুস্পষ্ট হয়। সম্প্রতি বানর-পর্য্যায়ের উচ্চস্তরের শিম্পাঞ্জী, শিমাং, গরিলা প্রভৃতির পারিবারিক জীবনের আলোচনা সুরু হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় সন্তানবাৎসল্য ও যৌন আচরণ হিসাবে উহারা অন্য জন্তু অপেক্ষা মানুষের সঙ্গে অনেকটা সমান। স্ত্রীজাতির উপর সন্দেহ ও আধিপত্য, মাতৃস্নেহ ও পরস্পরের সদ্ভাব ও সহযোগ উচ্চস্তরের বানরশ্রেণীতে মানুষের সমভাব ও বৈচিত্র্য গ্রহণ করিয়াছে।

বানর-পরিবার হয় এক-স্ত্রী অথবা বহু-স্ত্রী গ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ এক একটি পরিবার সংসক্ত অথচ স্বতন্ত্রভাবে বনজঙ্গলে বিচরণ করে। মানুষ যখন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের জীবন আপদ- ও ভয়-সঙ্কুল করিয়া তুলে, তখনই কয়েকটি পরিবার মিলিয়া যূথ সৃষ্টি করে। ভয় বা বিপদ না থাকিলে তাহারা স্বতন্ত্র পারিবারিক জীবনেরই পক্ষপাতী।

এক-একটি পরিবারে যেটি বীর ও নায়ক সে ভয় দেখাইয়া বা বলপ্রয়োগ করিয়া তাহার বহু স্ত্রীর উপর অধিকার অটুট রাখে। বানর-সমাজে স্ত্রী-ঘটিত কলহ ও বিপদের অন্ত নাই। বল হারাইলে বীর হনুমানকে তাহার নায়কত্ব ত্যাগ করিতে হয়, এমন কি তখন তাহার নির্জ্জন বনবাস আরম্ভ হয়, কিংবা পরিবারে থাকিয়া অপরের একাধিপত্য তাহাকে মানিয়া লইতে হয়।

মানবের ক্রমবিকাশের আরম্ভে ঠিক এই প্রকারেই পরিবার-বন্ধন কোথায়ও এক-স্ত্রী কোথায়ও বা বহু-স্ত্রীর ভিত্তিতে দেখা গিয়াছিল। বিভিন্ন আবেষ্টনে আহার্য্যের সঙ্কুলান ও নিরাপত্তার উপরই তাহার এক-স্ত্রীত্ব বা বহু-স্ত্রীত্ব নির্ভর করিয়াছিল। কখনও সে জঙ্গলে বানরের মতই এক-স্ত্রী ও তাহার সন্তানসন্ততি লইয়া, কখনও বা বহু যোষিৎ ও তাহাদিগের অনুরাগী অন্য পুরুষ ও উহাদিগের সন্তানদের লইয়া, কখনও বা বহু স্ত্রীকে আপনার অক্ষুণ্ণ ভোগদখলে রাখিয়া বিচরণ করিত। আহার-বিহারের সুবিধা ও নির্ভয়তার উপরই পরিবারের সংখ্যা ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ভর করিত।

যৌনসম্বন্ধীয় নিষেধের উৎপত্তি

যুগ যুগ ধরিয়া প্রকৃতি মানুষের স্বভাব, আচার ও অনুষ্ঠানকে যাচাই করিয়াছে। দেখা গেল, কলহমুখর, বহুধাবিভক্ত পরিবার জীবনসংগ্রামে হটিয়া যায়, যে সহযোগ শত্রু হইতে রক্ষার প্রধান সম্বল তাহার ব্যত্যয় ঘটে। বানরের অপেক্ষা মানুষের মানসিক অভিব্যক্তি অনেক বেশী। তাহার ধী ও স্মৃতি জাগিয়াছে, মুখে কথা ফুটিয়াছে। মানুষ সৃষ্টি করিল নানা প্রকার বিধিনিষেধ। নিয়ম ও নিষেধের পশ্চাতে আছে পাশবিক বল, কিন্তু উহা বাহিরে প্রকটিত হয় না। নিষেধ নানা বলপ্রয়োগ, লাঞ্ছনা ও মানসিক যন্ত্রণার স্মৃতি বহিয়া প্রত্যেকের অন্তরে এখন জাগিল বিধিহিসাবে। নিষেধ-বিশেষ দাঁড়াইল এখন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ও নীতিহিসাবে। উহার লঙ্ঘনের শাস্তি শুধু শারীরিক নহে, মানসিক; ব্যক্তিগত নহে, সামাজিক।

এই প্রকার যৌন বিধিনিষেধই মানুষের পরিবারকে নিত্য অশান্তি ও দ্বন্দ্ব হইতে যে শুধু রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে পরিবারজীবনের সুপ্রতিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতাও সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষের সংস্কৃতি অনেকটা পরিবার-জীবনকেই আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে ও বংশপরম্পরায় প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়। এই ধারা রক্ষার প্রধান উপকরণই হইল নিয়মানুবর্ত্তিতা, যাহা মানুষের পরিবারকে অন্য জন্তুর পরিবার হইতে পৃথক্ করিয়াছে এবং পৃথক্ করিয়াই মানুষের প্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

জৈব ধর্ম্ম ব্যতীত যে আচার ও ব্যবহার, নীতি ও ধর্ম্ম মানুষের আবেষ্টনকে জয় করিবার সহায় হয়, তাহাকে আমরা সংস্কৃতি বলি। মানুষের প্রাথমিক সংস্কৃতি পরিবারবর্গের খাদ্যসংস্থানকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল। খাদ্যসংগ্রহ, উৎপাদন ও সঞ্চয় যেমন পরিবার-রক্ষার সহায় হইয়াছে, তেমনই মাতা বা পিতার অধিকার ও শাসনকেও দৃঢ় করিয়াছে। এই অধিকার ও শাসন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায় অচ্ছেদ্য একবিবাহমূলক পরিবারে। জন্তুর অভিব্যক্তির ইতিহাসে অনেক পাখী ও উচ্চতর জীবের মধ্যে একবিবাহরীতি সন্তানপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিয়াই এখন পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। তাহারা পরদারগমন অনুমোদন করে না।

যৌন প্রবৃত্তির রূপান্তর

মানুষের মধ্যে কিন্তু তিন রকম পরিবারই সুপরিচিতঃ (ক) স্ত্রী-পুরুষের একবিবাহমূলক, (খ) পুরুষের বহুবিবাহ-মূলক, (গ) স্ত্রীর বহুবিবাহমূলক। তিন প্রকার বিবাহ ও পরিবারেই অবাধ যৌন সম্মিলন নিষিদ্ধ। জীবের ক্রমবিকাশে যৌন প্রবৃত্তি অন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়াছে। যৌন প্রবৃত্তি যতই অন্য মনোবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, ততই তাহার পাশবিকতা, তাহার লক্ষ্যহীন, অন্ধ ও অনিবার্য্য উত্তেজনা পরাস্ত হইয়াছে। মানুষের কামনা তাই অবাধ যৌন সংমিশ্রণে চরিতার্থ হয় না। মানুষ যৌন প্রবৃত্তির অনুশীলন করে অনেক মার্জ্জিত করিয়া, নানা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্য দিয়া। ঐ সব বিধিনিষেধ তাহার মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব দূরীকরণের এবং আর্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের স্বচ্ছন্দ ও অব্যাহত গতির সহায়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে কেহ কেহ যে ভবিষ্যতে বিবাহ-বন্ধন মোচনের ও যৌন ব্যভিচারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা অলীক। শুধু মানুষের মধ্যে কেন, জীবজগতেই দেখা যায় যৌন প্রবৃত্তি নিছক স্বতন্ত্রভাবে জৈব শক্তিকে এক কেন্দ্রে আকর্ষণ করে না। খেলা ও অভিসার, স্ত্রী-অধিকারের জন্য সংগ্রাম ও বাসনির্ম্মাণ বা অন্য কোনরূপ দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রদর্শন, স্নেহ ও মমতার বিকাশ, সব মিলিয়া যৌন আচরণকে রূপান্তরিত করে, উহাকে বিচিত্র ছাঁদ দেয়। উচ্চস্তরের জীবে এই বৈচিত্র্য অধিক বলিয়াই কখনও যে মানুষ বিবাহবন্ধনমুক্ত ও তাহার যৌন জীবন যে বিধিনিষেধ-বিবর্জ্জিত হইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

এইরূপে বিবাহের গণ্ডী নির্দ্ধারণ ও পরিবারের মধ্যে যৌন অধিকারের বিধিনিষেধ মানুষের সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গরূপে তাহার আদিম ইতিহাসেই গৃহীত হইয়াছে। মানুষের জৈব ও মানসিক অভিব্যক্তির সহিত পারিবারিক সংস্কৃতির উদ্ভব ও সাধারণত্বের বিশেষ সম্পর্ক আছে। অন্য প্রাণী অপেক্ষা মানব-শিশু অধিকতর অসহায় থাকে ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লালিত পালিত হয়। শিশুর মাতাও অধিকতর কাল যাবৎ পরনির্ভর। প্রকৃতি বানরশ্রেণীর মধ্যেও যাচাই করিয়া এমন একটি সম্বন্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যাহাতে সন্তান উৎপাদন ও পালন নির্ব্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু এবং মাতাও সুরক্ষিত হয়। ওরাং ওটাং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জী পুরুষ আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে গাছে উঠাইয়া দিয়া নীচে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং দিনের পর দিন স্ত্রী যখন অক্ষম, তখন সন্তানদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদিগের সঙ্গে খেলাধুলা করে। স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ, সন্তানপালন ও বংশবৃদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যৌন প্রবৃত্তি এবং আচরণও রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়াছে।

মাতাপিতৃক আচরণ ও সংস্কৃতি

যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে মিশিয়াছে স্ত্রীর উপর একাধিপত্য ও তাহার সঙ্গে জড়িত মমতা ও সন্দিগ্ধতা। আপনার বাসগৃহ ও সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ যৌন আকর্ষণকে স্নিগ্ধ ও পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। সন্তানসন্ততির লালন ও শিক্ষা ও গৃহস্থালী দম্পতীর প্রধান কর্ত্তব্য হয় যখন যৌবনের উত্তেজনা থাকে না। এমন কি প্রেম অস্তমিত হইলেও 'আপনার ঘর' ও 'আপনার সন্তান' এই মমত্ব পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করিতে দেয় না। মানবের ইতিহাসে স্ত্রী ও পুরুষের শ্রম-বিভাগ পরিবারের অন্নসংস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যের নানা আচার-নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ শুধু গৃহ নির্ম্মাণ ও রক্ষা করে না, সন্তানসন্ততির জন্য গৃহ-ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায়। গৃহরক্ষা ও সম্পত্তিরক্ষা বংশ-পরাম্পরাগত হইয়া পরিবারপালনের সহায় হইয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে পরিবার শুধু গৃহ-ধন-সম্পত্তি পায় না, আরও পায় পারিবারিক রীতিনীতি ও ধর্ম্ম। এইরূপে নানা আকারে পল্লবিত হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক ও ব্যবহার দম্পতীর জীবন অতিক্রম করিয়া ব্যাপকতর হইয়াছে; বংশরক্ষা, গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা, রীতি ও নীতি রক্ষার আশ্রয় হইয়া মানুষের প্রগতির সহায় হইয়াছে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান

মানুষের আদিম বিকাশ হইতেই তাই পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্কে সমাজ তাহার জোর ও দাবী জ্ঞাপন করিয়াছে। বিবাহ একটা সম্পর্কসূচনামাত্র নহে, ইহা একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বলিলে এই বুঝায় যে, পুরুষ ও স্ত্রী দুই জনে মাত্র মিলিয়া বিবাহসম্বন্ধ গ্রহণ করে না, তাহার সাক্ষী হয় গোষ্ঠী ও সমাজ। জ্ঞাতিকুটুম্ব না মিলিলে বিবাহ মঞ্জুর হয় না। "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" যে পরিবেশন করা হয় তাহা আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করে। বিবাহ-উৎসবের ভূরিভোজনে তাহাদিগের উপস্থিতি বিবাহসম্পর্কে স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্যের স্মারক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই বিবাহ উৎসবে আত্মীয়কুটুম্বের নিকট হইতে যেমন তাহাদিগের অধিকার পায়, তেমনই তাহাদিগের সম্মুখে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নিয়ম, বিধি ও নিষেধও স্বীকার করিয়া লয়।

বিবাহ-উৎসব ও অনুষ্ঠানে যে আত্মীয়স্বজন ও সমাজের যোগদান আবশ্যক শুধু তাহা নহে, বিচিত্র আচার ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বর ও বধূ তাহাদিগের পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের সম্মুখে বরণ করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সমাজের বিবাহের আচার ও অনুষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথমে ধরা যাউক বিবাহের সময় বা পর্ব্ব। অনেক আদিম জাতির মধ্যে বসন্তকালই বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রশস্ত সময়। ভারতবর্ষের আদিম জাতিদিগের মধ্যে যুবক ও যুবতী তখন শালমঞ্জরী ও মহুয়া বা পলাশ ফুলে সজ্জিত হইয়া পরস্পরকে খুঁজে। প্রেম-নিবেদনের রীতি ও নীতি অসভ্য সমাজেও সুপ্রচলিত। মুণ্ডা-দ্রাবিড় জাতির বিশ্বাস বসন্তকালে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের বাৎসরিক বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রকৃতি তখন কাননে কাননে সুরভি মুকুল ও নব কিশলয়ে সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যদেবতা অথবা সিংবঙ্গাকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করে। তাহাদিগের বিবাহ গ্রামে গ্রামে বহু সমারোহে অনুষ্ঠিত না হইলে মানুষের বিবাহ হয় না। নানা গল্প, আখ্যায়িকা ও জনপ্রবাদ যৌন আকর্ষণের অন্তরে একটা সৌন্দর্য্য ও সুষমার মোহ জাগায় ও যুবকযুবতীর প্রাণকে আরও নিবিড় ভাবে আন্দোলিত করে। মানুষের দেহকান্তি ও পরিচ্ছদের শোভা, যেমন প্রকৃতির বিরাট্ সৌন্দর্য্য ও সমাজের চারুশিল্পকলার সুষমার আবেষ্টনে আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠে, তেমনই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিও একটা বিপুলতর জীবনের অন্বেষণে অপ্রশস্ত অথচ পরীক্ষিত খাতে প্রবেশ করিয়া সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যের সহিত মিল রাখিয়া ধাবিত হয়। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে বিবাহ উদ্দেশ্যে পূর্ব্বানুরাগ প্রদর্শনের রীতিতে আমরা একটা সৌন্দর্য্যলিপ্সার পরিচয় পাই। সৌন্দর্য্য-বোধই নিছক কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার সহায়।

মাঙ্গলিক ও প্রতীকের ব্যবহার

তাহার পর সব জাতির বিবাহ-অনুষ্ঠানে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, মালা বা আংটী বদল, গাঁটছড়া বাঁধা অথবা একসঙ্গে ভোজন ও বিহার প্রভৃতি আচার প্রচলিত। অসভ্য জাতির মধ্যে যেমন বিবাহস্তম্ভের চারিদিকে প্রদক্ষিণ, তেমনই হিন্দুবিবাহে যজ্ঞাগ্নির চারিদিকে সপ্তপদী ভ্রমণ, বিবাহ-বন্ধনে পতি ও পত্নীর নিবিড় সহযোগ দ্যোতনা করে। সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধিও বিবাহের উদ্দেশ্য-রূপে প্রকটিত হয়, যখন নব-বধূকে গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে আম্র-কদলী-শাখাসুশোভিত পূর্ণকুম্ভ ও সদ্যফুটন্ত দুগ্ধপরিপূর্ণ পাত্র অথবা মৎস্যাদি প্রদর্শিত হয়। বিবাহের সুখ ও শান্তি একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। তাই সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিবাহের শুভ ফল নির্দ্দেশ করে। বিবাহের উদ্দেশ্য যে সন্তান-উৎপাদন তাহা প্রকাশিত হয় নববধূর ক্রোড়ে শিশু প্রদান, বরবধূর মস্তকে লাজ বর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা। ধান্য, দূর্ব্বা, নানাবিধ ফল ব্যতীত অনেক দ্রব্যের ব্যবহার হিন্দু স্ত্রী-আচারে দেখা যায় যাহা স্পষ্টভাবেই যৌনসঙ্গমব্যঞ্জক। আবার অশ্বত্থ গাছের পূজা এক দিকে যেমন বরবধূর দীর্ঘ পরমায়ু, তেমনই বহু বংশবৃদ্ধি যাচ্ঞার আভাস দেয়।

শিল্পযুগে যৌন আচরণ ও নীতি

বর্ত্তমান যুগে অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সুবিধার বিচার ও দেনাপাওনার চুক্তি প্রবলভাবে দেখা গিয়াছে। বিবাহ-বন্ধন ইহাতে শিথিল হইতেছে। কারণ পুরুষ ও স্ত্রীর স্বার্থসন্ধান সমাজ, পরিবার এমন কি সন্তানের প্রতি দায়িত্বকেও মানে নাই। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে গরীব লোকদিগের স্ত্রী-পরিত্যাগ ছাড়া বিবাহের মধ্যে শতকরা আঠারটি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। স্বামী ও স্ত্রীর এই বন্ধনমুক্তি পারিবারিক জীবনে ঘোর অসামঞ্জস্য ও মনোবৃত্তির বিপুল বিপ্লবের সূচনা করিতেছে। মানবের নিকটতম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিচার ও অভিলাষমূলক চুক্তির মনোভাবের প্রধান কারণ, ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কার ও ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রসূত ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা ও যান্ত্রিক যুগে কারখানায় স্ত্রীজাতির দলে দলে শ্রমিকের কাজ গ্রহণ। আমেরিকায় পাঁচ জন শ্রমিকের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক;

পাঁচ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জন শ্রমিক। তাঁহা ছাড়া পাঁচ জন স্ত্রী-শ্রমিকের মধ্যে এক জনের বয়স বিশ বৎসরের কম এবং চার জনের মধ্যে মাত্র এক জন বিবাহিত। রুশিয়ায় স্ত্রীজাতি ব্যাপকভাবে শ্রমিকের কাজে অধুনা নিযুক্ত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন সামাজিক আদর্শ প্রচারিত হইতেছে যে, স্বতন্ত্র গৃহস্থালী ও শিশুপালনের প্রয়োজন নাই। সাধারণ রান্না, সাধারণ গৃহিণীপনা, সাধারণ শিশুপালন, হোটেল, ক্রেচ নার্শারী ও বোর্ডিং স্কুলের সঙ্গে নগরে নগরে দেখা দিয়াছে। ইহাতে সাম্যতন্ত্রবাদীরা বলেন, অনেক কুসংস্কারের দোষ, ব্যক্তিগত ত্রুটি সংশোধিত হইবে এবং সমাজের ও ব্যক্তির শক্তিরও অপচয় ঘটিবে না। মানুষ যে এত কাল গৃহস্থালী চালান অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাঁহাদের মতে ইহা ভুল। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ায় স্ত্রীজাতির পরনির্ভরতা ঘুচিয়াছে। এ সাম্য আর কোন দেশে সম্ভবপর হয় নাই। রুশিয়ায় যেমন ভাবে স্ত্রী এবং বিশেষতঃ শিশুর মা আইনকানুনের দ্বারা সুরক্ষিত, এমন অন্য কোথায়ও দেখা যায় নাই। স্ত্রীর এই আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রেম অনেক কৃত্রিমতা ও পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কোন স্ত্রী পুরুষের মুখাপেক্ষিণী নহে এবং বিবাহ-বন্ধন হইতে তাহার মুক্তিও সহজ বলিয়া পরস্পরের স্বাভাবিক আকর্ষণই শ্রেষ্ঠ বন্ধনীরূপে অনুমোদিত হইতেছে। ইহাতে প্রেমের মর্য্যাদা বরং বাড়িয়াছে, কমে নাই। সমস্ত পৃথিবী পুরুষের তৈয়ারী স্বার্থান্ধ, পক্ষপাতী যৌন নীতিকে ত্যাগ করিয়া এই আদর্শের দিকে আজ অগ্রসর হইতেছে। বাস্তবিক রুশিয়ার আইনকানুন সামাজিক ও আর্থিক দিক হইতে স্ত্রীকে পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্ব দিয়াছে; যখন স্ত্রী মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অসহায় হয়, তখন তাহাকে ও তাহার সন্তানকে পূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, সে সন্তান বিবাহিত ও অবিবাহিত মাতার কি না এ প্রশ্ন রুশিয়ার আইন তুলে নাই। নানা দিক হইতে স্ত্রী ও মাতার সম্মান যাহা রুশিয়া দিয়াছে তাহা অন্য কোন দেশ দেয় নাই।

রুশিয়ায় গৃহস্থালী

তবুও সাধারণ রন্ধনশালা, সাধারণ বিশ্রামাগার, শিশুর লালনপালনের সাধারণ ক্রেচ ও নার্শারী প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া রুশিয়ার সমাজ গৃহ ও পরিবার অনুষ্ঠানকে নিতান্ত হতশ্রী ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। এটা ঠিক যে, ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনে মন ও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণতা অর্জ্জন করে, স্বার্থান্ধতা প্রশ্রয় পায়, মানুষ আপনার ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চায়, বাহিরের বিপুলপ্রসারিত জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বিরুদ্ধে সে স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী টানে। এ দীনতা ও কূপমণ্ডুকতা দোষের। ইহার সংস্কার চাই-ই। তবু গৃহ ও পরিবারের একটা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার আছে। ইহাদিগের ব্যত্যয় ঘটিলে মানব-মনের নিপীড়ন হয়। প্রেম নির্জ্জনতা খুঁজে। বিপুল জনমানবিকতার কলকোলাহল প্রেমগুঞ্জন শুনিতে দেয় না। তাই মানুষের নিজস্ব কুটীর চাই, বিরল বিশ্রামকুঞ্জ চাই যেখানে মাঝে মাঝে মানুষ আপনার প্রিয়জনের সহিত বিশ্রম্ভালাপে মুগ্ধ, উৎসাহিত, সংশোধিত ও মার্জ্জিত হইতে পারে। তাহার সন্তান-বাৎসল্যেরও দাবী আছে, সে দাবী মিটাইতে গেলেও স্বগৃহ চাই। শিশুর মনোবৃত্তির স্ফুরণও অনেকটা পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ ও সমুৎসুক পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। নার্শারী স্কুল ও হাসপাতালের আবহাওয়ায় শিশু শ্রমিক ও সৈনিক হয়, সর্ব্বাঙ্গীন মানুষ হয় না। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রধান আশ্রয়ই হইতেছে তাহার প্রিয়জনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। নিকটতম আত্মীয়েরা তাহাকে স্নেহ-মমতায় ঘিরিয়া এক দিকে প্রত্যয়, অপর দিকে গ্লানির সাহায্যে ধীরপদক্ষেপে উন্নীত করে। প্রেম ও পরিবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যুগে যুগে, কিন্তু মানুষের প্রাথমিক মনোবৃত্তির স্ফুরণ ও বিকাশের সঙ্গে তাহারা গাঁথা বলিয়া তাহাদিগের বিনাশ নাই। তেমনই মানুষের গৃহও এমন একটি অনুষ্ঠান যাহার সমকক্ষ আর কোন অনুষ্ঠানই নাই। আদিম মানবসংস্কৃতির প্রসূতি-আগার যেমন এই বাসগৃহ, তেমনই ভবিষ্যতে সংস্কৃতির প্রগতির পথ অনুধাবন করিবার গৃহই উচ্চচূড়, পবিত্র পর্য্যবেক্ষণমন্দির।

বিবাহ ও ধর্ম্ম

রুশিয়া মাতা ও সন্তানকে অজস্র পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রেমের সুবিচার সেখানে হয় নাই। দাম্পত্য ছেদনের জন্য সেখানে আইনতঃ কোন বিশেষ কারণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অপর পক্ষের অনুমতিরও প্রয়োজন নাই। রুশিয়ায় অনেকগুলি বিবাহ-বন্ধন-মুক্তির কোর্টে গিয়া দেখিয়াছি, স্ত্রী বলিল তাহার স্বামী অন্য শহরে কাজে গিয়াছে, সে তাহার সঙ্গে যাইতে চাহে না, সুতরাং তালাক মঞ্জুর হইল। স্ত্রীটি আগেই দুই বার স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছিল। অবশ্য দুয়েকটি প্রশ্ন করাতে সে তখন লজ্জাবোধই করিতেছিল। রুশ রাষ্ট্র এখন বিপুল সুশৃঙ্খলাপন্ন যৌথ আচরণ ও সমবেত শিক্ষা দীক্ষা ও

আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া, যত কিছু প্রবৃত্তি ও প্রভাব অতীত যুগে বাসগৃহ ও পরিবারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের মূলচ্ছেদ করিতেছে। অপর দিকে বিবাহনীতি ও আইনকানুনে ব্যক্তির সুবিধা ও অভিলাষের উপর বিলক্ষণ জোর দিয়া, বিবাহকে ধর্ম্মের বনিয়াদে নহে, দম্পতীর পরস্পরের চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিবাহের ধর্ম্মানুষ্ঠানসংক্রান্ত একটা দিক আছে। রুশিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতেছে। বিবাহে চুক্তির সম্বন্ধ স্থাপনে এই দোষ যে, মানুষের বিবাহসম্পর্ক উভয়ের সুবিধা ও অসুবিধা, উভয়ের জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্যকেও অতিক্রম করে বলিয়া। সেই অতিক্রমণের ফলে মানুষ যে-কয়েকটি নিবিড় সত্য ও রসের সন্ধান পায় যাহাকে সে প্রেম, ভক্তি ও সতীত্ব বলিয়া যুগে যুগে সাধন করিয়াছে, নিছক চুক্তির সম্বন্ধ তাহার পরিপন্থী হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাহসম্বন্ধ এক অনির্ব্বচনীয়ের প্রতীক হইয়া যেমন ব্যক্তির রসাস্বাদন ও আনন্দের উপকরণ যোগাইয়াছে, তেমনই সমাজগ্রন্থিকেও দৃঢ় ও সুন্দর করিয়াছে। ব্যক্তির ও সমাজের ক্রমবিকাশে গৃহ ও পরিবারের এই মহনীয় আদর্শ অতীত যুগে যেমন রাম ও সীতা, সাবিত্রী ও সত্যবান, নল ও দময়ন্তী, এবং ইউলিসিস ও পেনীলোনীকে প্রণোদিত করিয়াছিল, তেমনই ভবিষ্যতের নর-নারীকেও সমানভাবে অনুপ্রাণিত করিবে।

কোনার্ক

শ্রীকল্পিতা দেবী

কালের রথ চলে গেছে
সেই চাকার দাগ তোমার গায়ে আঁকা।
প্রাচীন কৃষ্টির পতাকা তুলে'
বালুতীরে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে,
অস্তরবির কিংশুক অঞ্জলি
তোমার চূড়ায় নিয়ত রাখে'
বিদায়বেলার শেষ নিবেদন।
কত মানুষের আশাকে
আঁকড়ে রেখেছ,
কত শিল্পীর চিত্তছায়া
ঘুমিয়ে আছে তোমার বুকে।
অকথিত বাণী যাদের
তোমার গায়ে মূর্তি নিয়েছে,
সেই সব পরমায়ু অসীমে বিলীন !
সময়কে ফাঁকি দিয়ে
প্রাণের উৎস রইল লুকিয়ে পাথরে।
পৃথিবী অবাক হয়ে আজো দেখছে
সেই অপূর্ব প্লাবন।
ভাবলোকে শরৎ বর্ষা এখনো ফুরোয় নি
অনুভূতির নিত্যালোকের জীবন্ত ছবিতে
ধরে নি মরচে কিছু মাত্র।
আকাশভরা কালো মেঘের ফেনিল ছায়া-
সে দিন জাগাত নায়িকার
বুকজোড়া উদ্‌ভ্রান্তি ;
ঝরা বকুলের মালা মারত উঁকি
বেণীর কোলে---
মহুয়া-বনে, বসন্তে লাগাত
শিষের হিল্লোল,
পলাশে চমকাত পূর্বরাগশিখা।
রজনীর স্বপ্নআবিলতায়
কল্পনার উত্তপ্ত ছবি এঁকেছিল
যে-সব রূপকার—
তাদের দিন-পঞ্জিকার
প্রেম, প্রীতিগুলি
আজো মনে হয় চিনি চিনি।
জন্মান্তরের রুদ্ধ কপাট খোলে না।
চির পরিচিত স্মৃতি বহন করে,
চেতনার অন্তরালে গোপনে আছে তবু
একই অস্তিত্বের সাড়া।
জগতজোড়া প্রাণের লীলা,
মনলোক দেহলোক ঘিরে'
করছে নিত্য রচনা।
উর্বশীর অমৃত পাত্র
দেশকাল ব্যাপ্ত ক'রে উপ্‌চে পড়ছে
যুগান্তর ধ'রে চলছে তার·
বারংবার রূপান্তরিত পরিবেশ॥

বাংলার বাহিরে চৈতন্যমত

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম্ম ব্রহ্মদেশ হইতে ডেরা ইস্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত সারা ভারতকে প্লাবিত করিল। পূর্ব্ব-আসামে রাজা স্বর্গনারায়ণ (১৪৯৭-১৫৯৩) ও পশ্চিম-আসামে রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮-১৫৮৪) এই ধর্ম্মের প্রভাবে বৈষ্ণব হইলেন। (E. R. E, II, 135 p.)

আসামের শঙ্কর দেব মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তাঁহার তিরোধান ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৩৬ বৎসর পরে। তবে তিনি নাকি ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁর আয়ু হয় ১২০ বৎসর। কেহ কেহ বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ করিবার চেষ্টায় এইরূপ জন্মসাল দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তাহাতে কিছু যায় আসে না। তিনি নিজেই এক জন মহাপুরুষ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষাদি বাংলা দেশেরই মানুষ (বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, III, ৪৬৭ পৃ.)। তাহা ছাড়া শঙ্কর দেব ১২ বৎসর নবদ্বীপে বাস করিয়া গিয়াছেন। সেই হিসাবেও কাহারও কাহারও মতে গৌড়ীয় প্রভাব তাঁহাতে আছে।

মহাপ্রভু কাশীতে গিয়া প্রায় দুই মাস বাস করেন। সেখানে তাঁহার প্রধান লীলা হইল মহাজ্ঞানী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে নিজ মতে আনয়ন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন তখন তিনি তথায় অনেক বাঙালীকে দেখিতে পান। তপন মিশ্রের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন চন্দ্রশেখর কবিরাজ। তিনি ভক্তিমান্ ও তীর্থক্ষেত্রবাসী ছিলেন। পুঁথি নকল করিয়া চন্দ্রশেখর কাশীতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় বহু লোক সুন্দর হস্তাক্ষরের দ্বারায় শাস্ত্রাদির প্রচারকার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। তাঁহাদিগকে "আখরিয়া" বলিত। দেখা যায় চন্দ্রশেখরও একজন আখরিয়া ছিলেন (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ)। চন্দ্রশেখরের এক জন বন্ধু ছিলেন পরমানন্দ। তিনিও বাঙালী এবং কীর্ত্তন-গান ছিল তাঁর কাজ। বাঙালী কীর্ত্তনীয়ার দ্বারা বুঝা যায় তখন কাশীতে বাঙালী কীর্ত্তনশ্রোতা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২০-২৪শ অধ্যায়ে বিষয়বস্তু "সনাতনশিক্ষা"। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা দেন তাহা অপূর্ব্ব বস্তু। প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকেও মহাপ্রভু যে শিক্ষা দেন তাহাও চমৎকার (ঐ, ২৬শ অধ্যায়)। ইহাতে দেখা যায় কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে গিয়াও মহাপ্রভু স্বীয় শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

এই সব কারণে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মহাপ্রভুর মত নানা ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। মহাপ্রভুর নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরেও তাঁহার মতবাদের প্রভাব প্রসারিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃন্দাবনে হরিদাসী বা টাট্টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাঁরা গৌড়ীয় ভাবে প্রভাবান্বিত। এই সম্প্রদায়ে বিঠ্ঠল বিপুল, বিহারিণী দাস, সহচরীশরণ (১৬৬৩) প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত কবি শীতল স্বামীরও (১৭২৩) এই টাট্টি সম্প্রদায়েই জন্ম। ইহাঁরা ঐ দেশে গৌড়ীয় ভাবকে বিলক্ষণ প্রসারিত করিয়াছেন।

হিত হরিবংশের (জন্ম ১৫০২) রাধাবল্লভী মত অনেকটা তান্ত্রিক বৈষ্ণব মত। বাংলাতে সেইরূপ মতই মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ছিল।

দিল্লীতে একটি সুফী সাধনার ধারা আছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই রকম গুরুই আছেন। মুসলমান বংশীয় য়ারী সাহেবের শিষ্য ছিলেন বুল্লা সাহেব। গাজীপুরের অন্তর্গত ভুরকুড়া গ্রামে এখনও বুল্লার স্থান আছে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। তাঁর শব্দসার গ্রন্থ ভক্তসমাজে খুব আদৃত। চলতি ভাষায় লিখিত তাঁহার বাণীতে পাই, "পূর্ব্বদেশ হ'তে আপনি এলেন একজন ব্রাহ্মণ, তিনি হলেন আবার অবধূত! অপার অখণ্ড ব্রহ্ম জানেন সেই ব্রাহ্মণ, তিনি এলেন আমার গৃহাঙ্গনে। পরমতত্ত্ব নিয়ে তিনি আপনি করলেন পূজা, সহজ অসীম তত্ত্বের গান তিনি গাইলেন। রজোগুণ তমোগুণ সত্ত্বগুণ তিনি দিলেন

সরিয়ে, তনুমন দুই-ই তিনি বসলেন হারিয়ে, গগনমণ্ডলে তিনি চাখলেন হরিরস, কচিতই কেউ বুঝবে এই রহস্য !"

পূরব দেসকর আপুহিঁ বঁভনা
আপু ভয়ল অবধুতা।
অপরংপার ব্রহ্ম জানৈ বঁভনা
আয়ো হমারে গৃহ অংগনা।
পরমতত্ত্ব লে পুজে আপুহিঁ
সরল গাবৈ অনহদ ততনা।
রজগুণ, তমগুণ, সতগুণ সারল
হারল তনমন দোউ।
গগন মঁডলমেঁ হরিরস চাখল
বুঝৈ বিরলা কোউ॥

এই অবধূত ব্রাহ্মণটি কে ? কোনো কোনো টীকাকারের মতে তিনি নিত্যানন্দ। আমাদেরও নিত্যানন্দের কথাই মনে হয়। কিন্তু তিনি কি সর্ব্বগুণাতীত ব্রহ্মের গান করিয়াছেন ? তবু এই গানটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম।

চৈতন্য-মত রাজস্থানে

এই সব কারণেই রাজস্থানে দিন দিন গৌড়ীয় প্রভাব বাড়িয়া চলিল। মানসিংহের দ্বারা যশোরের দেবী ও পূজারী আমেরে নীত হইলে বাংলার দেবীপূজা সেই দেশে গেল। আর দিল্লীর আক্রমণের ভয়ে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিগ্রহগুলিকেও রাজপুতানার নানা স্থানে আশ্রয় দিতে হইল।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনে ছিল সাতটি প্রধান বিগ্রহ। রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ, সনাতনের শ্রীমদনমোহন, জীব গোস্বামীর (কাহারও মতে রূপ গোস্বামীর) শ্রীরাধাদামোদর, ভূগর্ভ গোস্বামীর ও মধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ, শ্যামানন্দের শ্রীশ্যামসুন্দর, নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরাধাবিনোদ, লোকনাথ গোস্বামীর ও শ্রীগোকুলানন্দ গোপাল ভট্টের বিগ্রহ হইলেন শ্রীরাধারমণ। শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দের সেবা হয় একসঙ্গে। গ্রাউজ প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা মনে করেন উত্তর-ভারতে হিন্দু শিল্পকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও সর্ব্বাঙ্গের সামঞ্জস্য গোবিন্দজীর মন্দির (E. R. E., II, ৮৫৭ পৃ.)।

এই মন্দিরটি রূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে ও মূলতানী বণিক্ কৃষ্ণদাসের আর্থিক সহায়তায়, আকবরের ৩৪শ রাজ্যাব্দে রচিত।

রাজপুতানার শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাইৎ উড়িয়া, আর সব সেবাইৎ বাঙ্গালী। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীরাধারমণ ছাড়া আর সব বিগ্রহকেই বৃন্দাবন হইতে রাজপুতানায় লইয়া যাওয়া হইল। মদনমোহন গেলেন করৌলিতে আর বাকি সব গেলেন জয়পুরে। রাধারমণের সেবাইতরা ব্রজবাসী। যে জয়পুরে গৌড়ীয় সব বিগ্রহ গেলেন সেই জয়পুর বাঙ্গালী পণ্ডিত বিদ্যাধরেরই আদর্শে রচিত। বাংলার সঙ্গে রাজপুতানার এই সম্বন্ধ আজও জীবন্ত। জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি গীজগড়ের সর্দ্দার খুসহাল সিংহ গৌড়ীয় গোস্বামীর শিষ্য এবং অতিশয় ভক্ত বৈষ্ণব।

বৃন্দাবন শিঙ্গারবটের গোস্বামীরা নিত্যানন্দবংশীয়। বৃন্দাবনের আশেপাশে ও রাজপুতানায় তাঁহাদের বিস্তর শিষ্য আছে।

চৈতন্য-মতাবলম্বী ছাড়াও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিগ্রন্থ রসগ্রন্থ ও সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়া থাকেন। কাজেই বাংলার ভাব-ধারাকে বাংলার বাহিরে প্রচার করিবার কর্ম্মে এই গ্রন্থ-গুলি মস্ত সহায়। কাঠিয়াওয়াড়ে ভাবনগরে ও সুদামাপুরে (পোরবন্দর) আমি অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের মঠে যাইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ পঠিত হইতে দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও বাংলা গ্রন্থও সযত্নে রক্ষিত আছে। গৌড়ীয় কোনো ভক্তকে পাইলে তাঁহারা সেই সব গ্রন্থের তত্ত্ব তাঁহার মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হয়েন।

চৈতন্য-মত মহারাষ্ট্রে ও মধ্যভারতে

মহারাষ্ট্র দেশে সপ্তশৃঙ্গ তীর্থে বাঙ্গালী সাধু গৌড়স্বামীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভক্ত তুকারামের (জন্ম ১৬০৮) গুরু বাবাজি চৈতন্য তাঁহার গুরু পর পর রাঘব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্য (E. R. E., XII, ৪৬৭ পৃ.)। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা চৈতন্যভক্ত ছিলেন। অবশ্য চৈতন্য শব্দ দ্বারা তাহা মনে করা উচিত নহে।

মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অর্থাৎ শঙ্করারণ্য পাংঢর-পুরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিলেন ভক্ত নারী শিখরিণী। ভক্ত শিখরিণীর প্রদৌহিত্রী চরণদাসী। তিনি মহারাষ্ট্র হইতে গুজরাত সুরতে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন।—(বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, III, ২১৬)

বেরার প্রদেশে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব এখনও অনেকে আছেন। (E. R. E., II., 504 p.)

মধ্যভারত ছত্রপুরের মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহজী বৃন্দাবনের স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। নীলমণি গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতবংশীয়।

বাজিরাওর সময়েই নাকি ধরমপুর প্রদেশে বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত ছড়াইয়া পড়ে। ছত্র সিংহ ঠোকে প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই কাজে সহায়তা করেন।

চৈতন্য-মত গুজরাতে

গুজরাতের লোকের চিত্তবৃত্তি বৈষ্ণব ভাবের। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই গুজরাতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময়েই সুরতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মঠ স্থাপিত হয়। সুরতে দুইটি গৌড়ীয় মঠ। বড়টির অধিকারী ভরত দাস মহন্ত ও ছোটটির অধিকারী এক জন উড়িয়া মহন্ত। উড়িয়া মহন্তরা প্রায়ই শ্যামানন্দের শিষ্য —(বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, III, ২১৪)।

পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্যের নাম করা হইয়াছে। তাঁহারই শিষ্যা পূর্ব্বোক্তা শিখরিণী। শিখরিণীর কন্যা সুভদ্রা, দৌহিত্রী অনুজা ও প্রদৌহিত্রী চরণদাসী। তিনি সুরতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। বিশ্বরূপের ধারা হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর ভাবেই বেশী অনুপ্রাণিত। তাঁহার ভক্তি ও আচরণে বহু ভক্ত আকৃষ্ট হন। তাঁহার সাধনাস্থান এখন মাঈজীর আখড়া বা গৌড়ীয় গদী বলিয়া খ্যাত। এখানে নিত্য-সেবার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে।

গুজরাতে গ্রামে গ্রামেও অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন। সুরত জেলায় নবসারী, বুলসার প্রভৃতি স্থানেই তাঁহাদের অনেকের বাস। নবসারীর নিকটে সিসোদরা সুপা, অষ্টগ্রাম, চৌবিসিয়া সরপোর-পারধী প্রভৃতি গ্রামে বাংলা কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

ইঁহাদের গুরু ছিলেন অদ্বৈতবংশীয় স্বর্গীয় নন্দলাল গোস্বামী। বৃন্দাবনে পুরানা সীতানাথ মন্দিরে তাঁহাদের স্থান। নন্দলালের পুত্র ছিলেন স্বর্গীয় গোকুলনাথ। গোকুলনাথের পুত্র বীরেশ্বর গোস্বামীও পরলোকগত। তাঁহার মা ও স্ত্রী জীবিত আছেন, কিন্তু পুত্র নাই। কাজেই গুরুর অভাবে গুজরাতের এই সব ভক্তরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন।

নবসারীর পাটিদার বা পাটেলেরা এক সময় মুসলমানী মতের পীরাণা পন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন। তাহাতে অন্যান্য স্থানের পাটেলেরা তাঁহাদিগের সংসর্গ বর্জ্জন করেন। কিন্তু তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে। পরে আর্য্যসমাজের একটি বড় কেন্দ্র গড়িয়া উঠে নবসারীর অন্তর্গত সুপা গ্রামে। সুপাতে প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল ও আর্য্যসমাজ সেখানে বহু কাজ করিয়াছে।

চৈতন্য-মত সীমান্তপ্রদেশে

ভারতের সীমান্তপ্রদেশ দেরা ইসমাইল খাঁতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শিষ্য আছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কীর্ত্তন করিতেন, ক্রমে সেই কীর্ত্তনের ভাষা রূপান্তরিত হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। মধ্যে এক জন সাধু যাইয়া কীর্ত্তনগুলির একটু সংস্কার করিয়াছিলেন। বাংলা দেশ হইতে যোগভ্রষ্ট হওয়ায় এখন ইঁহারা সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের যুবকেরা সব লাহোরে গিয়া আর্য্য-সমাজী অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বংশেরই একটি ভক্তিমতী নারীর পুত্র এখন আমাদের শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মলিক গুরুদয়ালজী। বলা বাহুল্য, দেরা ইসমাইল খাঁতে বল্লভাচার্য্যের অনুবর্ত্তী বৈষ্ণবই প্রায় সকলে। তবু সেখানে এত দূরে বাংলার বৈষ্ণব মত কেমন করিয়া পৌছিল তাহাই বিস্ময়কর।

বেলুচিস্তান কোয়েটার মধ্যেও কিছু চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এখন বোধ হয় তাঁহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সিন্ধু শিকারপুরে এখনও এইরূপ বৈষ্ণব কিছু আছেন। এই সব স্থান হইতে ভক্তরা বৃন্দাবন আসেন, কেহ কেহ নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যাত্রা করেন। যোগসূত্র যদি ছিন্ন না হইত তবে এই সব স্থানে বাংলা দেশের ভাবধারা এমন করিয়া ক্ষীণ হইয়া আসিত না। এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তনাদিতে মহা উৎসাহ। ইঁহাদের উৎসবাদিতে হিন্দু-মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক মহা উৎসাহে যোগ দিয়া থাকেন। সিন্ধু লারকানাতে সেই দেশীয় এক ভক্তের বাড়ীতে চমৎকার বাংলা কীর্ত্তন শুনিয়াছি।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

সকালে উঠিয়া শাশুড়ী ডাকিলেন, বউমা, ও বউমা। এত বেলা অবধি তো ঘুম ভাল নয়, মা। ওঠ।

ধড়মড় করিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। দু-হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বাহিরের পানে চাহিল। রৌদ্র অনেক খানিই চড়িয়াছে। গাছের সবুজ পাতায় সকালের রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছে; রৌদ্রের একটা ফালি জানালার কাঠের গরাদগুলি স্পর্শ করিতেছে। শাশুড়ী যদি দরজার ওপারে থাকেন—কোন্ মুখে যোগমায়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইবে? যাহা হউক, নিদ্রিত রামচন্দ্রের পানে চাহিয়া সে তড়াক্ করিয়া মাইপোষ হইতে নামিয়া পড়িল ও কাপড়খানা কোন রকমে গায়ে জড়াইয়া সন্তর্পণে দুয়ার খুলিল। ভাঙ্গা একটা হাঁড়িতে গোবর গুলিয়া শাশুড়ী উঠানে ছড়া দিতেছেন। এ দিকটা পিছন করিয়া আছেন বলিয়া যোগমায়ার বাহিরে আসা তিনি দেখিতে পান নাই। যোগমায়া এ ধারে একটু সরিয়া আসিয়া পৈঠার কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে উঠেছ? খুব সকাল সকাল উঠবে, মা। বউ হচ্ছে বাড়ির লক্ষ্মী। সকালে উঠে দুয়োরে জল, উঠোনে গোবরজল ছড়া না দিলে মা-লক্ষ্মী রাগ করেন। বাসি পাটঝাঁট সারা হচ্ছে গেরস্থর লক্ষণের কাজ।

যোগমায়া নীরবে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিলেন, যাও, মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল। গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে মটকার শাড়ী পরে—সাজি নিয়ে চারটি ফুল তোল। গুছিয়ে ফুল তুলতে পারবে তো?

ঘাড় হেলাইয়া যোগমায়া সম্মতি জানাইল। সে একটু আগাইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, সেখানে বুঝি তিন পোর বেলায় উঠতে?

ডাইনে বামে ঘাড় হেলাইয়া যোগমায়া সে কথার জবাব দিল।

তবে? এতবেলা অবধি ঘুম—হঠাৎ তিনি কি যেন স্মরণে আনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, যাও, মুখ ধোও গে।

ঘোমটার আড়ালে চক্ষু থাকিলেও শাশুড়ীর ঈষৎ হাসি যোগমায়া দেখিয়াছিল, এবং সে-হাসিতে যে লজ্জার কালি ছিল—তাহা যোগমায়ার মুখখানাকেই শুধু ভরাইয়া দিল। একটু চঞ্চল হাতেই সে রোয়াকের ধারে বসানো ঘটিটা তুলিয়া লইল। এমন দুর্দ্দৈব, হাত ফস্কাইয়া জলপূর্ণ ঘটিটা রোয়াকের নীচেয় পড়িয়া গেল। শব্দ হইতেই শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন।

ভয়ে যোগমায়ার বুকের গোড়া ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সে ঘটি তুলিতে গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, থাক, থাক, ওখানে নোংরা। এই সকাল বেলায় নেমো না। আমি নাইবার সময় ঘটিটা তুলে—পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসব'খন।

যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, ছি মা, কাঁদে না। ঘটি পড়েছে—তা কি হয়েছে? অমন সবারই হাত থেকে পড়ে। এই তো কাল—আমার হাত থেকে এমন জায়গায় জলখাবার ফেরোটা পড়লো যে, ধুয়ে মেজে নেওয়াও আর চল্‌বে না। ও অমন হয়।

এ কথায় কান্না না কমিয়া আরও বাড়িল। ঘরের দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যোগমায়া কাঁদিতে লাগিল।

সান্ত্বনা দিবার সময় কম, কাজেই শাশুড়ী গোবর-জলের ছড়া দিতে দিতে উঠানের অন্য প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

কমলা বাহির হইয়া ক্রন্দনরতা যোগমায়াকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কাঁদছিস কেন, বউ? দাদা মেরেছে বুঝি?

এ রহস্যে সে হাসিল না—কাঁদিতেই লাগিল।

কি হ'ল—লো?

ঘটি পড়ে গেছে রোয়াকের নীচেয়। ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে যোগমায়া উত্তর দিল।

এই কথা! আমি বলি কি না কি! মা বকেছেন বুঝি?

সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, না, না।

মা দেখেছেন?

হুঁ।

তবে আর কি, তোমার তো সাত খুন মাপ হয়ে গেছে! নতুন বউ, কিছু তো বলতে পারবেন না। আমাদের হ'লে দেখতে মজা!

যোগমায়া কমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় কহিল, মা আসছেন। চল, কুয়োতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আসি।

দিনে শাশুড়ীর স্নেহসম্ভাষণ, কমলার রহস্যালাপ, রাত্রিতে স্বামীর সোহাগ—তবু যোগমায়ার অন্তর যেন ভরিতে চায় না। এই সোহাগ, রহস্য বা স্নেহপ্রকাশের মধ্যে বালিকার প্রাণটি ঠিক যেন যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছে না। বদ্ধ খাঁচায় থাকিয়া সোনার শিকল পায়ে দিয়া রূপার বাটিতে অনায়াসলব্ধ রাজভোগ মুখে তুলিয়া বনবিহগী কবে বা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে? যোগমায়ার সংসারে সে বিস্তীর্ণ আকাশের অভাব; যে-আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড়ের দোলা লাগে, বজ্রপতনের মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। স্বচ্ছন্দবিচরণের সেই ক্ষেত্রটিকে যোগমায়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। মায়ের তিরস্কার, সঙ্গিনীদের উপহাস বা তাহাদের লইয়া কলহ-ক্রন্দন—কোথায় গেল সে সব! ধুলাতে আঁচল লুটাইয়া—পিঠের কাপড়ে খোঁচ লাগাইয়া—হাতের চুড়ি ভাঙিয়া সেই যে ছুটাছুটি—সেই ক্ষতি ও শ্রমের মধ্যে বালিকার মন দিনরাত ডুবিয়া আছে।

প্রত্যহ রাত্রিতে রামচন্দ্রকে সে বলে, কবে আমায় পাঠিয়ে দেবেন, বলুন না?

রামচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলে, আমাদের তোমার ভাল লাগে না বুঝি? তাই রোজ রোজ এক কথা বল।

ভাল রামচন্দ্রকে লাগে, কিন্তু সে-কথা প্রত্যহ উচ্চারণ করিয়া কি লাভ? এই জায়গা—যেখানে স্নেহ-সতর্কতার সীমা নাই অথচ ইচ্ছাসুখে ভ্রমণেরও অধিকার নাই; যেখানে ভাল খাবারটি খাওয়াইবার জন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা, তবু সেখানে অলক্ষ্য-প্রসারিত বিধিনিষেধের বেড়াগুলি দিন দিন ঘন ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ইহার বাহিরে—সেই অবহেলা-অনাদরের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনযাপনের জন্য যোগমায়ার আগ্রহ দিন দিন তাই প্রবলতর হইতেছে। এই যদি তাহার চিরদিনের বাসভূমি হয়—(গুরুজনদের সমবেত কামনাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না) তবে জীবনধারণই যে অসহ্য হইয়া উঠিবে।

মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া যোগমায়া বলে, আপনিও তো রোজ রোজ এক কথা বলেন। কই, পাঠিয়ে দিলেন না তো!

রামচন্দ্র আহত কণ্ঠে বলে, এখান থেকে গেলে তুমি খুব খুশী হও!

ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া জবাব দেয়, খুব।

রামচন্দ্র রাগ করিয়া বলে, কালই মাকে বলে—এর ব্যবস্থা করব।

খুশীতে যোগমায়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেখানকার কত গল্প সে অনর্গল শুনাইয়া যায়। রামচন্দ্র নীরবে খানিক শোনে—অভিমানের বাষ্পে দু'টি চোখ তাহার আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং সেই বিরক্তির মাঝে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে। যোগমায়াও খানিক বকিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রভাতে কমলা রহস্য করিয়া বলে, কচি খুকী, বাপের বাড়ি যাবার জন্যে নাড়ী টন্ টন্ করছে!

যোগমায়া নীরবে হাসিতে থাকে।

কমলা জলিয়া উঠিয়া বলে, দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবি তো? পারবি? ধন্যি কাঠপ্রাণ যা হোক।

যোগমায়া হাসিতেই থাকে। সে তো আর কমলা নহে। পনর বছরের কিশোরী কিছু দশ বছরের বালিকার মনোবেদনা বুঝিতে পারিবে না। স্বামী-সোহাগের রশ্মিতে কমলার নূতন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়াছে। সেই রশ্মিতেই জগতের সমস্ত নারীর অন্তরকে দর্পণের মতই সে প্রতিফলিত দেখিতে চাহে। কমলা যখন বালিকা ছিল—তখনকার অনুভূতি সে হারাইয়াছে; যোগমায়ার কঠিনত্ব তাহার কাছে পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে বইকি!

শাশুড়ী বলিলেন, দেব বইকি বৌমাকে পাঠিয়ে। রথের দিন ভাল দিন আছে। সেই দিন—

যোগমায়া রাত্রিতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, রথের আর ক'দিন আছে?

রামচন্দ্র বলিল, রথ দেখতে যাবে নাকি?

না। সেদিন মা আমায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

ওঃ। বলিয়া রামচন্দ্র পাশ ফিরিল।

যোগমায়া তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিল, বললেন না তো?

আঃ, ঘুম পাচ্ছে। রামচন্দ্রের স্বর বিরক্তিজনক।

যোগমায়া সে বিরক্তি লক্ষ্য করিল না। নিজের মন আনন্দের কানায় কানায় ভরা থাকিলে পরের বিরক্তি লক্ষ্য করা দুরূহ। আপন আনন্দেই সে বলিল, আমার সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

তাই নাকি? মা বলেছেন বুঝি? স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

যোগমায়া সহজ কণ্ঠে বলিল, তা কেন, আমি একলা যেতে পারি বুঝি?

খুব পারবে। মাত্তর দুটি মাইল পথ তো। ঐ দালালপাড়ার মাঝখান দিয়ে—নীলকুঠির পাশ দিয়ে গিয়ে একেবারে হরিপুরের বিলের ধারে পড়বে। তার পর তো তোমাদের মুল্লুক।

দূর, একলা বুঝি যেতে আছে?

নেই নাকি? কিন্তু কেন?

সবাই নিন্দে করবে যে।

ছেলেমানুষকে কেউ নিন্দে করে না। তুমি নর্দ্দমায় ঘটি ফেললে কেউ কিছু বললেন কি?

সে তো হাত ফসকে পড়ে গেল, মশাই।

এ-ও না হয় ভুলে চলে যাবে!

যান। যোগমায়া এতক্ষণে রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল, আপনি ভারি দুষ্টু।

সে-কথা এতদিনে বুঝলে! রামচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

যাহা হউক, রামচন্দ্রের অভিমানমিশ্রিত ক্রোধের পরাজয় ঘটিল। যোগমায়াকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি আদর-সোহাগের অজস্র বর্ষণের মাঝেই কখন এক সময়ে সে দিয়া ফেলিল।

যাইবার সময় পিসিমা চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আবার শীগ্‌গির এস মা, এই ঘর তোমার জন্ম-জন্মান্তরের। সোয়ামীর ঘর ছাড়া—

শাশুড়ী এবং পাড়া-পড়শীরা ওই রকম অনেক কথা বলিল। কমলা তো চোখের জল মুছিতে ঢাকাই শাড়ীর আঁচলটাই চোখে চাপিয়া ধরিল। যোগমায়ার মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। ওই ঘর দু-খানির মধ্যে, রোয়াকটিতে, আমগাছতলার ছায়ায়, উঠানের ধুলাতে, তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দেখাইবার কালে—প্রাচীরের এ-পিঠে যে খণ্ডিত গৃহসীমা—তাহার ঘাসে, ধুলায়, গুল্মে সূক্ষ্ম একটি মমতার আস্তরণ ধীরে ধীরে কে বিছাইয়া চলিয়াছে। পিছন ফিরিলে মনের সুতায় টান ধরে—অথচ পিছন না ফিরিয়াই বা যোগমায়া করে কি? পাল্কীতে চাপিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়োন্মুখ সমবেত লোকগুলির পানে চাহিয়া সত্যই তাহার চোখের কোণে ধারা নামিল। বিধাতাপুরুষ কিছু স্বহস্তে নারীর অন্তর-পাতায় বেদনার লেখাগুলি লিখিয়া দেন না, সে সৃষ্টিক্রিয়া নারীর কোমল মনেই অত্যন্ত সন্তর্পণে আর অলক্ষ্যে আরম্ভ হইয়া যায়।

রামচন্দ্র সঙ্গে চলিল। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িতেই ক্ষণিক বেদনার রেখা মন হইতে মুছিয়া গেল, চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আস-শেওড়া গাছের কটু গন্ধ, কাল-কাসুন্দার ঘন ঝোপ, উপরে নীল আকাশ আর সম্মুখে প্রসারিত সবুজ বনসমুদ্র—যোগমায়াকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিল।

সে রামচন্দ্রকে বলিল, তুমি গান গাইতে জান?

রামচন্দ্র যোগমায়ার 'তুমি' সম্বোধনে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, অ্যাঁ, 'তুমি' বললে আমায়! পাপ হবে যে!

ইস, হবে বইকি। কমলা ঠাকুরঝিও তো তুমি বলেন।

সে বলে ব'লে তুমিও বলবে? জান, আমি তোমার গুরুজন?

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তাই বলেই তো বলছি। মাকে কি আপনি বলি নাকি?

অকাট্য যুক্তি। রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে জবাব দিল, বাপের বাড়ির গাছপালার আর মাটির গুণ আছে। বোবারও বোল ফোটায়।

আমি বোবা নাকি?

বোবাই তো। সেখানে তো ভাত চড়ে রা বেরুত না।

যোগমায়ার দৃষ্টি ততক্ষণে অন্য দিকে ফিরিয়াছে। সে বলিল, ওই পিটুলি গাছে—হল্‌দে রঙের কি পাখী ওটা বল দেখি?

ওটা তো 'বউ কথা কও' পাখী!

দূর—ওটা বেনেবউ পাখী। 'বউ কথা কও' বলে ডাকে।

কেন ডাকে? ওর বউ বুঝি কথা কয় না? রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল।

কি করে কবে! ও যে তাকে এক চড়ে মেরে ফেলেছিল। তাই তো দিনরাত ডাকে 'বউ কথা কও'—বলে।

কেন মেরে ফেললে ওর বউকে?

গল্প জান না? শোন তবে। এক যে ছিল…

গল্প ফুরাইবার আগে যোগমায়া বাপের বাড়ি

পৌঁছাইয়া গেল। রামচন্দ্র লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। যোগমায়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

৪

যোগমায়ার মা লবঙ্গলতা আসিয়া পাল্কী হইতে মেয়ে জামাই নামাইয়া লইলেন। ছোট গ্রাম হরিপুর, বাড়ির দু-পাশে প্রতিবেশীর ভিড় নাই। যোগমায়াদের বাড়ির পাশে মাত্র দু-তিন ঘর বসতি করেন। তাঁহারাই বর দেখিতে আসিলেন।

গাঙ্গুলী-বাড়ির বড়বউয়ের পিছনে বুড়ি দিদিমা লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে আসিলেন। মাঝের বাড়ির ছোট গিন্নী আসিলেন আর হরিশ ভট্টাচার্য্যের বিধবা পুত্রবধূ আধ-ঘোমটা টানিয়া ও রোরুদ্যমান ছেলেটার হাত ধরিয়া বর দেখিতে আসিলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে জন কুড়ি-বাইশ অর্দ্ধ-দিগম্বর ছেলেমেয়ে আসিয়া পাল্কীর চারি পাশে কলরব জুড়িয়া দিল।

গাঙ্গুলী-বুড়ি লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে আগাইয়া আসিলেন। দন্তহীন মুখে হাসিয়া কহিলেন, কই ভাই নাত-জামাই, কেমন আছ দেখি? বেশ বেশ, মুখখানি হাসি-হাসি, প্রাণখানি খুশী-খুশী, কনের সঙ্গে ভাব জমেছে তো, ভাই?

রামচন্দ্র উত্তর না দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

দিদিমা বলিলেন, এ কি মান-ভঞ্জনের পালা হচ্ছে ভাই? তুমি যে এতদিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে—তা তোমার ছিরাধিকের রাগ হতে পারে এটা বুঝতে পেরেছ—নয়? বেশ চালাক নটবর তো তুমি!

মাঝের বাড়ির ছোটগিন্নী বলিলেন, ছিরাধিকের চরণ ছাড়া কৃষ্ণের কি গতি আছে? তাইত ও তোমায় ভুলতে পারে নি। যা হোক, পালা তোমাদের জমবে ভাল।

দিদিমা বলিলেন, জমবে না! বৃন্দাবনে যদি না জমবে তো মথুরায় কুঁজিকে নিয়ে জমবে বুঝি? এখানে যে ষোল-শো গুপিনী।

ছোটগিন্নী বলিলেন, কিন্তু আমরা তো দেখছি কুঁজিরই জয়জয়কার। আমাদের কানু কুঁজির ছিচরণ ছাড়া চিনলে কই!

দিদিমা বলিলেন, বটে ছুঁড়ি! মন ভোলাতে হ'লে শুধু রূপের জ্যামাক করলে চলে না, যত্নআত্তি না করলে কি ওরা ভোলে! শুধু কান্না, শুধু মান—ওতে কি পালা জমে?

লবঙ্গলতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, একবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন, দিদিমা।

দিদিমা বলিলেন, ধুলো আর রইলো কই লবঙ্গ, এমনও হ্যাংলা জামাই করেছিস যে সবটুকু চেটেপুটে মেরে দিলে লো!

সকলে হাসিতে হাসিতে বাড়ির মধ্যে চলিলেন।

যোগমায়ার রাগ তখন রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছে। সে বেচারা প্রাচীনাদের রসিকতা বানে বিদ্ধ হইয়া কান মুখ রাঙা করিয়া চোরটির মত ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিল। যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গে চাঞ্চল্য ফুটিয়াছে। মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খসিয়া না পড়িলেও খাটো হইয়াছে এবং চোখে মুখে কৌতুক হাস্য দেখা যাইতেছে। আড়ষ্ট রামচন্দ্রের পানে চাহিয়াই হয়ত বা তাহার এই কৌতুক অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে!

যেখানে পাল্কী নামানো হয়—সেখান হইতে বাড়ি মিনিট দুইয়ের পথ। ওই শিশু বকুল গাছতলাটা হইতে দু-ধারে আস্‌শেওড়া সমন্বিত বনটা সবই যোগমায়াদের। বাড়ি পৌঁছিবার পথটি কিছু প্রশস্ত; প্রত্যহ সম্মার্জ্জনী সঞ্চালনে ও গোবরজল ছড়ায় পরিষ্কৃত সে পথ।

যোগমায়ার পিতা বাড়ি ছিলেন না। বৈদ্যপাড়ায় প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি দাবা খেলিতে যান; মেয়ে, জামাই আসিবার কথা জানিয়াও প্রাত্যহিক নেশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের পক্ষে সে ভালই হইয়াছে। মেয়েমহলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও রসিকতাগুলি পরিপাক করা কঠিন হইলেও রামচন্দ্র তাহাতে কিছু অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাশভারি, শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত শ্বশুরের পানে চাহিয়া কথা বলিবার সাহস তার নাই। যে কটা কটা চোখের তারা তাঁর, আর গলার স্বরটিও সেই পরিমাণে গম্ভীর। হইলই বা স্নেহ-পুলকিত মৃদু সে স্বর,—স্নেহ প্রকাশের শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরের গাম্ভীর্য্য যে ঢাকা পড়ে না!

অবশেষে সদর দরজা দিয়া ইঁহারা বাড়ির মধ্যে আসিলেন। উঠান প্রশস্ত। বাড়ি ঢুকিবার মুখেই একটা বেলগাছ দেখা যায়, সদর দরজার ভিতরেই মোটা কাছির মত একটা লতাগাছ প্রাচীর বাহিয়া বেলগাছে গিয়া ঝাঁকড়া হইয়াছে। মধুমালতীর লতা। সাদা সাদা ফুলগুলি তার চমৎকার। সদর দরজার ভিতরে খানিকটা জায়গা ছোট প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া ভিতরের উঠানের আব্রু রক্ষা করা হইয়াছে। ডান দিক দিয়া ঘুরিয়া সেই প্রাচীর পার হইলেই প্রশস্ত উঠান নজরে পড়ে। উঠানের এক

ধারে একটা স্বাস্থ্যহীন কাঁঠালগাছ দেখা যায়। তাহার ঠিক নীচেয় ছোট্ট পাতকুয়াটি। ও-পাশে ঝাঁকড়া লেবু-গাছ পূর্ব্ব দিকের প্রাচীরের গায়ে অনেকখানি জমি দখল করিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানের মাঝখানে একটি বকফুলের গাছ আছে, একটি করিয়া গন্ধরাজ ও জাঁতি-ফুলের গাছও আছে। ঠাকুরঘরের ও-পাশে জুঁই, টগর, মল্লিকা, জবা ও কুন্দফুলের ঝাড় রহিয়াছে। ঝাড়ের কোথাও বেড়া দেওয়া নাই, তথাপি ছাগল বা গরুর মুখ-স্পৃষ্টতার চিহ্ন সেগুলির কোথাও দেখা যায় না। দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া একটা ছোট পেয়ারা গাছ শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। প্রকাণ্ড আটচালা—সুশ্রী এবং শোভন। যেমন চওড়া তাহার দুই দিকের দাওয়া, তেমনই বড় বড় দু'খানি ঘর। দাওয়ায় তক্তাপোষ পাতা আছে। দশ-বার জন অতিথি আসিলে পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা দাওয়ার পূর্ব্ব বা দক্ষিণ ধারে অনায়াসে স্থান সঙ্কুলান হইয়া যায়। উঠান হইতে দাওয়ার উচ্চতাও হাত আড়াই হইবে।

বরকে লইয়া পুরমহিলারা ঘরের মধ্যেই বসিলেন। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। রেড়ির তেলের প্রদীপটি না জ্বালা থাকিলে বরের মুখই দেখা যাইত না! জোড়া কুলুঙ্গির নীচে যেখানে বরের বিছানা পাতা হইয়াছে—বসুধারার ছাপ। কুলুঙ্গির মাথায় কালী, দুর্গা, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথমূর্ত্তি, কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি ইত্যাদি ছোট ছোট পট রহিয়াছে। ও-পাশের বড় কড়ির আলনাটায় শীত-কালের কাঁথা বালিশ ইত্যাদি একখানি ফরসা কাপড় দিয়া বাঁধা রহিয়াছে,—অজ্ঞাতবাসকালে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখিবার মত। জলচৌকির উপর কাঁসার ও পিতলের বাসনগুলি প্রদীপের আলোয় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কাঠের সিন্দুকে সিন্দুর চন্দনের দাগ। তবে সিন্দুকগুলি রামচন্দ্রের বাড়ির চেয়ে অনেক বড় ও অনেক কারুকার্য্যমণ্ডিত!

যোগমায়া অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, রামচন্দ্র ইহাদের রসিকতা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে এবং মনে মনে ক্রুদ্ধও হইতেছে। ক্রুদ্ধ হইবার কথাই তো। চুন না দিয়া পান সাজা, পানের ডিবা খুলিতেই গোটাকতক আরশুলার বহির্গমন, কর্ণমর্দ্দন ইত্যাদি স্থূল রসিকতার দ্বারা পুরমহিলাদের কৌতুকরস সৃজন—কাহার না রাগ হয়। সতেরো-আঠারো বৎসরের বরকে লইয়া এই সব রসিকতা অবাধ গতিতেই চলিয়াছে।

অবশেষে লবঙ্গলতা তাহাকে সেই বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন, বাছাকে একটু জিরোতে দে ভাই! কোন্ দূর থেকে এসেছে—হাক্লান্ত হয়ে আছে। বিকেলে আসিস!

দিদিমা বলিলেন, তাই আসব। ভাল ক'রে মাছের মুড়ো—দুধ ঘি খাইয়ে বাছাকে তোর চাঙ্গা করে রাখবি—বুঝলি?

হাসিতে হাসিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র বিছানার উপর কাত হইয়া শুইল। শাশুড়ী দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বৈকাল আসিবার পূর্ব্বেই কিন্তু দুই-এক জন শালী সম্পর্কীয়া আসিয়া জুটিল। মণিমালা নাম্নী এক বিংশ বর্ষীয়া তরুণী লবঙ্গলতাকে বলিল, তুমি সর দেখি, খুড়িমা। জামায়ের পিড়ি পাতা—ভাত খাওয়ানো আমরাই করব।

লবঙ্গলতা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, ওকি মণি, ঘরের মধ্যে আসন পাতলি কেন? যে অন্ধকার ঘর, দাওয়ায় জায়গা কর।

মণিমালা ঘর হইতে উত্তর দিল, আহা, খুড়িমার কথার ছিরি দেখ! জামাইমানুষকে নাকি বাইরে খেতে দিতে আছে? পাঁচ জনের দৃষ্টি পড়ুক আর কি! ঘর তোমার অন্ধকার হয়—পিদীম রয়েছে কি করতে?

পিঁড়ি পাতিয়া ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল ভরিয়া মণি-মালা এ ঘরে আসিয়া ডাকিল, এস ভাই রামচন্দ্র—খাবে এস। আহা অনেকখানি বেলা হ'য়ে মুখখানি শুকিয়ে গেছে।

রামচন্দ্র সপ্রতিভ ভাবে বলিল, মুখ শুকুবে কেন, বাড়িতে তো আমি এই সময়ে খাই।

'এত বেলায়! জন মজুর খেটে আস বুঝি কোথাও? কৌতুকহাস্যে মণিমালা ফাটিয়া পড়িল।

লবঙ্গলতা রান্নাঘর হইতে হাঁকিলেন, তোদের জায়গা করা হ'লো রে মণি?

হাঁ—খুড়িমা। তোমার জামাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। এস ভাই।

এ ঘর আরও অন্ধকার। যে প্রদীপটি মণিমালা জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাতে অন্ধকার খানিকটা পাতলা হইয়াছে মাত্র—সুস্পষ্ট কোন জিনিষ দেখা যায় না। মাছের কাঁটা বাছিয়া গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

রামচন্দ্র সন্তর্পণে পিঁড়িতে পা দিতেই হড় হড় করিয়া পিঁড়ি গড়াইয়া গেল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল। আছাড় খাইয়া পড়িলে মাথা না ফাটুক—আঘাতটা গুরুতরই হইত। মণিমালা ও আর

দুই জন তরুণী 'আহা' 'আহা' ধ্বনি করিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

লবঙ্গলতা ওঘর হইতে হাঁকিলেন, শব্দ হ'লো কিসের, মণি?

তোমার অকর্ম্মা জামাই পড়ে যাচ্ছিলেন, খুড়ি মা। এমন যুগ্যতা নেই যে পিঁড়িতে ভাল করে বসেন। তখন পূর্ণোদ্যমে হাসি চলিতেছে।

লবঙ্গলতা তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, পিঁড়ির তলায় সুপুরি দিয়েছিস বুঝি? পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গলে তখন কি তোরা দায়ী হবি?

না গো খুড়িমা, বসতে গিয়ে যে পড়ে যায়—তেমন অকর্ম্মা জামাইয়ের দায়িক আমরা কেন হব?

ওকে বসা—আমি ভাত নিয়ে যাচ্ছি। লবঙ্গলতা বলিলেন।

ইস, তুমি নিয়ে আসবে বৈকি! আমরা বলে জামাইয়ের কাছে বসে খাওয়াব বলে আশা করে আছি। বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর দুই জন মেয়ে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া আসনে বসাইল।

ভাতের থালা লইয়া মণিমালা দেখা দিল। সুশীলা গ্লাস হইতে জল লইয়া হাতের তালু দিয়া মেঝে মুছিয়া দিল। মণিমালা থালা নামাইয়া বলিল, দুর্গা তুই একটু বাতাস কর না, ভাই।

আচমন করিয়া রামচন্দ্র যেমন ভাতের থালা টানিয়া লইয়াছে—অমনই দুর্গা সজোরে পাখা চালনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রকে বিস্মিত করিয়া পাখার হাওয়া লাগিয়া থালায় সজ্জিত শুভ্র অন্নরাজি চক্ষের নিমেষে এধার ওধার উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মণিমালা হাসিতে হাসিতে বলিল, কি ভাই বর, ফুস মন্তরে সব ভাত খেয়ে ফেললে? ও খুড়ি মা, আর এক থালা ভাত নিয়ে এস, তোমার জামাই সব খেয়ে ফেলেছে গো।

থালা মণিমালাই উঠাইয়া লইল। আধ ঘোমটা টানিয়া একটি বউ নূতন থালায় ভাত বাড়িয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, খাও ভাই, এ দোরম ফুলের ভাত নয়, হাওয়ায় উড়বে না। বলিয়া সে কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে দুর্গার হাত হইতে পাখা লইয়া অন্নথালির উপর বার কতক সজোরে বাতাস করিল।

এবারের বিপদ কিন্তু অন্য রকমের। মধ্যমাঙ্গুলি ভাতের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবিষ্ট করাইয়া রামচন্দ্র বুঝিল, চূড়াবিশিষ্ট অন্নরাজির মধ্যস্থলে একটি বাটি বসানো রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে ভাত ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল—যেন বাটি প্রকাশিত হইয়া না পড়ে।

শাক দিয়া অন্ন মুখে তুলিবার পর মণিমালা প্রশ্ন করিল, হাঁ ভাই, শাক তেলশাক কেমন হয়েছে?

ভাল। বলিয়া রামচন্দ্র সবটুকু শাক মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। কাঁচা শাক যতই বিস্বাদ হউক, মুখ বিকৃতি করা চলিবে না। উহাদের রহস্যের পথটি সে বন্ধ করিবেই।

মণিমালা হাসিয়া বলিল, ওগো খুড়িমা, শাক তেলশাক তোমার ভালই হয়েছে। আর একটু দেব?

আজ্ঞে না। অসঙ্কোচে রামচন্দ্র বলিল।

না, ভাই, আর মেলা শাকটাক খায় না, মাছ খাও।

সত্য বলিতে কি, আধপেটা খাইয়াই রামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ ঘাড় নাড়িতে হইল, উদ্গারও তুলিতে হইল।

মণিমালা জিদ ধরিল, না ভাই, ভাত তুমি মোটে ছুঁলে না। মাথা খাও আমার—মাঝখান থেকে চারটি ভেঙ্গে নাও।

হাতজোড়ের ভঙ্গিতে রামচন্দ্র বলিল, মাপ করুন।

এমন সময়ে দুধের বাটি হাতে করিয়া লবঙ্গলতা ঘরে ঢুকিয়া ধমকের সুরে বলিলেন, যা তো ছুঁড়িরা—বাছাকে খেতে দিবি না নাকি! বোস বাবা, এই দুধটুকু চারটি ভাত মেখে খেতেই হবে। বলিয়া নিজেই মুঠা দুই ভাত তুলিয়া দুধের বাটিতে দিলেন। ভাতের মধ্যের বাটি বাহির হইয়া পড়িল।

মণিমালা হাসিতে হাসিতে বলিল, ওমা, কি হবে গো, খুড়িমার জামাই ভাতের মধ্যে বাটি লুকিয়ে রেখেছিল! এমন চোর জামাই তো দেখি নি বাবা!

ধমক খাইয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে পলাইল।

লবঙ্গলতা অনুরোধ করিয়া না খাওয়াইলে বেচারাকে সে বেলা এক প্রকার উপবাসেই কাটাইতে হইত!

রাত্রিতে যোগমায়া বলিল, দোরম ফুলের ভাত বুঝতে পার নি?

যে অন্ধকার ঘর তোমাদের।

অন্ধকার বলেই তো ওই ঘরে ওরা তোমায় খেতে দিয়েছিল। ভারি দুষ্টু ওরা।

তোমার ঠানদিদিটিও কম নন।

নতুন বরকে নিয়ে সবাই ও রকম করে।

কেন, বর কি চোর নাকি?

আমেরিকায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন

মধ্য-আমেরিকার পর্ণকুটীর। বাংলা দেশের পল্লীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়
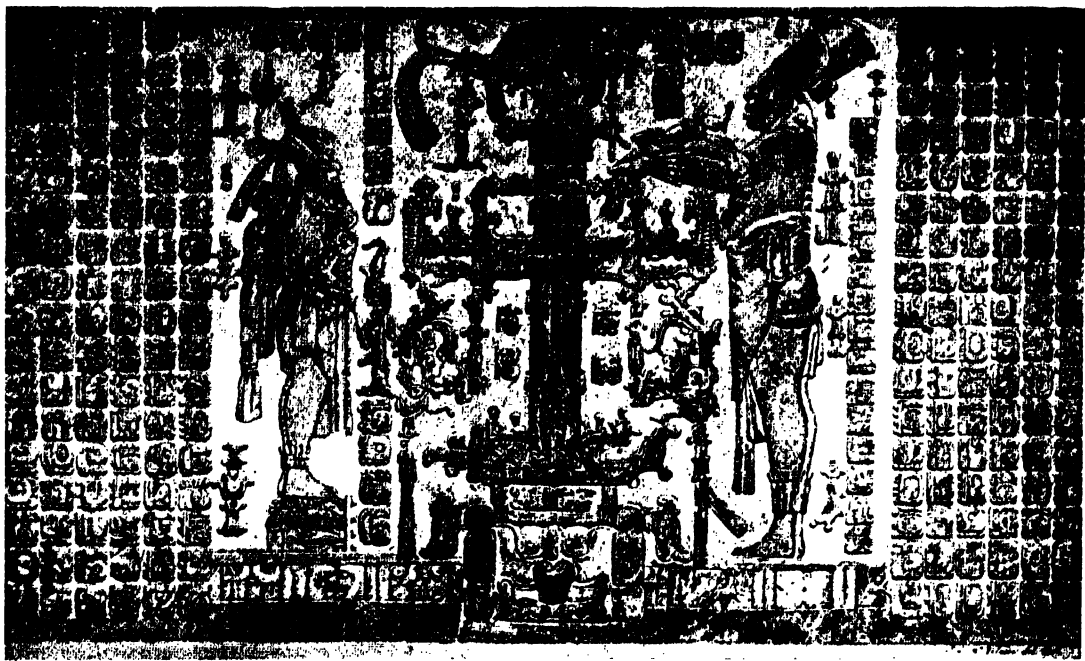
ঋগ্‌বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্যেনপক্ষী-নিধন-উৎসবের একটি দৃশ্য। মধ্য-আমেরিকায় মন্দির-গাত্রে এই দৃশ্যটি খোদিত হইয়াছে
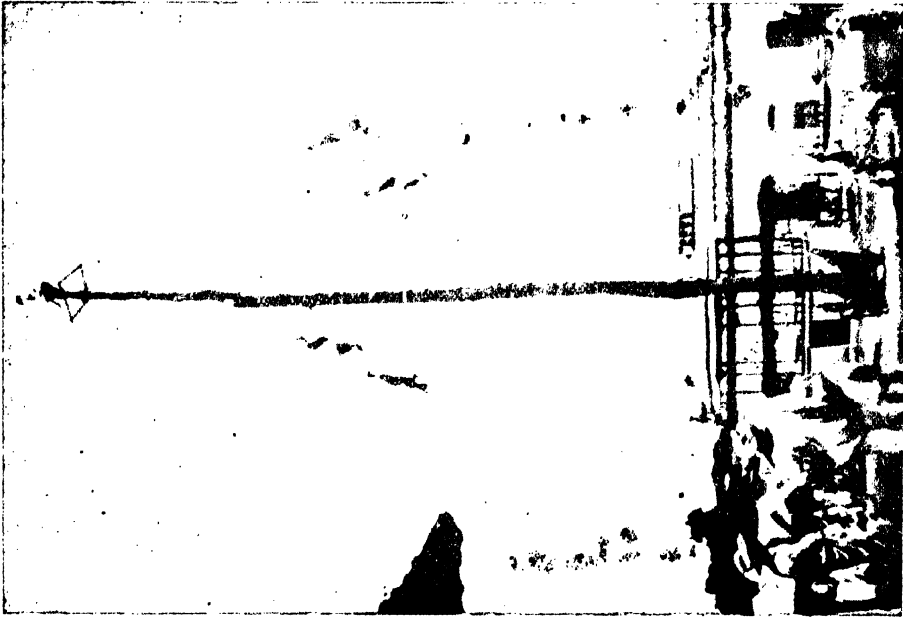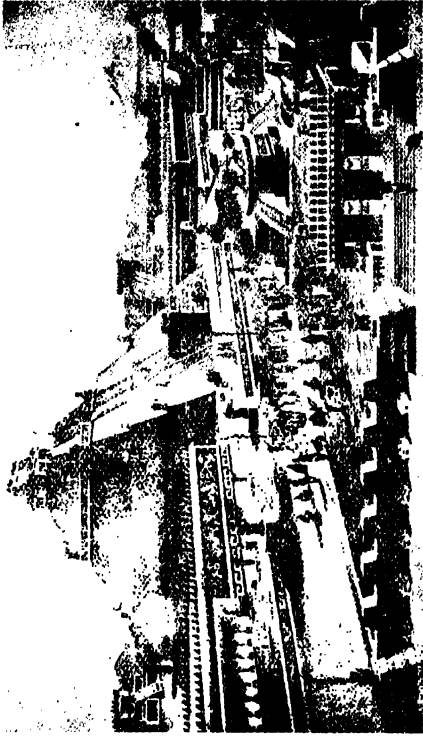
যোগমায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, চোর নয় তো কি! তোমায় দেখে আমার এমন মায়া হচ্ছিল!

প্রদীপের আলোয় যোগমায়াকে অপরূপ দেখাইল। রামচন্দ্র তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, শুধু মায়া?

বাঃ রে, কষ্ট হয় না বুঝি? খিদের সময় এক জনকে না খেতে দেওয়া!

শুধু কষ্ট?

আর শোন। কণ্ঠস্বর নামাইয়া যোগমায়া বলিল, কাল তোমাকে ওরা নেমন্তন্ন করে লুচি খেতে দেবে। ন্যাক্‌ড়ার লুচি। তুমি খেয়ো না, বলবে, না ফললে সে লুচি আমরা খাই নে। কেমন?

আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্র বলিল, তা তো বলবোই। আর কি পরামর্শ করেছে ওরা বল তো?

আমার মাথা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর আগে—কাউক্যে বলবে না? ওরা জানতে পারলে যা ক্ষেপাবে!

বেশ বল। রামচন্দ্র যোগমায়ার কথাবৎ শপথ করিল।

পিটুলি গোলা দেবে—দুধ বলে—খবরদার খেয়ো না। বলো পেটের অসুখ করেছে।

বটে! ভারি তো বুদ্ধি ওদের। খালি ঠকাবার মতলব।

আর যার বাড়ি নেমতন্ন করবে—আগে ভাল করে দেখে শুনে তবে খাবে। অন্ধকার ঘরে বসবে না, পিঁড়িটা সরিয়ে বসবে, পানের ডিবে খবরদার খুলো না।

যোগমায়ার বুদ্ধি আছে। তা ছাড়া বাপের বাড়িতে আসিয়া সে অনেকটা সহজ হইয়াছে। রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিয়া তবে সে ঘুমাইল। এ বাড়ির এইটুকু মজা যে, কাক কোকিল ডাকিতে-না-ডাকিতে দেহভরা আলস্য ও ঘুম-ভরা চোখ লইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে না। এখানে বধূজীবনের কোনরূপ কর্ত্তব্যত্রুটির ভয় নাই, নিঃসঙ্কোচ কন্যা জীবনের ভূমিকায় অভিনয়-দক্ষতার বালাই নাই। বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন।

ক্রমশঃ

আমেরিকায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রিষ্টফর কলম্বস সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ-অভিমুখে যাত্রা করিয়া একটি অজানা নূতন দেশে উপস্থিত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ইহাই 'ইণ্ডিয়া' বা ভারতবর্ষ, এ কারণ এদেশটির নাম 'ইণ্ডিজ' ও অধিবাসীদের 'ইণ্ডিয়ান' নামে আখ্যাত করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সমুদ্রপথে সত্যকার ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইলে কলম্বসের ভ্রম ধরা পড়িয়া যায়। এখনও 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ,' 'ইণ্ডিয়ান' বা 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামগুলি কলম্বসের ভ্রমের সাক্ষ্য দিতেছে।

তদবধি সভ্য মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, কলম্বসই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইউরোপীয়গণের আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের একটি উন্নত ধরণের সভ্যতা ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়—এ ধারণাও উহাদের মনে বদ্ধমূল হয়। ইণ্ডিয়ান বা রেড ইণ্ডিয়ানগণ আগন্তুকদের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া বরং
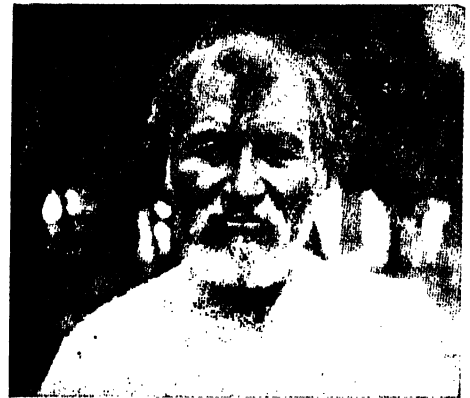
মেক্সিকোর পুরুষ, মনে হয় যেন সীমান্তের গান্ধী

পঞ্জাবী ধরণের আমেরিকান পুরুষ

মরণপণে তাহাদের বাধা দিয়াছিল এবং এইরূপ বাধা দিতে দিতে আত্মবিলোপেই মুক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। প্রসিদ্ধ নিগ্রো-নেতা বুকার টি. ওয়াশিংটন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, রেড ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের ইউরোপীয়গণের চেয়ে অধিকতর সভ্য ও উন্নত বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা যে আগন্তুকদের অধীন হইতে স্বীকৃত হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রধান কারণ।

ইণ্ডিয়ান বা রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন সভ্যতা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। সাধারণ ইউরোপীয়ের বিশ্বাস, পূর্ব্বে মধ্য-আমেরিকায় একটি বিশিষ্ট সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল। অতলান্তিক মহাসাগরের গর্ভে বহু সহস্র মাইল ব্যাপী আটলান্টিস্ নামে একটি দেশ নিমজ্জিত আছে। এই দেশটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ উন্নত ছিল। মধ্য-আমেরিকা ইহারই অঙ্গীভূত ছিল। কোন বিশেষ নৈসর্গিক কারণে ঐ বিস্তৃত মহাদেশটি জলমগ্ন হওয়ায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও সম্যক্ অধঃপতন হয়। বস্তুতঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের পূর্ব্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন এখন খুব কমই মিলে। উপরে যে নৈসর্গিক কারণের কথা বলিয়াছি, তাহা যুক্তিসিদ্ধ কি-না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আমেরিকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদের উপর আগন্তুক ইউরোপীয়দের অত্যাচার-অনাচারের তুলনা নাই। তাহারা তখন হীন দশায় উপনীত হইয়াছিল। তথাপি তাহাদের গ্রন্থাগার, দেবমন্দির, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা যাহা কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল আগন্তুকরা তাহা একে একে নষ্ট করিয়া ফেলে। গ্রন্থাগারগুলি তাহারা পুড়াইয়া দিয়াছিল। মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রথম প্রথম যে-সব ইউরোপীয় অভিযানকারী গিয়াছিল তাহাদের লেখা বিবরণ আছে। এই সকল বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলেও এগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারা যায়। আজ্‌টেকদের শেষ রাজা স্পেনদেশীয় অভিযানকারী কোর্টেসকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বদেশ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন। এইরূপ আরও এমন কতকগুলি সূত্র আছে যাহার ফলে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিমলার পাহাড়ীদের অনুরূপ আমেরিকান নারী

এই সব সূত্র ধরিয়া গত শতাব্দীতে মধ্য-ব ময় ও আজ্‌টেক সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী

গবেষণা সুরু করেন। এলিয়ট, স্মিথ, হিউয়েট, স্কোয়ার, মর্টন, টড, পোকক, ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ বহু মনীষী দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেক্সিকোর আদিম সভ্যতার উৎস খুঁজিতে হইবে ভারতবর্ষে। গত শতাব্দীতে, ইংরেজী ১৮৮৮ সালে কেদারনাথ বসু *Hindu Civilization in America* নামক পুস্তিকাতেও এই মত প্রকাশ করেন। কেদারনাথ আমেরিকার বোষ্টন নগরীর এনথ্রপলজিকাল সোসাইটির করেসপণ্ডিং মেম্বর বা সদস্য ছিলেন। তিনি এই পুস্তিকার আরম্ভেই এই মর্ম্মে লেখেন যে, আমেরিকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদের ঐতিহ্য, কাহিনী, গাথা, দেব-দেবীর মূর্ত্তি, স্থাপত্য-রীতি প্রভৃতি ইহাই প্রমাণ করে যে, এসবই হিন্দুদের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। উভয়ের মধ্যে এতখানি সাদৃশ্য কোন ক্রমেই আকস্মিক হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন,

That long before the discovery of the American continent by Europeans, the land was peopled by a civilized race is admitted by all. But it remains to be seen whether the people were an autochthonous race and had evoluted by degrees from primitivism to a civilization of no mean merit, or whether they belonged to an Asiatic stock which had migrated to the 'New World' with its civilization. From a study of the subject we are inclined to believe that the American Indians, and the ancient civilized Mexicans and Peruvians were of Asiatic origin but they belonged to two distinct races.

তাৎপর্য। "ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই যে এখানে একটি সভ্য জাতি বসবাস করিত তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। এখন ইহাই দেখিতে হইবে যে, এখানকার অধিবাসীরা একটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে আদিম অবস্থা হইতে অত উন্নত ধরণের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, না এশিয়াবাসীরা এই নূতন দেশে গিয়া এইরূপ একটি সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এ বিষয় ধীর ভাবে আলোচনা করিলে আমাদের এইরূপই প্রতীতি জন্মে যে, 'ইণ্ডিয়ান' নামধেয় আমেরিকার অধিবাসীরা এবং মেক্সিকান ও পেরুভিয়ানরা এশিয়া হইতেই এইরূপ উন্নত ধরণের সভ্যতা লইয়াই সেখানে গিয়াছে…।"

ইহার পর গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। যে-সকল পণ্ডিত গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েক জনের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মেক্সিকো, পেরু ও অন্যান্য স্থানে খননকার্য্যের ফলে মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সে-সব পরীক্ষা করিয়াও এ বিষয়ে বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এদিকে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনাও সবিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। ভারতীয় ও প্রাচ্য দেশসমূহের অধিবাসীদের রীতিনীতি, আমোদ-উৎসব, পূজা-পার্ব্বণ, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, এবং তাহাদের অনুসৃত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্প-রীতি আমেরিকার ঐ সব বিষয়ের সঙ্গে যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভবপর হইয়াছে ইদানীং।

মেক্সিকান পুরুষ

পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাস—ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুইটি প্রবাহ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চলিয়া যায়। পূর্ব্ব দিকের প্রবাহ মলয়, শ্যাম, বলী ও যবদ্বীপ হইয়া ইণ্ডোনেশিয়া ও পোলিনেশিয়া অতিক্রমপূর্ব্বক মধ্য-আমেরিকায় উপনীত হয়। ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব-এশিয়া হইতে আর্য্য ও মোঙ্গল জাতি খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশিষ্ট রীতিনীতি ও সভ্যতাও প্রবর্ত্তিত হয়। মেক্সিকো-রাজসরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মেক্সিকোর ইতিহাস' (*History of Mexico*) পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,

Those who first arrived on the continent later on known as America were groups of men driven by that mighty current that set out from India towards the East.

তাৎপর্য। পরবর্ত্তী কালে আমেরিকা নামে পরিচিত মহাদেশে পূর্ব্ব যুগে বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। **ভারতবর্ষ** হইতে পূর্ব্ব দিকে যে জনপ্রবাহ বহির্গত হইয়াছিল ইহারা তাহাদেরই কতকগুলি সমষ্টি।

মেক্সিকান নারী

দেখা যাইতেছে, দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে যে-সব তথ্য নির্ণীত হইয়াছে, অন্ততঃ আমেরিকার একটি স্বাধীন দেশও সরকারীভাবে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কলম্বসই আমেরিকার প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন এবং বিদেশ হইতে একমাত্র ইউরোপীয়েরাই প্রথমে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার অধিবাসীরা যে আমেরিকার বিভিন্ন অংশে বসবাস আরম্ভ করিয়া নিজেদের সভ্যতা বিস্তৃত করিয়াছে, তাহার নিদর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, আমেরিকার আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ানগণ এশিয়ার জাতি-সমূহেরই ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। তাহারা এশিয়া হইতেই ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন বা বসতি বিস্তার করিয়াছে। গত ডিসেম্বর (১৯৪০) সংখ্যা 'দি লিভিং এজ' পত্রিকায় উইলবার বার্টন: ময়-সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

Most probably, in general anthropological opinion, all the American Indians are of Asiatic origin, migrating in successive waves by way of the Aleutian Islands ten thousands or more years ago.

বার্টনের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়—ময়-সভ্যতা খুবই প্রাচীন ও উন্নত, কোন কোন বিষয়ে এমন কি হিন্দু সংস্কৃতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তবে তিনিও একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণ এশিয়া হইতে আগত এবং দশ হাজার কি ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে এলুশিয়ান দ্বীপের পথে ক্রমশঃ দলে দলে সেখানে গমন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত চমনলাল গত কয়েক বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মেক্সিকো গমন করিয়া সাক্ষাৎভাবে এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া 'হিন্দু আমেরিকা' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি নিজে নৃতত্ত্ববিদ্ নহেন, তবে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিষয়ে আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানগণ এশিয়া মহাদেশের ভারতবর্ষ হইতেই সেখানে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে মেক্সিকোবাসী বহু নরনারীর—বৃদ্ধ

মধ্য-আমেরিকার নারী

আর একটি মেক্সিকান নারী, ইঁহার গ্রামের নাম রাজাপুরা

প্রৌঢ় যুবক যুবতীর আলোকচিত্রের অনুলিপি দিয়াছেন। শাড়ী পরাইয়া একাধিক নারীচিত্রও ইহাতে দেওয়া আছে। চিত্রে ইহাদের মুখাবয়ব, দৃষ্টিভঙ্গী, বস্ত্র-পরিধান-রীতি, হাবভাব প্রভৃতি দেখাইয়া ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইহারা ভারতবাসীদের সমগোত্র ও সমজাতীয় না হইয়া পারে না। এত কাল আমরা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা মারফতই পরস্পরের আত্মীয়তার কথা জানিতে পারিয়াছি, চমনলাল মহাশয় এসব চিত্র দর্শাইয়া আমাদের প্রতীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মধ্য-আমেরিকায় খননকার্য্য পরিচালনার ফলে ইদানীং যে-সব মঠ, মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহের ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার নির্ম্মাণকৌশল, প্রাচীরচিত্র, চিত্রাঙ্কন-রীতি, খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহাতে ভারতবর্ষের শিল্প-রীতি বিশেষ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এগুলিতে চীনা ও জাপানী রীতিও অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচ্য রীতিই যে ইহার মূলে তাহা এখন স্পষ্টতই নির্ণীত হইয়াছে। হিন্দু শিল্প-রীতি মলয় শ্যাম যবদ্বীপ বলীদ্বীপ অতিক্রম করিতে করিতে যখন আমেরিকার তীরে গিয়া পৌছে তখন তাহাতে কতকটা পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। বৌদ্ধ মঠও আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্তও যে আমেরিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মেক্সিকোর ন্যাশনাল মিউজিয়মের কিউরেটর অধ্যাপক রমন মেনা বলেন,—

> The [Maya] human types are like those of India. The irreproachable technique of their reliefs, the sumptuous headdress and ostentatious buildings on high, the system of construction, all speak of India and the Orient.

রমণ মেনা মহাশয় এখানে মায়াদের কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মায়াদের দেহাবয়ব ভারতবাসীদেরই মত। তাহাদের অনবদ্য শিল্প-রীতি, মোটা উষ্ণীষ, জমকাল ঘরবাড়ী, গৃহ-নির্ম্মাণপদ্ধতি—সকলই ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অনুরূপ। উইলিয়ম বার্টন মহোদয় ব্যতিরেক হিসাবে

শাড়ী-পরিহিতা রেড ইণ্ডিয়ান নারী

মায়াদের সঙ্গে প্রাচ্যের সংস্রব—অন্ততঃ একটি মূর্ত্তির দিক দিয়া—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,

"Possibly the Ancient Chinese or some other people
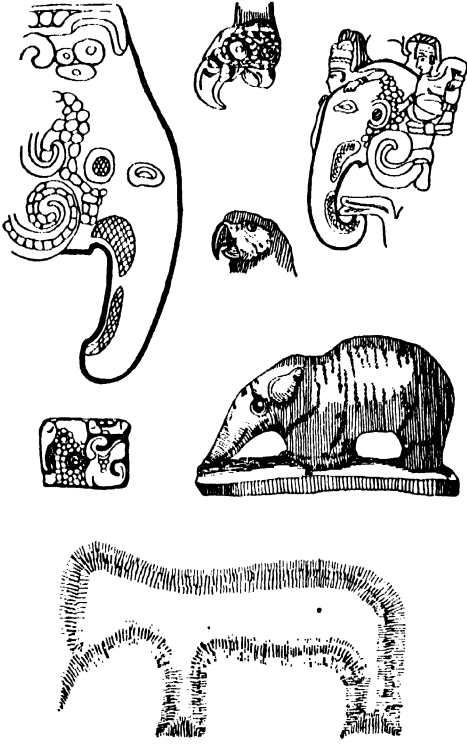
মেক্সিকোর মন্দিরে হস্তিমূর্ত্তি

in Asia and the Mayas developed Maize wholly independently of each other—or possibly the Mayas brought it with them from Asia to North America."

ময়-সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশেষ শাখা —কোন কোন গবেষক বহু পূর্ব্বে এই মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। মায়ারা স্থপতি-বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গৃহনির্ম্মাণ-রীতির সঙ্গে তাহাদের রীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এজন্য অনেকে মনে করেন, মহাভারতে যে ময়-দানবের উল্লেখ আছে ইহারা তাহাদেরই বংশসম্ভূত। ময়-দানব ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা-গৃহ নির্ম্মাণে স্থাপত্য কৌশলের কিরূপ আশ্চর্য্য পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা মহাভারতে আছে। কেহ কেহ বলেন, আমেরিকায় সে-যুগে মায়াগণ বহু বিষয়েই বিশিষ্টতা লাভ করে এবং কোন কোন বিষয় ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই সেখানে উন্নত আকারে দেখা দেয়। ইহা হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। মায়ারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে স্বকীয় চেষ্টায় কোন কোন বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া থাকিবে।

ইদানীং মধ্য-আমেরিকায় দেব-দেবীর মূর্ত্তিও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় অভিযানকারীরা যখন প্রথম মেক্সিকোতে উপস্থিত হন তখন তাঁহারা আদিম অধিবাসী-দের বহু দেবদেবীর পূজা করিতে দেখিয়াছিলেন। এখন যে-সব পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তি বা তাহার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন, সেগুলি হিন্দু দেবদেবীরই প্রতীক। গণেশ, ইন্দ্র, বরুণ, শালগ্রামশিলা ও ছোটবড় বহু দেবতা—এ

মধ্য-আমেরিকায় ভারতীয় বরদা ও অভয়া মূর্ত্তি

সকলেরই পূজা করিত আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা। এখানে তিনটি দেবমূর্ত্তির রেখাচিত্র প্রদত্ত হইল। ইহার সঙ্গে ভারতীয় দেবতাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহাতে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা নানা দেশ

মধ্য-আমেরিকায় ভারতীয় কীর্ত্তিমুখ

ঘুরিয়া সেখানে পৌছিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। বর্ত্তমান আমেরিকানরা ইউরোপীয়দের বংশধর হইলেও যেমন বহু বিষয়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছে, প্রাচীন আমেরিকানরাও ভারতবাসী ও প্রাচ্যবাসীদের সমগোত্রীয় হইলেও নানা ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল নিশ্চয়। মেক্সিকোর উক্ত তিনটি দেবতা হইল—(১) Serpent Bird, (২) God Kukulkan ও (৩) Maya Maize-God। এসব যথাক্রমে ভারতীয় (১) গরুড়, (২) কীর্ত্তিমুখ এবং (৩) বরদা ও অভয়া মূর্ত্তির অনুরূপ।

পূজা-পদ্ধতিতে, পাল-পার্ব্বণে এবং আচারে-ব্যবহারে উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। আমাদের দেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ। মেক্সিকোর অধিবাসীদের মধ্যেও পাল-পার্ব্বণের অসদ্ভাব নাই। বাংলা দেশের চড়কপূজার মত তাহারা এখনও একটি পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মেক্সিকোবাসীদের 'চড়কপূজা'র চিত্র প্রদত্ত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে, একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডের শীর্ষদেশে সংলগ্ন দড়ির সঙ্গে চারি জন লোকের পা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা দড়িতে দোল খাইতেছে। বাংলা দেশেও চড়কপূজায় এই রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও ইহা কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিন্দু-দের মত মায়া ও আজ্‌টেকদের মধ্যেও নাগপূজার প্রচলন ছিল। মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে হিন্দুর ন্যায় পুরোহিত-প্রথা, শবদাহ-ব্যবস্থা, সতী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বিবাহের আচারাদির মধ্যেও হিন্দু রীতিনীতি লক্ষিত হয়। হিন্দুদের মত লগ্ন দেখিয়া তাহারা বিবাহ করিয়া থাকে। মেক্সিকোর নারীরা হিন্দু প্রথায় প্রসাধন করে। সিঁথির সিন্দুর তাহাদের একটি বিশেষ ভূষণ।

মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা নীতি, আর্থিক আদান-প্রদান, ব্যবসায় রীতি প্রভৃতিও হিন্দুদের সঙ্গে তথাকার অধিবাসীদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা সূচিত করে। ভারতবর্ষে যেমন জাতিভেদ প্রথার প্রচলন আছে, এই সব দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীদের মধ্যে তাহা বলবৎ ছিল, এখনও তাহা কোন না কোন

আজ্‌টেক পঞ্জী। মধ্যস্থলে সূর্য্য-দেবতা। চতুর্যুগ সমন্বিত হিন্দু কালচক্রের অনুরূপ

আকারে পরিলক্ষিত হয়। সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পঞ্চায়েৎ প্রথাও ওসব দেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ তুলার আদিভূমি। এখানেই তুলা হইতে প্রথম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আমেরিকায় ভারতবর্ষ হইতেই প্রথম তুলা আমদানী হয়। ভারতবাসীদের কাছ হইতেই তাহারা প্রথম তুলার ব্যবহার শিক্ষা করে। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের ইহাও একটি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মেক্সিকোয় ভারতীয় গরুড়-মূর্ত্তি
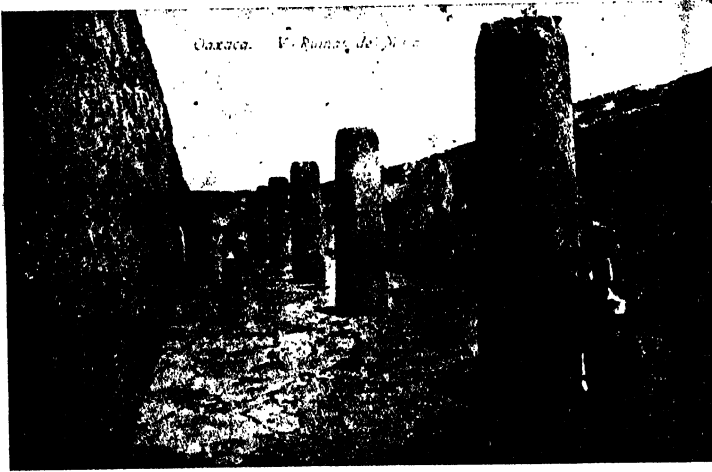
যুকাতানে সহস্র-স্তম্ভ মন্দির

ভারতবর্ষ ও মেক্সিকো তথা আমেরিকার মধ্যে সমুদ্র-পথে সুদূর অতীতে যাতায়াত আরম্ভ হয়। ভারতের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সব লোকই সেখানকার আদিম অধিবাসী। ময় ও আজ্‌টেক সভ্যতা-সৌধ প্রাচ্য তথা ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তির উপর গ্রথিত। দীর্ঘ কালের গবেষণার ফলে বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মেক্সিকোবাসীদের তরফে মেক্সিকো রাষ্ট্র যে বিশেষজ্ঞ-গণের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া অনেকাংশে মানিয়া লইয়াছেন গোড়াতেই সেকথা বলিয়াছি। কলম্বস ভ্রমক্রমে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের 'ইণ্ডিয়ান' বা 'ভারতবাসী' আখ্যা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের গবেষণার দ্বারা এই ভ্রমই বাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের গৌরব এখন হয়ত কলম্বসের আর প্রাপ্য নয়। *

* এই প্রবন্ধের মূল উপাদান শ্রীযুক্ত চমন লাল-প্রণীত *Hindu America* এবং ১৯৪০, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যা *The Modern Review* হইতে পাইয়াছি। চিত্রগুলি তিনখানি ব্যতীত সবই *Hindu America* হইতে গ্রন্থকার মহাশয়ের সৌজন্যে ও অনুমতিক্রমে গৃহীত। তাঁহার গ্রন্থের সমুদয় স্বত্ব তৎকর্তৃক রক্ষিত।—লেখক :

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বসাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দানবৈশিষ্ট্য আমরা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করি। বঙ্কিমচন্দ্র বা তারও আগে, একেবারে গোড়ায়, রামমোহনে বাঙ্গালীর সাহিত্যজগতে এই আধুনিকতা ও বিশ্বভাব সুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এ দুটি ধারা যেমন উপচিত সমৃদ্ধ ও বিচিত্রগতি হয়ে উঠেছে তা দেখে এই উপমাটি মনে হয় যে তাঁর পূর্ব্বে বঙ্গবাণী ছিল যেন—কালিদাসের ভাষায়—"বেণীভূত প্রতনুসলিলা," আর তাঁর পরে সে হয়ে উঠেছে উভয় কূল-পরিপ্লাবী ফেনিল উর্ম্মিল সাগরসঙ্গম।

সে যা হোক, এখানে রবীন্দ্রনাথের এ দিকটির পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ আধুনিকতার (ও বিশ্বমানবতার) প্রবাহ এত দূর চলে গিয়েছে, এত সর্ব্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে তা প্রায় অতিমাত্রার ও বিকৃতির পর্য্যায়ে উঠেছে গিয়ে। এখন সময় ও অবস্থা এসেছে যখন মনে হয় দৃঢ় উদাত্ত কণ্ঠে বলা প্রয়োজন হয়েছে—"এবার ফিরাও মোরে"; বর্ত্তমানের, দারুণ আধুনিকতার উপপ্লব ও পরিপ্লাবন থেকে প্রাচীনের সনাতনের দুই-একটা মহাসত্য সমুচ্চ উপলব্ধি রক্ষা করা আজ আশু কর্ত্তব্য হয়ে উঠেছে। আমি তাই বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও বিশ্ববাসী হলেও তাঁর মধ্যে অক্ষুন্ন রয়েছে, মূর্ত্তি পেয়েছে প্রাচীনের ও দেশীয়ের অন্তঃস্থ কয়েকটি সনাতন চিরন্তন সত্য ও উপলব্ধি।

কি তবে সেই বাঞ্ছনীয় পুরাতন ও সনাতন সত্য? সেগুলি পুরাতন ও সনাতন স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গেই বোধ হয় তাদের জন্ম হয়েছে; যুগে যুগে দেশে দেশে তারা মানুষের গভীরতম নিবিড়তম উচ্চতম প্রিয়তম আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভগবান্-ঈশ্বর-পরমাত্মা, সত্য-ঋত-বৃহৎ, আনন্দ-অমৃত, চৈতন্য-আনন্ত্য, উত্তম জ্যোতি, পরা শান্তি—এই সব অতিপরিচিত জিনিসগুলিরই কথা আমি বলছি। এই যত অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অব্যবহার্য্য জিনিস এরাই মানুষের চেতনায়, তার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে কি পিছনে, প্রকট কি প্রচ্ছন্ন রয়েছে—এরাই গড়েছে মানুষের সূত্রাত্মা যাকে আশ্রয় করে চলেছে তার জীবনলীলা, তাতেই প্রোত রয়েছে তার প্রকৃতির সকল রূপায়ন—মণিগণাইব। এই সব প্রাচীন সত্যই তাদের পূর্ণ সুষমা ও প্রভায় রবীন্দ্রনাথে পরিস্ফুট, তিনি তাদের সচেতন ও একনিষ্ঠ পূজারী। বর্ত্তমানের মানবচেতনা যুগধর্ম্মবশতঃ যেন এই সকল প্রাচীন পুরাতন সম্পদ অগ্রাহ্য করে চলতে চায়, মায়া মতিভ্রম বলে ঘোষণা করে। কেহ বা এদের গণনার মধ্যেই আনে না, সম্পূর্ণ উদাসীন এদের প্রতি; কেহ বা এদের উপর বিশেষ জোর দেয়, বিরোধী বিপজ্জনক মানুষের শত্রু বলে। তবে উভয়েরই লক্ষ্য ঐহিক লৌকিক স্থূল সামগ্রী ও ঐশ্বর্য্য, তারা চায় "ইদং"এর, "প্রেয়ে"র উপাসনা। এ ধারা সম্প্রতি আবার এত স্ফীত ও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে যে মানবজাতির সমগ্র চেতনাকে অভিভূত করে গ্রাস করে ফেলবার উপক্রম করেছে। বর্ত্তমানের কবি ও স্রষ্টা—আধুনিক নামে যাঁরা নিজেদের অভিহিত করতে চান তাঁরা—জোর গলায় স্পষ্টই জানাচ্ছেন: "আমরা আকাশের পূজারী নই, আমরা ধূলির সেবাইত—আত্মার নয় রক্তমাংসের, অনন্তের নয় ক্ষণিকের, আনন্দের অমৃতের নয় তীব্র বেদনার ও মৃত্যুর নবী ও কবি।"

কেবল লক্ষ্যের দিক দিয়ে নয় উপায়ের দিক দিয়েও, বস্তুর দিক দিয়ে নয় রীতির দিক দিয়েও এসেছে অনুরূপ পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়। স্বভাবের মেজাজের ধারায় দেখা দিয়েছে এক বৃহৎ বৈরূপ্য ও বৈপরীত্য। প্রাচীন জীবনের ও শিল্পের ধারা ও ধরণ অর্থ আভিজাত্য—মহত্ত্ব, গুরুত্ব (ম্যাথ্যু আর্নল্ডের high seriousness স্মরণ করা যেতে পারে), সংযম সামঞ্জস্য সৌষীম্য, শ্রী ও হ্রী। প্রাচীনের চলনে বলনে এই গুণগুলি ফুটে উঠেছে, এদের ছাড়া তার সৃষ্টি নাই। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার বনিয়াদ যে গ্রীকো-লাতিন প্রতিভা তা ঠিক এই রীতিকে একান্ত করে গ্রহণ করেছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা ওসব বদলে দিয়েছি—আভিজাত্য, শ্রী, হ্রীর বালাই আমাদের নাই। হেলেনিক দেবতাকে ত বিসর্জ্জন দিয়েছিই,

হেব্রায়িক দেবতাও আর আমাদের ইষ্ট হ'তে পারছেন না—আমরা এখন নর্ডিক (Nordic) দেবতার, থর ও ওডিনের পূজারী।

ফলতঃ মনে হয় গ্রীকো-রোমক জগতের পতনকালে যে অবস্থা হয়েছিল, বর্ত্তমান যুগে ঠিক সেই রকমই এক অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের উত্তরাপথ হ'তে বর্ব্বরবাহিনী রোমক সাম্রাজ্যের উপর যখন প্রলয়পয়োধিজলরাশির মত এসে ভেঙ্গে পড়ল, তাতে ধ্বসে গেল ভেসে গেল প্রাচীনের শিক্ষাদীক্ষা। গ্রীকো-রোমক আদর্শ মানুষকে দিয়েছিল যে একটা বিশিষ্ট শোভন সুচারু গড়ন, তার পরিবর্ত্তে এসে পড়ল সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, অশোভনতা, রূঢ়তা—চেতনার ক্ষীণতর দীনতর পরিম্লায়মান দ্যুতি। আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে দেখা দিল সাধারণ্যের জনতার ধর্ম্ম—অর্থাৎ চপলতা চঞ্চলতা মুখরতা স্থূলতা ব্যামিশ্রতা, সংযমের দার্ঢ্যের আত্মস্থতার সম্পূর্ণ বিলয়—তলা থেকে একটা অজ্ঞানের তামসিকতার আবির্ভাব, যার চাপে সর্ব্বগঠন ক্রমে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। এই ভাবেই সমাজ উৎসন্ন যায়। এ কথা ঠিক গ্রীকো-রোমক শিক্ষাদীক্ষা ভেসে গেল বিনষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু তার পরে ফলে এল নূতন অভিনব আধুনিক (অপেক্ষাকৃত) সংস্কৃতি। কিন্তু প্রথম কথা, সে নবসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কয়েক শতাব্দী—বিপ্লবের ভাঙনের জের শেষ হ'তে, তার ভোগকাল সমাপ্ত হ'তে—তার পর, নূতনের যখন গোড়াপত্তন হ'ল এবং সত্যকারের সৃষ্টি সুরু হ'ল তখনও আবার সেই পুরাতন গুণ বা ধর্ম্মেরই কাছে যেতে হ'ল, যতই নূতন ভাবে, ভেল পরিবর্ত্তন ক'রে হোক। রোমান্স ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠল রূপ গ্রহণ করল মানুষ যখন আবার ফিরে অর্জ্জন করল একটা অন্তরের আভিজাত্য, চলনে বলনে একটা শ্রী ও হ্রী।

আধুনিক সর্ব্বতোমুখী ভাঙনের কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি অটল পর্ব্বতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত তবু প্রাচীনের পুরাতনের শ্রীময়ী হ্রীময়ী বাণী—পুরাণী প্রজ্ঞা। আধুনিককে আধুনিক ক'রে তুলতে তাঁর মত বোধ হয় আর কেউ পারে নাই অর্থাৎ আধুনিকের অন্তরাত্মার দ্যুতি দিয়ে আধুনিককে গঠন করতে তিনি কথায় ও কাজে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যখন হয়ে পড়ল আধুনিকের চর্ম্ম বা খোলসের একটা রং ঢংকে অতিরিক্ত করে তোলা তখন তাতে তাঁর সায় আর মিলে না। তখন তিনি উপনিষদবার্ত্তার নবী।

২

আধুনিকতার এক বৈশিষ্ট্য সার্ব্বজনীনতা। বহুল শিক্ষাদীক্ষা, বিভিন্ন দেশকালগত বিচিত্র চিন্তাধারা বর্ত্তমান মানুষের চিত্তে যুগপৎ অধিষ্ঠিত, সংমিশ্রিত, এতখানি ও এত রকম ভঙ্গীতে—ইদৃক্তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা—যে তার তুলনা অন্য কোন যুগে আর পাওয়া যায় না। এ সার্ব্বজনীনতা গীতোক্ত বর্ণসঙ্করের মত হয়ে পড়েছে বলা যেতে পারে "সংস্কৃতিসঙ্কর"। আধুনিক দুই-এক জন কবি সজ্ঞানে এই আদর্শের রীতির চর্চ্চা করেছেন, ফুলিয়ে ফলিয়ে দেখিয়েছেন। এজরা পাউণ্ড তাঁর কবিতায়—গুরুগম্ভীর কবিতারই মধ্যে—ইংরেজী বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়, গ্রীক, লাতিন লাইনকে লাইন পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছেন; এলিয়ট সংস্কৃতের দ্বারস্থ পর্য্যন্ত হয়েছেন; জয়েস ত এক রকম সার্ব্বজনীন ভাষাই (composite ও cosmopolitan) সৃষ্টি করেছেন। দেশে দেশে বা অতীতে বর্ত্তমানে একটা বিনিময় বা সংমিশ্রণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বদাই আছে। বিদেশীয় ঐশ্বর্য্য আমদানি করা কবিদের (এক গ্রাম্য বা লোক-কবি ছাড়া হয়ত) একটা স্বধর্ম্ম বললেই চলে। মিলতন ইংরেজী ভাষায় সমগ্র লাতিন ভাষাকে সাহিত্যকে প্রায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন, ফরাসী ভাষায় রঁসার অনুপ্রবেশ করান গ্রীক ও ইতালীয় কাব্যের ও ভাষার রং ও ঢং। প্রাচীন কালে এ রকম ছিল, আধুনিক কালের ত কথাই হ'তে পারে না; আধুনিক কালে সমস্ত জগৎ ও মানবজাতি যখন সহজ অবাধ ক্ষিপ্র গতায়াতের কল্যাণে এতখানি সংহত ও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে (কাল হিসাবেও, অতীতে নানা শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছি) যে এ ধরণের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ বা বা "সঙ্কর" অনিবার্য্য স্বাভাবিক। তবু কথা আছে।

সর্ব্বজন যেমন সত্য, বিশেষজনও তেমনি সত্য। সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী সমান ভাবে সত্য বা বাস্তব। বিশ্বমানবতা রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের জাতির ভাষার যে পৃথক্ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে তা অগ্রাহ্য করবার নয়—শুধু তাই নয় জীবন্ত সৃষ্টির জন্য এ জিনিসটির উপর প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন। এ সব কথা এতখানি বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই সন্ধিস্থল, সেই মাধ্যমিক স্থিতি—golden mean—আবিষ্কার করতে পেরেছে—বিনা আয়াসে, অবহেলায়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রেরণার বশে—যেখানে মানবচেতনার এই দুটি প্রান্ত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-

সাহিত্যকে কতখানি আধুনিক ও বিশ্বজনীন ক'রে তুলেছেন—এই দিক দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে বিচার বিশ্লেষ ক'রে অনেকে এক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন; গোঁড়া গৌড়ীয়পন্থীরা তাঁকে বাংলায় ফেরঙ্গ-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক ব'লে বিবেচনা করতেন। অবশ্য ইউরোপীয় হাব-ভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে রাশি রাশি—চিন্তা বা বিচার-গত সিদ্ধান্ত ছাড়াও তিনি তাঁর অনুভব উপলব্ধির যে রূপাবলী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে একটা জগৎ (বা mythology) রচনা করেছেন তার উপাদান অনেক পরিমাণ এসেছে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি হ'তে। কিন্তু জাতীয় প্রতিভার সঙ্গে তিনি এ সকল এমন মিলিয়ে একীভূত ক'রে ধরেছেন যে তাদের পরদেশী পরধর্ম্মী ব'লে আর অনুভব হয় না, তাদের পৃথক্ ক'রে আবিষ্কার করাও সব সময় সহজ হয় না। বিশ্বমানবের বা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সমচিত্ত হয়েও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অটুট রয়েছে—বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার কেন্দ্রকে ধরেই তাঁর কাব্যসৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত—সে পরিধি যত দূরেই চলে যাক না, সেই অন্তঃপুরুষের কেন্দ্রই সে পরিধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বাংলার সাহিত্য বা রসসৃষ্টিতে আজকাল উৎকেন্দ্রতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তার মাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে, ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইংরেজের ইউরোপের শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শের যুগে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে যে একটা উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রের মধ্যেই তা একটা শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। আজ আবার আরও গভীরতর ব্যাপকতর এক উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়েছে। সকল মানুষ, যাবতীয় জনসঙ্ঘ, বিবিধ শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা আলিঙ্গন দিতে উন্মুখ ও ব্যাকুল। আধুনিকেরা এই একটি আদর্শের রীতির ঢঙের একমুখী ধারায় চলবার ঝোঁকে ভুলে গেছেন বিশেষ ভাষা সাহিত্য শিক্ষাদীক্ষার যে অন্তঃপুরুষ তার স্থিতির কথা। এ বস্তুটি অতি সূক্ষ্ম, সন্দেহ নাই, এর পরিধি যে কোথায় কত দূর গিয়ে থামতে পারে তার নিয়মও কিছু নাই। তবুও সীমা ও সীমানা একটা আছেই—যার এদিকের সৃষ্টি হ'ল জীবন্ত স্বাভাবিক, অপর দিকে তা কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথে একটা গভীর রসবোধ একটা সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান এই সীমা ও সীমানার অব্যর্থ সন্ধান অতি সহজেই দিতে পেরেছে। এক বিশ্বমুখী বিশ্বপ্রেমময় প্রেরণা তাঁর অন্তরাত্মার পরিধিকে প্রসারিত ক'রে ক'রে বহু দূরে চলে গিয়েছে, যত দূর সম্ভব, অথচ অন্তরাত্মার সূত্রকে কেটে উধাও হয়ে যায় নাই। তাঁর কবিচিত্ত বৈদিক ঋষির মতনই বলছে যেন—

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ—*

তোমার যে মন এই সারা বিশ্বের মধ্যে সুদূরের পারে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি।

নূতন যুগে নূতন জগতে নূতন সৃষ্টির অবসর ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এমন কতকগুলি সত্য আছে যা চিরন্তন সনাতন, নূতনের মোহে তাদের অবজ্ঞা করা ও প্রত্যাখ্যান করা অর্থ জীবনের সৃষ্টির মূল উচ্ছেদ করা। অতীত জগতের শ্রী ও হ্রীর কথা বলেছি—তারা হ'ল সর্ব্বাঙ্গসুষ্ঠু সম্যক্‌সৃষ্টির আবহাওয়া। শ্রী ও হ্রীর অর্থই হ'ল মাত্রাবোধ। বর্ত্তমান যুগে ঠিক এই দুটি জিনিসকেই আমরা বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছি—জীবনে ও শিল্পরচনায় (স্মরণ করা যায় "দাদা" Dada তন্ত্রীদের কথা)। কিন্তু ফিরে ও-দুটির আশ্রয়ে আসতেই হবে—যদি সত্যকার সৃষ্টি কিছু আমাদের প্রয়াসের লক্ষ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ আর কিছু হোন বা না-হোন তিনি শ্রী ও হ্রীর জাগ্রত জলন্ত বিগ্রহ।

শ্রী ও হ্রী আবার যখন একটা অবয়ব গ্রহণ করে, অনন্তের অসীমের প্রভাও যদি তার মধ্যে স্ফুট হয় তবুও, তখন তাকে একটা দেশকালপাত্রের মধ্যে সসীম বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে হয়। এই বিশিষ্ট আকারের সুষীম সৌন্দর্য্য, রূপনৈপুণ্য সৃষ্টির ও শিল্পের এক চিরন্তন সত্য। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় সর্ব্বাতীত হলেও যেমন আবার মানুষী তনু গ্রহণ করেন—সেই রকম। একত্ব সত্য বটে, কিন্তু একাকার নয়। আমাদের আজকালের চেতনা বহু-মুখী বহুল হয়ে গিয়েছে, একত্বকে রক্ষা করতে পারে নাই। যে একত্ব একাকার নয় অথচ বহুলকে সুষীমতা দিয়ে ধারণ করেছে তার নাম ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের দিক দিয়ে হয়ত বৈদান্তিক কিন্তু অনুভবের, চিত্তরাগের, রসবৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে হলেন বলা যেতে পারে pagan—মূর্ত্তি-উপাসক। তাঁর অন্তশ্চেতনার এই ভাবটিই তাঁকে অতিমাত্রা থেকে রক্ষা করেছে—যতই তিনি গতিপন্থী হোন না চঞ্চলের মধ্যে স্থাণু যে বস্তু তার সঙ্গে তার নিত্য সংযোগ বজায় রেখেছে।†

* ঋগ্বেদ, ১০-৫৮-১০

† রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

পরমাণুর গঠন

শ্রীপরমানন্দ চক্রবর্ত্তী

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের পক্ষেও ইহার বিষয় সামান্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অনুশীলনের সুবিধাকল্পে জ্ঞানকে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি নামে বিভক্ত করা হয়। পরে দেখা যায় প্রত্যেক বিভাগের গরিষ্ঠ (important) সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে সকলের সামান্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত অনেক দেশে সংবাদপত্রেও জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা করা হয়।

অল্পদিন পূর্বে পরমাণুগুলিকে রাসায়নিক মৌলের (elementsএর) অবিভাজ্য (indivisible) ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এখন বিজ্ঞানে বিশ্লষণের বিবিধ নব উপায় উদ্ভাবিত হওয়াতে পদার্থ- ও রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্‌রা পরমাণুর একটি কেন্দ্রন (core) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে পদার্থ শাস্ত্রে দেশ (space) ও কাল (time) লইয়া বিচার করিতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে দেশ কাল ও আলো (light) সম্বন্ধে দুইটি নূতন উপপত্তি (Theory) প্রচারিত হইয়াছে। পরমাণু বিষয়ে বর্তমান ধারণাগুলি জানিতে হইলে এতদুভয়ের এবং কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সহিত ব্যবহারিক পরিচয় আবশ্যক। বিবৃতির দ্বারাই উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

আমাদের নিকট দেশ ও কাল অব্যাহত (continuous) ভাবে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয়। দেশের যে কোনও দুইটি বিন্দুর মধ্যে জল স্থল বা আকাশের এক বা একাধিকের সাহায্যে যোগ স্থাপন করা সম্ভব এবং কালও কোন অনিশ্চিত অতীত হইতে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিরামহীন ভাবে ছুটিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব বিন্দুতে বিন্দুতে এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে একটা যোগের অনুভূতি হয়। বিরামহীন অস্তিত্ব হইতেই অব্যাহতি (continuity)-র ধারণা হয়। অব্যাহতির ধারণাকে রেখাচিত্রে (Graphএ) একটি ঋজু (straight) বা বক্র (curved) রেখা (line) দ্বারা দেখান যায়। মনে করা হউক একটি রেখাচিত্রে (Graphএ) দুই ও তিন সংখ্যার মধ্যে একটি লাইন (রেখা) ঋজু বা বক্রভাবে অঙ্কিত করা হইল। তাহা হইলে দুই ও তিনের মধ্যস্থ যে কোনও দশমিক সংখ্যা (decimal) এই রেখাতে থাকিবে। বিরামহীন স্রোতকেও অব্যাহত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অপর পক্ষে যাহাতে মাঝে মাঝে বিরাম, অন্তর বা ব্যবধান রহিয়াছে তাহা ব্যাহত (discontinuous) বলা হয়।

২ ৩

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্‌রা অনুমান করিতেন যে আলোকের উৎপত্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গান্তর (wave length) যুক্ত স্পন্দন (vibrations) হইতে হয়, ও তাহা আলোকের উৎপত্তিস্থল হইতে নির্গত হইয়া অব্যাহতভাবে ঋজুপথে চলিতে থাকে। কিন্তু ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা বৈদ্যুতিন (electron) আবিষ্কারের পর নানা প্রকার নূতন পরীক্ষা হইতে থাকে। এই সময় দেখা যায় যে অবস্থা বিশেষে ধাতব প্রাবরণে (metal sheetএ) আলোক-রশ্মি ফেলিলে একটি বৈদ্যুতিন (electron) প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আলোকে অব্যাহত স্পন্দন ধরিলে ইহার ব্যক্ত তেজ (kinetic energy) যাহা হওয়া আবশ্যক, প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে ভিন্ন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৯০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বার্লিনের বৈজ্ঞানিক সভায় প্ল্যাঙ্ক (Professor Plank) এক প্রবন্ধ (paper) পাঠ করিয়া দেখাইলেন যে আলোর নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্গমনের পর সামান্য বিরাম হইয়া পুনরায় সেই পরিমাণ নির্গত হয়, এইরূপ পুনঃপৌনিকভাবে আলোর নির্গমন, নিকিরণ (radiation), প্রতিফলন (reflection) হইতে থাকে মনে করিলে পূর্ববর্ণিত ব্যক্ত তেজের (kinetic energyর) প্রকৃত পরিমাণের সহিত গণনার ঐক্য হয়। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিবারে নির্গত, প্রতিফলিত, নিকিরিত (radiate) হয় তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ইহাকে পরিম (Quantum) বলা হয়। এইরূপে পরিমাণ্য (Quantum Theory) মতবাদের জন্ম হয়।

পরিমের (Quantaর) প্রয়োগ রসায়নেও সম্ভব। মনে করা হউক একটি পাত্রে জলজানের (Hydrogenএর) 'জ'
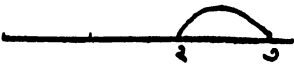
সংখ্যক পরমাণু রহিয়াছে এবং তাহাদের সমবেত ভার ‘ভ’। তাহা হইলে প্রত্যেকটির পরমাণুর ভার $\frac{\text{ভ}}{\text{জ}}$। এইটি জলজান পরমাণুর পরিম। একটি পরমাণুর অংশ কোনও প্রকারেই পাত্র হইতে লইতে বা তাহাতে দিতে পারা যায় না। পূর্ণ সংখ্যক পরমাণুই লইতে বা বৃদ্ধি করিতে পারা সম্ভব, এজন্য পরিমের গুণিতক (multiple) দ্বারাই পাত্রস্থ জানের ভার হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবে। পরিমের (Quantaর) প্রয়োগ জীবজগতেও হইতে পারে। যেখানেই কোনও প্রকার প্রাণীর সমষ্টি দৃষ্ট হইবে, তাহাদিগকে গণনা করিয়া পূর্ণ সংখ্যাই পাওয়া যাইবে। অতএব প্রাণীর পরিম ১। পরিম পূর্ণ সংখ্যা বা দশমিক (decimal) দুই হইতে পারে, কিন্তু যাহার যাহা ‘পরিম’ হয় সেই সংখ্যা বা তাহার গুণিতক দিয়াই তাহাতে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এজন্য মনে করা যাইতে পারে জনৈক ব্যক্তিকে লোক নিযুক্ত করিয়া কাজ লইতে হয় এবং একটি কাজ এক জনে ১৫ দিনে সম্পন্ন করে, সেইটি তাঁহাকে ৪ দিনে করিয়া লইতে হইবে। তখন তিনি $\frac{১৫}{৪}$ বা ৩·৭৫ লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে প্রতিদিন ৪টি এবং শেষ দিন ৩টি লোক লইতে হইবে। অথবা অন্য কোনও উপায় করিতে হইবে যাহাতে প্রাণী পরিম একের ব্যতিক্রম না করিতে হয়।

প্ল্যাঙ্ক সাহেবের প্রবন্ধ পাঠের প্রায় ৫ বৎসর পরে ১৯০৫ সালে বার্লিনের সেই সভাতেই সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক আইনস্টাইন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় অভিনব উপপত্তি (Theory) বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একটি স্বতঃসিদ্ধ সর্বজনসমর্থিত সিদ্ধান্ত ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে এই যে মেঘাবৃত গগনতলে কোনও বৃক্ষহীন প্রান্তরে যদি দুইটি যান বা বিমান নিঃশব্দে একই গতিতে একই অভিমুখে চলিতে থাকে তাহা হইলে কোনওটির আরোহীর পক্ষে অপরের বা নিজের গতি বিষয় নিশ্চিত হইবার উপায় থাকে না। আমরা নিরপেক্ষভাবে গতি নির্ণয় করিতে পারি না এই সামান্য সত্য হইতে তিনি বহু বিষয় বিচক্ষণ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপপত্তি (Theory)কে আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) বা সাপেক্ষবাদ বলা হয়। এই উপপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ ও সাধারণ গণনা করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগে। ১৯১৫ সালে তাঁহার গবেষণা-কার্য সম্পূর্ণ হয়।

আইনস্টাইন গণনা দ্বারা স্থির করিলেন যে স্বনামধন্য সার্ আইজাক নিউটনের আকর্ষণ বিকর্ষণ সূত্রের (formula of attraction and repulsionএর) পরিবর্তন আবশ্যক। এইখানে বলা উচিত যে নিউটনের সূত্রকে কোনও স্বীকৃত তত্ত্ব ধরিয়া প্রমাণ করা যায় না। তিনি একটি আপেলকে পড়িতে দেখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে এমন একটি সূত্রের ধারণা করিলেন যাহার দ্বারা গ্রহগণের কক্ষ ভ্রমণ-কাল পর্যন্ত গণনা করা সম্ভব হইল। এই গণনাগুলির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃত পরিভ্রমণ কালের সহিত ঐক্য হওয়াই নিউটনের নিয়মের সার্থকতা প্রতিপাদন করিত। কিন্তু বুধের কক্ষপরিভ্রমণ-কাল যাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহাতে প্রতিবারেই ঐ গ্রহের কক্ষের এক ডিগ্রীর ৯০ ভাগের এক ভাগ ($\frac{১}{৯০}$°) উদ্বৃত্ত থাকিত। প্রভেদ সামান্য হইলেও ইহার সমাধান চেষ্টায় বহু জ্যোতির্বিদ বিনিদ্র রজনী ব্যয়িত করিয়াছিলেন। আইনস্টাইনের অবরোহ (deduction) প্রথায় প্রাপ্ত সূত্রে এই প্রভেদ মিটিয়া যায়। কিন্তু কেবল ইহাই আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষত্ব নহে। এই মতানুসারে আলোক বীজ সদৃশ (granular)) তেজ পরিমের গতি (motion of energy quanta) হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্থির হয়। তাহাতে পরিমাণ্য (Quantum) উপপত্তির সহিত ইহার ঐক্য হয়। বিজ্ঞানের উপপত্তির সার্থকতার একটি প্রমাণ এই যে তাহা দ্বারা কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তাহার সত্যতা দেখাইতে পারা যায়। আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে স্থির হয় যে সূর্যের নিকট হইতে তারকার আলো আসিবার সময় আলোক বিচলন (deviation of rays and light) হইবে। এই বিচলন (deviation) পূর্ণ সূর্য গ্রহণ কালেই দর্শনযোগ্য। ১৯১৫-র পর ১৯১৯ পর্যন্ত পূর্ণ গ্রহণ হইল না। জ্যোতির্বিদরা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিলেন। গ্রহণ কালের ছায়াচিত্র লইয়া দেখা গেল বিচলন হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল কিন্তু সামান্য ত্রুটি রহিল। আইনস্টাইন যে পরিমাণ বিচলন হইবে গণনা করিয়াছিলেন প্রকৃত বিচলন তাহা অপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছিল। পর পর কয়েকটি গ্রহণে দেখা গেল প্রকৃত বিচলনের সহিত গণনার ঐক্যের সম্ভাবনা নাই। বিচলনের প্রকৃত মূল্য এক ডিগ্রীর ৫০০০ ভাগের কয়েকাংশ মাত্র। ইহার পরিমাণ ছায়াচিত্র হইতে স্থির করা সময় ও সাবধানতা সাপেক্ষ। কিন্তু বর্তমানে পরিমাণ নির্ণয় যন্ত্র সকল যথেষ্ট সূক্ষ্ম হইয়াছে এবং এই পার্থক্য বিজ্ঞানের একটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান পার্থক্য লইয়াই অগ্রসর হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের

প্রথম অবস্থায় গ্রহগণের কক্ষকে বৃত্তাকার মনে করা হইত। অন্যরূপ অনুমান করিবার মত কোনও উপাদান ছিল না। কিন্তু বৃত্ত অনুমানে গ্রহগণের কক্ষ পরিভ্রমণ কাল গণনাতে অনৈক্য হইত। তখন বৃত্তের উপর বৃত্ত কল্পনা করিয়া কোনও রূপে ঐক্য আনিবার যত্ন হইত।
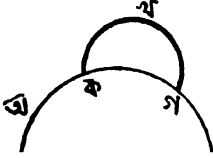
মনে করা হইত গ্রহটি অ হইতে ক পর্যন্ত একটি বৃত্তে পরে কখগ বৃত্তে ভ্রমণ করে বা ঐ প্রকার অন্য কোনও পথে। সমস্ত ধারণাই ছিল কল্পিত। ইহার পর কেপ্লার সাহেব তাঁহার পৃষ্ঠপোষক টাইকো ব্রাহের ভূয়োদর্শনে নির্ভর করিয়া স্থির করিলেন যে কক্ষগুলির আকার বৃত্ত নহে। সেগুলি বৃত্তাভাস (ellipse) তদবধি গ্রহদের কক্ষ পরিভ্রমণ কালের গণনায় সামান্য সংশোধন আবশ্যক হইলেও কক্ষ যে বৃত্তাভাস ইহা সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন। সুনিশ্চিত ভূয়োদর্শন হইতে প্রাপ্ত ফল পরিবর্তিত হয় না। এই বিষয়ে অন্য একটি উদাহরণ আশা করি অবান্তর বিবেচিত হইবে না।

ভিন্ন ঘনত্বের স্তরে চলিবার কালে আলোক-রশ্মির বক্রতা একটি সুপ্রত্যক্ষিত সত্য। বায়ুস্তরে তারকার আলো বক্রতা (refraction) প্রাপ্ত হয়। তারকার আলোক পৃথিবীতে যতটা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় পৃথিবী সেই সময়ের মধ্যে আপন কক্ষতে কতকটা অগ্রসর হয়। এজন্য পৃথিবী হইতে তারাকে যে স্থানে দেখা যায়, তাহা তারার প্রকৃত স্থান নহে। আলোর ও পৃথিবীর বেগের জন্য তারকার স্থানের যে প্রভেদ হয় তাহাকে (aberration) অপেরন বলা হয়। বক্রতা (refraction) ও অপেরণ (aberration) দুইটির ফল যোগ করিয়াও তারকার প্রকৃত স্থান গণনা নির্ভুল ভাবে হইতেছে না দেখিয়া জ্যোতির্বিদ্গণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন যে দর্শক পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকে না, তাহার ভূপৃষ্ঠে থাকার জন্য অন্য একটি সংশোধন আবশ্যক। ইহাকে লম্বন (parallax) বলা হয়। এই সংশোধনটি যোগ করিতেই তারকার স্থান স্থির হইয়া যায়। এখানেও আমরা দেখি যে সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও গণনা ফলের বর্জন বা পরিবর্তন হয় না।

আপেক্ষিকতাবাদের প্রতি যাহাতে আমাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে সেই কারণেই উপরোক্ত দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা এই উপপত্তির একটি সিদ্ধান্তের অবতারণা করিব যাহার সহিত পরমাণুর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। আইনস্টাইন গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে সাধারণ গতি-বিজ্ঞানে যাহাকে ব্যক্ত তেজ (kinetic energy) বলে তাহাকে আলোর বেগের বর্গ দ্বারা ভাগ দিলে তেজাত্মক জড়মানের (mass of energy-র) পরিমাণ পাওয়া যায়। গাণিতিক রূপে ইহা এই সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশিত হইবে :—

$$\text{তেজাত্মক জড়মান} = \frac{\text{ব্যক্ত তেজ}}{(\text{আলোর বেগ})^2}$$

ইহার পূর্বে তেজের যে জড়মান (mass of energy) হইতে পারে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। আলোর বেগ একটি বৃহৎ সংখ্যা। সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, তাহার বর্গ তদপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ। ইহা দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধি অতি সামান্যই হয় কিন্তু সামান্য হইলেও ইহার প্রভাব অল্প নহে। বিদ্যুতিনের গণনায় ইহার আবশ্যক এবং ইহার প্রভাবে এ যাবৎ স্বতন্ত্র ভাবে যে জড়মান ও তেজের সংরক্ষণশীলতার (conservation of energy and conservation of mass) দুইটি নিয়ম (law) ছিল তাহা মিলিত হইয়া এক জড়মান ও তেজের সম্মিলিত নিয়ম হয়। ইহা হইতে জড়ের তেজ ও তেজের জড়ে পরিণতিও সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

প্রতিবাদী বলিবেন আইনস্টাইন যদি আলোক বিচলন পরিমাণ (deviation of light) গণনায় অসমর্থ হইলেন, তাঁহার অপর অভিনব সিদ্ধান্তগুলির বিচারের আবশ্যক কি ? এই অথবা অন্য যে কারণে হউক আমাদের দেশের সার্ সুলেমান ফলৈক্যানিক্য (trial and error) পদ্ধতিতে নিউটনের সূত্রের পরিবর্তন সংঘটন করিয়া কক্ষ পরিভ্রমণ ও আলোক বিচলন গণনার পক্ষে মত দিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ-গণ তাহার বিচার করিবেন। অবিশেষজ্ঞ ভাবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সাপেক্ষতা বা আপেক্ষিকতা (relativity)-বাদের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত সহজবোধ্য ভূয়োদর্শন হইতে প্রাপ্ত বলিয়া অবর্জনীয়। আলোক বিচলন পরিমাণের যখন যে ভাবেই গণনার সহিত ঐক্য হউক তাহার জন্য আপেক্ষিক উপপত্তির সিদ্ধান্তগুলিকে বিসর্জন দেওয়ার অবশ্যক হইবে না।

পরমাণু সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইতেও আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে। এখন সেই বিষয়েরই অবতারণা করা হইবে। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয়

কণাদ মুনি বলিয়াছিলেন সকল প্রাকৃতিক বস্তুই ব্যাহত ভাবে সজ্জিত পরমাণুর সমষ্টি। অর্থাৎ পরমাণুগুলির মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। ব্যবধান নগ্ন চক্ষে দেখা যায় না, কি উপায়ে যে মুনিবর তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন বলা কঠিন। আমরা তাঁহাদের কর্ম সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সমস্ত মানব সমাজ আমাদের মত অলস হয় নাই। ভারতে জ্ঞানপ্রদীপ নির্বাপিত হইলে ইউরোপে তাহা জ্বলিয়া উঠিল। ১৮০০ সালে ম্যানচেষ্টারের এক স্কুল শিক্ষক জন ড্যাল্টন বলেন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যেক মৌলের (element-এর) নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু অপর মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সহিত মিলিত হয় এবং একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সংখ্যা ভিন্ন পদার্থের সহিত মিলিত হয়। যেমন দাহজানের (oxygen-এর) সহিত জলজানের দুইটি এবং একটি অঙ্গার (carbon) পরমাণুর সহিত জলজানের চারিটি সংযুক্ত হয়। ডালটনের পর সুইডেনের বার্যিলীয়াস সাহেব বহু মৌলিক পদার্থের অন্বেষণ ও তাহাদের সংযুক্তি সংখ্যা (valency) নির্ণয় করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে সাইবেরিয়ার টবলস্ক নগরে ডিমিট্রি মেণ্ডেলীফ (Dmitri Mendeleef) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতিতে স্কচ হইলেও ভারতের না হউক, এশিয়ার সহিত তাঁহার জন্মগত সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার জন্য তিনি তদানীন্তন সেণ্টপীটার্সবর্গ ও জার্মেনীর হাইডেলবরতে গিয়া রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অনেকগুলি মৌলের (elements-এর) পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। পরমাণু-গুরুত্ব সংখ্যা (atomic weight) পরমাণুদিগের তুলনামূলক ভার।

মেণ্ডেলীফ পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যাগুলির পর পর ৮টি করিয়া এক ক্ষৈতিজিক (horizontal) রেখায় লিখিয়া নবমটি প্রথমের ও দশমটি দ্বিতীয়ের নিম্নে লিখিয়া দেখিলেন যে প্রত্যেক লম্ববৎ স্তম্ভে (vertical column-এ) প্রায় সমধর্মী পদার্থের স্থান হয় এবং প্রত্যেক স্তম্ভের পর পর পদার্থের পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যার প্রভেদ প্রায় স্থলে স্থির। যেমন প্রথম স্তম্ভে হয় Lithium (লিথিয়াম) Soduim (সার্জক) ও potassium (পত্রক)। ইহারা সমধর্মী এবং ইহাদের পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যা সংন্যস্ত করিবার সময় দেখা গিয়াছিল সে সময়ের অবস্থিত সকল মৌলিক পদার্থগুলিকে মাত্র সংখ্যানুসারে লিখিলে সমস্ত সমধর্মী পদার্থ এক স্তম্ভের অন্তর্গত হয় না। তখন সমধর্মানুকতাসারে পদার্থগুলির স্থান দিয়া দেখা গেল স্তম্ভের অনেকগুলি স্থান শূন্য রহিয়া যায়। এইরূপে তিনি কতকগুলি পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভাবনা, তাহাদের পরমাণু গুরুত্ব সংখ্যা এবং গুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অনুসন্ধানে সেই প্রকার অনেকগুলি মৌল (element) প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের মধ্য গেল্লীয়াম, স্কণ্ডিয়াম, জর্মেনীয়াম এর নাম প্রসিদ্ধ। এই সময় মেণ্ডেলীফের সারিণীতে (tableএ) শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য অনুসন্ধান করাই ছিল রাসায়নিক গবেষণা। বহু রাসায়নিক নূতন মৌলিক পদার্থ অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে পীরি ও মাদম কুরীর অনুসন্ধান বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। ইঁহারা পোলাণ্ডের পীচ হইতে রেডিয়াম নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া রাসায়নিক জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। রেডিয়াম হইতে কয়েক প্রকার রশ্মি বাহির হয়।

রেডিয়ামের একটি রশ্মির নাম আলফা। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা হিলিয়াম বা সৌরজানের গরিষ্ঠাংশ (nucleus)। রেডিয়ামের দ্বিতীয় রশ্মি বীটা। ইহাই বৈদ্যুতিন (electron) এবং তৃতীয়টি গামা রশ্মি। ইহা তড়িৎ চৌম্বিক (electro-magnetic) রশ্মি। রেডিয়াম হইতে রশ্মিগুলি অমিত তেজে বাহির হয়। এখন পর্যন্ত আলোক বেগকে (১৮৬০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে) অতিক্রম করা যায় নাই। এলফারেণুলি মাত্র ইহার বিংশতী অংশ অর্থাৎ ৮৪০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ড বেগে নির্গত হয় এবং বীটা রশ্মি প্রায় আলোকের সমান বেগে। ইহাদের সংঘাত (impact) সামান্য পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যা যুক্ত মৌল (element) সহিতে পারে না। ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই প্রকার সংঘাতেই (যাহা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে) পরমাণুগুলির কেন্দ্রন আবিষ্কার করিতে পারা যায় এবং কেন্দ্রনের একটি গরিষ্ঠাংশ (nucleus) রহিয়াছে তাহাও জানা যায়। পরমাণু-গুরুত্ব-সংখ্যা (atomic weight) লঘিষ্ঠতর (অল্প) বলিয়া হাইড্রোজেন (জলজান), হিলিয়াম (সৌরজান) ও নাইট্রোজেন (নেত্রজান) লইয়াই অধিক পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে অবগত হওয়া যায় গরিষ্ঠাংশের মধ্যে এক বা একাধিক ভারঘন (proton) থাকে। ভারঘনেই পরমাণুর প্রায় সমস্ত গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত হয়। জলজানের (Hydrogenএর) পরমাণু গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরহীন। ইহাতে একটি ভারঘন (proton) রহিয়াছে ও তাহাকে একটি বৈদ্যুতিন (electron) পরিক্রমা করে। ভারঘন অপেক্ষা বৈদ্যুতিন ১৮৫০ গুণ লঘু। কিন্তু উভয়েরই ভরণ (charge) সমান। বৈদ্যুতিনের ভরণ

ঋণাত্মক, ভারঘনের ঘনাত্মক (positive), সেজন্য দুইয়ের মিলিত ফলে সমগ্র পরমাণুর বৈদ্যুতিক ভরণ শূন্য হয়। হাইড্রোজেনের পরমাণুগুরুত্ব ১'০০৭। ইহার সমস্তই ভারঘনে (protonএ) রহিয়াছে ধরিয়া লইতে পারা যায়।

সৌরজান (helium) পরমাণুকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ইহার কেন্দ্রনের গরিষ্ঠাংশে ৪টি ভারঘন রহিয়াছে ও তাহাদিগকে পরিক্রমা দেয় ২টি বৈদ্যুতিন। অতএব বৈদ্যুতিনের জড়মান অতি ক্ষুদ্র বলিয়া ধর্তব্যের মধ্যে না লইয়াও প্রত্যেক ভারঘনের জড়মান জলজানের তুলনায় ১'০০৭ ধরিলে সৌরজানের পরমাণু গুরুত্ব সংখ্যা ৪ × ১'০০৭ = ৪'০২৮ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৌরজানের পরমাণু গুরুত্ব ৪। তাহা হইলে '০২৮ পরিমাণ জড়জানের কি হইল ?

এডিংটন সাহেব এ কালের এক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। তিনি বলেন, ৪টি জলজান কেন্দ্রন মিলিয়া ১টি সৌরজান কেন্দ্রন হইবার সময় ০'২৮ জড়মান তেজে পরিণত হইয়া বিশ্বভ্রমণে যাত্রা করে। জীন্স সাহেবও তাঁহারই মত গণিতজ্ঞ। তাঁহার ধারণা যে নক্ষত্রান্তরবর্তী বিশাল আকাশের ও নক্ষত্রাভ্যন্তরের উত্তাপাবস্থার কল্পনাও আমরা করিতে অক্ষম। খুব সম্ভব বহু ভারঘন সংযোগে অনবরত জড়মানের বিলোপে তেজের উৎপত্তি হইতেছে। জীন্স সাহেবের মতকে এডিংটনের কল্পিতার্থের (hypothesisএর) তুলনায় প্রগতিশীল বলিতে পারা যায়, কারণ তিনি কেবল মাত্র জলজানের সংযুক্তির দ্বারা স্বীয় মতকে আবদ্ধ করিয়া দেন নাই। আমাদের পৃথিবীতে প্রকৃতির মত সীমাহীন (unbounded) প্রয়োগশালা (Laboratory) নাই যে জীন্স বা এডিংটনের কল্পিতার্থ (hypothesis) যাচাই করিয়া দেখি। কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত Cosmic Raysএর (বিশ্ব রশ্মির) ব্যবহার বিষয়ে যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই মতকে অসম্ভব বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বিবেচনার অযোগ্য বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই আপেক্ষিকতাবাদে জড়ের তেজে পরিণতি সিদ্ধান্তটিকেও অসম্ভব বলা যায় না এবং এই প্রকারে পরমাণু গঠন বিচারে আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থিত হয়।

পরমাণু গঠনের সহিত সৌর জগতের সাদৃশ্যও অনুধাবনীয়। সূর্যকে যেমন গ্রহগণ পরিক্রমা করে বৈদ্যুতিন সেই প্রকারে ভারঘন (proton)কে পরিক্রমা করে। পরিভ্রমণ কক্ষার পরিমাণ এক সেণ্টিমিটারের কোটি অংশের ($\frac{১}{১০^{৮}}$) এককে করিতে হয়। এই একক (unit)কে এঙ্গস্টাম (angostram) বলা হয়।

একজন নবীন হল্যাণ্ড দেশীয় পদার্থবিদ্যাবিশারদ নীলস বোহর (Niels Bohr) বৈদ্যুতিন কক্ষ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বৈদ্যুতিনদের কক্ষ পরস্পরের সহিত ১ : ৪ : ৯ : ১৬ ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ সংখ্যার বর্গফলের নিষ্পত্তি (Ratio)তে সজ্জিত। প্রত্যেক কক্ষাস্থিত বৈদ্যুতিনের একটি নির্দিষ্ট তেজ আবশ্যক। একটি বৈদ্যুতিন যদি কোনও কক্ষায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত অপর কক্ষায় যাইবার মত তেজ তাহার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, বৈদ্যুতিনটি আপন কক্ষাতেই পরিভ্রমণ

'অ' পরিমান তেজ যুক্ত কক্ষা

'ই' পরিমান তেজের কক্ষা

মধ্যবর্তী কক্ষা

করিবে। অর্থাৎ যদি একটি কক্ষায় অ পরিমাণ তেজ আবশ্যক ও অন্যটিতে 'ই' তাহা হইলে অ পরিমাণ কক্ষা হইতে সে 'অ' ও 'ই' তেজের কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে আসে না। যতক্ষণ 'ই' পরিমাণ তেজ না পায় প্রথম কক্ষাতেই থাকে। বৈদ্যুতিনদের ব্যবহার পরিমাণ্য উপপত্তি (Quantum Theory) অনুমোদিত। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজের বৃদ্ধি বা হ্রাস না হইলে বৈদ্যুতিন স্থানভ্রষ্ট হয় না। খুব সম্প্রতি মার্কিন ও কেম্ব্রিজে যে সকল পরীক্ষা হইতেছে তাহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে ভারঘনের (protonএর) ভিতরও বৈদ্যুতিন রহিয়াছে এবং ইহাদের বৈদ্যুতিক ভরণ (electric charge)কে সাম্যাবস্থায় আনার জন্য (positron) বৈদ্যুদ্ঘনও থাকে। বৈদ্যুদ্ঘনের জড়মান বৈদ্যুতিনের সমান। ভরণ ও ঘনাত্মক (positive) কিন্তু পরিমাণে বৈদ্যুতিনের সমান। কেন্দ্রনে (core-এ) কতকগুলি নির্বৈদ্যুতিক (neutron)ও পাওয়া যায়, যাহারা জড়মান বৈদ্যুতিনের সমান কিন্তু ভরণে উদাসীন (neutral in charge)।

বর্তমানে পরমাণু গঠন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে তাহাতে আপেক্ষিকতা (Relativity)-বাদ ও Quantum (পরিমাণ)-বাদ theory উভয়েই সমর্থিত
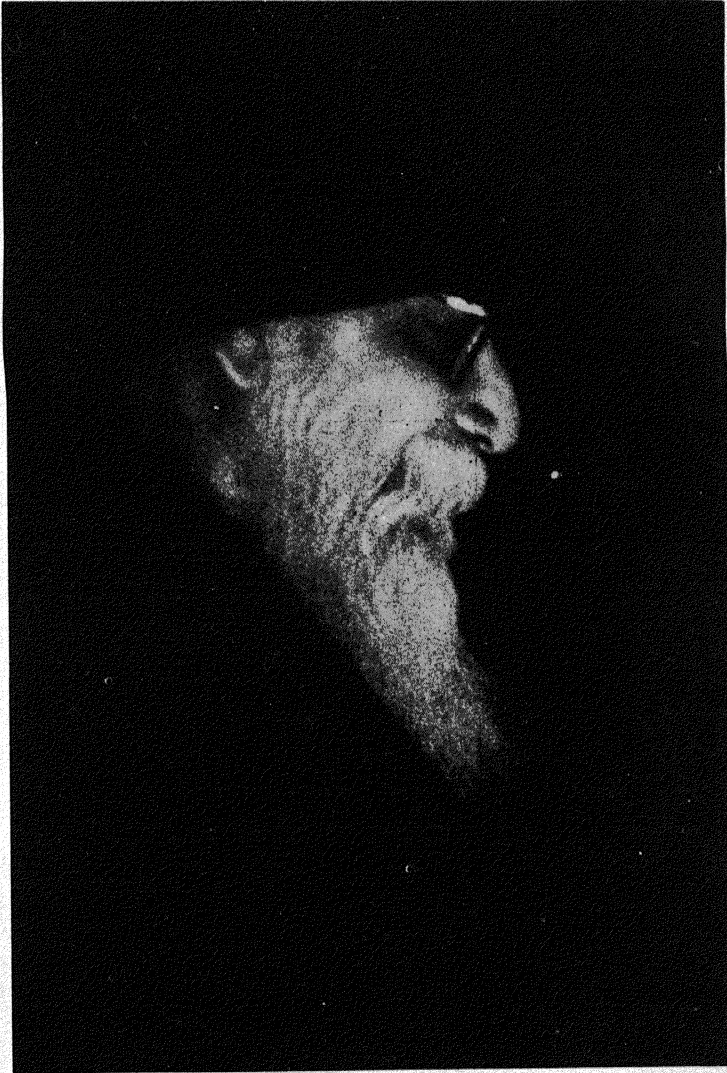
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মতিথির রাত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

হয় এবং কোনও নিত্য ব্যবহৃত বস্তুকে আর অব্যাহত বলিয়া বোধ করিবার অবকাশ নাই। অসংখ্য ভারঘন (proton) ব্যাহত (discontinuous) ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহারও অধিক বৈদ্যুতিন উহাদিগকে বিভিন্ন কক্ষায় অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের শরীরে ও চতুষ্পার্শে বিশ্বের অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম? তাহারও আভাষ পদার্থ বিদ্যা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। ভারঘনের মিলনে তেজ উৎপন্ন করিয়া আমরা কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিনের নিরপেক্ষ ভাবে সমাজ ও সংসার পরিচালন করিবার আশা পাইতেছি। কিন্তু এই অপরিমিত বল লইয়া মানব যাহাতে পরস্পরকে সংহার করিতে উদ্যত না হয় সে শিক্ষার ব্যবস্থা কই? প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভের সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস না করিতে পারিলে মানব আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে কি?

জন্মদিনে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

তুমিই কি সেই কবি, লেখা যার সঙ্গী "সঞ্চয়িতা",
চিরপ্রিয় "গল্পগুচ্ছ", "লিপিকা",—তোমারি লেখা কি তা?
"শিশু", "সে", "ছড়ার ছবি"—শিশুতে বুড়োতে কাড়াকাড়ি;
"মানসী", "ক্ষণিকা" নিয়ে গৃহবিচ্ছেদের শঙ্কা করি!
প্রিয়ার বালিশে চাপা "মহুয়া,"—পাব যে, আশা নাই,—
"শ্যামলী"র 'বাঁশি'য়ালা' তুমিই কি বাজালে "সানাই"?
"বলাকা"র পথ ধ'রে এক দিন করেছি সন্ধান,—
দেখেছি অনন্তে-ধাওয়া মুক্ত বিহঙ্গ ঐ প্রাণ
মৃত্তিকার বন্দী নয়, কীর্তিপথ তার লোকে লোকে;
সৃষ্টি চেয়ে স্রষ্টা বড়ো, এই সত্য প'ড়ে তার শ্লোকে
ব্যক্তি পরিচয়-ব্যর্থ সেদিন ফিরেছি ভেবে তাই,—
স্রষ্টা এত বড়ো!—তারে সৃষ্টিতে-বা সন্ধান বৃথাই!
অসীম রহস্য-ঘন স্রষ্টা তুমি বিধাতার সাথী,
গ্রহলোকে ইন্দ্র তুমি কাব্য-সে তোমার সৌরভাতি!—
—মনগড়া কত কথা এমনি জেগেছে মনে-মনে,
"জন্মদিনে"তে কিছু সে-তোমারে পেলাম জীবনে।
"বিপুলা এ পৃথিবীতে" করো তুমি "বাণীর সাধনা",—
পার করো,—ব'লে আজো দুর্বলের কান্না তো কাঁদ না!
মৃত্তিকার কাছে থেকে আরো-কাছে না-থাকার ক্ষোভ,
মৃত্যুঘেরা মৃত্তিকার ব্যথাতিক্ত অমৃতের লোভ,—
পৃথিবীর লোক ক'রে তোমারে করেছে আপনার,
"সভ্যতার সংকটে"তে বলীদের 'দানব-পনা'র
প্রতিবাদে শুনি আজ বজ্রকণ্ঠে রুদ্রের নির্ঘোষ,—
অন্যায়-অসত্য সাথে ভয়ে লোভে করো নি আপোষ।
নিঃস্ব-নির্যাতিত সাথে মিশিয়ে প্রাণের একই আশা,
চাও মুক্তি সকলের, নাই অন্য মুক্তির পিপাসা।
তবুও শুধাই কবি, আজকে জীবনে যারে জানি,
জীবনের বাণীভরা সে লিখেছে এই কাব্যখানি?
দেখা দিয়ে ইন্দ্রধনু মিলায় মেঘের মাঝখানে,—
বলো কবি, কাব্যে মিলে' কী জাদুতে কে সে মন টানে?
জানি, যে জীবনে মূর্ত, লোকে লোকে যাত্রা তারো বাঁধা,
বিশ্বে তার সৃষ্টি রয়, স'রে যায় স্রষ্টা-সে আলাদা,—
তবু তার সৃষ্টিতেই খুঁজি শেষে সেই তার ছবি,—
"নারায়ণী এ ধরণী" কথাখানি লিখেছে যে-কবি;
হৃদয়ের পাত্রটিরে ভ'রে দিয়ে সুধা-বৃষ্টিতে
জীবন্ত স্পর্শ দেয় নিত্য কে যে এই সৃষ্টিতে,—
চিরদিন দেবে তাই; —এ ছেড়ে কোথাও নাই সে-যে;—
—এক-একটি কথা পড়ি আর তাই ওঠে মনে বেজে।
স্রষ্টা-সে যেখানে যাক্, সাধ্য নাই তারে বেঁধে রাখি,
রয়েছে এ সৃষ্টি কাছে,—শেষে এই সান্ত্বনাই বাকী!
আছে সঙ্গী "সঞ্চয়িতা", আজ এই পড়ি "জন্মদিনে",—
নিত্য নূতন ক'রে মনোহরে যাই চিনে চিনে।
আর, যে-জীবন হ'তে ওঠে এই জীবনের বাণী,—
দেশে কালে তারে জেনে আজ এ জীবন ধন্য মানি।
তোমার ও-জীবনেও জানি সেই গুণী করে লীলা,
সৃজনের শক্তি তার ঐ মনে বহে অন্তঃশীলা,
ওর প্রতি-ঘটনায় কথা কাজে আছে সে মিশেই,—
মানুষ সে-তুমি প্রিয়; তবু কবি, তুমিই কি সেই?

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৪

অপর্ণা দেবী কি করিয়া প্রসঙ্গটা আবার তুলিবেন যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তরু চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বলছিলাম তোমার বেড়াতে যাওয়ার মতলবটা কেন হঠাৎ হ'ল। কোন আত্মীয়স্বজন কাছে-পিঠে আছেন নাকি?"

বলিলাম, "আত্মীয় নয়, চন্দননগরের কাছে আমার এক বন্ধু থাকে, একবার তার ওখান থেকে একটু ঘুরে আসব, অনেক ক'রে লিখেছে। কাছে, অথচ প্রায় পাঁচ মাস যাই নি। ওদিকে পরীক্ষার জন্যে তোয়ের হ'তে নিঃশ্বাস ফেলবার জো ছিল না; তার পরেই আপনাদের এখানে এসেছি, বুঝে-সুঝে নিতে এই তিনটে মাস কেটে গেল।"

অপর্ণা দেবী সুযোগটা হাতছাড়া হইতে দিলেন না, কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তা কেমন বুঝছ?"

বলিলাম, "ভালই। তরুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রী পাওয়া তো…"

"সে না হয় হ'ল, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়েই বা কি করবে?—দোটানায় ফেলে ওকে কোথায় যে দাঁড় করাবে এরা, আন্দাজ করতেই পারছি না।…আমি পড়াশোনা নিয়ে বোঝাবুঝির কথা বলছিলাম না; তুমি এই বাড়ীতে রয়েছও তো? সেই দিক দিয়ে কেমন বুঝছ?"

বলিলাম, "সে দিক দিয়ে আমায় তো আপনারা রাজার হালে রেখেছেন।"

অপর্ণা দেবী এই দ্বিতীয় সুযোগে সোজাসুজি আসল কথাটায় আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বেশ, মেনে নেওয়া গেল রাজার হালেই রয়েছ তুমি; কিন্তু যাকে রাজার হালে রাখা যায় তার মান-অভিমান সম্বন্ধেও সেই রকম সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয়। কাল এতে একটু ত্রুটি হয়েছে শৈলেন, আর মনে হচ্ছে তোমার এই হঠাৎ বেড়িয়ে আসার সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।"

কথাটা এত আচম্বিতে আনিয়া ফেলিয়াছেন যে আমি কি যে জবাব দিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অপর্ণা দেবীই বলিলেন, "আমি তোমায় যতটা জেনেছি তাতে অবিশ্বাসের কারণ নেই—তুমি যখন ছুটি নিচ্ছ তখন নিশ্চয় ছুটিই নিচ্ছ; কিন্তু বলতে বাধা নেই, আমার একবার যেন একটু মনে হয়েছিল তুমি একটা অশোভন গোলমাল না ক'রে ছুটির নাম নিয়ে আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছ।"

আমি আবার মুখ তুলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এমন কি মহামারী কাণ্ড হয়েছে যে?…"

অপর্ণা দেবী সাধারণতঃ খুবই সংযত প্রকৃতির স্ত্রীলোক, কিন্তু স্পষ্ট বুঝা গেল ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন; বলিলেন, "শৈলেন, আমি সব কথা শুনেছি। কাল সন্ধ্যেয় তরুর খোঁজ নিতে গিয়ে টের পেলাম তুমি তরুকে বেড়াতে নিয়ে গেছ। সেই থেকেই আমার মনে অশান্তি লেগে ছিল—বাড়ীতে একটা পার্টি, আর তুমি তাকে নিয়ে বেড়াতে চলে যাবে এমন বেখাপ্পা কাজ তুমি কখনই করতে পার না। মীরাকে জানি, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয় যাতে তোমায় মারাত্মক রকম কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতে হয়েছে। পার্টি ভেঙে গেলে টের পেলাম। টের পাবার ইতিহাসটা ত বড় চমৎকার! তোমাদের সঙ্গে পার্টিতে যারা সব ছিল তাদেরই মধ্যে একজন এসে বেশ বড় গলা ক'রে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার কাছে বর্ণনা করলে, যেন মীরা একটা মস্ত বড় বাহাদুরি করেছে! আমি আর তার নাম করলাম না, কিন্তু তুমি তাকে চিনেছ নিশ্চয়।…কি করব?—এদের সঙ্গেই তো মীরাকে মেলামেশা করতে হবে?"

বুঝিলাম, নিশীথের কাজ; মীরার সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে অযোগ্য স্তাবক, ওদের মধ্যে আমার প্রবেশটা ওরই সব চেয়ে পীড়াদায়ক হইয়াছিল, আমার অপমানে তাই ওই হইয়াছিল সব চেয়ে পুলকিত। প্রথম সুযোগ পাইয়াই অপর্ণা দেবীকে সুসংবাদটা না জানাইয়া পারে নাই।…মূর্খ! এত দিন দেখিয়া শুনিয়াও অপর্ণা দেবীকে চেনে নাই।

আমি নীরবেই রহিলাম।

অপর্ণা দেবী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, "তোমায় এক দিন হেরেডিটি সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বলেছিলাম, মনে আছে শৈলেন?"

কথাটা পূর্বে উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—এক

দিন কথাপ্রসঙ্গে অপর্ণা দেবী হেরেডিটি বা বংশানুক্রমিকতার কথা তুলিয়াছিলেন। এই রকম একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে ওঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমার জীবনের যা সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি ভুলিতে পারি? তবুও কথাটা হাল্কা করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বংশের ধারাটা কখনও কখনও একটা বা দুইটা ধাপ বাদ দিয়ে আবার চাগিয়ে ওঠে। আপনাদেরই উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের দেহে যে-রাজবংশের রক্ত আছে এটা আপনার মনে না থাকলেও মীরা দেবীর মধ্যে এ ধারণাটা আবার ফুটে উঠেছে।"

অপর্ণা দেবী আরও বেশী বলিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্য এই যে, মীরার রক্তের মধ্যে সেই রাজবংশের ধারাটা আরও পাতলা হ'য়ে আসা সত্ত্বেও ওরই মধ্যে মর্যাদাজ্ঞানটা—আভিজাত্যের গুমরটা আরও উৎকট হ'য়ে দেখা দিয়েছে।"

অবশ্য এ কথাটা আর অপর্ণা দেবীকে আমি বলিলাম না এখন।

অপর্ণা দেবী একটু শঙ্কিত ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "ঐ হয়েছে সর্বনাশের গোড়া শৈলেন। যখন জানই সব, তখন বরাবরের জন্যে তোমায় একটা কথা ব'লে রাখি,—মীরা এ বিষয়ে নিরুপায়। ও মেয়ে ভাল, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কি ক'রে যাবে? ওর মধ্যে এই নতুন গণতন্ত্রের যুগ আর মৃতপ্রায় রাজতন্ত্রের যুগ পাশাপাশি কাজ করছে। ও তোমাদের চায়, তোমাদের মধ্যে যেখানে সৌন্দর্য্য, যেখানে মহত্ত্ব সেখানে ওর নজর গিয়ে পড়ে; কিন্তু ওর মায়ের বংশের কোন যুগের রাজা-মহারাজারা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে। ও এইখানে একেবারে নির্দোষী। তাই বলছিলাম শৈলেন—মীরার ব্যবহারে যদি তুমি কখনও চলে যেতে বাধ্যই হও তো নিশ্চয় যেও, হীনতা কেউ মাথা পেতে নেয় এটা আমি চাই না; কিন্তু ওকে ক্ষমা ক'রো। হ'তে পারে রাজরক্তের খামখেয়ালিপনায় ও তোমার মনুষ্যত্বের কাছে কোন সময় বোধ হয় আরও বেশী অপরাধ করবে, আমাদের বাড়ীর আতিথ্যধর্মে সেটা একটা মস্ত বড় অন্যায় হবে বলে আগে থাকতেই আমার মেয়ের হয়ে তোমায় এই অনুরোধ ক'রে রাখলাম।"

অত্যন্ত লজ্জিত এবং অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বলিলাম, "আপনি ব্যাপারটাকে বড্ড বাড়িয়ে দেখে মিছি মিছি কষ্ট পাচ্ছেন; আসলে অতটা কিছু নয়। বোধ হয় একেবারেই কিছু নয়, হেরেডিটি নিয়ে মীরা দেবী সম্বন্ধে আপনার একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে বলেই আপনি এতটা ভেবে নিয়েছেন। নিশীথবাবুও বোধ হয় নিজের মনের রং ফলিয়েই কথাটা আপনাকে বলেছেন···।"

অপর্ণা দেবী চোখ তুলিয়া চাহিতে হুঁস হইল—নিশীথের নামটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে, অথচ তিনি ওটা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু অপর্ণা দেবী সে-বিষয়ে কিছু না বলিয়া, দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "আমার ধারণাটা ভুল নয় শৈলেন, নিজেরই মেয়ে তো, এতটা ভুল হবে না। ওর এই রাজরক্তের গুমর নিয়ে আমার মস্ত বড় একটা আশঙ্কাও রয়েছে, ভগবান্ না করুন সেটা কখনও ফলে ওর জীবনে···।"

একটু ভীতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি আশঙ্কা?"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আশঙ্কা নিশীথকে নিয়ে, জানতো ও একজন খুব বড় জমিদারের ছেলে। নিজে যে ও একেবারেই অপদার্থ, যদি মীরা অসার বংশমর্যাদার মোহে এ কথাটা কখনও ভুলে বসে?"

প্রকৃতিস্থ হইতে একটু বিলম্ব হইল।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী তন্দ্রালু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের স্ফটিক মালাটা কোলে পড়িয়া গিয়া 'ছলাৎ' করিয়া একটা মৃদু শব্দ হইল।

অপর্ণা দেবী প্রশ্ন করিলেন, "কবে যাবে?"

উত্তর করিলাম, "কালই যাই তাহলে। কটা দিন কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বেশ যাও, একটু জায়গা বদলান দরকার।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি, দেখি সরমা উঠিয়া আসিতেছে। আমি সিঁড়ির বাঁকে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "একটু অসময়ে যেন?"

ল্যাণ্ডিঙের দুইটা ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া হাসিয়া উত্তর দিল, "মীরার ঝোঁক চাপলে তো সময় অসময় বাছবার যো নেই। ফোন্ মারফৎ হুকুম হয়েছে—যেমন আছি চলে আসতে হবে, নৈলে আমার সঙ্গে চিরদিনের আড়ি।"

কিছু একটা বলা দরকার বলিয়াই কহিলাম, "একেবারে জার্মান্ কাইজারের আল্‌টিমেটাম্!"

"ঠিক তাই; কিন্তু কারণটা কি?"

"জানি না তো।"

সরমা আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল। সিঁড়ির মাথায় গিয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "অবশ্য জানবার কথাও নয় আপনার।—শুনেছি কাইজার নিজের নিকটতম পার্শ্বচরদেরও সব সময় নিজের গুপ্ত মন্ত্রণা জানান না⋯ ."

ওদিকে ঘুরিতেই নিশ্চয় মীরাকে দেখিতে পাইল। অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তোমার এমন 'ভয়ানক মন খারাপ' কিসের জন্যে যে⋯"

যেন ওদিক থেকে বারণের ইঙ্গিত পাইয়া থামিয়া গেল।

রাত্রে আহারের সময় মিষ্টার রায়কেও বলিলাম। একটু বেশী অন্যমনস্ক ছিলেন; বলিলেন, "যদি বেড়াতেই হয় চন্দননগর না গিয়ে একবার পদ্মার ওদিকটা হ'য়ে এস বরং—চাঁদপুর, পার তো কুমিল্লা পর্যন্ত⋯"

আজ বিলাস-ঝি ডাইনিং রুমে ছিল, এক এক দিন থাকে, পরিবেশনে সাহায্য করে। বলিল, "শুনছেন, মাস্টার মশাইয়ের বন্ধু থাকেন চন্দননগরে, উনি পদ্মার ধারে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে রায় মশাই, কি রকম মক্কেলের পাল্লায় আজ পড়েছিলেন বলুন তো?"

মিস্টার রায় কাঁটা চামচ প্লেটের উপর রাখিয়া দিয়া সিধা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "ভীষণ, বিলাস, ভীষণ! আর বুড়ো বয়সে একলা এঁটে উঠতে পারি না। ভাবছি কাল তোমায় জুনিয়ার ক'রে নিয়ে যাব,—যেমন চমৎকার ওকালতিটা করলে মাষ্টার মশাইয়ের পক্ষে!⋯"

পরদিন সকালে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকখানা বই, কাপড়চোপড়, অনিলের ছেলেমেয়ের জন্য গোটাকতক খেলনা, আর কয়েকটা টুকিটাকি গুছাইয়া লইতেছি, তরু নামিয়া আসিল। খুব উল্লসিত। বলিল, "উঃ, কি চমৎকার যে আপনার পত্রটা হয়েছে মাস্টার মশাই!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি?"

তরু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু দিদি নিজে বলেছে!"

আমি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলাম, "তবেই তো! আর বিশ্বাস যে করতেই হবে এ হুকুমও হয়েছে নাকি তোমার দিদির?"

আমার কপট গাম্ভীর্য দেখিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল, সেও কৌতুকের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁ, হয়েছে হুকুম। আরও একটা হুকুম হয়েছে।"

আমি আবার একচোট ভয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আবার কি?"

তরুও ভয় পাইবার ভঙ্গিতে বলিল, "আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

তরু হাসিতে হাসিতেই সামনে ঘাড়টা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল, "কেন আবার? আরও যদি কোন হুকুম করতে হয় দিদির, কি ক'রে করবেন?—বাঃ!"

তাহার পর আমার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "না মাস্টার মশাই, দিদি প্রীতি-উপহারটা খুব ভাল কাগজে ছাপাবেন, আপনাকেও একখানা পাঠাবেন, তাই ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে বললেন।"

আমি ছুটিতে যাইব, মীরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না আমায়; কোন একটা যোগসূত্র ধরিয়া থাকিতে চায়।

আপনি যাইবেন, তাই লইয়া এক জন অহেতুকভাবে শঙ্কিত,—কথাটাও ভাবিতে সুখ, নয় কি?

৫

বেশী নয়, সব মিলাইয়া হদ্দ ঘণ্টা-তিনেক লাগিল, যেন কোথা থেকে কোথায় আসিয়া গিয়াছি,—অন্য এক দেশ, অন্য এক যুগও যেন।

অনিলদের বাড়ীটা একটা পাড়ার ভিতর দিয়া গিয়া একেবারে শেষের দিকে পড়ে। কাঁচা, সরু গলি ছাড়িয়াই বাঁ-দিকে অনিলদের বাড়ীর বাইরের উঠান, দেয়াল দিয়া ঘেরা, ইটে মাঝে মাঝে নোনা ধরিয়া গিয়াছে। দেয়ালের মাঝখানটায় একটা চৌকাঠ আছে, কিন্তু দরজা নাই।

ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। চাপা, সবুজ দূর্বা ঘাসে উঠানটা ভরা, তাহার একটু বাঁয়ে ঘেঁসিয়া পায়ে পায়ে তৈয়ারী সরু পথটা ভিতর-বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডান দিকটায় একটু আগাছার জঙ্গল,—কচু, আসশ্যাওড়া, ভাঁট; তাহাদের উপর ছায়া ফেলিয়া একটা নোনার গাছ ফলে নুইয়া গিয়াছে। এক পাশে একটা ছোট চাঁপার গাছ, গা বাহিয়া কতকগুলা তরুলতা উঠিয়াছে, সরু সরু টকটকে রাঙা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে!⋯হঠাৎ কি করিয়া জানি না মীরাদের অতি-পরিচ্ছন্ন, সুসংযত বাগানের ছবিটা মাথায় যেন একবার উঁকি মারিয়া গেল।

একেবারে ভিতরে গেলাম না। কিসের যেন একটা ঘোর লাগিয়াছে, মনে হইতেছে সব রসটুকু নিংড়াইয়া পান করিতে করিতে অগ্রসর হই। রাস্তা দিয়াও আসিয়াছি যেন একটা স্বপ্নে চলিয়া। পাশের বাড়ীতে খানকতক বাসন ঝন্‌ঝনিয়া পড়িয়া যাওয়ার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্ত কণ্ঠের তিরস্কার—"ওলো, বিয়ে হ'লে দু-ছেলের মা হতিস্,—এই কাজের ছিরি ?"

একটু কানে বাজে, বিশেষ করিয়া তাহার, দীর্ঘ ছ'টা মাস যে কলিকাতার বাহিরে পা দেয় নাই, আর শেষের তিনটা মাস কাটাইয়াছে বালিগঞ্জের এক ব্যারিস্টার-ভবনে। কিন্তু একটা ছবি খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে, নিতান্তই বাংলার ছবি।—বড়, অনূঢ়া ঝিউড়ী মেয়ে—খিড়কির পুকুর থেকে বাসনের গোছা মাজিয়া বাঁ-হাতে সাজাইয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—অসাবধানতা—মায়ের শাসন—সব তিরস্কারেই আজকাল একটু বিয়ের কথা মিশান—বিয়ের কথায় লজ্জা—না হওয়ার জন্য বোধ হয় মনের অন্তস্তলে কোথায় একটি তপ্তশ্বাস···রৌদ্রক্লান্ত মুখটি আরও একটু রাঙিয়া উঠিল···।

দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ পল্লী আবার নিঝুম হইয়া পড়িল।

অগ্রসর হইয়া বাড়ীর ভিতর-দুয়ারের কাছে আবার এক বার দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। যদিও একটু ভয় হইতেছে বাহির হইতে বা ভিতর হইতে কেহ আসিয়া পড়িলে ব্যাপারটা দেখিতে বেশ মানানসই হইবে না; কিন্তু জানাশোনা লোক—এ ভরসাটাও আছে সঙ্গে সঙ্গে। আসল কথা, বাংলার রূপটি সব মিলিয়া এত নিখুঁৎভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, এমন কিছুই করিতে মন সরিতেছে না যাহাতে সে রূপটি চকিত, ত্রস্ত হইয়া মিলাইয়া যায়।···কে অন্নদামঙ্গল পড়িতেছে, খুবই সম্ভব অম্বুরী—ছন্দের একঘেয়ে বিলম্বিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় হয় কি জানি কে দিবে ফেরফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।

কি রকম একটা আবেগে আমার চোখ যেন ভিজিয়া আসিতে চাহিল। বহু বৎসর পরে অনেক দূরের কোন্ এক প্রবাস হইতে যেন ফিরিয়া আসিয়াছি। ধমনীর সমস্ত রক্ত যেন সাড়া দিয়া উঠিল;—ঠিক এই আমার নিজের ভুঁই। যুগ যুগ ধরিয়া এখানে দেবতায়-মানুষে লীলার খেলা হইয়া আসিয়াছে, তাই বহু যুগের সঙ্গ অভিজ্ঞতার দাবীতে এখানে মানুষ বিশ্বাস করে দেবতা ছলনা করিয়া পাটনীকে ডাকিয়া খেয়া পার হইল, আলতা-রাঙা পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনা করিয়া দিয়া পারণী মূল্য দিয়া গেল।···বুঝিতেছি, কলিকাতা এ দেশের গায়ে একটা পরগাছা—তার আকাশ-বাতাস, রাস্তা-ঘাট, মানুষ সব সমেত একটা পরগাছা কলিকাতা। আজ সকাল পর্যন্ত এই চারিটা বৎসর আমি ছিলাম সেখানে,—কি করিয়া যে ছিলাম! সেই অদ্ভুত শ্রীহীন বাড়ী—শাসনক্লিষ্ট বাগান—মিস্টার রায়—মীরা···কি সব অনাত্মীয়—কোন্ দেশের—কত দূরের···

মাঝে মাঝে একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছি, মাঝে মাঝে আবার অম্বুরীর সুর জাগিয়া উঠিতেছে—টানাটানা—অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে লয়ে মেশান—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভিরে যাবে ল'য়ে।
ভবানী বলিছে তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥

হুঁস হইল বেশী দেরি হইয়া যাইতেছে। "অনিল আছিস্?"—বলিয়া আমি ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

উঠানের ডান দিকে টানা রক, তাহার পরেই ঢাকা বারান্দা, দুয়ার খোলা। বারান্দার মেঝেয় মাদুর পাতিয়া অম্বুরী উবুড় হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছে, পাশে অনিলের মা একটা বালিসে মাথা দিয়া এদিক ফিরিয়া শুইয়া আছেন। মাঝখানে কোলের মেয়েটি, নিদ্রিত। অনিলের ছেলে দুই হাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া মা'র মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে।

প্রথম ডাকে ধ্যান ভঙ্গ হইল না, কাহারই। তখন চলিতেছে—

সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

"খোকা!" বলিয়া আবার ডাকিলাম, আর একটু জোরে।

অম্বুরী হুড়মুড়িয়া উঠিয়া একবারে আমার পানে চাহিয়াই এক গলা ঘোমটা টানিয়া বাঁ-হাতে ভর দিয়া বসিয়া রহিল। অনিলের মায়ের গলাটা বার্ধক্যের হেতু কাঁপিয়া গিয়াছে, কালা মানুষ, দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; একটু টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "থামলে কেন বৌমা, কি হ'ল?"

খোকা প্রথমটা ভয়ে পরে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, শৈল টাকা! কি ঠব্বনাশ!"

"পারলে চিনতে?"—বলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে গিয়া রকে উঠিলাম। বলিলাম, "তোমার মা অত শীগ্‌গির চিনবে অবশ্য আশা করি না।"

অম্বুরী ঘোমটা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—"ঠাকুরপো!···ওমা, ঠাকুরপো এসেছেন।"

আমি গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম, "জেঠাইমা, আমি শৈলেন।"

বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "ওমা, দেখ! আজ সকাল থেকেই বাঁ চোখটা নাচছে; তোমায় বললাম না বৌমা—কিছু একটা সুখবর আছে—হয় কেউ আসবে, নয়···"

অম্বুরী বলিল, "আমারও তো কাল রাত্তিরে হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গেল, বললাম—'রেতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ী যা'···উঃ, কত দিন আস নি যে ঠাকুরপো!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আসবার আঁচ পেয়েই কাল রাত্রি থেকে তুমি যে রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছ, অম্বুরী, তাতে···"

এখানে একটা কথা না বলিয়া রাখিলে ঠিক হইবে না। অনিল আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, একটু বেশীই হইবে; তাই অম্বুরী যখন নূতন আসিল "বৌদি" বলিয়া সুরু করিয়াছিলাম। অনিল সে বন্দোবস্তটা স্থায়ী হইতে দিল না। বলিল, "চিরটা কাল বয়সের একটু খাতির না করে দিব্যি ইয়ারকি মেরে এলি, আজ ওর ওপর ভক্তিতে আমায় দাদা ক'রে তুলবি সেটি হবে না। ও রইল আমাদের দু-জনের মাঝখানে, যেমন ছিল সদু। যা নাম দিয়ে মুখ দেখেছিলি তাই বলে ডাকতে হবে; শপথ দেওয়া রইল।"

অম্বুরী লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শোন কথা! তুমি আসছ কি আমি জানি?"

অনিলের মা বলিলেন, "তার পর, আছিস কেমন শৈল? প্রায়ই জিগ্যেস করি অনাকে, বলে···"

অম্বুরী শাশুড়ীর কথাটা লইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "বলে আর চিঠি দেয় না বেশী, বড়লোকদের বাড়ীতে পড়ায়—বড়লোকের মেয়েকে (অম্বুরী একটা কটাক্ষপাত করিল)—আমাদের সবাইকে ভুলে গেছে··· বলবেই তো, কেন বলবে না বল?···"

অনিলের মা আমার পক্ষ লইয়া বলিলেন, "তাই কি পারে গা ভুলতে?—কাজের ভিড়···"

আমি অম্বুরীর দিকে আড়ে চাহিয়া বলিলাম, "তা নয় হ'ল, কিন্তু যে বলে এ সব কথা সে কখন আসবে বল ত? তার উকিলের সঙ্গে মেলা বকাবকি ক'রে কি হবে?"

অম্বুরী ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল; অনিলের মা-ই উত্তর দিলেন—"অনার সেই বাঁধা সময়, ছটা কুড়ির গাড়ী, বাড়ী আসতেই সন্ধ্যে।"

কেমন যেন তন্ময় হইয়া গেছি। দাঁড়াইয়া আছি, এক হাতে সুটকেস্, এক হাতে খোকার জন্য কেনা সন্দেশের ছোট তিজেলটা, ভুলিয়া গেছি, দেওয়া হয় নাই তখনও; না দেওয়ার জন্য খোকা উৎসাহের মুখে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেছে। হঠাৎ একবার তাহার লোলুপ দৃষ্টির প্রতি নজর পড়িতেই মনে পড়িল, বলিলাম—"দেখ!··· খোকা আয়, খাবার নে, ভুলেই গেছি! কত বড় হয়েছিস রে তুই!···ওর জিবের আড়টা এখনও যায় নি দেখছি যে···"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "না, কবে যে যাবে তাও জানি নে, চার পেরিয়ে পাঁচে পড়বেন এবার। এখন কথার মাত্রা হয়েছে—"ঠব্বনাশ"···শুনলে তো? তুমি আসতেই··· কাকা বাড়ী এলে 'সব্বনাশ' বলতে আছে বোকা ছেলে? প্রণাম করতে হয় না কাকাকে? সন্দেশের হাঁড়ি তো দু-হাতে বাগিয়ে ধরেছ যাত্রার দলের হনুমানের মতন···"

শাশুড়ী হঠাৎ স্নেহের তিরস্কারে বলিলেন, "ওমা, কাণ্ডটা দেখ, শিশুকে বলছ, নিজের ভুলের হিসেব আছে?"

বধূ ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন, "বসতে বলেছ শৈলকে?···মুয়ে আগুন, আমিই বা কাকে বলছি?—বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে, এবার যেতে পারলেই হয়···"

"ওমা, সত্যিই তো"—বলিয়া অম্বুরী অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা মাদুর লইয়া আসিল; সামনের চৌকির উপর বিছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আর তাও বলি,—ঠাকুরপোকে নাকি কুটুমের মত 'আসুন বসুন' বলে খাতির করতে হবে? বয়ে গেছে আমার।"

চিবুকটা হঠাৎ একটু সামনে বাড়াইয়া দিয়া একটু বেপরোয়া ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমার বাপু বড্ড

আহ্লাদ হয়েছে, ভুলে গেছলাম, পারি নি খাতির করতে। ঠাকুরপো রাগ করে, ভাজের হাতের ভাত চারটি বেশী ক'রে খাবে।"

বসিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যে সত্যিই চাঁড়ালের বাড়ীর ব্যবস্থা কর নি, এই ঢের খাতির, কি বলুন জেঠাইমা ?"

অম্বুরীও তাহাকেই সালিশী মানিল, একটু অভিমানের সুরে বলিল, "সেই থেকে ঐ এক কথা ধরে ব'সে আছেন, —রাত্তিরে হাত থেকে ঘটি পড়লে ঐ কথা বলতে হয় না মা ? —রেতের কুটুম যে চোর।"

জেঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তুই আসবি তা কি জানতো বেচারি ? এমন দিন যায় না যেদিন শৈল-ঠাকুরপোর কথা একবার না বলে,—আর আসে না, ভুলে গেছে খোকাকে এত ভালবাসত···"

অম্বুরী ত্রুটি সারিতে লাগিয়া গেছে। আমার জামা, চাদর, জুতা, সুটকেস্ ভিতরে রাখিয়া দিয়া, অনিলের চটিটা পায়ের কাছে বসাইয়া চলিয়া গেল।

অনিলের মা তাঁহার ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "কত কথা যে এক সঙ্গে ভিড় ক'রে আসছে, কোন্‌টা যে আগে জিগ্যেস করব···বিয়ের কিছু ঠিকঠাক হ'ল শৈল ?"

খোকা কখন অদৃশ্য হইয়াছে কেহ টের পাই নাই, হঠাৎ হাঁড়ি-কোলে পাশের ঘর থেকে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল—"মা, কটা ঠাব ?"

অম্বুরী ওদের শোবার ঘর থেকে পাখা আনিতে গিয়াছিল, পাখা-হাতে বাহির হইয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "ওম্মা, আদ্দেক হাঁড়ি খালি ক'রে এখন জিগ্যেস করতে এসেছ—কটা খাব ? দে হাঁড়ি, বড্ড শক্ত পেট কিনা···"

আমি উঠিয়া খোকাকে টানিয়া কাছে লইলাম। হাঁড়ি থেকে দুইটা সন্দেশ বাহির করিয়া বলিলাম, "তুমি দুই হাতে দুটো নাও খোকা। নাও অম্বুরী, খোকার হাঁড়ি তুলে রেখে দাও। খোকার হাঁড়ি থেকে যদি একটাও চুরি যায় তো তোমার···কি করব বলত খোকাবাবু ?"

খোকা একবার চকিতে মায়ের দিকে চাহিয়া আমার কোলে আর একটু ঘেঁসিয়া বলিল, "ডাডার নাক কেটে···"

অম্বুরী ধমক দিতে থামিয়া গেল। আমি হাসিয়া উঠিলাম, অনিলের মাও মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অম্বুরী ঘরের তাকে হাঁড়ি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "শুনলে তো ? ঐ সব শেখায় ব'সে ব'সে। নিজেরা খেঁদা বোঁচা, আমার দাদার বাঁশীপানা নাকের হিংসেতেই গেল সব···"

গোড়ায় প্রথম বিস্ময় আর আনন্দের ঝোঁকে যেটুকু ত্রুটি হইয়াছিল, হইয়াছিল; অম্বুরী চরকির মত ঘুরিতে লাগিয়া গেছে। এক বার আওয়াজ আসিল উঠানের ও-কোণ থেকে, তাহার পর রান্নাঘর থেকে।···জেঠাইমা বলিতেছেন, "আমার কথার তো উত্তর দিলি নি শৈল, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন ? একটা বিয়ে-থা কর এবার, বৌমার পাশে তোর বৌকেও দেখে যেতে পারলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না; তোকে তো কখনও আলাদা ক'রে দেখি নি, আমিও না, তোর জেঠামশাইও না···"

বেশ লাগিতেছে। চারি দিকের সঙ্গে বৃদ্ধার অলস অবাস্তর কথাগুলা এমন মিলিয়া যাইতেছে! এখানকার ভাষাগুলাও সবার কি রকম হাল্কা, স্বচ্ছ!—যেন মনের কন্দর থেকে সোজা বাহির হইয়া আসিতেছে। আমার মুখের ভাষাও যেন বদলাইয়া গেছে; মাপিয়া-জুখিয়া, সাজাইয়া বলিবার কোন দরকার নাই।

খোকা মুখে সন্দেশ বোঝাই করিয়া, আমার মুখের পানে উল্টাইয়া চাহিয়া বলিল, "আমারও বিয়ে হবে শৈল-টাকা, ডেলে-বুড়ীর ঠংগে, না ঠাম্মা ?—এট্ট বড় মাছ···"

সকলে হাসিয়া উঠিতে থামিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "সেইটেই আগে দরকার; তুমি তাড়াতাড়ি সন্দেশটা খেয়ে নাও তা'হলে।···অম্বুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়েও তো আগে খুঁজে বের করতে হবে জেঠাইমা ?—সেটা কি খুব সহজ কথা ?"

বধূ-গর্বে শাশুড়ীর মুখটা একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা বটে শৈল, এমন বৌ হাজারে একটা মেলে না। তা যা বলেছিস্‌···"

অম্বুরী একটা বড় কাচের গেলাসে করিয়া এক গেলাস সরবৎ আনিল। জেঠাইমার কথার উত্তরস্বরূপ বলিলাম, "তা আর নয় জেঠাইমা ? এই দেখ না প্রশংসা করেছি কি না করেছি, এক গেলাস সরবৎ এসে হাজির হ'ল।"

অম্বুরী গেলাসটা বাড়াইয়া ছিল। "কার প্রশংসা ?" বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, গেলাসটা তাড়াতাড়ি আমার হাতে দিয়া বলিল, "তোমাদের মায়েপোয়ে বুঝি ঐ সব বাজে কথা হচ্ছে ? বেশ কর ঠেসে প্রশংসা, আমি উনুনে আঁচ দিয়ে এসেছি, যাই দেখিগে।"

লজ্জিত ভাবে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, "আমি সাত-তাড়াতাড়ি এলাম সবার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করতে···বেশ, এবার তা'হলে নিন্দের পালা আরম্ভ হ'ল···"

অম্বুরী রান্নাঘর থেকেই উত্তর করিল—"হোক আরম্ভ। ওঃ, বছর ঘুরিয়ে কি সাত-তাড়াতাড়ি আসা রে! ঐ-কথা ব'ল না, দেখব, আর এক জনের কাছে!"

* * *

বলিলাম, "জেঠাইমা, তুমি একটু গড়াও বাছা, ব্যাঘাত হ'ল। আমি এক বার দেখে আসি চারি দিকটা, ফিরে এসে খুকীটাকে তুলতে হবে···অনার ঘুম পেয়েছে বেটী!"

অনিলের মা বলিলেন, "আবার পাগলামি এল ছেলের। এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে কি দেখবি?"

হাসিয়া বলিলাম, "দুপুরই দেখব জেঠাইমা, অনেক দিন দেখি নি, দুপুর কাকে বলে ভুলে গেছি।"

ক্রমশঃ

গ্রামের ডাক

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমারে ডাকিছ মনে মনে তুমি,
হে মোর জননী, হে মোর গ্রাম,
আমি মনে মনে স্বপনে স্বপনে
তব ক্রোড়ে রচি সুচির ধাম।
বামেতে পুকুর, সাম্‌নে বাগান;
বিরাজিছে দীঘি সমুখে তারি;
দক্ষিণে মোর পিতৃ-আবাস,
তারি পাশে বাঁশবনের সারি।
অদূরে ও কোণে দেবীর দেউল,
বাম কোণে তাল-গাছের শ্রেণী;
দূরে ঝোপময় ঘন ঝাউগাছ
আকাশের গায়ে রচেছে বেণী।
পানকৌড়ী সে টুপ্ টাপ ডোবে
পাতড়ার গায়ে আমার বামে;
শালিক আর হাঁড়িচাঁচা দুই ডাকে
কভু এক সাথে, কভু বা থামে।
কাঠঠোক্‌রায় ঠকাঠক শুনি,
ঘুঘু সে গুমরি গুমরি উঠে;
সাম্‌নে একটি লম্বা ধুতুরা
মাথা ঠেলে দিয়ে উঠিছে ফুটে।
দেয়ালের গায়ে ফোটে আকন্দ,
বিচি ফেটে তার উড়িছে তূলা,
গরুর গাড়ীর চাকা ক্যাঁচ কোঁচ,
তেড়ে উঠে ফের নামিছে ধূলা।
বাঁশের তলায় ছাতার ডাকিছে,
এক সাথে তারা বিশটি ব'সে;
আমের ডালেতে বড় মৌচাকে
কত মৌমাছি জমায় রসে।
গরুর গাড়ীর শব্দ মিলাল,
পড়ুয়ারা পাঠশালাতে হাঁকে;
ভয়হীন সাপ রাস্তা পেরোয়,
এঁকে বেঁকে যায় বনের ফাঁকে।
বেলা দশটায় কেহ কোথা নাই,
আমি ব'সে আছি পুকুর-পাড়ে;
মোটা বুনো বেঁজি মুখ তুলে তুলে
শুকনা পাতায় নিয়ত নাড়ে।
মাছরাঙা জলে ঝাঁপায়ে পড়িছে,
শুধু-মুখে উঠে ল্যাজটি ঝাড়ে;
পুকুরের বুকে ঢেউর চাকাটি
ঘুরে ঘুরে ঘুরে কেবলি বাড়ে।

দেখি আর দেখি, শুনি আর শুনি,
মিশে যাই যেন পাতায় বনে;
আমার বুকের চাপা স্বর যেন
বেজে ওঠে ঘুঘু-ডাকের সনে।
সাপের সমান লতায়ে লতায়ে
আমি যাই যেন ধূলার বুকে;
পানকৌড়ীর সঙ্গে নিয়ত
ডুবি আর উঠি পুকুরে সুখে।
বাঁশের ডগায় দোল খেয়ে খেয়ে
ব'সে থাকি যেন ফিঙের মত;
ঝাউর সমান আকাশে উঠিয়া
বায়ু সাথে রহি ক্রীড়ায় রত।—
এই বাসনায় এই কামনায়
কাটে নিতি মোর দিবস রাতি;
দিবস-রাত্রি মন-আয়নায়
পড়িছে আমার গ্রামের ভাতি।
শহরে বসিয়া গুমরিয়া উঠি,
কেঁদে কেঁদে উঠি গ্রামের তরে;
কবে চিরদিন বাঁধিব আবাস
সেই সুশীতল ছায়ার ঘরে?

অর্জ্জুন ও উর্ব্বশী
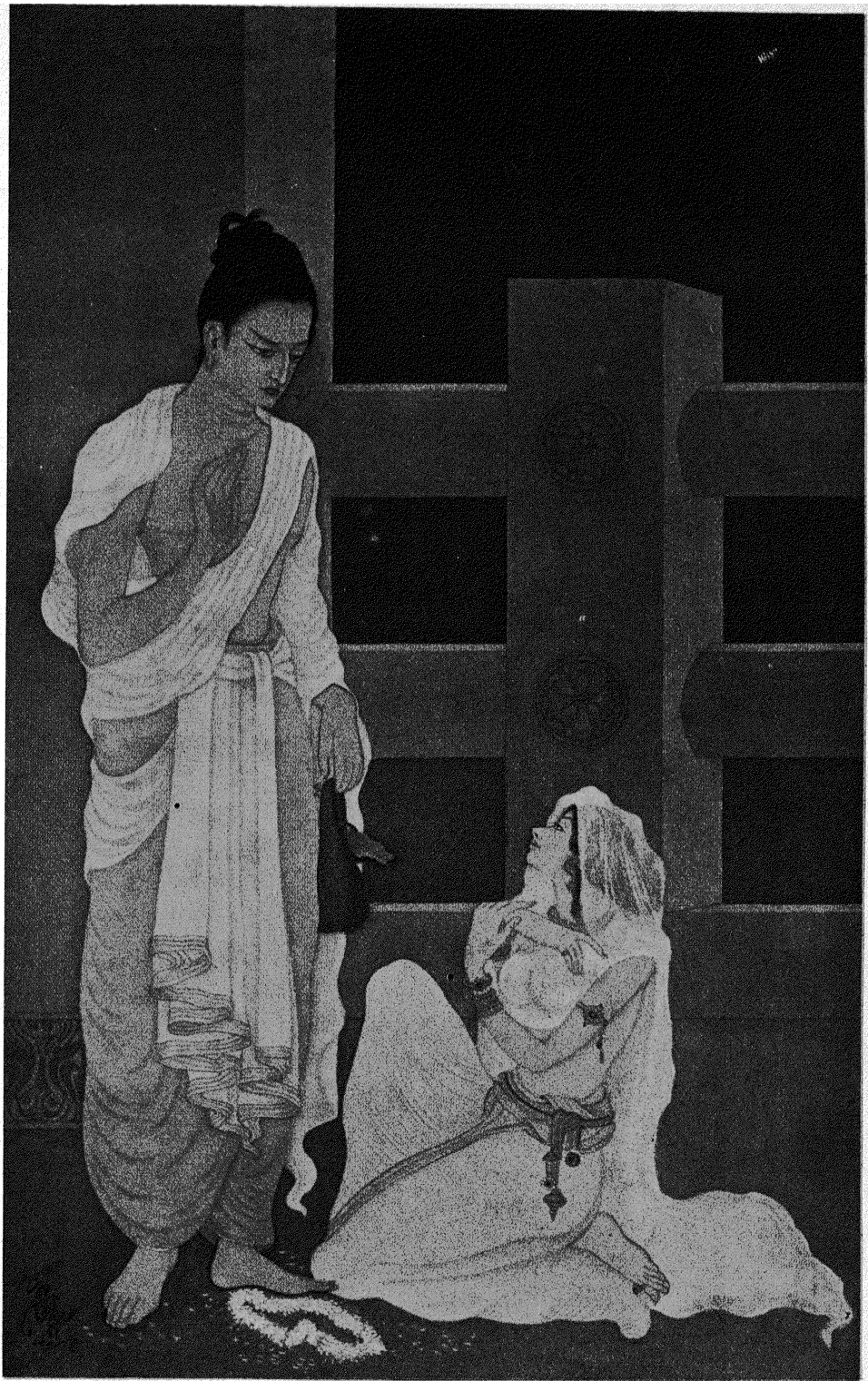
শ্রীসন্তোষকুমার সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বেদসংহিতায় নারীর স্থান

অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র বসু

বেদকালীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ, বৈদিক সংস্কৃতি ও অবৈদিক সংস্কৃতি, বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদবিরোধী ধর্ম্ম— এ সকলের ভিতরে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহার মধ্যে নারীর স্থানকে একটা প্রধান পার্থক্যের বিষয় গণনা করা যাইতে পারে।

বৈদিক যুগের পরে ভারতবর্ষে নানা প্রকারে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার লোপ পাইয়াছে। বৌদ্ধাদি ধর্ম্মে নারী পুরুষের দাম্পত্য-জীবনকে নিন্দার চক্ষে দেখা হইয়াছে এবং গৃহস্থাশ্রমকে অপবিত্র মনে করা হইয়াছে। সে ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মেও বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। শুধু তাহাই নয়, মধ্যযুগে এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার কারণে নারীকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করা হইত।

সুপ্রাচীন বেদে নারীকে যে গৌরবময় স্থান দেওয়া হইয়াছে আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে তাহা বিস্ময়কর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নিম্নে নারী-সম্বন্ধীয় কয়েকটি মন্ত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

অথর্ববেদে ব্রহ্মচর্য্য-সূক্তে বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।১১।৫।১৮

"ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা কন্যা যুবক পতি লাভ করে।" ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ দেহমনের সংযম। যে-যুগে "অষ্টাবর্ষা গৌরী" বধূর আদর্শ, সে-যুগে কন্যার ব্রহ্মচর্য্য পালনের কল্পনাই অলীক।

বিবাহে কন্যার পছন্দ যে একটা বিবেচনার বিষয় ছিল, তাহার প্রমাণ বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (ও অথর্ববেদে) সূর্য্যার বিবাহ-বর্ণনায় বলা হইয়াছে, বিবাহের বর কন্যার মনঃপূত হইয়াছে—

সূর্য্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা।—ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৯

সূর্য্যা যে ব্রহ্মচর্য্যপালনের পর গৃহে প্রবেশ করিতেছে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। "বশিনী" (জিতেন্দ্রিয়া) বলিয়া তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথা সো বশিনী ত্বং।—ঋগ্বেদ ১০।৮৫।২৬

আধুনিক স্বামী (মালিক) প্রভৃতি পতিবোধক শব্দ জায়ার প্রতি পতির অধিকার প্রকাশ করে। বেদে পতিপত্নীর আন্যান্য ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিবাহান্তে বধূবর দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—

"আমাদের দুই জনকে একমনা করুন [সমঞ্জন্তু]
আমাদের দুই জনের হৃদয় সম্মিলিত হোক,
আমাদের দুই জনকে একতা [সম] দান করুন।"

—ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৭

অথর্ববেদের বর্ণনায় বয়োবৃদ্ধেরা প্রার্থনা করিতেছেন,

ব্রহ্মণস্পতে পতিমস্যৈ রোচয়—অথর্ববেদ ১৪।১।৩১

"হে ব্রহ্মণস্পতে, পতি ইহার পছন্দ হোক।"

বৃদ্ধেরা বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব।—ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৬

"শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ ইঁহাদের উপর সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকে।" অথর্ববেদ ইহার সঙ্গে যোগ করিয়াছে—

সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুঃ—অথর্ব ১৪।১।৪৩

"পতির উপর সম্রাজ্ঞী হও।" পতিও তাহার অনুরাগ ব্যক্ত করিতেছে—

যা মে প্রিয়তমা তনূঃ—অথর্ব ১৪।২।৫০

পত্নী প্রার্থনা করিতেছে—

দীর্ঘায়ু রস্তু মে পতি জীবাতি শরদঃ শতম্।

—অথর্ব ১৪।২।৬৩

"আমার পতি দীর্ঘায়ু হোক, শত বর্ষ বাঁচুক।"

পতি দাম্পত্য সম্বন্ধকে বেদ ও দেবের সহিত তুলনা করিয়া সে সম্বন্ধের গৌরব ঘোষণা করিয়াছে। পত্নীর উদ্দেশে বলিতেছে—

সামাহং ঋক্ ত্বং
দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।—অথর্ব ১৪।২।৭১

"আমি সাম-বেদ (সঙ্গীত), তুমি ঋগ্বেদ (কবিতা); আমি দ্যৌ তুমি পৃথিবী।"

বয়োবৃদ্ধেরা বধূকে গৃহস্থাশ্রমের পথ দেখাইতেছেন। সে পথে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন—

প্রবুধ্যস্ব সুবুধা বুধ্যমানা
দীর্ঘায়ুত্বায় শত শারদায়।—অথর্ব ১৪।২।৭৫

"সুবুদ্ধি ও বুদ্ধিমতী হইয়া দীর্ঘায়ুর জন্য, শতবর্ষ বাঁচিবার জন্য জাগ্রত হও।"

গৃহস্থাশ্রমে স্বামী গৃহপতি, স্ত্রী গৃহপত্নী। সন্তান শুধু পিতাকেই মানিবে তাহা নয়—

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ—অথর্ব ৩।৩০।২

"পুত্র পিতার অনুব্রত হইবে, মাতার সহিত একমনা হইবে।"

গৃহকে সুখপূর্ণ করিতে হইলে জায়া মিষ্টভাষিণী হইবে, ভাইবোনেরা পরস্পর দ্বেষ না করিয়া একমন একব্রত হইয়া বাস করিবে—

জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবান্ ॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসার মুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥—অথর্ব ৩।৩০।২-৩

"জায়া পতির প্রতি শান্তিপূর্ণ মধুময় বাক্য বলিবে। ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করিবে না, ভগ্নী ভগ্নীকে দ্বেষ করিবে না; ইহারা একমন, একব্রত হইয়া, কল্যাণময় বাক্য বলিবে।"

সেকালে সকল কন্যারই যে বিবাহ হইত তাহা নয়। এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"পিতৃগৃহে থাকিয়া সতী কন্যা যেমন পিতামাতার নিকট ভরণপোষণ দাবী করে।"—ঋগ্বেদ ২।১৭।৭

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের "কোর্টশিপ" বোধ হয় সেকালে সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল না। এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "কত কত কন্যারা (সুন্দরী না হইয়াও) তাহাদের ধনের কারণে সুপুরুষ দ্বারা "পরিপ্রীতা" হইয়া থাকে (ঋগ্বেদ ১০।২৭।১২)। কোথাও অবিবাহিত কন্যার প্রেমিককে "জার" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যথা "জারঃ কনীন ইব" (কন্যার জারের মত)। শব্দটা এত সহজ ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে তাহাতে সেকালে নিন্দাই অর্থ ছিল কি না সন্দেহ। এক মন্ত্রে প্রেমিক রূপে কন্যার "জার" ও পত্নীর পতির একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে—

জারঃ কনীনাং পতি র্জনীনাম্—ঋগ্বেদ ১।৬৬।৪

বেদের ঋষিরা সকলেই পুরুষ ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে নারীও ছিলেন। বেদের এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে, দেবহীন, অপদার্থ পুরুষ অপেক্ষা অনেক নারী শ্রেষ্ঠা—

উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী
পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ ॥—ঋ. ৫।৬১।৬

বেদে দেবতাকে শুধু পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা হয় নাই, নারীরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে। উষার স্তুতিতে দেখা যায়, উষাকে কখনও কন্যা—আকাশের দুহিতা ("দিবো দুহিতা") বলিয়া উপমা দেওয়া হইয়াছে, কখনও বিবাহের বধূ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে—

সুসঙ্কাশা মাতৃ মৃষ্টেব যোষা—ঋ. ১।১২৩।১১

"মায়ের সাজানো সুবেশা কন্যার মত।" এক স্থানে বলা হইয়াছে, তিনি গৃহস্বামিনীর মত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সন্তানদিগকে জাগাইয়া থাকেন (১।১২৪।৪)।

ঋগ্বেদে মাতৃরূপিণী সরস্বতীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু দেবতার গৌরব করা হয় নাই, নারীর মাতৃত্বেরও গৌরব করা হইয়াছে—

তোমার যে পীন স্তন কল্যাণ সৃষ্টি করে, যাহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল পোষিত হয়, যাহা রত্ন ধারণ করে, ধন দান করে, সৌভাগ্য দান করে, হে সরস্বতি! (তোমার সন্তানদিগকে) সেই স্তন্য দ্বারা পুষ্ট কর। ঋ. ১।১৬৪।৪৯

বেদে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে গৌরবপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ মতভেদ হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই। কিন্তু বেদ গার্হস্থ্যকে উচ্চ পদবী দিয়াছে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে—

"পূর্ব্বে যে ঋষিরা ছিলেন—যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে সত্য বিষয়ে আলাপ করিতেন—তাঁহারা অপত্যের জনক হইয়াছিলেন এবং সে কারণে ব্রতচ্যুত হন নাই।"

অগস্ত্য ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য উভয় আশ্রম পালন করিয়া দেবের "আশিষ" লাভ করিয়াছিলেন—(ঋগ্বেদ ১।১৭৯।৬)

বৈদিক যজ্ঞ পতি-পত্নী মিলিত হইয়া করিতেন। পতি-পত্নীর যুগল প্রচেষ্টা দ্বারা যে ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে জয়ী হওয়া যায়, এ তথ্য বেদে ব্যক্ত করা হইয়াছে—

জয়া বেদত্র শতনীথমাজিং
যৎসম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥—১।১৭৯।৩

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বলিতেছেন, "এ পৃথিবীতে আমরা শত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি, যদি আমরা যুগলে একপ্রাণ হইয়া চেষ্টা করি।"

শুধু কন্যা বা মাতা রূপে নয়, শুধু গৃহপত্নীরূপে নয়, পতির প্রেমাভিষিক্তা পত্নীরূপেও বেদে নারীর মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দেবতার বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, তিনি

অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী—ঋগ্বেদ ১।৭৩।৩

"অনবদ্যা পতিপ্রিয়া নারীর মত।"

এখানে বিবাহিতা নারীকে ও গৃহস্থাশ্রমকে যে মহৎ স্থান দেওয়া হইয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

জন্মান্তরের মায়া

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ট্রেনখানা যখন স্টেশনে পৌছলো তখন বেলা দশটা। হৃষীকেশের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় এরই শব্দ শুনে তারা সকলে স্নানের ঘাটে ছুটতো। স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে!

প্ল্যাটফরমের দিকে তাকিয়ে তার মন আনন্দ ও বেদনায় দুলছে। সেই স্টেশন! সে প্ল্যাটফরমের ওপর নামলো। স্টেশন-ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন চোখে পড়ছে না। তবে পঁচিশ বৎসর আগে যেদিন সে এখান থেকে চলে যায়, সেদিন স্টেশনটার রং এমন উজ্জ্বল ছিল না। স্টেশনের পিছনে সেই পুরানো দেবদারু গাছ দুটির পাতাগুলির রং আজ হয়ে উঠেছে লাল, স্টেশন-ঘরখানাতেও লাগানো হয়েছে লাল রং, প্ল্যাটফরমের ধারে অশোকগাছটাও ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠেছে। আজ সব লাগছে নূতন। কিন্তু হৃষীকেশ যেদিন এখান থেকে চলে যায়, সে কি পঁচিশ বৎসর আগের কথা? হাঁ, তা হবে। তখন বর্ষা নেমেছে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা; থেকে থেকে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি ঝরছে। পথে কাদা, পথের দু-ধারে নয়ানজুলি দিয়ে বয়ে চলেছে বর্ষার জলধারা। গাছপালার রং মেঘের ছায়ায় দেখাচ্ছে আরও সবুজ। সজল দমকা হাওয়ায় গাছগুলোর মাথা দুলছে। বেলা তখন শেষ হয়ে আসছিল। গাছের গোড়ায় অন্ধকার হয়ে উঠছিল ঘনতর। সেদিন এই জায়গা ছেড়ে যেতে তার মনে বেদনা জাগে নি, যেন সে পেয়েছিল নিষ্কৃতি, আরাম। মনে ছিল কত আশা…

হৃষীকেশ খুঁজতে লাগলো, যদি কোন চেনামুখ চোখে পড়ে। না; যারা গাড়ি থেকে নামল, যারা গাড়িতে উঠল তারা সকলেই অচেনা। তাদের চোখে কৌতূহল আছে, পরিচয়ের ভাষা নেই।

ঐ যে স্টেশনের বাইরে পথের ধারে সেই বটগাছটা। তার নীচে খাবারের দোকানও রয়েছে—কিন্তু এখন হয়েছে চার-পাঁচখানা। দোকানগুলোর সম্মুখে ঘোড়ার ও গরুর গাড়ি দাঁড়াবার খানিকটা জায়গা। গরুর গাড়িগুলো রেলের যাত্রীদের নিয়ে যায় দূরের গ্রামে। কিন্তু একখানা গরুর গাড়িও ত সে দেখতে পাচ্ছে না। সেখানে রয়েছে দুখানা ধূলিধূসরিত পুরানো মোটর-বাস, খান দুই জীর্ণ ট্যাক্সি ও একখানা ঘোড়ার গাড়ি। ঘন ঘন হর্ন বাজছে। পঁচিশ বৎসর আগে মোটর ত দূরের কথা, এখানে বাইসিক্‌ল্ ছিল দর্শকের বিস্ময় এবং অধিকারীর গর্ব্বের সামগ্রী।

হৃষীকেশ প্ল্যাটফরমে যাবার-আসবার ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার হাতে একটা সুটকেশ—বিশেষ ভারী নয়। কিন্তু বেশীক্ষণ হাতে ঝুলিয়ে নিয়েও যাওয়া যায় না, হাত ব্যথায় টন্ টন্ করে। একটা কুলি—ঐ ত একটা লোক আসছে, যার কাপড় ও চেহারা দেখে অনুমান করা যেতে পারে লোকটার পেশা অপরের মোট বহন করা। তবে ও বাঙালী। অবশ্য এই স্টেশনে তখনও খোট্টা কুলি ছিল না। সে একেবারে কাছে আসতেই হৃষীকেশ তার হাতে সুটকেশটা দেবার উদ্যোগ করল। কিন্তু লোকটা সেটা নেবার আগ্রহ প্রকাশ করল না, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"যাবেন কোথায়?"

কোথায় যে যাবে হৃষীকেশ তখনও ঠিক করতে পারে নি। এখানকার অনেকের কথাই তার মনে হয়েছে, অনেক স্মৃতি, অনেক ছবি তাকে এখানে টেনে এনেছে; কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আশ্রয় নেবে তা সে জানে না। সবই তার আপনার, অথচ সবেরই মাঝে রয়েছে ব্যবধান।

লোকটার কথায় মনে পড়ল তার শৈশব ও কৈশোরের সঙ্গী জ্যোতিষকে। সে এখানেই থাকে; জমিদারী-সেরেস্তায় চাকরি করে। তাদের বাড়িখানা একেবারে নদীর ধারে। হৃষীকেশদেরও বাড়ি ছিল তাদের বাড়ির সম্মুখে। কিন্তু—?

লোকটার গলার স্বরে হৃষীকেশের মনে খানকয়েক পুরানো ছবি একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছিল। সে বললে—এখানে শ্রীপতি ঠাকুরের হোটেল—

—তিনি মারা গেছেন। তেনার মেয়ে এখন হোটেল করে—

—তুমি কানাই বেহারার ছেলে নিধু নও?

লোকটা এবার ভাল করে হৃষীকেশের মুখের দিকে তাকালো। তার পর বলে উঠলো—তুমি হৃষীবাবু, দত্ত-

মশায়ের ছেলে? ঠাহর পাই নি। কোলকেতায় থাক না?

—হাঁ। তোকে চেনাই যায় না। মুখে বড় বড় গোঁফ, মাথায় লম্বা—

—মশায় টিকিটখানা—

—এই যে—বলতে বলতে হৃষীকেশ টিকিটখানা বার করে টিকেট-কালেক্টারের হাতে দিল।

সেদিন রবিবার; আদালত বন্ধ। তাই যাত্রীও ছিল অল্প। সকলেই টিকিট দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হৃষীকেশ বললে—নিধে, শ্রীপতি ঠাকুরের হোটেলে চল্।

হোটেলটা সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূর, একেবারে নদীর ধারে। সেই দিকেই কাছারি।

দু-জনে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোটরগুলোর পাশ দিয়ে, খাবারের দোকানের সম্মুখ দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

তখনও অনাগত যাত্রীর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন হর্ন বাজছে, কন্ডাকটার হাঁকছে— "মীরপুর— পাকুড়তলা—শেখের বাজার—"

মোটরের এঞ্জিনও হয়ে উঠেছে অধীর।

হৃষীকেশ কৌতূহলবশে কনডাক্টারটার দিকে তাকাতেই সে বললে—আসুন বাবু! হাওয়ায় উড়ে যাবেন।

নিধু বললে—ওকে চেন না হৃষীবাবু?

—মনে পড়ছে না ত!

—সেই নরহরির নাতি।

—কোন্ নরহরি? সেই যুগীপাড়ার হাতকাটা?

—হাঁ—হাঁ। সেই যে গো, ওর বড় ভাইটাকে সাপে কেটেছিল। ও এখন কন্টাকের কাজ করে।

হৃষীকেশের মনে পড়লো একটি দৃশ্য। গ্রীষ্মকাল; অন্ধকার রাত্রি। যুগীপাড়ায় একখানি খড়ের বাড়ির উঠানে একটি অসাড় দেহ। তার চার ধারে স্ত্রীলোক ও পুরুষের দল। ওঝা মন্ত্র পড়ছে, দেহটির ওপর কলসী কলসী জল ঢালা হচ্ছে, আর একটি বিধবা হাহাকার করে কাঁদছে। হারিকেনের ম্লান আলোয় দৃশ্যটা হয়ে উঠেছিল ভীষণ। হৃষীকেশ তার পরের আরও কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি মাঝে ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লো।

পথটা কাঁচা-পাকা ও প্রশস্ত। তার এক ধারে সুদীর্ঘ ঝাউশ্রেণী, আর এক ধারে আমগাছের সারি। আমগাছগুলোর কতক নূতন পাতায়, কতক ছোট ছোট আমগুটিতে ভরে গেছে। ঐ যে মোড়ের সেই গাছটা। ওটা তখনও এই রকম আমগুটিতে ছেয়ে যেত। হৃষীকেশদের অত্যাচারে ফলগুলো পুষ্ট হবার আগেই গাছটা হয়ে পড়ত শূন্য; ওর রিক্তবৃন্তগুলি শীর্ণ আঙুলের মত এধারে-ওধারে বেরিয়ে থাকত।

জনবিরল পথ। সব কেমন স্তব্ধ, উদাস। ঝাউ-পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাসও বয়ে চলেছে চাপাস্বর তুলে। তখনও এ-সব এমনই ছিল; কিন্তু হৃষীকেশের আজ লাগছে নূতন ও মধুর।

তার মনে পড়ল নিধুর খবরটা নেওয়া হয় নি। তাকে বোধ হতে লাগল, আপনার জন। সেও এদেরই মত নূতন ও পুরানোয় মিশানো। সে বললে—নিধে তোর বাপ-মা এখনও বেঁচে আছে?

—না।

—তোদের সেই বাড়িটা আর বাতাবি লেবুর গাছ দুটো?

নিধু হেসে বললে—দক্ষিণেরটা আছে।

—তুই বিয়ে করেছিস?

নিধুর কান দুটো লাল হয়ে উঠলো; বললে—হাঁ।

—কি করিস? বেহারার কাজ?

—না; এখন আর পাল্‌কিতে কেউ চড়ে না। কলে কাজ করতাম—চাকরি গেছে। মোট বই।

—এতে তোর চলে? ছেলে-পুলে আছে?

—একটা হয়েছিল। বাতাস লেগে মরে গেল!

—বাতাস? কিসের বাতাস? ওহোঃ—হৃষীকেশ নীরবে চলতে লাগল।

নদীর ধারে পৌঁছবার জন্য হৃষীকেশ একটু তাড়াতাড়ি চলছিল। পথটা এক জায়গায় মোড় ঘুরেছে। হৃষীকেশ ডান দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—ওটা সতীশ সান্যালের বাড়ি নয় রে নিধে?

—হাঁ। গত বছর সান্যাল মশায়ের বড় ছেলে দালান তুলেছে।

হৃষীকেশ বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতে চললো। সান্যাল মশায়ের বড় ছেলে হরিপদ তার সহপাঠী। সে এখানে থাকে। এখন উকিল।

দালানের বারান্দায় একখানা হাতল-দেওয়া পিঠ-ভাঙা চেয়ারে বসে এক জন হুঁকো টানছিল। তার সম্মুখে শানের ওপর বসে এক জন ঝাঁকা থেকে কি যেন বেতের দাঁড়ি-পাল্লায় তুলে ওজন করছে। হৃষীকেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলে—তেঁতুল। তেঁতুলওয়ালার পাশে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে তেঁতুল চুষছে।

যে হুঁকো টানছিল তার ঠিক সম্মুখে গিয়ে পড়তে সেও হৃষীকেশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার পর বলে উঠলো—কে ও? হৃষী নাকি?

হৃষীকেশ হঠাৎ কৈশোরের দিনগুলির মাঝে গিয়ে পড়লো। তার মন তেমনই চঞ্চল, সরল ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই হরিপদ ত সে নয়! সে ছিল লাজুক, নিরীহ, ভীরু। এর চোখ সহপাঠী-হৃষীকেশকে খুঁজছে না, খুঁজছে মানুষ-হৃষীকেশকে।

হৃষীকেশ তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—

—হরিপদ? কেমন আছিস্? অনেক দিন পরে—

—মাঝে মাঝে এলেই পার। তবে ছোট জায়গা—পাড়াগাঁ—কোলকেতার সুখ-সুবিধে এখানে নেই। বলে হরিপদ সুতীক্ষ্ণ শব্দে হেসে উঠলো। এ বন্ধুর হাসি নয়, বন্ধু ত আঘাত করে না।

সে আবার বললে—হঠাৎ কি মনে করে?

—এমনই।

—এই পাড়াগাঁ ভাল লাগবে কি?

—না লাগবে কেন?

—তা বটে! কি করছ আজকাল?

তার প্রশ্নের উত্তর দেবার, এমন কি, তার সঙ্গে বাক্যালাপেরও আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবুও হৃষীকেশ বললে—যা আগে করছিলাম, এখনও তাই করি—

—সেই 'সুরলোক', না, কি নামের কাগজে এখনও কাজ করছ? হরিপদর চাল ভারিক্কী হয়ে উঠল।

হৃষীকেশ আর দাঁড়ালো না। এই জায়গাটির সকল মাধুর্য্য এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে গেল। সে একখানা কাগজে কাজ করতো বটে, কিন্তু তার নাম 'সুরলোক' নয় এবং সেখানা বিশ বৎসর আগে উঠে গেছে!

চলতে চলতে নিধু বললে—হৃষীবাবু, তুমি কোলকেতায় যে আপিসে কাজ কর, সেখানে আমাকে যাহোক একটা কাজ দিতে পার?

—আমি কোথাও চাকরি করি না রে।

নিধু চলছিল হৃষীকেশের পাশে পাশে। হৃষীকেশ দেখলো তার মুখে চোখে বিস্ময়। সে কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলে—নিধে, আমাদের পাড়ায় এখন কে কে আছে রে?

—কর্ত্তাবাবুরা কেউ নেই—তেনাদের ছেলেরা কেউ কেউ আছে।

হৃষীকেশের মনে হ'ল তার প্রতি নিধুর মনে যে সম্ভ্রম জেগে উঠেছিল, তা যেন এখন আর তেমন গভীর নেই।

পথটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সম্মুখে কয়েকটা গাছ। আরও হাত কয়েক যেতেই সেগুলোর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল, একটু জল রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে। তার ওধারে বালুচর দূরে আকাশ ছুঁয়ে পড়ে আছে। সেখানে আকাশের কোলে লেগে আছে একটি নীলাভ কৃষ্ণ রেখা।

হৃষীকেশ আর যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সে যত তার কাছে যায়, জলধারা ও চরখানি তত বিস্তৃত হতে থাকে। সে একেবারে ঘাটের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। সম্মুখে নীল শীতল জলধারা, পরপারে বালুচর। চরখানি জলের কিনারা থেকে ক্রমে উঁচু হয়ে এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ হয়েছে নদীর ভাঙা পাড়ের মত উন্নত। তার পর আর কোথাও তার শেষ নেই—বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে অসমতল মরুর মত পড়ে আছে। তার ওপর শুষ্ক, তপ্ত, লঘুবালুকণা রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে, হাওয়ায় উড়ছে। বর্ষায় এরই ওপর দিয়ে বয়ে যায় বিশাল উদ্দাম রক্তাভ জলপ্রবাহ। তখন এর চিহ্নটুকুও থাকে না।

হৃষীকেশ যে পথটার ওপর দাঁড়িয়েছিল, সেটা নেমে গেছে একেবারে জল অবধি। ঘাটে ছেলেরা মহোল্লাসে স্নান করছে, কয়েকটি স্ত্রীলোক কাপড় কাচছে।

নিধু হোটেলের পথে দাঁড়িয়ে ডাকলে—দাঁড়ালে কেন? হোটেল এই দিকে।

কিন্তু সেখান থেকে যেতে হৃষীকেশের মন চাইছিল না। সে খুঁজতে লাগলো নিজেকে সেই স্নানের ঘাটে, নদীর নীল জলধারায়, ওপারের সীমাশূন্য তপ্ত বালুচরে, তার ওপর ছোট ছোট ঝাউবনে। এদের মাঝে সে নেই, কিন্তু তার মাঝে এরা আজও আছে। স্মৃতি-মায়াপাশে এরা সকলে তাকে রেখেছে জড়িয়ে। হৃষীকেশ কিছুকালের জন্য সে জাল শিথিল করতে পেরেছিল মাত্র কিন্তু ছিন্ন করতে পারে নি।

শ্রীপতি ঠাকুরের হোটেলেও সেদিন ভিড় কম। নিধু সুটকেশটা বাইরের ঘরে চৌকিখানার ওপর রেখে বললে—যা দেবে দাও।

হৃষীকেশ তার হাতে একটা সিকি দিতে দিতে বললে—তুমি রাত্রেও আমার এটা স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে?

—আজই চলে যাবে? আচ্ছা। ওগো ঠাকুর মশাই, কোলকেতার বাবু এয়েছেন। এনারে চেন?

চটির আওয়াজ শুনে হৃষীকেশ মুখ ফিরিয়ে দেখলো—এক জন রুক্ষ মূর্ত্তি প্রৌঢ়; তার মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি, দু-পাশের জুলফি গাল অবধি নেমে এসেছে, চোখ দুটো ছোট ও লাল। গলার পৈতা গাছটি সাদা ও মোটা। হাতে একগাছি তাগায় দুটি মাদুলি বাঁধা। সে হৃষীকেশকে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কি করা হয়?

হৃষীকেশ দেখলো তার মুখে সম্মুখের ওপর-নীচের কয়েকটি দাঁত নেই, কথায় কেমন একটু বন্য টান।

সে বললে—আসছি কোলকেতা থেকে। পেশা লেখনী-পরিচালনা।"

লোকটি বললে—আপনি মনে 'অসন্তোষ' করবেন না। এ সব জানা আমার 'রুল'। এখানে পাঁচটা 'জেনটেল-ম্যান' আসেন। কোন রকম 'কেলেঙ্কার' করে এমন লোককে ঢুকতে দিই না। তাই—

নিধু বললে—তুমি ওনারে চিনতে পারছ না। বুড়ো ঠাকুর মশায়ের মেয়ের সঙ্গে ওনার খুব জানাশুনো আছে।

—কি রকম? এই দশ বছরের মধ্যে ত ওনারে দেখি নি। তার আগেকার কথা বলছ?

—হাঁ গো।

হৃষীকেশ বললে—পরিচয়ের দরকার নেই। উপস্থিত ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু আশ্রয় আর চারটি গরম ভাত দিও।

—এই নিধে—নিধু—পাশের দরজা থেকে একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নিধু সেদিকে এগিয়ে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—কে এসেছে রে?

—তিনকড়ি দত্তমশায়ের ছেলে হৃষীবাবু। ওগো ঠাকুর-মশায়, এদিকে শুনে যাও সে। আমি চললাম হৃষীবাবু। গাড়ি ত সেই সাড়ে আটটায়। তার আগেই আসবো—

হৃষীকেশ জামা-জুতো খুলে স্যুটকেশ থেকে কাপড় আর গামছা বার করে নিতেই সেই লোকটা দরজা থেকে বেরিয়ে এসে বললে—বাবুমশায় একটু ওদিকে চলুন।

—কোন্ দিকে?

—আমার পরিবারের কাছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কিন্তু আমার এই স্যুটকেশ, জামা, জুতো—

—থাক্, ওসব আর কেউ ছোঁবেও না।

হৃষীকেশ সচকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো; কিন্তু তাতে কোনই ভাবান্তর চোখে পড়লো না।

সে পাশের দরজাটার সম্মুখে দাঁড়াতেই একটি স্ত্রীলোক হাত তুলে নমস্কার করে সহাস্যে বললে—মনে পড়ে? ভাল আছ?

হৃষীকেশ প্রথমটা কেমন যেন হয়ে গেল। এই সেই শ্রীপতি ঠাকুরের মেয়ে সরস্বতী? তখন ছিল সাত-আট বৎসরের; অতি চালাক, চোখে মুখে কথা বলত। এখন এর মুখে-চোখে যে-ভাব মাখানো রয়েছে, তা হৃষীকেশের মনকে করে তুললো তার প্রতি বিরূপ। সে মুখে কৃত্রিম হাসি এনে কৃত্রিম কোমল কণ্ঠে বললে—হাঁ। তুমি এখানেই থাক?

—আর কোথায় যাব বল? উনি আমার স্বামী। বলে সে তর্জ্জনীটা ঈষৎ হেলিয়ে লোকটাকে নির্দ্দেশ করে মাথার ঘোমটাটা পাশের দিকে একটু টানলে। লোকটা তার স্ত্রীর উজ্জ্বল চঞ্চল চোখ দুটোর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চকিতে একবার তাকিয়েই হৃষীকেশের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

হৃষীকেশ বললে—ভালই হ'ল। এই পুরানো জায়গাটা এখন আমার বিদেশ। তোমরাই এখানে আমার পরম আত্মীয়। স্নান করে আসি—

লোকটা হাত কচলাতে কচলাতে বললে—যে আজ্ঞে, এদিকে সব রেডি।

হৃষীকেশ যেতে যেতে শুনতে পেল, সরস্বতী রুষ্ট কণ্ঠে বলছে—ওনাদের বাড়ি আমার বাবা এক সময়ে রান্না করেছে। আলাপ থাকবে না তো কি?

হৃষীকেশের কান দুটো জ্বালা করতে লাগলো।

হৃষীকেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে জলে নামলো। শীতল জল। তার সারা দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এ যেন মাতৃস্নেহধারা! সুদীর্ঘকাল পরে আজ সে তার ক্লিষ্ট অন্তর, ক্লান্ত দেহ নিয়ে তাতে অবগাহন করেছে। ঘাটে আরও অনেকে ছিল। কিন্তু হৃষীকেশ তাদের অপরিচিত। তারা কেবল কৌতূহলভরে হৃষীকেশকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

হৃষীকেশের দক্ষিণে বাজারের ঘাট। ঐ দূরে খেয়া চলেছে এপার থেকে ওপারে। হৃষীকেশের ইচ্ছা হ'ল সেও একবার খেয়ায় পারাপার হয়ে আসবে। ছেলেবেলায় তারা কত দিন ঐ খেয়ায় এপার থেকে ওপারে গেছে।

কিন্তু আহারের পর তার সে উৎসাহ আর থাকলো না। সুদীর্ঘকালের অনভ্যাস, দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা ও শান্তি তাকে করে তুললো অলস ও উৎসাহহীন। সে স্যুটকেশটা

মাথায় দিয়ে তক্তার ওপর মাদুরে শুয়ে রইলো। তখন কোথায় বসে যেন একটা ঘুঘু অক্লান্ত কণ্ঠে ডাকছে, দূর থেকে একটা চিলের ডাক ভেসে এলো, ফাল্গুনশেষের উদাস হাওয়া সম্মুখের আমবাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে বয়ে। সেই সুরে ও হাওয়ায় হৃষীকেশের মন সেখানকার পথে পথে এলোমেলোভাবে উড়ে বেড়াতে লাগলো। ক্রমে তার চোখের পাতা দুটো হয়ে এল ভারী···

যখন তার ঘুম ভাঙলো, বেলা পড়ে আসছে। সূর্য্য বাঁশবনের মাথায় নেমে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে, শুকনো কাপড় ও গামছা সুটকেশে পূরে, জুতো জোড়া পায়ে পরে ভাবলো, একেবারেই এখান থেকে চলে যাবে। পরক্ষণেই মনে পড়লো নিধুর কথা। সে তাকে আসতে বলেছে। ভাবলো, সরস্বতীকে ডাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

সরস্বতী বোধ হয় তারই ঘুমভাঙার প্রতীক্ষায় ছিল, দরজার কাছে এসে বললে—উঠেছ? বড় কষ্ট হচ্ছে?

হৃষীকেশ বললে—"আমি চলে যাচ্ছি। আর আসব না। তুমি নিধুকে দিয়ে এই সুটকেশটা আটটার গাড়ির সময় স্টেশনে পাঠিয়ে দিতে পারবে?

—যদি সে না আসে? ওদের ত কথার ঠিক নেই। আচ্ছা, যেমন করে হোক পাঠিয়ে দেব। তুমি রাত্রে কিছুই খাবে না?

—বাড়ি পৌছে খাব। চললাম—

হৃষীকেশ বাজারের পথ ধরলো। সেই পুরানো পথ, কিন্তু দুপাশে গাছ-পালা কেটে মাঝে মাঝে নূতন বাড়ি উঠেছে। সে বাজারের যত কাছে যায়, বসতি তত ঘন হয়ে আসে। বাজারে ঢোকবার মুখে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ভিড় ছিল। ভিড়ে চাষী ও মজুরের সংখ্যাই বেশী।

হৃষীকেশ ভিড়ের ভিতরে গিয়ে দেখলে একটা লোক মাটিতে হাত দুখানা রেখে বসে আছে, আর গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ একখানা কালো রংঙের ছোট লাঠি তার পিঠের ওপর বুলাতে বুলাতে ব্যাধি নিরাময়ের দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আওড়াচ্ছে। কলিকাতার পথে এ দৃশ্য পুরানো, হৃষীকেশ ছেলেবেলায় এখানে এ রকম কিছু দেখতে পায় নি। কয়েক জন ছাত্র এক পাশে গলা ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল। তারা বিদ্রূপ করে বলে উঠলো—বুজরুকি।

—হাঁ, বুজরুকি। কিন্তু ও অনশনে মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওদের ভোলাচ্ছে; আর, যারা ভুলছে, তারাও চাইছে বাঁচতে, সুখী হতে।

হৃষীকেশ সেখান থেকে আরও এগিয়ে চললো। সেই পুরানো গন্ধ, দৃশ্য ও শব্দ—তবুও সবার ওপর বিস্মৃতির অতি ক্ষীণ আবরণ ছড়ানো। তার আড়ালে সকল কিছুকে লাগছে নূতন।

বেলা আরও পড়ে এল। হৃষীকেশ বাজারের মধ্য দিয়ে নদী-তীরে পৌছলো। ঘাটে নানা রকমের নৌকার ভিড়—সব গায়ে গায়ে বাঁধা। ঘাটের ওপর মজুর, চাষী, ব্যাপারী ও মাল-পত্র। জলে বেলাশেষের ছায়া পড়েছে। শুদ্ধ বিজন বালুচরের ওপর আকাশপথে বকের সারি ও পাখীর ঝাঁক উড়ে চলেছে। ঐ দূরে এক দল গরু নদীতে নেমেছে জল পান করতে।

নদীর নীচু পাড়ের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-চলা আঁকা-বাঁকা পথ চলে গেছে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে। ঐ পথে পশ্চিম দিকে গেলে দক্ষিণ-পাড়ায় হৃষীকেশদের বাড়ি পৌছনো যায়। তারই সম্মুখে জ্যোতিষদের বাড়ি। হৃষীকেশদের বাড়িটা এখন অন্য লোকের। তার একবার ইচ্ছা হ'ল, সেটা দেখে আসে। তার পরই মনে বেদনা ও অনিচ্ছা হয়ে উঠলো প্রবল, না—সেখানে আর সে যাবে না। তবে জ্যোতিষকে একবার—

সে নীচে নেমে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে চলতে লাগলো। কিছু দূর যেতেই সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় সব হয়ে উঠতে লাগলো কালো ও রহস্যময়। দুটি একটি করে আলো, দুটি একটি করে তারা ফুটে উঠছে। মজুররা সারি গেয়ে নদী-পথে নৌকায় ওপারে ঘরে ফিরে চলেছে। হৃষীকেশ যখন জ্যোতিষদের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো তখন বেশ অন্ধকার। বাড়ির ভিতর থেকে শিশুদের কোলাহল ও একটি পুরুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। স্বরটা জ্যোতিষেরই। তবে এখন কিছু ভারী হয়েছে। ফটকে বাঁশের হুড়কো লাগানো ছিল। হৃষীকেশ হুড়কোটা খুলতেই সামনের উঠান থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। হৃষীকেশ ফটকটা ডিঙিয়ে পার হয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকলে—জ্যোতিষবাবু আছেন?—জ্যোতিষবাবু?

ভিতরের ক্রুদ্ধস্বর সহসা থামলো, কিন্তু শিশুদের কোলাহল একটুও উপশম হ'ল না। পরক্ষণেই খড়ম পায়ে জ্যোতিষ—হাঁ জ্যোতিষই—বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কে—কাকে চান?

—জ্যোতিষবাবুকে—বলতে হৃষীকেশ এগিয়ে গেল।

—কোথা থেকে আসছেন?

—কোলকাতা থেকে।

—কোলকাতা থেকে? জ্যোতিষ ঝুঁকে হৃষীকেশকে লক্ষ্য করতে লাগলো। তার পরেই বলে উঠলো—হৃষী না? হঠাৎ?

—ইচ্ছে হ'ল, এলাম।

—দাঁড়াও আলো আনি।

জ্যোতিষ একটা হারিকেন এনে বললে—এসো।

হৃষীকেশের মন হাল্কা হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর এক পাশে তক্তাপোষ পাতা। তার ওপর মসীলিপ্ত পুরানো সতরঞ্চি বিছানো। জ্যোতিষ হারিকেনটা একখানা মোটা কাগজের ওপর রাখতে রাখতে বললে—বস—বস—কখন এসেছ—কোথায় উঠেছ?

—এসেছি সকালে, উঠেছি হোটেলে। কিন্তু তোর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একেবারে নুয়ে পড়েছিস্, মনে হচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে, বয়স হয়েছে অন্ততঃ পঞ্চান্ন বছর। অথচ তুই আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট—

—তিন মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম। তা ছাড়া—

হৃষীকেশের সম্মুখে অন্দরের দরজাটি ছিল খোলা। দরজার পর উঠান; তার পর একখানা খড়ের ঘর। তার বারান্দায় কাঠের উনান জেলে একটি স্ত্রীলোক কি যেন তৈরি করছে। আর, সারা উঠানে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে সাত-আটটি ছেলে-মেয়ে।

স্ত্রীলোকটির মুখখানি আগুনের লাল আভায় এক এক বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এবং মুহূর্ত্তেই ছায়ায় হয়ে পড়ছে ম্লান। সে হৃষীকেশের দিকে দুই একবার তাকিয়ে দেখলো। হৃষীকেশের মনে পড়ে গেল, শৈশবের আর একখানি মুখ। এর সঙ্গে তার মিল আছে, পার্থক্যও আছে। কিন্তু এ হ'ল সংসারভারপীড়িতা প্রায়বিগতযৌবনা এক সুশ্রী নারীর মুখ; আর, সে মুখখানা ছিল এক কিশোরীর—আরও কোমল, সজীব, সুশ্রী।

হৃষীকেশ বললে—আচ্ছা জ্যোতি, সেই সিংহমশায় এখন কোথায়? মনে পড়ছে তোমার—সেই যাঁর মেয়ের সঙ্গে আমরা খেলতাম, আমার সঙ্গে যাঁর সেই মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল? মেয়েটির নাম যেন কি?

নামটি হৃষীকেশের মনে উজ্জ্বল হয়ে ছিল; কিন্তু উচ্চারণ করতে তার বড় সঙ্কোচ বোধ হ'ল।

জ্যোতিষ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"মাধবী। আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।" বলতে বলতে অন্দরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার পর বললে—একটু চা খাও—

হাতের ঘড়িটা দেখে হৃষীকেশ বললে—এখন সাড়ে সাতটা। সাড়ে আটটায় আমার ফিরবার গাড়ি। চা খাবার সময় হবে না। তোমার ছেলে-মেয়ে কটি?

—জীবিত আছে সাতটি, মারা গেছে চারটি। ঐ যে তারা খেলা করছে। তুমি ত বেশ আছ।

হৃষীকেশ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না; বললে—কিসে বুঝলে?

—চেহারায়।

হৃষীকেশ একটু হাসলো। সেও সুখী নয়, বললে—উঠি ভাই। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

জ্যোতিষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। হৃষীকেশকে যতক্ষণ দেখা গেল, যতক্ষণ তার পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগলো, সে আলো হাতে ফটকে রইলো দাঁড়িয়ে।

হৃষীকেশের মনে তখন পাশাপাশি ভাসছে দুখানি মুখ। এই সেই মাধবী? না—তার মৃত্যু হয়েছে—এ আর কেউ। তবুও সেই দুখানি মুখই তার চিন্তাস্রোতে ঘুরে-ফিরে ফুলের মত ভেসে আসতে লাগলো।...

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত থোরবেরগুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

স্নরি ভবনে লেখক (মধ্যস্থলে)

ষোড়শ শতাব্দীর হস্ত নির্ম্মিত কার্পেট
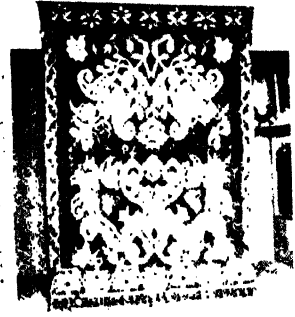
আইস্‌ল্যাণ্ডে

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

আইস্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক স্নরে স্তর্লারসন্‌ রচিত নরবৃশ অর্থাৎ উত্তরদেশীয় রাজাদের কীর্ত্তি কাহিনী ও প্রাচীন ধর্ম্মমত* এবং আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাগা (Saga) পড়িয়া সেই দেশ দেখিবার ও দেশবাসীদের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের বাসনা হয়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমার এক ডেনিস্‌ বন্ধু আইস্‌ল্যাণ্ডের আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক থোরবেরগুর থোরডারসন্‌ মহাশয়ের লিখিত এস্‌পারেন্টো ভাষা সম্পর্কে একখানা পুস্তক, উক্ত সাহিত্যিক ও ওলাফুর ক্রিশ্চিয়ান্‌সন্‌ নামক এক শিক্ষকের ঠিকানা আমাকে দেন। উভয়েই আন্তর্জ্জাতিক এস্‌পারেন্টো সমিতির সভ্য। আমি নিজেও তখন ঐ সমিতির সভ্য ছিলাম। সেই সূত্রে আমি উভয়কে আমার আইস্‌ল্যাণ্ড দেখিবার কল্পনা জানাইয়া চিঠি দিই।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীযুত থোরবেরগুর থোরডারসন্‌ মহাশয়ের উত্তর ও আমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আইস্‌ল্যাণ্ড যাওয়া স্থির করি। ট্রেনে করিয়া স্টক্‌হল্‌ম্‌ হইতে ওস্লো, আর ওস্লো হইতে নরওয়ের পশ্চিম বন্দর বেরগেনে যাই এবং ১১ই এপ্রিল রাত্রিবেলা আইস্‌ল্যাণ্ড-গামী লিয়রা নামক জাহাজে উঠি।

আইস্‌ল্যাণ্ড আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরে সুমেরু-বৃত্তের সন্নিকটে একটি দ্বীপ। ইহা আয়তনে প্রায় ৪০০০০ বর্গ মাইল। এই দ্বীপের উত্তরতম কূলভাগ সুমেরুবৃত্ত পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

তুষার যুগের আইস্‌ল্যাণ্ড বর্ত্তমান গ্রীনল্যাণ্ডের ন্যায় তুষারে সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। সেই তুষাররাশি ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে গতিশীল হইয়া মাটি পাথর প্রভৃতি অনাবদ্ধ বস্তুকে ধুইয়া লইয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ফিয়োর্ড ও খাদের সৃষ্টি করে। এই বৃহৎ পাহাড়ী দ্বীপের বিশেষ করিয়া নিম্ন সমভূমি ভিন্ন অল্প স্থানই বসতির যোগ্য। দক্ষিণস্থ লম্বা সমভূমির পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর তিন দিকেই পর্ব্বতমালা আর এক দিকে সমুদ্র। নানা আকৃতির ও বিভিন্ন প্রকৃতির সমভূমি এখানে সেখানে উচ্চ পর্ব্বতমালাকে বিভক্ত করিয়াছে কিন্তু কোন পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া দেশের চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে মনে হয় যেন পর্ব্বত-গুলি জড়িয়া এক হইয়া আছে। তখন নিম্ন সমভূমি আর চোখেই পড়ে না। আইস্‌ল্যাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার নাম ওরায়েফাজকুল। ইহার শিখরোপরি সমভূমি হিমবাহে আবৃত। ইহা ২১১৯ মিটার উচ্চ। দেশের অধিকাংশ উচ্চ পর্ব্বতই হিমবাহের শ্বেত উষ্ণীষ পরিয়া কঠিন প্রস্তরদেহ লইয়

*Snorro's Heimskringla—the Sagas of the Norse Kings.
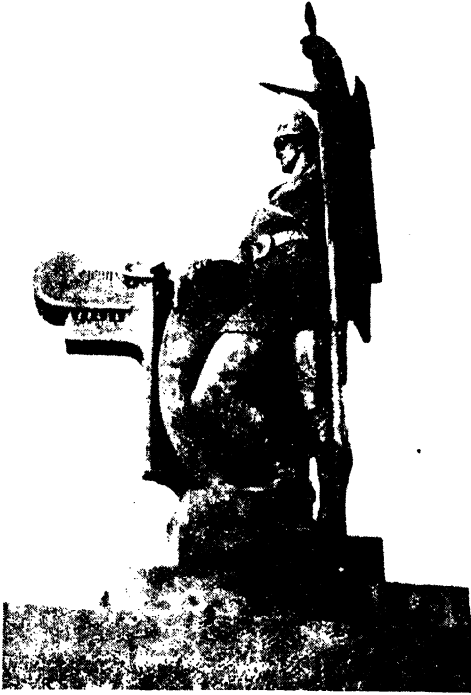
আইসল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ শিল্পী এইনার জনসন খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তি

দাঁড়াইয়া আছে। এই দ্বীপে গভীর মুখব্যাদান করিয়া অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'হেক্‌লা' (১৪৪৭ মিটার) গত সহস্র বৎসর মধ্যে আঠার বার অগ্নি ও গলিত লাভা উদ্গীরণ করিয়াছে। এই সময় মধ্যে বিশটি আগ্নেয়গিরি শতাধিকবার সক্রিয় হইয়া দেশের অধিবাসীদের বহু ক্ষতি করিয়াছে—এমন কি কোন কোন জনবসতির বিলুপ্তি সাধন করিয়াছে। আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ভূকম্পন হইয়াছে। ইহার ফলে এখন দেশের ভূমির এগার হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান গলিত লাভায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

উষ্ণ প্রস্রবণের সংখ্যা দ্বীপে অনেক; ইহাদের জলের উত্তাপের তারতম্য দশ ডিগ্রি হইতে একশত সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত; অধিক উত্তাপবিশিষ্ট প্রস্রবণের কোন কোন ফোয়ারার জল শূন্যে বহু ঊর্দ্ধে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ "গ্রেট্ গেইশীর" সাতষট্টি মিটার ঊর্দ্ধে জল বিকীর্ণ করিয়া বহুকাল নিষ্ক্রিয় ছিল; তিন চার বৎসর পূর্ব্বে ইহা আবার সক্রিয় হইয়াছে। এই প্রস্রবণগুলিকে আইস্‌ল্যাণ্ডীয় ভাষায় বলে "গেইশীর"।

দেশে অনেকগুলি হ্রদ; সর্ব্ববৃহৎ হ্রদ থীংভাল্লাভাটন্ ১২০ বর্গ কিলোমিটার। হ্রদ ও নদীর জলে প্রচুর মাছ। শিকারের লোভে বহু সৌখীন ভ্রমণকারী আজকাল আইস্‌ল্যাণ্ডে গিয়া থাকেন। সৌন্দর্য্যে খ্যাত বিশাল জলপ্রপাত 'গুলফস্' (Gullfoss), বাংলায় ইহার অর্থ হইবে স্বর্ণপ্রপাত। আইস্‌ল্যাণ্ডে বহু নদী; ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম "ভিটা" নদীর উৎস এই স্বর্ণপ্রপাত। নদীগুলির জল সাধারণতঃ ঘোলাটে। সেই জন্য জল অল্প হইলেও ইহাদের গভীরতা বুঝা কঠিন। জলস্রোতের প্রখরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীগুলিকে অনতিক্রম্য করিয়াছে। ইহাদের উপর নৌকা চালানও সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানে অনেকগুলি নদীর উপর সেতু—বিশেষ করিয়া টানা সেতু করা হইতেছে। কিন্তু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীর উপর সেতুর বাঁধ এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এই জাতীয় নদীগুলি বালিভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহাদের গতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল নদীর উৎস পর্ব্বতশিখরস্থ হিমবাহ। হিমবাহ স্থানে স্থানে গলিয়া জল হয়। সেই জল হিমবাহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। হঠাৎ যখন ইহারা পথ কাটিয়া বাহির হয়, তখন আর কোন বাধাই মানে না; সম্মুখে যাহা কিছু পায় ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যায়। হিমবাহের অংশ স্থানে স্থানে জলে পরিণত হওয়ার কারণ ইহাদের ভূনিম্নস্থ লুক্কায়িত ও নিকটবর্ত্তী আগ্নেয়গিরির প্রভাব। যখন বন্যা আসে, তখন খণ্ড খণ্ড হিমবাহের টুকরাও ভাসিয়া আসে।

সুমেরুবৃত্তের সন্নিকটে দেশের অবস্থিতি হইলেও ইহার জলবায়ু তত শীতকঠিন নহে। দেশে কোন কোন সময় কঠিন শীত পড়িয়াছে সত্য; কিন্তু সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসে দেশের উত্তরস্থ শহর আকুরেরি ও প্রধান শহর রেইকাভিক্ যথাক্রমে –৩·৪ ও –১·৩০ সেন্টিগ্রেড এবং জুলাই মাসে যথাক্রমে +১০·৪ ও +১১·২ পর্য্যন্ত উত্তাপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ উপসাগরীয় স্রোতপ্রবাহ ইহাকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর মেরু হইতে সময় সময় ভাসমান হিমশৈল দেশের উত্তর উপকূল পর্য্যন্ত পৌঁছে। সে জন্য সেখানে শীতাধিক্য ঘটে এবং অনেক বন্দরের জল জমাট বাঁধিয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরে পর্ব্বতভূমিতে শীত সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই জন্য বিশাল হিমবাহগুলি বাঁচিয়া আছে। বৃহত্তম হিমবাহ ভাট্‌নাজকূল ৮,৫০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া আছে। আর দেশের
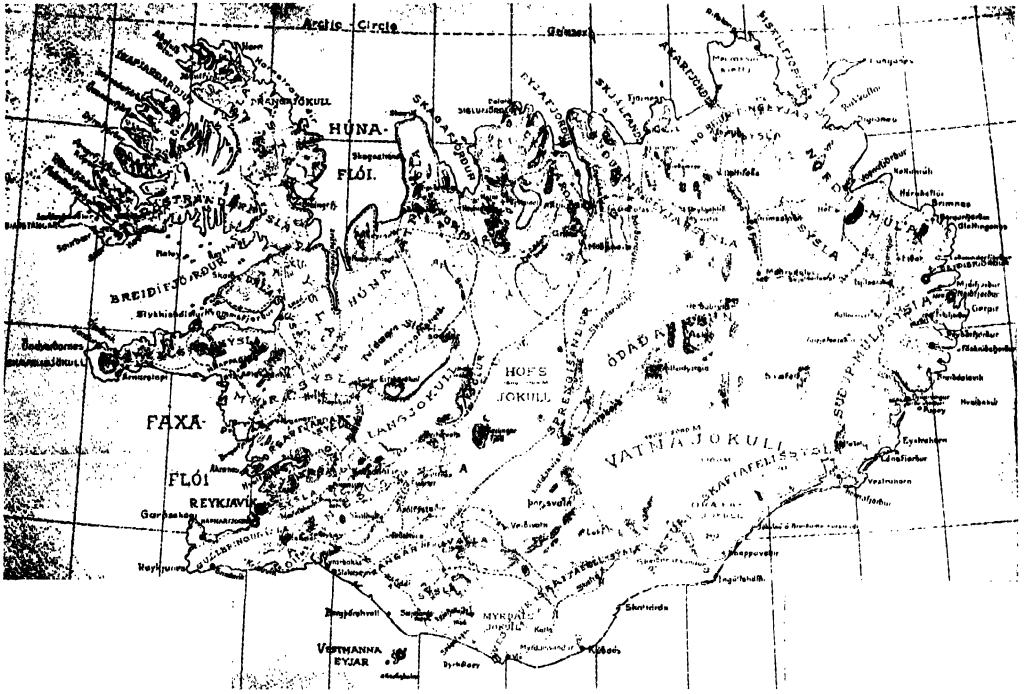
আইস্‌ল্যাণ্ডের মানচিত্র

সকল হিমবাহগুলি একত্রে ১৪০০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ভূখণ্ডের প্রায় ১৪ ভাগ অধিকার করিয়া আছে। হিমরেখা অর্থাৎ যে রেখার উর্দ্ধে তুষার আর গলে না দক্ষিণ হইতে উত্তরে ৬৫০ হইতে ১২৫০ মিটার উর্দ্ধে অবস্থিত। পর্ব্বতমালাগুলি দেশের স্থানে স্থানে জলবায়ুর প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণ বায়ু দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মেঘ ও বৃষ্টি বহন করিয়া আনে। মেরুবায়ু স্বভাবতই শুষ্ক। এই বিভিন্নমুখী বায়ুর সংঘর্ষণের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রতি বৎসর ২০০০ মিলিমিটার ও উত্তরাঞ্চলে ৩০০ হইতে ৪০০ মিলিমিটার বারিপাত হইয়া থাকে। ঝড়-ঝটিকা দেশে প্রায়ই লাগিয়া আছে। মোটের উপর দেশের আবহাওয়া বড়ই পরিবর্ত্তনশীল।

দেশের গাছপালার সংখ্যা অতি অপ্রচুর। বন বলিতে কিছু নাই বলিলেই চলে। বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম যাহারা এদেশে আসিয়াছিল, তখন ছোটখাট বেতুল বন কিছু ছিল। কিন্তু সেইগুলি মানুষের কুঠারের প্রকোপে ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। এখন গাছপালা মুক্ত দেশটি নিতান্ত নগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আইস্‌ল্যাণ্ডে পা দিলেই এই নগ্নতা চোখে পড়ে। পর্ব্বতগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ নগ্ন, স্থানে স্থানে শুধু শেওলা ও দর্ব্বা জাতীয় ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য পশুপক্ষীর সংখ্যাও দেশে অতি নগণ্য। ইহাদের মধ্যে ইঁদুরের সংখ্যাই বেশী। সমুদ্রকূলের মনুষ্যবসতি ও শহরগুলিতেই ইঁদুরের উৎপাত বেশী। দেশে এক সময় নেকড়ে বাঘের উপদ্রব ছিল। ইহারা গ্রামবাসীদের মেষ ধ্বংস করিয়া বহু ক্ষতি করিত। ফলে নেকড়ে বাঘ মানুষের প্রকোপে পড়িয়া প্রায় অস্তিত্বহীন হইয়াছে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে হইতে কতকগুলি বল্‌গা হরিণ আমদানী করা হইয়াছিল। ইহাদের অতি নগণ্য সংখ্যক এখন দেশের অভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। দেশে সাপ একেবারেই নাই। পাখীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্রিক পাখী। সকল জাতের পাখী শীত-কালে দেশে অবস্থান করে না। দেশে রেলগাড়ীর অবিদ্যমানে প্রসিদ্ধ আইস্‌ল্যাণ্ডীয় ঘোড়া আজও যান-বাহনের কাজ করিয়া থাকে। দেশে প্রতি দু-জন পিছু একটি করিয়া ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে করিয়াই দেশের

উপরে : থোরফাস্তাদির গামের একটি কৃষক-বাড়ী.

মধ্যে : স্নরে স্তুর্লাসনের বাসস্থান রেইখল্ট

নিম্নে : 'আলমান্নাজা' বা আইন-শৈল

অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থানসমূহ আমি দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। গৃহপালিত অন্যান্য পশুদের মধ্যে গাই ও মেষের সংখ্যা (১৯২৮ সালের গণনানুযায়ী) ৬২৭,০০০।

দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা অল্পাধিক ১,০৫,০০০, তন্মধ্যে ৫২,০০০ গ্রামবাসী। ৫৩০০০ ছোট শহর ও সমুদ্র উপকূলের বসতিতে বাস করে। প্রধান শহর রেয়েইকাভিকের জনসংখ্যা ২৬,৫০০।

পশুপালন ও মৎস্যশিকার অধিবাসীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অনেকে প্রতিপালিত হয় সত্য ; কিন্তু উপরোক্ত দুইটি দেশবাসীর ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান উৎস।

দেশের মানব সভ্যতার ইতিহাস অল্পাধিক সহস্র বৎসরের। কিন্তু সেই ইতিহাস ঘটনাবহুল। রোমাঞ্চকর আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাগা (Saga) সাহিত্যজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে ; সাগা সাহিত্যের মধ্যেই আইস্‌ল্যাণ্ডীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারার তথ্য নিহিত। এই সাগাই দেশকে ইহার সীমানার বাহিরে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছে। ভূতত্ত্বের দিক দিয়া দেশটি নিশ্চয়ই খুব কৌতূহলোদ্দীপক। ভৌগোলিক আইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, দেশটি এখনও দৃঢ় স্থিতি লাভ করে নাই, এখনও ইহা সবে গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র।

* * *

আমাদের জাহাজ পথে ফেরো দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগর থোর্সহাম্‌ন বন্দরে কয়েক ঘণ্টার জন্য থামিয়াছিল। নিতান্ত বন্ধুর সামুদ্রিক পথ অতিক্রম করিয়া ১৫ই এপ্রিল আইস্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী ও হিমবাহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই দিন বিকালবেলা জাহাজ ভ্যষ্ট্‌ম্যান দ্বীপের ঘাটে আসিয়া নোঙর করে। নিতান্ত অস্বস্তিকর ও অবিশ্রান্ত সমুদ্রগমনের ফলে শরীর ও মনের বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। সেদিন কাপড়চোপড় পরিয়া যখন বাহিরে আসি, তখন বোধ হইয়াছিল যে শরীরের সমস্ত শক্তি সমুদ্রের ঢেউ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তবু ডেকের উপর আসিয়া রেলিঙে ভর করিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল সামুদ্রিক পাখী, সংখ্যায় অগণিত, দ্বীপের প্রস্তরময় উপকূলের খোপেখাপে কিচ্‌কিচ্‌ করিতেছে। আর চোখে পড়িল অনেকগুলি "ট্রাউলার" (মৎস্য শিকারের জন্য এঞ্জিনে চালিত নৌকাবিশেষ)। শুনিলাম যে পরদিন সকালবেলাই জাহাজ রেয়েইকাভিকে পৌছিবে। দ্বীপের এই "ভ্যষ্ট্‌ম্যান্" নামটা আমার নিকট অদ্ভুত লাগিল ; কারণ ইহার অবস্থিতি আইস্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণে। প্রথম যিনি এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে অনেক 'কেল্টিক' অর্থাৎ আয়র্লণ্ডীয় দাস ছিল। ইহাদিগকে "ভ্যষ্ট্‌ম্যান" বলা হইত। এই দ্বীপটি অতি প্রাচীন আগ্নেয়গিরিসঞ্জাত একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডবিশেষ। এই প্রস্তরময় দ্বীপে পানীয় জল পাওয়া যায় না। সেই জন্য ইহার অধিবাসীদিগকে বৃষ্টির জল ধরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। ইহা প্রায় সমতল। কিন্তু আগ্নেয়গিরি সদৃশ উচ্চভূমি এখানে সেখানে সমতলতার একঘেয়ে ভাবকে বাধা দিয়াছে। সেখান হইতে জাহাজ যখন ছাড়িল তখন তিন-চার দিন পর কিছু খাইয়া শয্যা লইলাম।

জাহাজ কখন রেয়েইকাভিকে পৌছিয়াছিল জানি না। কিন্তু ১৬ই এপ্রিল রৌদ্রস্নাত শান্ত বসন্তপ্রাতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি জাহাজ রেয়েইকাভিকের বন্দরে বাঁধা।

থীংভাল্লীরে জলপূর্ণ ফাটির দৃশ্য

কেবিনের গোল জানালা দিয়া বন্দরের ওপারের যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহা অবর্ণনীয়।

অল্পক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত থোরবেরগুর থোডার্সন্ আসিয়া হাজির। তখন ভোর সাড়ে-চারিটার মতন হইবে। তিনি আমাকে আইস্‌ল্যাণ্ডে স্বাগতম্ সম্বোধন করিলেন। জাহাজ ছাড়িয়া পারে উঠিয়াই মনে হইল যে, এক নূতন রাজ্যে আসিয়াছি। চারি দিক বসন্তপ্রাতের প্রখর রৌদ্রের ছটায় উজ্জ্বল; যত দূর দৃষ্টি চলে গাছপালার কোন চিহ্ন নাই। বন্দরের অপর পার্শ্বে একটি পাহাড় সমুদ্রের গাঢ় নীল শান্ত জল হইতে যেন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। কি তার রং! গলিত তাম্রের রং বিশিষ্ট লাভাজাত পাহাড়ের গায়ে রৌদ্রচ্ছটা বিস্ফুরিত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের শিখরদেশের স্থানে স্থানে শুভ্র বরফের শ্বেত উষ্ণীষ সূর্য্যের কিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাওয়া যায় না। চোখ ঝলসাইয়া যায়। সাদা খণ্ড খণ্ড মেঘ দূরের পর্ব্বত শিখরের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে।

শহর তখনও ঘুমন্ত। পথে লোকজনের চলাচল নাই। বন্দরের মালগুদাম ছাড়াইয়া দুইটা রাস্তা পার হইয়াই আমরা একটা পার্কে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার এক দিকে "হোটেল আইস্‌ল্যাণ্ড" অন্য দিকে "থীং"। ইহার এক পাশে একটা গির্জ্জা, অন্য পাশে একটা হোটেল, নাম "স্যেলব্রেইড্" (Skjaldbreid)। পার্কের অন্য দিকে রেডিও-ষ্টেশন। শ্রীযুক্ত থোরবেরগুর দ্বিতীয় হোটেলটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি ও সঙ্গের সুইডিস্ বন্ধুদ্বয় সেখানেই উঠিলাম। দোতালায় আমাদের স্থান হইল।

ভোরে আমাদের কিছু করিবার ছিল না। দোতালার জানালা দিয়া চোখে পড়িল বন্দরের পরপারের পাহাড়-গুলির দৃশ্য। আমার ইচ্ছা হইল সেখান হইতে বেড়াইয়া আসি। কফির অর্ডার দিলাম। শ্রীযুক্ত থোরবেরগুরকেও সঙ্গে বসিতে অনুরোধ করিলাম। কফি পানের সময় আমি বন্দরের পরপারের পাহাড়-দেশটা ঘুরিয়া আসিবার কল্পনা জানাইলাম। শ্রীযুক্ত থোরবেরগুর বলিলেন যে সেখানে গেলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরা যাইবে না। শুনিয়া আমি ত অবাক্; আমি অনুমান করিয়াছিলাম ইহা দুই-তিন মাইলের রাস্তা হইবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত থোরবেরগুর বলিলেন যে ইহা শহর হইতে বার মাইল দূরে। আমি ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি জানাইলেন যে আইস্‌ল্যাণ্ডের স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে সকল বিদেশীরই প্রথম প্রথম এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়া থাকে, তরুলতাহীন উত্তর-আট্‌লান্টিকে অবস্থিত এই নগ্ন দ্বীপের আবহাওয়া পরিষ্কার দিনে এত স্বচ্ছ যে বহুদূরের জিনিসও অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রতিভাত হয়; আমি সেই দিন হইতেই সতর্ক হইলাম।
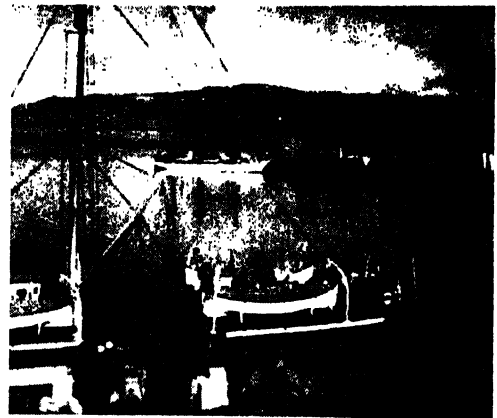
রেইকাভিক বন্দরের একটি দৃশ্য

দুপর বেলা আমরা লাঞ্চ খাইয়া সহর দেখিতে যাইব এমন সময় শ্রীযুত থোরবেরগুর আর এক জন ভদ্রলোককে সঙ্গে

ঐতিহাসিক নিয়াল সাগার কেন্দ্র আইনবিশারদ নিয়ালের বাসগৃহ

লইয়া আসিলেন। তাঁহার নাম ডাঃ সরেনসেন; বহু বৎসর আমেরিকায় ছিলেন; সেখানে তিনি বহু ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সৌজন্যসহকারে তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইতে আমন্ত্রণ করিলেন।

আইস্‌ল্যাণ্ডে দেড়মাসকাল কাটাইয়াছিলাম। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক সময় দেশের অভ্যন্তরে ও বাকী সময়টা প্রধান সহরেই কাটিয়াছিল। অবশ্য মোটরে করিয়া প্রধান সহর হইতে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরের বহু দর্শনীয় স্থান ও জনপদ ঘুরিয়া দেখিয়াছি। শ্রীযুত থোরবেরগুর ও ডাঃ সরেনসেন আমাকে আইস্‌ল্যাণ্ড দেখিবার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রধান সহরের গণ্যমান্য বহু লোকের সঙ্গে পরিচয়ও করাইয়া দেন। অনেকের বাড়ীতে একাধিক বার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল।

আইস্‌ল্যাণ্ডের তখনকার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রীযুক্ত থোরবেরগুরের বন্ধু। সেই সূত্রে গবর্ণমেণ্ট-গৃহে মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। তিনি তাঁর মোটরকার ব্যবহারে আমাকে নিমন্ত্রিত করেন। তাঁহারই গাড়ীতে করিয়া আইস্‌ল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক স্নরে স্তুর্লাসনের বাসস্থান রেইখল্ট দেখিয়া আসি।

অমর "স্নরির" (স্নরে স্তুর্লাসনকে সময় সময় স্নরি বলা হয়) স্মৃতি-রক্ষার্থ রেইখল্টে একটি উচ্চ গণবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই রেইখল্টে আপন বাসভবনে বিশ্বাসঘাতকের হস্তে স্নরি প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেইখানে একটা গোলাকৃতি ছোট জলাশয় আছে। উষ্ণ প্রস্রবণের জলধারায় ইহা পূর্ণ হয়। স্নরি ইহাতে স্নান করিতেন। ইতিহাসে আছে যে, এই জলাশয়ের মৃদু উষ্ণ জলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে তিনি বন্ধুজনের সঙ্গে রাজনীতি ও দর্শনের আলোচনা করিতেন।

প্রধান সহরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষা সুইডেনে লইয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যে কতকগুলি গ্রাম্য বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালের ছুটি সাড়ে তিন মাস, তখন ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

সম্প্রতি প্রধান সহরে আধুনিক চালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। ডিরেক্টর মহোদয়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম ইহা পরিদর্শন করি। পরে দুই-তিন বার সেখানে গিয়াছি। সহরে পড়ুয়া বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয় দুই বেলা করিয়া বসে। বিদ্যালয়ে হাতের কাজের দিকে খুব জোর

'থীংভাল্লীর'— এখানে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আইস্‌ল্যাণ্ডের পার্লেমেণ্ট বা গণপ্রতিনিধি-সভার প্রতিষ্ঠা হয়

দেওয়া হয়। আমি দুই দিন ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শিক্ষার্থীদিগকে স্বদেশীয় বিশিষ্ট স্থানসমূহের দৃশ্য দেখাইয়াছিলাম। মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটি হয়। সেই উপলক্ষে সেখানে সহরের সকল বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেদিন ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে তাহাদের কাজের নমুনা উপহার দিয়াছিল।

পূর্ব্বে আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীরা কোপেনহেগেন বিশ্ব-

১৭৬৫ সালে আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রধান শহর রেকাভিকের দৃশ্য

বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লইবার জন্য ডেনমার্ক যাইতেন। কিন্তু ১৯১১ সালে প্রধান সহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভাষা, দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এই তিনটি শাখা ইহাতে আছে। মেডিকেল কলেজটিও এক দিন দেখিতে গিয়াছিলাম; ইহার অধ্যক্ষ অতি যত্নের সহিত ইহার সকল ব্যবস্থা ঘুরাইয়া দেখান। আইস্‌ল্যাণ্ডের জনসংখ্যার ন্যূনতা বিবেচনা করিলে উচ্চশিক্ষার এই ব্যবস্থা দেশবাসীর উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শ্রীযুত থোরডারসন আইস্‌ল্যাণ্ডের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্। তিনি শান্তিবাদী। আধুনিক আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা করেন। তাঁহার নিকট হইতে খবর পাই আইস্‌ল্যাণ্ডের জনসংখ্যার ন্যূনতা বশতঃ কোন সাহিত্যিকেরই নিজের রচনার উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করা চলে না। সেই জন্য স্টেট সাহিত্যিকদের জীবিকার সংস্থান করেন। বড় বড় শিল্পীদের বেলায়ও তাই।

সহরে একটা অতি আধুনিক হাসপাতালও স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান পরিচালিকা এক দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইয়াছিলেন।

ডাঃ সরেনসেন এক জন এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বহু বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তাঁহার বাড়ী, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছান। তাঁহার পরিবারে—তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাদের একটি মাত্র আঠার বিশ বছরের কন্যা। এঞ্জিনিয়ারটি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত। তাঁহার মতে মানবসমাজকে স্বার্থপরতা, হিংসা ও বর্ব্বরতার স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইতে হইলে বুদ্ধপ্রচারিত অহিংসনীতি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় ইতিহাস তিনি পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও অন্তর্জাতীয় ব্যাপারে অশোকের আদর্শ স্থাপন করিতে পারিলে মানবজাতির কল্যাণের পথ মুক্ত হইতে পারে। আমি বুদ্ধের দেশের মানুষ—ইহাই তাঁহার নিকট আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এমন সুন্দর কথা ইউরোপে কোথাও শুনি নাই। এই সুদূর মেরুপ্রান্তবর্ত্তী দ্বীপের এক জন লোক এরূপ বলিতে পারে ইহা অতি বড় কথা। তাঁহারা প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন, আর তাঁহার বাড়ীতে আমার ও ডাঃ সরেনসেনের আড্ডা বসিত। ডাঃ সরেনসেন গীতার অনুবাদ আইস্‌ল্যাণ্ডীয় ভাষায় করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বহু স্থান পরিদর্শনে লইয়া গিয়াছেন।

এঞ্জিনিয়ারের বাড়ীটি শহরের প্রায় বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সেখান হইতে বাহিরের দৃশ্য অবাধ দৃষ্টিতে দেখা যায়। বাড়ীর নিকটে একটি টিলা আছে, আমরা মাঝে মাঝে রাত্রি ১০টার পর ইহার উপর

সারি বাঁধা ঘোড়ায় করিয়া ফসল ঘরে লইয়া যাইবার দৃশ্য

যাইতাম—সূর্য্যাস্ত দেখিবার উদ্দেশ্যে, সে আর এক দৃশ্য—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ পাহাড় পর্ব্বতের ও হিমবাহের অংশ বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। ইহার গভীর প্রভাবের ফলে সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষালোকে বাড়ী ফিরিবার সময় মনে হইত না যে লোকালয়ে আছি।

আমার সঙ্গীতপ্রীতির কথা জানিয়া এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার এক পরিচিতের বাড়ীতে লইয়া যান। সেই পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁহাদের বারটি সন্তান। আইস্‌ল্যাণ্ডের অন্যত্র এত বড় পরিবার আমার চোখে কমই পড়িয়াছে। তাঁহারা এক সময় আমেরিকায় ছিলেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমাকে পাইয়া খুব খুশী। আমি তাঁহাদের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বাংলা গান গাহিয়া শুনাইলাম। তাঁহারা আমাকে প্রাচীন আইস্‌ল্যাণ্ডীয় গণসঙ্গীত শুনাইলেন। ইউরোপের আধুনিক সঙ্গীতের ধারা আইস্‌ল্যাণ্ডে পূর্ণভাবেই পৌছিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার জাগৃতির লক্ষণ এখন প্রকাশ পাইতেছে। এই সঙ্গীত আমার কানে অতি করুণ ও বিলাপসূচক বলিয়া মনে হইল।

এই এঞ্জিনিয়ার আমাকে শহরের প্রধান ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শেষোক্ত জন আমাকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে করিয়া শহরের বাহিরে ইলেকট্রিক প্ল্যাণ্টগুলি দেখাইয়া আনিলেন। ইহাদের একটি পুরাতন, এইটা শহরে আলো দান করে, দ্বিতীয়টি

মৎস্য-শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মরতা নারীরা মৎস্য লবণাক্ত করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে

আধুনিক রেয়িকাভিক শহর

তখন সবেমাত্র সম্পূর্ণ হওয়ার পথে, ইহা পঁয়ত্রিশ হাজার অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। সোগ্ নামক নদীর স্রোতকে এই কাজে লাগান হইয়াছে।

এক দিন তিনি শহরের বাহিরে গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র ও মৎস্য-চাষের কেন্দ্র দেখাইতে লইয়া গেলেন। মৎস্য-চাষ ও মাছের ব্যবসা আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের বাজারে মাছের ব্যবসা বিশেষ লাভজনক হইবার কথা। বিগত যুদ্ধের সময় ২৩৫০০ টন মাছ বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল। গত বিশ বৎসর যাবত দেশে মৎস্যতৈল উৎপাদনের চেষ্টা চলিয়াছে। ১৯২০ সালে ৯০০ শত টন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে ইহার বৎসরিক উৎপন্ন হার ৬০০০ টনে পৌছিয়াছে। মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ১৯২৮ সালে ৭১ মিলিয়ন ক্রাউন্ দেশে আসিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে মৎস্য-ব্যবসা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য মাছের উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা খুবই। মৎস্য-চাষের কেন্দ্রে কোটি কোটি পোনা সৃষ্টি করিয়া সময়মত নদীর জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই পোনা চলিতে চলিতে ক্রমশঃ বড় হয় এবং নদীর জল ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া যায় ও পৃথিবীর বহু সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া বড় হইয়া আবার স্বদেশের নদীতে উজানে চলে। শুনিয়াছি মাছের গায়ে সময় সময় বিশেষ চিহ্ন দিয়া ইহাদিগকে নদীতে ছাড়া হইয়াছে এবং সেই মাছ, এমন কি, অষ্ট্রেলিয়ার জলে ধরা

পড়িয়াছে। মৎস্যরা কোন্ পথে সমুদ্রের কিরূপ জলস্রোত ধরিয়া বিদেশের জলে ভ্রমণ করে ও ফিরিয়া দেশের নদীতে প্রবেশ করে সেই সম্বন্ধে অনেক কার্য্যকরী গবেষণা হইয়াছে।

আদর্শ কৃষি ফার্ম্মটিতে গ্রাস হাউসের মধ্যে টমেটো, সালাদ, কপি ও নানাজাতীয় মরসুমী ফুল ও ফলের চাষের পরীক্ষা হয়। আইস্‌ল্যাণ্ডের মত গাছগাছরাহীন দেশে, এক জায়গায় এত শাকসব্জী ও ফলফুল সত্যই নয়নরঞ্জক। উষ্ণ প্রস্রবণের জল ব্যবহার করিয়া চাষের উৎকর্ষ বাড়িয়াছে। প্রস্রবণের উষ্ণজলের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে এক দিন হয়ত দেশের কৃষির অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

আইস্‌ল্যাণ্ডে কুষ্ঠ রোগ এক সময় বিস্তারলাভ করিয়াছিল, কুষ্ঠ রোগীদিগকে আলাদা করিয়া চিকিৎসার জন্য একটি কুষ্ঠাশ্রম শহরের বাহিরে সমুদ্রের তীরে তৈরি করা হইয়াছে। আমি যখন উহা দেখিতে যাই তখন সেখানে মোট ১৯ জন রোগী ছিল। এক জন মহিলা এই আশ্রমের পরিচালনা করেন। তিনি নগর-পরিষদের একজন সদস্য, নানা সামাজিক ও শিক্ষা-নৈতিক সংস্কার-কার্য্যের উদ্যোগী কর্ম্মী, তিনি এক দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ঈরিক্‌সদট্টার (Eriksdotter); ইহার অর্থ ঈরিক তনয়া (ঈরিক নামক ব্যক্তির কন্যা)। আইস্‌ল্যাণ্ডের কি পুরুষ কি মেয়েদের প্রাচীন নামকরণ-পদ্ধতিই এইরূপ। পুরুষানুক্রমে এই প্রথায় পুরুষ নারী নিজেদের পৈতৃক নামের স্মৃতি লইয়া চলে। শ্রীযুক্তা ঈরিক্‌সদট্টার রামায়ণ মহাভারত তাঁহাদের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সাবিত্রীর উপাখ্যান তাঁহার অতি প্রিয়। তাঁহার মতে প্রাচীন ভারতের হিন্দু নারীরা মেয়েদের যত উচ্চ ও মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—তেমনটি আর কোন জাতি করিতে পারে নাই। আইস্‌ল্যাণ্ডের অনেকে আমাকে তাঁহাদের দেশে আরও কিছুকাল কাটাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—ঈরিক্‌সদট্টার তাঁহাদের একজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেই আতিথেয়তা সময়াভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হই।

"সাগা" যুগ হইতেই আইস্‌ল্যাণ্ডে সাহিত্য-চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে, সাহিত্যেই দেশের প্রাচীন যুগের জীবনধারা গভীর ভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মুদ্রণ যন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে "সাগা" যুগের সাহিত্যিকেরা কিরূপ যত্ন ও অতিবিন্যস্ত হস্তাক্ষরে রচনা লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহার পরিচয় প্রধান শহরের জাতীয় পুস্তকালয়ে পুরাতন পুঁথি ও ইহাদের প্রতিছাপ দেখিলেই বুঝা যায়। লাইব্রেরির অধ্যক্ষ আমাদিগকে "সাগা" সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও অধুনাকৃত ইহাদের প্রতিলিপি দেখাইলেন। তদ্ভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এমন বিশ্বস্তভাবে পারিবারিক ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে। আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি পরিবার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনীর স্মৃতি এখনও বহন করিয়া চলে। ইহা আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। আমি যখন সেখানে যাই তখন জাতীয় পুস্তকালয়ের সন্নিকটে জাতীয় নাট্যশালার নূতন গৃহ সবেমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রধান শহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ী আজকাল ফেরো-কন্‌ক্রিটে তৈরি হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন কুটীর দুই-চারিটী এখনও এখানে সেখানে দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই কাঠের ঘর; করোগেটেড্ টিনের বেড়া। দুই শত বৎসর পূর্ব্বের শহরের দৃশ্যের সঙ্গে আধুনিক শহরের পার্থক্য বিপুল। আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রথম ও প্রধান জনপদ প্রধান শহর রেয়েইকাভিক্। ইহার মধ্যে ও আশেপাশে বহু উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণ আছে। উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে স্থানে স্থানে স্নানাগারে পরিণত করা হইয়াছে। শহরের বাহিরে অবস্থিত একটি বৃহৎ শীতল প্রস্রবণ হইতে শহরের পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে ও একটি উষ্ণ প্রস্রবণের জলস্রোত ধরিয়া শহরের ঘরবাড়ী গরম রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথম যাঁহারা এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বহু উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ধূম দেখিতে পাইয়া ইহার নাম রেয়েইকাভিক্ রাখিয়াছিলেন এবং সেই নামেই আজও প্রধান শহর অভিহিত। রেয়েইক্ শব্দের অর্থ ধূম আর ভিক্ শব্দের অর্থ উপদ্বীপ। আইস্‌ল্যাণ্ডীয়দের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ—সুইডিস্, নরওয়েজিয়ান্ ও ডেনিশ্‌দের ভাষায়ও এই উভয় শব্দ আজও ব্যবহৃত হইতেছে—যদিও ইহাদের বানান ও উচ্চারণ ঠিক অনুরূপ নহে। বর্ত্তমান শহরটি খুব বর্দ্ধিষ্ণু। ইহার জনসংখ্যা ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচ হাজার মাত্র ছিল। আর বর্ত্তমানে অধিবাসী-সংখ্যা ২৬,৫০০ জন।

রেয়েইকাভিকে বিশেষ দর্শনীয় সেখানকার প্রসিদ্ধ শিল্পী এইনার জনসন (Einar Jonsson) মহাশয়ের কলাভবন। ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পী আলবার্ট থোরবাল্‌ড্‌সনের (Albert Thorvaldsson) পিতা আইস্‌ল্যাণ্ডীয় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত জনসন আজ আইস্‌ল্যাণ্ডের ভাস্করশিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁহার কলাশালায় ঢুকিয়া এমন একটা ভাব-প্রবাহে পড়িয়াছিলাম যে বহুক্ষণ আমাকে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আইস্‌ল্যাণ্ডীয় প্রকৃতির প্রভাব তাঁহার কলাসৃষ্টিতে অতিশয় তীব্র। এক দিকে আইস্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য প্রকৃতি, অন্য দিকে দেশের রোমাঞ্চকর সাগা ও ইতিহাস, তাঁহার সৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তিনি মূলতঃ ভাস্করশিল্পী। কিন্তু তুলিতে রঙের কাজও করিয়া থাকেন।

আইস্‌ল্যাণ্ডের বিশেষ দর্শনীয় স্থান "থীংভাল্লীর"। বস্তুতঃ ইহা সমগ্র পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য স্থানসমূহের মধ্যে একটি। থীং শব্দের প্রচলিত অর্থ গণসম্মিলনী, ভাল্লীর অর্থ উপত্যকা; নির্জ্জন আইস্‌ল্যাণ্ডে ৮৭৪ সাল হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল জনসমাগম হইতে থাকে; ৯৩০ সালে দলপতি প্রধানেরা এক রাষ্ট্র গড়িবার উদ্দেশ্যে গণসম্মিলনীর অর্থাৎ থীঙের প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের এই শ্রেষ্ঠতম পর্ব্বত-উপত্যকা গণসম্মিলনীর জন্য নির্ব্বাচিত হয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি বিরাট্ আগ্নেয়গিরি অবিশ্রাম গলিত লাভা উদ্গীরণ করিয়া একটি লাভা-পর্ব্বতের সৃষ্টি করে। তার পর কখন—সে ইতিহাস মানুষ জানে না, এই লাভা-পর্ব্বত প্রবল ভূকম্পনের ফলে প্রায় এক শত ফুট নামিয়া বিরাট্ উপত্যকার সৃষ্টি করে, আর ইহার চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া যায় দুইটি বিরাট্ প্রস্তর-প্রাচীর। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই প্রাচীর দুইটির নাম আলমান্নাজা ও হ্রাফ্‌নাজা। প্রতি বৎসর গণসম্মিলনী উপলক্ষে আইনজ্ঞ প্রধানেরা এই প্রাচীরের উপর সপরিবারে ও সদলবলে তাঁবু নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতেন। প্রথমোক্ত প্রাচীরের উচ্চতম স্থান হইতে সভাপতি বিচারের ফলাফল ও নূতন আইন ঘোষণা করিতেন, সে জন্য ইহাকে "লোগ্‌বের্গ" অর্থাৎ 'আইনশৈল' বলা হয়। বৃদ্ধদের নিকট হইতে সাগা শুনিবার, ঘোড়ার যুদ্ধ দেখিবার, বিবদমান প্রতিযোগীদের বাহুবলের কৌশল ও আইনের মারপ্যাচ শুনিবার ও উপভোগ করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্রাধিক দর্শকের ভীড় হইত এই থীংভাল্লীরে;

আমার থীংভাল্লীর দর্শনের তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে সেখানে বিশেষ সমারোহের সহিত আইস্‌ল্যাণ্ডের থীঙের 'সহস্র' বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

থীংভাল্লীর উপত্যকতার মধ্য দিয়া একটি নদী থীং-ভাল্লীর হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে। থীংভাল্লীর বহু চ্যুতি-সমন্বিত একটি উপত্যকা। চ্যুতিগুলিও গভীর ও স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। কি বিরাট্ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় থীংভাল্লীরের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইহাকে না দেখিলে বুঝা যায় না।

বর্ত্তমানে এই আলথীং বা পার্লেমেণ্টেই আইস্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে।

আলোচনা

"মণিপুরী নৃত্য ও রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে "রবীন্দ্রনাথ ও মণিপুরী নৃত্য" শীর্ষক নিবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার রচনাংশটি স্থান পাইয়াছে। আমার অনবধানতাবশতঃ উক্ত রচনাংশে কবিগুরুর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কাল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে অত্যন্ত [illegible] ব্যস্ততার মধ্যে এরূপ) ঘটিয়াছে। সম্প্রতি পুরাতন কাগজ-পত্র ঘাঁটিয়া দেখি, আমার ডায়েরীতে কবির সঙ্গে সাক্ষাতের তারিখ লেখা আছে, ১৭ই জুন, ১৯৩৬। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৩৪২ সালের শেষের দিকে নয়, ১৩৪৩ সালের গোড়ার দিকে কবির সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা টাউন হলে 'কম্যুনাল এওয়ার্ডে'র প্রতিবাদ-সভা হয়, তাহা ১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ ভাগেই হইয়াছিল। কবি অসুস্থ শরীর লইয়াও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবির ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু।

দোস্ত

শ্রীকালীপদ ঘটক

তারাকুমার যখন বাড়ী থেকে বেরুলো, পশ্চিম দিকে সূর্য্য তখন অনেকখানি ঢলে পড়েছে। গাঁয়ের মেয়েরা দল বেঁধে কলসী-কাঁখে জলকে যাবার আয়োজন করছে। ঝিঙে ফুলের কুঁড়ির ডগায় একটু একটু রং ধরেছে।

তারাকুমারকে এই অবেলায় বাড়ী থেকে বেরুতেই হ'ল। থাকবার উপায় নাই, সকাল থেকে আপিস আছে; তখন আট-ন ক্রোশ পথ ভেঙে যেমন ক'রে হোক সন্ধ্যাতক তাকে কর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌছতেই হবে।

অজয় নদীর ধার পর্য্যন্ত ক্রোশ-চারেক গরু-গাড়ীর পথ। নদী থেকে উঠে কিন্তু জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা—বরাবর শহর পর্য্যন্ত, কোন রকমে নদীটা একবার পার হ'তে পারলেই নিশ্চিন্ত।

তারাকুমার তাড়াতাড়ি বাইসিকেলে চড়ে বসলো, বেলা ক্রমশঃ পড়ে আসছে। রবিবারের ছুটিটুকু সম্বল করেই মাঝে মাঝে তাকে ছুটে আসতে হয় শহর থেকে সুদূর এই পল্লীগ্রামে। দেশের মাটির মোহ, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা, পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ-সাহচর্য্যের আকর্ষণ প্রবাসী তারাকুমারকে এক এক সময় চঞ্চল ক'রে তোলে। মাঝে মাঝে না এসে তার উপায় নেই।

তারাকুমার রেল-আপিসের এক জন পদস্থ কেরানী। ধরা-বাঁধা আট ঘণ্টা ডিউটি, রাত জাগার হাঙ্গাম নেই, মাসান্তে যে টাকাটা পকেটে আসে আজকালকার বাজারে তার মূল্য নেহাৎ কম নয়। কিন্তু একঘেয়ে মেস-জীবন তারাকুমারের ভাল লাগে না, এক একবার ইচ্ছে করে দেশ থেকে বৌকে এনে ছোট্ট একটি সংসার পেতে বসতে—আর পাঁচ জন সমকর্ম্মীদের মত। কিন্তু একাধিক কারণে একাধিক বার সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে। কর্ত্তা-গৃহিণী বধূমাতাকে বিদেশে পাঠাতে একান্ত নারাজ। কর্ত্তা বলেন,—পাড়াগাঁয়ের মেয়েছেলেদের শহরের আওতায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা কোন কাজের কথাই নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য গৃহিণী বলেন,—বৌমা গেলে ঘর-সংসার চলে কেমন ক'রে।

এ-বিষয়ে বধূমাতার স্বতন্ত্র কোন মত নেই, তারাকুমারের দৃষ্টান্তে পূজনীয়দের সর্ব্বদাই সে মান্য ক'রে চলে। শ্বশুরবাড়ী কাজের ভিড়ে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে ডুবে থাকতে হয়, বাড়ী ছেড়ে বাইরে বেরোবার সুযোগ এবং অবসর তার কোথায়? তারাকুমারকে বাধ্য হয়ে বাড়ী যাতায়াতের কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। মাঝে মাঝে বাইসিকেলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া কতকটা তার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। শনিবার দিন সে বাড়ী আসে, সোমবার আবার ফিরে গিয়ে যেমন ক'রে হোক আপিসে তাকে হাজিরা দিতে হয়।

কালবৈশাখীর দিন। বায়ুকোণে হঠাৎ ঝড়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছোট একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তারাকুমারের বাইসিকেল তখন যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে। আরও মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে পারলেই অজয় নদীর ঘাট। কাছাকাছি একটা ছোট-মত গ্রামও আছে, দরকার হ'লে কিছুক্ষণের জন্যে মাথা গুঁজবার একটা আশ্রয়ও পাওয়া যেতে পারে। তারাকুমার জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে।

দেখতে দেখতে সারা বন তোলপাড় ক'রে শন্ শন্ শব্দে ঝড় এসে পড়লো—আকাশপ্রমাণ রাঙা ধুলো আর শুকনো পাতা উড়িয়ে। তারাকুমার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, চোখে মুখে রীতিমত ধুলো ঢুকতে আরম্ভ করেছে। একটা কালো পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আরোহীসমেত সাইকেল-খানা হঠাৎ পথের এক ধারে ছট্‌কে পড়লো। তারাকুমার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে কোন রকমে জঙ্গলটা পার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলো গিয়ে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে সাঁওতালদের একটা চালাঘরে। প্রচণ্ড ঝড়ের দোলায় ভাঙা চালা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, চারিদিক ঘোর ক'রে মুষলধারে তখন বৃষ্টি নেমে এসেছে।

তারাকুমার চিন্তিত হয়ে পড়লো। সময়মত কর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌছতে না পারলে চাকরি সম্বন্ধে সমূহ আশঙ্কার কথা। আজকাল পাঁচ মিনিট কারও আপিস যেতে দেরি হ'লে উপরওয়ালার কাছে দশ পৃষ্ঠা ধরে তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়; বড়বাবু লোকটিও বেশ সুবিধের নয়। এদিকে

গ্রেড-প্রমোশনের দিনও ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে, এ অবস্থায় বিনা-নোটিশে আপিস কামাই কোন রকমেই চলতে পারে না।

ঝড়বৃষ্টি থামবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, ক্রমশঃ বরং বেড়ে চলেছে। তারাকুমার সেই ভাঙা চালায় দড়ির একটা খাটিয়ার উপর ভাবতে ভাবতে ব'সে পড়লো। ভগবান্ না করুন দুর্য্যোগ যদি আজ না থামে তা হ'লে এই ফাঁকার মধ্যে ভাঙা চালায় পড়ে পড়ে সারাটা রাত্রি কাটানোই বা কেমন ক'রে সম্ভব। জঙ্গলপ্রান্তে বন্য বরাহযুথের অবাধ বিচরণের কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। দুপুর রাতে এক আধটা ভাল্লুক-টাল্লুক ছট্‌কে এসে পথশ্রান্ত নিদ্রিত পথিকের শিয়রে দাঁড়িয়ে কোঁ কোঁ শব্দে যে তার শান্তিভঙ্গের প্রয়াস পাবে না, তাই বা কে জোর ক'রে বলতে পারে!

তারাকুমার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। ভাঙা চালার অধিকারী বৃদ্ধ টুয়াই মাঝি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারাকুমারকে জিজ্ঞাসা করলে,—তুর কাছে চুটি আছে বাবু?

তারাকুমার জবাব দিলে—চুটি ত আছে মাঝি, কিন্তু 'সিঙেল' দরকার হবে; বৃষ্টির জলে দেশলাই ভিজে চুবরু হয়ে গেছে।

টুয়াই মাঝি একটা পোড়া কাঠে ফুঁ দিতে দিতে তারাকুমারের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারাকুমার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা মাঝি, বৃষ্টি কি আজ আর থামবে না? কি রকম লাগছে বল্ দেখি?

টুয়াই মাঝি আকাশের চারি দিক বেশ লক্ষ্য ক'রে জবাব দিলে,—ম্যাগ কুথা পেলি বাবু! ইটাতো উপরি ম্যাগ, আর খানিককে উড়ুঁই নিয়ে চলে যাবেক। কুন্ দিক থেকে বায়ড় দিছে দেখছিস না?

তারাকুমার এতক্ষণ ধরে বসে বসে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, ঝড়বৃষ্টির ভাবগতিক সে বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য ক'রে আসছে; কিন্তু কোন্ দিক থেকে 'বায়ড়' দিলে কি ভাবে যে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে সে ধারণা তার বোধগম্যের বাইরে। তবু তারাকুমার খানিকটা ভরসা পেয়ে বললে,—বলিস্ কি মাঝি, আর খানিককে সব থেমে যাবে? কিন্তু মেঘের চেহারা দেখে ত তা মনে হয় না।

এমন সময় কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো। টুয়াই মাঝি সামনের প্রকাণ্ড একটা মহুল গাছের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো,— ঐ যাঃ, গাছটো মারা পড়ে গেল হে!

তারাকুমার বিস্মিত হয়ে বললে,—মহুল গাছে বাজ পড়লো নাকি?

টুয়াই মাঝি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে,—হাঁ ত পড়লো নাই, এতক্ষণ দেখলি কি তবে?

তারাকুমার ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো,—তাহলে?

তারাকুমারের কথার কোন জবাব না দিয়ে টুয়াই মাঝি বললে—লেঃ আর একট চুটে ধরা।

ব'সে ব'সে আরও কিছুক্ষণ ধূমপান চললো। শেষ পর্য্যন্ত টুয়াই মাঝির কথাই কিন্তু সত্য হ'ল, দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি একদম গেল থেমে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। তারাকুমার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, এখনো চেষ্টা করলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পূর্ব্বেই নদী পার হওয়া যেতে পারে। নদী থেকে উঠে বরাবর পাকা সড়ক, বাগডিহির 'বাস-ষ্ট্যাণ্ড' পর্য্যন্ত দিবিা এক রকম চলে যাওয়া যাবে। তার পর রাত দশটার শেষ বাস খানা চ'ড়ে বসতে পারলেই নিশ্চিন্ত, সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌছে দেবে একেবারে ঠিকানায়।

ভাববার অবকাশ নাই, অজয় নদীর পথ ধ'রে তারাকুমার তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল। তালডাঙ্গার ঘাটে গিয়ে যখন সে পৌছলো, চার দিক তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, হালকা মেঘে আকাশ তখনো ঢাকা। বিস্তীর্ণ অজয় বিরাট্ একটা শ্বেতকায় অজগরের মত স্তব্ধ উদাস শান্ত আলস্যে দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেহ বিছিয়ে নিঃশব্দে যেন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

তারাকুমার সাহস ক'রে নেমে পড়লো, শুকনো নদী পারাপারের বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। মাঝে অবশ্য খানিকটা স্রোত পার হয়ে যেতে হবে, কিন্তু সে জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই—জল আজকাল হাঁটুর নীচে।

তারাকুমার দু-হাত দিয়ে বাইসিকেল ঠেলতে ঠেলতে কোন রকমে ওপারে গিয়ে উঠলো, খানিকটা তখন রাত হয়েছে। পিচ-দেওয়া সড়কের উপর দাঁড়িয়ে তারাকুমার যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। বাগডিহির 'বাস ষ্ট্যাণ্ড' আর মাইল-ছয়েক পথ, রাস্তা বরাবর পাকা, রাত দশটার শেষ বাসখানা অনায়াসে ধরা যেতে পারে। ব্যস—আর চাই কি, সকালবেলা গোলঘরের ভোঁয়া বাজতে-না-বাজতে 'ইওর মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট্ সার্ভেণ্ট' তারাকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ অফিস-রুমে টেবিলের উপর মোটা মোটা খাতা-পত্র খুলে বসে পড়েছে—punctually at seven. সাহেব

হয়ত খুশীই হবে, অন্ততঃ বড়বাবুর চটবার আশঙ্কা আর থাকলো না।

তারাকুমার নিশ্চিন্ত হয়ে বাইসিকেলে চড়ে বসলো। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেল—কয়েক দিন আগে নাকি 'কলভিন ব্রীজে' সন্ধ্যার পর চোরে একটা লোককে ধরে ভয়ানক মারপিট করেছিল, টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে লোকটাকে নাকি শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় গুণ্ডারা ব্রীজের নীচে ফেলে দিয়ে যায়। বিস্তারিত খবর অবশ্য পাওয়া যায় নি, কিন্তু আব্ছা একটা গুজব শোনা গেছে ঐ রকমই।

'কলভিন ব্রীজ' অজয় নদীর ঘাট থেকে বাগডিহির পথে একটা ছোট নদীর উপর। কোন্ এক কোল-কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কলভিন উদ্যোগী হয়ে বহু অর্থ-ব্যয়ে এই ব্রীজ তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন বহু কাল আগে। এ পথ দিয়ে যাত্রী বা যানবাহন চলাচলের এখন আর কোন অসুবিধা নাই। ব্রীজের উপর দিয়ে রাস্তা বরাবর পাকা।

বহু কাল ধরে এই পথ দিয়ে লোক যাতায়াত করছে, কিন্তু চোরডাকাতের উপদ্রবের কথা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো শোনা যায় নি, শোনা গেল এই প্রথম। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোবার সময় আগে এ কথা ত কই মনে হয় নি!

তারাকুমার একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো, এক্ষুনি যে তাকে কলভিন ব্রীজ পার হয়ে যেতে হবে একলা এই ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে। সঙ্গে একটা লোক থাকলে তবু অনেকটা ভরসা পাওয়া যেত।

তারাকুমার মহা সমস্যায় পড়লো। এর চেয়ে যে টুয়াই মাঝির ভাঙ্গা চালায় প'ড়ে প'ড়ে বুনো শূয়ারের গুঁতো খাওয়া ঢের ভাল ছিল। ভাবলে—কাজ নেই আর এগিয়ে, কাছাকাছি একটা আড্ডা খুঁজে নেওয়া যাক, যা হয় কাল সকালবেলা হবে।

তারাকুমার ধীরে ধীরে ব্রেক কষে দিলে, কিন্তু এত রাত্রে আড্ডাই বা খুঁজে নেওয়া যায় কোথায়? আর একটুখানি এগিয়ে যেতে পারলেই যেন ভাল হ'ত।

তারাকুমার ইতস্ততঃ করতে লাগলো। সামনে হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজ শোনা গেল, কে যেন জুতো পায়ে মচ্ মচ্ শব্দে অন্ধকারে রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তারাকুমার সামনের দিকে টর্চ্চের আলো ফেলতেই লোকটা হঠাৎ চমকে উঠে পিছন ফিরে ব'লে উঠলো,—কে?

তারাকুমারও বাইসিকেল থেকে নেমে প'ড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলো,—কে?

লোকটা জবাব দিলে,—আজ্ঞে আমি আসগর, আপনি কোথায় যাবেন বাবু?

তারাকুমার সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে,—তোমাকে একলা দেখছি যে, সঙ্গে কোন লোক নেই?

আসগর মিয়া জবাব দিলে,—আজ্ঞে না।

তারাকুমার একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—এত রাত্রে একলা পথ চলতে ভয় করে না?

আসগর বললে,—আজ্ঞে না, ভয়ের কোন কারণ নেই, পথ-ঘাট সব চেনা আছে।

লোকটার বয়স বেশী নয়, বছর বিশ-বাইশ হবে।

লম্বাচওড়া দোহারা দুর্দ্দান্ত চেহারা, অথচ মুখে চোখে বেশ একটা কমনীয় ভাব, মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা তেল-চোঁয়ানো বাঁশের লাঠি।

আসগরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তারাকুমার জিজ্ঞাসা করলে,—কদ্দূর তোমায় যেতে হবে ভাই?

আসগর বললে,—আজ্ঞে বাগডিহি।

—এ্যাঁ বল কি স্যাঙ্গাত, বাগডিহি! সেইখানেই বাড়ী বুঝি?

—আজ্ঞে না, বাড়ী আমার এই শাওডাঙ্গা, বাগ-ডিহিতে শ্বশুরবাড়ী।

তারাকুমার একটু হেসে বললে,—বৌ বুঝি এখন সেখানে?

আসগর জবাব দিলে,—আজ্ঞে হেঁ, বাবু!

কথায় কথায় আসগরের সঙ্গে তারাকুমারের বেশ খানিকটা আলাপ জমে গেল।

আসগরের পরনে মিহি একখানা আধময়লা ধুতি, গায়ে একটা ধব্‌ধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, বুকের উপর জিঞ্জিরে বাঁধা চাঁদির কয়েকটা বোতাম আঁটা। পায়ে তার মোটা চামড়ার দেশী এক জোড়া পামশু, কাঁধে একখানা চৌঘুড়ে সৌখীন গামছা। চোখে তার ডগ্‌ডগে সুরমা, গলায় এক ছড়া পরিপাটি বেলফুলের গজ্‌রা, হাতে একটা কম দামী রিষ্টওয়াচও।

আসগর মিয়ার রুচি আছে বলতে হবে।

আসগরের মত এক জন সঙ্গী পেয়ে তারাকুমার বর্ত্তে গেল।

আসগর ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে

তারাকুমারও। আসগর আবার জিজ্ঞাসা করলে,—আপনি কোথায় যাবেন বাবু?

তারাকুমার বললে,—বাগডিহির বাস-ষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত। ভালই হ'ল, দু-বন্ধুতে একসঙ্গেই যাওয়া যাক, চল। তুমি সাইকেল চড়তে জান?

আসগর জবাব দিলে,—আজ্ঞে হেঁ বাবু, অব্যেস আছে।

তারাকুমার খুশী হয়ে বললে,—তবে আর কি, এসো এসো উঠে পড়া যাক। আমাকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ত?

আসগর জবাব দিলে,—আজ্ঞে তা খুব পারবো, টায়ার টিউব আপনার ঠিক আছে ত?

তারাকুমার সোৎসাহে বলে উঠলো,—গাড়ী খুব ভাল আছে, ব'সো ব'সো—উঠে ব'সো। দাও তোমার লাঠি গাছটা আমাকে, হ্যাণ্ডেলটা বেশ বাগিয়ে ধ'রে ব'সো দেখি।

আসগর বললে,—কোন চিন্তা নাই বাবু, নিশ্চিন্তে আপনি চড়ে বসুন, লাঠি আমার হাতেই থাকবে।

তারাকুমারকে পিছনের 'ক্যারিয়ারে' বসিয়ে নিয়ে আসগর মিয়া বিপুল উদ্যমে 'প্যাডেল' করতে সুরু ক'রে দিলে। ভালই হলো, তাকেও আর এতখানা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হ'ল না।

তারাকুমার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা দোস্ত, কলভিন ব্রীজে রাত-বেরাত কোন ভয়ের কারণ নাই ত?

আসগর সহজ ভাবে জবাব দিলে,—আগে ত কিছু ছিলো না বাবু, তবে আজকাল কিছু কিছু শুনছি।

তারাকুমার চমকে উঠলো, বললে—সেদিন নাকি চোরে একটা লোককে ধ'রে মারপিট করেছিল?

আসগর বললে,—আজ্ঞে হেঁ, দিন পাঁচ-ছয় আগে। লোকটাকে একদম জখিম ক'রে ফেলেছে বাবু, নগুীর হাসপাতালে পড়ে আছে।

কি সর্ব্বনাশ! গুজব তা'হলে মিথ্যে নয়। তারাকুমারের বুকের ভিতরটা ঢিব্‌ ঢিব্‌ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ তাকে চুপচাপ দেখে আসগর ব'লে উঠলো,—ভয় করছে নাকি বাবু?

তারাকুমার বললে,—ভয়? না—ভয়ের কোন কারণ দেখি না, তবে কিনা লোকটাকে একেবারে,—তোমার একটুও ভয় করছে না ত?

আসগর বললে,—আজ্ঞে না, ভয় করবো কোন্ শালাকে। এমন কার তাগদ যে ছামনে এসে দাঁড়ায়, ঘাড় মুচাড়ে ধানমাঠে পুঁতে দিব না! সে জন্যে আপনি ভাববেন না বাবু, আমাদেরকে দেখলে বাঘ পর্য্যন্ত ভয়ে পথ ছেড়ে দেবে, চোরডাকাত ত কোন্ ছার।

তবু ভাল, লোকটা যখন এতটা ভরসা দিচ্ছে তখন আর চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে!

তারাকুমারের বাইসিকেলখানা তারই এক অপরিচিত পথিক বন্ধুর পরিচালনায় অন্ধকারে ছুটে চললো।

আসগরের গলায় বেলফুলের গজরা, বাতাসে তার তীব্রগন্ধ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারাকুমার ভাবতে থাকে ফুলের কথা, আসগরের এই মালার কথা, আজ রাত্রে হয়ত এই মালাগাছি আসগরের গলা থেকে নেমে কোন্ এক লজ্জাভীরু তরুণীর কোমল কণ্ঠে আদরে সোহাগে জড়িয়ে ছড়িয়ে এলিয়ে পড়তে পারে,—তারাকুমারের মনে ভেসে উঠলো সেই সঙ্গে তারও কথা।

তারাকুমার জিজ্ঞাসা করলে,—দোস্তের ছেলেমেয়ে ক'টি?

আসগর বললে.—আজ্ঞে না, সে-সব কিছু হয় নি।

—বৌ তোমার কদ্দিন হ'ল বাপের বাড়ী গেছে?

—আজ্ঞে সে অনেক দিন, বছর-তিনেক হবে।

—তিন বচ্ছর! তোমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাও নি কেন?

আসগর একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, সে অনেক কথা বাবু, আমার বুড়ো দাদু বেঁচে থাকতে সেটি আর হচ্ছে না, মতিচ্ছন্ন কি আর সাধে বলি!

আসগর এমন ভাবে কথাগুলি বললে যে তার মধ্যে অবাঞ্ছিত একটা পারিবারিক ঘটনার অস্পষ্ট আভাসই শুধু ফুটে উঠলো না, সেই সঙ্গে ফুটে উঠলো আসগরের অন্তরের প্রচ্ছন্ন একটা বেদনার সুরও।

তারাকুমার একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, কিছু মনে ক'রো না দোস্ত, ব্যাপারটা খুলে বলতে আপত্তি আছে কি?

আসগর বললে,—আজ্ঞে না, আপত্তি আর কি, আর ব্যাপারও তেমন কিছু নয়; তবে কিনা আমার দাদুসায়েব লোকটা কিছু কড়া মেজাজের, কথায় কথায় যখন-তখন রুখে উঠে। সে-বার আমার শ্বশুরের সঙ্গে বেহক এমন ঝগড়া বাধিয়ে দিলে যে সে কথা আর কি বলব।

তারাকুমার বললে,—বটে, তাঁর অপরাধ?

—আজ্ঞে বলছি বাবু, ঝগড়ার আগে গোড়া শুনুন। আমার যখন বিয়ে হয় বয়েস আমার তখন পনের বচ্ছর, বৌয়ের বয়েস বছর আঠেক। বিয়ের বচ্ছর চার-পাঁচ পরে বৌটি একটু সিয়েনা হতেই বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হ'ল। ভাতজল করবার মানুষ ত একটা চাই বাবু, বাড়ীর মধ্যে লোকজন বলতে বুড়ো আর আমি।

—তোমার বাপ মা বুঝি গেছেন ?

—আজ্ঞে হেঁ বাবু, আমি তখন একদম ছেলেমানুষ। ইদিকে আমার বিয়ের সময় বৌকে আমাদের বাড়ী থেকে সোনার একপদ গয়না দেওয়া হয়েছিল, চার কুড়ি টাকা দাম। আপনার কাছে বলতে কোন বাধা নেই বাবু, বিয়ের পর সেই অলঙ্কারখানা আমার শ্বশুর কখন বেচে ফেলে। অভাবী মানুষ, ঠেকায় পড়লে যা হয় আর কি! বৌ আসতেই এই ব্যাপার নিয়ে আগুন লেগে গেল, বুড়ো বললে, ও বৌয়ের আমি মুখ দেখবো না, অলঙ্কার না গড়িয়ে দেওয়াতক বৌকে যদি বাড়ী ঢুকতে দি ত আমি হারাম। দিলে বাবু বাড়ী থেকে বের করে, আমার শ্বশুর কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে নিয়ে বিদেয় হয়ে গেল।

তারাকুমার একটু দুঃখিত হয়ে বললে,—তোমার দাদু-সাহেবকে নিজে তুমি একটু বুঝিয়ে নিতে পারলে না ?

আসগর জবাব দিলে,—আমার তাগদ কি বাবু, সে সময় বুড়োর ছামনে গিয়ে দাঁড়াই। ভয়ানক একরোখা মানুষ, বদ্‌রাগী যাকে বলতে হয়।

তারাকুমার বললে,—তার পর সেই অলঙ্কার আবার গড়িয়ে দেওয়া হ'ল ?

আসগর বললে,—আজ্ঞে না বাবু, আমার শ্বশুরের এখন অবস্থা কিছু খারাপ। সেই জন্যেই ত আজ তিন বচ্ছর ধরে মেয়ে পাঠাতে পারে নি। বুড়ো আবার আমাকে বলে,—ও বৌকে তুই তালাক দে, ফের আমি তোর সাদি দিব। দেখুন দেখি বাবু, যুগ্যিমন্ত বৌ থাকতে ফের বুঝি কেউ সাদি করে!

তারাকুমার সায় দিয়ে বললে,—তাও কি কখনো হয়। হওয়া অন্ততঃ উচিত নয়।

আসগর বলে চললো,—শ্বশুরবাড়ী যাবার আমার হুকুম নেই বাবু। বুড়ো বলে, ও বৌয়ের তুই মুখ দেখতে পাবি না। বুড়োর কথা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমি রাখতে পারি নি,—মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করি। রাতারাতি যাই, আবার রাতারাতি ফিরে আসি। যেতে আসতে আমার ঘণ্টা-দেড়েক লাগে বাবু, মাইল চার-পাঁচেক ত পথ।

তারাকুমার হাসতে হাসতে বললে,—এ্যাঁ,—বল কি দোস্ত! তোমার এ গোপন অভিসার কদ্দিন থেকে সুরু হয়েছে ?

আসগর একটা ঢোক গিলে বললে,—আজ্ঞে, কি বলছেন বাবু ?

তারাকুমার জবাব দিলে,—কদ্দিন থেকে এমন ভাবে যাওয়া আসা করছো ?

আসগর বললে,—আজ্ঞে তা বছর-দেড়েক হবে। মাঝে মাঝে এক আধ দিন আসতে হয় বাবু, নৈলে আবার শ্বশুর-বাড়ীর ওরা সব দুঃখু করে।

তারাকুমার একটু বিস্মিত হয়ে বললে,—এই যে আজ বেরিয়েছ, তোমার দাদুসাহেব জানতে পারেন নি ?

আসগর হাসতে হাসতে বললে,—ক্ষেপেছেন বাবু, এক ঢেলা আফিঙ খাইয়ে বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে তবে এসেছি। যেদিন আমি আসি সেদিন বুড়োর মাত্রাটা কিছু বেশী ক'রে দি। আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে সন্ধ্যের পর ঐ যে ঘুমিয়ে পড়ে ত সারা রাত আর লাঠি মেরে ওঠায় কে ? উঠবে একদম সেই ভোরের দিকে, আমি তার আগেই বাড়ী ফিরে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ি। এক দিনও ধরতে পারে নি বাবু, বুড়ো ভাবে নাতি আমার কি সুবুদ্ধি!

তারাকুমার হাসতে হাসতে বললে,—নাতি যে এদিকে ডুবে ডুবে পানি খায়, বুড়ো কি আর সে খবর রাখে!

আসগর হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে,—তা যা বলেছেন বাবু, ডুবে ডুবে পানি খাওয়াই বটে!

পরক্ষণেই আসগর আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো, একটু চিন্তিত ভাবে বললে,—কিন্তু বাবু, এইবার সব জানাজানি হয়ে পড়বে, ঢেকে রাখবার আর কোন উপায় নেই। যেমন ক'রে হোক বৌকে এবার বাড়ী নিয়ে যেতেই হবে।

তারাকুমার একটু মনে মনে কি ভাবলে, একটুখানি হাসলেও, তার পর হঠাৎ বলে উঠলো,—কিন্তু সেই অলঙ্কারের ব্যবস্থা ?

আসগর বললে,—টাকা আমি জোগাড় ক'রে ফেলবো বাবু, শ্বশুরবাড়ীর নাম ক'রে আমাকেই ওটা গড়িয়ে দিতে হবে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে কয়লা-খাদে এখন টাকা পনের মাইনে পাই, আসছে মাস থেকে আরও পাঁচ টাকা বাড়বে। ধার-হাওলাত ক'রে কুড়ি চারেক টাকা কি আর জোগাড় করতে পারবো না! তা খুব পারবো। শক্ত করে ধরবেন বাবু, জায়গাটা একটু ঢালু আছে।

তারাকুমার বাইসিকেলের সিটটা একটু শক্ত ক'রে চেপে ধরলে।

এ কি, দূরে ওগুলো চক চক করছে কি! ওয়েষ্ট এণ্ড কোল কোম্পানির মেন সাইডিঙের আলো ? বাগডিহি এসে পড়লো যে, কিন্তু কলভিন ব্রীজ ?

আসগরের সঙ্গে গল্প করতে করতে তারাকুমার পথের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিল। এর মধ্যে যে ওরা বাগডিহির কাছাকাছি এসে পড়েছে এতক্ষণ তা বুঝতেই পারে নি।

আসগর জিজ্ঞাসা করলে,—কোন্ লরিতে যাবেন বাবু, আসানসোল না, রাণীগঞ্জ ?

তারাকুমার জবাব দিল,—আসানসোল।

বাগডিহির বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নেমে তারাকুমার আসগরকে নিয়ে সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। চা খাওয়া শেষ হ'লে আসগর বললে,—আপনাকে একেবারে লরিতে চাপিয়ে দিয়ে যাব নাকি বাবু ?

তারাকুমার ব্যস্তভাবে বললে,—না দোস্ত, আর তোমাকে আটকে রাখবো না, তোমাকে আজ অনেক তকলিফ দিলাম।

আসগর বলে উঠলো,—সেকি বাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'লো এ ত আমার সৌভাগ্য। দয়া ক'রে মনে রাখবেন যেন, আবার কোন সময় দেখা হ'তে পারে!

তারাকুমার বললে,—হবে বৈকি, নিশ্চয়ই হবে।

আসগর বললে—আদাব।

তারাকুমার প্রতিনমস্কার জানালে।

কিছুক্ষণ পরে আসানসোলের শেষ বাসখানা সামনে এসে দাঁড়াতেই তারাকুমার বাইসিকেলটা ছাতের উপর তুলে দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে চ'ড়ে বসলো।

কয়েক মাস পরে বাজারের পথে হঠাৎ এক দিন আসগরের সঙ্গে তারাকুমারের দেখা। তারাকুমার বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরে মেসের বাজার করতে বেরিয়েছে, বাজারের মোড়ে হঠাৎ পিছন থেকে জোর গলায় কে ডাক দিলে—দোস্ত!

তারাকুমার পিছন ফিরে চেয়ে দেখে আসগর মিয়া ছুটতে ছুটতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। আসগর সামনে এসে দাঁড়াতেই তারাকুমার বলে উঠলো,—কি হে, আসগর যে, খবর বেশ ভাল ?

আসগর জবাব দিলে,—আজ্ঞে হেঁ বাবু, আপনি বেশ ভাল আছেন ?

—হাঁ ভালই, তার পর এখানে কি মনে ক'রে ?

—আজ্ঞে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছি বাবু, আজ নাকি খুব ভাল খেল্ আছে,—'ইহুদী-কা-লেড়কী'। আপনি দেখেছেন বাবু ?

তারাকুমার বললে,—হাঁ, ছবি খুব ভাল। তার পর তোমার বৌ এখন কোথায় ? বাপের বাড়ীতে ?

আসগর জবাব দিল,—আজ্ঞে না, গেল মাসে নিয়ে গেছি। দাদুবুড়ো কিছুতেই রাজি হয় না, আমি শেষে জোর ক'রে নিয়ে গেলাম। আমার একটি খোকা হয়েছে বাবু, মাস-তিনেকের হলো।

তারাকুমার খুশী হ'য়ে বললে,—তাই নাকি ? বেশ বেশ, তোমার দাদুসাহেব খুব খুশী হয়েছেন নিশ্চয় ?

আসগর একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বললে,—আজ্ঞে না বাবু, বুড়ো ইস্তক চটেই আছে। সেই যে গহনার কথা আপনাকে বলেছিলাম না,—হাঁ ভাল কথা, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে বাবু! আপনার জানাচেনা স্যাকরাকে দিয়ে এক ছড়া কড়িহার আমাকে গড়িয়ে দিতে হবে, আর খোকার জন্যে একটা তাবিজ। ভালই হলো, আপনার কথাই আমি ভাবছিলুম।

এই বলে আসগর কোঁচার খুঁট থেকে কয়েকখানা নোট বের ক'রে তারাকুমারের হাতে গছিয়ে দিলে, বললে,—আপনার পছন্দ-মত গড়িয়ে রাখবেন,—ভরি-তিনেক ওজন। হপ্তাখানেক পরে এসে আমি নিয়ে যাব।

তারাকুমার আসগরের এ অনুরোধটুকু উপেক্ষা করতে পারলে না,—মনে পড়লো সেই রাত্রির কথা, কলভিন ব্রীজের কথা, আততায়ী চোর ডাকাতের আশঙ্কা আর সেই সঙ্গে আসগরের দুর্দ্দান্ত সাহসের কথা। লোকটা সেদিন অসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

নোট ক'খানা গুনে নিয়ে তারাকুমার বললে,—তিন ভরির কড়িহার, আর একটা কি বললে,—তাবিজ ?

আসগর বললে,—আজ্ঞে হেঁ, কিন্তু এ টাকা থেকে তাবিজ গড়ানো চলবে না বাবু, আপনি শুধু হারগাছটাই গড়িয়ে রাখবেন। বুড়োকে ত আগে ঠাণ্ডা করি, ছেলের গয়না পরে হলেও চলবে।

তারাকুমার জিজ্ঞাসা করলে,—একটা তাবিজের দাম কত পড়বে ? চার-কোণা তাবিজ ত—ছেলে-পিলেরা গলায় পরে ?

আসগর বললে,—আজ্ঞে হেঁ বাবু, ঠিক বলেছেন। খরচা আর এমন কি, গোটা কয়েক টাকা হ'লেই যথেষ্ট। সে আমি আর এক সময় গড়িয়ে নিয়ে যাব, হারগাছটা ত আপনি তৈরি করিয়ে রাখুন। আপনার বাসাটি কোন্ খানে বাবু ?

তারাকুমার আসগরকে ঠিকানাটা বাতলে দিলে। আসগরের কয়েক জন সঙ্গী দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বায়োস্কোপের সময় হয়ে আসছে, আসগর তাড়াতাড়ি কথা শেষ ক'রে বললে,—আজ তা হ'লে আসি বাবু, আদাব।

আসগর সঙ্গীদের নিয়ে সিনেমা হাউসের দিকে রওনা

হয়ে গেল। তারাকুমার একটা ঝাঁকা মুটে ডেকে ধীরে ধীরে চকবাজারে ঢুকে পড়লো।

দিন সাত-আট পরে আসগর এক ভাঁড় গাওয়া ঘি হাতে ঝুলিয়ে তারাকুমারের বাসা-বাড়ীতে এসে হাজির। তারাকুমারের মত এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর বাড়ী আসতে হ'লে খালি হাতে আসাটা যে একান্ত অশোভন, আসগর সে কথা কোন মতেই ভোলে নি। ঘিয়ের ভাঁড়টা তারাকুমারের সামনে নামিয়ে দিয়ে আসগর বললে,—আপনার দোস্তানী কিছুতেই ছাড়লে না বাবু, বাড়ীর তৈরি একটুখানি গাওয়া ঘি আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলে, বললে,—বাবুকে আমার সেলাম দিয়ো।

তারাকুমার হাসতে হাসতে বললে,—দোস্তানীর মেহেরবানি বলতে হবে, বাজারের বাজে ঘি খেয়ে খেয়ে দেশী ঘিয়ের তার একদম ভুলেই গেছি। দোস্তানীকে বলো বন্ধু, তাঁর এ শ্রদ্ধার দান,—মানে ঘিটুকু পেয়ে ভয়ানক আমি খুশী হয়েছি।

এই ব'লে তারাকুমার ভাঁড়ের মুখে বাঁধা কাঁচা শালপাতার মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলো,—বা কি চমৎকার গন্ধ! সম্প্রতি টাটকা ঘিয়ের একটু হালুয়া করতে বলে দেওয়া যাক, কি বল!

চাকরকে ডেকে জলখাবার তৈরি করতে ব'লে দেওয়া হলো। আসগর বললে,—আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে বাবু, সন্ধ্যের লরিতেই ফিরে যেতে হবে।

তারাকুমার বললে,—তা হোক, বাস ছাড়তে এখনও অনেক দেরি। তোমার বৌয়ের হারগাছটা তৈরি হয়ে গেছে, দেখবে নাকি! চমৎকার গড়েছে কিন্তু, দোস্তানী খুব খুশী হবে।

তারাকুমার স্যুটকেস থেকে হারগাছটা বের ক'রে এনে আসগরের হাতে দিলে। টাটকা পালিশ করা গিনি সোনার গহনা, রং একেবারে ঝক্ ঝক্ করছে। আসগরের সারা মন খুশীর আমেজে ভরে উঠলো।

তারাকুমার হাসতে হাসতে বললে,—তোমার দাদু-সাহেবের রাগ একদম জল হয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরের উপর খুব চটে আছেন, না?

আসগর বললে,—আজ্ঞে হেঁ, চটে যেমন থাকতে হয়। আজকাল আমার সঙ্গেও আর বনিবনা বেশ ভাল হচ্ছে না বাবু, বৌকে বাড়ী এনে আমি যেন ভয়ানক একটা গর অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি। আপনিই বলুন ত বাবু, পরিবারের মনে দুঃখু দেওয়া কি ভাল!

তারাকুমার আসগরকে আশ্বাস দিয়ে বললে,—বুড়ো লোকের কথায় তুমি কান দিও না, দেখবে দু-দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছেলেটি বেশ ভাল আছে ত?

আসগর একটু খুশী হয়ে বললে,—আপনাদের পায়ের আশীর্বাদে খোকা বেশ ভালই আছে বাবু, আজকাল বেশ হাসতে শিখেছে। হাঁ ভাল কথা, খোকার জন্যে যে একটা তাবিজ গড়িয়ে দিতে হবে বাবু, বৌয়ের আর দেরি সইছে না, এই মাসের মধ্যেই ওটা চাই।

তারাকুমার হাসতে হাসতে বললে,—তাবিজ আমি একটা গড়িয়েই রেখেছি, খোকাকে তোমার উপহার দিব ব'লে। দেখ দেখি পছন্দ হয় কি না।

তারাকুমার পকেট থেকে সোনার একটা তাবিজ বের ক'রে আসগরের সামনে ধরলে। আসগর একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো, এর জন্যে সে তৈরি ছিল না মোটেই।

তারাকুমার বললে,—ধর ধর, ভাববার কিছু নেই এতে, তোমার ছেলেকে আমার আশীর্বাদ দিও।

আসগরের ডান হাতটা চেপে ধরে তারাকুমার তাবিজটা তার মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিলে।

এর পর আর কথা চলে না, তাবিজটা আসগরকে নিতেই হ'ল। আসগর হাসতে হাসতে বললে,—বেটার আমার ভাগ্যি খুব ভাল, আপনার মত ভারিক্কি লোকের নেক-নজরে পড়ে গেছে। বড় হ'লে দেবেন একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে, বেটাকে আর লাঙল ধরে খেতে হবে না।

তারাকুমার হেসে বললে,—খুব ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ো, ছেলে তোমার ডেপুটি হবে।

আসগর হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে,—আপনি বলেন কি বাবু, কাঠকুড়ুনীর ছেলে হবে কি না ডেপুটি! কয়লা-খাদের টালোয়ানী জুটলে হয়।

চাকর এসে দু-থালা জলখাবার দিয়ে গেল। তারাকুমার বললে,—এস দোস্ত, একটু নাস্তা করে নাও।

খানিকটা হালুয়া মুখে পুরে আসগর বললে,—আপনাকে একবার আমার বাড়ী যেতে হবে বাবু, ঐ ত ঠায় আপনার বাড়ী যাওয়ার পথে। দয়া ক'রে এক দিন পায়ের ধুলো দেবেন যেন, ছেলেটাকে এক নজর দেখে যাবেন।

তারাকুমার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে,—বেশ ত, সময় মত এক দিন গেলেই হবে।

আসগর বললে,—গেলেই হবে বললে চলবে না বাবু, নিশ্চয়ই যেতে হবে।

তারাকুমার বললে,—যাব।

আসগর পুনরায় বললে,—গরীব দোস্ত ব'লে ভুলে যাবেন না ত? আপনি কিন্তু কথা দিলেন খোকাকে এক দিন দেখতে যাবেন, কেমন ঠিক ত?

তারাকুমার হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বললে,—নিশ্চয়ই যাব

জলযোগ শেষ ক'রে খুশী মনে আসগর বিদেয় হয়ে গেল। তারাকুমার গলায় চাদর জড়িয়ে ধীরে ধীরে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরুলো।

তার পর থেকে বহুদিন আর আসগরের দেখা নেই। প্রায় বছর-দুয়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে আসগরের সঙ্গে তারাকুমারের আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে ওঠে নি। তারাকুমারের আপিসের কাজ যথানিয়মে চলে আসছে। মাঝে মাঝে তাকে দেশেও যেতে হয় ঠিক আগেকার মতই, রবিবারের ছুটির শেষে ফিরে এসে আপিস করে আজও। আসগরের কথা তারাকুমারের মনে ছিল, প্রথম প্রথম ভাবতো পথে-ঘাটে কোন্ দিন হয়ত আবার দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু গত দু-বছরের মধ্যে আসগরের আর দেখা পাওয়া যায় নি, হয়ত কলিয়ারীর কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে বেরোবার ফুরসুৎ তার কম। তারাকুমার বাড়ী যাবার পথে আসগরের খোঁজ-খবরটা এক দিন নিয়ে যাবে ভেবে রেখেছিল, কিন্তু সময়াভাবে ওদিক দিয়ে আর যাওয়াই ঘটে নি।

কিছু দিন পরে তারাকুমারের মনের পর্দ্দায় আসগরের স্মৃতি ক্রমে ঝাপ্সা হয়ে গেল। চেষ্টা ক'রে মনে রাখবার মত ব্যাপার কিছু নয়, পথে-ঘাটে এমনধারা কত লোকের সঙ্গে কত লোকেরই ত আলাপ-পরিচয় হয়, দু-দিন পরে আবার ভুলে যেতেও কিছুমাত্র আটকায় না। আসগরকে অবশ্য তারাকুমারের বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু 'Out of sight out of mind'—স্বভাবের এই ধর্ম্ম, এর মধ্যে ভাল না লাগার কোন প্রশ্ন নেই।

কয়েক মাস আগে তারাকুমারের গ্রেড-প্রমোশন হয়েছে, এক-শ টাকা থেকে দু-শ টাকার কাছাকাছি। এই প্রমোশনের পর থেকে আপিসের বড়বাবু তারাকুমারের উপর কিঞ্চিৎ বিরূপ হয়ে আছেন। বড়বাবুর এক জুনিয়র সম্বন্ধীর দরখাস্ত নাকচ ক'রে বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিনিয়র ও কর্ম্মদক্ষ তারাকুমারের গ্রেড-প্রমোশন মঞ্জুর করেন। বড়বাবু অবশ্য শ্বশুরমশায়ের বংশ-দুলালকে ঠেলেঠুলে আর এক পৈঠা তুলে দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এ মহৎ প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই, কর্ত্তৃপক্ষ তারাকুমারের আবেদনই গ্রাহ্য করেন। বিক্ষুব্ধ বড়বাবু সেই থেকে তারাকুমারকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, সম্ভবপক্ষে বিরুদ্ধাচরণই ক'রে থাকেন। তাই তারাকুমারকে একটু সাবধান হয়েই আপিসের কাজকর্ম্ম ক'রে যেতে হয়, কারণ বড়বাবুদের অঘটনঘটনপটীয়সী অলৌকিক শক্তির কথা কেরানী মাত্রেই সুবিদিত। উপকার এঁরা খুব কম লোকেরই ক'রে থাকেন, কিন্তু অতি তুচ্ছ কারণে যে-কোন লোকের ক্ষতি করতে মোটেই এঁদের আটকায় না।

তারাকুমারের ছেলের অন্নপ্রাশন। দেশ থেকে কর্ত্তাবাবু চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন অন্নপ্রাশনের আগের দিন সন্ধ্যাতক তার বাড়ী যাওয়া চাই। তিন-তিনটি মেয়ের পর প্রথম এই ছেলে, সুতরাং অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন বেশ ভাল রকমই করা হয়েছে। বাড়ী থেকে মাঝে খান দুই তিন গরুর গাড়ী এসে কতকগুলো বাজারপত্র ক'রে নিয়ে গেল। তারাকুমার ফর্দ্দ মিলিয়ে নিজের হাতে জিনিসপত্র সব খরিদ ক'রে পাঠিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে গাড়োয়ানের মারফৎ সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হলো—তারাকুমার দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে যথাসময়ে বাড়ী গিয়ে পৌছবে, তার জন্যে কোন চিন্তার কারণ নেই। সেখানকার সব ব্যবস্থাদি প্রস্তুত, বাকি শুধু খোকার অলঙ্কার ক'গাছা, যাবার দিন তারাকুমার ওগুলো সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে।

বাড়ী যাবার আগের দিন সকালের ডাকে তারাকুমার একখানা চিঠি পেলে—বৌয়ের চিঠি। তারাকুমারকে জানানো হয়েছে—ফর্দ্দমত জিনিসপত্রগুলি যথাসময়ে বাড়ী পৌছেছে, খোকার ভাত খাবার গরদের চেলিখানা শুধু বাদ পড়ে গেছে, ওটা যেন অবশ্য অবশ্য মনে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্নপ্রাশনের চেলি অনুষ্ঠানের মস্তবড় একটা অঙ্গ, স্বল্প মূল্যের জিনিস হ'লেও ওটির আবশ্যকতা একান্তই অপরিহার্য্য। রাঙা টুকটুকে চেলি পরিয়ে অন্নপ্রাশনের দিন শিশুকে যখন চন্দনের ফোঁটা আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়, তার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা আর কোথায়! তারাকুমারের মনে ভেসে উঠলো তার শিশু-পুত্রের বিশেষ এক অনিন্দ্য মনোহর রূপ।

বাড়ী যাবার দিন। অফিসের কাজকর্ম্ম সেরে তারাকুমারের বেরুতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। বেলা দুটোর মধ্যে তার ছুটি পাবার কথা ছিল, সন্ধ্যাতক সে বাড়ী পৌছবে বলে খবর দেওয়া আছে, কিন্তু বড়বাবুর অনুগ্রহে পাঁচটার আগে তার অফিস ত্যাগ করা কোন রকমেই সম্ভবপর হলো না। বাইসিকেলে তিন-চার ঘণ্টার পথ, বেলাবেলি গিয়ে অজয় নদীটা পার হ'তে পারলে তবু অনেকটা ভরসা ছিল। কিন্তু বাড়ী তাকে আজ যেমন ক'রে হোক পৌছতেই হবে।

তারাকুমার তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে জামাকাপড় বদলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাজারে গিয়ে চটপট একখানা লাল রঙের গরদের চেলি কিনে সেখান থেকে রওনা হ'ল স্যাকরা-বাড়ী, খোকার অলঙ্কারগুলো নিয়ে যেতে হবে। অলঙ্কার সব তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু পালিশ তখনও শেষ হয় নি। বাধ্য হয়ে তারাকুমারকে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হ'ল। স্যাকরা যখন পালিশের দোকান থেকে গয়না নিয়ে ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

তারাকুমার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাতারাতি বাড়ী পৌছবার উপায় কি? অজয় নদীর ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা অবশ্য ভাল আছে, ঠেলেঠুলে অন্ধকারেও কোন রকমে চলে যাওয়া যাবে, কিন্তু তার পর?

ভেবেচিন্তে তারাকুমার ঠিক করলে অজয় পার হয়ে পীরু সেখের গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে নিলেও চলতে পারে। লোকটা বেশ বিশ্বাসী, ভদ্রলোকের খাতিরটাতিরও করে, রাত ১২টা ১টা তক যেমন ক'রে হোক বাড়ী পৌছে দেবেই। অতএব সেই যুক্তিই প্রশস্ত।

তারাকুমার মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হ'ল।

বাগডিহির সন্ধ্যার বাসখানা ছাড়বার প্রায় সময় হয়ে এসেছে। তারাকুমার বাস-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাইসিকেলখানা ছাতের উপর তুলে দিয়ে বাসের উপর চড়ে বসল। বাগডিহি থেকে অজয় ধার পর্য্যন্ত কয়েকটা মাইল বাইসিকেল করতে পারলেই ছুটি। নদী পার হয়ে পীরু সেখের একখানা গরুর গাড়ী যেমন ক'রে হোক ধরে নেওয়া যাবে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, সময়টি বেশ মনোরম। এক ফুলওয়ালা বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি মালা ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছিল। তারাকুমার হাতছানি দিয়ে ডাকলে। এ সব ফুল পাড়াগাঁয়ে দুষ্প্রাপ্য, কতকগুলো সে খরিদ করেই নিলে—কালকের অনুষ্ঠানে হয়ত কাজে লেগে যেতে পারে।

বাস ছাড়তেই ফুর ফুর ক'রে হাওয়া দিতে লাগল, টাটকা ফুলের মিঠে গন্ধে সারা বাস ভ'রে উঠল।

বাগডিহিতে নেমে তারাকুমার একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলো, পেট ভ'রে কিছু খেয়ে নিতে হবে, খিদে পেয়েছে প্রচুর। হঠাৎ তার চোখে পড়ল কে একটা লোক ঘরের ভিতর চেয়ার টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছে। লোকটাকে যেন তারাকুমারের চেনাচেনা ঠেকল—কে ও লোকটা? আসগর মিয়া নাকি? হাঁ—সেই-ই ত!

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই তারাকুমারের ভুল ভাঙলো। লোকটা দেখতে কতকটা আসগরের মতই, তেমনি ঠিক লম্বা দোহারা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীও,—কিন্তু আসগর সে নয়।

তারাকুমারের মনে ভেসে উঠলো বছর দুই আগের কথা। তার পর থেকে আসগরের আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই, লোকটার যে হ'ল কি ভগবান্ই জানেন।

দোকানদার একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—বসুন বাবু—বসুন, গরম গরম লুচি দেব কি?

তারাকুমার খাবারের ফিরিস্তি দিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লো। দু-এক খণ্ড লুচি মিষ্টি সবেমাত্র মুখে পুরেছে, এমন সময় শীর্ণ একটা লোক এসে করুণ দৃষ্টিতে তারাকুমারের সামনে দাঁড়ালো, বললে,—Sir, ভয়ানক্ বিপন্ন আমি, দয়া ক'রে কিছু help করবেন?

তারাকুমার লোকটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো। গায়ে তার ছেঁড়া একটা হাফশার্ট, পরনে ময়লা কাপড়, পায়ে একজোড়া চামড়ার তালি-মারা ক্যাম্বিসের জুতো। ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। লোকটা বলে যেতে লাগলো,—কলিয়ারীতে ভাল কাজই করতাম মশায়, টাকা-চল্লিশেক মাইনে পেতাম,—ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। ছ-মাস হলো রিডাক্‌শনে চাকরি গেছে। তার পর থেকে মেয়েছেলে নিয়ে কি কষ্টেই যে দিন কাটছে, ভগবান্ই জানেন। আজ দু-দিন থেকে এক রকম অনাহারে, regular starvation চলছে। kindly দেবেন কিছু?

দোকানদার দেখতে পেয়ে লোকটাকে তাড়া ক'রে এলো, বললে,—আবার তুমি এসেছ ঠাকুর? তোমার মত বেহায়া কিন্তুক বৃহ্মাণ্ডে দেখি নাই আমি। যাও যাও, বিরক্ত ক'রো না এখানে।

তারাকুমার দোকানদারের দিকে চেয়ে বললে,—আনা-চারেকের খাবার এঁকে দিয়ে দাও, আমি দাম দিচ্ছি।

লোকটা খাবারের ঠোঙা পেয়ে তারাকুমারকে নমস্কার ক'রে খুশী মনে বিদেয় হয়ে গেল।

দোকানদার তারাকুমারের দিকে চেয়ে বললে,—কত লোককেই বা এমনধারা দেওয়া যায় বাবু, পথে ঘাটে ভিকিরীর ভিড় হর্দ্দম লেগেই আছে। বেটারা সব এক একটি চোর।

তারাকুমারের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খালি পাতের দিকে লক্ষ্য হতেই দোকানদার চোরের কথা হঠাৎ ভুলে গেল, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো,—গোটাচারেক খাশ বালুসাই দিব নাকি বাবু? খেয়ে দেখুন, জিনিস খুব ভাল।

দোকানদার তারাকুমারের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আরও কয়েকটা মিষ্টি তার পাতে ফেলে দিলে।

তারাকুমার খাওয়া শেষ ক'রে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে গাছিয়ে বাইসিকেলের ক্যারিয়ারে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার, রাত তখন অনেকখানি হয়ে গেছে। অজয় নদীর পথ ধরে তারাকুমারের বাইসিকেলখানা তীরবেগে ছুটে যেতে লাগলো। সামনে কেরোসিনের ল্যাম্পটা কোন রকমে টিম টিম ক'রে জেগে আছে মাত্র, অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। রাস্তা অবশ্য বরাবর ফাঁকা, অন্ধকারে সাইকেল ক'রে যেতে কোন অসুবিধা নাই।

তারাকুমার এক মনে ভাবতে ভাবতে চলেছে,—বাড়ীর কথা, গাঁয়ের কথা, ছেলের অন্নপ্রাশনের কথা, আনুষঙ্গিক নানাবিধ অনুষ্ঠানের কথা। এই সঙ্গে সুবিধা হয়ত গ্রামের যাত্রাপার্টির একরাত্রি অভিনয়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা যেতে পারে। আত্মীয়-কুটুম্বাদি বার থেকে যারা আসবে তাদের নিয়ে একটা রাত্রি আমোদ-প্রমোদে কেটে যাবে এক রকম মন্দ না। অন্নপ্রাশনের পরদিন আবার কাঙালীভোজনের হাঙ্গামা আছে, এবার তাদের খিঁচুড়ির পরিবর্ত্তে—

সামনেই কলভিন ব্রীজ, অন্ধকারে লোহার থামগুলো তারাকুমারের দৃষ্টিগোচর হ'ল। হাঁ,—কলভিন ব্রীজই ত। এই ব্রীজ পার হ'তে সে-বার সেই রাত্তির বেলা—প্রচণ্ড এক কাল-বৈশাখীর পর—এমনিই ঠিক অন্ধকার রাত্রি; সে যেন এক দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপার। অথচ কোথায় যে কি তার ঠিক নাই। মানুষ যে মিছেমিছি কেন এত ভয় করে,—

একটা উঁচু মত কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে তারাকুমারের বাইসিকেলটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। এ কি, রাস্তার উপর এলোমেলো পাথর সাজিয়ে রেখে দিয়েছে কে?

তারাকুমার কোন রকমে টাল সামলে নেবার পূর্ব্বেই অন্ধকারে হঠাৎ একটা লোক ক্ষিপ্রবেগে পিছন দিক থেকে ছুটে এসে তারাকুমারের মাথা লক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাত কষে দিলে। তারাকুমার বেসামাল হয়ে পথের একধারে ছিটকে পড়লো, বাইসিকেলটা গড়াতে গড়াতে পড়লো গিয়ে কলভিন ব্রীজের নীচে। তারাকুমার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো,—উঃ, মাগো—!

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক টর্চ্চের আলো ফেললে তারাকুমারের মুখের উপর। আর একটা লোক বাঘের মত ছুটে গিয়ে তারাকুমারের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলাটা তার দু-হাত দিয়ে চেপে ধরলে। অপর লোকটা ব'লে উঠলো,—ছোরা—ছোরা—শীগ্‌গির ছোরা বের কর।

এই বলে সে টর্চ্চ নিয়ে তারাকুমারের দিকে এগিয়ে গেল। তারাকুমারের সংজ্ঞা প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে। টর্চ্চের আলোয় বহু কষ্টে সে চোখ মেলে তাকালে, দেখলে তার বুকের উপর ঝকঝকে একখানা ছোরা উঁচু ক'রে ধরা হয়েছে।

তারাকুমার শিউরে উঠলো, বাধা দেবার বিন্দুমাত্র শক্তি তার নাই। কাতর কণ্ঠে সে বলে উঠলো—মেরো না—মেরো না আমাকে, যা চাও পাবে।

লোকটা বললে,—টাকা—টাকা চাই আমরা, টুঁ শব্দটি করলে জান মেরে ফেলবো।

অপর লোকটা তারাকুমারের পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ে বললে,—পকেট ঝেড়ে যা-কিছু আছে বের ক'রে নে—শীগ্‌গির—দেরি করিস নে।

ও লোকটা তখন তারাকুমারের হাত থেকে টেনে-হিঁচড়ে সোনার হাতঘড়িটা খুলতে আরম্ভ করেছে। তারাকুমার বললে,—আস্তে, ভয়ানক লাগছে।

পাশের লোকটা তারাকুমারের মুখের কাছে টর্চ্চের আলো ফেলে একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলো,—কে?

তারাকুমার ক্ষীণকণ্ঠে বললে,—আমায় একটু উঠে বসতে দাও, পালাব না আমি, আমার কাছে যা আছে সব তোমরা পাবে।

পাশের লোকটা তারাকুমারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো,—কে—কে? এ কি,—দোস্ত তুমি!

তারাকুমার চমকে উঠলো, স্বরটা যেন পরিচিত, বললে,—কে—কে? আসগর? এঁ্যা—তুমি?

অপর লোকটা তখন তারাকুমারের ঘড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে আরম্ভ করেছে। তারা-

কুমারের মুখে আসগরের নাম শুনে হঠাৎ সে থেমে গেল। আসগর বললে,—ওরে যা যা—শীগ্‌গির খানিকটা পানি নিয়ে আয়।

তারাকুমারের মুখে চোখে জল দিয়ে কতকটা তাকে ঠাণ্ডা করা হ'ল। লাঠির আঘাতে মাথার পিছন দিকের খানিকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। আসগর তারাকুমারের চাদরখানা দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথাটা বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে। আসগরের সঙ্গীটা ব্রীজের নীচে থেকে বাইসিকেলখানা তুলে এনে তারাকুমারের পাশে নামিয়ে দিয়ে এক ধারে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। আসগর বললে,—ভাগ শালা ভাগ, তোর মত লোক আর আমার দরকার হবে না।

লোকটা হতভম্ব হয়ে তারাকুমারের ঘড়িটা আসগরের হাতে গুঁজে দিয়ে সামনের মেঠো পথ ধ'রে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারাকুমার একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো। আসগর রীতিমত ঘেমে উঠেছে। কিছুক্ষণ ধরে দু-জনেই চুপচাপ, কারও মুখ দিয়ে একটি কথাও যেন বের হ'তে চায় না।

সামনেই কলভিন ব্রীজ, লোহার কাঠামোটা ফ্যাকাশে অন্ধকারে বিরাট্ একটা প্রেতকঙ্কালের মত নিঃশব্দে খাড়া হয়ে আছে। চার দিক নিস্তব্ধ, জনমানবের সাড়াশব্দ নাই, আকাশ-বাতাস যেন মৌন এক অব্যক্ত বেদনার ভারে একান্ত ভারী হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে আসগর ধীরে ধীরে কথা কইলে, বললে,—এখন কেমন লাগছে দোস্ত, মাথার যন্ত্রণা কি কিছু কমেছে?

তারাকুমার যে এ কথার কি জবাব দেবে কিছুমাত্র ভেবে পেলে না, ঘৃণায় তার সারা অন্তর বিষিয়ে উঠলো।

আসগর পুনরায় বললে,—আমাকে মাপ করুন ভাই, ভয়ানক অন্যায় ক'রে ফেলেছি আমি।

তারাকুমার ব'লে উঠলো,—এ আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারি নি আসগর, যে, তোমার মত লোক এমন কাজ কখনও করতে পারে।

আসগর অপরাধীর মত মুখ নীচু ক'রে বললে,—সে কথা সত্যি, কিন্তু জীবনে কখনও এমন কাজ আমি করি নি বাবু, আজ এই প্রথম।

তারাকুমার শ্লেষকণ্ঠে ব'লে উঠলো,—তা হবে।

এই ব'লে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, বুকের ভিতরটা তখনও দুর দুর ক'রে কাঁপছে, শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল। কিন্তু বাড়ী যে আজ তাকে যেতেই হবে।

তারাকুমার বাইসিকেলখানা নেড়ে-চেড়ে দেখলে, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি, কলকব্জা সব ঠিকই আছে।

আসগর বাইসিকেলখানা চেপে ধ'রে বললে,—কোথায় যাবেন বাবু?

তারাকুমার বললে,—ছাড়, এক্ষুনি আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

আসগর বাধা দিয়ে বললে,—তা ত হয় না, এ অবস্থায় আপনি যাবেন কেমন ক'রে! আজকের মত আমার বাড়ীতেই চলুন বাবু, ভোরে উঠে বাড়ী চলে যাবেন।

অসঙ্গত প্রস্তাব, তারাকুমার একটু আশ্চর্য্য হ'ল। কিন্তু সত্যই কি এ নরঘাতক অপরাধীর কণ্ঠস্বর!

তারাকুমার সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ ধরে আসগরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো। কিন্তু না, বিশ্বাস কি? তারাকুমার ব'লে উঠলো,—কি তুমি বলছ আসগর, মনে মনে আবার কি এক নতুন মতলব আঁটছো? যাও যাও,—একটা খুনে ডাকাতের সঙ্গে আর আমি কথা কইতে চাই নে, তোমাকে আমি এখন থেকে আন্তরিক ঘৃণা করি।

আসগর হঠাৎ তারাকুমারের পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো, বললে,—বাবু, দোহাই আপনার, বিশ্বেস করুন, খুনে ডাকাত আমি সত্যিই নই, ভয়ানক বিপদে প'ড়ে আজ আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। নিজের জন্যে করি নি বাবু, খোকাকে আমার বাঁচাবার জন্যে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ আমাকে ডাকাত সেজে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

তারাকুমার ব'লে উঠলো,—সে কি, খোকার আবার কি হ'ল তোমার?

আসগর চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিলে,—ছেলে আমার আজ ছ-মাস ধরে বিছানায় পড়ে আছে বাবু, একটানা রোগে ভুগে চেহারা হয়ে গেছে কঙ্কালসার। চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু করাতে পারি নি, এক ফোঁটা বার্লির জল পর্য্যন্ত আজকাল আর জুটছে না। ডাক্তাররা সব একে একে জবাব দিয়েছে, পয়সা না পেলে আর ওষুধ দিতে চায় না। দেশের যা অবস্থা হয়েছে বাবু, একটা পয়সা কারও কাছ থেকে দেনা পাবার উপায় নেই। এমন দুরবস্থায় আমি জীবনে কখনও পড়ি নি।

তারাকুমার একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—সে কি, তোমার কলিয়ারীর চাকরি?

আসগর জবাব দিলে,—কয়লার বাজার আজকাল ভয়ানক মন্দা বাবু, আশপাশাড়ী খাদগুলো সব বন্ধই হয়ে গেছে। আজ দেড় বছর আমার চাকরি নেই। খেটে-খুটে বহু কষ্টে সংসার চালাচ্ছিলুম, কিন্তু বাবু, আল্লার মার, গেলুম এমন এক রোগে পড়ে যে মাস দুই-তিন বিছানা ছেড়ে আর উঠতে হ'ল না। গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে, থালা-ঘটী বিক্রি ক'রে যদি বা আমি কোন রকমে সেরে উঠলুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে ধরল পেটের অসুখে। দাওয়াই পানি কোন কিছুই ধরল না বাবু, রোগ দিন দিন বেড়েই যেতে লাগল। আজকাল তার যা অবস্থা হয়েছে, চোখে না দেখলে বিশ্বেস করবার উপায় নেই।

আসগরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল, একটুখানি থেমে হঠাৎ সে আবার বলে উঠল,—যাবেন বাবু, যাবেন আমার খোকাকে একবার দেখতে? চলুন না, এখান থেকে মাইল-দেড়েকের বেশী নয়; ভোর বেলা উঠে বাড়ী চলে যাবেন, অজয় নদী আমাদের ওখান থেকে ঠায়।

তারাকুমার ভুলে গেল যে আসগর মিয়া আস্ত একটা খুনে ডাকাত। মুহূর্তের মধ্যে তার মনের কোণে জমে উঠল পুঞ্জীভূত একটা বেদনার ছায়া।

আসগর পুনরায় বললে,—যাবেন বাবু, যাবেন?

তারাকুমার মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠল,—চল, কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে?

আসগর বললে,—এই যে এই মেঠো পথ দিয়ে আসুন, কিন্তু আপনি কি হেঁটে যেতে পারবেন?

তারাকুমার বললে,—পারবো, এখন অনেকটা ভাল। তুমি বরং আমার বাইসিকেলটা নিয়ে হেঁটে চল।

মেঠো পথ ধরে অন্ধকারে দু-জনে হেঁটে-যেতে লাগল।

তারাকুমার জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার বুড়ো দাদুর খবর কি আসগর?

আসগর বললে,—তার কথা আর বলেন কেন বাবু! বুড়ো আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে জমিজমা সব বেচে দিয়েছে, তার পর সে হজ করতে যাবে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে বছর খানেক আগে। আজতক বুড়ো আর ফেরে নি বাবু, খোঁজাখুঁজি আমি অনেক করেছি, কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি।

তারাকুমার একটু দুঃখিত হয়ে বললে,—তাহলে তোমার জমিজমা বলতে আজকাল আর কিছু নেই!

আজগড় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে,—তাহলে কি এত তকলিপ হতো বাবু, দু-চার বিঘে ভুঁই এ সময় বিক্রি ক'রে দিয়ে খোকার আমি চিকিৎসা করাতুম। মাস-খানেক হ'ল খোকার হাত-পাগুলো ফুলে গেছে বাবু, কাল থেকে অবস্থা খুব খারাপ। পীরপুরের হকিম সাহেবের কাছে গিয়ে আজ ধন্না দিয়েছিলুম, বেটা কিন্তু কিছুতেই এল না বাবু, বললে—বিজিটের টাকা আগে দিতে হবে। বেটার হাতে পায়ে ধরে আমি বেগত্তা করলুম, কিন্তু না—কোন কথাই আমার শুনলে না, শেষে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। ছেলে যদি আমার কোন কিছু হয়ে যায় বাবু, তাহলে ঐ হকিম শালাকে আমি আগে খুন করবো। মানুষের উপর শালা ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে আমার।

তারাকুমার অবাক্-বিস্ময়ে আসগরের ইতিহাস শুনে যেতে লাগল। আসগর বলে যেতে লাগল,—হকিমের ওখান থেকে ফিরবার সময় মাথায় আমার শয়তান ক্ষেপে উঠল বাবু, ভাবলুম যেমন ক'রে হোক খোকাকে আমার বাঁচাতে হবে, চুরি ডাকাতি খুন জখম সব কিছু করতে আমি রাজী। পাগলের মত অজয় নদীর পথ ধরে ছুটতে লাগলুম। ছই দেওয়া একখানা গরুর গাড়ী হঠাৎ চোখে পড়ল,—নদীর ঠিক মাঝখানে। কাছে গিয়ে দেখি ছইয়ের মধ্যে ভদ্রবাড়ীর একটি বৌ। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বাবু, লোকজন কেউ কোথাও নাই। লাঠি হাতে ছুটে গিয়ে গাড়ীখানা হঠাৎ চড়াও ক'রে ফেললুম।

তারাকুমার চমকে উঠল, বললে,—এ্যা—বল কি আসগর! তার পর?

আসগর বলে যেতে লাগল,—গাড়োয়ান বেটাকে দু-এক লাঠি বসিয়ে দিতেই মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। ধমক দিয়ে বললুম, আমার টাকা চাই। মেয়েটি একটি পোঁটলায় করে কতকগুলো কি বেঁধে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে। পোঁটলাটা কুড়িয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলুম, বাড়ী ফিরে দেখি পোঁটলার মধ্যে খালি কতকগুলো গিনি সোনার গহনা। এসব আমি চাই নি বাবু, আমি শুধু চেয়েছিলুম গোটাকয়েক টাকা, শহর থেকে একটা ডাক্তার আনতে যা খরচ। তাড়াতাড়ি তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়লুম, টাকা আমাকে পেতেই হবে। পাশের গাঁ থেকে পেশাদার এক শালা গুণ্ডাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সাঁকোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তার পর যা ব্যাপার ঘটলো, সবই ত আপনি জানেন।

তারাকুমার একটু থমকে দাঁড়াল, বললে,—আসগর, কতকগুলো টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, এই দিয়ে তোমার ছেলের চিকিৎসা ক'রো। কিন্তু এইখান থেকে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তোমার বাড়ী যেতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আসগর ক্ষুব্ধ হয়ে বললে,—আপনার উপর আমার জোর নাই বাবু, কিন্তু এতখানা পথ এসে আমার বাড়ী যদি আপনি না যান, তাহলে আপনার টাকাও আমার দরকার হবে না। বলেন ত সাইকেল করে অজয়ের ধার পর্য্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

তারাকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে স্থির ভাবে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকল। আসগর হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল,—বাবু, কে যেন কাঁদছে ব'লে মনে হচ্ছে না?

তারাকুমার কান খাড়া ক'রে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে,—কই,—না!

দূরে এক দল শেয়াল ডেকে উঠলো, রাত প্রায় প্রহর দুয়েক। আসগর চঞ্চল হয়ে উঠলো, বললে,—আর ত আমি দেরি করতে পারছি না বাবু, খোকার জন্যে আমার মন কেমন করছে। আপনিও চলুন বাবু, আমার অপরাধের কথা ভুলে যান, আজ আমি আপনাকে কিছুতেই ছেড়ে দিব না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তারাকুমারের মনের দৃঢ়তা আবার শিথিল হয়ে গেল, বললে,—চল, যাচ্ছি।

আসগর বললে,—চ'ড়ে বসুন সাইকেলের পিছনে, রাস্তা বরাবর ভাল আছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারাকুমার গিয়ে আসগরদের গ্রামে পৌঁছলো। ছোট্ট একটি নির্জ্জন পল্লী, কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস। চার দিক নানা রকম আগাছায় পরিপূর্ণ। আসগর তারাকুমারকে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে একটা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। উঠানে একটা দড়ির খাটিয়া পেতে দিয়ে বললে,—বসুন বাবু, বসুন এখানে।

ছোট একখানা কোঠা ঘর, মধ্যবিত্ত চাষী গৃহস্থের উপযুক্ত। তারই চালায় মাটির উপর বিছানা পাতা। বিছানায় শুয়ে আছে আসগরের ছেলে, আসগরের বৌ ছেলের পাশে রাত জেগে ব'সে আছে। কিছু দূরে কালি-পড়া একটা হারিকেন বাতির উপরকার ফুটো দিয়ে অজস্র ধোঁয়া উঠছে।

আসগর তারাকুমারকে খাটিয়ার উপর বসিয়ে ছেলের কাছে ছুটে গেল, বৌকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে,—এখন কেমন আছে?

আসগরের বৌ ঘোমটার ভিতর থেকে নিম্ন স্বরে জবাব দিলে,—সেই রকমই, নিঃশ্বেসটা আর একটু জোরে জোরে পড়ছে।

আসগর খোকার বুকের কাপড়খানা সরিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে জ্বরজ্বালা কিছু নাই, খালি একটু টেনে টেনে দম ফেলছে। আজ বিকেল থেকে নতুন এই উপসর্গটা দেখা দিয়েছে।

আসগরের বৌ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে,—ডাকতর বাবু এলো?

আসগর বললে,—এ্যাঁ,—ডাকতর? ও, না,—ডাক্তারকে আজ পাওয়া গেল না। ইনি আমার সেই দোস্ত, পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ডাক্তারের কাছেই গিয়েছিলুম আমি, বললে,—আজ রাতে আর যাব না, কাল সকাল বেলা গিয়ে দাওয়াই দিব।

এই বলে আসগর খোকার ডান হাতটা তুলে নাড়ী দেখতে লাগলো, কিন্তু ও সম্বন্ধে জ্ঞান তার কতটুকু!

আসগর তারাকুমারের কাছে গিয়ে বললে,—আপনি ধাত দেখতে জানেন, বাবু? আসুন দেখি, খোকাকে একবার দেখবেন।

তারাকুমারের নাড়ীজ্ঞান খুব সামান্যই, কিন্তু তবু এক্ষেত্রে সে-কথার উল্লেখ ক'রে নিশ্চেষ্ট ব'সে থেকে কোন লাভ নাই; তারাকুমার বললে,—চল।

তারাকুমার কাছে আসতেই আসগরের বৌ আরও খানিকটা ঘোমটা টেনে সসঙ্কোচে উঠে যাচ্ছিল। তারাকুমার বললে,—বসো মা, বসো, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

আসগরের বৌ জড়সড় হয়ে বিছানার একপাশে ধীরে ধীরে বসে পড়লো। তারাকুমার চেয়ে দেখে শয্যার উপর শীর্ণকায় ক্ষীণপ্রাণ এক শিশু, দেহের কঙ্কালগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা আছে মাত্র, মুখখানি শুধু পাতলা মেঘে ঢাকা শুকতারার মত টুকটুক করছে।

তারাকুমার রুগীর চেহারা দেখে বলে উঠলো,—এ কি, এ যে এনেমিক পেসেণ্ট, ড্রপসি ফর্ম্ম করেছে।

আসগর বললে,—সেটা কি বাবু?

তারাকুমার বললে,—শোঁত, রক্তহীনতার জন্যে হাত-পা ফোলা; রোগটা খুব খারাপ।

হঠাৎ তারাকুমারের দৃষ্টি পড়লো—ছেলেটার শ্বাস উঠেছে, চৈতন্যের লেশমাত্র নাই। নাড়ী পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে—হাত একদম অবশ, নাড়ী বইছে কি না ঠিক বোঝা গেল না।

তারাকুমার ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলো,—আসগর, নিকটে কোথাও ডাক্তার পাওয়া যাবে?

আসগরের বৌ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আসগর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেমন দেখছেন বাবু, বাঁচবে ত?

তারাকুমার সাহস দিয়ে বললে,—সে কি, ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। তোমার সেই পীরপুরের হকিম সাহেবকে

শীগ্‌গির ডাকতে পার একবার? কদ্দূর এখান থেকে?

আসগর বললে,—খুব বেশী দূর নয়, যাব নাকি বাবু! লোকটার দাওয়াই খুব ভাল, গোটা-দুই টাকা ধরিয়ে দিলেই এক্ষুনি ছুটে আসবে।

তারাকুমার বললে,—যত টাকা লাগে, শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো। এ সময় এক জন গিন্নীবান্নী স্ত্রীলোক কাছে থাকলে ভাল হ'ত, তেমন কেউ থাকে ত একবার ডাক না,—এখানে এসে তোমাদের একটু সাহায্য করুন।

আসগর বললে,—ও-বাড়ীর নানীকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি, আপনি একটু বস্থন বাবু, যাব আর আসবো।

এই ব'লে আসগর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাড়ী ঢুকলো। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি রুগীর পাশে ব'সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেই ব'লে উঠলো,—ওমা, ছাওয়ালের এ কি অবস্থা হইছে গো! দে—দে—মুখে পানি দে।

আসগরের বৌ জলের গেলাসটা এগিয়ে দিলে, বৃদ্ধা ফোঁটা ফোঁটা ক'রে খোকার মুখে জল দিতে লাগলো।

আসগর ভাঙ্গা গলায় ব'লে উঠলো,—নানী, খোকা কি আর বাঁচবে না?

আসগরের বৌ ডুকরে কেঁদে উঠলো। তারাকুমার বললে,—না না—কাঁদবার সময় এ নয়। আসগর, এই নাও টাকা, হকিম সাহেবকে যত শীগ্‌গির পার ধ'রে নিয়ে এসো।

তারাকুমার মনিব্যাগ থেকে গোটা-কয়েক টাকা বের ক'রে আসগরের হাতে দিলে।

আসগর একটু কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললে,—খোকার অবস্থা ত ভাল দেখছি না বাবু, ফিরে এসে দেখতে পাব ত?

তারাকুমার বললে,—আর দেরি করো না, সঙ্গে একটা লোক নিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

বৃদ্ধা খোকার মুখে জল দিতে দিতে বললে,—হকিম এসে করবেক আর ছাই, ছাওয়ালের আর আছে কি! ওমা, এ যে দাঁত লাগলো গো!

তারাকুমার খোকার মুখে হাত দিয়ে দাঁতি ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। বৃদ্ধা বললে,—থাক্ থাক্, বেচারাকে আর কষ্ট দিয়ো না, তার চেয়ে মুখে শুধু পানি দাও।

আসগর ব্যস্ত হয়ে বললে,—খোকাকে একটু বাতাস করবো নানী, না, ছুটে গিয়ে হকিম সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসবো?

খোকার হঠাৎ গলা ঘড় ঘড় ক'রে উঠলো। তারাকুমার আসগরের দিকে হতাশ ভাবে চেয়ে বললে,—থাক্, তোমাকে আর এ সময়ে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে না। খোদার মেহেরবাণীর উপর নির্ভর করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

আসগর খোকার পাশে ব'সে পড়লো। খোকাকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে তার কানের কাছে ডাকতে লাগলো,—খোকা! খোকা!

তারাকুমার বললে, —না, না, এত অধীর হ'লে চলবে না।

খোকার মুঠিবাঁধা হাত দু'খানা অকস্মাৎ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মাথার দিকে উঠে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার নীচের দিকে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা সে বিকৃত করে উঠলো। জুঁই ফুলের মত নধর কচি মুখখানির সে কি মর্মন্তুদ বিকৃতি!

প্রদীপে তেল ফুরিয়ে এসেছে, আসগরের খোকার জীবন-প্রদীপ শেষ বারের মত দপ্ ক'রে জলে উঠে তক্ষুনি নিবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল।

বৃদ্ধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

আসগরের বৌ ডেকে উঠলো,—খোকা!

আসগর সচকিতে ব'লে উঠলো,—দোস্ত!

তারাকুমার বললে,—সব শেষ হয়ে গেছে।

খোকার মৃত দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো আসগর আর আসগরের বৌ। বৃদ্ধাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরোলে কান্না জুড়ে দিলে।

তারাকুমারের বুকের পাঁজরাগুলোয় কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলো। চোখ মুছতে মুছতে সে উঠে গিয়ে উঠানের এক পাশে চুপচাপ খাটিয়ার উপর বসে পড়লো।

ঘণ্টা-দুই পরে আসগরের প্রতিবেশী শীর্ণকায় এক মুসলমান বৃদ্ধ খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে তারাকুমারের সামনে এসে দাঁড়ালো। আসগরের সে গ্রামসম্পর্কে নানা। বৃদ্ধ তারাকুমারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলে ছেলেটাকে মাটি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের মধ্যে মুসলমান জাতভাই বলতে অপর কেউ আর নাই। যা-কিছু করবার নিজেদেরকেই করতে হবে।

তারাকুমার বললে,—বেশ ত—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, শীগ্‌গীর গোর দেবার ব্যবস্থা কর।

আসগরের বৌ কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আসগর তখনও ছেলের পাশে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,—খোকা! খোকা! কিছুতেই বাঁচলি না বাপ! ওরে, যত কিছু অপরাধের বোঝা সব যে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলি। এক ফোঁটা দাওয়াই আমি দিতে পারি নি, এ দুঃখু যে আমার ম'লেও যাবে না।

তারাকুমার আসগরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আসগর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে,—বাবু, আপনি এক দিন কথা দিয়েছিলেন খোকাকে আমার দেখতে আসবেন, হয়ত সেই আশাতেই বাপ আমার আজ পর্য্যন্ত আপনারই পথ চেয়ে ছিল।

চোখের জল মুছতে মুছতে আসগর উঠে দাঁড়ালো, খোকাকে মাটি দেবার ব্যবস্থা যে তাকেই করতে হবে।

আসগরের বৌ ভাঙ্গা গলায় আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে স্বরু করলে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি তাকে যথাসাধ্য শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

মৃতদেহ গোসল করাতে হবে। বৃদ্ধা খোকার গলা থেকে তাবিজটা খুলে আসগরের হাতে দিলে। আসগরের চোখ দুটো জলে ভ'রে গেল। এত অভাবের মধ্যেও খোকার তাবিজটি সে কোন মতেই নষ্ট করে নি।

মৌলবী সাহেব শুদ্ধাচারে কোরান শরিফ পাঠ ক'রে জাফরানের হরফে লিখে দিয়েছিলেন মহামূল্য কল্যাণের বাণী। সেই তাবিজ সোনার পাতে মুড়ে খোকার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আসগরের বুকটা আনচান ক'রে উঠলো। ছোট্ট এই তাবিজটিতে খোকাকে তার মানাতো কত চমৎকার! তাবিজটা আসগর যত্ন ক'রে ঘরের মধ্যে রেখে দিলে।

'কফন' তৈরি করতে নূতন কাপড় দরকার। সারাঘর খোঁজাখুঁজি ক'রে ছোট্ট একখানা মার্কিনের গামছা মাত্র পাওয়া গেল। আসগর বললে,—নানা, এতে কি হবে?

বৃদ্ধ করুণভাবে মার্কিনের টুকরোটার দিকে চেয়ে বললে,—তাই ত রে, কাপড় যে বড় অল্প, এতে কোন রকমে 'নাহালা' চলতে পারে, কিন্তু কফন? আচ্ছা দে, এতেই কোন রকমে সেরে দি।

তারাকুমার জিজ্ঞাসা করলে,—কতখানা নতুন কাপড় লাগে?

বৃদ্ধ বললে,—বাবু, কাপড়ের খরচাটা আমাদের কিছু বেশী, পাঁচ-সাত হাত কাপড়ের কম এ ছেলে কি ঢাকা দেওয়া যায়!

আসগর আর বৃদ্ধ লোকটা মিলে মৃতদেহ স্নান করাবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। আসগর কিছুক্ষণ খোকার পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে ভাঙ্গা গলায় কেঁদে উঠে বললে,—খোকা, খোকা, তোর কফনের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত যোগাতে পারলুম না বাপ। এ দুঃখু রাখবার যে আর ঠাঁই নাই।

তারাকুমার স্যুটকেস থেকে তার ছেলের অন্নপ্রাশনের চেলিখানা তাড়াতাড়ি বের ক'রে এনে আসগরের হাতে দিয়ে বললে,—তুমি দুঃখু করো না আসগর, এই দিয়ে ছেলেকে তোমার সাজিয়ে দাও।

বৃদ্ধ একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললে,—এটা আপনার কাজে লাগবে না বাবু?

তারাকুমার জবাব দিলে,—কাজে ত লাগলো, এ কাপড় আমি খোকার জন্যে এনেছিলাম।

আসগরের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরতে লাগলো।

শিশুকে গোসল করিয়ে রাঙা টুকটুকে গরদের চেলি দিয়ে 'কফন' সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

আসগর বৃদ্ধকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—নানা, তোমার বাড়ীতে গোটাকতক ঝাঁটি ফুলের গাছ ছিল না?

বৃদ্ধ বললে,—ফুল ত আজ নেই, পাড়ার ছেলেরা কাল কুঁড়িসুদ্ধ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

ফুল ছিল তারাকুমারের সঙ্গেই, শহর থেকে বেরোবার সময়ে কয়েক গাছি মালা সে খরিদ ক'রে এনেছে। মালা ক'গাছি তারাকুমার তাড়াতাড়ি বের করে দিলে, সেই মালা আসগরের খোকার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! লাল টুকটুকে গরদের ওড়নার উপর অজস্র ফুলে ফুলে মৃত শিশুর সারাদেহ ছেয়ে গেল, শিশু যেন আপন মনে হাসছে।

অভাগিনী মা 'দোয়া' পড়বার জন্যে স্থির ভাবে দাঁড়ালো এসে শিশুর পাশে, পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে। ঈশ্বরের কাছে মনে মনে শিশুর জন্যে প্রার্থনা করলে, বললে,—মেহেরবান, বাছাকে আমার ক্ষমা ক'রো।

তার পর তারই চোখের সামনে দিয়ে মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবরস্থলে রওনা হয়ে গেল আসগর, বৃদ্ধ আর তারাকুমার।

হতভাগিনী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

আসগরের ছেলেকে যখন ওরা কবর দিয়ে ফিরলো রাত তখন শেষ হয়ে গেছে। সূর্য্যের সোনালী আলোয় পূবের আকাশ ভ'রে উঠেছে। তারাকুমারের আর অপেক্ষা করা চলে না, বাড়ী যেতে হবে, আজ তার ছেলের অন্নপ্রাশনের সমারোহ।

বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম—ভাঙা আর গড়া, গড়া আর ভাঙা। সুখ-দুঃখের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে বিরাট্ এই চলমান জগৎ। সারাবিশ্বের অনন্ত বুক জুড়ে সৃষ্টির আদি থেকে পাশাপাশি জড়িয়ে রয়েছে লক্ষ কোটি জীবের অন্তহীন অবিচ্ছিন্ন হাসি আর অশ্রুর ইতিহাস। কালের রথচক্র অতীতের চক্রবাল ভেদ ক'রে

বর্ত্তমানের বুকের উপর দিয়ে অবাধ গতিতে ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে—অবিশ্রান্ত অবিরাম। জগতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও ব্যথা-বেদনার কাহিনী শুনবার জন্যে মুহূর্ত্তের তরে থমকে দাঁড়াবার অবকাশ তার কোথায়! কালের চাকা শুধু ঘোরে আর ঘোরে।

কালরাত্রির অবসানে ঘুমন্ত পৃথিবী আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠলো। দিকে দিকে সুরু হ'ল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন কর্ম্মচাঞ্চল্য। দূরে কোন্ একটা কয়লা-খাদের বাঁশী বেজে উঠতেই তারাকুমার সজাগ হয়ে উঠলো, এবার তাকে বেরোতেই হবে।

বৃদ্ধলোকটি আসগরকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল। আসগরের বৌকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা বেরুলো গোসল করতে। তারাকুমার তৈরি হয়ে বললে,—আমি এবার আসি দোস্ত, আর ত আমার দেরি করা চলে না।

আসগর চোখ মুছতে মুছতে বললে,—আপনার এ মেহেরবাণী জীবনে কখনো ভুলবো না বাবু!

তারাকুমার বললে,—খোদাতালাকে ধন্যবাদ দাও, তোমার এ মহাদুঃখের সময় তিনিই আমাকে তোমার এখানে টেনে এনেছিলেন।

আসগর তারাকুমারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—ব্যথাটা আপনার কমেছে বাবু?

তারাকুমার বলে উঠলো,—ও কিছু না, তক্ষুনি সেরে গেছে; সে জন্যে তুমি দুঃখ ক'রো না।

এই ব'লে তারাকুমার দোরের দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় আসগর তার বাইসিকেলখানা চেপে ধরলে, বললে, বাবু, আর একটুখানি আপনাকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, দু-এক মিনিট।

তারাকুমার সেইখানেই থমকে দাঁড়ালো। আসগর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ছোট্ট একটা রঙচটা টিনের ক্যাসবাক্স হাতে ক'রে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে এলো। তারাকুমারের কাছে এসে বললে,—বাবু, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। কয়েকখানা সোনার গহনা আছে এই বাক্সের মধ্যে, কাল সন্ধ্যাবেলা সেই মেয়েটির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম। আপনি দয়া ক'রে নিয়ে যান এগুলো, কোন ভাল কাজে দান ক'রে দেবেন।

ডাকাতি করা পাপের উপার্জ্জন। বাক্সটা ছুঁতে তারাকুমারের প্রবৃত্তি হ'ল না, বললে,—তুমিই এর বিলি-ব্যবস্থা যা হোক একটা ক'রে ফেলো দোস্ত, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন!

আসগর বলে উঠলো,—আমি নিজেকে আর বিশ্বাস করি না বাবু, আমি চোর—আমি খুনে ডাকাত। আপনি এগুলো নিয়ে যান, আমার হয়ে গরীব দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেবেন। আর কিছুক্ষণ এগুলো আমার কাছে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব বাবু, দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান।

আসগর নিজের বুকটা চেপে ধ'রে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলো।

তারাকুমার আর স্থির থাকতে পারলে না, ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলো,—তোমার এ কাজের ভার আমি নিলাম আসগর, তুমি নিশ্চিন্ত হও, অনাথ-আশ্রমে এগুলো আমি জমা দিয়ে দিব।

আসগর গহনার বাক্সটা তারাকুমারের হাতে তুলে দিলে। আসগরের বুক থেকে যেন একটা জগদ্দল পাথরের বোঝা নেমে গেল।

তারাকুমার বাইসিকেলের পিছনে বাক্সটা বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে নিলে। তার পর আসগরের কাছে বিদেয় নিয়ে অজয় নদীর পথ ধরে ধীরে ধীরে রওনা হয়ে গেল।

স্তূপীকৃত বালি ভেঙে তারাকুমার দু'হাত দিয়ে বাইসিকেল ঠেলতে ঠেলতে অজয় নদীর ঠিক মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁচেছে, এমন সময় দূর থেকে কার ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়ালো, দূর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে ডাকছে,—দোস্ত! দোস্ত!

তারাকুমার পিছন ফিরে দেখে আসগর হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে তারি দিকে এগিয়ে আসছে।

তারাকুমারের কাছে এসে আসগর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—একটা জিনিস আপনার সঙ্গে চলে এসেছে বাবু, সেই জন্যে আমাকে আবার ছুটে আসতে হ'ল। খোকার তাবিজটা ঐ গহনার বাক্সের মধ্যে রয়ে গেছে, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

তারাকুমার বাক্স খুলে বের ক'রে দিলে তারই দেওয়া আসগরের খোকার সেই তাবিজ। আসগর সেটা হাতে নিয়েই আকুল আগ্রহে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে, তার পর রুদ্ধ আবেগে ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো,—এ যে আমার খোকার স্মৃতি, এ-জিনিস কি আমি হাতছাড়া করতে পারি!

আসগরের চোখ দুটো জলে ভ'রে গেল। তারাকুমারের মনের কোণে ঘনিয়ে উঠলো নিবিড়তর ব্যথা। কিন্তু বেলা ক্রমে বেড়ে উঠছে, নান্দীমুখের আগেই তাকে বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে হবে। তারাকুমার আসগরকে শান্ত ক'রে বললে,—আজ তাহলে আসি দোস্ত, বেলা হয়ে এলো।

আসগর কপালে হাত ঠেকিয়ে আর এক দফা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে বললে,—আদাব।

তারাকুমার ব'লে উঠলো,—আদাব দোস্ত, আদাব!

প্যারাশুটিষ্ট মাকড়সা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আজকাল "ব্লিৎস্‌ক্রিগের" যুগে "প্যারাশুট" ও "প্যারাশুটিষ্টে"র কথা কাহারও অজানা নাই। কাজেই বাংলা প্রতিশব্দের পরিবর্ত্তে "প্যারাশুটিষ্ট" কথাটাই ব্যবহার করিতেছি। আগুন লাগিলে উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া
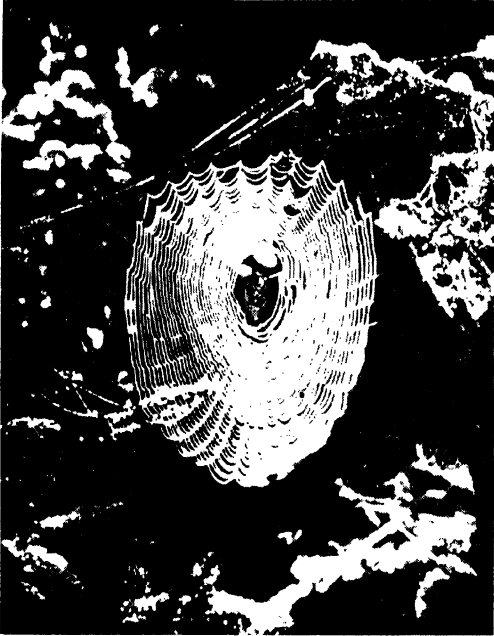
বাচ্চা মাকড়সার নিখুঁত জাল। জালের গায়ে শিশিরবিন্দু লাগিয়া থাকার ফলে এরূপ সাদা দেখাইতেছে

নিরাপদে নিম্নে অবতরণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সর্ব্বপ্রথমে প্যারাশুট ব্যবহৃত হয় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলুন হইতে নিরাপদে লাফাইয়া পড়িবার জন্য প্যারাশুট ব্যবহারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উড়ন্ত এরোপ্লেন হইতে আরোহীদিগকে ভূতলে অবতরণ করাইবার জন্য প্যারাশুটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রকৃতি মানুষকে উড্ডয়নক্ষম করিয়া গঠন করে নাই। বুদ্ধিকৌশলে তাহারা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু বংশ বিস্তার ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জীবজগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি উদ্ভিদ, প্রত্যেকটি প্রাণী এই সহজাত সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাই জীবজগতের সাধারণ নিয়ম। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিবিধ কৌশলের অধিকারী করিয়াছে। উড্ডয়নক্ষমতা তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ব্ব উৎকর্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু পক্ষবিহীন হইয়াও প্রকৃতি-দত্ত অদ্ভুত কৌশলে কোন কোন উদ্ভিদ-বীজ ও প্রাণী বাতাসে ভর করিয়া যে-ভাবে দূরদূরান্তরে আধিপত্য বিস্তার করে তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। আকন্দ, সোনালী, তুলা প্রভৃতির মত অনেক উদ্ভিদ-বীজের নাম করা যাইতে পারে যাহারা প্রকৃতি-দত্ত অপূর্ব কৌশলে বাতাসে উড়িয়া গিয়া দূরদূরান্তরে বংশ বিস্তার করিয়া

ডিমের থলি হইতে বাহির হইয়া মাকড়সার বাচ্চাগুলি সূক্ষ্ম সূত্র হইতে এলোমেলো ভাবে ঝুলিতেছে
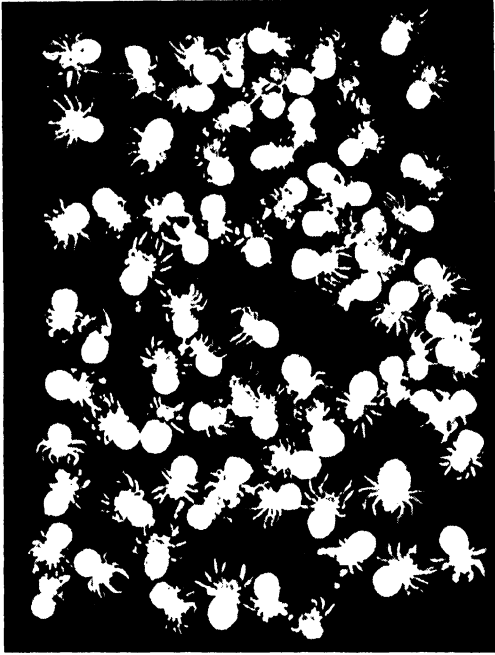
ডিম ফুটিবার পর মাকড়সার বাচ্চাগুলি কয়েক দিন এই ভাবে একত্র অবস্থান করে

থাকে। কীটপতঙ্গের মধ্যে মাকড়সাদের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা মাকড়সার জীবন যাত্রা-প্রণালীর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত নহেন তাঁহারা এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন যে, ডানাশূন্য প্রাণী হইয়াও মাকড়সা আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। গ্লাইডারের সাহায্যে মানুষ যেমন বাতাসে ভাসিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, বিমান ছত্রিকার সাহায্যে প্যারাশুটিষ্ট যেমন বাতাসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে ভূতলে অবতরণ করে, পক্ষবিহীন হইলেও মাকড়সা সেরূপ তাহার সূত্র অবলম্বনে হাওয়ায় ভাসিয়া ইচ্ছামত যে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়া বসতি স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষুদ্রকায় এবং বাচ্চা মাকড়সারাই এইরূপ উড্ডয়ন-ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ পরিণতবয়স্ক মাকড়সারা কিন্তু বাচ্চাদের মত এরূপ গগন-পর্য্যটন করিতে পারে না। অবশ্য পরিণতবয়স্ক মাকড়সারা ইচ্ছা করিলেই অল্প সময়ের মধ্যে সূত্রসাহায্যে দূরতর স্থানে চলিয়া যাইতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

মাকড়সা এক অদ্ভুত জীব। সাধারণ কীটপতঙ্গের সহিত ইহাদের আকৃতি- বা প্রকৃতিগত কোনই সামঞ্জস্য নাই। সাধারণ কীটপতঙ্গের শরীর যেমন মাথা, বুক ও পেট—এই তিন ভাগে বিভক্ত, ইহাদের শারীরিক গঠন সেরূপ নহে। মাথা ও পেটই ইহাদের শরীরের প্রধান অংশ। আটটি পা, আবার চোখও আটটি। পুং-জননেন্দ্রিয় দুইটি; তাহাও আবার মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। সর্ব্বোপরি বৈশিষ্ট্য হইতেছে—শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূতা বাহির করিয়া সুদৃশ্য অথচ শিকার ধরিবার উপযোগী জাল বুনিবার ক্ষমতা এবং সেই সূত্র সাহায্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিবার অপূর্ব্ব দক্ষতা।

"বুড়ীর-সূতা" হয়ত অনেকেই দেখিয়াছেন, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—Gossamer। অনেক সময় দেখা যায়—অতিসূক্ষ্ম লম্বা এক ফালি সূতা অথবা এলোমেলো ভাবে একসঙ্গে জড়িত কতকগুলি ফালি হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গল্পে আছে—চাঁদের মা বুড়ী বসিয়া বসিয়া রাত দিন চরকায় সূতা কাটেন। সেই সূতার বিচ্ছিন্ন বা কর্ত্তিত অংশ হাওয়ায় উড়িয়া আসে। ইহাই "বুড়ীর সূতা"। প্রকৃত প্রস্তাবে এই "বুড়ীর সূতা"ই বাচ্চা মাকড়সাদের প্যারাশুট। এই প্যারাশুট অবলম্বন করিয়াই বাচ্চা মাকড়সারা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে মাকড়সা পুষিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। জাল বুনিয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দ-

সূতায় জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে কয়েকটি বাচ্চা বাতাসে ভাসিতেছে

বহুসংখ্যক বাচ্চা মাকড়সা একযোগে সূতার পর্দা নির্মাণ করিয়াছে

মনে বাস করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে কতকগুলি ঝুলানো ফ্রেমের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিতে এক-একটি বড় মাকড়সা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক রাত্রি পার হইতেই দেখি—জাল বোনা তো দূরের কথা, প্রত্যেকটি ফ্রেম হইতেই মাকড়সাগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর পরীক্ষাগারের দেওয়ালের এক কোণে তাহাদের দুইটির মাত্র সন্ধান পাইলাম। বাকীগুলির কোনই সন্ধান মিলিল না। একমাত্র ঝুলানো তার বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া ব্যতীত মাকড়সাগুলির পলায়ন করিবার অন্য কোন রাস্তাই ছিল না। কাজেই পুনরায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঝুলানো তারের সহিত এমন একটা বৈদ্যুতিক কৌশল সংযোগ করিয়া দিলাম যাহাতে তার বাহিয়া উপরে উঠিতে গেলেই বৈদ্যুতিক "শক্" লাগিয়া মাকড়সা নিম্নে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে ফ্রেম হইতে পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া পুনরায় এক-একটি মাকড়সা ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, ফ্রেম হইতে পলায়ন করিবার উপায় না দেখিলে এক দিনেই হউক, দুই দিনেই হউক পেটের দায়ে অবশেষে জাল বুনিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু পর দিন পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়াই অবাক্ হইয়া গেলাম। এবারও প্রত্যেকটি ফ্রেম খালি। কোথাও একটি মাকড়সা খুঁজিয়া পাইলাম না। ফ্রেম হইতে বাহির হইবার কোন রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও ইহারা উধাও হইল কেমন করিয়া? কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। আবার নূতন মাকড়সা ধরিয়া আনিয়া ফ্রেমে বসাইয়া দিলাম। এবারও ঠিক পূর্বের মত অবস্থা ঘটিল। কিন্তু এবার এক দিকের দেয়ালের কোণে মস্ত একটা জাল বুনিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ফ্রেম হইতে পলায়ন করিয়া মাকড়সাটা শিকার ধরিবার আশায় জাল বুনিয়াছিল। আমার নির্দ্দেশিত স্থানে না হউক, একটা মাকড়সাও অন্ততঃ লেবরেটরীর মধ্যেই জাল পাতিয়াছে—আপাততঃ ইহাতেই কিঞ্চিৎ স্বস্তি অনুভব করিলাম এবং ইহার সাহায্যেই পরীক্ষা চালাইতে উদ্যোগী হইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে সর্ব্বদাই এই কথাটা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল যে, বাহিরের কোন কিছুর সহিত যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও ফ্রেম হইতে মাকড়সারা অদৃশ্য হইল কেমন করিয়া? তবে কি সূতার সাহায্যে নীচে ঝুলিয়া পড়ে? কিন্তু তাহাও সম্ভব মনে হইল না, কারণ অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়িলে কীটপতঙ্গেরা সাধারণতঃ ঊর্দ্ধদিক ছাড়া যেমন নিম্নগামী হইতে চাহে না, ইহাদের স্বভাবও সেইরূপ। তথাপি কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। এবারে ঝুলানো ফ্রেমগুলির ঠিক নীচে, মেঝের উপর মসৃণ উঁচু কানাওয়ালা বড় বড় কতকগুলি জলপাত্র স্থাপন করিলাম। উদ্দেশ্য, বৈদ্যুতিক "শকে"র ভয়ে মাকড়সা উপরের দিকে তো উঠিতেই পারিবে না, আবার নীচে নামিতে গেলে জলে ডুবিতে হইবে। কারণ সাঁতার কাটিয়া কোনক্রমে কিনারায় যাইতে পারিলেও খাড়া কানার মসৃণ গা বাহিয়া

শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া এপিরা মাকড়সা হাওয়ায় সূতা ছাড়িতেছে

বায়ুস্রোতের অভাবে কাচপাত্রের মধ্যে মাকড়সা এলোমেলোভাবে সূতা বুনিয়াছে

উপরে উঠিবার উপায় থাকিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যবস্থায়ও মাকড়সাগুলিকে ফ্রেমে বন্দী রাখিতে সমর্থ হইলাম না। জলের পরিবর্ত্তে নীচে তাড়িতিক জাল পাতিয়া রাখিলাম যেন সেখানে অবতরণ করিবামাত্রই তড়িতাহত হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও দেখা গেল মাকড়সারা ফ্রেম হইতে বাহির হইয়া দেয়াল বা ছাতের কড়িবরগার গায়ে দিব্যি সুস্থ শরীরে অবস্থান করিতেছে। একমাত্র উড়িবার ক্ষমতা থাকিলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হইতে পারিত; কিন্তু সেরূপ ক্ষমতা তো মাকড়সার নাই! ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর হইলেও কোনক্রমেই তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে না পারিয়া অবশেষে চতুষ্কোণ ট্যাঙ্কের মত বড় বড় কতকগুলি কাচের জারে মাকড়সা রাখিয়া তারের জালে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুনই হউক অথবা বদ্ধ পাত্রের তাপাধিক্যের ফলেই হউক মাকড়সাগুলি দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত জাল পাতিবার কোনই লক্ষণ দেখাইল না। তাহারা কাচপাত্রের এক কোণে গুটিসুটি হইয়া বসিয়া রহিল। খাবার লোভ দেখাইয়া জাল পাতিবার জন্য উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক পাত্রের অভ্যন্তরে এক-একটি জীবন্ত ফড়িং ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু মাকড়সারা তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। আশঙ্কা হইতেছিল, খাইতে না পাইলে মাকড়সাগুলি শীঘ্রই মরিয়া যাইবে, কারণ জাল বুনিতে না পারিলে শিকার মুখের কাছে ধরিলেও তাহারা তাহাকে স্পর্শ করে না। পরে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। চার-পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, একটা মাকড়সা কাচপাত্রের অভ্যন্তরে আড়াআড়ি ভাবে দুই-চারিটি সূতার টানা দিয়াছে। ভাবিলাম এবার নিশ্চয়ই জাল বুনিবে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। জাল আর বুনিল না, ঐ সূতার টানার নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল। আরও দুই-তিন দিন কাটিয়া গেল। এক দিন দেখিলাম, ঐ সূতার সঙ্গে একটি থলি বুনিয়া মাকড়সা তাহাতে ডিম পাড়িয়াছে। ডিম পাড়িবার পর চার দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। মাকড়সাসমেত কাচপাত্রটিকে টেবিলের উপর রাখিয়া যন্ত্রসহযোগে ডিমের থলিটির বয়ন-কৌশল পরীক্ষা করিতেছিলাম। পাত্রের ঢাকনাটি খোলাই ছিল। কিছু দূরে টেবিল-ফ্যান চলিতেছে। প্রথমে মাকড়সাটা এক কোণে হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছিল। খানিক বাদেই সে যেন চাঙ্গা হইয়া উঠিল। পাগুলি কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া দুই-এক বার
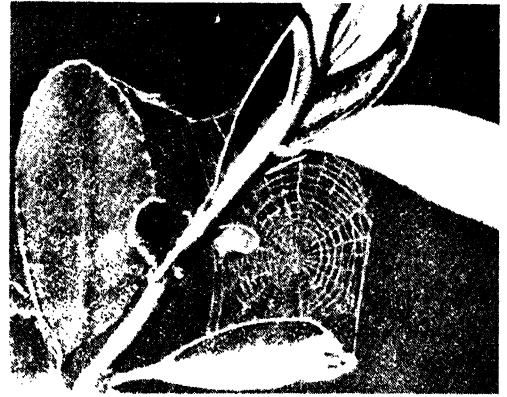
বায়ুসাহায্যে দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া বাচ্চা মাকড়সা গাছের ডালে জাল পাতিয়াছে

এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বসিল। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর কাচের গা বাহিয়া মাকড়সাটা ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিয়া পাত্রের কানার উপর বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অত বড় লম্বা পা লইয়া অপ্রশস্ত স্থানে বসিবার সুবিধা হইতেছিল না বলিয়া দুই-তিন বার

বাচ্চা মাকড়সাগুলি একসঙ্গে ঘাসের মধ্যে এলোমেলোভাবে অজস্র সূতা ছাড়িয়া লম্বমান পর্দা তৈয়ারী করিয়াছে

পিছলাইয়া পড়িয়াও অবশেষে টাল সামলাইয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হাওয়ার মধ্যে উঁচু করিয়া তুলিল। পাখাটা মাঝামাঝি বেগে চলিতেছিল। আমার চোখে মুখে সূক্ষ্ম আঁশের মত কিছু জড়াইয়া যাইতেছে অনুভব করিলাম। যতই মুছিয়া ফেলি ততই যেন আরও বেশী লাগিতেছিল। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম মাকড়সাটা শরীরের পশ্চাদ্দেশ উঁচু করিয়া বাতাসে সূতা ছাড়িতেছে প্রথম দিকের সূতাটা এত সূক্ষ্ম যে মোটেই নজরে পড়ে নাই। পরে ক্রমশঃ মোটা সূতা বাহির করিতেছিল। তখন এক পাশে সরিয়া গেলাম। ক্রমশঃ দ্রুতবেগে লম্বা হইতে হইতে সূতার প্রান্তভাগ দেওয়ালে ঠেকিয়া আটকাইয়া গেল। সূতাটা কিছুতে আটকাইয়াছে কি না বুঝিবার জন্য মাকড়সা তাহার পিছনের পা দিয়া কয়েক বার টানিয়া দেখিল। যেমন করিয়াই হউক সে বুঝিল যে, সূতাটা কিছুতে আটকাইয়া থাকিলেও ঢিলা ভাবে রহিয়াছে। তখন সে পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে সূতাটাকে গুটাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ গুটাইবার পর সূতাটা টান হইতেই তাহা কাচপাত্রের গায়ে জুড়িয়া দিয়া সেই সূত্র অবলম্বনে নীচের দিকে ঝুলিতে ঝুলিতে দেওয়ালে গিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রেম হইতে মাকড়সাগুলি কেমন করিয়া পলাইয়া যাইত, এ ব্যাপার দেখিয়া তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। পর্য্যবেক্ষণের ফলে আরও বুঝিতে পারিলাম যে, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা প্রায়ই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকে। অবশ্য জালে শিকার পড়িলে আলাদা কথা। কিন্তু শিকার বেশীর ভাগ রাত্রিতেই জালে পড়ে। কদাচিৎ কোন গতিকেই দুই একটা শিকার দিনের বেলায় জালে আটকাইতে দেখা যায়। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় ইহাদিগকে সূতার সাহায্যে পলায়ন করিতে দেখি নাই। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার পর ইহাদিগকে দিয়া আমার ইচ্ছানুযায়ী ফ্রেমে জাল পাতিবার ব্যবস্থা করিতে আর কোনই অসুবিধা ঘটে নাই।

যাহা হউক, এই ঘটনার প্রায় দিন-দশেক পর কাচ-পাত্রটার মধ্যেই মাকড়সার ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইল। সংখ্যায় তাহারা এক শতেরও বেশী হইবে। কতকগুলি বাচ্চা ডিমের থলিটার উপর, কতকগুলি কাচের গায়ে বসিয়াছিল এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতা হইতে ঝুলিতেছিল। এতগুলি বাচ্চাকে কি খাওয়াইয়া কেমন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ভাবিলাম দেখা যাউক, যদি দুই-একটা বাচ্চাকে অনাহারে মরিতে দেখা যায় তখন ছাড়িয়া দিলেই হইবে। তার পর অন্যান্য মাকড়সাগুলিকে লইয়া পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায় বাচ্চাগুলির কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ মনে পড়িতেই দেখিলাম—বাচ্চাগুলি অনাহারে মরা দূরে থাক্ কাচের জারের মধ্যে অজস্র সূতা বুনিয়া অনেকগুলি পাতলা সাদা কাগজের ফালির মত

ডিম হইতে বাহির হইয়া বাচ্চা মাকড়সাগুলি একস্থলে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে
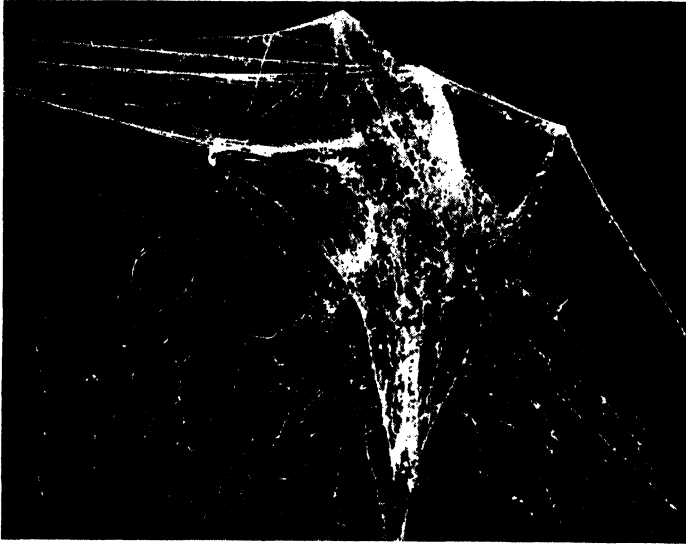
বায়ুপ্রবাহশূন্য আবদ্ধ ঘরে আমাদের দেশীয় এপিরা জাতীয় বাচ্চা মাকড়সারা সূতার পর্দ্দা তৈয়ারী করিয়াছে

হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের কৌশল সম্যক অবগত হইবার জন্য বিবিধ পরীক্ষার ফলে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলাম।

মোটের উপর বাচ্চা মাকড়সা-গুলিকেই প্যারাশুটিষ্ট আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ ইহারা নিজ নিজ দেহনিঃসৃত সূতায় ভর করিয়া অনুকূল বায়ুস্রোতে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতে পারে। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা ছাড়া পরিণতবয়স্ক মাকড়সারা মোটেই হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। খোলা জায়গায় একটু বাতাস বহিতে থাকিলেই বাচ্চা মাকড়সাগুলি লতাপাতা বাহিয়া উপরে উঠিয়া উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হয় এবং বায়ুস্রোতের দিকে মুখ করিয়া পাগুলিকে

পদার্থে সেটাকে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। কাচের পাত্রটা এখন অর্দ্ধস্বচ্ছ বা অস্বচ্ছই বোধ হইতেছে। হাওয়ার মধ্যে সূতা ছাড়িবার পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া বাচ্চাগুলির সম্বন্ধেও কৌতূহল জাগ্রত হইল। পাত্রটাকে তখন টেবল-ফ্যানের বিপরীত দিকে বসাইয়া জালের ঢাক্‌না খুলিয়া দিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! বায়ুস্রোতের সন্ধান পাইয়াই বাচ্চাগুলি একে একে উঠিয়া আসিয়া পাত্রের কানার উপর জমায়েৎ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু হাওয়ার জোরে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। পাখার ঘূর্ণনবেগ যথাসম্ভব কমাইয়া দিতেই দেখি—বাচ্চাগুলি কানার উপর উঠিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া তুলিল এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বাতাসে সূতা ছাড়িতে আরম্ভ করিল। সূতা এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষ্যই হয় না। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাগুলি যেন হাওয়ায় উড়িয়াই পাখার বিপরীত দিকস্থ দেওয়ালে বসিতে লাগিল। বড় মাকড়সাটা যেমন সূতা বাহিয়া দেওয়ালে গিয়াছিল এগুলিকে সেরূপ কিছুই করিতে দেখিলাম না। প্রায় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই সবগুলি বাচ্চা দেওয়ালের খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার পর বাচ্চাগুলির এক স্থান

প্রায় একত্র উঁচু করিয়া তোলে। তার পর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া সূতা ছাড়িতে থাকে। বাতাসের টানে সূতাটা কিছু দূর প্রসারিত হইলেই যখন বুঝিতে পারে সূতায় যথেষ্ট বাতাস আটকাইতেছে, তখন অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া সূতার সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া যায়। অনুকূল বায়ুভরে সূতায় ভর করিয়া বাচ্চাগুলি বহু দূর চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ সূত্র অবলম্বনে মাকড়সাকে উপকূল ভাগ হইতে প্রায় দুই শত মাইল দূরে জাহাজের উপর অবতরণ করিতেও দেখা গিয়াছে। উড়িতে উড়িতে ইহারা ইচ্ছামত যে কোন স্থানে অবতরণ করিতে পারে। এই কৌশলটি আরও অদ্ভুত। কোন স্থানে নামিতে ইচ্ছা হইলেই পায়ের সাহায্যে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সূতাটাকে গুটাইতে থাকে। সূতার দৈর্ঘ্য কমিয়া গেলেই তাহাতে আর বেশী বাতাস আটকাইতে পারে না; তখন প্যারাশুটিষ্টের মত ধীরে ধীরে নির্ব্বিঘ্নে নিম্নে অবতরণ করে। অবশ্য প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে অথবা স্থান-নির্ব্বাচনের ভুলে অনেকে বেঘোরে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হয়; কিন্তু সেটা ভিন্ন কথা। উপর হইতে নীচে নামিবার কালে তাহাদিগকে মোটেই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। নূতন স্থানে উপস্থিত হইয়াই তাহারা অতি ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ নিখুঁত জাল বুনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-

পতঙ্গ শিকার করিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। শিকারের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের শরীর দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধি হইলে ইহারা খোলস পরিত্যাগ করে। তখন দেহের ওজন বৃদ্ধির দরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা আর গগন-পর্য্যটনে সমর্থ হয় না। কাজেই তখন দূরবর্ত্তী স্থানে, সুতা আটকাইয়া স্থানান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু বাতাস চলাচল করিতে পারে না এরূপ আবদ্ধ কুঠরি বা পাত্রের মধ্যে থাকিলে বাচ্চা মাকড়সারা একই স্থানে জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান করে এবং যদৃচ্ছ সুতা বাহির করিয়া এলোমেলো ভাবে পাতলা চাদরের মত আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলে। কারণ, বাতাসের সাহায্য ব্যতিরেকে, বড়ই হউক আর ছোটই হউক, কোন মাকড়সাই জালের প্রাথমিক কাঠামো তৈয়ারী করিতে পারে না। বায়ুস্রোতরহিত কোন স্থানে আবদ্ধ থাকিলে বাচ্চাগুলি জন্মগত সংস্কারবশে জাল বুনিতে চেষ্টা করিলেও সেগুলি জাল না হইয়া কতকগুলি এলোমেলো সুতার স্তূপে পরিণত হয়। আমাদের দেশীয় এপিরা, নেফিলা ও অন্যান্য বিভিন্ন গণভুক্ত বহুজাতীয় মাকড়সার বাচ্চা লইয়া পরীক্ষার ফলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বদ্ধ পাত্র হইতে উন্মুক্ত স্থানে ছাড়িয়া দিলে একটু বায়ুপ্রবাহ অনুভব করিলেই তৎক্ষণাৎ সুতা ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়া যায়। কখন কখন আবার বিভিন্ন সুতা একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া কয়েকটি একত্র বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। ডিম হইতে বাহির হইবার পর বাচ্চাগুলিকে প্রায়ই দলবদ্ধভাবে সুতা হইতে ঝুলিতে দেখা যায়। চার-পাঁচ দিন পর ক্রমশঃ সুতার সাহায্যে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বাচ্চাদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্ন গৌণ হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-রক্ষার জন্য ছড়াইয়া পড়ার একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মাকড়সারা সুবিধা পাইলেই একে অন্যকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এক মাতৃগর্ভসম্ভূত বাচ্চাদের মধ্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমন কি, সুবিধা পাইলে মাও সন্তানদের রেহাই দেয় না। তাছাড়া অন্যান্য শত্রুর অভাব নাই। কাজেই আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য ইহাদিগকে বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। তাহার মধ্যে উড্ডয়নকৌশল ও অনুকরণ-ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বহারা কৃষকের অস্থিচর্ম্মসার
ম্লানমূর্ত্তি জাগাইল অন্তরে তোমার
সুতীব্র বেদনাবোধ। হেরিলে নয়নে
শৃঙ্খলিতা জন্মভূমি ভূতল-শয়নে
ফেলিছে অন্তিমশ্বাস। অন্তরের আলো
কল্যাণের পথ-রেখা নিমেষে দেখালো।
চলন্ত কঙ্কাল হবে জীবন্ত মানব—
দেশ যদি ফিরে পায় মুক্তির গৌরব।
সেই মুক্তি একতায়। ওগো মহাজ্ঞানি,
শতধাবিচ্ছিন্ন দেশে তুমি দিলে আনি
সুবিপুল ঐক্যবোধ করি উচ্চারণ
বন্দেমাতরম্ মন্ত্র। মহাজাগরণ
আনিলে ঘুমের দেশে। শিখাইলে তুমি-
আমাদের সকলেরই এক মাতৃভূমি।

সাহিত্য, গান, ছবি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসু গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সে সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্য শিল্প নিয়ে দিন কয়েক কিছু আলোচনা হয়। দেখছি বুদ্ধদেব তার নোট রেখেছিলেন এবং তাই নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ গড়ে তুলেছেন। মুখে মুখে যে সকল আলাপ হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। স্থলবিশেষে সব কথা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না, রোগজীর্ণ শরীরের দুর্বল স্মৃতির পক্ষে তা মনে করে বলাও অসম্ভব।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

"কবিতা" পত্রিকার এবারকার সংখ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ একটা যুগের আনন্দের স্মৃতি বিচিত্র পন্থায় তোমরা এখানে এনেছ। পণ্ডিতরা বিচার ক'রে সাহিত্যের ভালোমন্দের স্থির করেন। কিন্তু তোমরা একত্র করেছ বিশুদ্ধ উপভোগের আনন্দ। "আমরা খুশি হয়েছি", একথা তোমরা খুব ভালো করেই বলেছ। আমার কাছে এইটেই খুব ভালো লেগেছে। এটাই সত্যিকার সমালোচনা।

আমার পালা শেষ হয়ে এসেছে। এখন বিদায়ের পালা। আমাদের দেশে বিদায়ের একটা রীতি আছে;—এখন নেবো আমার কবি-বিদায়। এ অনুষ্ঠানকে পাণ্ডিত্য দিয়ে বিকৃত কোরো না তোমরা। সর্বজনের আনন্দধ্বনি তোমরা সমবেত করেছ। আনন্দ ভোগ করবার শক্তি আছে তোমাদের, সে পরিচয় পেলুম।

আমি মানি সাহিত্যের দুটো ক্ষেত্র আছে, একটা আনন্দের, একটা বিচারের। কিন্তু বিচার করতে বসে শুধু যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ঘাটন করি, তাতে লাভ নেই। সমালোচকের কাজ Physiologyকে খুলে দেখানো নয়, Physiognomyকে প্রকাশ করা। আমাদের দেশে নানা বই-পড়া বিদ্যেকে জাহির করাই সমালোচনা বলে। আমি তা মানি নে। এক দিকে আছে ভোজ্যবস্তু, অন্য দিকে আছে ভোক্তা, এ দুয়ের মিলন ঘটানোই সমালোচনা। ভোজ্যবস্তুটা মোগল না পাঠান, সামন্ততন্ত্রী না ধনতন্ত্রী, সে খোঁজে কাজ নেই। রস জমেছে ভালো লেগেছে, এ কথাটাই ভাল করে বলো। এর মধ্যে পাণ্ডিত্য এনো না।

এ কথাটা আমি মানি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লীরিক প্রতিভাতেই সব চেয়ে বড়ো। আমি নিশ্চিত জানি যে আমার কবিতা গল্প নাটকের ভাগ্যে ভবিষ্যতের দরবারে যা-ই জুটুক, আমার গান বাঙালি জাতিকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই হবে সকলকে, বাংলার ঘরে ঘরে, প্রান্তরে, নদীতীরে। ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখেছি, গানও লিখেছি; এটা দেখেছি গান যেন আমার অবচেতন মন থেকে উৎসারিত, সেই জন্যেই ওতে একটি সম্পূর্ণতা আছে, তোমরা হয়তো যাকে বলবে অনির্বচনীয়তা। গান কোনো তত্ত্ব কি তর্ক নিয়ে আসে না, তাই তার ঠিক বিচারও চলে না। "কবিতা" পত্রিকায় আমার সুর সম্বন্ধে যিনি লিখেছেন, তিনি সুরের technicalities সম্বন্ধে কিছু জানেন বলে মনে হ'লো। তিনি অনেক জিনিষ আবিষ্কার করেছেন আমার সুর থেকে, কিন্তু সে সব বিষয়ে আমি সচেতন নই। দিনুকে যখন আমার গান শেখাতুম তিনি হঠাৎ হয়তো ব'লে উঠতেন, এইখানে কোমল নিখাদ লেগেছে। আমি অবাক হয়ে বলতুম, তাই নাকি? ছেলেবেলায় দেখেছি

আমাদের বাড়িতে বড়ো বড়ো গাইয়েদের আনাগোনা, শুনেছি অনেক গান, কিন্তু গান শেখার মতো করে কখনো শিখি নি।

অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বলো যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে! কিংবা ধরো একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ এক দিন চলে যেতে হলো শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দেখেছি একজন পুরুষকে নিয়ে দু-জন মেয়ের রেষারেষি হানাহানি, দেখেছি পুত্রবধূর পরে মার সুতীব্র বিদ্বেষ, আমার 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' পড়লে তা বুঝতে পারবে। তোমরা জানো না—আমরা জন্ম নিয়েছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। আমাদের সময়ে বাংলার বিধাতাপুরুষ স্ত্রীলোক গড়েন নি। তখন মেয়েদের কাছে এগোতেই সাহস হতো না। আমরা মেয়েদের খুঁজে বেড়িয়েছি, কল্পনায় গড়েছি, কবিতায় রচনা করেছি মানস-সুন্দরীকে। এ হোলো কবিতার কথা, কিন্তু গল্পের উপাদান এ নয়। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পারো, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরো-পুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বলো, বলো যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি', এ-সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হ'তো জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারতো? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভাল লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ততন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পারো, যা মেটাবার রস তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারবো না বঙ্কিমকে, নিশ্চয়ই বলবো তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। কী dull সমাজ ছিল তখন! তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার লড়াই

ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য, যে, বাংলা দেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিলো,—আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিলো আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফললো ইংরেজ আসার দরুন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হতো, আজ আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়া-মাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বঙ্কিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম, তা ভুলতে পারি নে। এখন তোমরা বলো তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার সুখ দুঃখ ভালোবাসা কি তখন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স।

আর একটা কথা তোমাদের বলি। আজকালকার সমালোচনায় দেখি বড্ড নামকরণের উপর ঝোঁক—কে বুর্জোয়া, কে ফিউড্যাল, এই সব কথা। এ সব বাজে। আর্ট কখনো দাগা বুলিয়ে চলে না, সে আপনাতে আপনি প্রকাশিত। বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে, বললেন আমি তো এই দিলুম, এবার নিজেকে সম্পূর্ণ করো। সেই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। আর্ট যেখানে বড়ো সেখানে মহৎকে, সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মানতে চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টল্‌তো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য,—হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এ সব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, কিন্তু তাঁরা মহাপ্রাণ, আমাদের প্রণম্য। তুমি কি বলবে, আজ আমাদের জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য ব'লে আকাশে চাঁদ ওঠে না, মানুষ ভালোবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কী? তাতে তো কোনো মানুষের কোনো উপকার হবে না, কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।

কর্মজীবনে আমিও নেমেছিলুম এক দিন, চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের মানুষের দুর্গতি দূর করতে। হয়তো সে আমার অনধিকারচর্চা, হয়তো তাতে সার্থকও হই নি, ভালো রকম করতে পারি নি। কী করেই বা পারবো—সারাজীবন চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে এসেছি; ও তো সত্যি আমার কাজ নয়। কিন্তু বেদনা বেজেছে বুকে, চুপ করে থাকতে পারি নি।

তবু আসলে আমি তো কর্মী নই; আমি কবি, আমি শিল্পী। কবিতা লিখেছি, গল্প লিখেছি, গান বেঁধেছি, ছবিও এঁকেছি। আমার ছবি নিয়ে তোমরা আলোচনা করছ, ওসব আমি ঠিক গ্রহণ করতে পারি নে। সমালোচকেরা কথায় কথায় বড়ো বড়ো বিদেশী শিল্পীদের নাম করেন। তাঁদের সমালোচনা পড়ে যদি বা কিছু বুঝি, অন্তরে প্রবেশ করে না। ছবিটা ছবিই, তার বেশি কিছু নয়, তার কমও না।* সব ছবিই ছবি—ভারতীয়, অজন্টীয়, ও সব কিছু না। ভিতরের থেকে এলো তো এলো,

* রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রায়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

না এলো তো এলো না। চেয়ে দেখো, ছবিটা ছবি হয়েছে কি না। কিন্তু দেখবার দৃষ্টি কই আমাদের? তার জন্যে অনেক দিনের অভ্যেস চাই। সে অভ্যেস আমাদের দেশে নেই বললেই চলে।

এক সময়ে আমি ছবি আঁকতে বসলুম। আমার মনে খানিকটা background অবশ্য ছিল,—অবনীন্দ্রকে নন্দলালকে ছবি আঁকতে দেখেছি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যেটা এলো, সেটা কোনো নোটিশ দিয়ে আসে নি। তোমাদের বলি, কেমন করে আমি আঁকা শুরু করলুম। কবিতা লিখতে লিখতে কাটাকুটি করতুম, সেই কাটাকুটিগুলো যেন রূপ নিতে চাইতো, তারা হতে চাইতো, জন্ম নিতে চাইতো, তাদের সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করতে পারতুম না। প'ড়ে থাকতো লেখা, সেই কাটাকুটি-গুলোকে রূপে ফলাতুম, পারতুম না তাদের প্রেতলোকে ফেলে রাখতে। এই ভাবে আমার ছবির পালা শুরু। তোমরা যখন আঙ্গিকের কথা, বর্ণবিন্যাসের কথা বলো, আমার অবাক লাগে। আমার মনের মধ্যেই আছে ছবির ছায়া, তুলির আঁচড়ে তা ফুটে ওঠে—কেমন করে, তা বলতে পারবো না। এখনো আমার মনে কত ছবি উঁকিঝুঁকি দেয়, আঁকতে পারি নে, দৃষ্টি গেছে। ভেবেছিলেম শেষ জীবন ছবি এঁকে কাটাবো, বিধাতা তাও কেড়ে নিলেন।

এই তো আমার তিন পর্যায়—সাহিত্য, গান, ছবি। এদের ভিতর দিয়ে আমি প্রকাশ করেছি আমাকে, আমার আনন্দকে। আজকে শুনলুম তোমরাও আনন্দ পেয়েছ। মনে হচ্ছে ব্যর্থ হই নি আমি, যাবার সময় এই বিশ্বাস যদি নিয়ে যেতে পারি, তবে বুঝব কিছু পেলাম্।

সাহিত্য, শিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, কবি তাহা স্বীয় অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব সংশোধন করাইয়া এবং কোন কোন অংশ বর্জন করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত এই ছোট প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

সেদিন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা বলবার বিষয় ছিল তা বেশী কিছু নয়, কেবলমাত্র এই যে,—মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার প'ড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন ক'রে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্ত্তি নিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়—আপনাকে চেনে। বড় বড় মহাকাব্যে, মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প তার সাহিত্য। দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্য সাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশী। যদি সে কোনও

অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে, তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে, তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে, কৃত্রিম ; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে- ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা, সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প একটা বড় পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।

বদনাম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ;—সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্সপেক্‌টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমর-বন্ধ, হাফ-প্যান্ট-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নী এসে খুলে দিলেন। ইন্সপেক্‌টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন—"এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি, তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশশুদ্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাসের খেলা হচ্ছে।" ইন্সপেক্‌টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেক নজর আছে কি ভাগ্যিস। ও বেল্‌-এ খালাস আসামীই বটে, তবু পুলিসে না রিপোর্ট ক'রে কোথাও যাবার হুকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল,—'ইন্সপেক্‌টারবাবু ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আসছি।' কোথায় সভা তার কোন সন্ধান নেই। পুলিসে ও যেন ভেলকি খেলছে।" স্ত্রী সৌদামিনী বললে, "শোন তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শুনলে তোমার তাক্ লেগে যাবে। লোকটার কী আস্পর্ধা, কী বুকের পাটা! রাত্তির তখন ছুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বসলুম।'... সত্যিকথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল স্নেহ। মনে হোলো এক রাত্তিরের জন্য আমি ভাইকে পেয়েছি। সে বললে, 'দিদি, আজ তিন দিন কোনোমতে আধ-পেটা খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হবো।' তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়ালুম। বললুম—এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে। লোকটা বললে, 'কোনো ভয় নেই,

তিনি আমারি সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারবো।' বলে তোমারি জন্যে সাজা পান টপ্‌ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা 'ইন্সপেক্‌টারবাবু হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন; তারি একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে; তারা আজ সভা করবে।' তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে নির্ভয়ে সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

ইন্সপেক্‌টারবাবু বললেন, "নামটা কী, শুনতে পারি কি।"

সদু বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্‌দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হোলো? আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব? তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে?"

ইন্সপেক্‌টার চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সুযোগটাও কেটে গেল।" বসে বসে তাঁর নবাবী ছাঁদের গোঁফ জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরী দ্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মুখে রুচল না।

এই গেল এই গল্পের প্রথম পালা।

দ্বিতীয়

সদু স্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ। আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডের নাগাল পেয়েছ নাকি।"

"পেয়েছি বৈ কি।"

"কী রকম শুনি।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওখানে চরগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জঙ্গলে ওদের একটা মস্ত সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জঙ্গল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড় বড় ফুটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন? এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদু? এমন সুযোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো; ও মোচকাঠির জঙ্গল ওসব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা তুমি যদি লুকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তাহলে সবই সম্ভব হবে।"

"দেখো, অমন চালাকী কোরো না। বোকামি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের ঘরের বৌকে নিয়ে—" কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সঙ্গে।

"সত্থ, আমি দেখেছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো?"

"তা নেবো, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি করো তা যদি জানতে পারতুম তা হ'লে ওদের কাছে ফাঁস ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শুনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাখতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈ কি।"

"কানে যায়, আর তার পরে?"

"আর তার পরে চণ্ডীদাস বলেছেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্‌টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা বুঝবার বুদ্ধিই যদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্‌সপেক্‌টরি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদুর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তাহলে সেই যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখো কুকুরটা চেঁচিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

ইন্‌সপেক্‌টার বাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গুলি।"

সত্থ তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কক্ষনো তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন?"

তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুঁটি ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সত্থ, সেই অনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি ছুটোর সময়ে ও-ই যে তোমায় ডাক দিচ্ছে না, তাই বা বলি কী করে?"

সত্থ একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "এ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ। এই রইল তোমার ঘর-কন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে।" এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে কোথায় যাও, ভালো মুস্কিল, নিজের ঘরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জন্যে পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।" ব'লে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সত্থ কেবলই চোখ মুছতে লাগল।

"আহা কী করছো, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাট্টা নিয়ে।"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"
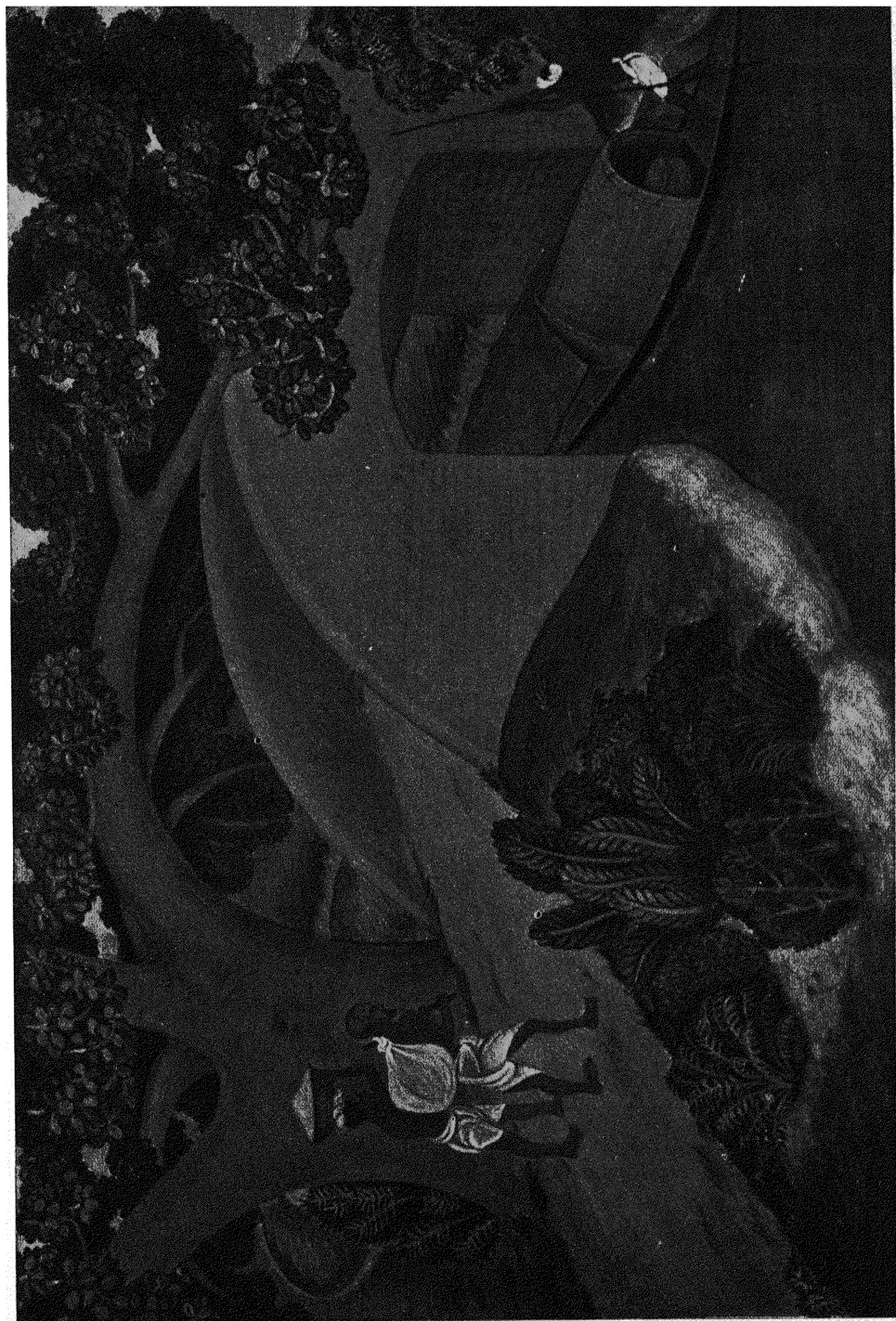
সেতু
শ্রীসুখময় মিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"আচ্ছা, আচ্ছা ব্যস—রইলো, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পুডিং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন আমি বুঝতেই পারি না

সত্থ বললে, "তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝবে না। পুত্রহীনা মেয়ের বুকে যে স্নেহ জমে থাকে সে যে-কোনও একটা প্রাণীকে পেলে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই ভয় হোতে থাকে, কে ওকে কোন দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাই তো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢুকে রাখি।"

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সত্থ কোনও জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"তা যতদিন বাঁচে, ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাবু বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিসের দলবল জুটলো, চললো সবাই আলাদা আলাদা রাস্তায় মোচকাঠির দিকে। বহু দূরের পথ, প্রায় রাত পুইয়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শুকিয়ে ইন্সপেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সত্থ, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে, তোমার কথাই সত্যি। পুলিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে, চীৎকার করে বলতে লাগলে কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গুলি চালাবো। অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চললো, কোনো সাড়া নেই। পুলিসের লোক খুব সাবধানে বনের মধ্যে ঢুকে তল্লাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠলো, ধর সেই নিতাইকে, বদমাইসকে। নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না।

একখানা চিঠি পাওয়া গেল কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।'

"দেখ দেখি কী কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষকালে"—

"শেষকালে আবার কী? পুলিসের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পাবে না; সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী থামের ছাপমারা। আমি আর কিছু বলব না। এখন তুমি একটু শোও, একটু ঘুমোও।"

ঘুম ভাঙল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল দিয়ে চারদিকে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ ক'রে শূন্যে আসন করে—এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে—ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয়—রীতিমতো নৈবেদ্য। সকালবেলা উঠে দেখে তার কোনও চিহ্ন নেই। হিন্দু পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেঁষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির দাঙ্গার পরে ওকে গ্রেপ্তার করেছিল। হপ্তা খানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেইজন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশী আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে—একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দুহাত অন্তর এক একটি পদক্ষেপ—দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ে আর কি। এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধরপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি

মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাবো, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুণে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরও সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাতকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হোলো। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছুদিন বেল্-এ খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁয়া লাগিয়ে দিলে। এদিকে পিছনে পিছনে প্রোপাগাণ্ডা চলছেই, নানা রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনেষ্টবল অত্যন্ত গদগদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হোলো না। ক'দিনের মধ্যে চারদিকে একেবারে গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন ধনী মাড়োয়ারী ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে—লোকটার পড়াশুনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগলো। এবারকার বেল্-এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মস্ত সমস্যা বাধলো।

"সত্নু, তুমি জান বোধ হয় এদিকে আর এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতীবাঁধা পরগণায় পুলিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে এক জন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিলো। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এদিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙ্গিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে পুরুত জোটে না। দূর গ্রাম থেকে পুরুতের সন্ধান পেলো, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজী এসে হঠাৎ আমার হেড কনেষ্টবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে, সদ্‌ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে খুশী করাচ্ছি। তাঁকে রাজী করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সত্নু, তুমিও একাজে সাহায্য করো।"

"ওমা করবো না তো কী, ওতো আমার কর্তব্য। আহা তোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিনু। সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ সব স্বামীজীদের কী করে আদর যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে লুটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ মুনির মতো। সত্নু ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মুচকে হেসে বললেন, "সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তোমার এতো ভক্তি হঠাৎ জেগে উঠল কী করে?"

সত্নু হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান। মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উলুর সঙ্গে বর আসার শব্দ এলো চারদিক থেকে। কনেকে একটি চেলী জড়ানো পুঁটুলীর মতো করে এয়োর দল নিয়ে এলো ছাঁদনাতলায়। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হোলো। বর কনে বাবাজীকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন বাবাজী আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাবুকে আর সভার সবাইকে বললেন, "মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। পুরুতের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমস্ত দারোগা কনেষ্টবলদের ভালো

করে জানা আছে। এখন আপনাদের পুরুতের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমার আর সয় সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।” এই বলে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চণ্ডীমণ্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও। সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাবুর মুখে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধূ বাসর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সত্ন স্বামীকে বললে, “তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসীবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোন খোঁজ পেলে কি ?”

“দুঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানার সামনে ২৫টি মেয়ের আমদানী হচ্ছে ; চাল, কলা, নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্‌টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।”

“সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানী তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজী সেজে বসেছ নাকি ?”

“না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক্‌ হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে আফিসের সামনের রাস্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুর লাগাচ্ছে, চন্দন মাখাচ্ছে ; কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসৌভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিষ্কার করতে গেলেই খবরের কাগজে মহা হাঁউ মাউ করে উঠবে যে এইবার হিন্দুর ধর্ম গেল। আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যবসা খুব জমে উঠল। টাকাগুলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়লো। একদিন দেখা গেল—না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলাগোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল। মুস্কিল এই হিন্দু ধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার-ষ্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তাহলে আবার সকলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্‌ দিক সামলাই। আর এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পুলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউ মাউ করে বললে যে ভোলানাথের একশিংওয়ালা ভৃঙ্গীবাবা ষাঁড়ের মত গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্চে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠি নে, কেন না মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।”

সত্ন হেসে বললে, “ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে।”

“দেখো, সর্বনাশ করো না যেন।”

“না, তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোল আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা—এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল না কেন সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে

জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবোই আর ঠকাবো না। বুড়ীগুলো বলে থাকে "সতু বড় লক্ষ্মী অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সতুর ক্লান্তি নেই"। এইটুকু খোঁড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মত মানুষ, তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি। আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে—হয় তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেবো দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সতুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।"

"তোমার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনই চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।"

"যাই হোক না কেন আমি জানি আমি যা-ই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষ মানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণর বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করব না—পুলিসের কাজে তোমার খবরদারীর শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাসকরে এসেছো, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এই জন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সতু আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে ত ব'লে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও ; বড্ড চেঁচাচ্ছে, ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

সতু হেসে বললে, "তুমি ইন্সপেক্টরি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজী সেজে বসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বখরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার স্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী? তোমার এই পুলিসের থানায় স্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এই জন্যই অনিলবাবুকে সবাই দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে—তুমি ছাড়া। আমি দুশ্চিন্তার ভান করব কী করে বল দেখি?"

তৃতীয়

"দেখ সতু এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সতু বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও—শুনি! এইজন্য তো তোমাকে সবাই স্ত্রৈণ

বলে। দু'জাতের স্ত্রৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না তারা কাপুরুষ। আর এক দল আছে তারা সত্যিকার পুরুষ তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়; তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়। এই দেখো না আমার কত বড় সুবিধে, তোমাকে যখন খুশী যেমন খুশী ঠকাতে পারি তুমি চোখ বুজে সব নাও।"

"সদু কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগুলি গো।"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে—।"

"এবারে কাজের কথাটা শুনে নাও—ওসব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে, এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন ক'রে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদু বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে। আচ্ছা তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিলুম। দু'দিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"

"পরশু হোলো শিবরাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল ডাকাত সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয় ডর কোথায়ও নেই। এদিকে ও ভারী ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কি রকম তান্ত্রিক মতের স্ত্রী হয়ে।"

"তোমরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেবো। কিন্তু রাত্রি ১টার আগে যেয়ো না। তাড়াহুড়ো করলে সব ফস্কে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের জুতো-খোলা দুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে। একজন চুপি চুপি তাঁকে ইসারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকরুনটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। হুজুর আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকরুনের গায়ে হাত দিতে পারব না, এমন কি চোখে দেখতেও পারব না—এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।" একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ, বিজয়বাবু যত বড় একেলে লোক হোন না কেন, তাঁর যে ভয় করছিল না একথা বলা যায় না। তাঁর বুক দুরদুর করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলী গলায় গুন গুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং—"

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। ভাবলেন কী করা যায়। একসময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা, ভাঙ্গা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড়হাত করে ব'সে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হোল মনে, বললেন—"সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে, যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেবো বলেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়।

তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনোও হুকুম কখনও ঠেলতে পারিনি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম, এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড় রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেবো। কখনো মনে কোরো না চাতুরী ক'রে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা করো আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড় যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবো। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সনুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাবু, আজ আমি ধরা দেবো বলেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সনুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোন ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সনু সম্বন্ধে কিচ্ছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এই সঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবি ঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ— 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।' " হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্সপেক্‌টারবাবু। "এই গান অনেক বার গেয়েছি, আবার গাইবো, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেবো। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইলো। আর পনর দিন পরে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কেঁপে উঠল, টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে। মুখের উপরে দুই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

পুস্তক পরিচয়

বুদ্ধি ও বোধি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৭৭ পৃষ্ঠা।

ইংরেজী Reason শব্দের জায়গায় 'বুদ্ধি' এবং Intuition অর্থে 'বোধি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয়ের তারতম্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপায়-স্বরূপ—'আর্য্য সত্য নির্ণয়ে'—উভয়ের আপেক্ষিক মূল্য এই গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে। 'বোধি'র স্থান বুদ্ধির উপরে; বুদ্ধি যেখানে বিফল হয়, 'বোধি' সেখানে কৃতকার্য্য হয়; চরম সত্য জানিতে বুদ্ধি অক্ষম; কিন্তু 'বোধি' সক্ষম। আধুনিক জগতে বার্গসোঁ প্রভৃতির এবং সর্ব্বকালের mysticদেরও ইহাই মত।

দর্শনে সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, এমন নয়। বরং এই মতের বিরোধীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা এই গ্রন্থের মূল্য বিচার করা চলে না। গ্রন্থকার দার্শনিক লেখক হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার রচনামাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং অতি নিপুণ অথচ প্রাঞ্জল ভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

সকলেই গ্রন্থকারের সহিত একমত হইবেন, ইহা আমরা আশা করি না; কিন্তু সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আলোচনা পাঠ করিবেন, ইহা নিঃসংকোচে বলা চলে। আর দর্শনে অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই বইখানি পড়িবেন, এ ভরসাও আমরা করি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ডাকে লইলে আলাদা মাশুল লাগে।

এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট অভিধানটির ৭৫তম সংখ্যা শেষ হইয়াছে। এই সংখ্যার শেষ শব্দ "মানস" এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২৩৯৭।

রোগটা যখন টি. বি.—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস য়্যাসোসিয়েশ্যন, ৮ লায়ন্স্ রেঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ২২৭+১২ পৃষ্ঠা। এণ্টীক কাগজে নূতন হরফে ভাল ছাপা।

গ্রন্থকার স্বয়ং এই রোগে ভুগিয়াছিলেন এবং তাহার পর আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন। এই জন্য, ভুক্তভোগীর লেখা বলিয়া এই পুস্তকটির বিশেষ মূল্য আছে। ইহাতে তিনি যক্ষ্মারোগের ইতিহাস ও প্রকৃতি, তাহার গতি ও লক্ষণ, তাহার বিশেষ কয়েকটি উপসর্গ, ব্যাধিগ্রস্ত ফুসফুসের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন, যক্ষ্মা সত্যই সারে কি না, ইহার স্যানিটোরিয়াম ও অন্যান্য চিকিৎসা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের যক্ষ্মানিবাস, ইত্যাদি সমুদয় আবশ্যক বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"এই সুন্দর পুস্তকখানি যে এই দেশের যক্ষ্মারোগী ও জনসাধারণের বহু প্রকার জড়তা ও অজ্ঞতা অপনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে উপকৃত ও সচেষ্ট হইতে সাহায্য করিবে ইহা সুনিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায়।"

"এক দিকে বৈজ্ঞানিকের মনোবৃত্তি এবং অপর দিকে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও লিপিকৌশল লইয়া অমিয়জীবন এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।"

"ভাবে, ভাষায় এবং রচনাপদ্ধতিতে গতানুগতিকতা হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত এই পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট সুখপাঠ্য এবং আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।"

আত্মঘাতী হিন্দু—শ্রীশাক্যসিংহ সেন। সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৪ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আত্মঘাতী হিন্দু, বাঁচিয়া থাকার গর্ব, হিন্দুর জাগরণে বিলম্ব, সংগঠনযোগ্যতা, হিন্দু ধর্ম্মের বিকার ও হিন্দু জাতির পতন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-গণের উদ্দেশ্য, অন্যান্য জাতির ধর্ম্মবিকার, গান্ধীজির অসিদ্ধির কারণ, পুরোহিতরাজ, ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ঘটা, আর্টবিলাসিতা, একটি মাত্র আদর্শ ও তদনুসারে একাগ্রতা, নানা দেশে কলাবিলাসের পরিণাম, রিলিজ্যাস ইম্পীরিয়্যালিজ্‌ম্, বাঁচিয়া থাকার আর্ট, হিন্দু কৃষ্টির অর্থ কি, দৈবকৃপা ও পুরুষকার, অহিংস বিপ্লব, বহুমতবাদের সমষ্টির নাম কি হিন্দু ধর্ম্ম, পঞ্জিকাই কি হিন্দুর বেদ, সংগঠন কি হিন্দু ধর্ম্মবিরুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব আর হিন্দুসংহতি কি অসম্ভব,—ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুদের এই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত। এই পুস্তকের দ্বারা সেই আলোচনার সাহায্য হইবে। লেখকের কোন কোন সিদ্ধান্ত আমাদের মতের সহিত মিলে, অনেকগুলি মিলে না।

ড.

সায়ন্তনী—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। সংহতি পাবলিশিং হাউস, ৭, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন অক্টেভো এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। পৃ. ১৫০। মূল্য দুই টাকা।

'সায়ন্তনী' কবিতার বই। উনসত্তরটি গীতিকবিতায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। যুগপ্রলয় লেখকের চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছে। অনেকগুলি কবিতা এই ব্যথিত ও ব্যাকুল মনের প্রকাশ।

"…যুগ সূর্য্য যায় অস্তাচলে,
সুপ্ত হোলো সভ্যতার শেষরশ্মি মানবের মর্ম্মবেদনায় সৃষ্টি শতদলে।"

বিশ্বব্যাপী তাণ্ডবে পাশ্চাত্য-জাতিসমূহের অহমিকাপুষ্ট যান্ত্রিক সভ্যতা আজ বিচূর্ণপ্রায়। "যে সভ্যতা দিল না ক' মহত্ত্বের কোন পরিচয় ক্ষুদ্র আমিত্বের লাগি" সেই সভ্যতা শান্তির দিনে মনোমোহন বেশে আমাদের ছলনা করিয়াছে। "কিবা হবে মরুদ্যান মাঝে সাজাইয়া ফুলের বাসর?" তবুও আশা হয়, বিনাশ মানবের পরিণাম নয়।

"ধ্বংসের পশ্চাতে রহে সনাতন সৃষ্টির নির্ঝর,
আবার হাসিবে বিশ্ব নন্দনের সম নিরন্তর।"

পাশ্চাত্যের এই প্রলয়দীপ্তির দিক হইতে রচয়িতা জাতির দিকে, ভারতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধতার দিকে, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ও অতীতের মহিমার দিকে চোখ ফিরাইয়াছেন। কতকগুলি কবিতায় বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ছাপ আছে। গাথাগুলি অন্তরকে আন্দোলিত করে। 'জলিম সিংহ,' 'এগার সিন্ধু' প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরবের গাথা। অপূর্ব্বকৃষ্ণের ছন্দে প্রবাহ, ভাষার ঝঙ্কার এবং

কবিতায় বৈচিত্র্য আছে। 'সায়ন্তনী' পাঠককে আনন্দ দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অকৃতজ্ঞ পৃথিবী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদয়াচল কার্যালয়, ১২৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য বইখানিতে ছয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক গল্পটিই জীবনের বাস্তব চিত্র, বাঙালীর জীবনের সুখ দুঃখ লইয়াই লেখক কারবার করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কল্পনার সাহায্য লেখক লইয়াছেন, কিন্তু সেখানেও কল্পনা বাস্তব জীবনকে অতিক্রম করিয়া অস্বাভাবিকত্বের শূন্য লোকে ধোঁয়া হইয়া যায় নাই। সেই জন্যই গল্পগুলি পড়িয়া মন তৃপ্ত হয়। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক গল্পটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক। লেখকের দৃষ্টি মুক্ত এবং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও কুশলতা দেখিয়া লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া রহিলাম।

সংলাপের মধ্যে যেখানে লেখক গ্রাম্যভাষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল; ঘোষ মহাশয় এ-দিকে অবহিত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা আরও উপাদেয় হইয়া উঠিবে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূর পশ্চিম ভ্রমণের দিনলিপিকা—শ্রীমতী সুধা সেন। বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৪০। পৃ. ।৵০ + ৪০০ + ১৮৮ ছবি।

লেখিকা ১৯৩১-৩২ সালে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তিনি ভক্তিমতী এবং উচ্চশিক্ষিতা; যে-সকল দেশে গিয়াছেন সেখানে শুধু দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, বরং প্রতি দেশের মানুষের সঙ্গে মিশিয়া প্রতি দেশের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেকগুলি ছবি থাকায় ভ্রমণকাহিনীটি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আধুনিক সমাজ—শ্রীশশধর দত্ত। প্রফুল্ল লাইব্রেরী ৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

আধুনিক সমাজের অন্যতম মুকুটমণি বিলাত ফেরত মিঃ দের একমাত্র কন্যা নন্দিনীর সহিত তাহার গৃহশিক্ষক অর্থাৎ মায়াপুর ষ্টেটের ছদ্মবেশী করদ রাজা কল্যাণকুমারের বিবাহ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়ক এবং নায়িকা দুই জনেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সুতরাং তাহাদের পূর্ব্বরাগ ও মিলন অবাঞ্ছিত নহে। তা ছাড়া আধুনিক সমাজের কয়েকটি নরনারী-চরিত্রও লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই চরিত্রগুলি আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে নাই। ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত মন্থর ও গতানুগতিক বলিয়াই চারি শতাধিক পৃষ্ঠার এই উপন্যাস-খানি শেষ করিতে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যজ্ঞোপবীততত্ত্বম্—শ্রীবেণু বিনোদদেব বর্ম্মণা সংগৃহীতম্। বি-এ, বি-এল্ ইত্যুপাধিকেন শ্রীনৃত্যগোপাল দেব বর্ম্মণা প্রকাশিতম্। পাঁচরোল, মেদিনীপুর।

স্মৃতিনিবন্ধের আকারে লিখিত এই পুস্তিকায় নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য যজ্ঞোপবীত সংখ্যা, যজ্ঞোপবীত পরিমাণ, যজ্ঞোপবীতধারণ বিধি প্রভৃতি সংকলিত ও সমালোচিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পুস্তিকা হইতে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

হিটলারের শত্রু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর। দেশপ্রিয় লাইব্রেরী, ১৯২।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

হিটলারের নাম আজ সকলেই জানেন। জার্ম্মানী হইতে ইহুদী-বিতাড়ন, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার প্রভৃতির জন্য তাঁহার খুবই নিন্দাবাদ হইয়াছে। লেখক তাঁহার এই সকল নিন্দার্হ কার্য্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা ছেলেদের জন্য লিখিত। তাহারা ইহা পাঠ করিয়া সমসাময়িক বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কতকটা ওয়াকিবহাল হইতে পারিবে।

শেক্সপীয়ারের গল্প—শ্রীবিমল দত্ত, এম্-এ। বি, সরকার এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৯৭। মূল্য এক টাকা।

'ল্যাম্‌স্ টেলস্ অফ্ সেক্সপীয়ার'-এর অনুসরণে বইখানি লিখিত। ইহাতে সেক্সপীয়ারের তেরখানা নাটকের আখ্যান বস্তু দেওয়া হইয়াছে—তন্মধ্যে ছয়টি ট্র্যাজেডী ও সাতটি কমেডী। সেক্সপীয়ারের জীবন কথাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। ইংরেজী বইখানি তরুণদের জন্য সুললিত ভাষায় লেখা, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত জনকেই পাঠ্য হিসাবে কৈশোরে ইহা পাঠ করিতে হইয়াছে। এরূপ একখানি বাংলা বইয়েরও যে যথেষ্ট চাহিদা ছিল, অল্প দিনের মধ্যে আলোচ্য বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। বইখানির ভাষা ঝরঝরে, একটানা পড়িয়া যাইতে কষ্ট হয় না। কয়েকটি আখ্যায়িকার সঙ্গে বিষয়বস্তুর অনুগ একটি করিয়া ছবি সংযোজিত হইয়াছে।

তরুণ তুর্কী—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ১০।৪ এ, মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪১। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাঁহার তুরস্ক ভ্রমণের ফল। নূতন কিছু দেখিবার ও জানিবার অদম্য স্পৃহা তাঁহাকে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে, পথের বিপদ, অর্থের অনটন তাঁহার কার্য্যে বাদ সাধিতে পারে নাই। অনন্যতুল্য অসম-সাহসিকতাই তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির প্রাণ এবং এই জন্যই ইহা পাঠক-সাধারণের নিকট এত প্রিয়। নিজ চোখে রামনাথবাবু তুরস্কে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন পুস্তকখানিতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষার দিকে অধিকতর নজর দিলে ভাল হইত। পুস্তকখানি সচিত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিবিধ প্রসঙ্গ

আরব্য উপন্যাসের ফাঁকা বার্মিসাইড ভোজ ও স্বরাজ দিবার ব্রিটিশ অভিনয়

গত ২৯শে মে লণ্ডন থেকে তারে খবর আসে যে, লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং পার্লেমেণ্টারি সহকারী ভারতসচিব ডিউক অব ডেভনশায়ার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্মেণ্টের পূরা ক্ষমতা ও সমর্থন অনুসারে বলিয়াছেন, "ভারত-শাসন কার্য ভারতবর্ষের দ্বারা, ভারতবর্ষের জন্য, ভারতবর্ষে নির্বাহিত হইবে, লণ্ডনস্থ ভারতসচিবের অফিস হোয়াইটহল হইতে হইবে না—[ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের] উদ্দেশ্য এইরূপ।" তাহার পর গত ৬ই জুনের দৈনিকগুলিতে ইহার রয়টার-প্রেরিত এই সংশোধনী বাহির হইয়াছে যে, ডিউক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা পার্লেমেণ্টের নূতন কিছু পলিসি নয়, ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সম্ভাব্যতা লুকাইয়া আছে ডিউকপ্রবর তাহাই খুলিয়া বলিয়াছেন; নূতন কোন পার্লেমেণ্টারি পলিসি হইলে তাহা পার্লেমেণ্টেই ঘোষিত হইত, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে হইত না।—এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে বলিতেছি।

ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার ব্রিটিশ ভঙ্গী আরব্য উপন্যাসের সাক্‌বাকের ভোজ খাওয়ার গল্পটা মনে পড়াইয়া দিয়াছে।

[সাক্‌বাক্‌ নামক এক জন ভিক্ষুক এক দিন অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া আহার্য্যের সন্ধানে] পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দরজায় গিয়া দারোয়ানদের কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা বলিল, "বাড়ীর মধ্যে ঢুকে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাও। তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" সাক্‌বাক্‌ আহ্লাদিত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, একটি দালানের মধ্যে সুন্দর খাটের উপর এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী স্বাগত বলিয়া তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাক্‌বাক্‌ নিজের দুঃখ বর্ণনা করিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিলেন। কর্তা তাঁহার এই কথা শুনিয়াই ভৃত্যকে হাত মুখ ধুইবার জল আনিতে বলিলেন। সাক্‌বাক্‌ মনে মনে আপন ভাগ্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু কেহই জল লইয়া আসিল না। কিন্তু কে যেন তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছে, তাহাতে তিনি হাত ধুইতেছেন, এই রকম ভাবভঙ্গী করিয়া গৃহস্বামী সাক্‌বাক্‌কে কহিলেন, "এস, হাত ধোও, চাকর অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।" সাক্‌বাক্‌ কি করেন, কর্তাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহার নকল করিতে লাগিলেন। তাহার পর অনেক মূল্যবান অথচ খাদ্যশূন্য পাত্রে সেই রকম মিথ্যা খাওয়ার ভান করিতে গৃহস্বামী বসিলেন; ভিক্ষুককেও বসিতে হইল। বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে খাবারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, সাক্‌বাক্‌ও তাঁহাকে খুশি করিবার জন্য তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার পর এমনি ভাবে মদ খাওয়ার ভানও চলিল। সাক্‌বাক্‌, যেন খুব পান করিয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া মত্তের মত টলিতে টলিতে গিয়া বৃদ্ধের গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চটিয়া বলিলেন, "তবে রে পাজি, আমার সঙ্গে এ কি রকম চালাকি হচ্ছে?" সাক্‌বাক্‌ বলিলেন, "প্রভু, মদ খেয়ে মাতাল হয়েই এ রকম কুকাজ করেছি, অপরাধ মার্জনা করবেন।" বৃদ্ধ কর্তা তাঁহার কথায় খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমি অনেক দিন থেকে তোমার মতন এক জন সুরসিক পুরুষ খুঁজছিলাম, আজ আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হ'ল। তুমি আজ থেকে আমার সহচর হ'লে।" তিনি এই কথা বলিয়াই চাকরদিগকে নানা রকম সত্যিকারের ভাল ভাল খাবার আনিতে বলিলেন। সত্যিকারের ভোজ হইল, এবং সেই দিন হইতে সাক্‌বাক্‌ সেই ধনী গৃহস্বামীর বন্ধু ও সহচর হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

আরব্য উপন্যাসের এই গল্পের বৃদ্ধ গৃহস্বামী ছিলেন বার্মিসাইড্‌ (Barmecide) রাজবংশের লোক; তাঁহার নাম অনুসারে ইংরেজীতে বার্মিসাইড্‌ ভোজ (Barmecide feast) কথাটার চলন হইয়াছে। যে ব্যক্তি কাল্পনিক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করে, তাহাকে বার্মিসাইড্‌ বলা হয়, এবং যে ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যক সার সুবিধাগুলি থাকে না, থাকে ভুয়ো কিছু, তাহাকে রূপক ভাষায় বার্মিসাইড্‌ ভোজ বলা হয়।

সাক্‌বাক্‌ যেমন নিজের দুঃখের কাহুনি গাইয়া ধনী গৃহস্বামীর কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তেমনি আমরাও আমাদের দুঃখের কথা জানাইয়া আমাদের দেশের প্রভু ব্রিটিশ জাতির নিকট স্বরাজ-ভোজ চাহিয়াছিলাম। প্রভুরা আমাদিগকে স্বরাজের জন্য প্রস্তুত হইতে (=হাত মুখ ধুইতে) বলিয়াছিলেন। তাহার পর প্রকৃতক্ষমতারূপ-খাদ্যশূন্য স্বরাজ-ডিশ্‌ কিছু কিছু আসিয়াছে। যথা—আমাদের আইনসভাগুলাকে বলা হয় পার্লেমেণ্ট। আমাদের প্রধান মন্ত্রী আছে, স্পীকার আছে, পার্লেমেণ্টারি সেক্রেটরি আছে—এই রকম স্বাধীন দেশের বড় মানুষী ঢঙের কত কী আছে। এগুলো হচ্ছে দামী দামী স্বরাজ-ডিশ, কিন্তু শূন্যগর্ভ। এরূপ ব্যবস্থার জগৎজোড়া প্রশংসা ব্রিটিশ প্রভুজাতি করিয়া আসিতেছে। আমরাও কেহ কেহ ভান করিয়াছি যে, কিছু ভাল ভোজ

জুটিয়াছে। এমন কি, কংগ্রেসওআলারা পর্যন্ত, ভারত-শাসন-আইন রূপ পাত্রে আসল সুবিধা ও আসল ক্ষমতা দেশের লোককে দেওয়া না-হওয়া সত্ত্বেও, মন্ত্রিত্বগ্রহণ দ্বারা এরূপ ভান করিয়াছিলেন যেন খুব সরেস ভোজ জুটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ আইন দ্বারা যে ভারতবর্ষের একত্ব নষ্ট হইয়াছে, প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষ্যাদ্বেষ জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন নাই—অন্ততঃ প্রথমটা বুঝিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, এই স্বরাজ-ভোজটা খাদ্যশূন্য ভোজ, ইহার দ্বারা জাতির হইবে না, শক্তি বাড়িবে না। কেন না, এই আইন জলে স্থলে আকাশে দেশরক্ষা, বিদেশের সহিত সন্ধিবিগ্রহ বাণিজ্যাদি ব্যবস্থা, ট্যাক্স স্থাপন রদ হ্রাস বৃদ্ধি ও সংগৃহীত রাজস্বের ব্যয়, শুল্ক আদি দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, জাহাজ চালাইবার ব্যবসায় সংরক্ষণ, ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক ব্যাপারগুলা বিদেশী ব্রিটিশ জাতির হাতেই রাখিয়াছে। অতএব ইহা একটা ভেল্কির ভোজ, অথবা তার চেয়েও খারাপ; কেন না, ইহার দ্বারা দেশের ও জাতির একতার পরিবর্তে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বার্মিসাইড্ ভোজের গল্পের সঙ্গে আমাদের স্বরাজ-ভোজের গরমিলও আছে। বার্মিসাইড্ ভোজের ভিক্ষুক পানমত্ততার ভান করিয়া কর্তার গালে চড় কসাইয়া দিয়া নিজের রসবোধের প্রমাণ দিয়াছিলেন এবং, কর্তারও রসবোধ থাকায়, ফলে আসল ভোজ পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান স্বরাজপ্রার্থী দল কংগ্রেস মত্ততার ভান করিয়া ব্রিটিশ প্রভুর গালে চড় কসাইয়া দেয় নাই, দিতে পারেও না। কারণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতারা সুরাপান-বিরোধী, কংগ্রেসী প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি সুরা উৎপাদন ও সুরাপান উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। তদ্ভিন্ন, কংগ্রেস নন্‌ভায়োলেণ্ট, কিন্তু চড় মারাটা স্পষ্ট এক রকম ভায়োলেন্স, সুতরাং বর্জনীয়। আরব্য-উপন্যাসের গল্পের রসিক গৃহস্বামীর যতটা রসবোধ ছিল, ব্রিটিশ জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ততটা রসবোধ আছে কি না সন্দেহস্থল—যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার ব্যাপারে ও এই শতাব্দীতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যাপারে ছিল বটে। সুতরাং বার্মিসাইড্ ভোজের শেষ অঙ্কের সহিত ব্রিটিশ জাতির স্বরাজ-প্রদান নাটকের শেষ অঙ্কের সাদৃশ্য স্থাপন করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিতে পারা যায় না।

এখন আবার ভারতসচিব ও বড়লাট সমস্বরে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া ভারতীয়দিগকে জানাইতেছেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিকে এক পংক্তিতে বসিয়া স্বরাজ-ভোজ খাইতে রাজী হইতে হইবে, তাহা না হইলে ভোজের ব্যবস্থা হইবে না; এই সাম্প্রদায়িক ঐকমত্য (communal agreement)টা আগে আবশ্যক। কিন্তু অবশ্য, যাহাতে ঐকমত্য না হয়, তাহার পাকা বন্দোবস্ত আছে।

পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে স্বরাজ-লাভের পন্থা নির্দেশ করিতে গেলে বলিতে হইবে, ভারতবর্ষের পক্ষে অস্ত্রবলপ্রয়োগ স্বরাজলাভের প্রকৃত পন্থা হইতেই পারে না। অবশ্য, ব্রিটিশ-জাতির কাছে ভিক্ষা করিয়া বা তাহাকে খুশি করিয়াও স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। এ সব কথা "নেতি", "নেতি"। ঠিক্ কোন্ উপায়ে ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে, কিম্বা ঠিক্ কোন্ পথ দিয়া কি ভাবে তাহার স্বরাজ আসিবে, বলিতে পারিতেছি না। কেবল এইটুকু বুঝি, যে, কাপুরুষতা, মিথ্যাচরণ, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি স্বরাজলাভের উপায় নহে, আবার যুদ্ধও নহে।

—

"ভারতের জন্য ভারতের দ্বারা ভারতে ভারতশাসন"

পার্লেমেণ্টারি সহকারী ভারতসচিব ডেভনশায়ারের ডিউক লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়াছেন, "ভারতের জন্য ভারতের দ্বারা ভারতে ভারতশাসন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত।" এই সঙ্গে তিনি যদি ভারত কথাটার মানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এবং যে-ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ক্ষমতা অনুসারে তিনি ঐ কথা বলিয়া-ছিলেন তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়টা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত।

ডিউকপুঙ্গব আমেরিকার অমরকীর্ত্তি রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের যে প্রসিদ্ধ বাণী নকল করিয়াছেন, তাহা, "Government of the people, for the people, by the people," "জনগণের দ্বারা জনগণের হিতকল্পে জনগণের গবর্মেণ্ট।"

ইংলণ্ডেশ্বরকে কোনও উপলক্ষ্যে অভিনন্দন আনুগত্য ইত্যাদি জানাইবার নিমিত্ত বড়লাট সমগ্র ভারতবর্ষ ও তাহার লোকসমষ্টির স্বয়ংমনোনীত মুখপাত্র রূপে অনেক সময় টেলিগ্রাফে বা অন্য উপায়ে নিজের বক্তব্য ভারতবর্ষেরই কথা বলিয়া পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মূরের প্রস্তাব অনুসারে যদি একা বড়লাট ভারতশাসন করেন, তাহাকেও ব্রিটিশ জাতি "ভারতের দ্বারা" ভারতশাসন

মনে করিতে পারেন। ব্রিটিশ ভারতের ও "দেশী" ভারতের তাঁহার মনোনীত কতকগুলি লোককে ধামাধরা পারিষদ রূপে লইয়া যদি তিনি দেশ শাসন করেন, তাহা হইলে তাহাও "ভারতের দ্বারা" ভারতশাসন বলিয়া ইংরেজরা ভারতের বাহিরে চালাইয়া দিতে পারে।

ভারতবর্ষের যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বা শ্রেণীর লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের মন জোগাইয়া চলে, প্রধানতঃ যদি তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত লোকদিগকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের শাসনকার্য চালান, তাহাকেও "ভারতবর্ষের দ্বারা" ভারতশাসন বলা চলিতে পারে। "ভারতের জন্য" ভারত-শাসন যে বরাবরই ইংরেজরা করিয়া আসিতেছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ। ব্রিটিশ জাতি বরাবরই এই দাবী করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা একমাত্র ভারতবর্ষের কল্যাণের নিমিত্তই এই আফশোসের দেশে (Land of Regrets-এ) হাহুতাশের সহিত খাটিয়া মরেন; যদিও এক বার বলডুইনের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রসচিব মুখফোঁড় সর্ উইলিয়ম জয়সন-হিক্স্ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন :—

"We did not conquer India for the benefit of the Indians. I know it is said at missionary meetings that we conquered India to raise the level of the Indians. That is cant. We conquered India as an outlet for the goods of Great Britain. . . . We hold it as the finest outlet for British goods. . . . ."

আমরা ভারতীয়দের উপকারের জন্য ভারতবর্ষ জয় করি নাই। আমি জানি মিশনরিদের সভায় বলা হইয়া থাকে যে আমরা ভারতীয়দের জীবনধারা উন্নত করিবার জন্য ভারত জয় করিয়াছিলাম। সেটা কপট ছেঁদো কথা। আমরা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বিক্রীর জায়গা রূপে ভারত জয় করিয়াছিলাম।...এই দেশটা আমরা দখল করিয়া আছি ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য-সমূহ রপ্তানী ও বিক্রীর সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গা বলিয়া...।

এই রকম আরও অনেক ইংরেজের বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ডেভনশায়ারের ডিউক আরো বলিয়াছেন যে, ভারত-শাসনটা ভারতেই হইবে, লণ্ডনের ভারত-সচিবের আফিস হইতে হইবে না। তাহাতে আমাদের কী লাভ? একজন ইংরেজ ভারতবর্ষে বসিয়া ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতশাসন করিবেন, কিম্বা দুই জন ইংরেজ—এক জন লণ্ডনে বসিয়া ও আর এক জন দিল্লী-সিমলায় বসিয়া—ইংরেজ জাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতশাসন করিবেন, এই দুটা বন্দোবস্তের মধ্যে বাস্তবিক উনিশ-বিশ কোথায়?

"ডেভনশায়ারের ডিউকের কথা পার্লেমেণ্টের নূতন পলিসি নয়"

ডেভনশায়ারের ডিউক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে পার্লেমেণ্টের একটা নূতন পলিসি মনে করিয়া আমরা যাহাতে বেশি আশান্বিত হইয়া না পড়ি এবং পরে সেই আশা পূর্ণ না হইলে যাহাতে আমরা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে অঙ্গীকারভঙ্গের দোষ না দি, বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যে রয়টারকে দিয়া এইরূপ একটা সংশোধনী পাঠান হইয়াছে যে, ওটা নূতন কোন পার্লেমেণ্টারি পলিসি নয়, গত বৎসর আগস্ট মাসে বড়লাট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই উহা উহ্য ছিল, পার্লেমেণ্টের নূতন পলিসি ঘোষণা করিতে হইলে তাহা পার্লেমেণ্টেই করা হয়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ সবই আমরা বুঝি। অধিকন্তু আমরা বার বার মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে পার্লেমেণ্টের বক্তৃতাদির প্রামাণিক রিপোর্ট হ্যানসার্ড হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরেরও কোন অঙ্গীকার পার্লেমেণ্ট পালন করিতে বাধ্য নহে, যদি তাহা উহার বিচারিত সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়। হ্যানসার্ড হইতে উক্তি দুইটি পুনর্বার উদ্ধৃত করিতেছি।

The Chairman of the Conservative M. P.s India Committee, Sir John Warlaw-Milne, stated in the House of Commons: "No pledge given by any Secretary of State or any Viceroy has any real legal bearing on the matter at all. The only thing that Parliament is really bound by is the Act of 1919."—*Hansard,* 10th December, 1934, Vol. 296, No. 15, p. 142.

Lord Rankeillour, for many years Chairman of Committees and Deputy Speaker in the House of Commons, said : "No statement by a Viceroy, no statement by any representative of the Sovereign, no statement by the Prime Minister, indeed, no statement by the Sovereign himself, can bind Parliament against its judgment."—*Hansard,* House of Lords, December 13th, 1934, Vol. 95, No. 3, Col. 331.

এই উক্তিগুলির কেহ কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

আমরা মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বার-বার লিখিয়াছি যে, পার্লেমেণ্টে প্রণীত কোন আইনের দ্বারা কিম্বা অন্ততঃ পার্লেমেণ্টে গৃহীত কোন প্রস্তাব দ্বারা যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তবে তাহাই নির্ভরযোগ্য হইবে; কোন রাজপুরুষ, এমন কি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরও, কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তাহা নির্ভরযোগ্য হইবে না; কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা পার্লেমেণ্টেরই আছে।

আমেরিকার ঐশ্বর্য ও ভারতের দারিদ্র্য

বর্তমান যুদ্ধে যত এরোপ্লেন প্রভৃতি আবশ্যক হইবে, তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটা বিরাট বরাদ্দের প্রস্তাব আমেরিকার কংগ্রেসে (ব্যবস্থাপক সভায়) উপস্থিত করা হইয়াছে। বরাদ্দটার পরিমাণ ১০,০০,৯৬,৫৫,১৮৭ ডলার, অর্থাৎ মোটামুটি তিন হাজার কোটি টাকা! আমেরিকা যুদ্ধ উপলক্ষ্যে আমাদের কল্পনাতীত মোটা মোটা টাকা আগে আরও ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তাহার উপর এই তিন হাজার কোটি টাকা!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ১৩ কোটি, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটি। কিন্তু ভারতবর্ষের উপর যত দূর সম্ভব নির্মম ভাবে ট্যাক্স বসাইয়াও ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট এই দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক যে শিক্ষার বন্দোবস্ত, তাহার নিমিত্তও কোন বৎসর ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করিতে পারেন নাই, তিন হাজার কোটি ত দূরের কথা। আর আমেরিকা অনেক হাজার কোটি টাকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিতে পারিতেছে।

পরাধীনতা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ না হইলেও, উহা যে প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

খাকসাররা বেআইনী দল বলিয়া ঘোষিত

ভারত-গবন্মেণ্ট খাকসারদিগকে বেআইনী দল বলিয়া স্থির করিয়া তাহাদিগকে বেআইনী দল বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সমুদয় প্রাদেশিক গবন্মেণ্টকে দেওয়ায় প্রাদেশিক গবন্মেণ্টসমূহ তাহাদিগকে বেআইনী ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের উদ্ভব ও প্রধান আড্ডা পঞ্জাবে। যখন পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খান স্বয়ং মুসলমান ও মুসলিম লীগের সভ্য হইয়াও এই মুসলমান দলের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ করেন এবং তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার নিমিত্ত কড়া উপায় অবলম্বন করেন, তখন বাংলার মন্ত্রীদিগকে বাংলার খাকসারদের সম্বন্ধে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করাইবার উদ্দেশ্যে বঙ্গে তাহাদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতির প্রতি মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, কিন্তু স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন কিছুই করেন নাই; ব্যাপারটা কার্যতঃ চাপা দিবার ও উড়াইয়া দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। বঙ্গেও এখন মন্ত্রীদিগকে উপরওআলার হুকুম তামিল করিতে হইয়াছে। যথাসময়ে খাকসারদিগকে দমন করিলে ঢাকা জেলায় ও অন্যত্র হয়ত কোন কোন লুটতরাজ হইত না। ইহা আনুমানিক কথা নহে। এখন বঙ্গের মন্ত্রীরা ঢাকার খুনজখম লুটপাট প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশের নিষেধ-আজ্ঞা প্রত্যাহার করায় একটি মাত্র তথ্য গত ২১শে এপ্রিলের লাহোরের ট্রিবিউন হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ট্রিবিউনের ঐ সংখ্যায় ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত Dacca Situation (ঢাকা পরিস্থিতি) শীর্ষক প্রবন্ধ বা বিবৃতিতে লিখিত হইয়াছে :—

> It appears that on the 1st of April last, without any provocation whatsoever, a gang of Moslems attacked and looted Hindu shops and houses at a village near Raipura police station within 40 miles from Dacca. The attackers were headed by a gang of uniformed men (*described as Khaksars* by some) not belonging to the locality who, as subsequent events show, proceeded in a methodical and organized manner. They carried with them petrol and syringes, maps and plans, deadly weapons, and were using slogans such as *Pakistan Zindabad*,—Zindabad, and—Zindabad.* The attackers gathered strength, collected from the Moslems of the locality, and in some places the mob consisted of five or six thousand people. Village after village was looted and burnt and the Hindus, who constituted about 15 per cent of the population here, had to flee for their lives. Nearly fifty villages were thus plundered.

* একজন গুজরাটী ও এক জন বাঙালী মুসলমানের নাম এখানে আছে। প্রবাসীর সম্পাদক।

—

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুলেখক বলিয়া বঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজীও উত্তম লিখিতে পারিতেন। তিনি জাপানে রসায়নী বিদ্যা এবং ঔষধ-প্রস্তুতি বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। যে-সকল বাঙালী যুবক প্রথম প্রথম জাপানে শিক্ষা লাভ করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রসিদ্ধ ইংরেজী-লেখক স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত জাপানেই সুরেশ বাবুর পরিচয় হয় এবং তাহা স্থায়ী ঘনিষ্ঠ সখ্যে পরিণত হয়। সুরেশবাবু ধনগোপাল বাবুর "গে নেক্" নামক ছেলেদের গল্পের বহি "চিত্রগ্রীব" নাম দিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের লেখা "চিত্রবহা" প্রভৃতি পুস্তকও আছে। জাপান সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জাপান ও জাপানীদিগকে বাঙালীর নিকট পরিচিত করেন।

সুরেশ বাবুর মত প্রকৃত ভদ্র মানুষ আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি অতি নম্র, অতি অল্পভাষী, এবং খুব দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। তাঁহার মুখে ঔদ্ধত্যের বা প্রগল্ভতার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার বাক্‌সংযম ও স্বদেশভক্তি দৃষ্টান্তস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কিছুকাল মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং

নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত নিজের কর্তব্য করিতেন। এই কাগজ দুটির আদর্শের ও উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ ছিল, কেবল বা প্রধানতঃ বেতনের বন্ধন ছিল না। সেই জন্য, তিনি যখন কার্যান্তর গ্রহণ করেন, তখনও অনেক দিন ইহাদের কিছু কিছু কাজ করিয়া দিতেন এবং পরেও ইহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

তাঁহার সহকর্মিতায় আমরা উপকৃত হইয়াছিলাম। উহার স্মৃতি এখনও সুখকর।

তিনি কখনও আমাদের কোনও অনুগ্রহ চান নাই, অযাচিত কোন অনুগ্রহও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই।

—

আইস্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহের লেখা আইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তিনি স্বয়ং ঐ দ্বীপদেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। আর কোন বাঙালী দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

গত ২০শে মে ইয়োরোপের আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ ডেন্মার্কের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। তাহার কারণ, ডেন্মার্ক এখন জার্মেনীর পদানত হওয়ায় তাহার গবর্মেণ্ট নিজের কাজ স্বাধীন ভাবে করিতে পারিতেছে না। যখন জার্মেনী ইয়োরোপের দেশগুলি একটির পর একটি দখল করিতেছে, এমন সময়ে তথাকার একটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সুসংবাদ। আইস্‌ল্যাণ্ড আগে ডেন্মার্কের অধীন ছিল। তাহার পর ১৯১৮ সালে উহার স্বয়ংপ্রভুতা (sovereignty) ডেন্মার্ক কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং উভয় দেশের বন্ধনসূত্র কেবল এই থাকে যে, ডেন্মার্কের রাজা আইস্‌ল্যাণ্ডেরও রাজা থাকেন। এখন সেই সূত্রও ছিন্ন হইল।

আইস্‌ল্যাণ্ড দখল করিয়া বিশেষ কোন সম্পদ লাভ হইবে কি না এবং উহা সামরিক ঘাঁটি হিসাবে আবশ্যক বা উপযোগীও নহে, এই জন্য জার্মেনী উহা দখল করিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু সামরিক প্রয়োজন পড়িলে নিশ্চয় করিবে।

১৯৩৫ সালে আইস্‌ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল মোটে ১,১৫,৮৭০। এখন হয়ত সওয়া লক্ষ হইয়াছে। এই সওয়া লক্ষ লোকও ভৌগোলিক অবস্থানের আনুকূল্যে ও দৈবপ্রসন্নতায় স্বাধীন;—আর ৪০ কোটি লোকের ভারতবর্ষ? হেমচন্দ্র একদা লিখিয়াছিলেন—

> চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান,
> তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
> ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

যখন তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মদেশের সবটা ইংরেজদের দখলে আসে নাই, এবং অন্যের গালে চড় মারিয়া ও অন্যের সম্পত্তি দখল করিয়া নিজের সভ্যতা প্রমাণ করিবার ক্ষমতা তখন জাপানের জন্মে নাই। আগেই বলিয়াছি, কেন জার্মেনী আইস্‌ল্যাণ্ড লইবার চেষ্টা এখনও করে নাই। যদি শিল্প-বাণিজ্যের বা যুদ্ধের নিমিত্ত উহার কোন উপযোগিতা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ গ্রাস করিবে।

—

হিতসাধন উদ্দেশ্যে দেশজয় ও মনুষ্যবধ

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে কোন দ্বীপ থাকিলে তাহারই হিতের নিমিত্ত জার্মেনী বা জাপান তাহা দখল করিতে পারে এবং তাহার অধিবাসীদিগের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদিগকে গুলি করিতে পারে;—ইহা আধুনিকতম রাষ্ট্রনীতির বিধান। এইরূপ বিধান সম্বন্ধে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মিঃ বের্ট্রাণ্ড শ্যাডোএল্ (Bertrand Shadwell) একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতা লেখার অভ্যাস না থাকায় পদ্যানুবাদ দিতে পারিলাম না—গদ্যানুবাদ বেশ জুৎসই হইবে না।

> If you see an island shore
> Which has not been grabbed before,
> Lying in the track of trade, as islands should,
> With the simple native quite
> Unprepared to make a fight,
> Oh, you just drop in and take it for his good.
> Not for love of money, be it understood.
> But you row yourself to the land,
> With your shastra in your hand,
> And you pray for him and rob him, for his good.
> If he hollers, then you shoot him, for his good.
> He would welcome foreign rule,
> If he weren't a blooming fool.
> Thus you see, it's only for his good.
> So they're burning houses for his good,
> Making helpless women homeless for their good
> Leaving little children orphans for their good.
> You may burn and you may shoot,
> You may fill your sack with loot,
> But be sure you do it only for his good.

MORAL

> If you dare commit a wrong
> On the weak because you're strong,
> You may do it if you do it for his good!
> You may rob him if you do it for his good;
> You may kill him if you do it for his good.

তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

কয়েক দিন আগে একখানি মাসিক কাগজে অন্য এক মাসিকের একটা গল্পের সমালোচনা চোখে পড়িল। সমালোচনাতে ঐ গল্পের কোন কোন অংশের যে চুম্বক দেওয়া হইয়াছে ও যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইলাম, বাঙালী শিক্ষিতসমাজে কেমন করিয়া এরূপ গল্প স্থান পায়। ঐ রকম গল্প বোধ হয় তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্যের নমুনা।

গত ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহার নিমিত্ত আমরা "সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টে একটি সাহিত্য-সম্মেলনে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতে নূতন কিছু জিনিস যোগ করিয়া ঐ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। উক্ত বক্তৃতা ও উক্ত প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, "প্রগতি"-সাহিত্য যদি কোনও প্রকার দুর্গতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির ফল হয়, তাহা হইলে সেই সহানুভূতির ফলে দুর্গতদের উন্নতির জন্য নানা সমিতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাহা ত দেখা যায় না। আমরা বলিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম—

যদি এই সমস্ত সাহিত্যিকরা বাস্তবিকই দরদী হন, তা হলে [তাঁরা এবং] তাঁদের রচনা পড়ে অন্য লোকেরা দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্রতী হবেন।...এঁদের রচনার ফলে পতিতাদের দুঃখ দুর্দশামোচনের জন্যে ক'টা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও চলছে, সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এঁদের রচনা পড়ে গরীব লোকদের জন্যে যদি কারো প্রাণ কাঁদে, তা হ'লে তাঁরা ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন যদি এঁদের রচনায় থাকে, তা হ'লে এঁদের সাহিত্য হবে সত্য। কিন্তু তা [নিকৃষ্ট] প্রবৃত্তিপ্রসূত আর বণিগ্‌বৃত্তি থেকে প্রসূত হ'লে কারো লেখা সত্য হবে না। প্রকৃত করুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখান হ'লেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাতে বড় হতে পারে সে চেষ্টা না করলে সবই ব্যর্থ।

আমরা কবি নহি, গল্প ও উপন্যাসও লিখিতে পারি না। সেই জন্য আমাদের কথা উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় আমরা আমাদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ভাষা-পরিচয়" গ্রন্থ হইতে নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম :—

সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালোমন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তার শুভবুদ্ধি, যে-বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হ'তে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হ'য়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধি রূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে, তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে। সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোন জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।

তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহঙ্কার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেন না, সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র ক'রতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হ'য়ে আত্মশ্লাঘা ক'রে বেড়াবে তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্য্যবান হ'য়ে সকল প্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হ'ল।

এই মাসের প্রবাসীতে "সাহিত্য, গান, ছবি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত "প্রগতি"-সাহিত্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে, বললেন আমি তো এই দিলুম, এবার নিজেকে সম্পূর্ণ করো। সেই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। আর্ট যেখানে বড়ো সেখানে মহৎকে, সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মানতে চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টল্‌তো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য। হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এসব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কমের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, কিন্তু তাঁরা মহাপ্রাণ, আমাদের প্রণম্য। তুমি কি বলবে আজ আমাদের জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য বলে আকাশে চাঁদ ওঠে না, মানুষ ভালোবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কী? তাতে তো কোনো মানুষের কোনো উপকার হবে না; কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, "তাতে তো...কারো পেট ভরবে না," তাহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি যে, কাব্যকে বিকৃত করিলে দেশের অন্নাভাব সমস্যার সমাধান হইবে না। "প্রগতি"-সাহিত্যিকের পেট অবশ্য ভরিতে পারে।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর

দেববর্মা বাহাদুর যে দরবারে রবীন্দ্রনাথকে গত ২৫শে বৈশাখ "ভারতভাস্কর" উপাধি দিয়াছেন, তাহাতে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেনঃ—

আমি প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই যাই। ভারতীয় কবিকে ঐদেশের সর্বশ্রেণীর লোকেরা তখন কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইটালীতে রাজকীয় সম্মানকে দূরে রাখিয়া পল্লীবাসী বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন সসম্ভ্রমে পথিপার্শ্ব হইতে নতজানু হইয়া কবির পরিধেয় পোষাক অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিত, তখন ভারতীয় যুবক আমি, আমার প্রাণ, গর্বে ভরিয়া উঠিত। এই প্রকার সম্মান সে দেশের পোপ অথবা সম্রাটেরই কেবল প্রাপ্য!

ইহার পরেও আমাকে কিছুকাল সুইজারলেণ্ডে কাটাইতে হইয়াছিল। সেখানে বিভিন্ন দেশের লোকের সম্মিলন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে-ই শুনিয়াছে আমি ভারতবাসী; অমনি আমার সঙ্গে তাহারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাহাদের শ্রদ্ধা দেখিয়া!

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃহৎ "বঙ্গীয় শব্দকোষে"র ৭৫তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "মানস", এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২০৯৬।

যুদ্ধের বাজারে কাগজ প্রভৃতির দাম খুব বেশি বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অভিধান বাহির করিয়া চলিতেছেন, ইহা তাঁহার আত্মোৎসর্গ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের প্রমাণ। এই অভিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, কলেজ লাইব্রেরি. উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি এবং সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরিসমূহে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

—

"লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা"র "আহার ও আহার্য্য"

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্য "আহার ও আহার্য" বিষয়ে এক জন বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার জন্য এই বহিটি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্য বিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে ব'লে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে।"

এই বইখানি বাংলা দেশের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার সর্বত্র ব্যবহারে দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে মনে করি।

আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞানলাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতী হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন। যে-রকম বহি মনে রাখিয়া ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালাতে সেইরূপ বহি অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। "আহার ও আহার্য" বহিখানির ঠিক্ আগে বাহির হইয়াছিল "পৃথ্বী-পরিচয়"। তাহার সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীমান্ প্রমথনাথের 'পৃথ্বী-পরিচয়' একাধিক বার পড়েছি। বই-খানি ছোট হলেও বিষয় ছোট নয়। যে-সব তথ্যের আলোচনা এতে রয়েছে তা সব সময়ে সহজবোধ্য নয় এবং তার খবর সকলের জানা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব খবর বিজ্ঞানভাণ্ডারের তাজা মাল। মাত্র কয়েক বৎসর হোলো এই সব রহস্যের মর্ম্মকথা বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। সহজ ও সরল ভাষায় প্রমথনাথ যে এই সব বিষয় জন-সাধারণের উপযোগী করে লিখতে পেরেছেন এতে তাঁর ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্য তো প্রকাশ পেয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হয়েছে তা পাঠকরা সকলেই স্বীকার করবেন।

"বিজ্ঞান প্রসারের যে-পন্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ যে শীঘ্রই লোকপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা নিঃসন্দেহ। "লোকশিক্ষা" গ্রন্থ-মালার আশুপ্রকাশ্য বইগুলি যে 'পৃথ্বী-পরিচয়ে'র মত সুখপাঠ্য ও অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকবে তা আমরা সহজেই আশা করতে পারি।"

—

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" নামক গ্রন্থটির এখন-প্রকাশ সময়োচিত হইয়াছে। এই বৎসর নানা স্থানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হইয়াছে, আরও অনেক জায়গায় হইবে। তাহার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। যাহারা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি লোক সত্য সত্যই রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা এই বৃহৎ গ্রন্থটি হইতে এই সাহিত্য বুঝিতে অনেক সাহায্য পাইবেন। ইহাতে "কবি রবীন্দ্রনাথ", "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন", "কাব্যপ্রবাহ", "ছোট গল্প", "নাটক ও নাটিকা", এবং "উপন্যাস", এই কয়টি অধ্যায় আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশাল, তাহার বিশালতা এখনও

বাড়িতেছে, এবং এই গ্রন্থখানিতে কবির নানাবিধ রচনার বিস্তারিত আলোচনা আছে। সুতরাং ইহাতে হাল-নাগাদ সকল গ্রন্থের আলোচনা নাই, থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা আছে, তাহা বহু অধ্যয়ন ও মননের ফল।

গ্রীস ও ক্রীট হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ

গ্রীসদেশের সভ্যতা এবং ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা খুব প্রাচীন। এই দুই দেশ ও দ্বীপ এখন জার্ম্যানদের হাতে। তাহারা অন্যত্র যেরূপ ধ্বংসনৈপুণ্য দেখাইয়াছে, তাহাতে গ্রীস ও ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক নানা পদার্থের কি অবস্থা হইবে বলা যায় না। কিন্তু গ্রীস ও ক্রীটের নাম করিলে আজ সে সব কথা আগেই মনে আসে না। সকলের আগেই মনে আসে, গ্রীস ও ক্রীট হইতে ব্রিটিশ সৈন্যদলের হটিয়া আসা। তাহারা লড়িয়াছিল খুব সাহস ও দক্ষতার সহিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইল কেন? তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, জার্ম্যানরা সৈন্য আনিয়া ফেলিয়াছিল অনেক বেশী (কতক প্যারাশুটের সাহায্যে), জার্ম্যান সৈন্যদের যন্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা (mechanization) ইংরেজদের চেয়ে বিরাট ও উৎকৃষ্টতর ছিল, এবং ইংরেজ স্থলসৈন্যেরা আকাশযোদ্ধা এরোপ্লেনের সাহায্য কম পাইয়াছিল।

এই সব কারণে ইংলণ্ডেই সংবাদপত্রসমূহ যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করিতেছে ও কৈফিয়ৎ চাহিতেছে।

উত্তর-আফ্রিকাতেও জার্ম্যানরা ইংরেজদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ও অধিকতর যন্ত্রসজ্জাবিশিষ্ট সৈন্য আনিয়া ফেলায় নানা স্থানে ইংরেজদিগকে হটিয়া আসিতে হয়।

ক্রীট জার্ম্যানদের হাতে যাওয়ায় তাহাদের সুয়েজ খাল আক্রমণের সুবিধা বাড়িল এবং ইংরেজদের তাহা রক্ষা করা কঠিনতর হইল।

ইংরেজদের কী চাই

হটিয়া আসার কাজটা যত শৌর্য্য ও দক্ষতার সহিতই করা হউক না কেন, সেটা যুদ্ধে জয়লাভের সমতুল্য ত নহেই, সামলাইয়া উঠিতে না পারিলে তাহা পরাজয়েরই উপক্রমণিকা হইয়া উঠিতে পারে। আমরা ইংরেজদের পরাজয় অবাঞ্ছনীয় মনে করি। আমরা তাহাদের জয়ই চাই। সেই জন্য তাহাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি চাই, সামরিক যন্ত্রসজ্জার আরও খুব বৃদ্ধি চাই, এবং তাহাদের এরোপ্লেনের ও এরোপ্লেন-চালকদের সংখ্যা খুব বাড়া চাই।

ভারতবর্ষের সাহায্য না লইলে ইহার কোন দিকেই ইংরেজদের ব্যবস্থা যথেষ্ট হইবে না—বিশেষতঃ যদি আমেরিকা জলে স্থলে আকাশে তাহার সৈন্য, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধে না নামে।

ভারতবর্ষকে অনির্দিষ্ট সুদীর্ঘ কালের জন্য আপন ক্ষমতার অধীন রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটেন কখনও তাহাকে জলেস্থলেআকাশে যুদ্ধে আত্মনির্ভরক্ষম করিতে চেষ্টা করে নাই, সামরিক ও অসামরিক যানবাহন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিবার শিক্ষা এবং সুযোগও দেয় নাই। এই সংকট-কালেও ব্রিটেনের পলিসি সারতঃ অপরিবর্তিত রহিয়াছে!

ভারতে এরোপ্লেনের ও তাহার চালকের সংখ্যা

আজকালকার যুদ্ধে এরোপ্লেন অত্যাবশ্যক। হাজার হাজার এরোপ্লেন চাই। প্রায় এক বৎসর আগে ভারত-সরকার বলেছিলেন, ভারতের এরোপ্লেন এক স্কোয়াড্রন থেকে বাড়িয়ে চার স্কোয়াড্রন করা হবে। চার শত গুণ বৃদ্ধি!!! শুনতে বেশ। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে চার স্কোয়াড্রন এরোপ্লেন ত দুই পক্ষের কোন-না-কোন পক্ষের বা উভয় পক্ষেরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের চার স্কোয়াড্রন এরোপ্লেন, "হাসি পায় কথা শুনে"! কান্নাই পেতে পারত যদি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট আমাদের সবাইকে ঘোর অদৃষ্টবাদী না করে ফেলতেন। যাদের পুরুষকার কাজে লাগাতে দেওয়া হয় না, তাদের, "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি", এই নিন্দা সহ্য করা ভিন্ন উপায় কি?

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বৎসরে ৩০০ চালক ও ২০০০ মিস্ত্রী শিক্ষা দিয়ে দু-বৎসরে ৬০০ চালক ও ৪০০০ মিস্ত্রী তৈরি করতে চান। চল্লিশ কোটি মানুষের দেশের জন্যে এই ব্যবস্থা। কানাডার লোকসংখ্যা মোটামুটি এক কোটি চার লক্ষ। কানাডা বৎসরে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ এরোপ্লেন-চালক তৈরি করছে। অষ্ট্রেলিয়াতেও এই রকম দ্রুত শিক্ষা বিস্তর যুবককে দেওয়া হচ্ছে; ইতিমধ্যেই ৩৫০০০ চালক সেখানে তালিকাভুক্ত হয়েছে। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যাও মোটে ৬৭,৫৩,১১৪,—ভারতবর্ষের তুলনায় কিছুই নয়।

বাংলার মন্ত্রীরা উপদেশ দিয়েছেন যদি কারু বাড়ীতে আগুনে বোমা পড়ে, তা হলে বাড়ীর লোকেরা যেন তাতে

মিলিটারি একাডেমির ছাত্রদের উপাধি-দান উৎসবে অশ্বপৃষ্ঠে সঙ্গিগণ সহ মার্শাল চিয়াং কাই-শেক।
দক্ষিণ পার্শ্বে—যুদ্ধক্ষেত্রের সেবিকা দল
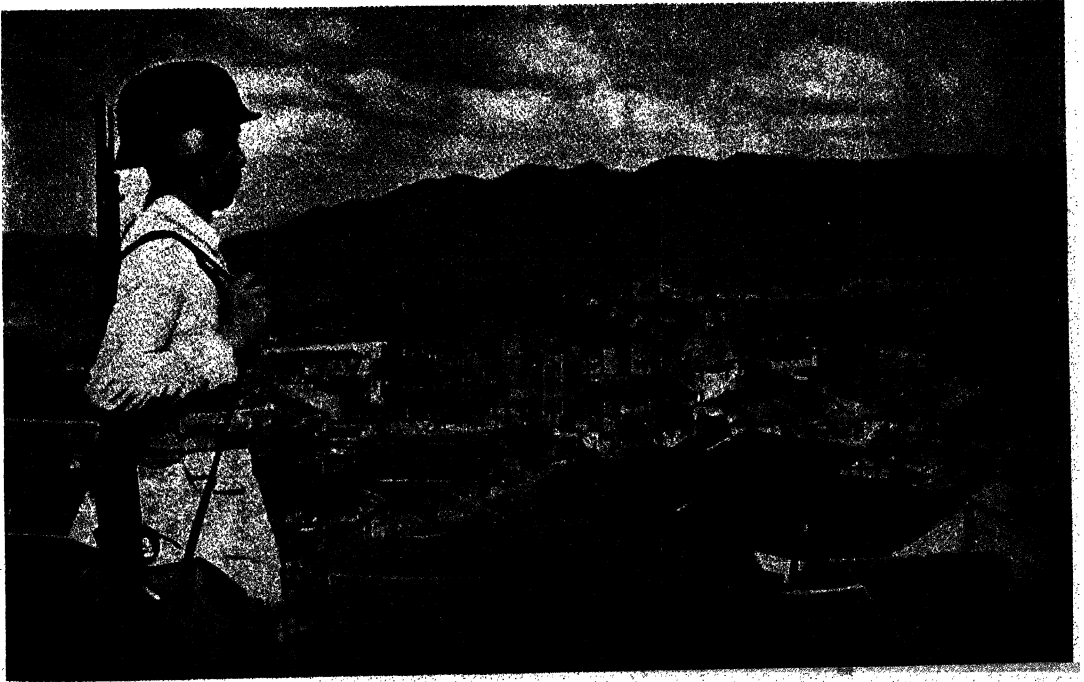
চীনের রাজধানী চুংকিং। সম্প্রতি জাপানীরা বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া ইহার বিস্তর ক্ষতি সাধন করিয়াছে

আইস্‌ল্যাণ্ডীয় হিমবাহ

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা
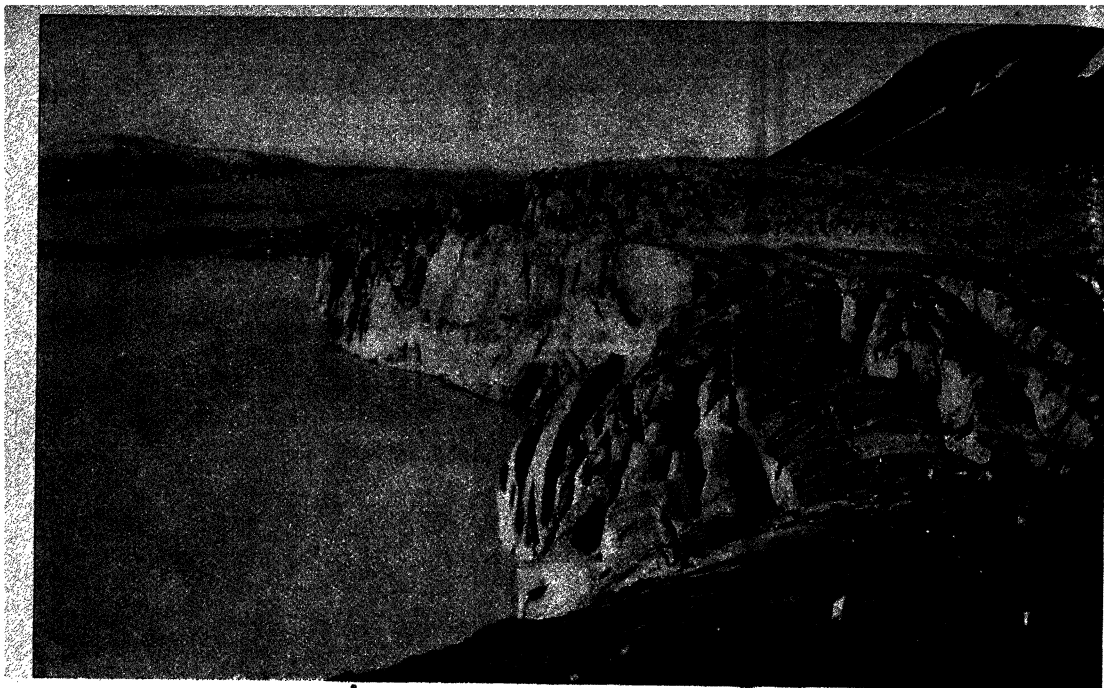
জল না ঢালেন—কেন না, জল ঢাললে বোমা ফেটে যেতে পারে! মন্ত্রী মশায়রা ধ'রে নিয়েছেন যে বোমাগুলি ভাল্‌মানুষের মতন আমাদের মাথায় না প'ড়ে আশেপাশে কোথাও পড়্‌বে।

—

সীরিয়ার সঙীন অবস্থা

যুদ্ধের কোন একটা সংবাদ নিয়ে মাসিক কাগজে কিছু লিখলে কাগজ বেরতে না বেরতে সেটা পুরাতন ইতিহাসের সামিল হয়ে যেতে পারে। তা হ'লেও সীরিয়া সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। এই দেশটা অনেক দিন থেকে ফ্রান্সের অধীন; পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছে কিন্তু এখনও পায় নি। এখন এখানে দুই পক্ষে যুদ্ধ আসন্ন;—এক পক্ষে ব্রিটেনের এবং 'স্বাধীন' ফ্রান্সের সৈন্যদল, অন্য পক্ষে জার্মেনী ও তার তাঁবেদার ফ্রান্সের সৈন্যদল। যুদ্ধটা পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষের নিকটে এসে পড়ল,—পূর্ব দিকে ত জার্মেনীর বন্ধু জাপান আগে থাকতেই ভারতবর্ষের খুব কাছে এগিয়ে আছে। দুই দিক থেকে, কিম্বা কোন একটা দিক থেকেও, আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে ভারতবর্ষ কতটা প্রস্তুত, তা সর্বসাধারণ বিদিত নয়।

—

যুদ্ধ-পরামর্শদাতা পরিষদ

একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে বড়লাট ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে পরামর্শদাতা নেবেন; এক একটা দলের নেতাদের বলা হয়েছে তাঁদের প্রতিনিধিদের নাম করতে। এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল। কিন্তু কংগ্রেসের পুণা-প্রস্তাব দ্বারা, কিম্বা অন্ততঃ বোম্বাইয়ের বে-দল নেতাদের কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবের দ্বারা, যে রকম 'জাতীয়' গবর্মেণ্ট চাওয়া হয়েছিল, তা না-হ'লে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্যে ভারতবর্ষে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মাবে না, এবং সে-রকম আগ্রহ না হ'লে ব্রিটেনের সব রকমের যত সাহায্য দরকার ভারতবর্ষ থেকে তা পাওয়া যাবে না। এটা দরদস্তর নয়, ব্রিটেনের সঙ্কট অবস্থার সুযোগ গ্রহণও নয়। ইংরেজরা ভেবে দেখতে পারেন তাঁরা যদি ভারতবর্ষের স্বলভুক্ত হতেন, তা হলে তাঁদের শাসক জাতির পক্ষে যুদ্ধ করতে হ'লে ভারতবর্ষের মত পরাধীন অবস্থায় তাঁদের উৎসাহ হ'ত কি না। মানুষের স্বভাব ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে আলাদা নয়।

হিন্দু মুসলমান কি দুটা পৃথক নেশ্যন?

মিঃ জিন্না ব'লেই চলেছেন, ভারতবর্ষের হিন্দুরা এক নেশ্যন মুসলমানরা আর এক নেশ্যন! নেশ্যান কথাটার মানেই তা হ'লে বদলাতে হয়। এখনও হিন্দুদের মধ্যে কেও কেও মুসলমান হচ্ছে আবার মুসলমানদের মধ্যে কেও কেও শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু হচ্ছে। তা হ'লে অন্য ধর্ম নেবার আগে এই লোকগুলি এক নেশ্যানের অন্তর্গত ছিল, অন্য ধর্ম নেবামাত্র তারা হ'য়ে গেল অন্য নেশ্যানের লোক! ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানের পূর্বপুরুষরা আগে ছিল হিন্দু। তারা এক নেশ্যন ছিল, আর তাদের বংশধরেরা হয়ে গেছে অন্য নেশ্যন, অথচ তাদের সবাইকার দেশটা আগেকার দেশই আছে, ভাষা আগেকার ভাষাই আছে, অধিকাংশের পরিচ্ছদ একই আছে, রীতিনীতি একই আছে, সংগীত যে এমন হৃদয়ের জিনিস তা একই আছে, খাদ্যও প্রধানতঃ একই আছে,...। ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু আর মুসলমান ত থাকে না; আদিবাসীরা আছে, খ্রীষ্টিয়ান ইহুদী পারসী বৌদ্ধ ইত্যাদি আছে। তা হ'লে ভারতবর্ষের নেশ্যনগুলার সংখ্যা কত? কোন কোন ইংরেজ বৌদ্ধ হয়েছে বা মুসলমান হয়েছে বা হিন্দু হয়েছে। তারা কি আর ব্রিটিশ নেশ্যনের অন্তর্গত নয়? তবে কোন নেশ্যনের? চীনে বৌদ্ধ, কংফুচ্‌শিষ্য, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান আছে। তাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, খাদ্য, পোষাক,...একই রকম। তারা সকলেই চৈনিক নেশ্যনের লোক, যুদ্ধ করছে জাপানী নেশ্যনের বিরুদ্ধে। মিঃ জিন্নার সুবিধার জন্যে দেখছি অভিধান, মানবপ্রকৃতি, রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান, সব বদলাতে হবে।

—

ঢাকার 'দাঙ্গা'র তদন্ত কমীটি

ঢাকার 'দাঙ্গা'র তদন্ত করবার জন্যে এক জন হাইকোর্ট জজ ও এক জন জেলাজজকে নিয়ে তদন্ত কমীটি নিযুক্ত হয়েছে। দু-জনই ইংরেজ। ইংরেজ রাজত্বে হিন্দু-মুসলমানের 'দাঙ্গা'য় কেবলমাত্র ইংরেজই যে নিরপেক্ষ তদন্তকারী বিবেচিত হবেন, এ আর বিচিত্র কি? তবে, দু-জনেই হাইকোর্টের ব্যারিস্টর জজ হ'লে চলত না কি? ফল কি হয় দেখা যাক। 'দাঙ্গা' ঢাকায় এই প্রথম হচ্ছে না; এর আগেও হয়েছিল। একবারের কথা মনে আছে। তার তদন্তের রিপোর্ট যে-কারণে সেবার প্রকাশিত হয় নি, তাও জানা আছে। এবার কি ব্যবস্থা হবে, দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ।

নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ঝড়

নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ঝড়ে কত যে মানুষ মরেছে, গবাদি পশু কত মারা পড়েছে, নানা রকমের সম্পত্তি কত যে নষ্ট হয়েছে, অগণিত ঘরবাড়ী নষ্ট হওয়ায় কত মানুষ যে গৃহহীন হয়েছে, তা ঠিক্ বলা যায় না। দুর্গত বিপন্ন লোকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। যাঁরা এঁদের সাহায্য করছেন, তাঁরা নানা কারণে সর্বসাধারণের নিকট থেকে যথেষ্ট টাকাকড়ি পাচ্ছেন না। তার কারণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহৃদয় লোকেরা সাহায্য করবেন। এ সময়ে গবর্মেণ্টের মুক্ত হস্তে সমুদয় বিপন্ন লোককে সাহায্য দেওয়া উচিত।

বিধ্বস্ত এই দুটি জেলায় নারিকেল ও সুপারির বাগান থেকে বিস্তর লোকের আয় হয়। ঝড়ে সেগুলি বহুপরিমাণে নষ্ট হওয়ায় তাদের বড় বেশি ক্ষতি হয়েছে। কত দিনে যে ক্ষতিপূরণ হবে বলা যায় না।

সম্মিলিত নির্বাচন

সিন্ধুদেশের কয়েকটি মিউনিসিপালিটিতে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নির্বাচকরা একত্র ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করায় ফল ভাল হয়েছে। নির্বাচিত সভ্যরা সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই সমর্থন পেয়েছেন ব'লে সকলের কল্যাণই তাঁদের দেখতে হয়। সম্মিলিত নির্বাচন সর্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ইয়োরোপীয় অনুবাদের প্রচার

ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের সম্মানের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, সুইজার্ল্যাণ্ডে নানান্ দেশের লোকের সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা হ'ত, তিনি দেখতেন তাঁরা সবাই তাঁদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ পড়েছেন। আমরাও এর অন্য রকম প্রমাণ জার্মেনীতে পেয়েছিলাম। ড্রেসডেনে যে হোটেলে কবি কয়েক দিন ছিলেন, সেখানে তাঁকে তাঁর কোন-না-কোন বহির জার্ম্যান অনুবাদ পুস্তকে স্বাক্ষর করতে দেখেছি। সে একটা দুটোতে নয়, অনেকগুলোতে, এবং যারা দস্তখত করাত, তাদের মধ্যে হোটেলের চাকরচাকরানীরাও ছিল।

রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, জার্মেনীতে তাঁর বই বিক্রী এত হয়েছিল, যে, মার্কের বিনিময়-মূল্য অত্যন্ত বেশি কমে না গেলে তিনি এত বেশী টাকা পেতেন যে, তাঁকে বিশ্বভারতীর জন্যে ভিক্ষা করতে হ'ত না। মার্কের দাম কমে যাওয়ায় তিনি জার্ম্যান অনুবাদের রয়্যাণ্টি ল্যান নি।

ইয়োরোপের জার্ম্যানী ও অন্য অনেক দেশে তাঁর কোন কোন বইয়ের যে অনুবাদ হয়েছে তা প্রায় সবই ইংরেজী অনুবাদ থেকে অর্থাৎ সেগুলো তর্জমার তর্জমা। তাঁর ভাল ভাল বিস্তর বইয়ের কোন বিদেশী ভাষাতেই অনুবাদ হয় নি। যা অনুবাদ হয়েছিল, তারই এত আদর হয়েছিল। আর আমাদের দেশে তাঁর গুণগ্রাহী অগণিত লোক আছেন, তিনি যে-ভাষায় কাব্য লিখেছেন তাও আমাদেরই ভাষা, অথচ আমাদিগকে দমদমায়, বর্ধমানে ও অন্যত্র রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় বলতে হয়েছে, যে, সভায় উপস্থিত অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যাঁদের একখানাও নিজস্ব রবীন্দ্ররচিত বই নেই। কেউ কোথাও এ কথার প্রতিবাদ করেন নি। আমাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তব ও "কেজো" হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ব্রিটেনে নাৎসী বর্বরতা

ব্রিটেনে বোমা ফেলে জার্ম্যানরা যে প্রলয়কাণ্ড করছে, রয়টারের তারের খবরে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে। আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে হ'লে শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা, এরোপ্লেন তৈরি করবার কারখানা, জাহাজের ডক্ ইত্যাদি ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া আবশ্যক বটে। যে-সব কারখানায় সেই-সব মাল তৈরি হয় যেগুলো বিদেশে চালান ও বিক্রী ক'রে টাকা পাওয়া যায়, তাও নষ্ট করা দরকার হ'তে পারে। কেন-না, যুদ্ধ চালাতে হ'লে খুব অর্থ চাই, অর্থ পাবার প্রধান উপায় বাণিজ্য। সুতরাং পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলো নষ্ট ক'রে দিলে অর্থ আসবার পথ বন্ধ ক'রে শত্রুকে কাবু করা যায়।

কিন্তু জিতবার জন্যে শত্রুপক্ষের গির্জা, হাসপাতাল, গরিব বৃদ্ধদের আশ্রয়স্থল, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, পুস্তকের দোকান, ইস্কুল কলেজ,...এসব ধ্বংস করবার কোনই আবশ্যক নাই। খুব বড় যুদ্ধ হ'লেও যুদ্ধরত সব দেশেরই অধিকাংশ লোক—বৃদ্ধ শিশু বালকবালিকা, নারী—যুদ্ধ করে না। বৃদ্ধেরা ত একেবারে সে কাজের বাইরে। নারীরাও প্রায় তাই। যুদ্ধ ৫।৭ বৎসর চললেও অনেক শিশু ও বালকের বয়স এত হবে না যে, তারা পরে যুদ্ধ করতে পারবে। গৃহস্থরা এই সব মানুষ নিয়ে যে-সব ঘরবাড়ীতে থাকে, লড়াই ফতে করবার জন্যে শহরের গ্রামের সে সব

ঘরবাড়ী নষ্ট করাও অনাবশ্যক। কিন্তু নাৎসীরা তা কচ্ছে। এই জন্যে তাদের বর্বরতার প্রতি ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। তারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছে। এ রকম বর্বরতা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও কোন কালে তাদের শত্রুদের সঙ্গে প্রকৃত সদ্ভাব স্থাপন সুদূরপরাহত করছে। অনেক সময় কোন পক্ষ নিজে যাদের যে বর্বরতা নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, তারই শোধ নেবার জন্যে তাদের উপর পাল্টা বর্বরতা করে থাকে। জার্মেনীর ব্রিটেনে সে রকম বর্বরতা করবার কোন কারণ আছে কিনা জানি না। জার্মেনী ব্রিটেনে যে বর্বরতা কচ্ছে, ব্রিটেন তার শোধ নেবার জন্যে জার্মেনীতে সে রকম বর্বরতা কচ্ছে কি না, তাও জানি না। কিন্তু বর্বরতা শুরু যারা করে, তারা খুবই বেশী নিন্দনীয়। যারা বর্বরতার প্রতিশোধে বর্বরতা করে তারাও প্রশংসার যোগ্য নয়, নিন্দারই যোগ্য।

—

ইয়োরোপের বাইরে য়ুরোপীয় বর্বরতা

এখন ইয়োরোপের যে যে দেশ অন্য কোন কোন দেশের লোকদের বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হচ্ছে, তাদেরই খুব রাগ হচ্ছে, এবং তারা শত্রুপক্ষকে অস্ত্রাঘাতের চেষ্টা ছাড়া তার উপর অভিধান থেকে বাছাবাছা বাক্যবাণও বর্ষণ করছে।

য়ুরোপীয় বর্বরতায় বিধ্বস্ত য়ুরোপীয় দেশ সকলের অধিবাসীদের কিন্তু এ সময় স্মরণ করা উচিত, ইয়োরোপের অনেক জা'ত ইয়োরোপের বাইরে এই রকম এবং এর চেয়েও বেশী বর্বরতা কখন্ কখন্ কোথায় কোথায় করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় য়ুরোপীয়েরা যাবার আগে যে-সব আদিম আমেরিকান জা'ত বাস করত তারা সবাই অসভ্য ছিল না। য়ুরোপীয়েরা যখন তাদের দেশ দখল করতে ও তাদের সকলকে নির্মূল করতে আরম্ভ করে, তখন তারা অনেক বিষয়ে সভ্য ছিল; তাদের বিজেতাদের মত বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী ছিল না, নিষ্ঠুরতাতেও তারা তাদের নিম্নস্থানীয় ছিল। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার ইঙ্কা, আজ্‌টেক ও ময়দের সভ্যতার নিদর্শন য়ুরোপীয় বিজেতাদের বর্বর ধ্বংসচেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত যা আছে, তাতে বিস্মিত হ'তে হয়। য়ুরোপীয় কোন কোন লেখকই তাদের সভ্যতার যে-সব বর্ণনা রেখে গেছেন, তা বিস্ময়কর। প্রাচীন আমেরিকান সভ্যতার যে-সব নিদর্শন ধ্বংস করা হয়েছে, যে-সব আদিম জাতি নিঃশেষে নিহত বা প্রায় লুপ্ত হয়েছে, তা কেমন ক'রে হয়েছে, তার য়ুরোপীয়দের লেখা বৃত্তান্ত পড়লে অবাক্ হয়ে যেতে হয় যে, সভ্যনামধারী মানুষরা কেমন করে এমন পৈশাচিক কাণ্ড করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে, য়ুরোপীয়দের কল্যাণে, অনেক আদিম জাতি লোপ পেয়েছে। মেওরিরা লোপ পেতে বসেছিল, নিউজীল্যাণ্ডের আধুনিক গবর্মেণ্টের প্রকৃত সভ্য মনোভাব ও ব্যবস্থার দরুন কিছু বাড়তে আরম্ভ করেছে।

আফ্রিকার নিগ্রোদের নির্মূল করতে য়ুরোপীয়রা পারে নি, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কমে গেছে. তাদের জমী থেকে তারা বেদখল হয়েছে, কোথাও তারা স্বাধীন নেই—কেবল লাইবীরিয়া নাম দিয়ে একটি ছোট নিগ্রো সাধারণ-তন্ত্র প্রধানত আমেরিকার কৃপায় স্থাপিত হ'য়ে টিকে আছে। নিগ্রোদের গ্রাম সব থেকে হাজারে হাজারে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকায় বিক্রী করা হ'ত। পথেই অনেকের মৃত্যু হ'ত, যারা আমেরিকায় পৌঁছত, তারা পশুর অধম ব্যবহার পেত। এক সময় বেলজিয়ান্ গবর্মেণ্ট কঙ্গো দেশে যথাদিষ্ট রবার সংগ্রহ করে না দিতে পারলে পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের একটা হাত বা একটা পা কেটে দিত। তার বৃত্তান্ত পড়েছি ছেপেছি, ছবি দেখেছি ছেপেছি।

আর কত লিখব? এশিয়ায় য়ুরোপীয়রা যখন প্রথম এসেছিল, তখন এই মহাদেশের প্রধান প্রধান জাতিরা এতটা সভ্য ও শক্তিশালী ছিল যে, কোথাও তাদেরকে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি—তারা অপেক্ষাকৃত সহজে পোষ মানে ব'লে হয়ত তা করবার চেষ্টাও আবশ্যক হয় নি। যে চীনে জাপানের বর্বর ধ্বংস-চেষ্টা এখন এত নিন্দিত হচ্ছে—সত্যই নিন্দার যোগ্য জাপান, সেই চীনে য়ুরোপীয়েরা উপদ্রব কম করেন নি। চীনের রাজধানী পেকিঙ্-এর যে অপূর্ব অতুল গ্রীষ্ম-রাজপ্রাসাদ (Summer Palace), তাও য়ুরোপীয় বর্বর দস্যুতা ও বিনাশ-চেষ্টার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি।

য়ুরোপীয় সভ্যতার নিছক নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। য়ুরোপীয়দের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি অনেক হয়েছে, সে বিজ্ঞানের সব প্রয়োগ সংঘাতিক নয়, অনেক উচ্চ মানবিক আদর্শ য়ুরোপীয়েরা আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাশ্চাত্য বহু কবি ও দার্শনিক চমৎকার কাব্য ও দর্শন রচনা করেছেন। পাশ্চাত্য লোকেরা ন্যায়-বিধির রাজত্ব ও মানবের সাম্য প্রচার করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগুলার অ-পাশ্চাত্যের সহিত সম্পর্ক ও ব্যবহার তাদের উচ্চ কোন আদর্শের অনুরূপ হয় নি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংস হবার আশঙ্কা

ইয়োরোপে এখন যে যুদ্ধ চলছে ও যা ক্রমেক্রমে আফ্রিকায় ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে, এবং যাতে আমেরিকারও শীঘ্র জড়িত হবার সম্ভাবনা হয়েছে, অনেকে বলেছেন সেই যুদ্ধ শীঘ্র থেমে না গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতা লোপ পাবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার যা ভাল ফল, খুব সংক্ষেপে তার উল্লেখ আগে করেছি। কিন্তু ইয়োরোপের বাইরে অপাশ্চাত্য জাতিরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে লুব্ধ দস্যু ও শ্বাপদ রূপের সঙ্গে বেশি পরিচিত, সেই দস্যু ও শ্বাপদ রূপ যদি লোপ পায়, তাতে ত ভয় পাবার বা দুঃখ করবার কোন কারণ দেখছি না।

ইয়োরোপের বাইরে কোন য়ুরোপীয় মানুষ সভ্য-সাধুজনোচিত ব্যবহার ও কাজ কখনো করেন নি, একথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। যাঁরা এরকম ব্যবহার ও কাজ করেছেন এ রকম মানুষ ছিলেন, আমরা দেখেছি ;—এখনও থাকতে পারেন। এটা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে, ইয়োরোপের বাইরে কোনো পাশ্চাত্য বিদেশী গবর্মেণ্ট হিতকর কোন আইনকানুনই করেন নি। তা কিছু কিছু করেছেন বই কি ? কিন্তু ইয়োরোপের বাইরে সর্বত্র—বোধ হয় এক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া—পাশ্চাত্য গবর্মেণ্টের ও শ্বেতজাত'দের প্রধান যে পলিসি ও চেষ্টা বরাবর চলে আসছে, তা গৃধ্নুতার উপর এবং অপাশ্চাত্য জা'তগুলোকে বরাবর পায়ের নীচে রাখবার প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুটো অঙ্গ পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িত নয়। এ দুটো গেলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ টিকে থাকতে পারবে।

কিন্তু ঐ দুটো যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্থিমজ্জাগত অপরিহার্য অংশ হয়, তা হলে যাক্ না পাশ্চাত্য সভ্যতা। মানবপ্রকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে বড় এবং আদিম। সেই মানবপ্রকৃতি জন্ম দিয়েছিল ভারতে উপনিষদের ঋষিগণকে গৌতম বুদ্ধকে, চীনে কংফুচকে লাওৎসেচক, ইরানে জরথুস্ট্রকে, প্যালেস্টাইনে খ্রীষ্ট যিশুকে। সত্য সভ্যতার পুনরুত্থান তার থেকে হতে পারবে। অতএব, ভয় পাব না আমরা।

—

আসামে ও বঙ্গে জলপ্লাবন

আসামের ও বঙ্গের কয়েকটি জেলায় নদীর বন্যা অধিক হওয়ায় জলপ্লাবনে লোকে সাতিশয় বিপন্ন হইয়াছে। প্রাণহানি ও সম্পত্তি হানির ঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই। গৃহহীনও হইয়াছে অগণিত লোক। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার উপর অন্য কতকগুলি জেলায় জলপ্লাবন। অন্য দিকে, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যাহাকে সরকারী ভাষায় অন্নকষ্ট বা অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা বলে। ঐ দুই জেলায় লোকে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিতেও ভুগিয়াছে। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে বাঁকুড়া জেলায় তিন জন লোক অনাহারে মরিয়াছে। তাহার তদন্ত আবশ্যক।

এই সকল দুঃসংবাদে হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু করিতে ত কিছু পারি না। কেবল অন্যকে দানশীল হইতে এবং গবর্মেণ্টকে কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে অনুরোধ করিতে লজ্জা বোধ হয়।

—

ব্রহ্মপুত্র নদ সম্বন্ধে দুই গবর্মেণ্টের সম্মিলিত চেষ্টার প্রস্তাব

এক সরকারী জ্ঞাপনীতে দেখিলাম, আসাম ও বাংলা গবর্মেণ্ট সম্মিলিত ভাবে ব্রহ্মপুত্র নদকে এরূপ অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন, যাহাতে তাহা হইতে লোক যথাসম্ভব সর্ববিধ উপকার পাইতে পারে অথচ যথাসম্ভব অল্প বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জ্ঞাপনী যদি কোন আন্তরিক শুভ ইচ্ছা হইতে প্রসূত হয়, তাহা হইলে উভয় গবর্মেণ্টকে এই শুভ ইচ্ছাটুকুর জন্যই কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি—কাজে পরে কিছু হউক বা না হউক। যদি ইহা উভয় গবর্মেণ্টের বর্তমান মন্ত্রীদের আগামী নির্বাচনে জয় লাভ করিবার কৌশল মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না।

স্বাধীন অনেক দেশে নদীসমূহের হেফাজত সুফলপ্রদ ভাবে করা হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের দেশেও হওয়া উচিত, এবং হওয়া অসম্ভব নয়।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় গত বৎসরের চেয়ে শতকরা কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার ঠিক্ কারণ বলা কঠিন, এবং প্রতি বৎসর যে গড়ে শতকরা সমানসংখ্যক পরীক্ষার্থীই পাস করিবে, এরূপ আশা করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। প্রশ্নের কঠিনতা সব বৎসর সমান থাকে না, পরীক্ষকেরা সব বৎসর

সমান কড়া না হইতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের পরীক্ষার্থী-দেরও পরিশ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা সমান না-থাকিতে পারে, এবং শিক্ষণীয় বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তক সব বৎসর ঠিক্ একই রকম না থাকিতে পারে। এ বৎসরের পরীক্ষার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া আর সকল বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীদিগকে মাতৃভাষায় দিতে হইয়াছে। তাহাতে ত কিন্তু পাস করিবার সুবিধাই হওয়া উচিত। কিন্তু যে-সব পরীক্ষার্থী কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরেজীতে নানা বিষয় শিখিয়াছে, তাহারা মাতৃভাষায় সেই জ্ঞান প্রকাশ করিতে যথেষ্ট দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয় নাই, এরূপ হইতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়ের ও পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্য আছে কি না, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

যদি পাকিস্তান ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ না হইত—

যে-সকল ভারতীয় মুসলমান পাকিস্তান প্রস্তাব পছন্দ করেন না, তাঁদের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, এই প্রস্তাবটা ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ। অবশ্য কোরানে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ নেই, এই শব্দটা নূতন গড়া, এটা বিশুদ্ধ আরবী ফারসী কিছুই নয়। কোরানে সব মানুষের একজাতিত্ব প্রভৃতি যে-সকল শ্রেষ্ঠ উপদেশ আছে, পাকিস্তান প্রস্তাবটা তার বিরুদ্ধ। অনেক মুসলমান, যে-কারণেই হোক, পাকিস্তান চান না, ভালই। কিন্তু ওটা ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ, এ যুক্তি অমুসলমানদের পক্ষে চূড়ান্ত যুক্তি নয়।

একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতেই খুব বেশী নিগ্রো ক্রীতদাস খাটত, তাতে তাদের খুব লাভ হ'ত। সেই জন্যে তারা বলেছিল তারা বরং উত্তরের রাষ্ট্রগুলির থেকে পৃথক্ হবে তবু দাসত্বপ্রথা রদ করায় মত দেবে না। তারা এ যুক্তিও দেখিয়েছিল যে, দাসত্বপ্রথা বাইবেলের অনুমোদিত। কিন্তু তবুও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে উত্তরের সব রাষ্ট্র থেকে আলাদা হ'তে দেওয়া হয় নি, দাসত্বপ্রথাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান যদি ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ না হ'ত, এমন কি ইস্‌লামের অনুমোদিতও হ'ত, তা হলেও আমরা ওটার বিরোধী থাকতাম, প্রাণপণে ওটার বিরুদ্ধে চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য মনে করতাম। ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার ও স্বাধীন থাকবার একটা একান্ত আবশ্যক সর্ত তার অখণ্ডতা এবং তার একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট। এ নইলে কী হিন্দুস্থান কী পাকিস্তান (যদি সেটা কখনও দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে পরিণত হয়), কোনটাই স্বাধীন হ'তে ও থাকতে পারবে না, এবং স্বাস্থ্যে সম্পদে জ্ঞানে শক্তিতে কল্যাণ ও আনন্দের আকর হ'তে ও থাকতে পারবে না।—পুরুষদের বহুবিবাহ ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ নয়, এবং তার সত্যাধীন অনুমতি মুসলমানদের শাস্ত্রে আছে। হিন্দুর শাস্ত্রেও তা আছে। তাই ব'লে কি বহুবিবাহের বিরোধিতা ছেড়ে দিয়ে ওটা চালাবার চেষ্টা করতে হবে? এখন ত ভারতবর্ষের সব ধর্মসম্প্রদায়ের জাগ্রত মহিলাবৃন্দ আইনের দ্বারা বহুবিবাহ বন্ধ ক'রে দিতে বলছেন।

চা'লের দাম বাড়া

চা'লের দাম বেড়ে চলায় বাংলা দেশের অধিকাংশ লোকের কষ্ট বেড়ে চলেছে। পশ্চিম বাংলায় অনেক আগে থাকতেই যথেষ্ট অন্নের অভাব ছিল; যদি বা পূর্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ ও আসাম থেকে চাল আমদানী হ'তে পারত, ঝড়ে আর বন্যায় তাতেও বাধা জন্মিয়েছে। শুধু তাই নয়;—ঐ সব অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গের অভাব দূর করা দূরে থাক্, নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় লাভ-লোলুপ ব্যবসাদারদের লোভ সংযত করবার জন্যে চা'লের দর বেঁধে দিলেই চলবে না—তা-ও অবশ্য চাই, তা আগেই করা উচিত ছিল, তার উপর ব্রহ্মদেশ থাই-স্থান (শ্যাম) প্রভৃতি চা'লের দেশ থেকে চা'ল আমদানীর ব্যবস্থা করতে ও করাতে হবে। চা'ল রপ্তানীর পরিমাণ বেঁধে দিতে এবং দরকার হ'লে রপ্তানী বন্ধ করতে হবে। ব্রিটেনের লোকসংখ্যার চেয়ে বাংলার লোকসংখ্যা বেশী। ইংরেজদের **সম্ভাবিত** খাদ্যের অভাব দূর করবার জন্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের পাহারায় মালবাহী জাহাজে ক'রে সমুদ্রপার থেকে খাদ্য আসছে। বাংলা দেশে চা'ল আনাতে হ'লে যুদ্ধ-জাহাজের পাহারা চাই না। তবুও বাঙালীর **বাস্তবিক** অন্নাভাব দূর করবার জন্যে কোন সরকারী ব্যবস্থা না-হওয়া দ্বারা নূতন ক'রে প্রমাণ হচ্ছে যে, ব্রিটিশ রান্নাঘরে তৈরি স্বরাজ-ভোজ আরব্য উপন্যাসের বার্মিসাইড খানাপিনার সমজাতীয়।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বাড়ছে

শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা অকাট্য আঙ্কিক যুক্তির দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা দশ বৎসর আগে যতটা গরিব ছিল এখন তার চেয়েও গরিব হয়েছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষের লোকেরা ১১,২১,০০০ টন চিনি, ২২,৭৮,০০,০০০ গ্যালন

কেরোসীন তেল, আর ১৮,৪৮৬ গ্রোস দিয়াশলাই ব্যবহার করেছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তারা ১০,৭৪,০০০ টন চিনি ২২,২০,০০,০০০ গ্যালন কেরোসীন তেল এবং ২১,৯৬৯ গ্রোস দিয়াশলাই ব্যবহার করেছিল। ১৯৩১-৩২ সালে তারা ব্যবহার করেছিল ৬০১ কোটি গজ কাপড়, ১৯৩৯-৪০ সালে ক'রেছিল ৬১৬ কোটি গজ। উনন জেলে রান্না না করলে নয়, সামান্য কাপড় না পরলে নয়, তাই দিয়াশলাই ও কাপড়ের কাটতি কিছু বেড়েছিল। কিন্তু সে বৃদ্ধিটা সত্যিকার বৃদ্ধি নয়,—মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে ঐ ক বৎসরে মানুষ বেড়েছে শতকরা ১৪।১৫ জন, কিন্তু কাপড়ের আর দিয়াশলাইয়ের কাটতি তার চেয়ে অনেক কম বেড়েছে। ১৯৩০-৩১ সালে ভারতীয়েরা ৫৪,০৭,০০,০০০ পোস্টকার্ড লিখেছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে লিখেছিল অনেক কম—মাত্র ৩৭,১৮,০০,০০০ খানা।

শেঠ ঘনশ্যামদাস আর একটা তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হাতে দুটো পয়সা বাড়তি থাকলে লোকে তীর্থ করতে চায়, দেশ দেখতে চায়। সুতরাং তাতে রেলের যাত্রী বাড়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রেলের যাত্রী না বেড়ে কমেছে। ১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষে ৫৫,০৮,০০,০০০ জন রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়েছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে কিন্তু কমে গিয়ে হয়েছিল ৫১,৩৫,০০,০০০ জন; অথচ ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের লোক শতকরা অনেক বেড়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছি। এ অবস্থাতেও যে আমরা বেঁচে থাকি তার কারণ, যথাসম্ভব কম খেয়ে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় আমরা ভারতবাসীরা পৃথিবীতে প্রথমস্থানীয়;—এ বিষয়ে রেকর্ড আমাদের। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কি বলেন? ভারতসচিব মিঃ এমারি বলেছেন ভারতবর্ষ 'প্রস্পারাস্'!

—

ভারতে বিদেশীদের মূলধন ও কারখানা

কারখানায় তৈরি যত রকম জিনিস বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে আসে তার অধিকাংশ এদেশেই তৈরি হতে পারে। তা যদি হয়, তা হলে দেশের টাকা বিদেশে যায় না, দারিদ্র্য কমে, ধন বাড়ে, বেকার লোকের কাজ ও রোজগার হয়। এই জন্যে বিদেশীদের দ্বারা তাদের মূলধনে স্থাপিত ও তাদের দ্বারা পরিচালিত কারখানা থাকা ও বেড়ে চলা আমাদের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ১১১ ধারা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস ও অন্য উদ্দেশ্যে জমি কেনা, সরকারী কাজে নিযুক্ত হওয়া, ইত্যাদি নানা প্রকার উপার্জনের ব্যাপারে ব্রিটেনের বাসিন্দাদিগকে ভারতীয়দের সমান পর্যায়ে ফেলেছে, যদিও তারা বাস্তবিক খাঁটি বিদেশী, এবং তারা শাসকদের জা'তভাই ব'লে উপার্জনের সকল ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা সবাইর চেয়ে বেশী সাংঘাতিক। ঐ আইনের ১১১ ধারাটার আবশ্যক অংশ এই:—

"111.—(1) Subject to the provisions of this chapter, a British subject domiciled in the United Kingdom shall be exempt from the operation of so much of any Federal or Provincial law as—

(a) imposes any restriction on the right of entry into British India; or

(b) imposes by reference to place of birth, race, descent, language, religion, domicile, residence or duration of residence, any disability, liability, restriction or condition in regard to travel, residence, the acquisition, holding, or disposal of property, the holding of public office, or the carrying on of any occupation, trade, business or profession.

Provided that no person shall by virtue of this sub-section be entitled to exemption from any such restriction, condition, liability or disability as aforesaid if and so long as British subjects domiciled in British India are by or under the law of the United Kingdom subject in the United Kingdom to a like restriction, condition, liability, or disability imposed in regard to the same subject-matter by reference to the same principle of distinction."

এই ধারাটা ব্রিটেন ও উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডের সব বাসিন্দাকে ভারতীয়দের সমান অধিকার দিয়েছে। এটা একান্ত অন্যায়। এর ফলে ইংরেজরা এদেশে তাদের কারখানা স্থাপন ক'রে পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রটা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে দখল ক'রে বসছে এবং তাদের মূলধন ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী ব'লে যে-সব জিনিস তৈরি করবার কারখানা ভারতীয়দের ছিল, প্রতিযোগিতা দ্বারা সেগুলিকে দুর্বল ও নষ্ট করছে।

অনেক বৎসর আগে বড়লাটের শাসনপরিষদের অন্যতম সদস্য ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন, যে-সব ইংরেজ ধনিক তাদের ইংলণ্ডস্থিত কারখানাগুলিদ্বারা দূর থেকে ভারতীয়দের ভারতবর্ষের কারখানাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, তারা যার দ্বারা ভারতবর্ষেই তাদের কারখানা স্থাপন ক'রে ভারতীয়দের কারখানাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এখন তাই ত হয়েছে। বিলাতী কারখানা ও কোম্পানী, তার ল্যাজে জুড়ে দেওয়া হয়েছে "(India) Limited"—এ রকম কোম্পানীতে কারখানায় দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের অল্প মূলধনের কারখানা টক্কর দিয়ে কেমন ক'রে বেঁচে থাকবে? আমাদের কোন

সাবানের কোম্পানী আছে কি যারা "লেভার ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড"-এর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে? কোন ভারতীয় দিয়াশলাইয়ের কারখানা এংলো-সুইডিশ কোম্পানীর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে?

ভারতশাসন আইন দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য (ও অন্যান্য) ক্ষেত্রে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সমান সুবিধার (অর্থাৎ বাস্তবিক অধিকতর সুবিধার) অধিকারী হওয়াতেই ত রক্ষে নেই; তার উপর ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব সর্ রামস্বামী মুদালিয়র গত বাজেট আলোচনার সময় যে বক্তৃতা করেন তাতে বলেছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন দেশের লোককেই বিদেশী মনে করেন না। তাঁর ঔদার্য্যকে নমস্কার। কিন্তু তিনি কোন্ আইনের বলে এ কথা বলেছেন? ভারতশাসন আইন যে ১১১ ধারা দ্বারা অন্যায় করে ভারতবর্ষে ইংরেজগণকে ভারতীয়দের সমান অধিকার দিয়েছে, তিনি সেই অধিকার কানাডার, দক্ষিণ-আফ্রিকার, অস্ট্রেলিয়ার লোকদের (যারা ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্যতুল্য মনে করে) কোন্ আইনের জোরে দিতে চান? তাঁর এই কথার খুব প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় আইন-সভার অধিবেশন যখন আরম্ভ হবে, তখন প্রশ্ন ক'রে তাঁর কৈফিয়ৎটা আদায় করা চাই।

কুলটীর গুলি বর্ষণের মোকদ্দমা

গত বৎসর এক দিন আসানসোলের নিকটবর্তী কুলটীতে হিন্দুরা দস্তুরমত সরকারী লাইসেন্স নিয়ে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার সময় তাদের উপর অনেক গুলি চলে। হতাহত অনেক হয়। একটা তদন্ত কমীটির দাবী হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত তা নিযুক্ত হয় নি, যদিও ইস্‌লামিয়া কলেজে পুলিস লাঠি চালানতে প্রধান মন্ত্রী অবিলম্বে মাফ্ চেয়েছিলেন ও তদন্ত কমীটি বসিয়েছিলেন এবং তার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়েছিলেন। কুলটীর গুলিবর্ষণ সম্বন্ধে একটা মোকদ্দমা গত বৎসরই রুজু হয়। কিন্তু সেটাকে কোন-না-কোন অজুহাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতুবি রাখা হয়। বর্ধমান জেলার ভিন্ন ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতের গত ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমার ফাইল তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মোকদ্দমা স্থগিত রাখার নিন্দা ক'রে এই মোকদ্দমাটা আবার চালাবার হুকুম দেওয়ায় সেটা আরম্ভ হয়েছে। বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। কিন্তু কুলটীর সমগ্র ব্যাপারটা থেকে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের ভাব-গতিক বুঝতে চেষ্টা করবার অনুরোধ সকলকে করা যেতে পারে।

মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি

মিস্ রাথবোন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের এক জন নারী সদস্য। তিনি অন্য অনেক ইংরেজের মত ভারতহিতৈষী বলে মুরুব্বিয়ানা আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ১লা বৈশাখের রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের অভিভাষণ "সভ্যতার সঙ্কট"-এ ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর যে মত প্রকাশ পেয়েছিল, মিস্ রাথবোনের চিঠির জবাবে সেই মত অন্য আকারে ও অন্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। মিস্ রাথবোন নিজেই বলছেন তাঁর অভিযোগটা একপেশে, অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তার উল্টো দিকেও অনেক বলবার আছে।

তিনি বলছেন, "আপনাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আমরা যুদ্ধ জিতব—যাদের চিন্তাধারা আপনাদের থেকে ভিন্ন তাঁদের সাহায্য আমরা পাচ্ছি।" তাই যদি হয়, তা হ'লে এত বড় লম্বা চিঠিটা তিনি নাই ঝাড়তেন।

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ ইংরেজীতে ভারতবর্ষের সব দৈনিকে ছাপা হয়েছে। মিস্ রাথবোনের ও অন্য ইংরেজদের রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি পড়া উচিত ব'লে ইংরেজীতে লেখাই ঠিক্ হয়েছে। এখানে যে বাংলাটি দেওয়া হচ্ছে, এটি কবির লেখা নয়, তাঁর দ্বারা সংশোধিতও নয়। কিন্তু এর থেকে তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য মোটামুটি বোঝা যাবে।

ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস রাথবোনের 'খোলা চিঠি' পড়িয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। মিস রাথবোন কে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি ধরিয়া লইতেছি, তিনি এই চিঠিতে, 'সদুদ্দেশ্যশালী' সাধারণ ব্রিটেনবাসীর মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই পত্র প্রধানতঃ জবাহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের সেই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের এই অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি, অবিবেচনা এবং বস্তুতঃ ধৃষ্টতার সহিত, যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা

তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্টসিদ্ধির কোনও সাহায্য হয় নাই। "ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও" গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু এ কথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান্ হইয়াছেন, আমাদিগকে অপশিক্ষিত করিবার সর্ব প্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল? আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষা দান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। তাহাতে তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিতই হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, ইংরেজী ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে 'সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে' দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজী ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্য দিকে, রাশিয়ার মাত্র ১৫ বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'ষ্টেটসম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই)।

কিন্তু এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই জ্ঞানালোক-দানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নির্মিত হইতে পারে।

আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দী কাল দৃঢ়-মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী-নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি;—কেন-না ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে, এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ী খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

ব্রিটিশ-রাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান্ ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না।

ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত্র যোদ্ধারাও ভয়ে প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধেও এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী এবং গ্রীক সৈনিকগণও প্রবলতর অস্ত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া ইয়োরোপে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র, নিরস্ত্র, অসহায় কৃষক, রোরুদ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কৃষক, সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ী রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসেন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহার ঘরবাড়ী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া লাঠি চালনা শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

এত কাল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্দ্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে; কিন্তু মিস্ রাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্তচুম্বন করিব, কেন-না তাহাদের সেই হাত আমাদিগের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোন একটা গবর্ণমেণ্ট ভাল কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না, সেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না, যে, ভদ্র-গোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততঃপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের অনিষ্টসাধনের উপর আবার আমাদের অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে।

ব্রিটেনের ভারতীয়গণকে জ্ঞানদানের খোঁটা নূতন নয়

মিস্ রাথবোন্ যে বলেছেন ব্রিটেন ভারতীয়দের জ্ঞান-

চক্ষু খুলে না দিলে তারা অন্ধ হয়ে থাকত, এই খোঁটাটা নূতন নয়। রাজা রামমোহন রায়কে দেশী বিদেশী বিস্তর লোকের সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক করতে হ'ত। তাদের মধ্যে এক জন ইংরেজ "A Christian" এই ছদ্মনাম নিয়ে লিখেছিল, ভারতীয়েরা "বুদ্ধির রশ্মি"র ("ray of intelligence"-এর) জন্যে ইংরেজদের কাছে ঋণী। তার উত্তরে রামমোহন লিখেছিলেন :—

If by the 'Ray of Intelligence,' for which the *Christian* says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also gratitude; but with respect to Science, Literature, or Religion, I do not acknowledge that we are placed under any obligation, for by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.

উপরের শেষ কথাগুলিতে রামমোহন রায় এই ইঙ্গিত করেছেন যে, ইংরেজ ও ইয়োরোপের অন্য অনেক আধুনিক জা'ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষার জন্যে গ্রীক লাটিনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের নিজের সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই আবশ্যক সমুদয় পারিভাষিক শব্দ গড়ে নিতে পারে।

বালক-বালিকাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

ভারতী সাহিত্য সভা কলকাতায় বালকবালিকাদের জন্যে বালকবালিকাদের দ্বারা রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বন্দোবস্ত ক'রে যথাযোগ্য কাজ করেছেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যাতে আনন্দের সঙ্গে হয়, তার জন্যে কবি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেখানে নানা রকমে তাদের চিত্তবিনোদনও করেছেন। তা ছাড়া, তাঁর নানা গদ্য ও পদ্য কাব্য, গান ও অভিনয়ের দ্বারা তিনি ছেলেমেয়েদের নানা রকম আনন্দের যে স্থায়ী আয়োজন ক'রে রেখেছেন, তা অতুলনীয়। ভারতী সাহিত্য সভার সঙ্গে এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছিলেন "পাঠশালা", "রংমশাল", "মৌচাক", "মাস পয়েলা", "ভাইবোন", "কৈশোরক," "রূপকথা", "রামধনু," "কিশোর বাংলা," "আনন্দ-মেলা" প্রভৃতি। এতে বালকবালিকাদের যে অনাবিল সুখ হয়েছিল, তা তারা অনেকটা প্রত্যহ ঘরে বসে পেতে পারবে যদি কবির "শিশু," "শিশু ভোলানাথ," "শারদোৎসব", "মুকুট," "লক্ষ্মীর পরীক্ষা," "খাপছাড়া", "সে," "ছড়ার ছবি" প্রভৃতি বই তারা পড়তে পায়। ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসীমা, মা, দিদি—এঁরা সবাই যোগানদার হ'তে পারবেন।

রামমোহন রায়ের জন্মদিন

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে, বাংলা সন ১১৭৯ সালের ৭ই কিম্বা ৮ই জ্যৈষ্ঠ, রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে কোন অনুষ্ঠান হয় না, কিন্তু লাহোরে, এবং আরো কোথাও কোথাও হয়। এ বৎসর কিন্তু ঐ দিন সরকারী অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কল্‌কাতা ষ্টেশন থেকে তাঁর সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদকের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ান হয়েছিল। এলাহাবাদ থেকে আর দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ থেকে আমরা চিঠি পেয়েছিলাম যে, বক্তৃতাটি ঠিক্ ঠিক্ শোনা গিয়েছিল। রেডিও কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে বক্তৃতাটি "তত্ত্বকৌমুদী"তে বেরবে।

বাংলা দেশের সেন্সস

এ বৎসর গত মার্চ মাসে যে সেন্সস বা লোকসংখ্যা গণনা হয়ে গেছে, অন্য সব প্রদেশের তার মোটামুটি ফল অনেক দিন আগে বেরিয়ে গেছে ; বাংলার এখনও বেরয় নি ; শোনা যাচ্ছে জুলাইয়ের মাঝামাঝির আগে বেরবে না। কেন ? মাসখানেক আগে সরদার নর্মদাপ্রসাদ সিং যুক্তপ্রদেশের লীডার ও ন্যাশন্যাল হেরাল্ড দৈনিক দুটোতে একটি বিবৃতি দেন যে, পঞ্জাব ও বাংলার সংখ্যাগুলোতে ভুলচুক আছে কি না পরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনি রেওআ রাজ্যের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক এবং কংগ্রেসওআলা। রেওয়ায় সেন্সসের কাজও তিনি করেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, বাংলায় এবার মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৩২ হয়ে গেছে। সেটা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য নয় যে, এবার বাংলা দেশের হিন্দুরা সেন্সস বয়কট না করায় এবং হিন্দুমহাসভা সব হিন্দুকে নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সংখ্যা ঠিক লেখা'তে অনুরোধ করায় এবারকার সেন্সসে ১৯৩১ সালের সেন্সসের চেয়ে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী নির্ভরযোগ্য হয়েছে, এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত কিছু বদলে গেছে। হিন্দুরা বাংলা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ হয়ে যায়, কিম্বা অন্ততঃ তারা ১৯৩১ সালের সেন্সসে মুসলমানদের চেয়ে শতকরা যত কম ব'লে দেখান হয়েছিল ততটা কম যে নয় এ বৎসরের সেন্সসে তা প্রমাণ হয়ে যায়, এটা ব্রিটিশ সরকার চান না, আর মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা ত চানই না। কেন

না, হিন্দুদের অনুপাত বেশি, এটা প্রমাণ হয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা বদলান দরকার হবে; তাতে মুসলমানরা এখনকার মত এত অন্যায় অনুগ্রহ পেতে পারবে না। সেন্সস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও তার খবর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল আমাদের একজন বন্ধু ও লেখক বলেছেন, তিনি শুনেছেন প্রধান মন্ত্রী পার্ক সার্কাসে এক খাস্ মজলিসে বলেছেন এবার মুসলমানরা শতকরা ৪৮ জন হয়ে গেছে। একথা আমরা ১লা জুন প্রকাশিত জুনের মডার্ন রিভিয়ুতে ছেপেছি ও ভুল হলে সংশোধনের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আজ ১৩ই জুন পর্য্যন্ত কোন প্রতিবাদ পাই নি।

সে যাই হোক, আমাদের ধারণা এই যে, বাংলা দেশের হিন্দুরা এবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাক বা না-যাক, তাদের অনুপাত বেড়ে থাকবে। নইলে সেন্সসের ফল প্রকাশ করতে এত দেরি হচ্ছে কেন, সেন্সসের কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ হিন্দু সহকারী সেন্সস অফিসারকে অন্যত্র অন্য কাজে বদলি করে দিয়ে তাঁর জায়গায় সেন্সসের কাজে অনভিজ্ঞ এক জন মুসলমান স্কুল সব-ইন্সপেক্টারকে কেন এনে বসান হয়েছে? স্কুল পরিদর্শনে ও শিক্ষকতায় তাঁর বেশ যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু যে হিন্দু কর্ম্মচারীটি নিজের যোগ্যতার জোরে সহকারী সেন্সস অফিসারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, যাঁর সেন্সসের কাজে অভিজ্ঞতা খুব বেশী, তাঁকে সেন্সসের ফল বের করবার সময়ের খুব কাছাকাছি সময়ে সরিয়ে দিয়ে এক জন অনভিজ্ঞ মুসলমান কর্ম্মচারী আনার কারণ কি? এই পরিবর্ত্তন সেন্সস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাচ্ সাহেবের প্রস্তাব বা সম্মতি অনুসারে হয়েছে কি? তিনি কি বলেন? এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের তর্কযুদ্ধ হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, জয়ী হয়েছেন নির্ম্মল বাবু।

সেন্সসের কাজটা ভারত-সরকারের, কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টেরই নয়। অথচ বাংলা দেশে দেখছি গোড়ার থেকেই প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে অবাঞ্ছনীয় বক্তৃতা প্রদান, বিবৃতি প্রকাশ, হিন্দু শিক্ষক উকীল প্রভৃতিকে মিথ্যাবাদী বলা, প্রভৃতি করছেন, এবং অভিজ্ঞ হিন্দু কর্ম্মচারীকে সরিয়েও দিলেন। ভারত-সরকার কি বাংলা দেশে নিজের মসনদ ত্যাগ করে আর কাউকে তাতে বসিয়েছেন?

এও ভারি অদ্ভুত ও অসঙ্গত যে, সেন্সসের প্যাডগুলি থেকে ফল সংকলনের সব কাজ বাংলার সদর সেন্সস অফিসে না হয়ে মফস্বলের কয়েকটা জায়গাতেও হয়েছে। অনেক জায়গার প্যাডই বা যথাসময়ে কল্‌কাতায় পৌছে নি কেন? এ খবর কি সত্যি যে নোয়াখালির সেন্সস কাগজপত্র সাম্প্রতিক ভীষণ ঝড়ে বা তার আগেই কোন ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

—

লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা সংকলন

এবার যে সেন্সস নেওয়া হয়েছে, তার থেকে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কোথাও লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা সংকলন করাবেন না এই রকম খবর বেরিয়েছিল। তাতে না-কি বড় বেশি খরচ হয়। যাঁরা যুদ্ধের জন্য ৩০।৪০ কোটি টাকা খরচ করছেন এবং আরও অনেক কোটি করবেন, তাঁরা এই অত্যন্ত আবশ্যক কাজটির জন্যে লাখ দু-লাখ টাকা খরচ করতে পারেন না, এটা অন্য দেশ হ'লে অবিশ্বাস্য হ'ত, এদেশে কিন্তু তা নয়। যাই হোক্, বাংলার মন্ত্রীরা কিন্তু জিদ ধরেছেন তাঁরা বাংলা-সরকারের ব্যয়ে এ কাজটি করাবেনই।

ভারত-সরকার সমগ্র ভারতের জন্যে এ কাজটি করাতে চান নাই বোধ হয় সামান্য টাকা বাঁচাবার জন্যে নয়,—চান নাই পাছে ধরা পড়ে যে, আগেকার দেড়-শ দু-শ বৎসরে যেমন তেমনি গত দশ বৎসরেও ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা সমানই আছে কিম্বা খুবই আস্তে আস্তে কমছে। আর বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা এই কাজটা করাতে চাচ্ছেন হয়ত এইটে দেখাবার জন্যে যে, মুসলমানদের মধ্যে গ্র্যাডুয়েট কম থাকলেও শিক্ষিত অর্থাৎ বর্ণপরিচয়বিশিষ্ট মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়!

—

"হিন্দু আমেরিকা"

এই মাসের "প্রবাসী"তে আমেরিকায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে তার প্রায় সব উপকরণই শ্রীযুক্ত চমনলাল-প্রণীত "হিন্দু আমেরিকা" নামক ইংরেজী বই থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনটি ছাড়া ছবি-গুলিও সমস্তই ঐ বই থেকে নেওয়া। এই রকম চমৎকার ও কৌতূহলোদ্দীপক ছবি ঐ বইখানিতে আশীটির উপর আছে। ছবিগুলি দেখলেই মনে হয় যেন ভারতবর্ষের। বইটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। গত বৎসর বইটি বেরিয়ে-ছিল; বড় বই, দাম রাখা হয়েছিল ৭॥০ টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১ম সংস্করণ কয়েক মাসেই শেষ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। বিক্রীর জন্য "প্রবাসী" কার্য্যালয়ে আনিয়ে রাখা হয়েছে। এবার দুটি নূতন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে, কিন্তু দাম কমিয়ে ৪॥০ করা হয়েছে।

উপরে লিখেছি, বইটি ভারি কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু

শুধু তাই বললে সব বলা হয় না। লেখক খুব পরিশ্রম ক'রে, টাকা খরচ ক'রে, বিস্তর বই কিনে ও প'ড়ে, আমেরিকায় গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে বইটি লিখেছেন। তিনি খুব উৎসাহী ও সাহসী লোক। "ভ্যানিশিং এম্পায়ার" নামক তাঁর বই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভাল না-লাগায় সেটা বাজেয়াপ্ত ও 'নিষিদ্ধ' হয় এবং ব্রিটেনে তাঁর ছাড়পত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে এখনও তা ফেরত দেওয়া হয় নি। তা সত্ত্বেও তিনি আইরিশ গবর্মেণ্টের, মেক্সিকো গবর্মেণ্টের এবং একটি জাপানী জাহাজ কোম্পানীর অনুকূলতায় আমেরিকা পর্যন্ত দেখে দেশে ফিরেছেন। তিনি দমবার পাত্র নন। তাঁর সংকল্প ব্রহ্মদেশ, জাভা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, নিউ গিনির পথে তিনি আমেরিকা যাবেন—হয়ত সেই পথ দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয়েরা আমেরিকা পৌঁছেছিল। তার পর তিনি তিব্বত অতিক্রম ক'রে সাইবীরিয়া পৌঁছে বেরিং প্রণালী পার হ'য়ে কানাডা পৌঁছবেন এবং দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু দেশে গিয়ে প্রাচীন ইঙ্কাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্তমানে বিদ্যমান নিদর্শন দেখে আসবেন—এই অভিপ্রায়ও তাঁর আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এশিয়ার ঔপনিবেশিক প্রবাহের ধারা হয়ত এই স্থলপথ দিয়ে গিয়েছিল।

—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ীর নির্বাচন

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী উত্তর বঙ্গ ও ময়মনসিংহ জেলার মিউনিসিপালিটিগুলি থেকে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় খুব বেশী ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নির্বাচন ঠিকই হয়েছে। তিনি দেশের জন্যে অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। দেশসেবায় তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ও উৎসাহ আছে।

—

বসু-লীগ চুক্তির অবসান

কল্‌কাতা মিউনিসিপালিটিতে বসুদল ও মুস্লিম লীগ দলের যে চুক্তি হয়েছিল, তা এবার ভেঙে গেছে। এ খবরে কেও অবাক্ হবে না। যখন চুক্তি হয়েছিল তখনই বরং অনেকের তাক লেগে গিয়েছিল।

—

মসজিদের সামনে দিয়ে মিছিল

তিন মাস হয়ে গেছে সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান মন্ত্রীকে একখানা খোলা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, যে, (১) সরকারী রাস্তার কাছে মসজিদ থাকলে তার সামনে দিয়ে গানবাজনা সমেত শোভাযাত্রা যেতে দিতে আপত্তি করতে মুসলমানেরা কি অধিকারী এই হেতু যে নিকটে মসজিদ আছে, না এই কারণে অধিকারী যে মিছিল গেলে তাতে তাদের নমাজের ব্যাঘাত হয়? (২) হিন্দুদের মিছিলে বাধা দেবার জন্যে মুসলমানদের এ দাবী কি ন্যায্য যে, দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টাই নমাজের সময়, অথবা ১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারীর বঙ্গীয় পুলিস গেজেটে যে সময়গুলি নমাজের সময় ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে সেইগুলিই নমাজের সময়? মৌলবী ফজ্‌লল হক এখনও জবাব না-দেওয়ায় সর্ মন্মথনাথ তাঁকে তাগিদ দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, "বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, নমাজের সময়ের বাইরে মসজিদের সামনে দিয়ে গানবাজনাসমেত মিছিল নিয়ে যাওয়া বৈধ যদি তার উল্টো কোন স্থানীয় রীতির সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকে; কিন্তু অনেক সূত্রে শুনে অবাক হয়েছি যে একটা গোপনীয় সার্কুলার সব হাকিমদের পাঠান হয়েছে যে, দিনরাত্রির যে-কোন সময়েই মসজিদের সামনে সংগীতবাদ্য শোভাযাত্রার অনুমতি যেন দেওয়া না হয়—যদি তার বিপরীত কোন স্থানীয় রীতির প্রমাণ না-থাকে। ব্যবস্থাপক সভার উত্তর আর এই সার্কুলারটার মধ্যে সঙ্গতি কোথায়?"

গবর্মেণ্টের যা কর্তব্য, স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে তা এই, যে, মসজিদের সম্বন্ধে যা নিয়ম হবে তা হিন্দুর দেবালয়, খ্রীষ্টীয়ানদের গির্জা, ব্রাহ্মের ব্রহ্মমন্দির, আর্য্যসমাজীর মন্দির ও শিখদের গুরুদ্বার সম্বন্ধেও প্রযোয্য হবে, এবং মুসলমান ও অন্য সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে তা মানতে হবে।

—

পুনর্মুদ্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"

বাংলা সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন। সে আজ ৬৯ বৎসর ২ মাস আগেকার কথা। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হ'য়ে যাঁরা বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা পড়েছিলেন, জীবিত এমন বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম। বঙ্কিমচন্দ্র চার বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেছিলেন। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম বর্ষের বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেছিলেন তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র। কিন্তু এই সব বৎসরেও বঙ্কিমের বিস্তর রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই জন্যে ১২৭৯ সাল থেকে যে ক বৎসর বঙ্গদর্শন বেরিয়েছিল, সবগুলির বঙ্গদর্শনকেই বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বলা যেতে পারে। ১২৮৬ সালে কাগজখানি বন্ধ ছিল।

আগেই বলেছি, বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা বেরবামাত্রই যে-সব প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী সেটি পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে

বেঁচে আছেন খুব কম লোকই। সেই জন্যে বঙ্গদর্শনের মাহাত্ম্য অধিকাংশ স্থলে আমাদের শোনা-কথা মাত্র, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-লব্ধ কিছু নয়। তা হবার সম্ভাবনাও কম ছিল। কারণ, সব বৎসরের বঙ্গদর্শন কোন কোন গ্রন্থাগারে থাকলেও সহজে অধিগম্য ছিল না। "দি ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানী" সবগুলি প্রকাশ করে শিক্ষিত বাঙালীদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের উপায় করে দিয়ে তাঁদের মহৎ উপকার করেছেন। তাঁরা এই পুনর্মুদ্রণ কাজটি করেওছেন উত্তমরূপে। নূতন বড় অক্ষরে পুরু এন্টীক্ কাগজে নয়টি খণ্ড সুন্দররূপে মুদ্রিত হয়েছে, বাঁধাইও পরিপাটী এবং মজবুত। কিস্তিবন্দী করে মাসে মাসে অল্প অল্প টাকা দিয়ে সব খণ্ডগুলি একেবারে পাবার সুবিধাও তাঁরা ক'রে দিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনের দ্বারা বাংলা দেশের যে হিত হয়েছিল, কি জাগরণ কি আনন্দ সে এনেছিল, তার পরিচয় প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু দিয়েছেন। তিনি একাধিক লেখকের মত উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কেবল তিনটি বাক্য নীচে তুলে দিচ্ছি।

"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত, মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নিঝ'রিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্যনাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

এই মাসের প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম যে আনন্দ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বড় সব লেখা পুস্তক আকারে অনেক দিন থেকে চলিত হয়ে আছে। কিন্তু তিনি যে ঠিক্ কি কি জিনিস দিয়ে কি আদর্শ নিয়ে কেমন করে মাসিকটি চালাতেন, তা ত অনেকরই জানা ছিল না। তা জানা শিক্ষিত বাঙালীদের উচিত। বিশেষ করে আমরা সম্পাদকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারি। এই জন্যে পুনর্মুদ্রিত বঙ্গদর্শনগুলির জন্যে আমরা ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদর্শন অবলম্বন করে আরও অনেক কথা পরে লিখব।

—

"বীরঙ্গ অপহরণের মামলা"

শ্রীচরণ মণ্ডলের নাবালিকা বিবাহিতা কন্যা ও শ্রীবিপিন দাসের স্ত্রী বীরাঙ্গনা বা বীরঙ্গকে অপহরণের অপরাধে আবদুল খালেক শেখ, ইমামদ্দী শেখ ও হামিদ শেখের চার বৎসর করে কারাদণ্ড হয়েছে, কিন্তু মেয়েটিকে এখনও পাওয়া যায় নি। তার সম্বন্ধে মোকদ্দমা গত বৎসর থেকে চলছে। ডিসমিস পুনর্বিচার প্রভৃতি নানা রকম ব্যাপার এর মধ্যে আছে। তার বৃত্তান্ত গত বৎসর অগ্রহারণ মাসের প্রবাসীতে দিয়েছি; এক অংশের পুনরাবৃত্তি করি—

"তৎকালীন দ্বিতীয় ডেপুটি এ, এম রহমানের আদালতে বিচার হওয়ার ব্যবস্থা হয়। বীরঙ্গ আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার বর্ণনায় অসামঞ্জস্য আছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে তাহার স্বামীর জামিনে স্বামীর নিকট বা কোনও হিন্দুর নিকট না রাখিয়া মোক্তার মৌলবী নবাব জান সর্দারের জিম্বায় প্রদান করেন। বিপিন স্ত্রীর অভিভাবক স্বরূপ হেপাজত প্রার্থনা করিলেও রহমান সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন। খুলনার জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য ৫৫২ ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিলে বিপিনকে স্ত্রী-প্রত্যর্পণের হুকুম হয়। ওই হুকুম পাওয়া সত্ত্বেও হাকিম রহমান সাহেব কয়েক মাস কিছু না করাতে কড়া তাগিদ প্রাপ্ত হন ও বিগত ২৩।৯।৪০ তারিখে বিপিনের স্ত্রীকে আদালত হইতে লইয়া যাইতে বিপিনকে বলেন। সেদিন আবদুল খালেক, ইমানদ্দী, এয়াকুব আলি প্রভৃতিকে লাঠিসোটা লইয়া আদালতের প্রাঙ্গণে হাজির থাকিতে দেখিয়া বিপিন তাহার মোক্তার বাবু নিত্যানন্দ বিশ্বাসের মারফৎ রহমান সাহেবের নিকট পুলিসের সহায়তা ভিক্ষা করে, কিন্তু হাকিম সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। আদালতের সম্মুখ হইতেই বিপিন ও তদীয় সঙ্গী নিবারণ হালদার নিশি মলঙ্গীকে আহত করিয়া দুর্বৃত্তের দল বীরঙ্গকে অপহরণ করে। আদালত হইতে কোনও সহায়তা পাওয়া যায় না এবং থানার দারোগাও এজাহার লইতে অস্বীকার করে।" —ভারত

এখনও দু-জন আসামী পলাতক আছে, মেয়েটিরও কোন সন্ধান নাই। দণ্ডিত আসামীদেরও দণ্ড শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা অনিশ্চিত। এই রকম অরাজকতার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজে যেরূপ প্রবল আন্দোলন হওয়া উচিত তা হয় নি। সমাজ রাজনৈতিক-মোহমায়াবিষ্ট।

—

বিশ্বভারতীকে স্বাতন্ত্র্যদান প্রস্তাব

আমরা গত সংখ্যায় বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য করবার যে প্রস্তাব করেছিলাম, সে রকম প্রস্তাব অধ্যক্ষ ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আগেই করেছিলেন।

—

নারীরক্ষা-সমিতি বিধবাশ্রম প্রভৃতির লোপ সম্ভাবনা

অনাথালয় বিধবাশ্রম নারীরক্ষা-সমিতি প্রভৃতির পরিদর্শন বিষয়ক যে বিল আইন-সভায় পেশ হয়েছে, তা পাস হলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের লোপ সম্ভাবনা আমরা একটি বিবৃতি দ্বারা দৈনিক কাগজগুলিতে দেখিয়েছি। এ বিষয়ে দেশে খুব আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নি। কেবল সম্প্রতি শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে একটি প্রতিবাদ-সভা হয়ে গেছে।

—

চিত্র

৩৮৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে "কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা" নামে যে চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিদ্বীপের মাধোয়ে কবং মন্দিরের ভাস্কর্য্য-অলঙ্কার "কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা"।

ভারতীয় দ্বারা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দেশীয় সংবাদপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই দেশীয়-মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাও মনে পড়ে। প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্রের কথা আলোচনা করিতে গিয়া এই বাংলা দেশে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টায় যে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মুদ্রাযন্ত্রের কথাও স্মরণ হয়। পার্শী ভাষায় ছাপিবার জন্য "পার্শীয়ান্ যন্ত্র" নামে মুদ্রাযন্ত্রই বাংলা দেশে নিছক ভারতীয় প্রচেষ্টায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই ভারতীয় হিন্দু প্রচেষ্টার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র "সংস্কৃত যন্ত্র" স্থাপিত হয়।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের বিষয় লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গত ভারতীয় হিন্দুগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র "সংস্কৃত যন্ত্র" সম্বন্ধে আলোচনা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র চতুশ্চত্বারিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় (বঙ্গাব্দ ১৩৪৪) করিয়াছেন, কিন্তু এই যন্ত্রের অন্যতম মালিক বাবুরাম পণ্ডিতের প্রকৃত পরিচয় সম্ভবত জ্ঞাত না থাকায় কিছু ভুল করিয়াছেন।

এদেশে অষ্টাদশ শতকেই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ শতকের শেষ দিকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী শহরে উইল্কিন্স স্বহস্তে বাংলা হরফ প্রস্তুত করার পর বাঙ্গলা অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রণ সম্ভব হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া "সংস্কৃত যন্ত্র" প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে যে ছাপাখানা ছিল তন্মধ্যে হুগলীর অ্যাণ্ড্রুজের ছাপাখানা ও লাল-বাজারের হিন্দুস্থানী প্রেসই প্রধান ছিল। তাহার পর উনবিংশ শতকের আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ ওয়ার্ড সাহেবের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়েই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার ইংরেজ ছাত্রদিগের জন্য ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হওয়াতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ কলেজের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শিক্ষাদান-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত ও মুন্সীগণ নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশীয় নানা ভাষায় পুস্তক রচনা করিতে উৎসাহিত করিতে থাকেন। এইরূপে পার্শী, উর্দ্দু, পূরবী, ব্রজভাষা, মারহাট্টা, তামিল, তেলেগু ও বাংলায় বহু পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্মও এই ভাবেই হয়। এই গদ্যের জন্মের জন্য শ্রীরামপুরের পাদ্রীদল তাঁহাদের **প্রাপ্য সম্মানের অধিক** পাইয়া আসিতেছেন এবং কলেজের 'প্রোভোস্ট' ব্রাউন্ ও ভাইস্-প্রোভোস্ট বুকাননের চেষ্টা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত হইয়াছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রামমোহন রায়ের সহিত শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের যেরূপ ধর্ম্মঘটিত বিপক্ষতা ছিল, ব্রাউন্ অথবা বুকাননের সহিত সেরূপ কোনও বিরোধিতা ছিল না। খ্রীষ্টান্ মিশনরীদের সহিত রামরাম বসু, গোলোকনাথ, রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয়ের পুস্তক প্রকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কিছু ছিল না। ঐ মিশনরী দলের কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের **বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসাবেই** এই সমস্ত পুস্তক রচনায় সাহায্য করিয়াছেন; **এবং তাহা কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের একটি ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ মাত্র।** কলেজ-পরিচালকগণ রাজকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশের যে পরিকল্পনা করেন, ইহা তাহারই অংশবিশেষ। পাবলিক ডিস্পুটেশনে 'ভিজিটর'-রূপে লর্ড মিণ্টো **প্রতিবর্ষে** যে বক্তৃতা দিতেন তাহাতে ঐ পরিকল্পনার কথা ও উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কতটুকু কাজ প্রতিবর্ষে হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিত। এই ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য ভারতীয় বহু ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঋণী। প্রচার-অভিজ্ঞ খ্রীষ্টীয় পাদ্রীদলের প্রচার-ফলে সকল কৃতিত্বটুকুই মিশনরীদল লাভ করিয়া আসিয়াছেন এবং কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহা হইতে অহেতুক ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ যেমন এক দিকে ভারতীয় সহকারী শিক্ষক ("পণ্ডিত" ও "মুন্সী")-দিগকে পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করিতেছিলেন তেমনই পুস্তক মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতেও তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকেন এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে, পুস্তক-মুদ্রণ ও বিক্রয় রূপ একটি নূতন ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখিয়া কলেজের সংস্পৃষ্ট কয়েকজন ভারতীয় উদ্যোগী পুরুষ **নিজেদের চেষ্টায়** মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এদেশে

করিয়াছিলেন। সে সময়ে যে সমস্ত মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার কোনওটিরই দেশীয় অক্ষরের ছাঁদ ভাল ছিল না, সে-জন্য সুদৃশ্যতর ছাঁদের অক্ষর প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে সরকারী পুস্তক ছাপিতে দিবার প্রতিশ্রুতি ইহাঁদের দেওয়া হয়; তাহার ফলে মুসলমান মুন্সীগণ সর্ব্বপ্রথমে পার্শী ভাষায় ছাপিবার যন্ত্র "পার্শীয়ান প্রেস্" স্থাপন করেন এবং তাহার পরে হিন্দুগণ "সংস্কৃত যন্ত্র" স্থাপন করিয়া প্রথমে সংস্কৃত, হিন্দী, পূরবী ও ব্রজ ভাষায় পুস্তক ছাপিবার ও পরে বাংলা অক্ষর আনাইয়া বাংলা পুস্তক ছাপিবার ব্যবস্থা করেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইংরেজ আগমনের পরে হিন্দু জাতির জাগরণই গোড়ার দিকে হইয়াছিল। সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বক্ষেত্রেই নূতনকে গ্রহণ করিবার ও আত্মস্থ করিবার যে সজাগ উন্মুখতা ও উদ্যম, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে হিন্দুসমাজেই পরিমাণে অনেক বেশী দেখা দিয়াছিল। সুতরাং গোড়াতে ভারতীয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হইয়া পার্শীয়ান প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটা খট্‌কা লাগিতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহার সঙ্গত কারণ বুঝা কঠিন হইবে না। যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় তাহার দীর্ঘকাল পরে পর্য্যন্তও পার্শী ভাষা রাজকীয় ভাষা বা 'কোর্ট ল্যাঙ্গোয়েজ'-এর আসন হইতে বরখাস্ত হয় নাই এবং সংস্কৃত ভাষার মর্য্যাদার তখন সবে মাত্র সুরু। (১) ইংরেজ সিবিলিয়ানদিগকে রাজকার্য্যের ব্যপদেশে সর্ব্বাগ্রে পার্শী ভাষার সহিতই পরিচিত হইতে হইত এবং (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ রাজকার্য্যের সুবিধার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিলেই সংস্কৃত যন্ত্র আগে না হইয়া পার্শীয়ান্ প্রেস আগে কেন হইল, তাহার কারণ বুঝা যাইবে।

১৮০৫ সালে প্রকাশিত কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়ম্ গ্রন্থে মৌলবী ও মুন্সীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই পার্শীয়ান্ প্রেসের সম্বন্ধে ক্লডিয়াস্ বুকানন বলিতেছেন,

An improved fount of Persian type has been cast by the learned *natives*, in the Persian and Arabic department, at *their* own expense and for the use of *their* own press, under the superintendence of Kulb Alee, the Persian writing master.* (Italics mine).

তাৎপর্য্য। পার্শী ও আরবী বিভাগের শিক্ষিত দেশীয়গণ নিজেদের ব্যয়ে নিজেদের ছাপাখানার জন্য সুন্দরতর ছাঁদের পার্শী অক্ষরের সাট প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহা পার্শী খোসনবীশ কুল্‌ব আলির অধ্যক্ষতায় সম্পাদিত হইয়াছে।

এই যন্ত্রে মৌলবী নজর আসরাব্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'তুবিস্তান্-ই-মুজাহিব' নামক গ্রন্থ ছাপিবার ব্যবস্থা হয়। রোবাকের 'অ্যানাল্‌স্ অফ্ ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে:

This work will be published by the native proprietors of a press which was established in former years.*

তাৎপর্য্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটি মুদ্রাযন্ত্রের দেশীয় স্বত্বাধিকারিগণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

পার্শীয়ান্ প্রেস যেমন পার্শী সাট উন্নত করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ছাপিবার বরাদ্দ পাইতে লাগিলেন, হিন্দুগণও উৎকৃষ্টতর সাট প্রস্তুত করিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে দেবনাগরী অক্ষরের পুস্তক ছাপিবার ভার পাইতে লাগিলেন। লর্ড মিণ্টো ঐ কলেজের 'ভিজিটর' রূপে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

At the recommendation of the Council of the College, those publications have received encouragement from the Government.†

তাৎপর্য্য। কলেজের অধ্যক্ষসভার সুপারিশ অনুসারে ঐ সকল গ্রন্থ-প্রকাশ সরকারী উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।

দেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য সহায়তা করিবে এবং তাহার দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা অন্তত সেই সময়কার গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতেন। তাই ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো উল্লিখিত ভিজিটর রূপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে বলেন,

This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit dictionaries. . . . . It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this numerous and very ancient people.‡

তাৎপর্য্য। কলেজ হইতে এই মুদ্রাযন্ত্রকে কয়েকখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত অভিধানের সংস্করণ বাহির করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে… ইহা আশা করা যায় যে, এইভাবে একটি সংস্কৃত যন্ত্র স্থাপনার দ্বারা হিন্দুদিগের মধ্যে যে মুদ্রণ শিল্পের প্রচলন হইল, তাহার দ্বারা এই জনবহুল প্রাচীন জাতির মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চা অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

* *The College of Fort William in Bengal*, edited by Rev. C. Buchanan, London, 1805, p. 223.

* Roebuck's *Annals of the College of Fort William*, p. 211.

† *Asiatic Journal Register*, 1809, Bengal Occurrence, p. 23.

‡ Roebuck, p. 155, also *Asiatic Annual Register*, 1808, Bengal Occurrence, March, p. 46.

এই আশা ফলবতী হইতেছে দেখিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতায় লর্ড মিণ্টো বলেন,

. . . . the publisher has been able to afford them at so moderate a price, as to furnish a strong confirmation of the hope entertained that the press may be rendered instrumental to the general diffusion of knowledge among the natives of the country.*

তাৎপর্য্য। প্রকাশক ঐ সকল [গ্রন্থ] এত কম মূল্যে দিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহার দ্বারা পূর্ব্বের সেই আশা ফলবতী হইবার প্রভূত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে যে, ঐ মুদ্রাযন্ত্র এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহায় স্বরূপ হইবে।

বাবুরাম এই প্রেস স্থাপয়িতাদের মধ্যে **অন্যতম** ছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু বাবুরামকে সংস্কৃত যন্ত্রের **একক** স্থাপয়িতা ও মালিক বলিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উল্লিখিত প্রবন্ধে বলিতেছেন, "বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন।"

তিনি নিজ প্রবন্ধে এই ছাপাখানা (সংস্কৃত যন্ত্র) সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ রূপে, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সপ্তম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে 'ভিজিটর' রূপে লর্ড মিণ্টো যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই বক্তৃতাতেই আছে "A printing press has been established by learned *Hindoos*."† (italics mine). অর্থাৎ শিক্ষিত **হিন্দুগণ** কর্তৃক একটি ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে।

লর্ড মিণ্টো স্পষ্টই একাধিক হিন্দুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্র বাবু "বাবুরাম নামক **একজন** হিন্দুই" বলিতেছেন কেন?

লর্ড মিণ্টো (ব্রজেন্দ্রবাবু যাঁহার বক্তৃতা প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়াছেন) এই ছাপাখানা সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির কথা যে কেবল ১৮০৮ সালের সপ্তম বার্ষিক বক্তৃতাতেই বলিয়াছেন তাহাই নহে, পরের ভাষণটিতেও সেই একাধিক স্বত্বাধিকারীর কথা পুনরুক্তি করিয়াছেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতায় এই ছাপাখানা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,

The *native proprietors* of the Sungskrit press, have with the improved Nagree types, which were noticed on a former occasion, printed several popular works, generally admitted by those who cultivate Indian literature.‡ (Italics mine).

এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, লর্ড মিণ্টো বলিতেছেন "native proprietors" অর্থাৎ দেশীয় মালিক-**বৃন্দ**।

* *Asiatic Journal*, 1809, Bengal Occurrence, p. 23.
† Roebuck, p. 155.
‡ *Asiatic Journal*, 1809, Bengal Occurrence, p. 23.

দেহ-যন্ত্র

আপনি ওষুধ খেতে ভালবাসেন না নিশ্চয়ই। তবু তথাকথিত পুষ্টি ও শক্তির জন্য কত ওষুধ আপনাকে খেতে হয়, ভেবে দেখেছেন কি? স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য যতটা প্রয়োজন, ওষুধ তার তুলনায় কিছুই নয়,—এই কথাটা কত কম প্রচারিত হয়!

এক শিশি ওষুধ যে দামে কিনবেন, তার চাইতে কম দামে, অনেক বেশী সুখাদ্য আপনি পেতে পারেন।

ওষুধের শিশিতে ক'রে ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট্ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু ঐ সকল গুণসম্পন্ন বটিকা নিয়মিত খেলেও মানুষের দেহ-যন্ত্র চলবে না।

ঘড়ির কাঁটা চলছে অবিশ্রান্ত,—জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস তেমনি। ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ! আপনার বুকের মাঝেও আর এক প্রকার জীবন-ঘড়ি তার কলকব্জাসমেত ধুক্ ধুক্ করছে।

এটি সম্ভব হয় খাদ্যের দ্বারা। এই খাদ্যকে আপনি যখন অবহেলা করেন, তখন মনে করেন না এ সকল কথা।

ঘিয়ে আয়ু বাড়ে। ঘৃতং আয়ুঃ। এটা আজকের কথা নয়! কিন্তু কথাটা আজকেও সত্যি। ঘি বস্তু এমনই অপরিহার্য্য দেহের পক্ষে, যে জন্য ঋণ করেও ঘি সংগ্রহ করা দরকার বিবেচিত হয়েছিল। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ! আজকের দিনে ঋণ লওয়া হয়ত ঠিক হবে না, কিন্তু ঘিয়ের সারবত্তা ও প্রয়োজন কমে নি একটুও।

ঘিয়ের যে এত গুণ, তা কেবল খাঁটি ঘি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাই ঘি যখন খেতে হয়, খাঁটি বস্তুটিই চাই। বাজারে 'শ্রী'এবং বিশ্রী উভয় প্রকার ঘিই আছে, তা কে না জানেন।

এই মালিকবৃন্দের মধ্যে অন্তত দুই জনের নাম জানা গিয়াছে।—পার্শীয়ান্ প্রেসের মালিকদিগের ন্যায় ইঁহারাও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।—এক জনের নাম বাবুরাম পণ্ডিত ও অপর জন, মুন্সী লাল্লুলাল কবি। ব্রজেন্দ্রবাবু বাবুরামের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই :—"বাবুরাম এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মীর্জ্জাপুর ত্রিলোচন ঘাটে।" কিন্তু কলিকাতায় তিনি কি কার্য্য করিতেন তাহার পরিচয় ব্রজেন্দ্রবাবু দেন নাই। বাবুরাম পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ঐ কলেজের উৎসাহে ও আনুকূল্যে 'বীর মিত্রোদয়' নামে হিন্দু আইনের বিচার-বিধি সম্পর্কে digest বা আইনসার প্রস্তুত করেন ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের *Asiatic Journal*-এর ১৭৭ পৃষ্ঠায়, ১৮১৪ খ্রীঃ হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলের অনুমোদন পাইয়া যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা আছে। এই তালিকা ব্রজভাষায় ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত মুন্সী লাল্লুলালের 'সভাবিলাস' ও বাবুরাম পণ্ডিতের 'বীর মিত্রোদয়ে'র উল্লেখ আছে। বীর মিত্রোদয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে "A complete digest of Hindoo law of administration of Justice...edited by Baboo ram pandit."

লাল্লুলাল ও বাবুরামের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লর্ড মিণ্টো বিদিত ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি সংস্কৃত যন্ত্রের

* পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ-দ্বিতীয় পুস্তক"-এ বাবুরাম পণ্ডিত সম্পাদিত আর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এইখানি ১৭৩৫ শকে মুদ্রিত "দায়ভাগ," দায়ভাগের মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে এইটি প্রথম। সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সমাজ খণ্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠার (৬) সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাকতেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে। এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাড্‌কোভাইন" সেবন করা, কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা ক'রে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাডকোভাইন
মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে
লিষ্টার এণ্টিসেপ্টিক্স্ :: কাশীপুর, কলিকাতা

স্থাপয়িতাদের "Learned Hindoos" অর্থাৎ 'সুপণ্ডিত হিন্দুগণ' বলিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ কলেজের দেশীয় শিক্ষকগণকে ছাপাখানা সম্পর্কে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় জানা থাকিলে ব্রজেন্দ্রবাবু সংস্কৃত যন্ত্রের সম্পর্কে যে সমস্ত অনুমান, "মনে হইতেছে" বলিয়া করিয়াছেন, তাহা করিতে হইত না। লাল্লুলাল যে পরে এই যন্ত্রটি **কিনিয়া লইয়াছিলেন** এরূপ অমূলক সিদ্ধান্ত তাঁহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে তিনি বাবুরামকে উহার একক প্রথম মালিক **ধরিয়া লইয়াছেন**। সংস্কৃত যন্ত্রের মুদ্রাকর প্রথমাবধিই মদন পাল ছিলেন। সংস্কৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির প্রথমে **প্রকাশক** রূপে বাবুরামের ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে **প্রকাশক** রূপে লাল্লুলালের নাম দেখা যায়। সেজন্য কতকগুলি গ্রন্থে বাবুরাম কর্তৃক প্রকাশিত ও মদন পাল মুদ্রিত এবং কতকগুলিতে লাল্লুলাল প্রকাশিত ও মদন পাল মুদ্রিত দেখিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু সম্ভবত মনে করিলেন যে লাল্লুলাল বাবুরামের নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্রটি কিনিয়া লইয়াছিলেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্রজেন্দ্রবাবু মুদ্রাযন্ত্রের প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী বা **স্থাপয়িতার** মধ্যে গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপয়িতা অথবা মালিক হইলেই যে তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের প্রকাশকও হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা এখনও নাই, আগেও ছিল না।

বস্তুতপক্ষে, প্রথম হইতেই **একাধিক** ব্যক্তি সংস্কৃত যন্ত্রের **মালিক** ছিলেন ইহা লর্ড মিণ্টো বার বার বলিয়াছেন এবং সেজন্য "Learned Hindoos" "Native proprietors" প্রভৃতি বহুবচনান্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত **প্রকাশক একজনই** হইতেন বলিয়া লর্ড মিণ্টো তাঁহার অষ্টম বার্ষিক অভিভাষণে "native proprietors" অর্থাৎ "দেশীয় মালিক**গণ**" বলিলেও, প্রকাশক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "the publisher has been able" অর্থাৎ প্রকাশকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এই বাক্য দ্বারা **এক জন** প্রকাশকের কথাই সূচিত হইতেছে। পরে সম্ভবতঃ লাল্লুলাল একক মালিক হইয়াছিলেন, কেন না পরে ঐ প্রেস হইতে মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় যে "লল্লুকবীশ্বরস্য সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীমদন পালেনামঙ্কিতম্" ছাপা হইয়াছে। এই "কবীশ্বরস্য" একবচনান্ত হওয়াতে একাকী লাল্লু মালিক ইহাই দ্যোতনা করিতেছে। এই সময়ে আরও দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত যন্ত্রটি তাহার

ক্যাষ্টরল

কেশপ্রাণ 'ভাইটামিন - এফ' সংযুক্ত ক্যালকেমিকোর এই প্রসিদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল অপূর্ব্ব মনোমদ সৌরভে ও অব্যর্থ কেশবর্দ্ধকগুণে দেশী ও বিদেশী সমস্ত ক্যাষ্টর অয়েলের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

৫, ১০ ও ২০ আউন্স সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

আদি স্থান খিদিরপুর হইতে পটলডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রেস সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের সেই আদি যুগে দেশীয় মনস্বিগণের এই প্রচেষ্টার কথা আমরা কতটুকু জানি? শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা কম নহে, কিন্তু এজন্য তাঁহারা যে পরিমাণ প্রশংসা পাইয়াছেন ও পাইয়া আসিতেছেন তাহার তুলনায় তাঁহাদেরই সমসাময়িক এই প্রথম **ভারতীয়** পথপ্রদর্শকগণের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা লজ্জার বিষয় নহে কি?

সংস্কৃত যন্ত্রে যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার কিছু পরিচয় রোবাক্, ক্লডিয়াস বুকানন প্রভৃতির পুস্তক ও 'এশিয়াটিক্ জর্ন্যাল' হইতে সংগৃহীত করিয়া দেওয়া গেল:

	গ্রন্থ	সম্পাদক	মুদ্রণবর্ষ
১।	হেমচন্দ্র কোষ		১৮০৭
২।	অমরকোষ, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হারাবলী একত্রে		১৮০৭
৩।	গীতগোবিন্দ		১৮০৮
৪।	ভগবদ্গীতা		১৮০৯
৫।	বিহারীলালের সৎসই		১৮০৯
৬।	প্রেমসাগর	লাল্লুলাল	১৮১০
৭।	তুলসীদাসের রামায়ণ		১৮১১
৮।	দায়ভাগ	বাবুরাম পণ্ডিত	১৮১২
৯।	সিদ্ধান্ত কৌমুদী		১৮১২
১০।	মনুসংহিতা		১৮১২
১১।	সভাবিলাস	লাল্লুলাল	১৮১৪
১২।	কিরাতার্জ্জুনীয়		১৮১৫
১৩।	বীর মিত্রোদয়	বাবুরাম পণ্ডিত	১৮১৫

স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট পাঠে জানা যায় যে, রামমোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত চারিটি উপনিষদ, 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার,' 'গোস্বামীর সহিত বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থ এই লাল্লুলালের ছাপাখানাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল; **এতদ্ব্যতীত রামগোপাল শর্ম্মার সহিত বিচার নামক আর একটি পুস্তকের সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। এই পুস্তকের**

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টরদের বিবৃতি এবং অডিটরদের সুপরীক্ষিত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান বিগত ৩১শে মে ১৯৪০ ইং হইতে স্থাপিত হইয়া মাত্র দশ মাস কালের ভিতর সর্বমোট ৩১,৮৯৩।৶৪ পাই লাভ করিয়াছে। ডিরেক্টরগণ সর্বপ্রকার আবশ্যক খরচের দাবী মিটাইয়া অংশীদারদের আয়করমুক্ত বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয় যে, একটা ব্যবসায় তার প্রারম্ভকাল হইতেই শতকরা যথেষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশদানে সমর্থ! এত শীঘ্র এইরূপ লভ্যাংশ বণ্টনের ঘোষণা সাধারণের ভিতর প্রবল সাড়া জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসও সংস্থাপিত হইল; এই নিমিত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এস্, চাটার্জ্জির কর্মকুশলতা সত্যই প্রশংসনীয়!

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায় জগতে সম্পূর্ণ অপরিহার্য্য অবলম্বন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অতি সামান্যই ছিল। শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জির অধিনায়কত্বে "বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড" এ বিষয়ে প্রশস্ততর পন্থা খুলিয়া দিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

সিণ্ডিকেটের অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা এবং এই অল্প সময়ের ভিতর ৪,১৯,৪৫০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া ১,৪৮,৫৮৫৲ টাকা আদায় হয়। অদ্যাবধি হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৫,০৫,০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া এ পর্যন্ত ১,৮৯,০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। এরূপ দ্রুত উন্নতি সিণ্ডিকেটের লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য!

এই সিণ্ডিকেট শাখা এবং এজেন্সী বিস্তারের উদ্দেশ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। বিপুল প্রচারার্থে ইহা দেশী ও বিদেশী বাজারের তথ্য-পরিপূর্ণ ধারাবাহিক "মার্কেট রিপোর্ট" প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। শিক্ষার দিক হইতেও এই "মার্কেট রিপোর্ট"র একটা বিশেষ মূল্য আছে। ষ্টক ও শেয়ার ব্যাপারে ইহা একটি সাহায্যকারী যন্ত্র। সিণ্ডিকেটের অংশ এখনও যাহা বিক্রয় হইতে বাকী আছে, তাহা ১লা জুলাই ১৯৪১ ইং তারিখ হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বর্দ্ধিত হারে বিক্রী হইবে।

সিণ্ডিকেটের নিজস্ব ভবনের জন্য চৌরঙ্গী স্কোয়ারে "ভিক্টোরিয়া হাউসে"র (দি ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ) নিকটবর্ত্তী এক খণ্ড জমী ক্রয় করা হইয়াছে। আগামী জুলাই ১৯৪১ ইং হইতেই গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সুরু হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য ঐকান্তিকভাবে বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমানে সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মুদ্রিত গ্রন্থাবলীতে ইহা নাই। রামমোহনের গ্রন্থাদি ভিন্ন 'রতিমঞ্জরী', 'স্বপ্নাধ্যায়' অথবা 'স্বপ্নপটোল' গ্রন্থও সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

লাল্লুলাল কবি সম্পাদিত অন্যান্য পুস্তক যাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই :—

১। জন গিলক্রাইষ্টের ইচ্ছায় হিতোপদেশ হইতে সংগৃহীত **রাজনীতি** (হিন্দুস্থানী প্রেসে মুদ্রিত।)

২। **ব্রজভাষায় ইংরেজি ব্যাকরণ**, (ইণ্ডিয়া গেজেট প্রস), ১৮১১

৩। **লুৎফী হিন্দু**—চতুরের কাহিনী—(ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস) ১৮১৮

৪। মির্জ্জা কাজিমুল্লার সহযোগিতায় **সিংহাসন বত্তিশি** ও

৫। মজাহার উল্লা খাঁর সহযোগিতায় **বেতাল পঁচিশি** প্রস্তুত হইয়া হিন্দুস্থানী প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৭।

টেলিফোন :—
হাওড়া ৫৩২, ৫৭৫

টেলিগ্রাম :—
"গাইডেন্স" হাওড়া।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—দাশনগর, হাওড়া।

ব্রাঞ্চ—
বড়বাজার—১৬নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
নিউ মার্কেট—৫নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কুড়িগ্রাম (রংপুর)

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি

কারেণ্ট একাউণ্ট—১/২%
সেভিংস ব্যাঙ্ক—২%
ফিক্সড্ ডিপোজিটের হার
আবেদন সাপেক্ষ।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

সুদানে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনানী। তাহারা আটবারা নদী পার হইতেছে

চন্দ্র দে
১৩ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।
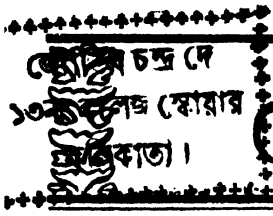
দেশ-বিদেশের কথা

পুরুলিয়ার রজনীকান্ত রোড

মানভূম জেলা বোর্ড ও পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটি পুরুলিয়ার বরাকর রোডের নাম বদলাইয়া রজনীকান্ত সরকার রোড নাম রাখিয়াছেন। রজনীকান্ত পুরুলিয়ার এক জন প্রসিদ্ধ উকীল ও বক্তা এবং সেকালের কংগ্রেসের স্থানীয় অন্যতম নেতা ছিলেন। ওকালতীতে তাঁর পসার এমন ছিল যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোথাও কোন মোকদ্দমায় এক পক্ষ কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টর লইয়া গেলে অন্য পক্ষ কখন কখন রজনী বাবুকে উকীল নিযুক্ত করা যথেষ্ট মনে করিত। রজনীকান্ত ষাট বৎসরেরও অধিক আগে বাঁকুড়া জেলা ইস্কুলে প্রবাসীর সম্পাদকের সহপাঠী ছিলেন। তখনই ইংরেজী দ্রুত ও ভাল লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ছিল। অন্য ছাত্রেরা ক্লাসের অনুশীলনী পরীক্ষায় ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক ঈড়িথ টমসনের ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে, রজনীকান্ত দিতেন মেকলে, হিউম প্রভৃতির বড় বড় ইতিহাস থেকে। তাঁর উত্তর দীর্ঘতম হইত, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়াই মোটামুটি তাহা আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সে সময়ে বাঁকুড়া জেলা ইস্কুলে ইংরেজী পড়া ও ইংরেজীতে কথাবার্তা বলার একটা পরীক্ষা হইত। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরীক্ষক ছিলেন, ও পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রজনীকান্ত। তিনি দানশীল ছিলেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী মহিলাদের কৃতিত্ব

কুমারী দীপালী তালুকদার ও কুমারী বাসন্তী বাগচী আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর বাংলা সাহিত্য সেবা

কানপুরের বঙ্গসাহিত্য সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মিত্র লিখিয়াছেন :—

"আমাদের সাহিত্য সমাজের পুস্তকাগারে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে 'প্রবাসী'র সকল সংখ্যাই আছে। আমাদের পুস্তকাগার বহু পুরাতন। সন ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। পুস্তক-সংখ্যা এখন ৪৭ শতের উপর। বহু দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গলা গ্রন্থ এখানে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বনামধন্য প্রবাসী বাঙ্গালী ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন। তিনিই আজ বহু কাল হইতে ইহার সভাপতি। সেন-পরিবারের দান পুস্তকাগারে অপরিমিত। ডাঃ সেন মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন নিজের বহু ভাল ভাল পুস্তক দিয়া পুস্তকাগারটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানে পুস্তকাগারটি যে ভবনে স্থাপিত, তাহাও সেন-পরিবারের দান।"

প্রবাসীর প্রতি শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন

বিগত ৩০এ বৈশাখ প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সভার একটি বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—

"'প্রবাসী'" পত্রিকা চল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া এই বৈশাখে একচল্লিশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ দিন ইহা নিয়মিত সময়ে নিয়মিত ভাবে এবং একই সম্পাদক দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষের মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 'প্রবাসী' এই এলাহাবাদ হইতেই প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তাহার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর এই স্থানেই অতিবাহিত হয়। সেই জন্য এলাহাবাদের বাঙ্গালীগণ এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিয়া গৌরব বোধ করেন। এই সভা "প্রবাসী"র একচল্লিশ বর্ষে পদার্পণ করায় উৎফুল্ল অন্তরে তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

"প্রবাসী"-সম্পাদক দেশগৌরব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদর্শ ও পৌরুষের বাণী প্রচার করিয়া আমাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া আসিতেছেন। এই কথা স্মরণ করিয়া এই সভা তাঁহার নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছে।"

শ্রীশশধর দত্ত, সম্পাদক, প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সভা।

প্রবাসীর "লেখকবর্গ"

গত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ যাঁহারা প্রবাসীতে লিখিয়াছেন তাঁহাদের একটি মোটামুটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তালিকাটি যে অসম্পূর্ণ তাহাও আমরা বলিয়াছি। অসম্পূর্ণ তালিকাটিতে এই সকল লেখকেরও নাম বাদ পড়িয়াছে—শ্রীরামানুজ কর, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, শ্রীসুজয়গোপাল দত্ত, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রকুমার দে, শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীগোপাললাল দে, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পুষ্পবালা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
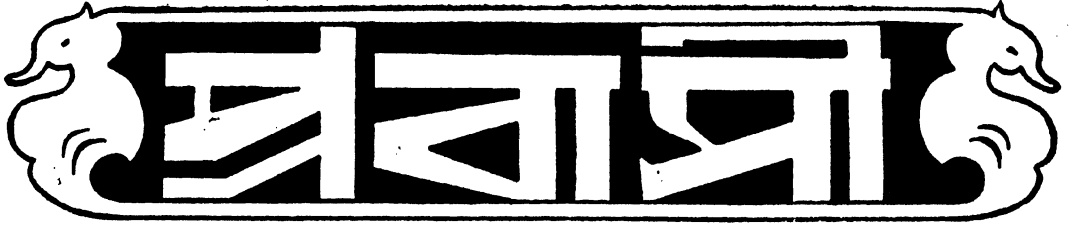
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৮

৪র্থ সংখ্যা

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;—
দিয়েছি উজাড় করি'
যাহা কিছু আছিল দিবার।
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা,
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদয়ন
৬ মে, ১৯৪১
সকাল

[শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই. সি. এস্-কে বাঁকুড়ায় প্রেরিত]

ছবি

[শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র]

কল্যাণীয়েষু,

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি; সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশী হই—তা নয়। দৃষ্টির উপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়তো, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হোলো ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পূরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোনও একটা বিশেষত্ব বশত—তা সুন্দর হোক বা না হোক, মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারি দিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত,—ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর, অর্থাৎ যদি সে কোনও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারি দিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছু দিন পূর্বে কয়েক জন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে আমার বোধ হয় নি। সেই জন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
২৪।৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু,

আমার পাশ্চাত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী ছিলেন তাঁদের অনবধান বা ঔদাসীন্য বশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে—এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু যে কোনো কারণে হোক এত দিন পর্যন্ত সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ-সহচরদের নিকটে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হোতে কোনো বাধা ঘটবে না। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"তুমি আমাদের পিতা" গানটির স্বরলিপি আছে বলে জানি নে। দিনু আজকাল জোড়াসাঁকোয় থাকে, কেউ গিয়ে যদি তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারে তো সহজ হয়। সুরটা শিখতে দেরী হবে না। নইলে অনাদির ঠিকানা যদি বের করতে পারেন সে শিখিয়ে দেবে। অনাদি বোধ হয় সঙ্গীত সম্মিলনীতে গান শেখায়।

আপনি উপাসনার আরম্ভে একটি কবিতা চান, গীতাঞ্জলি বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় ৪৯ সংখ্যক কবিতাটি বোধ হয় কাজে লাগতে পারে। সেটা ছেলেদের জন্যেই লেখা।

...র কাছ থেকে ছবি উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। আমাদের অনেক ছবি তার রসিদ সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। চিঠি লিখলে উত্তর পাবার আশা নেই। কিশোরীকে বলে দিয়েছি কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিশোরী সম্প্রতি গিরিডিতে—তার স্ত্রী অসুস্থ। আশা করি শীঘ্রই কলকাতায় যাবে। ছবিগুলোর জন্যে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। * * *

আমরা এই মাসের শেষভাগে সিংহলে যাবার উদ্যোগ করচি। স্বদেশে অন্নসংস্থানের আশা নেই। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১৯১৬ থেকে ১৭ খৃষ্টশক পর্য্যন্ত আমেরিকায় বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেই সময়ে সংবাদপত্র-যোগে খবর পাওয়া যেত,—মহাত্মাজি অসহযোগ প্রচার করচেন। একথা স্বীকার করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজ-রাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহ মাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজি দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অত বড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নঙর্থক উদ্দেশে খরচ হয়ে যাচ্চে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজি নিজের চার দিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য—এই কর্ত্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সুতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হতে পারেই না। জানি এই সংকল্পে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল—তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হোতো। এত দিন ধরে সংগ্রাম তো যথেষ্টই হোলো, দুঃখের তো অন্ত নেই। তার পরিবর্ত্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলুম আমাদের কোন প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আন্দোলন না করে নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্যে দেশের বহুধা শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের যে রূপ অভিব্যক্ত হোতো, সেই রূপটি হোতো সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলম্বো

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার টেলিগ্রাম পেলুম। রাশিয়ার চিঠির তর্জ্জমা ছাপবেন, আপত্তির কোন কারণ নেই।

এখানকার লেকচারের কথা লিখেচেন, শুনে দুঃখ বোধ হোলো। এক সময় কথা মুখে বাধত না, তখনো বয়েস যে বিশেষ অল্প ছিল তাও নয়, কিন্তু বুদ্ধিটা তখনো ছিল বিকেল বেলার পড়ন্ত রৌদ্র, কাজ চালাবার চেয়েও কিছু বেশী। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে। নদীতে দেখা যায় এক এক সময়ে দেখতে দেখতে দীর্ঘ চর পড়ে যায়। আমার সেই অবস্থা, বাণীর ধারা অনেক দূর পিছিয়ে গেছে। বক্তৃতা (বিশেষত ইংরেজীতে) লিখতে বসতে মন একান্ত নারাজ হয়ে ওঠে। চীনে মালয় দ্বীপে পরীক্ষা করে দেখেছি, মুখে মুখে যা বলা যেত লিখিত ভাষার সঙ্গে তার বর্ণভেদ প্রায় ছিল না। এখন প্রতিদিন দেখি বোবা মনের ডাঙাগুলিই কলকথাস্রোতের ঊর্দ্ধে মাথা তুলে উঠচে। তাই পুরোনো লেখা জুড়ে তেড়েই কাজ চালাই। অধিকাংশের কাছেই তা পুরোনো নয়, দৈবাৎ ধরা পড়ি। বলবার কথা তো এখন শেষ হয়ে এসেছে তাই পুনরাবৃত্তি করলে অন্যায় হয় না। সেই কাজ করেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ চলে যাবে। এখনকার বক্তৃতা পূর্ব্বতন কালের উচ্ছিষ্ট, কোন্ লজ্জায় পাঠাব আপনার কাছে।

বিষম ব্যস্ত করে রেখেচে। এখানকার বিবরণ যদি অনিলকে দিয়ে লেখাতে পারি পাঠিয়ে দেব।

আষাঢ়ের জন্যে সময় পেলে একটা কবিতা পাঠাব। কেদারের লেখা প্রবন্ধটি (বাংলা আর্টের পরিণতি সম্বন্ধে) এখানে বিশেষ কাজে লেগেছে—লেখাটা ভালো লাগল। ইতি ১১ মে ১৯৩৪ আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়েচেন সেটি আমার লেখা তাতে সংশয় নেই—এক সময় ঐ রকম ইংরেজি ছন্দের পরখ করতে কৌতূহল হয়েছিল। গোটাকয়েক লিখেছি। কিন্তু পরের ভাষার কাছে অপরাধী হবার সঙ্কোচ আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না—সেই জন্যে এগুলোকে বর্জ্জনীয় ভাবেই ফেলে রেখেচি। এই কবিতাটি আপনাদের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তো ছাপাতে পারেন। অন্যগুলো যে কোন্ জীর্ণ খাতায় সমাধিস্থ হয়ে আছে আমার মনেও নেই।

Supreme Man বলে একটা প্রবন্ধ আজকালের মধ্যেই পাঠাব—যদি মনঃপূত হয় Modern Reviewতে ছাপতে পারেন।

প্রবাসীর জন্যে যে কবিতা পাঠিয়েছিলুম তার প্রুফ পাই নি। ইতি ২৫ আষাঢ় ১৩৪১ আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
২২ পৌষ ১৩৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাকে যে অনুরোধ করেছেন তা আমার পক্ষে অসাধ্য দুই কারণে। আমি প্রতি দিন অনুভব করচি যে জনসঙ্ঘের মধ্যে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করা আমার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক। এতে প্রত্যেক বার আমার মূলধনের যে ব্যয় হয় এ বয়সে তার আর পূরণ হবার আশা থাকে না। ইতিপূর্ব্বে কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছি তাই আপনারা ব্যবহার করবেন, আমি কিন্তু নিষ্কৃতি চাই।

আমার দ্বিতীয় কারণটি দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক আমার পূর্ব্ব কারণের প্রতিবাদ। বহু পূর্ব্ব হতে "প্রবাসে" অর্থাৎ বাঙলার বাইরে, জড়িয়ে পড়েচি কর্ত্তব্য দাবীর জালে। ইংরেজিতে বক্তৃতা লিখতে বা সঙ্কলন করতে হবে। বর্ত্তমানে বাংলা লেখার কাজেও আমার লেখনীকে ঠেলাঠেলি করতে হয়—তার মধ্যে যে starter ছিল সেটা এখন অচলপ্রায়—তার উপরে, ইংরেজি লেখার কাজে মনকে অনেক দেলাশা দিয়ে তবে একটু নড়াতে পারি।

আসলে কর্ত্তব্যটা হয়তো তত ভারি নয় যত ভারি তার দুশ্চিন্তা। এই সকল ব্যাপারে মনটা উদ্বেলিত হয়ে আছে—কাজ করতে হয় সমস্ত দিন, এমন কাজ যা নেহাৎ দায়ে পড়া।

আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, এবং প্রসন্ন মনে আমাকে ছুটি দেবেন। ইতি আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমালোচনাগুলি পড়ে মনে হোলো ···র চিঠি না ছাপানোই ভাল। হয়তো ওতে অবিচার করা হবে, অন্তত ঝগড়ার সূত্রপাত হতে পারে। ···র পত্র অনুসারে যাঁরা কিছু বলেন না অথচ ছবিগুলিকে নিন্দনীয় মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমতের মূল্য কী তা তো জানি নে। এ সকল ব্যাপারে মতবিরোধ অনিবার্য্য—অতএব কোনো এক পক্ষের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না। গত মাসের প্রবাসীতে এটা ছাপা হয় নি ভালোই হয়েছে।

আমাকে সত্বর পশ্চিম প্রদেশের আমন্ত্রণে বেরতে হবে। অল্প বয়সে ভ্রমণে বের হবার জন্যেই ঔৎসুক্য ছিল, সব সময়ে সুযোগ ঘট্‌ত না, এখন ঠিক তার বিপরীত। বড় দাদা সংস্কৃত ছন্দে লিখেছিলেন ঃ—"পায়ে শিক্লী মন-উড়ুউড়ু কিন্তু পাথেয় নাস্তি"—এখন আমার মনেই বন্ধন, পায়ে টান লেগেছে, পাথেয়ও জুট্‌ল। এবার এখানে নববসন্তের আমন্ত্রণটা ব্যর্থ হবে। ভালো লাগে না এই মনে করে যে, ঋতুরাজের প্রাঙ্গণে বার্ষিক বিদায় আর তো বড়ো বেশি জুট্‌চে না। ইতি

১৯ মাঘ ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ পর্য্যন্ত আমার বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিক মত হোলোই না। সভার মধ্যে রিপোর্টারকে দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বর্ত্তমান যুগের অনেক উপদ্রবের মধ্যে এই উপদ্রবও অনিবার্য্য। নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়, নিজের কথা আমাকে পড়তে হবে বিকৃত ভাষায় এ আমার ললাটের লিখন। কিছু কাল পূর্ব্বে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম, আমার নিজের ভালো লেগেছিল অন্য অনেকেরও। একান্ত আশা করেছিলুম, সেটার রিপোর্ট হবে না, হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। অবশেষে কাগজে যখন দেখলুম তাকে, হাঁসপাতালে অপঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো, তার থেকে যে আঘাত পেয়েছিলুম সামলে উঠ্‌তে সময় লেগেছিল। এই সব ক্ষত বিক্ষত পদার্থকে সংশোধন করা আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি এ সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গীই আমার প্রধান শত্রু। রিপোর্টের ছাঁচের মধ্যে তাদের শোচনীয়তা ঘটে। যত ভালোই হোক্ সব কথাই যে ধরে রাখতে হবে এমন অত্যন্ত গরজ নেই—কিন্তু যে কটা কথা থাকে সুস্থ অবস্থায় থাকলেই বাঁচি।

কলম্বোর কলাসদনে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেম তখন রিপোর্টার ছিল এবং যে রিপোর্ট তারা বানিয়েছিল সেটা তাদেরি যোগ্য। এটাকে আমি বর্জ্জন করেছিলুম কিন্তু আমাকে অপদস্থ করবার জন্যে কে এই ছেঁড়া জিনিষ আমার অগোচরে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। ওটা নিতান্তই অপ্রকাশ্য—ওকে জাতে তুলতে গেলে যে শুদ্ধির প্রয়োজন তৎপরিমাণ ধৈর্য্য আমার নেই। আপনার সম্পাদকীয় নিমতলার ঘাটে ওটাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেবেন। জিনিষটার ভিতর এমন কিছুই নেই যাতে করে ওর অবলুপ্তিতে কোনো অনুশোচনার কারণ ঘটতে পারে।

সম্প্রতি লেখনীর কাজে আমার নিরতিশয় বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে। হয়তো আমার শেষ আশ্রম এই রকম লেখাবিরল অবস্থাতেই কাট্‌বে। কবিতার তহবিল শূন্য হয়ে গেছে। ফসলের শেষ কুড়ানি একটা বইয়ের মধ্যে মরাইজাৎ হয়েছে—আমার জন্মদিনের মধ্যে সেটা বেরবার কথা। অনেকগুলি চিঠি আমার দপ্তরে জমা হয়েছে, তার মধ্যে আত্ম্য অনাত্ম্য নানা কথারই আলোচনা আছে। যদি সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন তবে তার থেকে অনেক কালের রসদ জোগাতে পারব—কিন্তু নতুন লেখার দিকে মন ঝুঁকচে না, ছুটির জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।

আশ্রমের বন্ধুরা জন্মোৎসবের আয়োজন করচেন। সেটা তাঁদেরই কৃত্য, আমার তাতে কোনো হাত নেই। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩৪২

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই শ্রাবণের প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার, কিশোরীমোহন সাঁতরা, অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।]

ক্রমশঃ

গীতায় সাম্যবাদ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা, ৫।১৯

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্‌, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ; হি সমং ব্রহ্মঃ নির্দ্দোষং, তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ।

যাঁহাদের মন সাম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারা ইহলোকে এই পৃথিবীতেই সংসার জয় করিয়াছেন; ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন।

আত্ম-জ্ঞান লাভের ফল হয় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি, সকল ঘটনার প্রতি সমভাব। জ্ঞানী যখন নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার মন সর্ব্বদা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি বা জ্ঞান বা চৈতন্য—ইহা সব কিছুকে ছাড়িয়া শুধু ব্রহ্মকে দর্শন করা নহে, পরন্তু সকল জিনিষকে ব্রহ্মের মধ্যে দেখা, সকল জিনিসকেই আত্মা বলিয়া দেখা। ইহা উপনিষদেরই প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান*—আত্মৈবেদং সর্ব্বং (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)। কিন্তু পরবর্ত্তী বেদান্তদর্শনে এই জ্ঞানকে মোক্ষের উপায়রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—জ্ঞানলাভ করিয়া জীব ব্রহ্মে লীন হয়, এবং সেই সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে হইলে দেহের পতন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে,

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু॥ ৪।১।১৪

জ্ঞানপ্রভাবে সংসার বন্ধনের হেতুভূত পুণ্য পাপ উভয়েরই অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হওয়ায় দেহপতনান্তর জ্ঞানীর মুক্তি-লাভ অবশ্যম্ভাবী।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥ ৪।১।১৫

কিন্তু যে-সব পাপ ও পুণ্য কর্ম্মফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বিনাশ হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, সেই পর্য্যন্তই মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটে" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)। কিন্তু গীতা বলিয়াছে এই দেহের মধ্যে থাকিয়াই পূর্ণতম মুক্তি লাভ করা যায়, ইহৈব। জীব ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মে লীন হইতে পারে, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই—কিন্তু দেহের মধ্যে, এই পৃথিবীতে থাকিয়াই যে মুক্ত দিব্য জীবন লাভ করা যায় গীতা তাহারই উপর জোর দিয়াছে। গীতার মতে মুক্তির প্রকৃত অর্থ হইতেছে, বিক্ষোভময় নিম্নতন প্রকৃতির বশ্যতা হইতে, অজ্ঞান অহং ভাব হইতে মুক্তিলাভ—এইরূপ মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে এবং সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্য কর্ম্ম করা, দিব্য জীবনযাপন করা, ইহাই গীতার আদর্শ। এই দিব্যজীবনের স্বরূপ কি তাহা গীতা বিশদ্‌ভাবে পরিস্ফুট করে নাই, কেবল পন্থাটি দেখাইয়া দিয়াছে। পন্থাটি হইতেছে কর্ম্মযোগ এবং তাহার ফল হইতেছে এই সংসারে থাকিয়াই সংসারকে জয় করা। সংসার দুঃখময় অনিত্য, গীতা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছে, তবে ব্রহ্মে লীন হওয়া হইতেছে দুঃখময় সংসার হইতে পলায়ন করা, তাহাকে জয় করা নহে। গীতা বলিয়াছে, এই সংসারে যত শত্রু আছে, তাহাদিগকে জয় করিয়া এইখানেই দিব্যজীবন ভোগ করিতে হইবে, জিত্বা শত্রূন্‌ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌।

ব্রহ্মকে জানা, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ব্রহ্ম হওয়া—ইহাই প্রকৃত মুক্তি, ইহা যে এই পৃথিবীতে এই দেহ থাকিতেই হইতে পারে—তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে কেন যাইতে হইবে, আর মরণের পথই বা কেন দেখিতে হইবে? শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে-ব্যক্তি পূর্ণ সাম্য লাভ করিয়াছে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ. ৪।৪।৬)—তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে ব্রহ্মভূত হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার ব্যক্তি "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (কঠ ৬।১৪), এইখানেই ব্রহ্মলাভ করেন। তাহা হইলে অন্য শ্রুতি বাক্যে যে বলা হইয়াছে, জ্ঞানীকে মুক্তির জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়—এখানে কি বিরোধ হইতেছে না? না—জীবত্বের, ব্যষ্টিগত জীবনের সম্পূর্ণ লয় সাধন করিয়া ব্রহ্মের মধ্যে লীন হওয়া যে মুক্তির অর্থ তাহার জন্যই দেহপাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ এই দেহটিই হইতেছে ব্যষ্টিগত জীবের স্থূল আধার—এইরূপ লয় বা মুক্তিকে "বিদেহ" মুক্তি বলা যায়। আর দেহের মধ্যে

---

* গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক হইতে ৩২ শ্লোক পর্য্যন্ত এই প্রাচীন বেদান্তজ্ঞানের ফল স্বরূপ সমতা ও সমদৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছে।

থাকিয়া ইহৈব যে মুক্তিলাভ করা যায়, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিতই এই বিশ্বলীলার আস্বাদন করে—তাহাকে জীবন্মুক্তি বলা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈদান্তিকগণ বিদেহমুক্তির উপরেই জোর দিয়াছিলেন, গীতা জীবন্মুক্তির উপরেই জোর দিয়াছে। পূর্ব্ব বৈদান্তিকগণ জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের মতে ইহা কেবল পূর্ণ ও চরম মুক্তি লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। চরম বিদেহমুক্তিই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য, পরমগতি—জ্ঞান লাভের পর যত দিন না দেহটার পতন হয়, তত দিন বাধ্য হইয়া জ্ঞানীকে এই অপূর্ণ মুক্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হয়, যতটুকু কর্ম্ম না করিলে নয়, ভিক্ষাটনাদি করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতে হয়। কিন্তু গীতা এই শিক্ষা দেয় নাই, গীতা বলিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই পরমগতি, "সা কাষ্ঠা সা পরা গতি" (কঠ ৩।১১)। তাহা এই সংসারে, এই দেহে থাকিয়াই হয়, এবং সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের সকল দুঃখ দ্বন্দ্বকে জয় করা যায়, তখন আর সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার কোন আবশ্যকতা থাকে না, মুক্ত পুরুষ সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সকল কর্ম্ম করিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে উপভোগ করেন—সেই চৈতন্যময়, আনন্দময় অবস্থা হইতে তাঁহার আর কিছুতেই পতন হয় না।

"কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষগুলিকে ত বর্জ্জন করিতে হইবে, ভয় করিতে হইবে? এই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য যোগীকে যে কত কষ্টকর প্রয়াস করিতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে, আত্মদর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করা হয়। "হে অর্জ্জুন, যে-ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিষকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাঁহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম যোগী মনে করি" (৬।৩২)। আর ইহার দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, তিনি নিজে দুঃখলেশশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখের মধ্যেই পুনরায় সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিবেন, পরন্তু তিনি যে-সকল দ্বন্দ্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, জয় করিয়াছেন সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে চলিতে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিবেন, এবং দ্বন্দ্ব-সকলের বাহ্য দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ বা বিভ্রান্ত না হইয়া কেবল তাহাদের প্ররোচনায় সাহায্য করিতে, নিরাময় করিতে, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিজেকে ব্যাপৃত করিতে, মানবসকলকে অধ্যাত্ম আনন্দের দিকে লইয়া যাইতে, ভগবদ্ অভিমুখে সংসারের প্রগতির জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই সংসারে যত দিন তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হয় এই ভাবেই তিনি দিব্য জীবন যাপন করিবেন। যে ভগবদ্‌ভক্ত ইহা করিতে পারেন, এই ভাবে সকল জিনিষকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করিতে পারেন, শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণ-সকলের মধ্যে ও তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারেন, অথচ অধ্যাত্ম একত্বের উচ্চভূমি ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি ভগবদ্ দর্শনের উদারতায় মুক্ত স্বাধীন, ভাগবত প্রকৃতির শক্তিতে মধুর মহান্ ও জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম যোগী বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রকৃত পক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ॥"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২য় খণ্ড।

জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণতম সমতা লাভ হয় তাহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান বলিয়া দেখা যায়, সকলকেই এক সম অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া দেখা যায়। গীতার এই শিক্ষার দ্বারা পাছে সামাজিক ভেদবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য ভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ দূর হইয়া যায়, সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর এখানে গৌতম স্মৃতি হইতে একটি বচন তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সমত্ব দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে গীতা যে সমদর্শনের কথা বলিয়াছে তাহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রযোজ্য, সংসারীর পক্ষে নহে। কিন্তু গীতা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিবার কথাই বলিয়াছে, তাহাই গীতার কর্ম্মযোগ; সংসারত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য গীতা জ্ঞান ও সমতার শিক্ষা দেয় নাই। আর, সকল জিনিষে যে ভেদ ও বৈষম্য দর্শন করিবে, সে সমদৃষ্টি লাভ করিবে কেমন করিয়া? সংসারের মধ্যে থাকিয়া সকলকে সমান ভাবে দেখা অভ্যাস করিতে করিতেই আমরা প্রকৃত অদ্বৈত উপলব্ধি ও সমদৃষ্টি লাভ করিতে পারি। অতএব সমাজে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যে অলঙ্ঘ্য ভেদ প্রচলিত আছে তাহা সত্যজ্ঞানের বিরোধী এবং বর্জ্জনীয়। গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে সাময়িক বাহ্য ভেদ থাকিবে, কিন্তু মূল সত্তায় সকলেই ব্রহ্ম, সকলেই এক এই দৃষ্টি সকলকেই অভ্যাস করিতে হইবে এবং গীতা এখানে সেই শিক্ষাই দিয়াছে। যে মানুষকে আমি অস্পৃশ্য বা অদর্শনীয় বলিয়া সর্ব্বদা দূরে রাখি, তাহার সহিত আমি মূলতঃ এক, সে ব্রহ্ম, ভগবান্—এ জ্ঞান আমার কিছুতেই হইতে পারে না। সর্ব্বভূতের

মধ্যে সমান ভাবে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহার ভজনা ও সেবা করিতে করিতেই আমরা একত্বের জ্ঞান লাভ করি, ব্রহ্মজ্ঞানে, ভগবদ্ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন সংসারে সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আর আমাদের ভগবদ্‌জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি হয় না (৬।৩১)।

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম, এই দৃষ্টি অনুসারে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়েই সমান ভাবে ব্রহ্ম, এবং ইহাই গীতার মত। শঙ্করের মতে "সর্ব্বং" বলিয়া, জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইতেছে—এ সবই মিথ্যা, মায়া, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তাই তিনি সামাজিক ভেদবৈষম্য স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার মতে যতক্ষণ সংসার আছে, সমাজ আছে, ততক্ষণ ভেদ আছে। অভেদই সত্য, ভেদ সত্য নহে, সমাজ মিথ্যা ভেদের খেলা—এই মিথ্যা হইতে সরিয়া গিয়াই ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিতে হয়। কিন্তু গীতা যে প্রাচীন বৈদান্তিক মত প্রচার করিয়াছে তাহাতে ভেদও সত্য, অভেদও সত্য, ব্রহ্মও আছেন, জগৎও আছে, ব্রহ্মই এই সব জগৎ, সব জীব হইয়াছেন—ইহাই "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" বাক্যটির প্রকৃত অর্থ। এই অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে জগৎকে, জগতের সকল বস্তু ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া, ভগবান্ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে—সমাজ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া রাখিয়াছে তাহা এই পূর্ণ ব্রহ্মোপলব্ধির বিরোধী।

ভক্ষ্য-অভক্ষ্যের প্রভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের প্রভেদ হিন্দুর দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দেশাচারই লিপিবদ্ধ হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, এই সব আচারকে শাশ্বত অব্যাত্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। দেশাচারের সদাচারেরও মূল্য আছে, সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আচারের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল সামাজিক আচার বিচার পরিবর্ত্তনশীল। এক সময়ে যাহা উপযোগী ছিল অন্য সময়ে তাহা অনুপযোগী হইয়া উঠিতে পারে—তখন যদি গতানুগতিকতাবশে সেই সব আচারকে ধরিয়া থাকা যায় তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হয়। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌতম স্মৃতি হইতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইটি অনুধাবন করিলেই আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে (১৭।২০) "তাঁহার অন্ন অভোজ্য" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সম ও অসম ব্যক্তিগণকে দানাদি করিয়া তাঁহাদের বিষম ও সম করা হইলে তাদৃশ স্থলে পূজার জন্য অর্থাৎ দানাদির জন্য"—এইরূপ বলা হইয়াছে। বচনটির অর্থ এইরূপ—"চতুর্ব্বেদে পারদর্শী অত্যন্ত সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিকে যেরূপ বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্নাদি দিয়া পূজাবিশেষ করা হয় তাঁহারই সদৃশ অন্য একজন চতুর্ব্বেদ পারগামী সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যদি তদপেক্ষা অল্প বস্তু দিয়া বিষম অর্থাৎ পূজাবিশেষের ন্যূনতা করা হয় এবং অল্পবেদজ্ঞ হীনাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির যেরূপ নিকৃষ্ট উপকরণ দিয়া পূজাবিধি করা হয় যিনি সেইরূপই অসম অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বেদপারগ সদাচার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন তাঁহার সম্বন্ধে সেই হীন পূজার আধিক্য করিলে অর্থাৎ প্রধান (উৎকৃষ্ট) ব্যক্তির যেরূপ পূজা করা হয় সেইরূপ পূজা করিলে উত্তম ব্যক্তির হীনতা করায় এবং হীন ব্যক্তির উত্তমতা করায় সেই পূজা হেতু সেই পূজয়িতার অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সেইরূপ পূজা করে তাহার অন্ন অভোজ্য হয়" (মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা)।

সমাজে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি আছে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিও আছে। তাহাদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে—গীতা সে শিক্ষা দেয় নাই, তবে গীতা বলিয়াছে যে, এইরূপ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভেদ জন্ম বা জাতির উপর নির্ভর করে না, সকল মানুষই মূল সত্তায় ব্রহ্ম, অতএব সকলেই শিক্ষাদীক্ষা সাধনার দ্বারা নিজ নিজ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে—এই যে মূলগত সাম্য এইটিই গীতার শিক্ষা। আর, মানুষের গুণ ও কর্ম্মভেদে তাহার প্রতি ব্যবহারের যে তারতম্য করিতে হইবে তাহাও দেশকালভেদে বিভিন্ন হয়, সে-সম্বন্ধে চিরদিনের জন্য কোন বিধান বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। সে যুগে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন পন্থা ছিল না, তাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, সমাজের অন্যান্য বর্ণের কর্ত্তব্য ছিল দান ও পূজার দ্বারা সদাচারী ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা—সেই জন্য যাহারা তাহা না করিবে তাহাদের প্রতি সামাজিক দণ্ডের বিধান ছিল। আজ আর সমাজের সে পরিস্থিতি নাই। অতএব গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ সব বিধানের যে আর সেইরূপ উপযোগিতা নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজের বিকাশের এক অবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রয়োজন ছিল—তাই তদনুরূপ সামাজিক বিধিবিধানও হইয়াছিল—কিন্তু চিরকাল এক শ্রেণীর লোকই বিদ্যার অনুশীলন লইয়া থাকিবে, অন্য সকলে অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত থাকিবে ইহা ভগবানের বিধান নহে, ক্রমশঃ সকল মানুষকেই ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন হইয়া উঠিতে হইবে—তবেই আদর্শ মানবসমাজ গড়িয়া উঠিবে।

সমাজের প্রগতি যে সেই দিকেই চলিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট—এবং গীতা এই সাম্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তিটি দেখাইয়া দিয়াছে।

গ্রামের এক প্রান্তে অন্ত্যজ চণ্ডালেরা বাস করিবে, কোন ভদ্র, শিক্ষিত ব্যক্তি সে-ধার দিয়া যাইবে না, তাহারা অজ্ঞান ও অন্ধকারের মধ্যে চিরকাল পড়িয়া থাকিবে—এ ব্যবস্থা কখনই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে, কারণ ঐ পল্লীতে যত পাপ ও রোগের সৃষ্টি হইবে তাহা সমস্ত সমাজ-অঙ্গেই ছড়াইয়া পড়িবে, ক্রমশঃ সকলেই ঐ চণ্ডালের স্তরে নামিয়া যাইবে। প্রকৃত পন্থা হইতেছে, যাহারা নিকৃষ্ট, যাহারা নীচে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া উৎকৃষ্টের স্তরে তুলিয়া লওয়া, গীতা এই পথই দেখাইয়াছে, স্পষ্ট বলিয়াছে যে, পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডালও পরম উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারে (৯।৩২)।

শঙ্করাচার্য্য গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌতম ধর্ম্ম-সূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া, হিন্দু সমাজে প্রচলিত ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের বিভাগ অর্থাৎ "ইহা ভক্ষ্য, ইহা অভক্ষ্য" এইরূপ বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য সহস্রাধিক বৎসর পরে আজও হিন্দু সমাজে সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার চলিতেছে। বস্তুত এ-সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান কি সংক্ষেপে এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণ-সংবাদে এইরূপ শ্রুতি আছে—"প্রাণবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলের অন্নই তাঁহাদের ভক্ষ্য" (ছান্দোগ্য ৫।২।১)। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও এইরূপ উক্তি আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে ভক্ষ্য অভক্ষ্য সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা এই সব শ্রুতিবচনের বিরুদ্ধ। তাই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিলেন যে, শ্রুতি বস্তুতঃ সর্ব্বান্নভোজনের বিধান দেন নাই, অন্নাভাবে প্রাণ রক্ষার নিমিত্তই সর্ব্বান্নভোজনের অনুমতি করা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র—৩।৪।২৮)। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে শ্রুতিসম্মত দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। চাক্রায়ণ ঋষি বিপন্ন হইয়া হস্তিপালকের অর্দ্ধভুক্ত কুল্মাষ অর্থাৎ ছোলার ঘুংনি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। জল পান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—"এই অন্ন না খাইলে আমার জীবন রক্ষা হইত না, জীবন রক্ষার জন্যই উচ্ছিষ্টও খাইয়াছি, কিন্তু জল সুলভ, সর্ব্বস্থানেই জল পাইব।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়ম শ্রুতিশাস্ত্রসম্মত কোন সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক শাশ্বত বিধান নহে, কোন বিশেষ অবস্থায় উহা সামাজিক আচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবং সেই দেশাচারই স্মৃতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় না যে কাহারও স্পর্শের জন্য কোন অন্ন বা জল অভক্ষ্য বা অপানীয় হইত। উচ্ছিষ্ট জল ও অন্নই অভক্ষ্য এবং তাহার কারণও সুস্পষ্ট—উহা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান। আরও কথা এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রাণবিয়োগরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভোজনের অনুমতি করা হইয়াছে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলেও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে ঐ অনুমতি দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য—কারণ অস্পৃশ্যতা দোষে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নহে, সমগ্র হিন্দু সমাজ, হিন্দু জাতিরই প্রাণান্ত হইতে চলিয়াছে।

গীতা শ্রুতিশাস্ত্রের সার, তাহার মধ্যে আমরা কোথাও দেখিতে পাই না যে, স্পর্শদোষে কাহারও অন্ন অভক্ষ্য হয়। গীতাও ভক্ষ্য-অভক্ষ্যের বিভাগ করিয়াছে কিন্তু তাহার লক্ষ্য হইতেছে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা। গীতার মতে সাত্ত্বিক আহার হইতেছে, আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (১৭।৮)। অতিশয় কটু ও রুক্ষ যে-সব খাদ্যের দ্বারা রক্ত গরম হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহা রাজসিক, এবং পচা, বাসি, উচ্ছিষ্ট তামসিক। অতএব যাহাতে শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহাই ভক্ষ্য, এবং তাহার বিপরীত অভক্ষ্য—খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর অন্য কোন নিয়মই পালনীয় নহে। স্পর্শদোষও আছে, যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়, সেই অন্নের সহিত তাহার প্রভাব সূক্ষ্মভাবে আসিতে পারে—কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোন বাহ্যিক সামাজিক বিধি-নিষেধ বাঁধিয়া দেওয়া চলে না—অধ্যাত্ম সাধনায় যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারাই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে যে গতানুগতিক ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার চলিতেছে ইহার মূলে কোন সত্য বা হিতকারিতা নাই, ইহা কেবল সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুর প্রাচীন মহামান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যে-সব বিধান রহিয়াছে, সে-সব অমান্য করিলে কি হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যাইবে না? হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর হিন্দুত্বই যদি লোপ পাইল তাহা হইলে আর সমাজ রক্ষার সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই যে হিন্দুধর্ম্মে কতকগুলি শাশ্বত সনাতন নীতি আছে—তাহাই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম, তাহা শুধু হিন্দুর ধর্ম্ম নহে, সকল মানবেরই ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই মানুষ ক্রমশঃ ভগবানের দিকে, ভাগবৎ

জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সনাতন ধর্ম্মকে হিন্দু যে-ভাবে ধরিয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া অনুসরণ করিয়াছে, জগতে আর কোন জাতিই তাহা পারে নাই—এই জন্যই হিন্দু ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয় এবং উহার শাস্ত্র হইতেছে বেদ, উপনিষদ ও গীতা। কিন্তু হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যে-সব বিধান আছে সে-সবই ঐ সনাতন ধর্ম্ম নহে। বিশেষ দেশ ও কালের উপযোগী বহু নৈতিক ও সামাজিক বিধান ঐ সকল শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, এবং মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় যে সব বিধান অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের স্থলে নূতন নূতন বিধিবিধান প্রয়োজন হইতেছে। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Synthesis of Yoga গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "প্রাচীনেরা জ্ঞানীদের নীতিরূপে মনুসংহিতা প্রভৃতি যে-সকল ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা সামাজিক বিধান, নৈতিক আদর্শ এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি শাশ্বত নীতি বিধিবদ্ধ করিয়া সেই সবের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ক্রমপরিবর্ত্তনশীল (evolutionary), তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শেষেরটিরও তদবস্থা হইয়াছে (অর্থাৎ তাহারা নিজেরা শাশ্বত হইলেও তাহাদের রূপের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন)। অতএব কালক্রমে শাস্ত্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ উহার উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন করিতে হয় অথবা শেষ পর্য্যন্ত উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়, নতুবা উহা মানব জাতির আত্মবিকাশে কঠিন বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কেবল তাহাই নহে, শাস্ত্রের ঝোঁক হইতেছে সমষ্টিগত ও বাহ্যিক বিধিনিষেধেরই দিকে, তাহা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির খবর লয় না। কিন্তু মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে এই ভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না; তাহার দাবী অলঙ্ঘনীয়; উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত চালিত হইলে তাহার পতন হইতে পারে বটে, কিন্তু বাঁধাধরা গতানুগতিক বিধিনিষেধের দ্বারা জোর করিয়া তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিলে অগ্রগতি প্রতিহত ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইবে। আসল কথা, ব্যক্তিই শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করিবে এবং তাহা সমাজকে দিবে, অন্য লোককে দিবে, তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবে না, পরন্তু যে উপায়ে ব্যক্তি নিজ জীবনে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়াছে সেই পথ প্রদর্শন করিয়া। অধ্যাত্ম জীবন চিরকালই বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে অস্বীকার করে। অধ্যাত্মজীবন বিস্তৃতি লাভ করিলেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করিবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মের সহিত, আত্মার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই নিরবচ্ছিন্ন সংস্পর্শেরই পরিণতি হইতেছে ভগবদ্ ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং যে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম এই সবই হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের নিমজ্জন। ইহার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী স্বরূপ হইবে আত্মার সার্ব্বজনীন ভাব, সাম্য ও সকলের সহিত ঐক্য। সেই সার্ব্বজনীনতা ও ঐক্যের মধ্যেই আমরা মানবজীবনের মধ্যে ভাগবত প্রকাশের পরমতম সত্যটি লাভ করিব।" (Arya, Vol. I—690)

কবিতা

শ্রীকানাই সামন্ত

কথা-সনে কেন কথা গাঁথি
যেন এ মালতীফুলপাঁতি—
কোন্ বন্ধু সে কোন্ সাথী
আদরে তুলিয়া লবে বুকে ?

প্রণয়ের মধু-উৎসবে
কবে বধূ চিরবান্ধবে
মালা পরাইয়া বরি লবে—
এ মালা পরিবে হাসিমুখে ?

কথা-সনে শুধু কথা গাঁথি,
এ নহে বকুলফুলপাঁতি,
এ নহে মাধবী, মধুরাতি ;—
মিছা মোহ মিছা সুখে দুখে।

রাণীর অপমৃত্যু

শ্রীমনোজ বসু

পুরী চললাম।

কোন উদ্দেশ্য নেই, যাওয়ারও কিছু ঠিক ছিল না, মেজদাদাই যেতেন। তিনি রেলে কাজ করেন, পাস পেয়েছিলেন, হঠাৎ বাতের অসুখ বেড়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন—তুমি যাও যত্ন, পাসটা নষ্ট হবে কেন। রেলের কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্রেফ আমার নাম ব'লে দিও, কে কাকে চেনে!···আর আমাদের রায়বাহাদুর রয়েছেন সেখানে, গিয়ে দেখা ক'রো—কোন রকম অসুবিধা হবে না।

রায়বাহাদুর হলেন অনন্তপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। আপনাদের মনে পড়বে কি না জানি না, তাঁর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নিয়ে সেবারে খবরের কাগজে অনেক টীকা-টিপ্পনী হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে ঐ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়, এবং রায়বাহাদুরের সন্দেহ—ঐ লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যোগসাজস ছিল। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। এক রকম সেই থেকেই রায়বাহাদুর নূতন বউ এবং আগের পক্ষের কচি ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে পুরীতে বসবাস করছেন। তাঁর এক ছেলে যতীশ্বর মেজদাদার কলেজের বন্ধু—অভিন্নহৃদয় বললে হয়। এখন আবার এক আপিসে কাজ করছেন। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে মেজদাদার আড্ডা।

পুরী পৌছলাম সকালবেলা। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিকালে রায়বাহাদুরের খোঁজে বেরিয়েছি। বহুকাল আছেন, অনেকেই চেনে দেখলাম। চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁ-হাতি এক রাস্তা, সারি সারি বিস্তর ঝাউগাছ, তার মধ্যে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওয়ালা দোতলা বাড়ি।

রায়বাহাদুর বাইরের ঘরে ছিলেন, বেরুবার তোড়জোড় হচ্ছিল। ইনভ্যালিড-চেয়ার এসেছে, দু-জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছেলেপুলের পাল। একটি মহিলাও ছিলেন—নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষের সেই স্ত্রী। আমায় ঢুকতে দেখে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। চলে গেছেন—তবু দামী সেন্টের গন্ধে ঘর আমোদ করে রেখেছে। বুড়া বয়সের বউ কি না! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে আমার দিকে চাইলেন, অস্থিচর্ম্মসার বিসদৃশ রকমের লম্বা মুখ। সাড়াশব্দ না দিয়ে এ রকম ভাবে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি, বুঝতে পারলাম।

—কি চাই তোমার?

জবাব না দিয়ে যতীশ্বর-দা'র চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

—চিঠি, খালি চিঠি···। বিড়-বিড় ক'রে বকতে বকতে পকেট হাতড়ে তিনি চশমা বের করলেন। এক নজর পড়ে অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—তা কি করতে হবে আমায়?

—কিছু না। ব'লে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম। বড্ড রাগ হ'ল, এ ধরণের মানুষগুলোই এই রকম! আমি কি চাকরি চাচ্ছি, না ওঁর বাড়িতে অন্ন-ধ্বংস করবার মতলবে এসেছি? এমন জায়গায় মানুষে আসে, মেজদাদার যেমন কাণ্ড!

আর ও-মুখো যাই না। হোটেলেই শুয়ে বসে তাস খেলে কাটাই, সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। স্বর্গদ্বারের ওদিকে যে জায়গাটাকে গৌরবাটসাহি বলে, সেখানে লোকজন বড় বেশি যায় না—আমি এক দিন গিয়েছি সেদিকে। দেখি, বালির উপর চেয়ার পেতে রায়বাহাদুর ব'সে আছেন। আমি হন হন ক'রে এগিয়ে গেলাম, তাকালাম না। ফিরবার মুখে দেখলাম, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর মাঝে মাঝে ওদিকে যাই। ঐ একটা জায়গাতেই তাঁরা রোজ এসে বসেন। সেই আমলের খবরের কাগজে লিখেছিল—'একটি পরমা-সুন্দরী কিশোরী বৃদ্ধের লালসায় আত্মাহুতি দিল'···এমনি কত কি! তাই মহিলাটিকে দেখবার খুব ঔৎসুক্য আছে, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোর হয়ে গেলে তবে তিনি আসেন, সুবিধা হয় না। এক দিন অবশেষে দেখে ফেললাম। গাড়ি রাস্তায় রেখে বালি ভেঙে তিনি আসছিলেন, একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা,—খুব চেনা ব'লে মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না,

মনে প'ড়েও পড়ে না,—যেন পূর্ব্বজন্মের পরিচিত কেউ, এ জন্মের নয়। মহিলাটিরও আমার দিকে নজর পড়ল; তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ফিরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। তার পর মনে হ'ল, রাণীর মুখের সঙ্গে এঁর আশ্চর্য্য মিল। কিন্তু রাণী কি ক'রে হবে? রাণীর অপমৃত্যু হয়েছে, সে জলে ডুবে মরেছে, পুলিসের রিপোর্টেও একথা আছে। তার সম্বন্ধে সকল কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়েছি, ঘর অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের পর্দ্দা উঠে যায়···কাল পিছুতে পিছুতে বছর-কুড়িক পিছিয়ে গেল। আমরা থাকতাম কলেজের হোস্টেলে। হোস্টেল মানে গোলপাতার ঘর, মাটির মেঝে। শীতকালে মাটিতে শুতাম, বর্ষার সময় বাঁশের মাচা তৈরি ক'রে নেওয়া হ'ত—ঠাণ্ডার জন্য নয়, পিছনের জঙ্গল থেকে রাত্রিবেলা সাপ উঠত সেই আশঙ্কায়। কুন্তল-দা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেন—'পড়তেন' বলা ঠিক হ'ল না, ফোর্থ ইয়ারের খাতায় নাম ছিল, কয়েক বছর ধ'রেই ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা আসত হোস্টেলের ঠিকানায়, কিন্তু তিনি হোস্টেলে থাকতেন না, ওখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে দ্বারিক চাটুজ্জে নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে খাওয়া-থাকা পেতেন। বাড়ির লোক জানত, হোস্টেলে আছেন, তারা তদনুযায়ী টাকা পাঠাত···সে টাকা কুন্তল-দা কি করতেন, পরে জেনেছি—কিন্তু তখন আশ্চর্য্য লাগত, দুঃখও হ'ত। কত কষ্ট যে করতেন কুন্তল-দা। দ্বারিক চাটুজ্জের অবস্থা সুবিধের নয়—চাকর-বাকর ছিল না, খাওয়ার পর কুন্তল-দাকে এঁটো পাড়তে হ'ত, বাসন মাজতে হ'ত। আর সে কি খাওয়া! সমস্ত বসন্তকাল ধরে চলত সজনের খাড়া, তার পরেই কাঁঠালবিচি আর নটের ডাঁটা একেবারে আশ্বিন অবধি।

কলেজের পর আমরা প্রায়ই যেতাম কুন্তল-দা'র ওখানে; রবিবারের দিন ত নিশ্চয়ই। রাণী অর্থাৎ উমারাণীর সঙ্গে চেনাশোনা সেখানেই, সে ঐ বাড়ির মেয়ে। বয়স আঠার-উনিশ—তবু বিয়ে হয় নি। ওঁরা কুলীন, পালটি ঘর খোঁজ ক'রে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। আর সে রকম টাকা-পয়সা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

রবিবারে রবিবারে সেখানে নানা রকম বই পড়া হ'ত—গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ ও দেউস্করের বই··· এই সমস্ত। কুন্তল-দা'র হুকুম ছিল, প্রত্যেক দিনই সবাইকে গীতা পড়তে হবে। যার যেখানে খট্‌কা লাগত, দাগ দিয়ে রেখে দিত; রবিবারের দিন কুন্তল-দা তার মানে বুঝিয়ে দিতেন—একেবারে নিজের মতো করে, ছাপানো বাংলা ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এই সব পড়াশুনার মধ্যে আমরা এক এক দিন দেখতাম—কুন্তল-দা'ও দেখেছেন নিশ্চয়—রাণী কামরার মধ্যে ব'সে তন্ময় হয়ে শুনছে, তার যেন সম্বিৎ নেই। সে ছবি আজও মনে করতে পারি। মনে রাখবেন, সেটা পাড়াগাঁ জায়গা, আর রাণীরাও কিছু বড়লোক নয়—সেজন্য পর্দ্দার কড়াকড়ি ছিল না, সহজ ভাবেই সে আমাদের সঙ্গে মিশত। একেবারে বাড়ির গায়ে ভৈরব নদী, মাঝে মাঝে আমরা নদীর ঘাটে গিয়ে বসতাম। তখন লক্ষ্য করেছি, রাণী জল-আনা, কাপড়-কাচা এই রকম নানা ছুতো ক'রে বার-বার সেখানে আসা-যাওয়া করত।

বর্ষার সময়টা এক দিন সকাল থেকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আমার এ রকম হয়েছিল, কলেজ না থাকলে দুপুরবেলাটা হোস্টেলে বসে কিছুতে সোয়াস্তি পেতাম না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলাম সেই চালাঘরখানায়, যেখানে কুন্তল-দা'র অনন্তশয্যা বারো মাস তিরিশ দিন পাতাই থাকত। একে মেঘলা দিন, তার উপর সে ঘরে জানলার হাঙ্গামা না থাকায় ভিতরটা আঁধার আঁধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমটা শুধু কুন্তল-দা'কে দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর হয়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তার পর অবাক্ হয়ে গেলাম—এ রকমটা আর কোন দিন হয় নি—দেখি, মেঝের উপর মুখ নিচু ক'রে বসে রয়েছে রাণী, দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কুন্তল-দা বললেন—এই যে যদু এসে গেছিস। ভাল হয়েছে, বোস। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন, বসতেই আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলেন। চুপচাপ, কোন কথাবার্ত্তা নেই—তিনি বড় বিচলিত হয়েছেন বুঝতে পারছি।

এমন অবস্থায় আমি যে কি করব, বুঝতে পারি নে—কাকে কি বলব! একটু পরে কুন্তল-দা'ই বললেন—আচ্ছা, যদুই বলুক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমি ত ভেবে পাই নে। তুমি মিথ্যে দুঃখ করছ, রাণী।

উমারাণী কান্নার সুরে বলে—আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তা-ই বলুন। ভাবছেন, আমাকে দলে নিলে দেশের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন—আচ্ছা এক পাগল! একটু বুঝিয়ে দে ত যদু।

আবার নিজেই বোঝাতে লাগলেন—দেশ মানে কি খানিকটা মাটি আর দুটো গাছপালা? দেশ হচ্ছ তোমরা সকলে মিলে। স্বাধীন দেশে তোমরা স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমরা খেটে মরছি। বিনা লাভে কেউ কখনো কষ্ট করে···বলো, তুমিই বলো। তার চেয়ে শোন—যখন ছেলেপুলে হবে, একটা-দুটো আমাদের দিও। দেশ উদ্ধার ত এক দিনে হয়ে যাচ্ছে না।

রাণী তর্ক করে—আর তোমরা? তোমরা বুঝি দেশের মানুষ নও কুন্তল-দা? তোমরা যে না খেয়েদেয়ে জীবনের মায়া না ক'রে এই রকম ভাবে বেড়াচ্ছ—

কুন্তল-দা হো-হো ক'রে হেসে কথা উড়িয়ে দিলেন। বলেন—দেখ এক বার। এই জন্য তোমাদের নিতে চাই না। তোমরা এলে মহা আয়োজনে খাওয়াতে ব'সে যাবে, জীবনের সম্বন্ধে যাতে মায়া করি তার সদুপদেশ ছাড়বে। ঐ সব বুঝেই স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে সাবধান ক'রে গেছেন।

দেয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, পরনে গেরুয়া আলখেল্লা, গেরুয়া পাগড়ি—বীরমূর্ত্তি! কুন্তল-দা সেই দিকে হাস্যমুখে চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন—আর যে কাউকে দেখছি নে। বিষ্টি-বাদলায় সাহেবদের 'পরে রাগ হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল নাকি?

উমারাণী এই সময়ে কথা ব'লে উঠল। বলে—আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব কুন্তল-দা? তাতেও কি আপত্তি আছে?

কুন্তল-দা যেন চমকে উঠলেন। আমার দিকে চেয়ে সহজ ভাবে বলতে লাগলেন—বুঝলি যদু, দেশ স্বাধীন হ'লে আমায় যদি তোরা রাজা করিস—এই সেন্টিমেণ্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাব।···শোন রাণী, তোমার বাবাকে আমি ব'লে দেব কিন্তু—সত্যি ব'লে দেব। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ, জাত-জন্ম রইল না আর!

কিন্তু আমি কুন্তল-দার সঙ্গে হাসতে পারলাম না। রাণী যে কি রকম ভাবে কুন্তল-দার পায়ে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল, সে কেমন ক'রে বোঝাই! অনেকক্ষণ পরে উঠে মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল।

এরই দিন-দুয়েক পরে দেখলাম, রাণী আর হাসি ধরে রাখতে পারে না, যেন পাখীর মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমি উঠানে পা দিতেই ছুটে এসে কানে কানে বলে—শুনেছ যদু-দা—কুন্তল-দা রাজি হয়েছেন, আমায় কাজ করতে দেবেন।

কুন্তল-দা বললেন—আগে পরীক্ষা দাও দিকি, তার পর সে-কথা।

—বলুন, কি করব।

রাণী তখনই প্রস্তুত।

—চট ক'রে চাট্টি মুড়ি ভেজে আন। বর্ষার দিনে খাসা লাগবে।

রাণী ছুটে চলল। কিন্তু সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে বলল—আমায় এখান থেকে সরাতে চান?

অল্পক্ষণের মধ্যে গরম মুড়ি এল, অত তাড়াতাড়ি কি ক'রে করল, জানি না। মহানন্দে আমরা থালার চারি পাশে ব'সে গেলাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন—দলের মধ্যে তোমার রইল এই মুড়ি ভাজার কাজ। খুব বড় কাজ এইটে—জান?

কিন্তু ওর চেয়েও বড় কাজ সে পেয়েছিল।

এক দিন রাত্রে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে দোর খুললাম। বাইরে কুন্তল-দা বাইকে ক'রে এসেছেন, চোখ জ্বলছে, আমায় বললেন—শোন্, খবর পেয়েছি—পুলিসে বাড়ি ঘেরাও করেছে, ভোর রাতে সার্চ হবে। কিছু মাল সরাবার দরকার। ওপারে শিবরঞ্জনের ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। তুই আমাদের খালিশপুরের ঘাটে গিয়ে নৌকা ঠিক ক'রে গাবতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে মাল পৌঁছবে···বুঝলি? আমি বাড়ি চললাম।

অতএব নৌকা ঠিক ক'রে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অমাবস্যার কাছাকাছি একটা তিথি, তার উপর আকাশে মেঘ করেছে—বড় ভয়ানক অন্ধকার। ভৈরবে জোয়ার এসেছে, কোটালের টান। দেখতে দেখতে প্রায় সেই গাবতলা অবধি জল এসে পৌঁছল। চেয়েই আছি—অনেকক্ষণ পরে দেখি, রাস্তা দিয়ে নয়—বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা-ঢাকা একটা আবছা মূর্ত্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই-তিন তার পথ আটকাল।

—দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম—অতি নির্ভীক অপূর্ব্ব উমারাণীর মুখ। বলল—ঘাটে যাচ্ছি।

—কেন?

ঝাঁঝাল স্বরে রাণী জবাব দিল—একটু জিরোব ব'লে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

—তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে সে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে সুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর এই রকম অন্ধকার। আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

খবর পেলাম, সকালবেলা দ্বারিক চাটুজ্জের বাড়ি সত্যিই সার্চ হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে না, সে ত জানতামই। বেলা একটা-দেড়টার সময় কুন্তল-দা হোস্টেলে এলেন। আমায় বললেন—কলেজে যাচ্ছিস? আজ আর যাস নে যদু, কামাই কর্। চল্, দু-জনে একটু বেড়িয়ে আসি।

ঠিক দুপুরে বেড়াবার সময় নয়, আর কুন্তল-দা'র যে রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা তাতে বেড়াবার মতো অবস্থাও নয়, বুঝতে পারি। একটু দূরে খালের উপর একটা কাঠের পুল। তারই উপর কুন্তল-দা বসে পড়লেন, আমাকেও বসালেন। বললেন—কি রকম সাহস আর বুদ্ধি মেয়েটার! দলটা ত সে-ই বাঁচাল। বাড়ি থেকে সাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল, তখন ওরা বুঝতে পারে নি। আর মেয়েমানুষের সুবিধা আছে, হঠাৎ কেউ ধরতেও পারে না।

আমি বললাম—রাণীর বাবা খুব বকেছিলেন বুঝি?

কুন্তল-দা বললেন—সে ত হরদম চলছে। আমাকেও নোটিশ দিয়ে রেখেছেন, ভাদ্র মাস কাটলে বিদায় হ'তে হবে। কিন্তু বকাবকির জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে, এরা কি সেই ধরনের মেয়ে? তোর হাতে যখন দিতে পারল না, রাণী ঠিক ভেবেছিল—সাঁতার দিয়ে ও-ই শিবরঞ্জনের বাড়ি যাবে। তা পারে নি। ওপার থেকেই আসছি। আহা, কাজের জন্য এমন করত বেচারি—গোড়াতেই চলে গেল?

অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাবার্ত্তা হ'ল। বলতে বলতে একবার কুন্তল-দা দু-ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেললেন। পাষাণে জল আছে, এই প্রথম দেখলাম।

রাণীর কথা কত দিন ভেবেছি! পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়ে—কি বা বুঝত, কতটুকু জানত—আঁধার রাতে নির্ভয়ে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পুলিসের টর্চ-আলোয় তার শেষ মুহূর্ত্তের চেহারা কেবল আমিই দেখেছিলাম। সে আবার ভৈরবের জলশয্যা থেকে উঠেছে, এবং অন্ততপক্ষে দু-শ ভরি পরিমাণ জড়োয়া গহনায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে রায়বাহাদুরের ঘর আলো ক'রে আছে, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ নিজের চোখ দুটোকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে?

পরদিন গিয়ে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে দেখছি, রায়বাহাদুর যথারীতি সমুদ্রের ধারে চেয়ারখানিতে উবু হয়ে আছেন। মহিলাটি এলেন—সে রাণীই। আমায় দেখে একটু আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলে—যদু-দা, কবে এলে এখানে? কোথায় উঠেছ?

আমি বললাম—রাণী, উমারাণী, তুমি বেঁচে আছ?

রাণী হেসে বলে—দস্তুরমতো বেঁচে আছি। আমার স্বামী কত বড়মানুষ—যেমন টাকায় বড়, তেমনি বয়সে! মস্ত খেতাব, প্রকাণ্ড জমিদারি।

কথা বলতে বলতে দু-জনে এগিয়ে চলেছি। রাণী বলে—তোমায় এক নজর দেখেই চিনেছিলাম, তুমি কিন্তু চেন নি।

আমি বললাম—চিনলেও যার অপমৃত্যু হয়েছে জানি, তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে সাহস হবে কি ক'রে?

রাণী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বয়স হয়েছে রাণীর, কত মোটা হয়ে গেছে, তবু আগেকার মতো হাসির সেই রকম মিষ্ট আওয়াজ, গালের উপর তেমনি টোল পড়ে। বলে—তা হ'লে আমি ভূত হয়ে চলছি তোমার সঙ্গে?… তা সত্যি। আমি কি স্বপ্নেও জানতাম, এত সুখ আমার কপালে আছে?

গম্ভীর হয়ে গেল। আর খানিকটা এসে বলে—এবার সরে যাও যদু-দা। আমার সঙ্গে আর কেউ কথাবার্ত্তা বলছে, দেখলে রাগারাগি করবে। বুড়ো হয়ে মেজাজের ঠিক নেই। তুমি এমন ভাব দেখাবে, যেন আমাদের কখনো চেনাজানা নেই। কাল সকালবেলা একবার আসবে এদিকে?

অত্যন্ত করুণ চোখে চেয়ে সে বলতে লাগল—যদি আসতে পার যদু-দা, মন্দিরে যাবার নাম ক'রে আমিও চলে আসি। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে…বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

সকালবেলা নিরিবিলি ব'সে অনেক কথা হ'ল। রাণীর বিয়ের কাহিনী শুনলাম। অনন্তপ্রসাদ তখন খুলনায় ডেপুটি। এরই আগে এক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হঠাৎ কলেরা হয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতীলোকে চলে গেছেন। থাকল এক পাল ছেলেপুলে। অনন্ত সরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে তাদের দেখে, তাঁকেই বা কে সেবা-যত্ন করে! ঝি-চাকর দিয়ে ঠিক হয় না, মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন, ভেবে কূল-কিনারা পান না। আত্মীয়েরা বিয়ে করতে বলেন, কিন্তু বিয়ে বললেই ত হয় না…তাঁরা শ্রোত্রিয়, এমনি সাধারণ ভাবে একবার বিয়ে করার মেয়ে পাওয়া

কঠিন—তার উপর এতগুলো ছেলেপুলে থাকা অবস্থায়, এই বয়সে···চুল সমস্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লোকে বলে, বাংলা দেশে মেয়ে সস্তা; তবু ত কোন মেয়ের বাপ এগোয় না!

কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসী লোক—সকল কাজের মধ্যেও তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুল হয় না—ভগবানই উপায় ক'রে দিলেন। এক দিন গিয়েছিলেন বাগেরহাট অঞ্চলে একটা তদন্ত করতে। নৌকোয় ক'রে ফিরছেন। শেষ রাত। এক জন দাঁড়ি দাঁড় তুলে আ-হা-হা ক'রে উঠল।

—কি, কি ব্যাপার?

—মানুষ একটা···ডুবে যাচ্ছে।

অনন্ত বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টর্চ ফেললেন জলে। কে এক জন জল দাপাদাপি করছে, হয়ত নৌকোর কাছাকাছি আসবার মতলব, কিন্তু পারছে না—তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে, সাঁতার দেবার জো নেই। দাঁড়িরা লাফিয়ে পড়ল। সেখানটা চরের মতো জায়গা, জল বেশি নয়। তোলা হ'ল।

অনেক কষ্টে রাণীর সামান্য চেতনা হ'ল। অনন্ত তাকে খুলনার বাসায় নিয়ে তুললেন। বিকালের দিকে দ্বারিক চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আনা হ'ল।

অনন্ত বললেন—গোলমালের কাজ কি বলুন। গ্রামের মধ্যে নানা কথা উঠেছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে আমাকেই সমর্পণ করুন। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

—আপনাকে? দ্বারিক ইতস্তত করতে লাগলেন।

—তা নইলে জেলে নিয়ে পুরবে। ওর কোমরের সঙ্গে রিভলভার বাঁধা ছিল। জেলের চেয়ে কি আমার ঘর করা খারাপ হবে? বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। মানী ঘরের মেয়ে—খবরের কাগজে নাম বেরুবে, আর এই প্রসঙ্গে সত্য-মিথ্যা কত কি রটে যাবে।

বাপ নিরুত্তর হলেন। রাণী বলল—হোক জেল; আমার জেলই ভাল।

মৃদু হেসে অনন্ত বললেন—তা হ'লে এলুমিনিয়ামের কোটোর উপর সিলমোহর করে যে কাগজগুলো যত্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলে, তাও পুলিসের হাতে পড়বে। তাতে তুমি একা নও—দলসুদ্ধ জালে পড়বে।

রাণী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

—সেটাও পেয়েছেন? আমি ভাবলাম, জলে পড়ে গেছে। দিন আমাকে, দিন বলছি—

অনন্ত পাকা লোক—ছেলেমানুষের রাগ দেখে তাঁর হাসি আরও বেড়ে যায়। বললেন—তাড়াতাড়ি কি? আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছে থাকাও তাই।··· আচ্ছা, বউভাতের দিন দেবো। অবশ্য সে পর্য্যন্ত যদি এগোয়। আর নইলে দিয়ে আসব থানায়।

বউভাতের দিনও অনন্ত দেন নি সে কাগজগুলো। রাণী মাঝে মাঝে চাইতো, অনন্ত দেবো দেবো করতেন। তখনও তাঁর ভয় ঘোচে নি, জিনিসটা হাতে পেলে রাণী কি এই রকম সেবা-যত্ন করবে? এখন অনেক বৎসর হয়ে গেছে, চাইলে হয়ত দিয়ে দেন, কিন্তু রাণীরই খেয়াল হয় না—কি হবে তা দিয়ে? দেশের রাষ্ট্র-সংগ্রামে সে এক বিস্মৃত অধ্যায়। কাগজগুলো হয়ত ছিন্ন বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে আয়রন-সেফের এক কোণে। কিংবা হয়ত নেই।

গল্প শেষ ক'রে রাণী চুপ ক'রে কি সব ভাবে। তার পর জিজ্ঞাসা করে—কুন্তল-দা কোথায় এখন?

বললাম—জানি না।

কথাটা মিথ্যা—জেনেও বললাম না। কুন্তল-দা থাইসিসে মরেছিলেন। বড় শোচনীয় মৃত্যু—চিকিৎসা হয় নি বললেই হয়। কিন্তু সে সব খবর দিয়ে লাভ কি? কুন্তল-দা পৃথিবীতে নেই, রাণীর মনের মধ্যেও সে রকম ভাবে নেই, বুঝতে পারছি।

তার পর আমার নিজের কথাও অনেক হ'ল। রাণী বলে—যতীশ্বরের চিঠি নিয়ে এসেছিলে, তবে আর কি? সেই সূত্রে আজকে আবার যেও আমাদের বাড়ি। নিশ্চয় যেও। আমি ওঁর সামনেই তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে রাত্রে খাবার কথা বলব। সেই গরম গরম মুড়ি ভেজে দিতাম। উঃ, কত দিন দেখি নি তোমাদের কারো। যাবে ত?

ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলাম। বিকেলে যেতে বলেছে, রাণী নিমন্ত্রণ করবে। এখন বড়লোকের বউ—মুড়ি খাওয়াবে না, আয়োজন গুরুতর হবে নিশ্চয়। হোটেলের ঘ্যাঁট খেয়ে এই ক'দিনে অরুচি জন্মে গেছে। কিন্তু চলতে চলতে সাব্যস্ত করলাম, যাব না ওদের বাড়ি। বরঞ্চ আর যাতে দেখা না হয়, পুরী ছেড়েই চলে যাব। এই ক'টা দিন ভুলে যাই—রাণীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই কথাই থাক আমার মনে। গাঢ় আঁধারের মধ্যে বিনা দ্বিধায় করাল ভৈরবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—পুলিসের টর্চের আলোয় সেই যে ছবি দেখেছিলাম, সেইখানে কাহিনীর সমাপ্তি হয়ে থাক।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

রামচন্দ্র কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। সারাদিন হাসি-ঠাট্টায় উত্যক্ত হইয়া গভীর রাত্রিতে যখন তাহার মুক্তি মেলে—তখন যোগমায়াকে একান্তে পাইয়াও সে প্রাণ খুলিয়া আলাপ জমাইতে পারে না। ভোরবেলায় এ বাড়ির দুয়ারে কৌতুকলোভীর দল হানা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দেয়।

যোগমায়া উঠিয়া অন্য ঘরে যায়, কিংবা দাওয়ার পশ্চিম কোণের তক্তাপোষের উপর শুইয়া রাত্রির অনিদ্রার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়। নূতন জামাইয়ের সে সুবিধা নাই। ঘুমভারে চোখ ঢুলিলে উহাদের হাসিও প্রখর হইয়া উঠে। তার উপর খাওয়া, শোওয়া, বসা, দাঁড়ানো ইত্যাদি সমস্ত কাজেই সদা সশঙ্কিত ভাব। এমন আড়ষ্টভাবে কি মানুষ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে!

এক দিন শ্বশুর শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাও কোন কাজের চেষ্টা করছো নাকি?

হেঁটমুখে রামচন্দ্র উত্তর দিল, আজ্ঞে পোস্ট আপিসে একখানা দরখাস্ত করেছি।

পোস্ট আপিসে! ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামজীবন বলিলেন, সুবিধে হবে ওখানে? শুনেছি বড় মাইনে কম। উপরি নেই।

তা ছাড়া কোথায় চেষ্টা করব?

কেন, কোন জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকতে পারলে ভাল হয়। গোটা আট-দশ টাকা মাইনে দেবে বটে, দোল-দুর্গোৎসবও ওতে চালানো যায়।

দেখি তো চেষ্টা করে।

হাঁ, তাই দেখ। আর তুমি যদি বল—আমি না হয় চৌধুরী মশায়কে একবার অনুরোধ ক'রে দেখি।

এখন থাক, পরে আপনাকে জানাবো।

বেশ, তাই জানিয়ো। বলিয়া তিনি উঠিলেন। কয়েক পা চলিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শুনছিলাম—তুমি নাকি আজই যেতে চাও?

হাঁ।

না-না, কাল যে বিষ্ণু জেলেকে বলেছি একটা পাকা রুইমাছ দিয়ে যেতে। একটু পোলাও-টোলাও—আজ তোমার যাওয়া হবে না। পরশু ভাল দিন আছে, বলিতে বলিতে তিনি জামাতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যোগমায়া রাত্রিতে বলিল, বাড়ি যাওয়ার জন্যে তোমার এত তাড়া কেন?

তোমাদের বাড়ি ভাল নয় বলে। গম্ভীর ভাবে রামচন্দ্র উত্তর দিল।

ওঃ, নিজের বাড়িখানি সবাইয়ের ভাল লাগে গো। আমি কাঁদতাম—আর তুমি কত না ক্ষেপাতে!

রামচন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই বাড়িতে যে তোমার ঘর। সেইখানেই তোমায় সারা জীবন কাটাতে হবে।

যোগমায়া বলিল, ইস্, তা বৈকি। আমি কক্‌খনো সেখানে থাকতে পারব না। একবার এখানে—একবার সেখানে—

আচ্ছা, দেখা যাবে।

আচ্ছা—দেখো।

ক্ষুব্ধ মনে রামচন্দ্র পাশ ফিরিল। যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলেও সে অনেকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, আপনার বাড়ি মানুষের এত ভাল লাগে কেন? সেখানে বাধা-নিষেধ নাই—তাই কি এত ভাল লাগে? তবে যোগমায়া সে বাড়িখানি কেন পছন্দ করে না? যোগমায়া তো তাহার একরূপ আপনই হইয়া গিয়াছে। যোগমায়াকে ভালবাসিয়া সেই বাড়িখানি রামচন্দ্রের আরও রমণীয় বোধ হইতেছে। হয়তো যোগমায়া তাহাকে ভালবাসে না, তাই রামচন্দ্রের যাহা ভাল লাগে—যোগমায়ার তাহাতে আনন্দ জন্মায় না।

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে যোগমায়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুভব করিল। মাথার স্বল্প ঘোমটা খসিয়া গেল, হুড়া-হুড়ি ছুটাছুটির মাত্রা বাড়িয়া গেল। অনেকবার ডাকিয়াও মা তাহার সাড়াশব্দ পান না।

ও মায়া—মায়া রে, একবার উনুন-ধারে এসে বোস না!

বাঃ রে, আমরা যে জল ডিঙ্গোডিঙ্গী খেলছি, কুমীরে ধরুক আর কি!

বলি, রান্না-বান্নাগুলো একটু শেখ, নইলে শ্বশুরবাড়ি শতেকখোয়ার হবে যে!

হাঁ, কাঠের ধোঁয়ায় চোখ কানা করে বসি আর কি। কানামাছি খেলবার সময় চোখে খালি ধোঁয়া দেখব।

তোর কপালে দুঃখু আছে—এই আমি বলে দিলাম।

সারাদিন খেলায় কাটাইয়া রাত্রিতে যোগমায়া যখন শুইতে আসে, তখন তাহার বালিকাচিত্ত খানিকক্ষণের জন্য কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। নির্ব্বাপিতদীপ কক্ষে—পাশে আর একটি নূতন প্রাণী, কত আবোল-তাবোল সে বকে, কত আদর করে যোগমায়াকে, তাহার সঙ্গে কত না কথা-কাটাকাটি চলে! ঘুমাইতে না দিবার কত না ছলছুতা সে আবিষ্কার করে। মাথার খোপা খুলিয়া, চুল টানিয়া, পিঠে সুড়সুড়ি দিয়া, হাতের মুঠায় হাতখানি ভরিয়া—কত না তাহার রাত জাগাইবার প্রয়াস। যোগমায়া বিরক্ত হয়, হাসে। খেলার আনন্দে এই উপদ্রবগুলির নেশা অল্পে অল্পে তাহাকেও কেমন পাইয়া বসিতেছে। একলা শুইয়া সেই কথাই আজকাল খানিকক্ষণ মনে পড়ে। তাহাকে মনে পড়িবার সঙ্গে সেই ভগ্ন বাড়িটার স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে থাকে। প্রায়ান্ধকার উঠানের সেই আম, কাঁঠাল ও লেবু গাছগুলি; পূর্ব্বদিকে তুলসীমঞ্চ; সন্ধ্যা-কালে সেই মঞ্চতলে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধুনার ধোঁয়া ও শাঁখের ডাকে সন্ধ্যা-আবাহন, সকালের উঠান ঝাঁট—গোবরজল ছড়ানো, দুপুরে আমিষ নিরামিষ দু'টি হেঁসেলের রান্না—সবই শাশুড়ী নিজের হাতে করেন। ভাঙ্গা ঘর-দুয়ারের উপর তাঁহার কি অসীম মমতা! কমলার সখিত্ব—সেও তো ভাল লাগে। এখানে বসিয়া সেখানকার অনেক কিছুই তো ভাল লাগে, তবু সেখানকার বাতাস ভারী। প্রতিপদে বিধি-নিষেধ! কে নিন্দা করিল, কে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, কে রূপের ত্রুটি ধরিয়া সমালোচনা করিল! ভৎর্সনা নাই, অথচ সঙ্কোচের ছায়া প্রতি পদক্ষেপে গাঢ়তর হইয়া উঠে। পিসিমার মনখানি ভারি ভাল, শাশুড়ীও স্নেহশীলা, কমলার তো কথাই নাই। তবু এই বাড়িতে বসিয়া সেই বাড়িখানি যেমন মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বাড়িতে বাস করিয়া ঠিক তেমনটি তো হয় না। এখানে যোগমায়ার মুক্তির ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ, সেখানে রঙীন জাল বোনা হইলেও—সেই ক্ষেত্র খণ্ডিত—কায়েতদের বনসীমায় প্রাচীর তুলিয়া বাড়িখানাকে যেমন সীমার মধ্যে বন্দী করা হইয়াছে।

রামচন্দ্রের কথা ও বাড়ির কথা ভাবিয়াই আজকাল যোগমায়ার নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। দিনে দিনে স্মৃতি তরল হইয়া আসে। মাঠের বৈঁচি বন, কদমতলার ডোবায় শুষ্‌নি শাক তোলা, আমবাগানে আম কুড়ানো, কুলগাছের ডাল নাড়া দিয়া কুল পাড়া, পাকা জাম পাড়িয়া দিবার জন্য দুঃসাহসিক ছেলের খোসামুদি, রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া আচার চুরি, সঙ্গিনীর সঙ্গে জল ডিঙ্গোডিঙ্গী, কানামাছি, গঙ্গাযমুনা খেলা—এ বাড়ির যত কিছু মন-মাতানো জিনিস যোগমায়াকে অভিভূত করিয়া তুলে। ও-বাড়ির স্মৃতি তরল হইতে থাকে, এ-বাড়ির প্রদীপখানি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে।

আগে এমন ছিল না, আজকাল যোগমায়ার নিদ্রা খুব তরল হইয়াছে। 'খুট্' করিয়া একটু শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। চোখ না চাহিয়াই সে কল্পনা করে—দু'টি পাশই যেন খালি রহিয়াছে। মধ্য রাত্রিতে খুনসুটি করিবার জন্য মন তাহার ব্যাকুল হয় না বটে, খুনসুটি করিলেও তো মন্দ লাগে না! অনেক সময় স্বপ্নে সে শ্বশুরবাড়ির অবস্থান ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সেই ঘটনার সঙ্গে—লজ্জা, সঙ্কোচ, আনন্দ ও শিহরণ সবই সে অনুভব করিতে পারে।

আজ, হয় তো মধ্য রাত্রেই হইবে, প্রদীপটা অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে—ঘুমও ভাঙিয়াছে, শুধু নিজের অবস্থানটি সঠিক অনুভব করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মনে হইল, পিতাই কথা কহিতেছেন, তা হোক, তিনটে মাস সময় বড় কম নয়, সে আমি ঠিক করে নেব।

এবার মায়ের কণ্ঠস্বর, তিন মাসের মধ্যে যদি মেয়ে নিতে আসে?

শ্রাবণ মাসটা অসুখ-বিসুক বলে কাটিয়ে দেওয়া যায়, সামনে ভাদ্র মাস। তা ছাড়া আশ্বিন মাসের শেষে এবার পূজো।

মায়ের কণ্ঠস্বর, কি জানি, আমার মনে কেবলই কু গাইছে।

মায়ের মন কিনা! পিতার গম্ভীর হাসিতে যোগমায়া চোখ চাহিল। ঘন অন্ধকারে ভরা, তক্তাপোষের নীচেয় খুটুর খুটুর শব্দ হইতেছে—ইঁদুর হয়তো।

মা বলিলেন, আমাদের যা সাধ্যি তেমনি লগনে দেওয়া-থোওয়া করলেই হ'ত।

বাবা বলিলেন, ওই আমাদের বড় মেয়ে—ওর বিয়েতে সাধ-আহ্লাদ করবো না তো কি মাইপোষে কুলুপ লাগিয়ে বসে থাকবো! মানুষের খরচ আছে, তাই ধার হয়। সে ধার চিরকাল থাকে না। বলিতে বলিতে তিনি আর একবার অনুচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, ধার শোধ যায়, কিন্তু সাধ-আহ্লাদ যদি না পোরাও তো জীবনভোর আপসোস তোমার থেকে যাবে।

মা মৃদুস্বরে বলিলেন, সবই বুঝি, তবু ভয় তো কমে না। ওই তো আমাদের শেষ সন্তান নয়।

কিন্তু সাধ আমাদের এই প্রথম। তুমি ভেবো না, ঘুমোও।

হাঁ গা, জামাইটি কেমন মনে হয়?

ভাল। এখন থেকেই কাজের চেষ্টা করবে বলে। আজ অবধি এই রামজীবন বাঁড়ুয্যে কখনও খারাপ জিনিস ঘরে আনে নি, জান?

হুঁ, ঘুমোও।

ঘুমে যোগমায়ার চক্ষু পুনরায় মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। পিতামাতার চিন্তার সূত্রটি যে তাহাকে লইয়া তাহা সে যেন অল্প অল্প বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু এত ঘুমের মধ্যে সে চিন্তাকে মাটি স্পর্শ করানো কঠিন। চিন্তা ঘুমের স্রোতে ভাসিয়া গেল, যোগমায়ার জগৎ পুনরায় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

তৃতীয় বার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যোগমায়া কল্পলোক হইতে মাটিতে পা দিল। কমলা পিত্রালয়ে নাই। একটি বৎসরের পরমায়ুক্ষয়ে পিসিমা ও শাশুড়ী ঈষৎ ম্লান হইয়াছেন। পিসিমা মাথায় পূর্ব্বের মতই ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ধীর গতিতে চলাফেরা করেন, শাশুড়ী পূর্ব্ববৎ সংসারের শৃঙ্খলাবিধানে নিবিষ্টচিত্ত। বয়স বাড়িয়াছে বলিয়াই তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মুখরা হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অপরাহ্ণে যোগমায়ার হাতে গঙ্গাজলের ঘটি দিয়া বলিলেন, দুয়োরে জলের ছিটে দিয়ে পিদীমটা জেলে ফেল। সন্ধ্যে দেখিয়ে শাঁখ বাজাবে, তার পর ধুনোর ধোঁয়া এঘর ওঘর দেবে। তোমার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

অনভ্যস্ত করে যোগমায়া দুয়ারের ঝনকাঠে জলের ধারা দিল, চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিল। এ-ঘর ও-ঘর উঠান ও তুলসীমঞ্চে আলো দেখাইয়া শাঁখে ফুঁ পাড়িল। মনে হইল, এইটিই সব চেয়ে কঠিনতম কাজ। গাল ফুলাইয়া চোখ দিয়া জল বাহির করিয়া প্রাণপণে ফুঁ দেওয়া সত্ত্বেও শাঁখ বিন্দুমাত্র শব্দ করিল না। যোগমায়া দারুণ লজ্জায় মরিয়া হইয়া পুনরায় সজোরে ফুঁ পাড়িল। শাঁকের আওয়াজ বাহির হইল না, একটা চাপা ফুৎকারধ্বনি ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। হরিনামের মালা হাতে শাশুড়ী শঙ্খধ্বনির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, চাপা ফুৎকার ধ্বনিতে মালা কপালে ঠেকাইয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল, অমনি করে ফুঁ পাড়ে বুঝি? আস্তে আস্তে সবটা ফুঁ শাঁখের মধ্যে না দিলে বুঝি শাঁখ বাজে? বেয়ান কি—তোমাকে শাঁখটাও বাজাতে শেখান নি, বৌমা?

শাঁখ হাতে লইয়া তিনি বাজাইবার কৌশল শিখাইয়া দিলেন। যোগমায়া মরমে মরিয়া গেল।

ধুনা দেওয়া প্রভৃতিতে আর গোল বাধিল না। রাত্রিতে রুটি বেলিবার কালে যোগমায়া আর একবার ফাঁপড়ে পড়িল। শাঁখ বাজাইবার মত বৃথা প্রয়াসে সে নিজেকে অপ্রস্তুত না করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমি তো রুটি বেলতে পারি না, মা।

শাশুড়ী বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, রুটি বেলতে জান না?

যোগমায়া তাড়াতাড়ি বলিল, আমরা ত রাত্তিরে রুটি খাই নে, ভাত খাই।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, তবে রুটি বেলাটা আমার কাছেই শেখ। এই এমনি করে নেচি ময়দার গুঁড়ির ওপর চেপ্টে চাকিতে রাখবে। তার পর বেলন দিয়ে—এমনি করে বেলতে থাকবে।

পরদিন দুপুর বেলায় যোগমায়া চুপি চুপি পিসিমাকে বলিল, আমায় তরকারি রান্না শিখিয়ে দেবেন, পিসিমা?

পিসিমা বলিলেন, কি তরকারি, মা?

সব। আমি তো কিছু জানি নে, পিসিমা। রাশভারী শাশুড়ীর কাছে যোগমায়া এমন অসঙ্কোচে কথা বলিতে পারে না। পিসিমাকে সে সত্যই ভালবাসে।

পিসিমা বলিলেন, ধর চচ্চড়ি রাঁধতে কি কি মশলা দিতে হয়। সরষে বাটা, লঙ্কা বাটা—

যোগমায়ার ভাগ্য ভাল—শাশুড়ী এক দিনও তাহাকে হেঁসেল-ধারে ঘেঁষিতে দিলেন না। যোগমায়াও বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না।

রোজই সে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে হরি, শাশুড়ীর শরীর যেন ভাল থাকে। তিনি যেন রন্ধনের ভার যোগমায়ার স্কন্ধে না চাপান। এবার বাপের বাড়ি গিয়া

তাহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে রন্ধনবিদ্যা আয়ত্ত করা। সত্যই তো, এ বিদ্যা জানা না থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকে না।

শ্বশুরবাড়িতে যোগমায়ার মন এবার বসিতেছে না। রামচন্দ্র নাই। কোন্ পোস্ট আপিসে তাহার চাকরি হইয়াছে। আজ এখানে কাল সেখানে বেদের মত টোল ফেলিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। এমন আপিস, ছুটি নাই। যোগমায়া যে এ বাড়িতে আসিয়াছে—সে খবরটাও কি সে পায় নাই? এমন চাকরি না করিলেই বা কি ক্ষতি হইত? শ্বশুরবাড়ি যে এমন খারাপ লাগিতে পারে এ-কথা যোগমায়া পূর্ব্বে একবারও বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে সে ইহার ত্রিসীমানায় পা দিত না।

সকালবেলায় শাশুড়ী বলিলেন, ফুলের সাজিটা নিয়ে ও বাড়ি থেকে চারটি ফুল তুলে আন, বৌমা। জবা, জুঁই, টগর—যা পাও। দুব্বো তুলবে। চারটি আলোচাল ভিজিয়ে অধ্যি থালার একপাশে রাখবে। আহা, আগে এড়া কাপড়খানা ছেড়ে—মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে মটকার শাড়ীখানা পর। আমি ভোগ রাঁধব—গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। যদি পার, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে নিয়ে নৈবিদ্যিগুলোও করে নিও। হাঁ ভাল কথা, সাদা চন্নন, রক্তচন্নন ঘষে রাখবে।

ফুল তুলিয়া যোগমায়া বলিল, আমায় নৈবিদ্যি করা শিখিয়ে দিন না, পিসিমা?

শাশুড়ী বাড়ি নাই। পিসিমার নির্দ্দেশমত আলোচাল ভিজাইয়া পিতলের থালায় চূড়াকৃতি করিয়া যোগমায়া নৈবেদ্য সাজাইতে লাগিল। কলার টুকরা, বাতাবী লেবুর টুকরা, শসার টুকরা, ছোলা মটর ভিজা ইত্যাদি কয়েকটি ফলমূল থালায় ভাগ করিয়া রাখা হইল।

পিসিমা বলিলেন, একটা থালায় লক্ষ্মীর, একটা থালায় নারায়ণের, একটা থালায় কুবের প্যাঁচার—নৈবিদ্যি কর। পঞ্চ দেবতার নবগ্রহের কুচো নৈবিদ্যি ঐ ছোট রিকিবিখানায় কর। চন্নন ঘষে কলাপাতায় রাখ, সিঁদুর গুলে রাখ, আর দুব্বো একটু আলাদা ক'রে রাখ। বাঃ, বেশ হয়েছে। পানি শঙ্খে জল ভরে বাঁ পাশে রাখ, উঁহু ঘণ্টা রাখতে হবে না, লক্ষ্মীপূজোয় ঘণ্টা বাজায় না। পঞ্চপিদীমে তুলোর সলতেগুলো ঘিয়ে ভিজিয়ে দাও। হাঁ, পিলসুজটা মাজা আছে তো? রাখ ঐ কোণের দিকে। একটা কলায় গোটা দুই ধুপ গেঁথে রাখ—পূজোর সময় জেলে দেবে। বাঃ, বেশ পঞ্চমুখী জবাফুল পেয়েছ তো। মা লক্ষ্মীর কি মহিমে, পোষ মাসে, চোত মাসে, ভাদ্দর মাসে যখনই পূজো হয়—জবাফুল যেন আপনি ফোটে।

একটা বড় বাটিতে পিটুলি গুলিয়া ফরসা একখানি ন্যাকড়া তাহাতে ডুবাইয়া পিসিমা আলিপনা দিতে বসিলেন।

যোগমায়া মুগ্ধ নয়নে তাঁহার আলিপনা দেওয়া দেখিতে লাগিল। পিসিমা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তবু তাঁহার দ্রুত সঞ্চরমান করাঙ্গুলির বিচিত্র স্পর্শে কেমন লতাপাতা পদ্মফুল, মরাই প্রভৃতি জন্মলাভ করিতেছে। খোয়া-ওঠা রুক্ষ মেঝে—তবু আলিপনার সৌন্দর্য্যে সে মেঝেকে অপরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।

যোগমায়া মাঝে মা ঝ প্রশ্ন করিতেছে, ঐ মরাইয়ের গায়ে মই আঁকলেন—তার পাশে এক জোড়া পা আঁকলেন কেন?

পিসিমা বলিলেন, মা লক্ষ্মীর ছিচরণ, মা। ওঁর দৌলতেই মানুষের যত কিছু বাড়বৃদ্ধি। জান না তো এ-বাড়ির কথা। এমন এক সময় ছিল—যখন মা লক্ষ্মী উথলে পড়তেন এ-বাড়িতে।

আপনারা দেখেছেন? আগ্রহে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

দেখেছি বৈকি, মা। আমার বাবার আমলেই দোল-দুর্গোচ্ছব দেখেছি, আবার তাঁর আমলেই হাতীতে খাওয়া কদ্‌বেলের মত অবস্থাও দেখলাম। একজন্মে অনেক দেখা হয়েছে, মা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আলিপনা দিতে লাগিলেন। ঘর ছাড়িয়া পিসিমা উঠানে নামিলেন। গোময়লিপ্ত পরিষ্কার উঠান,—সাদা আলিপনা উঠানটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। যোগমায়া নীরবে পিসিমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

খানিক থামিয়া পিসিমা বলিলেন, বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের নামী লোক। এই গেরামের আধখানা ছিল তাঁর—সব নাখরাজ জমি। এক পয়সা খাজনা দিতে হ'ত না। তাঁর টাকা ছিল অনেক, লোককে ধারও দিতেন। দেখছ না, বাড়িখানা আমাদের বনের মধ্যে। তখন ডাকাতের ভয় ছিল কি না, তাই, শত মধ্যিখানে বাড়ি করেছিলেন। পুবদিকে কায়েতদের বাড়ি, উত্তুরে কামারেরা ক-ভাই ছিল, দক্ষিণে দুলে-বাগ্দীরা—তিন-চার ঘর খাজনা-করা পেরজা ছিল আর পশ্চিমে তোমার জেঠ শ্বশুররা থাকতেন। আপন জেঠা নন, পাড়া সম্পর্কে। কিন্তু আপন জনও এমন হয় না। আর ঐ উত্তুর-পশ্চিম

কোণে থাকত বেনেরা। আজ সবাই মরে হেজে গেছে, কেউ বাস উঠিয়ে দেশান্তরী হয়েছে—তাই বনের মাঝখানে বাড়িখানা মনে হয়।

একটু থামিয়া বলিলেন, তিনিই তো চালাঘর ঘুচিয়ে কোঠাঘর তুললেন—দু-খানা। চোরের ভয়ে বেশি দুয়োর-জানালা রাখেন নি। সেকালের কোঠাঘর—কতলোক যে দেখতে আসত। শুধু কি তাই, নীলকুঠির আয় ছিল, গোটা দুই আমবাগান—একটা পুকুর ছিল।

উঠানের আলিপনা প্রায় শেষ করিয়া পিসিমা উত্তর-মুখী হইলেন। এই দিকে বাড়ি ঢুকিবার বড় দরজা। দরজার ঝনকাঠে নক্সা কাটিতে কাটিতে বলিলেন, বাইরে দোল-দুর্গোচ্ছব চালাতেন—ভেতরে ফোঁপরা হয়ে আসছিল। যে-সব গরিব লোক টাকা ধার নিত—সুদ দেওয়া চুলোয় যাক, আসলই শুধতে পারত না। তাঁর ছিল দয়ার শরীল। বলতেন, ওদের পীড়ন করব না, সময় ভাল হ'লে দেবে বৈ কি। আবার এমনি কপাল, পালবাবুদের সঙ্গে মোকদ্দমা করে টাকা হুড়হুড় করে জলের মত বেরিয়ে গেল। বাগান দু-খানাও রক্ষে হ'ল না। নাথরাজ জমি—দলিলপত্র দেখাতে পারলেন না, ওরা দলিল জাল করে ওদের আমবাগানের সঙ্গে আমাদের আমবাগান দুটোও এক করে নিল। দেনার দায়ে পুকুর বিকুলো, শুধু নীলকুঠি রইল। বেচবার উপায় ছিল না বলে।

কেন?

ও যে সায়েবদের মৌরসীপাট্টা দেওয়া। খাজনা ছাড়া ওর উপস্বত্ব পাবার জো ছিল না। সায়েবরা ভারি গোঁয়ার—নামমাত্র খাজনা দিত—সে জমি কিনতে চাইল না।

দুয়ারের বাহিরে গোময়লিপ্ত জমির উপর বড় মরাই আঁকিতে আঁকিতে তিনি বলিলেন, তার পর শোন, মা। বাবা শোক সামলাতে পারলেন না। বিছানায় পড়লেন। সেই শোওয়াই তাঁর শেষ শোওয়া। মরবার আগে বললেন, সদু, তোদের আমি পথে বসিয়ে চললাম, মা।

অতীত কথা স্মরণে পিসিমার চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। আঁচলে চোখ মুছিয়া ধরা গলায় তিনি বলিতে লাগিলেন, বাবার মিত্যুর পর আমাদের অগ্নিপরীক্ষে আরম্ভ হ'ল, মা। পানু—তোমার শ্বশুর—তখন পাঁচ বছরের, আমার বয়েস দশ। মা একলা বিধবা মানুষ—কি করেন। বাপের বাড়ি থেকে দিদিমা এসে মেয়ে আগলাতে লাগলেন। আমার শ্বশুর ছিলেন দেবতুল্যি লোক, উনি বুক দিয়ে না পড়লে বাড়িঘর কিছুই রক্ষে হ'ত না।

তার পর?

আর তো কিছু রইলো না, নীলকুঠির চব্বিশ-পঁচিশ টাকা খাজনা বছরে পাওয়া যেত। তাই কি সায়েব সহজে দিত! যে বজ্জাত ওরা। চাবুক মারব বলে ভয় দেখাত, কুকুর লেলিয়ে দিত। বলত, ভাগো, নেই মিলেগা।

তবে টাকা আসত কি করে!

আমার শ্বশুর আদায় করতে পারতেন না। বাবাও তার আগে আনতে পারেন নি এক বছর। চার-পাঁচ বছরের খাজনা বাকি ছিল। আমার শ্বশুর খুব চালাক ছিলেন। তোমার শ্বশুরের বয়েস তখন ছ' বছর। এক দিন মতলব করলেন কি, ওকে দিয়েই খাজনা আদায় করবেন। যে মতলব সেই কাজ। নীলকুঠির বাইরে একটা গাছ তলায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর তোমার শ্বশুর ওই ছ' বছরের ছেলে কুঠিতে ঢুকতো। সায়েবরা ভয় দেখাত, কুকুর লেলিয়ে দিত—সে ভয় না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত—এক ধারে। শেখান ছিল কিনা—টাকা না নিয়ে নড়বি নে। সায়েবরা খুশী হয়ে হা—হা করে হাসতো। বলতো, কি চাই বাবু? তোমার শ্বশুর বলতো, খাজনা। সায়েব বলতো, খাজনা কি হবে, একটা মাছ নিয়ে যাও। ছেলেমানুষ তো। মাছ দিয়ে ভুলিয়ে ওরা তোমার শ্বশুরকে ফেরত পাঠাত। মাছ দেখে আমার শ্বশুর বলতেন, আর এক বার যাও ধন, বলগে—ঘরে টাকা নেই, শুধু মাছ খাব কি দিয়ে? তোমার শ্বশুর আবার যেতেন। কথা শুনে সায়েবরা খুশী হয়ে এক সঙ্গে দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিত। ছোট ছোট ছেলেকে ওরা ভারি ভালবাসে কিনা!

পিসিমার গল্প হয়ত আরও খানিকক্ষণ চলিত। কিন্তু গঙ্গাস্নান সারিয়া শাশুড়ী আসিয়া পড়িবেন—এই আশঙ্কায় দুই জনেই তাড়াতাড়ি অন্যান্য কাজগুলি সারিতে লাগিলেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে পিসিমা সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, সে এক দিন গেছে, মা। চার দিকের পাঁচীল ভেঙে ইঁট বিক্রী করে মা আমার নাবালক মানুষ করেছিলেন। তোমার বিয়ের পর সেই পাঁচীল আবার উঠলো। তাও ধারকর্জ্জে—

পিসিমা হঠাৎ থামিয়া গেলেন। নূতন বধূ ও বালিকা-বধূর কাছে অনেকখানিই তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

তাহাকে দুঃখের মধ্যে আর টানিয়া আনা কেন? ছেলেমানুষ, কিছুই হয়ত বুঝিবে না, মাঝে হইতে মন খারাপ করিয়া বসিবে।

শাশুড়ী গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া পিসিমাকে বলিলেন, ঠাকুরঝি, গোবিন্দর মা, হরিপদর পিসি, আর দ্বারিকের বৌকে বলা হয়েছে তো? অড়র ডালের খিচুড়ী—পাচ রকম ভাজা ভুজি—আর একটু পায়েস নামিয়ে তাড়াতাড়ি ভোগের ব্যবস্থা করি। পুরুতঠাকুর কি আর দু-বার করে নারায়ণ নিয়ে আসবেন? আজ তো অনেক বাড়িতেই পূজো আছে।

সকাল হইতেই বেশ লাগিতেছে যোগমায়ার। কাজের তাড়ায়, একটা নূতন কিছু দেখিবার আগ্রহে—ভাদ্র মাসের চড়া রৌদ্রকেও পিঠ পাতিয়া খুশী মনে গ্রহণ করিতে ভালই লাগিতেছে।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গোবিন্দর মা ও হরিপদর পিসি পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। তাঁহারা বিধবা মানুষ; শুদ্ধাচারে পূজার দ্রব্যসামগ্রী এটা-ওটা আগাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেছেন। পুরোহিতের জন্য এক ঘটি জল ও গামছা রোয়াকের যেখানে ছায়া পড়িয়াছে সেইখানটায় রাখা হইল। নারিকেল-ছোবড়ায় আগুন দিয়া ধুনুচির মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইল, পিলসুজের উপর প্রদীপও জ্বলিল। চন্দন, ফুল, ধূপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি মিলিয়া বেশ একটি স্নিগ্ধ ও পবিত্র গন্ধ পূজাগৃহ হইতে বাহির হইতেছে। মালক্ষ্মী এমন শুচিশুভ্রতার মধ্যে কেনই বা নিজের আসনখানি বিছাইয়া পূজার দিনটিকে সার্থক করিবেন না?

পূজা তখন বসিয়া গিয়াছে। প্রতিমা না থাকিলেও লক্ষ্মীদেবী বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত। আলিপনা-দেওয়া জলচৌকির উপর একটি কাঠায় ধান উপচাইয়া পড়িতেছে। চৌকির সমস্তটাই সেই উপচিত ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে। বিচিত্র বর্ণের বড় বড় সামুদ্রিক কড়ি ও কাঠের নানা আকৃতির সিঁন্দুর-মাখানো কৌটা চৌকির উপর সাজানো রহিয়াছে। একখানি ছোট লাল চেলি কাঠার উপর ঢাকিয়া দিয়া মা-লক্ষ্মীকে অবগুণ্ঠনবতী করা হইয়াছে। চেলির উপর অর্থাৎ সিঁথিতে একটি পঞ্চমুখী জবা শোভা পাইতেছে। একটি সিঁদুর-মাখানো মোহর—(টাকাও হইতে পারে, কারণ সিন্দুরচর্চ্চিত হইয়া সেটির গাত্রবর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে), পঞ্চমুখী জবার পাশে সযত্নে সাজানো আছে। ধূপধুনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং সদ্যরন্ধিত খিচুড়ির সুগন্ধেও সে ঘর আমোদিত হইয়াছে। বিধবারা নাকে কাপড় চাপিয়া লুব্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কঠোর ভাবেই শাসন করিতেছেন। ঠাকুরের ভোগের আগে ঘ্রাণ লওয়া নাকি প্রথাবহির্ভূত। পিসিমা পাশে বসিয়া ধুনুচির মুখে একখানি আধভাঙা পাখা দিয়া বাম হাতে বাতাস করিতেছেন ও মাঝে মাঝে ডান হাতের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধ অঙ্গুলির সাহায্যে অল্প পরিমাণ ধুনা উঠাইয়া ধুনুচিতে নিক্ষেপ করিতেছেন। শাশুড়ী ও-পাশে বসিয়া সঙ্কল্পের পূর্ব্বে নাম, গোত্র ইত্যাদি বলিতেছেন; কখনও বা পুরোহিতকে কোন্ দেবতার কোন্ নৈবেদ্য বা খিচুড়ি ভোগ দেখাইয়া দিতেছেন।

এমন সময় 'কি গো রামের মা' বলিতে বলিতে বিনোদিনী ওরফে দ্বারিক গাঙ্গুলীর বৌ আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি একা নহেন, সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী এক বধূও আসিয়াছে।

শাশুড়ী যোগমায়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আসন পেতে ওদের ও-ঘরে বসাও না, বৌমা। ওটি অনুকূলের বউ বুঝি? আহা থাক, থাক, এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি, জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে থাক, পাকাচুলে সিঁদুর পর—

যোগমায়ার নির্দ্দেশমত উঁহারা এ ঘরে আসিলেন। গৃহিণীর দেহ মেদবাহুল্যে ভারাক্রান্ত; তার উপর মোটা মোটা গহনায় ও চওড়া পাড় শাড়িতে তাঁহার গৌরবর্ণ খুলিয়াছে ভাল। বয়সকালে তিনি সুন্দরী ছিলেন এবং স্বাস্থ্যবতীও ছিলেন। তবে সৌন্দর্য্যের নমুনা যদি গৌরবর্ণ ও মেদময়তাকে যদি স্বাস্থ্য বলা যায়, তবে এখনও—এই চল্লিশের অপর প্রান্তে পৌঁছিয়াও তিনি সে খ্যাতি হারান নাই বলিতে হইবে। নাক চোখ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত, তেমনি মিশমিশে কালো চুলে প্রকাণ্ড খোঁপা বাঁধা। বউটিকে তাঁহার পাশে মানায় নাই; তেমন বর্ণ থাকিলেও,—স্বাস্থ্যও নাই; উপরন্তু রোগা বলিয়া যে কয়খানি গহনা হাতে বা গায়ে আছে—তাহা গৌরবের না হইয়া দেহের ভারই বাড়াইয়াছে। ঘোমটা-ঢাকা মুখখানিও কেমন যেন মলিন।

বিনোদিনী বলিলেন, তোমরা দু'টিতে বসে গল্প কর, মা। আমি পূজোটা দেখে আসি। লজ্জা কি, একবয়সী তোমরা—ভাবসাব কর।

তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে যোগমায়া ধীরে ধীরে বউটির অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার নামটি কি ভাই?

রাধারাণী। তোমার নাম?

যোগমায়া। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপের বাড়ি?

গয়েশপুর। গয়েশপুরের ত্রৈলোক্য বাঁড়ুজ্জে আমার বাবা। নাম শোন নি তাঁর?

না তো।

তিনি যে ভাল যাত্রার দল খুলেছেন। এ তল্লাটে বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের দলের নাম জানে না—হেন লোক নেই। তাইত বাঁড়ুজ্জে না বলে সবাই বলে অধিকারী।

বাঃ। তুমি এবার নিয়ে কবার শ্বশুরবাড়ি এসেছ?

তা বার তিনেক হবে।

আমিও। তোমার বর কি করে ভাই?

কি আবার করবে, টো টো করে বেড়ায়! বলে তোমার বাবার দলে আমি পালা লিখে দেব। সুন্দর গান বাঁধতে পারে, ভাই।

সত্যি? কবির গান বাঁধতে পারে তোমার বর?

হুঁ। আমাকে নিয়ে সেদিন কেমন ছড়া তৈরি করলে!

বলবে ভাই ছড়াটা?

আমার ভাই সবটা মনে নেই। যদি খানিকটা শোন তো বলতে পারি।

বেশ ত, বল না।

রাধারাণী আবৃত্তি করিল:

কদমতলায় দাঁড়িয়ে কেন রাধা?
বাঁশীর ডাকে মন যে তোমার বাঁধা।
সাঁজের বেলায় জল আনিতে চল,
থির যমুনার অতল কালো জল
তোমায় ডাকে - আমায় ডাকে প্রিয়ে
ঘর ছেড়ে তাই বাইরে এসো ধেয়ে।

আর আমার মনে নেই।

তুমি ভাই গান জান?

দূর গান গাইতে আছে শ্বশুরবাড়ি! সবাই নিন্দে করবে না!

তোমার বর বাসরঘরে গান গেয়েছিল?

কি জানি, মনে নেই। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে দেখি, রাঙা ঠান্দি ভাঙ্গা গলায় গান ধরেছেন।

আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, আর একটা কথা বলব ভাই কানে কানে!

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, কি কথা? বরের কথা বুঝি?

যোগমায়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, হাঁ।

রাধারাণী বলিল, তোমাকেও কিন্তু বলতে হবে ভাই। ফাঁকি দিয়ে যে আমার কথাটি শুনে নেবে—

ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই নববধূতে কথা আরম্ভ হইল। ঘরের দেওয়ালের কান থাকিলেও সে কথা শোনা দুষ্কর। কিন্তু গুরুজনে ভরা বাড়ি, ইহারা নবাগত প্রাণী এবং আলোচনাটিও এমন একটি ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাকে রাত্রির নিরালা মুহূর্তে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা, সুতরাং সে অন্তরের কথাকে দরদী অন্তর ভিন্ন মেলিয়া ধরিবার উপায়ই বা কই?

পূজা শেষ হইলেও দুই বধূর অজস্র উৎসারিত কথার শেষ যেন আর হয় না। রাধারাণীর অভিজ্ঞতা বিচিত্র, যোগমায়ার চেয়ে সে বছর দুইয়ের বড় হইবে। তাহার কথাই যোগমায়াকে শুনিতে হইল সর্বক্ষণ। এবং তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, উহাদের ভালবাসাই সার্থক। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব যে ভালবাসার বিন্দুবাষ্পও যোগমায়া জানে না, রাধারাণীর অন্তর তাহারই ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। যে-উজ্জ্বল আলোকে রাধারাণীর নবীন জীবনের গতি আরম্ভ হইয়াছে—তাহারই বৃহৎ ও গাঢ় ছায়ার তলে যোগমায়া এখনও সুপ্তিমগ্ন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। জানালা দিয়া উঠানের আমকাঁঠাল গাছ সেই আলোয় অদ্ভুত দেখাইতেছে। কাঁঠালের অতি মসৃণ পাতায় জ্যোৎস্না যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে। গুমোটভরা ভাদ্রমাস, হাওয়া কোথাও নাই। উঠানের সাদা আলিপনা জ্যোৎস্নার শুভ্রতায় মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হয় নাই। শাখাজালনিবদ্ধ আমকাঁঠালের নিবিড় ছায়ার ফাঁকে উপরের যে খণ্ড খণ্ড আলো উঠানটিতে নূতন আলিপনা আঁকিয়াছে—তাহারই কোণে ওবেলাকার আলিপনা নবরূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যোগমায়া অন্য দিন ঘুমাইয়া পড়ে, আজ সে জাগিয়া জাগিয়া আকাশের গায়ে চাঁদের দৌড়াদৌড়ি দেখিতেছে, গাছের পত্রান্তরালে পলাতক অন্ধকারের গাঢ়তা লক্ষ্য করিতেছে এবং নবপরিচিতা বউটির কথাও ভাবিতেছে। অন্তরের দৈন্য বাহিরের বেশভূষায় সব সময়েই কি প্রকটিত হয়? কথা কহিবার সময় বউটির মুখের মালিন্য কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর কথা বলিতে বলিতে সে মুখ প্রভাতের পদ্মফুলের মতই প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া পালা গান বেঁধে—তাহাকে কত

প্রকারে আদর করে—সর্বক্ষণ (মানে সারারাত্রি) সঙ্গ দিয়া কৌতুক হাসিতে সময় কাটাইয়া দেয়।

যোগমায়া সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিল। আঁচলের গ্রন্থি হইতে চাবি লইয়া বাপের বাড়ির দেওয়া কাঠের বাক্সটি খুলিল। অন্ধকারে খানিকটা এধার-ওধার হাতড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজে তাহার হাত ঠেকিল। একখানি চিঠি। সুবাসে ভরা। বিলাতী এসেন্সের উগ্র গন্ধে মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বেশ তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ। চিঠির কাগজ নাকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সেই গন্ধের তীব্রতাকে যোগমায়া মস্তিষ্ক দিয়া সারা দেহে সঞ্চারিত করিয়া দিল। ধীরে ধীরে আবার সে বাক্স বন্ধ করিল। রাত্রিতে আলো জ্বালা নিষেধ। নিষেধ না থাকিলেও শাশুড়ী জাগিয়া উঠিতে পারেন। কাল মধ্যাহ্নে কিংবা সকালের কোন এক নিরালা মুহূর্তে চিঠিখানি আর একবার সে পড়িবে।

বৎসরখানেক হইল যোগমায়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে।

কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিলেই কিছু চিঠির উত্তর দেওয়া চলে না। এই সব উচ্ছ্বাসভরা কথার অর্থ যোগমায়ার হৃদয়ঙ্গম হয় না। বেশ সোজা কথায় লিখিলেই তো হয়—তুমি কেমন আছ? প্রাণ সত্যই কিছু তাহার ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হয় নাই। প্রাণের অস্থিরতা তখনই বৃদ্ধি পায়—বাপের বাড়ি হইতে অনেক দিন যদি কোন সংবাদ না আসে। অগ্রহায়ণে যোগমায়া বাপের বাড়ি যাইবে। নলেন গুড়ের সন্দেশ ও নিখুঁতি সঙ্গে না দিয়া বউ পাঠাইলে নাকি শাশুড়ীর নিন্দা রটিবে। বেশ তো, কালই যদি অগ্রহায়ণ আসে তো মন্দ কি!

স্বামীর চিঠি আজ চার দিন পড়িয়া আছে। পড়া হইয়াছে, ভাল মানে বুঝা যায় নাই। শাশুড়ী বা পিস্‌-শাশুড়ীর কাছে ত চিঠির পাঠ বুঝাইয়া লওয়া চলে না। শীঘ্র করিয়া অগ্রহায়ণ না আসিলে যোগমায়ার চলে কি করিয়া? সে ব্যক্তিটি হয়ত ভাবিবে, এমন বউ তাহার যে চিঠির উত্তর দিবার বিদ্যাটুকুও সঞ্চয় করে নাই। হাঁ, ছিল বটে বিবাহের সময়, বর্ণপরিচয়ের বোধ তাহার ছিল না। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে যুক্তাক্ষরের জাল ভেদ করিয়া যোগমায়া যে বাংলা ভাষার মনোরম উদ্যান-সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছে—সে সংবাদ তো রামচন্দ্র জানে না!

রাধারাণীর সঙ্গে ভাব হইবার পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছে, বুঝি বিধাতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে দুই বৎসরের বড়, সে অনেক জানে। কবিতা দিয়া চিঠিও হয়ত লিখিয়া দিতে পারে। না-হয় একখানা গানও তো দিতে পারিবে। কিন্তু কেমন করিয়া রাধারাণীর সঙ্গে আবার তাহার দেখা হইবে? উপলক্ষ্য একটা কিছু চাই। লক্ষ্মী পূজা কালই তো হইবে না। কিংবা শাশুড়ীর অনুমতি না পাইলে রাধারাণীও এখানে আসিতে পারিবে না। বাপের বাড়ি হইলে এই রাত্রিতেই এক দৌড়ে সে রাধারাণীর দুয়ারে ধাক্কা মারিয়া ডাকিত, ও রাধুদিদি, দুয়োর খোল না গো? ও দিদি—

বউমা, বউমা, অমন গোঁ গোঁ করছ কেন? শাশুড়ী তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিলেন। যোগমায়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। সবটাই স্বপ্ন? না তো! নাকে সেই ভুরভুরে মিষ্ট গন্ধটা এখনও যেন লাগিয়া আছে, আর হাতের মুঠায় সেই চিঠিখানা। কি লজ্জার কথা! তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়ের মধ্যে চিঠিখানাকে চালান করিয়া দিয়া যোগমায়া নিদ্রাকাতর কণ্ঠে কহিল, উঃ, না তো।

পাশ ফিরে শোও। খারাপ স্বপন দেখলে গোবিন্দ—গোবিন্দ বলবে। বলিতে বলিতে শাশুড়ী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যোগমায়া ঠিক করিল, রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করিবার কথা একবার পিসিমাকে বলিলে কেমন হয়। কালই সে সে-কথা পিসিমাকে বলিবে।

পিসিমার চেষ্টায় দু'টি বউয়ের মিলন ঘটিল। বেলা তিনটা; খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। আহারের পর শাশুড়ী একটু গড়াইয়া লন। মেঝেয় আঁচল পাতিয়া তিনি আলস্য উপভোগ করিতেছেন। পাশের ঘরে দুই বউ মিলিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছে। দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরখানিতে পিসিমা ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে চরকা কাটিতেছেন। দুপুরের রৌদ্র যখন তীব্র হইয়া উঠে, আকাশে চিলের ডাক ও জলটুনটুনি পাখীর টুনটুন্ শব্দ সেই নিস্তব্ধ দুপুরের বুকে ভারি মিষ্ট শোনায়, আর মিষ্ট লাগে চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ। যেন কয়েকটা কালো ভোমরা অশ্রান্তভাবে পাখার গুঞ্জন তুলিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চোখে নিদ্রার কালো কাজলরেখা টানিয়া দেয়।

রাধারাণী বলিল, কই তোমার চিঠি, দেখি?

আঁচলের প্রান্ত হইতে সন্তর্পণে চিঠিখানি খুলিয়া যোগমায়া রাধারাণীর হাতে দিল।

রাধারাণী চিঠিখানি নাকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া
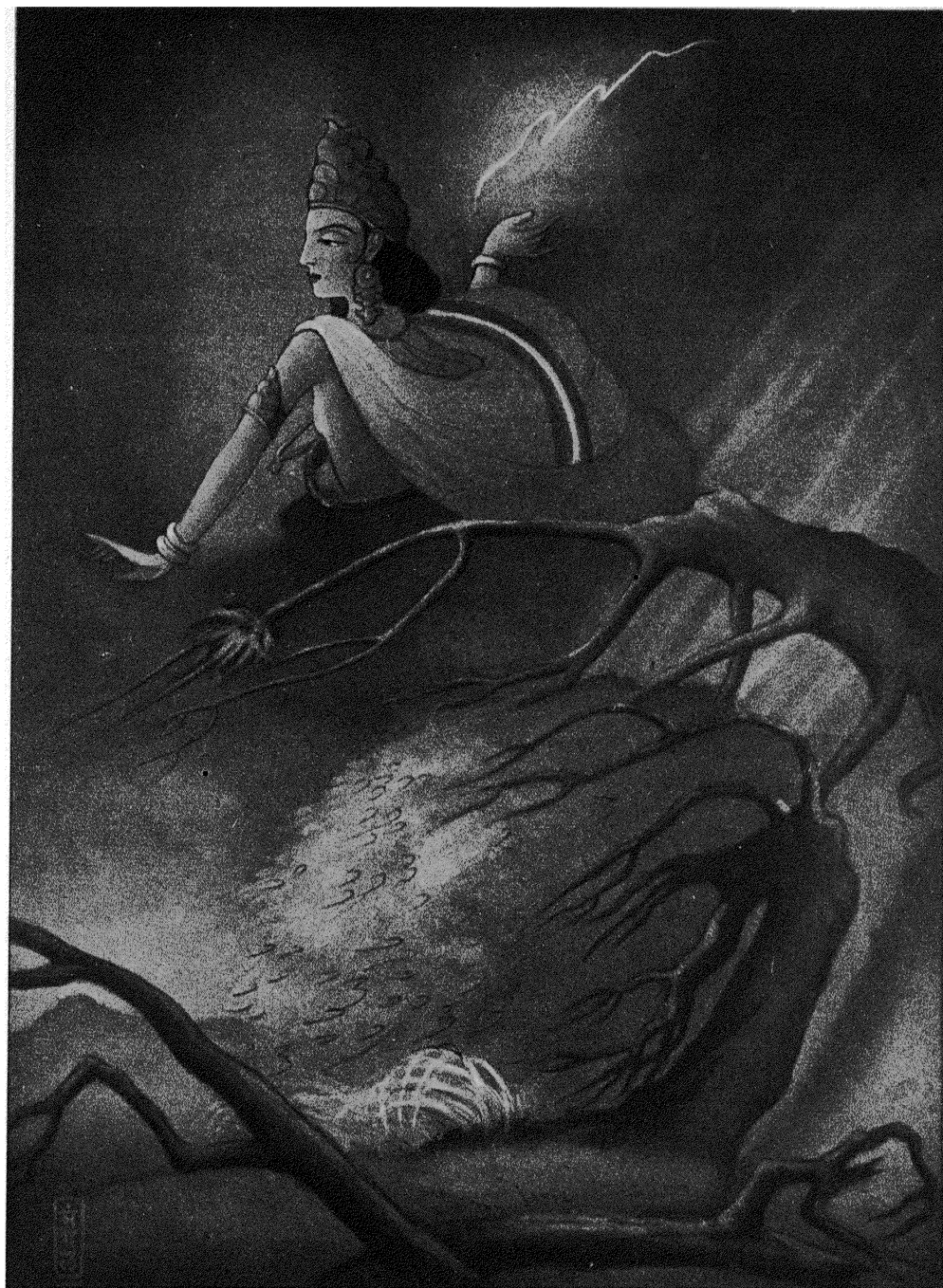
মল্লার

কুমার মঙ্গল সিংজী (লাঠী)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বলিল, বেশ মিষ্টি গন্ধ তোমার বর বুঝি এসেন্ ভালবাসে?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

চিঠি খুলিয়া রাধারাণী পড়িতে লাগিল। এক এক লাইন পড়ে—আর মুখচোখ তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কামারের হাপরে ভস্ত্রার চাপে যেমন আগুনের হাসি দেখা যায়। এক সময়ে সে হাসিতে হাসিতে যোগমায়ার গায়ে লুটাইয়া পড়িল, কহিল, মা গো মা, তোমার বরটি ভারি বেহায়া।

কেন? কেন? চিঠির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

এই দেখ না, এইখানটায় কি লিখেছে তা ভালবাসে বটে, তোমাকে খুব ভালবাসে।

যোগমায়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, তা অত কথা কি লিখেছে?

ওই ভালবাসারই কথা। আমিও সব মানে ভাল বুঝতে পারি নে, উনি পড়লে ঠিক বলে দেবেন।

দূর! যোগমায়া চিঠিখানি তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল।

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, আমি যেন তাকে এখনই দেখাচ্ছি আর কি! ইস্, ভয় দেখ না মেয়ের!

না ভয় করে না বুঝি? তোমার চিঠি দেখাতে পার ওদের?

আমার তো চিঠি নেই। কাছেই বাপের বাড়ি, উনিও বিদেশে যান নি কখনও, চিঠি কোথায় পাব ভাই? একখানিও চিঠি না থাকার দুঃখে রাধারাণী মুখখানা ম্লান করিয়া রহিল।

যোগমায়া বলিল, তাহ'লে উত্তুর লেখাব কাকে দিয়ে, ভাই?

কেন, চিঠি পাই নি বলে—তোমার উত্তুরটাও লিখে দিতে পারব না? দেখি কাগজ কলম?

যোগমায়া কাগজ, কলম ও বালির পুঁটুলি আগাইয়া দিল। রাধারাণী পত্র রচনায় মনোনিবেশ করিল। অনেকখানি সময় লাগিল পত্র রচনায়। রোয়াকের রোদ সরিয়া গেল, ও-বাড়ীর সজিনা গাছের অন্তরালে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এখনই শাশুড়ী জাগিয়া উঠিবেন। হে হরি, আর খানিকক্ষণ যেন উঁহার নিদ্রা না ভাঙ্গে! মাঝে মাঝে সে রাধারাণীকে তাড়া দিতে লাগিল, হ'ল ভাই, বড্ড দেরি করছ, মা এখুনি উঠে পড়বেন!

এই হ'ল। বলিয়া রাধারাণী পড়িল, ইতি সেবিকা তোমার শ্রীচরণের দাসী—সবটা পড়ব? পড়

যোগমায়ার ভালই লাগিল পত্র। রাধারাণীর লিখিবার ক্ষমতা আছে। চিঠির মধ্যে ভালবাসার কথা আছে অনেক বার, ছড়া আছে দু'টি, একটি গানের দেড়খানি লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে এবং আর যাহা আছে তাহা সত্যই দুর্ব্বোধ্য। চাঁদ, বসন্তকাল, মলয় পবন, প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলা এমনি আরও অনেক কথা। যেমন উনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তেমনই জবাব দিতেছে যোগমায়া।

রাধারাণী খামের মধ্যে চিঠি পুরিতে পুরিতে বলিল, ইংরিজী ঠিকানা যে আমি লিখতে জানি নে ভাই। ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে দেব, কেমন?

কিন্তু তোমার বর যদি চিঠি পড়েন?

দূর, তোমার চিঠি সে পড়বে কেন।

না ভাই, আমার মাথা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর—এ চিঠি তাঁকে পড়তে দেবে না।

না না না। হল তো? রাধারাণী উঠিল।

আবার কবে আসবে ভাই?

আর দু-এক দিন পরে। কই ভাই, তোমার পিসিমাকে বল আমায় পৌঁছে দিয়ে আসুন।

পত্রের উত্তর শীঘ্রই আসিল। পিওন চিঠি বিলি করিবার কালে হাঁক দিল, আপনাদের চিঠি রৈল গো মাঠাকরুন।

যোগমায়ার শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চিঠিখানি চৌকাঠের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন। চিঠির আকৃতি দেখিয়া তিনি হাঁকিলেন, ও বউমা, রাম বোধ হয় চিঠি দিয়েছে। দেখত মা।

লজ্জায় যোগমায়া বাহির হইতে পারিল না। স্বামীর চিঠি কি শাশুড়ীর হাত হইতে লওয়া যায়?

যে ঘরে বসিয়া যোগমায়া কুটনা কুটিতেছিল, তাহার দ্বারপ্রান্তে চিঠিখানি রাখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, কেমন আছে একবার জানিও বৌমা। ডালটা না সাঁতলালে এখনই ধরে পুড়ে যাবে।

পুষ্পসার সুরভিত চিঠি। সেই পরিচিত গন্ধ, তেমনই তীব্র অথচ মধুর। খামখানাও ভারি ভারি বোধ হইতেছে।

আলুর খোসা ছাড়ানো শেষ হইলে যোগমায়া চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িল। অদ্ভুত চিঠি। কতকগুলি কবিতা, গান ও দুর্ব্বোধ্য কথার সমষ্টি। অতবড় পত্র যোগমায়া বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। লেখকের কুশল-সংবাদ কিছু নাই! যেমন পত্র দিয়াছিল যোগমায়া, তেমনই কঠিন তার প্রত্যুত্তর। রাধারাণীর লিপিকুশলতার সুযোগ লইয়া

রামচন্দ্র রীতিমত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে যে শারীরিক কেমন আছে, সে সংবাদটিও দিতে ভুলিয়াছে। মনের অবস্থা তাহার শোচনীয়—হয় ত শরীরটা খারাপ বলিয়া।

শাশুড়ী রান্নাঘর হইতে হাঁকিলেন, রাম কেমন আছে, বৌমা?

চিঠি হাতে যোগমায়া রান্নঘরের দুয়ারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, ভাল।

হুঁ, আর কিছু লেখে নি?

না।

তা লিখবে কেন, সেই যে কথায় বলে, 'পরের হুলো খায়, আর বনের পানে চায়।' এও হয়েছে ঠিক তাই। মাকে এক ছত্তর লিখে পেরনাম জানাতে তার হাত ব্যথা করে বুঝি?

কঠিন অভিযোগ। যোগমায়া অপরাধিনীর মত সরিয়া আসিল। শাশুড়ী সজোরে খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে আরও কি সব মন্তব্য করিলেন—তাহা সে শুনিতে পাইল না।

খানিক পরে শাশুড়ী ডাকিলেন, আলু কোটা হ'ল? একটা বাটিতে কোটা আলু আনিয়া যোগমায়া উনানের কাছে নামাইয়া দিল।

শাশুড়ী বলিলেন, আঃ আমার পোড়া কপাল! আলু-গুলো না ধুয়েই হেঁসেলে ঠেকালে? বলে, 'আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!'

যোগমায়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী বলিলেন, এক কাজ কর, ওই ঘটিতে জল আছে—আলগোছে বাটিতে একটু ঢেলে দাও। বেগুন কোটনি তো—বেগুন? থাক, কাল হবে।

আজ স্নান করিতে গিয়া যোগমায়ার জলের বালতি ভাল করিয়া ধোওয়া হইল না। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা পরিমাণে কম হওয়াতে শাশুড়ী শুচিশীলতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা যোগমায়াকে শুনাইলেন। খাইতে বসিয়া জলের ঘটি আলগোছে মুখে তুলিতে গিয়া ঠোঁটে ঠেকিয়া গেল। শাশুড়ীর কড়া মন্তব্যে কি দুর্ব্বোধ্য চিঠির আক্রমণে যোগমায়ার আজ সব গোলমাল হইয়া পড়িতেছে, কে জানে! চিঠিটা যদি সব সে বুঝিতে পারিত তো এত হাঙ্গামা বাধিত না। চিঠিটা পাইয়াই তার রাধারাণীর কথা মনে পড়িতেছে, এবং কি করিয়া তাহার সঙ্গে দুপুরের নিরালা মুহূর্ত্তে আর একবার সাক্ষাৎ করা চলে সেই কল্পনাতেই সে মাতিয়া উঠিয়াছে। পিসিমাকে বার-বার অনুরোধ করিলে তিনি যদি বেহায়া মনে করেন বধূকে? হায়রে, বধূজীবন! বাপের বাড়ি থাকিলে এ দুর্ভোগ তাহাকে ভুগিতে হইত না। ক্রমশঃ

নির্জ্জন

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আমার নির্জ্জন-মাঝে সজনের বাসা,
নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলি ওঠে ভ'রে ভ'রে
স্মৃতিরসে তাহাদের—যাহাদের ভাষা
শবদের বৃন্ত হতে গেছে ঝ'রে ঝ'রে।
নির্জ্জনের দ্বারে মোর স্তব্ধ করাঘাতে
এসে ভিড় করে তারা যারা গেছে চ'লে—
কেহ বিচ্ছেদের দুখে পূর্ণিমার রাতে
কেহ অভাবিত ক্ষণে কিছু নাহি ব'লে।

হাসি অশ্রু সাথে লয়ে, লয়ে দুঃখ সুখ
অঙ্গনে এসেছে তারা, অতীতের দিন
দলে দলে এলো চ'লে শব্দহীন মূক,—
নির্জ্জনের শূন্য ভরি বাজাইছে বীণ।
কাছে যারা দূরে তারা যায় এ নির্জ্জনে,
দূরে যারা কাছে আসে বক্ষের গোপনে।

বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

"To find a new vision of the world, a new path to truth is the instinct of the artist or the thinker. He changes the whole system of our organised perceptions."

"শিল্পীর অথবা ভাবুকের মনের সহজ গতি হচ্ছে একটা নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা, সত্যে উপনীত হবার একটা নূতন পথ আবিষ্কার করা। আমাদের সমস্ত চিন্তার ধারাকে তিনি একটা নূতন পথে চালিয়ে দেন।"

প্রথিতযশা পণ্ডিত হ্যাভেলক এলিস শিল্পী অথবা ভাবুকের এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। এঁদের কথা ছেঁদো কথা নয়—নতুন কথা যার মধ্যে লক্‌লক্ করে আগুনের শিখা। এঁরা দশের প্রতিধ্বনি নন—এঁরা বহু জনের মধ্যে একা। আর মানুষের ইতিহাসে বারে বারে যুগান্তর এনেছে তাঁদেরই অগ্নিগর্ভ বাণী যাঁরা সমসাময়িক কালের কাছ থেকে পেয়ে গেছেন শুধু আঘাতের পর আঘাত—যাঁদের গান তখনকার দিনের লোকের কানে বেতালা ব'লেই মনে হয়েছে—যাঁহাদিগকে জনসাধারণ অদ্ভুত মনে করেছে। অদ্ভুত যে মনে করেছে—তার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা যে-সব আদর্শকে অন্তরের বেদীতে বসিয়ে পুরুষানুক্রমে পূজা ক'রে এসেছি—প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক অথবা ভাবুকেরা এসে সেই আদর্শগুলিকে অবজ্ঞা করেছেন; আমাদের কাছে যা পর্ব্বত ব'লে মনে হয়েছে তাঁরা এসে তাকে উয়ের ঢিবির পর্য্যায়ে ফেলেছেন; আমরা যাকে উয়ের ঢিবির মতন অবজ্ঞা ক'রে এসেছি তাঁরা এসে তাকে পর্ব্বত ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'পুঁথির কথা কইনে মোরা উল্টো কথাই কই'—যুগে যুগে 'জীনিয়াস্'দের কণ্ঠ থেকে এই বাণীই উৎসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ রকম অবস্থায় যা ঘটা স্বাভাবিক যুগে যুগে জীনিয়াসদের ভাগ্যে তাই ঘটেছে, অর্থাৎ লোকের আত্মাভিমানে তাঁদের উল্টো কথা যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে এবং ফলে তাঁহাদিগকে ভোগ করতে হয়েছে যথেষ্ট বিড়ম্বনা। প্রত্যেক যুগেই মানুষ তখনকার দিনের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অথবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়। তাদের আদৌ কোনো মূল্য আছে কি না—এ প্রশ্ন তার মনে কখনো ওঠেই না। চিনেমাটির প্লেটে গরম দুধ রাখা হয়েছে। বেড়ালের বাচ্চা সেই দুধ জিব দিয়ে চক্ চক্ ক'রে খায়। চিনেমাটির কথা সে কিছু জানে না। গোরু গোয়ালে খোল আর বিচুলি গলাধঃকরণ করে। কোথা থেকে খোল আর বিচুলি এল—এ প্রশ্ন তার মাথায় কখনো আসে না। আমরা মনুষ্যনামধারী জীবেরাও যা পাই সরল বিশ্বাসে তাকে গ্রহণ করি—তার ভালমন্দ বিচার ক'রে খতিয়ে দেখতে যাই নে। আমাদের সকাল বেলার চা-রুটী, আমাদের রেলগাড়ী, টেলিফোন, সিনেমা, নীতির অনুশাসন, আদর্শের মাপকাঠি—এগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যে সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বেড়ে উঠি তারই রঙে আমাদের চিত্ত আপনা থেকেই রাঙিয়ে যায়। ইতিমধ্যে কেউ যদি এসে আমাদের ধারণাগুলিকে পাল্‌টিয়ে ফেলতে বলে—আমরা তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাই এবং মনে মনে তার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠি। আমাদের আদর্শগুলি আমাদের কাছে পুত্রকন্যার সামিল হয়ে ওঠে ব'লেই তাদের সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। আমাদের কানা ছেলেকে কেউ কানা বললে অথবা খোঁড়া মেয়েকে কেউ খোঁড়া বললে যেমন সেই সমালোচনা আমাদের কাছে অপ্রীতিকর লাগে—আমাদের মনের কোণের সযত্নে লালিত ধারণাগুলির কেউ বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেও আমরা তেমনই আঘাত পাই। আমরা প্রশ্নকারীকে সমাজের শত্রু ব'লে মনে করি; তাকে ক্রুশ কাঠে দোলাই, অগ্নিশিখায় পোড়াই, পাথর ছুড়ে মারি, ফাঁসিকাঠে তুলি—যত রকমে পারি তাকে আঘাত দিতে ত্রুটি করি নে।

মনের এই যে জড়তা, যে জড়তার জন্য আমরা হৃদয়ের কোণে যে-সব ভ্রান্ত আদর্শকে সাদরে স্থান দিয়ে এসেছি তাদের ত্যাগ করতে পারি নে এবং যে-সব নূতন আদর্শকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা উচিত তাদের গ্রহণও করতে পারি নে, এই জড়তা ঘুচিয়ে মানুষকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখানোই হচ্ছে 'জীনিয়াস্'দের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নতুন ক'রে ভাবতে শিখিয়েছেন। যে জড়তা আমাদের মনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছিল তার

আধিপত্যকে তিনি শিথিল করেছেন। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন একটা নূতন স্বদেশের আদর্শ। সেই আদর্শ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

এখানে স্বদেশের যে নূতন স্বপ্ন কবি আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়েছেন সেখানকার মানুষগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাদের চিত্তের নির্ভীকতা। তারা মাথা কারও কাছে নত করবে না। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি অতি সহজেই দেখতে পেয়েছেন, স্বদেশকে নতুন ক'রে গড়তে হ'লে স্বদেশের নবযৌবনকে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে আর এই নূতন আদর্শ হ'ল নির্ভীকতার আদর্শ। নীট্‌শের Thus Spake Zarathustraতে আছে, "What is good? Ye ask : It is good to be brave." "তোমরা সুধাও, কী ভালো? ভালো সাহসী হওয়া।" রবীন্দ্রনাথও স্বদেশের কর্ণে বজ্র-গর্জ্জনে ঘোষণা করলেন It is good to be brave. 'শীর্ণ শান্ত সাধু'দের 'নিরাপদ নম্রতা'র আদর্শকে তিনি কোনো মূল্য দিলেন না। তিনি মূল্য দিলেন পৌরুষের আদর্শকে; কারণ পৌরুষের অভাবই আমাদের চিত্তকে জড়তায় পঙ্গু ক'রে রেখেছে। সত্যকে যে গ্রহণ করতে পারছি নে কারণ তা অপ্রিয়। যা অপ্রিয়, যা আমাদের স্বার্থের বিরোধী, যা আমাদের অনেক দিনের সংস্কারকে আঘাত দেয়—তা সত্য হ'লেও তাকে অসত্য ব'লে মনে করাই মানব-স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই যে দুর্ব্বলতা—একে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কাটিয়ে উঠ্‌তে না পারছি ততক্ষণ যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর তাকে আমরা জয়যুক্ত করতে পারব না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই বলিষ্ঠ চিত্তের সেই নির্ভীকতা যার বর্ম্মে আবৃত হয়ে যে নূতন অত্যন্ত অপ্রিয় তাকেও আমরা বরণ করতে পারি, যা অসত্য ব'লে মনে হয়েছে তা অত্যন্ত প্রিয় হ'লেও তাকে বর্জ্জন করবার মত অন্তরে সাহস খুঁজে পাই, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি তার জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হই না। এই নির্ভীকতা যতক্ষণ জীবনে না আসছে ততক্ষণ যে শৃঙ্খল মানুষের আত্মাকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে বেঁধে রেখেছে তাকেই সে বারম্বার সোহাগ করবে। বিধিব্যবস্থার মুখোস প'রে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা তার আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে। অন্তরের এই যে নির্ভীকতা—এই নির্ভীকতাই তো যৌবনের বৈশিষ্ট্য। যৌবন সুখ চায় না, শান্তি চায় না, চায় জীবন। সেই জন্য অতীতের আরামদায়ক কোটরের মধ্যে নিরাপদে থাকার প্রতি কোনো লোভ নেই তার। যা সত্য তারই মধ্যে সে বাঁচতে চায় আর সেখানে বাঁচতে গিয়ে যদি চিরদিনের সংস্কারকে ত্যাগ করার দুঃসহ বেদনাকে বরণ করতে হয়, না ক'রে উপায় কি? যেহেতু এত দিন ধরে যা ভেবে এসেছি তার সঙ্গে যা নূতন তার কোনো মিল নেই—এই জন্যই কি আমরা পুরাতনকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো? অজানাকে দূরে দূরে রেখে দেবো? যৌবন তো এমন ক'রে কূলকে আঁকড়ে পড়ে থাকে নি। যে সমুদ্রে কেউ কোনোদিন পাড়ি দেয় নি—কলম্বাস হয়ে সেই পথহীন সাগরবক্ষে সে দিয়েছে পাড়ি—যে অরণ্যে কেউ কোনোদিন পা দেয় নি লিভিংস্টোন হয়ে সেই অরণ্যে সে করেছে পর্য্যটন। সত্যের জন্য মরিয়া হবার এই ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের বাণী তার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কবি—কিন্তু বিশেষ ক'রে যৌবনের কবি। তাঁর কবিতায় পথের জয়-গান। তিনি তাদের জন্য যাদের প্রাণকে কেউ বাঁধতে পারে নি, যারা মুক্ত-পথের পথিক, যাদের চিত্ত জড়িয়ে যায় নি কোনো বিশেষ মতবাদের অথবা বিধি-নিষেধের জঞ্জালের মধ্যে।

"ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্তপ্রেমে
রবো না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ দান করেছেন সে হচ্ছে সব কিছুকে বিচার করবার একটা নূতন মাপকাঠি। তিনি আমাদের অন্তরে

জাগিয়েছেন সেই দুঃসাহস যার জোরে যেখানে কোনো নাবিক যেতে সাহস করে না সেখানেও যাবার সাহস জেগেছে আমাদের বুকে, পথে চলবার চাঞ্চল্য জেগেছে আমাদের পায়ে। এই যে অজানার পানে চলবার সাহস, এই যে spirit of adventure—এখানেই তো প্রগতির মূল কথা। এই অনুসন্ধিৎসা যেখানে জেগেছে সেখানে নব-জীবনের স্পন্দনও শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে নূতন আদর্শ নব্য ভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর সাহিত্যকে সহায় ক'রে, সে হচ্ছে বন্ধনমোচনের দ্বারা আত্মপ্রকাশের আদর্শ। মানুষের জীবনের মূল্য আর সব কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রই হোক আর শাস্ত্রই হোক, সমাজই হোক আর ধর্ম্মই হোক—সব কিছুরই সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে জ্ঞানের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, স্বাস্থ্যের মধ্যে, জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে বিকশিত ক'রে তোলায়। মানুষ যেখানে দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রেরও মূল্য নেই, সভ্যতারও মূল্য নেই, সমাজেরও মূল্য নেই, শাস্ত্রেরও মূল্য নেই। মানুষ তো একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। সকলের উঁচুতে হোলো তার আসন। তাকে বিকশিত ক'রে তোলবার জন্যই সভ্যতার এই সহস্র উপকরণ, রাষ্ট্রের যত বিচিত্ররূপ, মতবাদের যত বৈচিত্র্য, সমাজের যত বিধিনিষেধ, শাস্ত্রের যত অনুশাসন। মানুষই যদি আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল, তার দেহ যদি স্বাস্থ্যে সবল, মগজ যদি জ্ঞানে সতেজ এবং হৃদয় যদি প্রেমে বিশাল হবার সৌভাগ্য লাভ না করলো—তবে কিসের জন্য রাষ্ট্রের এই ইমারৎ? কিসের জন্য সমাজের এই সব বিধি-ব্যবস্থা? কিসের জন্য সভ্যতার এই সব সাজ-সরঞ্জাম? কিসের জন্য কত যুগের কত তপস্বীর নিদ্রাহীন দুর্জ্জয় তপশ্চর্য্যা? যুগে যুগে দেশে দেশে যত বড়ো বড়ো কবির আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা মানুষেরই জয়গান গেয়ে গেছেন তাঁদের কাব্যে। শৃঙ্খলমুক্ত পরিপূর্ণ মানবের জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে তাঁদের কণ্ঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই মানুষেরই বন্দনাগান। A man before all—এই বাণীই হ'ল রবীন্দ্রনাথের বাণী। মানুষকে যা-কিছু খর্ব্ব করতে চেয়েছে, তার আত্মপ্রকাশের পথে যা-কিছু বাধার সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে ক্ষমা করেন নি কখনো। সমস্ত কিছু বাধাকে ছিন্ন ক'রে সবলে আপনাকে প্রকাশ করবার এই দৃপ্তবাণীই তো নৈবেদ্যের বহু কবিতায় ফুটে উঠেছে।

> এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
> এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
> মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
> এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
> এই কর্ম্মধামে!

'অচলায়তনে'র প্রাকারকে যেখানে তিনি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছেন সেখানে সমাজের নিরর্থক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর রসনায় সত্য বাক্য খর-খড়্গের মতোই ঝ'লে উঠেছে। মানুষের আত্মাকে সঙ্কুচিত ক'রে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বড়ো হ'য়ে উঠবে—মানবাত্মার এত বড়ো অপমান তিনি সহ্য করতে পারেন নি। অমৃতসরে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রান্তরে জেনারেল ডায়ার যখন নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলি চালালো, ভয়ে ভীত নরনারীকে রাস্তার ধূলায় বুকে হাঁটালো, তখন সেই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রথম যাঁর কণ্ঠ তারস্বরে প্রতিবাদ জানালো তিনি রবীন্দ্রনাথ। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপাধি ত্যাগ করলেন। এখানেও রাষ্ট্রের দাবীর চেয়ে মানুষের দাবীকেই উচ্চতর আসন দেওয়া হয়েছে। মানুষের অপমান তাঁর চিত্তকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে—অপমানিত মানুষের আহত চিত্তের বেদনাকে তিনি আপনার বেদনা ব'লে জ্ঞান করেছেন। শক্তি-মানের ঔদ্ধত্যকে বাধা দেবার জন্য প্রয়োজন আছে এই রকম তেজস্বী মানুষের, যারা যোগাযোগের বিপ্রদাসের মতো বলবে, 'সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।' ম্যাস্তামুখো নিরীহ-প্রকৃতির সাধু মানুষদের অভাব নেই। তাদের সংখ্যা প্রচুর। মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, মদ খায় না, পরস্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় না, রবিবারে রবিবারে গীর্জ্জায় যায়, চূড়ামণি-যোগে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গায় ডুব দেয়, বাড়ীতে রেখে দু'চারটা গরীব ছাত্রও পড়ায়, কিন্তু ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে যে দৃপ্ত পৌরুষের প্রয়োজন, অন্যায়কে বাধা দিতে গেলে চরিত্রে যে নির্ভীকতা থাকা দরকার—সেই নির্ভীকতা এবং পৌরুষের অপ্রাচুর্য্যই তো জাতিকে পরাধীনতার অসম্মানের মধ্যে অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে। "Order is good for what it implies and not for its own sake." (Laski.) আমরা যে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিই সে তো বিনা সর্ত্তে নয়। সেই আনুগত্যের অপরিহার্য্য সর্ত্ত হচ্ছে—রাষ্ট্র আমাদিগকে

জীবনের লক্ষ্যে পৌছে দিতে সাহায্য করবে।* রাষ্ট্র যদি সেই লক্ষ্যে পৌছাবার পথে সহায় না হয়ে অন্তরায় হয় তবে সে আমাদের আনুগত্যের উপরে কোনো দাবীই করতে পারে না—কারণ মানুষ রাষ্ট্রের চেয়ে বড়ো।

"মানুষের পরিবর্ত্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্ত্তে পাথরের মতো। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।" রবীন্দ্রনাথ

জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের আদর্শকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দান করেছেন। এই আত্মপ্রকাশের পথে কিছু যদি অন্তরায় হয় তার আনুগত্য স্বীকার না করার বাণীই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে এই বাণীই তিনি প্রচার করেছেন। পাপকে পাপ জেনেও যদি তার সঙ্গে মিতালি ক'রে চলি, অন্যায়কে অন্যায় জেনেও যদি তাকে বাধা না দিই, তবে ভগবানের চোখে সেটা অপরাধ—এই কথাই কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কর্ণে ঘোষণা করেন নি? শুধু চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা অথবা মদ খাওয়াই কি পাপ? 'পাপকে ঠেকাবার জন্য কিছু না করাই তো পাপ'—'তপতী' নাটকে এই আদর্শের প্রচারক রূপেই তো রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। এই একই আদর্শ প্রচার করবার জন্যই তো বঙ্কিমচন্দ্রকে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখতে হয়েছিল। আমেরিকার যুবকদের চিত্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এই শৌর্য্যকে জাগ্রত করবার জন্য এমার্সনকে একদা বলতে হয়েছিল, Good-nature is plentiful, but we want justice, with heart of steel, to fight down the proud. ভারতবর্ষের যুবকদের চিত্তে ক্ষাত্রবীর্য্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে একই বাণী প্রচার করতে হয়েছে। দু-জনেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক।

'রক্তকরবী'তেও কবি মানুষকে ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন। যক্ষ-রাজের পাতালপুরীতে মানুষের জীবনের মূল্যের চাইতে সোনার মূল্য অনেক বেশী। যক্ষরাজের কাছে মানুষ মানুষ নয়, কেবল সংখ্যা। তাই তো রাজার বিরুদ্ধে নন্দিনীর অভিযান। রাজাকে অবশেষে ধ্বজা ভেঙে ফেলে, শক্তির ঔদ্ধত্যকে বর্জ্জন ক'রে সুন্দরের চরণ-তলে আত্মনিবেদন করতে হয়েছে। নন্দিনীকে সম্বোধন ক'রে তাকে বলতে হয়েছে,

"এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক্, তাতেই আমারমুক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে নাগরিকের জীবনকে মুক্ত করবার জন্য যেমন লেখনী ধারণ করেছেন, সমাজের অর্থহীন বিধি-নিষেধের অচলায়তনকে যেমন ভেঙে ফেলেছেন মানুষকে তার অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—তেমনি পুরুষের শাসনদুর্গকে ধূলিসাৎ ক'রে নারীকে মুক্তি দেবার জন্যও তাঁর লেখনী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে। গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নারীকে অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে বন্দিনী ক'রে রাখবার যে ইতিহাস আমাদের সমাজে চ'লে আসছে—সে ইতিহাস যে কত কলঙ্কের—সে কথাই রবীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে আমাদের কাছে বলেছেন। নারী পতিব্রতা হ'তে গিয়ে আপনাকে পুরুষের ছায়া আর প্রতি-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত করবে, বস্তুর পর্য্যায়ে আপনাকে ফেলে রাখবে—এ আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছেন, যেমন আঘাত দিয়েছেন ইবসেন্ তাঁর Doll's House এবং Ghosts এই দুইখানি নাটকে। 'স্ত্রীর পত্রে'র 'মেজবউ'কে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলো না। পুরী থেকে মেজবউ স্বামীকে লিখছে, 'কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না।' পুরুষ নারীর জীবনটাকে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে—মানুষের এই অপমানের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের সুর 'যোগাযোগে'র মধ্যেও শুনতে পাই। মধুসূদন অপমানিতা বধূকে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য যখন বললে, 'মানে কী? বাড়ীর বৌ বাড়ীতে যাবে না?' তখন কুমু শুধু সংক্ষেপে বললে, 'না।' দৃপ্ত নারীর এই যে 'না' বলবার শক্তি—এই শক্তিরই উদ্বোধন করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বাংলার শৃঙ্খলিত মাতৃজাতির হৃদয়ে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ইবসেন্।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জোরের সঙ্গে আমরা এই কথাই বলতে পারি যে তিনি আমাদিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। তিনি তাঁর ঋষির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন কোটি

* We give our allegiance to the State always upon the condition that its end satisfies the end we set before ourselves. Laski.

কোটি মানুষের ভীরুতাই প্রবলের ঔদ্ধত্যকে খাড়া রেখে পৃথিবীকে নরকের সামিল ক'রে তুলেছে।

"দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ,…"

(প্রান্তিক—রবীন্দ্রনাথ)

পৃথিবীকে আবার স্বর্গ ক'রে তুলতে হ'লে মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করা চাই নির্ভীকতার আদর্শ। বর্ব্বরতার দিগন্তব্যাপী অভিযানকে ঠেকাতে হ'লে মানুষকে ডাক দিতে হবে শক্তির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তে এসে বাংলার নবযৌবনের কর্ণে যে আহ্বান প্রেরণ করেছেন সে হচ্ছে সংগ্রামের আহ্বান।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

(প্রান্তিক)

গল্পসল্প

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বসেছে রঙের সভা জম্‌কালো দিগন্ত-আকাশে;
হাতছানি দিয়ে যায় ধৈর্যহারা বলাকা-পাখা-সে!
কলকল কাকলীতে ডেকে বলে কী-সে আমন্ত্রণ,—
গৃহ-আঙিনাতে ধায় আপিসের পাশমুক্ত মন।
মনে পড়ে কত কথা,—ছেলেবেলা ছিল অভ্যেস,—
কলরবে এ রকমই এ সময়ে মিলে সব বেশ
দাদুটিকে মাঝে রেখে কথা হ'ত কত রকমের,—
যুদ্ধ, মৃগয়া কত, কত বরা-বাঘ-জখমের,—
পাহাড়-পর্বত, মরু, নদ-নদী, কত মাঠ, বন,
কত বিয়ে, বনবাস, রাজ্যলাভ, সন্ন্যাস-গ্রহণ!
কত মান-অভিমান, হাসি-ঠাট্টা, কত বেয়াকুবী,
জাদুকর, দাঁড়ি-মাঝি, গালগাট্টা;—মজা হ'ত খুবই!
কত কাঠকুড়ুনীর ছোটোখাটো কত সুখদুখ,—
কত ভয়-বিভীষিকা, কত অশ্রু-হাসি-ভরা মুখ!
সৃষ্টিটাই গোটা এসে রূপ নিত যেন সে কথাতে—
শুনে যাই,—ভুলে যাই লাভক্ষতি খুঁটিয়ে খতাতে!
কোথায় বা শেষ তার, কোথা হ'তে হ'ল তার শুরু,
সব শুনে আরো শুনি হোক-না-সে বুক দুরুদুরু!
সারাদিন হুটোপুটি শ্রান্তিতে শরীর অবশ,—
তখন সে কথাগুলি সারা মন করে নিত বশ!
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে এত সত্য লাগে সেই কথা,—
সত্যেরো অধিক বেশি তার সে সত্যের উজ্জ্বলতা!
রঙে রসে ঝিলিমিলি, কিছু যেন নয় বেমানানো;
সংসারে ঘটনাটা, মনে হ'ত—সেটাই বানানো!
ঘটনা ঘটেছে কত কল্পে-কল্পে কত কাল ধ'রে,
সবি কোথা মিলে গেল, কথা কিন্তু ফিরে দোরে দোরে,
প্রিয় দাদু চলে যায়, চলে যায় শ্রোতারা পুরানো,—
রবির রঙের সভা মনে আনে গল্প অফুরানো!
নূতন বলাকাপাঁতি মাতে নব বর্ণসমারোহে,—
বসেছে রঙের সভা, মন মাতে গল্পসল্প-মোহে।
দিন ভ'রে আজো কত ঘটনা যে ঘটে কোথা হ'তে;
কথার অপূর্ব-সাজে সাজে তা'রা গোধূলি-আলোতে।
কথা নিয়ে দোরে এসে বসে সে-ও সে-পাড়া-কুঁদুলী;—
কী নেশা ধরিয়ে যায় সোনামাখা মায়াবী গোধূলি!
সুখ নয়, নয় দুখ, নয় ভুল-ভ্রান্তি-পরিতাপ,—
দিনশ্রান্তি দূর করে গল্পেসল্পে দু-কথা আলাপ।
ক্রমে মিলে দিবা-আলো, আঁধার দাওয়াতে জ্বলে দীপ;
রাত্রি আসে, কালো শাড়ী, ভালে সন্ধ্যাতারার সে টীপ!
প্রাঙ্গণের কাছাকাছি কোথা হ'তে বেলি গন্ধ ছাড়ে,
শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিল্লিদল ডাকে ঝোপেঝাড়ে।
কথা আসে থেমে থেমে, মনে খেলে কথার ইঙ্গিত,—
ঘরের ঘেরায় ঢুকি, প্রাণে বাজে বাণীর সংগীত॥

নেপালের প্রবাসী বাঙালী

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের অবস্থান তুষারমৌলি হিমালয়ের ক্রোড়ে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশটির পূর্ব্বে সিকিম ও দার্জ্জিলিং, পশ্চিমে আলমোড়া ও নৈনীতাল, উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে গোরক্ষপুর, পিলভিত্, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী কতকগুলি দেশ ও অঞ্চল। নেপাল রাজ্যের আয়তন নিতান্ত অল্প নয়; এর বিস্তৃতি পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চার-শ পঞ্চাশ মাইল ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় এক-শ ষাট মাইল। সাগরাম্বুপৃষ্ঠ (sea-level) থেকে নেপালের উচ্চতা চার হাজার পাঁচ-শ ফুট ও সমগ্র রাজ্যের পরিসর ছাপ্পান্ন হাজার মাইল। আদমসুমারীর (census) কোন সাময়িক ব্যবস্থা না থাকায় নেপালের সঠিক লোকসংখ্যা জানা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু রাজধানী কাঠমণ্ডু ও তার অদূরবর্ত্তী ভাতগাঁও (ভদ্রগ্রাম) ও পাটনের ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়গুলি দেখে অনুমান করা যায়, নেপালের লোকসংখ্যা প্রায় ছাপ্পান্ন লক্ষ হবে। নেপালে প্রধানতঃ দুই জাতির লোকের বাস;—গোর্খা ও নেওয়ার। ইহা ভিন্ন গুরুং, লিম্বু, কিরান্তি, মাগর, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি জাতি আছে। ইহারা সকলেই বিভিন্নভাষাভাষী। গোর্খাদের ভাষা গুর্খালি হ'লেও ওরা দেবনাগরী বর্ণমালাই অনুসরণ করে। কেবল নেওয়ারদের মধ্যেই না কি একাধিক ভাষার প্রচলন আছে। এক জন নেওয়ারের নিকট শুনেছি তন্মধ্যে কোন একটি ভাষা বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদরা এ কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করতে পারবেন।

নেপালের সঙ্গে বাংলা দেশের ও বাঙালীর সম্বন্ধ বহু প্রাচীন। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন,—

> "নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; অনেক সময় মনে হয়, নেপাল আগে বোধ হয় বাঙালীরই উপনিবেশ ছিল।...চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজাবিপ্লব ঘটে, তখন সেখানে রামগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত নামে দুই জন পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বাংলা অক্ষরে পুঁথি লিখিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারা বাঙালী ছিলেন।"

বহুকাল পূর্ব্বে মৈথিলীদের সঙ্গে অনেক বাঙালীও নেপালে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন; তাঁদের বংশধরেরা এখন অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেপালী পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার ও ব্যবহার অনুসরণ ক'রে থাকেন। এই রকম একটি পরিবারের কথা আমি জানি। তাঁদের পারিবারিক পদবী 'ভট্টাচার্য্য' ও তাঁরা নিজেদের বাঙালী ব'লে পরিচয় দান করেন। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কাশীর এক জন বাঙালী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান গোর্খা রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নেওয়ার রাজাদের আমলে পাটন, ভাতগাঁও ও কাঠমণ্ডুতে তিন জন পৃথক্ নৃপতি রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহ চলত। ভাতগাঁওয়ের রাজার সঙ্গে কাঠমণ্ডুর রাজার ছিল প্রচণ্ড বৈরিতা। বহুবার চেষ্টা ক'রেও যখন তিনি কোনক্রমেই কাঠমণ্ডুর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে নিজের দীর্ঘলালিত প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে পারলেন না, তখন তিনি তাঁর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বহু অনুসন্ধানের পর কাশী থেকে সেই খ্যাতনামা বাঙালী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণকে বহু সমাদরে ভাতগাঁওয়ে আনয়ন ক'রে উপনিবিষ্ট করালেন ও তন্ত্রমতে যাগযজ্ঞ করার জন্য তাঁর মন্ত্রণামত খুব ধুমধাম ক'রে এক বিশাল দেবমন্দির স্থাপনা করলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পরেই, যে কারণেই হোক্, কাঠমণ্ডু রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলার ও বিদ্রোহের সূচনা হ'ল এবং অবশেষে যথেষ্ট অশান্তি ভোগ ক'রে রাজা বোধ হয় মারাও গেলেন। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় ভাতগাঁওয়ের রাজা সানন্দে সেই বাঙালী ব্রাহ্মণকে বিস্তীর্ণ জায়গীর দান করলেন ও আরও বহু প্রকারে পুরস্কৃত করলেন। সে আজ প্রায় তিন-শ বছর পূর্ব্বের কথা। তাঁর বংশধরেরা এখনও সেই জায়গীর ভোগদখল করছেন।

বিজয় সেন এই বাংলা থেকে গিয়েই একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপাল-রাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর নেপালের বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান গোর্খা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বীনারায়ণ শা মল্লবংশীয় শেষ নেওয়ার রাজা জয়প্রকাশ মল্লকে পরাজিত ক'রে নেপাল অধিকার করেন ও কাঠমণ্ডু রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি কাঠমণ্ডু নেপাল-রাজ্যের রাজধানী।

নেপালের মন্দিরসমূহের শিল্প-সৌন্দর্য্য জগদ্বিদিত।

মাণ্য সর্দ্দার শ্রীহরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অনুপম শিল্প-রীতি কেবল নেপালে নয়, তিব্বতেও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল গৌড়দেশের ভাস্করের দ্বারা। অবশ্য তৎকালে কেবল উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ নয়, সমস্ত উত্তরাপথ-ব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যকেই গৌড়দেশ নামে অভিহিত করা হ'ত। তা হ'লেও বাঙালী শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার খ্যাতিই ছিল সেকালে অসামান্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একাদশ শতাব্দীর এক জন শিল্পীর দ্বারা লিখিত 'পপপাম জমজাম' নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যাতে বাঙালী তখন শীর্ষস্থানীয় ছিল। নেওয়ার, তিব্বতীয় ও চৈনিক শিল্পীর স্থান ছিল যথাক্রমে বাঙালী শিল্পীর নীচে। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, গৌড়ীয় শিল্পরীতি বাঙালী শিল্পীর দানে বহুলাংশে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেই কথা স্মরণ ক'রে নেপালের প্রাচীন মন্দিরসমূহের যে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য জগতের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, তার জন্য আজ আমরা বাঙালীরাও অনেকটা গৌরব বোধ করতে পারি।

কিন্তু এ সব হ'ল প্রাচীন কালের কথা। তখন নেপাল পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। নেপাল আধুনিক হিসাবে উন্নতির পথে কতকটা চ'লতে শুরু করেছে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। কিন্তু সে কেবল চলার শুরু। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের পঞ্চম গোর্খা রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম সাহ কর্ত্তৃক রাজ্যশাসনের ভার জঙ্গ বাহাদুর রাণার উপর অর্পিত হয়। তদবধি পুরুষানুক্রমে রাণাবংশীয় প্রধান মন্ত্রীই নেপাল-রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন ও মহারাজাধিরাজ কেবল নারায়ণ হিসাবে পূজিত হন। নেপালের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনাও হয় সেই সময় থেকে। নেপালে এই নবযুগের প্রবর্ত্তনে বাঙালীর মনীষা ও ধীশক্তি নিয়োজিত হয়েছে প্রায় শুরু থেকেই। নেপাল-সরকারের প্রায় সকল বিভাগই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতী বাঙালীদের সহযোগিতায় উন্নত হয়েছে ও রাজকার্য্য-পরিচালনে বাঙালী নানা প্রকারে মহামন্ত্রীর একনিষ্ঠ সহায়তা করেছে। বাঙালীর এই অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা ও কার্য্যানুরক্তির জন্য নেপাল-সরকারও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাঙালীদের বহু প্রকারে পুরস্কৃত ক'রে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দান করেছেন। প্রধানতঃ উদরান্নের সংস্থানের জন্যই নিরাপদ গৃহকোণ ছেড়ে বাঙালীরা প্রথমে নেপালে গিয়েছিলেন, এ কথা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু সেই সুদূর প্রবাসে গিয়ে যদি তাঁরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদের ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সামাজিকতা, চরিত্রবত্তা প্রভৃতির পরিচয় দিয়ে রাজপুরুষদের ও আপামর জনসাধারণের মনোরঞ্জন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারতেন তা হ'লে সেখানে তাঁরা এতটা প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারতেন না। যে-সব কৃতী প্রবাসী বাঙালী

ডাক্তার শ্রীসুধীন্দ্রলাল দাসগুপ্ত
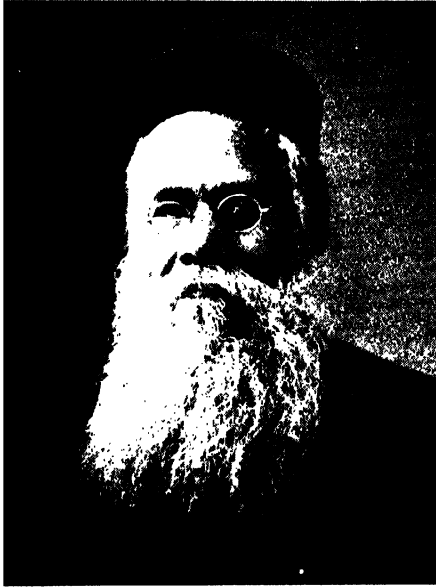
মান্য সর্দার শ্রীবটকৃষ্ণ মৈত্র

নেপালে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন ক'রে নিয়েছেন ও স্বীয় প্রতিভাবলে দুর্লভ যশোলাভ ক'রে বহির্ভারতে বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গ কতকাংশে যদি পূর্ব্বশ্রুতও হয়, আশা করি, তা হ'লেও তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হবে না।

এই রকম কৃতী বাঙালীদের বিষয় লিখতে হ'লে কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তিনি স্বীয় উদ্যমে অতি সামান্য অবস্থা থেকে অসামান্য উন্নতি করেছিলেন। নেপালের টাকশালে পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথায় মুদ্রা নির্ম্মিত হ'ত। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথম সেখানে মুদ্রা-প্রস্তুতের আধুনিক উন্নততর প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। নেপালের কারখানায় আধুনিক আদর্শে কামান, মেশিনগান, বন্দুকাদি নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তকও তিনি। নেপালে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রবর্ত্তনেও তাঁর উদ্যোগ ছিল। বস্তুতঃ তাঁর বিচিত্র কর্ম্মশক্তি নানা খাতে প্রবাহিত হয়ে নেপালের অগ্রগতির সহায়তা করেছিল। তাঁর কার্য্যে মুগ্ধ হয়ে ১৯২৩ সালে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মহারাজা চন্দ্রসামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা তাঁকে নানা প্রকারে পুরস্কৃত করেন ও তিনি "কাপ্তেন" পদে বৃত হন। নেপালের রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ঐ দেশেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

মহারাজা বীর সামসের জঙ্গ বাহাদুরের শাসনকালে কলিকাতা-নিবাসী এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ আইচ্ কর্ত্তৃক কাঠমণ্ডুতে প্রথম জলের কল স্থাপিত হয়। তিনি নেপালের পূর্ত্ত-বিভাগে বহু বৎসর দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। "নারায়ণ হিত্তি দরবার" নামক নেপালের বিরাট্ রাজপ্রাসাদ তাঁরই পরিচালনায় নির্ম্মিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে এক জন বাঙালী নেপালের প্রধান এঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কাঠমণ্ডু থেকে প্রায় ছ-মাইল দূরবর্ত্তী 'সুন্দরী জল' নামক স্থানে অবস্থিত নেপালের হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার হাউস্ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত নেপালে সরবরাহ হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলী নামক একজন কৃতী বাঙালী ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার এক জন শ্বেতাঙ্গ প্রধান এঞ্জিনীয়ারের সহকারীরূপে উপস্থিত এই পাওয়ার হাউসটির পরিচালনা করেন। কর্ম্মদক্ষ এঞ্জিনীয়ার হিসাবে নেপালে এঁর প্রচুর প্রতিপত্তি আছে।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি নেপালের পূর্ত্ত-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্য তিনি সেখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

নেপাল-সরকারের বারুদখানার চার্জ্জে উপস্থিত যিনি আছেন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত প্রতিভাসুন্দর পাল। ইনি বিলাত থেকে নানা প্রকার বিস্ফোরক প্রস্তুতের আধুনিকতম উন্নত প্রণালী শিক্ষা ক'রে এসেছেন। নেপালের বারুদখানার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইনি চেষ্টিত আছেন।

ডাক্তার শ্রীকেশবলাল গুপ্ত

ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ইতিমধ্যেই তাঁর তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট বন্দুকের টোটা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েছে। এই অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অল্পকাল মধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছে।

কলিকাতার খ্যাতনামা এঞ্জিনীয়ার ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেপাল-সরকারে প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় পূর্ত্তকার্য্যের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নেপাল-সরকার কর্ত্তৃক এক জন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার প্রেরণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুস্তৌফীকে নেপালে পাঠিয়েছিলেন। নরেন্দ্রবাবু তদবধি নেপাল-সরকারের অধীনে এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছেন।

এঁরা ভিন্নও নেপালের এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দাস ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী এঞ্জিনীয়ার ও মিঃ এইচ. রায়, মিঃ জে. এন্. দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বাঙালী ওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক জন বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ একটি কয়লার খনি আবিষ্কার ক'রে নেপালকে সমৃদ্ধতর করার একটি নূতন পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন।

উপস্থিত শ্রীযুক্ত ভবতোষ সেন ভূতত্ত্ব ও খনিজ বিদ্যাবিদ্‌রূপে নেপালের এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কাজ করছেন।

পূর্ব্বে রক্সৌল থেকেই পশুপতিনাথ দর্শনার্থী যাত্রীদের হয় পদব্রজে, না হয় তাম্‌দান্, খাটুলী প্রভৃতি মনুষ্যবাহিত যানে আশি-বিরাশি মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে কাঠমণ্ডুতে যেতে হ'ত। ১৯২৭ সালে মহারাজা চন্দ্র সামসের জঙ্গের শাসনকালে, কলিকাতার মার্টিন এণ্ড কোম্পানী রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জ পর্য্যন্ত চব্বিশ মাইল দীর্ঘ ন্যারো গেজের রেল লাইন খোলেন। উক্ত কোম্পানীর তৎকালীন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস ছিলেন ঐ লাইন স্থাপন কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পরেও ঐ পথে ট্রেন-চলাচলের তত্ত্বাবধান মার্টিন কোম্পানীই করতেন। বলা বাহুল্য, সে জন্য বহু বাঙালী কর্ম্মচারীকে নেপালে বাস করতে হয়েছিল। পরে নেপাল-সরকার যখন নেপাল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের তত্ত্বাবধান নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করলেন, তখন মার্টিন কোম্পানীর এই সব বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ বাঙালী কর্ম্মচারীদেরও ত্যাগ করলেন না। তাঁরা নেপাল-সরকারের অধীনে অদ্যাবধি কাজ করছেন। সেই জন্য উক্ত রেলপথে ভ্রমণের সময় এখনও প্রায় প্রতি স্টেশনে বাঙালী কর্ম্মচারীর পরিচিত মুখ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী এই রকম এক জন বাঙালী। তিনি উক্ত রেলওয়ের হিসাব-পরীক্ষক ও প্রধান অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন। উপস্থিত তিনি ম্যানেজারের পদে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

নেপালের চিকিৎসা-বিভাগে বহু বাঙালী নিযুক্ত আছেন। এই বিভাগের যাবতীয় উন্নতির মূলে একমাত্র যদি নাও হয় প্রধানতঃ বাঙালীর ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল, এটা অত্যুক্তি নয়। ৺হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নেপালের দরবারের শিক্ষকরূপে প্রথমে তথায় গমন করেন। সেই সময় নেপালে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যাপারদর্শী এক জন চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। হেমবাবুর চিকিৎসাবিদ্যার্জ্জনের অপূর্ব্ব উৎসাহ লক্ষ্য ক'রে এক জন রাজভ্রাতা তাঁকে অর্থ সাহায্য

ডাক্তার শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী ঘোষ

ডাক্তার শ্রীনীহারেন্দু চট্টোপাধ্যায়

করেন ও তাঁর অধ্যয়নের সুবিধার জন্য সরকার থেকে তাঁকে ছুটিও মঞ্জুর করা হয়। তিনি এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে অবিলম্বে লাহোর গমন করেন ও সেখান থেকে পাচ বৎসর পরে এল, এম্, এস্ উপাধি অর্জ্জন ক'রে সুচিকিৎসক হয়ে নেপালে ফিরে এসে সকলকে চমৎকৃত করেন। হেমবাবু নেপালের মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হয়ে স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে নেপালের নানা স্থানে অনেকগুলি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। নেপালের চিকিৎসা-বিভাগের সংস্কার সাধনে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে লোকান্তরিত হওয়ায়, তাঁর সে সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে নি।

হাওড়া খুরুট নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল, এম্, এস্ মহাশয় নেপালের প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহের শাসনকালে তত্রত্য চিকিৎসা-বিভাগে নিযুক্ত হয়ে নেপাল গমন করেন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করেন ও অবশেষে নেপালের চীফ মেডিক্যাল অফিসারের পদও অলঙ্কৃত করেন। হেমবাবুর ন্যায় তিনিও নেপালের চিকিৎসা-বিভাগের প্রভূত উন্নতি-সাধন করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানে অনেকগুলি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রণদীপ সিংহের পরবর্ত্তী মহারাজা বীরসামসের জঙ্গ বাহাদুরের ইনি অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন ও তাঁর রাজত্বকালেই ইনি প্রভূত যশ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। গুণগ্রাহী নেপাল-সরকার তাঁর কার্য্যে তুষ্ট হয়ে তাঁকে সুবিস্তীর্ণ জায়গীর দান করেন ও অন্য প্রকারেও পুরস্কৃত করেন। অধরবাবু অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। সেই কারণেই তিনি সুদূর নেপালে যে কেবল বিপুল অর্থার্জ্জন করতে পেরেছিলেন তাই নয়, দেশবাসীর মনোরঞ্জন করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। অনুমান ১৯১২ সালে তিনি নেপাল-সরকারের কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মহারাজা বীরসামসের জঙ্গের শাসনকালে ও অধর-বাবুর কার্য্যকালেই অনুমান ১৮৯৯ সালে, কলিকাতা ৬-ডি বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক রূপে প্রথম নেপালে গমন করেন। তিনিই মহারাজা বীরসামসের জঙ্গের সাক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ ক'রে নেপালে চিকিৎসা-বিদ্যার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। নেপালে মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর যথেষ্ট উদ্যম ছিল। তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপরতার জন্য উত্তরোত্তর পদোন্নতি হ'তে থাকে। অবশেষে তিনি অসামরিক চিকিৎসালয়সমূহের পরিদর্শক ও চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সম্মানজনক পদে উন্নীত হন ও নেপালের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হন। নেপালের সমস্ত চিকিৎসা-বিভাগ তাঁর উদ্যোগে পুনর্গঠিত হয়। রাজকৃষ্ণবাবু পার্ব্বতীয় ভাষায় শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু চিত্র-সম্বলিত ও সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে ঐ দেশীয় লোকের চিকিৎসাবিদ্যানুশীলনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন। তিনি নেপালের দীন, দরিদ্র, আর্ত্তের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন ও অনেক ক্ষেত্রে সম্বলহীন পীড়িত ব্যক্তির বিনা

ডাক্তার শ্রীতারাপদ মৈত্র

শ্রীশিবনারায়ণ সেন

পারিশ্রমিকেও চিকিৎসা করতেন। সেজন্য তারাও তাঁকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করত।

ফরিদপুর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবলাল গুপ্ত এল্, এম্, এস্ ১৯৬৩ বিক্রমাব্দের (ইং ১৯০৭ সাল) ১লা পৌষ মহারাজা বীর সামসের জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বীর হাসপাতালের দ্বিতীয় অফিসার-রূপে প্রথমে নেপালে গমন করেন। তখন মহারাজা চন্দ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুরের শাসনকাল। কেশববাবু পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তার রাজকৃষ্ণ বাবুর সহপাঠী ছিলেন ও তাঁহারা উভয়ে এককালেই মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজকৃষ্ণ বাবুর কার্য্যকালেই কেশববাবু নেপাল-সরকারের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁর চিকিৎসার গুণে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ব'লে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। কেশববাবুর কার্য্যনৈপুণ্য মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হন। তৎকালে তিনি বীর হাসপাতালের পরিচালকও ছিলেন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মহারাজা চন্দ্র সামসের জঙ্গের পরলোকপ্রাপ্তির ও মহারাজা ভীম সামসের জঙ্গের শাসনভার গ্রহণের পর কেশববাবু নূতন মহামন্ত্রীর চিকিৎসক নিযুক্ত হ'য়ে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি যে কেবল

দরবারী পোষাকে নেপাল-প্রবাসী বাঙালীগণ

বিজ্ঞ চিকিৎসক তাই নয়, তাঁর মত অমায়িক, সদালাপী ব্যক্তি সুলভ নয়। কেশববাবু বিক্রমাব্দ ১৯৯০ (ইং ১৯৩৪) সালের চৈত্র মাসে নেপাল-সরকারের কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে কলিকাতা, পি. ১৪৮।২ জনক রোডে অবস্থান করছেন। কিন্তু এখনও নেপালের মন্ত্রী-বংশের কেহ যখনই কলিকাতায় থাকেন, পীড়িত হলেই চিকিৎসার জন্য কেশববাবুকে আহ্বান করেন। সুতরাং এক হিসাবে নেপালের সঙ্গে কেশববাবুর যোগসূত্র এখনও ছিন্ন হয় নি বলা চলে। তা ভিন্ন, অন্য হিসাবেও নেপালের সঙ্গে এখনও তাঁর যোগ রয়েছে। নেপালে তাঁর কার্য্য-কালেই তিনি সরকারের অনুমতিক্রমে কাঠমণ্ডুতে "জমলেশ্বর ফার্ম্মেসী" নামে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেছিলেন। সেই ঔষধালয়টিই কাঠমণ্ডুতে তথা নেপালে

ডাক্তার শ্রীসুশীলচন্দ্র হালদার

ক'রে নেপাল গমন করেন। আদর্শ হিন্দু বিধবার ন্যায় ইনি অতি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। অতি বিচক্ষণ ধাত্রী ব'লে সমগ্র কাঠমণ্ডু শহরে এঁর অসীম খ্যাতি আছে। অধিরাজ ও মহারাজের পরিবারে ইনি যে কত প্রসবকার্য্য নিরাপদে সুসম্পন্ন করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এঁর মত সদালাপী ও নিরভিমানী মহিলা আজকাল খুব অল্পই দেখা যায়।

বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ, এম, বি (ক্যাল); ডি, টি, এম, এইচ (ক্যাণ্টাব), ডি, পি, এইচ (লণ্ডন) ব্যাধি-বিজ্ঞান বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে ১৯৩০ সাল থেকে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করছেন। এঁর নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাওয়ালদিয়া গ্রামে। বর্ত্তমান কালে ইনি নেপালের বিজ্ঞতম চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম-বি, (ক্যাল), ডি, টি, এম, (বেঙ্গল), এম, আর, সি, পি (এডিন), এল, আর, সি, এস (এডিন), ডি, পি, এইচ (লণ্ডন) জিতেন্দ্রবাবুর সমসাময়িক। তিনি কাঠমণ্ডুর শ্রীত্রিভুবন-চন্দ্র সামরিক হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে ১৯৩০ সাল থেকে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। হাসপাতালের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টিত আছেন। কলিকাতার সন্নিকটে 'যাদবপুর কলোনী'তে তাঁর বাড়ী।

ত্রি-চন্দ্র কলেজ, কাঠমণ্ডু

পাবনা, সাতবেড়িয়া-নিবাসী ডাক্তার শ্রীসুশীলচন্দ্র হালদার, এম, বি ১৯৩৫ সাল থেকে উক্ত সামরিক হাসপাতালের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদাভিষিক্ত আছেন।

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত হালিসহর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীনীরদেন্দু চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, এফ ও মালদহ-নিবাসী ডাক্তার শ্রীতারাপদ মৈত্র, এল, এম, এফ উভয়েই ১৯৩৪ সালে নেপাল-সরকারের চিকিৎসা-বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁদের ইতিপূর্ব্বে নেপালের অন্তর্গত কাডারবানা, ডোটি, হনুমাননগর প্রভৃতি বহু স্থানের হাসপাতালে কার্য্য করতে হয়েছে। এমন কি তারাপদবাবুকে সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে তিব্বতের দুর্গমতম প্রদেশেও যেতে হয়েছিল। উপস্থিত নীরদেন্দুবাবু নেপালের চিকিৎসা-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলের অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষের পদে ও তারাপদবাবু গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ষ্টোর্সের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ছাত্রজীবনে ইঁহারা সহপাঠী ছিলেন।

নেপাল-সরকার প্রজাদের জন্য কাঠমণ্ডু শহর থেকে প্রায় নয় মাইল দূরবর্ত্তী একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর 'টোখা' নামক মনোরম স্থানে আধুনিক প্রথায় একটি যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাইকভেরী-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ বেরা এম, বি, ১৯৩৬ সাল থেকে এই চিকিৎসালয়ের সহকারী
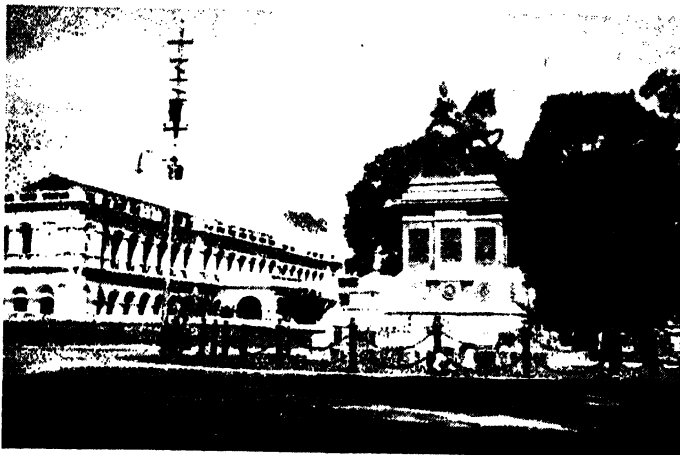
বীরহাসপাতাল, কাঠমণ্ডু

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রূপে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করছেন। বোম্বাই-নিবাসী একজন পার্শী ডাক্তার উপস্থিত এই চিকিৎসালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরলরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রধান সেনাধ্যক্ষের দরবারের চিকিৎসক ও ডাক্তার শ্রীসুশীলচন্দ্র সরকার কাঠমণ্ডু থেকে প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী ভাতগাঁও সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

উপরিলিখিত চিকিৎসকগণ ভিন্নও নেপালের তরাইতে আরও প্রায় চব্বিশ জন বাঙালী চিকিৎসক নেপাল-সরকারের অধীনে নিযুক্ত আছেন।

চিকিৎসা-বিভাগের ন্যায় নেপালের শিক্ষা-বিভাগেও অদ্যাবধি বাঙালীর প্রভাব অল্প নয়। বস্তুতঃ নেপালের জনসাধারণের মধ্যে প্রধানতঃ বাঙালীরাই শিক্ষার আলোক বিকিরণে সহায়তা করেছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও শিক্ষিত নেপালী বিরল ছিল। কিন্তু অধুনা নেপালীদের মধ্যে বহু গ্র্যাজুয়েট সুলভ। তাঁরা এখন বিদেশে গিয়ে নানা বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ক'রে স্বদেশে ফিরে আসছেন। সুতরাং এখন বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় তাঁদেরই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা হচ্ছে। নেপালের এই চেতনার মূলে আছে মহারাজার শুভেচ্ছা ও বাঙালীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার শুভ পরিণতি দেখে আজ আমরা বাঙালীরা সত্যই গৌরব বোধ করতে পারি।

নেপালে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দরবার হাইস্কুল নামে একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও ত্রি-চন্দ্র কলেজ নামে একটি সরকারী কলেজ আছে। কলেজে বি, এ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন নেপালের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রদের বেতন দিতে হয় না; সমুদয় ব্যয়ভার সরকার বহন করেন। পূর্ব্বে এই হাইস্কুল ও কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ছিল। তখন পরীক্ষার্থীদের কলিকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হ'ত। তার জন্যও সমস্ত খরচ সরকারই দিতেন। উপস্থিত সে ব্যবস্থা আর নেই। এখন নেপালের স্কুল কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গীভূত নয়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন এই ব্যবস্থা হয়েছে যে, পরীক্ষার সময় তাঁরা একজন পরীক্ষককে নেপালে প্রেরণ করেন; তাঁরই সাক্ষাতে ও তত্ত্বাবধানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয় ও তারই ফলাফল দেখে বিশ্ববিদ্যালয় বিহারী ছাত্রদের সঙ্গে নেপালী ছাত্রদেরও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এর জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় নেপাল-সরকারের নিকট থেকে পারিশ্রমিক লাভ ক'রে থাকেন; কিন্তু নেপালের শিক্ষাসংক্রান্ত অপর কোন বিষয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপ করার অধিকারও নেই, দায়িত্বও নেই।

আমাদের দিক দিয়ে বিচার করলে, নেপালী ছাত্রদের কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে আসার একটা কার্য্যকারিতা ছিল এই যে, বাংলা দেশের ও বাঙালীর সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় নেপালী ছাত্রেরা অধ্যয়নের সুবিধার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করতেন। ফলে, বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে কেবল যে তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্দ হ'ত তাই নয়; অনেক সময়ে তাঁরা বাংলা ভাষা বুঝতে, এমন কি বলতেও পারতেন। এ কথা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি; কারণ, কলিকাতার কলেজ থেকে পাস করেছেন এমন একজন নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে নেপালে বাংলা ভাষায় কথোপকথন করার সুযোগ আমার হয়েছে ও তাঁরা বাঙালীর প্রতি বেশ শ্রদ্ধান্বিত তাও দেখে স্বভাবতই খুশী হয়েছি।

নেপালের বর্ত্তমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় মহারাজা বীরসামসের জঙ্গ বাহাদুরের শাসনকালে। তৎপূর্ব্বে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন রীতিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। "নারায়ণ-হিত্তি দরবার" নামক রাজপ্রাসাদেরই মধ্যে 'দরবার স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে কেবল মন্ত্রী-বংশের ছেলেদেরই অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বিশেষ শিক্ষাই তাঁরা লাভ করতেন সেখানে। এই দরবার স্কুল ও স্থানীয় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে একজন বাঙালীর যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। তাঁর নাম সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল। বর্ত্তমান মহারাজা যোধা সামসের জঙ্গ বাহাদুরের পিতা বীর সামসের জঙ্গ বাহাদুরের গৃহশিক্ষকরূপে তিনি প্রথম নেপাল গমন করেন। নেপালের দু-জন ভূতপূর্ব্ব মহামন্ত্রী, বীর সামসের জঙ্গ বাহাদুর ও চন্দ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুর,—যাঁরা নেপালে গৌরবময় নবযুগের সূচনা করেন,—এবং ঐ বংশের অন্যান্য অনেকেই বাল্যাবধি বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কেদারবাবুর নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কেদারবাবু দরবার স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নেপালের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি খুব উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে শিক্ষিত নেপালী

যুবকরা শিল্প-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আহরণের জন্য দূর বিদেশে গমন করতে আরম্ভ করেন। চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য তিনি কি ধনী, কি দরিদ্র, কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। তদানীন্তন মহারাজা নেপালের একান্ত হিতকামী এই বাঙালী শিক্ষকের সহিত কেবল শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে নয়, দেশ-শাসনসম্পর্কিত জটিল বিষয়েও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কেদারবাবুর নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে নেপাল-সরকার তাঁকে "সর্দ্দার" উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন ও তাঁকে দিল্লী দরবারে নেপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় তৎকালে অনেক বাঙালী নেপাল-সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হয়ে নেপাল-প্রবাসী হয়েছিলেন। কেদারবাবু নেপালে ত্রিশ বৎসর কার্য্য ক'রে অবসর গ্রহণ করেন ও ১৯০৬ সালে ইহলীলা সংবরণ করেন।

কলিকাতার বরাহনগর পরামাণিক ঘাট রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ মৈত্র প্রথমে নেপালের মহারাজাধিরাজের (অর্থাৎ রাজার, প্রধান মন্ত্রীর নয়) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে নেপাল গমন করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বহু বৎসর যাবৎ দরবার স্কুলের ও পরে ত্রি-চন্দ্র কলেজের প্রিন্সি-প্যালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ বটকৃষ্ণবাবুই ত্রি-চন্দ্র কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল। অতি কৃতিত্বের সহিত স্কুল ও কলেজ পরিচালনা ক'রে ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা ক'রে তিনি নেপালে অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে তুষ্ট হয়ে নেপাল-সরকার তাঁকে দুর্লভ "মান্য সর্দ্দার" উপাধি দানে সম্মানিত করেছিলেন ও নেপালে বিস্তীর্ণ জায়গীর দান করেছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ মৈত্র নামক তাঁর এক পুত্র পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই জমি-দারীর তত্ত্বাবধানের জন্য নেপালের অন্তর্গত বীরগঞ্জ নামক স্থানে নিজের প্রাসাদোপম বাটীতে এখন অবস্থান করেন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ বটকৃষ্ণবাবু নেপাল-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, দরবার স্কুলের হেড মাষ্টারের পদাভিষিক্ত ছিলেন।

কলিকাতা হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, এম-এ প্রায় বার বৎসর ত্রি-চন্দ্র কলেজের ইতিহাস ও অর্থ-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত কলেজের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নেপালে বহুকাল কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করেছিলেন।

নেপালের স্কুল অথবা কলেজের শিক্ষক না হয়েও অনেক বাঙালী মহারাজাধিরাজের অথবা মহামন্ত্রীর বংশধরদের গৃহশিক্ষকরূপে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের পদও কিছু কম সম্মানজনক নয়। বস্তুতঃ নেপালের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রকদের শিক্ষার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের ওপর, এটা গৌরবেরই কথা।

কাশীনিবাসী মান্য সর্দ্দার শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান নেপাল-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অন্যতম, প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ। ১৮৯৭ অব্দে তিনি প্রথমে বর্ত্তমান মহারাজের তৃতীয় ভ্রাতা দেবসামসের জঙ্গ বাহাদুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে নেপাল-প্রবাসী হন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, দেবসামসের জঙ্গ পরবর্ত্তী কালে অল্প দিনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তদবধি হরিগোপালবাবু বিভিন্ন পদে অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য ক'রে অসামান্য সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি নেপাল-সরকারের বৈদেশিক পণ্য-বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত ছিলেন। উপস্থিত তিনি বর্ত্তমান মহারাজার সেরেস্তার কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ব'লে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন। নেপালের শুভেচ্ছু নিরহঙ্কার এই কর্ম্মী বাঙালী নিজের চরিত্রগুণে স্থানীয় লোকের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নেপাল-সরকারও তাঁর ঐকান্তিক সেবা ও সততার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে 'মান্য সর্দ্দার' উপাধিতে ভূষিত ক'রে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন ও কাশীতে একখানি বাড়ী তাঁকে দান করেছেন। হরিগোপাল বাবু কেবল বয়োবৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধও বটে। সেই জন্য কোন কূট প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন হ'লেই, বর্ত্তমান মহারাজা কর্ত্তৃক তিনি সসম্মানে আহূত হন। তাঁর প্রতি মহারাজার এই স্নেহ ও বিশ্বাসের জন্য তিনিও মহারাজার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ও তাঁর অকৃত্রিম গুণানুরক্ত।

পূর্ব্বে লিখিত হয়েছে নারায়ণ-হিত্তি দরবারের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দরবার স্কুলের পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী কালে জনসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য দরবার হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মন্ত্রী-বংশের ছেলেদের উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষা পৃথক্‌ভাবে তাঁদের পাওয়া প্রয়োজন, একথা

পুনরায় অনুভূত হ'তেই "সিংহ দরবার" নামক মহামন্ত্রীর বর্ত্তমান বিরাট্ হর্ম্ম্যের মধ্যে কেবল তাঁদেরই শিক্ষার জন্য "সিংহ দরবার স্কুল" স্থাপিত হয়। স্থাপনের সময় থেকেই প্রধানতঃ বাঙালীরাই এই স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে আসছেন। এই স্কুলের সঙ্গে দরবার হাইস্কুল অথবা ত্রি-চন্দ্র কলেজের কোন সম্পর্কও নেই, অথবা পঠনীয় বিষয়ের কোন মিলও নেই। বস্তুতঃ উক্ত বিদ্যায়তনটিকে স্কুলও বলা চলে, কলেজ বললেও ভুল হয় না। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত উপস্থিত এর অধ্যক্ষের পদে ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুব বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি সিংহ দরবার স্কুলের অধ্যক্ষ হ'লেও এখন তাঁকে প্রধানতঃ মহারাজার ব্যক্তিগত কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করতে হয়।

শ্রীযুক্ত অনিমেষ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরী নেপালের বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে খ্যাতনামা। ষ্টেট্স্‌ম্যান, ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি ইংরেজী সাময়িক পত্রে নেপাল সম্বন্ধে অনিমেষবাবুর লেখা বহু চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ বোধ হয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সঞ্জীববাবুর লেখা ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ বহু ইংরাজ পাঠক ও সমালোচক কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁদের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সঞ্জীববাবুর 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির সম্ভাবনার সংবাদ বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। উপর্য্যুপরি কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার পর সঞ্জীববাবু সম্প্রতি নেপাল ত্যাগ ক'রে দেশাভিমুখী হয়েছেন।

এঁরা ভিন্ন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিরাপদ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সেন (ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের জামাতা), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু বাঙালী শিক্ষক ও অধ্যাপক কেহ স্থানীয় দরবার হাইস্কুলে, কেহ ত্রি-চন্দ্র কলেজে, কেহ সিংহ দরবার স্কুলে, কেহ বা রাজবংশীয় অথবা মন্ত্রী-বংশীয়দের গৃহশিক্ষকরূপে নেপালে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। বস্তুতঃ প্রায় সমগ্র নেপালের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করার দায়িত্ব প্রধানতঃ বাঙালী শিক্ষকদের উপরই ন্যস্ত আছে।

নেপালের বীর লাইব্রেরির নাম পুরাতত্ত্বানুসন্ধীর নিকট অপরিচিত নয়। এই পুস্তকালয়টি উপস্থিত ত্রি-চন্দ্র কলেজের নিম্নতলে অবস্থিত। প্রখ্যাতনামা ফরাসী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী, ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিহারের শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সবাল প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে তাঁদের গবেষণার বহু উপকরণ এখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন। এই পুস্তকালয়ে তিব্বতী, নেওয়ারী, দেবনাগরী, পালি, মৈথিলী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন অমূল্য পুঁথি আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ঐহিকলাল চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থরক্ষক ছিলেন।

কাশী-নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নেপাল-সরকারের অধীনে 'সুব্বা'র পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর পূর্ব্বে অপর কোন বাঙালীর সম্ভবতঃ ঐ পদে কার্য্য করার সুযোগ হয় নি। তিনি ইতিপূর্ব্বে নেপালের ডেভেলপমেণ্ট বোর্ডের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত উভয় অসামরিক পদই খুব সম্মানজনক।

নেপালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার নামে একজন সরকারী পশু-চিকিৎসক আছেন। এঁর নিবাস চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে। পূর্ব্বে কাশ্মীর এঁর কর্ম্মস্থল ছিল।

পূর্ব্বে নেপালে জনসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য মিউজিয়ম ছিল না। নেপালের পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নানা কৌতূহলজনক দ্রব্যে সুসজ্জিত বর্ত্তমান যে মিউজিয়মটি অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, গবেষক ও সুধীজনের নিকট ইতিমধ্যেই সমাদর লাভ করেছে, ওটিকে আধুনিক প্রণালীতে এ ভাবে সুসংস্কৃত, সুসজ্জিত ও বস্তুতঃ রূপান্তরিত করার সমস্ত কৃতিত্ব মিউজিয়মের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সেন মহাশয়ের। তজ্জন্য শিবনারায়ণবাবু নেপাল-সরকার কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন।

নেপালের প্রবাসী বাঙালীদের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর বর্ণনা শেষ হয়েছে। এবার তাঁদের নিন্দনীয় একটি দোষের বিষয় মন্তব্য ক'রে প্রবন্ধের উপসংহার করব। সুদূর নেপালে মাত্র এই কয়জন বাঙালীর মধ্যে যতটা মেলামেশা ও পারস্পরিক সৌহৃদ্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক তা থাকা দূরের কথা, কি কারণে বলতে পারি নে, বরং যেন তার বিপরীত ভাবই লক্ষ্য হয়। এই কারণেই তাদের সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সাধারণ মিলন-ক্ষেত্র অথবা লাইব্রেরি গ'ড়ে উঠতে পারে নি; অথবা বাঙালীদের নিজস্ব পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান ও তার আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করাও এ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নি। জানি না, সেখানকার বাঙালীদের মধ্যে এই অবাঞ্ছনীয় ভাব দূর করার পথে কি এমন অলঙ্ঘনীয় বাধা থাকতে পারে।*

* এই প্রবন্ধ-রচনায় ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত অমূল্য গ্রন্থ 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' থেকে কিছু কিছু উপকরণ নিয়েছি। তজ্জন্য স্বর্গীয় গ্রন্থকারের আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রামরাম বসুর জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

বাঙালীর লেখা সর্বপ্রথম প্রকাশিত (১৮০১) মৌলিক বাংলা গদ্য পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন রামরাম বসু (সংক্ষেপে—'রাম বসু')। কিছু না কিছু পরিমাণে তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র আদর্শেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থে রচিত অব্যবহিত পরবর্তী এগারো-বারোখানি পুস্তক লেখা হয়েছিল। এ সকল পুস্তকের সমসাময়িক প্রচার ও প্রভাব নানা কারণে খুব সীমাবদ্ধ(১) থাকলেও বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের পথিকৃৎ হিসাবে এ পুস্তক নিচয়ের লেখকবর্গের নাম প্রশংসার সহিত স্মরণীয়। এজন্যে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রাম বসুর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। কিন্তু এ হেন কৃতী পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব বেশী নয়। যত দূর জানা যায় তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক কোন বাঙালীর স্বলিখিত বর্ণনা বর্তমান নেই। জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) ও উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা শিক্ষক রূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাজ করেছিলেন। তাই টমাস ও কেরীর লেখা থেকে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্র থেকে রাম বসুর সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। এছাড়া অন্য দু-এক জন মিশনারী ও শ্রীরামপুর মিশনের রিপোর্ট-আদিতেও রাম বসুর সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে, নানা কারণে কেরী ও টমাসের লিখিত বৃত্তান্তই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। মুখ্যত এ বৃত্তান্তের সারাংশ আশ্রয় করেই এখানে রাম বসুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাবে।

রাম বসুর সম্বন্ধে কেরী যা লিখেছেন তার অধিকাংশই তার Journal বা দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ দিনলিপি কখনো সমগ্রভাবে মুদ্রিত হয় নি। Memoirs of William Carey (London 1836) নামক পুস্তকে এ দিনলিপির কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে। তাতে রাম বসুর সম্বন্ধে কেরী প্রদত্ত সব বৃত্তান্ত নেই বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব এ পুস্তক থেকে সন্ধান পেয়েই স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় শ্রীরামপুরে গিয়ে 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র' থেকে কিছু অজ্ঞাত পূর্ব্ব ও মূল্যবান্ তথ্য বাঙালী পাঠকদের জানিয়েছেন। এ সকল তথ্য সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়েছে(২) কিন্তু উক্ত আলোচনা লেখার পরে জানা গেল যে ১৩২৮ সালের প্রবাসী পত্রিকায় (মাঘ, ৫০৪ পৃঃ) 'শ্যামলবর্ম্মা' নামে কোন এক ব্যক্তি নিখিলনাথ রায়ের উক্তিতে কিছু ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। প্রবাসীখানা সংগ্রহ করে দেখলুম যে 'শ্যামলবর্ম্মা'র অভিযোগ বিচারসহ নয়। ঐ লেখক **'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্রে'র অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ স্বীকার করলেও** তাঁর (কেরীর) উক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লেখকের উক্তির মর্ম্ম এই যে রাম বসু রামমোহন রায়ের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অতএব তাঁর পক্ষে কোন কালে কোন বিষয়ের জন্য রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষার্থী হওয়া সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তি লিখেছেন:—

"Carey সাহেব রাম বসুর পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না। ঘনশ্যাম বসুর নিকট শুনিয়া যাহা কিছু জানিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি এই:— রামমোহন যখন নিতান্ত বালক তখন রাম রাম বসু ভাল বাংলা লিখিতে পড়িতে পারিতেন। ১৭৮৮ সালে তিনি বেশ ভাল বাংলা কবিতা রচনা করিয়া ছিলেন। ঐ সালে তিনি টমাস সাহেবের মুন্শী ছিলেন। তখন রামমোহন বড় জোর ১৪ বছরের বালক।" (প্রবাসী ১৩২৮ মাঘ, পৃ. ৫০৪)

এ আপত্তি আপাতত গুরুতর মনে হয় বটে কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব ঢের কমে যায়; টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার সময়ে রাম বসুর যথেষ্ট পার্শীজ্ঞান ছিল(৩)। সেরূপ জ্ঞান থাকার ফলেই তিনি সুপ্রীম কোর্টের কর্ম্মচারী মিঃ চেম্বার্সে'র (William Chambers) অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছিলেন। এ চেম্বার্সে'র সুপারিসেই তিনি ১৭৮৭ সালে টমাসের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। আচ্ছা, এ সময়ে তাঁর (রাম বসুর) বয়স ন্যূনপক্ষে কত থাকতে পারে? যদি মনে করা যায় যে সে সময়ে তাঁর বয়স ১৮।১৯ বছরের মত ছিল তবে অসম্ভাব্য কিছু কল্পনা করা হয় কি? আমাদের কালে ত দেখেছি ১৫ বছরের ছেলেরা ইংরেজীর মত বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ রকম ছেলে যদি কোন বিদেশীকে বাংলা শেখাবার ভার পায় তবে তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু আছে বলে মনে হয় না। অতএব রাম বসুর বয়স ১৭৮৭ সালে এ রকম ছেলের চেয়েও ৩।৪ বছরের বেশি ছিল মনে করলে সেটা নিশ্চয় কষ্টকল্পনা বলে গণ্য হবে না। কারণ সতেরো বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামে বাংলা নাটক লিখে এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কাজেই মনে হয় ১৭৮৮ সালে আনুমানিক ২০ বছর বয়সে রাম বসুর পক্ষে পদ্যে খ্রীষ্টকথা রচনা করা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। সে যাই হোক, টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার সময়ে রাম বসুর বয়স হয়ত উনিশ বছরের বেশি ছিল, কারণ যে চেম্বার্সে'র সুপারিশে তিনি টমাসের চাকরী পান সে চেম্বার্সেরও নিকট তিনি হয়ত দু-এক বছর কাজ করে থাকবেন; তা হলে

(১) প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন, ৭৯৫-৭৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার সমসাময়িক বহুল প্রচার প্রমাণ করবার জন্যে কেউ কেউ লঙ-প্রণীত ক্যাটালগের দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু ঐ পুস্তকের ১৩৪ নং অনুচ্ছেদে আছে:—"Krishna Chandra Charitra by Rajib Lochan 1st. ed. 1805. last 1834……It was composed at the request of Dr. Carey…and though the price was 5 Rs. for 120 pp. it barely paid its expenses then, so limited was the demand for Bengali books. It was reprinted in London in 1830." ১৮৩০ অথবা ১৮৩৪ সালে পুনর্মুদ্রিত হওয়ার দ্বারা এ জাতীয় পুস্তকের সমসাময়িক প্রভাব কল্পনা করা হাস্যকর। কারণ তখন এর চেয়ে ভালো রচনা অনেক প্রকাশিত হয়েছিল। লঙ-এর out of print ক্যাটালগখানি ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের ৬ষ্ঠ সংস্করণের সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। আলোচ্য অংশটি সে বই থেকে উদ্ধৃত।

(২) প্রবাসী ১৩৪৭ চৈত্র, ৭৫১-৭৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৩) C. B. Lewis, The Life of John Thomas, London 1873, ৬৫ পৃঃ।

১৭৮৭ সালে রাম বসুর আনুমানিক বয়স দাঁড়ায় প্রায় একুশ। অর্থাৎ তাঁর জন্ম সাল দাঁড়ায় প্রায় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি(৪)। কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হচ্ছে টমাসের উক্তি। ১৭৯২ সালে তিনি লিখছেন যে রাম বসুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মতো।৫ টমাসের এই 'আন্দাজী' কথাকে কেউ কেউ 'সন্তোষজনক' তথ্যের মর্যাদা দিলেও এর বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি আছে।

(১) যাঁরা একজাতীয়, এবং এক দেশে বাস করেন তাঁদের পক্ষেও পরস্পরের বয়স আন্দাজ করা বেশ শক্ত কাজ। আন্দাজে বয়স নির্ণয় করতে গেলে প্রায়শ দেখা যায় যে প্রকৃত বয়সের সঙ্গে 'আন্দাজী' বয়সের তফাৎ ১০ থেকে ১২ বছরের উপর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। একই বয়সে বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের এতই বিপুল তারতম্য দেখা যায় যে বয়স আন্দাজ করার কোন নির্ভুল সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা বড়ই দুঃসাধ্য; এবং ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন জাতীয় লোকের বয়সের নির্ভুল আন্দাজ করা স্বাভাবিক কারণেই সুকঠিন। (২) যিনি বয়স আন্দাজ করবেন তাঁর মানসিক অবস্থা যদি খুব স্বাভাবিক থাকে তবু এই কাঠিন্যের লাঘব হয় না কিন্তু সেই মানসিক অবস্থা যদি একটু অস্বাভাবিক (*abnormal*) হয় তবে বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে ভুলের সম্ভাবনা ভয়ানক ভাবেই বেড়ে যায়। যে-টমাসের আন্দাজের উপর নির্ভর করে ১৭৯২ সালে রাম বসুর বয়স ৩৫ বছর মনে করা হয় সে টমাসের মানসিক গঠন (*constitution*) যে একটু অদ্ভুত রকমের ছিল তার একাধিক প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুর মিশনের অধিকর্মী জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের (সংক্ষেপে—'মার্শম্যান') উক্তি (১৮৫৯) থেকে জানা যায় যে টমাস eccentric (খামখেয়ালী)৬ এবং wayward (ছেলেমানুষের মতো যুক্তিবিচারবর্জিত)৭ ছিলেন অধিকন্তু টমাসের চরিত্র সম্বন্ধে উক্ত মার্শম্যান লিখছেন :—

"পর্যায়ক্রমে তিনি (টমাস) যে আনন্দবিহ্বলতা ও হতাশভাব এবং উৎসাহ ও মানসিক আলস্য দেখাতেন তাতে তাঁকে সহযোগী হিসাবে বড়ই অবাঞ্ছিত করেছিল। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এ দোষ তাঁর মানসিক গঠনের—নৈতিকতার নয়; এবং যে রোগের ফলে তাঁকে (বাতুল) আশ্রমে বাস করতে হয়েছিল সে রোগ যে তাঁর দৈহিক গঠনের অন্তর্নিহিত ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"৮

টমাসের এরূপ শোচনীয় মানসিক দুর্বলতা থাকার ফলে তাঁর কতকগুলি অদ্ভুতত্ব ছিল প্রচুর, এহেতু তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা সম্ভবপর হয় নি। এ বিষয়ে তাঁর জীবনী লেখক লুইস্ (C. B. Lewis) বলেন, (১৮৭৩) "[ইতঃপূর্বে] ব্যাপটিষ্ট মিশনের পুরাণো বন্ধুরা মিঃ টমাসের ইতিহাসের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হতে দেন নি। সন্দেহ নেই যে, সে সকল ঘটনা তাঁদের কাছে অগৌরবকর (discreditable) বলে বিবেচিত হয়েছিল।"৯ টমাসের চরিত্রে এরূপ মারাত্মক ত্রুটি থাকার ফলেই ১৮৭১ সনের আগে তাঁর স্মৃতিকথার নির্বাচিত অংশও ছাপা হয় নি। আর তাঁর বৃহৎ জীবনচরিত ছাপা হয়েছিল ১৮৭৩ সালে, মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পরে, যে সময়ে তাঁর দুর্বলতার কথা লোকে অনেকটা ভুলে গেছে। এহেন অব্যবস্থিতচিত্ত ও প্রায় আধপাগলা টমাসের আন্দাজকে রাম বসুর জন্মসময় সম্বন্ধে 'সন্তোষজনক প্রমাণ' বলে মনে করা খুবই অসাবধানতার কাজ হবে। এমন অবস্থায় রাম বসুর জন্মসাল নিরূপণের জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় নিতে হবে। সেরূপ প্রমাণ হয়ত দুর্লভ না হতে পারে। কারণ, প্রসঙ্গত কেরী ও রাম বসু সম্পর্কিত ১৭৯৫ সালের বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লুইস্ লিখছেন :—

"রাম বসু তখনও কেরীর বাংলা শিক্ষক ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট (খ্রীষ্টধর্ম) প্রচারের সময় তাঁর (কেরীর) সাহায্য করতেন **কিন্তু** তাঁর (রাম বসুর) চরিত্র **যতই পূর্ণভাবে বিকশিত হতে লাগল,** তিনি যে দীক্ষিত খ্রীষ্টান হবেন সে আশা ততই কমতে লাগল।"১০

এই চারিত্রিক বিকাশের কথা লিখে লুইস্ (হয়ত অজ্ঞাতসারে) বেশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন রাম বসু টমাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হওয়ার মত বয়স তাঁর ছিল না। যদি সে সময় রাম বসুর বয়স ত্রিশ বছরের মত থাকত তবে লুইসের পক্ষে এরূপ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে ত্রিশ বছর বয়সেই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশি। অবশ্য কোন লোক যদি জড়বুদ্ধি (mentally defective) হয় তবে তার সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটবে না। কিন্তু রাম বসুর বুদ্ধি প্রাখর্য সম্বন্ধে সকলেই একমত। অতএব এরূপ অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে টমাসের নিকট চাকরী নেওয়ার সময়ে অর্থাৎ ১৭৮৭ সালে রাম বসুর বয়স প্রায় ২১ বছরের মত ছিল অর্থাৎ তিনি প্রায় ১৭৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।১১ যদি একথা মেনে নেওয়ার কোন দুর্লঙ্ঘ্য আপত্তি আবিষ্কৃত না হয় তবে রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাম বসুর বয়সের তফাৎ দাঁড়ায় ৬ বছরের (মতান্তরে ৮ বছরের)। বয়সের এহেন বিভিন্নতা এত গুরুতর নয় যে বয়োধিক ব্যক্তি কখনও কোন বিষয়ের জন্য বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট শিক্ষার্থী বা শিষ্য হতে পারেন না। বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে বয়সের বাধা একটা বাধাই নয়। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুরারি

---

(৪) দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (৬ষ্ঠ সং) তিনি লিখেছেন যে লুইস্ লিখিত টমাসের জীবনচরিত অনুসারে রাম বসুর জন্ম ১৭৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে। অনুসন্ধান করে দেখেছি যে উক্ত পুস্তকে এরূপ কোন কথা নেই। রাম বসুর কথা লিখতে গিয়ে দীনেশবাবু আরও অনেক ভুল করেছেন।

(৫) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র (কলিকাতা, ১৩৪৩) ভূমিকা পৃঃ /০, ।৶০ এবং ঐ গ্রন্থকার কৃত রাম রাম বসু, কলিকাতা, ১৩৪৭, পৃঃ ১,৬।

(৬) J. C. Marshman—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, London 1859, ২৯ পৃ.

(৭) প্রাগুক্ত গ্রন্থ (=প্রা. গ্র.)—৬৬ পৃ.

(৮) প্রা. গ্র.—১১৪ পৃ.

(৯) Life of John Thomas, Preface p. iv.

(১০) প্রা. গ্র.—২৭৬ পৃ.

(১১) ১৮১৩ সালের ১১ আগষ্ট লিখিত কেরীর পত্রে জানা যায় যে রাম বসুর পুত্র নরোত্তম তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আট বছর ধ'রে কাজ করছেন। (রামরাম বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৪৭, পৃঃ ৩৩)। নরোত্তম যদি ২০ বছর বয়সে ঐ কাজ পেয়ে থাকেন (এরূপ অনুমানে হয়ত দোষ নেই, কারণ বিদ্যাসাগরও প্রায় ঐ বয়সেই ঐ কলেজে কাজ পেয়েছিলেন) তবে তখন তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর। রাম বসুর জন্ম যদি ১৭৬৬ সালে হয় তবে মৃত্যুর সময় (১৮১৩) তাঁর বয়স হয় ৪৭এর কাছাকাছি এবং তাঁর পুত্র নরোত্তমের জন্ম ধরা যেতে পারে তাঁর ১৯ বছর বয়সের সময়। সেকালকার বাল্যবিবাহের দিনে কেন এখনও এরূপ ব্যাপার আশ্চর্যজনক বা অসম্ভব বিবেচিত হবে না সন্দেহ।

গুপ্ত, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং শিষ্যবর্গ যে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, একথা যে-কোন শিক্ষিত বাঙালীর জানা আছে। আর আধুনিক কালেও হয়ত এরূপ বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

অতএব কেরীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে রাম বসু তাঁর জীবনের কোনও সময়ে রামমোহনের নিকট কোন কোন বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁকে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও গুরুর মত জ্ঞান করেছিলেন তবে সেই ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বিবেচনা করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে কোন্ সময়ে রামমোহনের সঙ্গে রাম বসুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রামমোহনের বাল্যে তাঁর সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ সম্ভবপর নয়। কাজেই পরবর্ত্তী জীবনে যে উভয়ের সংযোগ হয়েছিল একথা অনুমান করা যেতে পারে। ১৭৯৬ সালে কেরীর চাকরী ছাড়ার পর থেকে ১৮০০ সালে কেরীর সঙ্গে পুনর্মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাম বসুর যে সময় কেটেছে সে সময়েই হয়ত রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ ১৭৯৬ সালে রামমোহনের বয়স চব্বিশ (মতান্তরে বাইশ) এবং রাম বসুর বয়স প্রায় ত্রিশ। ১৭৯৬ থেকে ১৭৯৯ পর্য্যন্ত রামমোহন কলিকাতায় বাস করেছিলেন।১২ তার আগেই তিব্বত থেকে ফিরে এসে (১৭৮৮ বা ১৭৮৯) কিছুকাল তিনি পাটনায় পারসী আরবি এবং কাশীতে সংস্কৃত (বেদান্ত উপনিষৎ) অধ্যয়ন করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ ভাবে সংবর্দ্ধিত করেছিলেন।১৩ এহেন জ্ঞানবৃদ্ধ রামমোহনের নিকট যে বয়োজ্যেষ্ঠ রাম বসু সাগ্রহে শিক্ষার্থী বা শিষ্য হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই, রাম বসুর গদ্য রচনার পশ্চাতে রামমোহনের আদর্শ ও প্রেরণা কাজ করেছিল বলে কেরী যে উক্তি করেছিলেন তার মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। পূর্ব্বোক্ত 'শ্যামল বর্ম্মা' নিজ সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবে এ সকল কথা ভেবে দেখতে পারেন নি। ১৮০০ সালের শেষভাগ থেকে ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত এবং তার পরেও রামমোহন রায় প্রায়শঃ কলিকাতায় বাস করতেন। অবশ্য কলিকাতা থেকে তিনি মাঝে মাঝে পাটনা, কাশী, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও গতায়াত করতেন। অতএব ১৮০১ সালের কোন এক সময়ে রাম বসু যে রামমোহন রায়কে দিয়ে তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়ে নিতে পারেন এ কথা অসম্ভব মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

রাম বসুর জন্মসাল এবং রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করার পরেই আলোচ্য রাম বসুর চারিত্রিক শুচিতা। নিখিলনাথ রায় 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজ পত্র' থেকে রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সে সকলের অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি। তিনি লুইসকৃত টমাসের জীবনচরিতের নজীরে রাম বসুকে এক অতি নীচাশয়, ভণ্ড, শঠ, কৃতঘ্ন ব্যভিচারী ও নৃশংস ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছেন।১৪ তার পর থেকে যাঁরাই রাম বসু সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরাই প্রায় নির্ব্বিচারে দীনেশ বাবুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং রামবসু যে এক জন অতি ঘৃণ্যচরিত্র ব্যক্তি সে সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু নিখিলবাবুর উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্ বর্ত্তমান লেখক এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে এক মত হতে পারেন নি। সেই জন্যে তাঁকে লুইসকৃত টমাসের জীবনী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের আলোচনা করতে হয়েছিল। এ আলোচনার ফল নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা যাচ্ছে।

দীনেশবাবু লুইসকৃত টমাসের জীবনচরিতের নজীরে বলেন যে ব্যভিচার ও তদানুষঙ্গিক কোন গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় রাম বসু কেরীর চাকরী থেকে বিতাড়িত হন। ঘটনাটি সম্বন্ধে তিনি টমাসের উল্লিখিত জীবনী যে যথাযথ অনুসরণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কেরীর উক্তি থেকেও জানা যায় যে রামবসু কোন অপরাধের জন্যে কর্ম্মচ্যুত হন। কিন্তু আরোপিত অপরাধের গুরুত্ব সত্ত্বেও পরবর্ত্তী কালে কেরী যে কেন তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী ও তৎসঙ্গে মিশন থেকে বৃত্তি দিয়েছিলেন তার কারণ ঠিক বোঝা যায় না। রামবসুর মধ্যে নানাগুণের আধিক্যের জন্যেই যদি তাঁকে পুনরায় চাকরীতে নেওয়া সঙ্গত মনে হয়েছিল তবে তাঁকে বিদায় দেওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? কেরীর মত খ্রীষ্টভক্তগণ তাঁকে এ ক্ষমা আগেও করতে পারতেন! এ কথাগুলি ভাবলে কেবল রাম বসুর চরিত্র নয় কেরী প্রভৃতির চরিত্রও রহস্যজনক মনে হয়। নিখিলনাথ রায়ের উল্লিখিত 'কেরীর অপ্রকাশিত কাগজ পত্রে'র মধ্যে তিনি রাম বসুর সম্বন্ধে কেরীকৃত যে উচ্চ প্রশংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে এ রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ছে। বেশ মনে হয় রাম বসুর প্রতি দোষারোপের মধ্যে একটা বড় রকমের গলদ আছে। এ গলদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন, যখন দেখতে পাই যে পূর্ব্বোল্লিখিত মার্শমান, কেরীর সঙ্গে রাম বসুর পুনর্মিলন (১৮০০) সম্বন্ধে লিখছেন :

"প্রায় এ বছরের মাঝামাঝি শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে রাম বসু মিশনারীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ইনি (পূর্ব্বে) কয়েক বছর ধরে মিঃ টমাসের সাহচর্য্য করেছিলেন এবং কিছুকাল যাবৎ মিঃ কেরীর মুন্সী ছিলেন। সে সময়কার অন্য কোন দেশীয় লোকের চেয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্বসম্বন্ধে তাঁর বোধ স্পষ্টতর ছিল এবং তিনি স্বদেশের লৌকিক কুসংস্কারগুলিকে দার্শনিক জনোচিত অবজ্ঞার সঙ্গে দেখতেন কিন্তু পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত দৃঢ়সংকল্প তাঁর ছিল না। মিঃ মার্শমান (=জশুয়া মার্শমান) লিখেছেন, "যে সকল বন্ধন পিতার, স্বামীর, সন্তানের এবং প্রতিবেশীর হৃদয়কে জড়িয়ে রাখে খ্রীষ্টের নিকট নিজকে সমর্পণ করবার আগে সে সকলকে ছিন্ন করা প্রয়োজন।" রাম বসুর খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসের চেয়ে সে সকল বন্ধন দৃঢ়তর ছিল"।১৫

যদিও লুইসের মতে খ্রীষ্টের প্রতি রাম বসুর ভক্তি প্রদর্শন কেবল ভণ্ডামি এবং সরলপ্রাণ টমাসের অর্থশোষণের কৌশল মাত্র, মার্শমান দ্বয়ের উল্লিখিত উক্তি থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে রাম বসুর চরিত্র যদি বর্ণিতরূপ জঘন্য হত তবে কেরীর সহযোগী জশুয়া মার্শমান যে তা জানতেন না এমন কল্পনা দুষ্কর মনে হয়। অথচ মার্শমান যে

(১২) Rai Bahadur R. P. Chanda and Dr. J. K. Majumdar—Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohan Roy, vol. 1. Calcutta 1938. xxxiv-xxxv

(১৩) প্রা গ্র. পৃ xxxii

(১৪) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৯। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এ অংশটি পূর্ব্বে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

(১৫) মার্শমানকৃত পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃঃ ১৩২; রাম বসুর জনৈক জীবনীলেখক এ পুস্তকের উল্লিখিত অংশটির সংলগ্ন কোনও অংশ তাঁর বইতে উদ্ধৃত করলেও, কি কারণে জানি না, এ অংশটির প্রতি অবহেলা করেছেন (দ্রঃ রামরাম বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, পৃঃ ৩৬-৩৭ এবং পূর্ব্বোক্ত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকা—পৃঃ ২৮০)।

কেরীর জার্ণাল পড়েন নি একথা ভাবাও শক্ত। কিন্তু এরূপ পরস্পর সংহারক (*conflicting*) উক্তি থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি সম্ভব? টমাসের উল্লিখিত জীবনীখানি ভাল করে পড়লে এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলতে পারে। তখন মনে হতে পারে যে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য হলেও হয়ত অসাধ্য নয়। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

উপস্থিত সমস্যাগ্রন্থির মোচন দুভাবে হতে পারে: (১) অনুমান করা যেতে পারে যে রাম বসু একবার অপরাধ করে থাকলেও পরে নিজকে শুধরে ছিলেন এবং খুব সম্ভব রামমোহন রায়ের মহৎ চরিত্রের প্রভাবে রাম বসুর চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এসেছিল, যার ফলে কেরী তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে বা মিশনের কাজে নিয়োজিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি! কিন্তু এরূপ অনুমান অযৌক্তিক না হলেও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে একে হয়ত পরিত্যাগ করতে হবে।

(২) পূর্ব্বোল্লিখিত লুইসকৃত টমাসের জীবনীতে রাম বসু সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার পূর্ব্বক আলোচনা করলে মনে হয় যে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলেই রাম বসুর বিরুদ্ধে অপবাদ রটেছিল এবং কেরী অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁকে দোষী মনে করতে বাধ্য হয়ে কর্ম্মচ্যুত করেছিলেন; পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাম বসুকে পুনরায় চাকরী দিয়ে পূর্ব্বকৃত ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করেন। একথাটি শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও লুইসকৃত টমাসের জীবনীতে রাম বসুর সম্বন্ধে উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে (যে ঘটনাগুলির সম্বন্ধে দীনেশবাবু ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য রাম বসুর চরিতলেখকগণ আশ্চর্য্যজনক ভাবে উদাসীন) লুইসের মতামত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিরপেক্ষভাবে দেখলে পূর্ব্বোক্ত মত পোষণ করতে হয়।[১৬]

টমাসের সঙ্গে কিছুকাল মালদহে বাস করার পরে রাম বসু নিজ যোগ্যতা ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা এই প্রচারকের প্রীতিলাভ করেছিলেন। মনে হয় এই প্রীতির জন্যে অর্থহীন ও অভাবগ্রস্ত রাম বসুকে টমাস বেতনের অতিরিক্ত অর্থও মাঝে মাঝে দান করতেন। এ অর্থলাভ ছাড়াও রাম বসু টমাসের শিক্ষকতার দ্বারা অন্য দিক দিয়ে লাভবান্ হয়েছিলেন। টমাস তখন মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট মিঃ উড্নীর পরিবারে বাস করছিলেন। এ হেতু কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারী উড্নীর বন্ধু টমাসের শিক্ষকরূপে রাম বসুকে সেখানকার লোকে নিশ্চয়ই একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত। একুশ বাইশ বছরের এক জন যুবকের এতটা সৌভাগ্য দেখে সে জায়গায় কোন কোন লোকের পক্ষে ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। টমাসের জীবনীতে বর্ণিত যে সকল ঘটনা এখানে বলা যাবে সেগুলির আলোচনা করলে মনে হয় সত্যি এরূপই কিছু ঘটেছিল। কিন্তু শুধু এরূপ ঈর্ষায় রাম বসুর কোন ক্ষতিই হত না যদি মিঃ টমাস স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চরিত্র লোক হতেন। তাঁর স্বভাবের দুর্ব্বলতার (বিশ্বাসপ্রবণতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততার) কথা যখন ক্রমে ক্রমে লোকে জানতে পারল তখনই ধীরে ধীরে রাম বসুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হল। মনে হয় ঐ ষড়যন্ত্রের মূলাধার ছিল মোহন চাঁদ অধিকারী নামক এক 'গুরুগিরিব্যবসায়ী' লোক। ইনি একদিন টমাসের নিকট উপস্থিত হয়ে খ্রীষ্টভক্তি জানাতেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস-প্রবণতা (credulity) এবং ধর্ম্মান্ধতাবশত তাঁকে খাঁটি লোক মনে করে তদুপযোগী ব্যবহার করতে লাগলেন।[১৭] এ ঘটনার পরে রাম বসু একবার বাড়ি থেকে ফিরে এলে টমাস তাঁকে খ্রীষ্টান হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন কিন্তু প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান হবার পক্ষে তাঁর যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তা জানিয়ে দিতেই টমাস আর জোর করলেন না।[১৮] তখন থেকে রাম বসু এবং মোহনচাঁদ দুজনেই টমাসের সাহায্যকারী হিসাবে রইলেন।[১৯] রাম বসু ছিলেন বেতনভুক এবং মোহনচাঁদও মাঝে মাঝে কিছু অর্থ পেতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে মনে হয় মোহনচাঁদ অন্তরে রাম বসুর প্রতি ঘোর বিদ্বেষ পোষণ করত। ১৭৮৯ সালের শেষ ভাগে রাম বসু যখন ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন তখন মোহনচাঁদ একদিন টমাসের নিকট রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ ইঙ্গিত করল যে তিনি (টমাস) যাঁকে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান সেবক এবং শিষ্য বলে ভাবছেন তিনি নানা প্রতারণা ও দুষ্কর্ম্মে নিপুণ। মোহনচাঁদ আরও বলল যে রাম বসু বাড়ি যাওয়ার নাম করে আর এক জায়গায় চাকরী খুঁজতে গিয়েছেন এবং চাকরী না পেলেই ফিরে আসবেন এবং তিনি বিশ্বাসঘাতক, তাঁর পূর্ব্ব মনিব তাঁকে যে যে কাজের ভার দিয়েছিলেন সে সে কাজেই রাম বসু তাঁকে ঠকিয়েছেন, আর তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে গুরুতর কথা এই যে, তিনি এমন সব ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন যার বর্ণনা শুনলে লোকে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে।[২০]

এ সকল কথা জেনে টমাস সাময়িক ভাবে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ও বিপন্ন হলেন কিন্তু সত্য নির্ণয় করবার মত স্থিরবুদ্ধি না থাকায় সেদিকে তিনি কোন চেষ্টাই করলেন না! খ্রীষ্টতত্ত্ব জানতে উৎসুক এমন দু-এক জন লোক সঙ্গে করে রাম বসু যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে টমাসের দুশ্চিন্তা হালকা হয়ে গেল কিন্তু মোহনচাঁদ যে মিথ্যা অভিযোগ এনে থাকতে পারে এবং সে জন্যে তিরস্কারের যোগ্য একথা তিনি ভুলেই গেলেন। রাম বসুর সঙ্গে তুল্য ভাবে মোহনচাঁদ টমাসের প্রিয়পাত্র হয়ে রইল।

এ ঘটনার অল্পকাল পরে পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায় নামক মোহন অধিকারীর এক আত্মীয় এসে তার সঙ্গে জুটে টমাসের অর্থশোষণের কাজে ব্রতী হল।[২১] বলা বাহুল্য, এ লোকটিও মোহনচাঁদের মত ভণ্ড। খুব সম্ভব মোহনই তাকে নিজের কাজের সুবিধার জন্যে জুটিয়ে ছিল এবং টমাসের নিকট রাম বসুকে অপদস্থ করাও হয় ত ছিল এই সংযোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য এরূপ ধারণার পরিপোষক গৌণ ছাড়া কোন সোজাসুজি প্রমাণ নেই। সে যাই হোক সুচতুর পার্ব্বতী অল্প দিনের মধ্যেই টমাসের মনকে মুগ্ধ করল। একদা কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে রাম বসু ও পার্ব্বতীর সঙ্গে বসে টমাস যে ভগবৎ প্রার্থনা করেছিলেন তার বিবরণে তিনি লিখেছেন:-

"মুনশীর (রাম বসুর) প্রার্থনা বেশ বিবেচনাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হলেও পার্ব্বতীর প্রার্থনার বরণধারণ ও বক্তব্য তখন আমার নিকট অনির্ব্বচনীয়রূপে মধুর এবং ভাবোদ্দীপক লেগেছিল"।[২২]

এ ঘটনার কিছুকাল পরে আবার রাম বসুর বিরুদ্ধে টমাসের নিকট মিথ্যাভাষণ, প্রতারণা ও ব্যভিচারের অভিযোগ উপস্থিত হল।[২৩] কিন্তু কে এই অভিযোগ উত্থাপিত করল লুইস্ সে সম্বন্ধে নীরব। যদি এ ক্ষেত্রে অনুমান অসঙ্গত না হয় তবে ভাবা যেতে পারে যে মোহনচাঁদ বা

(১৬) ঘটনাগুলির জন্যে লুইসের উক্তি সংক্ষিপ্ত ভাবে পুনর্ব্বর্ণন করলেও সে সকল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ও টিপ্পনী প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য মনে করি নি। কারণ রাম বসু যে তাঁর শত্রু মোহনচাঁদের দুষ্কার্য্যের সহযোগী হতে পারেন নি এ সোজা কথাটি লুইস বুঝতে পারেন নি।

(১৭) লুইস—প্রা. গ্র. পৃঃ ১২৪
(১৮) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১২৫
(১৯) লুইস্—প্রা গ্র. পৃঃ ১৪১,
(২০) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১৫৪
(২১) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১৬৫-১৬৬
(২২) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১৬৭

তারই পক্ষীয় কোন লোক দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছিল। সে যাই হোক (লুইসের মতে) রাম বসুর অনুতাপবাণী শুনে টমাস তাঁকে ক্ষমা করলেন। এ ব্যাপারের পরে এক দিন টমাস, রাম বসু, মোহন ও পার্ব্বতী এ তিন জনকে স্পষ্ট জানালেন যে যদি তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা না লন তবে তাঁদের বেতন ও অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন (লুইসের মতে) তাঁরা তিন জনে সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করে দীক্ষা নিতে স্বীকৃত হলেন কিন্তু কার্য্যকালে দীক্ষার স্থানে কাউকে পাওয়া গেল না।২৪ এ ব্যাপারে টমাস মোহনচাঁদকেই সব চেয়ে বেশি দায়ী করেছিলেন।২৫ লুইস্ কিন্তু টমাসের এ পক্ষপাতের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।২৬

এ সকল ঘটনার কিছুকাল পরে ১৭৯২ সনের গোড়ার দিকে টমাস এক দিন বিলাত চলে গেলেন এবং রাম বসু ও পার্ব্বতী গিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলেন। কিন্তু কিছুকাল বিলাতে থেকে ১৭৯৩ সালের শেষের দিকে টমাস কেরীকে সঙ্গে করে নিয়ে কলিকাতায় ফিরলেন। মিঃ কেরী এদেশে আসবার পরে রাম বসুকে নিজের বাংলা শিক্ষক বা মুনশী নিযুক্ত করলেন। কেরীর সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে রাম বসু যখন অবশেষে মদনাবাটিতে বাস করতে লাগলেন তখন তাঁর শত্রু মোহনচাঁদ আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠল। টমাস ও কেরী যথাক্রমে মইপালদীঘি এবং মদনাবাটিতে গিয়ে বসলে মোহনচাঁদ এসে তাঁদের দু-জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল, কিন্তু পার্ব্বতী তখনও দেখা দিতে চাইল না, কারণ কিছু আগে রাম বসুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল।২৭ "সে যাই হোক টমাস ও কেরী পার্ব্বতীর খ্রীষ্টভক্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা পেলেন তাতে তাঁদের আশার সঞ্চার হ'ল।২৮ এদিকে মোহনচাঁদও কেরীর আসবার কিছুকালের মধ্যে তাঁর বিশ্বাস অর্জ্জন করল।২৯ মোহনচাঁদের সম্বন্ধে কেরী-আদির যখন এরূপ মনের ভাব তখন মিশনারীরা দিনাজপুর থেকে পাঁচ জন উচ্চবর্ণের হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক চিঠি পেলেন। তাতে ছিল খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের কাজে মোহনচাঁদের প্রশংসা এবং আবার মোহনচাঁদকে সেখানে পাঠাবার জন্য আবেদন। পত্র পেয়ে মিশনারীরা উল্লসিত হলেও কিছুকাল পরে দেখলেন যে আর ওরূপ চিঠি আসছে না। তখন তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানলেন যে ঐ সকল নামের কোন লোকই দিনাজপুরে নেই। চিঠিখানি যে মোহনচাঁদের কারসাজি একথা তাঁরা স্পষ্ট বুঝলেন।৩০ মোহনচাঁদ তাঁদের নিকট প্রত্যাশিত অর্থ ও সমাদর লাভ করতে না পেরে নিরাশ হল। এ ঘটনার কিছুদিন পরে (১৭৯৬ আরম্ভ) রাম বসুর চরম অপমানের দিন ঘনিয়ে এল। কয়েক জন লোক মইপালদীঘিতে টমাসকে জানাল যে রাম বসু ব্যভিচার ও তদানুষঙ্গিক ঘোর পাপে লিপ্ত হয়েছেন। রাম বসু তখন মইপালদীঘি থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরবর্ত্তী মদনাবাটিতে কেরীর মুনশীরূপে আছেন। কাজেই টমাস কেরীকে ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য পত্র দিলেন। পত্র পেয়ে কেরী এ বিষয়ে তদন্ত করলেন, এবং রাম বসু দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে কর্ম্মচ্যুত করতে হল।৩১ জানা যায় না কাদের সাহায্যে কেরী এ তদন্তকার্য্য করেছিলেন এবং এ তদন্তের কাজে মোহনচাঁদ, পার্ব্বতী বা তাদের কোন অনুগত লোকের সংশ্রব ছিল কি না। এবং কিঞ্চিদূর্দ্ধ দু-বছর এদেশে থেকে কেরী কতটা বাংলা শিখেছিলেন বা পল্লীগ্রামের লোকদের ষড়যন্ত্র কৌশল ভেদ করার মত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধেও কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। এমন অবস্থায় তাঁর অনুসন্ধানের ফলকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে যে কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরই দ্বিধা হবে। অতএব নূতন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রাম বসুর নামে যে কলঙ্ক রটেছে তার সম্বন্ধে সন্দিহান থাকাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্রই হয় ত এ কলঙ্কের মূল কারণ।

উপস্থিত প্রবন্ধে রাম বসুর জীবনী এবং জীবনীলেখকদের সম্বন্ধে যে দুটি কথা আলোচিত হল তা ছাড়াও অনেক কথা বলবার আছে। বারান্তরে সে সকল আলোচনার ইচ্ছা রইল।৩২

(২৩) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১৭৭
(২৪) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ১৭৯
(২৫, ২৬) লুইস্—প্রাঃ গ্র. পৃঃ ১৮০
(২৭) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ২৭৬
(২৮) পূর্ব্ববৎ
(২৯) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ২৭৭
(৩০) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ২৮৮-২৮৯
(৩১) লুইস্—প্রা. গ্র. পৃঃ ২৯৪
৩২। বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ অনেক বেশি বড় হবে এ ভয়ে টমাসের জীবনী এবং মার্শমানের বই থেকে অনুবাদিত অংশগুলির মূল এখানে দেওয়া গেল না। যাঁরা সেগুলির মূল ইংরাজী দেখতে চান তাঁরা 'বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে টমাসের জীবনী এবং 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে মার্শমানের বইখানি দেখতে পারেন। বই দু খানি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলে এ সন্ধান দেওয়া হ'ল। প্রবন্ধলেখক।

বিপ্লবী বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তখন এসেছে সবে ফেরঙ্গ সভ্যতা
লৌহরথ ছুটিয়াছে ভাঙি নীরবতা
বন-গিরি-প্রান্তরের। উদ্ধত শহর
আকাশে তুলিছে মাথা। তারের খবর
দেশ হতে দেশান্তরে যেতেছে পলকে
আসিয়াছে মুদ্রাযন্ত্র। আমরা পুলকে
গাহিতে লাগিনু উচ্চে—ইংরেজের দান
এনেছে দুর্ভাগা দেশে অশেষ কল্যাণ।
হেনকালে তুমি এসে ভেঙে দিলে ভুল
কহিলে, কিসের লাগি এত হুলুস্থূল ?
ক্ষুধাতুর সর্ব্বহারা—বক্ষ হতে তার
নেমেছে কি দারিদ্র্যের জগদ্দল-ভার ?
সেই প্রশ্ন ব্যাপ্ত করি দিলো চেতনারে
যেখানে নিরন্ন কাঁদে দৈন্যের আঁধারে।

কুসুমের প্রার্থনা

শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কৈলাস শণসুতা দিয়া জাল বুনিতেছিল। জাল বুনিবার তালে তাল রাখিয়া গুন গুন স্বরে অনর্গল গানের সুর টানিয়া চলিয়াছে, আবার কখনও হঠাৎ গান থামাইয়া ন্যাকামি করিয়া ডাকে স্ত্রীকে, বলে, "বউ, জালায় যে মইলাম ; একবার বাইরে আইয়া মুখটা দেখাইয়া যা।" সঙ্গে সঙ্গেই আবার গান ধরে,

"মনের জালায় মইলাম রে সুবলসখা,
মইলাম প্রেমের জালায়—"

বউ মানে কৈলাসের স্ত্রী কুসুমকুমারী।

কুসুম এতক্ষণ নিস্তব্ধেই বিছানায় শুইয়া ছিল। বিছানায় সে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটায়। কারণ প্রায় ছয় মাস যাবৎ সে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। দিনের মধ্যে কম করিয়াও অন্তত বার দশ তাহাকে বিছানা লইতে হয়। ইহাই নাকি ম্যালেরিয়া জ্বরের বৈশিষ্ট্য। বিছানায় যাইবার পূর্বে মিনিট দুই-তিন ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সারা গায়ের একটানা কম্পনটাকে একটু ধাতস্থ করিয়া লইয়া দুই চক্ষু বন্ধ করিয়াই বিছানায় লম্বা হইয়া পড়িয়া যায়। দুইটা কাঁথা সারা গায়ে জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। ধীরে ধীরে রক্তের ধারা মাথার ভিতর হইতে সারা গায়ে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কথা বলিবার সামর্থ্য থাকে না। হাতের কাজ পড়িয়া থাকে, সাহায্য করিবার লোক নাই। এক জন যে আছে, সে কুড়ের বাদশা, নিষ্কর্মা পুরুষ। তাহা ছাড়া কৈলাসও ম্যালেরিয়ার রোগী। তবে কুসুমের মত নিয়ম আর সময় বাঁধা রোগী নয়। হঠাৎ কোন দিন জ্বরটা আসিয়া পড়ে। কিন্তু যখন আসে তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হিষ্টিরিয়া রোগীর মত ঘণ্টাখানেক হাত-পায়ে দাপাদাপি করিয়া, ঘরের জিনিসপত্তর নষ্ট করিয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে, বারো ঘণ্টার মধ্যে চক্ষু মেলিয়া দেখে না।

কুসুম বলে, তোমার এ মেলারী জ্বর না কচু! এর নাম ফাঁকি-জ্বর। কাম করণের কথা কইলেই জ্বর আইএ। ঘরে চাউল নাই, ডাইল নাই কইলেই হইছে—"মইলাম রে মইলাম—বিছানাডা পাত্‌ শিগ্‌গির বউ" এ আমি বুঝি খুব! জ্বর আওনের পথটা আমি চিন্যা রাখছি।

কৈলাস হাসে আর কপট গাম্ভীর্য্যে চোখ পাকাইয়া বলে, সব টের পাইয়া যে গেলি বউ—এখন উপায় করুম কী? ফাঁকি দেওনের লাগি কোন্ পথটা ধরি কওছে।

কুসুম বলে, ফাঁকি আর দেওয়ন লাগবো না, বউ খুব চালাক হইছে এখন।

কথা শুনিয়া কৈলাস মুখ টিপিয়া শুধু হাসে।

কৈলাস জালের ঘরগুলি চোখের সম্মুখে টানিয়া লইয়া বার-বার পরীক্ষা করে, আর শয্যায় শায়িত স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলে, "বলি.বউ, এইডা কি তোর অনন্ত-শয্যা? বিশ্ব-ব্রেম্মাণ্ড যে ইদিকে তলাইয়া গেল রে। ওঠ্‌ এখন।"

কুসুমের শরীর ভাল নয়, তদুপরি মনটাও খুব খারাপ ছিল। ঘরে এক মুঠো চাল নাই আজ যে কোন মতে সিদ্ধ করিয়া তার নিষ্কর্মা কুড়ে স্বামীর পাতে দিতে পারে। নিজের কথা তত ভাবে না, জ্বরের শরীরে মাঝে মাঝে লঙ্ঘন দেওয়াই ভাল। কিন্তু এই যে লোকটা ঘুম হইতে উঠিয়াই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গান গায় আর বোনা জালের সুতা খুলিয়া আবার নূতন করিয়া জাল বোনে—রোজগারের পথ দেখে না, বলিলেই শুধু দাঁত বাহির করিয়া বোকার মত হাসে আর বলে, "চাউল নাই ঘরে মান্‌লাম, কিন্তু তুই তো আছস্। তুই আইয়া সামনে বইয়া থাক্—দেখিস্ আমার পেট ভইরা গেছে।" এমন লোক যে, তাকে লইয়া কি করিয়া সংসার চালাইবে? না, এই লোকটার জালাতেই কুসুম এক দিন পাগল হইয়া যাইবে। নয়ত এক দিন দুই চোখ যেদিকে যাইতে চায় সে চলিয়া যাইবে, আর কখনও ফিরিয়া আসিবার নামও করিবে না।

কৈলাস পুনঃ গলা বাড়াইয়া ডাকিল, কি রে বউ, মেলারীবিবি তোরে ছাড়লো?

কুসুম এইবার বিছানা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কৈলাস দুই চোখ বন্ধ করিয়া গান ধরিল, আমি এই রূপ আর হের্‌বো না গো—কালো রূপে ভুবন আলো···

কুসুম ধমক দিয়া উঠিল, বলিল, চুপ করছেন, ভালা

লাগে না আর। পেডে ভাত নাই—গলা ছাইড়া গান গাওনে লজ্জা করে না? মাইন্‌সে শুইন্যা কী কয়!

—মাইন্‌সে শুইন্যা আবার কইবো কি ডা? তুই কি পাগল হইলি বউ? মাইন্‌সের কওয়নডারে আমি ডরাই!

কুসুম এইবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কি সব ছোট-লোকের মত কথার ছিরি! ঘরের বউরে "তুই-তুমারি" কইরা কথা কওয়ন শুনলে আমার বেবাগ শরীর জলে। কেষ্টলীলার দলে থাইক্যা এই গুণখানই হইছে তোমার।

কৈলাস যেন অবাক হইয়া বলিল, "তুই আবার কবে থাইক্যা ভদ্রলোক হইলি ঠাকুরাইন? ছাইড়া দেরে ছাইড়া দে, এমন সখটা রাখিস না আর ধইরা। ভদ্রলোকগিরি আমাগো পুষাইবো না।"

—না পুষাউক, তুমি আমারে আর 'তুই-তুমারি' করতে পারবা না জানাইয়া রাখলাম।

—তুই তো জানাইয়া রাইখ্যাই খালাস হইলি ঠাকুরাইন, ইদিকে কৈলাস বোষ্টবী যে ঠেক্‌লাইন মাঝ গাঙে আইয়া।

কৈলাস এত দিনে সত্যিই ঠেকিয়া গেল। ইহা তার বহুকালের অভ্যাস, এখন স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আট বৎসর বয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল শিশু কুসুমের সঙ্গে। বিবাহ সম্বন্ধে তখন দুই জনই একমতাবলম্বী ছিল। বিবাহও বুঝিত না, স্বামী-স্ত্রীও বুঝিত না। তখন ছিল একে অন্যের খেলার সাথী, ঝগড়া করিবার প্রতিপক্ষ। ঝগড়া করিয়া একে অন্যকে প্রায় খুন করিয়া ফেলিবার কল্পনাও তখন করিয়াছে। একজন ঘুসি চালাইলে অন্য জন হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া পলাইয়াছে। কুসুম অল্প বয়সেই মুখরা মেয়ে বলিয়া খ্যাত ছিল, ঝগড়া করিয়া মার খাইয়াও ইচ্ছামত শোধ তুলিয়া ছুটিয়া পলাইত। আবার দূরে দাঁড়াইয়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকদের মত কোমরে দুই হাত রাখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিত, "মর্-মর্ মুখপুড়া, তুই মইলে রাজ্যের মানুষের হাড় জুড়াইব।"

তার পরই আবার শাশুড়ীর কাছে যাইয়া সত্য-মিথ্যায় নালিশও করিত। কিন্তু তখনকার দিনে কৈলাস অল্প কয়েক দিনের জন্য বাড়িতে আসিয়া থাকিত। কেহ কাহাকেও বড় হইয়া উঠিতে দেখিতে পায় নাই। কৈলাস কৃষ্ণলীলার দলে থাকিয়া সখী সাজিত—গান গাহিত, নাচিত—বাড়িতে আসিবার নামও করিত না। তার পর প্রায় একটানা নয়টি বৎসর একেবারে নিরুদ্দিষ্ট ছিল। কোথায় আছে বা কেমন আছে, কোনরূপ খবরই জানাইত না। তখন তার নিজের গড়া দল লইয়াই মাতিয়া ছিল। বাড়ির কোনরূপ আকর্ষণই তার মনে পড়িত না। তার পর হঠাৎ এক দিন বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে তার সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে। সাত বৎসর বয়সের কুসুম তখন পূর্ণ যুবতী। স্ত্রীকে দেখিয়া কৈলাস শুধু মুগ্ধই হইল না, ঘরের বাহির হইবার পথটাকেও একেবারে যেন ভুলিয়া গেল। অবশ্য কুসুম স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে নাই—কৈলাসই ভুলিয়া থাকিবার জন্য গর্ব অনুভব করিল যেন···তার পর আরও কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল তাহাদের মিলিত জীবনধারার মধ্যে। সেই জীবন-যাত্রা মধুর হইলেও সহজ সুন্দর হয় নাই।

স্ত্রীকে ছোটলোকি সম্বোধন করিবার বেলাতেই শুধু কৈলাস ঠেকিয়া যায় নাই—ঠেকিয়াছে আরও অনেকগুলি ব্যাপারেই। স্ত্রীকে হয়ত দুই কথার স্থানে দশ কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিবে, কিন্তু অন্য সবগুলিকে দুই শত 'দশবার' বলিয়াও ত কোন ফল হইবে না। কৈলাস সেই জন্যই ঐগুলিকে মনে স্থান দেয় না।

কৈলাস চুপ করিয়া থাকিয়াই জালটা বুনিতেছিল।

কুসুম সম্মুখে আসিয়া বলিল, গাঙের মাছ দেখছি আর পালানির পথ পাইবো না—বেবাগই আইয়া জালে লাগবো।

হাসিয়া কৈলাস বলিল, এইডা আমার প্রেমের জাল, গাঙের মাছ না লাগলেও ঘরের মাছটারে তো প্যাঁচাইয়া তুল্‌বাম।

—ঘরের মাছটারে তুইল্যাই ফেলছো গো—এখন কাইট্যা খাও। ঘরে তো আর কিছুই নাই—লও দাওখান হাতে, কাইট্যা টুক্‌রা টুক্‌রা কইরা খাও। আমি তা হইলে একটুক্ মইরা বাঁচি।

কুসুমের কথা শুনিয়া কৈলাস প্রায় লাফাইয়া উঠিল, বলিল, ওরে সর্বনাইশ্যা কইস্ না এমন কথা—

—কইয়া আর বেশি কিডা হইবো, শুনি? মরণের বাকী আছে আমার?

—আরে তেও কয় হেই কথা! 'মরণ-মরণ' এত কইস্ না বউ, শেষটায় কী হইতে কী হইয়া যায় কেউ কইত পারে? তোর এত এত সখ পইরা থাকবো আমার চোক্কের সামনে—আমি দেখ্‌বাম কেম্‌নে? সংসারের বেবাগ সখটাই মিডাইস্ বউ, মরণের সখটারে মুখেও আনিস্ না কিন্তু।

—কিয়ের লাইগ্যা আনতাম না শুনি? তুমি তো আমারে মাইরা ফেলানির কলই করছ দেখ্‌তাছি।

—এইডা কী কইলেরে বউ! তোরে মাইরা ফেলানির আগে আমি নিজে মরতাম না?

—হেই কথাডাই তো কইতাছি গো; নিজেও মরতাছ আমারেও পুইড়া মারতাছ।

—কেম্‌নে দেখা?

—দেখাইবাম আর কয়ডা কওছেন? ভরাশাওয়ন গেল ঘরডা ছাওনের নাম করলা না—মাসভরা ভিজ্‌ঞা মরলাম। ঘরের বেড়া ভাইঙ্গা পড়ছে; চাল বাইয়া, টুই বাইয়া জল পইড়া দেউরিডাও পড়্‌ছে। এখন কুত্তা, শিয়াল, বেজি, বেঙ্‌, সাপ আইয়া ঘরে মান্‌সের লগেই ঘুমায়। কত আর উইঠ্যা খেদান যায় কওছেন?

কৈলাস এইবার শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাস্‌লা যে? এই লাইগ্যাই তো আমার রাগ উডে।

—তোর রাগডা ওঠ্‌লেই তোরে আমি বাঁচি বউ। তোর রাগের মুখটা দেখলেই আমার গাডা শীতল হইয়া যায়। কর্‌ একটুক্‌ রাগই কর্‌—

কৈলাসের কথা বলিবার ঢং দেখিয়া কুসুমেরও হাসি পাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা করিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, এক্কেবারে শীতল্‌ হইবো জানি আমি মইলে। কামের কথা কইলেই যত ফষ্টি-নষ্টি করণ আমার ভালা লাগে না।

—তোর কামের কথাডা এখন একটুক্‌ রাইখ্যা দেছেন—ভালা লাগে না বিহাইন্যা বেলা উইঠ্যাই বেবাগ কামের জায় শুন্‌তে। রান্‌ছস্‌ কিছু আইজ?

—হিয়ার লাইগ্যাই তো তোমার কাছে আওয়ন। দেও কাইট্যা আমারে—গিয়া রাইনধ্যা দেই।

—দেখ্‌, এক কথা হগ্‌গল সময় কইস না, কইয়া দিলাম।

—কমুই তো।

—খুব ক'। দেখিস্‌ এক দিন ইয়ার উল্‌টাডা হইবো। তরে থুইয়া আমারই যাওয়ন লাগবো।

কুসুম এই বার জব্দ হইল। দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, কথা বলা হইল না, ঠোঁটেই সমস্ত কথা জড়াইয়া গেল যেন।

কৈলাস চঞ্চল হইয়া উঠিল, ডাকিল, 'বউ!'

কুসুম শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মুহূর্তের মধ্যেই যেন খান্‌খান্‌ হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল। কৈলাস উঠিয়া যাইয়া কুসুমকে দুই হাতে প্রায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কান্‌দস্‌কে রে বউ? কী কইলাম যে এম্‌নে কাইন্‌ধ্যা ওঠ্‌লি?

কুসুম এক ঝট্‌কা দিয়া নিজেকে স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি মরলেই তো গো তুমি সুখী হও—

—আবার?

—আবার না তো কী? আমি আর পারুম না, আমি এখন মরণই চাই।

—এত দিন তো খুব পাইরা উঠ্‌ছিলি বউ, আইজ হডাৎ না পারনের কীডা হইল ক'ছেন?

—কাণা মাইনসেরে কত আর দেখাইবাম আমি?

—যাক্‌ বাঁচাইছস্‌ বউ। এতক্ষণে একটা হাচা কথা কইছস্‌ দেখ্‌তাছি। এই বেবাগ কথাডার মধ্যেই কইয়া উডস্‌ 'মরবাম-মরবাম'—আচ্ছা বউ, বুকটাত্‌ হাতখান্‌ রাইখ্যা ক'ছেন, আমরে ফালাইয়া রাইখ্যা তুই একলা মরতে পারবি? মনডা তোর্‌ কয় এমন কথা?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

চুপ সে রোজই করে। স্বামীর সঙ্গে কোনদিনেই সে কথায় পারিয়া উঠে না। মনের ক্ষোভ মনেই চাপা পড়িয়া থাকে—প্রকাশ করিতে যাইয়া শুধু চোখের জল ফেলাই সার হয়। এত করিয়া ভাবিয়া রাখে স্বামীকে খুব শক্ত কথা শুনাইবে কিন্তু সম্মুখে আসিয়া সবই তার ভুল হইয়া যায়। কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই কৈলাস হাসে আর গান গায়। অথচ সংসারটা যে কি ভাবে চলিবে তাহা যদি একবারের জন্যও একটু ভাবিয়া দেখে। কৈলাস এইদিকে একেবারে অন্ধ। ঘরের চাল নাই, বেড়া নাই, ভিত্‌ ধ্বসিয়া পড়িয়া ভূমিতে মিশিয়াছে। খামার জমি নাই, হাল নাই, গরুও নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এক খণ্ড জমি। তাহাও নিজে চাষ করিতে পারে না, গ্রামের একজন চাষীর সঙ্গে আধিব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। ঐ জমি হইতে যে ধান ঘরে আসে তাহাতে সম্বৎসরের খোরাক ত দূরের কথা তিন মাসও কুলাইয়া উঠে না। ধানের কথা তুলিলেই কৈলাস গম্ভীর হইয়া জবাব দেয়, কর্তারে তো ধরছি, কইছেন সকালেই একটা ব্যবস্থা কইরা দিবেন। জমি চাইলেই তো দুই আরা জমির আধি বন্দোবস্ত কইরা দেন্‌ কিন্তু হাল-গরু না কিন্‌ন্যা জমিডা খামাকা লওয়ন হইব! পূজাডা পার হউক—ঠিক জমিও লমু, হালগরুও করুম। এই কয়ডা দিন তুই কোনমতে চালাইয়া নে—দেখিস্‌ পূজার পরে জাল আর ধরতাম না, লাঙ্গলের খুঁটি ধর্‌বাম ঘুম থেইক্যা উঠ্‌ঠাই। তখন তো কইবি, ঘরে একটু রওনাগো, একলা বাড়িত্‌ থাকি কথা কওনের মানুষ পাইনা! হুঁ।

কথা শুনিয়া কুসুম জলিয়া উঠে, বলে, কওনের আমার ঠেকা লাগ্ছে! ধানে-চাউলে ঘর ভইরা ফেলাইবা—মুরাদ জান্তে আর আমার বাকী আছে কিছু?

কৈলাস বলে, কথা কইলেই তো তুই বিশ্বাস কন্নতে চাস্নারে বউ! এই লাগাই তো কইনা কিছু। কর্তা তো কাইলও ডাইক্যা কইলাইন, 'জমি, জমি' করস্ কৈলেস, নে গাঙের পাড়ের দুইডা জমি দিতাছি—চাষ আবাদ কর্।

—হুঁ, গাঙের পাড়ের জমি লওনেরই এখন তোমার কাম। ঘরের একটা মানুষ যখন আছে—পুড়ান তো লাগবোনে। যাও গো যাও, কর্তার মোড়া পাও দুইডা জড়াইয়া পইড়া থাকগা।......জমি দিতে কয় তো ইদিকে রোজ পেয়দা পাঠায় কিয়ের লাইগ্যা শুনি?

কৈলাস এইবার ব্যস্ত হইয়া বলে, চুপ চুপ—আস্তে কথা ক পাগ্লী।

—কার ভয়ডা শুনি?

—তোরে লইয়া দেখ্ছি মুস্কিলেই হইবো শেষটায়। কর্তার কানে গেলে আর উপায় আছে রে সর্বনাশী!

—এম্নেই বেবাগ উপায় আইয়া ঘর-বাড়ী ভইরা রইছে। খাতিরডা কিয়ের লইগ্যা এত?

—খাতিরডা ঠাকুরাইন তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ছে। পেয়দাও আইবনা কইতে চাস?

কুসুমের রাগ বাড়িয়া যায়, বলে, তিন বছরে কয় কাডা ধান ঘরে তুলছি যে খাজনা দেওয়ন লাগব?

—ধানের লগে খাজনার সম্বন্ধ আছে রে পাগলী! রাজার জমির উপরে যখন থাকবাম তখন তো খাজনা দেওনই লাগব।

—এমন রাজার মুখে আগুন।

কৈলাস ধমক দিয়া বলে, চুপ কর্ পাগলী। তুই দেখছি সর্বনাশ ডাইক্যাই আনবি ঘরে। হেরা হইলাইন গরীবের মা-বাপ, এমন কথা মুখে আনতে আছে রে?

এই কথাটাই কুসুমের বেশী অসহ্য বোধ হয়, ঝঙ্কার দিয়া বলে, বাপ-মায়ের পিণ্ডি যুগাইতেই তো মইলাম আমরা। বাপ-মা হওয়ন একেবারে মুখের কথা আর কি! বাপ-মা যে কও—শুনি কিয়ের লাইগ্যা? এইযে মেলারী জ্বরে দেশটা উজাড় হইয়া যাইতাছে—মানুষ মইরা গ্রাম পড়া পড়তাছে—আইয়া চুপি দেয়? চুপি দেওয়ন তো দূরের কথা গাট্টি বাইন্ধা বেবাগ পালাইছেন শহর। গ্রামে থাইক্যা আমরা পইচ্যা মরি—অষুধ খাওনের নাম নাই, হাতে পয়সা নাই, ঘরে চাউল নাই—এই তা দেখে কেডা? মেলারী জ্বরে মর আর কলেরায় মর, খাজনাডা ঠিক থাকে যেন। এই যে গ্রামের বেবাগ বেডা বিছনাতে জ্বরে পইরা কুকায়—জমিত্ লাঙ্গল পড়ে না, ধান পাকলে কাইট্যা ঘরে আনতো পারে না, তোমার বাপ-মারা শহরথনে আইয়া দেইখ্যা যায়? বাবুর বাড়ি কামকাজ কইরা যে দুই-চাইর বেডা খাইব হেই পথখান পর্য্যন্ত বন্ধ হইছে। কেবল খাজনা দেও খাজনা দেও—খাজনাডা আইয়ে কইথনে শুনি?

কুসুম একবার বকিতে শুরু করিলে সহজে আর থামিতে চায় না। অনর্গল বকিয়া যাইবার সময় চোখ-মুখের চেহারাও রুক্ষ হইয়া উঠে। কৈলাস চুপ করিয়া থাকিয়া এক সময় বলে, তুই দেখছি বইক্যা বইক্যাই এক দিন পাগল হইবি বউ।

কুসুম বলে, পাগল হওনের আর বাকী কিডা আছে? আমি পাগল হইছি তোমার ঘর আইয়া। এখন থাইক্যা বাইন্দা রাইক্যো—না হইলে এক দিন তোমাগোর ঐ গরীবের বাপ-মায়ের ঘরে আগুন লাগাইয়া বেবাগরে পুইড়া মারবাম—।

কুসুমের কথা শুনিয়া কৈলাস হাসিয়া উঠে, মনে তার ভয়ও হয়। শেষে যদি এক দিন সত্যিসত্যিই পাগলী বউটা ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। জ্বরে এত ভুগিলে মাথার দোষ ত হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই দিন কৈলাস বাড়ি হইতে তাড়া খাইয়া সারাদিন বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়া কাটাইয়াছে। বাড়িতে যাইতে মন বার-বার চাহিলেও যাইতে সাহস পায় নাই। কারণ, কুসুম আজ ঘুম হইতে জাগিয়াই চটিয়া গিয়াছে। শয্যাত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়া দিয়াছে, ঘরে চাউল নাই, ডাল নাই, পয়সা নাই—চাই সবই। কিন্তু কৈলাস কোথা হইতে যে সেই বিরাট্ চাওয়াগুলিকে মিটায় তাহা একবারও তলাইয়া দেখে নাই। তারপর জমিদারের পেয়াদাও সকাল হইতেই আসিয়া ঘরের দরজার কাছে বসিয়া আছে। তিন বৎসরের বকেয়া খাজনা মিটাইয়া দিতে হইবে। এই ত গেল এক দিকের ব্যাপার! অন্য দিকে আছে, সাড়ে এগারো আনা পয়সা দিয়া এক বোতল ম্যালেরিয়ার যম 'করুণা' কিনিয়া স্ত্রীকে দিতে হইবে। বেচারার জ্বরটা আর কিছুতেই ছাড়িতেছে না। দিনে অন্ততঃ দশ-বারো বার জ্বর আসে। হাতে পয়সা থাকে না বলিয়া আজ নয় কাল নয় করিয়া এত দিন কাটিয়া গেল। এক ফোঁটা ওষুধ মুখে পড়িল না। শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে যেন

বেশী দিন আর ফাঁকি দিয়া রাখা যাইবে না। শেষে যদি মন্দ কিছু হঠাৎ হইয়া পড়ে! একেই ত ভুগিয়া একেবারে কঙ্কালসার হইয়াছে, হাসিয়া কথা বলিতে চোখের কোণ বাহিয়া জল পড়ে। একা কুসুমেরই বা দোষ কেন! ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া গেল—কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই। শুধু পড়িয়াছে কান্না। গ্রামের আকাশে-বাতাসে শুধু কান্নারই একটানা রোল বাজিয়া চলিয়াছে। যাহারা গ্রামে পড়িয়া আছে তাহাদের চোখ-মুখের চেহারা মৃত্যুভয়ে মৃত ছাগলছানার মত হইয়া উঠিয়াছে। কখন কাহার ডাক আসিবে উপর হইতে তাহারই ভাবনাটা বেশী। মাঠে জমির পর জমি পতিত পড়িয়া আছে, চাষ করিবার লোক নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া যদিও কেহ কেহ জমিতে লাঙ্গল-গরু লইয়া যায়, কিন্তু সামান্য রৌদ্র চড়িয়া উঠিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। অনেকে আবার বাড়ি ফিরিয়াই রেহাই পায় না, সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইতে হয়। যাহার হাতে পয়সাকড়ি আছে তাহাদের হয়ত কুইনাইন খাওয়া সুবিধা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের অবস্থাই কৈলাসের মত। জ্বর আসিলেই চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকে, আবার ছাড়িয়া যাইতেই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে দিনের গতি দেখে। কোন দিন এক মুঠো ভাত খাইতে পায়, কোন দিন আবার আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়। কৈলাসরা সারা বর্ষাকালটা রাঙাআলু সিদ্ধ খাইয়া কোন মতে কাটাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশ্বিন কার্তিক মাস দুইটা যে কি খাইয়া কাটাইবে তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না। রাঙাআলুও ত এমন সময় সহজে পাওয়া যাইবে না। ধানও সেই পৌষে মাঘে কাটা পড়িবে। অথচ এই দিকে তিন বৎসরের বকেয়া খাজনা—পূজার পার্বণী দিয়া দিতেই হইবে। হাতে আর মোটে সময় নাই। পূজাও ত আরম্ভ হইয়া গেল। কৈলাসের হঠাৎ মনে পড়িল, বউকে একটা রাঙাপেড়ে শাড়ী কিনিয়া দিতেই হইবে।

…"রাঙাপাইড়ের শাড়ী পরলে বউডারে যা মানায় এক্কেবারে যেন দুগ্‌গা পর্‌তিমা।" ভাবিতে ভাবিতে কৈলাস আনন্দে গর্বে আপন মনেই নাচিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে পড়িয়া যায় অভাবের কথা। বেচারা কুসুম কত দুঃখেই না দিন কাটায়। পরনের একটা ভাল শাড়ী পর্য্যন্ত কিনিয়া দিতে সে পারে না। ছেঁড়া বহুকালের পুরানো একটা শাড়ী পরিয়া থাকে। দেখিতে তার নিজেরই এক এক সময় লজ্জা করে। সেলাইয়ের উপর সেলাই করিয়া একটা কাঁথা তৈরি হইয়াছে তবুও যদি সমস্তটা গা ঢাকা পড়ে। কিন্তু তবুও কুসুমের মুখে সামান্য দাবী পর্য্যন্ত নাই। তার পর আবার ঘরটাকেও এখন দুরস্ত করিয়া তুলিতে হইবে, সামান্য ঝড়-ঝাপটাতেই কাত হইয়া পড়িয়া না যায় আবার।

কৈলাস আজ একসঙ্গে সব কথাই ভাবিতে বসিল। বেলা পড়িয়া গেল তবুও বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে ভরসা পাইল না। একেবারে শূন্য হস্তেই বা কোন্ সাহসে বাড়িতে যাইয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইবে!

দুর্বল শরীর লইয়া কৈলাস সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কাটাইল, কিন্তু সন্ধ্যা হইবার সঙ্গেই তার পা দুইটা যেন ত্রিশ মণ ভারী হইয়া গেল। আর চলিতে চায় না। বাড়ির নিকটে আসিয়া কৈলাস পুকুরপাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর এক সময় পুকুরপাড়ের ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। ঘুম যখন ভাঙিল, রাত্রি তখন অনেকখানি হইয়াছে। সারাটা আকাশের গা তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের নয়াচাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, আকাশের বুকে তার শেষ আলোর রেখাও আর চোখে পড়ে না। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম হইয়া গিয়াছে। কৈলাসের ভয় হইতেছিল। মনে পড়িয়া গেল কুসুমের কথা। বেচারী একা বাড়িতে পড়িয়া থাকিয়া কত ভয়ই না পাইতেছে! যা ভীতু মেয়ে! অন্ধকারে একা ঘরের বাইরে যাইতে হইলে কৈলাসের একটা হাত ধরিয়া তবে যায়। সর্বনাশই বুঝি এতক্ষণে ঘটিয়া গেল। কৈলাস ভাবিতে ভাবিতে ছুটিয়া যাইয়া ঢুকিল বাড়ির ভিতর আঙ্গিনায়। ঘরের দরজা ঠেলিয়া দিতেই খুলিয়া গেল, ঘর অন্ধকার, কোনরূপ সাড়া নাই, একটা কুকুর ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভয় পাইয়া কৈলাস 'মাগো' বলিয়া লাফাইয়া নীচে নামিয়া যাইতেই কুসুম বিছানা হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। কৈলাস ভয়ে ভয়ে ডাকিল, 'বউ'। কুসুম উঠিয়া আলো জ্বালাইতেই কৈলাস ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বোকার মত হাসিয়া বলিল, খুব ভয়ডা পাইছস্ নারে?

কুসুম প্রায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আহ্লাদ রাখ। দেখি পিঠ্‌খানের অবস্থাডা?

কথা শুনিয়া কৈলাস যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, পিঠখান্ দেইখ্যা কী করবি?

—ফির দেখি আগে। একটুক্ তেলও ঘরে নাই যে মালিশ করণ যাইবো। হাঁ কইরা চাইয়া থাকনের কী হইল? শীগগির ফির না দেখি।

কৈলাস আরও অবাক্ হইয়া গেল, বলিল, তুই কি শেষটায় পাগল হইয়া গেলি বউ? পিঠে তেল মালিশ করণ লাগবো কে রে?

কুসুম এইবার শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, আমার কাছে আর কেন ঢাক্‌তে চাও কওছেন? সারাদিন ঘরে বাইন্ধা রাইখ্যা তোমারে দুধ-ভাত খাওনের দিসে না?

—কী কস্ পাগল-ছাগলের মতন?

—কই আমার মাথা! ঢাক্কোনা আমার কাছে, আমি সব জানি। বাবুর পেয়াদাবেডা তো কইয়াই গেছে, পাইলেই বাইন্ধা লইয়া যাইবো। গরীবের বাপ-মায়ের হুকুম। টেকা না দিলে গায়ের হাড্ডি কয়খান্ নাকি বাপ-মায়ের কাছারি ঘরের দরজায় সেলামী দিয়া আওয়ন লাগবো।

কৈলাস এইবার হাসিয়া উঠিল।

—হাস কেন্?

—হাসি পাগলের কথা শুইন্যা। আমার লাগাল পাইলে তো হাড্ডি পাইবো! পেয়দাবেডা এইখান দিয়া গেলে আমি দৌড় দিছি ঐখান দিয়া। আমারে ধরণ কি পেয়দাবেডার কাম!

কুসুম এইবার অনেকখানি শান্ত হইল। সারাটা দিনমান ঘরে পড়িয়া সে শুধু কাঁদিয়াছিল, আর ভগবানের কাছে করিয়াছিল নালিশ। যাক্ ভগবান্ তবে তাহার ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন।

কুসুম বলিল, কি খাইয়া রইছো সারাদিন কওছেন?

—খাইছিলাম কিছু, এক্কেবারে উবাস দেই নাই।

কৈলাস যে মিথ্যা কথা বলিল কুসুম তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেও জেরা করিবার মত সাহস পাইল না। ভিতরে যেন সে কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই ভাবে কতকাল তাহাদের চলিবে? কুসুম ভাঙ্গা গলায় বলিল, আচ্ছা এই ভাবে কয় দিন পালাইয়া থাইক্যা কাটবো শুনি? পেয়দাবেডা তো কাইলও আইবো। বেডার লাইগ্যা না ঘর থাইক্যা বাইরন যায়, না ঘরে পইড়া থাকন যায়। কেবল চুপি মাইরা মাইরা দেখে। এত মানুষ মরতাছে—কই, এরা তো ঠিকই রইছে!

কৈলাস ভরসা দিয়া বলিল, কাইলের দিনডা পার করতে পারলেই খালাস হমু। পশুদিন থেইক্যা পূজা লাগবো—শেষ হইবো লক্ষ্মীপূজা গেলে। এই কয়ডা দিন পেয়দা-টেয়দার কারবার নাই রে বউ। ঘরে বইয়া থাকলেও কেউ আইয়া দেখবো না। পূজাডা গেলেই ধরবাম বাবুর হাতে-পায়ে।—

কুসুম জ্বলিয়া উঠিল, এই নামডা আমার কাছে কইও না আর। শুনলে গাডা জ্বলে!

পরদিনও কৈলাস বাড়িতে ছিল না সারাদিন। কত রাত্রে যে সে বিছানা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে কুসুম পর্যন্ত টের পায় নাই। ভোর বেলাতেই জমিদারের পেয়াদা উপস্থিত হইল। কুসুম ঘর হইতে জানাইল, 'বাড়িতে নাই।'

পেয়াদা বলিল, লোকটা যখন বাড়ি না থাকনই ঠিক্ করছেন, তখন ঠাক্‌রাইনই আমার লগে চল গো, কর্ত্তার কাছে দরবার করবা। মুখখান্ তো দেখতে ভালাই আছে, কর্ত্তা খুশীই হইবো দেইখ্যা।

কুসুম কোনরূপ উত্তর দিতে পারিল না। শুধু রাগে দুঃখে তার দুই চোখের কোণ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পেয়াদা চলিয়া গেল অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া। কৈলাস বাড়ি ফিরিল গভীর রাত্রে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধরছিল নাকি?

এক গাল হাসিয়া কৈলাস উত্তর দিলে, ধরন এত সোজা কাম? হাত তো এই কইরাই পাকাইছি। কৃষ্ট লীলার দল যখন ছিল কত করণ লাগছে তখন! মানুষ তে মানুষ পরমেশ্বরও দেখতে পান কি না সন্দে হয়!

কৈলাস একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া বলিল, এই নে, তোর লাইগ্যা একটা শাড়ি আন্‌ছি, পূজার সময় পইরা যাইস্। আর এই নে এক বোতল 'করুণা', খাইয়া দেখিস্ মেলারীবিবি ছাইড়া দিয়া পর্ পর্ দৌড় দিব।

কুসুম এইবার সত্যই বিস্মিত হইয়া গেল! বলিল, এই সব কই পাইলা? কোনখান থনে আইলো শুনি?

—কে রে, বাজার থনে আওয়নের পথটা এরা চিনেন না?

—চিনেন রে চিনেন! একটু চিনাইয়া দিওয়ন লাগে আর কি! চাইয়া থাকনের কিডা হইল? নে, আমার কোমরে দুইলা টেকা আছে, বাইর কর। আমি আবার পয়সা-কড়ি ছুঁইতে পারি না, গুরুর মন্তর লইছি। কামিনী-কাঞ্চন একেবারে ছাড়ান।—নিজের রসিকতায় কৈলাস নিজেই শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসিডা পরে কইরো। এখন হাচা কথা কও। কই পাইছো টেকা? হাচা কথা না কইলে কিন্তু চিল্লাইয়া পাড়ার মানুষ জড়া করবাম কইয়া রাখলাম।

—দুই মণ পাট বেচ্‌ছি।

—পাট ! পাট কই পাইলা শুনি ?

—আছে রে আছে ! কেবল দেইখ্যা আনন আর কি ! খেতের পাট আমারই বা কি, আর দক্ষিণ পাড়ার নয়াবাড়িরেই বা কি ? হেরা সুবিধা কইরা লইছে দেইখ্যাই কয় তারার, এখন থেইক্যা আমরাও সুবিধা করবাম।

—তবে চুরি করছো তুমি ?

কৈলাস এইবার অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিল, বলিল, কেডা কার দ্রব্য চুরি করতে পারে রে ? ভাবের ঘরে কি বেবাকেই চুরি করতে পারে ? এই সব তো বসুন্ধরার বুকে জন্ম লইছে—মার দ্রব্য, যার যেমন মুরাদ কাইরা নেয়।

—বুঝলাম। তুমি এখন চুরি করতেও শিখছো। আমার কপালে এও লেখা ছিল। এইবার নিজের ঘরে নিজেই তবে আগুন লাগাইলা !

—দুঃখু করিস না বউ, পরমেশ্বর তো সবই দেখেন রে ! এই কয়ডা দিন তো চালাইয়া নিয়ন লাগবো। নে, কাইল ঘুম থনে উইঠ্যা স্নান কইরা নতুন শাড়িখান্ পরিস। বাজার থনে কলা, চাউল, বাতাসা, ফলমূল কিন্যা আনছি—রঘুমালীর বাড়িত আছে সব। কাইল সকাল বেলাতেই আইন্যা দিবাম। মার পূজাডা এই যাত্রা একটু জাঁক কইরা দিওন লাগবো। সারাডা বছর বেটি যে সুখের মধ্যে রাখছে—মুখে আর কওন যায় না !

শেষ রাত্রের দিকে কৈলাসের গায়ে জ্বর আসিল। অনেক কাল সে একটু ভালই ছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্বর আসিয়া তাকে একটু বেশি রকমে কাবু করিয়া ফেলিল। একে পুরো দুইটি দিন পেটে সামান্য দানা-পানি পড়ে নাই, তার উপর পাট চুরি করিয়া দশ মাইল দূরের বাজারে বিক্রী করিতে যাইতে হইয়াছিল। একটা শরীরে এতখানি সহ্য হইবার কথাও নয়। জ্বরের জন্য যত নয়, তার চেয়ে বেশি অস্থির করিয়া তুলিল জঠরের জ্বালায়। কথা বলিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ছিল না শরীরে। বেহুঁসের মত পড়িয়াছিল বিছানার উপর। কুসুম শিয়রে বসিয়া ঠাণ্ডা জলে হাত চুবাইয়া লইয়া বার-বার কৈলাসের গরম কপাল, গাল, গলা মুছিয়া দিতেছিল।

কৈলাস অনেকক্ষণ পরে কথা বলিল, একটু জল দিবি বউ !

জল পান করিতে যাইয়া কৈলাস বিষম খাইল। দুই চোখ উলটাইয়া দিয়া যেন যায়-যায় অবস্থা। কুসুম ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কী যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া শেষটায় শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

কৈলাস কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হইয়া যাইয়া বলিল, আরেকটুক্ জল দে।

—আর জল না। খালি পেটে জল খাইলে খারাপ হয় যে।

—ভরা পেটটা কবে আবার দেখলি ? দে শীগগির গলাডা শুকাইয়া গেছে।

—পাণি-ভাত আছে ঘরে, খাও না উইঠ্যা।

—না রে বউ, এখন আর কিছু খাওনের উপায় নাই, ফর্সা হইয়া গেছে। মার ভোগ দিওয়ন লাগবো। খাওয়া দাওয়া হইবো হেই পূজা শেষ হইলে।

—এতক্ষণ থাকবা কেম্‌নে ?

—না থাইক্যা উপায় কি ! বছরে একটা পূজা, তাও যদি না পারলাম ত মইরা যাওয়নও ভালা বউ।

জ্বর লইয়াই কৈলাস রঘুমালীর বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। কুসুম সকালবেলাতেই পুকুরে যাইয়া স্নান করিয়া স্বামীর দেওয়া নূতন শাড়ি পড়িল। নূতন শাড়িতে তাকে মানাইতেছিল বেশ ! মনটা তার খুশীতে ভরিয়া গেল। মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, হে ভগবান্, মুখ তুইল্যা চাও একবার গরীবের দিকে, আর দুঃখু দিও না ঠাকুর !

প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিল জমিদার-বাড়ির পেয়াদা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

কুসুমের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, কোন মতে পাশ কাটাইয়া ঘরের ভিতর যাইতে লাগিল। পেছন হইতে পেয়াদা বলিল, ঠাক্‌রাইন দেখছি সাইজ্যা এক্কেবারে পরি হইছেন। কৈলাস বোষ্টমীর দিন কাল ভালাই যাইতেছে কওয়নই লাগবো।

কুসুম কোন রূপ উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে যাইয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে ভগবান্, হে ভগবান্, মানুষটা যেন হঠাৎ এখন না আইয়া পড়ে—তুমি দেইখ্যো ঠাকুর !

—বলি ও ভালা মান্‌ষের ঝি ; কথা কওনা যে—বোবা না কি ? রোজই যে মানুষটা শেষ রাইত উইঠ্যা ডুব মারে, হের কারণডা কী শুনি ? বউরে নতুন পাছা পাইড়ের শাড়ি কিন্যা দিত পারে—খাজনা দিওনের নাম নাই কে রে ? রোজ আইয়া বইস্যা থাকি, দেখা নাই—

আইজ হয় বাইর কইরা দাও, না হয় ঠাক্‌রাইন নিজেই চল আমার লগে।

কুসুম কোন মতে বলিল, আইজ পূজার দিন—কর্তা কি এই দিনও রেহান দিব না?

—দিব ঠাক্‌রাইন নিজে গেলে।

এমন সময় কৈলাস আসিয়া ঢুকিল বাড়িতে। হাত জোড়া ছিল পূজা আয়োজনে, তাছাড়া শরীরও টলিতেছিল জ্বরের চাপে। তাই পেয়াদাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াও পলাইতে পারিল না, একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে যাইয়া পড়িল।

—এই তো বাবাজী আইছেন—

—হ, আইছি। কিডা চাই তোমার শুনি?

—শুইনো কর্তার মুখ থনেই।

—চল তবে কর্তার কাছেই।

এই বার আর কুসুম ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, যাইও না, যাইও না কইলাম। গেলে আমি আইজই গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরবাম।

—ভয় কি রে? কর্তা তলব দিছেন, দেখডা কইরাই চইল্যা আমু। তুই ইদিগে ভোগডা সাজাইয়া ফেলা—আমি আইলাম আর কি!···চল গো কর্তা।

কৈলাস চলিয়া গেলে কুসুম কাঁদিতে বসিল।

ঘণ্টা দুই পরেই কৈলাস বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়িতে ঢুকিয়া উঠানের উপর যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। উঠানের উপর কুসুম পিঁড়ি পাতিয়া মাটির ঘটে আম্র-পল্লব দিয়া সিন্দুরের ফোঁটায় দেবতার সহজ সংস্করণ করিয়াছে। ঘটের সম্মুখে ধূপ, প্রদীপ জ্বালাইয়াছে, থরে থরে সাজাইয়া দিয়াছে পূজার নৈবেদ্য। গলায় আঁচল জড়াইয়া মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া বিড় বিড় করিয়া অনর্গল কী যেন বকিয়া যাইতেছিল। কৈলাস সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েক বার নাম ধরিয়া ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া হাত দিয়া গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল, এ কি হইতাছে শুনি? বাবুর বাড়ি ত পূজার ভোগ সাজাইয়া দিওনের লাইগ্যা আন্‌লাম আর তুই এইডা কী করলি?

কুসুম এই বার ঝটকা মারিয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কথা কইও না, যা করি দেইখ্যা তাই কর। পূজা আমাগো এইখানেই হইব। তোমার কর্তা বাপ-মা কিডা কইলাইন শুনি। পিঠ্‌খান আস্তা আছে তো?

—আছে না তো যাইব কই! একটা খাইয়াই ঢং কইরা বেহুঁস হইলাম—দেইখ্যাই কর্তার চক্ষুস্থির! ছাইরা দিয়া বাঁচছে শেষে। এখন দেখিস আঘুন মাসের আগে আর বাবারা আমার বাড়ির পথ্‌খান মাড়ানের নাম লইবো না। হুঁ।

—বুঝছি। এখন আইও, পেন্নাম কর ঘটের সাম্‌নে মাথা রাইখ্যা। আমি যা কই—কইয়া যাও।

—তুই পূজার মন্তর-টন্তর জানস্‌ নাকি?

—জানি। কও, হে মা, হে অসুর-দলনী মা—অসুর ছাইড়া এইবার কেবল গাঁয়ের শয়তান আর পাজিগুলারে দলন কইরা যাও মা! কৈলাসে যাওনের সময় লগে লইয়া যাও মা—দুইডা দিন একটু প্রাণ খুইল্যা হাসি। আর কিছু চাই না—ধান না, চাউল না, জ্বর-জারি থনে ভালা হওয়ন না—কেবল এইগুলারে দমন কইরা দিয়া যাও। হে মা, হে মা ভগবতী, অসুর-দলনী মা!

কুসুম বার-বার ঘটের সম্মুখে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

কৈলাস ভয় পাইয়া কয়েক পা পশ্চাতে হটিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিল, কুসুম তবে জ্বরে ভুগিতে ভুগিতেই পাগল হইয়া গেল।

কৈলাস দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "হে ঠাকুর, বউডারে ভাল্যা কইরা দাও···সুমোতি দাও···বড় কইরা তোমার ভোগ দিমু···হে ভগবান্‌···।"
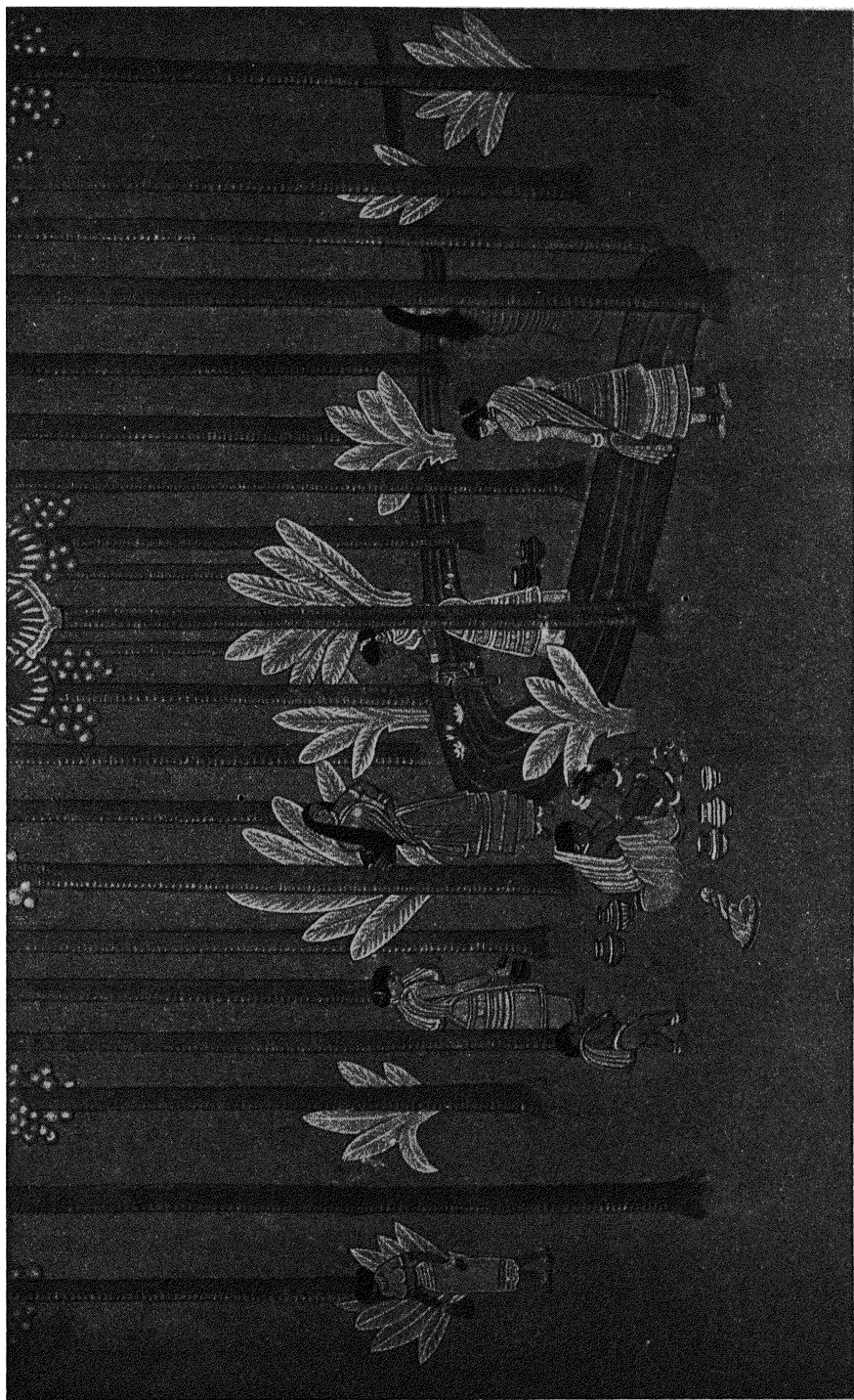
তালীকুঞ্জ
শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আলোচনা

একতেশ্বর শিব

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ছাতনা থানার দক্ষিণ সীমায় দেউল-ভেড়্যা নামে এক গ্রাম আছে। ঋজু রেখায় ছাতনা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, বাঁকুড়া হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে। এক শীর্ণ স্রোতস্বতী গ্রামকে পূর্বে ও দক্ষিণে বেষ্টন করিয়াছে। সাত আট বৎসর পূর্বে শুনিলাম সে গ্রামে এক পাষাণ প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মাথার উপরে সাতটি ফণা বিস্তৃত রহিয়াছে। তার পর শুনিলাম একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে, মূর্তিটি মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। দেখিবার নিমিত্ত আমার কৌতুহল হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বালকের কৌতূহল। কারণ আমি প্রতিমালক্ষণ কিছুমাত্র জানি না, গেলে ফণা দেখিয়া আসিতাম, অথবা ফণাধর শিব কল্পনা করিতাম। গ্রামটি ঋজু রেখায় বাঁকুড়ার নিকটে বটে, কিন্তু মোটরে ২৬ মাইল।

পরম আহ্লাদের বিষয় বাঁকুড়া সাহিত্য-পরিষদের সদস্য শ্রীকালীপদ বন্দোপাধ্যায় আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত ও প্রবৃদ্ধ করিয়াছেন। গত জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে দেউলভিড়ায় নবাবিষ্কৃত পাষাণমূর্তির বৃত্তান্তে তাঁহার প্রচুর দর্শন শ্রবণ গ্রহণ বিচারণের পরিচয় আছে। সুন্দর সংযত প্রাঞ্জল ভাষায় বৃত্তান্তটি মনোহারী হইয়াছে। যে ফটো তুলিয়াছে, মন্দিরমধ্যস্থ বিগ্রহের এমন স্পষ্ট চিত্র তুলিয়াছে, তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়ার এক বিখ্যাত প্রবীণ ডাক্তার। তিনি রোগ-চিকিৎসার নিমিত্ত বাঁকুড়ার বহু গ্রামে গিয়াছেন, চক্ষু কর্ণ মন মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার ফলে তিনি নানা স্থানের নানা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিমার কি দেখিতে হইবে। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত দুই এক কথা লিখিতেছি। যথা, প্রতিমাটি কিসে নির্মিত, শৈল দারু ধাতু মৃত্তিকা চিত্র; পরিমাণ; আকার, বেশ, অলঙ্কার; কয়খানা হাত, হাতে কি আছে; আসন; পরিকর। এইরূপ বর্গে বর্গে ভাগ করিয়া লিখিলে বর্ণনাটি মানসচক্ষে দৃষ্ট হইবে। তার পর, লোকে কি নাম বলে, কিম্বদন্তী কি, পূজিত হইলে কে পূজা করে, উৎসব হইলে কোন্ মাসের কোন্ দিন, উৎসবের বিবরণ লিখিতে হইবে। যাহা দেখিতেছি তাহার যথাযথ বর্ণনা অল্প শিক্ষায় হয় না। সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষের সহিত নিজের কল্পনা মিলাইয়া ফেলে। আদালতে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যাহা দেখে নাই, তাহাও ত বলে, বিপক্ষের উকীল হৃষ্ট হন। একতেশ্বরের 'ধাঁদারাণী' হাজার হাজার লোকে দেখিয়াছে, কিন্তু সত্যসত্য ধাঁদা কি না তাহা কেহ দেখে নাই। এ বিষয়ে পরে লিখিতেছি।

প্রত্যক্ষ বর্ণনার পর অনুমান। প্রতিমাটি কোন্ দেব বা দেবীর, কত কাল পূর্বে নির্মিত, কে স্বামী। প্রতিমা-প্রাজ্ঞেরা প্রথম দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। ঐতিহাসিক তৃতীয় প্রশ্ন আলোচনা করিতে পারেন। আরও দুরূহ প্রশ্ন আছে। সে দেব বা দেবীর উৎপত্তি, প্রকৃতি, প্রয়োজন। পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যানের মূল অন্বেষণ না করিলে চতুর্থ প্রশ্নের ধারেও উপস্থিত হইতে পারা যায় না। অমুক পুরাণে আছে, অমুক অমুক তন্ত্রে আছে, এইরূপ উক্তি প্রশ্নটির উত্তর নয়। বিনা প্রয়োজনে, বিনা হেতু কেহ কোন কম করে না, দেবদেবীর প্রতিমা-কল্পনাও করে না, আর বিনা আশ্রয়ে কল্পনাও চলে না। মানুষের চিত্ত নানা দিকে ধাবিত হয়, আনন্দ চায় শান্তি চায় উৎসাহ চায়। দেশের নিসর্গ, মানুষের চরিত্র, রাজ্যের অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে দেবদেবীর আকার-কল্পনায় নানা ভেদ ঘটে। অতএব চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর অতিশয় দুরূহ, নানামুনির নানামত হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি কোন প্রতিমা দেখিলে চারিটি জিজ্ঞাসা আসে, ইনি কে কবে কার কেন।

আমরা গৌতম বুদ্ধকে চিনি। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতম বুদ্ধের পূর্বে অনেক বুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরেও অনেক বুদ্ধ হইবেন। অবলোকিত এক বুদ্ধ। বিখ্যাত কোষ-কার অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি অবলোকিত বুদ্ধ জানিতেন না, কোষে উল্লেখ করেন নাই। আমার অনুমানে তিনি তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দ-শতকে ছিলেন। একাদশ খ্রিষ্টাব্দ-শতকে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব অমরকোষের অসম্পূর্ণতা দূর করিতে ত্রিকাণ্ডশেষ নামক কোষ রচিয়াছিলেন। তিনি অবলোকিতের বাইশটি নাম দিয়াছেন। তন্মধ্যে পদ্মপাণি, বহুরূপ, জটাধর, বজ্রস্পর্শ, তাঁহার রূপজ্ঞাপক। যিনি বহুরূপ, তাঁহাকে চেনা দুষ্কর। তাঁহার প্রতিমা-লক্ষণের পুস্তক আছে। চক্রস্থিত অষ্টভুজ মূর্তি বিষ্ণুর হইতে পারে। বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে বিষ্ণুর প্রতিমা দ্বিভুজ চতুর্ভুজ বা অষ্টভুজ। কিন্তু তিনি করতালিযোগে কেন নৃত্য করিবেন, বুঝিতে পারা যায় না। অতএব গবর্মেণ্ট প্রত্নবিভাগের কর্তাদের নিকটে দেউলভিড়্যার প্রতিমূর্তির চিত্র ও বর্ণনা পাঠাইয়া কে কবে প্রশ্নের উত্তর জানা যাইবে।

কুবের এক অদ্ভুত দেবতা। তিনি মনুষ্যধর্মা, মুখে শ্মশ্রু আছে, নরবাহন। তাঁহার দেহ কুৎসিৎ, উদর বৃহৎ। তাঁহার ধনের ইয়ত্তা নাই, যক্ষ গুহ্যক পিশাচ ধন রক্ষণ করিতেছে। কুবের বৈদিক দেবতা নহেন। ত্রিকাণ্ডশেষে তাঁহার এক নাম ত্রিশিরা। ত্রিশিরাঃ ত্বষ্টার পুত্র, বৈদিক। কিন্তু কুবেরের তিনটি শির নাই। জম্ভল এক পূর্বকালের যক্ষ, তিনি জলে থাকিতেন। বোধ হয় পাঁজির সুপ্রসবের মন্ত্রের জম্ভলা তাঁহার ভগিনী। এক সমুদ্রতীরে থাকিতেন, অতএব রাক্ষসী। আমরা শুনিয়াছি জলে যক্ষ থাকে, ধন রক্ষা করে। মাটির নীচে ধন লুকায়িত থাকে, গুহ্যক রক্ষা করে। বনে বৃক্ষমূলে ধন থাকে, বোধ হয় পিশাচ রক্ষা করে। অতএব মনে হয় কুবের এক লৌকিক দেবতা ছিলেন, মানুষের মতন ছিলেন, পরে দেবত্ব পাইয়াছেন। বেদের কালেও কোন কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ দেবত্ব পাইয়াছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের নাম "দেউলভিড়া" লিখিয়াছেন। নামটি দেউল-ভিড়্যা, যেখানে দেউলের ভিত্তি প্রাচীর আছে। কেহ কেহ দেউল-ভেড়্যা বলে, সেটেলমেণ্টের মানচিত্রে এই নাম আছে। মনে হয় পার্শ্বস্থ নদীর বন্যা হইতে দেউল রক্ষার্থে ভেড়ীবাঁধ (সরু নীচু বাঁধ) ছিল।

এখন একতেশ্বরে আসি। বাঁকুড়া নগরের সন্নিকটে একতেশ্বর শিবমন্দির। বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র লোক দেখিতে যায়, আর নারী ধাঁদা রাণীর দেহে সিঁদুর লেপিয়া আসে। এখন হীনাসিকা নরমূর্তিকে কে ধাঁদা রাণী করিয়াছে, কে জানে। ইন্দ্রপুর থানায় এক ধাঁদা রাণী

আছেন। তিনি খণ্ডিত-নাসিকা কি না, জানি না। তাহা হইলেও কালাপাহাড়ের কুকীর্তি মনে করিতাম না। নাক ও বহির্গত বাহু সহজে ভাঙিয়া যায়। কালাপাহাড় পুরীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার অনুচর অন্যত্র ধাবিত হয় নাই।

একতেশ্বরের পূজকদের নিকটে শুনিয়াছি, ১৩১৭ সালে একতেশ্বরের মন্দির সংস্কার হয়। সে সময়ে খাঁদা রাণীর বর্তমান ক্ষুদ্র গৃহ নির্মিত হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিশাল চাকল্দা ও তেঁতুল গাছ ছিল, রাণী তাহার তলে শায়িতা ছিলেন। সেখানে বহুকাল বৃষ্টি বাত ভোগ হেতু দেহ ক্ষয়িত হইয়াছে। আমি দ্বাদশবাহু দেখিয়া কার্তিকেয় মনে করিয়াছিলাম। কার্তিকেয়ের এক নাম গুহ। গুহবাহু, গুহনেত্র বলিলে দ্বাদশ সংখ্যা বুঝায়। কিরীট কুণ্ডলধারী, বাহুতে কেয়ূর, কণ্ঠে হার, বক্ষে যজ্ঞোপবীত। বাম ও দক্ষিণের নীচের দুই হাত দুই ভক্তের মাথায় স্থাপিত আছে। অন্য দশ হাতে কি ছিল, বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু বাম দিকের এক হাতে শক্তি (বল্লম) স্পষ্ট। এক সর্প উরুদেশ বেষ্টন করিয়া পশ্চাতে মাথার উপরে সাত ফণা ধরিয়াছে। এই বেষ্টন হেতু মূর্তিটি চলৎশক্তিহীন হইবার কথা। পাদ হইতে কটি কঞ্চুকাবৃত, মনে হয় যেন পাজমা-পরা। সপ্তফণা দেখিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। কার্তিকেয় দ্বাদশবাহু শক্তিধর শিখিবাহন। শিখী স্থানে কি সপ্তফণার আকারে ময়ূরচন্দ্রিকা? (আমার লিপিতে চন্দ্রিকা ছিল, ছাপায় চন্দ্রিমা হইয়াছিল। চন্দ্রক, চন্দ্রিকা ময়ূর-পুচ্ছের চাঁদা।) সাতটি দেখিয়া এই ভ্রমের উৎপত্তি। সপ্তর্ষি নক্ষত্রে সাতটি তারা। কার্তিকেয় কল্পনার আদ্য কালে কার্তিকেয়ের বাম হাতে তাম্রচূড় (কুক্কুট) ছিল (মহাভারত বনপর্ব দ্রষ্টব্য)। সপ্তর্ষি নক্ষত্র এই কল্পনার আশ্রয়। সপ্তর্ষি দেখিয়া নানাবিধ আকার কল্পিত হইয়াছিল। এক আকার, ময়ূর। দেউলভিড়্যার দ্বাদশবাহু মূর্তির সহিত খাঁদা রাণীর সাদৃশ্য দুইটি অঙ্গে স্পষ্ট, বাহুসংখ্যায় ও সপ্তফণাছত্রে। কিন্তু পরিকর এক নয়। খাঁদা রাণীর আসনের নীচে ছোট ছোট মহাবীর মূর্তি আছে। অতএব মনে হয়, দুইটি মূর্তি এক কল্পনার নয়, এক শিল্পীবংশের নয়। (এখানে আমার আর এক ভুল সংশোধন করি। সূর্যপ্রতিমার শিলার নিমিত্ত আমি বালেশ্বর কিম্বা গয়া গিয়াছিলাম। অত দূরে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। রাইপুর থানায় প্রতিমা নির্মাণের উপযোগী পাথর আছে, থালা বাটি খোরা নির্মিত হইতেছে।)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, একতেশ্বর বুদ্ধ, আর খাঁদা রাণীর অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের নিমিত্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি যথেষ্ট মনে হইতেছে না। লোকে একতেশ্বরকে শিব জ্ঞানে পূজা করে। বৌদ্ধ শৈব শাক্ততন্ত্র মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিব শক্তি নূতন নয়, বুদ্ধের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে আছেন। একতেশ্বরের বিগ্রহ স্পর্শ করিতে হইলে মন্দির মধ্যে সাত আট ফুট নীচে নামিতে হয়, বর্ষাকালে বিগ্রহ জলমগ্ন থাকে। সে স্থানে খাঁদা রাণীকে বসাইলে তিনি আপাদমস্তক ডুবিয়া যাইবেন, তাঁহার মাথার উপরের ফণাছত্র নিরর্থক হইবে।

বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন, অবলোকিত ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর কেবল শিবের নাম। একতার ঈশ্বর, প্রলয়কর্তা, সংহার কালে সব এক। কিন্তু মূর্তি দেখিলে ইঁহাকে একপাদীশ্বর মনে হয়। একপাৎ, শিবের এক নাম, ত্রিকাণ্ডশেষে ও হেমচন্দ্রকোষে আছে। পাদ গতি। বিষ্ণু ত্রিপাৎ। বেদে একপাদ্ এক রুদ্র। তাহা হইতে একপাৎ আসিয়াছে। মূর্তিটি একটি পাদই বটে, দীর্ঘে ১৪ ইঞ্চি, ঈশানকোণের দিকে ৪ ইঞ্চি, অপর দিকে ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। ঈশানকোণের দিকে আধ ইঞ্চি উচ্চ, সেদিকে পাদাগ্র। ব্রাহ্মণেরা বলেন, মন্দিরের উপরে বিরূপাক্ষের আসন ছিল। অমরকোষে বিরূপাক্ষ শিবের নাম। একপাৎ শব্দের প লোপে একাৎ। একাৎ শব্দের অর্থ হয় না, এই হেতু একতা হইয়া থাকিবে।

এক পাদের নৈসর্গিক উৎপত্তি অনুমান করিতে পারা যায়। ভগ্ন ক্ষয়িত বিশ্লিষ্ট পাহাড়ের পৃষ্ঠে বাঁকুড়া নগর। দ্বারকেশ্বর নদ এই পাহাড় ভেদ করিতে পারে নাই, দক্ষিণে গিয়া বাঁকিয়া পূর্বমুখ হইয়াছে। এই বাঁকে একতেশ্বরের মন্দির। নীচের পাহাড় সর্বত্র বিশ্লিষ্ট হয় নাই, কোথাও কোথাও মাটির উপরে মাথা দেখা যায় (যেমন চাঁদ-মারির নিকটে)। কঠিন পাথর, ভূবিদ্যায় 'নাইস', বরং 'গ্রানাইট নাইস'। একতেশ্বরের মন্দিরের দশ বার ফুট মাটি তুলিয়া ফেলিলে সে পাথর দেখা যাইতে পারে। পূর্বকালে কেহ এই পাথরে একটি পদসাদৃশ্য দেখিয়াছিল, মাথা ঘষিয়া সমতল করিয়াছিল। কামাখ্যার উৎপত্তিও এইরূপ। কঠিন পাথরের মাথায় গর্ত ছিল। বিশেষ এই, একতেশ্বরে নদীর পলি পড়িয়া পাদটি দশ বার ফুট নীচে চলিয়া গিয়াছে, নদীর জল বৃদ্ধির সময় পাদটি জলমগ্ন হয়। কামাখ্যা নিম্ন পাহাড়ে, উচ্চ পাহাড়ের জল আসিয়া মুদ্রাকে জলমগ্ন করে। একতেশ্বরে দশ ফুট পলি পড়িতে অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর লাগিয়া থাকিবে। বোধ হয় এখানে বন ছিল, সে কারণে পলি সঞ্চয় দ্রুত হইয়াছিল। তথাপি হাজার বৎসর লাগিয়া থাকিবে। খাঁদা রাণী ও অন্যান্য মূর্তি অন্যান্য স্থল হইতে আনীত ও রক্ষিত হইয়াছে। দেওঘরের মন্দির-বেষ্টনের মধ্যে অপর স্থানের অনেক মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে।

একতেশ্বরের গাজনের সন্ন্যাসীরা 'একতেশ্বর মুনি মহাদেব' নাম করিয়া একতেশ্বরকে মুনি ও মহাদেব বলে। শিব যোগী, এই হেতু তাহারা কৃচ্ছ্র করে। যোগী মৌনী, এই হেতু মুনি। অথবা গীতা অনুসারে মুনি। শিবের সুখদুঃখ নাই, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধী। বোধ হয় মহাদেব শব্দে ম পাইয়া অনুপ্রাসের লোভে যোগী না বলিয়া মুনি বলে।

শিবের গাজনে বৌদ্ধ প্রভাব পড়িয়া থাকিবে। যাঁহারা বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা তাঁহারা বলিতে পারেন। ধর্মের গাজন হয়, শীতলার হয়, কোথাও কোথাও মনসার হয়। ধর্মরাজ বুদ্ধ। লোকে চিরদিন বসন্তরোগ ও সর্পদংশন ভয় করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন শীতলা ও মনসা দুই বৌদ্ধদেবীর অনুকরণ। সকল শিবের গাজন হয় না, সকল ব্রাহ্মণ গাজনে শিবের পূজা করেন না। ভক্ত্যা সকল জাতির হইতে পারে, ব্রাহ্মণ ভক্ত্যা শুনি নাই। এক কালে ব্রাহ্মণেরা শিবের নির্মাল্য গ্রহণ করিতেন না। বোধ হয় তাঁহারা ঋগ্বেদী। শিব যজুর্বেদীর উপাস্য ছিলেন।

গাজনের সন্ন্যাসীরা শিব-ব্রত করে। প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী শিব-রাত্রি, মাঘী (বা ফাল্গুনী) কৃষ্ণাচতুর্দশী মহাশিবরাত্রি। সাড়ে তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল এই রাত্রি প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এক কালে এই রাত্রিতে অয়ন-পরিবর্তন হইত, পরদিন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত, যজ্ঞ হইত। বোধ হয় মঙ্গলময় শিবের আরাধনা দ্বারা লোকে নূতন বর্ষে শুভ প্রার্থনা করিত। কিন্তু সৌর চৈত্রমাসের সমাপ্তি দিনে গাজনে যে শিব-ব্রত হয়, সেটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সে দিন বিষুব-দিন, পরদিন হইতে সৌরবৎসর আরম্ভ। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ-শতকে ঐ দিন বিষুব হইত, তৎপূর্বে হইত না। অতএব চৈত্র মাসে শিবের গাজন যত পুরাতন হউক, উক্ত শতাব্দের পরে প্রচলিত হইয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে, যাহারা সৌর মাস ও বৎসর গণনা করে, এই দিনের শিব-ব্রত তাহাদের। ভারতের অন্য সব প্রদেশে ইহা অজ্ঞাত। কোন পুরাণে এই ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ আছে। আমার বিশ্বাস বর্তমান পুরাণটি রাঢ় দেশের।

এই লৌকিক উৎসবের উৎপত্তি কি? বৌদ্ধেরা এই রূপ উৎসব করিত কি না, জানি না। করিলেও কেন করিত? ধর্মের গাজন বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ পূর্ণিমা।

শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা বাণ দ্বারা দেহ বিদ্ধ করে, লৌহ-কীলকের উপরে শয়ন করে, আর একতেশ্বরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া চলে। ভক্তিভরে ভক্ত্যারা নর্তন কুর্দন গর্জন করে। চড়ক এই উৎসবের এক অঙ্গ। সংস্কৃত চরক শব্দ হইতে চড়ক আসিয়াছে। এক উপনিষদে চরক পাইয়াছি। অতএব চড়কটি নূতন নয়। ইং ১৯০৪ সালে আমি কটকে চরক দেখিয়াছি। ওড়িষ্যার এক রাজ্য হইতে (বোধ হয় সম্বলপুর হইতে তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল। দু-তলা সমান উচ্চ বাঁশ পোতা হয়। এক সুগঠিত-সুসংবৃত দেহা অল্প বয়সী যুবতী ক্ষিপ্রবেগে, হনুমানের মত, নির্গ্রন্থি বাঁশের উপরে উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসে, তলার পুরুষেরা মাদল বাজায়, নারী গান করে। ঝটিতি সে বাঁশের অগ্রে শুইয়া পাক খাইয়া তদুপরি উদর রাখিয়া কুলালচক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে, দেখিলে ত্রাস জন্মে। প্রাচীনেরা আনন্দ-উৎসবে চরক দেখিতেন।

কোথাও কোথাও শিবের গাজনে নীল-পূজা হয়। রাঢ়ে নীল-এর শুনি নাই, একতেশ্বরের ব্রাহ্মণেরা নীল জানেন না, নীলপূজা করেন না। শিবের গাজন, গ্রাম ষোল আনার উৎসব, বিবাহিতা নারী সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পরে শিব-পূজান্তে জলগ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে নীলপূজা প্রসিদ্ধ আছে। ইদানীর পাঁজিতেও নীলপূজার উল্লেখ আছে। শিব নীলকণ্ঠ, নীললোহিত, কদাপি নীল নহেন। তিনি রজত-গিরিনিভ! ত্রিকাণ্ডশেষে নীল, নীলোৎপল এক পূর্ববুদ্ধের নাম। তাঁহার অনেক নাম। প্রচলিত নাম মঞ্জুশ্রী। ইনিই কি শিবের গাজনে আসিয়া নীল নামে পূজা পাইতেছেন?

নীল যিনিই হউন, নীলকণ্ঠের সহিত পার্বতীর বিবাহ হয়। সন্ন্যাসীরা প্রমথ, দণ্ডধারণ না করিয়া বেত্রহস্তে বিবাহমণ্ডপ রক্ষা করে। বিবাহ সমাপ্ত না হইলে কন্যার মাতারা ভোজন করিতে পারেন না। কালিকা পুরাণে (৪৪।৪১) শিবকালীর বিবাহের দিন নিরূপিত আছে। সেদিন বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমী, বৃহস্পতিবার, চন্দ্র উত্তর ফল্গুনীতে, রবি ভরণী নক্ষত্রের আদ্যে। বাঁকুড়াবাসী এই দিনটি অদ্যাপি স্মরণ করিতেছেন। ১৩ই বৈশাখে তাঁহারা নূতন বৎসর আরম্ভ করেন।* এই দিনে "শূন্যপুরাণ"কার রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল, এইরূপ কাহিনী আছে। আর আসামের কালিকা পুরাণও এই দিন স্মরণ করিয়াছেন। অশ্বিনী নক্ষত্রের অন্তে বিষুব হইয়াছে, রবি ভরণী নক্ষত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। ইহা প্রায় খ্রি পূ ৬০০ অব্দে ঘটিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, হরগৌরীর বিবাহ তখন বিষুবদিনে হইত, এখনও হইতেছে। বসন্তকালে বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। ছয় মাস পরে শরৎকালে বঙ্গনারী উমাকে মাতৃগৃহে আনেন। ধর্মের গাজনেও ধর্মের সহিত মুক্তির বিবাহ হয়। গাজন কি তবে বিবাহ-উৎসব? কোন্ গাজন প্রথমে, শিবের না ধর্মের? লৌকিক উৎসবের প্রকৃতি কালে কালে পরিবর্তিত হয়, পুরাতন কিছু যায়, নূতন কিছু আসে। উহা হইতে ইহা, অর্থাৎ কারণ নির্ণয় দুরূহ। সে যাহাই হউক, একতেশ্বর শিবকে বুদ্ধ মনে করিবার কোন হেতু পাইলাম না। আকারে, নিত্য পূজায়, বার্ষিক উৎসবে বুদ্ধত্বের লক্ষণ পাইতেছি না। এক পুরাণে (শিবপুরাণে?) শিব-পূজার প্রশস্ত কাল দুইটি, অয়ন ও বিষুব। একতেশ্বরের পূজা এই দুই দিনে প্রসিদ্ধ।

---

* ইতিহাসে এই দিনটির গুরুত্ব শিলালিপি অপেক্ষা অধিক। অশ্বিনী নক্ষত্রের অন্তে বিষুব হইত, গণিত দ্বারা জানা যায়। এখানে গণিত নয়, লোক-ব্যবহার; কেবল বাঁকুড়ায় নয়, আসামে। কালিকা পুরাণ অষ্টম খ্রিষ্টাব্দ-শতকে আসামে প্রণীত হইয়াছিল।

সাঁতার

শ্রীশান্তি পাল

শরীরের প্রাণধারণ-শক্তি উৎপাদন এবং উত্তাপ রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সাধারণ খাদ্যে ছয় প্রকার উপাদান থাকা দরকার। সেগুলি:—১। শর্করাজাতীয়, ২। আমিষজাতীয়, ৩। মেদজাতীয়, ৪। ধাতব লবণাদি, যথা—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ ইত্যাদি—৫। জলজাতীয়, ৬। ভাইটামিন-জাতীয়। এগুলি ছাড়া আহারের স্বাদের জন্য আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, যথা,—নানা প্রকার তৈল; নানা প্রকার মশলা; ইহাদের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সুগন্ধযুক্ত ও মুখরোচক করা যায়।

আমাদের সাধারণ আহারের মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত উপাদান কয়টি থাকা একান্ত আবশ্যক। শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী খাইলে, সেই অতিরিক্ত আহার চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া শরীরে জমা হয়। সাঁতারে অজ্ঞানিত ভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম হওয়ার জন্য এই চর্ব্বি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধির প্রতি নিয়মোচিত দৃষ্টি রাখিবার জন্য খাদ্যের প্রতি সাঁতারুর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সাঁতারের পরিশ্রম অনুযায়ী সাধারণ খাদ্য অপেক্ষা কিছু বেশী আহার প্রয়োজন। রাতারাতি শরীরে শক্তি সঞ্চয় করিব কল্পনা করিয়া অযথা কতকগুলি গুরুপাক খাদ্য খাইয়া পরিপাক-যন্ত্রকে পীড়িত করাও কোনক্রমে উচিত নয়। ব্যায়ামকুশলীর মত এই যে,

সাঁতারুর প্রচুর খাদ্যের আবশ্যক হয় না। সাঁতারুর পক্ষে কিছু কিছু চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্য বিশেষ দরকার। এই চর্ব্বি আমিষজাতীয় হইলেই উত্তম, যথা—দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা প্রভৃতি। তবে আমিষজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ দুধ, ঘি, মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত নিজ নিজ পরিপাকশক্তি অনুযায়ী খাওয়াই উচিত। সাঁতারুর পক্ষে দেহের ওজন স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়। কারণ, সাঁতার-জনিত ক্ষয় পূরণ করিয়া দেহ যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সাঁতারুর সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

নানা প্রকার খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন খাদ্যে বেশী পরিমাণ কার্ব্বোহাইড্রেট, কোন খাদ্যে বেশী প্রোটিন এবং কোনটিতে বা কেবল চর্ব্বিই আছে। ডাল কড়াই, ছোলা, মটর প্রভৃতি খাদ্যে উপরি লিখিত ঐ তিন প্রকার উপাদানই মাঝামাঝি রকম আছে, সেই জন্য ঐগুলি সাঁতারুর পক্ষে (ব্যায়ামবিদের পক্ষে নয়) হজম করা কিছু শক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হজম করিতে পারিলে সেগুলি খুবই উপকারী। ছোলা, মুগ প্রভৃতি কড়াই-জাতীয় খাদ্য ভিজাইয়া রাখিলে কলি বাহির হয়। সেইরূপ কলিযুক্ত ছোলা বা মুগে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে, তাহা ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যপ্রাণও উহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে; তাই সাঁতারুর পক্ষে সেগুলি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং যে-কথা সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রযোজ্য, সে-কথা সাঁতারুর সম্বন্ধেও আরও জোর দিয়া বলা চলে। যখনই যাহা কিছু খাইবেন, তাহা খাইবেন ধীরে ধীরে ও ভাল করিয়া চিবাইয়া।

সাঁতারু তাঁহার প্রাত্যহিক সাঁতার অভ্যাসের পর এক মুঠা ভিজা ছোলা, বা মুগের সহিত সামান্য মধু বা আখের গুড় মিশাইয়া খুব চিবাইয়া খাইবেন। তিন-চারিটি বাদামের সরবৎ, (বরফ না দিয়া) পান করিবেন। (এগ-ফিলিপ) এক পোয়া হইতে আধ সের গরম দুধে একটি মুরগীর ডিম ভাল করিয়া ঘুঁটিয়া পান করিতে পারেন। মোহনভোগ, মাখন, মিছরি প্রভৃতি খাইবেন। শাক-শব্জী, ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে খাইতে পারেন। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আহার্য্যের নিত্য পরিবর্ত্তন যেন না হয়। যে-সব সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন, বিশেষভাবে তাঁহারাই যেন এই সব নিয়মকানুন খুব দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করেন। প্রতিযোগিতার দিনে প্রতিযোগী যেন তাঁহার প্রাত্যহিক পূর্ণ আহার গ্রহণ না করেন, অন্তত পক্ষে প্রতিযোগিতার চার ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রতিযোগী তাঁহার প্রাত্যহিক আহার্য্যের অর্দ্ধেক খাইবেন। মাছ, মাংস, ডিম, চা, কফি, কোকো ইত্যাদি যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। না খাইলে আরও ভাল হয়। বাজারের যে কোন খাদ্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন।

সাঁতারুর খাদ্য সম্পর্কে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, ব্যায়াম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অবহিত হওয়া দরকার। শরীরশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, ব্যায়ামে মাংসপেশীর সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়। সে সময় কার্বন-ডায়ক্সাইড বেশী পরিমাণে পেশীতে সৃষ্ট হয় ও তথা হইতে রক্ত-কণিকা দ্বারা শ্বাসযন্ত্রে নীত এবং নিশ্বাসের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পুনরায় অক্সিজেনে পরিপূরিত হইয়া ওঠে। তাঁহারা বলেন যে, এই কার্বন-ডায়ক্সাইড শরীরের তাপেরও বৃদ্ধি করে।

ব্যায়ামে বেশী পরিমাণে ল্যাক্টিভ-অ্যাসিডও সৃষ্ট হয়। এই ল্যাক্টিভ-অ্যাসিড শরীরে যত বেশী সঞ্চিত হইতে থাকে, পেশী-সঞ্চালনও ততই কমিয়া যায় এবং পরে পেশী সকল অবসাদগ্রস্ত হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে এই ল্যাক্টিভ-অ্যাসিড ও উত্তাপ শরীর হইতে দূর হয় এবং পেশীর সঞ্চালন-ক্ষমতাও পুনরায় ফিরিয়া আসে। জলে থাকার জন্য এই উত্তাপ বৃদ্ধি আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং আনন্দের আতিশয্যবশতঃ বেশীক্ষণ সাঁতার দিলে শরীরও অজ্ঞাতসারে অবসাদগ্রস্ত হয়। এ বিষয়েও সাঁতারুর বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

সাঁতারুর পক্ষে গুরুতর ব্যায়াম যথা—প্যারালাল বার বা হোরাইজেণ্টাল বারে দোলা, রিং, ভারি বারবেল, ডম্বেল, মুগুর ইত্যাদি—সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সন্তরণ-জনিত যে-সকল পেশীর বিকাশ হয় তাহাতে জলের মধ্যে সাঁতারুর শরীরের সহিত জলের সমতা বজায় রাখে। এই সমতা যত দিন থাকে, তত দিন সাঁতারু ভাল সাঁতার কাটিতে পারেন। নানা রকমের ব্যায়ামের দ্বারা এবং শরীরের অনাবশ্যক পেশী বৃদ্ধির জন্য জলের সহিত সমতা হারাইলে তাহা পুনরায় লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। সাঁতারের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা নিয়মিত সাঁতার রেওয়াজের দ্বারা লাভ করা যায়। তাই বলবান্ ব্যক্তি হইলেই যে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবেন এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। সাঁতারুর অবশ্য শীতকালে, শরীরকে উপযুক্ত বা দম রক্ষা করিবার জন্য হাল্কা

ব্যায়াম-চর্চ্চা করা আবশ্যক তবে মাঝে মাঝে অল্প-পথ সাঁতার কাটিতে পারিলে খুবই ভাল হয়।

সাঁতারুর পক্ষে শীতের সময় দাঁড়-টানা, হাল্কা মুগুর, ধীরে ধীরে দৌড়, খোলা জায়গায় পায়ে হাঁটা আবশ্যক কারণ ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

সাঁতারুর শরীরের পেশীগুলি কোমল রাখিবার জন্য ও শরীরের রক্তচলাচল ঠিক রাখিবার জন্য নিয়মিত তৈল-মর্দ্দনও দরকার। সাঁতারের সময় সম্বন্ধেও নিয়ম রক্ষা করা উচিত। প্রতিদিন একই সময়ে এবং নিজের শক্তি অর্থাৎ দম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত পথ সাঁতার দেওয়া আবশ্যক। যে কোন সময়ে সাঁতার কাটা এবং নিয়মিত সাঁতার না কাটা উভয়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে সমান হানিকর।

এইবার নিদ্রার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। নিদ্রার হেতু সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। শরীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মস্তিষ্কে রক্তচলাচল কম হইলে ঘুম আসে। জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তচলাচল-কেন্দ্র অনবরত কাজ করিতে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় ইহা শরীরের অন্য স্থানের রক্ত-চলাচল হ্রাস করাইয়া দিয়া মস্তিষ্কে বেশী রক্ত আনে। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা দিনান্তে মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হয়। তাহাতে মস্তিষ্কে পূর্ব্বের মত রক্ত যায় না এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘুম আসিয়া পড়ে।

আমার বিবেচনায় সাঁতারুদের নিদ্রা সম্বন্ধে অত সূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই তাহা লইয়া আলোচনা করিলেই হইবে। মোট কথা, ঘুমের প্রতিও সাঁতারুর বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

সাঁতারের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিতে পারে একমাত্র সুনিদ্রা। একমাত্র সুনিদ্রাই শরীরকে ক্লান্ত অবস্থা হইতে পুনরায় সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ ও শ্রমোপযোগী অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে। সন্তরণে সাফল্য লাভ করিতে হইলে কোনক্রমেই ঘুমের ব্যাঘাত হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক সাঁতারু, বিশেষ করিয়া প্রতিযোগিগণ অন্ততপক্ষে আট ঘণ্টা নির্বিবাদে ঘুমাইবেন। এমন সময়ে শয্যা গ্রহণ করা আবশ্যক যাহাতে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়। সাঁতারুর দৈনিক সাঁতার রেওয়াজের পর অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টা সমস্ত শরীরকে সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করা দরকার; ইহাতে শরীরের স্বাভাবিক সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসে। আর এক কথা, সন্তরণ-কুশলীদের সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার যে, আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াও যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে, শরীরের অবসাদ বা গ্লানি দূর হয় নাই বা দেহ কর্ম্মোপ-যোগী হয় নাই, তাহা হইলে সেই দিন রেওয়াজ বন্ধ রাখিবেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কদাচ সাঁতার কাটিবেন না। ইহাতে উৎকর্ষ বা ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, বরং কমিয়া যায়। আমরা ব্যবহারিক জীবনে দেখিতে পাই যে, স্থলে অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যায়ামে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয়, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদূরিত হয়। কিন্তু সাঁতারে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অবগাহন স্নানে স্বভাবতই মানুষকে সহজে নিদ্রাভিভূত করিয়া তুলে। কারণ, সন্তরণে সাঁতারুর আনন্দের আধিক্যবশতঃ অজ্ঞাতসারে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ আসে। অত্যধিক মাংসপেশীর সঞ্চালনের জন্য ওয়েষ্ট-প্রডাক্ট বেশী পরিমাণে তৈয়ারী হয়, সেগুলিও অল্পসময়ের মধ্যে বাহির হয় না। ইহাও অবসাদের অন্যতম হেতু। সুতরাং সাঁতারুদের ঘুম সম্বন্ধে সচেতন হওয়া খুব সমীচীন মনে করি।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

সন্ধ্যার সময় অনিল আসিল।

আমি খুকী আর অনিলের ছেলে সান্টুকে লইয়া কাছাকাছি একটু ঘুরিয়া আসিয়াছি। অম্বুরী গলায় আঁচল জড়াইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেছিল, বলিল, "থামো ঠাকুরপো, আমি মাদুর পেতে দিই, বকে ঠাণ্ডায় একটু ব'স, তার পর···"

এমন সময় "মা-মণি কোথায় গো?"—বলিয়া শিশু-কন্যাকে আহ্বান করিতে করিতে অনিল প্রবেশ করিল। আমায় দেখিয়া বলিল, "মশাই? আমি বলি অম্বুরী আবার আধ আঁচরে কাকে বসায়!"

দার্শনিক শ্রেণীর মানুষ, কোন কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হওয়া ওর ধাত নয়; জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "এসে পড়াতে তোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল কোটের পকেটে হাত দিতে দিতে বলিল, "দাঁড়া দেখি···না, নেই। তোকে আজ একখানা চিঠি লিখে আবার টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম, খামসুদ্ধ। পকেটে নেই একটাও টুকরো, নইলে দেখাতাম। ভাবলাম আর তোকে কখনও চিঠি দোব না, তার পর ভাবলাম মা, অম্বুরী সবাইকে সুদ্ধ এক দিন নিয়ে গিয়ে তোর ব্যারিষ্টার মনিবের বাড়িতে এমন বেয়াড়া তোলপাড় লাগিয়ে দোব যে তোকে তাড়াতে পথ পাবে না। কি করলে যে তোর ওপর শোধ নেওয়া হয় ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছিলাম না, তবে খুব লাগসই একটা মতলব খুঁজে বের করতামই, এমন সময় তুই বিপদ বুঝে এসে পড়লি।"

বলিলাম, "তুই বা কোন এক বার গেলি? লিখেছিলাম এক বার দেখা ক'রে আসতে, পারতিস্ না?"

অম্বুরী পাখা আনিয়া হাওয়া করিতে যাইতেছিল, অনিল তাহার হাত থেকে সেটা লইয়া বলিল, "দাও, থাক্, আমি শৈলকে নিজেই বলছি—রোজ সতী সাবিত্রীর মত তুমি তোমার আধমরা স্বামীকে এমনি ক'রে বাঁচিয়ে তুলছ।"

অম্বুরী লজ্জিত হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলে বলিল, "যাওয়ার কথা বলছিস শৈল, তোর তো আর যমের বাড়ি নয় যে চোখ বুজলেই পৌছনো যাবে। তিন-খানা চিঠি দিয়েছিস্ বলছিস, পেয়েছি দুখানা তার মধ্যে—একখানাতেও ঠিকানার নামগন্ধ নেই। তাই তো অম্বুরীকে বললাম—শৈল এখন ব্যারিষ্টারি কায়দায় নেমন্তন্ন করতে শিখেছে গো, পথ বন্ধ ক'রে খেয়ে আসতে বলে···।"

অম্বুরী বাহির হইয়া আসিয়া কলহের ভঙ্গিতে বলিল, "আমি তোমার হয়ে বলছি ঠাকুরপো, সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন যে, নিজে গেলে সত্যিই কি বাড়ি খুঁজে বের করতে পারতেন না? নড়বেন না বাড়ি থেকে, তা···।"

অনিল বলিল, "নড়ি না? আপিসে তুমি যাও কাছাকোঁচা এঁটে?"

অম্বুরী অনিলের মুখের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া লইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁধা গৎ রোজ এক বার ক'রে আপিসে যাওয়া—মস্ত বড় বাহাদুরি!"

অনিলও আমাকেই সাক্ষী মানিল, বলিল, "তুই তো থাকবি দুটো দিন শৈল? মিলিয়ে দেখ আমার পক্ষে আপিসে যাওয়াটা মস্ত বড় একটা বাহাদুরি কি না, আর বাইরে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব কি না।"

এক বর্ণও ভুল নয়। যখন থেকে বাড়ি আসিল অনিল যেন শত বাঁদীর মধ্যে বাদশাহ! নিজেকে একটি কুটা নাড়িতে হইল না, যখন যেটি দরকার একেবারে হাতের কাছে জোগান। কোন জিনিসটির জন্য তাহাকে মুখ ফুটিয়া একটা ফরমাইস পর্য্যন্ত করিতে হইল না। অম্বুরীকে এক বার শুধু বাতাস করিতে বারণ করিয়াছিল, ঐ একটু ছন্দপতন, তা ভিন্ন ঠিক যেন দু-জনে মিলিয়া বেশ ভাল করিয়া রিহার্সেল-দেওয়া একটা পার্ট করিয়া যাইতেছে।

শাশুড়ীকে অম্বুরী জপে বসাইয়া আসিয়াছিল; একবার গিয়া তুলিয়া লইয়া আসিল। আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি রাত্রিকালীন জলযোগ সারিলেন। শেষ

হইলে তাঁহাকে আর সানুকে বিছানায় দিয়া আসিল। এইবার যত রাজ্যের রাজকুমার, কোটালপুত্র, কেশবতী কন্যে, রাক্ষস, হুমো জড় হইবে, তাহাদের ভিড়ের মধ্যে দিয়া নাতি-ঠাকুরমা স্বপ্নবুড়ীর রাজ্যে গিয়া হাজির হইবে।

অনিল বলিল, "চল্ এবার ছাদে যাই শৈল।... অম্বুরী তুমি এস শীগ্‌গির।"

আমার অবর্ত্তমানে কি হয় জানি না, কিন্তু আমি থাকিলে অনিলও ওকে অম্বুরী বলিয়াই ডাকে। ওর আসল নাম মুক্তকেশী।

অম্বুরী রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে ঘুরিয়া হাসিয়া বলিল, "কেউ তাহ'লে শাড়ী প'রে হেঁসেলে ঢুকুক। আমার একটু দেরি হবে আজ আসতে।"

উপরে উঠিয়া বেশ খানিকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, এ বাড়িতে অম্বুরী আছে জানিয়াও। ছোট ছাদটা বেশ ভাল করিয়া জল দিয়া ধোওয়া; প্রথম ভাপটা কাটিয়া গিয়া এখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে একটা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি পাতা। দুইটা তাকিয়া, একবাটা পান, দুইখানা পাখা, আর সবচেয়ে যা চমৎকার—শীতলপাটির একপাশে একটা কাঁসার রেকাবি করিয়া এক রেকাবি টাটকা বেলফুল।

প্রশ্ন করিলাম, "অম্বুরীর বশে কোন দৈত্য আছে নাকি অনিল? এ যে রীতিমত আরব্য রজনীর ব্যাপার ক'রে তুললে। নীচে থেকে একবারও যে ওপরে এসেছে মনে পড়ে না তো!"

অনিল গিয়া একটা তাকিয়া আশ্রয় করিল, বলিল—"এর মধ্যে একটাও তোর জন্যে বিশেষ ক'রে আয়োজন নয় শৈল। এই ক'রে আমার একটা বদনাম ধরিয়ে দিয়েছে—বৌয়ের আঁচলধরা। অবশ্য আমার গতিবিধি আছে সব জায়গায়, ঐ বরং কুনো হ'য়ে গেলে ব'লে ঠেলে পাঠায়; কিন্তু থাকতে পারি না। দোষ দিতে পারিস সে জন্যে?...তোর খবর কি বল্ এবার। নে, পান খা; তুই রাঁধুনি দেওয়া পান ভালবাসিস—প্রায়ই বলে।... তোর জীবনে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে শৈল, লক্ষ্য করেছি। মনে করিস নে যে শুধুই চোখ বুজে এই রকম অম্বুরী-সেবন ক'রে যাচ্ছি। করেছি লক্ষ্য। কি ব্যাপার বল্ দিকিন? সোঁদা ছেলে, ছাত্রীর টুইশ্যন নিতে গেলি কেন? আমরা গরীব..."

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ছাত্রীর আমার বয়স নয় বছর।"

অনিল থমকিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। ও যে একটা অন্যায়, অশোভন ধারণা করিয়া বসিয়াছিল সেই জন্য একটু রাগিয়াই বলিল, "চিঠিতে আগে লিখিস নি তো?"

বলিলাম, "জানতাম দেখা হলেই শুনবি। বয়সের কথা ওঠে কোথা থেকে।"

অনিল একটু হাসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তাও তো বটে, আদর্শ শিক্ষক!..."

আমি হাসিলাম। অনিল প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে? কিছু একটা ব্যাপার তো হচ্ছেই।"

এড়াইবার জো আছে ও ছোঁড়াকে। একে ওর দৃষ্টি, তায় আমার অন্তস্তলের প্রত্যেক অলিগলি ওর নখদর্পণে।...কিন্তু মীরার কথা যেন মনে হয় মনের আরও গহনের জিনিস।

জ্যোৎস্নারাত্রি। একটা হাওয়া উঠিয়াছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় লবঙ্গলতার ফুলের গন্ধ কোথা থেকে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে টাটকা চন্দনের মত গন্ধ, এক-একবার কাছের বেলফুলের মিঠেকড়া গন্ধর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে...মীরার কথা যে ভীরু অবগুণ্ঠনে আমার চিত্তের নিভৃততম কোন এক জায়গায়।

আমি একবার জড়িত দৃষ্টিতে চাহিলাম অনিলের পানে। ওর "তাহ'লে?"র উত্তর দিতে পারিতেছি না।

অনিল যেন একটু নিরাশ হইল, ব্যথিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল যেন; বলিল, "থাক্ তবে, অন্য সময় ওকথা হবে'খন। তোর এম-এ পড়ার কতদূর কি করছিস?"

আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল।—এ কি করিলাম! অনিলকে জীবনে কখনও এত আলাদা করিয়া দেখিব, এ-ধরণের একটা বৈষম্যের আঘাত দিতে পারিব, কবে ভাবিতে পারিয়াছিলাম একথা? চিরকালই বিশ্বাস ছিল আমার অন্তরের যদি খুব কাছে কেউ আসে তো সে অনিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার চেয়েও কাছে আর জায়গা কই?

সেই অনিলের কাছে আজ মীরার কথা গোপন করিলাম!

নীচে অম্বুরীর গলা—"খোকন তুমি যেন ঘুমিয়ে প'ড়ো না বাবা, আমার হ'ল ব'লে।"

মনে পড়িয়া গেল ঠিক এই জিনিসটি অনিল নিজের জীবনে দাঁড় করাইয়াছে—অণুমাত্রও ব্যবধান রাখে নাই ওর; অম্বুরীর, আর আমার মাঝখানে।...ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ঠিক ধরিয়াছে আমি বদলাইয়া গিয়াছি, বরং বোধ হয় পূর্ণভাবে ধরিতে পারে নাই যে কত বদলাইয়া গিয়াছি।

আমি অনিলের শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া একটু কুণ্ঠার সহিত ওর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। ওর প্রশ্ন সেই "তাহলে?"র উত্তরেই বলিলাম, "ঠিক যে কি করে আরম্ভ করব বুঝতে পাচ্ছি না অনিল। মীরা ব'লে একটি মেয়ের উল্লেখ ছিল কি আমার চিঠিতে?"

অনিল সংশোধনের ভঙ্গিতে বলিল—"মীরা দেবী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, মীরা দেবী। সে ছাত্রীর বোন।"

অনিল পূরণ করিয়া লইল—"বড় বোন।"

"হ্যাঁ বড় বোন।"

"অবিবাহিতা।"

"হ্যাঁ অবিবাহিতা; কিন্তু তুই জানলি কি ক'রে?"

"আগে চিঠি পড়ে ভেবেছিলাম বিবাহিতা, কিম্বা বোধ হয় কিছুই ভাবি নি, তোর ছাত্রী ছেড়ে ওদিকে খেয়ালই যায় নি। এখন বুঝছি অবিবাহিতা।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে বুঝলি?"

অনিল বলিল, "খুবই সহজে। তুই প্রেমিক, তোর বুদ্ধির জড়তা এসেছে; আমার বন্ধুর জীবন-মরণ সমস্যা, কাজেই আমার বুদ্ধিটা আরও খুলে গেছে।...তার পর?"

একবার বাঁধ ভাঙিলে আর কিছু আটকাইল না। একটি একটি করিয়া অনিলকে সব কথা বলিলাম—প্রথম দিনের সাক্ষাৎ থেকে শেষ দিনের অশ্রু পর্য্যন্ত। ওর ঘৃণার কথাও বলিলাম; বলিলাম যখনই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, মীরা যেন একটা ধাক্কা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে দূরে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে। এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। অপর্ণা দেবীর কথা বলিলাম—হেরেডিটি সম্বন্ধে তাঁর থিয়োরি। মীরার স্তাবকদের কথা বলিলাম, বিশেষ করিয়া স্তাবকচূড়ামণি নিশীথের কথা। সরমার কথা বলিলাম; সরমাকে লইয়া সেদিনকার সেই অসূয়ার কথা, প্রায় যাহার জন্য ঘটনাপরম্পরায় এখানে আসা আমার। মীরার কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বলার মধ্যে যে এত মধু লুকান ছিল জানিতাম না। শেষকালে সত্যিই কতকটা আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম, "এখন আমি কি করি অনিল? ও কখনও আমার স্তরে নামতে পারবে না; যখনই অজ্ঞান্তে নেমে আসে, কতখানি নামতে হয়েছে দেখে শিউরে ওঠে। আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি এই ওর ঘৃণার রহস্য। বোধ হয় ও আমায় ঘৃণা করে না; যেটাকে ঘৃণা বলছি সেটা হয়ত ওর আতঙ্ক; কিন্তু তবুও...। আরও একটা কথা, —আমার দিক থেকে দেখতে গেলে আরও দরকারী কথা; আমি ওর স্তরে উঠি কি ক'রে? আর সব চেয়ে যা দরকারী কথা তা এই যে—কেন উঠতে যাব? অনিল, যখন প্রথম বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলাম, একটা আশা মনে জেগেছিল বড়লোকের যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কত কীই না হতে পারে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারি—এমন তো হচ্ছেও! কিন্তু এখন সেই সব প্রায় হাতের মধ্যে—আমি এম-এ বেশ ভাল ক'রে পাস করব নিশ্চয়,—মিষ্টার রায়, অপর্ণা দেবী আমায় খুব ভালবাসেন—যেন মনে হয় মাঝে মাঝে আমায় একটু বিচার ক'রে, তৌল ক'রে দেখেন—আমার দিকে মীরার ঝোঁক ওঁদের খুব সম্ভব জানা।—আমায় যে মিস্টার রায় বিলাত পাঠাতে চান এমন ইঙ্গিত দু-একবার পেয়েছি আমি।—সবই অনুকূল। রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্যের স্বপ্ন গোড়ায় দেখেছিলাম, এখন যেন শুধু স্বয়ংবর-সভায় গিয়ে বসা একবার। কিন্তু ঠিক এই সময়টায় আমারও মন বিরূপ হ'য়ে উঠেছে; অবশ্য রাজকন্যায় নয়, রাজ্যে। মনে হচ্ছে আমিই বা কেন উঠতে যাব নিজের জায়গা ছেড়ে মীরার সামাজিক স্তরে?—মীরাকে পাওয়ার একটা উপায় হিসেবে কেন মিস্টার রায়ের সাহায্য নিতে যাব? মীরাকে আমি ভালবাসি, নিজের মধ্যে দিয়ে যোগ্যতা অর্জন ক'রে ওকে পাব; আমার ভালবাসাকে আমি বেচাকেনার জিনিস করব কেন?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "যৌতুক নেয় না বিবাহে?"

আমি ভাবের ঘোরে বাধা পাইয়া ওর মুখের পানে চাহিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "যা বললি, তুই নিজে সে কথায় বিশ্বাস করিস্?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "সে উত্তর পরে দোব, তোর নিজের মতটাই আগে শুনি না।"

আমি বলিলাম, "যৌতুক নেওয়া চলে বিবাহে; কিন্তু এটা ঠিক ত যৌতুক নয়। আমি অযোগ্য; অর্থ, প্রতিষ্ঠা আর ওদের দৃষ্টিতে কাল্‌চার হিসাবে আমি নীচে, তাই আমায় মীরার যোগ্য ক'রে নেওয়া—এটাকে যৌতুক বলব, না, অপমান?—শুধু ত আমার অপমান নয়—আমি যেখানে মানুষ হয়েছি, যাদের সঙ্গে মানুষ হয়েছি, তাদের সকলকেই অপমান।...অনিল, আমি মীরাকে ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি, তুই যেমন বাসিস অম্বুরীকে। তাই আমি কোন রকম হীনতার কালি মেখে ওকে স্পর্শ করতে পারব না। ওরা যেটাকে যোগ্যতা বলে—মীরা পর্য্যন্ত—

বোধ হয় এক মীরার মা ছাড়া আর সকলেই—আমি জানি সেইটেই হবে আমার দারুণ অযোগ্যতা, আমি এ রংচঙে কাগজের বরমাল্য গলায় দিয়ে বিয়ের আসনে বসতে পারব না।"

অনিল হাসিল, হাসিয়াই জানাইল ওরও মনের কথা এই।

আমি বলিতে লাগিলাম, "আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল অনিল, কী একটা অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে যে পড়েছিলাম! এমন সময় তোর চিঠি পেয়ে যেন স্বর্গ পেলাম হাতে। আমি হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম কাদের অভাবে, কিসের অভাবে আমার এমন অবস্থা হয়েছে। মীরা যদি আমায় ভালবাসেই ত আমার যা দেশ, আমার যা পরিজন, আমার মন জুড়ে যারা অষ্টপ্রহর রয়েছে তাদের সুদ্ধ আমায় নিতে হবে ওকে।…ঠিক বোধ হয় গুছিয়ে বলতে পারলাম না, অনিল। মনের অবস্থা ভাল ছিল না, নেইও এখন; কিন্তু বোধ হয় কতকটা এই রকম। মোট কথা…"

অম্বুরী উঠিয়া আসিল। বলিল, "মোট কথা শোনবার আর একজন অংশীদার এল। ঠাকুরপো কি আগেকার মত একটু রাত করেই খাও, না ব্যারিষ্টার-বাড়িতে ঘড়ির অভ্যেস হয়েছে?"

অর্থাৎ বেশ খানিকক্ষণ গল্প চলুক। বলিলাম—"ধর বদ অভ্যেসই যদি হয়ে থাকে একটা ত ছাড়া উচিত নয় কি সৎসঙ্গে প'ড়ে?"

পর-দিন দুপুর বেলার কথা।

অনিল আপিসে গিয়াছে। বলিয়া গেল চার-পাঁচ দিন ছুটির চেষ্টা দেখিবে অর্থাৎ বাকি সমস্ত সপ্তাহটা। অনিলের মা রকে বিশ্রাম করিতেছেন। অম্বুরী বেড়াইতে গিয়াছে খুকীকে লইয়া। কোণের ঠাণ্ডা ঘরটা ধুইয়া মুছিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া আমার জন্য আরও শীতল করিয়া রাখিয়াছিল, খোকাকে লইয়া আমি শুইয়াছি। খুব ভাব হইয়াছে খোকার সঙ্গে। সকালে তাহার পছন্দমত আরও এক রাশ খেলনা আনিয়া তাহার চিত্তটা একেবারে জয় করিয়া লইয়াছি। বেশ চমৎকার ছেলে; নাদুসনুদুস, মাথায় একমাথা তারকেশ্বরের মানৎকরা চুল, তিনটা জটা হইয়া গেছে; একটু চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়া অভ্যাস বলিয়া সর্বদা ডমরুর দোলকের মত দুলিতে থাকে। কখন কাপড় ঠিক রাখিতে পারে না, প্রায়ই কসিয়া গেরো দিয়া দিতে হয়; আবার কখন কি করিয়া খুলিয়া যায় কাঁকালে জড় করিয়া লইয়া বেড়ায়।—একটি শিশু ভোলানাথ। কথার মধ্যে "ট"-কারের বাড়াবাড়ি থাকায় আরও যেন আলগা, আপন-ভোলা বলিয়া বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোকে কে বেশী ভালবাসে রে সানু?—মা, না বাবা?"

সানু বলিল, "ঠা'ম্মা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমার পর?"

পাশের ডল্ পুতুলটা আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "টুমি।"

আর কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সানু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "রাত্তিরে ঠাম্মার কাছে যাবো বলে কাঁডলে কি হয় জানো শৈলটাকা?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়?"

"হুমো ঢোরে নেয়।"

এর পরে হুমোর নানা রকম কীর্তিকলাপের কথা বলিতে বলিতে খোকা এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

আমারও ঘুম আসিবার কথা, কাল অনেক রাত পর্যন্ত ছাদের উপর গল্পগুজবে কাটিয়াছে; কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। পল্লীর মধ্যাহ্নকাল যেমন ছিল সেই রকমই স্তব্ধ, বরং বেশী। পাশের আগাছার মধ্যে একটা ঝিল্লির অবিরাম সঙ্গীত ছাড়া অন্য কোন শব্দ নাই। আমি এই রূপের লালসাতেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছি; কাল মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজ রূপ যখন আরও নিবিড় হইয়া ফুটিয়াছে, তখন আরও মুগ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু আজ ভাল লাগিতেছে না। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতেছি। এই ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মনের অতল শূন্যতায় কোথায় যেন একটা করুণ ক্রন্দন উঠিয়াছে।…ক্রমে অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া লিগুসে ক্রিসেন্টের দু-একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর শূন্যে যেমন ধীর-সঞ্চরণে ফোটে তারা—অস্পষ্ট থেকে ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া। আশ্চর্য, আর কাহারও কথা মনে পড়ার আগে আমার মনে পড়িল সরমার কথা। তরুর কথা নয়, এমন কি মীরার কথাও নয়।

সরমা কিসের প্রতীক্ষায় আছে? মীরার দাদার কথা যতটা শুনি, তাহাকে নিজের সমাজে বা নিজের দেশে কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে তাহার আশা নাই। সে বাড়িতে কাহাকেও চিঠি দেয় না, কেন না চিঠি দেওয়ার যাহা একটি মাত্র উদ্দেশ্য তাহার শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল—টাকা চাওয়া—বাড়িতে, বাহিরেও—সেটা সব জায়গায়

বন্ধ হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত মাত্র অপর্ণা দেবীর কাছে চিঠি আসিত—কচিৎ কখনও; কিন্তু টাকা পাঠাইবার বিপদ বা ব্যর্থতা তিনি উপলব্ধি করিতেই চিঠি বন্ধ হইয়া গেছে—বহু দিন হইতেই। এখন অবশ্য অনেকের বিশ্বাস সরমার কাছে কখনও কখনও আসে চিঠি। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিশ্বাসটুকু শুধু পরিণাম থেকে কারণে গিয়ে ওঠা, অর্থাৎ সরমা যখন শবরীর ধৈর্য্য লইয়া এখনও প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তখন নিশ্চয় ওর সঙ্গে যোগসূত্র আছে;—নিশ্চয় ও চিঠি পায়ই।

কিন্তু যদি থাকেও যোগসূত্র ত একতরফা, অর্থাৎ চিঠি দিলেও যে মীরার দাদা ঠিকানা দেয় না এটা নিশ্চয়, তাহা হইলে অন্ততঃ আর এক জনের সঙ্গে যোগটা থাকিয়া যাইত,—অপর্ণা দেবীর সঙ্গে। সেটা নাই।

তাহার প্রকৃত খবর মাঝে মাঝে এখন যেটুকু পাওয়া যায়, সে এখানকার বিলাত-প্রবাসী ছাত্রদের কাছ থেকে। তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, শুধু একটা কথা স্পষ্ট তাহাতে—সে দিন-দিনই নামিয়া যাইতেছে। আর, যতই দিন যাইতেছে, এ ধরণের খবরও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। মীরার দাদা অর্থের শৃঙ্খল রচনা করিয়া বিদেশী সমাজের গহ্বরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যত দিন অর্থ পাইয়াছে শৃঙ্খল জুড়িয়া জুড়িয়া ক্রমাগতই নামিয়া গেছে। এখন সে অদৃশ্যপ্রায়।

ইহাই দীর্ঘ আট বৎসরের ক্রমিক ইতিহাস। অর্পণা দেবীর কথা মনে পড়িতেছে, প্রথম যেদিন দেখা হয়, বলিতেছেন—"তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত।"

সরমা এরই কাছে বাগ্‌দত্তা, এরই প্রতীক্ষায় আছে। শান্ত, অল্পভাষিণী, চারিদিকের অসংযত বিলাসের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসের জীবন লইয়া এই আত্মবিলুপ্তের জন্য তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে সরমা। এত বড় করুণ দৃশ্য চোখে পড়ে না, ঠিক যেমন ওর মত সুন্দরীও সহসা পড়ে না চক্ষে। সরমার জীবনের সঙ্গে খর দ্বিপ্রহরে পল্লীর এই একটানা কলতানের—এই দহন-সঙ্গীতের কোথায় যেন একটা মিল আছে,—শুধু তপ্ত নিঃশ্বাসের মত বহিয়া যাওয়া—কোথায় এর শেষ? কি উদ্দেশ্য? কিই বা পরিণতি? এ কি শুধুই ভুল,—একটা অপচয়? তাই যদি হয় ত এই বিরাট্ ভ্রান্তির সার্থকতা কি?—যদি ভ্রান্তির সার্থকতা থাকা সম্ভবই হয় নিতান্ত।

আবার মনে হয় এই তিল তিল করিয়া জলার মধ্যেই বোধ হয় লোকোত্তর কোন বিপুল সার্থকতা লুকান আছে, যার রহস্য শুধু সরমারাই জানে। কবি ফিকরির দুইটা লাইন মনে পড়িল—

> কঁহা ব লজ্জতে উলফৎ মিলি পতংগ তুঝে
> মিলি যো শ্যামাকো ঘুল্‌ঘুল্‌কে জান দেনে মে।

হে পতঙ্গ, (প্রদীপের কাছে মুহূর্তের আত্মসমর্পণে) তুমি ভালবাসার সে-আনন্দ কোথায় পাবে যা পেলে মোমবাতি তিল তিল ক'রে নিজের জীবন আহুতি দেবার মধ্যে?

বাহিরের দিকের জানালার ছিদ্রপথে নিরাভরণ মধ্যাহ্নের আলো প্রবেশ করিতেছে, ঘরের অন্ধকারের বৈষম্যে আরও তীব্র হইয়া; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হাওয়ার ঝলকা;···মনটা ঝিমাইয়া যাইতেছে। এক-একবার হঠাৎ উগ্র স্পষ্টতায় লিওসে ক্রিসেণ্ট পূর্ণ অবয়বে ফুটিয়া উঠিতেছে—রেডিওর রেগুলেটারটা বাড়তির দিকে ঘুরাইয়া দিলে যেমন একতান যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দগুলা হঠাৎ ঝঙ্কার করিয়া ওঠে:—মীরা—তরু—ইমানুল—অপর্ণা দেবী—মিষ্টার রায়—বাড়ি বাগান—পার্টি—আভিজাত্যের সচ্ছলতা—পুত্রশোকাতুরা ভুটানী জননী—সব মিলাইয়া একটা সঙ্গীত, একটা অদ্ভুত সিম্‌ফনি, যার মূল সুর—কেমন করিয়া জানি না—সরমা।

মনটা কেমন হঠাৎ উদগ্র হইয়া ওঠে, আবার এই মধ্যাহ্নের স্বপ্ন-সঙ্গীত স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হইয়া আসে।

খোকার শীতল, মসৃণ, নগ্ন গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাই। শিশু,—জীবনের উত্তপ্ত অঙ্গে ভগবানের চন্দন প্রলেপ। বেশ বুঝিতে পারি তপ্ত আঙ্গুল বাহিয়া যেন শান্তি উঠিয়া আসিতেছে—হাত বুলাইয়া যাই; বুলাইয়া বুলাইয়া যেন আশ মিটিতেছে না।

মন আবার ঘুরিয়া যাইতেছে; ঠিক শান্তিতে তৃপ্তি পাইতেছে না। চাই বেদনা, চাই দহন; তাই বিধির বিধান এই যে শিশুর আগে আসিবে সরমা, আসিবে মীরা···

আমি সেদিন বিরহের দীর্ঘ অবকাশে প্রেমকে যেন ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "হে জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অনবদ্য, তাই সৃষ্টির যা চরম ভাল তাহাই তোমার চরণে পড়ে অর্ঘ্য হইয়া; তাই ত তুমি যুগযুগান্ত ধরিয়া তাদেরই পূজা গ্রহণ করিয়াছ—রাজ্য, মান, লজ্জা, রূপ, যৌবন—সমস্ত বিভবকেই ধূলিমুষ্টির মত পথে ফেলিয়া যাহারা তোমার মন্দির-তোরণে উত্তীর্ণ হইয়াছে।···তোমায় পাইয়াছে সরমা; নিজেকে নিখুঁত

ভাবে গড়িয়া তুলিয়া নিঃশেষ ভাবে তোমার চরণে বিলাইয়া দিয়াছে। পদে পদে এই হিসাব, আত্মাভিমানের এই চুলচেরা বিচার, মনের এই বণিক্‌বৃত্তি লইয়া আমি তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিবার স্পর্দ্ধা কোথা থেকে পাই?"

দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিয়া দেখিলাম জানালার ছিদ্রপথে আলো নরম হইয়া আসিয়াছে। দরজা খুলিয়া দেখি অম্বুরী দাঁড়াইয়া; বলিল, "বেলা প'ড়ে এসেছে যে ঠাকুরপো, খুড়োভাইপোতে খুব ঘুমোচ্ছ। কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, না?"

বলিলাম, "হয়ে থাকবে, কিন্তু ক্ষতি হয় নি; কাল রাত্তিরটাও যেমন ভাল লেগেছিল আজ দিনের ঘুমটাও তেমনি চমৎকার লাগল।"

মুখ হাত ধুইলাম। অম্বুরী খোকাকে তুলিয়া আনিয়া বলিল, "এবার রকে ওই আমগাছের ছায়াটায় মাদুর পেতে দিই ঠাকুরপো। সরবৎ ক'রে দোব, না, চা?—···চা? বেশ চাই হবে। তার পর একটা ফরমাস আছে—অমন সরবতেই নেশা ছাড়িয়ে যারা চায়ের নেশা ধরিয়েছে তাদের কথা বলতে হবে।"

তাহার পর আমার মুখের পানে কৌতূহলোদীপ্ত চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "আরও নেশা যদি কিছু ধরিয়ে থাকে, সে সব কথাও; ছাড়বার পাত্রী নই আমি।"

৮

ছোট মেয়েটাকে বুকে করিয়া একটু ঘুরিলাম। ওর সব চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে আমার চশমা। মুখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিল; তাহাতে রহস্য পরিষ্কার না হওয়ায় হাত বাড়াইল। আমি হাতটা ধরিয়া লইতে মুখ আগাইয়া আনিয়া যেই একটা কামড় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, খোকা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঠব্বনাশ! ওকে খেটে ডিও না শৈলটাকা, পেটের অসুক করবে।···খুকু, চঁশমা খেও না; টেটো! বিচ্ছিরি!"

মুখটা কাল্পনিক তিক্তাস্বাদে যতটা সম্ভব বিকৃত করিয়া বোনকে বিরত করিবার চেষ্টা করিল। ··· খোকা অভিভাবক হইয়া উঠিতেছে। যাহার নীচে ছোট বোন রহিয়াছে সে কি নিজে আর ছোট থাকিতে পারে কখন?

অম্বুরী চা আর হালুয়া তৈয়ার করিয়া আমার মাদুরের পাশে রাখিয়া নিজে আমার সামনে সিঁড়িটাতে বসিল। মাদুরে খোকা আর খুকীকে বসাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম—"জেঠাইমা কোথায়? —ওঠেন নি এখনও?"

অম্বুরী বলিল, "উঠেছেন, হারাণীর মা ভেতরে পাট করছে, যতক্ষণ তার আওয়াজ পাবেন বকর বকর করবেন। এ সময়টা আমি নিশ্চিন্দি থাকি একটু। পাট সেরে হারাণীর মাও যাবে, ওঁকেও হাত পা ধুইয়ে জপে বসিয়ে দোব। এই আমার রুটীন"—বলিয়া গর্ব্বের অভিনয় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দেখ, আমিও ইংরিজী জানি ঠাকুরপো।"

সান্থ মায়ের হাতটা টানিয়া ভীত ভাবে বলিল, "খুকু শৈলটাকার টশমা খাবে মা, গলায় আটকে যাবে না?"

তাহার নিজের হাতে মুঠাভরা হালুয়া; মা বলিল, "তুমিও তা ব'লে হালুয়া অতখানি খেয়ো না যেন, চশমার মত পেটে যেতে আটকায় না বলে ওতে পেটের অসুখ করবে না নাকি?"

তাহার পর গল্প শুনিবার ভঙ্গিতে আবার এক চোট ভাল করিয়া গুটাইয়া সুটাইয়া বসিয়া বলিল—"এবার যা বলছিলাম—কেমন বাড়ি, কেমন লোক সব? তোমার ছাত্রী···"

হাসিয়া ফেলিয়া দুষ্টামির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমি না বুঝিবার ভান করিয়া গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলাম, "বয়সের কথা জিগ্যেস করছ? —ন' বছর। বেশ চমৎকার মেয়ে, একটুও বেগ পেতে হয় না আমায় পড়াতে।"

অম্বুরী হারিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল। একবার আমার পানে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া রকের উপর ধীরে ধীরে তর্জনীর ডগাটা ঘষিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েছেলেই তো? এসব বিষয়ে ওরা কবে হারিয়াছে কাহার কাছে? নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখটা আমার মতই গম্ভীর করিয়া ফেলিল। বলিল, "বেশ ভাল হয়েছে—হাল্কা কাজ; আর তোমার বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম বাড়িটিও ছিমছাম—কর্ত্তা নিজে, গিন্নী, আর একটি মেয়ে—তোমার ছাত্রীর বোন। ···কোথায় বিয়ে হয়েছে তার ঠাকুরপো? —খুব বড়লোকের বাড়ি? এদের তো শুনেছি দুটো মটোর গাড়ি, তাদের?"

কিন্তু এত ঘুরাইয়া কথা বাহির করিবার দরকারই ছিল না অম্বুরীর; কাল সন্ধ্যায় অনিলের কাছে যে সেই একবার গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার পর থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এদের দু-জনের কাছে সমস্ত কথাই একটি একটি করিয়া মেলিয়া ধরিব, অবশ্য স্ত্রীলোক হিসাবে অম্বুরীর সামনে খানিকটা আব্রু রক্ষা করিয়া। আমার এই তিনমাসব্যাপী সমস্ত অভিজ্ঞতা বলিয়া গেলাম অম্বুরীকে

—মিস্টার রায়ের কথা, অপর্ণা দেবীর পুত্রগত অদ্ভুত বেদনাময়-জীবনের কথা, ভুটানীর সহিত দরদের সমতার জন্য তাঁহাদের অসম সখীত্বের কথা, রাজু-বেয়ারার গুরুত্বপূর্ণ শব্দপ্রীতি, ইমানুলের অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনা, বিলাস-ঝির কথা। গভীর অভিনিবেশের সহিত অম্বুরী সব শুনিয়া যাইতে লাগিল। ওর স্বভাবটাই এমন—আর বিবাহের পর থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর মুক্ত মেলামেশার মধ্যে দিয়া অনিল এমন অভ্যাস করাইয়া দিয়াছে যে আমায় একটু সংকোচ করে না অম্বুরী, আজ যেন কোন দূরত্বই রাখিল না। গল্প শুনিতে শুনিতে কখনও হাসিল, কখনও চক্ষে বস্ত্র দিল। যখন প্রয়োজন মনে হইল, নিঃশব্দে নিজের মন্তব্য দিল—"আহা, নিজে সুন্দর নয় ব'লে সুন্দরকে চাইতে পারবে না বেচারি? অবিশ্যি মেমসায়েব বলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ···হাসিও পায় বাপু, করছিস মালীগিরি, বিয়ে করতে হবে পাদ্রী-সায়েবের ভাইঝিকে।"

অম্বুরী ডুকরাইয়া হাসিয়া ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝিয়ের ঘর ঝাঁট দেওয়ার শব্দ থামিয়া যায়; বোধ হয় একটু বেখাপ্পা ঠেকে ওদের কানে।

তাহার পর বলি তরুর কথা এবং সবশেষে ও সবচেয়ে সবিস্তারে মীরার কথা। অবশ্য যেমন ভাবে অনিলকে বলিয়াছি অম্বুরীকে ঠিক সে ভাবে সে-ভাষায় বলা চলে না। কর্মে নিয়োগের দিন থেকে এখানে আসার আগে পর্যন্ত মীরাঘটিত সব কথাই এক রকম খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিলাম। শুধু মন লইয়া ব্যাপার যেখানে, সেই সব কথাগুলা বাদ দিয়া গেলাম।—যেমন, অশ্রুর কথা বলিলাম না; যেমন, মীরাকে যে বলিয়াছিলাম—নিজের তাগিদেই থাকিয়া গেলাম সে কথারও উল্লেখ করিলাম না।

অম্বুরী শুনিতেছে—একেবারে তদ্গত হইয়া; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়া আমার পানে চাহিতেছে; মুখের ভাব যে কত রকম বদলাইতেছে বলা যায় না। মাঝে মাঝে এক একটা ছোট্ট প্রশ্ন করিয়া নিজের চিন্তার পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। গোড়াতেই খানিকটা শুনিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "নাম বললে—মীরা? কি,—শ্রীমতী মীরাসুন্দরী দেবী?"

বলিলাম, "না, মিস্ মীরা রায়।"

অম্বুরী চোখ দুইটা একবার উপরে তুলিয়া কি একটু ভাবিয়া লইল যেন। আবার কাহিনী শুনিয়া চলিল। খানিকটা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয় নি, বুঝলাম, কিন্তু কথাবার্তাও হচ্ছে না? যেমন বলছ—বেশ তো ডাগর মেয়ে···কত বয়স হবে ঠাকুরপো?"

নির্লিপ্তভাবে বলিলাম, "ওর বাপ মা তো ওর ঠিকুজি গড়তে দেন নি আমায়, কি ক'রে বলব? তবে আন্দাজে মনে হয়—এই আঠার-উনিশ-কুড়ি···"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "একুশ—বাইশ—তেইশ—সাতাশ—ত্রিশ···বেশ, বুঝেছি; বল।"

একবার অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "ওদের মেয়েরা তো নিজেরাই বর খুঁজে নেয়, কিছু টের পাও নি তুমি?"

নির্লিপ্তভাবেই হাসিয়া বলিলাম, "কি ক'রে পাব বল? বর শীকার করতে কি ও আমায় সঙ্গী ক'রে নেয়?"

একটা জিনিস লক্ষ্য করি,—আমার এই ঔদাসীন্যে অম্বুরী যেন তৃপ্ত হয়। প্রশ্নটা করিয়াই তীব্র আগ্রহে আমার পানে চাহিয়া থাকে, তাহার পর উত্তরটা পাইয়াই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ওঠে।

শোনার পাশে পাশে ওর চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। শেষ দিকে একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তুমি তো দু-জনকেই দেখেছ,—সরমা বেশী সুন্দর, না মীরা বেশী সুন্দর ঠাকুরপো?"

এবারও নির্লিপ্তভাবেই, কতকটা যেন এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এ বড় শক্ত প্রশ্ন করলে যে! আমি কি ক'রে বলি?—কারুর চক্ষে মীরা সুন্দরী, কারুর চক্ষে সরমা সুন্দরী।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "কী যে বলেন ঠাকুরপো! ···আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই সই; তোমার চোখে কে বেশী সুন্দরী?"

স্পষ্ট জবাব দিলাম না, বলিলাম, "মীরা কালো হোক, কিন্তু শ্রী আছে। ···অবশ্য সরমার কথা আলাদা।"

অম্বুরী আবার দৃষ্টি নত করিয়া শানে তর্জনীর ডগাটা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তার মানে ঠাকুরপোর চোখে মীরাই বেশী সুন্দরী।"—বলিয়াই একবার হাসিয়া আমার পানে চোখ তুলিয়া চাহিল।

খোকা-খুকী খেলা করিতে করিতে রকের ওদিকটায় চলিয়া গিয়াছিল। খোকা ডাকিল, "ওমা ঠিগ্‌গির এস,—টোমার মেয়ের কাণ্ড!"

অম্বুরী গিয়া খুকীকে ধরিয়া আনিল। খুকীর কাণ্ড,—সে একটা টিকটিকির বাচ্চা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। খোকা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ঠব্বনাশ, ওটা যদি ঠাপ্‌ হোত শৈলটাকা!"

বলিলাম, "তোর মামা যদি তোর মেসো হ'ত খোকা!"

এ ঠাট্টাটা দিনকতক পরে মুখ দিয়া বাহির হইবে না

বোধ হয়, যেমন কড়া রকম ভদ্র হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু আপাতত এই আবেষ্টনীর মধ্যে ঠাট্টা করিয়া ফেলিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "ওর মামা-মাসীকে এর মধ্যে টানা কেন? তোমাদের ঘরে বোন দিয়েছে এই অপরাধে?"

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথা তুমি অভয় দাও তো বলি।"

বলিলাম, "আমার ভয়ের কথা না হয় তো অভয় দিই।"

অম্বুরী একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ দুইটি একটু কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি মীরাকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো?—যতটা শুনলাম তাতে মনে হয় ওর যেন তোমাকে পছন্দ হয়েছে।"

হাসিয়া বলিলাম, "যদি ক'রেই বসি কোন দিন তো আশ্চর্য হ'য়ো না অম্বুরী।"

অম্বুরীর মুখটা যেন এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। নামাইয়া লইয়া খোকার দিকে চাহিয়া এক রকম বিনা কারণেই বলিল, "ও খোকা! কি হচ্চে আবার?"

ওইটুকুর মধ্যে কিন্তু নিজেকে আবার সামলাইয়া লইল, অন্তত বাহিরে বাহিরে। খুকীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "খুকুমণি, তোমার কেমন রাঙা টুকটুকে কাকীমা আসবে এইবার!···

খোকা ঐদিক থেকে প্রশ্ন করিল, "ঠৈল কাকীমা, মা?"

অম্বুরী এতক্ষণে আমার পানে একটু চাহিল; হাসিয়া আমার পানে চাহিয়াই খোকার কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ শৈলকাকীমা। ···বেশ হবে ঠাকুরপো তা হ'লে। যাই- সন্ধ্যে হ'য়ে এল।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

* * * * *

অনেক ভাবিয়া মিলাইয়া পরে রহস্যটা বুঝিয়াছি; যাহা বুঝিয়াছি সেইটাই সত্য।

অম্বুরী সহ্য করিতে পারিল না। ঈর্ষা নয়। যে-আমি একান্তভাবে ওদেরই মানুষ, মীরাকে লাভ করিয়া, মীরাকে অবলম্বন করিয়া কোন্ একটা অপরিচিত উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইব, যেখানে অম্বুরীর প্রবেশ নাই—এই কল্পনাটাই অসহ্য অম্বুরীর পক্ষে। ঈর্ষা নয়, আসন্ন বিচ্ছেদের টন্‌টনানি, অম্বুরীর হৃদয়ের তন্ত্রীতে যেন টান পড়িল। অনিল আমায় অতটা চায়, কিম্বা আমি অনিলকে এতটা চাই তার অনেক কারণ আছে,—আমাদের দুই জনের বাইশ-তেইশ বছরের প্রতি দিনটি যেন জড়াইয়া মিশাইয়া রহিয়াছে। অম্বুরী আমায় চায় অনিলের মধ্যে দিয়াও, তাহার উপর আরও একটা অন্য কারণে। শ্বশুরবাড়ীর দিকে ওর আর কেহ আত্মীয় নাই, অনাত্মীয় হইয়াও আমি একা এই জায়গাটি পূরণ করিয়া আছি। আমি ওর দেবর, স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া দেবরের চেয়েও বেশী কিছু। স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া অম্বুরী আমায় চারি দিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। অনাত্মীয় যখন আত্মীয় হয়, তার সঙ্গে যোগটা হয় আরও নিবিড়, কেন না সদাই একটা বিচ্ছেদের ভয় লাগিয়া থাকে—অল্প কারণেই। অম্বুরী ঠিক এই রকম একটা আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াছে।

মীরা অন্য স্তরের জীব। রূপে, সম্পদে, শিক্ষায়, বিলাসে অম্বুরীর জগতের চেয়ে মীরার জগৎ অনেক উচ্চে। বোধ হয় স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গা; যতটা শুনিয়াছে অম্বুরী তাহাতে ওর মনে হয় মর্ত্যের চেয়ে স্বর্গেরই বেশী কাছে। কিন্তু হাজার দুঃখ বেদনা থাকাতেও মানুষ যেমন মর্ত্যকেই বুক আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, স্বর্গকে পরিহার করিয়াই চলে, মীরার জগৎ সম্বন্ধে অম্বুরীর মনের ভাবটাও সেই রকম,—বেশ প্রশংসা করা চলে, আশ্চর্য্য হওয়া চলে, এমন কি আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত করা চলে, কিন্তু পাওয়া চলে না। তখন দেখা যায় শত দোষ থাকা সত্বেও এই মাটিমাখা জীবনই ভাল।···যাদের আপন বলিয়া বুকে জড়াইয়াছে তাদের কেহই এই গণ্ডির বাহিরে যায় অম্বুরী এটা সহ্য করিবে কি করিয়া?

মীরার নামটা শুনিয়াও অম্বুরী খুশী হইতে পারে নাই—বেশ মনে আছে। নামেও যেন সম্পূর্ণ এক অন্য স্থর। অম্বুরী নিজে যে-জগতের মানুষ সেখানকার মেয়েরা কমলা, লক্ষ্মী, শিবকালী, শৈলবালা, কিরণ; খুব বেশী হইল তো নয়নতারা, নিভাননী,—অম্বুরীর নিজের নাম মুক্তকেশী।

ওদের যে-কেহ অম্বুরীর দেবরকে অধিকার করুক, অম্বুরী তাহাকে বরণ করিয়া বুকে করিয়া লইবে। এদের মধ্যে কেহ আসিলে অম্বুরীর আর এক জন বাড়িবে, মীরার আবির্ভাবে কিন্তু বাড়া দূরের কথা, আমি শুদ্ধ লুপ্ত হইয়া যাইব অম্বুরীর জগৎ থেকে।

মনে আছে এর আগের বারে আমি যখন আসিয়া-ছিলাম—মাস-ছয়েক পূর্বে, অম্বুরী বলিয়াছিল, "আমাদের গ্রামে একটি মেয়ে আছে ঠাকুরপো, তোমার জন্যে আমি এঁচে রেখেছি। তুমি বিয়ে কর; তার পর আবার এখানে ফিরে এস, আমরা দুটি বোনে কাছাকাছি থাকি। কী পশ্চিমে পড়ে আছ বাপু? বুঝি না···"

মীরা অম্বুরীর সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া দিবে। তাই মীরার নামে অম্বুরীর মুখ শুকাইল। ক্রমশঃ

বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন। এই দুই জনই অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহারা এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যে নাম করিতে গেলে অনেকের ধৈর্যহানি হইবে। তাহার মধ্যে শ্রীসনাতন প্রায় সিদ্ধান্তগ্রন্থ ও শ্রীরূপ প্রায় রসগ্রন্থগুলি রচনা করেন। ইঁহাদের গ্রন্থাগারও বিপুল ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থগুলি তাঁহাদের সমাধির পাশেই সমাধি দিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নাম "গ্রন্থ"-সমাধি! শ্রীজীব গোস্বামী দীর্ঘজীবী কঠোর তপস্বী ছিলেন—তাঁহারও বহু গ্রন্থ ছিল। সেগুলি সমাহিত হয় নাই সত্য কিন্তু তাহা যে রাধা দামোদর মন্দিরে ছিল তাহার অধিকারীদের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় বহুকাল তালাবদ্ধ থাকাতে নাকি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি পোকাতে ও মাটিতে পচিয়া সব অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

সনাতন গোস্বামীর ভাই রূপ ও বল্লভ। বল্লভ সর্বকনিষ্ঠ। তাঁহার আর এক নাম ছিল অনুপম। বল্লভের পুত্র হইলেন জীব গোস্বামী। তিনি কাশীতে আসিয়া মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের ছাত্র হন। রূপ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা লইয়া জীব গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগ কঠোর তপস্যাতে ও প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার গ্রন্থাদির কথা বাঙ্গালীর রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকরণে বলা হইবে। জীব গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগে বৃক্ষের শুষ্ক পত্র ও তীর্থের ধূলা মাত্র খাইতেন। তাহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। উদরী রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। বৈষ্ণবদের বসাইয়া সমাধি দেওয়া বিধি। কিন্তু উদরী রোগে শরীর ফুলিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে বসাইয়া সমাধি দেওয়া গেল না। তাই তাঁহার সমাধি শোয়ান অবস্থায়—দীর্ঘ সমাধি।

জীব গোস্বামীর তেজও বিলক্ষণ ছিল। কথিত আছে, এগারসিন্দুরবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপনারায়ণ কাশী যাইয়া সংস্কৃত পড়েন। তার পর তিনি বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মহারাষ্ট্র বাঁই নগর প্রভৃতি স্থানে যান। সরস্বতী উপাধি লইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। বৃন্দাবনে রূপ সনাতনকে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁহারা বীতরাগ বৈষ্ণব, তাই যুদ্ধ না করিয়াই তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র লইয়া তিনি জীবের নিকট গেলে জীব তাঁহার সহিত ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাঁহাকে পরাজিত করেন। রূপনারায়ণ তখন বিনীত হইয়া সনাতনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিতণ্ডাবুদ্ধিতে জীব তর্ক করিয়া অবৈষ্ণবের মত কাজ করিয়াছেন বলিয়া রূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি স্বীয় দম্ভের দ্বারা বৃন্দাবনকে অসম্মানিত করিয়াছ। এই তীর্থের তুমি অযোগ্য।" তাই জীব দীর্ঘকাল বৃন্দাবনের বাহিরে যমুনা-কুটীরে বাস করিতেন। পরে সনাতন গোস্বামী কৃপা করিয়া তাঁহাকে আবার বৃন্দাবনে লইয়া আসেন।

রূপ সনাতনের পাণ্ডিত্যে মহামতি আকবর মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবদের বৃন্দাবন রচনায় সহায়তা করিয়াছেন। মহারাজা মানসিংহ তাঁহার গোবিন্দজীর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে রূপ ও সনাতনকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লিপিতে একটি কথা দেখা যায় যাহা হিন্দী ভক্তদের লেখার সঙ্গে মেলে না। ভগবান দাস মানসিংহের পিতা নহেন, তিনি পিতৃব্য।

ভক্তিরসবোধিনী-প্রণেতা প্রিয়াদাসজী বলেন, মীরাবাঈ নাকি বৃন্দাবনে গিয়া জীব গোস্বামীর খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। গোস্বামীজী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না।" তাহাতে মীরা বলিয়া পাঠাইলেন, "বৃন্দাবনে তো জানি পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আর তো সবাই নারী। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে আর এক জন পুরুষ বসিয়া আছেন জানিলে তো তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথায় গোস্বামীজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া আসিয়া মীরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাই প্রিয়াদাসজী বলেন,

> বৃংদাবন আঈ জীব গুসাঈঁ সোঁ হিলিমিলি
> তিয়ামুখ দেখিবে কো পণ লে ছুড়ায়ো হৈ।
> (ভক্তমাল, মীরা-চরিত টীকা)

জীব গোস্বামীর সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যাহাতে মনে হয় তিনি প্রচলিত লোকাচার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জীব নাকি একবার যমুনায় স্নানরত ছিলেন

তখন আচারনিষ্ঠ দক্ষিণী এক ব্রাহ্মণ দেখিলেন জীব সন্ধ্যা করেন না। তখন তিনি জীবকে সন্ধ্যা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জীব বলিলেন,

সদ্ভক্তির্দুহিতা জাতা মায়া ভার্য্যা মৃতাধুনা।
অশৌচ দ্বয়যুক্তেন ত্যক্তা সন্ধ্যা ময়া সখে॥

"হে বন্ধু, আমার সদ্ভক্তিরূপা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মায়ারূপা ভার্য্যা পরলোকগতা, এই দুই অশৌচ একসঙ্গে আসিয়া পড়ায় আমি এখন সন্ধ্যা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

আর একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সন্ধ্যা না করার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে জীব গোস্বামী নাকি বলিয়াছিলেন,

হৃদাকাশে চিদানন্দঃ সূর্য্যো ভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥

"হৃদয়াকাশে চিদানন্দ সূর্য্য নিরন্তর দেখিতেছি দীপ্যমান। তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই তাই কেমন করিয়া করি সন্ধ্যা ?"

কেহ কেহ বলেন, দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণই জীব গোস্বামীকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেন।

এই শ্লোক দুইটি মৈত্রেয়োপনিষৎ পুস্তকে একটু ভিন্ন ভাবে পাই—যথা

মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ
সূতকদ্বয় সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥৪
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥৫

মৈত্রেয়োপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪, ৫,
Otto Schrader's Edition, Adyar Library, p 115, 116

বৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট, আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। এখানে গোস্বামী রঘুনাথ দাস ও লোকনাথ গোস্বামীর নামও করা উচিত।

এই সব বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের লেখা ও সংগৃহীত বহু গ্রন্থ গাড়ী বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠান হইয়াছিল, পথে বনবিষ্ণুপুরে তাহা লুণ্ঠিত হয়। তাহার কিছু কিছু পরে পাওয়া যায়, সব আর পাওয়া যায় নাই। ইহার পরেও বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ লেখা হয় তাহার উল্লেখ করার অবসর এখানে নাই।

এখানে মহাপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নাম না করিলে অন্যায় হয়। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ। তাঁহার সারার্থ দর্শিনী নামে ভাগবতের টীকাই তার চরমগ্রন্থ, ইহা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

বৃন্দাবনের কুঞ্জ ও মন্দিরগুলি প্রায়ই বাঙালীর। সেখানে দান ও পুণ্যার্থে যে অর্থ নানা দেশ হইতে আসে তাহারও বার আনা বাঙ্গালীরই দান, যদিও নিজেদের দলাদলি ও অন্যান্য কারণে এখন পৌরাধিকারে বাঙ্গালীর তেমন হাত নাই। বৃন্দাবনধাম মহাপ্রভুর ভক্তেরাই গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় প্রভাব সমগ্র রাজপুতানায় ছড়াইয়া পড়িল। তাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মতবাদিগণ ইহাতে কিছু দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সকলে বলিলেন, চৈতন্য মত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এই লইয়া অম্বরপতি রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে অম্বরে এক মহা বিচার-সভা বসিল। তাহাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় মতকে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ছিল না। গোবিন্দজীর কৃপায় এক মাসের মধ্যে বলদেব এক অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিলেন। তাই তাহার নাম হইল গোবিন্দভাষ্য।

বৃন্দাবনের সেই গ্রন্থরচনার ধারা এখনও চলিয়া আসিতেছে। এক শত বৎসর আগেও গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ বাবাজী বাংলা গদ্যে একখানি গুটকা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের দিনগত লীলার কথা বর্ণিত। ভক্ত গোস্বামী রাধিকানাথ, ব্রজবিদেহী সন্তদাস, রাজর্ষি বনমালী রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী সাধুরা এবং ব্রজমণ্ডলের বনবাসী বাঙ্গালী বাবাজীগণ এখনো বাংলার নাম ধন্য করিয়া রাখিয়াছেন।

বাংলার জয়দেব, মহাপ্রভু, জীব গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রসিক মুরারী, দাস রঘুনাথ, নিত্যানন্দ, রূপসনাতন প্রভৃতির জীবনী নাভাজীর ভক্তমালে ও প্রিয়াদাসের ভক্তিরসবোধিনীতে পাই। তাহা ছাড়া রাঘবদাস, হরিবর রামানুজ প্রভৃতি হিন্দী ভক্তচরিত লেখকেরাও বহু গৌড়ীয় ভক্তের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বর্ষা-নটী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মর্ত্ত্যের প্রেমলোক-চিত্তের নৃত্যে হর্ষ ও বেদনার হিন্দোল ছন্দে,
ঝর্ঝর ঝলি গো তুই রসঝর্ণা, নাম্‌লি এ বিশ্বেতে রূপগীতগন্ধে।
রৌদ্রের তপলোক রুদ্রের হাস্যে মেঘলোকস্বপ্নে-যে রূপ তোর সৃষ্টি,
লাখ লাখ যক্ষের বক্ষের মেঘদূত কাব্যের ফুলফোটা সুন্দর বৃষ্টি।
অম্বুদ গুরু গুরু অঙ্গের ছমছম,
চঞ্চল পা'র দোল ঝরণার মঞ্জীর ঝর্ঝর ঝমঝম ঝর্ঝর ঝমঝম।

হাস্যের দমকায় চমকায় বিদ্যুৎ ঝকমক ক'রে ওঠে কুন্দের মাল্য,
অম্বর-মজলিস-শিল্পের কুঞ্জে গাঁথলো কে যৌবন কৈশোর বাল্য ?
হস্তের দোল তার মালকোষ ঝাঁপতাল, চাউনির বেগ তার মঙ্গল ঘূর্ণী,
ঝঞ্ঝায় বীণ তার গায় নটমল্লার, দেয় সব মর্ত্ত্যের পাপতাপ চূর্ণি।
অম্বুদ ধন ধন গায় জয় ডিণ্ডিম,
বাস্তব স্বপ্নের রূপরসনির্ঝর ঝর্ঝর ঝমঝম রিমঝিম রিমঝিম।

বৃষ্টির ঝর্ঝর সৃষ্টির বর তার ডর তার চমকায় বজ্রের খড়্গে,
ছন্দের শিবদূত তাল দেয় বম্‌বম্ তিনলোক জয়গান গায় তার স্বর্গে।
দোল খায় বক্ষের দুই শিবসুন্দর, মৃত্যুর ভয় নাই তার শ্যামকুঞ্জে,
চল চল যৌবন-নৌকায় সাম্‌লা টলমল বর্ষায় ঐ তার গুণ যে।
আজ শিব সঙ্গে যে ভয় নাই চল্ চল্,
থম থম অম্বর অঙ্গের ছমছম, ঝর্ঝর ঝমঝম কলকল ছলছল।

ঘাটমাঠ পথবন দশদিক আব্‌ছা, ঝর্ঝর ঝর তুই স্বর্গের ঝর্ণা,
বাস্তব ঢাক্ তুই বৃষ্টির স্বপ্নে, আন্ তুই ধ্যানলোক মুক্তার বর্ণা।
অস্ত্রের ঝঞ্চন হিংসার পাপতাপ চঞ্চল পায় তোর খাক সব চুম্ গো,
জাগ্রৎ বিশ্বের দুঃখের ঘুরপাক অঙ্গের 'পর তোর যাক সব ঘুম গো।
আয় ঘুম থমথম অঙ্গের ছমছম,
রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম ঝর্ঝর ঝমঝম ঝর্ঝর ঝম্‌ঝম্।

ক্ষুদে-পিঁপড়ের ব্লিৎস্‌ক্রিগ্‌

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কেবল বিদ্যুৎগতিতে সৈন্য পরিচালনাই নহে, শত্রু-ঘাঁটির যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা উৎপাদন এবং তৎসহ অবিরাম শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত সহকারে প্রবল বন্যা-প্রবাহের মত যান্ত্রিক বাহিনীর যুগপৎ দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণই

ডালের একাংশে লড়াই ও অপর অংশে পুরাতন বাসার দৃশ্য

'ব্লিৎস্‌ক্রিগে'র বিশেষত্ব। আকাশ হইতে বোমারু বিমানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটিষ্ট সৈন্যদের নগরাভ্যন্তরে অবতরণ এবং পঞ্চম বাহিনীর সহায়তায় পেট্রোল সরবরাহের আস্তানা, বিমান ঘাঁটি, যানবাহন চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্রসমূহ দখল করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলেই সাধারণ নাগরিকেরা ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্য চলাচলের বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং অনেকে দলিত ও পিষ্ট হইয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হয়। ছোট-খাট পাহাড় পর্ব্বত বা উচ্চ ভূমিতে বাধা পাইয়া বন্যার জল যেমন বর্দ্ধিত তেজে ভীমগর্জ্জনে প্রবাহিত হইতে থাকে, যান্ত্রিক বাহিনীও সেইরূপ জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সম্মুখের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাই সমর-কৌশলের আধুনিকতম অভিব্যক্তি। মানুষের পক্ষে এরূপ সমর-নীতি বা 'ব্লিৎস্‌ক্রিগ' পরিচালনা সম্ভব হইলেও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে কোথাও যে এরূপ কৌশল অনুসরণ করা সম্ভব নহে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনুষ্য হইতে বহু নিম্ন পর্য্যায়ের কীটপতঙ্গ শ্রেণীর পিপড়েদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আমার এমন কয়েকটি লড়াই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল যাহাতে তাহাদের এক পক্ষের রণ-কৌশল—সৈন্য পরিচালন, সৈন্য-সংস্থান এবং অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার, বহুলাংশেই 'ব্লিৎস্‌ক্রিগে'র অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। এমন কি, ব্যাপক ধ্বংস ও লুণ্ঠনাদি ব্যাপারের ভীষণতায় হয়তো ইহা মনুষ্য-পরিচালিত 'ব্লিৎস্‌ক্রিগ'কেও হার মানায়। এইরূপ 'ব্লিৎস্‌ক্রিগে'র এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

লড়াই বাধিয়াছিল বিভিন্ন জাতীয় দুই দল পিঁপড়ের মধ্যে। এক দল ক্ষুদে, অপর দল বৃহদাকৃতি। বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় যাঁহারা সম্যক

যুদ্ধের মধ্যভাগে নালসোরা নূতন বাসা নির্ম্মাণে ব্যস্ত

আমের ডাল হইতে নালসোদের পুরাতন বাসাটি ঝুলিতেছে

অবগত নহেন তাঁদের বুঝিবার স্থবিধার নিমিত্ত যুধ্যমান পিঁপড়েদের একটু মোটামুটি পরিচয় দিতেছি। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই আম, জাম, পাকুড় প্রভৃতি গাছে লাল রঙের এক প্রকার দুর্দ্ধর্ষ পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি পাতা একত্রে জুড়িয়া এই পিঁপড়েরা গাছের ডালে ফুট-বলের মত বড় বড় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব অতিশয় উগ্র; কাহাকেও নিকটে পাইলেই দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করে। মরিয়া গেলেও কামড় ছাড়ে না। ইহাদের পরিবারের মধ্যে শ্রমিক, পুরুষ ও রাণী—এই তিন রকমের পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও রাণী উভয়েরই ডানা আছে; কিন্তু শ্রমিকদের ডানা থাকে না। পুরুষের শরীরের রং কালো, রাণীদের রং সবুজ কিন্তু একমাত্র শ্রমিকদের শরীরের রঙই লাল। রাণীরা লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির মত বড় হয়। পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু বেশী। শ্রমিকরা সিকি ইঞ্চি হইতে আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। শ্রমিকরাই তাহাদের সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে। যুদ্ধের সময় সৈনিকের কাজও ইহারাই করে। এক একটি বাসার মধ্যে প্রায় শতাধিক রাণী, কয়েক শত পুরুষ এবং চার-পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক বাস করে। তাছাড়া বাসার মধ্যে থাকে হাজার হাজার ডিম, বাচ্চা ও পুত্তলী। বাচ্চাগুলিই পিঁপড়েদের প্রধান সম্পত্তি। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রমিকরা প্রাণ বিসর্জ্জনেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। বাচ্চা না হইলে ইহাদের বাসা তৈয়ারী করা সম্ভব হয় না। বাচ্চার সাহায্যে সূতা বুনিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হইতেছে ধারালো সাঁড়াশীর মত এক জোড়া শক্ত চোয়াল এবং এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস। যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলেই শরীরের পশ্চাদ্দেশ উঁচু করিয়া শত্রুর প্রতি অনবরত গ্যাস ছুড়িতে থাকে। তার পর সুরু হয় কামড়াকামড়ি। এই পিঁপড়ে-গুলির বৈজ্ঞানিক নাম—Œcophylla smaragdina. বাংলা দেশে ইহারা নালসো-পিঁপড়ে নামে পরিচিত।

আমাদের দেশে বহু জাতীয় ক্ষুদে-পিঁপড়ে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় ক্ষুদে-পিঁপড়ের শরীরের সম্মুখ-ভাগ লাল্‌চে হলুদ বর্ণের; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ কালো। দেড় হইতে দুই মিলিমিটারের বেশী লম্বা হয় না। ইহাদিগকে প্রায়ই সুদীর্ঘ লাইন করিয়া উঁচু জমি, ঘরের দেয়াল বা বড় বড় গাছের উপর বিচরণ করিতে দেখা যায়। এক একটি ফাটলে বা গর্ত্তে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে-পিঁপড়ে বসবাস করে। নালসো-পিঁপড়ে অপেক্ষা ইহারা অনেক মৃদুগতি-সম্পন্ন। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা নালসো-পিঁপড়ে এবং তাহাদের ডিম ও বাচ্চাগুলিকে অতি উপাদেয়বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ক্ষুদে-পিঁপড়েদের দংশন অতি বিষাক্ত, বিশেষতঃ নালসোদের পক্ষে ইহা অতি মারাত্মক বলিয়াই মনে হয়। নালসোদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদেরা তাহাদের সঙ্গে লড়াই বাধায় এবং শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করে। নালসোদের সঙ্গে ইহাদের যুদ্ধ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সময় সময় উভয় পক্ষে একটা সাময়িক সন্ধিও হইতে দেখা যায়। নালসোরা কিন্তু প্রায়ই চুক্তি ভঙ্গ করে না; কিন্তু ক্ষুদেরা সুযোগ বুঝিলেই যখন তখন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই ক্ষুদে-পিঁপড়েদের বৈজ্ঞানিক নাম—Solenopsis geminata.

পিঁপড়েদের জন্মরহস্য বড়ই জটিলতাপূর্ণ। এই জন্মরহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য কিছুকাল হইতে নালসো-পিঁপড়ে লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক পিঁপড়ের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কলিকাতার আশেপাশে নালসো-পিঁপড়ের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইলেও, শহরের অভ্যন্তরে যথেষ্ট গাছপালার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোথাও ইহাদের সন্ধান পাই নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে শিবপুরের বাগান হইতে পিঁপড়ে সমেত বড় বড় বাসা থলিয়ায় ভর্ত্তি করিয়া

আমের ডালটার উপর ক্ষুদে ও নালসো-পিঁপড়ের লড়াই চলিতেছে

পরীক্ষাগারের প্রাঙ্গণস্থ একটা আমগাছে ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, পিঁপড়েরা নূতন বাসা বাঁধিয়া গাছটাতে উপনিবেশ স্থাপন করিবে। প্রথমতঃ, একটা থলিয়ার মুখ খুলিয়া বাসাটাকে বাহির করিয়া গাছের একটা নীচু ডালে আটকাইয়া রাখিলাম। পাতলা সাদা কাগজের মত পর্দ্দার সাহায্যে পাতাগুলিকে পরস্পর জুড়িয়া নালসোরা বাসা নির্ম্মাণ করে। দূরস্থান হইতে থলিয়ায় পুরিয়া আনিবার সময় জোড়ামুখের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া বাসাগুলি স্বভাবতঃই কিছু-না-কিছু জখম হইয়া থাকে। তাছাড়া পাতাগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিতেই বাসাটা ক্রমশঃ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। বাসা ভাঙিবার পরই সহজাত সংস্কারবশে পিঁপড়েরা ইহা বুঝিতে পারিয়াই নূতন পত্র-পল্লব পাইলেই তদ্দ্বারা নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিতে সুরু করে। স্বাভাবিক ভাবে বিপদ-আপদ সংঘটিত হইলে সাধারণতঃ ইহাদিগকে এইরূপ কার্য্য-প্রণালীই অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এই ভরসাতেই পত্র-পল্লবের মধ্যে বাসাটাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক। মাঝে মাঝে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হইতেছে। পিঁপড়েগুলি পুরাতন বাসা হইতে ছুটাছুটি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত। অনেকগুলি বাসাটাকে ঘিরিয়া পাহারা দিতে দিতে মাঝে মাঝে একে অন্যের মুখে মুখ ঠেকাইয়া কি যেন সঙ্কেত করে আবার ছুটিয়া গিয়া চতুর্দ্দিক তদারক করিয়া আসে। কতকগুলি আবার নিশ্চল পুত্তলিকার মত শুঁড় উঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে খাড়া পাহারায় নিযুক্ত। আমাকে সেখানে নড়াচড়া করিতে দেখিয়া, আর একদল—প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি হইবে—বাসার শেষ প্রান্তে নিম্নভাগ ঘেঁষিয়া, সম্মুখের পা দুইটি শূন্যে তুলিয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছিল। কতকগুলি আবার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমার প্রতি বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইতেছিল। একটা অতৃপ্তিকর গন্ধে তাহা বুঝিতে পারিলাম। কয়েক শত নালসো তড়িদ্‌গতিতে ছুটাছুটি করিয়া গাছটার বিভিন্ন ডালে নূতন স্থানের অবস্থা তদারক করিতে লাগিয়া গেল। ভাবিলাম শীঘ্রই হয়তো নূতন বাসার পত্তন সুরু হইবে। কিন্তু কোথায় হইবে তাহার কিছুই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল তথাপি বাসা নির্ম্মাণ করিবার কোনই তোড়জোড় নজরে পড়িল না। বাসার নীচের দিকটা ছিঁড়িয়া যাওয়ার ফলে কতকগুলি ডিম ও বাচ্চা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সেগুলির লোভে ইতিমধ্যে কতকগুলি ক্ষুদে-পিঁপড়ে আনাগোনা সুরু করিয়াছিল। আমার নজর ছিল তখন নালসোদের দিকে। ক্ষুদে-পিঁপড়ে তো সর্ব্বত্রই আছে—এইখানেও ছিল, ডিম খাইতে আসিয়াছে—এই ভাবিয়াই ব্যাপারটা উপেক্ষা করিয়া গেলাম।

বেলা তখন ৫টা হইবে। হাল্কা একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছের ডালে ডালে যে-নালসোগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বৃষ্টির দরুন তাহাদের আনাগোনা কমিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেকেই বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে। খাড়া পাহারা ও টহলদারেরাও অনেকেই

যুদ্ধের শেষের দিকে থলে দুইটির উপরও উভয় পক্ষে লড়াই হইতেছে

কৃত্রিম বাসার মধ্যে বিভিন্ন কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া নালসোরা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছে

বাসায় আশ্রয় লইয়াছে। ইতিমধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যে-ক্ষুদে-পিঁপড়েরা মাটির উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা এখন একটা সরু লাইন করিয়া প্রায় ছয়-সাত হাত তফাৎ হইতে গাছের গুঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহার ফলে যে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সে-বিষয়ে তখন কিছুমাত্র সংশয় জাগে নাই। যাহা হউক, নিরাশ অন্তঃকরণে সেদিনের মত পর্য্যবেক্ষণ বন্ধ করিতে হইল।

তার পর দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। নালসোগুলিকে গাছের উপর ঘোরাঘুরি করিতে দেখিলাম না, এতদ্ব্যতীত যে ডালটায় তাহাদের বাসা ঝুলিতেছিল সেই ডালটার আগাগোড়া কতগুলি টহলদার নালসো মোতায়েন হইয়াছে। বাসাটার উপরেও কয়েকটা খাড়া পাহারার ব্যবস্থা দেখিলাম। গাছটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়া যাইতেই শিকড়ের প্রায় কাছাকাছি গুঁড়িটার গায়ে ৫০।৬০টা লাল পিঁপড়েকে শুঁড় উঁচাইয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। তাহার কিছু উপর হইতেই ডালটি পর্য্যন্ত দশ-বারোটি নালসো বার্ত্তা-বাহকের মত একবার উপরে একবার নীচে ছুটাছুটি করিতেছে। এক একটি বার্ত্তাবাহক নীচ হইতে বাসার দিকে ছুটিয়া যাইবার পথে ডালের উপরে টহলদার ও খাড়া পাহারাদারদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গে মুখ ঠেকাইয়া কি যেন বলিয়া যাইতেছে। যাই বলুক সেটা যে কোন উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ বার্ত্তাবাহকের সঙ্গে মুখ ঠেকাঠেকি হইবার পরক্ষণেই প্রত্যেকটি পাহারাদার যেন জোড় পায়ে লাফাইতে থাকে। এক দিন এক রাত কাটিয়া গিয়াছে—উত্তেজনা একটু মন্দীভূত হইবারই কথা! তবে এরা আজ আবার বাসা হইতে এত দূরে আসিয়া ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে কেন? চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেই নজরে পড়িল ক্ষুদে-পিঁপড়েরা গাছের গোড়াটার চতুর্দ্দিকে ঝুরা মাটি তুলিয়াছে। পূর্ব্বের দিন যে সরু লাইনটি দেখিয়াছিলাম সেটি আজ অনেক মোটা হইয়াছে এবং ক্ষুদেরা পরম উৎসাহভরে দলে দলে আনাগোনা করিতেছে। লাইনটি শেষ হইয়াছে——গাছের গোড়ার কাছে মাটির নীচে। ঝুরা মাটির উপর এখানে-সেখানে কতকগুলি নালসোর মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। ঝুরা মাটির নীচ হইতে অলক্ষিতে ক্ষুদেরা সেই মৃতদেহগুলি টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইতিপূর্ব্বেই উভয় দলে একটা লড়াই হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদেরা হয়তো নালসোদের নিকট পরাজিত হইয়া মাটির আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে। যাহা হউক, ক্ষুদে-পিঁপড়েদের অত্যাচার হইতে নালসো-পিঁপড়ে-গুলিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গাছটার চতুর্দ্দিকে পরিখার মত করিয়া তাহা জলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। গাছটার ডালপালার সঙ্গে অন্য কোন গাছের যোগাযোগ না থাকায় নালসোদের অন্য কোথাও চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। এখন ক্ষুদে-পিঁপড়েদের সহিত লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে গুঁড়ি বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসাতে মাটির উপর দিয়া অন্যত্র পলায়ন করিবার আশঙ্কা ছিল। গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে জলের বেষ্টনী দেওয়ার ফলে এক দিকে যেমন নালসোগুলির অন্যত্র পলায়নের পথ বন্ধ হইল ক্ষুদে-পিঁপড়ে-গুলির পক্ষে তেমন জল অতিক্রম করিয়া গাছের নিকটে পৌঁছিবার উপায় রহিল না।

বেলা প্রায় ১টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখি—বেষ্টনীর জল প্রায় অর্দ্ধেকটা মাটিতে শুষিয়া গিয়াছে। বেষ্টনীর অপর পাড় পর্য্যন্ত ক্ষুদে-পিঁপড়ের লাইনটা পূর্ব্বের মতই বজায় আছে, কিন্তু জলের জন্য বাধা পাইয়া পিঁপড়েরা অনেকেই নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য বাঁধটার নানা স্থানে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা

যে গাছটার উপর লড়াই বাধিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ দৃশ্য

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গাছের গোড়ায় মাটির নীচে যে-পিঁপড়েগুলি লুকাইয়া ছিল তাহারা নালসোদের সঙ্গে অভিনব পরিখা-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে পরিখা-যুদ্ধ না বলিয়া স্বরঙ্গ-যুদ্ধ বলাই উচিত। কারণ উই-পোকারা যেমন স্বরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রসর হয়, ইহারাও সেরূপ মাটির বেষ্টনী তুলিয়া গোড়াটার ৬।৭ ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত একটা দিক প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নালসোদের সৈন্য সংস্থান পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অধিকৃত এলাকা হইতে প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে। হাজার হাজার ক্ষুদে স্বরঙ্গের অভ্যন্তরে কাজ করিতেছিল; স্বরঙ্গের প্রান্তভাগে তাহাদের মুখ ও শুঁড়গুলি ছাড়া আর কিছুই বড় একটা দেখা যায় না। নালসো-প্রহরীরা অতি সতর্কভাবে তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। দৈবাৎ এক একটা ক্ষুদে বাহিরে আসিয়া পড়িলে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া কাটিয়া ফেলিতেছে। সময় সময় দুই-একটা ক্ষুদে-পিঁপড়েকে শুঁড় ধরিয়া স্বরঙ্গ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল। তাহারাও আবার পাল্টা আক্রমণে তাহার মুখে বা শুঁড়ে কামড়াইয়া ধরিতেছে। অবশেষে কামড়ের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উভয়েই গড়াগড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছে। এদিকে স্বরঙ্গ ক্রমশঃ উর্দ্ধ দিকে অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছে। বেলা তিনটার সময় স্বরঙ্গটা প্রায় ১০ ইঞ্চি উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এদিকে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বাঁধের জল প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল। জলের মধ্যস্থলে খানিকটা উঁচু জায়গা দ্বীপের মত জাগিয়া উঠিয়াছে। অপর পাড়ের সেই ক্ষুদে-পিপড়ের লাইন হইতে কয়েকটা পিপড়ে একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে এরূপ ঘটনায় হয়তো বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ক্ষুদে-পিপড়েরা একটির পিছনে আর একটি, এরূপভাবে সারি বাঁধিয়া জলের পাতলা আবরণের উপর অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দ্বীপটার উপর জড়ো হইয়াছে। এখান হইতে গাছের গুঁড়ির দূরত্ব মাত্র দেড় ইঞ্চির কিছু বেশী। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে তাহারা সকলে জড়াজড়ি করিয়া একটা মোটা লাইনের মত জলের উপর ভাসিয়া পড়িল; কিন্তু ব্যবধানটুকু অতিক্রম করিতে পারিল না।

প্রায় ৫টার সময় দেখিতে পাইলাম গাছের গুঁড়িটার প্রায় মাঝামাঝি স্থলে উভয় পক্ষে ভীষণ লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। বাঁধের মধ্যে স্থানে স্থানে সামান্য জল রহিয়াছে। সেই কর্দ্দমাক্ত জমির উপর দিয়াই ক্ষুদে-পিপড়েরা মোটা লাইন বাঁধিয়া গাছের গুঁড়ির উপর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া

গাছটার গোড়ার কালো অংশটা ক্ষুদে-পিপড়েদের নির্ম্মিত স্বড়ঙ্গ

নালসোদের শিকল

পড়িয়াছে। অগ্রবর্ত্তী নালসোরা ক্ষুদে-পিপড়েদের সঙ্গে মোটেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রায় প্রত্যেকটা নালসোরই—কাহারও শুঁড়ে, কাহারও পায়ে দুই-তিনটা করিয়া ক্ষুদে-পিঁপড়ে কামড়াইয়া ঝুলিতেছিল। নালসোরা এক একটা ক্ষুদেকে কামড়াইয়া ধরিবামাত্রই সেও আবার তাহার মুখে কামড়াইয়া ধরে। নালসো তখন বিষের জালায় মুখ ঘষিতে ঘষিতে এক দিকে ছুটিতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও দুই-চারিটা ক্ষুদে পিঁপড়ে আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিতেই শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকা করিয়া সবাইকে লইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। ক্ষুদেরা প্রবল বেগে আক্রমণ চালাইয়াছে, এক-একটা নালসোকে ৪।৫টা ক্ষুদে-পিঁপড়ে মিলিয়া আক্রমণ করিতেছে আর বাকীগুলি ফাঁকফন্দি দিয়া বন্যার জলের মত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই অগণিত নালসো ও ক্ষুদে-পিঁপড়ে হতাহত হইয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচে পড়িতে লাগিল। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা করিয়াছে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ আর নালসোরা করিতেছে আত্মরক্ষা। ক্ষুদেদের একটা মরিলে তাহার স্থলে আরও দশটা আসিয়া দাঁড়ায় আর নালসোরা চায় বাধা দিতে, যাহাতে শক্ররা তাহাদের বাসায় প্রবেশ করিতে না পারে। কাজেই নালসোরা পিছু হটিয়া ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত। যে ডালে বাসাটা ঝুলিতেছিল ক্ষুদে-পিঁপড়েরা আরও প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেই ডাল ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। ক্ষুদেরা যাহাতে সেই ডালটায় আসিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে নালসোরা এবার প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগিল। বাসা হইতে দলে দলে নালসোরা আসিয়া সেই সংযোগস্থলে সমবেত হইতে লাগিল। ক্ষুদে-পিপড়েরা এস্থলে লাইন করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কাজেই সঙ্কীর্ণ লাইনের সুবিধা লইয়া নালসোরা তাহাদের ধারালো সাঁড়াশীর সাহায্যে এক-একটি করিয়া ক্ষুদেগুলিকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার ক্ষুদেগুলিকে ধরিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল অনেকে আবার জড়াজড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছিল। নালসোরা উত্তেজিতভাবে এত বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িতেছিল যে প্রায় দুই হাত তফাৎ হইতেও নাকে বেশ ঝাঁঝ অনুভব করিতেছিলাম। বিষাক্ত গ্যাসের উগ্র গন্ধে এবং সমবেতভাবে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়া ক্ষুদেরা এবার মোটেই সুবিধা করিতে পারিল না। যে-পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা সেই পথে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু নালসোরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না। ডাল ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলেই ঘাটি আগলাইয়া রহিল। তখনও ক্ষুদেরা সকলে একেবারে চলিয়া যায় নাই, তবে খুবই অল্প সংখ্যক সৈন্য আনাগোনা করিতেছিল। লড়াই চলিবার সময় সম্মুখের ঘাটি ও ডালের প্রান্তভাগে অবস্থিত বাসা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ জুড়িয়া বার্ত্তাবাহকদিগকে খুবই উত্তেজিতভাবে ছুটাছুটি করিতে দেখা গেল। বাসাটার মধ্যে কি হইতেছিল তখন লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই। এবার বাসার কাছে গিয়া দেখিলাম, যে-স্থানে বাসাটা ঝুলিতেছিল তাহা হইতে প্রায় হাতখানেক তফাতে কতকগুলি পাতার উপর প্রায় চার-পাচ শত নালসো একত্র হইয়া নূতন একটা বাসা নির্ম্মাণ করিতে সুরু করিয়াছে। কতকগুলি নালসো সারবন্দিভাবে অবস্থান করিয়া অনেকগুলি পাতাকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এখনও সুতা বুনিয়া সেগুলিকে জোড়া দেওয়া হয় নাই। তারই পাশে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট্ট বাসারও পত্তন করিয়াছে। শত শত নালসো অতি দ্রুত গতিতে সেই

পুরাতন বাসাটার একাংশে নালসোরা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে রক্ষা করিতেছে

অসম্পূর্ণ বাসার মধ্যেই তাহাদের ডিম ও বাচ্চাগুলিকে স্থানান্তরিত করিতেছিল। যে ডালটার উপর দিয়া ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইতেছিল তাহার এক পাশে শতাধিক খাড়া পাহারা মোতায়েন রহিয়াছে। অগ্রবর্ত্তী ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেও শত্রুর পক্ষে এই ঘাঁটি ভেদ করা সহজ হইত না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দেখা গেল, বাচ্চার সাহায্যে সুতা বুনিয়া নূতন বাসার জোড়া মুখগুলি আটকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

তৃতীয় দিন বেলা একটা পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে উভয়পক্ষের কোন কার্য্যতৎপরতা দেখা গেল না। নালসোদের পাহারার ব্যবস্থায় একটু শৈথিল্য লক্ষিত হইল; কিন্তু তখনও তাহাদের ডিম, বাচ্চা অপসারণ পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা অন্য দিকের একটা ডাল বহিয়া উপরের দিকে লাইন করিয়া চলিতেছিল, অবশ্য নালসোদের অধিকৃত ডালটার আশেপাশেও দুই-একটা ক্ষুদে-পিঁপড়েকে আনাগোনা করিতে দেখা গেল। ডালটার একটু কাছে যাইতেই গোটা তিনেক পাহারাদার নালসো হঠাৎ যেন কেমন একটা ভয় পাইয়া উল্টামুখে ছুটিয়া গিয়া খাড়া একটা ডালের উপর উঠিল। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা সেই ডালটার অপর পার্শ্ব দিয়াই উপরে যাতায়াত করিতেছিল। দলভ্রষ্ট নালসোদের একটা ছুটিতে ছুটিতে গিয়া তাহাদের লাইনে পড়িল। আর যায় কোথায়! পাঁচ সাতটা ক্ষুদে মিলিয়া সেটাকে কাবু করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল এবং বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বাসার দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে ক্ষুদেদের লাইনের ভিতর একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। লাইন ছাড়িয়া অনেকেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যেন অপরাপর দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অপর একটি নালসোর সহিত হঠাৎ আবার ক্ষুদেদের দেখা হইয়া গেল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের অধিকৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া একেবারে বাসার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ক্ষুদে-পিঁপড়েরা নালসোর সঙ্গে সমানবেগে ছুটিতে না পারিলেও বোধ হয় তাহার গন্ধ অনুসরণ করিয়া কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বোক্ত লড়াইয়ের স্থলে উপনীত হইল এবং কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া লাইনের মধ্যে ফিরিয়া গেল। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পর ক্ষুদেরা ঊর্দ্ধগামী লাইন হইতে খুব ক্ষীণ একটি লাইনে নালসোদের অধিকৃত ডালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নালসোদের ডালের মাঝামাঝি আসিয়াও তাহারা কোনই বাধা পাইল না। আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটা টহলদার নালসো অগ্রবর্ত্তী ক্ষুদে-পিঁপড়েটাকে ধরিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। আর একটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবামাত্রই দুইটা ক্ষুদে-পিঁপড়ে তাহার দুই ঠ্যাং কামড়াইয়া ধরিল। যন্ত্রণায় নালসোটা কিছুক্ষণ লাফালাফি করিয়া অতি অল্প সময়েই

নালসোদের নূতন বাসা নির্ম্মাণ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে

উপরের পাতায় লড়াই ও নীচের পাতায় নালসোদের নূতন বাসার পত্তন হইতেছে

নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন একে একে ক্ষুদেরা আসিয়া অর্দ্ধমৃত পিঁপড়েটাকে ঘিরিয়া ধরিল। ক্ষুদেদের প্রধান লাইনে এই সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল না। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদে-পিঁপড়েরা কাতারে কাতারে ডালটার দিকে অভিযান সুরু করিয়া দিল। ডালটার ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় হাতখানেক স্থান জুড়িয়া উভয় পক্ষে তুমুলযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্ষুদেদের প্রবল চাপ নালসোরা এবার সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বাধা দিতে দিতে তাহারা ক্রমেই পিছু হটিতে লাগিল। দলে দলে নালসোরা প্রাণ দিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদেদের সৈন্য সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বোধ হইল যেন বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধেই তাহারা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। কারণ সে স্থলে বহু নালসো সমবেত হইয়া একযোগে গ্যাস ছাড়িতেছিল। প্রায় মিনিট দশেক এ ভাবে চলিবার পর দেখা গেল, ক্ষুদে-পিঁপড়েরা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। পুরাতন বাসাটার প্রায় দুই ইঞ্চি উপরে অন্য ডালের একটা পাতার ডগা ঝুলিতেছিল। উপরের ডাল ধরিয়া ঘুরিয়া গিয়া ক্ষুদেরা সেই পাতার ডগা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে; কিন্তু যোগাযোগ না থাকায় নামিতে পারিতেছে না। বাসাটা যে খুবই নিকটে গন্ধে বোধ হয় তাহা টের পাইয়াছিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর অবশেষে ক্ষুদেরা একে একে ঝুপ ঝুপ করিয়া বাসাটার উপর পড়িতে লাগিল। যেন প্যারাশুটিষ্টের অবতরণ। অবতরণ করিয়াই বিনা বাধায় তাহাদের অনেকেই বাসাটার ছিন্ন অংশ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বাসার উপরেই এই অবতরণকারী সৈন্যদের কয়েকটার সহিত নালসোদের ভীষণ ধস্তাধস্তিও চলিতেছিল। প্রায় ৬০।৭০টা ক্ষুদে-পিঁপড়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ভিতরে তখন কি ঘটিতেছিল বাহির হইতে তাহা দেখিবার উপায় ছিল না; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, নালসোরা বাসার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশের ভিতর দিয়া দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া যে যেদিকে পারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। অনেকে আবার ডিম ও বাচ্চাগুলিকে লইয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের চালচলন ও গতিভঙ্গী দেখিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল যে, তাহারা ভয়ানক ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা ভীষণ অরাজক কাণ্ড। এদিকে ডালের উপরের ক্ষুদে-পিঁপড়েরা অগ্রগতিতে বাধা পাইয়া এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এতক্ষণ ডালটার উপর দিকেই যুদ্ধ চলিতেছিল। পার্শ্ব ও নীচের দিকে নালসোদের কোন রক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না। এই সুযোগে ক্ষুদেরা ডালটার নীচ ও পাশের দিক দিয়া আরও দুইটা নূতন লাইনে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই কৌশলে এক রকম বিনা বাধায় বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য নালসোদের বাসার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বাসার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল—এখন অতর্কিতে বহু শত্রুসৈন্য বাসার প্রবেশপথ ধরিয়া আক্রমণ করার ফলে বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিল। মাঝখানে এক দল এবং বাসাটার নিকটে দুই-তিন দলে বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়াই চলিতে লাগিল। নালসোদের মধ্যে যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কাজেই প্রাণভয়ে সকলেই পলায়নে ব্যস্ত। তাহারা এতই ভয় পাইয়া গিয়াছিল যে, অসংখ্য পিঁপড়ে দিশাহারা হইয়া ছুটিতে গিয়া বাসার উপর হইতে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া নীচে পড়িতে লাগিল। সেখানে তাহারা মাটিতে অবস্থিত ক্ষুদে-পিঁপড়েদের কবলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বাসাটার বাহিরের দিকে একস্থানে দেখিলাম প্রায় ৪০।৫০টা রাণী এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া ভয়ে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। নূতন বাসার মধ্যে অসংখ্য নালসো আশ্রয় গ্রহণ করিলেও পুরাতন বাসায় তখনও কয়েক হাজার পিঁপড়ে অবস্থান করিতেছিল,

ডিম, বাচ্চা প্রভৃতিও কম ছিল না, তাছাড়া পুরুষ ও রাণী যথেষ্ট ছিল। সেগুলিকে তখনও নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। ক্ষুদেদের আক্রমণ হইতে ইহাদের একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না। প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ক্ষুদেরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল। তখন বাসার উপরে ও আশে-পাশে নালসোদের অজস্র মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়িতেছিল না; অবশ্য ইহাদের সঙ্গে ক্ষুদে সৈন্যদের মৃতদেহও অনেক ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদেরা মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যুদ্ধের পরও দুই দিন পর্য্যন্ত এই মৃতদেহ, ডিম ও বাচ্চার অপসারণ-কার্য্য চলিয়াছিল। এক স্থানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। লড়াইয়ের সময় কতকগুলি নালসো উপরের একটা পাতা হইতে শিকল গাঁথিয়া নীচের অন্য একটি ডালে পলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ক্ষুদেদের আক্রমণ হইতে তাহারাও কেহই রেহাই পায় নাই। জ্যান্ত পিঁপড়ের শিকলটি এখন কতকগুলি মৃতদেহের শিকলে পরিণত হইয়া ঝুলিতেছিল। পুরাতন বাসাটা দখল করিবার পর ক্ষুদেরা নূতন বাসাটা আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে; কিন্তু সেটা বিশেষ সুরক্ষিত থাকায় যুদ্ধ চলিয়াছিল প্রায় পাঁচ দিনেরও বেশী।

চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার

সারাটা দিন মা উপোস ক'রে আছেন। সেই কখন সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চাননতলায় পূজো হবে, তখন দুটি ফলমূল মুখে দিতে পারবেন। তার অনেক দেরী। পূজো শেষ হ'তে সন্ধ্যে তার পর ভোগ, এবং তারও পরে প্রসাদ-বিতরণের পালা। বাড়ীতে বাড়ীতে একটু চরণামৃত এসে পৌঁছতে দস্তুরমত রাত হয়ে যাবে।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। নারকেলগাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে খড়ের চাল ডিঙিয়ে খিড়কি-পুকুরের মাঝামাঝি গিয়ে পড়েছে। যেতে হ'লে এখনি বেরিয়ে পড়া দরকার, তা না হ'লে পৌঁছতেই অন্ধকার হয়ে আসবে। বিষ্টু, শ্যামা, বিপিন তারা কখন চলে গিয়েছে। যাবার সময় হাঁক দিয়ে গিয়েছিল, "শীগগির আসিস্ তারক, তা নইলে পুতুলনাচ দেখতে পাবি নে—খুব চমৎকার একটা দল এসেছে রে, 'সীতার বনবাস' পালা দেখাবে।"

কিন্তু মা কিছু একটু মুখে না দিলে কথাটা কেমন ক'রে তোলা যায়? পঞ্চাননতলার পুরুতঠাকুরের ওপর তারক ভারী চটে ওঠে। পূজোটা একটু আগে থেকে আরম্ভ করলেই তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়! কেন যে তা করেন না!

অবশ্য বাবা ঘুম থেকে উঠেছেন, পূব দিকের দাওয়া থেকে তাঁর তামাক খাবার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওঁকে বললে হয়, কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ লাগে। ওঁর কাছে গিয়ে কথাটা ব'লে ফেলা তারকের আর কিছুতেই হয়ে উঠল না।

দলে দলে লোক চলেছে চাঁদনগরের দিকে। ব্যাপারীর দল ঝাঁকা মাথায় নিয়ে দুপুর থেকেই যেতে শুরু করেছে। যারা দোকান করবে, তারা দু-দিন আগে থেকে ছই, ভাঙা তক্তাপোষ আর মালপত্র গরুর গাড়ীর পিঠে চাপিয়ে ওখানে হাজির হয়েছে। দোকান বাঁধতে সময়ও যায় কিছু, তা ছাড়া ভাল জায়গা দেখে জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে বসবার হাঙ্গামও কম নয়। এখন যারা চলেছে তারা অধিকাংশই দর্শক। মেয়েরা, ছোট ছেলের দল, বয়স্ক লোক—কেউ আর বাকী নেই। ছেলেদের গায়ে কত রকমের, কত রঙের জামা। খুব ছোট যারা, তাদের অনেকের মাথায় জরির টুপি। কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ বাপ-দাদার কাঁধে চ'ড়ে, কেউ ছ-হাত কাপড়ের কোঁচা সামলাতে সামলাতে ছুটে চলেছে। ভিড় হবে না কেন? এত বড় মেলা এ তল্লাটে বহুদিন হয় নি। আর-বছর গোষ্ঠের সময় এ গাঁয়ে একটা মেলা হয়েছিল, কিন্তু সে ঐ নামে

মাত্র—চাঁদনগরের মেলার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। ওখানকার শিবমন্দিরের সমস্ত মাঠটায় কোথাও আর নড়েচড়ে বেড়াবার উপায় নেই; দোকানপাট, বাজার, কবির গান পুতুলনাচ আর যাত্রার দৌলতে সমস্ত গ্রামটা সরগরম হয়ে উঠেছে।

পার্ব্বণী বলে মা যদি কিছু দেন তা হ'লে মেলায় গিয়ে কত জিনিস যে কেনা যেতে পারে তা হিসেব করতে গিয়ে তারকের খালি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হালদার-পাড়ার চন্দোরের মতন একটা লাট্টু কেনবার তার ভারী সখ; কত দিন থেকে কিনবে কিনবে করছে, কখনও হয়ে ওঠে নি। গণেশ অধিকারীর দোকানে তারক ঐ রকম লাট্টু দেখেছে বটে, কিন্তু গণেশ তার একে-আর দর বলে। একটা ছোট লাট্টুর দাম নাকি তিন আনা হ'তে পারে? হুঁ, মেলাতে ও জিনিস ছ-পয়সা দু-আনায় অনেক মিলবে। তা ছাড়া গণেশের দোকানের জিনিসগুলো অনেক দিনের পুরোনো—গায়ে মরচে ধরে গিয়েছে প'ড়ে থেকে থেকে। মেলাতে আর কিছু নাই হোক, নতুন জিনিস পাওয়া যাবে। মণিহারী দোকান বড় কম যায় নি, দু-এক দোকান ঘুরে পছন্দ মত জিনিস কেনা চলে।

কিন্তু শুধু লাট্টু নয়, আরও একটা মস্ত দরকারী জিনিস কেনা দরকার—পাটের দড়ি। মেলাতে ভারি সস্তায় পাওয়া যাবে। এখন না কিনলে এ বছর আর ঘুড়ি ওড়ানো যাবে না। নদীর কাছে ব'লে এই সময়টা তারকদের গ্রামে জোর দক্ষিণে হাওয়া চলে। ছেলেরা সরু বাঁশের কাঠি আর কাগজ দিয়ে প্রায় এক-মানুষ-সমান ঘুড়ি তৈরি ক'রে উড়োয়। সে ঘুড়ি ধরে রাখে কার সাধ্যি—নামাবার সময় এক জন জোয়ান লোক হিমসিম্ খেয়ে যায়। লাটাইয়ের ফিন্‌ফিনে মাঞ্জা-দেওয়া সুতোর তো কথাই ওঠে না, তিন-ফেরতা ক'রে পাকানো পাটের দড়িও মাঝে মাঝে কেটে যায়। আগের বছরের যে-দড়ির তালটা আছে, সেটা দিয়ে ওড়ালেই ঘুড়ি কেটে যাবে, উড়তে উড়তে বাহাদুরপুর, হরিণডাঙা পেরিয়ে কত দূর যে চলে যাবে তার ঠিক নেই।

অবশ্য গাঁয়ে কি আর পাটের দড়ি পাওয়া যায় না? খুবই পাওয়া যায়, কিন্তু যত বারই তারক কেনবার কথা বলেছে তত বারই মা বলেছেন, 'মেলার সময় হবে।' কত দুঃখে যে ছেলের এই সামান্য দু-চার আনার আব্দার দুর্গা ঠেকিয়ে রেখেছে, তা সে-ই জানে। তারক কিন্তু সরল মনে বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে যে মেলা ছাড়া উৎকৃষ্ট পাটের দড়ি পাওয়াই যায় না।

আরও অনেক জিনিসই মেলা ছাড়া পাওয়া যায় না। গরম গরম পাঁপর-ভাজা, জিলিপী, চিনির তৈরি আম আর লিচু—এ সব বাদ দিলেও কত যে দেখবার জিনিস আছে তার আর শেষ নেই। এক বন্ধুর কাছে তারক শুনেছে যে মেলাতে নাকি শহর থেকে এক রকম বায়স্কোপ আসে। একটা গোল টিনের বাক্সের এক দিকে একটা চোং মতন বসানো। বায়স্কোপওয়ালা একটা ক'রে পয়সা নিয়ে ছেলেদের ঐ চোঙের কাছে চোখ দিয়ে দাঁড়াতে বলে, তার পর আস্তে আস্তে বাক্সের গায়ে একটা হাতল ঘোরায়। তখন সেই ছোট্ট বাক্সটি হঠাৎ ছেলেদের কাছে রূপকথার রাজপুরী হয়ে ওঠে। রাজপুত্র রাজকন্যা অনেক দেখা যায়, যুদ্ধবিগ্রহ চলে প্রবল উৎসাহে। দেখতে দেখতে ছেলেরা যখন তন্ময় হয়ে যায়, তখন এক সময় হাতল থামিয়ে বায়স্কোপওয়ালা একটা ছোট ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করে আর হাঁকে, 'চলে এসো খোকাবাবুরা, এক পইসায় বাইস্‌কোপ—ঠঠং ঠং।'

এতক্ষণ চাঁদনগরের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমালের আওয়াজ আসছিল, এখন ঢাক আর কাঁসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কি আওয়াজ এই ঢাকের, শুনলেই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। বেচারী তারক এতক্ষণ সামলে ছিল, আর পারলে না। চুপি চুপি পা টিপে টিপে ও মায়ের সন্ধানে গেল।

ধানের গোলার কাছে মাকে দেখা যাচ্ছে। হাতে কুলো আর পাশে একরাশ খইনে ধান। খইনে ধান দেখলেই তারক চিনতে পারে—ওদের মাথায় একটা ক'রে সোঁয়া আছে। নিশ্চয় আজ বাড়ীতে খই ভাজা হবে।

পেছন থেকে গিয়ে তারক মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরলে।

—ও কি করিস? প'ড়ে মরবো যে! ছাড়, ছাড়—

গলাটা ছেড়ে দিয়ে তারক মার পাশটিতে ধুপ ক'রে ব'সে পড়লো।

—কোথায় কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ছিপ নিয়ে বেরুনো হয়েছিল বুঝি?

—বা, আমি তো ঘরে ছিলুম।

দুর্গা কুলোর ওপর থেকে কয়েকটা কুরুই ও মাটির ডেলা বেছে মাটিতে ফেললে, তার পর অনেকটা মনে মনে বললে, ও, তার মধ্যে বন্ধুর দল তো আজ মেলা

দেখতে গিয়েছে। সেই জন্যেই ছোট বাবু আজ ঘর থেকে বেরুন নি, না রে তারক ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে তারক আবার দুর্গার ঘাড়ের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। তার পর ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে আমিও যাব মা।

এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে দুর্গা বললে, যাবি তো ওঁকে গিয়ে বল্ না। উনি তো ঘুম থেকে উঠেছেন।

—তুমি বলো।

দুর্গা হাসিমুখে তারকের দিকে ফিরলে :

—তার বেলা 'তুমি বলো' কেন ? অতবড় ছেলে হয়েছিস, এটুকু আর পারিস্ না ? আমি কক্ষণো বলব না।

তারকের মুখখানা ভারী শুকিয়ে গেল। দুর্গা আড়-চোখে চেয়ে দেখে বললে, বাবা, ছেলের আর তর সয় না। আর পালি দুয়েক ধান বাকী, এটা সেরে তবে তো যাব। নে, তুই একটু স'রে বোস দিকি, ধানের ধুলোয় গা-মাথা এদিকে বোঝাই হয়ে গেল।

দুর্গার কাছে কথাটা শুনে শিবু বললে, যেতে চায় যাক ; কিন্তু পথ অনেকটা, হাঁটতে পারবে তো ?

দুর্গা দুষ্টুমি ক'রে তারককে পাল্টা প্রশ্ন করে, কি তারক, হাঁটতে পারবি তো ?

মা যেন কী ! চটপট একটা 'হ্যাঁ' ব'লে দিলেই চুকে যেত, তা নয় উল্টে তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন হাঁটতে পারবে কি না ! কেন, মা কি জানেন না যে কত বার তারক পায়ে হেঁটে বাহাদুরপুর আর হরিণডাঙায় বেড়াতে গিয়েছে ?

শিবু আবার বললে, তার ওপর সারাদিন যে-রকম গুমোট হয়ে রয়েছে, সন্ধ্যেবেলা বিষ্টি না আসে ! খোলা মাঠের ওপর কাল-বোশেখীর ঝড় উঠলে আর চোখে কানে দেখতে দেবে না।

—তা হোক, যাবার বায়না ধরেছে যখন, নিয়ে যাও একবার। কোথাও তো বেরুতে পায় না। তুমি যখন সঙ্গে যাচ্ছ তখন আর ভাবনা কি ? আসবার সময় না হয় গরুর গাড়ীতে চ'লে এসো।

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে' ব'লে শিবু এতক্ষণে তারকের দিকে ফিরে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রে, আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়বি না তো ? সন্ধ্যে হ'লেই তো ঢুলতে আরম্ভ করিস।'

তারক কোনও ক্রমে জানায়, না, কিছুতেই সে ঘুমোবে না।

—নে, তবে চটপট কাপড় জামা প'রে তৈরি হয়ে নে।

কাপড়জামা আর কি, একটা সোডা দিয়ে কাচা ধুতি, আর একটা ছিটের হাতকাটা শার্ট। টানাটানির সংসার, ভাল কাপড় জামা আসবে কোথা থেকে ? তারক অত কথা ভাবতে শেখে নি, তবে একটু একটু বুঝতে পারে যে তাদের অনেক টাকা নেই। তাদের ঘরের চালটা আজ দু-তিন বছর ছাওয়া হয় নি , খড়ের খুঁচি দিয়ে কোনক্রমে চলছে বটে, কিন্তু ঝড়-বাদলের সময় ভারি অসুবিধে হয়। আর-বছরের বর্ষায় গোয়ালঘরের একদিককার দেয়ালটা পড়ে গিয়েছিল, সেটাও সারানো হয়ে ওঠে নি।

যাই হোক, কাপড়-জামা প'রে তারক প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় দুর্গা বললে, মেলাতে যাচ্ছিস্, কই পার্ব্বণী নিলি না তো ?

তারক আর কি বলবে ? যে-কথাটা বলবার জন্যে সে এতক্ষণ উস্‌খুস্ করছিল, মা নিজেই তা ব'লে ফেললেন দেখে সে আনন্দে কি যে বলবে ভেবে পেলে না। এই সময় তার দ্বিতীয় বার মনে পড়লো যে মা উপোস ক'রে আছেন। সে বিষয়ে কিছু বললে হ'ত ; কিন্তু 'মা, তুমি কখন খাবে ?' বা ঐ ধরণের কোনও প্রশ্ন তার নিজের কাছেই কেমন বেমানান লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হ'ল না।

দুর্গা খানিকক্ষণ তারকের মুখভাব লক্ষ্য ক'রে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

দু-জনে ঘরের মধ্যে গেল। তার পর দুর্গা কুলুঙ্গীর ভেতর থেকে একটা লক্ষ্মীর খুঁচি নামিয়ে আনলে। সামান্য কিছু পয়সা সে এখানে রেখে দেয়—সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে।

—এই নে, সাবধানে রাখ, আর নয় তো ওঁর হাতে দিয়ে দে। তুই যে ছেলে, যেতে যেতেই হয়ত হারিয়ে ফেলবি।

হাত পেতে জিনিসটা নিয়ে তারক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

একটা চক্‌চকে সিকি।

তার মানে দু'টো দোয়ানি, চার-চারটে আনি, চার চারে ষোলটা পয়সা !

বেশী ভাববার চেষ্টা করলে না তারক, শুধু তার মনে

হ'ল যে সমস্ত চাঁদনগরের মেলাটা বুঝি সে ঐ একটা সিকি দিয়ে কিনে আনতে পারবে।

পথে এসে তারকের ভারি কৌতুক বোধ হ'ল। কাতারে কাতারে চলেছে লোক—আগে পেছনে শেষ দেখা যায় না। মাথার পর মাথা—যেন একরাশ কালো পিঁপড়ে। বর্ষার আগে কাঠপিঁপড়ের দল ঠিক এমনি সারবন্দী হয়ে নারকেল-গাছের গুঁড়ি বেয়ে নামে।

পারুল, নয়নপুর আর চাঁপাহাটি—এই তিনখানা গাঁয়ের লোক যাবার একটা মাত্র পথ। তারকদের গাঁয়ের পশ্চিম কোণে বকুল-দীঘি, সেই দীঘির পাশ দিয়ে পথটা এঁকেবেঁকে শুক্‌নো মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। চৈত্রের দীপ্তিতে সেখানকার সবুজ জীবন ধূসর হয়ে এসেছে; মাঝে মাঝে সঙ্গীহীন বাবলা-গাছ বা দু-একটা আমকাঁঠালের বন ছাড়া আর কোনও শ্যামলতার ইঙ্গিত চোখে পড়ে না।

কাজেই মেলায় যারা চলেছে তারা এই গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে না নিয়ে আর যেন চলতে পারে না। বেলা প'ড়ে এলে কি হবে, রোদের ঝাঁজে চোখ চাওয়া যায় না। কাছেপিঠে পুকুর ডোবা থাকলে কেউ বা চোখেমুখে জল দিয়ে নেয়, কেউ তার গামছাটা অল্প ভিজিয়ে চার পাট ক'রে মাথার ওপর রাখে। যাদের ছাতি আছে তারাও সেগুলো ভিজিয়ে নেয়। খানিকটা পথ তাতে বেশ আরামে যাওয়া যায়—চলতে চলতে মাথার চার পাশে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার রেশ এসে লাগে।

শিবুর ছাতির আড়ালে আড়ালে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যে তারকের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। রোদ্দুরের তাত কি কম? তার ওপর এতটা পথ আল ভেঙে ভেঙে আসা! একবার তারকের মনে হ'ল জামাটা খুলে কাঁধে ফেলবে; কিন্তু আশপাশের ছেলেদের দিকে চেয়ে তারক সে লোভ সামলে নিলে। তাদের সকলেরই গায় যাহোক একটা-না-একটা কিছু আছে; সে হঠাৎ যদি জামা খুলে এলো গায়ে যায়, সে যেন কেমন দেখাবে। তারক শুধু কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে নিলে একবার।

যাই হোক্, ক্রমশঃ পথ ফুরিয়ে এল। আশেপাশে দেখতে দেখতে তারক অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিল। এক সময় সামনের দিকে চাইতেই সে লাফিয়ে উঠল—চাঁদ-নগরের শিবমন্দিরের চুড়োয় ত্রিশূল দেখা গিয়েছে। ঢাকের আওয়াজ আর গোলমাল এত বেড়ে গিয়েছে যে আশপাশের লোকের কথা আর ভাল ক'রে শোনা যাচ্ছে না। শেষ পর্য্যন্ত তারক তাহলে সত্যি সত্যিই মেলায় এল। এই বার মেলার ভিড়ের মধ্যে যদি বিষ্টু, শ্যামার সঙ্গে এক বার দেখা হয়ে যায়, তাহ'লেই সবচেয়ে মজা হয়। তিন জনে একসঙ্গে জিনিস কিনতে পারবে। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা সিকিটা তারক এক বার দেখে নিলে।

শিবু দেখতে পেয়ে বললে, কি দেখছিস? পয়সা?

—হ্যাঁ।

—কত?

—চার আনা।

—আমার কাছে দে বরং। এই ভিড়ের মধ্যে একবার হাত থেকে পড়ে গেলেই চার গণ্ডা পয়সা জলে যাবে।

বাইরে এসে তারকের সাহস হয়েছে, দু-হাত মেলে দিয়ে বললে, এই দেখো বাবা, হাতে তো নেই।

—তবে কোথায় রেখেছিস?

কাপড়ের খুঁটটা দেখিয়ে দিয়ে তারক বললে, এই-খানে। খু-উ-ব শক্ত ক'রে বেঁধেছি, কক্ষণো পড়বে না।

মেলার মধ্যে ভিড় ঠেলে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় তারক চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ তো বিষ্টু আর অভয়-দা। ও বিষ্টু, বিষ্টু—উ—

ডাক শুনে বিষ্টু আর তার দাদা অভয় কাছে এল। বিষ্টু বললে, এই সবে এলি বুঝি?

—হ্যাঁ। শ্যামা আর বিপিন কোথায় রে?

—তারা সেই পুতুলনাচের মাঠে। আমরাও যাবো একটু পরে। এখনও আরম্ভ হ'তে দেরী আছে কি না। চল্ না, ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি।

তারক শিবুর দিকে চাইলে। শিবু এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে বললে, তা যাবি তো যা, খানিক ঘুরে আয়। আমারও এই তক্কে একটা কাজ সারা হয়ে যায় তাহলে—নটবরের দোকানে একবার না গেলেই নয়।—তোরা কত দূর যাবি রে অভয়?

—এই কাছেই থাকবো।

—তারকের হাতটা তাহলে ধ'রে নে, ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে ব'সে থাকবে তার ঠিক নেই। আমি নটবরের দোকানে আছি, তোরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবি তো? বেশ, তখন আমি তোদের নিয়ে বেরুবো। আর দেখ, (তারককে দেখিয়ে) ওর বুঝি সখ হয়েছে একটা লাট্টু কিনবে, দেখিস্ তো সস্তাগণ্ডায় যদি কিনে দিতে পারিস। পয়সা ওর কাছে আছে।

উৎসাহের চোটে তারক পদে পদে ধাক্কা খেতে লাগল। অভয় এক বার বললে, ওরে আস্তে চল্। কিন্তু কে কার কথা শোনে! যেদিকে চাওয়া যায় সেদিক থেকে আর চোখ ফেরানো যায় না। দোকানগুলো অবশ্য অধিকাংশই বাঁশের খুঁটি, তালপাতা বা ছই দিয়ে বানানো, কিন্তু লাল নীল কাগজের ফুল দিয়ে তাদের এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে বাইরে থেকে ধরবার উপায় নেই। তার ওপর স্তূপাকার জিনিস। খাবারের দোকানে সারবন্দী থালার ওপর মন্দিরের চূড়োর মতন গজা, জিলিপী আর চিনির সন্দেশ। কাপড়ের দোকানে রঙীন জামা কাপড় আর জরির টুপি পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে তারককে যদি কেউ একটা বেছে নিতে বলে, সে কিছুতেই পেরে উঠবে না—এত রকমারি জিনিস সেখানে। দু-একটা চায়ের দোকানও বসেছে। সেখানে চা ছাড়া নানা জিনিস পাওয়া যায়—ডিম, পরোটা, ঘুগ্‌নী এই সব। একটা দোকানের বাইরে গ্রামোফোন বাজছে—তার চোংটা প্রকাণ্ড ধুতরো ফুলের মতন।

এক জন লোক একটা আস্ত গাছের ডাল কাঁধে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারক প্রথমে কিছুতেই বুঝতে পারে নি, পরে লক্ষ্য ক'রে দেখলে যে ডালটার গায়ে সুতো দিয়ে বাঁধা লাল লাল লিচু। দূর থেকে দেখলে কে বলবে যে ওগুলো চিনির তৈরি! এক বার তারকের ইচ্ছে হ'ল কেনে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল যে এখন কিনে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মুশকিল। তার চেয়ে বাড়ী ফেরবার সময় কেনাই ভাল। তাছাড়া বিষ্টুর কাছে এইমাত্র শোনা গিয়েছে যে মেলায় নাকি এক জন ভয়ানক আশ্চর্য্য ম্যাজিকওয়ালা এসেছে। একটা জ্যান্ত লোকের জিব কেটে সে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে, চোখের সামনে একটা ঘড়ি টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে আবার সেটাকে আস্ত বার করে লোকের পকেট থেকে। এমন আরও কত কি? রণরঙ্কিণী তলার মাঠে লোকটা তাঁবু ফেলেছে। তারই মধ্যে খেলা দেখায়, দু-পয়সা ক'রে টিকিট। ঠিক যেখানে চড়কগাছ পোঁতা হয়েছে তার পাশে। তারক সেদিকে যাবে না ঠিক করেছে; এক বার খুব ছোটবেলায় চড়কের মাঠে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দেখতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলেছিল। সেই থেকে তার ভারি ভয়—যে-ত্রিশূল আর ধারালো অস্ত্রের উপর সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দেয় সেগুলো দেখলেই ও চম্‌কে ওঠে। ম্যাজিক দেখেই তারক ফিরে আসবে, চড়কতলার মাঠে সে কোনও ক্রমেই যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে তারক এক পয়সার বায়স্কোপ দেখেছে এবং অভয় দেখেশুনে তার জন্যে একটা লাট্টুও কিনে দিয়েছে। যেমনটি তারক চেয়েছিল ঠিক সেই রকম। অথচ দাম নিয়েছে মোটে পাঁচ পয়সা। তারক ভারি খুশী। এই লাট্টুর দাম গণেশ অধিকারী তিন আনা চেয়েছিল। ওঃ লোকটা কি ঠকাতেই পারে!

ম্যাজিক দেখবার পর তারকের হাতে রইল তা হ'লে আট পয়সা। দু-পয়সা দিয়ে একটা লিচুর ডাল কিনলেও ছ-পয়সা থাকবে। ঘুড়ির দড়ি আর হয়ত কেনা হবে না, কিন্তু তার চেয়েও একটা ভাল মতলব তারকের মাথায় এসেছে। সে আর বিষ্টু ইতিমধ্যে গোপনে পরামর্শ করেছে যে আধাআধি পয়সা দিয়ে ওরা একটা 'লুডো' কিনবে। যে দোকান থেকে লাট্টু কেনা হ'ল সেইখানেই ওরা ঐ খেলাটা দেখছে। কতকগুলোর অবশ্য দাম বেশী, কিন্তু তেমন জিনিস ওরা কিনতে যাবেই বা কেন? একটা আছে কম দামী, সস্তা পেষ্ট-বোর্ডের ওপর লাল নীল কালি দিয়ে ঘর কাটা, আর ছক্কাটা কাঠের। ঐতেই চমৎকার চলে যাবে। দাম বলেছে দু-আনা। তার মানে ভাগে পড়বে চার পয়সা ক'রে। ঐটে কিনে নিয়েই তারকরা এবার ফিরবে নটবরের দোকানে। সেখান থেকে শিবুর সঙ্গে যাবে পুতুলনাচের মাঠে।

যে অদ্ভুত খেলা ম্যাজিকওয়ালা দেখালে, বাড়ীতে ফিরে মার কাছে কি ভাবে তা বর্ণনা করবে তাই ভাবতে ভাবতে তারক পথ চলছিল, আর বিষ্টুর সঙ্গে গল্প ক'রে সব খেলা-গুলো সে ভাল ক'রে মনে রাখবার চেষ্টা করছিল। ম্যাজিক আর বায়স্কোপের গল্প শুনতে শুনতে মা নিশ্চয় ভারি অবাক হয়ে যাবেন। শুধু মা কেন, কাল পাড়ার কত ছেলের কাছে এই কাহিনী বলা যাবে। বিষ্টুটা আগে থেকে সব ব'লে না দিলে হয়।

মোটে তিন পয়সা খরচ ক'রে ম্যাজিক আর বায়স্কোপ দেখতে পেয়ে তারক ভারী খুশী; তা ছাড়া যে-জিনিসটা কেনবার তার প্রধান লোভ ছিল, সেই লাট্টুটাও পাওয়া গিয়েছে জলের দরে। লিচুর একটা ডাল কিনবে তাও সে ঠিক ক'রে ফেলেছে। সেটাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে দাওয়ার এক জায়গায় গর্ত্ত ক'রে পুঁততে হবে। চিনির তৈরি জিনিস, খারাপ তো আর হবে না, যদি পিঁপড়ে না লাগে তা হ'লে রোজ একটা ক'রে পেড়ে খাওয়া যাবে। তার পর অভয়দা যদি বিষ্টুর ভাগের পয়সাটা দেয় তাহ'লে একটা লুডোও তারা—

হঠাৎ তারক এক দোকানের সামনে থম্‌কে দাঁড়ালো।

সেদিক থেকে আর তার চোখ ফেরে না। দোকানদারের ঐ সামান্য কাঠের বাক্সটার মধ্যে কি এমন লোভনীয় জিনিস থাকতে পারে বিষ্টু-অভয় তা দেখতে পেলে না। ডেকে বললে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন, পা চালিয়ে চলে আয় তারক।

তারকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দোকানদারের বাক্সের মধ্যে সে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে—যেমন ক'রে হোক সেটা কিনতেই হবে। তাতে যে তার লুডো কেনবার পয়সা কম পড়ে যাবে, বাবা জানতে পারলে যে রাগ করবেন, এসব কোন কথাই তার মনে এলো না। অভয়ের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে গেল দোকানের দিকে, বলে গেল, এক মিনিট দাঁড়াও না অভয়দা, আমি এক্ষুনি আসছি।

একটা থলের ওপর বসে দোকানী তামাক খাচ্ছিল। তারককে দেখে মোটা গলায় বললে, কি খোকা, কিছু কিনবে না কি?

- হ্যাঁ, এইটের দাম কত? তারক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

দোকানী হাঁ হাঁ ক'রে উঠল ;

—করো কি? দেখছ কাঁচের জিনিস, পড়লেই ভেঙে চার টুকরো হবে। খপ ক'রে অমন হাত দিতে আছে? কোন্ জোড়া চাই তোমার?

তারক অপ্রস্তুত হয়ে কোনক্রমে বললে, এই লালটা।

—ওটা বাপু সরেস জিনিস; দাম লাগবে ছ-পয়সা।

তারক বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা বার ক'রে দিলে। তার পর জিনিস দুটোকে অতি সযত্নে পকেটে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অভয় সবই দেখছিল, অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কার জন্যে কিনলি রে?

তারক সে কথায় কান দিলে না, শুধু বললে, কাউকে কিছু ব'লো না অভয়দা, লক্ষ্মীটি।

মেলা থেকে ফিরতে রাত হ'ল। বকুলদীঘি অবধি তারকরা এসেছে গরুর গাড়ীতে, বাকী পথটা হেঁটে। বাইরের রাস্তায় তারকের গলা শুনে দুর্গা নিশ্চিন্ত হ'ল। এত রাত হচ্ছে দেখে তার ভাবনা হয়েছিল। আর কিছু নয়, সন্ধ্যে থেকে আকাশে মেঘ জমছিল, পথের মধ্যে বিষ্টি-বাদল এসে পড়লে মুশকিল হ'ত।

তাড়াতাড়ি দুর্গা সদর দরজা খুলে দিলে। শিবু আর ভেতরে এল না। বললে, বড্ড গরম, দাওয়াতেই একটু বসি। এক ছিলিম তামাক দাও দিকিনি সেজে, ততক্ষণ ঘামটা জুড়োই। আর তারককে এই বেলা খাইয়ে দাও। একবার ঘুমোলে আর ওকে তোলা দায় হবে।

শিবুর তামাক দেওয়া হ'লে দুর্গা আর তারক রান্নাঘরে এল। রান্নাবান্না অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। তারক আর শিবু খেয়ে নিলেই সংসার চোকে। দুর্গা সন্ধ্যেবেলায় প্রসাদী ফলমূল খেয়ে নিয়েছে, রাতে আর খাবে না কিছু।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন মেলা দেখলি তারক? কি কি কিনলি, কই দেখালি না তো?

দেখাবার মধ্যে ছিল লাট্টুটা। লিচুর ডালটা তারকের হাতে ছিল, সে তো মা আগেই দেখেছেন। আর যে জিনিসটা পকেটে আছে, সেটা কেমনভাবে মার হাতে দেওয়া যায় এইটেই সমস্যা। কি করবে তারক ভাবছে, এমন সময় দুর্গা জিজ্ঞাসা করলে, আর কিছু কিনিস্ নি?

একটা সুযোগ তবু পাওয়া গিয়েছে। আস্তে আস্তে পকেট থেকে কাগজমোড়া জিনিসটা বার ক'রে তারক মার হাতে তুলে দিলে।

—এর মধ্যে আবার কি লবঞ্চুষ বুঝি?

'নাঃ' বলে তারক মায়ের পিঠের ওপর এসে পড়লো, কিছুতেই আর দুর্গার চোখের দিকে চোখ চাইতে পারলে না।

কাগজের মোড়কটা খুলে দুর্গা অস্ফুট আওয়াজ ক'রে উঠল। এ কি, এ তো তারই জন্যে আনা! উনি নিশ্চয়ই দেখেন নি, দেখলে রাগ করতেন। সংসারের টানাটানির মধ্যে অতি কষ্টে দুর্গা ঐ কটি পয়সা বাঁচিয়েছিল চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় ছেলের হাতে দেবে ব'লে। সে পয়সা যে তারক এমন ভাবে খরচ করবে দুর্গা তা কল্পনাও করতে পারে নি।

তাছাড়া কি করবে সে ঐ দুটি আভরণ নিয়ে? এক সময় ছিল যখন পাওয়ার আশায় দিন কাটতো। সেদিন আজ আর নেই। বহু কাল অপেক্ষা ক'রে ক'রে তারা ফিরে গিয়েছে।

নিজেকে সামলে নিলে দুর্গা; নিয়ে কঠিন স্বরে তারককে প্রশ্ন করলে, এ কি তুই নিজে কিনেছিস্?

—হুঁ।

—উনি দেখেছেন?

—না।

—দাম নিয়েছে কত?

—ছ-পয়সা।

একটু চুপ ক'রে থেকে:

—আমার জন্যে এনেছিস?

এর উত্তর তারক আর কিছুতেই দিতে পারলে না, শুধু মুখটা একটু বেশী জোরে মার গলার কাছে চেপে ধরলে। দুর্গা অবশ, তার চোখের কোণ চিক্ চিক্ ক'রে উঠলো প্রদীপের আলোতে। এই বেহিসেবী ছেলেটা কখন বুঝি লক্ষ্য করেছে যে মার হাত দুটিতে এক জোড়া শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই মেলা থেকে ছ-ছটা পয়সা খরচ ক'রে কিনে এনেছে দু-গাছি চুড়ি। কাঁচের জিনিস, কিন্তু রংটা আগুনের মতন।

স্মৃতি-চিত্র

শ্রীপ্রতিমা দেবী

১

মানুষের জীবন আর কতটুকু, তারই মধ্যে তাকে নানা ভাবে নানা জিনিস সংগ্রহ করতে হয়। শিক্ষা, দীক্ষা, কর্মের মধ্যে দিয়ে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা-জড়ান একটা জীবনের সম্পূর্ণ আকৃতি যখন গড়ে ওঠে তখন মনে হয় কিছু আগে যদি এই সম্বল নিয়ে পথ চলা আরম্ভ হ'ত, তবে অনেক কিছু, যা জানার অভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাকে হয় তো সুনিপুণ ভাবেই রূপ দেওয়া যেতে পারত, উপকরণের আবর্জনায় সময়ের গুদাম এমন করে ভর্তি হ'ত না। তাই ফেলে-আসা পথের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আর একবার যদি ফিরে চলা আরম্ভ করতে পারতুম। বয়েসের পাল্লাটা যে পালটে দেবার উপায় নেই বিধাতার বিধানে, এই অতৃপ্তি নিয়েই তাকে জীবনের কাছে বিদায় নিতে হবে।

গ্রহ যেমন তার বাষ্পময় দেহের জৈব অজৈব পদার্থ অনুসারে বিশিষ্টতা পায়, মানুষ তেমনই তার বংশানুক্রমিক উপাদান অনুসারে নিজের ভাগ্য শুরু করে, সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তার স্বভাবে নতুন রঙ লাগায়। মানুষ তার প্রকৃতি অনুসারে চারিদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে থাকে, এই গ্রহণ করার ক্ষমতাই বোধ হয় নিয়ন্ত্রিত জাতক চক্র থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে।

যে-যুগের কথা শুরু করলুম সেদিন বাংলার নব যুগ, বর্তমান সাহিত্যশিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই দিন। যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে যখন বহুকালের সনাতনী প্রথাগুলো নাড়া খেয়ে উঠেছিল তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এখনকার মতো বিশদভাবে ঘটে নি, দেউল তখন ছিল খাড়া কেবল প্রাচীন বটের মতো তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরেছিল ঘুণ।

তখনকার প্রথা অনুসারে সামাজিক জীবনে পূজা, পার্বণ, ব্রত, কথকতা, দোল-উৎসব ইত্যাদি অনেক কিছু প্রচলিত ছিল। আর সেই উৎসবগুলিই ছিল সামাজিক মেলামেশার পথ। ছোটবেলার ঝাপসা ছবি যা মনে পড়ে তাই দিয়ে শুরু করি এই গল্প। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলেও গোধূলির রাঙা রঙ লাগে প্রকৃতির গায়ে, সেই ধূসর ঘোমটার অন্তরালে তার স্মৃতি ঘোলা হয়ে এসেছে তবু সেদিনের ছবি আজও মনের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। তাই সামনের বৃহৎ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মনটা উতলা হয়—ঐ অন্ধকার নির্জন বাড়ীটা এক দিন প্রাণের আলোড়নে পূর্ণ ছিল, আজও সেই পুরান কালের দু-এক জন বৃদ্ধ স্মৃতির অবশিষ্ট খুঁটি আগলে বসে আছেন। চক্‌মিলনো ঠাকুর-দালানটির দিকে চেয়ে মনটা যখন ভরে উঠেছে, হঠাৎ অন্ধকার আকাশ চিরে প্যাঁচার ডাকে বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। চীলে-ছাদের এক কোণে তখন একটা আকাশ-প্রদীপ মিট মিট ক'রে জ্বলছে, আমার চোখের সামনে ঐ ভাঙা বাড়ীর মৃত আত্মা তার কবর থেকে বেরিয়ে এল, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের তান শুনতে পাচ্ছি, আবার জ্বললো আলো, চোখের সামনে যেন পরীস্থানের ইমারৎ।

২

গেছি সেই রূপকথার যুগে চলে, যখন পাদারী পিসীমার লেপের তলায় এক ডজন ভাইবোন মিলে সেটিকে ভাগাভাগি করে নিয়ে, যে যতটা পারে দখল করেছে পিসীমার কোলের কাছটা। তার পর চলল,—গোলেবকায়লী, হাতেমতাই, কঙ্কাবতী—আমরা মর্ত্যলোক থেকে চলে যেতুম কে জানে কোথায়, কেবল পিসীমার গলার স্বর থাকত আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে। সেই মানুষটি আমাদের কখন গহন বনের অন্ধকারে, কখন সাত-সমুদ্র-তের-নদী পার, আর কখন বা বাংলা দেশের শ্যামল ক্ষেতের, পাড়াগাঁয়ের নদীর তীরে নিয়ে ফেলতেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ড বাড়ীর বনেদী ব্যাপার। মস্ত রান্নাবাড়ীর উঠনের সামনে লম্বা বারান্দা। সকাল থেকে একটা কর্মের স্রোত বইত সেখানে। আসছে মেছুনী, আসছে তরকারি, বাজার, নাপিত, সরকার, আমলার হিসাব, দাসদাসীর অনুযোগ-অভিযোগের বিচার, বোষ্টমীর কীর্তন, ভিখারীর "জয় রাধা, শ্রীরাধা," কত বিচিত্র জীবনের বিবিধ ঘটনাবহুল ধারা চলত সকাল থেকে। সে যেন একটা বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার,

একটা একান্নবর্তী পরিবার ঘিরে তার নিত্য ব্যবস্থা। কর্ত্রী বসতেন তাঁর কাঠের তক্তায় সেই তাঁর "ময়ূর তক্ত", তাঁর একপাশে বসতেন বঁটি নিয়ে পাঁদারী পিসীমা আর এক দিকে সার্ব্বজনীন কোনে দিদি। চলত তরকারি কোটা আর এবাড়ী-ওবাড়ীর খোস গল্প, বৌঝিদের সমালোচনা, কীর্ত্তনীর গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের হিসাবও বাদ পড়ত না। তার পর একে একে আসন পাড়া হ'ত; প্রথম ছেলেদের খাওয়া, তার পর পুরুষরা, শেষে আসত মেয়েদের পালা। বাড়ীর গিন্নী কখন লুকিয়ে সকলের শেষে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দিতেন, কেউ তার খোঁজও রাখত না। তাঁর সঙ্গে বসত তিন চারটে গৃহ-পালিত পোষা বেরাল, তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে কি তিনি খেতে পারেন, তারাই শেষ অভুক্ত সংসারে, তখন যারা আহারের অপেক্ষায় আছে। সেই দালানেই বিকেল বেলা মাদুর পড়ত, এক একটি মুখ-সাফের বাক্স নিয়ে মাদুরের উপর বসতেন বৌদিরা বেণী রচনায়, সেই পেটরীর মধ্যে প্রসাধনের বিচিত্র সরঞ্জাম সাজান থাকত। এখনকার চেয়ে যে তার কোথায় কিছু কম ছিল তা বলতে পারি না, পমেটম রুজ থেকে আরম্ভ করে গোলা খয়ের আর কাঁচপোকার টীপ, আলতা, সিঁদুর, সুরুমা, কাজল কিছুই বাদ যেত না। মাথাঘষার মিষ্টি গন্ধ বাক্স খোলার সঙ্গেই ভুর ভুরিয়ে উঠত।

চার থেকে পাঁচ গুছির বিনুনী আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে, গোড়া বাঁধা ফিতেটিকে ঠোঁটের পাশে চেপে ধরে নানা প্রকারের থাপড়া-থুপড়ি দিয়ে খোঁপা বাঁধা শেষ হ'ত। তার পর একে একে আসতেন তাঁদের শাশুড়ীর সিংহাসনের কাছে। তিনি এক একটি বেল কিংবা যুঁইয়ের মালা জড়িয়ে দিতেন খোঁপায়। বেনে, বাগান, মন ভুলান, ফাঁসজাল, কলকা, বিবিয়ানা কত প্রকারের সৌখীন খোঁপাই তখন ছিল। অনেক সময় এই খোঁপা বাঁধায় নাপতিনীরাই ছিল পটু, তারাই বাড়ী বাড়ী খোঁপা বেঁধে, আলতা পরিয়ে বেড়াত, নখ রাঙান হ'ত তখন মেদি পাতার রসে। মেনিকিয়রের কিছুমাত্র ত্রুটি হ'ত না।

গিন্নী প্রমোদিনী ছিলেন বড়লোকের ঘরের বৌ, অনেক কিছু জীবনে সইতে হয়েছিল তাঁকে, সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে, তিনটি শিশু পুত্র আর দুটি বাচ্চা মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হলেন। আমরা বাড়ীর কর্ত্তাকে দেখি নি, কেবল যখন বোঝবার বয়েস হয়েছিল দিদিমা নাতি-নাতনীদের কাছে খোসগল্প বলতে বলতে তাঁর যৌবনকালের অনেক কথা বলে ফেলতেন, তারই সঙ্গে জড়িয়ে থাকত দাদামশা'র ছবি, তাঁর বিবাহিত জীবনের আভাস। মন যেন তার প্রকাশের সীমানায় এসে থমকে দাঁড়াত, অতীতের দিকে চেয়ে, চাপা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে উথলে উঠত তাঁর ভুলে-যাওয়া দিনের ব্যথা।

তিনি এসেছিলেন ফুলতলা গ্রাম ছেড়ে আট বৎসরের মেয়ে, সে কি আজকের কথা! বলতেন, "যেদিন যশোর ছেড়ে এলুম এই শহরের অন্দরে, বাড়ীর নতুন বৌ আমি, তখন পরিচিত নই কারুর সঙ্গে, কেবল দু-চার জন ননদের সঙ্গে সখী সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছি সে তাদেরই গুণে, তারাই বুঝতে পারত এই গ্রামের মেয়ের কান্না।"

খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ীর সকলে যখন বৈঠকখানা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, গরম দিনে ঝিমনো হ'ল চূড়ান্ত আলসেমী। টানা-পাখার হাওয়ায় গড়গড়া টানতে টানতে চোখ তাঁদের পড়ত ঢুলে। নতুন বর তখন অন্দরে আহারের পর বিশ্রাম করতে আসতেন। বধূ পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াত আকাশের দিকে চেয়ে—ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে ঘুঘুর ডাক মিলত গিয়ে বধূর বুকের তালে তালে, হঠাৎ পশ্চিমে মেঘ জমে আসত; চিলেরা দূর আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখা যেত, তারই সঙ্গে বধূর মন উড়ে যেত যশোরের ফুলতলা গ্রামে, সে ভাবত—এতক্ষণ সেখানে নারকোল গাছের সার পুকুরের জলে ছায়া ফেলেছে, এই কাল মেঘে আমাদের দীঘির জল এখন নীল দেখাচ্ছে বুঝি। যেখানে কলসী ভাসিয়ে মেয়েরা পুকুরের এপার-ওপার হয়, যেখানে ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট সুখ-দুঃখের মধ্যে মানুষ তৃপ্ত, বধূ সেই চিলের মতো চলে যেত কোন্ সেই সুদূর গাঁয়ে। মনে বলত—"পাখী তোমার মতো যদি থাকত আমার ডানা, তাহলে আমাকে কি বাঁধতে পারত কেউ এই বনেদী ইঁটের পাঁজার ভিতর!"

৩

তখনকার বড় ঘরের ব্যাপারের মধ্যে অনেক লুকনো সুখ দুঃখ অতৃপ্তি থাকত, কোথাও একটু অবকাশ পেলেই গুমরে উঠত ফাঁকা মন। সেদিনের জীবন মেয়েদের পক্ষে যে খুব আরামের ছিল তা বলতে পারি না। এক দিকে মনুর আইন আর এক দিকে মুসলমানের পর্দা মেয়েদের অন্তঃপুরের আসবাব বানিয়েছিল, আর বাইরে ছিল পুরুষদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। দিদিমা বলতেন—"তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের একটু হাওয়া বদলান দরকার হ'লে বোটে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। শরতের

হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসত বজরা জমিদারী থেকে, কর্তার হুকুমে এবারও তাই হ'ল। ছেলেদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে তাদের পিসতুত ভাগ্নের গার্জেনশিপে রেখে, দুই ছোট মেয়ে ও গিন্নীকে নিয়ে যাত্রা স্থির হ'ল, সঙ্গে যাবেন কর্তার দুই বোন। তখনকার দিনে বোটে যাওয়াটাই পর্দা থেকে বেরবার মেয়েদের একমাত্র সুযোগ। কলকাতার আহিরিটোলার ঘাট থেকে বোটে চড়া হ'ল, বড় বোটে কর্তা, গিন্নি, মেয়ে দুটিকে নিয়ে উঠলেন এবং আরও দুটি ছোট বোট ভাড়া নেওয়া হ'ল বোনদের জন্য। সঙ্গে জিনিসপত্র তরিতরকারি চাকর-বাকর আহারের সব রকম আয়োজন। পরিবারের সকলেই উঠলেন। বোট ছেড়ে দিল, দুটি বোন বোটের শার্সি তুলে চেয়ে রইল বাইরের দিকে, মনে হ'ল যেন একখানা মস্ত বাড়ী ভেসে চলেছে, পিছনে মাঝি তার প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউয়ের আঘাতে টলমল ক'রে উঠছিল মাথা ও দেহ, নিজেদের সামলে নিয়ে বাইরের সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুটি মেয়ে, সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে, জলের এক দিকে পড়েছে তীরের কাল ছায়া আর অপর দিক থেকে চাঁদ গাছের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাতে গঙ্গার ঢেউগুলি চিক্ চিক্ ক'রে উঠছে। উপর দিকে চাইলে দেখা যায় কর্তা বোটের ছাদে তাঁর বিপুল দেহ ইজি-চেয়ারের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রামগ্ন, পাশে তাঁর সখের বন্দুক রয়েছে পড়ে, বৃদ্ধ চাকর দূরে ব'সে তামাক সাজছে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, ঘুম আসে নেমে দুই বোনের চোখে, ধীরে ধীরে চলে যায় বোটের ভিতরে নিজের বিছানায়, সে রাত্রের রহস্য তাদের মনের উপর চাদর বিছায়, ফুরফুরে হাওয়া হাত বুলিয়ে যায় গায়ে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম ভেঙে যেতেই মেয়ে দুটি নেমে পড়েছে চরে যেখানে বোট বাঁধা ছিল রাতের জন্য। শেষরাতের ম্লান চাঁদ তখন আকাশের গায়ে আঁকা, সূর্য উদয়ের পূর্ব্বাভাস লাল ছটা সাহসী চিত্রকরের তুলির নির্ভীক পোঁচের মতো লাগিয়েছে লাল আর সোনা পূর্ব্বদিগন্তে। মেয়ে দুটি ভোরের আলোর ম্লান ছায়াতে মাঝে মাঝে ঠোকর খেতে খেতে পা ফেলে চলেছে। দাসী পিছন থেকে বলছে "সাবধান দিদি, এসব মড়ার হাড় পায়ে লাগে না যেন।" ছোট পাখী সকাল বেলায় বাতাস পেয়ে কিচির-মিচির করছে, তারা মড়ার মাথার ভিতর নির্ভয়ে বাসা বেঁধেছে, ভূতের ভয় তাদের একেবারেই নেই, এই হ'ল পল্লীগ্রামের শ্মশান। মেয়েরা যখন বেড়িয়ে বোটে ফিরল মা তখন রান্নার আয়োজন করে ফেলেছেন। ঘাটের নাম মনে নেই, সেখানেই রান্না খাওয়া-দাওয়া সেরে বোট খুলে দেবে। তারই আয়োজন চলেছে—এমন সময় হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল, মেয়েরা বাইরে ছুটে গিয়ে দেখে গুপীদাসী চান করতে নেমে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, তাই মাঝি-মাল্লারা লোক ডাকাডাকি ক'রে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করছে, "বাবুমশা'র কাছে বকশিশের আভাস পেয়ে চার-পাঁচ জন ভোজপুরী দরোয়ান লাফিয়ে প'ড়ে গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে, গুপীকে টেনে তুলল, সে বেঁচে গেল, দরোয়ানরাও বকশিস পেলে। কর্তা অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন, গরীবের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। যদিও তিনি তখনকার দিনের বড়লোকের ঘরের ছেলেদের দুর্বলতা এড়াতে পারেন নি তবুও সকলের উপর তাঁর অমায়িকতা উদারতা তাঁকে বন্ধু-বান্ধবমহলে জনপ্রিয় করেছিল। এ যাত্রা তাঁদের দৌড় ছিল মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত, রাস্তায় হুগলীর ইমামবাড়ী ইস্তক আরম্ভ ক'রে হংসেশ্বরী-মন্দির পর্যন্ত অনেক কিছু দেখা হ'ল। সেকালের শিশু-চিত্তের লোভনীয় জিনিস ছিল কৃষ্ণনগরের পুতুল আর শান্তিপুরী ফেণী বাতাসা, কত যত্নেই না সেগুলি সঞ্চিত হ'ত বোটের তক্তার নীচে আর দুই বোনের সমস্ত দিন মন পড়ে থাকত সেই-গুলোরই উপর, বার বার ক'রে দেখা আর নেড়েচেড়ে তুলে রাখা—এই ছিল সমস্ত দিনের কাজ। গানে, গল্পে, নানা প্রকার ছোটখাট অভিজ্ঞতা-জড়ান বোটের দিনগুলি জলের স্রোতের মতো অবাধে কেটে গেল, মাসখানেক পরে সকলে বাড়ী ফিরল। কোথায় গেল সেই মুক্ত আকাশ আর বাধাহীন গঙ্গার প্রবাহ, সবশুদ্ধ বোটের জীবনটা যেন বৃহৎ বনেদী ভিটার অন্দরের অন্তরালে মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মতো।

৪

এক দিন হঠাৎ শোনা গেল কর্তা বাইশ বিঘা জমির উপর গঙ্গার ধারে বাড়ী কিনেছেন। তাঁর বড় সখের ছিল সেই বাগান।

সেবার গরমে সেইখানেই বেড়াতে যাওয়া স্থির হ'ল। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই প্রায় গেল, কর্তার বোনের ছেলে বৌরাও এবার বাদ পড়লেন না। তখনকার দিনে বাগানে বেড়াতে যেতে হ'লে কুক কোম্পানীতে ঘোড়ার অর্ডার দেওয়া হ'ত, মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল ক'রে লোকে তবে বাগানে পৌছত। ছয় ক্রোশ অন্তর অন্তর সহিস ঘোড়া নিয়ে গাছের তলায় আগের দিন গিয়ে বাসা বেঁধে থাকত। কর্তার বাগানযাত্রাও ঠিক এই ভাবে হয়েছিল। ক্রমে

সমস্ত পরিবারদের নিয়ে ল্যাণ্ড গাড়ী ও প্রকাণ্ড দুটো কাল জুড়ি বাগানের গেটে পৌছল। দূর থেকেই এক সার বকুল গাছ চোখে পড়ে, রাশি রাশি ফুল বিছিয়ে আছে গাছের তলায়। সেদিন বাবু আসবেন বলে মালীরা বিশেষ ক'রে শ্বেত কাঁচের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়েছিল, তারই থেকে জল ছিটিয়ে পড়ছিল আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা ক'রে। ফ্রেঞ্চ স্টাইলের সাদা পাথরের মূর্তি সাজান রয়েছে এখানে সেখানে আর ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে আমোদ-করা লাল রাস্তা এঁকেবেঁকে ঘুরে গিয়ে কুঠীতে লেগেছে। তারই দু-ধারে মনোমুগ্ধকারী দেশী ও বিলাতী ফুলের কেয়ারী। কোথাও গেটের উপর হল্‌দে গোলাপ ফুটে আছে। লোহার তারের উপর তাকে উঠিয়ে দিয়ে সযত্নে সাজান হয়েছে। মাঝে একটা ঝিল, বেল, যুঁই ইত্যাদি নানাবিধ ফুলের গাছের বাহার তারই চারি দিক ঘিরে, নানা প্রকারের পাখীও জলে ভাসছে, ময়ূর ও সারস বাগানে ছাড়া আছে। দুই প্রকাণ্ড কচ্ছপ ঝিলের জলে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে দেখা যায়। মালীরা তরকারি লাগিয়ে জল দিচ্ছে, আলু, কপির চারা সাজান হয়েছে, নানাবিধ শাকসব্জীরও অভাব নেই। কুঠীর ভিতর সমস্ত ফার্নিচার তখনকার ফ্যাশানেবল অসলার কোম্পানী থেকে কেনা, মেহগনির উপর মখমল দিয়ে মোড়া ঝাড় লণ্ঠন ও তখনকার দিনের হাল-ফ্যাশানের তৈরি।

কর্তার মনটা ছিল সৌখীন, অনেক কারুকার্য দিয়ে বাগানবাড়ী সুশোভিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সেই চেষ্টার পিছনে ছিল সৌন্দর্য-পিপাসা। অনেক দিন পরে ছেলেমেয়েরা শহরের আবহাওয়া থেকে বেরতে পেয়ে বেঁচে গেল। সকলে অতি স্ফূর্তিতে গঙ্গাস্নান, আম কুড়ানো, কুঁড়োজালি নিয়ে খেলা—এই সব আমোদে দিন কাটাতে লাগল। এদিকে চাকর-মহলে ভূতের ভয় দেখা দিল, ঝিরা বলে, "দিনে বেশ থাকা যায়, রাত্রি হ'লে কেমন গা ছম্ ছম্ করে।" আর রাত হ'লেই চাকররা নিমগাছে বেলগাছে ছায়ামূর্তি দেখতে থাকে এবং দিনের বেলা তার থেকে অদ্ভুত গল্প-গুজব তৈরি হয়ে উঠত। সন্ধ্যার সময় সেই সব গল্প শুনতে শুনতে ছেলেরা বিছানায় আশ্রয় নিত, তাদের ভাল ক'রে চোখ খুলতেও ভয় করত—বুঝিবা সেই সব বিচিত্র প্রেতাত্মা তাদের মনে হ'ত মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পর কখন ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ত মনেও থাকত না, ভয় যেত কেটে। একটা সাহেবী ভূতের উপদ্রবেই চাকর-বাকর বেশী অস্থির, কেন-না এই বাগানটা সেই সাহেবেরই পূর্বে ছিল। তার পর আবার তার গোরও আছে সেই বাগানে, সেই জন্য এই বাগান কিনতে কর্তাকে অনেকে নিষেধ করেছিলেন। যাই হোক, হিন্দু ব্রহ্মদৈত্যগুলো সেই সাহেব ভূতের কাছে হার মেনেছে, বুদ্ধু চাকর খালিই বলে, "ওরা পারবে কেন—সাহেব রোজ রাতে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে ঘুরে বেড়ায়।" এদিকে জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম বেলা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণে হাওয়া ওঠে, গরমে ক্লান্তি-জড়ান অবসাদ আনে মনে। বেলফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ দিনের শেষে বাতাসের পেয়ালা থেকে উপচে পড়ে। এমনই ক'রে সরল দিন সহজ ভাবে কেটে যায়। হঠাৎ কর্তা এক দিন তাঁর বড় ভাগ্নেকে ডেকে বললেন, "যতী, আমার বাগান বন্ধু-বান্ধবকে দেখান হয় নি, অনেক দিন তাঁদের নিমন্ত্রণও করি নি, যাও, তুমি কলকাতা গিয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।" যতীনবাবু যেতে প্রস্তুত হলেন তবে বললেন সব ব্যবস্থা শেষ হ'তে এক সপ্তাহ লাগবে।

তার পরদিন থেকে রাজসূয় যজ্ঞের মতো আয়োজন শুরু হ'ল। বাগানের চারিদিকে তাঁবু খাটাতে লাগল, নিমন্ত্রিত ও তাদের চাকর-বাকরদের থাকবার জন্য দরমার ঘর তোলা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দর ওস্তাদ ও মতিলাল বাবু হাজির হলেন। মতিবাবুর চেহারাটি ছিল মজার, কাঁচায় পাকায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, একটি থেলো হুঁকো হাতে সামিয়ানার নীচে বসে থাকতেন, আর কাজের চেয়ে হাঁক-ডাকেই রাখতেন উৎসব সরগরম ক'রে। বাবুমহলে মোসাহেব নামে তাঁর খ্যাতি ছিল, তাঁর কাজই ছিল কাপ্তেন-মহলে পসার জমান। তখনকার দিনে এই রকম একটি ক'রে গৃহপালিত মানুষ জমিদার-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করত। বাবুদের সঙ্গে থেকে তাঁদের হাবভাব ও কাজের প্রশংসা করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য কর্ম। কিন্তু এই প্রকারের লোকের কথাবার্তা কেউই সত্য ব'লে গ্রহণ করত না, এমন কি তিনি নিজেও না। এখনকার দিনে এই ধরণের কাজ উঠে গেছে, সেই জন্য ঐ রকম লোকের আর দরকার হয় না। শ্যামসুন্দর ওস্তাদের তখন অল্প বয়েস, নতুন এসেছেন কলকাতায়, এঁদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে তাঁর ভবিষ্যতের পথ খুলে গেল, পরবর্ত্তী যুগে এই শ্যামসুন্দর একজন সুশিক্ষক নামে কলকাতা-সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। যাই হোক, এঁদের হাতেই ভার পড়ল গান-বাজনার আসরের। ঈশ্বরীবাবু এসে হুকুম নিয়ে গেলেন মেয়েদের মনের মতো কী কী গান হবে। মতিবাবু হাঁকডাক ক'রে বাইরের বাড়ীতে কাজের আবহাওয়া সজাগ ক'রে রাখলেন। এদিকে ভিয়ানকর

বামুন এসে নানা প্রকারের মিষ্টি তৈরী শুরু ক'রে দিলে। কলকাতা থেকে রাশি রাশি মিষ্টি ও রাবড়ীর আমদানী হ'ল। নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বহু লোক। অনেক সম্রান্ত লোক আসবে, তার উপযুক্ত উদ্যোগ হ'তে লাগল।

ভাগবৎ মালী গাঁদা আর গোলাপ দিয়ে সমস্ত কুঠীবাড়ী সাজিয়ে ফেললে, ছোট তোড়া আর বোকে বাঁধা হ'তে লাগল। হুঁকোবর্দ্দারের অনবরত তামাক সাজার গন্ধ দক্ষিণ হাওয়াতে অন্দরে ভেসে আসছে। মালাকর যুঁই ও বেলের রাশ রাশ মালা দিয়ে গেল। হঠাৎ যেন মনে হ'ল বাগানটার চেহারা বদলে গেছে, যেন কোন ইন্দ্রপুরী। দুপুর থেকেই নিমন্ত্রিত দল আসতে থাকল। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব অনেক এসেছেন। সমস্ত রাত ব্যাপী গান বাজনা মজলিশ চলল। গাছের তলায় তলায় গানের আসর, আর ঘন পাতার ভিতর দিয়ে জাপানী ফানুসের আলো ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে মাথার উপর। অন্দর বাড়ী থেকে বাইরের বাড়ীর গোলমাল মেয়েরা শুনতে পাচ্ছে, এ রকম উৎসবের আভাস তখনকার দিনে মেয়েরা দূর থেকেই পেত, তবু সবসুদ্ধ উৎসবের উত্তেজনা থেকে তারাও বঞ্চিত হত না। খাওয়ার হিড়িক চলল প্রায় সমস্ত রাতব্যাপী, এই উৎসবের জের চলল দিন-তিনেক ধরে। তৃতীয় দিনে সব চুপচাপ হয়ে এল, ক্লান্ত দেহমন নিয়ে বন্ধু-বান্ধব বাড়ী ফিরলেন—এখন "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।" খালি উৎসবের বাসি ফুলের মালা, ঝরা গোলাপের তোড়া স্থানে স্থানে ছড়ান রয়েছে। ফুলদানীর ফুল এখনও ম্লান হয় নি, উৎসবের মোহ এখনও যেন মোছে নি তাদের গন্ধ থেকে।

ভোর ৪টার সময় হঠাৎ বৈঠকখানা থেকে একটা হৈ হৈ শোনা গেল, ঘুম ভেঙে গেল একটি ছোট মেয়ের, সে তার ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে ঝি বলত," ঝি বললে, "জান না দিদি, একেই বলে এই হাসি এই কান্না। কাল লোক চলে যাবার পর থেকে বাবার যে অসুখ করেছে, তাই সকলে ব্যস্ত।" সকালে দেখা গেল ডাক্তার নীলমাধব বাবুর গাড়ী বাগানের দরজায়। সমস্ত দিন চিকিৎসা চলল কর্তার, রক্তবমি কেউ বন্ধ করতে পারল না। ৩৬ বৎসর বয়সে বনেদী ঘরের অভিশপ্ত জীবন গঙ্গার শান্ত তীরে বিশ্রাম নিল। তাঁর উদ্দাম জীবন, উৎসবের উন্মত্ততায় নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চলে গেল, কেউ জানল না কিসের দুর্দমনীয় বেগ তাঁকে এমন নির্মমভাবে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মধ্যে সত্যিকার একটি শিল্পী ছিল কিন্তু সে ফুটতে পায় নি, তারই আবেগে নিজেকে ছিন্নভিন্ন ক'রে চলে গেলেন কোন্ অজানা ভাগ্যপথে। তাঁরই প্রতিহত শক্তি নিয়ে পরবর্তী যুগে যে দু-জন শিল্পীর আবির্ভাব হ'ল তাঁরাই শিল্পজগতে নতুন রূপ সংযোজনা করলেন, আর বাংলার রুচিকে ফিরিয়ে দিলেন নব নব শিল্প-বিকাশের পথে।

সেই পুরনো বাড়ীর পুরনো কালকে ভাবতে ভাবতে কখন ঝিমিয়ে পড়েছিলুম আমার চৌকিখানার উপর তা বুঝতেও পারি নি, হঠাৎ যেন কারো কোমল স্বরে মনটা নাড়া খেল, তন্দ্রার ঘোরেই যেন শুনলুম কেউ বলছে, "এই তো আমার একাধিক রজনীর একটি গল্প শেষ করলুম, ভোর হয়ে এল, আমি এইবার যাই। ঐ বড় বাড়ীর আর এক ইতিহাসের পালা শোনাব তোমায়, তুমি যখন এসে বসবে এমনই ক'রে এই বারাণ্ডায় আর এক দিন। এমনিই ক্লান্ত সন্ধ্যায় সুরু করব আর এক যুগের পারিবারিক কাহিনী।"

অভিযান

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

দূর কর গান, ফেল বীণা ফেল, কাজ নাই আর বাঁশীতে
জীবনেরে ঘিরে চারিদিকে চলে মরণের অভিযান,
গ্যাস, বিষ আর বোমারু বিমান, কামানেতে আর ফাঁসীতে
অপমানাহত কত শতকের নিঃশেষ অবসান।

মহাশ্মশানের কোলে নেচে ফেরে চিল, শকুনের দল,
তরল গরলে সভ্য নরের কণ্ঠ হয়েছে নীল,
আজিকে বাজারে লোহা চাই শুধু, পণ্যেতে কিবা ফল,
প্রাণের মূল্য হিসাবেতে নাই প্রয়োজন এক তিল।

ভুলে যাও আজ কেমনে জীবন বিকশিত হয় ফুলে,
দিনের চিতাই জ্বলে আকাশেতে, ওঠে নাক' রামধনু ;
নীল মৃত্যুর দ্রুত অভিযান চলে জীবনের কূলে,
সাহারা বসুধা, ফিনিক্সের আজ ক্ষীণ হয়ে গেছে তনু।

বন্ধ্যা রজনী, ব্যাকাস্, প্লুটাসে আজি আর কাজ নাই,
সুমধ্যমার স্বপনে আজিকে এঁকো নাক' অঞ্জন ;
অমৃত সরাও, থাকে যদি বিষ, পাত্রেতে ঢালো তাই,
অন্ধকারেতে ক্ষুব্ধ শিবের আজিকে নিরঞ্জন।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী রোহাৎগী

শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্তা

শ্রীমতী বাণী ঘোষ

কলিকাতার ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত বি. কে. রোহাৎগীর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণ কামিনী রোহাৎগী এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এস্‌সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী বাণী ঘোষ ১৯৩৯ সালে দশ বৎসর সাত মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এবারে বার বৎসর সাত মাস বয়সে তিনি আই-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। যত ছাত্রছাত্রী এপর্য্যন্ত আই-এ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের চেয়ে তিনি বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি নেপাল-সরকারের চিকিৎসা-বিভাগের ক্যাপ্টেন জে. এম. ঘোষ, এম্‌-বি, ডি-পি-এইচ্‌, ডি-টি-এম্‌ এণ্ড এইচ, মহাশয়ের দুহিতা।

শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্তা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় রাজস্ব-বিভাগের ডেপুটি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কন্যা।
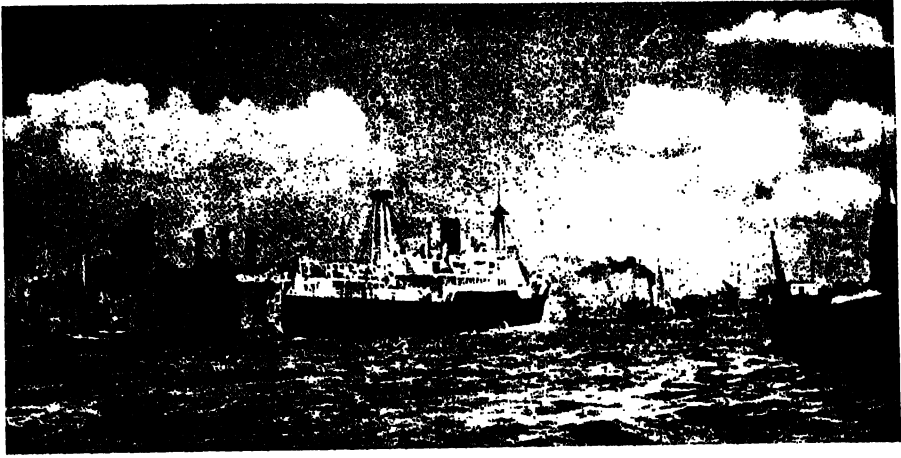
লেনিনগ্রাড হইতে বাষ্পীয়পোত লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইতেছে

রুষের সমস্যা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুষ-জার্ম্মান যুদ্ধের আজ ষোড়শ দিবস। যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহের অভিযানগুলির ফলাফল সম্বন্ধে দুই পক্ষের বিবরণ প্রকাশের ফলে অনেক ভূত ও ভবিষ্যৎ বাণী অনেক দিক্ হইতে আসিয়াছে। মোটের উপর, এখন বুঝা যাইতেছে যে জার্ম্মান ও রুষ এই দুই রাষ্ট্রেরই যুদ্ধশক্তি সম্বন্ধে বাহিরের জগৎ অতি সামান্যই জানিত। বিশেষজ্ঞদিগের দল—দেশী বা বিদেশী, আরামকেদারাশায়ী বা যুদ্ধাশ্বারূঢ়—এখন পর্য্যন্ত মাথা চুলকাইয়া স্তোকবাক্য উচ্চারণ ভিন্ন বিশেষ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সার কথা যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অতি সামান্যই, তবে বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরে এই প্রথম বিরাট সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ইয়োরোপ বা আফ্রিকায় এতাবৎ যে কয়টি অভিযান হইয়াছে এ অভিযানের তুলনায় সেগুলি নগণ্য বলিলেই চলে। এই যুদ্ধে এক এক পক্ষ যে সংখ্যায় সেনা ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, তাহার পরিমাপে বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর অন্য সকল রাষ্ট্রের মিলিত সামরিক শক্তি সমকক্ষ হয় কি না সন্দেহ। একমাত্র উত্তর-পোলাণ্ডের যুদ্ধে যে-সংখ্যায় বর্ম্মাবৃত যুদ্ধরথ, বিমানরথ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল তাহা জার্ম্মানী ও রুষদেশের বাহিরের ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জগতের সমরসচিবদিগের কল্পনারও গোচর ছিল কি না বলা যায় না। সুতরাং বিশেষজ্ঞগণের জড়ভরত অবস্থা প্রাপ্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

মস্কৌর রেড স্কোয়ারে সেণ্ট বেসিল ক্যাথেড্রাল
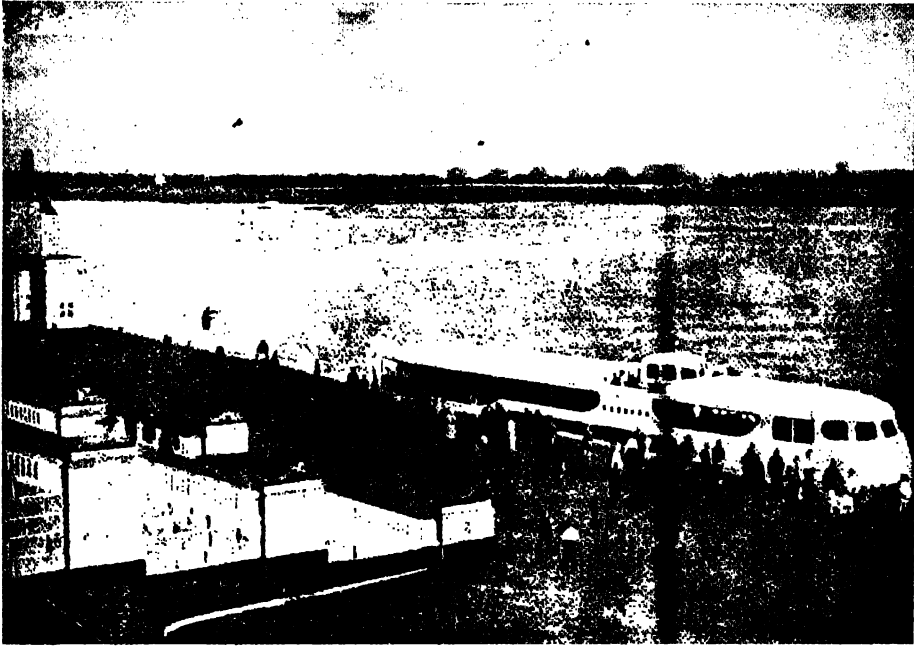
নূতন মস্কো-ভল্‌গা খাল

রুষ লড়িতেছে, এবং এখনো প্রচণ্ড বিক্রমে সংঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিসংঘাত চালনা করিয়া জার্ম্মান অভিযানের গতি রোধ করিয়া তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা সত্য যে, বল্টিক সাগরের উপকূলের রাষ্ট্রগুলি এবং পূর্ব্ব-পোলাণ্ড জার্ম্মান সেনাবাহিনীর বিদ্যুৎ-যুদ্ধের চক্রদলিত হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে রুষ এখন নিজের দেশের রক্ষার চেষ্টায় মরণ-বাঁচন লড়িতেছে। কিন্তু এই ষোল দিনের যুদ্ধেই ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আধুনিক সামরিক শাস্ত্র ও শস্ত্রের শত পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও রুষসেনা পূর্ব্বেরই মত দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধক্ষম আছে। রুষ সেনাবাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ অতি ভয়ানক হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং ইহাও সম্ভব সে তুলনায় জার্ম্মান বাহিনীর ক্ষতি অনেক কম কিন্তু রুষের ক্ষতি সহিবার ক্ষমতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ—গত মহাসমরেই রুষ হতাহতের সংখ্যা ৭০ লক্ষের অধিক ছিল—এবং বিপদাপদের দুর্দ্দশায় রুষজাতি এশিয়াটিকদিগের ন্যায় সহিষ্ণু। সুতরাং জার্ম্মান-রুষ অভিযানে এখনও এমন কিছু হয় নাই যাহাতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভাগ্যনির্ণয় করা যায়।

* * *

ক্লওসেভিট্‌স্‌, যাঁহার যুদ্ধশাস্ত্রের সন্দর্ভ আধুনিক (১৯৩৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) যুদ্ধবিশারদগণের বেদবিশেষ, বলিয়া গিয়াছেন যে রুষরাষ্ট্র সমর অভিযান দ্বারা বিজিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র অন্তর্বিপ্লব ও ক্লান্তির ফলে উহার পতন সম্ভব। যদি এই আপ্তবাক্য এখনও সত্য হয় তবে জার্ম্মানীর এই নূতনতম বিদ্যুৎ-যুদ্ধাভিযান নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। এই অভিযান "বিনা মেঘে বজ্রপাতে"র মত সমস্ত জগৎকে—এমন কি রোম-বার্লিনের প্রগাঢ় বন্ধু জাপানকেও—হতভম্ব করিয়াছে, এবং অকস্মাৎ আক্রমণের ফলে সোভিয়েট-বাহিনীকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া শত শত মাইল হটিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েটের সামরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা "যুদ্ধবিশারদে"র নানা মত হইলেও ঐ ৮,১০০,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী রাষ্ট্রের ১৭,৫০,০০,০০০ অধিবাসিগণ যে তাহাদের নেতৃবৃন্দের পশ্চাতে একমত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের স্থান নাই। ঐ রাষ্ট্রে নানা বিভিন্ন জাতির লোক ১১টি বিভিন্ন সোভিয়েট উপরাষ্ট্রে নানাপ্রকার ভূমিখণ্ডে বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দলাদলি, সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা, বা সামাজিক বিক্ষোভের কোনও চিহ্ন

প্যারাশুট-অবতরণ-কৌশল শিক্ষার উচ্চ চূড়া

সৈন্যগণ প্যারাশুট সাহায্যে বিমান হইতে অবতরণ করিতেছে

প্রকাশ পায় নাই। পেশাদারী রাজনীতির স্থান ষ্টালিনের রাষ্ট্রে নাই, সুতরাং সে ক্ষেত্রেও বিশ্বাসঘাতকতার অবকাশ নাই।

"কর্ম্মী ও কৃষকগণের সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে" ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও বিদ্বেষ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু কোনও প্রকার সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব থাকা সম্ভবপর নহে। "পার্টি সিষ্টেম" নামক যে বিলাতী মাদক—যাহা অশিক্ষিত, উৎকোচ-দোষদুষ্ট বা উদাসীন নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে দারুণ বিষময় ফল দেয়—এ দেশে প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ তাহার চলন রহিত। যাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লব গড়িয়া উঠিতে পারিত তাহারাও বিতাড়িত বা "পরিষ্কৃত" হইয়াছে। দেশের নেতৃবর্গ সন্ন্যাস-তুল্য কঠোর স্বার্থত্যাগ ও দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য, ব্রত পালনে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলে বিতাড়ন, নির্ব্বাসন বা "বিরেচন" অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সোভিয়েট রুষে অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা বিশেষ নাই মনে হয়।

বাকুর তৈল-কূপ

দেশের ও দেশের লোকের অবস্থা ও ব্যবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে সোভিয়েটের বিরাট্ পরিকল্পনাগুলির ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অনেক কিছুই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গণশিক্ষায়, সংস্কৃতির বিকাশে, রাষ্ট্রচালনায় জনতার দায়িত্বজ্ঞানগঠনে এবং অনুরূপ লোকশিক্ষা-অভিযানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতি যে আশ্চর্য্যরূপে বহু সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েটের স্থিতি ঐরূপ স্পষ্ট নহে, কিন্তু তাহা হইলেও ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের চেষ্টার ফলে দেশকে স্বাবলম্বী করার পথে সোভিয়েট রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে মনে হয়। ১৯৩০-১৯৪০ খৃঃ মধ্যে (দশ বৎসরের মধ্যে) মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। মাখন ও পনির পরিমাণে তিন হইতে চারি গুণ বাড়িয়াছে। গমের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার শস্যই অনেক অধিক পরিমাণে জন্মাইতেছে।

মস্কৌ-ভল্‌গা খালের তীরে খিমকি ষ্টেশন

শিল্পের উন্নতি আরও অধিক উল্লেখযোগ্য। সম্রাট্‌গণের অধিকৃত রুষসাম্রাজ্যে কলকারখানা নামমাত্র ছিল। বলশেভিক বিদ্রোহের পর আট বৎসর ব্যাপী বিপ্লবে পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহারও ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। তাহার পরের দশ বারো বৎসরে দেশ বহু যুগ অতিক্রম করিয়া সম্প্রতি বিরাট্ শিল্প-প্রাধান্যের পথে চলিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে রুষদেশের স্থান এখন জগতে তৃতীয়, সিমেণ্টে পঞ্চম এবং অসংখ্য রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ে বলিয়া গণ্য। খনিজ উত্তোলনে এবং পরিষ্কৃতিতে সোভিয়েট রাষ্ট্র এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই স্থান পায়। এই রাষ্ট্রের লোকবল ও আয়তন এতই
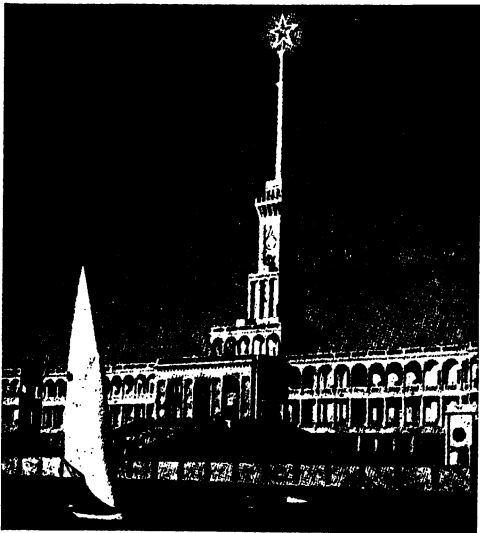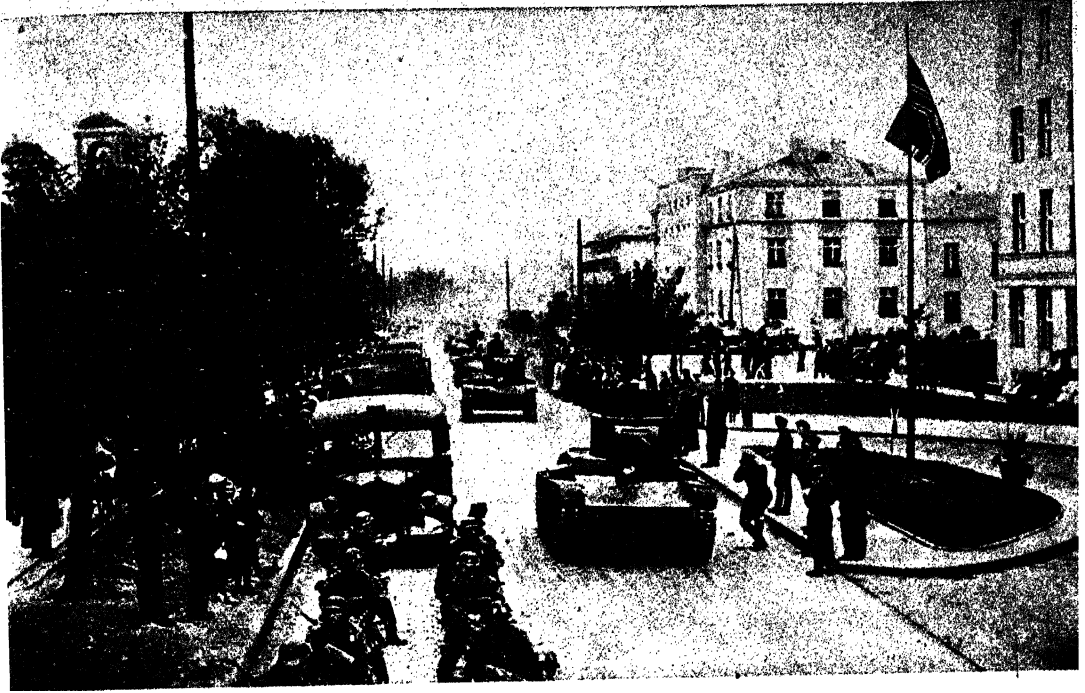
ব্রেষ্ট-লিটভ্স্ক শহরে সোভিয়েট ও জার্ম্মাণ
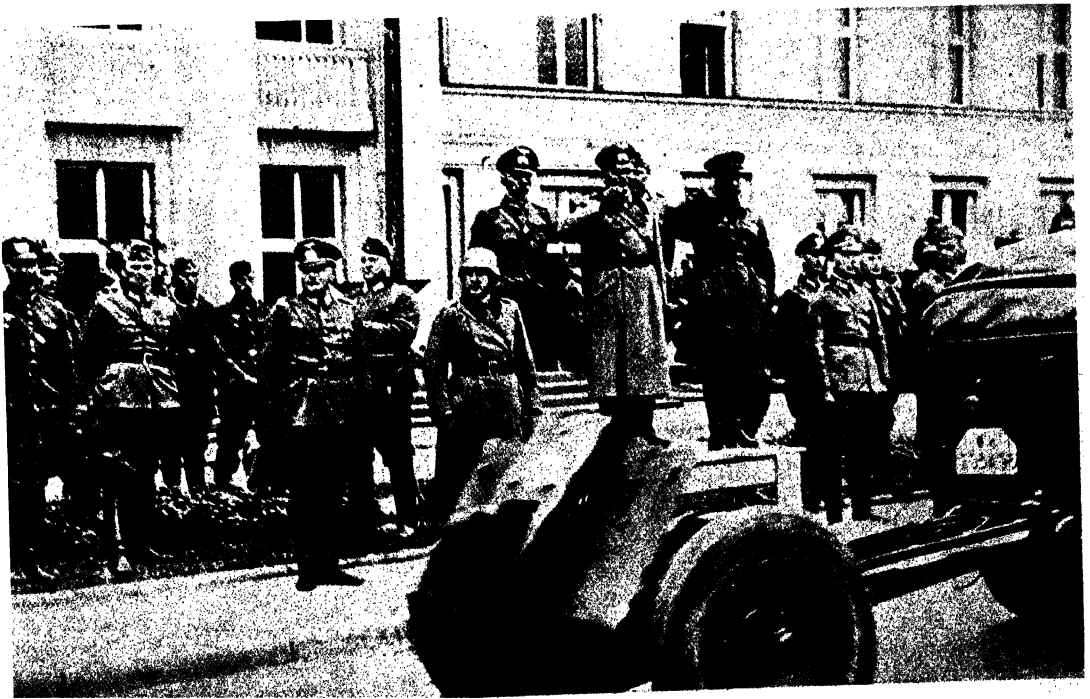
পোলাণ্ডের পতনের পর ব্রেষ্ট-লিটভ্স্কে জার্ম্মাণ ও সোভিয়েট অধ্যক্ষগণ উভয় বাহিনী
কুচকাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন

রেড স্কোয়ারে লেনিনের সমাধি-স্তম্ভ
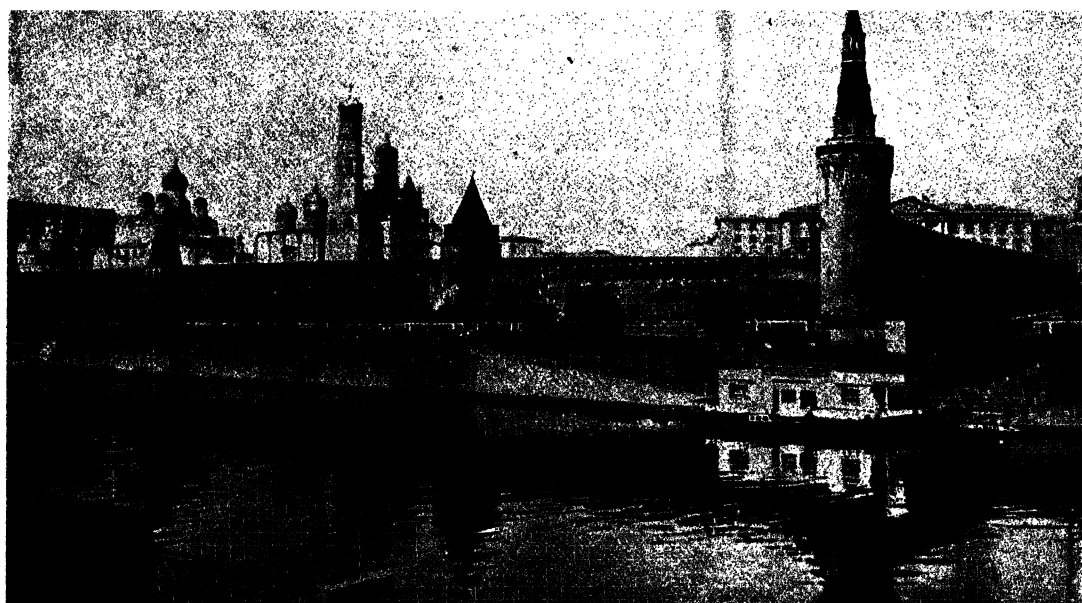
মস্কৌ নগরীর সুবিখ্যাত ক্রেমলিন

লেনিনগ্রাডে মস্‌জিদ

লেনিনগ্রাডে 'স্কোয়ার অফ রিভলিউশ্যন' বা বিপ্লব-উদ্যান
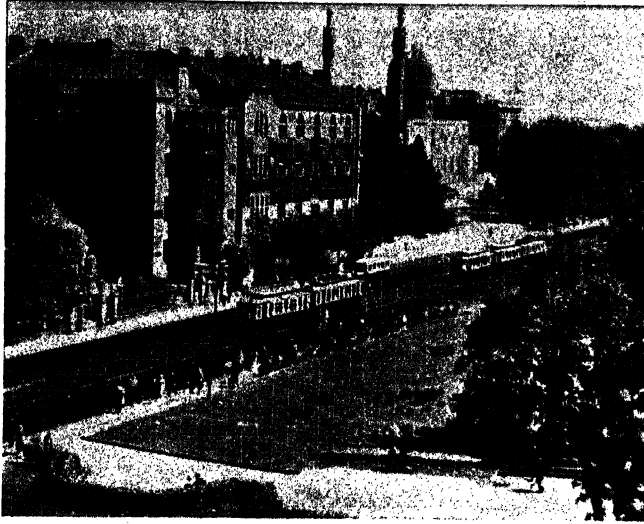
("নেপালের প্রবাসী বাঙালী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)
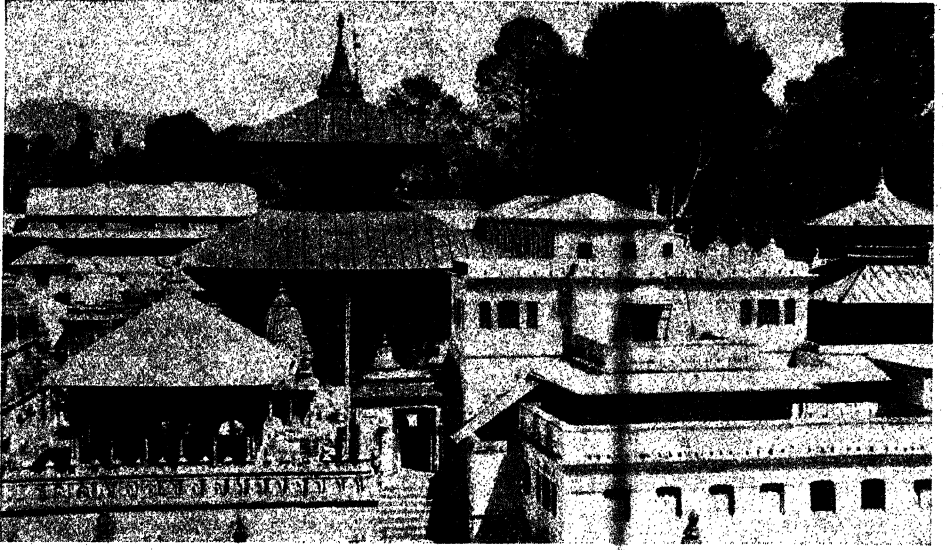
নেপালের পশুপতিনাথ মন্দির
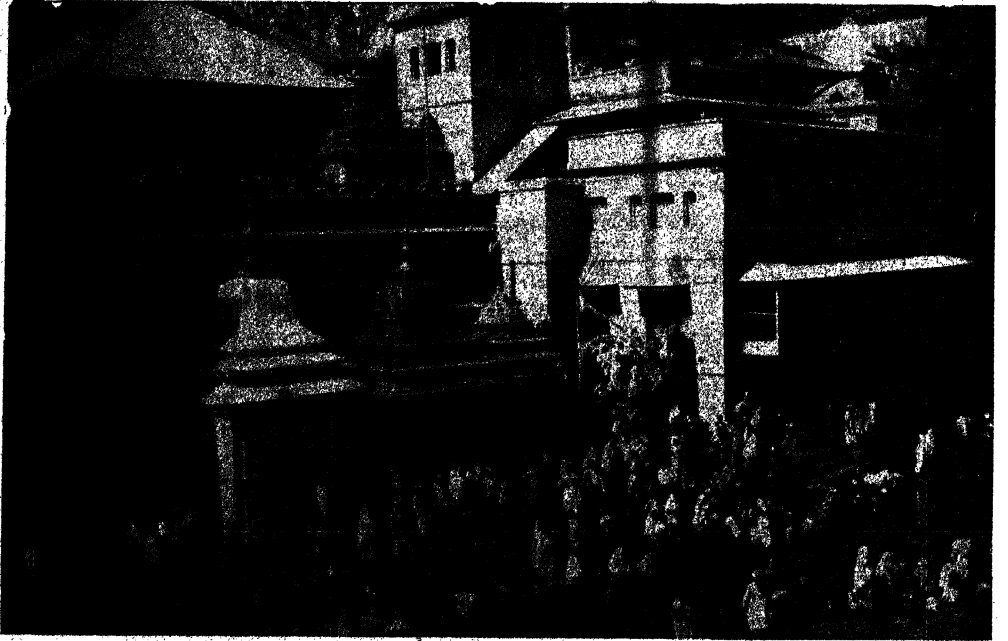
পশুপতিনাথ মন্দিরের সন্নিকট বাগমতী নদীতে স্নানের ঘাট

বিরাট্‌ যে ইহার প্রগতির পথ অসীম বলিলেই চলে। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্র সংস্কৃতি, বলবৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিমিত সঙ্গতিযুক্ত বলিলেও চলে।

* * *

রুওসেভিট্‌সের অভিমত যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই নূতন ও আশ্চর্য্য পরিণতিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরাজয় অসম্ভব। চীন-জাপানের তুলনাও যদি করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে চীন অপেক্ষা রুষের বিপরীত সেনা চালনের স্থান অনেক অধিক। চীন প্রায় প্রত্যেকটি সমর-উপকরণের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী এবং যুদ্ধ বাধিবার সময় তাহার সেনাবাহিনী ছিল অতি ছোট। রুষ-রাষ্ট্র বৎসরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন এবং ৩ কোটি টন পেট্রোল জাতীয় তৈল উত্তোলন করে এবং তাহার সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় ও যুদ্ধোপকরণের পরিমাণে জগতে বিরাটতম বাহিনীর অন্যতম। যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের জন্য যাহা কিছু কাঁচা মাল প্রয়োজন সে সকলের বিষয়ে রুষ রাষ্ট্রের অবস্থা জার্ম্মানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাস্ত্র চালনা শিক্ষায়ও রুষসৈন্য আধুনিক সকল প্রথাতেই অভিজ্ঞ। সুতরাং এই যুদ্ধ চীন-জাপান যুদ্ধ নহে। ইহা দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যুদ্ধকৌশল ও কারুকৌশল এবং ব্যাপক ব্যবস্থাকারিত্বের অগ্নি-পরীক্ষা।

রুষসেনার শৌর্য্য-বীর্য্য ও সহিষ্ণুতা জগদ্বিখ্যাত। বর্ত্তমান সমর অভিযানেও তাহার পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যাইতেছে এবং এখনও যে জার্ম্মান যন্ত্রচালিত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ রুষব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন করিতে পারে নাই তার প্রধান কারণ রুষসেনার অসীম সাহসের সহিত শত্রুকে যুদ্ধদান। জার্ম্মান-আক্রমণের সম্মুখে রুষসেনা হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অসংখ্য সৈন্য হতাহত ও বন্দী হওয়ায় তাহার ক্ষতিও ভয়ানক হইয়াছে কিন্তু এখনও তাহার ব্যূহ অটুট এবং সংগ্রামশক্তি ও সংকল্প ক্ষীণ হয় নাই। হটিবার স্থান এখনও অনেক রহিয়াছে, যদিও উক্রাইন প্রদেশ শত্রুহস্তগত হইলে তাহার কলকারখানার এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইবে।

রুওসেভিট্‌স্‌ যাহাই বলিয়া থাকুন আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান মহাসমরে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহা সামান্য দুই বৎসর পূর্ব্বেও লোক-কল্পনার অতীত ছিল। মোটর ও এরোপ্লেন আমাদের সময় ও দূরত্বের আপেক্ষিক জ্ঞান প্রায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং তাহার পিছনে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাতাগণের কলকারখানায় এখন যে প্রকার সূক্ষ্ম ও নির্ভুল কার্য্যকলাপের প্রয়োজন তাহা অল্পদিন পূর্ব্বেও স্বপ্নের অগোচর ছিল। মার্কিন রাষ্ট্রের কলকারখানার দানবপুরীগুলিতে—যেখানে অযুত মোটর প্রস্তুত করা দিনের কাজ মাত্র—এখন দিবারাত্র সমরসজ্জা ও যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের অশ্রান্ত অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। সেখানে জলের স্রোতের ন্যায় অর্থব্যয় করা হইতেছে, লক্ষ লক্ষ সুনিপুণ শিল্পী ও যন্ত্রবিশারদ গলদঘর্ম্ম হইয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু এখনও আয়োজনের পরিণতি বহুদূরে! ইহাতেই বুঝা যায় অত্যাধুনিক যুদ্ধে সৈন্যদলের পিছনে কি ব্যবস্থার পারিপাট্য কি কলকারখানার পরিসর প্রয়োজন।

যুদ্ধবিশারদগণ এতদিনে বলিতেছেন যে হিটলার সৈন্য চালনায় অদ্ভুত পারদর্শী এবং জার্ম্মান সেনার অভিযানে বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীর যোগ এতই নিখুঁত ভাবে চালিত হয় যে তাহা অঙ্কশাস্ত্রের পর্য্যায়ে পড়ে। সুতরাং তাহার বিরোধ করিতে হইলে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগে কুলাইবে না, সৈন্যচালনায় ও শক্তিপ্রয়োগে অঙ্কশাস্ত্র-বিদের ন্যায় সূক্ষ্ম বিচারে কার্য্যের ক্রম, গতি ও দিক নির্ণয় করিতে হইবে। যন্ত্রযুদ্ধের এই অভিনবতম যুগে যন্ত্রচালিত অস্ত্রের উৎকর্ষ যেমন প্রয়োজন যোদ্ধারও তেমনই জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা আবশ্যক। তবে শেষ পরীক্ষায় পুরুষকার এখনও আগেকারই মত মহামূল্য গুণ—যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চীনসেনা। সুতরাং বর্ত্তমান অভিযানে জয়পরাজয় "দেবতার ক্রোড়ে"।

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৩৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এবং বর্ত্তমান সংখ্যার ৪০৬ পৃষ্ঠায় 'ছবি' নিবন্ধে 'শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রায়' স্থলে 'শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়' পাঠ করিতে হইবে।

আশীর্বাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্বপানে বাহির হবে
আপন কারা টুটি'
এই সাধনায় কুঁড়ি ওঠে
কুসুম হয়ে ফুটি'।
বীজ আপনার, বাঁধন ছিঁড়ে
ফলেরে দেয় সাড়া।
সূর্যতারা আঁধার চিরে
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া।
এই সাধনায় যোগযুক্ত
সাধু তাপসবর
মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
অমৃতনির্ঝর।
এই সাধনায় বিশ্বকবির
আনন্দ-বীণ বাজে ;—
আপনারে দেন উৎস্রাবিয়া
আপন সৃষ্টি মাঝে।
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
পুণ্য মিলন-ব্রতে ;
আপনারে দাও ছুটি তুমি
আপন বন্ধ হতে।
আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলবে একাকার
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার॥

১১ আষাঢ় ১৩৩০

২

শ্রীমতী উর্ম্মি দেবী কল্যাণীয়াসু

নবমিলন-পূর্ণিমায়
উর্ম্মি উঠে উচ্ছলি',
সুরলোকের আশিস নামে
আলোকে তারে উজ্জ্বলি'।
প্রেমারতির শঙ্খসম
ধ্বনিত করে চন্দ্রমা
নীরব রবে শুভোৎসবে
প্রজাপতির বন্দনা॥

২৫ ফাল্গুন, ১৩৪৪

'আরোগ্য'*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছু দিন পূর্ব্বে কবির 'রোগশয্যায়' প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কবি 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি'র ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন। তার পর 'আরোগ্য'। "লক্ষ যুগের সঙ্গীতে ভরা সুন্দর ধরাতল" তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিল, ছাড়িল না; "অশ্রুজলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি" আবার মধুময় হইয়া দেখা দিল।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি'
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।"

সদ্যরোগমুক্ত দেহ প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; আর শান্ত স্বচ্ছ হৃদয়ে ছায়া ফেলিতেছে পৃথিবীর বিচিত্র মায়ামাধুরী।

"নির্জন রোগীর ঘর।
খোলাদ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্ন তাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থর গতি
শৈবালে দুর্ব্বল স্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।"

একটি অর্দ্ধ-উদাসীন কল্পনার আলোকে অপূর্ব্ব মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে ছবিগুলি—রৌদ্ররঙীন্ ভোরের মেঘের মত।

"জেলে-ডিঙি চলে পাল তুলে
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে' আছে আকাশের কোণে।"

এমনি নিরালা অবকাশে অতীতের কত না স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি স্বপ্নময় হইয়া দেখা দেয়।

"মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা

*   *   *

ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।"

এই পদ্মাকে তিনি কতবার কতরূপে দেখিয়াছেন! তাহার অসংখ্য ছবি মনের পটে আঁকা রহিয়াছে। আর গঙ্গা

"সেই বহুদিন আগে
দু'পহর রাতি, নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।"

জীবন-প্রান্তে আসিয়া পিছন পানে চাহিতে ভালো লাগে। সোনালী আভায় শ্যামল ছায়ায় জড়ানো অপরূপ সেই "নানা রঙের দিনগুলি।"

মনে পড়ে একটি রাত্রি।

"ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তর তর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্ব্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।"

রেখা ও রঙের উপরে আজিও কবির অসামান্য অধিকার। অনবদ্য শিল্পমূর্ত্তিতে প্রতিটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ কাব্যে কবি প্রধানতঃ চিত্রকর; আর সে চিত্র প্রায়ই শান্ত সৌন্দর্য্যের চিত্র। প্রকৃতি ও জীবনের বিক্ষোভে নহে, আলোড়ন নহে, তাহাদের সহজ শান্ত গতিভঙ্গী রূপায়িত হইয়াছে তুলির টানে টানে। সকলেরই সহিত কবির মনের যোগ, স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতা।

"একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
...নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা এক সারি।
...ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম,
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।"

"এই সব উপেক্ষিত ছবি"ও আজ মহামূল্য হইয়া উঠিয়াছে কবির চোখে।

পৃথিবীর রূপে রসে বিভোর তাঁহার মন। "শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী" তিনি নহেন, তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী, কাল-দেবতার "তপোভঙ্গদূত"। অসীমের চিহ্ন-আঁকা রঙীন মুহূর্ত্তগুলি ফুলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে তাঁহার কাব্যে।

*   *   *

শুধু ছবিই নয়, তাহার সহিত মিলিয়াছে ভাবুকতা। জ্ঞান ও কল্পনার সুন্দর সমন্বয় প্রকৃতির মর্ম্মকথাকে বিজ্ঞানীর মত করিয়া তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই, অনুভূতিদ্বারা সরস করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রাণময়ী ধরিত্রী তৃণে পুষ্পে হাসিয়া ওঠে; সূর্য্য হইতে সে আহরণ করে প্রাণবীজ।

"পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেক্ষেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।"

মুগ্ধ মন ভাষা খুঁজিয়া পায় না প্রকাশের।

"ভাষা নাই, ভাষা নাই,
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন আকাশে।

অদ্ভুত এই সৃষ্টি,—অদ্ভুত জীবন। "আকাশে আকাশে সূর্য চন্দ্র তারা ল'য়ে আতসবাজির খেলা" চলিয়াছে, কবির জীবনও একটি

---

* "আরোগ্য"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ ও ৪৲।

"অগ্নিকণা"। যেমনি কবি "প্রস্থানের অঙ্কে" আসিলেন, "দীপশিখা ম্লান" হইয়া আসিল,—"ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ।" এমনি করিয়া যুগে যুগে কত জীবন, কত অগ্নিশিখা নিবিয়া গিয়াছে।

"দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি'
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।"

ধ্বংসে ও সৃষ্টিতে, রূপে রূপান্তরে চলিয়াছে নটরাজের নৃত্যলীলা।

"চির নূতনের অভিষেক চিরপুরাতন বেদীতলে।"

* * *

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনেক সময়ে শোনা যায়, যে, তিনি শুধু অভিজাত-সমাজের কবি, জনগণের সহিত তাঁহার কাব্যের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ কথা কেবল বুলি-বিলাসীদের মুখেই শোভা পায়, রসজ্ঞ দৃষ্টিমান্ পাঠক কখনই এ অভিযোগ করিবেন না।

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে' থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

* * *

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে।

* * *

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।"

কৃষক-শ্রমিকের এমন প্রশস্তি গাথা এদেশের অতি আধুনিক তরুণ কবিদের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

* * *

শেষের কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে ধ্যানী দৃষ্টি। পূর্ব্বগ্রন্থের অনেক কবিতার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। আর পৃথিবীর বিচিত্র ছবির মালা নয়, এখানে দেখি যুগযুগান্তরের পথের আভাস, পরম সত্যের জ্যোতির্লেখা।

"ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যায় খুলি'
প্রহরের কর্ম্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি, পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার আলোকের সাগর সংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে।
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।"

কবির জীবনেও "ধীরে সন্ধ্যা আসে"; তিনিও প্রস্তুত "গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয় করিতে মগন।"

"ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এলো,
বিদায়-দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্ভ সূর্যাস্ত আভার,
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক্ স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক্ মৌন পল্লব সম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।"

কুহেলিকা ছিন্ন করিয়া সত্যের অমৃত রূপ দর্শনের জন্য তিনি উৎসুক। ধূলিজাল যেন হৃদয়কে ঘিরিয়া না থাকে।

"এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক্ বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুদ্রতার স্তব্ধ উর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি।"

নিত্যের শান্তিরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে কবির ধ্যাননেত্রে, জীবন-মরণ, ধরণী ও আকাশ মধুময় হইয়া উঠিয়াছে সত্যের অমৃতদীপ্তিতে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র ও নাৎসি-বাদ

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের গত অধিবেশনে এক জন বক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উক্তি প'ড়ে প্রশংসা-সূচক হাততালি পেয়েছিলেন। সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার অন্তর্গত "ভারত কলঙ্ক" প্রবন্ধ থেকে সেই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করছি।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে, অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না-হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে-জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

'মঙ্গল' ও 'অমঙ্গল' শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থের আলোচনা এখানে করব না; কোনো জা'তের প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গলে অন্য কোনো জা'তের প্রকৃত অমঙ্গল বা মঙ্গল হ'তে পারে কি না, তার বিচারও করব না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সব কথা লিখেছিলেন, তখন নাৎসি-মতের উদ্ভব হয় নি, কিন্তু তারি সমতুল্য উৎকট ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ (স্বাজাতিকতা) ছিল। তিনি যদি শুধু ঐ কথাগুলোই লিখতেন তা হলে তাঁকে নাৎসি-বাদের সমর্থক বললে অন্যায় হ'ত না; কারণ, নাৎসিরাও পরের দেশ অধিকার ক'রে, পরের দেশ লুট ক'রে নিজেরা ধনী, সুখী, বড় হ'তে চায়, অন্য জা'তকে পদানত ক'রে নিজেরা প্রভু হ'তে চায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির ঠিক্ পরেই বঙ্কিম আরো কিছু লিখেছেন—সেগুলি বক্তা কৃষ্ণনগরে সভাস্থলে প'ড়ে দেন নি;—দিলে বোধ করি শ্রোতারা হাততালি দিতেন না। সে কথাগুলি এই :—

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল; পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে; বহু-লোক-ক্ষয়কারী 'সক্সেসন-যুদ্ধ' এই সামাজিক চিত্ত-বিকারের ফল। গত বর্ষের ভয়ঙ্কর ফরাসী-প্রুসীয় যুদ্ধ এই বিষবৃক্ষে জন্মিয়াছিল। অদ্যাপি ইউরোপে অনেক কুসংস্কার এই বিষবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতেছে। যথা—'প্রোটেকশন'।

(উপরে উদ্ধৃত অংশ দুটি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ১৯-২০ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া।)

বঙ্কিমচন্দ্র এখন জীবিত থাকলে দৃষ্টান্তস্বরূপ হিটলারের দুরাকাঙ্ক্ষারও উল্লেখ করতেন।

বঙ্গদর্শন ভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্বেও তিনি এই বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন এবং আরো স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন।

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়; অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বাস্তবিক জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বা স্বজনপ্রীতির বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত্ত চোরের উদাহরণ দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যের করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না, কোন সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পরসমাজের অনিষ্ট-সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয়দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় patriotism (পেট্রিয়টিজ্‌ম্) ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় patriotism নহে। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ স্বদেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ, ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠা।)

এখানেও 'ইষ্ট' ও 'অনিষ্ট' শব্দ দুটির অর্থের বিচার ইত্যাদি আলোচনা করলাম না।

বঙ্কিম যে বলছেন, "জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে," ইহা বর্তমান সময়ে অনুধাবনযোগ্য।

—

কে কে "বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন"

ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী বঙ্কিমচন্দ্রের **বঙ্গদর্শন** পুনর্মুদ্রিত করায় তাঁর এমন কোন কোন ছোট লেখা চোখে পড়ছে যার অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। এই জন্যে উক্ত কোম্পানীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি চার বৎসর বঙ্গদর্শন চালিয়ে চতুর্থ বৎসরের শেষ সংখ্যার শেষে "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" লিখেছিলেন। তার গোড়ায় অন্য কিছু লেখে তিনি বলছেন :—

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ।

এর পর তিনি লিখছেন :

তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে।

এখানে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। শেষে বঙ্কিম লিখছেন :—

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রেই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন; অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না। কিন্তু এক্ষণ গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ: বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এই রূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান এবং যথার্থবাদী ভারত সংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

"সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট" বঙ্কিম যে রকম কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, প্রত্যেক সম্পাদক তা অনুভব করেন; কেন না "সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে" কোন সম্পাদকই তাঁর পত্রিকা চালাতে পারেন না। "কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই" কাগজ চালান যায়—বিশেষতঃ মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র। সুতরাং তাঁদের কাছেও সম্পাদকদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ।" অন্য মাসিকগুলির কথা আমরা বলতে পারি না, যদিও ছোট বড় যত মাসিক আমরা দেখি সবগুলিতেই এমন কিছু থাকে যা পড়বার যোগ্য এবং যার জন্যে সেগুলি উৎসাহ পাবার যোগ্য;—আমরা কেবল "প্রবাসী"র কথাই এখানে বলব। অবশ্য বঙ্গদর্শনের সঙ্গে "প্রবাসী"র তুলনা করবার কোন অভিপ্রায় থেকে যে তা বলব এমন নয়, "প্রবাসী"র কথাই অধিক জানি ব'লে বলব। "প্রবাসী"কে যে-কাগজ যখন উৎসাহিত করেছেন, তাকে শত শত ধন্যবাদ। কিন্তু এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে "একটি স্পর্দ্ধার কথা" বলেছেন, "প্রবাসী" তা বলতে পারে না। বঙ্কিম লিখেছেন, "উচ্চ শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন।" এ কথা বলা যায় না যে "উচ্চ শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই" প্রবাসীর "অনুকূল"; বস্তুতঃ, হয়ত এই কথা বললেই অনেকটা ঠিক্ বলা হবে যে, উচ্চ বা নিম্ন সব শ্রেণীর "সম্বাদপত্র মাত্রই" "প্রবাসী" সম্বন্ধে সাধারণতঃ কেহ বা নির্বাক্ কেহ বা প্রায় নির্বাক্। বঙ্কিম তার পর বলেছেন, "অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্ন শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন।" আমাদের এ "স্পর্দ্ধা" করবারও জো নাই, যদিও প্রতিকূলতার দৃষ্টান্ত আগেও পাওয়া যেত মাসিক পত্রিকা মহলে, এখনও সেখানে পাওয়া যায়—ব্যাধিরূপে। কিন্তু পত্রিকাগুলিকে উচ্চ ও নিম্ন দুটা শ্রেণীতে ভাগ করবার যে অধিকার অসাধারণ-প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তার দাবী আমরা করতে পারি না।

এ প্রশ্ন হ'তে পারে যে, "বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে তখনকার

খবরের কাগজগুলি যা করত, কেন মনে কর যে প্রবাসী সম্বন্ধে তা এখনকার কাগজগুলির করা উচিত ?" আগেই বলেছি, বঙ্গদর্শনের সঙ্গে প্রবাসীর তুলনা করা আমাদের অভিপ্রেত নয় ; সেই কথাই আবার বলে প্রশ্নটার একটা উত্তর দিচ্ছি। বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিম ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখক, আর এখনকার কালে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ লেখক। বঙ্কিমের রচনাবলী বেরত বলে যদি তখনকার কালে বঙ্গদর্শন সকলের আলোচনার যোগ্য ছিল, তা হলে যে মাসিকে রবীন্দ্রনাথের সকলের চেয়ে বেশী রচনা চল্লিশ বৎসর ধরে বেরিয়েছে এবং এখনও বেরচ্ছে, তা কেন আলোচনার যোগ্য হবে না ?

রবীন্দ্রনাথের রচনা কোন্ কোন্ কাগজে বেরচ্ছে, সংবাদপত্রগুলি তার উল্লেখ বা আলোচনা না-করলে তাতে তাঁর কৃতিত্বের ও যশের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না ; কিন্তু সাধারণ পাঠকরা তাঁর নবতম রচনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবার এবং তার দ্বারা আনন্দিত ও উপকৃত হবার যথেষ্ট সুযোগ পান না।

আমরা যে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নাম কচ্ছি তার মানে এ নয় যে, "প্রবাসী"তে প্রকাশিত অন্য সকল লেখকের ও সম্পাদকের লেখার কোন মূল্য নাই। রবীন্দ্রনাথের লেখার উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে, তিনি জগদ্বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্বভাষাভাষীরা তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা আবশ্যক মনে করেছেন। তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা খুব দরকার কিন্তু তাঁর নবতম রচনার খবর রাখা ও দেওয়া খুব অনুচিত, এ-রকম ধারণা অসঙ্গত। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, শুধু এসোসিয়েটেড প্রেস ও য়ুনাইটেড প্রেসের মারফৎ প্রচারিত তাঁর বাণীগুলিই যে আলোচনার যোগ্য তা নয়, তাঁর উপন্যাস নাটক গল্প প্রবন্ধ কবিতা গান ভাষণ পত্রাবলী কথাবার্তা ইত্যাদি তার চেয়ে অনেক বেশী অনুধাবনের ও আলোচনার যোগ্য। তাঁর এই সকল রকম অনেক লেখাই "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আমরা "প্রবাসী"র কথা বেশি করে জানি বলে তার কথাই এ-পর্যন্ত বলেছি। কিন্তু বাস্তবিক আজকালকার সংবাদপত্রগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন, শুধু "প্রবাসী"কে নয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমস্থলও আছে। যে মাসিকের পক্ষ থেকে তদ্বিরতাগিদাদি হয়ে থাকে, খবরের কাগজে তার কোন কোন বা অনেক সংখ্যার উল্লেখ হয়। নতুবা উপেক্ষাটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এ-বিষয়ে আমাদের আরো যা বলবার আছে, তার কিছু পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি। দৈনিক মশায়রা মাসিকগুলিকে বাস্তবিক মনে মনে উপেক্ষা করেন না। অনুকরণ সমাদরের অকপটতম বাহ্য লক্ষণ। দৈনিকদের বাহ্য ব্যবহার যেমনই হোক, তাঁরা মাসিকগুলির মনোরঞ্জক ও আবশ্যক বিশেষত্ব অনেকগুলি স্বাঙ্গীকৃত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সব কাগজের কাছ থেকে সহৃদয়তা, বল ও উৎসাহ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি ছিল ইংরেজি— ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর, ইণ্ডিয়ান মিরর ও হিন্দু পেট্রিয়ট। তখনকার মত এখনও "ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না।" সেই জন্যে, ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর যে বঙ্গদর্শনের সহায়তা করতেন, এটি তাঁর খুবই প্রশংসার কথা। দেশী ইণ্ডিয়ান মিরর ও হিন্দু পেট্রিয়ট এ বিষয়ে যা করতেন, এখনকার কোনো ইংরেজি কাগজই, শুধু "প্রবাসী"র জন্যে নয়, কোন মাসিকের জন্যই তা করেন না, "প্রবাসী"র জন্যে ত মোটেই নয়। মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত অন্য কোন কোন মাসিকের সম্বন্ধে তাঁদের দু-চার কথা ছেপে দেওয়া ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বাংলা অনেকগুলি সম্বাদপত্রকেই ধন্যবাদ দিয়েছেন। এঁরা আলোচ্য বিষয়ে এখনকার সম্বাদপত্রগুলির চেয়ে ন্যায়বান্ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, ইণ্ডিয়ান মিররের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের অনেক গুরুতর বিষয়ে মতভেদ ছিল, তা সত্ত্বেও মিরর তাঁকে বল প্রদান করতেন। আজকালকার দিনে মতভেদ সত্ত্বেও এমন "বলপ্রদান" কল্পনাই করা যায় না। মতভেদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক ও সমাজবিষয়ক মতভেদ থাকা বিচিত্র নয় ; কারণ ইণ্ডিয়ান মিরর তখন ব্রাহ্মদের কাগজ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। আর তিনি যে ভারত-সংস্কারককে নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান ও যথার্থবাদী বলেছেন, সেই কাগজটিও ছিল ব্রাহ্মদের এবং তার অধ্যক্ষ ছিলেন ভক্ত ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত। তখনকার 'উচ্চ শ্রেণীর' খবরের কাগজের সম্পাদকদের মতিগতি কর্তব্যবোধ বোধ করি এখনকার অনেক সম্পাদকদের থেকে ভিন্ন রকমের ছিল। যাঁরা মতভেদ সত্ত্বেও সমদর্শী ছিলেন, তাঁরা ধর্মবিষয়ক ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন।

—

সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র

অনেক দিন আগে চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়াতে বিলাতী অনেক সাময়িক পত্র সম্বন্ধে পড়েছিলাম, তাতে

"critical comments on public events and literature" ("সার্বজনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ও সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য") থাকে। সে রকম মন্তব্য বাংলা কোন মাসিকেই বেরোয় না, এমন নয়। ঐ মহাকোষে তার পর আছে:

Their sales are not large but they are influential, and these publications are much quoted in the Press." —(Article PERIODICALS, *Chambers's Encyclopaedia*, Vol. VIII, p. 23)

তাৎপর্য। তাদের বিক্রী বেশী নয় কিন্তু তারা প্রভাবশালী এবং খবরের কাগজে তাদের থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত হয়।.

সাময়িক পত্রসমূহ সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলির তুষ্ণীভাব দেখে মনে হতে পারে যে, তাঁদের বিবেচনায় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথেরও কোন মন্তব্য উদ্ধার ও আলোচনার যোগ্য নয়। আমাদের কিন্তু ধারণা এই যে, ছোট ছোট কাগজেও এমন অনেক জিনিস থাকে যা জ্ঞানগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ ও আলোচনার যোগ্য।

বঙ্কিম লিখেছেন, "আমি একদিনের তরেও ব্যক্তি-বিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই।" তিনি যদি তা না লিখতেন তা হলেও কেও কল্পনা করতে পারত না যে, তিনি ধরনা দিয়ে তদ্বিরতাগিদ করে কতকগুলি সম্পাদকের কাছ থেকে সহৃদয়তা, উৎসাহ ও বল আদায় করেছেন। তাঁর আত্মসম্মান তাঁর কাছে যেমন মূল্যবান ছিল, ক্ষুদ্রতর সম্পাদকদের ও লেখকদের আত্মসম্মানও তাঁদের নিজের নিজের কাছে সেইরূপ মূল্যবান।

খবরের কাগজগুলি যদি বিনা তদ্বিরে বিনা তাগিদে সাময়িক পত্রসমূহের, এবং পুস্তকসমূহেরও, সমালোচনা একটি নিয়মিত কর্তব্য মনে করেন, তা হলে সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের ও গ্রন্থকারদের আত্মসম্মান বজায় থাকে, তদ্বির-তাগিদের পঙ্কতিলক তাঁদের কপালে পড়ে না। এটা যে একটা কর্তব্য বলে গণ্য হতে পারে, তা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাক্যকে উপলক্ষ্য করে বলছি।

বঙ্গদর্শনকে "আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন"

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র "পত্র সূচনা"য় লিখেছিলেন:—

এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্।

বার্তার একটি অর্থ সংবাদ, খবর। বার্তাবহ মানে যে খবর নিয়ে যায় বা এনে দেয়। সাধারণতঃ খবর বলতে বাইরের খবরই বুঝায়; যেমন যুদ্ধসংবাদ, আদালতের নানা রকম মোকদ্দমার খবর, সত্যাগ্রহ সংবাদ, 'ছাত্র-সংবাদ', দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর, নেতা-উপনেতাদের দেড়গজী বিবৃতি, সভাসমিতির বৃত্তান্ত, ইত্যাদি। যা ঘটে, তা-ই খবর। কিন্তু বাইরে যা ঘটে, তা-ই একমাত্র ঘটনা নয়। মানুষের অন্তরে যা ঘটে, তাও ঘটনা। সুতরাং তার বিবৃতিও খবর। বঙ্কিমচন্দ্র এই রকম খবর দেবার জন্যে বঙ্গদর্শনকে বার্তাবহ রূপে ব্যবহার করতে বাঙালি কৃতবিদ্য সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেছিলেন। নূতন চিন্তা, নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত, নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ, নবকল্পিত সৌন্দর্য—শ্রেয় ও শোভন যা কিছু মানুষের মনে উদিত হয়, সমস্তই এই রকম খবর। তার থেকে সমাজের চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। (বোধ হয়, আজকাল যাকে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলা হয়, তাকে বঙ্গদর্শনে 'চিত্তোৎকর্ষ' নাম দেওয়া হয়েছিল।)

বাংলা ছোট ছোট সাময়িক পত্রেও, ছোট ছোট বইয়েতেও মানুষের অন্তরের এই রকম নানা খবর পাওয়া যায়। সেই জন্যে খবরের কাগজে যেমন বাইরের খবর থাকে, সেই রকম মনোরাজ্যের এই সব খবরও থাকলে তবে কাগজগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়।

যুদ্ধের কথা

এ পর্যন্ত যুদ্ধ চলছিল তিনটা মহাদেশে—ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া। আজ ২২শে আষাঢ়ের দৈনিক কাগজে দেখছি দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু আর ইকোয়েডর দেশ দুটার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। মানুষ যে-যে দেশে বিপন্ন হচ্ছে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

যুদ্ধসম্বন্ধীয় খবরের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সংবাদই সান্ত্বনা-দায়ক। একটি ভূখণ্ড থেকে সেই রকম সংবাদ এসেছে। আবিসীনিয়ায় ইটালীর যত সৈন্য এখনও ছিল তারা হা'র মেনে আত্মসমর্পণ করায় সেখানকার যুদ্ধ থেমে গেছে। আপাততঃ ঐ দেশের সম্রাট্ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। যত দিন আর কোন শত্রু তাঁর দেশ আক্রমণ না করে, তত দিন তিনি হাবসীদেরকে সাধারণ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, কাঁচামাল থেকে দরকারী নানান জিনিস তৈরি করবার শিল্প শিক্ষা

নয়ে দেশটিকে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী ক'রে তুললে তবে শান্তির সময়টির সদ্ব্যবহার হবে।

জার্মেনীর রাশিয়া আক্রমণ একটা খুব জবর খবর। কে হারছে, কে জিতছে, কে এগোচ্ছে, কে পিছোচ্ছে, কে শত্রু পক্ষের কত মানুষকে মেরে ফেলেছে, জখম করেছে, কত অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করেছে দখল করেছে—এর পরস্পর বিরোধী খবর আসছে। তা যদি না-ও আস্‌ত, তা হলেও মাসিক কাগজে কোন খবর দেওয়া পণ্ডশ্রম হ'ত;—কেন-না রোজ রোজ, এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

জার্মেনী হারবে কি রাশিয়া হারবে, তাই নিয়ে কল্পনা জল্পনা সর্বত্র চলছে। ঠিক্‌ কিছু ত বলা যায় না। তবে, নানা কারণে মনে হয় শেষ পর্যন্ত জার্মেনীকে হেরে হটে আসতে হবে। রাশিয়া ত ছোট দেশ নয়, যে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গিয়ে দেশটার সব অংশকে কাবু করে ফেলা যাবে। কোন কোন অংশ দখল করলেও আরও বিস্তর অংশ বাকী থাকবে;—যেমন চীনে হয়েছে। আবার জার্মেনী যত বেশী রাশিয়ার ভিতরে এগিয়ে যাবে সে ততই নিজের দেশ থেকে দূরে গিয়ে পড়ায় সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র জিনিসপত্র আনবার অসুবিধা বোধ করবে। এগিয়ে যত যাবে, পেছন থেকে খণ্ডযুদ্ধ (guerilla warfare) চালাবার তত সুযোগ রাশিয়ানরা পাবে।

রাশিয়ার জিতবার সম্ভাবনার আর একটা বড় কারণ আছে। জার্মেনী অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করায়, সে রাশিয়া আক্রমণ করবার আগেই তার সৈন্য মরেছে জখম হয়েছে বিস্তর, অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট হয়েছে খুব বেশী, অর্থের ও খাদ্যের পুঁজি ঢের খরচ হয়ে গেছে, সৈন্যেরা যুদ্ধক্লান্ত হয়েছে; অন্য দিকে রাশিয়ার ঠিক্‌ সে রকম কিছু অবস্থা এখনও হয় নি। সৈন্যেরা তাজা আছে, আর্থিক অবস্থা ভাল আছে, খাদ্য অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম ঠিক্‌ আছে। জার্মেনীর যে-সব জায়গার কারখানায় যুদ্ধের সব উপকরণ তৈরি হয়, ইংরেজদের বোমারু এরোপ্লেন তার অনেকগুলোতে বোমা ফেলে সেগুলোকে প্রায় অকেজো করে তুলছে; নষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিষ-পত্রর জায়গায় নূতন কিছু তৈরি করবার সুবিধা কমছে। রাশিয়ার এ অবস্থা এখনও হয় নি।

রাশিয়াকে জার্মেনী ছাড়া কোন বড় শক্তিশালী দেশ এখনও আক্রমণ করে নি—অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ইত্যাদি যদিও করেছে বটে। অন্য দিকে, জার্মেনীর অতি প্রবল শত্রু এখনই ত রয়েছে দুটা—ব্রিটেন আর রাশিয়া। যদি আমেরিকা যুদ্ধে নামে, তা হলে অতি প্রবল অতি সমৃদ্ধ খুব তাজা আর একটা শত্রু তার বাড়বে। অবশ্য জাপান জার্মেনীর পক্ষ নিয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করতে পারে বটে—রুশ-জাপান চুক্তিটাতে আটকাবে না; কিন্তু জাপানও চার বৎসর ধ'রে চীনের সঙ্গে লড়াই ক'রে এখন খুব ফুর্তিতে নাই। তার আর্থিক অবস্থাটা উদ্বেগজনক। তা ছাড়া, জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগলে চীন রাশিয়ার সহায় হবে। চীনের অধিকাংশ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ আছে, লোক-বলও অফুরন্ত।

ব্যক্তিগত ভাবে সব দেশেই এমন মানুষ ছিল, এখনও আছে, যাদের বন্ধুত্ব কোন বিপদ কোন প্রলোভন কোন চিত্তবিকার নষ্ট করতে পারে নি, পারবে না। মানুষের প্রকৃতির এটি একটি মহৎ ও আশাপ্রদ অংশ। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে আমরা যাদেরকে এক একটা জা'ত বা নেশ্যন বলি, তাদের সন্ধি চুক্তি বন্ধুত্ব ঠুনকো জিনিস—এই আছে এই নাই।—"বড়র পিরীতি বালীর বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"—এই কথা ভাবলে জা'ত হিসাবে বন্ধুত্বের গৌরব করবার মানুষের কিছু থাকে না। এই ত সে দিন জার্মেনী রাশিয়ার সঙ্গে দশ বৎসরের জন্যে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল, যা তার পর আরো পাঁচ বৎসরের জন্যে হ'তে পারবার সর্ত ছিল। সেটা ক-মাস টিক্‌ল? এই চুক্তিটা করবার সময় দুই পক্ষেরই এরূপ মৎলব ছিল কিনা কে জানে যে, সুযোগ পেলেই দেব বন্ধুর গলায় ছুরি বসিয়ে; কিন্তু হিটলারের যে ছিল তা মনে করবার কিছু কারণ পাওয়া যাচ্ছে।

স্টালিন ও মাৎসুওকা যে নাটকীয় ভঙ্গীতে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়েছিল, সেই কণ্ঠাশ্লেষটা কুস্তির প্যাঁচ কিনা বুঝ্‌তে হয়ত দেরি হবে না।

রাশিয়ার সঙ্গে যে ব্রিটেনের আপাততঃ মিতালি হয়েছে, তাতে আমাদের কোন দুঃখ হয় নি; বরং সেটা ভালই লেগেছে। ইংলণ্ডকে যারা ভাল বাসে না এ রকম ইউরোপীয় জা'তদের মধ্যে একটা শ্লেষ প্রচলিত আছে যে, ইংলণ্ড অন্যকে দিয়ে নিজের যুদ্ধ করিয়ে নেয়। বর্তমান যুদ্ধে ইংরেজরা খুবই স্বদেশপ্রীতি, সাহস, সহিষ্ণুতা, যুদ্ধনৈপুণ্য দেখাচ্ছে। সুতরাং ঐ অপবাদটা অন্ততঃ এবার তাকে দেওয়া চলে না। কিন্তু ইংরেজদের দূত বরাবর মস্কোতে স্টালিনকে স্বপক্ষভুক্ত করবার চেষ্টায় ছিল। আর, গত এপ্রিলে লেখা মে মাসের একটি

আমেরিকান্ মাসিকে দেখছি, আমেরিকায় রাশিয়াকে নিজের দলে আনা উচিত কিনা সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলছিল। ব্রিটেন আমেরিকার মারফৎও রাশিয়াকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছিল কি না কে জানে। হয়ত হিটলার ইংরেজদের ও আমেরিকানদের এই সব পাঁয়তারা দেখে আক্রমণটা নিজেই আগে করে ফেলেছে। এসব অনুমান মাত্র।

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার সাম্প্রতিক মিতালি অনেক পুরন কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। তেত্রিশ বৎসর আগে ১৯০৮ সালের মে মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে "যদি রাশিয়া ভারত-শাসন করৃত" এই নামের একটা প্রবন্ধ ছেপেছিলাম। সেটা লিখেছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় এখন স্বর্গত বামনদাস বসু মহাশয়। তাতে আমাদেরও হাত ছিল। আমরা তাতে বলি নি যে, রাশিয়ার অধীনতা ভারতবর্ষের কাম্য; কারণ আমরা তখনও ছিলাম ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতাকামী। প্রবন্ধটাতে শুধু কিছু তুলনা, কিছু জল্পনা-কল্পনা ছিল। তার জন্যেই কিন্তু মডার্ন রিভিয়ুকে কর্তৃপক্ষের 'বিরাগ-ভাজন' হতে হয়েছিল।

এ অনেক আগেকার কথা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কম্যুনিস্টমতাবলম্বী ব'লে ভারতের কত লোক কারারুদ্ধ হয়েছে। এখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বাস্তব কম্যুনিস্টদের বন্ধু। এখন 'বাক্যে কম্যুনিস্ট' এদেশী লোকদের মুক্তি হ'লেই শোভন হয়।

প্রধান সেনাপতি অদলবদল

ভারতবর্ষের যিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি অল্প দিন কাজ ক'রেই অন্যত্র বদলি হলেন। তাঁর জায়গায় এলেন জেনারাল ওএভেল, যিনি উত্তর-আফ্রিকার ও সীরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হয়েছেন। সেনাপতি অকিনলেকের পরিবর্তে তাঁকে আনাতে তার কারণ সম্বন্ধে নানা অনুমান হয়েছে। এই একটা অনুমান খুব প্রবল যে, জার্মেনী রাশিয়া আক্রমণ করে ককেসাসের পথে ভারত আক্রমণও করতে পারে—রাশিয়াকে হারিয়ে দিতে পারলে ত নিশ্চয়ই করবে। সেনাপতি ওএভেল রাশিয়ার ভাষা জানেন, আফগানিস্থান ইরান ও ভারতবর্ষে আসবার অন্যান্য পথ ঘাট তাঁর জানা আছে। সেই জন্যে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হ'লে আক্রমণ প্রতিহত ক'রে ভারতরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাঁকে আনা হয়েছে। এই অনুমান সত্য হতে পারে। সেনাপতি অকিনলেক ভারতরক্ষা বিষয়ে পরামর্শদাতা কমীটি গঠনের পরিকল্পনা ও তার সূত্রপাত করেছিলেন; সব প্রদেশ থেকে অল্প অল্প সিপাহী সংগ্রহও তিনি আরম্ভ করেছিলেন। নূতন প্রধান সেনাপতি যদি এই দু-দিকে আরও ব্যাপক কাজ করেন তা হলে বোঝা যাবে তিনি কেবল বড় সেনানায়ক নন, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ও বটেন।

দুঃসংবাদের প্রাচুর্যে মনে ঘাঁটা পড়া

যখন স্নেহলতা কেরোসীনসিক্ত শাড়ীতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন, তখন দেশের লোক এই ভীষণ সংবাদে শিউরে উঠেছিল। তার পর নির্লজ্জ লোভী বরের বাপমাদের ও বরদের অনুসৃত রাক্ষসী প্রথার প্রভাবে কত স্নেহলতার প্রাণ গেছে, কিন্তু তাতে কারো চোখ ঝাপসা হয় নি। হৃদয়ে ঘাঁটা পড়ে গেছে। হৃদয় অসাড় হয়ে গেছে। আত্মঘাতিনী বালিকাদের মর্মবেদনা ও দৈহিক যন্ত্রণা আমরা অনুভবই করতে পারি না।

দীর্ঘ অনেক বৎসর ধরে বীভৎস নিদারুণ নারীনিগ্রহের খবর পড়ে পড়ে পাঠকরা এখন আর তাতে বিচলিত হয় না—এমন কি সেই রকম খবর পড়তে অনেকের ভাল লাগে। নির্যাতিতা ও অত্যাচরিতা বালিকা ও নারীদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন সমাজের কানে পৌঁছে কি? তাদের নারীত্বের অপমান, তাদের জীবনের ব্যর্থতা, তাদের আশ্রয়হীনতা ক'জনকে বিচলিত করে?

অনেক বৎসর ধ'রে যুদ্ধের সংবাদ প'ড়ে প'ড়ে এখন আর হৃদয়ে কোন আঘাতই লাগে না। অথচ শান্তির সময়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থায় একটা মানুষ খুন হওয়ার খবরেও মন ব্যথিত হ'ত। আজ পড়লাম, চার বৎসরের চীন-জাপান যুদ্ধে চীনাদের হিসাবে জাপানী হতাহত হয়েছে ষোল লাখ আর জাপানীদের হিসাবে চীনা হতাহত হয়েছে চৌষট্টি লাখ; কিন্তু প'ড়ে মনটা ত কোন আঘাত পেল না। এর আগে পড়েছি, রাশিয়ানরা বলেছে এক লাখ জার্ম্যান মেরেছি জখম করেছি, জার্ম্যানরা বলেছে তিন লাখ রাশিয়ান মেরেছি জখম করেছি। তার আগে, রাশিয়ার রণাঙ্গনে এবং তারও আগে অন্যান্য রণাঙ্গনে রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট নিধন করবার দাবী উভয় পক্ষই করেছে। কিন্তু তাতে কোন পাঠকের অন্নে অরুচি হয় নি, দৈনন্দিন আমোদ প্রমোদের কোন ব্যাঘাত জন্মে নি।

নৃশংস বর্বরেরা যে রকম অনুভূতিশূন্য হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করছে, আমরা ঘরে বসে তাদের নৃশংসতার সংবাদ পড়তে পড়তে সেই রকম অনুভূতিশূন্য হয়ে যাচ্ছি।

কেবল যে যুদ্ধরত সৈন্যদের ও তাদের জা'তের লোকদের অবনতি হচ্ছে, তাদের মধ্যে পাশবতা ও বর্বরতা বাড়ছে, তা নয়; যে সব জা'ত যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাদেরও হৃদয়মন অনুভূতিশূন্য হচ্ছে।

যে-সব জা'ত যুদ্ধ করছে না, যুদ্ধ হওয়ার জন্যে তারা দায়ী নয় বটে। কিন্তু যুদ্ধ প্রথাটাই যে এখনও পৃথিবীতে আছে, সেটা যে এখনও লুপ্ত হয় নি, তার জন্যে যুদ্ধরত ও যুদ্ধে অলিপ্ত সব জা'তের মানুষই দায়ী। যুদ্ধ প্রথাটাকে লুপ্ত করবার জন্যে যে পৃথিবীব্যাপী চেষ্টা হয় নি, তার শাস্তি এই হচ্ছে যে, যোদ্ধা অযোদ্ধা সকলেরই হৃদয় বর্বরীভূত ও অনুভূতিশূন্য হয়ে আসছে। অথচ, হৃদয় বিচলিত বিক্ষুব্ধ হোক বা না-হোক, বুদ্ধি দ্বারা ত আমরা বুঝতে পারছি, যতগুলি মানুষ মারা পড়ছে, তাদের জীবনের আনন্দ-সম্ভাবনা, তাদের দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধনের সম্ভাবনা, শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের মৃত্যুতে কত লক্ষ নরনারী বালক-বালিকা শিশু, কেও পিতা, কেও পুত্র, কেও স্বামী, কেও ভাই, কেহ পালনকর্তা হারিয়ে, অসহায় নিরাশ্রয় গৃহহীন সান্ত্বনাহীন শোকবিহ্বল দিশাহারা হচ্ছে।

এ যে হচ্ছে, তার জন্যে সমগ্র মানবজাতি দায়ী ও দোষী; এবং সেই জন্যে সকলকেই শাস্তি পেতে হচ্ছে।

যুদ্ধ হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে অনেক দূরে। ভারতবর্ষে রক্তপাত হচ্ছে গুণ্ডাদের ও গুণ্ডাপ্রকৃতি লোকদের অতর্কিত আক্রমণে ছোরার ঘায়ে। যুদ্ধে যত মানুষ মরে, এতে তার চেয়ে ঢের কম মানুষ মরছে বটে। কিন্তু যুদ্ধ যতই নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হোক, যত বিশ্বাসঘাতকতাপ্রসূতই হোক, গুণ্ডাদের আক্রমণের চেয়ে যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ এই জন্যে যে, কে যুদ্ধ করাচ্ছে কারা যুদ্ধ করছে জানা আছে, উভয় পক্ষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়ছে; কিন্তু পৈশাচিক কাজে গুণ্ডাদের লাগিয়েছে কে বা কারা, গুণ্ডারাই বা কারা, তা জানা নেই, আর তারা যাদেরকে খুন করছে তারা নিরস্ত্র অবস্থায় হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণ হারাচ্ছে। যুদ্ধের হাজার দোষ থাকলেও তাতে শৌর্য্য থাকতে পারে। কিন্তু গুণ্ডামি জঘন্য কাপুরুষতা, আর গুণ্ডাদের প্ররোচক ও নিযোক্তা যারা তারা নরাধম, পশুর অধম।

—

'অহিংসা' সম্বন্ধে নানা মত

ইউরোপীয় রীতিতে নাম সংক্ষেপ করবার রীতি প্রচলিত হওয়াতে কোন কোন প্রসিদ্ধ লোকের পূরা নামটা জানাই কঠিন। আর যদি সংক্ষেপই করতে হয়, তা হলে দেশী নামের আদ্য অক্ষরগুলো ইংরেজী হবে কেন? পূরা নামটি যদি হয় মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধী, সেটিকে বাংলায় সংক্ষেপে এম্ কে গান্ধী কেন লিখব? সংক্ষিপ্ত করতে হলে লিখব ম ক গান্ধী। কথাটা মনে হ'ল মিঃ কে এম্ মুন্‌শীর নামটি বাংলায় কি লিখব ভাবতে গিয়ে। তাঁর পূরা নামের প্রথম অংশটি কান্‌হাইয়ালাল, 'এম্'টি কি নামের সংক্ষেপ জানি না। শ্রী কে এম্ মুন্‌শী অদ্ভুত খিচুড়ী।

মুন্‌শী মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর মত সর্বদা সর্বত্র সব অবস্থায় অহিংস আচরণ করতে পারবেন না বলে, মহাত্মাজীর পরামর্শ চেয়েছিলেন। মহাত্মাজীর মতে যাঁরা অন্তরে বাইরে পূর্ণমাত্রায় অহিংস হতে থাকতে পারবেন না তাঁদের কংগ্রেস-সভ্য হওয়া বা থাকা উচিত নয়। তাই তিনি মুন্‌শী মহাশয়কে পরামর্শ দেন কংগ্রেসের সভ্যত্বে ইস্তাফা দিতে। তিনি ইস্তফা দিয়েছেন।

আমাদের বোধ হয় কংগ্রেসে আরও বিস্তর লোক আছেন, যাঁরা অন্তরে বাইরে পুরোপুরি অহিংস নন। তবে তাঁরা মহাত্মাজীর পরামর্শ চান নি এই যা প্রভেদ। চেয়ে, পেলে, কি করতেন?

অহিংসা সম্বন্ধে আমাদের মত নানা প্রসঙ্গে অনেক বার লিখেছি; সম্প্রতি আবার সব কথা লিখবার ইচ্ছা নাই।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি বিবৃতিতে বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্যে আবশ্যক হলে তিনি অহিংসা ত্যাগ বৈধ মনে করেন। মালবীয় জী অ-হিন্দু বাক্য বলেন নি।

আমাদের মনে হয়, 'অহিংসা' আর 'হিংসা' শব্দ দুটার ঠিক্ প্রয়োগ অনেক সময় করা হয় না। 'হিংসা'র ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হননের অর্থাৎ মেরে ফেলবার ইচ্ছা। সেই জন্যে অভিধানে এর মানে দেখতে পাই, 'বধ, প্রাণিপীড়া, অন্যের হানি বা তাহা করিবার প্রবৃত্তি।' হবু যদি গবুর বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে আসে, আর গবু যদি ছোরাটা অনায়াসে অল্প আয়াসে বা ধস্তাধস্তি করে হবুর হাত থেকে শুধু কেড়ে নেয়, হবুর বুকে বিঁধিয়ে না দেয়, বা বিঁধিয়ে দিতে না চায়, তবে সে কাজটাকে হিংসা কেন বলা হবে? কি অর্থে বলা হবে? গবু ত হবুকে বধ করতে চায় নি, 'হবুপীড়া' করতে চায় নি, হবুর হানি করে নি, করতে চায় নি। সে কেবল আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে, এবং বস্তুতঃ সে হবুকে নরহত্যা পাপ করতে না-দিয়ে তার উপকারই করেছে। সুতরাং এ রকম ক্ষেত্রেও যদি কেও বলেন, গবু অহিংসাধর্ম থেকে চ্যুত

হয়েছে, আমরা তাঁকে ভ্রান্ত বলব, অন্ততঃ এ কথা বলবই যে তিনি শব্দের অপব্যবহার করছেন।

বলপ্রয়োগ আর 'হিংসা' এক জিনিষ নয়। আত্মরক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে, দুর্বলের সাহায্যের ও রক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগে হিংসার লেশমাত্র নাই ততক্ষণ যতক্ষণ না বল যার উপর বা বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা জখম করা বা অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হচ্ছে, কিম্বা সেরূপ অভিপ্রায় সেই বলপ্রয়োগে না থাকছে। আত্মরক্ষার জন্যে, আবশ্যক হলে, আততায়ীকে বধ করা পর্যন্ত আমরা অবৈধ মনে করি না। তবে এ কথা ঠিক যে, কেও যদি আক্রান্ত হ'লেও, আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক সাহস ও শক্তি থাকা সত্বেও এবং আততায়ীকে বধ করা ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় না থাকলেও, বরং নিজের প্রাণ দেন তবু আততায়ীর প্রাণবধ করেন না, বা করতে চান না, তাঁর সাত্বিকতা স্বীকার করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে করুন যদি কোন দুর্বৃত্ত কোন নারীর সতীত্ব নাশ করবার উপক্রম করে, এবং তাকে বধ করা ছাড়া সেই দুষ্কর্মে বাধা দেবার অন্য উপায় না থাকে, তা হলে তাকে বধ করা বৈধ এবং বধ না করাই অধর্ম এবং তার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দেওয়া অহিংসা নয়, ঘৃণ্য কাপুরুষতা।

ইংরেজি ভায়োলেন্স আর নন্-ভায়োলেন্স শব্দ দুটির প্রতিশব্দ রূপে হিংসা অহিংসা ব্যবহার করাতেও কোন কোন স্থলে ভ্রান্তির কারণ ঘটে। ভায়োলেন্স বলতে কখন শুধু বল (ফোর্স) বা সজোরে বলপ্রয়োগ বুঝায়—সেটা বৈধ কি অবৈধ তা বলা বা মনে করা হয় না, আবার কখন কখন অতিমাত্র বা অবৈধ বলপ্রয়োগকে বলে ভায়োলেন্স। শেষোক্ত অর্থে শব্দটার ব্যবহারই অনেক স্থলেই করা হয়। নন-ভায়োলেন্স মাত্রেই অহিংসা নয়।

আমাদের মত যা তা সংক্ষেপে বললাম। আর একটা কথাও বলা দরকার। আমরা যদিও মনে করি যে, দুর্বৃত্তদের হিংসা সদ্য সদ্য ব্যর্থ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ, এমন কি হননও আবশ্যক হতে পারে, তা হলেও আমাদের বিশ্বাস শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা, শুধু হিংসার দ্বারা, হিংসা (অর্থাৎ অপরকে বধ করবার বা অপরের অনিষ্ট করবার প্রবৃত্তি) নির্মূল করা যেতে পারে না। বলপ্রয়োগ দ্বারা দুর্বৃত্তকে হিংসাত্মক কাজ থেকে নিরস্ত ক'রে তার পর তার সঙ্গে সপ্রেম অহিংস সাত্বিক ব্যবহার দ্বারাই তার হিংসাপ্রবৃত্তি নির্মূল হতে পারে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে (মহাভারতে) উপদিষ্ট হয়েছে, "অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্" (অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে); এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও পালি ভাষায় ঠিক্ এর অনুরূপ উপদেশ আছে।

এই হেতু আমরা মহাত্মা গান্ধীর মত পুরোপুরি অহিংস মানুষের অস্তিত্ব আবশ্যক মনে করি, তাঁকে শ্রদ্ধা করি,—উপহাস করি না। এ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে লঘুচিত্ততা গর্হিত।

—

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার কথা

গত মাসে কল্‌কাতায় "পূর্ব্বভারত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন" নামক একটি সভার অধিবেশন হয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দীকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা ব'লে স্বীকার করান ও ও প্রচার করা। ভারতবর্ষের যে-কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করাবার চেষ্টা করবার অধিকার সেই ভাষাভাষীদের এবং অন্যেরও আছে। এর মধ্যে কৌতুকের ও দুঃখের বিষয় কেবল এইটুকু যে, হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে, যেমন বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা করবার কথা তুললেই হিন্দীভাষীরা বলেন, ওটা ওদের প্রাদেশিকতা; কিন্তু হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টা প্রাদেশিকতা নয়! আমরা বলি কোনটাই প্রাদেশিকতা নয়। তোমার নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করাবার যে অধিকার তোমার আছে, আমার নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করাবার অধিকারও আমার ঠিক্ সেই রকম আছে—এক চুলও কম নাই।

আমরা এই প্রসঙ্গে যা কিছু লিখব তা এ আশায় নয় যে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে। তার কোন আশা কে করে? শুধু আলোচনার জন্য লিখছি।

কল্‌কাতায় রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়ে গেল, তার সভাপতি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বক্তারা সবাই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বললেন; কিন্তু যাঁরা ভারতের একটা রাষ্ট্রভাষা চাই এই ধুয়া তুলেছেন, তাঁরা ত হিন্দীর কথা বলেন না। তাঁরা বলেন, হিন্দুস্থানীর কথা। তাঁদের মতে এই হিন্দুস্থানী হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে এবং তাতে আরো কিছু আরবী ফারসী কথার আমদানী ক'রে, তৈরি হবে ও হচ্ছে। সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্ট করে এই কথাটা সভাস্থলে বললে ভাল করতেন। আমরা এই রকম কিছু মন্তব্য জুলাইয়ের মডার্ন রিভিয়ুতে করেছিলাম। তার পর কয়েক দিন পরে বোম্বাই থেকে সেই শহরের কংগ্রেসী দৈনিক বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্ এলে দেখলাম, একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রাজেন্দ্রবাবুর 'হিন্দী' শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি করা হয়েছে এবং তাতে লেখা আছে যে, লক্ষ্ণৌর

ন্যাশন্যাল হেরাল্ডও সেই আপত্তি করেছেন। প্রবন্ধটি থেকে আবশ্যক অংশ তুলে দিচ্ছি। অনুবাদ দিচ্ছি না।

Presiding over a Conference of the Rashtriya Bhasha Prachar Samiti at Calcutta the other day, Dr. Rajendra Prasad is reported to have stated that Hindi was best suited to be the *lingua franca* of India. If he actually said "Hindi" he must have meant Hindustani, because he has had much to do with the recognition of Hindustani as the national language by Congress and various attempts to popularise it. But at a time when misunderstanding and misrepresentation are so common Congress leaders should be scrupulously careful to say "Hindustani" when they refer to the national language. Unfortunately, however, the term "Hindi" is very commonly used in Madras and in several other places by Congress leaders when they mean Hindustani. And this has been misrepresented as evidence of an attempt to impose Hindi on even the Urdu-speaking people while pretending to popularise Hindustani. When the three terms "Hindi," "Urdu" and "Hindustani" are generally admitted to represent three separate languages, sufficiently different to justify the use of separate names, however allied the three may be, it is a grievous mistake on the part of Congressmen to refer to the national language as Hindi.

Commenting on Rajen Babu's speech, the *National Herald* regrets that while "responsible Hindu and Muslim Congress leaders continue to preside over Hindi Sahitya Sammelans and corresponding organisations for the propagation of Urdu, nothing appears to have been done, so far, to create a common platform, which is urgently needed."

বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্‌ বলছেন, 'হিন্দুস্থানী'কে রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করাবার উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান একজন রাজেন্দ্রবাবু। ঐ কাগজে এ কথাও লেখা হয়েছে, এটা সাধারণতঃ স্বীকৃত যে, হিন্দী, উর্দু ও হিন্দুস্থানী যথেষ্ট পৃথক্‌ তিনটি আলাদা ভাষা। এ অবস্থায়, সম্মেলনে রাজেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য কংগ্রেসী বক্তারা 'হিন্দুস্থানী' শব্দটা ব্যবহার না ক'রে 'হিন্দী' শব্দটি ব্যবহার কেন করলেন, তা তাঁরাই বলতে পারবেন।

হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী কত লোকের ভাষা

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, ঐ ভাষাটি ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশী লোকে বলে ও বুঝে। সেইটি যদি একটি প্রধান কারণ হয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, হিন্দুস্থানী নামক যে নূতন (অন্ততঃ আংশিক নূতন) ভাষা গড়বার চেষ্টা হচ্ছে, তা কত জন লোকে বলে ও বুঝে।

হিন্দীভাষীর সংখ্যা সেন্সস রিপোর্টে ও স্টেটসম্যান্স ইয়্যারবুকে যা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এর প্রচারকদের কথিত সংখ্যা মেলে না। তাঁরা কেউ বলেন ১২ কোটি, কেউ ১৫ কোটি, কেউ ২২ কোটি, কেউ বা ২৫ কোটি। সম্প্রতি আজকালের মধ্যে আরো বেশি কেউ বলেছেন কিনা জানি না।

হিন্দীভাষীরা থাকেন প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে ও অঞ্চলে, তাও হিন্দীপ্রচারকদের ঠিক্‌ ক'রে বলা উচিত। তাঁরা বলেন, সারা খাস্‌ বিহারে হিন্দী প্রচলিত। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বিহারের ব্যারিস্টার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ খাস্‌ খাটি বিহারী। তিনি বিহারের ভাষাকে বলেন 'বিহারী', হিন্দী নয়। তাঁর মতে এই বিহারী ভাষার তিনটি শাখা বা উপভাষা আছে—মৈথিলী, ভোজপুরী ও মগাহি। তাঁর মতে বিহারী ভাষা শুধু বিহারের নয়, যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর ও বেনারস ডিবিজনের আটটি জেলারও ভাষা। মৈথিলরা বলেন, তাঁদের ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা;—তা বারাণসী, পাটনা ও কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নিয়েছেন। মৈথিলরা আরো বলেন, তাঁদের ভাষা অন্যূন দু-কোটি লোকে বলে ও বুঝে।

হিন্দীপ্রচারকেরা রাজস্থান ও পঞ্জাবের ভাষাকেও হিন্দীর সামিল করেন। যাদের কোন রাজনৈতিক চরখায় তেল দিতে হয় না, এ রকম ভাষাতত্ত্ববিদেরা কিন্তু রাজস্থানীকে ও পঞ্জাবীকে আলাদা ভাষা বলেন।

মুসলমানেরা দাবী করেন, উর্দুই হচ্ছে আসল ভারতের সব অঞ্চলের যোগাযোগের ভাষা অর্থাৎ লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা এবং কথিত যে ভাষাকে হিন্দী নাম দেওয়া হয়, সেটা বস্তুতঃ উর্দু। কিন্তু উর্দু যে বেশি লোকে বলে না, বুঝে না, তার একটা অকাট্য সাম্প্রতিক প্রমাণ আছে, তা এই:—

উর্দু লেখা হয় ফারসী অক্ষরে, তার বই ছাপা হয় ফারসী অক্ষরে। ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে জনবহুল হিন্দীভাষী, উর্দুভাষী, বা হিন্দুস্থানীভাষী প্রদেশ হচ্ছে আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ। পুস্তকপত্রিকাদি প্রকাশ সম্বন্ধে এই প্রদেশের সর্বাধুনিক রিপোর্টে দেখতে পাই, ১৯৩৯ সালে হিন্দী পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯২টি, আর উর্দু হয়েছিল মাত্র ১৮৪টি। সুতরাং উর্দুর চেয়ে হিন্দী ব্যবহার করে প্রায় দশ গুণ বেশী লোক তাতে সন্দেহ নেই। ইহা স্বাভাবিকও বটে; কারণ, উর্দু অনুপ্রাণনা পায় বিদেশী ফারসী আরবী থেকে, হিন্দী পায় দেশের প্রাচীন ও নূতন ভাষা ও সাহিত্য থেকে, দেশের আকাশ বাতাস জলস্থল থেকে প্রকৃতি থেকে।

কৃত্রিম যে 'হিন্দুস্থানী' ভাষা তৈরি করা হচ্ছে, তা কত লোক ব্যবহার করে, জানবার জো নাই।

মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, খুব বেশী লোকে কোন একটি ভাষা ব্যবহার করে, এই কারণে তাকে যদি

রাষ্ট্রভাষা করতে হয়, তা হলে হিন্দী, উর্দু ও হিন্দুস্থানী এই তিনটির মধ্যে হিন্দীর দাবীই অগ্রগণ্য। কৃত্রিম ভাষা কোন দেশেই রাষ্ট্রভাষা হয় নি, ভারতেও হবে না।

—

হিন্দী ও বাংলা কত লোকে বলে

যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বিহার, ছোটনাগপুর (অন্ততঃ অনেকটা অংশ), ও মধ্যপ্রদেশের একটা ভাগ হিন্দীভাষী ব'লে হিন্দী প্রচারকরা দাবী করেন। তাঁরা যে কারণে ঐ সব অঞ্চলে হিন্দী প্রচলিত বলেন, সেই কারণে বলা যেতে পারে যে, বাংলা দেশ ছাড়া আসামে, মণিপুরে, আরাকানে, উড়িষ্যায়, ছোটনাগপুরের অনেক অংশে, সাঁওতাল পরগণায়, এবং বিহারের কতক অংশে বাংলা প্রচলিত; কিন্তু আমরা বলি না, যে মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমিয়া, মণিপুরী প্রভৃতি ভাষা বাংলা ভাষার সামিল। অথচ এটা নিশ্চিত যে, বাংলার সঙ্গে ঐ ভাষাগুলির যতটা সাদৃশ্য আছে, হিন্দীর সঙ্গে তত সাদৃশ্য থাকলে হিন্দী-প্রচারকরা বলতেন আসামে উড়িষ্যায় মণিপুরে আরাকানে হিন্দী প্রচলিত।

—

বাংলার লিপি ও 'হিন্দুস্থানী'র লিপি

বাংলা লেখা হয় একই রকম অক্ষরে। কংগ্রেসের ফরমাশ এই যে 'হিন্দুস্থানী' নাগরী ও ফারসী দু-রকম অক্ষরেই লিখতে হবে। তাতে কিন্তু শিক্ষার্থীদের ও ব্যবহারকদের পরিশ্রম দ্বিগুণ। শুধু দুটা লিপিতেই নিস্তার নাই। কোন কোন ভাষাবিদ্ বলছেন, 'হিন্দুস্থানী'টা রোমান অক্ষরে লিখলে ভাল হয়। এটা একটা মত হিসাবে যে কতকগুলি লোক বলছেন, শুধু তা-ই নয়। খ্রীষ্টিয়ান মিশনারিরা তাদের অনেক হিন্দী-উর্দু পুস্তক পত্রিকাদি রোমান অক্ষরে ছাপেন, এবং সেনাদলেও হিন্দী-উর্দুর জন্য রোমান অক্ষরের ব্যবহার আছে। এই তিন রকম থেকেও খালাস পাবার জো নেই। লিপিসংস্কারকরা আরও দু-এক রকম লিপি বানাচ্ছেন। সুতরাং হিন্দুস্থানীর লিপিসঙ্কটটা প্রায় বৈদ্যসঙ্কটের কাছাকাছি যাচ্ছে।

—

হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য

আমরা এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের বড়াই করতে যাচ্ছি না। আমরা অন্য একটা সোজা কথা বলতে চাই।

যদি হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করতে হয়, তা হ'লে শিক্ষার্থী, পাঠকপাঠিকা ও ব্যবহারকদের হিন্দুদের লেখা নাগরীতে ছাপা হিন্দী সাহিত্য, প্রধানতঃ মুসলমানদের লেখা ফারসী অক্ষরে ছাপা উর্দু সাহিত্য, এবং কংগ্রেস-ধর্মীদের লেখা দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ বা বিবিধ অক্ষরে ছাপা কৃত্রিম 'হিন্দুস্থানী' সাহিত্য পড়া আবশ্যক হবে।

অন্য দিকে বাংলা কেউ যদি শিখতে পড়তে ব্যবহার করতে চান, তা হলে তাঁর একই রকম লিপিতে ছাপা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান মুসলমানের সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য পড়লেই চলবে।

—

বাংলার এবং হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ

বাংলার ব্যাকরণ হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণের চেয়ে সহজ ও কম জটিল। কেউ কেউ বাজারু হিন্দী বা চালু হিন্দী নাম দিয়ে একটা কৃত্রিম ভাষা চালাবার পক্ষপাতী। সেটা যখন চলবে তখন চলবে, সাহিত্য নামের যোগ্য সাহিত্য তাহার যখন হবে তখন হবে। তার ব্যাকরণ কি রকম হবে, নির্দিষ্ট রূপে কেউ তা লিখলে বললে তবে বিচার হতে পারবে তা বাংলা ব্যাকরণের চেয়ে সোজা হবে কিনা।

—

রাষ্ট্রভাষার মানে

'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তা হয় না। রাষ্ট্রভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ হওয়া উচিত 'স্টেট-ল্যাঙ্গোএজ' ('State language'), লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা নয়। কিন্তু অনেকে স্টেট ল্যাঙ্গোএজ ও লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা দুই অর্থেই রাষ্ট্রভাষা শব্দ ব্যবহার করেন। অথচ যা লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা তা সর্বত্র স্টেট ল্যাঙ্গোএজ না হতেও পারে। ফ্রেঞ্চ দীর্ঘকাল ইয়োরোপের লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা ছিল বা আছে। ইয়োরোপের যে যে দেশের ভাষা ফ্রেঞ্চ নয়, সেখানে বা তার সঙ্গে অনেক কাজ ফ্রেঞ্চের সাহায্যে হ'ত বা হ'তে পারে; কিন্তু ফ্রেঞ্চ কেবল ফ্রান্সের রাষ্ট্রভাষা; অর্থাৎ উহা সেখানকার গবর্মেণ্টের ভাষা, সরকারী ভাষা, আইন আদালতের ভাষা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম, ও সেখানকার লোকদের মাতৃভাষা ত বটেই।

যাঁরা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান, তাঁরা তাঁদের অভিপ্রায়ের সমর্থনে বলেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষাভাষী লোকেরা ঐ ভাষার সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে চিঠি লিখতে ভাবচিন্তা বিনিময়

করতে পারবে,—যা এখন ইংরেজীজানা লোকেরা ইংরেজীর সাহায্যে করে। এটি হচ্ছে লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কার কাজ। কিন্তু হিন্দুস্থানীকে যাঁরা রাষ্ট্রভাষা করতে চান, তাঁরা কি চান যে, এখনকার রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীর জায়গায় ঐটি চল্‌বে? প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী কাজ, আদালতের কাজ, সরকারী আপিসের কাছারির কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার কাজ, ব্যবস্থাপক সভার কাজ হিন্দুস্থানীতে হবে? তা যদি হয়, তা হ'লে রাষ্ট্রভাষা রূপে ঐ ভাষার ব্যবহার দ্বারা প্রাদেশিক কোন ভাষার মর্যাদাহানি বা ক্ষতি হবে না, এই কথা তাঁরা যে বলেন তা সত্যি নয়। আর যদি এই ব্যবস্থা তাঁরা চান যে, প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী সব কাজের ভাষা, শিক্ষার ভাষা, ব্যবস্থাপক সভার ভাষা সেই প্রদেশেরই একমাত্র ভাষা বা প্রধান ভাষাটিই হবে, তাহলে বলতে হবে যে, তাঁরা ভারতবর্ষের সাধারণ একটি রাষ্ট্রভাষা চান না, চান কেবল একটি সাধারণ আন্তঃ-প্রাদেশিক কথাবার্তা ও পত্র-ব্যবহারের ভাষা। কংগ্রেস এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কখনো পরিষ্কার ক'রে সব সন্দেহের নিরসন ক'রে কোন প্রস্তাব ধার্য করেছেন বলে জানি না। মহাত্মা গান্ধীও সে রকম স্পষ্ট কিছু বলেন নি। আমরা অনেক সময় এ বিষয়ে যে-সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, তারও উত্তর কেও দেন নি।

—

"বঙ্গীয় অনাথালয় ও বিধবা-নিবাস তদারক বিল"

আমরা যত দূর জানি, এই বিলটির দ্বারা যে অনিষ্ট হতে পারে তার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী। আমরা এটার সম্বন্ধে প্রথমে যা লিখি, তা ইংরেজী ও বাংলা কয়েকটি দৈনিকে বেরিয়েছিল; কিছু বাড়িয়ে তা আমাদের ইংরেজী মাসিকেও ছেপেছি। লেডী অবলা বসু, সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে এক সাতিশয় জনাকীর্ণ মহিলা ও পুরুষদের সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র জাকারিয়া সাহেব, বর্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, ভূতপূর্ব চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, ব্যারিস্টর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টর শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। এর আগের একটি সভায় শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি এর বিরুদ্ধে ব'লেছিলেন। যাঁরা এর বিরুদ্ধে লিখেছেন ও বলেছেন, সকলেরই মত এই যে, এ রকম বিল অনাবশ্যক এবং এটা আইন হলে এর দ্বারা খুব অনিষ্ট হবে। সেই জন্যে কেও এর কোন সংশোধন চান নি, সবাই এর প্রত্যাহারই চেয়েছেন।

বিলটার নামে যদিও উল্লেখ আছে কেবল অনাথালয় ও বিধবা-নিবাসে, কিন্তু তার হেতুবাদে, ধারাগুলায় এবং উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে এর প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে আনা হয়েছে ঘটকালি প্রতিষ্ঠান, উদ্ধারাশ্রম, নিরাশ্রয়-নিবাস, নারীরক্ষা সমিতি **ইত্যাদি**। এই 'ইত্যাদি'টি আমাদের নয়, বিলটার উদ্দেশ্য বিবৃতিতেই ইংরেজিতে ওটা আছে। অতএব বিলটা বেড়া জাল।

এ উদ্দেশ্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ খাঁটি নয়; তারা অনাথালয়, বিধবা-নিবাস, উদ্ধারাশ্রম ও ঘটকালি প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে পাপ কাযের জন্যে বালিকা সরবরাহ করে। পাপ ব্যবসার জন্যে নারী সংগ্রহ ও বিক্রী দুর্বৃত্ত লোকে অন্য অনেক দেশ-প্রদেশের মত বঙ্গেও করতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের জানা উল্লিখিত কোন প্রকার একটি প্রতিষ্ঠানও এ রকম দুষ্কর্ম করে, তার কোন প্রমাণ সরকারী রিপোর্টে বা খবরের কাগজে দেখি নি, উকীল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেটদের মুখে, কিম্বা নারীহিতসাধনে ব্যাপৃত কোন মহিলা বা পুরুষের মুখে শুনি নি। কোন্ প্রমাণের বলে বিলের রচয়িত্রী এত বড় গুরুতর কলঙ্ক এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আরোপ করেছেন, জানি না। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, তিনি ভরসা রাখেন, আইন-সভার সদস্যেরা প্রশ্ন করবেন:—(১) যে-সব প্রতিষ্ঠানকে এই বিলের ক্ষমতার মধ্যে আনা হচ্ছে তাদের মোট সংখ্যা কত? (২) তাদের ক'টির বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে যে, তারা পাপব্যবসার জোগানদার? (৩) বিলে উল্লিখিত অপরাধে অভিযুক্ত ক'জন লোককে শাস্তি দিতে পারা যায় নি পীন্যাল কোড প্রভৃতি চারটি আইনের ব্যবস্থার অযথেষ্টতার জন্যে? যাদের দ্বারা কৃত অপরাধের কোন প্রমাণ নাই, তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে আইন প্রণয়ন অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। তা ছাড়া, যদি স্বীকার করা যায় যে, তারা ঐ রকম অপরাধ করে, তা হ'লে তার শাস্তি ও নিবারণের জন্য পীন্যাল কোড, কলিকাতা পুলিস আইন (Calcutta Police Act), পাপ ব্যবসায় উচ্ছেদ আইন (Bengal Suppression of Immoral Traffic

Act), বালকবালিকা সম্পৃক্ত আইন (Bengal Children Act) রয়েছে। নূতন আইন করতে হলে দেখাতে হবে এইগুলির দ্বারা কাজ হয় নি। কিন্তু তা দেখান হয় নি। যদি দেখান হ'ত, তা হ'লেও ঐ আইনগুলা সংশোধন করলেই চলত, নূতন আইন করা আবশ্যক হ'ত না।

বিলের রচয়িত্রী বলছেন এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ পাপব্যবসার পণ্য জোগায়; কিন্তু গবর্মেণ্ট ত পুলিসের মারফৎ এই রকম সব প্রতিষ্ঠানেই মেয়ে পাঠান। তাদের আশ্রমগুলি যদি কুস্থান, তা হলে গবর্মেণ্ট সেখানে মেয়ে পাঠান কেন? কল্‌কাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম প্রকাশ্য সভায় এই প্রশ্ন করেছিলেন।

বিলে আছে, এই সব প্রতিষ্ঠান চালাতে হ'লে পরিচালক সমিতিকে লাইসেন্স নিতে হবে, এবং লাইসেন্স পেতে হলে দু-বছরের খরচ মজুত আছে দেখাতে হবে ও অন্যান্য সর্ত পূরণ করতে হবে। তাতে একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি বলেছেন, এ রকম হিতকর্মের জন্যে চাঁদা পাওয়া কঠিন, কোন্ বৎসর কত খরচ হবে কেমন করে জানা যাবে, এখন যে প্রতিষ্ঠানে কম নারী বালিকা বা বালক আছে আসছে বৎসর তাতে অনেক বেশী হতে পারে (এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠানের হয়েছে), ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বিধবা-নিবাস, উদ্ধারাশ্রম, অনাথালয় যদি সত্যি সত্যি পাপকাজের জোগানদার হ'ত তা হলে তারা টাকার অভাবের কথাটা তুলতই না। যারা পাপব্যবসার জোগানদার, তাদের ধনী মুরুব্বি আছে। তাদের কাছে, দু-বছর কেন, দশ বৎসরের খরচের আগাম টাকা মজুত দেখ্‌তে চান না কেন, তারা দেখাতে পারবে। নারী-হিতসাধক যে প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে আপত্তি করেছে, তা-ই তাদের নিষ্কলুষতার একটি প্রকৃষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ—অবশ্য যদি কোন অর্বাচীন প্রমাণ চায়। কেও যদি আফিম গাঁজা মদের দোকান খুলতে চায়, বেশ্যালয় খুলতে চায়, তাকে লাইসেন্স নিতে হতে পারে। কিন্তু কল্যাণকাজের জন্যে লাইসেন্স নিতে হবে, সুনীতি সুরুচি শালীনতার উপর এত বড় স্পর্ধিত আক্রমণ আগে কখনো শোনা যায় নি। আর লাইসেন্স নিতে বলা হবে কাকে কাকে? বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণরূপিণী লেডী অবলা বসুকে? নারী-রক্ষা সমিতির সভাপতি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে? নারী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে?……।

এই বিলটার মুসাবিদায় এত গলদ আছে যে, সব তন্ন তন্ন ক'রে দেখাবার সময় নাই, স্থানও নাই। আর তার দরকারও নাই; কেন না, আগেই বলেছি, বিলটা সংশোধনের অযোগ্য, প্রত্যাহারেরই যোগ্য। তবু আরো দু একটা কথা বলি।

নারীরক্ষা সমিতিকে কেন এর মধ্যে আনা হ'ল? এ সমিতি ত বিধবা-নিবাস নয়, উদ্ধারাশ্রম নয়, অনাথালয় নয়। বিধবা সধবা কুমারী কোন মেয়েই এর আশ্রয়ে থাকে না। এই সমিতি যে-কোন সম্প্রদায়ের নারীর উপর অত্যাচার হোক না, অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। গবর্মেণ্টের, পুলিসের, যা কাজ, সেই কাজেরই এঁরা সাহায্য করেন। বঙ্গে যদি একটিও নারীরক্ষা সমিতি না থাকে, তা হলে ত গুণ্ডাদের বদমায়েসদের খুব সুবিধাই হয়। এই বিলটা আইন হ'লে কোনো নারীরক্ষা সমিতি থাকবে কি? সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি কি লাইসেন্স নিতে যাবেন?

এই বিলটা আইন হ'লে যদি নারীরক্ষা সমিতি উঠে যায়, যদি সম্প্রদায়নির্বিশেষে সব অত্যাচরিতা নিরাশ্রয়া নারী ও বালিকাকে আশ্রয় ও শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত নারীকল্যাণ আশ্রম উঠে যায়, বিধবাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর বাণীভবন উঠে যায়, অসহায়া দুঃস্থা বিধবাদের ভরসার স্থল বিধবা-নিবাসাদি প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, তা কি মাতৃজাতীয়া কোনো মহিলার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ব'লে বিশ্বাসযোগ্য? বিলটার রচয়িত্রী ব'লে নাম আছে একটি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্তা মহিলা। তাঁর এ রকম আকাঙ্ক্ষা হ'তে পারে, কে বিশ্বাস করে জানতে চাই।

অনাথ, অনাথালয়, বিধবা ও বিধবা-নিবাসের যে সংজ্ঞা বিলটাতে আছে তা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিপজ্জনক।

"Orphan means a boy or girl, under 18 years of age, who has lost his or her parents, or has been given up by his or her parents.

"Orphanage means a house where orphans may be kept, by whatever name it may be called."

"আঠার বছরের কম বয়সের পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত বালক বা বালিকাকে বলে অর্ফ্যান বা অনাথ। যে বাড়ীতে সেই রকম বালক বা বালিকাকে রাখা হয়, তা যে-নামেই পরিচিত হোক না কেন, তারই নাম অনাথালয়।"

বাংলা দেশে বিস্তর অনাথ বালকবালিকা আছে, যারা জেঠা, খুড়া, দাদা, দিদি, মাসী, পিসী, মামা বা মামীর বাড়ী থাকে, বা দূরসম্পর্কের জ্ঞাতির বাড়ী থাকে, কিম্বা নিঃসম্পর্ক দয়ালু ভদ্রলোকের বাড়ী থাকে। এই সব বাড়ীই অনাথালয়! বললে চলবে না যে, অনাথালয় নয়, মামা-বাড়ী বা মাসীর বাড়ী ইত্যাদি। আইনে বলছে, নিশ্চয় অনাথালয়! সুতরাং যে-কেও, সম্পর্কিত বা নিঃসম্পর্ক

অনাথ কোন বালকবালিকা পালন করেন, তাঁকে লাইসেন্স নিতে হবে, না নিলে তাঁর ৫০০ টাকা জরিমানা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

আবার, বিধবা ও বিধবা-নিবাসের সংজ্ঞা দেখুন :—

"Widow shall include a woman abandoned by her husband.

"Widows' Home means an institution including the house where widows or girls may be kept, by whatever name it may be designated. It shall include Refuge Home also."

স্বামীপরিত্যক্তা নারী বিধবাদের মধ্যে গণ্য হবেন, এর মানে বুঝা সহজ; কেন না, বিধবার স্বামী নাই, আর স্বামীপরিত্যক্তার স্বামী থেকেও নাই। কিন্তু যাতে 'girls' (বালিকারা) থাকবে, সেটাও—তার অন্য যে নামই থাক না কেন—বিধবা-নিবাস বলে কেন গণ্য হ'বে? বালিকারা কুমারী, সধবা, বিধবা—তিন রকমই ত হতে পারে? বিধবা-নিবাসের সংজ্ঞায় ইন্সটিটিউশ্যন (প্রতিষ্ঠান) কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইন্সটিটিউশ্যনের সংজ্ঞা বিলের কোথাও নাই। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর মন্তব্যটিতে দেখিয়েছেন, ঐ শব্দটারও সংজ্ঞা দেওয়া দরকার—বিলাতী অনেক আইনের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন। আলোচ্য বিলটাতে তার কোন সংজ্ঞা না থাকায়, স্কুল কলেজের ছাত্রীনিবাস, নার্সদের ক্লাব ও বাসা, কোন হোটেলে নারীরা থাকলে তা ইত্যাদি, এমন কি প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী যেখানে বিধবা বা অন্য নারী বা বালিকা থাকে, তাকেও বিধবা-নিবাস বলে রেজিস্টরি করতে হবে, তার জন্যে লাইসেন্স নিতে হবে, না নিলে ৫০০৲ টাকা জরিমানা হবে!!! কেন না ছাত্রনিবাস ইত্যাদি নামে, গৃহস্থ-বাড়ী নামে, কি এসে যায়? বিলে আছে, "by what ever name it may be designated", "অন্য যে-নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন", সেটা উইডোজ্ হোম ব'লে গণিত হবে!!!

বিধবা-নিবাসের সংজ্ঞায় আছে "রেফিউজ হোম্"ও বিধবা-নিবাস ব'লে গণিত হবে। কল্‌কাতায় "দি রেফিউজ" নামে একটি অসহায়দের আশ্রয়ভবন আছে (যেটি আগেকার দাসাশ্রম থেকে উৎপন্ন)। তাতে নানা বয়সের আর্ত আতুর অসহায় পুরুষজাতীয় মানুষ যে-সব আছে, তারাও তা হ'লে **বিধবা**?

বিলটার প্রয়োগক্ষেত্র হবে যে-সব প্রতিষ্ঠান (যদিও সেটাতে প্রতিষ্ঠানের কোন সংজ্ঞা নাই) তা খুলতে বা চালাতে হলে লাইসেন্স নেওয়া আবশ্যক যে-ধারায় বলা হয়েছে, তাতে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের নাম ক'রে তার পর বলা হয়েছে "or any other institution having similar objects", "অথবা তৎসদৃশ উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান।" কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিলটার ক্ষমতার মধ্যে আনা হচ্ছে, সেই "উদ্দেশ্য"টার সংজ্ঞা বা বিবৃতি বিলের কোথাও নাই—এবং প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাও কোথাও নাই, তা আগে বলেছি। কোন আইনের খসড়ার মুসাবিদা এমন অদ্ভুত হ'তে পারে, আগে জানতাম না, কল্পনা করি নি।

বিলটা হয়েছে, কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের "নিয়ন্ত্রণ ও তদারক" ('control and supervision') করবার জন্যে। কিন্তু বিলের কোথাও তার ব্যবস্থা নাই। আছে এই কথা যে, গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে নিয়মাবলী তৈরি করতে পারবেন। নিয়মগুলা বিলের মধ্যে দেওয়া হয় নি। সুতরাং নিয়মগুলা যে কেমন হবে, তার বিচার আইনসভা বা সর্বসাধারণ করবার সুযোগ পাবে না। এমন নিয়ম সরকার বাহাদুর করতে পারেন যা মেনে চলা কোন ভদ্র মহিলার পক্ষে বা ভদ্র পুরুষেরও পক্ষে অসম্ভব। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকেও খুব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর মন্তব্যে বলেছেন, এত কথা না লিখে সংক্ষেপে বলে দিলেই হ'ত যে, জার্ম্যান রাষ্ট্রে হিটলারের যে ক্ষমতা আছে, গবর্ন্মেণ্টকে ও জেলা হাকিমকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হল!

আরো অনেক কথা লেখা যেতে পারে, কিন্তু এখানেই থামি। এক জন ভদ্র মহিলার নাম দিয়ে এ রকম একটা বিল প্রচারিত হওয়ায় আমরা একান্ত দুঃখিত যেটার সম্বন্ধে অখিলচন্দ্র দত্তর মত প্রবীণ বিবেচক লোক সভাস্থলে বলেছেন, বিলটার নামকরণে সুপারভিজনের জায়গায় সাপ্রেশ্যন শব্দ ব্যবহৃত হ'লেই ঠিক্ হত। বিলটা প্রত্যাহৃত হলে আমরা খুবই খুশী হব।

গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে শুধু বাংলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই।

তিনি প্রধানতঃ ব্রতচারী প্রচেষ্টার ও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলে বিদিত। কিন্তু এই দুটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য বলে না করলেও চলত এমন জনহিতকর কাজ তিনি করতেন। তাঁর পত্নী সরোজনলিনীও তাতে যোগ দিতেন।

গুরুসদয় দত্ত

তিনি যখন বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন এরূপ কাজ তাঁরা যা করেছিলেন তার থেকে এর পরিচয় পেয়েছিলাম।

তিনি সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হবার পরবর্ত্তী শেষ (Final) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সিবিলিয়ানদের বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণতঃ যেরূপ থাকে, তার চেয়ে তাঁর যে ঐ দুটি কম ছিল না, এর থেকেই তা বুঝা যায়। তিনি দক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীও ছিলেন। যোগ্যতার জোরে এরূপ অফিসারের প্রাদেশিক গবর্ণর নিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একাধিক বার তাঁকে ডিঙিয়ে অন্য, ইংরেজ, অফিসারকে গবর্ণর করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন ভারতীয় ও বাঙালী। তা ছাড়া তাঁর অন্য 'অপরাধ'ও ছিল যার জন্যে তাঁকে কখনো ডিবিজন্যাল কমিশনার বা চীফ সেক্রেটরী করা হয় নাই। একটা হচ্ছে তাঁর নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততা। অন্যায় দেখলে তিনি ইংরেজ অফিসারদেরকেও তিরস্কার করতে পশ্চাৎপদ হতেন না—যেমন বামনগাছি গুলি চালানোর ব্যাপারে তিনি ইংরেজ মিলিটারি ও পুলিস অফিসারদের করেছিলেন। আর একটা 'অপরাধ'ও তাঁর ছিল। স্বদেশবাসীদের সঙ্গে তাঁর 'সহানুভূতি'টা মৌখিক ও পোষাকী ছিল না;—যেমনটি ছিল, তার নাম একাত্মবোধ। তা তাঁর নানা কাজে ও ব্যবহারে প্রকাশ পেত। তিনি যখন চাকরীতে ছিলেন, তখনও অনেক সময় দেখেছি, আফিসের বাইরে আফিসের সময় ছাড়া অন্যত্র অন্য সময়ে তাঁর ব্রতচারী মালকোঁচা ও বাঙালি বেশ। ব্রতচারীর নিয়ম অনুসারে কোঁচা দোলান নিষিদ্ধ। তিনি 'আপনি আচরি' ব্রতচারী ধর্ম শেখাবার জন্যে নিজের প্রণীত সব নিয়ম মেনে চলতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গ্রামোন্নয়ন প্রবর্ত্তন করেন, সে ত অনেক আগেকার কথা। তাঁর প্রবর্তিত নানা রকম গ্রাম-পুনরুজ্জীবন ও গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ তখন থেকে চলে আসছে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিই তার জন্যে। এখন গ্রাম পুনর্গঠনের কথা বলা ও তার সঙ্গে 'সহানুভূতি' দেখান অনেক হোমরাচোমরার মধ্যেও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্বয়ং বিলাতফেরত ম্যাজিষ্ট্রেট কুড়াল কোদাল হাতে জঙ্গল আগাছা কাটতে আর পঙ্কোদ্ধার করতে নরদামা সাফ করতে লেগে গেছেন, শভেল হাতে শহরের আবর্জনাস্থালী উজাড় করছেন, এ দৃশ্যটা গুরুসদয় দত্তর আগে কেও দেখান নি।

ব্রতচারী শুধু নৃত্য নয়। এর যেটুকু নৃত্য আছে, তারও মধ্যে ব্যায়াম, দলবদ্ধতা-শিক্ষা, সংগীতের তাল ও সংযম আছে, কিন্তু বিলাসবিভ্রম হাবভাব নাই। দেশী হাডুডুডু, বিদেশী ক্রিকেট ফুটবল ইত্যাদিতে যে রেষারেষির ভাব আছে, এতে তা নাই। মেয়েদের পক্ষে এর আরো এই উপযোগিতা আছে যে, এতে তাদের ব্যায়াম ত হয়ই, অধিকন্তু ছোট বড় সকলের সঙ্গে মুক্ত বাতাসে আকাশের নীচে সাহচর্যের সুযোগ হয়। ব্রতচারী প্রতিজ্ঞাগুলি পালিত হলে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে।

ব্রতচারীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই। এর মধ্যে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক আছে। প্রাদেশিকতাও এর মধ্যে নাই। বাংলার বাইরে, বিশেষ ক'রে মান্দ্রাজ প্রদেশে, ব্রতচারী কোন কোন জায়গায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। লণ্ডনে পর্য্যন্ত গুরুসদয় ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

গুরুসদয় খুব উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে ব্রতচারী নৃত্য করতেন, ব্রতচারী গান গাইতেন—কোন সংকোচ বোধ করতেন না। কতকগুলি নৃত্য আমাদের বাংলাদেশেরই চিরাগত নৃত্য। গ্রাম্য বলেই তিনি কোন জিনিসকে অবজ্ঞা করতেন না; শ্রদ্ধেয় যা তাকে শ্রদ্ধা করতেন। সে কালের অনেক গ্রাম্য নাচগানের পুনরুদ্ধার ক'রে তিনি

সেগুলিকে নূতন জীবন দিয়ে গেছেন। বীরত্বব্যঞ্জক রায়বেঁশে নৃত্য তার মধ্যে একটি। আমাদের দেশের অনেক পট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই পটগুলি, তাদের বিষয় সম্বন্ধে গানের সঙ্গে, পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়াত। এই রকম গানও তিনি পটুয়াদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি সমেত প্রকাশিত ক্বরে গেছেন। সেকালের কাঠখোদাইয়েরও অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, কতকগুলির ছবিও ছাপিয়েছিলেন। বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্যও তাঁর প্রিয় ছিল। তার চর্চাও তিনি করেছিলেন। বঙ্গের অনেক প্রাচীন মূর্তিও তাঁর সংগ্রহে আছে। বাংলা দেশের স্বকীয় সকল রকম সংস্কৃতির তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এর নানা রকম নমুনা তাঁর মিউজিয়মে আছে। এই মিউজিয়মটিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি ব্রতচারী জনশিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত জমী নিয়েছিলেন, টাকাও সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনি গদ্যে ও পদ্যে ছোট ছোট অনেক বই লিখে গেছেন। তাঁর কবিতায় লালিত্যের চেয়ে অন্তরের আবেগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

জামশেদপুরে গত ডিসেম্বরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গত অধিবেশনে তিনি সভাপতির কাজ দক্ষতা এবং স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা ও উৎসাহের সহিত করেছিলেন। তিনি যা কিছু করতেন, তাতে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিতেন।

চারশতাধিক-শাখা বিশিষ্ট সরোজনলিনীদত্ত নারীমঙ্গল সমিতি তাঁর আর একটি কীর্তি। এর দ্বারা তিনি নারী-সমাজের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীন হিতসাধনের চেষ্টা করে গেছেন। একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত অনেক সাধ্বী মহিলা দেখিয়ে চিরপূজ্য হয়ে আছেন। গভীর পত্নীপ্রেমকে সক্রিয় নারীহিতৈষণার ও সমাজসেবার মূর্তি দিয়ে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। এরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না।

ঢাকার "দাঙ্গা"র তদন্ত

ঢাকার ও ঢাকা জেলার এই বৎসরের প্রথম "দাঙ্গা"র তদন্ত যখন চলছিল তখন আবার "দাঙ্গা" আরম্ভ হয়। সেই "দাঙ্গা" কাল ১০ই জুলাই ২৬শে আষাঢ় পর্যন্ত নিঃশেষ একেবারে হয় নি। পরবর্তী খবর পাঠকরা দৈনিক কাগজে পাবেন।

যাঁরা এই দু-দফা "দাঙ্গা"র সব বৃত্তান্ত পড়ছেন, তাঁরা অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, প্রথম "দাঙ্গা" বাধে তখন যখন বঙ্গের গবর্ণর ভিন্ন ভিন্ন দলের ও সম্প্রদায়ের মাতব্বর লোকদের নিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং চালিয়েওছিলেন কতক দূর। যারা "দাঙ্গা" করেছিল তাদের, এবং তাদের যদি প্ররোচক প্রবর্তক কোন কোন লোক থাকে, তা হলে তাদের এমন কোন মৎলব ছিল কি যে, গবর্ণর বাহাদুরের সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টাকে তারা সফল হতে দেবে না, ব্যর্থ করবে? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে জানি না। তার পর, প্রথম দফা "দাঙ্গা" থেমে যাবার পর, তদন্ত কমীটি নিযুক্ত হ'ল, তদন্ত আরম্ভ হ'ল। কমীটির সামনে যে সব সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থিৎ করা হ'য়েছে এবং পরেও হ'তে পারে, তাতে অনেক গোপনীয় ব্যাপার বেরিয়ে পড়তে পারে না-ও পারে—এমন কি আমরা উপরে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তরের সন্ধানও মিলতে পারে। এই ভেবে কি "দাঙ্গা"কারী ও তাদের প্রবর্তকরা (যদি প্রবর্তক থাকে) তদন্তটা বন্ধ করবার অভিপ্রায়ে আবার "দাঙ্গা" শুরু করেছে? কারণ, "দাঙ্গা" হেতু তদন্ত একাধিক বার স্থগিত করতে হয়েছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যদি তদন্তটা হয় ও সব সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে পারে, তা হলে, তদন্তের ফল যাই হোক, "দাঙ্গা" থামাবার ক্ষমতা গবর্মেণ্টের আছে ব'লে কতকটা মুখ রক্ষা হবে।

—

সাম্প্রদায়িক "দাঙ্গা"র ফলাফল

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে কোনো **সম্প্রদায়েরই** ঐহিক পারত্রিক কোন হিত হয় না। এতে কোন কোন গুণ্ডার ও প্ররোচক প্রবর্তকদের সাংসারিক কিছু লাভ কখন কখন হ'য়ে থাকে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কোন সম্প্রদায়েরই সাংসারিক লাভও কিছু হয় না।

—

"সিরাজুদ্দৌলা দিবস"

সিরাজুদ্দৌলা-চরিত আলোচনা করবার ঠিক্ উপযোগী সময় এটা নয়। কেবল দু-একটা কথা বলি। তাঁকে যে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি বলা হয়েছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য নয়;—তিনি কিম্বা তাঁর মাতামহ আলিবর্দি খাঁ স্বাধীন ছিলেন না। মোগল বাদশাহদের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু এখনকার প্রাদেশিক গবর্ণরদের চেয়ে তাঁদের ক্ষমতা ও স্বতন্ত্রতা অনেক বেশী ছিল,

সত্য। আর একটি কথা এই যে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে সম্মিলিত ভাবে স্মরণোৎসব করবার সিরাজের চেয়ে যোগ্যতর মুসলমান নৃপতি বাংলার ইতিহাসে আছে।

মীরজাফরের দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে কলঙ্ক তাদের চিরকাল থাকবে—"সিরাজস্মৃতি-পূজা" না করলেও থাকবে।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে কমীটি

বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক্ সাহেব অনেক বিষয়েই 'রেকর্ড' স্থাপন করেছেন ও করছেন। নূতন 'রেকর্ড' মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে "সর্বসাধারণের এক অংশের" ("of a section of the public") আপত্তি জানবার জন্যে একটি কমীটি নিয়োগ। এই বিলটার বিরুদ্ধে বাংলার সব স্বাজাতিক কাগজ প্রবন্ধ লিখেছে। আমরাও লিখেছি এবং অন্য লেখকদের প্রবন্ধ ছেপেছি। এই সব লেখায় বিলটার বিরুদ্ধে সব আপত্তি বেশ স্পষ্ট ভাষায় নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সমগ্র বাংলা দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসে যে বৃহৎ প্রতিবাদ-কন্‌ফারেন্সে এর দোষ সব দেখালেন, তাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে আপত্তিগুলি আছে, এবং তার সভাপতির ও অন্যান্য প্রধান বক্তাদের বক্তৃতাতেও আছে। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এটার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল; তাঁরাও তাঁদের মন্তব্যে আপত্তিগুলি জানিয়েছেন। বহরমপুরে যে শিক্ষাবিষয়ক কন্‌ফারেন্স হয়েছিল, তাতে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এটার নানা দোষ দেখিয়েছেন। এর সিলেক্ট কমীটির রিপোর্টের উপর বেঙ্গল এডুকেশন কৌন্সিলের সভাপতিরূপে সর্ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তাতে দফা দফা দেখান হয়েছে সিলেক্ট কমীটি বিলটাকে দোষমুক্ত না ক'রে বরং আরও আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর করেছে। দেখান হয়েছে যে, বিলটাতে, শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নয়, প্রাথমিক শিক্ষা, কলেজী শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ঘোরতর অনিষ্ট হবে। এই জন্যে তাতে বিলটিকে প্রত্যাহার করবার অনুরোধ জানান হয়েছে।

এততেও প্রধানমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী সাহেব বিলটার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের আপত্তিগুলা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারলেন না! না-বুঝতে পারবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ, মান্‌তেই হবে। এ বিষয়ে তাঁর জুড়ি মিলবে না।

আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক্, তিনি বুঝতে পারেন নি। তা হলে তাঁকে আপত্তিগুলি জানাবার ও বুঝাবার যোগ্য লোক কারা? নিশ্চয়ই তারা বা তাদের প্রতিনিধিরা যারা বিলটার বিরুদ্ধ সমালোচনা এ পর্যন্ত ক'রে আসছে। কিন্তু হক্ সাহেব কমীটির মেম্বর নিযুক্ত করেছেন কাকে। কাকে? এমন এক জনকেও না যিনি একা বা কোন কোন সমিতির বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য রূপে বা কোন কাগজের সম্পাদকীয় বা অন্য লেখকরূপে বিলটার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এমনও নয় যে, তাঁর নিযুক্ত কমীটির অধিকাংশ মেম্বর নিরপেক্ষ। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কমীটির সভাপতি হচ্ছেন স্বয়ং হক্ সাহেব যিনি বিলটা পেশ করেছেন। এক জন সদস্য ডক্টর জেঙ্কিন্স, যে ব্যক্তি বিলটার আসল জন্মদাতা। অন্য দু-জন সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক, যে বিশ্ববিদ্যালয় বিলটার সমর্থন করেছে। আরও এক জন সদস্য কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর সর্ আজিজুল হক, যিনি ভাইস্-চ্যান্সেলর হ'লেও বিলটার উপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্তব্যে স্বাক্ষর করেন নি। তার দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে, হয় তিনি বিলটাতে কোন দোষ দেখ্‌তে পান নি, কিম্বা নিরপেক্ষ থাকতে চান। তা ছাড়া, তিনি বঙ্গের আইন-সভার বৃহত্তর কক্ষের স্পীকার বা সভাপতি। সেখানে বিলটা নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক হবে। স্পীকার বা সভাপতি রূপে আইনতঃ তিনি তর্কবিতর্কে নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। সুতরাং এই কমীটির মেম্বর রূপে বিলটার বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন না, এর সমর্থনও করতে পারেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই কমীটি নিয়োগ ও তার মেম্বরদের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাও বলেছেন যে, কমীটিকে বিলটা ভাল ক'রে বিবেচনা করবার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নি—২৬শে জুলাইয়ের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

মন্ত্রিমণ্ডল যদি তাড়াতাড়ি বিলটাকে পাস করাতে চান, করুন; কিন্তু সকল দিকের শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করবার পর বিলটাকে আইনে পরিণত করা হচ্ছে, এই ধারণা যদি তাঁরা জন্মাতে চান, তা হ'লে কমীটিটার নিয়োগ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এটা অপচেষ্টা।

—

আইস্‌ল্যাণ্ডে আমেরিকান ফৌজের অবতরণ

আমরা যখন গত মাসে আইসল্যাণ্ড সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে কিছু লিখেছিলাম এবং তার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহের লেখা আইসল্যাণ্ড সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ ছেপেছিলাম, তখন আইসল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা উপলক্ষ্যে তা করেছিলাম। তখন ঠিক্ এ অনুমান করতে পারি নি যে

আমেরিকা সেখানে রণতরী ও জলযোদ্ধা পাঠিয়ে দ্বীপটিকে জার্মেনীর হস্তগত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। তবে এ অনুমান করেছিলাম বটে যে, দ্বীপটি যাতে হিটলারের হাতে না পড়ে, এরকম ব্যবস্থা করতে হবে। এখন তা হয়েছে। এতে সুবিধা এই হবে যে, ব্রিটেনের সাহায্যার্থ আমেরিকা থেকে প্রেরিত সব মাল অপেক্ষাকৃত নিরাপদে সেখানে পৌছতে পারবে এবং জার্মেনী গ্রীনল্যাণ্ডে ও গ্রীনল্যাণ্ডের সন্নিহিত উত্তর-আমেরিকার কোন অংশে সহজে চড়াও করতে পারবে না।

আইসল্যাণ্ডের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না, প্রধানতঃ এই সর্তে এবং আইসল্যাণ্ডের সম্মতি নিয়ে আমেরিকা সৈন্য নামিয়েছে। সুতরাং কোন অন্যায় কাজ হয় নি।

এখন আইসল্যাণ্ড সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল বাড়বে। গত মাসে প্রকাশিত লক্ষ্মীশ্বরবাবুর প্রবন্ধ থেকে ও আমাদের বিবিধ প্রসঙ্গ থেকে সে কৌতূহল কতকটা তৃপ্ত হবে।

—

সত্যাগ্রহ কত দিন চলবে

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন, সত্যাগ্রহ চলবে পাঁচ বৎসর। সত্যাগ্রহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে পূর্ণ-স্বরাজ স্থাপন। তাঁর উক্তি থেকে অনুমান হয়, তিনি আরো পাঁচ বৎসরের আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে মনে করেন না। সত্যিই যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভে এত বিলম্ব হয়, তা হলে আমরা বুড়ো মানুষরা এ দুঃখ করলে কি লাভ যে, আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে যেত পারব না। যত দেরিই হোক্, স্বাধীন দেশের আকাশ বাতাস জল ও মাটিতে আমাদের দেহাবশেষ মিশুক বা না-মিশুক, স্বাধীনতালাভের চেষ্টা ত চলতে থাক্। কিন্তু প্রশ্ন এই, সত্যাগ্রহ দ্বারা স্বাধীনতা কি নিকটতর হয়ে এসেছে বা আসছে? আমাদের ধারণা, সত্যাগ্রহের বর্তমান অধ্যায় দ্বারা এ পর্যন্ত সেরূপ কিছু না হ'লেও সমগ্র সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাটির ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও আশা কল্পলোক থেকে বাস্তব জগতে এসে পৌছেছে।

সত্যাগ্রহের অন্য ও বৃহত্তর একটি উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে ও পৃথিবীকে অহিংস করা। এই উদ্দেশ্যও কত দূর সিদ্ধ হয়েছে, গাণিতিক ভাষায় তা বলা যায় না। কিন্তু মহাত্মাজীর চেষ্টার অন্ততঃ এই ফল হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ভাবে অহিংস থাকা, সব সময় সমীচীন বা সহজ না হতে পারে, কিন্তু সম্ভব, এবং অনেক সময় তা খুব বড় আদর্শ—এ কথা অনেকে স্বীকার করছেন। সমষ্টিগত ভাবে অহিংস থাকা না-থাকার কথা এখন সবাই হেসে উড়িয়ে দেয় না, অনেকে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করেন—এও একটি ফল।

মহাত্মাজী বলেছেন, গবর্মেণ্টকে কোন প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা বর্তমান সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য নয়। আগেও তিনি এই কথা বলেছিলেন। আমাদের ধারণাও বরাবর এই রকম।

—

পঞ্জাবী প্রধান মন্ত্রীর পাকিস্থানের বিরোধিতা

পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খান্ আগেও অনেক বার পাকিস্থান পরিকল্পনার নিন্দা করেছিলেন। সম্প্রতি লায়ালপুর জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশ্যনের দ্বারা আহূত একটি কনফারেন্সের সভাপতিরূপে আবার তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন। তিনি পাকিস্থান ইমারতের অন্যতম বৃহৎ স্তম্ভ বিবেচিত হতেন। কিন্তু আবার পরে কখন কি বলবেন, কে জানে।

—

ভারতে তৈরি প্রথম এরোপ্লেন

বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট্ ফ্যাক্টরিতে একটি এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে। এটি ভারত-গবর্মেণ্টকে উপহার দেওয়া হবে।

—

ভারতে তৈরি জাহাজ

"রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভী"তে ("রাজকীয় ভারতীয় জঙ্গী নৌবহরে") ত্রিবাঙ্কুড় ('Travancore') নামক যে আধুনিক জাহাজটি যোগ করা হ'ল, তার এঞ্জিন আর বয়লার ছাড়া আর সব অংশ বাংলা দেশে সরকারী কারখানায় নির্মিত। সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাবিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের মতে এঞ্জিন ও বয়লারও ভারতবর্ষেই তৈরি হতে পারে। কেন পারবে না?

ভিজাগাপাটমে এই কোম্পানীর যে জাহাজ নির্মাণের কারখানা গত মাসে খোলা হয়েছে, সেই বেসরকারী কারখানায় আধুনিক স্টীমার তৈরি হবে। প্রথম প্রথম হয়ত তার এঞ্জিন ও বয়লার বিদেশ থেকে আনাতে হবে, কিন্তু পরে সে সবই ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই তৈরি হতে পারবে।

অতীত কালে ভারতবর্ষে হাজার বন্দর ছিল, তার প্রত্যেকটির জাহাজনির্মাণের কারখানা ছিল। সেকালে কোথাও স্টীমার তৈরি হত না, ভারতবর্ষেও হ'ত না। কিন্তু বিদেশের অনেক জাহাজ, যেমন তুরস্কের কোন কোন জাহাজ, ভারতবর্ষে তৈরি করিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত। ভারতের জাহাজ ইয়োরোপ পর্যন্ত যেত।

—

কাঁচা পাটের উপর ট্যাক্স

বাংলা দেশের উপর করভার বেড়েই চলেছে। শুনা যাচ্ছে কাঁচা পাটের উপর ট্যাক্স বসাবার জন্যে একটা বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করা হবে। এই ট্যাক্সের বোঝা কার ঘাড়ে পড়বে? যে-সব পাটচাষীর মূক ম্লান শীর্ণ কণ্ঠে ভাষা নাই, তাদের ঘাড়ে বোঝা চাপানই সহজ। এই পাটচাষীদের অধিকাংশ কিন্তু মুসলিম মন্ত্রীদের জা'তভাই। তাঁরা কোন মতেই ইসলামকে বিপন্ন হতে দেন না, কিন্তু ইসলামীদের প্রতি দরদ কোথায়?

—

সর্ চিরুরাভুরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি

ডক্টর সর্ চিরুরাভুরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। তাতে ভারতবর্ষ, বিশেষ ক'রে যুক্ত-প্রদেশ, এক জন প্রসিদ্ধতম, দক্ষতম, রাজনীতিবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্ সংবাদপত্রসম্পাদকের সেবা থেকে বঞ্চিত হ'ল। তাঁর স্থান পূর্ণ করবার লোক আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। তিনি মৃত্যুকালে এলাহাবাদের দৈনিক "লীডর" কাগজটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত দক্ষ সহকারীরা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরকেও অনেকটা তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। সুতরাং একথা বললে কারো প্রতি অবিচার করা হবে না যে, লীডার তাঁরই কীর্তি, তাঁরই যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলে লীডার প্রসিদ্ধ হয়েছে।

তিনি যে এত বড় সাংবাদিক হ'য়েছিলেন, তা হঠাৎ এক দিনে হন নি। অল্প বয়স থেকেই তাঁর খবরের কাগজ চালাবার দিকে ঝোঁক ছিল। কলেজ ছাড়বার পর আঠার বৎসর বয়সেই তিনি তাঁর জন্মস্থান ভিজাগাপাটমে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের ক'রেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় প্রায় ৪০ বৎসর আগে। লীডারের সম্পাদক হবার আগে তিনি অন্য অনেক কাজ ক'রেছিলেন। ভারতীয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সের তাৎকালিক প্রধান অবৈতনিক কর্মী, অমরাবতীর উকীল, শ্রীযুক্ত মুধোলকরের তিনি সহকারী ছিলেন, এবং ঐ কন্‌ফারেন্স-সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও পুস্তকাদি সংকলন ও প্রকাশ ক'রেছিলেন। ভারতীয় সামাজিক কন্‌ফারেন্স (Indian National Social Conference) সম্পর্কীয় একটি বৃহৎ পুস্তকও তিনি সংকলন ও প্রকাশ করেছিলেন। সেকালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা সর্ ফিরোজ শাহ মেহতার বক্তৃতাবলীও তিনি প্রকাশ ক'রেছিলেন।

যুক্তপ্রদেশকে ও তার রাজধানী এলাহাবাদকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ক'রেছিলেন; ঐ প্রদেশের মঙ্গলের জন্যে ও স্বার্থরক্ষার জন্যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতেন। সেই জন্যে তথাকার বিস্তর লোকের তিনি এত প্রিয় ছিলেন যে, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর অধুনালুপ্ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও লীডার টিকে ছিল ও আছে। অবশ্য সেটা শুধু তাঁর লোকপ্রিয়তার জন্যে নয়; তিনি খুব অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং পরিশ্রমী কর্তব্যপরায়ণ সম্পাদক ছিলেন ব'লেও। তাঁর লোকপ্রিয়তার প্রধান কারণও তাই। তিনি এলাহাবাদে ঠিক কখন এসেছিলেন মনে নাই। কিন্তু মনে আছে ১৯০৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেস উপলক্ষ্যে আমরা একত্র বোম্বাই গিয়েছিলাম, ১৯০৬ সালের কল্‌কাতা কংগ্রেসের সময় একত্র কলকাতা এসেছিলাম,—কল্‌কাতা আসবার সময় মডার্ন রিভিয়ুর প্রথম সংখ্যা সঙ্গে করে এনেছিলাম এবং, বোধ হয়, চিন্তামণির মারফতেই গোপাল কৃষ্ণ গোখলেকে একখানি দিয়েছিলাম। চিন্তামণি আমার চেয়ে ষোল বৎসরের ছোট ছিলেন।

এলাহাবাদে লীডার স্থাপিত হবার আগে ইণ্ডিয়ান পীপল নামে একখানা সাপ্তাহিক স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা ঠিক্ মনে পড়ছে না; কিন্তু মিঃ (এক্ষণে ডক্টর) সচ্চিদানন্দ সিংহ যখন তার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, চিন্তামণি তখন তার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। যা কিছু লিখবার প্রায় সমস্তই চিন্তামণি লিখতেন, সচ্চিদানন্দ সিংহ কড়া মন্তব্য ও ভাষা কিছু নরম ক'রে দেবার চেষ্টা করতেন। চিন্তামণি কখন কখন তাতে আমাকে প্রবন্ধ ও নোট লিখতে বলায় আমি লিখতাম। এই সময় সচ্চিদানন্দ সিংহের হিন্দুস্থান রিভিয়ু মাসিকের সহকারী সম্পাদকের কাজও চিন্তামণি করতেন। মনে পড়ে, তিনি ঐ মাসিকের একটি বিশেষ সংখ্যার জন্যে দাদাভাই নওরোজী, উমেশচন্দ্র বোনার্জি, উইলিয়ম ওএডারবর্ণ ও দিনশা এদুলজী বাচার প্রবন্ধ আনিয়েছিলেন। প্রবন্ধগুলি অবশ্য সবই ইংরেজীতে।

উমেশচন্দ্রের প্রবন্ধটির শেষে কিন্তু বাংলা অক্ষরে উদ্ধৃত ছিল, **"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"**—বাংলা আখরগুলি খুব পাকা, দৃঢ়, ও গোটা গোটা ছিল মনে পড়ছে। ইংরেজি প্রবন্ধের শেষে বাংলা বচন উদ্ধৃত থেকে চিন্তামণি হেসে এই মর্মের মন্তব্য করেছিলেন, "বাঙালিরা বেহদ্দ বাঙালি; দু-জন বাঙালি একত্র হ'লেই অমনি বাংলা ভাষায় কথাবার্তা জুড়ে দেয়;—ডবলিউ সি বোনার্জি যে এত বড় সাহেব, তিনিও ইংরেজি কাগজের জন্যে লেখা ইংরেজি প্রবন্ধ শেষ করেন বাংলা বচন উদ্ধৃত ক'রে!" চিন্তামণি পরিহাস ক'রে বলতেন, "পৃথিবীতে দুটি সভ্য ভাষা আছে, তেলুগু (তাঁর মাতৃভাষা) আর ইংরেজি।" তিনি নিজে যদিও এলাহাবাদেরই বাসিন্দা হ'য়ে গেছলেন, কিন্তু হিন্দী অতি সামান্যই বলতে পারতেন। তাঁর মা অল্পস্বল্প পারতেন, তাঁর এক বিধবা ভগ্নী ও তাঁর দাদা গণেশ শাস্ত্রীর পত্নী সহজেই বলতে পারতেন; কারণ তাঁরা অনেক দিন কাশীতে ছিলেন। চিন্তামণির এক পুত্র তরুণ লোকপ্রিয় হিন্দী কবিদের মধ্যে এক জন ব'লে গণিত হন।

চিন্তামণি কলেজে দু-বৎসর পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি। কিন্তু তিনি ইংরেজি বেশ ভাল জানতেন, লিখতে ও বলতে বেশ ভাল পারতেন। ব্যাকরণের এবং কমা সেমিকোলনের খুঁটিনাটি পর্যন্তর, উপর তাঁর খুব দৃষ্টি থাকত। এই জন্যে লীডারের সম্পাদকীয় ও অন্যান্য লেখার ছাপায় প্রায় ভুল থাকে না। তাঁর স্মৃতিশক্তি, তথ্যাদির জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তাঁর লেখায় উচ্ছ্বাস থাকত না, যুক্তি প্রমাণ খুব থাকত; বক্তৃতাতেও তাই। যুক্তপ্রদেশের আইন-সভায় তর্কবিতর্কে তাঁর সমকক্ষ কেও ছিল না; কারণ, তাঁর তথ্য যুক্তি প্রমাণের সঙ্গে কেও এঁটে উঠতে পারত না। একবার এক দিনের অধিবেশনে একটা বিতর্কের সময় তিনি উপস্থিত না থাকায় প্রাদেশিক রাজস্বসচিব (?) সর্ এডোআর্ড ব্লণ্ট বলেছিলেন, "এখন বিতর্কটা হবে হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয়।"

তিনি একবার প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ভার তাঁর উপর ছিল। শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির জন্যে তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়েছিলেন। গবর্ণর তাঁর হাতে অর্পিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় তিনি পদত্যাগ করেন; কারণ তাঁর যোগ্যতা যেমন ছিল, স্বাধীনচিত্ততাও সেইরূপ ছিল। কাজে ইস্তফা দেবার আগে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, গবর্ণর অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছেন। এত হাজার টাকার চাকরি যে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা তাঁর পুঁজিপাটার জোরে নয়। কেন-না, তিনি গরিব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে ছিলেন; ছাত্রাবস্থায় এবং তার পরও অনেক সময় নিজের হাতে রেঁধে খেতেন। স্বকৃতপুরুষ যাকে বলে, তা তিনি ছিলেন। 'সর্' উপাধি তিনি কখনও চান নি, তার জন্যে চেষ্টা করেন নি। আমাদের মতে, কোনো সাংবাদিকের সরকারী উপাধি নেওয়া উচিত নয়; তিনিও না-নিলেই ভাল হ'ত। কিন্তু সর্ হয়েছিলেন ব'লে সুরটা নরম করেন নি। বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনকে অন্তরের সহিত সাহায্য করা উচিত, এ কথা তিনি খুব জোরের সহিত লিখতেন আন্তরিক বিশ্বাসবশে। অন্য দিকে, গবর্মেণ্টের সামরিক নীতির তাঁর চেয়ে সদা-সজাগ অধ্যবসায়ী কঠোর সমালোচক আর কোনো দৈনিকসম্পাদক ছিলেন ব'লে আমরা অবগত নই।

সাবেক কংগ্রেসের তিনি এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। যখন "মডারেট"দের সঙ্গে "চরমপন্থী"দের ছাড়াছাড়ি হয়, তখন থেকে তিনি "মডারেট" বা লিবার্যাল। কিন্তু এই দলের মধ্যে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। তিনি অসহযোগের প্রবল ও দৃঢ় বিরোধী ছিলেন, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। অসহযোগের এই বিরোধিতার জন্যে তিনি হালি কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নেতাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। এ বিষয়ে এবং অন্য অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল। অসহযোগের বিরোধিতা তিনি করতেন বলেছি। কিন্তু "যুগ-আত্মা" (Time Spirit) তার প্রতিশোধ নিয়েছিল। যুদ্ধের পরবর্তী ভারতের পুনর্গঠনের জন্যে যে সরকারী কমীটি নিযুক্ত হয়েছে, তাতে তার ভারতীয় সভাপতি বাণিজ্যসচিব পদবশাৎ তার সদস্য হয়েছেন, আর সব কটি সদস্যই শ্বেতকায়;—এই কারণে চিন্তামণি তাঁর মৃত্যুর বার ঘণ্টা আগে লেখা একটি প্রবন্ধে এই কমীটিকে বয়কট করতে লিখেছেন! অসহযোগের বিরোধী অসহযোগ সমর্থন করছেন!

চিন্তামণি ধর্মানুরাগী হিন্দু ছিলেন; সমাজসংস্কারকও ছিলেন। দীর্ঘকাল বিপত্নীক থেকে পরে একটি বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনিই বর্তমান লেডী চিন্তামণি।

তিনি স্পিরিচুয়্যালিজ্‌মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের আত্মার দ্বারা চালিত চিন্তামণির আত্মীয়ের হাতের দ্বারা লিখিত একাধিক প্রবন্ধ তিনি লীডারে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছেপেছিলেন।

রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় নূতন বৃহৎ গ্রন্থ

ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম্ এ, পীএইচ্ ডী (লণ্ডন), রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় আর একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এটির নাম "Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India : A Selection From Records (1775-1845)"। রামমোহন স্বয়ং বা সহকর্ম্মীদের সহযোগে যে-সব প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত ক'রেছিলেন এবং অন্যের প্রবর্ত্তিত যে-সব প্রচেষ্টার সহিত তাঁর যোগ ছিল, সেই সব সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র এবং সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। এতে সংগৃহীত উপকরণগুলি সাত ভাগে বিভক্ত;—"Religious and Moral", "Social", "Educational and Literary," "Political", "Judicial", "Economic", "Administrative"। তা ছাড়া গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকা ও দীর্ঘ উপক্রমণিকা আছে। গ্রন্থটি প্রবাসীর মত বড় ৬৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত। উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত। এতে যে-সব উপকরণ সংকলিত হয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করতে ডক্টর মজুমদারকে দীর্ঘকাল ধরে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিনি এর পূর্ব্ববর্তী দুখানি বৃহৎ বইয়ের জন্যেও এই রকম পরিশ্রম করেছেন। এই তিনখানি বৃহৎ গ্রন্থের জন্যই তাঁকে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনুসন্ধানের ক্ষমতা ও নির্বাচন-শক্তিও প্রয়োগ করতে হয়েছে। রামমোহন সম্বন্ধে এবং তাঁর সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা মৌলিক উপাদান থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চান, তাঁদের এই গ্রন্থগুলি রাখা ও পড়া চাই-ই। ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক বিদ্যার্থী ও গবেষকদের জন্যে এগুলি একান্ত আবশ্যক। ঐতিহাসিক উপকরণের আকর (Source Books) রূপে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের এগুলিকে নির্দেশ করা উচিত, এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের লাইব্রেরিতে রাখা উচিত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরিতেও এগুলি রক্ষণীয়, বিশেষতঃ যাঁরা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত তাঁদের বাড়ীতে। গ্রন্থকারকে তাঁর এই কীর্তির জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বর

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরার কলিকাতা আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর যে সুচিন্তিত, অনেক জ্ঞাতব্যকথাপূর্ণ অভিভাষণ দেন, তার শেষের দিকে বলেন :—

"বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির পক্ষে কথঞ্চিৎ বাধা অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু আমি আশা করি বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিয়া—ইহাদের অগ্রগতির পথ মুক্ত করিয়া দিবেন।"

মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের এই সময়োচিত সতর্কতা-বিধায়ক কথাগুলির প্রতি আমরা ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—

"নালন্দা ইয়্যার বুক"

আগে ইংরেজীতে এই রকম বর্ষপুস্তক প্রকাশ করা বিলাতের ও এ দেশের ইংরেজদের একচেটে ছিল। সুখের বিষয় এখন ভারতীয়েরাও এই কাজ করছেন। এই বইটি ভাল। ছাপা ভাল, দামও সস্তা।

—

আসামে একটি ছাত্রীর কৃতিত্ব

শিলঙের লেডী কীন কলেজের ছাত্রী কুমারী গঙ্গাবাঈ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় সমুদয় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান, আসামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় আই-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছেন। লেডী কীন কলেজ দু বৎসর মাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়েছে। কুমারী গঙ্গাবাঈ ও এই কলেজ প্রশংসার্হ।

—

দীনেশরঞ্জন দাস

স্বর্গত দীনেশরঞ্জন দাস যখন অধুনালুপ্ত "কল্লোল" নামক মাসিকের সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর কাগজটিতে লিখবার নূতন ধারা, ব্যঙ্গ চিত্রেরও নূতন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এমন কোন কোন নূতন লেখককে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন যাঁরা এখন খ্যাতনামা হয়েছেন। "কল্লোল" সম্বন্ধে এ কথা খুব কম লোকই জানেন যে, প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁর ভগ্নী শ্রীমতী মাদলীন রলাঁ "কল্লোল" পড়তেন। দীনেশ বাবু মিষ্ট প্রকৃতির বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। "কল্লোল" বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি সিনেমার পরিচালক হয়েছিলেন এবং এই কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি। ।/০+২৪+৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা, প্রাপ্তিস্থান—৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট এবং প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়সমূহে।

ব্রহ্মসূত্রসকল মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে মহর্ষি বাদরায়ণ এবং বেদব্যাস একই ব্যক্তি। উপনিষদের বাক্যসকল প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্রহ্মসূত্রগুলিতে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ দর্শন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ, মৃত্যুর পর জীবের বিভিন্ন পথে গমন, মোক্ষলাভের উপায়, মোক্ষলাভ হইলে জীবের অবস্থা, জগৎ সৃষ্টির বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে উপনিষদের সিদ্ধান্ত কি তাহা ব্রহ্মসূত্রে নির্ণয় করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন বাক্যগুলির মধ্যে আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধ সকল সমাধান করা হইয়াছে ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুর পক্ষে বেদই প্রমাণ। শঙ্কর যে-সকল উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছিলেন, সেই উপনিষদগুলি বেদের অন্তর্গত। হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলি অধিকাংশই উপনিষদের অন্তর্গত। সুতরাং দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে হিন্দুর পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে অদ্বৈত মতানুযায়ী শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শারীরক মীমাংসাভাষ্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতানুযায়ী রামানুজাচার্য্যপ্রণীত শ্রীভাষ্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

বর্তমান গ্রন্থে বসন্তবাবু ব্রহ্মসূত্রগুলির মূল এবং বাঙ্গলা অনুবাদ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য এবং রামানুজ ভাষ্যের সারমর্ম সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শঙ্কর এবং রামানুজের কোন্ কোন্ বিষয়ে মতভেদ এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে উভয়ে এক মত তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

এই গ্রন্থটির ভাষা সরল।

অ.

স্রোত ও আবর্ত্ত—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। কিশোর গ্রন্থালয়, ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত 'প্রবাসী'র পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। 'প্রবাসী' মারফতে তাঁহার ছোটগল্প পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'স্রোত ও আবর্ত্ত' শ্রীযুক্ত গুপ্তের প্রথম উপন্যাস। 'স্রোত ও আবর্ত্ত' পড়িয়া সুখী হইয়াছি। আখ্যান ভাগে নূতনত্বের দিকে গুপ্ত মহাশয় দৃষ্টি দেন নাই, পুরাতনকে নবীন মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি স্থান চমৎকার হইয়াছে, যেমন উজ্জ্বল তেমনই জীবন্ত। বইখানি আগাগোড়া এই উজ্জ্বলতা এবং জীবনরসে অভিষিক্ত হইলে আমরা একখানি সত্যকার ভাল উপন্যাস পাইতে পারিতাম। গুপ্ত মহাশয়ের পরবর্ত্তী প্রচেষ্টায় আমাদের আশা সার্থক হইবে বলিয়া আশা করি।

পরিশেষে একটি ত্রুটির কথা নিবেদন করিব। সংলাপের মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব কিছু বেশী বলিয়া মনে হইল। লেখক এ বিষয়ে অবহিত হইলে সুখী হইব। যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহাদের কাছে তাঁহাদের নিজস্ব বস্তুই প্রত্যাশা করি।

বিষকন্যা—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গল্পের বই। বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বর্ত্তমানে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম প্রথমেই মনে পড়ে, তাঁহাদেরই এক জন। বিশেষ করিয়া অতীতের রহস্যময় পশ্চাৎপটে স্বপ্নময় গল্প রচনায় শরদিন্দু বাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁহার 'জাতিস্মর', 'চুয়াচন্দন' সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবে। 'বিষকন্যা' লেখকের খ্যাতিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবে ইহা নিঃসন্দেহ। আলোচ্য বইখানিতে ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। সবগুলিই পূর্বে কোন না কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং জাতিতে সবগুলিই 'জাতিস্মর' জাতীয়। রসমাধুর্য্যের দিক দিয়া 'চন্দনমূর্ত্তি' গল্পটি শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে এবং লঘু ও মধুর রসের সমাবেশে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্পটি অপূর্ব্ব হইয়াছে। শেষ গল্প 'বিষকন্যা' সবগুলি অপেক্ষা আকারে বড়। এই গল্পটির মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল, উপন্যাসের আকারে 'বিষকন্যা' অধিকতর সার্থকতা লাভ করিত বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের স্মৃতি—শ্রীমতী হেমনলিনী বসু। ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০। পৃ, ৵০+১৯৪+১০

লেখিকা ১৩১৭ সালে কেদারবদরী যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন হিমালয়ের এই পথটি এখনকার মত সুগম হয় নাই। তথাপি তীর্থপথের আকর্ষণে তিনি বাহির হইয়া যে-সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পুস্তকখানিতে তাহারই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

বইখানির ছাপা খুব ভাল।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। ২২ নং, গোকুল মিত্র লেন হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং, মুখার্জি লেন, কলিকাতা মূল্য ১।৵০।

আলোচ্য গ্রন্থে মহাতাপস লাটু মহারাজের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উক্ত মহাপুরুষের উপদেশরাশির কিয়দংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার তপোময় জীবনের সকল কথা এখনও জানা যায় নাই।

এই নিরক্ষর সাধকের জীবনী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সাধনার দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে সাধন জগতের সকল রহস্য সাধকের আয়ত্ত হয়, যাহার কাছে বই-পড়া বুদ্ধি তুচ্ছ। নিরক্ষর হইয়াও তিনি নিজ মনোজগতের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সনাতন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ভাব বর্ত্তমান। যতক্ষণ না মানুষের ভিতর ভগবানের আলোক প্রবেশ করে, ততক্ষণ মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তাঁর আলো আসিলেই সব অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, সকল মূর্খতার নাশ হয়, সত্য বস্তু কি তাহা উপলব্ধ হয়। সাধন জগতে লাটু-মহারাজ ছিলেন গৌরবের বিষয়। তাঁহার মত এমন কঠোর ব্রতধারী সাধু অতি বিরল। এই চির-বিরাগী তাপসটি গৃহী ভক্তগণের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিলেও, হংসের মত তাঁহার পাখা কখনও ভিজিত না, কারণ কাহারও সঙ্গে তিনি মায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

সন্ধ্যাশঙ্খ—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৬৮। দাম দুই টাকা।

রস-সাহিত্যিক কেদারবাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার আবশ্যক করে না; হাস্যরস পরিবেশনে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট একটি স্থান ইঁহার সুনির্দ্দিষ্ট। সে কালের পল্লীজীবনের ভাল মন্দ দু'টি দিকই নিরপেক্ষ দর্শকের মত ইনি দেখিতে জানেন; কালের স্রোতে গ্রাম যে শহর অভিমুখী হইয়া আত্মসুখপরায়ণতার প্রসার ঘটাইতেছে—সেই পরিবর্ত্তনের ধারাটুকুও তাঁহার অবিদিত নহে; আমাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনধারায় ও সমাজের স্তরে যে গ্লানি, বেদনা বা বন্ধন জমিয়া আছে—তাহা সরস ও লঘু কৌতুক রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ। এই গ্লানি ও বেদনা উন্মোচন কালে কোন তীক্ষ্ণমুখী শরক্ষেপ তিনি করেন না; কাজেই মুখের হাসি ছাপাইয়া মনের ক্ষোভ কোথাও ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু এই হাসির অন্তরালে কয়েক ফোঁটা চোখের জল আসিয়া জমে। সেই কয়েক ফোঁটা জলের মধ্য দিয়া কেদারবাবুর দরদী মনের পরিচয় লেখার সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠে। 'সন্ধ্যাশঙ্খে' সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্যে হাসিবার সুযোগ যেমন প্রচুর, অশ্রুকেও তেমনই ধরিয়া রাখা কঠিন। 'দেবা ন জানন্তি', 'ভোলানাথের উইল', 'দাদার শ্বশুরবাড়ী', 'চাটুয্যে সংবাদে' হাস্যরসিক কেদারবাবুর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালাচাঁদের চতুর্বর্গ' হাসি-অশ্রুর সংমিশ্রণে উজ্জ্বল। 'মায়ের অনুগ্রহে'র মত করুণ কাহিনী কেদারবাবুও বেশী লেখেন নাই। এই সংগ্রহের মধ্যে 'স্নেহের ফাঁদ' ঠিক গল্প নহে—সেকথা লেখক স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের করুণ রসটুকু ইহাতে আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়াছে। 'দেবদাসের দুর্গোৎসব' গল্পটি ইতিপূর্ব্বে 'কবুলতী'তে 'পূজার প্রসাদ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। একই গল্প নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পুস্তকে দেওয়ার অর্থ যাহাই হউক, পাঠকের পক্ষে ইহা লাভই বলিতে হইবে। কারণ, কয়েক বার পঠিত হইলেও কেদারবাবুর রসরচনা পুরাতন বলিয়া বিস্বাদ লাগে না। পুস্তকের মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানখানির ৭৬তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "মিল" এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২৪২০।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থমালা—[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আধুনিক ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও শিক্ষা নীতির পরিচয়] নং ১, চীন; নং ২, জাপান—সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্ম্মণ। প্রথমটির লেখক রথীন্দ্র সেন; দ্বিতীয়টির, চিত্ত গুহ। প্রত্যেকটির মূল্য দুই আনা। কাল্‌চার ক্লাব, ৪৮৮।১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা।

বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল আরও বাড়ে যদি কোন দেশে বড় কোন ঘটনা ঘটে বা বড় বড় ঘটনা ঘটিতে থাকে,—যেমন যুদ্ধ। এই দুইটি পুস্তিকা বাহির করিয়া প্রকাশক সেই কৌতূহল তৃপ্তির কিছু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ এই দুইটি হইতে ভাল করিয়া বুঝা যায়। এই গ্রন্থমালায় তুরস্ক, মিশর, ইরান ও আফগানিস্থান, ফিলিপাইন, রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মেনী, ইতালী ও যুগোস্লাভিয়া সম্বন্ধেও পুস্তিকা প্রকাশিত হইবে।

ড.

পঙ্কতীর্থ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, বি-এল। 'কল্পনাবাস' কুমিল্লা। পৃঃ ১০৫। মূল্য এক টাকা।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধ। স্মৃতি বা জয়ন্তী-সভায় পঠিত, 'কেশবচন্দ্র' ব্যতীত অন্য চারিটি সভাপতির অভিভাষণ। প্রশস্তিমূলক হইলেও রচনায় প্রবীণতা এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে।

পলাতক—দীনেশচন্দ্র লোধ। প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ৩০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২৭৫। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাস। নিরঙ্কুশ প্রণয়কাহিনী; সুতরাং অসম্ভাব্যতা, রোমান্স, তিতিক্ষা, ত্যাগ ও অশ্রু-হাসি—সবই ইহাতে আছে। কথাবার্তার ভাষা মন্দ নহে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

বৈজ্ঞানিক রহস্য—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল। ১৭১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৬১; মূল্য ।৵০

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার এরোপ্লেন, আপেক্ষিকতা-বাদ, বিশ্বরহস্য, সৌরজগৎ ও ইলেকট্রন প্রোটন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সৃষ্টি ও সভ্যতা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা। পৃঃ ১৪০। মূল্য ১৷৹।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিশ্বের ও তাহার অন্তর্গত পৃথিবীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের সৃষ্টি, মানুষের ক্রমবিবর্ত্তন, সভ্যতার গোড়াপত্তন ও তাহার ক্রমবিকাশ ও যেহেতু ভাষা ও লিপি মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্ভব করিয়াছে সেই জন্য ভাষা ও লিপির কথা, পারিবারিক ব্যবস্থা ও ব্যবসায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের ক্রমবিকাশের কথা সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। সৃষ্টির গোড়ার কথা ও নিজেদের পূর্ব্ব ইতিহাস জানিবার জন্য মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে এবং তাহা জানিবার জন্য মানুষের প্রয়াসেরও বিরাম নাই। এই প্রয়াসের ফলে যত দূর জানা গিয়াছে সেই বিচিত্র কথা ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানুষের প্রয়াসের ফলে যে সভ্যতা ধাপে ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কথা মনের প্রসার বৃদ্ধি করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "লেখক যদিও সব কথা খুব সোজা করিয়া বলিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, তথাপি বিষয়গুলির দুর্বোধ্যতা বশতঃ কোন কোন বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা না হইতে পারে। তাহাতে ক্ষতি নাই। বাল্যকালেই মননের বৃহৎ পটভূমিকা প্রস্তুত হওয়া কম লাভ নহে। আমরা অনেকেই বাল্যকালে কোন কোন প্রসিদ্ধ কাব্য পড়িয়াছি। তখন সেগুলির সকল অংশ বুঝিতে না পারিলেও মানসিক পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত উপকরণ অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ করিয়াছি। কাব্যের সহিত বাল্যকালে পরিচয়ে এক দিকে এইরূপে যেমন লাভবান হওয়া যায়, বাল্যে সৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের সহিত পরিচয়েও অন্য দিকে সেইরূপ লাভ হয়। চিন্তা, ভাব ও কল্পনার বিহারের সীমাহীন বিশাল ক্ষেত্র পাওয়া কম লাভ নহে।" বইখানিতে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি সুনির্ব্বাচিত, বিশেষ করিয়া শ্রীইন্দু গুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি খুবই উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

মাটির মায়া—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস্‌সি। ১৬৪ নং মনিকতলা রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বাইশটি কবিতা আছে। মধ্য বাংলার পদ্মাতীরবর্ত্তী পল্লী-অঞ্চলই কবিতাগুলির পটভূমি। লেখকের গভীর অনুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকায় পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের কথা এবং পল্লীভূমির আলেখ্যগুলি ও পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ পদ্ধতিগুলি আমাদের নিকট মনোজ্ঞ হইয়াছে। কবিতাগুলিতে উচ্চ সুরের ভাবঘন সাহিত্যের উপকরণ না থাকিলেও সম্পূর্ণ বাস্তবে অনুভূত রসসৌন্দর্য্য আছে এবং মাঠের বাঁশীর সুরের স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ হইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে আম, বাঁশ, শীতের সকাল, খেয়াঘাট, চৈতালী, সরিষা ভাঙানো, ধান-বুনানি, গাঁয়ের ছবি প্রভৃতি অতীব উপভোগ্য হইয়াছে। শীতের সকাল বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

'পাশের সরিষা ক্ষেতে
সোনালী রঙের বান ডেকে যেত, মৌমাছি যেত মেতে।
দূরের ক্ষেতের তিসি
অপরূপ নীল ফুলসম্ভারে যেত দিগন্ত মিশি।'

আর এক স্থানে দেখিতে পাই—

'আম কি কেবল গাছেই ধরে গো আম কি শুধুই ফল?
আম যে মোদের স্মৃতির ফলকে সদা করে ঝলমল।'

এ সব চিত্র বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই সব সম্পদ লইয়া গ্রন্থকার বাঙালী মনকে পল্লীর পথে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মায়ের মন্দির—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, বি, ই, এম-আই-ই। প্রকাশক—শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায়, পি ১৪, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন্, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

অস্পৃশ্য জাতির মন্দির প্রবেশ এবং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য প্রচারমূলক উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থকার এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ল্যাপল্যাণ্ড—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রবাসীর আকারে ।৵০+৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ দুই বারে প্রায় সাত বৎসর উত্তর-ইউরোপে কাটাইয়াছেন। ইহার মধ্যে সুইডেনের উত্তরাংশের ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ-জাতির বিবরণ মাত্র তিনি এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ল্যাপল্যাণ্ডে গিয়া ল্যাপদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকখানি। প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাই চিত্র সম্বলিত। ইহাতে পুস্তকখানি খুবই মনোহারী হইয়াছে। দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন আর নূতন করিয়া কিছু বলিতে হয় না। এই পুস্তকের মধ্যে সুদূর ল্যাপল্যাণ্ডের ও ইহার আদিম অধিবাসী ল্যাপদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রভৃতির কথা জানিয়া বাংলাভাষীদের জ্ঞানের পরিধি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইবে। নিশীথ-সূর্য্যের দেশ ল্যাপল্যাণ্ডকে গ্রন্থকার আমাদের একেবারে হাতের কাছে আনিয়া দিয়াছেন যেন। বাংলাভাষীরা ইহা পাঠে আনন্দ তো পাইবেনই, গ্রন্থকারের প্রতি কৃতজ্ঞও থাকিবেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ। প্রকাশক—শ্রীক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, গ্রাম বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর, জেলা মেদিনীপুর। মূল্য বার আনা।

কলিকাতা শিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর তারকনাথ প্রামাণিকের জীবন-কথা। বইখানির ভাষা কিঞ্চিৎ সেকেলে হইলেও প্রাঞ্জল। বঙ্গের কৃতী ব্যবসায়ী ও সজ্জন ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপ যতই প্রচারিত হয় ততই ভাল।

দুর্গম পথের যাত্রী—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

তাকলা-মরুর বুকে, আমাজন নদীর মুখে ও নরখাদক দস্যু-কবলে—এই অধ্যায়ত্রয়ে তিনটি অভিযান-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমিতে স্বেন হেডিনের অভিযান বিশ্ববিখ্যাত। 'তাকলা-মরু'তে ইহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ-আমেরিকার বন-জঙ্গল-শ্বাপদ সমাকীর্ণ অঞ্চলে আমাজন নদীর উৎস ও মোহানার সন্ধানে দুই জন উৎসাহী অভিযাত্রীর বিবরণ অন্য দুইটি অধ্যায়ে আছে। ভাষা প্রাঞ্জল, ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে। পুস্তকখানির শেষ দিকে মুদ্রাকর প্রমাদ লক্ষিত হইল।

১। মহাচীনে মহাসমর, ২। কামানের মুখে নানকিঙ্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথমখানির মূল্য বার আনা, দ্বিতীয়-খানির মূল্য এক টাকা।

চীন-জাপান যুদ্ধ পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে। এই কয় বৎসরে এ সম্বন্ধে বিস্তর লেখালেখি হইয়াছে। এ পুস্তক দুইখানি কিঞ্চিৎ নূতন ধরণের। ইহাতে লেখক গল্পের ভিতর দিয়া চীনাদের বীরত্ব ও জাপানীদের নৃশংসতা বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রথমখানিতে নানকিঙ্ ফ্রণ্টে, সান্‌ইয়াতের সমাধি, জাপানী যুদ্ধ, স্পাই, মৃত্যুর মুহূর্ত্তে, জাপানী সংবাদ, দেশের শত্রু, মহাচীনে মহাসমর—এই আটটি ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয়খানি উপন্যাস। ভারতীয় যুবক-যুবতীদের রিপোর্টার হইয়া চীনে গমন ও শেষ পর্য্যন্ত চীনাদের সপক্ষে যুদ্ধ করিয়া দুঃখবরণের কাহিনী ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। বাস্তব চু-তের সহিত কাল্পনিক সরোজের সাক্ষাৎ ও আলাপন কেমন বিসদৃশ ঠেকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিলে রসের বড়ই ব্যাঘাত হয়। পুস্তক দুইখানি সুলিখিত, ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য হইবে। সচিত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

পশ্চিম-বাংলায় জলসেচের ব্যবস্থা

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবের জন্যই বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অংশে কৃষিকার্য সফল হয় না এবং এই কারণে এই সকল অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রবাসী পত্রিকায় একাধিকবার আলোচনা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ হইলে, সরকারের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সবলকায় লোকদের জন্য পরীক্ষামূলক পূর্ত কার্যের ব্যবস্থা হয়। এক শত ঘন ফুটের চৌকা অনুসারে মাটি কাটিয়া সামান্য যাহা কিছু রোজগার করা যায়, তাহাতেই এই সকল হতভাগ্য লোকের নুন-ভাতের সংস্থান হয়।

কিন্তু ইহাতে দেশের কোন উপকার হয় না। স্থান কাল নির্বিশেষে মাটি কাটিয়া রাস্তার ধারে নিক্ষেপ করিলে এবং পরে সেই সকল রাস্তার সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না করিলে, এই সকল রাস্তার স্থায়ী উন্নতিসাধন হয় না। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বৎসরে বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে এই সকল কার্যের অস্তিত্বই থাকে না। এক বৎসরের দুর্ভিক্ষে যে রাস্তার যে স্থানে মাটি পড়িয়াছে, পরবর্তী দুর্ভিক্ষে পুনরায় সেই স্থানেই মাটির কাজ হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

এই সকল অঞ্চলে সেচনের জন্য ছোট বড় অসংখ্য জলাশয় আছে। সংস্কারের অভাবে ইহাদের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এই কারণেই কৃষিকার্যের জন্য জলাভাব ঘটে। দুর্ভিক্ষ হইলে, কর্মহীন লোকদের জন্য যে মাটি কাটার ব্যবস্থা হয় তাহাদের সাহায্যে এই সকল জলাশয়ের সংস্কারের কোনও চেষ্টা ইতিপূর্বে হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কয়েকটি জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল বটে, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকের জন্য ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

গত ১৯৪০ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্ট এই সকল জলাশয়ের উদ্ধার কল্পে Bengal Tank Excavation Act নামে একটি আইন পাস করেন। এই বৎসর বীরভূম জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, এই জেলার কালেক্টর রায় বাহাদুর বিনোদবিহারী সরকার মহাশয় এই আইনের প্রয়োগ করিয়া সেচনের উন্নতি করিবার সংকল্প করেন। তাঁহার একান্ত চেষ্টার ফলে দুর্ভিক্ষের তহবিল হইতে এই আইন অনুসারে জেলার নানা স্থানে বাঁধ ও পুষ্করিণীর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর পল্লীসেবার কেন্দ্র শ্রীনিকেতনের সমীপবর্তী কালী সায়ের নামক জলাশয়টীর পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে শ্রীনিকেতনের কর্মিগণ একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই উৎসবে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সময়োপযোগী কয়েকটি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি গান গাওয়া হইয়াছিল—

(১)

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কলকল ছলছল!
এসো এসো উৎস-স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এসো হে নির্মল,
কলকল ছলছল॥
রবি-কর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি যে খেলার সাথী
সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল,
কলকল ছলছল॥

টেলিফোন:— হাওড়া ৫৩২, ৫৬৫

টেলিগ্রাম:— "গাইডেন্স" হাওড়া।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—দাশনগর, হাওড়া।

ব্রাঞ্চ— বড়বাজার—৪৬নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
নিউ মার্কেট—৫নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কুড়িগ্রাম (রংপুর)

চেয়ারম্যান—**কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ**

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—**মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি**

কারেণ্ট একাউণ্ট—½%

সেভিংস ব্যাঙ্ক—২%

ফিক্সড্ ডিপোজিটের হার
আবেদন সাপেক্ষ।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়"! সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গ রবে
করতালি দিতে হবে.
এসো হে চঞ্চল,
কলকল ছলছল॥
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে ক'রেছে বন্দী পাষাণ-শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল,
কলকল ছলছল॥

(২)

হে আকাশ-বিহারী নীরদ-বাহন জল।
আছিল শৈল শিখরে শিখরে তোমার লীলাস্থল।
তুমি বরণে বরণে কিরণে কিরণে,
প্রতি সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে
স্বপনে তরণীদল।
শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে,
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,
কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেথানে
ধরার গভীর তিমিরতল।
আজ পাষাণ-দুয়ার গিয়াছে টুটিয়া
কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া,
নীল আকাশের হারানো স্বপন
গানেতে সমুচ্ছল॥

বীরভূম জেলায় এই প্রণালীতে কাজ আরম্ভ হইবার পর, বাঁকুড়া জেলাতেও এই আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। সময়ের অভাবে বেশী জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশটি বাঁধ-পুষ্করিণীর সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন বাঁকুড়ার কালেক্টর ছিলেন তখন তিনি এই জেলায় ছোট বড় প্রায় ত্রিশ হাজার জলাশয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুতরাং এক বৎসরে কয়েকটি জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলেই এই সকল জেলার কৃষি সমস্যার সমাধান হইবে না। এই প্রচেষ্টা যদি অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া চালানো হয়, তবেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতপ্রায় পশ্চিম বাংলার দুঃখ অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের অবসান হইলেই যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগের অভাব না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

এই জেলায় এ বৎসর প্রায় সাড়ে তিন শতটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। এই সকল জলাশয় হইতে অনূ্ন চল্লিশ হাজার বিঘা জমিতে সেচন হইবে। সেচনের যথোচিত ব্যবস্থা হইলে ধান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে এবং এই জমির কতক অংশে আলু আখ ইত্যাদি মূল্যবান্ ফসল উৎপন্ন হইতে পারিবে।

খাদ্য ও জীবন-বীমা

আপনি যখন জীবন-বীমার পলিসি নেন, তখন নিতান্ত সঙ্গত কাজ করেন, কারণ জীবিতকালে বিবেচকের মত সাবধানতা অবলম্বন করাই উচিৎ। কিন্তু আপনার জীবন-মন্দির সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখবার জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও কি করেছেন?

জীবন বীমা জীবনকে কখন রক্ষা করতে পারে না, জীবন বীমা করলেই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হয় না; আপনার উচিৎ, যতদিন পারেন, ভালভাবে বেঁচে থেকে, আপনার পরিবারের ও দেশের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। জীবন বীমার উদ্দেশ্য জীবনকে শেষ করা নয়। কে না জীবন বীমা করেও সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়ে দীর্ঘজীবী থাকতে চায়?

জীবনের শক্তি ও আয়ু নির্ভর করে বিশুদ্ধ দুধ-ঘিয়ের উপর অনেক পরিমাণে। খারাপ ও ভেজাল ঘি ও আপনাকে দাম দিয়েই কিনতে হয়। কিন্তু শুধু তাই নয়, এর প্রতিক্রিয়া সামলাতে মোটা রকমের খরচ হয়ে যায়। ভেজাল ও ক্ষতিকর ঘি, তেল, ময়দা খাওয়ার দরুন আপনার পেট খারাপ হয়, পরে কাশি, ডিস্‌পেপসিয়া, অম্বল, আমাশা কিম্বা অর্শ, আরও কত কি? তারপর এই দেহযন্ত্রকে আর সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায় কি?

উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পুষ্টি 'শ্রী'ঘৃতে পাবেন, এইখানে হতে পারবে আপনার স্বাস্থ্য-বীমা। জীবন-বীমার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকারী আইন হয়েছে। ঘিয়ের নিরাপত্তা 'শ্রী'ঘিয়ে সম্ভব হয়েছে। এর প্রিমিয়াম এমন বেশী নয়, কিন্তু বোনাস অনেক। বাজারের নানা নিকৃষ্ট ঘিয়ের চাইতে এই ঘি দামে কিছু বেশী হয়ত হবে, কিন্তু পরিণামে দেহযন্ত্রকে বিকল করবে না, এবং ডাক্তার বৈদ্যের ফি ও ওষুধের মোটা বিল থেকে আপনাকে রেহাই দেবে।

আপনি যাহাই খান, শুদ্ধ ও পুষ্টিকর জিনিষ সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

নারী সমবায় শিল্পাশ্রম

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় নারী-শিক্ষা-সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য ও বিভাগীয় কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা

নারী সমবায় শিল্প আশ্রমের সম্মুখ দৃশ্য

করিয়াছেন। এই সমিতির সম্মানিতা সম্পাদিকা ও অধিষ্ঠাত্রী লেডি অবলা বসু মহোদয়ার পরিচালনায় নারী সমবায় শিল্প আশ্রম নামক আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমটি ভারত-সরকারের খাস-মহলস্থিত দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট ৮ নং গবর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার্সে অবস্থিত। নারী-শিক্ষা-সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি দেখিতে গিয়াছিলাম এবং ইহার কাজকর্ম্ম দেখিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি।

নারী সমবায় শিল্পাশ্রমের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে বাংলা দেশের দুঃস্থ মহিলাদিগকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য কুটীর-শিল্প সমবায় পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তন করা ইহার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে সেখানে একুশ জন

আশ্রমের খোলা মাঠে শ্রদ্ধেয়া লেডি বসু ও আশ্রমের কর্ম্মিগণ

সুগন্ধ মধুর নিমের টয়লেট সাবান গ্রীষ্মের অস্বস্তি দূর করে, ঘামাচি হয় না। তনুদেহ কোমল ও মসৃণ রাখে। অঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা উজ্জ্বল হয়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বিধবা ও এক জন কুমারী স্বাবলম্বীভাবে কাজ শিখিতেছেন, অর্থাৎ আশ্রমের সকল কর্ম্মীই সমবায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। বাড়ীভাড়া ও নিজেদের ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মীদের স্বোপার্জ্জিত অর্থেই চালিত হইয়া থাকে। এমন কি, অনেকে সেখানে কাজ করিয়া আত্মীয় স্বজনকেও সাহায্য করিয়া থাকেন।

আশ্রমের কর্ম্মালয়ের আংশিক দৃশ্য

তাঁতে কার্য্যরত মহিলাগণ

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাকতেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে। এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাড্‌কোভাইন" সেবন করা, কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা ক'রে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাডকোভাইন

মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে

লিস্টার এন্টিসেপ্টিক্স্‌ :: কাশীপুর, কালিকাতা

বর্ত্তমানে সেখানে ১২টি তাঁতে কাজ চলিতেছে। গেল বৎসরের হিসাব হইতে জানা যায় প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের আশ্রমে তৈরী জিনিষ এক বৎসরে বিক্রয় হইয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম যে, আশ্রম-বাসী কর্ম্মীদের সকলেই বস্ত্র বয়ন, রঞ্জন ও ছাপার কার্য্যদ্বারা প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৮৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সেখানে কাজ করিলে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। সেজন্য কর্ম্মে অবহেলা ত দূরের কথা অবসর সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মীরা কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিলাম। ইঁহাদের অধিকাংশই দুঃস্থ হিন্দু ঘরের বিধবা। সমবায় পদ্ধতিতে এইরূপ কার্য্যকরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও দুঃস্থ বিধবাদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দান—এই দুইটিই এই আশ্রমের বিশেষত্ব। এইরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে দ্বিতীয়টি আছে কি না জানি না।

বাংলা-সরকার এই প্রতিষ্ঠানে এককালীন ৬৮৫০৲ টাকা তাঁতের কাজের সরঞ্জাম ক্রয়ার্থ দিয়াছেন এবং কর্ম্মীদের বেতন ও অন্যান্য খরচাদি বাবত বাৎসরিক ২৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার রঙের ঘর, রান্নাঘর, চাকর-বাকরদের থাকিবার স্থান প্রভৃতি আবশ্যক ব্যবস্থার জন্য আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষকে দুই হাজার টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে বলিয়া জানিলাম। অনেক দুঃস্থ বিধবাকেও স্থানাভাবে লওয়া যাইতেছে না। এইরূপ সমবায় কার্য্যকরী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ যত প্রসার লাভ করিতে পারে ততই দেশের ও দশের মঙ্গল, ইহা বলাই বাহুল্য।

সত্যেন্দ্র বিশীর গুণের আদর

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষালাভ করবার আগে অন্য কোন কোন শিক্ষকদের সাহায্য পেয়েছিলেন। পরে কলাভবনে চিত্রাঙ্কন মূর্ত্তিগঠন প্রভৃতি কলায় শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন ১২ বৎসর, তখনি তাঁর আঁকা ছবি মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। তিনি ফোটোগ্রাফও বেশ ভাল তোলেন। তাঁর তোলা রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতির ফোটোগ্রাফ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি কলকাতা লেক বালিকা বিদ্যালয়ে ললিতকলা শিক্ষক ছিলেন; রাজকোটের রাজকুমার কলেজের ললিতকলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী

আকাশ-যুদ্ধে হত কালীপ্রসাদ চৌধুরী

সংবাদ এসেছে ইংলণ্ডে আকাশ-যুদ্ধ করবার সময় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী নিহত হয়েছেন। এই বীর যুবক পরলোকগত ব্যারিষ্টর কুমুদনাথ চৌধুরীর পুত্র। কুমুদনাথ প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, অনেক বাঘ শিকার করেছিলেন। সত্তরের উপর যখন বয়স, তখন মধ্যপ্রদেশে বাঘ শিকার করতে গিয়ে নিহত হন। পুত্র কালীপ্রসাদ বিপৎসঙ্কুল কাজের আকর্ষণ পিতারই মত অনুভব করতেন। সেই জন্যে পঞ্জাবে মোটা মাইনের কাজ ছেড়ে দিয়ে বোমারু এরোপ্লেনের চালক যোদ্ধা হয়েছিলেন, বেতনের আকর্ষণে যুদ্ধ করতে যান নি।
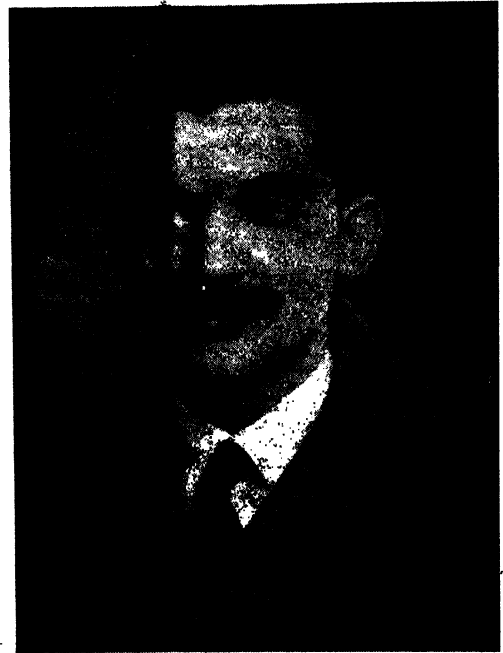
কালীপ্রসাদ চৌধুরী
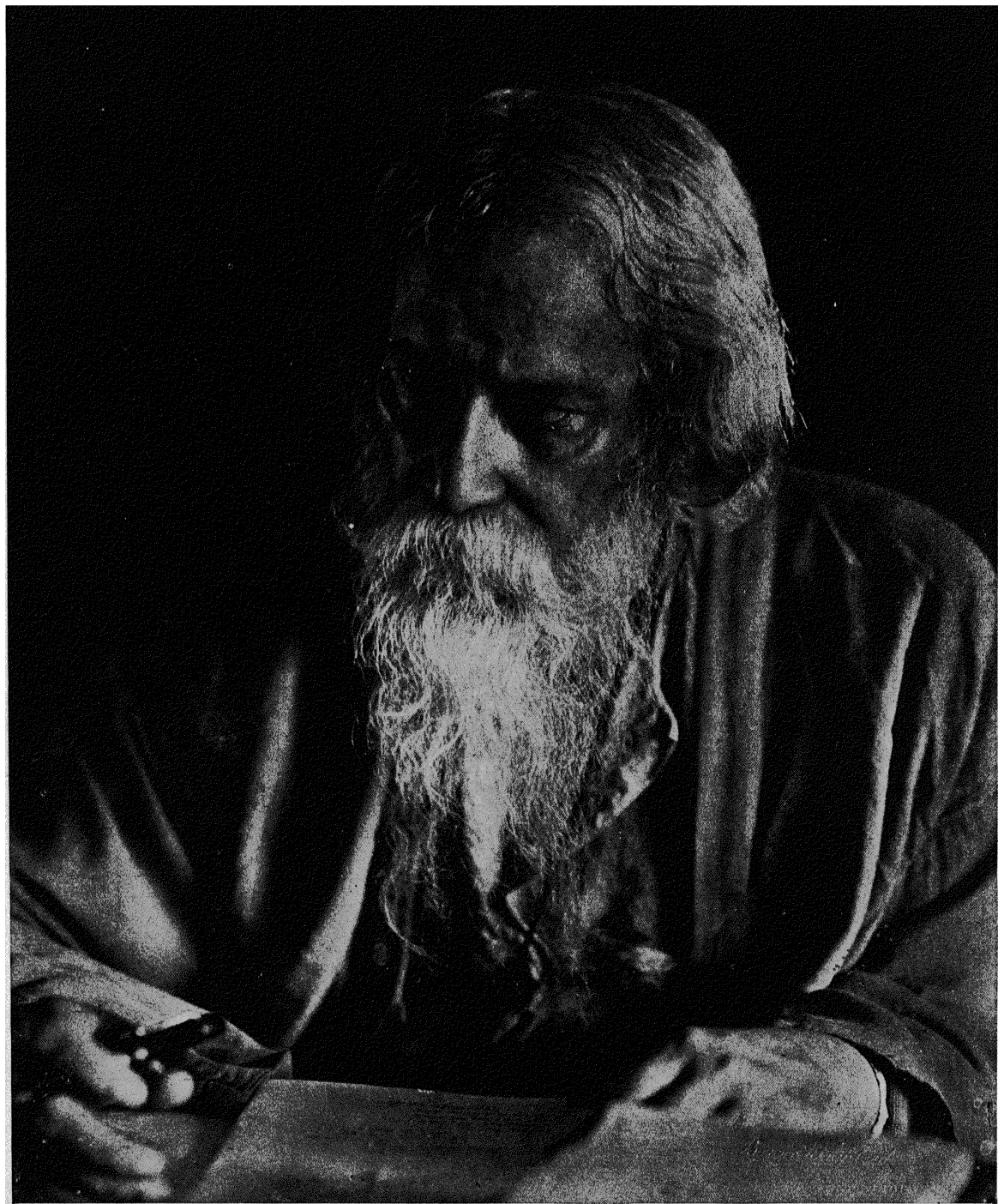
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস

বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড

প্রবাসী
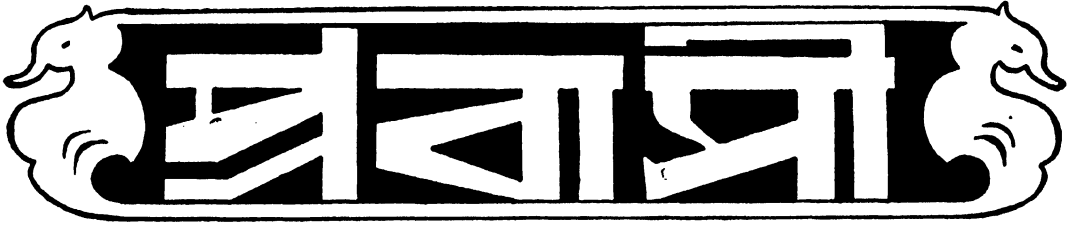
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৮

৫ম সংখ্যা

দিনের শেষে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে।
বোধ হ'ত তাই কিছুই তো নাই কাছে
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি একরোখে।
দিনের শেষে, পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছুপানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে।
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

১১ আষাঢ়, ১৩৩০

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ

On Board
House Boat "Padma"

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি প্রবাসীতে যে লেখার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বিশেষ কিছু ক্ষোভের বিষয় আছে বলে লক্ষ্য করি নি। কোনো লেখকের কোনো বক্তব্য বিষয় অপ্রিয় হলেও সেটা যদি অন্যায় না হয় তবে তা নিয়ে বিচলিত হওয়া উচিত বোধ করি নে। সাহিত্যে অসৌজন্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি বা অসরলতাই নিন্দনীয়।

অনিল কাল কলকাতায় যাচ্চে সেখানে আপনার হাতে একটা কোনো তর্জ্জমা হয়তো দিতে পারবে। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে কবিতাগুলির ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই আমার Fugitive বইয়ে আছে। ওর মধ্যে একটি ছিল যেটি ব্যবহারে লাগানো চলে। আপনি জানেন নিজের ইংরেজি বিদ্যের উপরে আজও আমার শ্রদ্ধা জন্মায় নি—সেই জন্যে সেটা তর্জ্জমার জন্যে সুরেনকে দিয়েছিলুম। কাজের ভিড়ে করে উঠতে পারে নি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে তখনি একটা অনুবাদ লিখে আপনাকে পাঠিয়েছি—চলনসই হোলো কিনা বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। দেরি হয়ে গেল বলে লজ্জিত আছি।—আপনি সুরেনকে যদি একখানি চিঠি দেন তাহলে নিঃসন্দেহই তার কাছ থেকে অনুবাদটি পাবেন। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জর্ম্মনিতে আমার বই বিক্রী সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জর্ম্মনিকেই দান করে এলুম। তার মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তাহলে বিশ্বভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না। আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রী হয়, এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌঁছয় না। সেজন্যে দুঃখ করে ফল নেই, কেন না লাভের অঙ্ক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে,—বস্তুত য়ুরোপের হাটে আমার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, হিসাবের খাতাটা দর্শন শ্রবণের অগোচরে। আমার পক্ষে হিট্‌লারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে

সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞমহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন এক জন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্ব্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হোতো সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুশি পরিতোষ প্রকাশের জন্যে কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তাহলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দু টাকা পাঁচ শিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন—তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্ব্বরতা এ কথা মানতেই হবে।

অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ বেদে পাওয়া যায়, যথা,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

জ্যোতিদার গানেও এই অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ আছে, প্রয়োজন অনুসারে আর একটু সুর চড়িয়ে এই তরকেই আমি তম করেছি। ইতি ৮ জুলাই ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আমার মনে হয় চিরকুমার সভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলা দেশে শ্যালী-ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ, এমন কি, ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে। তা হোক, সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তুলতে পারে আমি তাতে কোনো আপত্তি করব না। আমি তাকে চিঠিও লিখে দিচ্চি। আমার বিশ্বাস "শেষের কবিতা" যদিও দুরূহ তবু সেটার তর্জ্জমা একেবারে অসম্ভব না হতে পারে—ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে এর রস অধিগম্য হতেও পারে—কিন্তু চিরকুমার সভার গোড়াকার কথাটাতেই ওরা হুঁচট খাবে। হয়তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিষটা কৌতুকাবহ হতেও পারে। আমাদের দেশের এক জন সাহিত্য-অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্যলেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারে না—অতএব সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

* * * *

আজকাল আমার মন সকল প্রকার কর্ম্মধারা থেকে সরে এসেছে—ডাঙায় তোলা জীর্ণ নৌকোর মতো, অতি লঘু দায়িত্বও স্বীকার করতে সে নারাজ—দিনাবসানের ম্লায়মান আলোকটুকুকে রেখেছি নিষ্কৃতির সন্ধানে। ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা এলো মাথায় এবং মাথা থেকে কলমের মুখে—গভীর জল থেকে হঠাৎ যেমন মাছ ধরা পড়ে বঁড়শিতে—পাঠাই প্রবাসীর দরবারে।

সুরেন লিখেছে, চিরকুমার সভার পদে পদে গান এবং শ্লোক, অনুবাদের পক্ষে ওগুলো সহজসাধ্য নয়। "শেষের কবিতা" তর্জ্জমা করতে সুরেন রাজি ছিল কিন্তু সেটা আমার সম্মতিক্রমে কৃপালানি অনেকটা সেরে ফেলেছে। আপনি অনুরোধ করলে সুরেন হয়তো দুই বোন, মালঞ্চ অনুবাদ করতে পারে—ওর দ্রুত কলমে বেশি সময়ও লাগবে না। তর্জ্জমা করতে নিজেই কোমর বাঁধব এমন পালোয়ানি আমার কাছ থেকে এখন আর আশা করবেন না। গ্রীষ্মে কুয়োর জল অনেক নিচে নেবে গেলে টেনে টেনে জল তুলতে যেমন দম নিকলিয়ে যায়—লেখার প্রয়োজনে কথার যোগান দেওয়া আমার পক্ষে তেমনি অসাধ্য হয়েছে। ইংরেজি কথার তো কথাই নেই। বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষায় অবহেলা করেছি এ কথাটা মাঝে মাঝে ভুলতে বসেছিলুম—কিন্তু সেই অবহেলিত অশিক্ষিত ইস্কুল পালানে বাল্যবয়স গোপনে লুকিয়ে ছিল, প্রাচীন বয়সের শিথিল শাসনের দিনে বেরিয়ে পড়েছে। যদি কিছু দিনের জন্যে য়ুরোপে যাই তাহলে এই ছেলেটাই কোথা থেকে হঠাৎ আপন বিলিতি মুহুরিআনা প্রকাশ করবে। হয়তো জাহাজ থেকেই সুরু হবে তার বাহাদুরি। বার বার দেখেছি আমার মনের মধ্যে হাওয়ায়-বাজা একটা যন্ত্র আছে, হাওয়ার হাতে তার সুরের বৈচিত্র্য জাগে। ইতি

১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সুরেন অল্প একটু অবকাশ সম্প্রতি পেয়েছে। তাকে মডার্‌ন্‌ রিভিয়ুর জন্যে অনুরোধ করলে শিক্ষা বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করতে দ্বিধা করবে না।...

কর্ম্ম এখন আমার পক্ষে বোঝা অথচ তাকে কাঁধের থেকে নামানো অসম্ভব হয়েছে—এদিকে শরীর অপটু, মনও বাহিরের দিকে নেই। ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা তর্জ্জমা করে পাঠাচ্ছি। আশা করি এটা গ্রহণীয় হবে।

আপনাদের কাগজে দেখা গেল তদীয় উত্তুঙ্গতা আগা খাঁয়ের আচরণে পূর্ব্বাপরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য নেই বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে এ রকম নিন্দাবাদের কারণ আছে বলে আমি মনে করি নে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সাধনকে পুণ্যকর্ম্মই বলা যায়। বিশ্বমুসলমানীর প্রচেষ্টাও সেই লক্ষ্য অভিমুখে। প্যান-ইসলামীয় প্রচেষ্টা ভারত-সাম্রাজ্যের অনুকূল নয়। তার অর্ঘ্য রাজদ্বার পেরিয়ে চলে যায়। ইতি ৪ মার্চ্চ ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছেন অনিলকুমার চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি।]

ক্রমশঃ

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের শ্রীনাথ মন্দিরে বাঙ্গালী সেবক

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বৃন্দাবনের আশে পাশেও তখন এমন বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন যাঁহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থের বাহিরেরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাজে রত ছিলেন। তাহার সামান্য একটি বিবরণ আমরা গোকুলনাথজী-রচিত "চৌরাশী বৈষ্ণবকী বার্ত্তা" গ্রন্থ হইতে দিতে পারি। এই বিবরণটি বড় সুখকর নহে, কারণ ইহাতে সেই যুগের ভক্তগণের মধ্যেও যে কতটা সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা ছিল তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবু যাহা আছে তাহা যথাযথ ভাবে দেওয়াই সঙ্গত।

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য তৈলঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ বংশে কাশীধামে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজধামে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তিনি শ্রীনাথ নামে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখন বল্লভাচারী মত সারা গুজরাট, কাঠিয়াওয়াড়, কচ্ছ, সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত। তাঁহার পুত্র বিঠ্ঠলনাথ গোস্বামীও পরম ভক্ত ছিলেন। বিঠ্ঠলনাথ-জীর পুত্র গোকুলনাথ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার বৈষ্ণব চরিত্র গ্রন্থ লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তমালে নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের জীবনী, কিন্তু "চৌরাশী বার্ত্তাতে" বল্লভপন্থের ভক্তদেরই বিবরণ। চমৎকার সরল স্থানীয় গদ্য ভাষাতে পুস্তকখানি লেখা।

বৈষ্ণবগণের কাছে জাতি অপেক্ষা ভক্তিই বড়। তাই মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্য শূদ্রজাতীয় কৃষ্ণদাসজীকে দীক্ষা দেন। কৃষ্ণদাসকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। ক্রমে তিনি শ্রীনাথ মন্দিরের চালনার সকল অধিকার কৃষ্ণদাসজীকে সমর্পণ করেন, তাই অধিকারী নামেই কৃষ্ণদাসজী প্রসিদ্ধ।

এখন চৌরাশী বার্ত্তা হইতে একেবারে মূলানুগত অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাউক,

"আর প্রথমে শ্রীনাথজীর সেবা বাঙ্গালীরাই করিতেন (ঔর প্রথম সেবা শ্রীনাথজী কী বাংগালী করতে)...। পরে শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভু (বল্লভাচার্য্য) কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি গোবর্দ্ধনে থাক, ঠাকুরের সেবা-পরিচর্য্যা কর। তাই কৃষ্ণদাস অধিকারী হইলেন, অধিকার করিতে থাকিলেন।"

"পরে এক দিন কৃষ্ণদাস মথুরা যাইতেছিলেন, যখন তিনি **অডীংগে** গিয়া পৌঁছিলেন তখন পথে অবধূত দাসের সঙ্গে দেখা হইল। অবধূতদাস ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি ব্রজধামে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। তখন অবধূতদাস কহিলেন, কৃষ্ণদাস, তুমি কোথায় চলিয়াছ? কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'মথুরা যাইতেছি, একটু কাজ আছে'। অবধূত-দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রীনাথজীর সেবা কাঁহারা করেন?' কৃষ্ণদাস কহিলেন, বাঙ্গালীরা করেন (তব কৃষ্ণদাস নে কহী জো বংগালী করত হৈঁ)। তখন অবধূতদাস কহিলেন, "যখন শ্রীনাথজীর আপন ঐশ্বর্য্য প্রসারিত করিতে হইবে তখন তোমাকে বাঙ্গালীদের দূর করিয়া দিতে হইবে।" (জো শ্রীনাথ জীকো অপনো বৈভব বঢ়াবনো হৈ তাতে তুম বংগালীন কো দূর ক্যোঁ নাহীঁ করত)?

শ্রীনাথজী (না কি) স্বয়ং অবধূত দাসকে কহিয়াছিলেন যে 'বংগালীরা আমাকে বহু দুঃখ দিতেছে। (শ্রীনাথজী জীনে কহ্যো জো মোকোঁ বংগালী বহুত দুঃখ দেত হৈঁ)'। যখন বাঙ্গালীরা শ্রীনাথজীকে ভোগ নিবেদন করেন তখন বাঙ্গালীদের শিখার মধ্যে যে লুকায়িত দেবীর একটি ছোট্ট মূর্ত্তি থাকে তাহাকে সামনে বসাইয়া তাঁহারা ভোগ সরান। সেই দেবীমূর্ত্তিকে তাঁহারা সদা আপন শিখার মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। এই কথা শ্রীনাথজী অবধূতদাসকে জানাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, 'বাঙ্গালীদের দূর কর (বংগালীন কো দূর করৌ')। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'শ্রীগোসাঁইজীর (বিঠ্ঠলনাথজী) আজ্ঞা বিনা তাড়াইয়া দেই কেমনে (শ্রীগুসাঁইজী কী আজ্ঞা বিনা কৈসে কাঢ়ে)। তখন অবধূতদাস কহিলেন, "তুমি অডেলে যাইয়া শ্রীগোসাঁইজীর আজ্ঞা লইয়া এস। যেমন করিয়া হউক এই বাঙ্গালীদের তাড়াও (জৈসে বনে তৈসে ইন বংগালীন কো কাঢ়ো)'।"

তাই কৃষ্ণদাস অডীংগ হইতেই ফিরিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন আসিলেন। তিনি বাঙ্গালীদের কহিলেন, 'আমি তো শ্রীগুসাঁইজীর কাছে অডেলে চলিলাম, তোমরা সাবধানে শ্রীনাথজীর সেবা করিও।' অন্য সব সেবক-গণকেও কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'শ্রীগুসাঁইজীর কাছে একটু কাজ আছে, আমি তাই অডেলে চলিলাম, তোমরা সাবধানে থাকিবে। তার পর শ্রীনাথজীর কাছে বিদায়

লইয়া কৃষ্ণদাসজী অডেলে যাত্রা করিলেন……। তখন গোসাঈঁজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৃষ্ণদাস তুমি কেন আসিয়াছ ?' তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন যে, "শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবে, আর বাঙ্গালীরা বড়ই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু ভেট আসে সব তাহারা লইয়া যায় এবং নিজ গুরুদিগকে দেয় (বংগালীন নে বহুত মাথৌ উঠায়ৌ হৈ জো ভেট আবত হৈ সো লে জাত হৈঁ সো সব অপনে গুরুন কো দেত হৈঁ)।"

তখন গোসাঈঁজীও বলিলেন, "পূর্ব্বদেশ হইতে প্রায় লক্ষ টাকার ভেট দিয়া ঠাকুরের সব সোনার আভূষণ ও দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বাঙ্গালীরা বছরখানেকের ভিতরে সব লইয়া গিয়াছে এবং নিজ গুরুদেরকে নিয়া দিয়াছে।" এই কথা বলিয়া গোসাঈঁজী কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, "বাঙ্গালীরা মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে মহাপ্রভু স্বয়ং নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে এখন তাড়ান যায় কেমনে ?"

তখন কৃষ্ণদাস গোসাঈঁজীকে বলিলেন, "মহারাজ, শ্রীনাথজী স্বয়ং আজ্ঞা করিতেছেন, বাঙ্গালীদের তাড়াও, এই কথায় আপনি আর কিছু বলিবেন না (শ্রীনাথজী কী আজ্ঞা হৈ জো বংগালীন কোঁ নিকাসৌ তাতে আপ যা বাত মেঁ কছু মতি বোলৌ)। আপনি যদি আমাকে আজ্ঞা দেন তবে আমিই সব ঠিক করিয়া লইব। যেমন করিয়া বাঙ্গালীদের বাহির করা যায় তেমন করিয়া তাড়াইব (জৈসে বংগালী নিকসেংগে তেসে কাঢ়ূঁ-গৌ)। তখন শ্রীগোসাঈঁজী বলিলেন যে "অবশ্য।" তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, "মহারাজ আগে দুইখানি পত্র লিখুন, একখানি রাজা টোডরমলকে, অন্যখানি বীরবলকে।" …গোসাঈঁজীও উভয়কে লিখিলেন, "কৃষ্ণদাস যাহা কহেন তাহাই করিবেন।"…কৃষ্ণদাস আগরা আসিয়া টোডরমল ও বীরবলের সঙ্গে দেখা করিলেন ও পত্র দিলেন। পত্র পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে কহিলেন, "তুমি যেমন বলিবে, তেমনই করিব।" তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, "এখন তবে আমি মথুরা চলিলাম, বাঙ্গালীদের তাড়াইতে (বংগালীন কোঁ কাঢিবে কোঁ)।"

…পথে অবধূতদাসের সঙ্গে দেখা। অবধূতদাস কহিলেন, "কৃষ্ণদাসজী ঢিলেমি করিতেছে কেন ? বাঙ্গালীদের তাড়াও (ঢীল কহা করি রাখী হৈ বংগালীন কোঁ কাঢ়ৌ), শ্রীনাথজীরও ইহাই ইচ্ছা, তাঁহার আপন ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবে।" তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "গোসাঈঁজীর আজ্ঞা লইয়া আসিতেছি, এখন যাইয়া বাঙ্গালীদের খেদাইব" (অব জায়কে বংগালীন কো কাঢ়ত হৌ)।…

সেই সব বাঙ্গালীর বাস-কুটীর ছিল রুদ্র কুণ্ডের তীরে। কৃষ্ণদাস এক দিন বাঙ্গালীদের কুটীরে দিলেন আগুন লাগাইয়া। আগুন লাগিলে মহা গোলমাল হইল। তখন বাঙ্গালীরা সেবা ছাড়িয়া পর্ব্বতের নীচে দৌড়াইয়া আসিল। ততক্ষণে কৃষ্ণদাস আপন লোকজন পর্ব্বতের উপর পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীরা আসিয়া দেখে কৃষ্ণদাস কুটীরে আগুন লাগাইয়াছেন। তখন বাঙ্গালীরা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে লড়িতে লাগিল। তখন কৃষ্ণদাস সকলকেই দুই দুই চারি চারি লাঠি লাগাইয়া দিলেন (তব কৃষ্ণদাস নে দ্বৈ দ্বৈ চার চার লাঠী সবন মেঁ দীনী)।

তখন সেই সব বাঙ্গালী সেখান হইতে পলাইয়া মথুরা আসিল। রূপ সনাতনের কাছে আসিয়া সব কথা কহিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণদাসও আসিয়া সেখানে খাড়া হইলেন। রূপসনাতন * কৃষ্ণদাসের উপর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "কেন তুমি শূদ্র হইয়া এই সব ব্রাহ্মণদের মারিলে ?" তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, "আমি না হয় শূদ্রই আছি, কিন্তু তুমিও কিছু অগ্নিহোত্রী নহ। তুমিও তো কায়স্থ।" তখন সনাতন কহিলেন, "এই সব কথা বাদশাহ শুনিলে তুমি কি জবাব দিবে ?" তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি তো বেশ জবাব দিব, কিন্তু তোমার জবাব দিতে মুশকিল আছে। তোমাকে জবাব দিতে হইবে কেন তুমি কায়স্থ হইয়া এই সব ব্রাহ্মণকে দণ্ডবত করাও ?" তখন রূপ-সনাতন চুপ করিয়া রহিলেন, বাঙ্গালীদের কহিলেন, "তোমরা জান আর ইনি জানেন (এ সব কথার মধ্যে আমি নাই)।"

তখন বাঙ্গালীরা মথুরায় হাকিমের কাছে গেল। কৃষ্ণদাসও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হাকিম কহিলেন, "যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে কিন্তু এখন ইহাদিগকে রাখ। তখন কৃষ্ণদাসে কহিলেন, "এখন তো আর ইহাদিগকে রাখিব না। এঁরা তো আমাদের চাকর ছিল, আমরা ইহাদের উপর সেবার ভার দিয়াছিলাম, তবে ইহারা সেবা ছাড়িয়া কেন নীচে নামিয়া আসিল। যদি ইহাদের কুটীর জ্বলিয়াই গিয়াছিল তবে না হয়

* রূপ সনাতনকে তিনি একজন মনে করিয়াছেন। অথবা ভাইদের মধ্যে এইরূপ যুক্তনামে একের বা উভয়ের উল্লেখ দেখা যায় যথা দাদুর কন্যাদের নাম নানীবাঈ ও মাতাবাঈ কিন্তু উভয়কেই নানীমাতা বলে। পূরণশূরণও এইরূপ যুক্তনাম। প্রথম বারে "রূপ সনাতন" ও দ্বিতীয় বারে মাত্র "সনাতন" বলাতে মনে হয় রূপের ভাই সনাতনকেই তিনি বুঝাইয়াছেন।

নূতন কুটীর ছাওইয়া দিতাম, ঠাকুরকে ছাড়িয়া ইহারা নাবিল কেন? তাই এখন তো আর ইহাদিগকে রাখিব না। তাতে আপনি বলিতেছেন, 'শ্রীগোসাঈঁজীকে লিখিব, তিনি যেমন বলিবেন তেমনই করিব।' তা আপনি গোসাঈঁজীকে লিখিতে হয় তো লিখুন।" গোসাঈঁজীর সঙ্গে তো আগেই সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

পরে কৃষ্ণদাস গেলেন শ্রীনাথ-দ্বারে আর বাঙ্গালী সব গেল শ্রীকুণ্ডে। তখন কৃষ্ণদাস গোসাঁঈজীকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে বাঙ্গালীদের তাড়াইবার সংবাদ সবিস্তারে লিখিলেন আর জানাইলেন "এখন আপনি যদি এক বার আসেন তবে ভাল হয়।"...পরে শ্রীগোসাঁই শ্রীনাথদ্বারে আসিলেন, তখন সেই সব বাঙ্গালী তাঁহার কাছে আসিল। তখন তাহারা গোসাঁঈজীকে বলিল, "মহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যজী আমাদিগকে সেবাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণদাস আমাদিগকে তাড়াইলেন!" তখন গোসাঈঁজী বলিলেন, "আগুন লাগিয়াছে বলিয়া তোমরা সেবা ছাড়িয়া (নিজ নিজ কুটীরের দিকে) গেলে কেন? দোষ তো তোমাদের, তাই এখন আর তোমাদিগকে সেবার কাজে রাখিব না।"

তখন সেই সব বাঙ্গালী বহু মিনতি করিতে লাগিল যে, "মহারাজ এখন আমরা খাইব কি?" তখন গোসাঁঈজী তাহাদিগকে নাথজীর সেবার পরিবর্ত্তে মদনমোহনজীর সেবাতে নিযুক্ত করিলেন, এবং কহিলেন যে ইঁহার সেবা তোমরা করিও এবং যাহা (ভেট) আসিবে তাহা খাইবে। তখন সেই সব বাঙ্গালীরা মদনমোহনজীর সেবা করিতে লাগিলেন ও গোবর্দ্ধনে বাস উঠাইয়া দিলেন। তার পর শ্রীনাথজীর সেবাতে গুজরাতী ব্রাহ্মণেরাই "ভীতরিয়া" নিযুক্ত হইলেন।* (চৌরাশী বার্ত্তা, কৃষ্ণদাস অধিকারী তিনকী বার্ত্তা, প্রসংগ ২)

হয়তো ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মদনমোহন বল্লভ-সম্প্রদায়ের মন্দির। আসলে মদনমোহন ঠাকুর শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন হইতে পরে এই ঠাকুর জয়পুর করৌলীতে নীত হয়। সেখানেও মদন-মোহনের সেবকেরা সব বাঙ্গালী। হয়তো শ্রীসনাতনই বিপন্ন বাঙ্গালী সেবকদের মদনমোহনের সেবায় নিযুক্ত করেন।

* এই পর্য্যন্ত একেবারে অবিকল অনুবাদ। ইহার পরে মর্ম্মানুবাদে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এই কৃষ্ণদাস অধিকারী পরে এক বার আগরা গিয়া এক বেশ্যার নৃত্যগীতে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দশটি মুদ্রা দিয়া কহিলেন, "রাত্রিতে তোমাদের দলবল লইয়া আমার বাসাতে আসিও।" এক প্রহর রাত্রিতে তাহারা আসিল। নৃত্য-গীত হইল। কৃষ্ণদাসের খুব ভাল লাগিল। বেশ্যাকে এক শত টাকা দিয়া কৃষ্ণদাস কহিলেন, "তোমার নৃত্যগীত চমৎকার।" কৃষ্ণদাস তাহাকে পূরবী রাগে একটি পদও শিখাইলেন এবং তাহাকে লইয়া নাথ-দ্বারে গেলেন। ঠাকুরের উত্থানের সময় কীর্ত্তনীয়াদের ডাকা হইল না, ঐ বেশ্যারই নৃত্যগীত চলিল। কৃষ্ণদাসের আগ্রহে শ্রীনাথজীও ঐ বাঈজীকে অঙ্গীকার করিলেন। (ঐ, প্রসংগ ৫)

সেই গঙ্গাবাঈর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের বহু প্রীতি ছিল। গোসাঈঁজীর তাহা ভাল লাগিত না। এক দিন ভোগের সময় গঙ্গাবাঈর দৃষ্টি পড়াতে শ্রীনাথজী খাইলেন না। নিদ্রিত ভীতরিয়া সেবককে শ্রীনাথজী লাথি মারিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "আমার খাওয়া হয় নাই।" গোসাঁঈজী খবর পাইয়া স্নান করিয়া পাক করিলেন ও ভোগ সরাইলেন। ভোগ অতি অপূর্ব হইল। কৃষ্ণদাস তখন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, আপনি নিজেই ভোগ প্রস্তুত করিলেন, আপনি নিজেই তাহা খাইলেন, ইহাতে উত্তম কেন না হইবে?" গোসাঁঈজী হাসিয়া কহিলেন, "তোমার জন্যই এই কর্ম্মভোগ!" (ঐ, প্রসংগ ৫)

এই কথাতে কৃষ্ণদাস চটিলেন। গোসাঁঈজীকে আর গোবর্দ্ধন পর্বতের উপর মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। যদিও গোসাঁঈজী শ্রীনাথদ্বারের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্যের পুত্র, তবু তিনি অধিকারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। এই খবর বীরবলের কানে গেল; তিনি বলিলেন, "আমি এখন যাইয়া কৃষ্ণদাসকে তাড়াইয়া দিব।" বীরবল কৃষ্ণদাসকে বন্দী করিলেন। পরম বৈষ্ণব গোসাঁঈজী তাহা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কহিলেন, "হায় হায় মহাপ্রভুর সেবকদের এইরূপ দুঃখ সহিতে হইল!" কৃষ্ণদাসকে না দেখিলে তিনি আর ভোজন করিবেন না শুনিয়া বীরবল কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস আসিয়া গোসাঁঈজীকে দণ্ডবৎ করিয়া নূতন গান রচনা করিয়া তাঁহার স্তবগান করিলেন। (ঐ, প্রসংগ ৭)

কৃষ্ণদাস বহু বৎসর ধরিয়া মন্দিরের অধিকার চালাইলেন। একবার এক জন ভক্ত আসিয়া কৃষ্ণদাসকে একটি কূপ খনন করাইতে তিন শত টাকা দিলেন। তাঁহার সময় ছিল না বলিয়া ভক্তটি কৃষ্ণদাসকেই টাকাটা বুঝাইয়া দিয়া সব ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস দুই শত টাকা

দিয়া কূপ করাইলেন, এক শত টাকা এক বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিলেন। কূপ সমাপ্ত হইলে এক দিন কৃষ্ণদাস তাহা দেখিতে গেলেন। কূপের মুখে লাঠি ভর করিয়া দেখিতেছেন এমন সময় হঠাৎ লাঠি সরিয়া গেল, কৃষ্ণদাস কূপে পড়িয়া গেলেন। এই খবর শুনিয়া রামদাসজী বলিলেন, "অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ" অর্থাৎ তামসিক লোকের অধোগতিই হয়। গোসাঁঈজী বলিলেন, "রামদাস, এমন কথা মুখে-আনিতে নাই।" (ঐ, প্রসংগ ৮)

এখানে একটি কথা উল্লেখ করার যোগ্য। শ্রীনাথজীর সেবাতে যেসব বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা সবাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু উল্লিখিত বৈষ্ণব বার্ত্তায় তাঁহাদিগকে কোথাও বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই, উপেক্ষার সহিত "বংগালী" মাত্র বলা হইয়াছে। অথচ অন্য দেশীয় বৈষ্ণবদের পরিচয় দিতে গিয়া ব্রাহ্মণাদি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এত কাল পূর্বেও এইরূপ মনোবৃত্তি দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়।

গ্রামের মেয়ে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

গ্রামের মেয়ে আমি তোমায়
বাসি ভালো।
আঁধার ঘরের কোণে তুমি
প্রদীপ জ্বালো।
তোমার শাড়ী তোমার শাঁখায়
অলক্তরাগ তোমার দু-পায়
সন্ধ্যামণির মালা খোঁপায়
মন ভুলালো
তোমার দু'টি নয়ন কালো—
গ্রামের মেয়ে!

প্রাণ-জুড়ানো হাওয়া তোমার
আঁচল-তলে
ইচ্ছা করে দু-এক নিমেষ
বাঁচব ব'লে—
ইচ্ছা করে তোমার পাশে
ছন্দ রচি মন্দ ভাষে—
কুন্দ-কলি তেম্‌নি হাসে
পদ্ম জলে
ইচ্ছা করে বাঁচব ব'লে—
গ্রামের মেয়ে!

অনেক দিনের অনেক কথাই
আছে মনে,
সব কি তুমি শুন্‌বে বসি
অকারণে?
বেণুর ঘন শাখার মাঝে
যে সুর শুনি সকাল-সাঁঝে,
শঙ্খে তোমার যে সুর বাজে
সন্ধ্যা-ক্ষণে—
উদাস করে পান্থ-জনে
গ্রামের মেয়ে!

কাজে আমার মন বসে না
শোনো বলি—
স্মৃতির যত গুঞ্জর-গীত
উঠছে জ্বলি।
তুমি যখন আসবে পাশে,
অনেক ফুলের গন্ধ আসে
অনেক কথা দীর্ঘশ্বাসে
পরান ভরি
আকুল করে জীবন-তরী
গ্রামের মেয়ে!

আমার সাথে আসবে তুমি
নদীর ধারে—
আম্র-বন-পথটি বেয়ে
নদীর ধারে?
তোমার কলকণ্ঠ-গানে
নয়নে মোর নিদ্‌ যে আনে
সকল কথাই অতল পানে
বারে বারে,
ছুটে যে যায় অশ্রুধারে
গ্রামের মেয়ে!

গ্রামের মেয়ে আমি তোমায়
বাসি ভালো।
আঁধার ঘরের কোণে তুমি
প্রদীপ জ্বালো।
তোমার শাড়ী তোমার শাঁখায়
অলক্তরাগ তোমার দু-পায়
সন্ধ্যামণির মালা খোঁপায়
মন ভুলালো
তোমার দুটি নয়ন কালো—
গ্রামের মেয়ে!

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ফাল্গুনের মাঝামাঝি, আমের গাছে বোল আসিয়াছে—বাতাস তাহার মৃদুগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। পলাশ ফুটিয়া বন লাল করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টির অন্তরালে কিসের যেন একটা অপূর্ব আয়োজন চলিয়াছে—নূতন পাতায়, ফুলের গন্ধে, কোকিলের ডাকে, বাতাসের উষ্ণতায় তার কিছু কিছু আভাস মিলিতেছে। এমন সময় এক দিন বাঁধের উপর চরিতে চরিতে সরযূ ধোপার গাধাটার মন হঠাৎ অত্যন্ত উন্মনা হইয়া উঠিল। ঘাস হইতে মুখ তুলিয়া সে ভাবিতে লাগিল কি রহস্যময়, আনন্দময় এই পৃথিবী, কত বড়—কত মুক্ত! সেও ত এই আনন্দের, মুক্তির অংশ দাবি করিতে পারে। তবে কেন সে এই নিরানন্দ বন্দী জীবন যাপন করিতেছে? ছোট পল্লী, আরও ছোট ধোপার প্রাঙ্গণ—তারই মধ্যে তাহার জীবনের বহুমূল্য মুহূর্ত্তগুলি কাটিয়া যাইতেছে! ভাবিতে ভাবিতে গাধার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সরযূ ধোপার গাধাটা চিরদিনই ভাবপ্রবণ। এক গ্রাস খাদ্যের ও একটু আশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত হীন ধরণে দৈহিক পরিশ্রম তাহার কোন দিনই ভাল লাগে নাই। তাহার চারি পাশের জীবগুলিও যে হৃদয়হীন ও বেদরদী তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। যদি কোন দিন হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবরাশি সঙ্গীত হইয়া তাহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে যে লাঞ্ছনা তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা কল্পনাতীত। তাহার বিশ্বাস এই নীরস পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহার সত্যকার স্থান নহে—তাহার স্থান আর কোথাও।

গাছের উপর একটা কোকিল মুহুর্মুহুঃ ডাকিতেছিল, গাধা মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া গেল। হঠাৎ কাহার কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমক

ভাঙিল—চাহিয়া দেখিল স্বয়ং সরযূ মাথায় কাপড়ের একটা প্রকাণ্ড বোঁচকা লইয়া রুচিবিরুদ্ধ ভাষায় তাহাকে সম্বোধন ও সম্ভাষণ করিতে করিতে বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছে। গাধা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সরযূ আসিয়া কাপড়ের বোঁচকাটা তাহার পিঠে চাপাইয়া দিল এবং পেটে এক ঘা লাঠি কষাইয়া দিয়া কহিল, "চল্ হারামজাদ।" গাধা চলিতে শুরু করিল বটে, কিন্তু লজ্জায় ক্ষোভে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, আমের গাছে এত বোল ধরিয়াছে, বনে এত পলাশ ফুটিয়াছে, এত কোকিল ডাকিতেছে, তাহার মধ্যে এ কি অসুন্দর, এ কি ভয়ানক গন্ধময় ঘটনা!

ছোট্ট পাহাড়ে নদী, অর্দ্ধেক বালি আর অর্দ্ধেক জল—তাহার তীরে আসিয়া সরযূ গাধার পিঠ হইতে কাপড়ের বোঁচকা নামাইয়া লইল। এইখানে সে রোজ কাপড় কাচে। গাধা ছুটি পাইয়া এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া চলিল। এই নদীর ধারটি তাহার বড় ভাল লাগে, প্রতিদিনই অনেকক্ষণ তাহাকে এইখানে একাকী কাটাইতে হয়। কঙ্করময় নদীতীরে তৃণের বড় অভাব—খুঁজিয়া-পাতিয়া দুই-চারিটি যাহা পায় তাহাই সে চাখিয়া চাখিয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া পরমানন্দে ভোজন করে। আজ আর তাহার তৃণে অভিরুচি নাই, নিকটে একটা মহুয়া গাছের তলায় গিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিদিন সে ঘাড় হেঁট করিয়া ঘাস খায়, দৃষ্টি থাকে মাটিতে আবদ্ধ, আজ ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল নদীর ওপারে। গাধা বিস্ময়ে মনে মনে বলিয়া উঠিল, "আহা, কি সুন্দর!" নদীর ওপারে কঙ্করময় মাঠ বহুদূর পর্যন্ত ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরে সবুজ শালবন—শালবনের পিছনে ধূসর পাহাড়। গাধা সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সুদূরের ঐ ধূসর পাহাড় গর্দভ-হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। গাধা কল্পনা-নেত্রে দেখিল পাহাড়ের ঢালু গায় সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, পাহাড়ের পদতলে আঁকাবাঁকা ছোট নদী, পাহাড়ের মাথায় ঘন বনের গভীর ছায়া। আহা, ঐ ত তাহার সত্যকার আবাস! ক্ষুদ্র ধূলিময় কুৎসিত মানবপল্লীতে স্বাধীনতা কোথায়, আনন্দ কোথায়? ঐ দূর পাহাড়ের উদার বুকেই স্বাধীনতার আসন পাতা—আনন্দের ঝরণা প্রবহমান। ভাবিতে ভাবিতে গাধার লেজটি পর্যন্ত নিশ্চল হইয়া গেল।

বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি লইয়া গাধা সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কাপড়ের বোঝা পিঠে করিয়া সরযূ ধোপার ক্ষুদ্র আঙিনায় ফিরিয়া আসিল। সরযূর স্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া ডাকিল, সে ডাক তাহার কানে প্রবেশ করিল না; সরযূর ছেলে ধনীরাম অভ্যাসমত তাহার কান ধরিয়া টানিল—সে আজ তাহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিল। রাত্রি গভীর হইতে চলিল, তাহার চোখে ঘুম নাই। সরযূর ছোট আঙিনা আরও ছোট মনে হইল। ভাঙা প্রাচীরটা অন্ধকারে কঙ্কাল-মূর্তির মত মনে হইল—মনে হইল যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিবার জন্য ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে। মনে পড়িল নদীর ওপারের সেই ধূসর পাহাড়কে। গাধার মন মুহূর্ত্তে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—ঐ অনুচ্চ ভাঙা প্রাচীর তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না—সে তাহার সুদূর স্বপ্নলোকের দিকে যাত্রা করিবেই। সরযূর নিরীহ দুর্বল গাধা এক লাফে প্রাচীর ডিঙাইয়া পথে আসিয়া পড়িল, পথ অতিক্রম করিয়া মাঠে আসিয়া পড়িল—মাঠ ছাড়াইয়া নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল। তার পরে নদী পার হইয়া ওপারের পথ ধরিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের গায়, বনের অন্তরালে খানিকটা খোলা মাঠ—সেই মাঠে প্রভাতের রৌদ্রালোকে যে চতুষ্পদ প্রাণীটি চরিতেছে সে যে অভিজাত-বংশীয় তাহা তাহার দীর্ঘ কান দুইটি প্রমাণ করিতেছে। সে আর কেহ নহে, সরযূ ধোপার গাধা। পল্লীর অসুন্দর অপরিচ্ছন্ন গন্ধময় আবেষ্টনের পরিবর্ত্তে আজ তাহার চতুর্দিকে অপূর্ব কাব্যলোক বিরাজ করিতেছে। সে আজ এই কাব্য-লোকের এক জন। গাধা কখনো ঘাস খাইতেছে, কখনো প্রকৃতির শোভা উপভোগ করিতেছে। তাহার মনে আজ কি অনির্বচনীয় আনন্দ! দরজায় দরজায় কাপড়ের বোঝা বহিয়া লইবার জন্য যে তাহার মত এত সুন্দর, এত ভাবুক গাধার সৃষ্টি হয় নাই তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল।

কচি ঘাসে যখন তাহার পেট ভরিয়া উঠিল তখন সে পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া ধীরে ধীরে নদীর দিকে নামিয়া চলিল। নদীর ক্ষীণ জলধারা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—গাধা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত সেই জল পান করিল। তার পরে বহুক্ষণ ধরিয়া সলিল-দর্পণে আপনার অপরূপ মুখশ্রী দর্শন করিল। বেলা পড়িয়া আসিলে গাধা আবার পাহাড়ের একটা উচ্চ স্থানে উঠিয়া পড়িল। সেখান হইতে নিম্নভূমিকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। গাধা চাহিয়া দেখিল নীচের গাছগুলি ক্ষুদ্র গুল্মের

আকার ধারণ করিয়াছে, তরঙ্গায়িত মাঠ সমতল হইয়া গিয়াছে—গ্রামগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে ধোঁয়া হইতে অনুমান করা যায়। ঐ ধূলিমলিন জগৎ হইতে সে আজ কত উচ্চে!

বিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে রাত্রি নামিয়া আসিল। নিম্নভূমি অদৃশ্য হইয়া গেল, অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার গাঢ়তর হইল—গাধা একটু ভয় পাইল। এমন নির্জন স্থানে রাত্রিবাস সে আর কখনো করে নাই। মনের ভাবময় অবস্থাটা অনেক কমিয়া আসিল। রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, তাহার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ততই অধিক হইতে লাগিল। সরযুর আঙ্গিনার কথা মনে পড়িল—অপরিচ্ছন্ন হইলেও, ক্ষুদ্র হইলেও রাত্রিবাসের পক্ষে তাহা যে পাহাড়ে ঘনবনের চেয়ে উপযোগী সে কথা তাহাকে স্বীকার করিতে হইল। এত দিন সে ভাবিত সরযুর কদাকার গৃহ এবং প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি কেবলমাত্র তাহার কবিহৃদয়কে পীড়া দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে সেই প্রাচীন মতটা বদলাইয়া গেল।

সকাল হইতেই গাধা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভোরের আলোয়, পাখীর গানে তাহার মতটা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। মাঠে গিয়া প্রচুর ঘাস খাইল, নদীতে গিয়া জলপান করিল, বনে বনে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিল—তার পরে একটি পলাশ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আর কি করিবে ভাবিতে লাগিল। বহু অবসর, কাজ নাই—অথচ একটা কিছু না করিলে ভাল লাগে না। গাধার মনে প্রশ্ন উঠিল এই ভাল না-লাগার মানে কি? ইহা কি বহুদিনের অভ্যাসের কুফল? আবাল্য কাজ করিয়া করিয়া এমন একটা খারাপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কাজ না করিলেই নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হয়? ইহাই কি দাসমনোভাব? অনেক ভাবিয়াও গাধা কোন কিনারা করিতে পারিল না। অবশেষে ঠিক করিল খানিক দৌড়াইবে—তাহাতে সময়ও কাটিবে, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে।

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম, গাধা লেজ উঁচু করিয়া দৌড়াইতে শুরু করিল—সে অপরূপ গতিভঙ্গী যে স্বচক্ষে দেখে নাই, সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। কিছু দূর ছুটিয়া গাধা হঠাৎ থামিয়া গেল, তাহার মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। তাহার এই গতির পশ্চাতে আজ সরযু ধোপার বংশদণ্ডের প্রেরণা কই? সরযুর লাঠি তাড়না না করিলেও সে তাহা হইলে ছুটিতে পারে, অর্থাৎ সে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছুটিত তাহা হইলে সরযুর লাঠির বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইত। সরযুকে সে কেন তবে অত্যাচারী বলিয়া এত দিন
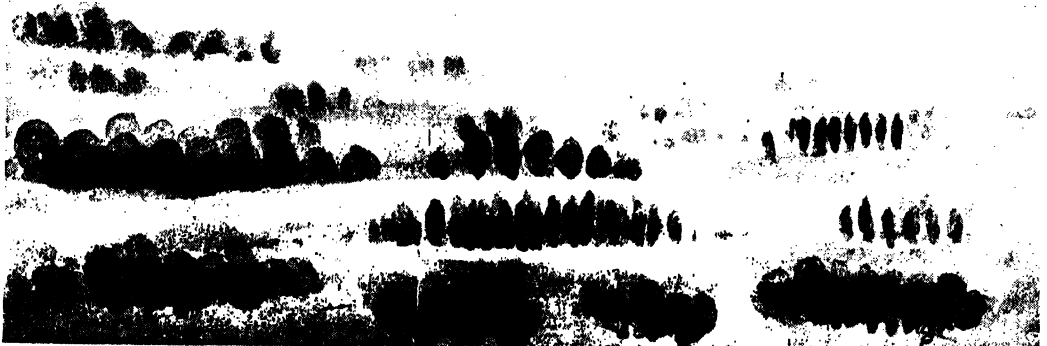
ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে? আহা বেচারার উপরে অত্যন্ত অবিচার সে করিয়াছে! অনুতপ্ত গাধা সুদূর গ্রামের দিকে তাকাইল—চোখে পড়িল ক্ষুদ্র নদী একটি ক্ষীণরেখার মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। উহার জলে সরযূ ধোপা প্রতি দিন কাপড় কাচিতে আসে, তাহার অভাবে সে নিজেই কাপড়ের বোঝা মাথায় করিয়া যাতায়াত করে। গাধার হৃদয়ের উপকূলে চিন্তার ঢেউ একটির পর একটি আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। রৌদ্র-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কেনই বা সরযূ মলিন কাপড় সংগ্রহ করে এবং কেনই বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া মাথায় করিয়া আবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়? সে ত অনায়াসে তাহার কদর্য্য পল্লী এবং হৃদয়হীন পল্লীসমাজ ত্যাগ করিয়া এই পাহাড়ের কোলে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারিত? তবু কেন সে তাহা করে নাই—এ কি রহস্য!

চিন্তা যে এক প্রকার ব্যাধি তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন-না চিন্তাক্লিষ্ট সরযূ ধোপার গাধার সেদিন আহারে আর রুচি রহিল না। দুই-চারি বার ঘাসে মুখ দিল বটে, কিন্তু খাইল না—কেমন এক রকম অন্যমনস্ক ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অখণ্ড অবসর, চারিদিকে অপূর্ব শোভা, কিন্তু গাধার ললাটে চিন্তারেখা। এত নির্জনতা যেন আর ভাল লাগে না। মনে পড়িল জান্‌কী ধোপার গর্দভীকে। পথে দেখা হইলেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে তাকায়—সে দৃষ্টি কি মধুর! এক দিন নিরালায় দেখা হইয়াছিল—কি একটা কথা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই। আসিবার আগে তাহাকে ত কিছুই বলিয়া আসে নাই। পল্লীর নিরানন্দ আবেষ্টনের মধ্যে জান্‌কীর তরুণী গর্দভীকে একা ফেলিয়া সে নিজে পলাইয়া আসিল এটা কি উচিত হইয়াছে! কি কাপুরুষ, কি নিষ্ঠুর, কত বড় স্বার্থপর সে! আহা, বেচারী কতই যেন নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। গাধার বুকটা খালি করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—চোখ দুটিও সজল হইয়া আসিল। কাছে থাকিতে যে-কথাটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই, দূরে আসিয়া আজ হঠাৎ সেই কথাটা স্পষ্ট বুঝিল—বুঝিল জান্‌কীর তরুণী গর্দভীকে সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

প্রাকৃতিক শোভা গাধার সজল আঁখিকে আর আনন্দ দান করিতে পারিল না, বসন্তের বাতাস তাহার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে পারিল না। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সুদূর গ্রাম হইতে যে সূক্ষ্ম ধূমরেখা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছিল, গাধা অপলক চক্ষে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার আত্মা তাহার দেহেই রহিল—না—ঐ সুদূর গ্রামে কোন্ এক বিরহিণী গর্দভীর নিকট চলিয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

আবার রাত্রি আসিল। গাধা একটি গাছের নীচে আশ্রয় লইল। রজনীর বিরাট্ অন্ধকারে পৃথিবীর অরণ্য পর্বত ঢাকা পড়িল, কিন্তু গাধার মনের কতিপয় সমস্যা ঢাকা পড়িল না। সে চোখ বুজিয়া ধ্যানমগ্ন হইল। এই ভাবে প্রহরখানেক কাটিয়া গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা, দক্ষিণের শীতল সুরভি বাতাস এবং মশকের অভাব গাধার চোখে ঘুম আনিল। ঘুমাইয়া সরযূর গাধা স্বপ্ন দেখিল ধূলিময় জনবহুল পথ দিয়া সে বিরাট্ এক বোঝা পিঠে করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে—সে-বোঝা মলিন কাপড়ের নয়—সে-বোঝা দুনিয়ার যত দুঃখ-শোক, ভয়-ভাবনা, অভাব-অনটনের বোঝা। বোঝার বিষম ভারে পিঠ তার বাঁকিয়া গিয়াছে, পা টলিতেছে, তবু মনে তার কি নির্মল আনন্দ—সে যে দুনিয়ার যত দুঃখের বোঝা নিজের পিঠে তুলিয়া লইয়াছে! বুকের মধ্যে একটা পরম শান্তি লইয়া গাধার ঘুম ভাঙিল—স্বপ্নে তাহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে দূরে পলাইলে চলিবে না—সমাজের ধূলিময় পথে তাহাকে সকলের দুঃখ-শোকের বোঝা বহন করিয়া চলিতে হইবে।

সকাল বেলা সরযূর ছেলেমেয়ে ঘরের দরজা খুলিয়া আঙিনায় বাহির হইয়া মহা কলরব করিয়া উঠিল—তাহাদের গাধা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে!

জার্ম্মানীর নবনির্ম্মিত রাইখস্ অটোবান
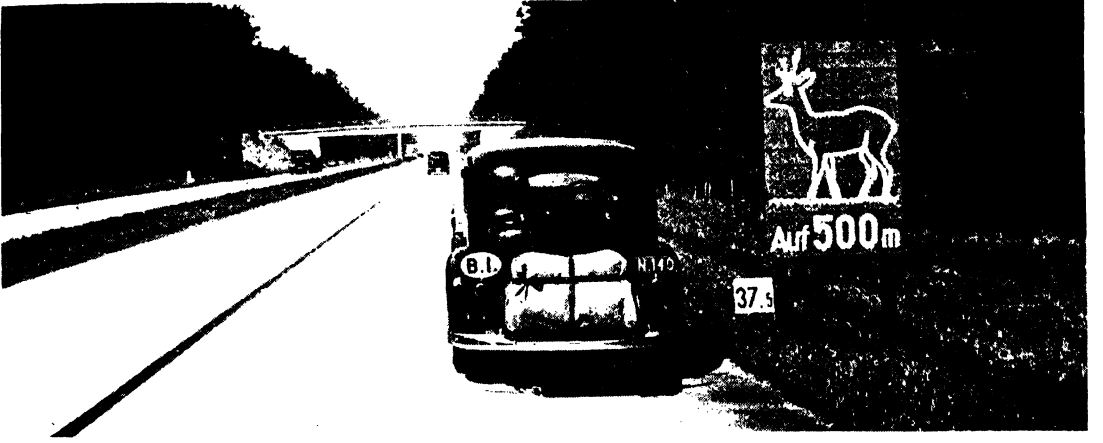
রাজপথ

শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ

মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত পথের তুলনায় বর্ত্তমান ভারতের পথসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট এ কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন আছে কি না জানি না। বর্ত্তমান সময়ে কয়েকটি সমৃদ্ধ নগরীর অন্তর্গত ও তৎসংযুক্ত পথ এবং কলিকাতা হইতে পেশোয়ারব্যাপী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—এই প্রসিদ্ধ পথ ব্যতীত ভারতে পথের দুর্দ্দশা পথচারী মাত্রেই কষ্টের সহিত অনুভব করিয়া থাকেন। অধুনা ভ্রমণে পরাঙ্মুখতার অন্যতম কারণ পথসমূহের দুরবস্থা ও তজ্জনিত অপরিমিত অধ্বশ্রম। শ্রীরামচন্দ্রের ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে স্বতঃই মনে হয় সে যুগে পথকষ্ট বুঝি বা এত বেশী ছিল না। গৌতম মুনি হয়ত নিজ আশ্রম হইতে যোগবলে বহুদূরে স্থিত গঙ্গা নদীতে স্নানার্থ প্রত্যহ যাইতেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যে রাজপথই যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হইত ইহা সহজে অনুমেয়।

সেকালের পথনির্ম্মাণ সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রসমূহের স্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুধাবন করিলে এই কথাই মনে হয় যে, আমাদের অধুনাবিস্মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিকল্পনা কত সুন্দর কত উদার ছিল। নূতন নগর পরিকল্পনায় নগরবিধায়ক যথাক্রমে ভূমিপরীক্ষা, ভূমিসংগ্রহ, দিক্‌পরিচ্ছেদ, পদ-বিন্যাস, বলিকর্ম্মবিধান, নগরবিন্যাস, ভূমিবিধান, গোপুর-বিধান, মণ্ডপবিধান, রাজবেশবিধান, নগরবিশেষের কৃষি, বাণিজ্য, বিদ্যা বা সমরবিষয়ে প্রাধান্য বা উপযোগিতা অনুসারে স্থির করিতেন। এই সব নগর-নগরীর অন্তর্বর্ত্তী ও যোগসূত্রস্বরূপ গ্রাম-গ্রামান্তরের পথসমূহের পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয়তাবোধে প্রকারভেদ করিতেন। বিভিন্ন পুরাণে ও প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধে নির্দ্দেশসমূহে সামান্যই মতভেদ লক্ষিত হয় এবং তাহাও পরবর্ত্তী কালের উন্নতির জন্য সাধিত হইয়াছে বেশ বোঝা যায়। গ্রন্থকারভেদে যে কিঞ্চিৎ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রমাণ এখনও প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। নহিলে আধুনিক বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণেই কত মনগড়া প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বা তাহার অবলুপ্তি দেখিতে পাইতাম না।

পুরাতন শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পাওয়া গেলেও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অনভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে উহা দুর্ব্বোধ্য। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় 'মানসার' গ্রন্থের ইংরেজী

অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। মানসার গ্রন্থে দেখা যায়, সে যুগে রথী ও পদব্রাজকের জন্য পথের বিভিন্ন অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান রাজপথসমূহে সেই বিধান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। পায়ে চলা পথিকের জন্য 'পাদ্য' পথের এক পার্শ্বে অবস্থিত হইত এবং প্রস্থে উহা রাজপথের এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিত। পথের ব্যবহারিক প্রয়োগভেদে তাহাদের বিভিন্ন প্রস্থ ও বিভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথা বীথি, মার্গ, রথ্য বা রাজপথ, দেশমার্গ, গ্রামমার্গ, সীমামার্গ, শাখারথ্য, উপরথ্য, উপরথ্যিকা, ঘণ্টামার্গ ও জঙ্ঘাপথ। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে এই বিভিন্ন পথসমূহের প্রস্থ ইংরেজী ফুট হিসাবে যথাক্রমে ৭½´, ১৫´, ১০৫´, ৩১৫´, ২১০´, ১০৫´, ৪২´, ৩১½´, ২১´, ও ৭´ ফুট দেওয়া হইল।

সেই যুগে বাষ্পীয় শকট বা লৌহপথ ছিল না; রাজপথসমূহ সমগ্র যানবাহন, শকট, রথ, পদাতিক, অশ্বারোহী, সৈন্যবাহিনী, উষ্ট্রযূথ, হস্তিযূথ, মিছিল বা শোভাযাত্রা অগণিত তীর্থযাত্রীর দল সমস্তই বহন করিত। ভারতের অতীত গৌরবের দিনে রাজপথে কি পরিমাণ লোক-সমাগম হইত, এক একটি অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী কত বৃহৎ ছিল, তাহার ধারণা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। রাজপুতানার প্রাচীন স্বাধীন রাজ্যসমূহে এখনও পুরাকালের সমৃদ্ধির ও রাজপথ সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীক্ষেত্রে পুরীর ৺জগন্নাথদেবের মন্দির-সম্মুখস্থ বড়দাণ্ড পুরাতন রাজপথের প্রস্থের উদাহরণস্বরূপ; রথযাত্রার সময় লক্ষ লোকের স্থান এই রাজপথ রথস্থ বামনরূপী ভগবানের ভার বহন করে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেশমার্গের প্রস্থ ২১০ হস্ত বা ৩১৫ ফুট নির্দ্দিষ্ট আছে। আধুনিক জগতে পৃথিবীর মধ্যে প্রস্থে বৃহত্তম রাজপথ বার্লিন নগরীস্থ পট্‌স্‌ডামের ষ্ট্রাসে (Potsdamer Strasse) অত চওড়া নহে। সাধারণ রাজপথের জন্য সেকালে ৭০ হস্ত বা ১০৫ ফুট নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রাম-গ্রামান্তরের উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনয়ন করিবার জন্য গ্রাম-মার্গের প্রস্থ রাজপথের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২১০ ফুট নির্দ্ধারিত ছিল।

অতিআধুনিক রাজপথে বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহনের জন্য পথের বিভিন্ন অংশ ব্যবহারের জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, প্রাচীন ভারতের নগরীসমূহের মহামার্গে তাহার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার দিনেও "কূর্ম্মপৃষ্ঠ মার্গভূমি কার্য্যা" অনুজ্ঞা অনুসারে রাজপথের মধ্যভাগ ঈষদুচ্চ রাখিয়া পথপার্শ্বস্থ অল্প গভীর নালী দিয়া ধৌতজল বা বারিপাত লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা ছিল। সেকালের নগরের কোন কোন পথ "সুধাশর্করাভিঃ ঘটিতান্" কোনটি "কঙ্করীকৃতা" এবং কোনটি "জতুকৃত"। মোহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পায় এই প্রকার বহু প্রশস্ত রাজপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অনেক পথ 'কুট্টিমক'—পাথর-বাঁধানো রাস্তা নির্ম্মিত হইত। সেকালের সুধাশর্করার নির্ম্মাণ প্রণালী আজ কেহ সঠিক জানে না, তাহা শুধু বালি সিমেণ্টের কংক্রীট বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। তখনকার দিনে যে মশলায় শর্করা বা গুড় দিত যাহার প্রয়োগে পথের দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত, তাহার প্রমাণ আজও নালন্দা ও মোহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া যায়।

প্রত্যেক প্রাচীন নগর বা গ্রামকে বেষ্টন করিয়া একটি বৃত্তাকার মঙ্গলবীথি থাকিত। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে এই মঙ্গলবীথি দিয়া শোভাযাত্রা নগর বা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইত এবং সেই কারণে এই বীথি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। এই সব রাজপথের দুই ধারে সুদৃশ্য বৃক্ষলতাদি এবং সুগন্ধ পুষ্পোদ্যান থাকিত। সে সব দিনের নাগরিক জীবনের উৎসব-আনন্দের বর্ণনা যে-কোন প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়। রাজপথের দুই পার্শ্বে সুশীতল ছায়াবৃক্ষ রোপণের পদ্ধতি আমরা আজ প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। বৃক্ষরোপণের পরিবর্ত্তে বৃক্ষচ্ছেদনের পক্ষপাতী হওয়ায় আমাদের রাজপথ মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্রে পথিকের প্রাণঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ কি ভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে পাইতেছি না?

পথঘাটই দেশের সভ্যতার মাপকাঠি; এই সত্য আজ সভ্যজগৎ সহজেই মানিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ সেই দিক্ দিয়া এখনও পঙ্কিল বন্ধুর বা ধূলিধূসরিত পথবাহী গোশকটের যুগেই আছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইউরোপ ও ইংলণ্ডে এখনও রোমক রাজপথগুলি তদানীন্তন রোমক সভ্যতা ও প্রভুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান। আমেরিকার অতি অল্পকাল মধ্যে এরূপ অতুল সমৃদ্ধির কারণ সেই মহাদেশের রাজপথসমূহের দ্রুত সম্প্রসার। ফরাসী দেশের বিখ্যাত বৃক্ষচ্ছায়াঘন রাজপথ (Boulevard) বাহিয়া ফরাসী ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি আধুনিক কালে জার্ম্মানীর একচ্ছত্র শাসক হের হিটলার
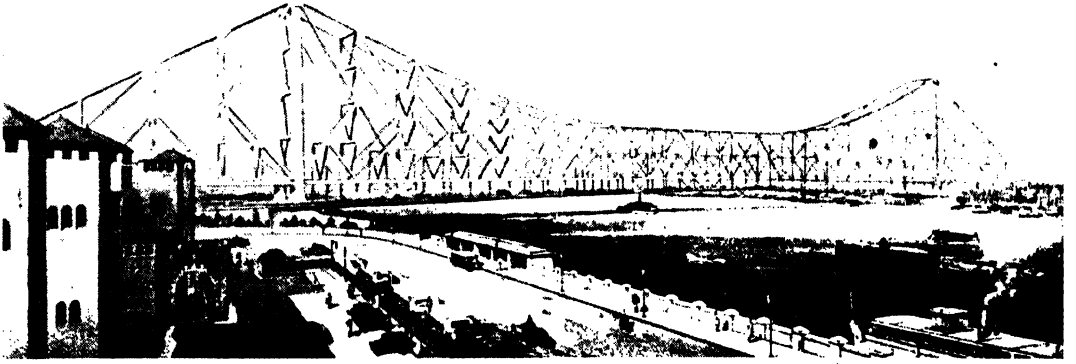
নূতন হাবড়া পুলের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে দেখিতে এইরূপ হইবে

রণদুর্ম্মদ অ্যাটিলা ও চেঙ্গিস খাঁকে এক ব্যাপারে হার মানাইয়াছেন; প্রায় ৫০০০ মাইল প্রসারী বিপরীতগামী মোটরের জন্য মধ্যে ব্যবধানযুক্ত সুপ্রশস্ত যুগ্ম রাজপথ দেখিতে দেখিতে জার্ম্মানীর চতুঃসীমানা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত করিয়া এই সব রাষ্ট্রীয় মোটর পথ (Reichs-autobahn) বাহিয়া আজ হিটলার তাঁহার রণ-উন্মাদনার ইন্ধন যোগাইতেছেন। এই সব রাজপথ বাহিয়া শত শত মোটর ও মালবাহী ট্রাক ঘণ্টায় ৯০ মাইল্ বেগে ছুটিতেছে, কিন্তু পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য দুর্ঘটনা আদৌ ঘটে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পদচারী বা অন্যান্য শ্লথগামী যানবাহনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ পথ আছে।

মোটর শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ফলে আজ অতি সাধারণ মোটরকার ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল অনায়াসে ছুটিতে পারে, কিন্তু আমাদের রাজপথগুলি সেই আদিম যুগের গোশকটের উপযোগী রহিয়াছে এবং একই পথ দিয়া বিপরীতগামী গরুর গাড়ী, মোটরকার, সাইকেল, গবাদি পশু, পথচারী সকলেই কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া যে যার তালে চলিতেছে এবং ইহার ফলে প্রতিনিয়ত সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইতে ভারত সরকার বাহাদুরের রাজপথ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ভারতীয় রাজপথ-উদ্ধার সম্মেলন (Indian Roads Congress) গত ছয় বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রধান প্রধান নগরীতে অধিবেশন আহ্বান করিয়া সকল প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের পূর্ত্তবিদ্‌দিগকে রাজপথ-সম্পর্কীয় গবেষণা, প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনার সুযোগ দান করিয়া এ বিষয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াছে। বে-সরকারী অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে "ভারতীয় রাজপথ ও বাহনপ্রসার সঙ্ঘ" (Indian Roads and Transport Development Association Ltd.) এবং "ভারতীয় কংক্রীট সঙ্ঘ" (Concrete Association of India) ভারতের পথঘাটের উন্নতিকল্পে বিগত পনর বৎসর যাবৎ নানা ভাবে প্রচারকার্য্যের ফলে জনসাধারণের মনে এই সম্বন্ধে সাড়া জাগাইয়াছেন।

উৎকৃষ্ট রাজপথ নির্ম্মাণের সমস্ত উপাদানই অধুনা ভারতে সহজলভ্য। পাথরের খোয়া, ইট, লোহা, সিমেণ্ট, আলকাতরা সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; শুধু আমাদের আয়ব্যয়ের হিসাবের প্রতি দূরদৃষ্টি রাখিয়া এককালীন ভাল ভাবে রাস্তা করিয়া তাহার সময়মত মেরামতের ব্যবস্থা করিলে পথঘাট সংস্কার অভাবে শীঘ্র দুর্দ্দশাপন্ন হয় না। সম্প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্টের পেট্রোল ট্যাক্সের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে (গ্যালন-পিছু দুই আনা, যুদ্ধের কল্যাণে আরও বাড়িয়াছে) পুণা হইতে বোম্বাই নগরী পর্য্যন্ত সিমেণ্ট কংক্রীট রাজপথ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ম্মিত হইতেছে। বারাণসী হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত প্রথম এই ধরণের রাজপথ ১৯২৭ সালে ভারতের এক নগরী হইতে অন্য নগরী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়। তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিমেণ্ট কংক্রীটের দৃঢ়তা যত দিন যায় ততই বাড়ে এবং ইহার ক্ষয় অতি সামান্য বলিয়া মেরামতের খরচ অতি অল্প। এই কারণে জার্ম্মানী, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে এই প্রকার রাজপথ

পুণা বোম্বাই রাজপথ

সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপিয়া দেশের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন আনিয়াছে। মোটরের সহজ গতিবেগ স্পীডোমিটারে এক-শ উঠিতে আর দেরি নাই।

আর এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে হুগলী নদীকে যে লৌহসেতু পরবর্ত্তী যুগের জন্য বাঁধিয়া ফেলিবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানে 'পথের কাঁটা' ছোট বড় অ-বাঁধা নদীনালাগুলিও যথাশীঘ্র সেতু দিয়া বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড যোগসূত্র স্থাপিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিজনিত নৈরাশ্য ও ক্লৈব্য অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে আমাদের রাজপথগুলির সুনির্ম্মাণ ও সংস্কার সম্বন্ধে যত্নবান্ হইতে হইবে। কলিকাতা-বোম্বাই রাজপথ, বাংলার পরিকল্পিত রাজপথসমূহ (কিং সাহেবের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) জনসাধারণের প্রবল আগ্রহের অভাবে নথীভুক্ত হইয়া সরকারী দপ্তরের তাকে কাগজের রিপোর্ট, প্ল্যান, এষ্টিমেটরূপে পড়িয়া আছে। কোন্ ভগীরথ তাহাদের উদ্ধার করিবে?

পুরাতনপন্থী কেহ হয়ত বলিবেন, একটু ধীরে একটু ধুলা খাইয়া একটু কাদা মাখিয়া চলিলে ক্ষতি কি? ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিতকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরন্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥ চরৈবেতি চরৈবেতি

চলাটাই তো পরম মধু, চলাটাই তো স্বাদু ফল (উডুম্বর)। চাহিয়া দেখ সূর্য্যের কি অতুলনীয় আলোক-ঐশ্বর্য্য। সূর্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়া সদাই জাগ্রত ও চলন্ত, ঘুম নাই। অতএব আমরা আরও জোরে চলিব। "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেশ লাগিতেছে বটে, কিন্তু যতটা শান্তি পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম ততটা পাইতেছি না। যতক্ষণ অনিল থাকে, যতক্ষণ জেঠাইমার সঙ্গে, অম্বুরীর সঙ্গে গল্প করি কিংবা খোকা খুকীকে লইয়া থাকি, দিব্য কাটে। একলা থাকিলেই মুশকিল—সেদিন লিণ্ড্‌সে টেরাস মুছিয়া যেমন সাঁতরা জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি এখানে সাঁতরাকে বিলুপ্ত করিয়া লিণ্ড্‌সে টেরাস জাগিয়া ওঠে। ভাবিয়াছিলাম একবার ঘুরিয়া আসি, একটু শান্তি পাইব, আসিয়া দেখি কবে অলক্ষ্যে অশান্তির বীজ বপন করিয়া ফেলিয়াছি, অঙ্কুরিত হইয়াছে, পল্লবিত হইবে, তাহার পর শাখা-প্রশাখা।…শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে।

একলা থাকিলেই মীরার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে তরু, অপর্ণা দেবী, মিষ্টার রায়, দাসদাসী—কত যে আপনার সব! কিন্তু ঐ এক মীরাকে ঘিরিয়া। তরু মীরার বোন—ভাবিতে এত ভাল লাগে!—কিন্তু তবুও কোথায় একটা বেদনা…

কেমন যেন একটা ভয় হয় -যেখানেই যাইব, এই বেদনা কি জন্মের সাথী হইয়া থাকিবে? এ কি বন্ধন! আবার এই বন্ধন হইতে মুক্তিকল্পনায়ও শিহরিয়া ওঠে সমস্ত অন্তরাত্মা। ধর, মীরা নাই, বেদনা নাই;—কি অসীম, দুঃসহ শূন্যতা!

অনিল সমস্ত সপ্তাহটা ছুটি পাইয়াছে। আজ আপিসে যায় নাই। সকাল বেলাটা দুই জনে ঘুরিলাম একচোট, দেখিয়া শুনিয়া, দেখাশোনা করিয়া। দুপুরে দুই জনে আহার করিয়া শুইয়া আছি অনিলের ঘরে। গল্প করিতেছি। ছ-মাসের গল্প জমা আছে, একটু ফাঁক নেই যে নিদ্রা আসিয়া প্রবেশ করে।

অম্বুরী টানা বারান্দার ওদিকটায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া অন্নদামঙ্গল কিংবা রামায়ণ কি মহাভারত পড়িতেছে, খুব নীচু স্বরে, দূর থেকে মাত্র একটা গুন্ গুন্ আওয়াজের মত মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। আজকাল আমাদের খাওয়াইয়া, পাট সারিয়া বই পড়িতে দেরি হয় বলিয়া অনিলের মা পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করেন।

হঠাৎ অম্বুরী বলিয়া উঠিল, "ও মা! তুমি কোথা থেকে? কবে এলে?"

বেশ একটা হাস্যোচ্ছল কণ্ঠে উত্তর হইল, "যমের বাড়ী থেকে। এসেছি কাল সন্ধ্যেয়।"

"ব'সো ঠাকুরঝি, তার পর কি খবর? দু-বচ্ছর আস নি, শুনি বড্ড কড়া লোক, আসতে দেয় না; তা ছাড়লে যে হঠাৎ?"

একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, অনিল উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাও বন্ধ করিয়া লইয়াছে।

সেইরূপ নি-খাদ কণ্ঠেই উত্তর হইল, "জ্বালাস নে বউ, সত্তর বচ্ছরের নড়বড়ে একটা মনিষ্যি—মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ীর দরজা-জানালাগুলোর মত—সে হ'ল কড়া, সে দেবে না আসতে! দু-বচ্ছর আসতে মন চায় নি, আসি নি; আজ মন হ'ল, এলাম।…তার পর, কি খবর? বর কোথায়? শুনলাম নাকি শৈলদা এসেছে?…শুনলাম তোর একটা খুকী হয়েছে?—কোথায় বৌ?—আন না দেখি…"

অনিল চুপ করিয়া আছে। আমিও প্রশ্নের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। স্মৃতি হঠাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে।

অম্বুরী উত্তর করিল, "তবু ভাল, খোঁজ রাখ দেখছি!"

কপট গাম্ভীর্য্যের স্বরে উত্তর হইল, "তুমি তো জান না ভাই, খোঁজ রাখা কত শক্ত! বলে, ছেলেয়-মেয়েয়, স্বামীতে-শ্বশুরে নিজের সংসারের কথা ভেবেই ফুরসৎ থাকে না; বিশেস ক'রে কন্দর্পের মত স্বামী, সদাই ভয়—চোখের আড়াল করি আর কেউ কেড়ে নিক…"

এক ঝলক আবার সেই তরল হাসি। অনিলের রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা একটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ওদিকে গম্ভীর হইয়া—

"না বৌ, মস্করা থাক, এনে দে তোর মেয়েকে দেখি একবার; ছেলেটাই বা কোথায়?"

অম্বুরী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "ওদের কাছে, ঐ ঘরে।"

"তোর বর ঘরে?—শৈলদাও নাকি?"

অম্বুরী নিশ্চয় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "জেগে, না, ঘুমুচ্ছে লো?"

অম্বুরীও নীচু গলাতেই একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "মনে হয় তো ঘুমুচ্ছিল, কিন্তু তুমি যে রকম..."

"মুয়ে আগুন তোমার, বলতে হয় আগে।... নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে; একটু গলা ছেড়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেক দূরে আছি। যা, তুই মেয়েটাকে নিয়ে আয় আস্তে আস্তে। ঐ কোণের ঘরে চল্, এখানে সুবিধে হবে না। শাশুড়ী কোথায়?...তুই আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিস বৌ! দাঁড়াতো দেখি...ঠিক ইচ্ছে করে..."

তাহার পর দুইটা কণ্ঠের একটা উচ্ছল হাসি মাত্র শোনা গেল।

অম্বুরী আসিয়া অতি সন্তর্পণে খুকীকে অনিলের বুকের কাছ থেকে উঠাইয়া লইয়া আবার খুব সাবধানে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমরা গভীর নিদ্রামগ্ন, গাঢ় সুপ্তির নিঃশ্বাস উঠা-নামা করিতেছে।

প্রশ্ন হইল, "ঘুমিয়েছিল?"

"হুঁ।"

"ভাগ্যিস!...তা হোক, এখানে সুবিধে হবে না, খুকীকে আমার কোলে দে, তুই মাদুরটা নিয়ে আয়। বাঃ, কি চমৎকার হয়েছে রে!"

ঘন, আকুল চুম্বনের শব্দ হইতে লাগিল।

ওরা চলিয়া গেলে অনিল প্রশ্ন করিল, "চিনতে পারলি?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "সদু নাকি?"

"হুঁ।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দু-জনেই, তাহার পর আমিই প্রশ্ন করিলাম, "যা বললে কথাটা ঠিক নাকি অনিল?"

"কি কথা?"

"এই সত্তর বছরের কথা?"

"না।"

"তবে?"

"আবার একটুখানি চুপচাপ গেল।

প্রশ্ন করিতেছি না, কি উত্তর দেয় সেই উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছি। একটু পরে অনিল বলিল, "হিন্দুললনা স্বামী সম্বন্ধে কখন এসব বিষয়ে সত্যি কথা বলতে পারে? নরকের ভয় নেই?—অন্ততঃ পাঁচটা বছর কমিয়ে বলেছে।"

তাহার পর আর কোন কথাই হইল না। দুই জনেই বুঝিতেছি দুই জনেই জাগিয়া অথচ যেন কথা কহিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে ওদিককার ঘর হইতে হাসির লহর ভাসিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার একটু আগে চা খাইয়া আমরা দুই জনে বাহির হইলাম। অম্বুরী বলিল, "মেলা রাত ক'রো না যেন।"

অনিল বলিল, "সে অবস্থা রেখেছ?"

অম্বুরী বলিল, "রঙ্গ নয়, দু-জনে একত্তর হ'লে কোন্ জগতে থাক তার তো ঠিকানা থাকে না।"

খানিকটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম; এখানে আসিলে আমাদের যেমন অভ্যাস। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, যখন বিলম্বিত চন্দ্রোদয় হইল তখন আমরা বড় পুকুরের ধারে। এদিকটা এখন জনবিরল হইয়া গেছে। চৌধুরীদের তখন অবস্থা ভাল ছিল, মজা নদী থেকে পুকুরে নূতন জল ফেলিবার জন্য একটা পাকা নালা করিয়া দিয়াছিল। সেটা যেখানে পুকুরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার পাশেই পাকা ঘাট। এখন চৌধুরীদের মত এ দুটারও অবস্থা শোচনীয়। ঘাটটা পরিত্যক্ত বলিলেও চলে, বাগ্দীপাড়ার মেয়েরা অল্প অল্প সরে। তাহারাও প্রায় লোপাট হইয়া আসিতেছে।

যদিও নিরুদ্দেশভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়া, তবু দুই জনেই জানি কিসের টানে আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এটা ছিল আমাদের স্নানের ঘাট, সৌদামিনীর বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া আমরা এখানেই স্নান করিতে আসিতাম, বেশীর ভাগ। প্রথম আকর্ষণ ছিল ঘাটের ওপরের কামরাঙা জাম আর অন্যান্য ফলের গাছগুলো, দ্বিতীয় আকর্ষণ সৌদামিনী। ক্রমে ধারাটা উল্টাইয়া গেল, আমাদের অজ্ঞাতসারেই।—প্রথম আকর্ষণ হইয়া উঠিল সৌদামিনী, দ্বিতীয় আকর্ষণ জাম, কামরাঙা ইত্যাদি। পরে দেখা গেল জাম-কামরাঙার যা কিছু খাতির সৌদামিনীকে লইয়াই।

সৌদামিনীর একমাত্র অভিভাবক ছিল ওর বুড়ী দিদিমা—অত্যন্ত ক্ষীণ একটা প্রভাব। ছেলেবেলা থেকেই ও যেন ছিল কারুর কেউ নয়, সম্পূর্ণ মুক্ত, নিঃসম্পর্কিত। বড় হইয়া যখন রবিবাবুর পদ্য পড়িতে শিখি, তখন "উর্ব্বশী"

পত্রটা পড়িলে মনে পড়িত সৌদামিনীকে, ঠিক মিলিয়া যাইত ওর সঙ্গে।

সেই স্মৃতির মধ্যে আসিয়া বসিয়াছি—আজ দুপুরে যাহা হইয়া গেল তাহার পর না আসিয়া উপায় ছিল না। কেহ কথা কহিতেছি না অথচ বুঝিতেছি দুই জনের মনেই এক প্রবাহ, সেই প্রবাহেই যেন ভাসাইয়া আনিয়াছে আমাদের। মন ক্রমেই যেমন ভরিয়া উঠিতেছে, এক সময় না এক সময় কথা কহিতেই হইবে, বোধ হয় উভয়ে উভয়ের অপেক্ষায় আছি। পূর্বদিকে চাঁদ একটু উপরে উঠিতে তীরের বৃক্ষরাজির উপর দিয়া আলো আসিয়া পড়িল। ধীর সঞ্চারে কখন্ একটা হাওয়া উঠিল—যেন কালের ও-প্রান্ত থেকে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল। বড় পুকুরের কালো জল রুপালী রেখায় রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমিই কথা কহিলাম, বলিলাম, "সদুর কথা তুই আমায় কখন বলিস নি তো অনিল।"

অনিল স্থির দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া ছিল, বলিল, "আশ্চর্য হলি ?"

উত্তর করিলাম, "হ'লাম বইকি।"

অনিল সেই ভাবেই বলিল, "তার চেয়েও একটা আশ্চর্য হবার কথা আছে—অন্ততঃ আমার তো মনে হয়।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

উত্তর হইল, "তুই কখন জিগ্যেস করিস নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "না, করি নি জিগ্যেস। বহুদিন আগে এক বার জিগ্যেস ক'রে শুনলাম, 'বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে।' আর কি জিগ্যেস করব ?"

অনিল বলিল, "তা তো বটেই ;—পরস্ত্রী !"

একটু পরে বলিল, "আমাকেই জিগ্যেস করেছিলি, আমিই ঐটুকু খবর দিয়েছিলাম। তুইও আর কিছু জিগ্যেস করলি নি, আমিও আর তুলি নি ওর কথা। ভাবলাম পরস্ত্রীর কথা শুনিয়ে মহা সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারীর ব্রত ভঙ্গ ক'রে মহাপাতকের ভাগী হই কেন ?"

অভিমানের কথা অনিলের। ওর মুখের পানে চাহিলাম,—স্ফিংসের মত সামনেই চাহিয়া আছে, মুখের রেখাটি কঠিনভাবে নির্বিকার।

একটু পরে আমার মুখ থেকে যেন আপনি আপনিই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, "শেষে পঁচাত্তর বছরের বুড়োর হাতে পড়ল ?···সদু !"

অনিল বলিল, "যখন পড়েছিল তখন অত কোথায় ? পাঁচ বছর তো কেটেও গেল।"

এর পরে বহুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বাগ্দীপাড়ায় একটা গুপী-যন্ত্রের আওয়াজ উঠিল, দু-একটা আলো নিবিল।···মৌন বিস্ময়ে ভাবিতেছি—পাঁচটা বৎসর সৌদামিনী এই ভাবে কাটাইল ! —প্রথম যৌবনের পাঁচটা বৎসর !—নারীজীবনের সার সম্পদ !···কী ব্যর্থতা !···

এক সময় একদৃষ্টিতে কঠোর মুখটা আমার পানে ফিরাইয়া অনিল বলিল, "শৈল, তুই সদুকে বিয়ে কর ; মীরা যে হবে না, বুঝতেই পাচ্ছিস্, She is too far off (ও বহুদূরে)।"

এত বড় ধাক্কা জীবনে কম পায় লোকে। বলিলাম, "ওর স্বামী !···তুই কি বলছিস্ অনিল !···"

অনিল স্থিরকণ্ঠে বলিল, "না, ওর স্বামী থাকতে থাকতে নয়, মরে···মানে স্বর্গগত হ'লে।"

অনিল কথা কহিতেছে ?—আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম ; কহিলাম, "তুই কি বলছিস অনিল ? সদুর বৈধব্য কামনা করছিস ?—সদুর ?—অনিল···তুই !"

আমার ভাষা জোগাইতেছিল না।

অনিল বলিল, "তাই কামনা করলাম শৈল ?—না কামনা করছি ও চির-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকুক ?···তুই যে অন্ততঃ এখনও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর বাঁচবি—এটা আশা করা যায় না ?"

তাহার পর অনিলের মুখ খুলিয়া গেল। বলিল, "আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ অশীতিপর বুড়োকেই গন্ধর্বের রূপযৌবন দিতাম শৈল—সব ভুলে—শুধু সৌদামিনীর জন্যে, কিন্তু তা হবার জো নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি, নিজের সিঁথির সিঁদুরের ওপর বড় মায়া সদুর—কাকে এক বার সজল চোখে বলছিল—'কপালের ঐ আলোটুকু জ্বলতে থাকাই কি কম ভাগ্যি ?'···বুড়োকে এখানে চিকিৎসা করতে নিয়ে এসেছে ; কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার শৈল, আমি দেখে পর্যান্ত এসেছি এর মধ্যে,—দরকার আছে ব'লে আজ সকালে এক বার বেরিয়ে গেছলাম না ?···লোকটা যে এত দিন বেঁচে ছিল কি ক'রে, সেইটেই আশ্চর্য্যের কথা, আর এখন যা অবস্থা হয়েছে দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়, মনে হয় যেন মরবার আগেই ভূত হয়ে ব'সে আছে !···সদুর বর !···কাল চল্ এক বার দেখে আসবি শৈল, ভাগবৎ হালদারের বাড়ীতে রয়েছে···।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ভাগবৎ হালদারের বাড়ীতে!"

অনিল বলিল, "ও, তাও তো বটে, তুই যে কিছুই জানিস্‌ না।···হ্যাঁ, সদু এখন ভাগবতের ওখানেই ওঠে। ভাগবৎ এখন ওর মস্ত বড় অভিভাবক, একেবারে বড়-কুটুম! ওর ঠাকুরমা মারা যেতেই ভাগবৎ ওপরপড়া হয়ে ওকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল,—সেই দিনই। সদু তখন সমর্থ মেয়ে, তা ভাগবতের দয়াতে এক দিনও তাকে অরক্ষিত থাকতে হয় নি। কেউ বললে, 'সাবাস ভাগবৎ', কেউ সদুর জন্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, কেউ বললে, 'ও যা মেয়ে, ঠিক জায়গাতেই পৌছুল—যোগ্যে যোগ্যং যোজয়েৎ।'···তখন ব্যাপারটা অতশত বুঝি না, শুনে যেতে লাগলাম। কিছু দিন গেল, তার পর এল ভাগবতের উপকারের দোসরা দফা। এক দিন গ্রামে জন দুই-তিন নতুন লোক দেখে খোঁজ নিয়ে টের পেলাম ভাগবতের বাড়ী বরযাত্রী এসেছে—সদুর বিয়ে। দিনটা বেশ মনে আছে। বরযাত্রীদের দেখে আমি সদুর সঙ্গে দেখা করলাম। একটু গা-ঢাকা হয়ে এসেছে; খিড়কীর পুকুরে গা ডুবিয়ে সে গামছা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছে, ঘাটে রক্ষক হিসেবে ভাগবতের ছোট মেয়ে নারাণী। ভাগবতের বাড়ীতে লোকজন তো কমই, বিশেষ কাউকে ডাকেও নি···বললাম, 'তোর বর দেখে এলাম সদী।' ···বিয়ের জন্যে মুখখানাকে ঘষে ঘষে রাঙা ক'রে ফেলেছে —অন্ধকার হয়ে এলেও বেশ বুঝতে পারা যায়; কি রকম সৌখীন জানিসই তো। গামছাটা সরিয়ে মুখের এক পাশে জড় ক'রে বললে, 'ও মা, অনিল?—এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, আমি বলি হঠাৎ কে কথা কয়?··· কি রকম বর দেখলি রে?'—ব'লে গামছা দিয়ে মুখটা সব ঢেকে ফেলে শুধু কৌতুকভরা চোখ দুটো বের ক'রে আমার পানে চেয়ে রইল। বললাম, 'ভালই।' সদু হেসে বললে, 'তবে যে শুনছিলাম বর বুড়ো? অবিশ্যি আমায় কেউ বলে নি, এমনি শুনছিলাম।' আমি বললাম, 'তোর শ্বশুর খুব বুড়ো সদু, বরযাত্রীর আর সবাইও বুড়োবুড়োই, শুধু তোর বর দেখলাম কম বয়সী, মানে এই ছাব্বিশ, সাতাশ —তিরিশের মধ্যে।' সদু মুখের জলটা কুলকুচু ক'রে ফেলে দিয়ে বললে—'মরুক গে, শ্বশুর নিয়ে তো আর ধুয়ে খাব না'—ব'লে খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে—'তুই এবার সর অনিল, উঠতে দে আমায়। আর শোন, বিয়ে দেখতে আসবি তো? নিশ্চয় আসবি। তোকে নেমন্তন্ন করেছে? নিশ্চয় করে নি; ভাগবৎ-কাকার জানাশোনা নিজের দলের ক'জন ছাড়া কাউকে বলে নি। না করলেও আমি করলাম। বিয়ে আমার, ভাগবৎ কাকার তো বিয়ে নয়' —ব'লে আবার একবার চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

"গেছলাম বিয়ে দেখতে অনিমন্ত্রিত হ'লেও, অবশ্য না গেলেই ছিল ভাল। ছাদনাতলায় দেখলাম শ্বশুরই বর, বরোচিত লজ্জায় এবং শ্বশুরোচিত বয়সে এত ঝুঁকে গেছে যে মুখই দেখা যায় না প্রায়। আমার যে কী হ'ল!—না ভাল ক'রে বুঝে কি ভুলটাই ক'রে ব'সে আছি! আমি দাঁড়াতে পারি নি, কিন্তু তারই মধ্যে সদুর সঙ্গে একবার চোখোচোখি হ'য়ে গেল, সে যে কী নীরব মর্মন্তুদ দৃষ্টি!— যেন এত বড় প্রবঞ্চনাটা আর যারই কাছে হোক, অন্ততঃ আমার কাছে ও আশা করে নি।"

অনিল আবার চুপ করিল। পাড়াগাঁ হিসাবে রাত্রি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বাগ্‌দী-পল্লীতে দুই-একটা যে আলো ছিল, নিবিয়া গিয়াছে; শুধু জাগিয়া আছে বৈষ্ণবভক্তের সেই গুপীযন্ত্রটা। আমরা দু-জনেই আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল প্রশ্ন করিল, "বদলালো মত?"

মনের যে রকম অবস্থা, একটু বিরক্তিও লাগিল। অনিল দার্শনিক, সবাই তো তাহা নয়। মনের ভাবটা চাপিয়া বলিলাম, "থাক্‌ ও-কথা এখন অনিল।"

অনিল বুঝিল। বলিল, "নাই বদলাক্‌, একটা কথা শুনিয়ে রাখি। জানিস তো সাঁতরায় 'ভাগবৎ হালদারের উপকারের দুই দফা' ব'লে একটা কথা আছে?"

আমি ওর মুখের পানে চাহিলাম।

বলিল, "প্রথম দফা—টাকা হাওলাৎ দেওয়া, অমন খুঁজে খুঁজে উপকার ভাগবৎ ছাড়া আর কেউ পারবে না। তার ওপর সুদের তাগাদা নেই,—টাকা যে ধার দিয়েছে ভুলেই গেছে যেন—বলে গেরস্থ যখন দেবার দেবেই, তাগাদা দিয়ে মিছে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় ফেলা কেন? ফলে ওর সম্বন্ধে লোকে নিশ্চিন্দি হয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় ভাগবৎ তোমার কাঁধ থেকে বিষয়-সম্পত্তি বোঝা পর্য্যন্ত নামিয়ে তোমায় নির্ভাবনা ক'রে দিলে। সদু প্রথম দফা পেয়েছে, এখন দ্বিতীয় দফা বাকি, ভাগবৎ তার গোড়া-পত্তন ক'রে রেখেছে। অবশ্য সদীর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সে নিজে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাহিলাম।

অনিল বলিতে লাগিল, "সদুর স্বামী ভাগবতের কুটুম।

সে যদি স্বর্গে যায়, ভাগবৎ কি সত্নকে ঠেলতে পারে?—যে-ভাগবৎ, যখন একেবারেই কোন সম্পর্ক ছিল না, পরের বোঝা বাড়ী এনে থুয়েছিল। গোড়াপত্তনের মধ্যে আরও একটা দূরদৃষ্টি আছে ভাগবতের।—সত্নর বর আবার যে-সে কুটুম নয়, দূর-সম্পর্কের সম্বন্ধী!—ভাগবতের এমনই আটঘাট বেঁধে কাজ করা মানুষেও সম্বন্ধবিরুদ্ধ একটা কিছু হচ্ছে বলতে পারবে না, ভগবানেও নয়। সবার মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছে। অবশ্য সত্ন এখনও ওকে আগেকার মত 'ভাগবৎ-কাকা' বলেই ডেকে আসছে, বোধ হয় আশা করে এইটেই হবে ওর বর্ম, ভাগবতের উপকারের পরিণতি থেকে ওকে বাঁচাবে।"

অনিল আবার একটু চুপ করিয়া বলিল, "বুঝেছি তোর মনের ভাব শৈল। সত্নর বৈধব্যকে ওর মুক্তি বলতে প্রাণে লাগে; কিন্তু আমি জানি সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যাই বলুক, ও-ও মনে মনে ক্লান্ত। আজ দুপুরে শুনলি তো?··· তার পর, বিধবা-বিবাহ ক'রে সত্নর জীবনে দাগ লাগান!—শিউরে উঠেছিস ভাবতেই। কিন্তু সত্নর সামনে ঐ নরক, ভাগবতের দ্বিতীয় দফা উপকার।···দেখ ভেবে; জীবনকে, সমাজকে তোরা শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিস, আমার মত নাস্তিকের আবার বেশী বলা মানায় না।

"চল্, ওঠা যাক্, রাত অনেক হ'ল। অম্বুরীর কাছে একটা মিথ্যে জবাবদিহি দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চল্।"

১০

কয়টা দিন গুমট করিয়াছিল, পরের দিন সকাল থেকে মেঘ জমিতে জমিতে দুপুরের পর বৃষ্টি নামিল। এই জন্যও, তা ভিন্ন মনেও দুই জনের মেঘ জমিয়া আছে সে জন্যও আর মোটেই বাহির হইলাম না। অম্বুরী বলিল, "হয়েছে ভাল, কাল যেমন আমায় ভাবিয়েছিলে··"

বিকালে দুইখানা চিঠি পাইলাম; একটা বাড়ীর চিঠি, রিডাইরেক্ট করা, একটা তরুর।

তরুর সেই প্রীতি-উপহার ছাপা হইয়াছে। এক কপি পাঠাইয়া দিয়াছে। সত্যই খুব ভাল করিয়া ছাপাইয়াছে মীরা, এক্সমাস্ কি নিউ-ইয়ার কার্ডের মত, চারখানি মোটা মোটা পাতার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে ছাপা। চওড়া, সবুজ রেশমের ফিতা দিয়া বাঁধা। তরু লিখিয়াছে মীরা নাকি দুঃখ করিয়াছে পদ্যটি যেমন, তাহার যোগ্য ছাপা হইল না। নিশীথবাবু আসিয়াছিলেন, মীরা নিজের হাতে একখানা দেয়। নিশীথবাবু বলিলেন—ভয়ঙ্কর চমৎকার হইয়াছে, তিনি কখন এমন সুন্দর প্রীতি-উপহার পড়েন নাই। আমি চলিয়া আসিতে তরুর মন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে খাবার সময় ওর বাবা মা দুই জনেই নাম করিতেছিলেন। ওর বাবা বলিলেন, "তরুকে নিয়ে মাস্টার-মশাই না হয় বিলাত চলে যান না, ইচ্ছে থাকে নিজেও কিছু শিখে আসুন।" মা বলিলেন, "লক্ষ্মী-পাঠশালার সখ এর মধ্যেই মিটে গেল?" তাহার পর থেকেই ওর বাবা চুপ করিয়া গেলেন। যদি যাইতে চাই আমি বিলাত, একাই হোক বা তরুকে লইয়া হোক—তাহা হইলে ওর দিদি চেষ্টা করিতে পারে। আজ আমার ঘরে বসিয়া এই কথা বলিল।

আর একটা কথা বলিল দিদি। বলিয়াছে, "তরু, তোমার মাস্টার-মশাইকে সাবধান ক'রে দাও তাঁর জন্যে মস্ত বড় একটা সারপ্রাইজ তোয়ের করেছি আমি, নোটিশ দিয়ে রাখলাম।"

তরুকে কিছু বলে নাই মীরা, আমি কিছু আন্দাজ করিতে পারি কি?

চিঠিটা যখন পাইলাম তখন অম্বুরীও ছিল সেখানে বসিয়া; প্রশ্ন করিল, "সারপ্রাই না কি লিখেছে, ওটার মানে কি ঠাকুরপো? সারপ্রাই তোয়ের করা কি?"

অনিল বলিল, "তার মানে হঠাৎ এমন একটা কিছু ক'রে বসবে যাতে শৈলেনের একেবারে তাক্ লেগে যাবে।"

"আর আমি ভাবলাম ঠাকুরপোর জন্যে মস্ত বড় একটা মালা তোয়ের করছে বুঝি।···হাসি নয়, সত্যিই তাই ভেবেছিলাম—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কি ক'রে জানব বল? ভাবলাম ইংরিজীতে মালাকেই বুঝি সারপ্রাই বলে।"

অদ্ভুত আন্দাজে নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে পার ঢাক পিটিয়ে, সাবধান ক'রে আর কে মালা দেয়। তা জজ্ ব্যারিস্টারের মেয়ে, ওদের পদ্ধতি কেমন কি ক'রে জানব বল?"

একটু থামিয়া বলিল, "বেশ, তা কি সারপ্রাই করবে বলই না।—মালা নাই হ'ল।"

বলিলাম, "সেটা তো তোমায়ই জিজ্ঞেস করব মনে করেছিলাম,—মেয়েছেলেদের সারপ্রাইজ করবার কি সব রীতি তা আমরা কি ক'রে জানতে পারব?—বিশেষ ক'রে আমি বেচারা।"

অম্বুরী চোখ তুলিয়া চিন্তা করিতেছিল, অনিল বলিল, "হ্যাঁ, ভেবে আরও দু-একটা বল অম্বুরী, তোমার বা

তোমাদের একটা সারপ্রাইজ করবার রহস্য তো জানাই গেল।"

অম্বুরী বিস্মিত ভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ?"

"এই মালা তোয়ের করবার কথা। যদিও অভ্যেস হ'য়ে পড়ায় আমার কাছে আর ওতে কিছু সারপ্রাইজ নেই।"

অম্বুরী বলিল, "আমি তোমার জন্যে রোজ রোজ মালা তোয়ের করতে গেলাম! আমার খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই যেন!"

অনিল বলিল, "রোজ নয়; রোজ হ'লে তো আর সারপ্রাইজ হ'ল না। যেমন, কোন রাত্তিরে যদি তেমন জ্যোৎস্না ফুটল, কিংবা ধর আজ রাত্তিরে—এই ঘন বর্ষা নেমেছে···"

অম্বুরী ধমক দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার লজ্জা ব'লে একটা বস্তু নেই? কি বেহায়াপনা হচ্ছে বল দিকিন ঠাকুরপোর সামনে?"

অনিল হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, যেন একটা ভুল সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, "ও, ঠিক, মনেই ছিল না।···শৈলেন, ওটা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার কথা···"

"আঃ, কি জ্বালা গা!"—বলিয়া অম্বুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

অনিল বলিল, "অম্বুরীর সামনে কথাটা তুললে ও বোধ হয় মাকে বলত, মা আবার এই নিয়ে ভ্যানর ভ্যানর লাগাত, তাই ওকে দিলাম উঠিয়ে। জিজ্ঞাসা করছিলাম, বিলেত যাওয়ার কথাটা সিরিয়াসলি ভাবছিস শৈল?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা কি সিরিয়াসলি উঠেছে ব'লে তোর বিশ্বাস অনিল?"

অনিল একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ধর, যদি ওঠে কখনও? যে ভাবেই উঠুক, উঠেছে তো কথাটা? তোর নিজের কাছেও তো বার-দুয়েক প্রশ্ন হয়েছে বললি। আমি যতটা বুঝেছি ব্যাপারটা তোদের দু-জনের সম্বন্ধের তরলতা কিংবা ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করছে। আমার মনে হয় এখানে রায়-দম্পতি ওঁদের মেয়েকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "ঠিক ওইখানেই ওঁরা আমার স্বাধীনতা নষ্ট করেছেন। আমি যেতে পারি যদি তরুর গার্জেন হয়ে যেতে হয়; কিন্তু সেটা হবে না অনিল।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কেন?"

বলিলাম, "যত দূর বুঝতে পেরেছি, তরুর বিলিতী কেরিয়ার ঐ লরেটো পর্য্যন্ত। ওর মায়ের ওপর দ্বিতীয় আর একটা আঘাত দিতে মিস্টার রায় সাহস করবেন না। তাঁদের ছেলের আঘাতই তাঁর পক্ষে দিন দিন মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠছে। ভুটানীর ব্যাপারটা যদি নিজের চক্ষে দেখিস তো স্পষ্টই বুঝতে পারবি অপর্ণা দেবী ওর মধ্যে দিয়েও নিজের পুত্র-শোকটা আর একবার ক'রে উপলব্ধি করছেন। শোককে এই রকম দু-ধারায় পান করলে আর কত দিন টিকবেন?"

অনিল একটু চিন্তিত ভাবে থাকিয়া বলিল, "হুঁ।···বেশ ধর, তরু যেমন লিখেছে মীরা চেষ্টা ক'রে যদি তোকে একাই পাঠাতে পারে কোন ট্রেনিঙের জন্যে কিংবা ব্যারিস্টারির জন্যে?"

আমি ধীর হাসির সঙ্গে বলিলাম, "সেই কথাই তো বলছিলাম। পৌঁছুতে পারব কি বিলেতে তা হলে?"

অনিল একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

বলিলাম, "তার মানে, অতটা লজ্জার বোঝা ঘাড়ে ক'রে যাত্রা করলে জাহাজসুদ্ধ ডুবে মরব না কি?"

অনিল লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল, "না, না, আমি তা মীন্ করি নি।···আচ্ছা, আর একটা সম্ভাবনার কথা ধর; মানে, ধর, রায়-দম্পতিই যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোকে পাঠান?"

বলিলাম, "একই কথা হ'ল না কি? তার পেছনেও কি মীরা নীরব মিনতি নিয়ে রইল না?"

অনিল আবার একটু থামিল, তাহার পর বলিল, "কেন, যৌতুক ব'লে কিছু দেবার অধিকার নেই বাপমায়ের?"

বলিলাম, "ঠিক এই কথাটা তুই আর একবার জিজ্ঞেস করেছিলি অনিল, পরশুই। নিজের বুদ্ধিমত আমিও উত্তর দিয়েছি—অর্থাৎ এটা ঠিক যৌতুক হবে না, হবে আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে অপমান। গরীব বাপমায়ে জন্ম দিয়ে যে আমায় মীরার উপযোগী শিক্ষা দিতে পারলেন না—সেই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যঙ্গ। আমার বাপমায়ের গরীবিয়ানা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে।"

বাহিরে প্রবল ধারায় বর্ষাপাত চলিয়াছে। অনিল আবার খানিকক্ষণ মৌন রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "বিলাত তা হ'লে হ'ল না?"

বলিলাম, "হবেই,—যদি এই রকম পড়বার সুবিধেটা থেকে যায়। কোন-না-কোন একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমি যাবই বিলাত—বিলাতই হোক বা জার্ম্মানীই হোক্।"

অনিল খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিল, "যদি—এই রকম—পড়ার সুবিধেটা—থেকে যায়···যদি···"

ক্রমশঃ

সংস্কৃত-সাহিত্যে নারীর দান

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পিএইচ্-ডি (লণ্ডন)

বর্ত্তমান যুগে নারী-প্রগতি সম্বন্ধে সকলে, বিশেষতঃ নারীরা, সচেষ্ট। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সব বিষয়ে, তাঁরা উচ্চ থেকে উচ্চতর আদর্শে উন্নীত হ'তে চান এবং তজ্জন্য যত্নও করছেন অনেক। তাঁরা যে শুধু উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছেন, তা নয়—নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেও যশ অর্জন করছেন। নারী-শিক্ষার এই উচ্চ আদর্শ ভারতের আজকের নয়; সেই বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় রমণীরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আসছেন। বৈদিক যুগের নারীরা সর্ব্বতোভাবে সামাজিক জীবনে যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন, সে সম্বন্ধে হয়ত অনেকেই কিছু কিছু জানেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ যুগের নারীদের বিষয় কিছু বলবার চেষ্টা আমি করব না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগেও যে নারীরা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন এবং শুধু তাই নয়—বহু গ্রন্থাদিও রচনা ক'রে গিয়েছেন, তার সুসংবদ্ধ ইতিহাস হয়ত কারও জানা নেই। এই সব সংস্কৃত গ্রন্থের হস্ত-লিখিত পুঁথি ভারতের বিভিন্ন স্থানে—কোথাও বা পুস্তকাগারে, কোথাও বা ব্যক্তিবিশেষের কাছে, কোথাও বা মঠে মন্দিরে—বিক্ষিপ্ত বা লুক্কায়িত হয়ে আছে। এও ঠিক যে কালস্রোতে অনেক কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছে। কিছু কিছু পুঁথি ভারতের বাইরেও চলে গেছে। তবুও কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ইত্যাদি বহু বিষয়ে পারদর্শিতা-মূলক তাঁদের যা-যা গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া গেছে—তারও মূল্য কম নয়। এই সব গ্রন্থ থেকে পুরাকালের ভারতীয় নারীদের বহুমুখী প্রতিভার কথঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় নারীদের এই দানের যা অবশিষ্ট আছে, তাতেও এই সাহিত্যের অদ্যাপি অজ্ঞাত, অভিনব একটি শাখার সৃষ্টি হ'তে পারে। অনেক অনুসন্ধান ক'রে ভারতীয় নারীদের যে-সব সংস্কৃত রচনা সংগ্রহ করেছি, তা আমি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করছি।[১] তারই কয়েকটি গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এখানে দেব। ধারাবাহিকভাবে এগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করবার ইচ্ছা রইল।

১। মৎপ্রণীত "The Contribution of Women to Sanskrit Literature Series," Vols. I—VII.

দৃশ্যকাব্য—নাটকাদি

মহাপণ্ডিত মন্ত্রী ঘনশ্যামের সুন্দরী ও কমলা নাম্নী দুই বিদুষী পত্নী কবি রাজশেখরের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার উপরে অতি সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি টীকা লিখে গেছেন। এ টীকার নাম সুন্দরীকমলীয় বা চমৎকার-তরঙ্গিণী। তাঁদের স্বামী ঘনশ্যামও এই বিদ্ধশালভঞ্জিকার উপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। সুন্দরী ও কমলার বোধশক্তি অপূর্ব, ভাষা নিখুঁৎ, বিচারদক্ষতা অতুলনীয়। তাঁরা যে কেবল পূর্ববর্ত্তী টীকাকারদের সমালোচনা করেছেন, তা নয়—এমন কি, কালিদাস, ভবভূতি, অমরসিংহ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি মহামনস্বীদেরও কঠোর সমালোচনা করতে পশ্চাৎপদ হন নি। এ স্বীকার করতেই হবে যে বহু স্থানে তাঁদের সমালোচনা সমীচীন। এ টীকায় স্বকীয় মতের সমর্থনের জন্য তাঁরা অলঙ্কার গ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণাদি থেকে বহু স্থলে উদ্ধৃত করেছেন; ঐ সব গ্রন্থের বেশীর ভাগই পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে।

শ্রব্যকাব্য—মহাকাব্যাদি

শ্রব্যকাব্যে নারীদের দান বিষয়ে যা নিদর্শন পেয়েছি, তা দু-ভাগে ভাগ করা যায়:—(১) বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, (২) সম্পূর্ণ কাব্য।

(১) ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা প্রভৃতি বৈদিক নারী ঋষিদের ও পালি প্রাকৃত ভাষার নারী কবিদের কথা এখানে বলবো না। এ ছাড়াও আরও অনেক নারী কবিদের নাম পেয়েছি, যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখে গেছেন। রাজশেখর, ধনদদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্য-মহারথীরা তাঁদের স্তুতিবাদও ক'রে গেছেন যথেষ্ট। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের কেবল নামই পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের সুসজ্জিত কাব্যোদ্যানের একটি বিশীর্ণ পত্রও আজ আমাদের জন্য অবশিষ্ট নেই। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম—কামলীলা, কনকবল্লী, ললিতাঙ্গী, মধুরাঙ্গী, সুনন্দা, বিমলাঙ্গী, প্রভুদেবী লাটী, বিজয়াঙ্কা প্রভৃতি। যাঁদের কবিতা অল্পবিস্তর পাওয়া গেছে, তাঁদের কয়েক জনের

নাম ভাবদেবী, গৌরী, ইন্দুলেখা, কেরলী, কুটলা, লক্ষ্মী, মদালসা, মধুরবর্ণী, মদিরেক্ষণা, মারুলা, মোরিকা, নাগম্মা, পদ্মাবতী, ফল্গুহস্তিনী, চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণী, প্রিয়ংবদা, সরস্বতী, সরস্বতীকুটুম্বদুহিতা, শীলাভট্টারিকা, সীতা, সুভদ্রা, ত্রিভুবনসরস্বতী, চণ্ডালবিদ্যা, বিম্বাবতী, বিজ্জা, বিকটনিতম্বা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কারও কারও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি কবিতাও আমি পেয়েছি। কারও কারও মাত্র দু-চারটি। প্রাপ্ত কবিতাগুলি বিবিধ বিষয় অবলম্বনে লিখিত। যথা, দেবস্তুতি, দর্শন, ধর্ম্ম, প্রেম প্রভৃতি বর্ণন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণন, পশুপক্ষি-বর্ণন, ইত্যাদি। এঁদের ভাব ও ভাষা সুমধুর; ছন্দ ও অলঙ্কারে কৃতিত্ব কম নয়। তাঁদের যে আরও অনেক কবিতা ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব দু-চারটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পের সৌরভেও দিগ্‌বিদিক্ আমোদিত হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীর পূর্বে ভারত অলঙ্কৃত করেন।

(২) আমরা ভারতীয় নারীদের কয়েকখানি সম্পূর্ণ কাব্য পেয়েছি।

(ক) সংগ্রামসিংহ-জননী অমরসিংহের পট্টরাণী দেব-কুমারিকাকৃত বৈদ্যনাথ-প্রাসাদ-প্রশস্তি। বৈদ্যনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এই প্রশস্তি রচিত হয় এবং ইহা মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে। তবে এই ঐতিহাসিক প্রশস্তি সত্যই রাজমাতৃকৃত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজপুতনায় জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) রাণী গঙ্গাদেবীকৃত মধুরা-বিজয় বা বীর-কম্পরায়-চরিত। ইনি বিজয়নগরের সম্রাট্ বীর কম্পনের মহিষী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বামীর মাদুরা (মধুরা)-বিজয় উপলক্ষে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দক্ষিণ-ভারতের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

(গ) তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথ নায়কের সভাকবি মধুরবাণীকৃত রামায়ণ কাব্য। ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই গ্রন্থ রঘুনাথকৃত আন্ধ্র (তেলেগু)-রামায়ণ অবলম্বনে সংস্কৃতে লিখিত।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথ নায়কের অন্য এক জন সভাকবি রামভদ্রাম্বাকৃত রঘুনাথাভ্যুদয় মহাকাব্য। এই গ্রন্থে রঘুনাথ ভূপের রূপ, গুণ ও বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে তাঞ্জোরের তৎকালীন বহু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা অবগত হই।

(ঙ) বিজয়নগরের সম্রাট্ অচ্যুত দেবরায়ের সভাকবি তিরুমলাম্বাকৃত বরদাম্বিকা-পরিণয়-চম্পূ। ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রথম ভাগে অচ্যুতদেবের বংশাবলী, তাঁহার পিতার বিজয়-কাহিনী, তাঁহার বাল্যাবস্থা ইত্যাদির ইতিহাস-সম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরভাগে নৃপ অচ্যুত-দেবরায়ের সহিত বরদাম্বিকার পরিণয় এবং তাঁদের পুত্র চিনবেঙ্কটরায়ের জন্মপরিগ্রহাদি বিবৃত আছে। এই ভাগে ইতিহাস অপেক্ষা কবিত্বই সমধিক।

আধুনিক সংস্কৃত নারী কবি

যদিও আজকাল সংস্কৃতের পঠন-পাঠন যথেষ্ট কমে গেছে—তবুও ভারতীয় মহিলারা এখনও সংস্কৃতে কাব্যাদি রচনা করেন, তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। যেমন, মালাবারের লক্ষ্মী রাজ্ঞীকৃত সম্পূর্ণ কাব্য সন্তানগোপাল। আরও কয়েক জনের নাম করা যায়—যেমন, অনসূয়া কমলাবাঈ বাপট, বালাম্বিকা, হনুমাম্বা, জ্ঞানসুন্দরী, কামাক্ষী, মন্দয়ম ধাটী আলমেলম্মা, রাধাপ্রিয়া, রমাবাঈ, শ্রীদেবী বালরাজ্ঞী, সোনামণি দেবী, সুন্দরবল্লী, ত্রিবেণী, ইত্যাদি।

পৌরাণিক কর্ম্ম-পদ্ধতি

মণ্ডলীক নৃপতির কন্যা হরসিংহ রাজের মহারাণী বীনবায়ী খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে গুজরাট অলঙ্কৃত করেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। দ্বারকা-পত্তল (মাহাত্ম্য) নামে তাঁর পুস্তক কেবল বিশিষ্ট কয়েক জনের ধর্ম্ম-ক্রিয়ার সহায়তার জন্যই রচিত হয় নি, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই ধর্মক্রিয়া যাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তারই জন্য তিনি এ পুস্তক রচনা করেছিলেন,—বহু দেশ, বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে। এতে প্রমাণিত হয় যে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেষতঃ লৌকিক আচার সম্বন্ধীয় বিধান দানে, যে কেবল বৈদিক যুগের নারীদেরই অধিকার ছিল, তা নয়—বহু পরবর্তী যুগেও নারীরা দেশের ধর্ম্ম-সংক্রান্তবিষয়ের বিবিধ সুব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন, আচার-বিচার ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি নানাবিধ পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক গ্রন্থাদি প্রণয়ন ক'রে।

স্মৃতিশাস্ত্র

নারী-স্মার্তদের মধ্যে বিশ্বাসদেবী ও লক্ষ্মীদেবী পায়গুণ্ড অন্যতম।
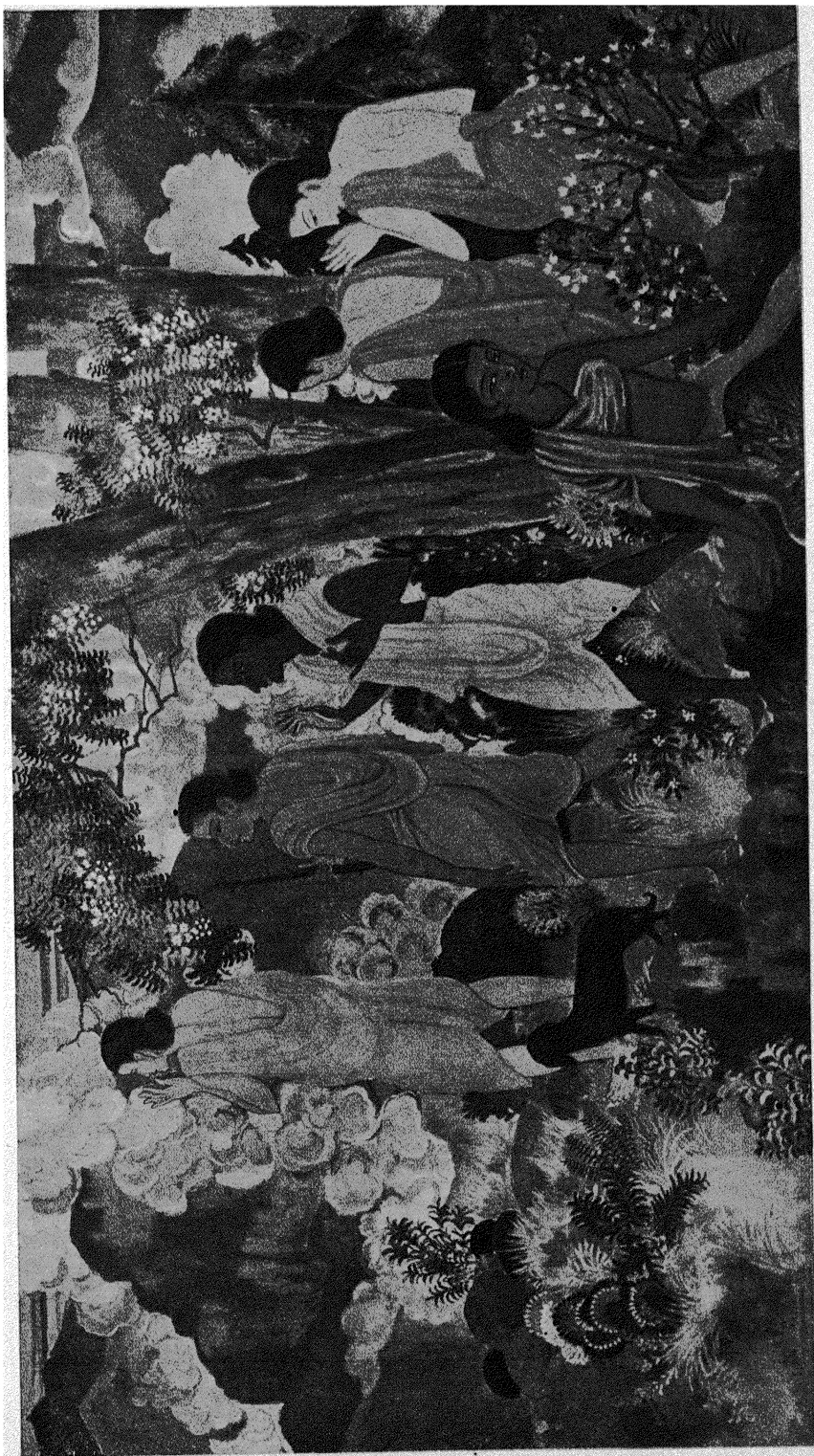
স্বর্গারোহণ
[ঝাড়গ্রাম বাণীভবন ফ্রেস্কো]
শ্রীখগেন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশ্বাসদেবী মিথিলার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি পদ্মসিংহের পট্টরাণী; নিঃসন্তানা ছিলেন ব'লে তাঁর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য চলে যায় ভবসিংহের পুত্র হরসিংহের হাতে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। গঙ্গার প্রতি অত্যধিক আসক্তি হেতু তিনি গঙ্গা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পুস্তক রচনা ক'রে গিয়েছেন—তার নাম গঙ্গা-বাক্যাবলী। গঙ্গা-সংক্রান্ত যত প্রকার ধর্মক্রিয়াকলাপ হ'তে পারে, যেমন দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, স্নান, গঙ্গাতীরে বাস, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি—সে সব বিষয়ে তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র মন্থন ক'রে সারটুকু নিয়ে স্বীয় অভিলাষ অনুসারে সব বক্তব্য বিষয় সাজিয়েছেন এবং সর্বত্র যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। স্মৃতির কঠোর বিচারে আত্মনিয়োগ করতে কোথাও তিনি পশ্চাৎপদা হন নি—পূর্ববর্তী স্মার্তাদির মতামত বিবেচনা ক'রে স্বীয় মত নিঃসন্দিগ্ধভাবে উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেছেন। স্মৃতি-তত্ত্বের বোধশক্তি তাঁর অপূর্ব, বিশ্লেষণ-শক্তি অনুপম। এ পুস্তক পরবর্তী স্মার্তমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—ফলে মিত্রমিশ্র, স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত স্মার্তশিরোমণিরা এই গ্রন্থের মত সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন এবং প্রায় সর্বত্র মেনে নিয়েছেন। এত সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ একটি ভারতীয় নারীর কি ক'রে হ'তে পারে, এ সন্দেহে কেও কেও ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেছেন যে এ গ্রন্থ মহাকবি বিদ্যাপতিকৃত। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্র স্পষ্ট বলা আছে যে, এ গ্রন্থ বিশ্বাসদেবী-কৃত; সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, বিদ্যাপতি সামান্য একটু সাহায্য করেছিলেন নিবন্ধ থেকে প্রমাণ-সংগ্রহ-ব্যাপারে। সুতরাং এ গ্রন্থ বিশ্বাসদেবীকৃত নয়—এ সন্দেহপ্রসূত মত নিতান্ত অযৌক্তিক।

লক্ষ্মীদেবী পায়গুণ্ড সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের সহধর্মিণী। তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁর কালমাধব লক্ষ্মী নামক টীকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি লিখেছেন—খ্রীষ্টীয় ১৭৯২-৯৩ সালে, তাঁর উক্ত টীকার ঐ অংশ প্রণয়নের কিছুকাল আগে—এক বার তেরটি তিথিতে একটি পক্ষ হয়েছিল—যা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

লক্ষ্মীদেবী অসাধারণ বিদুষী রমণী ছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিটীকা মিতাক্ষরার উপরে তিনি মিতাক্ষরা-ব্যাখ্যান নামক টীকা করেছেন। মাধবাচার্য-রচিত কালমাধব নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থের তিনি উপাদেয় সুবিস্তৃত টীকা ক'রে গেছেন—নামকরণ করেছেন তাঁর নিজের নামানুসারে—কালমাধব-লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ছিলেন পূর্ণ সরস্বতী। অগণিত শাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান তাঁর লেখার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, সূত্র, মহাভারতাদি, প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি, পুরাণ ও উপপুরাণ, জ্যোতিষ,—বিশেষ ক'রে ব্যাকরণ—যথাস্থানে যথাযথ প্রকারে এমন নিপুণভাবে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা ক'রে নিজের সিদ্ধান্ত সব প্রমাণিত করেছেন যে আমাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'তে হয়। মাধবাচার্য ছিলেন একাধারে মহাপ্রাজ্ঞ ও যুক্তির অবতারণা এবং সিদ্ধান্তোপনয়নে সিদ্ধহস্ত। এ মাধবাচার্যের উপর টীকা করতে যাওয়াই অসীম সাহসের কাজ; কিন্তু টীকায় দেখা যায়, তিনি অনেক ক্ষেত্রে মাধবাচার্যকেও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে ও বিশ্লেষণ-পারদর্শিতায় পরাভূত করেছেন। মাধব যেখানে অস্পষ্ট, লক্ষ্মী সেখানে সুস্পষ্ট; মাধব হয়ত অকারণে নির্বাক; লক্ষ্মী নারী-সুলভ সারল্যে ও সৌজন্যে সবাক্, মুখর। লক্ষ্মীর মত সরস্বতী সোনার ভারতেও অতি বিরল। কালমাধব-লক্ষ্মীর সংস্করণের প্রথম খণ্ডে অন্য দুটি টীকাও পাশাপাশি প্রকাশিত ক'রে—এ দুটি টীকা কালমাধব-লক্ষ্মীর পূর্ববর্তী, একটা টীকা স্বয়ং মাধবাচার্যের নামে চলে—দেখানো হয়েছে যে এ অংশের টীকা হিসাবে লক্ষ্মীর লক্ষ্মী-টীকা সর্বোৎকৃষ্ট। অবশিষ্ট কালমাধব গ্রন্থের উপর ঐ দুটি টীকা নেই; লক্ষ্মীই সমগ্র গ্রন্থের টীকা করেছেন সুচারুরূপে—তারই কল্যাণে ধৈর্য ও জ্ঞানের সমুদ্র থেকে উঠে এলো জগতের পরম কল্যাণ হেতু—কালমাধব-লক্ষ্মী—ভারতের বিশিষ্ট ভারতী।

তন্ত্র-শাস্ত্র

সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ প্রেমনিধির পত্নী প্রাণমঞ্জরী শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বতোভাবে পতির অনুবর্তিনী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি কুমায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তন্ত্ররাজ-তন্ত্রের টীকার প্রথম পটলের টীকামাত্র অবশিষ্ট আছে; খুব সম্ভবতঃ অবশিষ্ট পটলগুলোর টীকাও তিনি করেছিলেন; কিন্তু কালক্রমে তা চিরতরে লোপ পেয়ে গেছে। টীকার যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে ও প্রকাশিত করা হয়েছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্ত্ররাজ-তন্ত্রের টীকার নাম সুদর্শন। তাঁর "সুদর্শন" নামক পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি অক্ষরালী-ময় এ "সুদর্শন" নামক টীকা রচনা ক'রে তাকে অমরত্ব দানের প্রচেষ্টা

করেছিলেন। এ টীকায় তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে প্রগাঢ় নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন। তন্ত্ররাজ-তন্ত্রের প্রথম কবিতার পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মনোরমাকার সুভগনাথ প্রভৃতি টীকাকার, অন্যান্য তান্ত্রিক ও বহু শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করেছেন, কোথাও কোথাও নিজ মতের স্বপক্ষে, কোথাও বা সেগুলো খণ্ডন করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মত নিয়ে তিনি সূক্ষ্মতম বিচার করেছেন—বিভিন্ন তন্ত্রসম্মত মত পর্যন্ত নিরাস ক'রে তিনি স্বকীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঈদৃশী বিদুষী হয়েও তিনি তাঁর গ্রন্থ-সম্পাদনে কল্যাণার্থ এমন কি অভীষ্ট দেবতা হৈহয়-নাথের বর প্রার্থনা না ক'রে স্বামী প্রেমনিধির শুভ কামনাই বর বলে মেনে নিয়েছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র অতি জটিল; তাতেও ঈদৃশ পাণ্ডিত্য প্রকাশ সবিশেষ প্রশংসার্হ।

যুগে যুগে ভারতীয় নারীরা জ্ঞানের যে বর্তিকা জ্বেলে রেখে গেছেন—তার আলো অনুসরণ ক'রে বর্ত্তমান যুগের রমণীরাও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারিণী হয়ে ও তা দেশের এবং দশের কল্যাণার্থ বিতরণ ক'রে ধন্য হবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রাবণ এসেছে

শ্রীকমলরাণী মিত্র

শ্রাবণ এসেছে কেতকী-কদম-বনে,
শ্রাবণ এসেছে শৈলসানুর দেশে,
শুধু বনে কেন? তোমার আমারো মনে
দেখেছ শ্রাবণ কত ঘন হ'য়ে মেশে?
সেদিনের সেই অলকা যক্ষপুরী,
শ্রীমতী রাধার রসঘন অভিসার
সকলি যে আজ খেলে মনে লুকোচুরি—
গগনে গগনে নিরন্ধ্র অন্ধকার।
চির জনমের সে প্রেম-বিরহ-লীলা
আজিও হ'ল না এতটুকু পরিম্লান,
যুগ যুগ ধ'রে সে-ধারা অন্তঃশীলা
আজিও গাহিছে অবিরাম কলগান!
তাই সচকিতে বাতায়নে দেখি চেয়ে
পূবে উত্তরে হু হু মেঘ ভেসে যায়,
খনে খনে মন সকল গগন ছেয়ে
দূর দূরান্তে মেঘ হ'য়ে যেতে চায়!
কভু মনে হয় বৃষ্টি ঝরার সাথে
দুই চোখ ভ'রে যত পারি আজ কাঁদি,
কভু মনে ভাবি নীপশাখে ঝুলনাতে
দুলে দুলে মোর সব কথা গানে বাঁধি!

আমি যেন আর আমি নই বুঝি আজ
কোন্ সে যুগের যেন বা যক্ষপ্রিয়া
সাধ হয় সব ছিঁড়ে ফেলি ফুলসাজ,
ভূমিতে লুটাই বসন বিছায়ে দিয়া!!

দেয়া গুরু গুরু—দুরু দুরু হিয়া মোর,
ঝরো ঝরো ঝরে বাদল বরিষাধারা;
বিজুরী চমকে, দুর্যোগ ঘনঘোর,
আর্ত-পবন বহিছে আত্মহারা!

আপনার মাঝে আপনি হারায়ে যাই
নিবিড় করিয়া চারিদিক আসে ঘিরে;
যেন মনে হয় কেহ মোর কোথা নাই
জাগি একাকিনী দিগন্ত-তীর্থ-তীরে—
অনাগত কাল নিঃসীম বিস্তার
মোর পানে চেয়ে, আমিও চাহিয়া আছি;
নয়নে আমার রাধিকার আঁখি ধার
নব বরিষণ-ধারায় মিশাইয়াছি!!

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাণীর বরপুত্র প্রতিভার অবতার যে বরেণ্য ব্যক্তির অশীতিতম বর্ষসম্পূর্ত্তি সম্পর্কে আজ সমস্ত দেশে আনন্দ অভিনন্দনের কল-কল্লোল জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু না জানেন, এমন দুর্ভাগ্য, বোধ করি, আমাদের মধ্যে কেহই নাই। যে শিশু সবেমাত্র লেখা-পড়া শিখিতেছে, সেও শিশু-কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত; যে ভাগ্যহীন শিক্ষার সহিত সম্পর্কশূন্য, সেও তাঁহার রচিত গান শুনিয়া জীবনে বারম্বার মুগ্ধ হইয়াছে।

শুধু আমাদের এই বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে নয়, শুধু এশিয়া মহাদেশেও নয়, রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভালোকে সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দেশে-দেশে কণ্ঠে-কণ্ঠে তাঁহার বন্দনাগান গীত হইতেছে; সপ্তসাগরের তরঙ্গে-তরঙ্গে তাঁহার জয়ধ্বনি নিনাদিত।

বহুতর বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার রচনাবলী অনূদিত হইয়াছে এবং তিনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সংস্কৃতির একজন অতি বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তি বলিয়া জগতের সমস্ত সভ্যদেশেই স্বীকৃত হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার আকৃতি-গত সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য ও সুন্দর কণ্ঠস্বরটি পর্য্যন্ত সেই উচ্চ আদর্শেরই অনুরূপ বলিয়া অনেকেরই ধারণা।

যে "Sir," "Poet Laureate of Asia" প্রভৃতি উপাধিতে তিনি আমাদের উচ্চতম রাজসরকার কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছেন, সেই সকল অলঙ্কারে তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্মান বাড়ে নাই, বরং ঐ সকল বিশিষ্ট উপাধিই তৎসংস্পর্শে ধন্য হইয়াছে। কুখ্যাত জালিনওয়ালাবাগের কীর্ত্তিকলাপে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি প্রায় দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার "Sir" উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উপাধিটিও নিরর্থক বলিয়াই বোধ করি, জীবনে কোনদিন তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তিনি ঐ সকল উপাধি-উৎপাত বর্জ্জন করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যের এই অসুস্থ অবস্থাতেও তাহারই গর্জ্জন সেদিন পর্য্যন্ত কানে আসিয়াছে। বস্তুতঃ স্বীয় রবীন্দ্রনাথ নামই তাঁহার একমাত্র অলঙ্কার। অন্য অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তদীয় অগ্রজ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাঞ্চনে সোণালিকাজ, শ্বেতপদ্মে চূণকামকরা, গন্ধ ছিটাইয়া দেওয়া বিকশিত গন্ধরাজ ফুলে"র মতন অর্থহীন। সন ১৩০০ সালে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটে। তদবধি প্রায় এই পঞ্চাশবৎসর কাল বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহিত্যের এমন কোনও দিক্-দেশ-নাই যাহা রবি-প্রতিভার স্পর্শমণি স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই,—কাব্যে তো কথাই নাই। "যাহা নাই ভারতে (অর্থাৎ মহাভারতে) তাহা নাই ভারতে" বলিয়া দেশে যে জনপ্রবাদ আছে, এই পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তেমনি বলিতে পারা যায়,—"যাহা নাই রবিতে, তাহা নাই কবিতে"।

বাংলার সাহিত্যাকাশে কবি যথার্থই সার্থকনামা। পুরাণে বলে,—সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য্যদেব। অরুণ সারথি-চালিত সপ্তাশ্বরথে সবিতাদেবতা বিশ্ব পর্য্যটন করেন। বিজ্ঞানেও বলে এবং 'স্পেক্ট্রাম্'—কাচখণ্ডের সাহায্যে প্রতীয়মান হয়, সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে সূর্য্যের শ্বেতবর্ণ সমুদ্ভূত। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিলে সেই সাতটি বিভিন্ন রঙের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনি বাঙ্গলার গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সপ্ত কেন, প্রায় সর্ব্ব বিভাগেই কবির অপূর্ব্ব সৃজনশক্তি ও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার যে-কেহ যাহা কিছু সাহিত্যে রচনা করিয়াছেন, রবির প্রভাব সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান। অল্লাধিক প্রতিভাবান্ সমস্ত জ্যোতিষ্কেই রবি-কিরণ প্রতিফলিত। কোন-কোনটি বাহ্যতঃ দূরবর্ত্তী ও ভিন্নপথযাত্রী বলিয়া বোধ হইলেও, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই এই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে। আবার সূর্য্যেরই মতো কবি প্রকৃতির রসভাণ্ডার হইতে যাহা গ্রহণ করেন, সহস্র গুণেই সহস্র করে তাহা ফিরাইয়া দেন। "সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

আজকার দিনে বিশ্বকবির কাব্যপ্রতিভার কথা বিশদ

ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই; থাকিলেও, স্বল্পপরিসর স্থানে বা সময়ে তাহা সম্ভবপর নহে। নানা স্থানে, নানা জনে, নানা ভাবে, খণ্ডে-খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তবে অল্প কথায় বলিতে গেলে, সব দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া নিঃসন্দেহেই বোধ করি, বলা যায়, তিনি নিখিল বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীরিক বা গীতিকবি। ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিমাপে এবং ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সমন্বয় ও উৎকর্ষে তাঁহার গীতিকাব্য জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। দরিদ্র পরাধীন বাঙালীর পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। সুসূক্ষ্ম সুখ-দুঃখ-সমস্যা, মানবমনের সুগভীর রসানুভূতি ও দুরবগাহ অতীন্দ্রিয়-বাদের অপরূপ প্রকাশে তিনি যে পরিমাণ পারদর্শিতা সহকারে 'সীমার মাঝে অসীমের সুর'-সংযোগ করিয়াছেন, তাহা যেন জগতের সহিত জগদন্তরের সম্বন্ধ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কল্পলোকের যে দৃশ্যাবলী সাধারণ মানবের অধিগম্য নহে, সেই সেতুর সাহায্যে পার হইতে পারিলে, ভক্তের ভাগ্যে, বোধ করি, তাঁহার তীর্থ-দেবতার সাক্ষাৎকার ঘটে।

সঙ্গীতও এই লীরিকেরই অন্তর্গত। এই বিভাগেও তাঁহার দানের তুলনা মিলা কঠিন। শুনিয়াছি, জগতের কোনো গীতকার (composer) কবির এক-চতুর্থাংশ গীত-রচনাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমি সাধু, মহাজন বা সাধকদিগের ভজন-সঙ্গীতের কথা তুলিতে চাহি না। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সে সকল সঙ্গীত তুলনারহিত।

ছোট-গল্প সম্বন্ধেও এই লীরিকের কথা খাটে; তবে ঠিক ষোল আনা নহে, আট আনা মাত্র। শিলাইদহে অবস্থানকালে কবি অনেক সময় পদ্মাবক্ষে বজরায় বাস করিতেন এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার ছোট গল্পের উপাদান সেখানকার অভিজ্ঞতা হইতেই সাধারণতঃ সংগৃহীত। কিন্তু Bull's Eye আঁধারি-লণ্ঠন সাহায্যে দেখার মতো, ঐ সকল ঘটনা বা দৃশ্যের খানিকটা এক ঝলকে যাহা তাঁহার চোখে পড়িত, তাহারই উপরে রং ফলাইয়া বাকি অংশ কল্পনা সাহায্যে পূরণ করিয়াই এই সকল গল্পের রচনা। বিষয়প্রাচুর্য্যে, ভাববৈভবে ও রচনা-নৈপুণ্যে,—সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব দরদের প্রাণময় স্পর্শে এই সকল গল্প পৃথিবীর গল্পসাহিত্যে অমূল্য দান। পড়িতে পড়িতে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

এই সূত্রে কবির পত্ররচনা সম্বন্ধেও দুয়েকটি কথা বলিব। দীর্ঘকাল ধরিয়া কবির সহিত পত্রালাপের সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন, কবির অতি সাধারণ এক একখানি পত্রও সাহিত্যের বাজারে এক একখানি 'কোম্পানীর কাগজ'। কি ভাব প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে, কি রচনাভঙ্গীর নিপুণতায়, কি রসপ্রাচুর্য্যে তাহাদের তুলনা পাওয়া দুষ্কর। চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো এই সকল পত্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, জগতের ঐগুলি পত্র-সাহিত্যের এক অভিনব সম্পদরূপে গণ্য হইবে।

এইবারে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই অপূর্ব্ব প্রতিভশালী ব্যক্তির কয়েকটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব। বোলপুর শান্তিনিকেতনে বার তিনেক কবির আতিথ্য-গ্রহণের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। একখানি পত্রিকা প্রকাশের সম্পর্কে কবিকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া একবার; পরলোকগত বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র ও মণিলালের সাহচর্য্যে তথাকার কোনো একটি উৎসব উপলক্ষ্যে আর একবার, এবং তৃতীয় বার প্রিয়বন্ধু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রণে। তন্মধ্যে একবার আমার স্থিতিস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কবিগুরুর তখনকার একতলা বাসগৃহের একেবারে পাশের কক্ষে। তদানীন্তন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী সম্পর্কে আজকার মতো এমন বিরাট ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। তাই, কবির সান্নিধ্য তখন যেমন সহজ, তেমনি সুখময় হইয়া উঠিবার সুযোগ ছিল। যে অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি, প্রধানতঃ সেইখান হইতেই তাহা সংগৃহীত।

দেখিয়াছি, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কবির স্বভাবসিদ্ধ। সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে উঠিয়াও কোনদিন তাঁহাকে নিদ্রিত দেখি নাই। তৎপূর্ব্বেই তিনি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ঐ সময়ে কঙ্করখচিত শালতরুপথে গুনগুন স্বরে যে সকল গান রচনা করিতেন, ভ্রমণান্তে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, দারুণ গ্রীষ্মেও কবিকে কোনদিন পাখার হাওয়া খাইতে বা বিশ্রামার্থ দিবাভাগে শয্যাগ্রহণ করিতে দেখি নাই। তখনকার দিনে ইলেকট্রিক পাখার প্রচলন হয় নাই। আলাপ-আলোচনা ভিন্ন, অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে পাঠে বা সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত দেখিয়াছি। আহারের পরও ব্যতিক্রম ছিল না।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আর একটি অভ্যাসের কথা তাঁহার বলি। এক দিন ছয়-সাত ঘণ্টাকাল অব্যাহতভাবে কবির সম্মুখে বসিয়া থাকিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। যত দূর মনে পড়ে, তখন কি একটা নব-রচিত নাটক অভিনয়ের

ব্যবস্থা হইতেছিল, সেই দীর্ঘকাল মধ্যে একটি বারের জন্যও তাঁহাকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে বা বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইতে দেখি নাই। আমাদের প্রত্যেককেই বহুবার এপাশ-ওপাশ করিতে, এমন কি, এক-আধ বার উঠিয়া যাইতেও হইয়াছে, কিন্তু কবি সেই যে আসনবদ্ধ হইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মতো বসিয়াছেন, তাহার আর ব্যত্যয় নাই। সেই অচঞ্চল ঋজু আসন সাধারণের সাধ্য তো নহেই, যোগী ভিন্ন অন্য কাহারো সাধ্যায়ত্ত বলিয়াও জানি না।

শুভ্রশুচি রসরচনায় যেরূপ, (যেমন গোড়ায় গলদ, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ইত্যাদি) সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যেও তেমনই তাঁহার রহস্যপটুতা ও রস-বৈদগ্ধের তুলনা দেখি নাই। সরস বাক্যালাপে এমন কাহাকেও মনে পড়ে না, যিনি কবির দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবারও যোগ্য। গভীর ভাবাবেশে নিমগ্ন না থাকিলে, তাঁহার রসিকতার আনন্দোজ্জ্বল 'ফুলঝুরি'তে ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হইতে হয়।

অনেক সময় কত ছোটখাট কথা সে—কথার কণিকা-মাত্র, কিন্তু কনক-কণিকার মতোই উজ্জ্বল। একবার কয়দিন হইতে দারুণ বর্ষা নামিয়াছে, বৃষ্টি ধারার বিরাম নাই, শুধু জল আর জল, বাহির হইবার উপায় নাই। কবি বলিলেন, না—আকাশের এই ধারাবাহিক অত্যাচারে তো আর পারা যায় না! কি সার্থক ও সরস মন্তব্যটি!

মনে আছে, একবার এক প্রগল্‌ভ তরুণ সমালোচকের কোনও এক অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনার উত্তরে কবি এক সভায় বলিয়াছিলেন—কাঁচা বাঁশে বাঁশী হ'তে পারে কিন্তু পাকা বাঁশ ভিন্ন লাঠি হয় না। সমালোচনা অকালপকের কর্ম্ম নয়। জগতে বরং ভাইপো হয়ে জন্মানোই সম্ভব। জ্যাঠা হয়ে জন্মানো যায় না। কি ভীষণ সুন্দর এই সমালোচনা।

একদিন আমাদের কয় বন্ধুর কবি-গৃহে একত্র আহারের ব্যবস্থা। একটি বন্ধুর—নাম করিব না—কিঞ্চিৎ গুরুভোজন ঘটিয়া গিয়াছিল। ফলে, দেহ শিথিল এবং চক্ষু বিস্ফারিত—চলিবার সামর্থ্যটুকুও প্রায় হারাইবার অবস্থা। ভোজনকক্ষ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার ভাব দেখিয়া কবি কহিলেন—কি হে, তোমার এ কি হ'ল? আহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা তো শাস্ত্রে পড়ি নি। হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বন্ধুবরও অতি কষ্টে সে হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দোলের দিনে বিশ্বকবির সহিত স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাৎ। নমস্কারান্তে সহসা দ্বিজেন্দ্রবাবু কবিকে বেশ করিয়া আবিরে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। কবি হাসিয়া বলিলেন—নূতন পরিচয় বটে! এতদিন জানতাম, দ্বিজেন্দ্রবাবু সকলের মনোরঞ্জনই ক'রে থাকেন, আজ দেখছি, দেহরঞ্জনেরও তিনি একজন ওস্তাদ। 'হাসির কবি'র স্মিত হাস্য বিস্মিত হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বকবির জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে দেশের সর্ব্বত্র আনন্দোৎসবের যে সমারোহ দেখিতেছি, তাহাতে আশান্বিত হইতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, এই উৎসব সার্থক করিতে হইলে, ইহাকে সম্বৎসরের আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে হইবে। সম্বর্দ্ধনার প্রকৃত অর্থ গুণীর গুণগ্রাহিতা ও গুণানুসরণ। প্রতিভা চেষ্টাসাধ্য নহে বটে—"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"; কিন্তু গুণানুসরণ খানিকটা চেষ্টা ও নিষ্ঠাসাধ্য, গুণীর গুণান্বিত হইতে পারিলে, তবে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দেশাত্মবোধ, আদর্শানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি, তাঁহার সৌজন্য ও সংস্কৃতি, তাঁহার উচ্চ চিন্তা ও উচ্চভাবের অনুশীলন করিতে পারিলে, তবেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সার্থক। বিলাতে যেমন শেক্‌স্‌পিয়ার, ব্রাউনিং প্রভৃতি বড়-বড় কবির নামে সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েসন আছে, এখানেও তেমনি কবির নামে স্থানে স্থানে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া সাহিত্য চর্চ্চা, কাব্য চর্চ্চা, ইতিহাস চর্চ্চা, উচ্চভাব ও উচ্চ-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, তবেই এই সকল অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে সত্যকার কল্যাণজনক হইতে পারে।

পরিশেষে মহাকবির অশীতিতমবর্ষ-সম্পূর্ত্তি সম্পর্কে পূর্ব্বরচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতার অর্ঘ্যে রচনা শেষ করিতে চাই।

শাশ্বত কালের সাক্ষী, বিশ্বের যা অনন্ত বিস্ময়,—
সেই সূর্য্যে বর্ণ-সূত্রে কে বাঁধিবে দিতে পরিচয়!
লোকে-লোকে চোখে-চোখে জ্বলে যাঁর জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা,
তাঁর কণ্ঠে কে পরাবে আশী-ফুলে বাসি জয়ন্তিকা?
সৃষ্টির আদিম প্রাতে যে রহস্য মোহিল মানবে
প্রথম নয়নপাতে—আলোকের অমৃত-উৎসবে,
আজও যার নাহি পার, সন্ধানের নাহি সীমা-শেষ,
চলেছে মানব-যাত্রী যুগে-যুগে করিয়া উদ্দেশ
যে অম্লান দীপ্তি-তীর্থ,—তুমি জানো তাহার সন্ধান,
হে কবি, হে মৃত্যুঞ্জয়ী! তাই তব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান
চির মানবের মনে চিরদিন অক্ষয় নবীন।
জয়-জয়ন্তিকা তব নহে খণ্ড কালের অধীন।
অশীতির পরপারে—শত-শরতের সীমাশেষে
তোমার যশের মাল্য দুলিছে কালের কণ্ঠদেশে।

ভারতের খনিজ সম্পদ—ক্রোমাইট

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে ক্রোমিয়মের স্থান খুব পুরাতন নহে। ইহার মূল আকরিক প্রস্তর ক্রোমাইটের বিষয় ১৭৬২ সালে লেহমান (Lehman) প্রথম উল্লেখ করেন। ছত্রিশ বৎসর বাদে ১৭৯৮ সালে ভকেলিন (L. N. Vauquelin) ও ক্লাপরথ (M. H. Klaproth) একই সময়ে খনিজ সীসক প্রস্তর বা crocoite (lead chromate, $PbCrO_4$) এর মধ্যে নূতন মৌলিক ধাতু ক্রোমিয়মের সন্ধান লাভ করেন। ১৮৫৯ সালে বহু চেষ্টায় ওহ্লার (F. Wohler) অতি সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়ম উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেও সাধারণ ব্যবহারের মত যথেষ্ট পরিমাণ ক্রোমিয়ম পাইবার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল ব্যবহারের সুযোগ হওয়ায় আজ ক্রোমিয়ম একটি প্রয়োজনীয় ধাতুরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহাই আয়ত্তে আনিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ খনির মধ্যে ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি পুরু স্তরে ক্রোমাইট থাকে। এই পাথর অত্যন্ত কঠিন বলিয়া প্রায়ই বারুদ দ্বারা ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। অধিকাংশ খনিই উপর হইতে অপ্রয়োজনীয় প্রস্তরাদি সরাইয়া খোলা খাদ (open-cast or quarry method) রূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা এক এক স্থানে বিরাট প্রসারতা লাভ করিয়া থাকে। নিউ ক্যালিডোনিয়ায় এইরূপ একটি খাদ হইতে অন্ততঃ দুই লক্ষ টন প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় খাদের মধ্যে লকি হিট, পেন্সি, জোসেফিন, এ্যালিস্ লুই, তিবাঘি (Lucky Hit, Pensee, Josephine, Alice Louise, Tiebaghe) প্রভৃতি খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খাদ হইতে পাথর উঠাইয়া হাত দিয়া বাছিয়া ক্রোমাইট প্রস্তরের সহিত অন্য খনিজ সংলগ্ন থাকিলে, হাতুড়ি দ্বারা ঘা মারিয়া তাহা পৃথক্ করে। কখনও কখনও যন্ত্রসাহায্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে ভাঙ্গিয়া লইয়া পরে হাতে করিয়া বাছা হইয়া থাকে।

ক্রোমাইট দেখিতে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে ধাতব উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু ক্রোমিয়ম সর্ব্ব প্রকার মলিনতা-বিহীন ইস্পাতের ন্যায় সাদা।

ভারতবর্ষে যে এখনও সমস্ত খনিজের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তাহা ক্রোমাইটের নব আবির্ভাব হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা কালে ইহার পরিচয় মাত্র প্রকাশ পায়। ১৯০১ সালে ভ্রেডেন-বুর্গ (Vredenburg) বেলুচিস্থানের মৃত্তিকায় ইহার সন্ধান পান। ১৯০৩ সালে খননকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ঐ সালে মাত্র ২৮৪ টন প্রস্তর উৎখাত হয়। কিন্তু ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত পাঁচ সাল প্রতি বৎসর গড়ে ২৪,৪০৪ পাউণ্ড (৩,৬৬,০৬০ টাকা) মূল্যে ৬,৭৪৫ টন ক্রোমাইট উঠিতে থাকে। বেলুচিস্থান হইতে প্রাপ্ত ক্রোমাইটের সমাদর এবং বাজার দর দেখিয়া নানা স্থানে ক্রোমাইট লাভের যে প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তাহার ফলে ১৯০৫ সালে শ্লেটার মহীশূর রাজ্যে উহার সন্ধান পান। পরে ঐ স্থানের মহীশূর, হাসান, সিমাগো জেলায়, বিশেষতঃ মহীশূর জেলার কাদাকোলা গ্রামে খনি আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৭ সালে কার্য্যারম্ভ হওয়ার ফলে উৎখাত খনিজের পরিমাণ হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে ১৯০৭ সালই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৬ সালে যখন মাত্র ৪,৩৭৫ টন ক্রোমাইট উঠে, ১৯০৭ সালে তাহা ১৮,৩০৩ টনে পৌঁছে। ইহাতে ফল বিশেষ ভাল হয় নাই। বহু মাল মজুত থাকায় এবং বিদেশীর চাহিদা হ্রাস পাওয়াতে ১৯০৮ সালে আবার ৪,৭৪৫ টনে পড়িয়া যায়।

উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ বহু কাজে ক্রোমাইটের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে এবং ধাতুশিল্পে সমৃদ্ধিশালী জাতিদিগের মধ্যে ক্রোমাইটের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যে কয়েকটি দেশে ক্রোমাইট পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা খুব বেশী নহে, সুতরাং ভারতবর্ষের এ বিষয়ে খুব সুবিধা আছে। জগতের বাজারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা খুব বেশী নাই।

ক্রোমাইট-উৎপাদনে আফ্রিকার দক্ষিণ-রোডেসিয়ার স্থান প্রথম এবং এক কালে ওসিয়ানিয়ার নিউ ক্যালিডোনিয়াকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইলেও আজ তুরস্ক,

দক্ষিণ-আফ্রিকা (যুক্তরাজ্য), কিউবা, ফিলিপাইন, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ স্থান দখল করিয়াছে। জাপানেও ক্রোমাইট পাওয়া যাইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমে এশিয়া মাইনরের ব্রুসা হইতে ক্রোমাইট পাওয়া যাইত, পরে রোডেসিয়া ও ক্যালিডোনিয়ার ক্রোমাইট পাওয়া যাইবার পর তাহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকে। বর্ত্তমানে আবার তুরস্কের ক্রোমাইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রুসার প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণে দাঘারি বা আলাবার্দ্দা খনি হইতে এই ক্রোমোমাইট পাওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর কত ক্রোমাইট উৎখাত হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩৭	১৯৩৮
	টন	টন
ব্রেজিল	২৯৮০	—
বুলগেরিয়া	২,৩১৩	১,৭১৭
কানাডা	৩,৮১৪	—
কিউবা	৭৯,৪২০	৩৬,৭৩৯
গ্রীস	৫১,৭৮৯	৩৫,০৯৮
ভারতবর্ষ	৬২,৩০৭	৪৪,১৪৯
নিউ ক্যালিডোনিয়া	৪৭,২৬৪	৫১,৩৯১
ফিলিপাইন	৭৫,২০৯	৩৮,২৭১
দক্ষিণ-রোডেসিয়া	২,৭১,২৬৫	১,৮৩,০৮৩
তুরস্ক	১,৮৯,৪৬৮	২,১০,২৫৬
ইউনিয়ন অফ্ সাউথ-আফ্রিকা	১,৬৫,৯৫৮	১,৭৩,৭৭৩
যুগোশ্লাভিয়া	৫৮,৯১৮	৪৯,৪০১
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২,৩২১	৮১২
সাইপ্রস্	১,৬১৫	৫,৫৭৭

ভারতবর্ষে বেলুচিস্থান, বিহার, বোম্বাই, ঈষ্টর্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সী এবং মহীশূর রাজ্য হইতে ক্রোমাইট প্রস্তর উঠিয়া থাকে। ইহা হইতে ক্রোমিক অক্সাইড উদ্ধার করা হয়।

১৯৩৮ সালে উৎখাত মোট ৪৪,১৪৯ টনের মধ্যে প্রতি প্রদেশ এবং প্রদেশের মধ্যে কোন্ জেলায় কত ক্রোমাইট উঠিয়াছে, তাহার অংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	টন	শতকরা অংশ
বেলুচিস্থান		
কোয়েটা পিসিন	৩০৩	·৬
জোব (Zhob)	২১,৫৮৯	৪৯·০
বিহার		
সিংভূম		১১·৭
ঈষ্টর্ণ ষ্টেটস এজেন্সী		
সেরাইকেলা	৯৪	
মহীশূর করদ রাজ্য		
হাসান	৭,২৫০	১৬·৫
মহীশূর	৯,৭১০	২২·০

ভারতের অন্যান্য স্থানেও ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা আজও অর্থকরী ব্যবসা হিসাবে পরিণত করা যায় নাই। মহীশূরের মধ্যে হাসান ও মহীশূর জেলা ব্যতীত সিমাগো এবং নঞ্জনগুড় অঞ্চলে, মন্দ্রে সালেম জেলায় "খটিক পর্ব্বতে" (Chalk Hills-এর) কাকপুরে, রাঁচির হোটাগ, ভাগলপুরে বাইদাচক, মণিপুরে মিনবু জেলায় এবং পোর্টব্লেয়ারে চকরগাঁ নামক গ্রামে এবং অন্যান্য স্থানে ক্রোমাইটের পরিচয় মিলিতেছে। কে জানে এই যুদ্ধের টানে ক্রমশঃ ঐ সকল স্থান হইতে অধিক পরিমাণ ক্রোমাইট উৎখাত হইবে না।

ভারতবর্ষে ক্রোমাইটের বিশেষ ব্যবহার নাই, অর্থাৎ যাহা উৎখাত হয়, তাহার অধিকাংশই রপ্তানী হয়। বাহিরের চাহিদার সহিত ভারতের ক্রোমাইট উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সংস্রব রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ সাল হইতেই ভারতে প্রতি বৎসর উৎপাদিত মোট ক্রোমাইট ও তাহার আনুমানিক মূল্যের হিসাব রাখা হইতেছে। নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে কেবল মাত্র যে পরিমাণের হিসাব পাওয়া যাইবে তাহা নহে, ইহা হইতে প্রতি বৎসর রপ্তানীরও একটা ধারণা হইবে :—

সাল	টন	মূল্য পাউণ্ড (£)
১৯০৪	৬,৫৯৬	৪,১৩৭
১৯০৫	২৭০৮	৩,৪৮২
১৯০৬	৪,৩৭৫	৭,১৮৮
১৯০৭	১৮,৩০৩	২৪,৪০৪
১৯০৮	৪,৭৪৫	৬,৩৩৮
১৯০৯	৯,২৫০	৭,৭৩৭
১৯১০	১,৭৩৭	২,৩১৫
১৯১১	৬,৮০৪	৫,০৭২
১৯১২	২,৮৯০	৩,৮৪৯
১৯১৩	৫,৬৭৬	২,৪৩৫
১৯১৪	৫,৮৮৮	২,৬১১
১৯১৫	৩,৭৬৭	৩,৫৩১
১৯১৬	২০,১৫৯	১৬,৪০১
১৯১৭	২৭,০৩১	২৬,২১৫
১৯১৮	,	৫২,০৬৩

ইহার পর হইতে সরকারী হিসাবে ক্রোমাইটের মূল্য পাউণ্ডের স্থলে টাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে—

		টাকা
১৯১৯	৩৬,৪৩৯	৮,৮৭,২৪৪
১৯২০	২৬,৮০১	৭,৯৯,৬৯৮
১৯২১	৩৪,৭৬২	৫,৪৭,৩৮৯
১৯২২	২২,৭৭৭	৩,৬১,২৮৭

সাল	টন	টাকা
১৯২৩	৫৪,২৪২	৭,৬৬,৭৯১
১৯২৪	৪৫,৪৬২	৫,৮৭,৪০২
১৯২৫	৩৭,৪৫২	৫,৩৪,২৮০
১৯২৬	৩৩,৩৮২	৪,১২,৮৫৯
১৯২৭	৫১,২০৭	৮,৮০,৯৫৭
১৯২৮	৪৫,৪৫৫	৭,৬৫,৬৬৮
১৯২৯	৪৯,৫৬৫	৮,৪১,৭৬৯
১৯৩০	৫০,৬৮৪	৮,৬৭,৪৫৬
১৯৩১	১৯,৯১৩	৩,১৫,০২৬
১৯৩২	১৭,৮৫৬	২,৭৫,৬৭৫
১৯৩৩	১৫,৫২৬	২,২৩,২৪৫
১৯৩৪	২১,৫৭৬	৩,১০,০৬৩
১৯৩৫	৩৯,১২৭	৪,৭৯,৯৫৭
১৯৩৬	৪৯,৪৮৬	৬,০৪,৪৯২
১৯৩৭	৬২,৬০৭	৮,৩৫,৫৮৯
১৯৩৮	৪৪ ১৪৯	৬.৮২.৫০২

গত তিন বৎসরে ক্রোমাইটের দরের সামান্য তারতম্য হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে প্রতি টন ১২৵০, পর বৎসর ১৩৷০ এবং ১৯৩৮ সালে তাহা ১৫৷৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

যখনই কোনও বিশেষ গুণসম্পন্ন বা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় তখনই ক্রোমাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৯১৫ সালে মাত্র ৩,৭৬৭ টন ক্রোমাইট উৎখাত হয়, ১৯১৬ সালে উহা একেবারে ২০,১৫৯ টন এবং ১৯১৮ সালে ৫৭,৭৬৯ টন হয়। যুদ্ধের সময় জাহাজে স্থান অসঙ্কুলান হওয়ায় ভারতের সমস্ত মাল চালান যাইতে পারে নাই ; যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আরও অধিক পরিমাণ ক্রোমাইট রপ্তানী হইত। এই সময় নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলের বোস্তান-বোলান ভাগ খেনাই হইয়া হিন্দুবাগের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের ক্রোমাইট চলাচলের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে রপ্তানীর অসুবিধা ঘটিয়া বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয় নাই। যুদ্ধের পর হইতে এবং বাজারে দারুণ মন্দার জন্য ভারতের ক্রোমাইটের ক্রমে অনাদর ঘটে এবং উৎখাত ক্রোমাইটের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৩৩ সালে মাত্র ১৫,৫২৬ টনে দাঁড়ায়।

পৃথিবীতে যত ক্রোমাইট প্রতি বৎসর পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মেনী ও ব্রিটেন লইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ক্রোমাইটও এক সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে চালান যাইত কিন্তু দক্ষিণ-রোডেসিয়া এবং নিউক্যালিডোনিয়া প্রতিদ্বন্দী হওয়ায় সে বাজার কতক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল :—

	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	২৬,০৯১	৭,৯৬,২৯৩
১৯৩৬-৩৭	২২,৫৪০	৬,১৯,৮৪৯
১৯৩৭-৩৮	৪১,৪৫০	১২,৬৯,০৭৮
১৯৩৮-৩৯	১৪,৬০৬	৫,৩৬,৮৬৩
১৯৩৯-৪০	৩০ ০০০	৯ ০০ ০০০

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আমাদের প্রধান ক্রেতা। জার্ম্মেনী, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতিও লইত ; যুদ্ধের জন্য ঐ সকল স্থানে রপ্তানী বন্ধ আছে। ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালে আমেরিকা ও ইংলণ্ড যথাক্রমে ১৯,৪০০ ও ১,০০০ এবং ৯,৯০০ ও ২,৬০০ টন ক্রোমাইট লইয়াছিল।

ক্রোমিয়মের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আজকাল বহু স্থানে ক্রোমাইট খনিত হইতেছে। ইস্পাত প্রস্তুত করিতে প্রতি বৎসরে প্রাপ্ত সমস্ত ক্রোমিক অক্সাইডের শতকরা ৮০ ভাগ লাগিয়া যায়। লৌহের সহিত নানা অনুপাতে ক্রোমিয়ম মিলাইয়া বহু প্রকার অতি কঠিন এবং কলঙ্করোধী ইস্পাত (stainless steel) প্রস্তুতকার্য্যে এবং অত্যুগ্র-তাপসহনশীলতার জন্য ইহা ধাতু গলাইবার চুল্লী এবং পাত্রাদির অভ্যন্তরের আস্তরণরূপে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ক্রোমাইট প্রস্তরের সহিত অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে নিকেল, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় ইহা হইতে প্রাপ্ত ইস্পাত অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জামের বর্ম্ম বা আচ্ছাদন এবং অতি কঠিন বস্তু ভেদ করিবার জন্য শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি, সিন্ধুক, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্র, পুলের অংশ প্রভৃতি, গাড়ীর চাকা এবং স্প্রীং প্রভৃতি, উচ্চ তাপে কাজ করিতে এবং কঠিন দ্রব্যাদি চূর্ণ বা খণ্ডিত করিবার যন্ত্রের অংশবিশেষে ক্রোমিয়ম ইস্পাত না হইলে চলে না। ক্রমে ক্রমে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন এবং অন্যান্য অংশ (যথা, exhaust valves, turbine blades), নানা প্রকার পাম্পে বা শোষণ যন্ত্রে, বড় হাতুড়ি তৈয়ারী করিতে এবং বৃহদাকার বস্তুতে বাঁধন দিতে (cotters) এবং আরও নানা বিষয়ে ("races and roller bearings, steam traps, acid pumps, evaporating pans") ক্রোমিয়মযুক্ত লৌহ ব্যবহৃত হইতেছে। ক্রোমিয়ম, কোবাল্ট ও মলিবডেনম্ মিশ্রিত ইস্পাত ("stellite") তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাদিতে কাজে লাগে। এই সকল অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা সহজে, এমন কি অনেক তাপেও নষ্ট হয় না। নিকেল, ক্রোমিয়ম ও লৌহ ও ভ্যানাডিয়ম, ক্রোমিয়ম

মিশ্রিত লৌহ যত প্রকার কাজে লাগিতেছে তাহার তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। ক্রোমিয়ম মিশ্রিত ইস্পাত শীতল অবস্থাতেও মোচড়াইতে পারা যায় এবং এমন গুরু কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যেও ছিদ্র করা যায় না। সাধারণতঃ এই সকল ইস্পাত জল বা অম্লের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং কোনও রকমে মরিচা পড়ে না।

ক্রোমেট ও বাই-ক্রোমেট পাইতে হইলে ক্রোমাইট প্রয়োজন। ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর রং বিশেষতঃ হরিদ্রা, সবুজ, লাল ও ছাপা কাপড়ের রং এবং চীনা-মাটির কাজে বিশেষ প্রয়োজন। চামড়ার সংস্কার (chrome leather) কার্য্যে ইহার ব্যবহার আছে। বাই-ক্রোমেটের সাহায্যে তৈল বা স্নেহ পদার্থ (চর্ব্বি প্রভৃতি) বর্ণহীন করা যায় এবং পরীক্ষাগারে বস্তু অক্সিডাইজ করিতেও ইহার ব্যবহার উপেক্ষণীয় নহে।

ক্রোমিক অম্ল বা এ্যাসিড এই সকল কাজেই উপযোগী এবং ফটোগ্রাফিতে এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কাজে ইহা লাগে। উচ্চাঙ্গের সাদা পালিশ করিতে ক্রোমিয়ম ব্যবহৃত হইতেছে এবং ক্রমেই তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু ইহাতে ক্রোমিয়মের পরিমাণ সামান্যই লাগে।

নানা প্রকার পণ্যের ন্যায় আমাদের দেশ হইতে অসংস্কৃত ক্রোমাইট-প্রস্তর পাঠাইয়া দিলেই আমাদের কাজ চুকিয়া যায়। কিন্তু দেশে দেশে ইহার বহু চাহিদা রহিয়াছে কারণ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে ক্রোমিয়ম সংক্রান্ত শিল্প কিছুই নাই। যে ভাবে ক্রোমিয়ম লৌহের সহিত যুক্ত হয়, তাহাতে লৌহের বিরাট কারখানা না করিয়াও ক্রোমিয়ম সংক্রান্ত শিল্প পরিচালনা করা অসম্ভব নহে। ক্রোমাইট হইতে ক্রোমিক অক্সাইড বিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। চেষ্টা করিলে ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। আজ আমাদের দেশে গন্ধক-লৌহ প্রস্তর হইতে গন্ধক উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় এই উদ্দেশ্যে বড় কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন; প্রকৃতপক্ষে দুই-তিন লক্ষ টাকা হইলে বাঙালী মস্তিষ্ক-প্রসূত যন্ত্রাদির সাহায্যে গন্ধক পাওয়া যাইবে। উৎসাহ এবং সামান্য সাহায্য পাইলে হয়ত ক্রোমিয়ম পাওয়া এই ভাবেই সহজ হইয়া পড়িতে পারে। ক্রোমিয়ম পাইলে দেশে উৎপাদিত লৌহ দ্বারা অন্যান্য কারখানায় ছুরি কাঁচি এবং অন্যান্য ক্রোমিয়মসংযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য সহজেই চলিতে পারে। বেলুচিস্থানের ক্রোমাইটের শতকরা ৫৭ ভাগ ক্রোমিক অক্সাইড, ১৩'৬ ভাগ ফেরিক অক্সাইড, ১৬'৬ ভাগ ম্যাগনেসিম অক্সাইড, ৯'৮ ভাগ এলুমিনিয়ম অক্সাইড আছে। সাধারণতঃ ভারতের ক্রোমাইটের আধাআধি ক্রোমিক অক্সাইড ধরা হয়। সুতরাং ভারতে ক্রোমিয়ম সংক্রান্ত শিল্প যদি গড়িয়া না উঠে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তবে আশা আছে যখন ভারতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তখন সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমিয়মযুক্ত ইস্পাত প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে।

এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বন্ধু প্রবন্ধ দেখিয়া বলিলেন, ভারতে ক্রোমিক এ্যাসিডের ভয়ানক অভাব হইয়াছে, কিন্তু স্বল্প ব্যয়ে ভারতীয় ক্রোমাইট হইতে সহজেই উহা প্রস্তুত হইতে পারে। এ দিকে যদি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে।

সুন্দরের ঘর

শ্রীহেমলতা দেবী

মাটিতে মিশায়ে আছে দেহের আনন্দ
হরিৎ করিছে তৃণে, ফুলে মধুগন্ধ
দিতেছে ভরিয়া, রস জোগাইছে আনি
তরুলতা গুল্মদেহে সজীব প্রমাণি।
প্রচ্ছন্ন মাটির রস—অলক্ষ্যবাহিনী
ফুলে ফলে ব্যক্ত তার অব্যক্ত কাহিনী।
প্রেমে যদি মাটিদেহ না হ'ত গঠিত
সুন্দরের এত রূপ ফুলে কি ফুটিত?

বসুন্ধরা এত রসে উঠিত কি ভরি
সুন্দরে অন্তরে যদি না রহিত ধরি?

সুন্দরের দেহ সে যে অনিন্দ্যসুন্দর
আলো করি রাখে প্রেম এ মাটির ঘর।

সুন্দরের দেহ সাথে দেহ বিনিময়
অন্তর করিল চিরসুন্দরে তন্ময়।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শাশুড়ী বলিলেন, আজ বেশ রোদ উঠেছে, ওলের আচারের খোরাটা রোদে দাও দেখি, বৌমা।

আচার রোদে দিয়া যোগমায়া জলের ঘটি লইয়া যেমন হাত ধুইতেছে অমনই হাত ফস্কাইয়া ঘটি রোয়াকের উপর পড়িয়া গেল। সন্ত্রস্ত যোগমায়া তাড়াতাড়ি ঘটি তুলিয়া লইতে-না-লইতে শাশুড়ী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, হাত থেকে ঘটি পড়লো বুঝি?

যোগমায়া কাষ্ঠ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী হাসিমুখে বলিলেন, কাল চাকা পাখী ডেকে গেল—আজ ঘটি পড়লো তোমার হাত থেকে—নিশ্চয়ই রাম আসবে। এমন ছেলে সব আজকালকার—একখানা চিঠি দিয়েও বলে না, কবে আসবে।

নিজের আনন্দেই শাশুড়ী বলিয়া চলিলেন, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে বল আধকাঠা সোনা-মুগের ডাল ভেজে আজই যেন ভেঙ্গে রাখেন। এক গুটি (কাঁচি এক পোয়া) ঘি দেখতে হবে গয়লা বাড়ি। পূজো আসছে কিনা, সব জিনিসই মাগ্যি।

যোগমায়ার অন্তরেও বুঝি শাশুড়ীর মনের প্রসন্নতার ছোঁয়াচ লাগিল। এক নিমিষে এই বাড়িখানার চেহারা বদলাইয়া গেল। শরতের আকাশ সত্যই গাঢ় নীল। বর্ষায় যে আকাশ জলভারে অবনত হইয়া থাকে, শরতের ছোঁয়া লাগিয়া সে কতখানি উঁচু হইয়াছে! স্থলপদ্মের গাছ ভরিয়া গোলাপী ফুল ফুটিয়াছে, কত নূতন রঙের পাখী আসিয়া আম ও কাঁঠাল গাছে কলরব তুলিতেছে। ও-পাশের শিউলি গাছটায় অজস্র ফুল, ভারি মিষ্ট গন্ধ বাহির হয় রাত্রিতে। সকালে শিউলিতলা আলো করিয়া সেই ফুল বিছাইয়া থাকে। আঁচল ভরিয়া শিউলি ফুল সংগ্রহ করিয়া তাহার লাল রঙের বোঁটাগুলি কাটিয়া যোগমায়া রোয়াকে শুকাইয়া লয় প্রত্যহ। প্রায় একপো-টাক শুকনা বোঁটা জমিয়াছে। চারখানা শাড়ী সেই রঙে ছোপানো চলিবে। যে লাল পাড় শাড়ীখানা কাল ছোপানো হইয়াছে সেখানা পরিলেও তো মন্দ দেখায় না। রামচন্দ্র আসিয়াই যদি দেখে শিউলি রঙের শাড়ী পরিয়া অপরিচিতা একটি মেয়ে এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কি বলিবে সে? চিনিতে পারিবে তো যোগমায়াকে? কিন্তু রাত্রিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিবে না। অমন ভাবে চিঠি লেখা কি তার উচিত হইয়াছে! রাধারাণী যা হাসিয়াছে চিঠি পড়িয়া। দুর্ব্বোধ্য চিঠির সবটা বুঝিতে না পারিয়া রাধারাণী বাধ্য হইয়া তাহার বরের সাহায্য লইয়াছে। কি লজ্জার কথা! তা ছাড়া নিজের মাকে মাসে মাত্র একখানা চিঠি দেওয়া কেন! যেমন যোগমায়ার চিঠি আসে—ঐ সঙ্গে মাকেও কি দু-ছত্রে প্রণামটুকু জানানো চলে না? শাশুড়ী যখন তখন চিঠির কথা লইয়া যোগমায়াকে কত কথা বলেন! শ্বশুর-বাড়ি না হইলে সে এতদিন অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইত।

পক্ষীদূতেরা অনেক সময় সঠিক সংবাদই দেয়। সেই দিনই দুপুরবেলায় রামচন্দ্রের পত্র আসিল। চারি দিনের ছুটি লইয়া আগামীকল্য সে বাড়ি আসিতেছে।

সত্য সত্য আজ বৈকালে সূর্য্য পাটে বসিবার সময় পশ্চিমের ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলির মাথায় যা চমৎকার রক্তের ছোপ ধরিয়াছিল! এক ঝাঁক সাদা পাখী 'ক্যাঁক' 'ক্যাঁক' শব্দ করিতে করিতে সেই মেঘের গা দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। হয়ত ওদের ঘরে।

পিসিমার সঙ্গে আজ যোগমায়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। সেকালের গল্প শুনিতে যোগমায়া ভালবাসে। অতীত কালের লোকেরা চিরদিনই সুখী, চিরদিনই তাঁহাদের রাম-রাজত্বে বাস। বর্ত্তমান কাল—বড় প্রখর কাল। অনেক আচার-প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সোনার কালের (পিসিমার ভাষায়) শতজীবী লোকেরা কি সাধে ধর্ম্মঅন্তপ্রাণ ছিলেন! যা মুনিঋষি-প্রচলিত বিধান তাকে মানিয়া চলাতেই জগতের মঙ্গল। কলির শেষে পাপ যখন চারি পোয়ায় পূর্ণ হইবে তখন কল্কি অবতার সারা পৃথিবীটার পাপী লোকগুলিকে তীক্ষ্ণ ধার তরবারির দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার শ্বেত অশ্বটিকে উল্কার গতিতে ছুটাইয়া পাপময় সৃষ্টিকে ধ্বংস করিবেন। তার

পর আরম্ভ হইবে সত্য যুগ। সত্য যুগে মানুষের কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সে অঋণী হইবে, প্রবাস জীবনযাপন করিবে না, সর্ব্বক্ষণের জন্য সরস প্রসন্নতা তার বজায় থাকিবে। এবং...

গল্প শুনিতে শুনিতে যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পিসিমা ডাকিয়া তুলিয়া দিলেন। ভরসন্ধ্যা বেলায় বধূর ঘুম দেখিলে শাশুড়ী এখনই অলক্ষণের আশঙ্কায় আঁতকাইয়া উঠিবেন।

প্রবাস হইতে বাড়ি আসিল রামচন্দ্র। তখন দিনের বেলা। অন্তরালে অবস্থিতি ছাড়া যোগমায়ার উপায় নাই। তোরঙ্গ নামাইবার শব্দ, কাপড়-জামা বাহির করিবার ঘস্‌ঘসানি, আর মাতাপুত্রের কথোপকথন পাশের ঘর হইতে যতটা শোনা যায়—যোগমায়া শুনিল। আশ্চর্য্য দেশ! রামচন্দ্রকে নিজেই হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে হয়! তরকারি? পুরুষমানুষ কখনও ও-সব রাঁধিতে পারে? তিন দিন ভাতে ভাত খাইয়া—তাও কি ফেনগালা ঝরঝরে ভাত—রামচন্দ্রের শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছিল! ভাগ্যে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী ছেলেটির আনাড়িপনা দেখিয়া নিজে হইতে সাধিয়া তাঁহাদেরই বাড়িতে উহার দুই বেলা দু'টি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন! বিনিময়ে মাত্র পাঁচটি টাকা তাঁহাকে দিতে হয়। কিন্তু ঐ সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে যত্ন তিনি করেন তাহা নাকি জীবনে ভুলিবার নহে। পোস্ট আপিসের কাজ,—সকাল, দুপুর, বিকাল অষ্টপ্রহরই লাগিয়া আছে। একটা পিওন আছে, সে বাবুর ফাইফরমাশ খাটে। শীতকালে পাটালী গুড়, খেজুর রস, গ্রীষ্মকালে ফুটিটি, তরমুজটি, ভাল জাম, ফলসা বা আমটি আনিয়া রামচন্দ্রকে উপহার দেয়। আষাঢ়ে পেটো অর্থাৎ বড় ইলিস মাছ—নদী হইতে যেদিন সে পায়—একটি লইয়া আসিতে ভোলে না। মাছ পাইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর নাকি আনন্দ ধরে না। তাড়াতাড়ি ভোঁতা বঁটিখানা পাতিয়া মাছটি তিনি কুটিয়া ফেলেন। আগে আঁশগুলি ছাড়াইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তবে ইলিস মাছ কুটিয়া পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। কাঁচা ঝাল-দেওয়া পেটি তিনি বেশি করিয়াই রামচন্দ্রের পাতে দেন। যে মাছ আনে, তাহাকে নাকি বেশি করিয়া দেওয়াই নিয়ম।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর সুখ্যাতিতে শাশুড়ী মুখর হইয়া উঠিলেন, আহা সতীকন্তে, রেতের প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক। হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। হাঁ রে, এত খাস-দাস, জল-হাওয়াও বললি ভাল, তবু তোকে রোগা রোগা দেখাচ্ছে কেন বল ত?

রোগা! কৈ? রামচন্দ্র সশব্দে হাসিয়া উঠিল। আমাদের পোস্ট আপিসের কাছেই রেল-স্টেশন। সেখানে ওজন হবার যন্ত্র আছে। যখন যাই ওখানে, প্রথম ওজন হলাম—এক মণ দশ সের। কাল আবার ওজন হ'লাম—এক মণ সাড়ে তের সের। সাড়ে তিন সের বেড়েছি, মা।

হাঁ, ছাই যন্তর! ওজনে বাড়লে বুঝি মানুষের মুখ সরু হয়! মানুষ বুঝি লম্বা তালগাছের মত হয়?

তিন মণ ওজনে বাড়লেও তোমার চোখে আমি তেমনি রোগাই থাকব। রামচন্দ্র টানিয়া টানিয়া যে দীর্ঘ হাসিটি হাসে তাহা সত্যই ধ্বনি-মাধুর্য্যে অপরূপ। সে যে রামচন্দ্রের হাসি—অনেকগুলি লোকের হাসির মধ্যে মিশিয়া থাকিলেও যোগমায়া অনায়াসে তা বলিয়া দিতে পারে।

নাঃ, জালাতন! অনেক দিন বাদে বাড়ি আসিলে পাড়ার লোকে যেন তামাশা দেখিতে ভিড় জমায় বাড়িতে। বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ি ভর্ত্তি। বেচারা কোন তেপান্তরের মাঠ ভাঙ্গিয়া, সারারাত্রি না ঘুমাইয়া আসিয়াছে; না মিলিতেছে তাহার বিশ্রাম, না বা জল-খাবার খাইবার একটু ফুরসৎ? বাড়ি যেন কেহ আর আসে না!

দুপুর বেলায় শাশুড়ী আজ ঘুমাইলেন না, ছেলের সঙ্গে কত গল্প করিতে লাগিলেন। ছেলেও গল্পে মাতিয়া গেল। গল্প আর কিছুই নহে, বাড়িতে নূতন ঘর তুলিবার কথা। কোন্‌খানে ঘর উঠিবে, একতলা না দোতলা হইবে, পাত-কুয়াটা বুজিয়া আসিতেছে—নূতন একটা কাটাইতে হইবে, আপাততঃ গোয়াল না ছাওয়াইলে শীতকালে গরু রাখা দায় হইয়া উঠিবে। বাঘ না হউক, হাঁড়োলেও তো ছোট ছোট বাছুর অনেক মারিয়া ফেলে!

রাত্রির আহারে বেশ খানিকটা বিলম্ব হইল। বিলম্ব তো হইবারই কথা। ছেলে বাড়ি আসিয়াছে, যেখানে যে সময়ের বা অসময়ের আনাজপাতি পাওয়া যায় শাশুড়ী তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। তার উপর, খাওয়ার সঙ্গে গল্প। সে গল্পেরও যেন শেষ নাই। রাত্রি বারোটায় যোগমায়া যখন শুইতে আসিল, তখন সারাদিনকার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলি নিদ্রার ছায়াময় আলস্যে মন্থর হইয়া উঠিতেছে। বার বছরের মেয়ে যদি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই প্রতীক্ষাকে সমান তীক্ষ্ণ করিয়া রাখিতে না পারে—তাহারই বা অপরাধ কি!

রামচন্দ্র জাগিয়াই ছিল। এমন কি সে শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত করে নাই। যোগমায়া দুয়ার বন্ধ করিবার সঙ্গে সে বিছানা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। দু'টি ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে একটি অস্ফুট ধ্বনি তুলিবামাত্র যোগমায়া খপ করিয়া তাহার পায়ের গোড়ায় অবনত হইয়া পায়ের ধুলা তুলিয়া মাথায় দিল। তার পর রামচন্দ্রের বাহুবিস্তারের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভাল ছিলে?

কথাটা অভিনয়ের মত শোনাইল না, আন্তরিকতায় গাঢ়বদ্ধ সে স্বর। রামচন্দ্র চুম্বনের দ্বারা সে কথার প্রত্যুত্তর দিয়া যোগমায়াকে প্রতিপ্রশ্ন করিল।

তন্দ্রাদেবী এ ঘরের সীমানা পরিত্যাগ করিলেন। যোগমায়া বলিল, ফের যদি দুষ্টুমি ক'রে অমন চিঠি লেখ তো জবাবই দেব না।

তুমি কেন লিখেছিলে অত কথা? যত দোষ বুঝি আমারই বেলায়!

বাঃ রে, তোমার চিঠির জবাব না দিলে তুমি হয়ত ভাববে—যোগমায়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বলিল, কি ভাবব? থামলে কেন, বল?

ভাববে আমি কিছুই জানি নে।

বটে! আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে? চিঠিখানা তুমি নিজে লিখেছিলে না, আর কেউ—

বল দেখি কে? কৌতুকে যোগমায়ার চক্ষু নাচিয়া উঠিল।

তুমিই। রামচন্দ্র সমাপ্তির ছেদ টানিয়া এক মুহূর্ত্তে যোগমায়ার সমস্ত কৌতূহলকে নির্ব্বাণ করিয়া দিল।

যোগমায়া কহিল, আমি? ঠিক বলছো তো?

কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

ইস্। বলবো বই কি। নিজে পারলেন না বলতে!

এখানে তোমার আবার কে সঙ্গীসাথী জুটলো তা তো জানি নে। মা কি পিসিমা তো লিখতে পড়তে জানেন না।

মাকে দিয়ে বুঝি তোমার চিঠি লেখানো যায়? কি বুদ্ধি!

তাই ত, তবে এ সখীটি কে? রামচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তার অভিনয় করিল।

মৃদু হাসিয়া যোগমায়া বলিল, বল দেখি। বলতে পারলে তোমায় একটা জিনিস দেব কিন্তু।

কি জিনিস আগে বল?

তা বলব বৈকি! ফাঁকি দিয়ে জিনিসের নামটি জেনে নাও—ভারি চালাক!

তা হ'লে জিনিস তোমারই রইলো, মায়া। নাম আমি বলতে পারলাম না।

বলি? রয়ে আকার রা—আর ধয়ে আকার ধা—কি হয়?

রাধা।

তারপরটা বল না।

রাধাকে আমি তো জানি না।

দুয়ো, হেরে গেলে! রাধাদি হচ্ছেন গাঙ্গুলী-বাড়ির বউ।

বটে! তাঁর সঙ্গে এরই মধ্যে ভাব করে নিয়েছ?

সেদিন লক্ষ্মীপুজোর দিন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন, ভাব হয়ে গেল।

তাই বলি, এমন কবিত্বভরা চিঠি কে লিখলে?

হুঁ—হুঁ—কেমন জব্দ! যোগমায়া হাসিয়া উঠিল।

খুব জব্দ করেছ যা হোক। আচ্ছা এইবার না বলতে পারার জন্যে তোমায় একটা উপহার দেব আমি। পছন্দ হল কিনা বলতে হবে।

রামচন্দ্র উঠিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে একটা কাগজের বাণ্ডিল টানিয়া আনিল। ছোট লম্বামত বাণ্ডিল। কাগজ খুলিবার সময় যোগমায়ার লুব্ধ দৃষ্টি সেই অনাবৃত বস্তুটির উপর পড়িল। সবুজ রঙের একখানা শাড়ী। পাড়গুলিতে ফুল কাটা। চক্‌চকে শাড়ীখানা ফুল পাড়ে মানাইয়াছে ভাল।

রামচন্দ্র বলিল, এর নাম পার্শী শাড়ী—নতুন উঠেছে। কেমন পছন্দ হয়!

এ জিনিস যে রামচন্দ্র তাহারই জন্য আনিয়াছে সে কথা ভাবিতে গিয়া পুলক-বিহ্বলা যোগমায়ার আর উত্তর দেওয়া হইল না। পুলকের আতিশয্যে সে ঘাড় নাড়িতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। শুধু তাহার উজ্জ্বল চোখ দেখিয়া রামচন্দ্র আশ্বস্ত হইল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিবার পর রামচন্দ্র বলিল, এইবার পর দেখি—কেমন মানায়?

দূর! লজ্জায় যোগমায়া মুখ নামাইল।

কেন দোষ কি?

কিছুতেই যোগমায়াকে নূতন শাড়ী পরানো গেল না। উপরন্তু সে জানাইল, মাকে না জানাইয়া চুপি চুপি তাহাকে উপহার দিলে কোন দিন সে শাড়ী সে পরিতে পারিবে না। সে শাড়ী পড়া তাহার উচিত নহে।

রামচন্দ্র বলিল, বাঃ, এখন এ শাড়ী কি মাকে দেখানো চলে? তোমার আটপৌরে কাপড়, মার কাপড়, পিসিমার কাপড়—সব তো দুপুর বেলায় ওঁর হাতে দিয়েছি!

যোগমায়া বলিল, তবে এ শাড়ী আমি পরবো না, ফিরিয়ে দিয়ো।

দোকান থেকে একবার কিনলে আবার নাকি ফেরৎ নেয়!

তাহলে কি হবে? দুশ্চিন্তায় যোগমায়ার কচি-মুখখানিতে ছায়া নামিল।

রামচন্দ্র খানিকক্ষণ চিন্তাচ্ছন্নের মত বিমূঢ় হইয়া রহিল। অকস্মাৎ এক সময়ে মৃদুহাসির ছটায় তাহার মুখখানি ভরিয়া উঠিল।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, হাসছ যে?

রামচন্দ্র বলিল, মানে—এখন তোলা থাক এখানা। আমি যাবার দিন সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তার পর সুবিধা বুঝে এক দিন তোমায় দেওয়া যাবে।

কি করে দেবে?

সে আমি বুঝবো। বলিয়া রামচন্দ্র হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

যোগমায়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, কি যে হাসছো!

আছে—আছে—মজার কথা আছে। রামচন্দ্র হাসিতেই লাগিল।

যোগমায়া বলিল, সর, আমি শুই।

সারারাত যাত্রাগান শুনিয়া ভোরবেলায় শ্রোত্রীর যেমন অবস্থা হয়, নিদ্রা-শৈথিল্যে যোগমায়া তেমনই অবশ হইয়া পড়িল। পথক্লান্ত রামচন্দ্রও কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে সুখস্বপ্নের মত তিনটি দিন কাটিয়া গেল। অষ্টমী পূজার দিন—ঠাকুর দেখিতে শাশুড়ীর সঙ্গে সে বুড়া বারোয়ারি তলায় গিয়াছিল। শাশুড়ী বুকের রক্ত দেওয়া ও ধুনা পোড়ানো মানত করিয়াছিলেন বলিয়া পিসিমার সঙ্গে যোগমায়াও মানত শোধ দেওয়া দেখিতে গেল। ঠাকুরের সম্মুখে—যেখানে আক, কুমড়া, কলা, প্রভৃতি বলিদান দেওয়ার জন্য মাটির অস্থায়ী ছোট আল তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহারই সামনে যোগমায়ার শাশুড়ী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পদ্মাসন করিয়া বসিলেন। মাথায় ও দুই হাতে মাটির সরা লইয়া নারিকেল ছোব্‌ড়ায় আগুন জ্বালিয়া সরার উপর রাখা হইল। ঠাকুরের নির্মাল্য ফুল মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত তাহার উপর রাখিলেন এবং পিসিমা উৎসর্গীকৃত ধুনা মুঠা মুঠা করিয়া সেই আগুনে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। চারিদিকে বহু নরনারী ভিড় করিয়া সেই ধুনা পোড়ানো দেখিতে লাগিল। যোগমায়ার ভারি লজ্জা করিতেছিল। এতগুলি লোকের সামনে বসিয়া—হাতে ও মাথায় সরা লইয়া ধুনা পোড়ানো—সে হইলে কিছুতেই পারিত না!

তার পর বুক চিরিয়া রক্ত দেওয়ার পালা। নূতন ছুরিতে বুকের খানিকটা চিরিয়া যে রক্ত বাহির হইল তাহারই খানিকটা নূতন পাত্রে রাখিয়া দেবীর সাম্‌নে ধরিয়া দেওয়া হইল। ঢুলি বাজনা বাজাইতেছিল, চারিদিকের লোকজন প্রশংসাধ্বনি তুলিয়াছিল। যোগমায়া কিন্তু সারাক্ষণই চোখ বুজিয়া ছিল।

নবমীর দিন কাদা খেঁড় যোগমায়া দেখিতে যায় নাই, শুধু রামচন্দ্র কাপড় জামায় কাদা মাখিয়া বাড়ি আসিলে তাহার হাসি পাইয়াছিল। স্ফূর্ত্তিতে মানুষের এমন অদ্ভুত চেহারাও হইতে পারে!

দশমীর দিন বিল্বপত্রে নাম লিখিবার কালে রামচন্দ্র যোগমায়াকে একান্তে পাইয়া কহিল, তুমিও নাম লেখ না কেন?

দূর, মা এখুনি এসে পড়বেন।

কোথায় মা? গঙ্গা থেকে নেয়ে আসতে তাঁর এখনও আধঘণ্টা। লক্ষ্মীটি, লেখ। এই যে আল্‌তা—

যে ছোট ছোট বেল পাতা—আর যোগমায়ার অক্ষরের ছাঁদগুলি বড় বড়। শ্রী শ্রী লিখিতেই একটা পাতা ফুরাইয়া গেল। সরু বেলপাতার বোঁটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া রামচন্দ্র যোগমায়ার হাত ধরিয়া বলিল, এমনি করে ছোট ছোট ক'রে ধরে ধরে লেখ।

বলিতে গেলে—সে লেখা রামচন্দ্রেরই। যোগমায়ার আড়ষ্ট হাতে শুধু বেলপাতার বোঁটাটি ছিল—যা করিবার রামচন্দ্রই করিয়াছে।

বৈকালে রামচন্দ্র বিদায় লইল। বিদায়কালে পিসিমা আশীর্ব্বাদ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন, শাশুড়ীও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইলেন। যোগমায়ার মনটিতে যেন ভারি একখানা পাথর চাপিয়া বসিয়াছে। চোখে জল আসা এমন কিছু বিচিত্র নহে।

যোগমায়ার যা-কিছু মনোবেদনা অন্তরালেই নিষ্পন্ন হইল। মনের মাঝে তরঙ্গ উঠিল, কেহ দেখিল না, নির্জ্জন ঘরে দাঁড়াইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া সে বিদায়-ব্যথা অনুভব করিল—কেহ বুঝিলেন না, এবং সেই নির্জ্জন ঘরে কাঁদিলেও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ রহিলেন না।

৮

শ্বশুরবাড়ি যোগমায়ার ভাল লাগিতেছে না। মনের

মধ্যে সামান্য ব্যথা জমিয়া আছে, কাহারও কাছে মন খুলিয়া ধরিবার উপায় নাই। যখন তখন গাঙ্গুলী-বাড়ি যাওয়া চলে না। সেদিন তো শাশুড়ী স্পষ্টই বলিলেন, হুট বলতে কারো বাড়ি যাওয়া আমি পছন্দ করি নে। তোরা এলি, আমরাও গেলাম—সে এক কথা।

অথচ শাশুড়ী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামখানি আট-দশ বার ঘুরিয়া আসেন। সংসারে মানুষ-জন নাই। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন—শক্ত না হইলে বাহিরের সংসারে তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই যে কঠিন হইত! বাজার হাট, দোকানের কেনা-কাটা, কাহারও কাছে টাকা ধার করা, ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনা, পড়ো জমিতে কেহ কাঠ ভাঙ্গিতে আসিলে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করা ইত্যাদি সবই তিনি একাকী করিয়া থাকেন। পিসিমা গ্রামের মেয়ে হইয়াও কুলবধূর মত চরকা সূতা লইয়া ঘরের কোণে দিন কাটাইতে ভালবাসেন। এই গ্রামের মেয়ে হইলেও শ্বশুর-ঘর তাঁহাকে করিতে হয় নাই। পিসেমশাই ঘর-জামাই ছিলেন বলিয়া পিসিমা অত্যধিক লজ্জাশীলা হইয়াছেন।

পাড়ার বাহির হইলেও বা নিস্তার ছিল। যত বার বাহির হইতে ফিরেন তত বারই শাশুড়ীকে গা ধুইয়া স্নান করিতে হয়। পল্লীর পথঘাট ভাল নহে, বাসি কাপড়ে কত জাতির লোক যে তাঁহারই গা ঘেঁষিয়া পথে চলে—তাহারও হিসাব তিনি প্রত্যেকবার শুদ্ধীকৃত হইবার সময় দেন। অবশ্য তাহারা যে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাপড় অপবিত্র করিয়া দেয় এমন নহে, মানুষের স্বভাবই হইল—সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা!

বাড়ি আসিয়া বলেন, এক ঘড়া জল মাথায় ঢেলে দাও তো কাপড়খানা কেচে নিই; কলুদের ছেলেটা এমন জোরে ছুটে গেল—গায়ে কাপড়খানা ঠেকে গেল যেন! ওই টেমি ঘটির গঙ্গাজলের কি কম্ম! তাঁবার বড় ফেরোটা এনে সবটুকু জল মাথায় ঢেলে দাও। ছিরিক ক'রে একটুখানি জল ছিটোলে কি দেহ শুদ্ধ হয়!

তা ছাড়া আজকাল সংসারের ছোটখাটো কাজ—যেমন গরুর বিচালী কাটা, গোবর নেদি দেওয়া, ঘর রোয়াক ঝাঁট দেওয়া, রান্নাঘর নিকানো সবই যোগমায়া করে। যন্ত্রের মত সে কাজ করে, কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। কখনও দূর প্রবাসে স্বামীর কথা মনে পড়ে, কখনও হরিপুরের বৈঁচি বনের ধারে, কদমতলার ডোবার শুসনি-কলমির বনে, কখনও বা আমবাগানের মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়ায়। শীতকালে বড় বড় বৈঁচি পাকিবে, মোড়লদের ক্ষেতে রাঙা-আলু ও শাঁকালু তোলা হইবে, মটর গাছগুলিতে এত দিনে বেগুনি ফুল ধরিয়াছে নিশ্চয়।...শাশুড়ী বকেন। কাজে মনোযোগ না থাকিলে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না। বকুনিতে যোগমায়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে—আবার এলোমেলো চিন্তার ধারায় কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

আর একটি কাজ কার্ত্তিক মাস পড়িয়া অবধি যোগমায়াকে করিতে হইতেছে। গোময় লেপিয়া তুলসীতলা পরিষ্কার করিয়া প্রত্যেকটি সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেই একটি করিয়া মাটির প্রদীপ তার তলায় জ্বালিয়া দিতে হয়। প্রদীপের সলিতা পাকানো দুপুর বেলাতেই সে সারিয়া রাখে। এত কাজ, তবু যোগমায়ার মন এখানে বসিতে চায় না। এ বাড়ির সঙ্গে কেমন নাড়ীর যোগ যেন তাহার নাই! পরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসার মত—সর্ব্বদাই লজ্জা ও কুণ্ঠায় যোগমায়া নিজেকে ঘরের এক কোণে গোপন করিয়া রাখিতে চায়।

শাশুড়ী যত বলেন, তোমার ঘর, তোমার দুয়োর বুঝে নাও এই বেলা। যোগমায়া মাথা নাড়িয়া শাশুড়ীকে জানায় সে সব বুঝিয়াছে, কিন্তু মনে মনে ভাবে, যেখানে জোরে হাসিবার অধিকার নাই—সে বাড়িকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করার মত অধর্ম্মের ভোগ আর কি আছে! যোগমায়া কি যখন তখন ছাদে উঠিতে পারে? যখন তখন লাফাইয়া এঘর-ওঘর করিতে পারে? না, পাড়ায় অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাই তাহার আছে! তবে শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করিতে নাই, যোগমায়া নীরবে তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলে।

এক দিন রাধারাণী বলিল, শাশুড়ীকে একটু যত্ন-আত্তি করবি ভাই, নইলে কথা শুনতে হয়।

যোগমায়া বলিল, উনি তো আমায় ভালবাসেন।

দূর নেকি, কি রকম জানিস? উনি কাজ করছেন, তুই হাত থেকে সে কাজ কেড়ে নিলি। উনি শুয়েছেন—হ'লো বা একটু পা টিপে দিলি। ওঁর মাথায় যদি পাকা চুল থাকে তো তুলে দিবি।

যোগমায়া শুষ্ক মুখে বলিল, আমার ভয় করে। অষ্ট-প্রহর যে রকম ছুঁই-ছুঁই করেন। ওঁকে ছুঁলে কি আর রক্ষে আছে?

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, তা বটে! ছুঁচিবেয়ে ধাত যাদের তারা কারও কাজ পছন্দ করে না। আমার শাশুড়ীরও ছিল, ওঁর পাল্লায় পড়ে সে রোগ সেরেছে।

হাসিয়া যোগমায়া বলিল, কি রকম ?

এই ধর না, যেমন কাচা কাপড় পরে ভাঁড়ারে ঢুকেছেন—উনি গিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। বকৃতে বকৃতে মাথায় জল ঢেলে ফের কাচা কাপড় পরেছেন—অমনি উনি আবার ছুঁয়ে দিলেন। মানুষ আর কত বার মাথায় জল ঢালতে পারে, বল ?

আমার শাশুড়ী দিনে আট-দশ বার ঢালেন।

সকলের ধাত তো সমান নয়। ওঁর সহ্য হয় না। এখন কি বলেন, জানিস ? বলেন, বামুন মানুষ তিন পা বাড়ালেই শুদ্ধ।

যোগমায়া ও রাধারাণী দুই জনেই হাসিতে লাগিল। হাসি থামাইয়া রাধারাণী বলিল, তুই বরং এক কাজ করিস। দশমীর দিন—দোয়াদশীর দিন ওঁর ফল মূলগুলো কুটে কেটে দিস। ফলে তো দোষ নেই।

যোগমায়া চুপ করিয়া রহিল। একটু থামিয়া বলিল, ফল তো উনি খান না।

খান না! তবে কি খান দশমীর দিন ?

ময়দার সঙ্গে ঘি মিশিয়ে, কখনও বা দোকান থেকে ছানা আনান।

আর দোয়াদশীর দিন ?

প্রথমে একটা কলা ছাড়িয়ে আধখানা খান, বাকি আধখানা চাল ভাজার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খান।

তবে চালভাজাগুলো গুঁড়িয়ে রাখিস।

হাঁ! ভাজাখোলা সেই তেকাটায় টাঙানো আছে। আমাদের ছুঁতে দেন কিনা!

তাই ত, তোর তা হ'লে এ জন্মে আর শাশুড়ী-সেবা হ'ল না। তা মন দিয়ে স্বামী-সেবা করিস—তাতেই অক্ষয় পুণ্য।

তার পর সেই প্রসঙ্গই চলিতে থাকে।

কিন্তু সে আর ক'দিন! সারা কার্ত্তিক মাসে এক দিন রাধারাণী বেড়াইতে আসিয়াছিল এ বাড়িতে, এক দিন যোগমায়া গাঙ্গুলী-বাড়ি গিয়াছিল। দু'টি স্বল্পায়ু দুপুরের নিরালা মুহূর্ত্তে মন খুলিবার অবসর যা মিলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি তৃপ্তি আসে ? একটি পুরা দিনে যে কথার উৎস অবিশ্রান্ত ভাবে উৎসারিত হইলেও ফুরাইতে চাহে না, সামান্য কয়েক দণ্ডের আলাপে—আলাপের তৃষ্ণাই তো বাড়িয়া যায়!

একটু আশার আলোক যা দেখা যাইতেছে। বাবা এক দিন আসিয়াছিলেন—যোগমায়াকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া। কার্ত্তিক মাসে বাপের বাড়ি হইতে আসা বা যাওয়ায় নাকি ভায়ের অকল্যাণ ঘটে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি শাশুড়ী দিন স্থির করিলেন। অগ্রহায়ণের প্রথমেই ভাল দিন থাকিলেও নবান্নটা না সারিয়া বধূকে তিনি পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত নন।

বাবা বলিলেন, সেই ভাল, আমরা নবান্নের দিন করব অঘ্রাণের শেষাশেষি। ওখানে গিয়েও মায়া নবান্ন করতে পারবে।

উৎসবের দিনগুলিকে যোগমায়ার ভারি ভাল লাগে। ভোরবেলায় স্নান সারিয়া মটকার শাড়ীখানা পরিয়া সর্ব্ব-প্রথম সাজি ভরিয়া ফুল তোলে। শাড়ীখানা বহু পুরাতন এবং পরনে বড় হইলেও—ওর ফ্যাকাসে লাল পাড়টুকু যোগমায়ার ভারি ভাল লাগে। এই শাড়ীতে কত ব্রত, পূজা, উপবাস, ও পুণ্যাহের স্মৃতি লাগিয়া আছে। উইয়ে বা পোকায় দুই-এক জায়গায় ফুটা করিলেও, ঐ শাড়ী পরিলে নিজেকে শুচিস্নিগ্ধা মনে হয়। ফুলের সাজি হাতে করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে—ঘাসের শিশিরে পা ভিজাইয়া এলোমেলো টগর-গাঁদার ঝোপে ফুল তুলিবার কালে মনের যত কিছু গ্লানি কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পঞ্চপাত্রে ফুল গুছাইয়া রাখা, কলার পাতে সিঁদুর গুলিয়া ও চন্দন ঘষিয়া এবং সেই পাত্রেরই একধারে দূর্ব্বা ও আতপ চাউলের অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখার মধ্যেও পারিপাট্য দেখা যায়। পঞ্চ-প্রদীপের তুলার সলিতাগুলি ঘিয়ে ভিজাইয়া, পানি শঙ্খটিতে জল ভরিয়া, চক্‌চকে পিলসুজের মাথায় পিতলের প্রদীপটি রাখিয়া—ধূপ ও ধুনা জ্বালাইবার আয়োজন করা পর্য্যন্ত—ঠাকুর আসিয়া ওই বেদীতে বসিবেন এই কল্পনায় মন যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। যে-ঠাকুরকে চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত করা যায় না, মনের মন্দিরে তিনি সেই মুহূর্ত্তে সব ঠাঁই ব্যাপ্ত করিয়া অনুভূতিতে পরিপূর্ণ ও প্রখর হইয়া উঠেন। আবাহন বোঝে না যোগমায়া, বিসর্জ্জনের বেদনাও তাহার মনকে পীড়া দেয় না, কিন্তু ধূপ-ধুনা-ফুল-চন্দনের গন্ধে, পুরোহিতের দুরুচ্চার্য্য মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে একটা অপ্রত্যক্ষীভূত মহিমা—সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সে যেন অনুভব করিতে পারে। সে মহিমার গাঢ় উত্তাপে চোখ দিয়া তাহার হু-হু করিয়া জল বাহির হয়, মনের তন্ত্রীতে একটানা একটি সুর বাজিয়া মাথাটিকে মেঝেতে লুটাইয়া দেয়, এবং মনে মনে সে এই সংসারের—আত্মীয়-পরিজনের মঙ্গল কামনা করে।

নবান্নের দিন এত আয়োজন সমারোহ অবশ্য ছিল না।

নূতন আতপ চাউলের সঙ্গে নূতন খেজুরের গুড়, কলা, কাঁচা দুধ, ছোলা মটর ভিজা, মূলার টুকরা ইত্যাদি মাখিয়া শাশুড়ী নবান্ন প্রস্তুত করিলেন। পুরোহিত শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে তুলসীপত্র ফেলিয়া সেই নবান্ন দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। একটু বেলা হইলে ঠাকুরকে আর এক বার লইয়া আসিয়া তিনি পায়স-ভোগ নিবেদন করাইয়া যাইবেন।

শাশুড়ী এক টুকরা কলার পাতায় নবান্ন উঠাইয়া যোগমায়ার হাতে দিয়া বলিলেন, ঐ পাঁচীলের মাথায় রেখে এসো তো, মা। কাগে না খেলে তো নবান্ন মুখে দিতে নেই। আর শোন, এই কলার পাতাটা গরুর মুখে দিয়ে এসো।

যোগমায়া কথাবৎ কার্য্য করিল।

আশ্চর্য্য, অন্য দিন কা-কা রবে অসংখ্য কাক বাড়ি-খানার উপর কত রকমেই না দৌরাত্ম্য করে, আজ কি একটি কাকেরও দেখা নাই! শাশুড়ী ও যোগমায়া পুরা দশ মিনিট প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, কাকের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

শাশুড়ী মন্তব্য করিলেন, মরণ! নবান্নের কাগ কি না, ত্রিসীমানায় নেই। গরুতে খেয়েছে তো, বৌমা?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

এমন সময় কোথা হইতে দুইটা শালিখ পাখী কিচির-মিচির করিতে করিতে আসিয়া প্রাচীরের মাথায় বসিল ও কাকের জন্য রক্ষিত নবান্ন ঝগড়া মারামারি করিতে করিতে গিলিতে লাগিল।

শাশুড়ী প্রসন্ন মুখে বলিলেন, ওই হয়েছে। কাক-পক্ষীতে খেলেই হ'ল। এই বার তুমি মুখে দাও, বৌমা।

এ বাড়ির কোন আকর্ষণই যোগমায়ার ছিল না, তবু যাত্রাকালে মন খারাপ হইয়া যায়। যাত্রাকালে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহিণীরা পর্য্যন্ত পাল্কীর ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা অনাত্মীয়, তবু গলার স্বরটি তাঁহাদের কোমল হইয়া আসে। গদগদ স্বরে বলেন, আবার এসো মা শীগ্গির। তোমারই ঘর—তোমারই সব।

যোগমায়া চারিদিকে চাহিয়া ভাবে, কেন ইঁহারা বার-বার একই কথা বলেন? শাশুড়ী থাকিতে এ-বাড়িতে তাহার অধিকার বা মর্য্যাদা সে বুঝিতে পারে না। হয় এসব স্তোকবাক্য, নতুবা প্রথামাফিক বলা। বাড়ির উপর টান না থাকুক, মনের কোথায় যেন টান ধরে। এখানে যে ক-দিন ছিল, মন্দই বা কি ছিল! শাশুড়ীর প্রখর দৃষ্টিতে শাসনের যে রূঢ়তা, এইক্ষণে স্নেহের মেদুরতায় তাহা রূপান্তরিত হইতেছে। আশ্চর্য্য, তাঁহার চোখেও জল! বিদায়ের কথাটি স্নেহপ্রতিমদের মুখ হইতে নাকি বাহির হইতে নাই।

প্রণাম করিয়া মৃদুকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, মা, আসি?

এস, মা। তাহার মুখখানি বুকের কাছে টানিয়া শাশুড়ী স্নেহ-চুম্বনে ভরিয়া দিলেন। মায়ের আদরের মতই মিষ্ট সেই চুম্বন।

চোখে জল আসা অতঃপর বিচিত্র নহে। ক্রমশঃ

সার্থক

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

নিখিলেরে ভরিয়াছ তুমি করুণায়
বুভুক্ষিতে স্নেহে অন্ন দিয়াছ ক্ষুধায়,
তৃষিতের
শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিয়াছ ধারা অমৃতের;
তোমার চরম দান তারি মাঝে জানি
বাণী, শুধু বাণী।

বাণী তব বসন্তের পল্লব-মর্ম্মরে
কলনৃত্যমনোহরা তরল নির্ঝরে,
পুষ্পের
পরাগে পরাগে তব বাণী সৃজনের,
বরণের বাণী জাগে ঋতুতে ঋতুতে
ধরার তনুতে।

বাণী তব মুক্তবন্ধ উদ্দাম ঝঞ্ঝাতে
স্ফীতবক্ষ সাগরের উর্ম্মির সংঘাতে,
মৃত্তিকার
বুক চিরে লেখে বাণী, ভূকম্প, তোমার,
ভাসে তাহা তারকায়, তপনে, জীমূতে
জ্যোৎস্না বিদ্যুতে।

ধ্বনিতে, শোভায়, শ্রী-তে, রূপে অনিবার
দিকে দিকে কী বিচিত্র প্রকাশ তাহার!
তারি মাঝে
নিরন্তর ভাষাময়ী এই গীতি বাজে—
সে বাণী সার্থক হ'ল সারা ধরণীতে
আমারি বাণীতে।
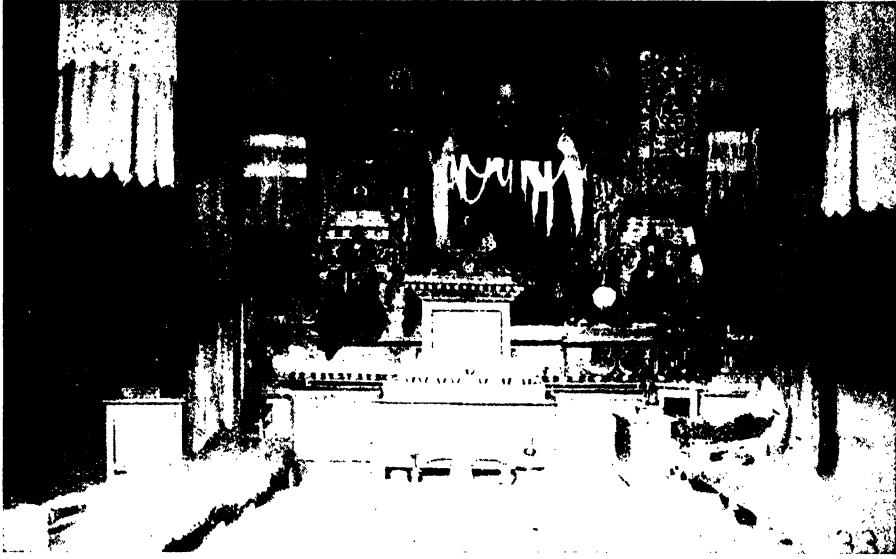
তিব্বতের একটি বিহারের অভ্যন্তরস্থ বেদীর দৃশ্য

লামার দেশ তিব্বত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মানুষ প্রথমে খোঁজ রাখে ঘরের, তার পর খোঁজ লয় প্রতিবেশীর। ইহাই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! আমরা ঘরের খোঁজ বাধ্য হইয়া যদি-বা কিছু রাখি, প্রতিবেশীর খোঁজ একেবারেই লই না, তাহার কথা জানা যে আবশ্যক এ বোধ আমাদের মন হইতে প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। লণ্ডন, মস্কো, বার্লিন, ওয়াশিংটন আমাদের একেবারে গৃহকোণে বলিয়া মনে হয়, তেহেরান, লাসা, ব্যাঙ্কক প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে চোখ রগ্‌ড়াইতে হয়। মনে হয় কোন সুদূর অঞ্চলে এসব অবস্থিত। অথচ ইরাণ, তিব্বত, শ্যাম প্রভৃতি আমাদের একেবারে ঘরের দুয়ারে। আমরা আধুনিক যুগে বিশ্বের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে চলিয়াছি, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের নিকট হইতে অতি দূরেই রহিয়া গিয়াছে!

অতীত যুগে কিন্তু এরূপ ছিল না। ভারতবাসীর দেহ-মন ছিল বলিষ্ঠ, উদার, প্রশস্ত, তার দৃষ্টি ছিল বহুদূর-প্রসারী। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের আলোচনা ও গবেষণার ফলে এরূপ বহু তথ্য পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। তিব্বতের পাহাড়-পর্ব্বত সমাকীর্ণ অধিত্যকায় ও মধ্য-এশিয়ার জনবিরল মরুভূমির ফাঁকে ফাঁকে ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা যে শিকড় গাড়িয়াছিল তাহার নিদর্শন এখনও বহু আছে।

তিব্বতে তো এরূপ নিদর্শন বিস্তর। তিব্বতীদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, লিপিমালা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ললিতকলা প্রত্যেকটির মধ্যেই ভারতীয়দের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম তিব্বতে প্রচারিত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। ভারতক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইলে বৌদ্ধগণ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ইস্‌লামের আবির্ভাবের পরই ইহা জন্মভূমি হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে এই দুইটি ঘটনার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন রকম যোগ ছিল কিনা জানা যায় না। তবে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলীই যে সেখানে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে অবহিত হইয়াছিলেন তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে।

ভারতবর্ষ হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধুসন্ত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে তিব্বতে গমন করিতে থাকেন।

নূতন দলাই লামা

স্মৃতি, ধর্ম্মপাল, সিদ্ধপাল, প্রজ্ঞাপাল, সুভূতি, শ্রীশান্তি, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ প্রমুখ পণ্ডিতগণের নাম তিব্বতীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে। পদ্মসম্ভব ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতে পূর্ব্বপ্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কৃত করিয়া ইহাকে নূতন রূপ দান করেন। ইঁহারা তিব্বতে বিশেষ ভাবে পূজিত। দীপঙ্করের নামে তীর্থ ও মঠ রহিয়াছে, তিনি এখনও তিব্বতীদের নিকট বুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন।

দীপঙ্কর সম্পর্কে আমাদের বিশেষ গৌরব করিবার কারণ আছে। ভুটান ইতিবৃত্ত মতে তিনি ছিলেন বাংলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। বিক্রমশিলা বিহারে অধ্যাপনা কালে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা হেতু বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উনষাট বৎসর বয়সে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতীদের হিতার্থে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা কর্ম্ম সবই নিয়োজিত হয়। তিনি যে ঐ দেশে এখনও এমন ভাবে পূজা পাইয়া থাকেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার এই আত্মদান। অতীশ আর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন নাই। তিব্বতেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

পাহাড়-পর্ব্বত সমাকীর্ণ তিব্বত দীর্ঘকাল পরদেশী মানুষের পক্ষে দুর্গম স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই কারণে ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করাও তেমন কঠিন হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পুষ্ট হইতেছিল। চেঙ্গিস খাঁর ভারত-আক্রমণ সকলেরই জানা। এই চেঙ্গিস খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে দিগ্বিজয় মুখে তিব্বতও অধিকার করেন। কিন্তু তখনকার দিনে অন্যান্য দেশ যেমন, তিব্বতও তেমনি বিজিত হইলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয় নাই।

এই চেঙ্গিস খাঁর বংশধর প্রবলপ্রতাপ চীনাধিপতি কুবলাই খাঁর দ্বারা তিব্বত বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। কুবলাই খাঁ তাঁহার রাজসভায় এক তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষুকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম চীনের রাজধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মগুরুকে তিব্বতের শাসনভারও অর্পণ করিয়াছিলেন। কুবলাই খাঁ ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

কোন্ সময় হইতে তিব্বতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লামা নামে অভিহিত হইতে থাকেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। 'লামা' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। কুবলাই খাঁর ধর্ম্মগুরুর স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তী লামাগণও রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে চীনসম্রাট্
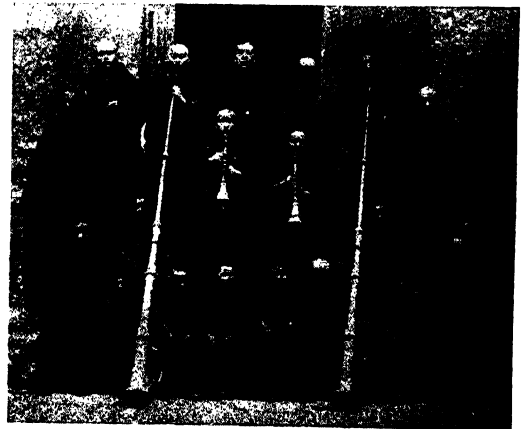
তিব্বতের কয়েক জন লামা

আলতান খাঁ পঞ্চম প্রধান লামাকে দলাই লামা উপাধি দান করেন। 'দলাই' মানে সমুদ্র। পরবর্ত্তী কালে রাজকীয় ব্যাপারে তিব্বত ও চীনের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং তিব্বত চীনের একটি প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। কিন্তু তিব্বতের আভ্যন্তরিক শাসন এই দলাই লামার দ্বারাই দীর্ঘকাল যাবং পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

লামারা চিরকুমার। কাজেই দলাই লামা বরাবর এক নূতন রকমের 'নির্ব্বাচন' দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া আসিতেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের নির্ব্বাচন হইতে ইহার মূলগত পার্থক্য আছে। ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যু হয় গত ১৯৩৩ সালে; ছয় বৎসর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর গত ১৯৩৯ সালে নূতন দলাই লামাকে পাওয়া যায়। দলাই লামার নির্ব্বাচন-ব্যাপার এই কয় বৎসরে অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে। ইহা কতকটা কৌতুককরও বটে। দলাই লামার নির্ব্বাচন-প্রণালী যাহা দীর্ঘকাল যাবং অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, 'বিশ্বকোষে' এইরূপ বর্ণিত আছে—

"লামাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময় স্ব স্ব পুনর্জ্জন্ম প্রকটন করিয়া যান। তাঁহারা কোন্ গ্রামে ও কোন্ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র প্রথায় গৃহীত হইয়া থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অভিহিত হইতে পারেন, প্রথমে ৭১১৭ জন বিশুদ্ধচেতা লামা একত্র হইয়া তাহার নাম নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। নাম নির্দ্দেশ কালে ভজনা ও পূজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাঁহাদের মনে ওঠে, তাহাই তাঁহারা এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটি স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁহারা সকলেই স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ৩১ম হইতে ৭১ম দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া এক একখানি কাগজ উঠাইয়া লন। এই কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের নাম পাওয়া যায়।"

ত্রয়োদশ দলাই লামা

নূতন দলাই লামার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা

দলাই লামা নির্ব্বাচন প্রথার ইদানীং আরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। কারণ বর্ত্তমান দলাই লামাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তিব্বতের লামাগণের প্রায় ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। চীন-তিব্বত সীমান্তের এক গ্রাম হইতে একটি শিশুকে বর্ত্তমান দলাই লামা বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

লামাচার্য্য শুধু ধর্ম্মগুরু নহেন, তিনি চীন-সম্রাটের নিকট হইতে রাজশক্তি তথা তিব্বতের শাসন-কর্ত্তৃত্বও লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আধিপত্য ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। তিব্বতে একটি বিশিষ্ট লামা-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। কারাকোরাম হইতে পিকিং পর্য্যন্ত লামাধর্ম্ম প্রসার লাভ করিল। মোঙ্গোলিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রে লামা-ধর্ম্মের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইল। লামাধর্ম্মের আদিভূমি তিব্বতে লামাচার্য্য দলাই লামা ও তাঁহার সহচর অনুচরদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল অসাধারণ। প্রত্যেক পরিবার হইতেই সন্তানগণ আসিয়া লামা-সম্প্রদায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত
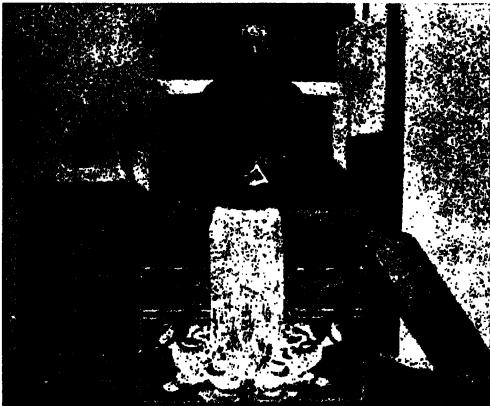
রাজধানী লাসার উত্তর দিকের প্রবেশ-দ্বার

করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রত্যেক পরিবার হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র লামা হইয়া থাকে। অন্যান্য পুত্রও ইচ্ছা করিলে লামা হইতে পারে। এইরূপে দেখা যায়, বর্ত্তমানে তিব্বতীদের এক-পঞ্চমাংশ পুরুষ অধিবাসী লামা-সম্প্রদায়ভুক্ত। মহিলাগণও অনেকে সন্ন্যাসিনী হইয়া মঠে বসবাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্যও বহু মঠ আছে।

তিব্বতের শাসনভার যেমন লামাদের হস্তে ন্যস্ত, ইহার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতারও রক্ষক ইহারাই। তিব্বতের অভ্যন্তরে বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইবে কয়েক সহস্র। সেখানে শুধু ধর্ম্ম-কথাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, ঐহিক বিষয়েরও অধ্যয়ন ও চর্চ্চা সেখানে যথারীতি হইয়া থাকে। তবে বিশেষজ্ঞগণের মতে সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতির অনুসারী। হিন্দুগণ যেমন টোল বা চতুষ্পাঠীতে গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তিব্বতেও ছাত্রগণ সেইরূপ বৌদ্ধবিহার ও মঠে লামার অধীনে থাকিয়া নানা বিদ্যা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করে। দশ হাজার ছাত্র যে গুরু পোষণ করেন তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রে কুলপতি বলা হয়। তিব্বতে কোথাও কোথাও এখনও এই কুলপতি-প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। সেখানকার কোন কোন বিহারে এখনও দশ হাজার কি ততোধিক সংখ্যক ছাত্র একত্রে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাহাদের ভরণপোষণ অধ্যয়নাদির যাবতীয় ব্যয়ভার বিহারই বহন করেন।*

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ভারতে বিলুপ্ত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ মূলে না হউক, অন্ততঃ অনুবাদের মধ্য দিয়া তিব্বতীতে পাওয়া যায়। তিব্বতের লামাগণ ভারতবর্ষ হইতে আনীত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। মূলের সন্ধান বহু ক্ষেত্রে না পাওয়ায় এইগুলিই এখন সেই অভাব পূরণ করিতেছে এবং মূলের সমানই মান্য বলিয়া দেশ-বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

* প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭, পৃঃ ৩২৮ দ্রষ্টব্য।

পল্লীর একাংশ

সরাইখানা

বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিহারের পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন তিব্বত হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতের বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন এই যুগের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হইতেছেও। তিব্বতীগণ নিজেরাও এই সব আলোচনায় তৎপর হইয়াছেন। একজন বৌদ্ধ লামা কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া এই সব বিষয় আলোচনায় রত হইয়াছিলেন।

তিব্বতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ললিতকলাও বিহার বা মঠকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। এ সব বিষয়ে তিব্বতের লামাগণ বিশেষ অগ্রণী। ভারতীয় শিল্পরীতি তাঁহারা হজম করিয়া লইয়াছেন ও নিজস্ব পদ্ধতির সংযোগে এক নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিব্বতের কোন কোন মঠ ও বিহারে ভারতীয় রীতির সঙ্গে চৈনিক রীতিও সংমিশ্রিত হইয়াছে।

এই সব মঠ বা বিহার ধর্ম্মচর্চ্চা বা বিদ্যাভ্যাসেরই কেন্দ্র নহে, এক কথায় বলিতে গেলে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া তিব্বতীদের সামাজিক জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। দলাই লামা, অন্য লামাচার্য্য ও বিশিষ্ট লামাগণের মৃত্যুদিনে বিভিন্ন বিহারে বিশেষ বিশেষ উৎসব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সব উৎসবে শুধু লামাগণ নহে, সাধারণ গৃহী নরনারীও সানন্দে এই সব উৎসবে যোগ দিয়া থাকে। হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণের মত তিব্বতীদের মধ্যেও বিস্তর পূজা উৎসব প্রতিপালিত হয়। তিব্বতীরা অবলোকিতেশ্বরের রীতিমত পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থানীয় অধিবাসীদের রুচিসম্মত করিয়া অদলবদল করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিব্বতীরা তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার প্রাধান্য। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের মৃত্যু-উৎসব এখনও তিব্বতের বিহারে বিহারে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত মিল থাকিলেও রাজনীতি সম্পর্কে চীনের সঙ্গেই বহু শতাব্দী যাবৎ তাহার যোগাযোগ। কিন্তু তিব্বতের নৈসর্গিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হেতু কি ধর্ম্ম-সংস্কৃতি, কি রাজনীতি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিব্বতীরা বিশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠে। বিদেশীদের, বিশেষতঃ যাহাদিগকে তাহারা স্বাধীনতার অপহারক বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাদের কোন মতেই প্রশ্রয় দিত না। এ কারণ কাহারও কাহারও নিকট তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ ও লাসা নিষিদ্ধ নগরী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বিংশ

লাসার পর্ব্বত-গাত্রে দলাই লামার বাসগৃহ পোতালা

কিন্তু রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত পরিক্রমাই বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা বলিতে হইবে। তিনি ১৮৭৯ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁহার এই দুই বারের ভ্রমণ-কাহিনীর বিবরণ সরকারে পেশ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারণে ইংরেজী ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত তাহা গোপন রাখা হয়। পরে বিলাতের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯০২ সালে তাহা প্রকাশিত হয়। অন্য কোন কোন ইংরেজী জর্নালেও শরচ্চন্দ্র ইহার কোন কোন অংশ প্রকাশ করেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তেও তাঁহার তিব্বত-ভ্রমণ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বাহির হয়। এই সকল প্রবন্ধ ও পুস্তকে তিনি তিব্বতীদের ঐতিহ্য ও সংস্কার, জাতিতত্ত্ব ও ধর্ম্ম সম্পর্কে বিস্তর তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তিব্বত হইতে বহু সংস্কৃত ও তিব্বতী পুস্তক আনিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে এই 'নিষিদ্ধ' দেশের আশ্চর্য্য কাহিনীর কথা জানা আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে সম্ভব হইল।

ইহার পর তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের, অথবা সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতে ইংরেজ-রাজের, ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ তিব্বত ও তিব্বতীদের পক্ষে সুখকর হইয়াছে কি

শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত বহু অভিযানকারী তিব্বতের সু-উচ্চ অধিত্যকায় পর্য্যটন করিয়া এই 'নিষিদ্ধ' দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকে ফ্রায়ার অডোরিক ও মার্কো-পোলো তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বহু বিদেশী পর্য্যটক তিব্বতের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত বিখ্যাত সুইড অভিযানকারী স্বেন হেডিন তিব্বত গমন করেন। তাঁহাদের নিকট তিব্বতের দ্বার উন্মুক্তই ছিল।

তবে তিব্বত 'নিষিদ্ধ' দেশ কাহাদের নিকট? প্রবল-প্রতাপ ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে উহার সীমানা সুরক্ষিত করিতে লাগিয়া যায়। সীমানা সুরক্ষিত করা মানে অনেক সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে স্বমতের অনুবর্ত্তী করাইয়া পরিচালিত করা। ভারতের ব্রিটিশ-রাজ এই উদ্দেশ্যে বহুবার তিব্বতে সসৈন্য অভিযান প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস ম্যানিং ইংরেজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সৈন্যের সাহায্য না লইয়া একক ভাবে 'নিষিদ্ধ' লাসা নগরীতে প্রবেশ করেন। ইহার পর ভারতীয় জরীপ বিভাগের তরফেও কেহ কেহ তিব্বতের পশ্চিম অংশ দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়া ইহার অংশবিশেষ জরীপ করেন।

একজন সম্ভ্রান্ত তিব্বতীর বাসগৃহ

তিব্বতের বাজার

না ভাবী ইতিহাসকার তাহার বিচার করিবেন। ঐ সময় রুশিয়ার ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ-রাজ মনে আশঙ্কা পোষণ করিতেছিলেন। প্রকাশ, জনৈক রুশীয় পরামর্শ-দাতা দলাই লামার দরবারে তখন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইহা ইংরেজরা মোটেই ভাল চক্ষে দেখে নাই। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ সালে প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা ও হিমালয় পর্ব্বতমালা অভিযানকারী সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একটা মিলিটারি মিশন বা সামরিক অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন। তিব্বতীরা তাঁহাদের অগ্রগতিতে বাধা দিলে উভয় দলে কিছু যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিব্বতীরা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই বৎসরই ৭ই সেপ্টেম্বর উভয়ের মধ্যে কয়েকটি সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল। রাষ্ট্রনীতির দিক্ হইতে ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্ত্তটি হইল—তিব্বতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বৈষয়িক বা বাণিজ্যিক কোনরকমে সুবিধাই থাকিবে না।

এই সময়ের পরে এশিয়ায় রুশ-আতঙ্কও অবলুপ্ত হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে জার্ম্মানীরূপ নূতন শনি উপস্থিত হইলে ব্রিটেন ও রুশিয়ার মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মিতে থাকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তিব্বত সম্পর্কেও একটা বন্ধুত্বমূলক চুক্তি হয়। ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, লাসা নগরীতে কি রুশিয়া কি ব্রিটেন কাহারও তরফে কোন প্রতিনিধি অবস্থান করিবে না। ১৯০৯ সালে তিব্বত সম্পর্কে চীনের সঙ্গে ইংরেজের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে চীন অন্য কোন রাষ্ট্রকে তিব্বতের কোন অংশ ইজারা বা বিক্রয় করিতে পারিবে না স্থির হয়। তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশের অবাধ-বাণিজ্য স্থাপন ও তিব্বতের শান্তি-রক্ষা—এ দুইটি বিষয়ও চুক্তির অঙ্গীভূত হইল।

ইহার তিন বৎসর পরে ১৯১২ সালে যখন তিব্বত ও চীনের মধ্যে নূতন করিয়া সংঘর্ষ বাধে তখন তিব্বতের শাসনকর্ত্তা দলাই লামা দার্জ্জিলিঙে আসিয়া ইংরেজ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহার প্রতি তখন তাঁহার পদমর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ সরকারেরই মধ্যস্থতায় চীন তিব্বতে আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। পরে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, চীন ও তিব্বতের প্রতিনিধিগণ সিমলায় একটি শান্তি-বৈঠকে সম্মিলিত হন। এই বৈঠকে কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এ সব কিন্তু বরাবর গোপনীয়ই রাখা হইয়াছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চীন-সরকার এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। চীনের এবারকার তিব্বত
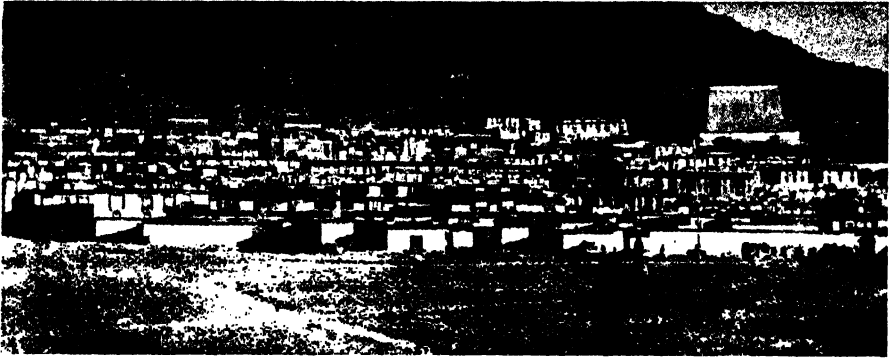
তিব্বতের একটি বৃহত্তম বিহার

আক্রমণের ফলেই ইংরেজ তিব্বতে বেশী করিয়া সুবিধা করিয়া লইবার সুযোগ পাইল।

ইহার কিছু পরে ইউরোপে মহাসমর বাধে, তখন তিব্বত প্রচুর সৈন্য ও রসদ দিয়া ইংরেজকে সাহায্য করে। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এত দিন তিব্বত-সরকার কোন ইংরেজকে তাহাদের পরামর্শদাতা রূপে গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধের পরে সার চার্লস বেল প্রথম এই পদ গ্রহণ করিয়া তিব্বত যান। তিব্বত ও ভারতবর্ষের মধ্যে টেলিগ্রাফ বা তারযোগে সংবাদ আদান-প্রদানেরও প্রথম ব্যবস্থা হয় ১৯২২ সালে।

লাসা এখন আর নিষিদ্ধ নগরী নহে, তিব্বতেরও এখন আর এ অপবাদ নাই। ব্রিটিশ বাণিজ্যের দৌলতে বিবিধ বিলাসের সামগ্রী ভিক্ষু লামার দেশেও প্রবেশ করিয়াছে। বিদেশী বস্ত্রাদি তাহাদের নিকট এখন আর নূতন জিনিস নহে। রেডিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মারফত দৈনন্দিন বিশ্বের সংবাদ তাহারা এখন জানিয়া লয়। তিব্বতের ধনী পরিবারের ছেলেরা বিদেশে, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য গমন করিয়া থাকে। লামার শাসনেও কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হইয়াছে। একজন মন্ত্রী তাঁহার আছেন। শাসনব্যাপারে ইহার পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক। তিব্বত স্থূলতঃ চীনের অধীন হইলেও বর্ত্তমানে ব্রিটিশের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। তিব্বত-সরকার এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণকারীদের এখন শুধু অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, লামাদের দ্বারা তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রশস্তি-বাচনও করাইয়া থাকেন।

ছাপাখানার ভূতের সমস্যা

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক

ভূত! ভূতই বটে। ভূত না হইলে কি রসিকের মনের ক্ষুধা এবং মালিকের ধনের ক্ষুধার জোগান দিয়া এমন করিয়া নিজে সপরিবারে অর্দ্ধাহারে থাকে? যা কিছু হারায়, 'পুরাতন ভৃত্যের' মনিব-গৃহিণী বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর।" তেমনি, বইয়ে যা কিছু ভুল থাকে, পণ্ডিত লোকে বলেন, "ছাপাখানার ভূতের উপদ্রব!" বাংলা বইয়ে এই ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবের অন্ত নাই।

কিন্তু ছাপাখানার ভূত যেমন নানা অপরাধে অপরাধী তেমনি তাহার সমস্যাও অনেক, একথা পণ্ডিত লোকে বোঝেন না। ছাপাখানায় কাজ করিবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের কেহ কি কখনও নির্ভুল বাংলা পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন? ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমাকে কিছুদিন এই ভূতের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। তবে আমার ভৌতিক জীবন হ্রস্ব, অভিজ্ঞতার মূল্যও অতএব
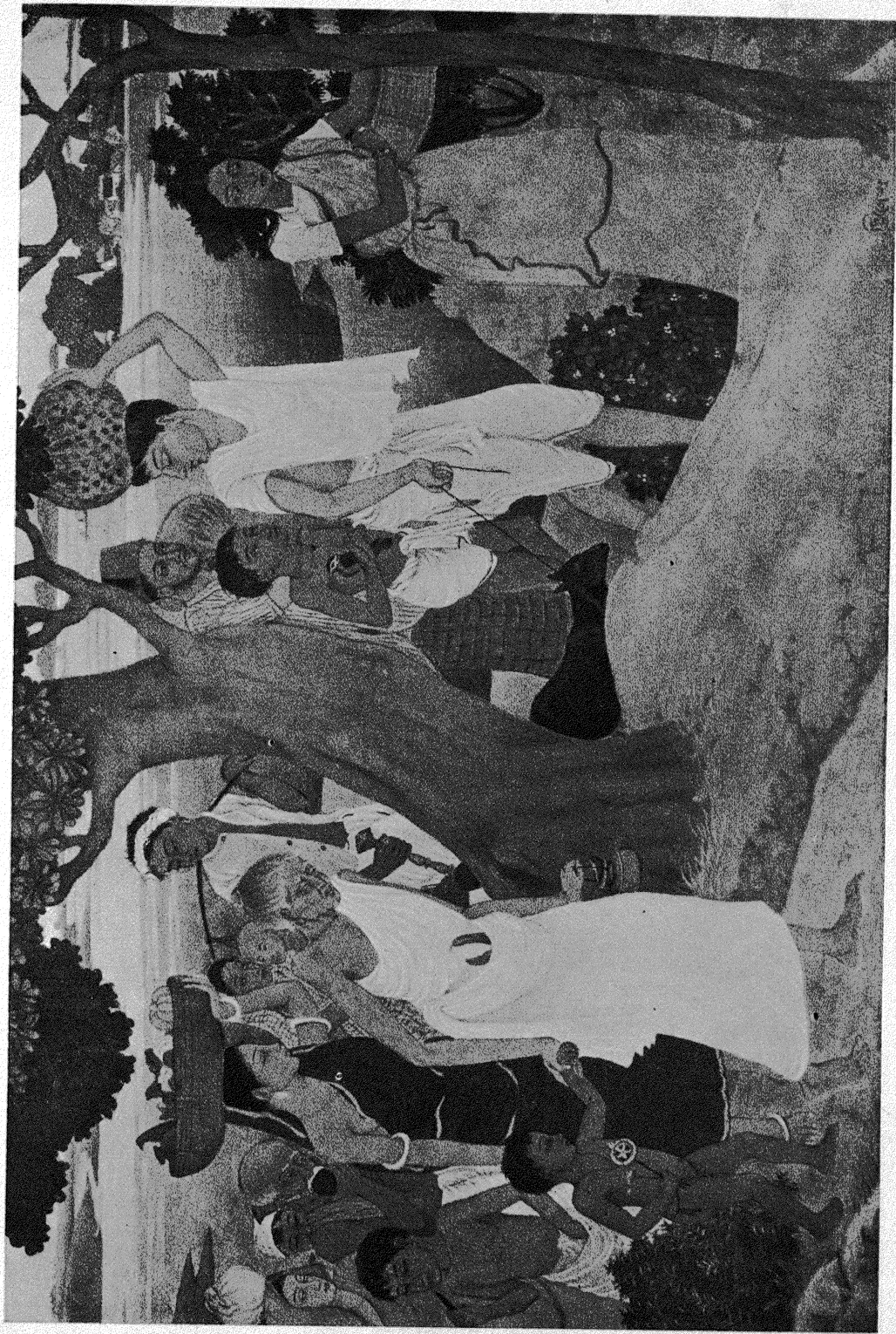
হাট হইতে
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র ধর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কম। তবু মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে—বাংলা ছাপা বই নির্ভুল পাওয়া শক্ত বটে, কিন্তু বাংলা পাণ্ডুলিপি নির্ভুল পাওয়া ততোধিক শক্ত। ছাপাখানার ভূতের পক্ষে এ একটি বিষম সমস্যা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তাহাকে জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, বাংলা কোনও কেতাবের সাহায্যে যাহার সমাধান করিতে পারা যায় না। তাহার সমস্যাগুলি সাধারণের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের প্রুফ-সংশোধন করিয়া অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহাদের নিকট সেরূপ মনে হইবে না। নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে আমাকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি এখানে উল্লিখিত হইল। যদি পণ্ডিত-গণের কেহ এগুলির সমাধানে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ছাপাখানার সকল ভূতই উপকৃত হইবে এবং ফলে তাহাদের উপদ্রবও কিয়ৎপরিমাণে কমিবে।

সমস্যা প্রধানতঃ সমাসঘটিত ও বানানঘটিত। হাইফেন, ঊর্দ্ধকমা এবং বিরামচিহ্নের ব্যবহারও অনেক সময় কম সমস্যার সৃষ্টি করে না। আশা করি, কোনও ভাষাবিদ্ পণ্ডিত এবিষয়ে নির্দ্দেশ দিবেন।

দুই বা ততোধিক পদে সমাস করিলে, উহারা একপদে পরিণত হয় এবং ঐ সমাসগঠিত পদ একত্র লেখা উচিত—এইরূপ একটা কথা ছেলেবেলায় রচনার বইতে পড়িয়া মনের এমনই একটা কু-অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, এখন সে সর্ব্বত্রই সমাসগঠিত পদ একত্র দেখিতে চাহে, না পাইলে খুঁৎখুঁৎ করে। যে পদগুলি স্ব-স্ব বিভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া একটি পদ গঠন করিল, তাহাদের একত্র না করিয়া পৃথক-ভাবে ছাপার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও পাওয়া যায় না। অথচ এমন বাংলা বই হাতে পড়ে না, যাহাতে কুত্রাপি সমস্ত পদকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই। সাধারণ কোনও লেখকের বইয়ে যখন সমস্ত পদকে বিশ্লিষ্ট-আকারে দেখি, তখন উহা ভ্রমের উদাহরণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কিন্তু বিপদ হয় যখন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির বইয়ে উহার সাক্ষাৎ মেলে। অথচ তাহারও উদাহরণ মোটেই দুর্লভ নহে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে যাঁহাদের অভিমত প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং বাংলা ভাষাকে নূতন রূপ দিবার শক্তি যাঁহারা ধারণ করেন, এমন তিনজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির তিনখানি বই আমার হাতের কাছে আছে। প্রথমখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, মহাশয়ের 'সুখ ও দুঃখ'-নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক। দ্বিতীয়খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা'। তৃতীয়খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান-সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'হনুমানের স্বপ্ন'। এই তিনখানি বই যত্রতত্র উল্টাইয়া কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, অবিসংবাদি-পাণ্ডিত্য এরূপ গ্রন্থকারগণের পুস্তকের কোনও প্রয়োগ যে ভ্রমপ্রসূত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে পারি না, অথচ ছাপাখানার ভূত যে এরূপ্ ক্ষেত্রেও এতটা উপদ্রব করিতে পারিয়াছে, তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; ইহাই সমস্যা।

প্রথম গ্রন্থ 'সুখ ও দুঃখ' যেখানেই উল্টাইতেছি, সেখানেই দু-একটি করিয়া সমস্ত পদ বিশ্লিষ্টভাবে মুদ্রিত দেখিতেছি। যথা:—(১) **বংশ পরম্পরার** স্থিরত্ব বিধান করিবার জন্য……এই সুখের প্রবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে। (৩ পৃঃ) (২) এক **দৈব শক্তি বলে** তাহারা সাধারণতঃ হেয়কে বর্জ্জন…করিতে সমর্থ হয়। (৫ পৃঃ) (৩) জগতের **দুঃখ বিমিশ্রিত** ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া…চিরন্তন সুখের কামনা করিয়াছিলেন। (৫৪ পৃঃ) (৪) সেখানে **চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য রূপ** রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও রসের প্রসঙ্গ নাই। (৫৬ পৃঃ) (৫)…পুরাতন দপ্তরখানায় **স্থায়ী ভাবে*** অবস্থিতি করিতে চলিয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' উল্টাইয়া দেখিতেছি, ইহাতে এই বিশ্লিষ্ট সমস্ত পদের উদাহরণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও দুষ্প্রাপ্য নহে। যথা:—(১) শ্রীকৃষ্ণের **বৃন্দাবনলীলা বিষয়ে** রচিত। (২ পৃঃ) (২) জয়-দেবের **স্মৃতিপূজা উপলক্ষে** আবহমান্ কাল ধরিয়া **প্রতি বৎসরে পৌষ সংক্রান্তির** সময়ে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। (৩ পৃঃ) (৩) **সতীত্ব গুণে** প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল। (১৬ পৃঃ) (৪) তাহা হইতেছে **ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়**। (২৫ পৃঃ) (৫) **মনোহরদাস বিরচিত** দিনমনি চন্দ্রোদয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। (৬৬ পৃঃ)

---

* স্পষ্টতঃই এখানে গ্রন্থকার সমাস করিতে চাহেন নাই; কারণ তাহা হইলে কখনই 'স্থায়ী' শব্দে ঈ-কার বজায় রাখিতেন না। কিন্তু সমাস না করিয়া কি উপায়ে যে পদ দুইটি সাধন করা যায়, তাহা বুঝিতে পারি না।

তৃতীয় গ্রন্থ 'হনুমানের স্বপ্নে' এইরূপ উদাহরণ আরও কম চোখে পড়িতেছে। যেস্থলে দুইটি পদে বহুব্রীহি সমাস হইয়া একটি ক্রিয়াবিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে, এই পুস্তকে প্রধানতঃ সেইরূপ স্থলেই পদদ্বয় বিশ্লিষ্টভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা:—(১) **বিষণ্ণ বদনে** নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। (৩ পৃঃ) (২) সুগ্রীব রাজোচিত **গাম্ভীর্য্য সহকারে** কহিলেন……। (১৭ পৃঃ) (৩) চিলিম্পার **কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক** জয় রাম বলিয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ দিলেন। (২৬ পৃঃ) (৪) পুরুষত্বের **চিহ্ন স্বরূপ** এই গোঁফজোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন। (১১০ পৃঃ) (৫) **বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে** উত্তর আসিল………। (১২২ পৃঃ)

বাল্যে একখানি খাঁটি বাংলা-ব্যাকরণ আমার হাতে পড়িয়াছিল। আমরা স্কুলে যে সব ব্যাকরণের সহিত পরিচিত ছিলাম, উহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের অনুবাদমাত্র। ঐ একখানি ছাড়া খাঁটি বাংলা-ব্যাকরণ তখন আর দেখি নাই। সেই জন্য পণ্ডিত-মহাশয়দের নিকট আদৃত না হইলেও, ব্যাকরণখানি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল এবং ব্যাকরণ-চর্চ্চা না করিলেও বইখানির উপর তদবধি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিতেছি। আজ প্রৌঢ় বয়সে প্রয়োজনের খাতিরে সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে উহার কথা স্মরণ করিলাম। দেখিলাম, এতদিনে উহা সমাদর লাভ করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বইখানি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রণীত 'ভাসা-বোধ বাঙ্গালা-ব্যাকারণ'।

ইহাতে সমস্যা আরও গুরুতর হইয়াছে। কারণ যদিও গ্রন্থকারের মতে 'সমাস হইলে পদগুলির সমস্ত বিভক্তির লোপ হইয়া একটি নূতন শব্দ হয়', তাহা হইলেও তাঁহার গ্রন্থে সমস্ত পদ বহুস্থলেই দুই পদের ন্যায় বিশ্লিষ্টভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। যথা:—(১) বাঙলায় ধাতুর **গণ বিভাগ অনুসারে** ক্রিয়ার উক্তরূপ আকারভেদ হয় না। (ভূমিকা ৬০ পৃঃ) (২) পুস্তকখানির **সংশোধন কার্য্যে** আমার কনিষ্ঠপুত্র…আমার সাহায্য করিয়াছেন। (৬৮০ পৃঃ) (৩) বাক্যের **সংক্ষেপ সাধনের** ন্যায় সুশ্রাব্যতা-সাধনও সমাসের উদ্দেশ্য। (১২৫ পৃঃ) (৪) শত কোটি **প্রণাম পূর্ব্বক** নিবেদন। (১৮৭ পৃঃ) (৫) নিম্নলিখিত পদগুলি **অব্যয়ীভাবসমাস নিষ্পন্ন**। (১৮৫ পৃঃ)

পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গ্রন্থে, এমন কি প্রামাণিক ব্যাকরণেও, এই সমস্যা সমাধান করিবার কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। কোথাও এ-বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, একই সমস্ত পদ এক জায়গায় বিশ্লিষ্ট এবং অন্য জায়গায় একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য—ছাপাখানার ভূত সমস্ত পদ একত্র করিবে, না বিশ্লিষ্ট রাখিবে? একত্র যদি না করা হয়, তাহা হইলে এগুলি কি করিয়া একপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? অথবা এগুলি সমস্ত পদই নহে, বিভক্তির লোপ ও আগম অন্য কারণে ঘটিয়াছে। তাহাই যদি হয়, তবে স্থানে স্থানে উহাদের একত্র করা হইয়াছে কেন?

ইন্-ভাগান্ত শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস আর একটি সমস্যার স্থল। প্রামাণিক লেখকগণের অনেকেই একই পুস্তকে, এমন কি অনেক স্থলে একই বাক্যে, দুই রকম লেখেন। যিনি 'স্বামিভক্তি', 'ধনিসম্প্রদায়', লিখিয়া-ছেন, তাঁহাকেই 'স্বামী-স্ত্রী', 'ধনী-দরিদ্র' লিখিতে দেখিতেছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষাবোধ ব্যাকরণে 'প্রাণিবাচক'ও চোখে পড়িল, আবার 'সন্ন্যাসীদল'ও চোখে পড়িল। একস্থলে তিনি 'ধনী-নির্ধন' বাংলা সমস্ত পদ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং অন্যত্র লিখিয়াছেন—'ধনী-গণ' অশুদ্ধ, শুদ্ধ হইবে 'ধনিগণ'। সুপ্রতিষ্ঠিত খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণেই যদি এইরূপ পরস্পর-বিরোধী অভিমত পাওয়া যায়, তাহা হইলে ছাপাখানার ভূত কি করিবে?

সমাসস্থলে আর একটি সমস্যা—সমস্যমান পদগুলিকে যদি একত্র করিতে হয়, তাহা হইলে কোথায় সম্পূর্ণ একত্র করিব, আর কোথায়ই বা হাইফেন দ্বারা জুড়িব? ইংরেজীতে হাইফেন-ব্যবহারের একটা ধরাবাঁধা নিয়ম পাই। কিন্তু কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এযাবৎ বাংলায় হাইফেন-ব্যবহারের বিষয়ে কোনও নিয়মের উল্লেখ করিয়া-ছেন বলিয়া জানি না। কার্য্যতঃ দেখি, একই পণ্ডিত গ্রন্থকার একস্থলে সমস্যমান পদগুলিকে হাইফেন দ্বারা জুড়িয়াছেন, আবার অন্যস্থলে সেগুলি সম্পূর্ণ একত্র করিয়া-ছেন, আবার কোথাও বা বিশ্লিষ্টভাবে রাখিয়াছেন। 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?' ছাপাখানার ভূত তো আর পণ্ডিত লোক নহে; সে এ-ক্ষেত্রে কি করিবে, কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি কি তাহার নির্দ্দেশ দিবেন না?

এই প্রসঙ্গে মনে আরও একটি সমস্যার উদয় হইতেছে। যেস্থলে কোনও সাধারণ শব্দের সহিত একাধিক শব্দের সমাস হয় (যথা—ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষপীড়িত), সেরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? এখানে যেভাবে লিখিত হইল, সাধারণতঃ সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কি এই অর্থ হয় না যে, 'ও' এই সংযোজক অব্যয় 'ব্যাধি' এবং 'দুর্ভিক্ষপীড়িত' এই দুইটি পদকে যুক্ত করিতেছে?

অথচ তাহা নিতান্ত অর্থহীন। এরূপ ক্ষেত্রে সংযোজক অব্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের পর হাইফেন ব্যবহার করিলে কি দোষ হইতে পারে? কিছুকাল পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রে যেন এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তাহা রহিত করা হইল কেন? মুদ্রণ-শিল্প-সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দেশই দেখিয়াছি।

বহু শব্দের বানান লইয়াও ছাপাখানার ভূতকে সমস্যায় পড়িতে হয়। সমস্ত পদে ইন্-ভাগান্ত শব্দ প্রথমে থাকিলে এক সমস্যা হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। যে গ্রন্থকার একক্ষেত্রে সংস্কৃত-ব্যাকরণ-অনুযায়ী ইন্-এর ন্ লোপ করিয়া শব্দটি ই-কারান্ত করেন, তিনিই অন্যত্র উহাকে ঈ-কারান্ত (হয়তো বাংলা-ব্যাকরণ-অনুসারেই) করেন। ণ, ন, ষ, স-এর ব্যবহার-সম্বন্ধেও এইরূপ পরস্পর-বিরোধী ব্যবহার একই পণ্ডিত ব্যক্তির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে বানান-সংস্কার সমিতি অনেকটা সুনির্দ্দেশ দিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই সমিতির নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বানান করেন না; আবার যাঁহারা করেন, তাঁহারাও সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষাবোধ ব্যাকরণেও এইরূপ অসামঞ্জস্য কিছু কিছু দেখিয়াছি মনে হইতেছে। যে পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে ছাপাখানার ভূতের কর্ত্তব্য কি?

ঊর্দ্ধকমার ব্যবহার লইয়াও কম বেগ পাইতে হয় না। বর্ণবিশেষ উহ্য আছে, ইহা বুঝাইতেই ইংরেজীতে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহৃত হয়। অনেকে বাংলায়ও তাহাই করেন। অ-কারের ও-কারের ন্যায় উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার করা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেহ কেহ উভয়-প্রকারে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহার করেন এবং ফলে মধ্যে মধ্যে এক একটি বাক্য সঙ্গীনধারী একটি সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় দেখায়। (যথা—তা'রা দু'শ' বছর ধ'রে' যা' গ'ড়ে' তুলে'ছিলেন, তা' দু'দিনে নষ্ট হ'য়েছে ব'লে' আমরা দুঃখিত হ'ব না।) অনেক সময় ইহাতে ছাপাখানার ঊর্দ্ধকমার ভাণ্ড'র বাড়ন্ত হইয়া পড়ে। একই রচনায় বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে ঊর্দ্ধকমা ব্যবহৃত হইলে ছাপাখানার ভূতকে তাল ঠিক করিতে বড়ই বেগ পাইতে হয়। উহ্য বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঊর্দ্ধকমার ব্যবহার একেবারেই নিষেধ করা যায় না কি?

বিরামচিহ্নের ব্যবহার আর একটি বড় সমস্যার স্থল। ইংরেজীতে এ-বিষয়ে তবু কিছু নিয়ম-কানুন আছে, কিন্তু বাংলায় তেমন কিছু দেখি না। সুলেখকগণের লেখায় সামঞ্জস্যের নিতান্ত অভাব। অনেক লেখক এইজন্য নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে বিরামচিহ্নের ব্যবহার একরূপ এড়াইয়া চলেন, বহুনিন্দিত ছাপাখানার ভূতের উপরই ভারটা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে সর্ব্বজনগ্রাহ্য নির্দ্দেশ দিতে পারেন না কি?

ছাপাখানার ভূতের ছোটখাট আরও বহু সমস্যা আছে; সকলগুলির এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির নিয়মাবলী কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের উপায় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ নাই। তদুপরি তাহাতে ক্ষেত্র-বিশেষে বিকল্প-বিধান থাকায় গণ্ডগোলের মূল রহিয়া গিয়াছে। উহা সর্ব্বজনগ্রাহ্যও হয় নাই; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের প্রকাশিত অনেক পুস্তকেই ঐ নিয়মাবলী অনুসৃত হইতেছে না। এই সমস্ত কারণে ছাপাখানার ভূতও তাহার নিন্দা কিয়ৎপরিমাণেও ক্ষালন করিবার সুবিধা পাইতেছে না। নিন্দক পণ্ডিতবর্গের এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ হইলে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারিত। ব্যক্তিবিশেষের অভিমত সকলের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ডে যেরূপ Committee on Grammatical Terminology স্থাপন করিয়া ইংরেজী Grammar-এর সংস্কার-সাধন করা হইয়াছে, যদি সেইরূপ একটি সমিতি স্থাপন করিয়া বাংলা-ভাষার ব্যাকরণের সংস্কার ও ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কলন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি তাহা অবশ্যগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি এ-বিষয়ে অবহিত হইবেন?

সেন্সাস্ ও 'তপশীলভুক্ত জাতি'

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কতকগুলি জাতিকে গবর্ণমেণ্ট 'তপশীলভুক্ত জাতি' বা 'Scheduled castes' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজভুক্ত ঐ সকল জাতিদিগের এই 'তপশীল' আখ্যাটি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এক নবতর সৃষ্টি। কতকগুলি জাতিকে এই অভিনব সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করায় হিন্দুসমাজের পূর্ব্ব রূপের এক অপরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যাহারা ছিল একই গোত্রভুক্ত অর্থাৎ সাধারণ 'হিন্দু' নামে পরিচিত, তাহাদিগের কতকাংশ হইয়াছে 'বর্ণ-হিন্দু' বা 'Caste Hindus', অন্য কতকাংশ হইয়াছে 'তপশীলভুক্ত জাতি' বা 'Scheduled castes'। এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, কতকগুলি জাতির সহিত 'হিন্দু' নামের সংযোগ অব্যাহত রাখা হইয়াছে এবং কতকগুলি জাতিকে 'হিন্দু' নাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টি মাত্রই স্পষ্টতঃ ইহা অনুমিত হয় যে, 'বর্ণহিন্দুগণ' হইতে 'তপশীলভুক্তগণ' সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি।

'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের তালিকা প্রকাশিত হইবার পর ঐ তালিকার অন্তর্গতরূপে নির্দ্দিষ্ট জাতিগণের মধ্যে একটা ঘোরতর চাঞ্চল্যের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সমালোচনার জন্য উক্ত তালিকা প্রকাশিত হইলে তেলী, কপালী, নাথ, সূত্রধর, তাঁতী ও মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিসকল প্রতিবাদ করিয়া তালিকা হইতে তাঁহাদিগের নাম বাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। পরে নমঃশূদ্র, পোদ ও রাজবংশী প্রভৃতি ছাব্বিশটি জাতি এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সমীপে তীব্র প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করিয়া উক্ত তালিকা হইতে তাঁহাদিগের নাম বাদ দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবাদকারীদিগের মধ্যে নয়টি জাতির নাম বাদ গিয়াছে এবং অবশিষ্ট সতেরটি জাতির নাম সহ অন্যান্য উনষাটটি জাতি 'তপশীলে'র তালিকাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে দাঁড়াইয়াছে ছিয়াত্তরটি। সমগ্র তপশীলভুক্ত জাতিদিগের মধ্যে নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী ও বাগ্দী এই চারিটি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষাবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর। আপত্তি সত্ত্বেও যে-সকল জাতিকে 'তপশীলে'র তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে আজিও অনুযোগের চীৎকার প্রশমিত হয় নাই। ইহা লইয়া প্রত্যেক জাতির মধ্যেও দলাদলি, অনৈক্য ও তীব্র মন-কষাকষি চলিতেছে। এই হেতু প্রত্যেক সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথেও বিষম বাধার উৎপত্তি হইয়াছে। এমন কি ঐ সকল সমাজের মধ্যে নেপথ্যে এমন সমূহ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছে যাহার ফলে ভবিষ্যতে প্রত্যেক সমাজের ভিতর বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রত্যেক সমাজকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যেক জাতি আপনাপন সমাজোন্নতির জন্য যে পবিত্র ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিজদিগকে এক-একটি আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন শক্তিশালী জাতিরূপে পরিণত করিবার আশা পোষণ করিতেছিলেন, তপশীলরূপী সোনার পাথর-বাটির আবির্ভাবে সেই উচ্চ আশা সমূলে ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে। বৃহত্তর উন্নতির কথা বিস্মৃত হইয়া 'তপশীল'-রূপ রক্ষা-কবচের মারফতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলোভনের দিকে প্রায় প্রত্যেক জাতির কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমতাবস্থায় 'তপশীল' সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক সমূহ বিষয় আলোচনা করিবার আবশ্যকতা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেন্সাস্ রিপোর্টগুলিতেই 'অনুন্নত সম্প্রদায়' (Backward classes), 'অস্পৃশ্য জাতি' (Depressed classes) এবং 'তপশীলভুক্ত জাতি' (Scheduled castes) প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক ইস্তাহার ও প্রস্তাবাবলীতেও কখনও কখনও এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিমত প্রচারিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯১, ১৯০১ এবং ১৯১১ সালের সেন্সাস্গুলির সময়ে জাতিতত্ত্ব লইয়া সাধারণের মধ্যে তেমন অধিক উত্তেজনা দেখা যায় নাই। ইংরাজী ১৯২১ সালের সেন্সাসের সময় হইতেই এই তীব্রতা পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তৎকালীন সেন্সাস্-সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত টম্‌সন্ মহোদয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"No part of the Census in 1891, 1901, or 1911 aroused so much excitement as the return of caste, which caused a great deal of heart-burning * * * *." (P. 346).

যদিও শ্রীযুক্ত টম্সন্ মহোদয় ১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টের উক্ত ৩৪৬ পৃষ্ঠার ১৯ ছত্রে স্পষ্টতঃ প্রবোধ দিয়াছেন—

"The object of the return was merely to ascertain the numbers of each caste * * * *."

তথাপি সেন্সাস্ ও জাতিসমূহের শ্রেণী-বিভাগ প্রভৃতি সম্পর্কে এই অসন্তোষ ক্রমবর্দ্ধমানরূপেই চলিয়া আসিতেছে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সেন্সাস্ রিপোর্টসমূহ, প্রস্তাবাবলী ও প্রচারপত্র এবং ভারত-গবর্ণমেন্টের বিবৃতি প্রভৃতি হইতে উপরিউক্ত অসন্তোষ-সৃষ্টির কোনও উপাদান প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা অবশ্য প্রয়োজন।

ইং ১৯২১ সালের বঙ্গীয় সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের জন্য সম্প্রতি যে বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদ্দ্বারা Depressed classes সংজ্ঞাটি একটি রাজনৈতিক স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। যে সময়ে শাসন-সংস্কার আইন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছিল সেই সময়ে 'ডিপ্রেস্ড্ শ্রেণীর' ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া হয় বোধ না। প্রতিনিধিগণ গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভোট গণনার দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে ইহা করিবার আবশ্যক হইত। কিন্তু যাহারা এইরূপ প্রতিনিধিত্বের দ্বারা লাভবান হইবে যদি তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই সিদ্ধান্ত না করা হয় তাহা হইলে সেন্সাস্-কার্য্যের উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অসম্পূর্ণ হইবে। এই হেতু এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং তাহা সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইবে।"

উপরিউক্ত একাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

Depressed classes সংজ্ঞাটি ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হয় নাই এবং ইহার ব্যাখ্যা করাও সহজ নহে। Backward classes-এর যে-অর্থ ইহার ঠিক সেই অর্থ নহে। Backward classes অর্থে সাধারণতঃ শিক্ষা ও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে বুঝায়, অথচ ইহারা হিন্দু সমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলির সমান অবস্থাপন্নও নহে।"

এই সম্পর্কে উপরিউক্ত সেন্সাস্-রিপোর্টের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মুচির (চামড়া প্রস্তুতকারী ও জুতা-মেরামতকারী) ন্যায় একটি জাতিকে কেন Depressed class বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে অথচ কুমারকে (হাঁড়ি-প্রস্তুতকারক) পরিত্যাগ করা হইয়াছে এবং নাপিত (ক্ষৌরকার), গোয়ালা (দুগ্ধ-বিক্রেতা) ও ধোবার (বস্ত্র-পরিষ্কারক) ন্যায় জাতিগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে? এ সম্বন্ধে সীমা নির্দ্দেশ করা যথার্থই কঠিন। মুচিদিগের অপেক্ষা কুমারদিগের সামাজিক অবস্থান ভাল এবং তাহারা উহাদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত; নাপিতগণ নিশ্চয়ই বাকাবাগীশ; প্রকৃতপক্ষে ইহারা পাকা গ্রাম্য কর্ম্ম-তৎপর জাতি এবং অন্যান্য প্রত্যেক জাতির বৃত্তি-নিপুণ ও সকলের সহিত সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে দক্ষ। গোয়ালা এবং ধোবাও শিক্ষিত জাতিগণের সহিত মেলামেশা করে এই জন্য ইহাদিগকে depressed বলা যায় না। চাষী-কৈবর্ত্তগণকে depressed-এর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, যদিও হিন্দু সমাজে ইঁহাদের স্থান কথঞ্চিৎ উচ্চে কিন্তু ইঁহারা গ্রামাঞ্চলেই বাস করেন এবং যে স্থানে ইঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তথায় রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদিগের সমতুল্যই ইঁহাদের অবস্থা।"

উপরিউক্ত একাদশ অধ্যায়ে ৩৫১ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ জাতির বিবরণীমধ্যে লিখিত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি জাতি ভদ্রলোক শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত।"

১৯২১ সালের এই সেন্সাস্ রিপোর্টের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে কতকগুলি জাতিকে (ইহারা সংখ্যায় সাতাশী) Depressed classes-এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ সকল জাতিকেই ১৯৩৪ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে প্রচারিত তালিকার দ্বারা Scheduled castes বা "তপশীলভুক্ত জাতি" রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

Depressed classes এবং Scheduled castes যে অভিন্ন তৎসম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেন্টের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"Government of India Act, 1935
General

26. (1) * * *
The Scheduled castes means which castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes, being castes, races, tribes, parts or groups which appear to His Majesty in Council to correspond to the classes of persons formerly known as the *depressed classes* as His Majesty in Council may specify;"

ইং ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট ১২২ এ, আর, নং প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে "তপশীলভুক্ত জাতি"দের তালিকা প্রস্তুতির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"The list has been prepared on the basis of the social and political backwardness of these castes and the necessity of securing for them special representation in order to protect their interests."

ইং ১৯৩৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের ৯১৫ এ, আর, নং ঘোষণা-পত্র দ্বারা বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট যে-প্রস্তাবটি প্রচার করিয়া ১৯৩৫ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—

"ডিপ্রেস্ড শ্রেণিগণের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় প্রথমে লিপিবদ্ধ এবং পুণা-চুক্তি অনুসারে পরে পরিবর্ত্তিত

প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার পন্থার ভিত্তিস্বরূপে গৃহীত তপশীলভুক্ত জাতির অস্থায়ী তালিকাটি বাঙ্গালা-সরকার ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ১২২ এ, আর, নং প্রস্তাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহের জন্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবনতিকে ভিত্তি করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় শ্রীযুক্ত সুখলাল নাগ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের হোম-মেম্বার শ্রীযুক্ত প্রেণ্টিস্ মহোদয় বলিয়াছিলেন—

"The Government has not classified any castes as "Depressed Classes." They have prepared a list of Scheduled castes on the basis of social and political backwardness of the castes and the necessity of securing for them special representation in order to protect their interests."

"তপশীলে"র তালিকা প্রস্তুতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা-সরকারের হোম-মেম্বার শ্রীযুক্ত রীড মহোদয় বলিয়াছেন—

"বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অভিমত এবং জাতিগুলির অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া 'তপশীলে'র তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেবল কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া কোনও জাতিকে তপশীলভুক্ত করা হয় নাই।" (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা—১৭ই চৈত্র, ১৩৪১ সাল)

১৯৩১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্টের ৪৯৪ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে "Depressed" জাতিগুলির পরিচায়ক যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে সেগুলি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"১। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না।

২। যাহারা ব্রাহ্মণ অথবা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হিন্দু-গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে না।

৩। যাহারা বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না।

৪। যাহারা প্রধান প্রধান হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করে না।

৫। উত্তম ব্রাহ্মণগণ যাহাদের পৌরোহিত্য করেন না।

৬। যাহাদের আদৌ পুরোহিত নাই।

৭। যাহারা সাধারণ দেব-দেবীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না।

৮। যাহারা স্পর্শ দ্বারা অথবা কিয়দ্দূরে অবস্থান করার দ্বারা অন্যকে অপবিত্র করে।

৯। যাহারা মাটিতে মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলে।

১০। যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে এবং গো-মাতাকে শ্রদ্ধা করে না।

১১। যাহাদের হস্ত হইতে তিনটি উচ্চ জাতি ও নবশায়করা জল গ্রহণ করিয়া পান করে না। এবং যাহারা ঐ সকল জাতির রান্নাঘরে, জলের ঘরে ও পাকান্ন রক্ষিত ঘরে প্রবেশ করিলে সেই সকল দ্রব্য কলুষিত হয়।

১২। যাহারা কোনও সাধারণ দেব-দেবীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না এবং যাহারা তথায় প্রবেশ করিলে তথাকার দ্রব্যসকল অপবিত্র হয়।

১৩। বর্ণহিন্দুদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোটেলে বা খাইবার ঘরের মধ্যে যাহাদিগকে আহার করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না।

১৪। যাহাদের দৈব ও পৈত্র কার্য্যে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করেন না।

১৯৩১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্টের ৫০০ পৃষ্ঠার এক স্থলে সেন্সাস্-সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট মহোদয় পরিষ্কার রূপে লিখিয়াছেন—"On the other hand, no caste should be included which prefers to be excluded." অর্থাৎ কোনও জাতি 'তপশীলভুক্ত' থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে তাহার নাম এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

উল্লিখিত ১৯৩১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টের পঞ্চম ভাগের প্রথম খণ্ডের ৪২৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গদেশীয় হিন্দু-জাতিগণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া লিখিত হইয়াছে—

"(*i*) What the castes think of themselves?
(*ii*) What others think of them?"

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেচারা 'তপশীলভুক্ত' জাতিগুলির বড় একটি তালিকা প্রকাশিত হইবার পরেই এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে লিখিত হইয়াছিল—"তপশীলভুক্ত মানে সোজা কথায় নীচ জা'ত বা ছোট লোক।" ১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তপশীলী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক এক পত্র *Statesman* পত্রিকায় প্রেরিত হইলে উহার সম্পাদক মহোদয় ঐ পত্রের বাহককে সন্দেহসূচক প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"Are you Hindus?" বর্ত্তমান ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত আমেরী মহোদয় নির্ব্বিকারচিত্তে বলিয়াছেন, "হিন্দু হইতে মুসলমান যেমন পৃথক্, তেমনি হিন্দু হইতে তপশীলী সমাজও পৃথক্।" (অর্দ্ধ সাঃ আনন্দবাজার—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০)। এতদ্ব্যতীত যে-সকল হিন্দু জাতি অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষা ও সভ্যতা লাভপূর্ব্বক এবং সমাজ-সংস্কার আদি করতঃ তাহাদের সামাজিক অবস্থানকে কথঞ্চিৎ উন্নত করিয়াছিল, তপশীলভুক্ত করার পর হইতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অলীকতা নাই। এইরূপে তাহাদিগের গত অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী উন্নতির মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করা হইয়াছে।

কোনও বিবৃতি দ্বারা যদি এক দল খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান-সমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া, একদল মুসলমানকে মুসলমান-সমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া, একদল বৌদ্ধকে বৌদ্ধসমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া ও একদল শিখকে শিখসমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝায় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা যদি বিজ্ঞবান

কর্ত্তৃক "নীচ জাত ও ছোট লোক" বলিয়া অভিহিত হন ও তাঁহাদের সামাজিক অবস্থান ক্ষুণ্ণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে যেমন তাঁহাদিগের অন্তর্বেদনা তীব্রভাবে জাগরিত হইয়া উঠে এবং বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহাদিগের প্রচলিত মর্য্যাদা হানির সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তেমনি হিন্দু নামে অভিহিত প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির পক্ষেও ঐরূপ হওয়া সম্ভব। পূর্ব্ব-কথিত যে-সকল বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি 'তপশীলভুক্ত' নামে বর্ণিত হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত জাতিগণের উদ্দেশ্যে "নীচ জাত", "ছোট লোক", "হিন্দু কি না" এবং "হিন্দু হইতে পৃথক্" প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও যে তপশীলভুক্ত জাতিগণের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষ নাই একথা একান্ত সত্য। তথাপি যে তাঁহারা ঐ প্রকার অকপট ও স্পষ্ট উক্তিসকল করিয়াছেন তৎপক্ষে সেন্সাস্-রিপোর্ট, বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিসমূহই, যে, প্ররোচক ইহা বলিলে আদৌ ভুল বলা হয় না। তাঁহারা ঐ সকল বিবৃতি ও বর্ণনার অর্থ যে বুঝিতে সমর্থ হন নাই ইহা বলা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অজ্ঞতা-প্রসূত। পক্ষান্তরে 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের পূর্ব্ব-সঞ্জাত অসন্তোষকে উপরিউক্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মন্তব্য-সকল সর্ব্বতোভাবেই সমর্থন করিতেছে। অধিকন্তু এই সমর্থনগুলি আমাদের পূর্ব্বকথিত অসন্তোষ-সৃষ্টির উপাদান-সমূহের অনুসন্ধান-অভিপ্রায়কেও অধিকতর সজাগ করিয়া দিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে যে-সকল সরকারী বিবৃতি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি সেইগুলির মধ্য হইতে সারসঙ্কলন করিলে নিম্নের লিখিত দফাগুলি অনুযায়ী প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বিশেষ-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :—

১। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিবার জন্য হিন্দুসমাজের কতকগুলি জাতিকে 'Depressed' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই 'ডিপ্রেস্ড' সংজ্ঞাটি একটি রাজনৈতিক স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। (১৯২১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্ট, পৃ. ৩৪৬)

২। হিন্দু সমাজের কতকগুলি জাতির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা-পরিষদে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতির ভিত্তিতে Scheduled বা 'তপশীল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। (বাঙ্গালাসরকারের ১৯৩৪।২৮শে ডিসেম্বর তারিখের ৯১৫ এ, আর, নং প্রস্তাব)

৩। Depressed classes ও Scheduled castes অভিন্ন। যে সকল জাতিকে Depressed classes-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদিগকেই Scheduled বা 'তপশীলে'র অন্তর্গত করা হইয়াছে (Govt of India Act 1935)

৪। শাসন-সংস্কার রচনার সময়ে Depressed সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের মনোনয়ন দ্বারাই 'ডিপ্রেস্ড' শ্রেণীদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। (১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টের ২৪৬ পৃ.)

৫। যে সকল জাতি প্রতিনিধিত্বের দ্বারা লাভবান হইবে সেই সকল জাতিকে কি কারণে Depressed সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করার একান্ত আবশ্যক। ১৯২১ সালের সেঃ রিঃ, ৩৪৬ পৃ.)

৬। Depressed সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করাও সহজ নহে। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ, ৩৬৫ পৃ.)

৭। Backward classes-এর যে অর্থ Depressed-এর ঠিক সেই অর্থ নহে। Backward classes অর্থে সাধারণতঃ শিক্ষায় ও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে বুঝায়। অথচ ইহারা হিন্দুসমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলির সমান অবস্থাপন্নও নহে। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৩৬৫ পৃ.)

৮। মুচিদিগকে Depressed শ্রেণী বলা চলে কিন্তু কুমার, নাপিত, গোয়ালা, ধোবা ইহাদিগকে Depressed বলা চলে না। কারণ মুচি-দিগের অপেক্ষা কুমারদিগের সামাজিক অবস্থান ভাল এবং তাহারা উহাদের অপেক্ষা শিক্ষিত; নাপিতগণ বাক্যবাগীশ, অন্য প্রত্যেক জাতির বৃত্তি-নিপুণ ও সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে দক্ষ; গোয়ালা ও ধোবারাও শিক্ষিত জাতিগণের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকে। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৩৬৬ পৃ)।

৯। চাষী-কৈবর্ত্তগণের সামাজিক অবস্থান কথঞ্চিৎ উচ্চ হইলেও ইহারা গ্রামাঞ্চলেই বাস করে এবং ইহারা রাজনীতি বিষয়ে নমঃশূদ্রদিগের সমতুল্য বলিয়া ইহাদিগকে Depressed শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৩৬৬ পৃ.)।

১০। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ইঁহারা ভদ্রলোক শ্রেণী। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৩৫১ পৃ)।

১১। গবর্ণমেণ্ট কোনও জাতিকে Depressed বলিয়া শ্রেণী-বিভাগ করেন নাই। (বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের হোম-মেম্বার মিঃ প্রেণ্টিস মহোদয়ের উক্তি)।

১২। Depressed শ্রেণীগুলি চৌদ্দটি লক্ষণসম্পন্ন।

১৩। 'তপশীলভুক্ত' জাতিগুলির মধ্যে যাহারা 'তপশীলে'র তালিকাভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইবে, তাহাদিগের নাম বাদ দেওয়া হইবে। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৫০০ পৃ.)।

১৪। হিন্দুসমাজের জাতিসমূহের স্বরূপ-নির্ণয়ের লক্ষণ হইতেছে দুইটি। যথা :—

(ক) জাতিসকল নিজেদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে?

(খ) তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্য লোকের ধারণা কি?

১৫। লোকগণনার উদ্দেশ্য হইতেছে কেবলমাত্র জাতিগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা। (১৯২১-এর সেঃ রিঃ ৩৪৬ পৃ.)।

অতঃপর উপরিউক্ত প্রধান প্রধান উক্তিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং ঐগুলির মধ্যেকার অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলির মধ্য হইতে আমরা Depressed এবং Scheduled বা 'তপশীল' সংজ্ঞা

দুইটির উদ্ভাবন সম্বন্ধে ইহাই উপলব্ধি করিতেছি যে, হিন্দুজাতির কতকগুলি শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক হীনতাকে ভিত্তি করিয়া ও তত্তদ্বিষয়ক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উহার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রথম দফার বর্ণনায়, কেবল সাধারণ ভাবে জাতির বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় দফায়, বিশেষ ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতির ভিত্তিতে স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম দফার বর্ণনায় যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় দফার বর্ণনায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম হইতেই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকার বাধা যে কি ছিল তাহা বুঝা যায় না। তাহার পর Depressed-এর ব্যাখ্যা করা সহজ নহে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশের পর, উহার যে-ভাবে বিশদ ব্যাখ্যা করিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা 'তপশীলভুক্ত' জাতিদিগকে যে কোন্ শ্রেণীর জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় নাই। মুচি জাতিকে 'তপশীলে'র আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কি বুঝিতে হইবে যে, কুমার, নাপিত, গোয়ালা ও ধোবা জাতিরা পূর্ব্ব-কথিত গুনসম্পন্ন বলিয়াই রাজনীতিতে পারদর্শী রহিয়াছেন? রাজনীতিতে পারদর্শী হইবার পক্ষে ঐ সকল গুণই যে যথেষ্ট, তাহা কোনও রাজনীতিবিদের লেখার মধ্যে আছে কি না আমরা জানি না বা কোনও রাজনীতিজ্ঞের মুখে শুনিবার সুযোগও হয় নাই। ঐ সকল গুণের অজুহাতে কুমার, নাপিত, গোয়ালা ও ধোবা প্রমুখ জাতিগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জনের এরূপ একটি সহজ পন্থা হইতে বঞ্চিত রাখার যৌক্তিকতা কি বিচারসহ? ধোবা জাতির সামাজিক অবস্থান যে অপেক্ষাকৃত অনেক হীন তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। 'তপশীলভুক্ত'গণের সামাজিক হীনতার সুস্পষ্ট আভাস যখন প্রদত্ত হইয়াছে, তখন 'তপশীলে'র তালিকা হইতে এই সামাজিক হীনাবস্থাপন্ন ধোবা জাতির নাম প্রথমে Depressed-এর তালিকা হইতে বাদ দেওয়ায়, তাঁহাদের দুর্দ্দশা অপনোদন করার কথা কি ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই? অধিকন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় দফার বর্ণনাগুলিতে কতকগুলি জাতিকে Depressed আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া একাদশ দফার বর্ণনায় তাহা স্পষ্টতঃ অস্বীকার করা হইয়াছে। যদি ভুল বুঝিয়া না থাকি তবে এরূপ করিবার হেতু কি? ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় ইহা যেন বোকা বুঝাইবার অথবা চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের প্রয়াস মাত্র।

সপ্তম দফার বর্ণনানুযায়ী জানিতে পারা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে Backward classes নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, যে-সকল জাতি সাধারণতঃ শিক্ষায় ও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ অথচ হিন্দুসমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলির সমান অবস্থাপন্ন নহে তাহারাই Backward classes। আরও বলিয়াছিলেন যে, Backward classesএর যে-অর্থ Depressed-এর সে-অর্থ নহে। অষ্টম দফায় বলা হইয়াছে যে, মুচিদিগের সামাজিক অবস্থান ভাল নহে বলিয়াই তাহারা Depressed শ্রেণী। সুতরাং এরূপ পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও ষষ্ঠ দফায় যে বলা হইয়াছে Depressed সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করা সহজ নহে, একথা বলার সার্থকতা কি? অথচ এই সপ্তম দফার বর্ণনানুযায়ী 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণকে স্পষ্টতঃ হিন্দুসমাজের নিম্নতম শ্রেণী বলিয়াই বলা হইয়াছে, কেন না Depressed জাতিগণ ও 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণ অভিন্ন। এই সকল বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যেন গোলকধাঁধার চক্রে ঘুরপাক খাইতেছি।

দশম দফার বর্ণনানুযায়ী অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী। এই বিবৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজ মধ্যে যে অ-ভদ্র শ্রেণীর বিদ্যমানতা আছে তাহা বুঝিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। বাংলা ভাষায় অ-ভদ্র শব্দটি গালিবাচক।

দ্বাদশ দফার বর্ণনায় Depressed শ্রেণীগুলির যে চৌদ্দটি লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্ন, নিম্নতর ও নিম্নতম জাতিগুলির সামাজিক নিম্নতার হেতুগুলি তন্ন তন্ন করিয়াই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই বিশ্বাস জন্মে যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুসমাজের কতকগুলি জাতির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানের একটি খাঁটি হীন চিত্র অঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ ১৯২১ সালের বঙ্গীয় সেন্সাস্-রিপোর্টের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ২১২ পরিচ্ছেদে সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় লিখিয়াছেন—

"এই দেশের লোকদের জ্ঞান নিতান্ত অপরিপক্ব; কেবলমাত্র সংখ্যা গণনার সার্থকতাটুকু তাহারা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; এবং সেন্সাসের উদ্দেশ্যই হইতেছে হিন্দুসমাজে তাহাদের জাতিগত স্থান নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া—এই ভুল ধারণাটি তাহারা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।"

উপরিউক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, আমাদের দেশের অপরিপক্ব জ্ঞান-বিশিষ্ট লোকেরা শুধু

এইমাত্র বুঝিয়াছে যে, হিন্দুসমাজের মধ্যেই তদন্তর্গত জাতিগুলির স্থান নির্ণয় করা ও নির্দ্দিষ্ট করা সেন্সাসের উদ্দেশ্য; পরিপক্ক জ্ঞানবিশিষ্ট *Statesman* পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত আমেরী মহোদয়দ্বয় বুঝিয়াছেন যে, সেন্সাসের উদ্দেশ্য হইতেছে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কতকগুলি জাতিকে হিন্দু হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন করা। "উল্টা বুঝলি রাম" এই প্রবচনটির সহিত ইহা তুলনার যোগ্য।

ত্রয়োদশ দফার বর্ণনা মতে জানা যায় যে, যে সকল জাতি Scheduled বা 'তপশীলভুক্ত' জাতির তালিকার মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা না করিবে, তাহাদের নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছাব্বিশটি জাতি উক্ত 'তপশীলে'র তালিকা হইতে নাম বাদ দিবার জন্য আপত্তি জানাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আপত্তিকারীদের মধ্যে মাত্র নয়টি জাতির নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। আপত্তি করা সত্ত্বেও অন্যান্য সতরটি জাতির নাম বাদ না-দিবার একটি হেতু আমরা এই জানি যে, ঐ সকল জাতির মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের আশায় 'তপশীলে'র মধ্যে থাকিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল তপশীল-বিলাসীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় সম্প্রতি তপশীল-সংজ্ঞার বর্ত্তমান ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধ আলোচনাও আরম্ভ করিয়াছেন। ('পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' পত্রিকা—১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৮৫-১৮৬ পৃ. দ্রষ্টব্য) ইহাকেই বলে—"ভূতে পশ্যন্তি···।"

চতুর্দ্দশ দফার বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, হিন্দুদিগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সেন্সাস্-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় লিখিয়াছেন যে, জাতিগণ নিজদিগকে কি বলিয়া মনে করে এবং অন্য লোকেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া মনে করে, এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। একথা নিশ্চয় যে, 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের মধ্যে অনেক জাতি নিজদিগকে 'হিন্দু' বলিয়াই মনে করে; কিন্তু সেন্সাস্-কর্তৃপক্ষগণের বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও মন্তব্য প্রভৃতি দৃষ্টে অন্যান্য বিজ্ঞ লোকেরা 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের সম্বন্ধে—"আপনারা কি হিন্দু?", "হিন্দু হইতে তপশীলীগণ পৃথক্" ও "ছোট লোক" প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন এবং হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীরা জাতিনির্বিশেষে ইঁহাদের সকলকেই অস্পৃশ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এইরূপ নিশ্চয়ার্থক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত করিতেন না।

অষ্টম দফার বর্ণনায় দেখা যায় যে, ধোবা জাতিকে Depressed-এর তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার হেতু সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ আদি উচ্চ শ্রেণী এবং অন্যান্য জলাচরণীয় শ্রেণীদের ইহারা সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য অবনত হিন্দুদিগের তাহা করে না; এই জন্য ইহারা Depressed শ্রেণীদের সহিত পাংক্তেয় হইবার দুর্ভাগ্যলাভ (?) করিতে পারে নাই। নাপিত, গোয়ালা ও কুমার প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতপক্ষে শিক্ষায় ও রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ জাতি-গুলিকেও Depressed-এর তালিকা হইতে বাদ দিবার এইরূপই সম্ভাবনা থাকিতে পারে। অবশ্য ধোবা জাতিকে পরে তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'তপশীলভুক্ত' জাতিগুলির মধ্যে কোনও কোনও জাতির শিক্ষিত সুচতুর ব্যক্তিগণ নিজেরাই অধিকতর স্বার্থ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, কতকগুলি অজ্ঞ জাতিকে স্বদলভুক্ত করিবার ও অল্প-শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য জাতিগুলিকে তপশীলের তালিকা হইতে বাদ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ প্রদান করিবার কথাও অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণও রহিয়াছে। রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) জাতির নেতা স্বর্গীয় পঞ্চানন বর্ম্মার সম্বন্ধে উক্ত সমাজের মুখপত্র 'ক্ষত্রিয়' নামক সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে –

> "ভ্রাতৃগণ, তপশীলী সংগঠনে তাঁহার দানও কম নহে। আজ যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী, ভিন্ন ভাবাপন্ন, চির-অপরিচিত, পরস্পর চির-অবিশ্বাসী ৩০টি লোকও একত্র কাজ করার সুযোগ পাইয়াছি তাহাতে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মার দান কম নহে। গোলটেবিল বৈঠকের কথা মনে করুন।··· সমস্ত জাতির আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য Depressed কথার স্থানে Scheduled বা তপশীলী আখ্যা দেওয়াইয়াছিলেন।··· তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি তপশীলী সংগঠনের দিকেও মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় তপশীলী শব্দ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন।" ('ক্ষত্রিয়', ১৩৪৭ ভাদ্র সংখ্যা, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এইরূপ নমঃশূদ্র সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে সহযোগিতা করার কথা ১৯৩২ সালের Franchise Committeeর রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সম্পর্কে এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, সমস্ত অনগ্রসর জাতিদিগের মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকদের অভিমত এ সম্বন্ধে গ্রহণ করা হয় নাই। এস্থলে পূর্ব্বলিখিত "পরস্পর চির অবিশ্বাসী" উক্তির অনুকূল আর একটি কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা এই, যে, তপশীলভুক্ত জাতি-গুলির মধ্যে বর্ণহিন্দুদিগের ন্যায় নানা বিভাগ রহিয়াছে। সুতরাং কোনও একটি তপশীলভুক্ত জাতির কোনও

নির্ব্বাচিত সভ্যই আইন-সভায় অন্য সকল জাতিদের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করিতে পারেন না। অন্য দিকে এই প্রশ্নও উঠে, যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ আদি জাতি যখন আইন-সভায় কুমার, গোয়ালা ও নাপিত প্রভৃতি জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন তখন নমঃশূদ্র, রাজবংশী ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আদি জাতির প্রতিনিধিত্ব তাঁহারা করিতে পারিবেন না কেন? এবং এই জন্য 'তপশীলী' সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া পৃথক্ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিবার আবশ্যক কি? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি জাতি যে ঐ সকল তপশীলী জাতিদের প্রতিনিধিত্ব করিতে অযোগ্য, একথা তপশীলভুক্ত জাতিদিগের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে কোনও জাতি কখনও বলেন নাই। বরং 'জাতীয় কংগ্রেসে'র পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে তপশীলী জাতিরা প্রতিনিধিরূপে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিয়া ইহার বিপরীত দিকটাই প্রমাণ করিয়া চলিয়াছেন। সুতরাং কোনও দিক দিয়াই তপশীলভুক্ত জাতিদের তালিকা সৃষ্টির যৌক্তিকতা দেখা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠে, যে, "পরস্পর চির-অবিশ্বাসী" জাতিগুলি 'তপশীলভুক্ত' হইবার পর বিশ্বাসের প্রমাণের জন্য কে কাহাকে কয়টি আসন আইন-সভার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন?

'সেন্সাস্' কথার অর্থ হইতেছে লোকগণনা। সেন্সাস্ সুপারইনটেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত টমসন্ মহোদয় সেন্সাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"The individual failed to realise the utility of mere enumeration."

অথচ এই আদম-সুমারীর রোয়দাদসকল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে হিন্দু সমাজের জাতিগুলির উৎপত্তি, সামাজিক অবস্থান ও লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতি অগণিত গ্রন্থে ঐ সকল সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ইতিবৃত্ত থাকা সত্ত্বেও এবং সরকারী নিষেধাত্মক নির্দ্দেশ-আদি প্রদানের পরেও ইহার পুনরাবৃত্তির কোনও সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। ১৯০১ এবং ১৯১১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্টগুলির পৃষ্ঠাসমূহ উল্টাইলেই জাতিগুলির উৎপত্তি-আদির নূতনত্বের ও পুনরাবৃত্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। "Mere enumeration" এই সুস্পষ্ট উক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? ১৯২১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্টের ৩৪৬ পৃষ্ঠার ২১২ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

"The ancient idea that the King, or the Government, is the last appellate authority on questions of caste distinction, still has its influence, * * *."

এই উক্তির প্রতিপক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যদি জাতিসকলের সংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসভূমির বিবরণ প্রভৃতি ব্যতীত সামাজিক উচ্চ-নীচতা-জ্ঞাপক তথ্য আদৌ প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রাচীন ধারণার অস্তিত্ব থাকিত না। বিশেষতঃ যেহেতু ঐ সকল তথ্যের অধিকাংশই আপত্তিকর ও ভ্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু ঐগুলি শাসক-কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সঙ্কলিত একটি বিশ্বাস্য ও প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত রাজকীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু লোকের উক্তরূপ ধারণা পুনরায় সজাগ হইয়া উঠা অযৌক্তিক হয় নাই। বিবিধ বেসরকারী গ্রন্থে জাতিসকলের বহু বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বিবরণীসমূহ রহিয়াছে। তাহার অধিকাংশই অবিশ্বাস্য ও অপ্রীতিকর। তৎসত্ত্বেও 'ধান ভানিতে শিবের গীতে'র ন্যায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ঈদৃশ প্রয়াস অকারণ হইয়াছে বলিতে হইবে। আর জাতিভেদের প্রশ্ন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে "The last appellate authority" মনে করার হেতু এই, যে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই "খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছেন।"

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। তাহা এই, যে, 'Depressed' বা 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের জন্য যে-চৌদ্দটি লক্ষণের নির্দ্দেশ গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলি যথার্থপক্ষে অস্পৃশ্যতারই পরিচায়ক হইয়াছে। ১৯৩১ সালের সেন্সাস সুপারইনটেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পোর্টার মহোদয় এই কারণেই Depressed বা তপশীলীগণকে অস্পৃশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত চৌদ্দটি লক্ষণ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে যে-কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাই মনে করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরোধে শ্রীযুক্ত পোর্টার মহোদয় সেন্সাস্-রিপোর্ট হইতে পরে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করেন। এই প্রসঙ্গে পরলোকগত অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—

"I have been contending that there is no depressed class problem in Bengal and in this opinion I am fortified by no less eminent an authority than the Superintendent of Census Operations for Bengal for 1931. It is remarkable that the first part of Mr. Porter's report containing this expression of opinion has been held back from publication at the special request of Government of Bengal."

কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটু বক্তব্য এই, যে, যত কাল পর্য্যন্ত উপরিউক্ত চৌদ্দটি লক্ষণ সেন্সাস-রিপোর্ট হইতে তুলিয়া না দেওয়া হয়, তত কাল বাঙ্গালা

দেশের 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণ অস্পৃশ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, এই চৌদ্দটি লক্ষণ ফ্রানচিস্ কমীটি কর্ত্তৃক পরে সংযোজিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় মান্দ্রাজের ন্যায় 'পঞ্চম' জাতি নাই। 'পঞ্চম'দিগকেই প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—

"The removal of untouchability means the abolition of the fifth caste." (January 5, 1922, p. 3—*Young India*).

উচ্চ শ্রেণীগণ 'পঞ্চম' জাতিদের হইতেই সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার 'তপশীলী' জাতিগণ (কয়েকটি ব্যতীত) হাটে, বাজারে, মেলায়, নৌকায়, রেলে, স্টীমারে ও জলাশয়ে সকলের সহিত মেলামেশা করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত নহে। শুধু বাঙ্গালায় নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ ও বৈষ্ণবগণ এবং এমন কি সাধু-সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত তাহাদের নিজেদের রান্না করিবার স্থানে স্বজাতীয় অন্য লোককেও প্রবেশ করিতে দেয় না; দেবপূজার স্থলেও প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহা অস্পৃশ্যতার সমর্থক ব্যবস্থা নহে। নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দুগণ অন্য সকলের পক্ষেই এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তথাপি বঙ্গীয় সেন্সাস-রিপোর্টের লিখিত লক্ষণগুলির কয়েকটি পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতারই পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। সুতরাং Depressed বা 'তপশীলভুক্ত' জাতিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট উক্ত লক্ষণগুলির দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে অস্পৃশ্য জাতির কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। এই কারণেও আমরা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের কতকগুলি জাতিকে Depressed বা তপশীলের অন্তর্গত করার এবং উপরিউক্ত চৌদ্দটি লক্ষণের নির্দ্দেশ করার সর্ব্বতোভাবে অসমর্থন করি।

'তপশীল' সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে, হিন্দুসমাজকে 'বর্ণহিন্দু' ও 'তপশীলী' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার কোনও যৌক্তিকতা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতকগুলি জাতিকে তপশীলীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া 'অ-হিন্দু', 'ছোটলোক' ও 'অস্পৃশ্য' বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কতকগুলি প্রকৃত হিন্দুজাতির অন্তরে বিষম ক্ষোভের সঞ্চার করা হইয়াছে এবং হিন্দু-সমাজে তাহাদের সামাজিক অবস্থান পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দফার বর্ণনায় জানা যায়, যে, Depressed সংজ্ঞাটি রাজনৈতিক স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে ("attained a political significance"); কিন্তু তাহার পর Depressedএর পরিবর্ত্তে অর্থশূন্য Scheduled বা 'তপশীলী' সংজ্ঞাটি প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ Depressed-এর ন্যায় 'তপশীলী' সংজ্ঞাটির দ্বারাও কার্য্যতঃ সামাজিক হীনতাই যখন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহাও বর্জ্জন করা সমীচীন বলিয়া মনে করি। আর ১৯২১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টের ৩৪৬ পৃষ্ঠার লেখা হইতে জানিতে পারি যে, (এই অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) এ দেশের লোকেরা সেন্সাস সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই যে, সমাজে তাহাদের জাতিগত উচ্চ-নীচ স্থান নির্ণয় করিয়া দেওয়া ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এবং ঐ রিপোর্টের ৩৪৭ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ ছত্রে লিখিত হইয়াছে—

"... the notion that the census was intended to adjust social distinctions in any way was erroneous."

অতএব যাহা সেন্সাসের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সরলান্তঃকরণে বলিয়াছেন, তাহাই যদি অন্যান্য বিজ্ঞজনের উক্তি দ্বারা পুনঃ পুনঃ সত্যরূপে ফুটিয়া উঠে, তবে সেন্সাস্ হইতে উক্ত অনভিপ্রেত ব্যবস্থাসমূহ পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আর বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের হোম-মেম্বার শ্রীযুক্ত রীড মহোদয়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতিগুলির কি কি অবস্থা এবং অন্যান্য কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে 'তপশীলভুক্ত' করা হইয়াছে তাহা এই উক্তিতে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। যদি তাহা থাকিত তবে আমাদের আলোচনার পক্ষে আরও সুবিধা হইত। তাহা না থাকায় এ সম্বন্ধে সন্দেহই রহিয়া গেল। আর Depressed ও 'তপশীলে'র দ্বারা যদি অন্য কর্ত্তৃক কতকগুলি জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া বুঝিতে না দিবার উদ্দেশ্য থাকে তবে কি ইহাই বুঝিব, যে, ঐ সকল জাতির সামাজিক হীনাবস্থার কথা উহাদিগকেই তীব্রভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে? নতুবা "Mere enumeration"এর মধ্যে "জাতিগুলির অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার" কথা কি করিয়া প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

'তপশীলে'র তালিকা প্রণয়নের বিরুদ্ধে 'প্রবাসী'-সম্পাদকের সুচিন্তিত মন্তব্যের আরও কতকাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। ১৩৪১ সালের মাঘ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তিনি লিখিয়াছেন—

"অবনত জাতিদের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ত্রিশটি আসন রক্ষিত আছে। কিন্তু "অবনত" "তপশীলভুক্ত" জাতির সংখ্যা ৭৭

সাতাত্তরটি। ইহার মধ্যে নমঃশূদ্র ও অন্য দুই-একটি জাতি নিশ্চয়ই প্রত্যেকে একাধিক আসন দখল করিতে পারিবে। কিন্তু উহা না ধরিয়া যদি মনে করা যায় যে, কোন জাতির লোকই একটির অধিক আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা হইলেও কেবল ত্রিশটি জাতির ত্রিশ জন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবে, বাকী ৪৭টি জাতির এক জনও একটি আসন পাইবে না—তাহাদের "জাত যাইবে অথচ পেট ভরিবে না।" সোজা বাংলায় বলিতে গেলে, তাহারা সরকারী তালিকায় "নীচ জাত" ও "ছোট লোক" বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যস্বরূপ প্রলোভনের জিনিষের কোন অংশ পাইবে না।"

"১৯৩১ সালের বঙ্গের সেন্সাস রিপোর্টে দেখিতে পাই, কতকগুলি জাতি ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও অবনতত্ব স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ব দাবী বজায় রাখিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হইবে না, বরং তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষা করিতে ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গতি রক্ষার জন্য অপরের সম্মানভাজন হইবেন।"

'প্রবাসী'-সম্পাদক মহোদয়ের ব্যবস্থিত এই কুইনাইনের বড়িটি গলাধঃকরণ করিতে তপশীল বিলাসীগণের রুচি হইবে কি?

হিন্দু সমাজের কতকগুলি অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত জাতিকে রাজনৈতিক অগ্রগতি প্রদানের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য আন্তরিক হইলেও হিন্দু সমাজ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বুঝায় বা হিন্দু সমাজে হীন ও অস্পৃশ্য বলিয়া তাহারা গণ্য হইতে পারে, এইরূপ কোনও প্রকার আখ্যা দ্বারা (তাহা Depressed, Scheduled বা তপশীল, কি অন্য যাহাই হউক না কেন), তাহাদিগকে অভিহিত করা কোনও মতে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। আর ব্যবস্থা-পরিষদ-মঞ্চও 'বত্রিশ সিংহাসন' তুল্য নহে যে, সেখানে যে-কেহ যাইয়া উপবেশন করিবেন তিনিই রাজনীতিজ্ঞানে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন। 'তপশীলে'র তালিকায় এমন অনেক জাতি আছেন যে, রাজনীতিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে যাঁহাদের আরও অনেক শতাব্দীর প্রয়োজন হইবে। কেবল মাত্র তপশীলদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দর্শাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত ঐ সকল জাতিকে তালিকাভুক্ত করিয়া তালিকাটির বহর দীর্ঘ করিবার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এ কথা শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দবাবুও ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেচারাদের মধ্যে এখনও অনেকে এমন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের হাতে সুচতুর লোকেরা পুনঃ পুনঃ তামাক খাইয়া গেলেও তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। 'তপশীল'দের তালিকা প্রণয়নের এই গূঢ় রহস্যটি সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয়ীভূত।

বর্ত্তমান ১৯৪১ সালের সেন্সাসেও গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বিভিন্ন 'জা'ত' বা শ্রেণী হিসাবে গণনা করিবার ও নূতন নূতন জা'তকে তপশীলের তালিকাভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এবং মুসলমানদিগের অনুরোধে তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আমরা অতীব বিস্ময় বোধ করিতেছি। ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝায় না যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের প্রবল জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান ১৯৪১ সালের আদম-সুমারীর বিবরণীতে যাহাতে পূর্ব্ববর্ণিতরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অপ্রীতিকর ও অশ্রদ্ধেয় বিবরণ এবং উক্তি সকল স্থান না পায়, আর হিন্দুদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি শিক্ষাহীন, অজ্ঞ, নিরীহ জাতিকে অস্পৃশ্য ও অ-হিন্দু প্রভৃতি বুঝাইতে পারে এমন কোনও প্রকার ব্যাখ্যা করা না হয় এবং আখ্যা দেওয়া না হয় (যাহা মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেলায় করা হয় না) তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
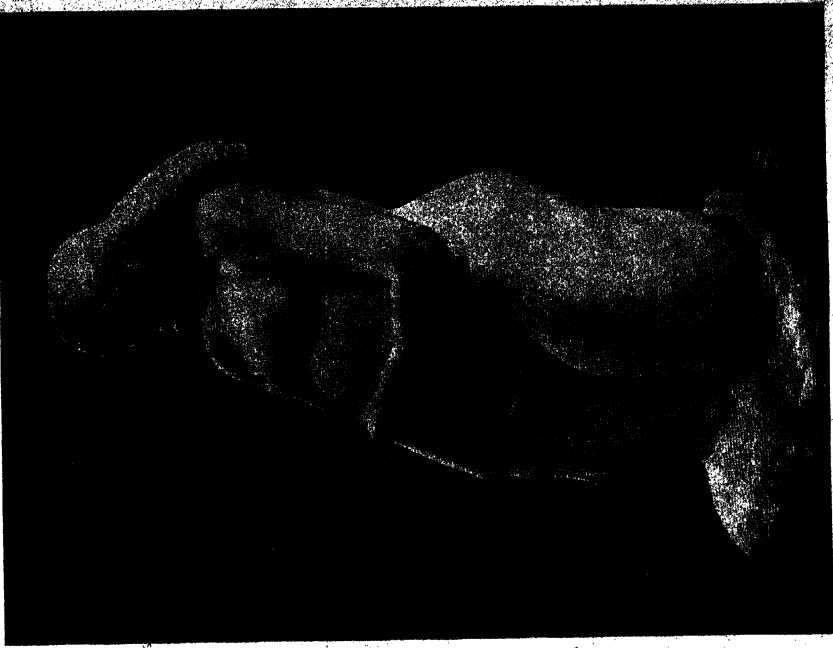
সেণ্ট ফ্রান্সিস —এরিক গিল

সন্তানসম্ভবা —জেকব এপ্‌ষ্টাইন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জেকব এপ্‌ষ্টাইন
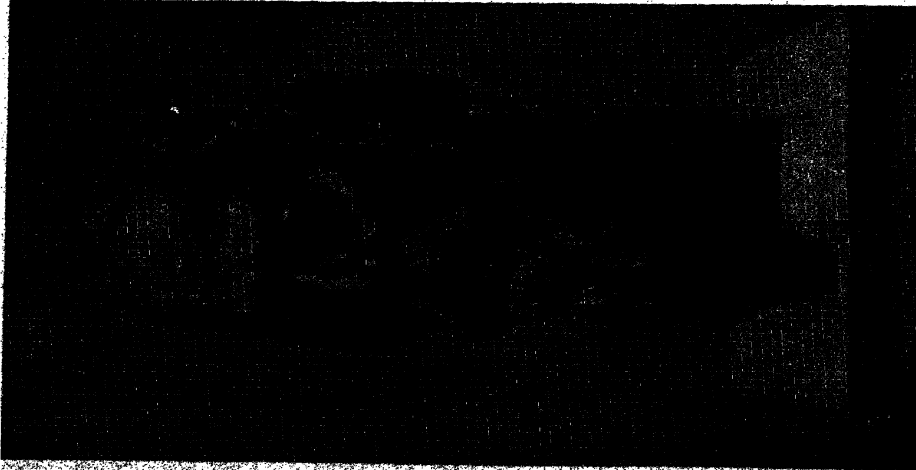
এরিক গিল-কৃত নিজ প্রতিকৃতি (কাঠখোদাই)
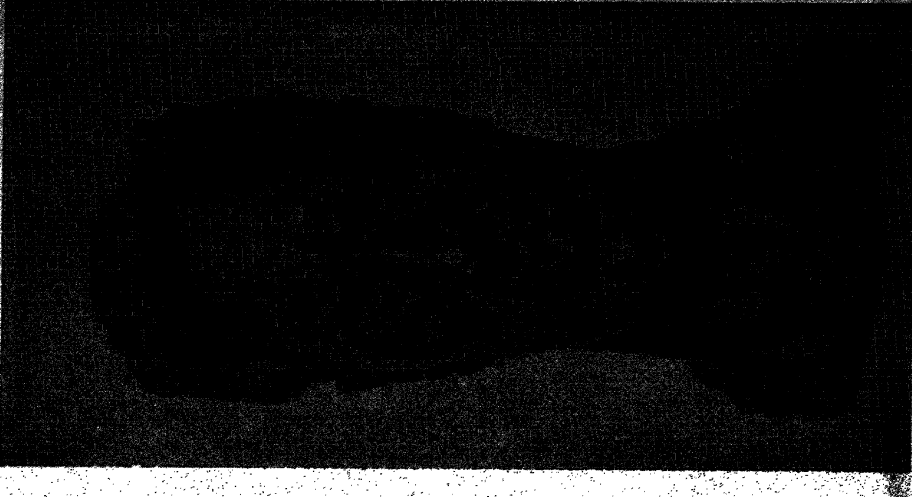
জেকব এপ্‌ষ্টাইন-কৃত নিজ কৃতি

ইংলণ্ডের দুই জন ভাস্কর

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

আর্ট স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী কিলবিল করে—লণ্ডনের ব্লুম্‌স্‌বেরী, চেলসী ইত্যাদি জায়গায় অনেক দাড়িগোঁফওয়ালা আর্টিস্ট ও ভাস্করদের ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে সত্যিকার শিল্পী খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য কাজ। শিল্পীর অন্বেষণকারী চোখ নিয়েও সাবধানী না হ'লে আসল শিল্পী ও শিল্পের সাক্ষাৎ ঘটে ওঠে না।

ইউরোপ ও ইংলণ্ডের শিল্পকেন্দ্র ও আর্ট-গ্যালারি দেখবার উদ্দেশ্যে যখন বার হই, তখন অনেক বিলাত-ফেরত বন্ধুর নানা রকম পরামর্শে জর্জ্জরিত হয়েছিলাম—অনেকে আবার তাঁদের চেনা-জানা ইউরোপের শিল্পীদের পরিচয়পত্র দেবার জন্যও কাতর হয়েছিলেন। খানকয়েক নিয়েও ছিলাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

বোম্বাই শহর থেকে জাহাজে উঠেছিলুম। সেখানে এক সদ্য বিলাত-ফেরত (শিল্পী নয়) ভারতবর্ষের শিল্পীদের সম্বন্ধে নানা অকথ্য গালাগাল দিয়ে উপদেশ দিলেন—"যান্ এক বার—দেখুন সব—মাথা ঘুরে যাবে; কোথায় আপনাদের স্থান বুঝতে পারবেন।"

বন্ধুবরের ভারতবর্ষের শিল্পের উপর ওরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রধান কারণ তিনি নিজের দেশের শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন নি। ইতালীর ভ্যাটিকান বলতে তিনি অজ্ঞান, কিন্তু বোম্বাইয়ের কাছেই এলিফ্যাণ্টা-গুহা যে আছে তার অস্তিত্ব জানা থাকলেও তিনি তা দেখেন নি। "লুভ" বলতে তাঁর কথা ফুরোয় না—দেশের অজন্তা ইলোরার নামই জানেন মাত্র। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় শিল্পের যে উচ্চদরের নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে, তার সঙ্গে যথেষ্ট ভাবে পরিচিত হ'য়ে যদি ইউরোপে যাওয়া যায় তবে চোখে ধাঁধা লাগবার সম্ভাবনা অল্প, মাথা ঘোরা ত দূরের কথা! বিদেশের আর্ট-গ্যালারী ও মিউজিয়ম দেখে এই কথাই বার-বার মনে হয়েছে যে, শিল্পরক্ষার ও সংগ্রহের জন্য যদি ঐ প্রকার অর্থব্যয় করা হ'ত, তবে ভারতের শিল্পের নিদর্শন দেখে পৃথিবীর সব লোকই অবাক্ হ'ত।

মানুষের শিক্ষা প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। সেই শিক্ষার উপর মানুষের পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয় শিল্প, সে কত ক্ষণভঙ্গুর! তা এই যুদ্ধের যুগ ব'লে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

যখন লণ্ডনের আর্ট-গ্যালারি ঘুরে ঘুরে পা ধরে গেছে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো পরিচয়পত্রগুলোর কথা। একটি চিঠি এপস্টাইনের নামে, ঠিকানা দেওয়া—কূলিং আর্ট গ্যালারি, বণ্ড ষ্ট্রীট। চললুম সেখানে—সৌখীন পল্লী—দোকানগুলো অভিজাতবর্গের জন্য। ঢুকলুম কূলিং আর্ট গ্যালারিতে—একটি আধবুড়ো লোক এলেন, তাঁর কথাবলার ভঙ্গী, বেশভূষা অদ্ভুত রকমের, তাক লাগাবার মত। বুঝলুম ছবি বিক্রী করতে হ'লে এ সব শেখার প্রয়োজন আছে। চিঠিখানা দেখিয়ে বললুম এর বাড়ীর ঠিকানা দিতে পারেন?

বললেন, "এপস্টাইন! বাড়ীর ঠিকানা? তিনি ত আজকাল লণ্ডনে নেই!" তার পর যা সব উনি বললেন এপস্টাইন সম্বন্ধে, তাতে মনে করলুম নাই বা হ'ল শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়, তাঁর শিল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করলেই হবে।—এপস্টাইনের গড়া মূর্ত্তির সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়েছিল—টেট গ্যালারি, বারমিংহাম আর্ট গ্যালারি ও লিস্টার আর্ট গ্যালারিতে। আবার শুনলুম কিছু দিনের মধ্যেই লিস্টার আর্ট গ্যালারিতে তাঁর কাজের "One man show" হবে, সুতরাং সেই আশায় রইলুম। পরিচয়পত্রের তাড়া আবার দেখলুম—এরিক্ গিলের নামে একখানা। High-wycombe—সে কোথায়? লণ্ডনের বাইরে। খোঁজ-খবর নিয়ে বের হলুম এক দিন সকালে বাসে ক'রে; সেখানে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেও সেদিন বাড়ী খুঁজে পেলুম না। হেঁটে হেঁটে শুধু হ'ল পা ব্যথা। একখানা পোষ্টকার্ড লিখলুম এবার এরিক্ গিলের নামে। দু-দিনের মধ্যে জবাব এল—তাঁর বাড়ী যাবার রাস্তার নক্সা আঁকা—সময় দিয়েছেন দেখা করবার। চললুম আবার। এবারে ভাগ্যক্রমে কলকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্গে ছিলেন। ধারণা ছিল না তিনি কেমন মানুষ! একটা টিলার উপর বাগান এবং

বাগানের মাঝে পুরনো একটা বাড়ী। ঢুকলুম ঘরে। ঢিলা ধরণের অদ্ভুত পোষাক-পরা সাদা গোঁফদাড়ি চুল-ওয়ালা মানুষটি—বার্দ্ধক্যের দরুনই হোক কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের জন্যেই হোক্ একটু কাহিল লাগলো। কথা-বার্ত্তা সুরু হ'ল। তাঁর স্ত্রী এলেন—চা খাওয়া হ'ল। তার পর তিনি নিয়ে চললেন তাঁর ষ্টুডিওতে। পাথরের মূর্ত্তিতে ভরা, অসমাপ্ত সমাপ্ত নানা রকমের মূর্ত্তি রয়েছে। একটা অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড পাথরে আরম্ভ করেছেন। জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম, জিনিসটা জেনিভাতে লীগ অব নেশুন্স-গৃহের সাম্‌নে বসাবার জন্যে অর্ডারের কাজ। মূর্ত্তির দিকে তাকালুম, তার পর বৃদ্ধের দিকে—তার পর মাটিতে রাখা হাতিয়ারগুলোর দিকে! নানা আকারের হাতুড়ি ছেনি ও অন্যান্য পাথর কাটবার যন্ত্র! ঘরটা পাথরকুচি ও পাথরের ধুলোয় ভরা! দেখলুম, শুনলুম ওঁর কথা। এঁর হাতের মূর্ত্তি ইংলণ্ডের অনেক আর্ট-গ্যালারিতেও দেখেছিলুম। তাঁর ষ্টুডিওতেও দেখলুম। প্রকৃত দক্ষ শিল্পসাধক ব'লে মন মেনে নিল।

এপস্টাইন যে রাস্তা নিয়েছেন, এ সে রাস্তা নয়। এঁর কাজে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়, পরিকল্পনার ভাব পরিস্ফুট। এঁর কাজে মন চঞ্চল হয় না, মনকে স্থির করে। কথাবার্ত্তা শুনে ভারতের অন্যতম শিল্পীগুরু নন্দলালবাবুর কথা মনে পড়ছিল।

জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে শিখতে এসেছ? কোথায় ঢুকেছ—রয়াল কলেজ, না অ্যাকাডেমি। বললুম, "দেখতে এসেছি—কোথাও ঢুকি নি।" বললেন, "ভালো করেছ, তোমাদের শেখাবে কে? তোমাদের কাছে আমরা শিখছি যে।" হঠাৎ নিজের আপিস-ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন, ফাইল ঘেঁটে কি দেখলেন, তার পর বইয়ের গাদা থেকে একটা অ্যালবাম বার করলেন—বললেন, "দেখ, চিনতে পার?" কি আশ্চর্য্য। কলকাতা থেকে কত হাজার হাজার মাইল দূরে কালীঘাটের পট দেখছি যে! অতি সযত্নে রেখেছেন সংগ্রহ ক'রে। বললেন, "এ শিল্প যে-দেশের শিল্পীরা সৃষ্টি করেছে, তারা এখানে কি শিখবে? এখানে এসে মারা যাবে যে! ইংলণ্ড—এ কি শিল্পীর বাসযোগ্য জায়গা?" তার পর খানিকক্ষণ হাসলেন! জিজ্ঞেস করলেন, "ভারতের শিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব কি সত্যিই ভারতের শিল্পকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে? ক্ষতি করছে না কি?" তাঁর দৃঢ় ধারণা ক্ষতিই করছে। তার পর উঠলো এপস্টাইনের কথা। জিজ্ঞেস করলেন, "দেখেছ তাঁর কাজ? তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে?" বললুম, "কাজ দেখেছি, তাঁকে দেখবার সুযোগ হয় নি।" হাসলেন, বললেন, "ঐ এক ভাস্কর আর তার চেলারা"—ব্রোঞ্জে মূর্ত্তি করেন এপস্টাইন—ব্রোঞ্জ হয় না, হয় এপস্টাইন।" নিয়ে গেলেন আর একটা ঘরে—দেখালেন একটা দক্ষিণ-ভারতীয় নটরাজের মূর্ত্তি। বললেন, "এই দেখ, এই হচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি! যাতে ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি হয়েছে—নটরাজ হয়েছে, কোনো শিল্পী-বিশেষ হয় নি।" ওঁর কথার মধ্যে সত্য নিহিত আছে বুঝলুম, তবুও মনে হ'ল সমধর্ম্মীর ঈর্ষা থেকে উনিও নিস্তার পান নি।

* * *

এপস্টাইনের মূর্ত্তির প্রদর্শনী দেখলাম লিস্টার আর্ট গ্যালারিতে। দেড় শিলিং করে ঢোকবার টিকিট—তার পর তালিকার জন্য এক শিলিং। লোকের ভীড়—বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকের! মোট বাইশটি মূর্ত্তি—আবক্ষ মূর্ত্তিই বেশীর ভাগ।

শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম মূর্ত্তি গড়া আরম্ভ হয়, সেই সময় থেকে যে ক'জন বিদেশী ভাস্করের কাজ দেখেছি, তাঁরা খুব নাম-করা না হ'লেও কেউ ফরাসী ভাস্কর বুরদেল-এর ছাত্র, কেউ রোঁদার। সবারই মূর্ত্তি গড়বার এক-একটা স্বতন্ত্র রীতি আছে। কেউ বলেন, মূর্ত্তি গড়তে হয় যখন, তখন তাকে অল্প মাটি থেকে গড়ে তুলতে হবে ক্রমে ক্রমে। ছোট গাছ যেমন বেড়ে ফুলে ফলে ভ'রে সুন্দর হয়ে উঠে, এও তেমনি। সুতরাং মাটি এখানে ওখানে সংযত ও শুদ্ধভাবে লাগিয়ে লাগিয়ে মূর্ত্তি গড়তে হবে, তবেই হবে মূর্ত্তি গড়া। আবার কেউ বললেন, তা নয়, মাটিকে গড়ন দেওয়ার সহজ ও সুন্দর উপায় হচ্ছে—যা করতে চাই তা মনের মধ্যে সুস্পষ্ট যদি থাকে তবে চটপট মাটির পর মাটি চড়াও—পছন্দ না হয় কাট, ছাঁট ক্ষতি নেই। গড়ন দিতে পারলেই হ'ল।

এপস্টাইনের আবক্ষ মূর্ত্তিগুলিতে যা প্রথমেই নজরে পড়ে তা তার গড়বার ধরণ মোটেই নয়—অন্ততঃ আমার কাছে। সাধারণ মানুষ মানুষকে যে চোখে দেখে, সে চোখে উনি দেখেন না, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই জন্যে সাধারণ লোকে হঠাৎ তাঁর গড়া মূর্ত্তি দেখে ব'লে বসেন, "কিছু হয় নি।" এঁর এই এবড়ো-খেবড়ো মূর্ত্তি-গুলোকে কিছুতেই তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। এপস্টাইনের আবক্ষ মূর্ত্তিগুলোকে কিন্তু খুব ভাল ক'রে যদি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, তবে মনে প্রাণে অনুভব করা যায় যে এবড়ো-খেবড়ো ভাব থাকলেও ওঁর

চোখ মানুষটির গড়নের একটি জায়গাও এড়ায় নি। উনি ঈগল পাখীর তীক্ষ্ণ শিকারী চোখ দিয়ে মানুষটিকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত ক'রে তবে ছেড়েছেন। সেই কারণে ওঁর আবক্ষ মূর্ত্তিগুলো বড় বেশী সাংঘাতিক সত্য ব'লে মনে হয় আমার কাছে। সাধারণের দৃষ্টি অত দূর এগোতে পারে না বলেই তাঁরা বুঝতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি এপস্টাইন গড়েছেন। মূর্ত্তিটি সবার চোখে ভাল লেগেছে কি না জানি না। সম্ভবতঃ লাগে নি। হয়ত রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে-চোখে দেখেছিলেন, সে চোখে আমরা দেখি না। মূর্ত্তিটির ফোটো যখন আমি দেখি, আমারও ভাল লাগে নি। ১৯৩৭ সালে আমার রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছা হয় এবং সে ইচ্ছা আমি তাঁর কাছে প্রকাশও করি। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বলেই হয়ত শারীরিক ক্লান্তি সত্বেও উনি রাজী হন। কিন্তু বলেছিলেন, "দেখ্ আমায় কষ্ট দিতে পারবি নে। আমি এই ঘরে ব'সে ছবি আঁকবো, তোকে ঐ কোণে কাজ করতে হবে। আমায় শান্তি দিতে পারবি নে। তার পরে বলবি যে, এদিকে মুখ ফেরান, ওদিকে মুখ ফেরান—তার পর কম্পাস দিয়ে মাপামাপি—সে সব চলবে না।" রাজী হয়েছিলুম, মূর্ত্তিও গড়েছিলুম। মূর্ত্তি গড়বার সময় মাঝে মাঝে যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা আমার মনে দাগা দিয়েছিল। অনেকেই ওঁর মূর্ত্তি গড়েছেন, এবং অনেক বিদেশী ভাস্করদের গল্প বললেন যাঁরা ওঁর মূর্ত্তি গড়েছেন। এপস্টাইনের কথা ও আর একটি তরুণ সুন্দর যুবক ভাস্করের কথা বিশেষ ক'রে বলেছিলেন—তাঁর নাম আমার মনে নেই।

এপস্টাইনের কথায় বললেন, "মূর্ত্তি গড়বার সময়ে সে যেন একটি "এপ" বন্য মূর্ত্তি ধারণ করে—একবার মুখের দিকে তাকায় যেন খেয়ে ফেলবে—তার পর হুঁ হাঁ শব্দ করতে থাকে—আর গড়ে যায়। এক তাল মাটি নিয়ে এপস্টাইনের আর কিছু মনে থাকে না। যা গড়তে চান, তা যতক্ষণ না তাঁর আয়ত্তের মধ্যে আসছে, ততক্ষণ তাঁর আর নিজেকে স্মরণ থাকে না। সেই কারণেই আবক্ষ মূর্ত্তির ভেতর এপস্টাইনের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।"

পাথরের মূর্ত্তি ও পরিকল্পনা যা এপস্টাইন ক'রে থাকেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য অল্প। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি পরিকল্পনার কাজে সফলতা লাভ করতে পারেন নি। নিগ্রো প্রভাব ওঁর সব কাজেই বর্ত্তমান। মিসরীয় ও ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাবও কিছু কিছু ওঁর কাজে দেখা যায়। এই সব প্রভাব ও তাঁর উগ্র বাস্তবপ্রিয়তা মিলে অত্যন্ত জোর করা পরিকল্পনা অত্যন্ত স্থূল হয়ে ওঁর হাতে প্রকাশ পায়। এইখানে তাঁর চেয়ে এরিক গিল ঢের বেশী সফলতা লাভ করেছেন। পরিকল্পনায় ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বজায় রাখতে গেলে চলে না। পরিকল্পনার কাজ তাঁরই সাজে যিনি ভগবানের অফুরন্ত সৃষ্টির ভাণ্ডারকে অন্তরের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করছেন। ভগবানের কাজে পরিকল্পনার শেষ নাই—অফুরন্ত তাঁর রূপ।

বিপ্রলব্ধা

উমা দেবী

—তবে তাই হোক। আজ এইখানে তবে
শেষ হোক আমাদের শেষ আলাপন
শেষ আলাপন প্রিয় তোমার আমার
নির্জন নদীর কূলে এই সন্ধ্যাবেলা।
ভয় নাই—শুধাবো না ভালবাসো কিনা
সজল নয়নে মৃদু কম্পিত অধরে,
—ভাল যদি বেসে থাকি আমিই বেসেছি
উন্মুখ অন্তর মোর বিমুখ অন্তরে
জানাবে না শোনো আর—করুণ প্রার্থনা।

তবু আজ ভিক্ষা চাই এই সন্ধ্যাটুকু
তোমার জীবন হ'তে এটুকু সময়
—তোমার অসংখ্য আছে দিবস রজনী—
কর্মকোলাহলত্রস্ত অসংখ্য দিবস
সম্ভোগবাসনামত্ত অসংখ্য রজনী—
অসংখ্য রজনী দিবা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

—আর—আজ হ'তে মোর নাই রাত্রিদিবা
—রাতের দুঃস্বপ্ন আসি জাগিবে দিবসে

দিবসের আশা মোর ঘুমাবে নিশীথে—
রাত্রিহীন দিবাহীন মোর জীবনের
যতগুলি উষা আছে রহিবে জাগিয়া—
অশ্রুনিপীড়িত মোর নেত্রমণিকায়
যতগুলি সন্ধ্যা আছে মূছিবে আসিয়া—
আজিকার এই শেষ সন্ধ্যার স্মৃতিতে।

আজ আর মৃদুস্বরে মনে করাবো না
মধুর প্রতিজ্ঞাগুলি—যা শুনায়েছিলে
বিমুগ্ধ-মানসে মোর উষায় সন্ধ্যায়
মৃদুল-গুঞ্জন-তানে। সে-সব আজিকে
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি। আমিও ভুলিব
বাসনা-আবেগ-দুষ্ট বচন-বিন্যাসে।
—শুধু এইখানে এস—এই নদীকূলে—
এই নদীকূলে আজ তরুর ছায়ায়—
কোমল-বালুর চরে অলস-ক্লান্তিতে
আজ শুধু বসে রবো আমরা দু-জনে।
দু-জনে বসিয়া রবো শোন প্রিয়তম
এই বালুচরে আজ এই নদীকূলে—
এই সন্ধ্যাটুকু শুধু তরুর ছায়ায়
পাশাপাশি বসি প্রিয় করিব যাপন।

আজ কোনো প্রয়োজন নাই এ প্রশ্নের
মোর সাথে অভিনয় করেছিলে কিনা!
—ভালবেসেছিলে কিনা মোরে কোনো দিন
কোনো বেলা কিম্বা হায় কোনও নিমেষ
সে প্রশ্নও মনে হয় আজ অবান্তর।
লাভ ও ক্ষতির কথা আজ দূরে যাক
পার্থিব ও অপার্থিব লাভ ও ক্ষতির।

এমনি বসিয়া রবো বিজন ভুবনে
দিবানিশীথের মত আমরা দু-জন
—নিশীথের মত তুমি আঁধার কঠিন
দিবার মতন আমি চিরশান্তিহীন:—
কলকল ছলছল কত কথা আসি
তরঙ্গ জাগাবে মোর হৃদয়ের তটে
নির্বাক অধরমূলে লভিবে বিরাম
বিরাম লভিবে তারা নয়নের কূলে।

মনে কি পড়িবে সখা সেদিনের কথা
যেদিন প্রথম তুমি দেখেছিলে মোরে?
কামনা-কুয়াশাচ্ছন্ন নয়নের কোণে
লালসার হিংস্র সর্প গুপ্ত ছিল কিনা
উদ্যত কুটিল ফণা বাঁকায়ে বিদ্রূপে
আজ এত দিন পরে পড়ে নাকো মনে।
তুমি ছুঁয়ে গিয়েছিলে হৃদয় আমার,
—আকাশে একক তুমি ভোরের তারকা,
তোমার নয়নে রাখি আমার নয়ন
প্রথম দেখেছি আমি ভোরের স্বপন।
—কিন্তু যাক—সে কথাও ভুলে যাব আজি
সহস্র রজনী পরে করাবে স্মরণ—
আজ এইখানে শুধু রক্তিম সন্ধ্যার
বিমর্ষ পাণ্ডুর আলো দেখিব দু-জন।

তার পরে?—চলে যাব—। আর ফিরিব না
—ফিরিবার পথ খুঁজে তোমার জীবনে,
যে আমি নিঃশেষ হয়ে গিয়াছি সেথায়
কোন ছল ধরি আর সে ফিরিবে হায়!!

তবু এক দিন যদি ফিরে কভু আসো
জীবনের অপরাহ্নে এই নদীকূলে
সেদিন কি পূরবীর কোমল রেখাবে
বাজিবে না আজিকার ভোরের ভৈরবী
জীবনের তারে তারে, করুণ গুঞ্জনে
মর্মরিয়া মনোতল সজল আবেগে?

অথবা সেদিন যদি নাহি ফিরে আসে
কোনো দুঃখ নাই মনে। শুধু আজিকার
নিস্তরঙ্গ-পাণ্ডু-আলো-ম্লান সন্ধ্যাটুকু
তোমার জীবন হ'তে করি আহরণ
স্থির নদীকূলে নীল তরুর ছায়ায়
হলুদ-বালুর স্তরে আমরা দু-জন
পাশাপাশি বসি প্রিয় করিব যাপন।

ভিতর হইতে বারম্বার আঘাত করিয়া করাতে-পোকা চাক্‌তিখানিকে ক্রমশঃ নীচে ঠেলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে

লাফানো মটর

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কোন কোনও উদ্ভিদ পোকামাকড় ধরিয়া খায়—একথা সকলেই শুনিয়াছেন। আমাদের অনেকে হয়তো উদ্ভিদের শিকার-কৌশল প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। কিন্তু গাছের বীজ মাটিতে পড়িয়া জীবন্ত প্রাণীর মত লাফাইয়া চলে—ইহা কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? না দেখিয়া থাকিলে কেহই হয়তো বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখনও সম্ভব হইতে পারে। আমার একবার লম্ফপ্রদানকারী বীজ স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ লাহা একবার এরূপ কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি সেগুলি দেখাইয়াছিলেন। টেবিলের উপর রাখিবার কিছুক্ষণ পরেই দুই-একটা বীজ লাফাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। দুই-একটাকে ঈষৎ নড়াচড়া করিতেও দেখিলাম। কিন্তু ঈষদুষ্ণ একটা পাত্রে রাখিবার পর প্রায় সবগুলি বীজই খই ফোটার মত এক সঙ্গে লম্ফঝম্প সুরু করিয়া দিল। বীজগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে নিখুঁৎ। কেমন করিয়া তাহারা এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে সেগুলি দেখান হয়। তিনি ইহার রহস্য উদ্ভেদ করিয়া দেন।

আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে সেবাষ্টিয়ানা গণভুক্ত এক প্রকার জংলী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পর ইহাদেরই বীজগুলি লম্ফপ্রদানে যখন তখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। বীজগুলি দেখিতে সাধারণ মটরের মত কিন্তু সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। প্রকৃত পক্ষে মটর না হইলেও আমরা ইহাকে মটর নামেই অভিহিত করিতেছি। বীজের গঠনপ্রণালী আমাদের দেশের আমলকী ফলের বীজের মত। আমলকীর বীজ ভাঙ্গিলে যেমন বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এই লাফানো বীজগুলি সেরূপ বাহিরের দিকে মসৃণ হইলেও ভাঙ্গিলে তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। রোদ লাগিলে অথবা কোন কারণে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলেই বীজগুলি লাফাইতে সুরু করে এবং লাফাইতে লাফাইতে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তভাব ধারণ করে না। গাছের প্রত্যেকটি বীজই যে এরূপ ভাবে লম্ফ-

প্রদান করিতে পারে তাহা নহে, তবে অধিকাংশ বীজই এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকে।

এক সময়ে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক অনেকেই এই বীজের লম্ফপ্রদানের অদ্ভুত ক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বীজের শক্ত খোলার অভ্যন্তরস্থ অতি সামান্য পরিমাণ আবদ্ধ বায়ু রৌদ্রের তাপে আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া বীজটাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, বায়ুর চাপে বীজটা লাফাইয়া উঠিতে পারে না; খোলার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-সমূহের অসমানভাবে উত্তপ্ত হইবার ফলে সঙ্কোচন ও প্রসারণের তারতম্যেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কয়েকটি পরীক্ষায় তাহাদের কোন মতবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। অবশেষে সঞ্চরণক্ষম বীজ কাটিয়া তাহার অভ্যন্তর-ভাগ পরীক্ষার ফলেই এই অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ বীজের লাফাইবার ক্ষমতা থাকিলেও প্রত্যেকটি বীজই সঞ্চরণক্ষম নহে। কিন্তু একথা পূর্ব্বে কেহই জানিত না। কাজেই তখন প্রত্যেকটি বীজকেই সক্রিয় মনে করিয়া দৈবাৎ দুই-একটি নিষ্ক্রিয় বীজ কাটিয়া পরীক্ষা করিবার ফলেই সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ নিষ্ক্রিয় বীজকে সক্রিয় মনে করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগ অনুসন্ধানের ফলে শাঁস ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান মিলে নাই। যাহা হউক, ইহার পরে একটি লাফানো বীজ ভাঙ্গিয়া দেখা গেল—বীজটির ভিতরে ছোট একটি পোকা রহিয়াছে। এই পোকাগুলি "কারপোক্যাপসা সল্‌টিটান্‌স্‌" নামক এক প্রকার মথ্‌-প্রজাপতির বাচ্চা। মটরগুলি যখন খুব কচি অবস্থায় থাকে তখন এই মথ্‌-প্রজাপতিরা এক একটি ফলের গায়ে এক একটি ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চাটি কচি ফলের গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফলের আবরণ অক্ষত রাখিয়া ভিতরের অংশ কুরিয়া খায়। ফলটি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিদ্রও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। উপরের আবরণের কোন অনিষ্ট না হওয়ায় ফলটি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধির অনুপাতে বাচ্চাটিও অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় স্থান করিয়া লয়। ফল পাকিবার প্রায়

মটর-পোকা গুটি বুনিতেছে

লাফানো-মটরের অভ্যন্তরভাগ দেখান হইয়াছে। পোকাটা সুতা বুনিয়া বাসার পত্তন করিয়াছে

মটর-পোকা সূত্রাবরণের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে

অন্যান্য শুঁয়াপোকা হইতে এখানেই ইহাদের একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। খাওয়া শেষ হইলেও ইহারা অনেক পরে পুত্তলির আকার ধারণ করে। কোন কোন প্রজাপতির বাচ্চার পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে মাত্র দুই-এক ঘণ্টা, কাহারও দশ-পনর ঘণ্টা, কাহার আবার পাঁচ-সাত দিন—এরূপ বিভিন্ন সময় লাগিতে দেখা যায়। উল্লিখিত মটরের পোকাদের কিন্তু সুপ্তাবস্থা কাটাইবার জন্য সূতা বুনিয়া কুঠরি নির্ম্মাণ করিতে অনেক দিন অতিবাহিত হয়। তাছাড়া যে সময় মটরগুলি পাকিয়া মাটিতে পড়ে, ঐ সকল অঞ্চলে সে সময়ে সূর্য্যের তেজ

সমকালেই বাচ্চারও খাওয়া শেষ হয়। এখানে একটু বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, প্রজাপতি ও মথের বাচ্চারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকারের শুঁয়াপোকার আকৃতি ধারণ করে। অবশ্য শুঁয়াপোকা বলিলেই যে, সকল জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চারই শুঁয়া থাকিবে—এমন কথা নয়। অনেক প্রজাপতির বাচ্চার শরীরে শুঁয়া থাকে না। সেগুলিকেও আমরা সাধারণতঃ শুঁয়াপোকা বলিয়া থাকি। প্রজাপতি ও মথের বাচ্চাগুলিকে ইংরেজীতে বলা হয়—ক্যাটারপিলার। মটরের ভিতরের বাচ্চাগুলিও এক জাতীয় শুঁয়াপোকা বা ক্যাটারপিলার। কিন্তু ইহাদের গায়ে শুঁয়া নাই। প্রজাপতি ও মথের বাচ্চাগুলি ডিম হইতে বাহির হইয়াই পরিণতবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাতদিনই প্রায় আহারে ব্যস্ত থাকে। তার পর খাওয়া বন্ধ করিয়া পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়। পুত্তলি অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে এবং কিছু দিন পর হঠাৎ এক সময়ে পূর্ণাঙ্গ মথ বা প্রজাপতি রূপ ধারণ করিয়া পুত্তলি হইতে বাহির হইয়া আসে।

মটরটি যখন গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া যায় সেই সময় অভ্যন্তরস্থ পোকাটির শুঁয়াপোকার আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া পুত্তলির আকৃতি পরিগ্রহণ করিবার কথা। কিন্তু

খুবই প্রখর থাকে। মটরের অভ্যন্তরস্থ শুঁয়াপোকা এই উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। কাজেই রোদ লাগিলেই সেস্থান হইতে সরিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে অথচ পুত্তলির আকার ধারণ করিলে আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং পরিণত অবস্থায় উপনীত হইলেও স্বভাবজাত সংস্কারবশেই যেন তাহারা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইতে কয়েক মাস বিলম্ব করে এবং ফলটা যাহাতে লাফাইয়া বা গড়াইয়া রোদ হইতে ছায়াযুক্ত স্থানে গিয়া অবস্থান করিতে পারে সেজন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

লাফানো-মটরের অভ্যন্তরস্থ পোকা

করাতে-পোকা সাইকামোর পাতার গোলাকার অংশটির সবুজ কণিকা নিঃশেষ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ করিয়া তুলিতেছে

বাহিরের সহিত কোন যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও আবদ্ধ পোকাটা বীজটাকে লাফাইয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা করে কেমন করিয়া? মনে করুন, ডিমের খোলার মধ্যে একটি জীবন্ত ব্যাং রাখিয়া ডিমের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। লাফাইতে গেলে ব্যাঙের পিছনের ঠ্যাং দুটি যতদূর প্রসারিত হওয়া সম্ভব, ডিমের অভ্যন্তরে ততটুকু মাত্র স্থান আছে। ব্যাংটা এখন ভিতরে লাফাইতে আরম্ভ করিলে ডিমের খোলাটাও কি সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিবে? ডিমটা নড়াচড়া করিতে পারে, কিম্বা পাশের দিকে ধাক্কা লাগিলে গড়াইয়া যাইতে পারে, কিন্তু লাফাইয়া উঠিতে পারে না। কারণ একই সময়ে নীচের দিকে পায়ের চাপ ও উপরের দিকে ধাক্কায় ডিমটি সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিবে। উভয় দিকের চাপের বৈষম্য না ঘটিলে ডিমের উর্দ্ধগতি সম্ভব নয়। মটরের বেলাও ঠিক এই কথাই খাটে। আবদ্ধ পোকাটার পক্ষেও নীচের দিকে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ আটকাইয়া সোজাসুজি উপরের দিকে ধাক্কা দিলেই বীজটাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করা সম্ভব নহে; তজ্জন্য অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডিমের কথাই ধরা যাক। ডিমের অভ্যন্তরে এক প্রান্তে পাশাপাশি ভাবে সংযুক্ত একটি রবারের ফিতার উপর ব্যাংটা শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া সেখান হইতে উর্দ্ধদিকে লম্ফ প্রদান করিলে ডিমের অবস্থা কি হইবে? দেখা যাইবে, ব্যাঙের লম্ফ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই ডিমটা খানিক দূর উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিল। ইহার কারণ এই যে, লাফাইবার সময় নীচের দিকে যে চাপ পড়ে স্থিতিস্থাপকতাগুণে রবার তাহা সামলাইয়া লয়; পরন্তু উপরের দিকে ধাক্কায় চাপের মাত্রা বেশী হইবার ফলেই ডিমটা লাফাইয়া উঠে। মটরের অভ্যন্তরস্থ শুয়াপোকাও ঠিক এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। মটরটা কাটিলেই দেখা যায়—পোকাটা ফাঁপা স্থানটার চতুর্দ্দিকে সুতা জড়াইয়া একটি আবরণ গড়িয়া তুলিয়াছে। কর্ত্তিত অংশের ভিতর দিয়া আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করিবার জন্য পোকাটা দ্রুতগতিতে সেই স্থলের আস্তরণটাকে আরও পুরু করিয়া তোলে। একটু উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অথবা রৌদ্রে রাখিলে খণ্ডিত বীজও লাফাইয়া দূরে চলিয়া যায়। কর্ত্তিত বীজ হইতে পোকাটার কার্য্যকলাপ যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—মটর-পোকা তাহার শরীরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র সাঁড়াশীর মত যন্ত্রসাহায্যে আস্তরণের সুতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া মস্তকের সাহায্যে উপরের দিকে বারম্বার

সাইকামোর পাতার অভ্যন্তরস্থ সবুজ কণিকাগুলি উদরস্থ করিয়া করাতে-পোকা এক প্রান্তে বাসার পত্তন করিতেছে

চাক্‌তিখানি পাতা হইয়া আলগা হইয়া নীচে পড়িতেছে

ধাক্কা দিতে থাকে। প্রত্যেকবার ধাক্কা দিবার সময়েই মুখ হইতে আঠার মত এক প্রকারের তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা শুষ্ক হইয়া পুঞ্জীকৃত সূত্রে পরিণত হইয়া থাকে। এই পুঞ্জীকৃত সূত্রগুলির উপর ধাক্কা লাগার ফলে পোকাটার মাথায় আঘাত লাগে না, অধিকন্তু তাহা অনেকটা স্প্রিঙের মত কাজ করে। নীচের সূতার স্থিতি-স্থাপকতা ও উর্দ্ধদিকে ধাক্কা এই উভয়ে মিলিয়া মটরটাকে লাফাইয়া উঠিতে সাহায্য করে। ধাক্কার তারতম্যানুসারে মটরটা হয় গড়াইয়া যায়, নয় লাফাইয়া উঠে। মটরটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ছায়াযুক্ত স্থানে না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পোকাটা অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। যত দিন সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর থাকে তত দিন শুয়াপোকার অবস্থায় কাটাইয়া মটর-পোকা পুত্তলির আকার ধারণ করে। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে রূপান্তরিত হইবার পর ফলের আবরণীর ভিতর হইতে যাহাতে সহজে বাহির হইয়া আসিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পুত্তলির আকৃতি পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই সে তাহার ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খোলার গায়ে ছিদ্র করিয়া ঢাকনা বন্ধ করিয়া রাখে। পতঙ্গ সেই ঢাকনা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়।

লাফানো-মটর ছাড়াও লাফানো-চাকতি নামে এক প্রকার সঞ্চরণক্ষম পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি গাছের ফল না হইলেও গাছের পাতা হইতে গঠিত ক্ষুদ্রাকার এক প্রকার চাক্‌তির মত চেপ্টা ও ফাঁপা পদার্থ। এই চাকতিগুলিও এক রকম পোকার বাসগৃহ। অতিরিক্ত উত্তাপ বা রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারাও লাফাইয়া বা গড়াইয়া গিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে অবস্থান করে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সাইকামোর নামে এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের পাতা হইতেই লাফানো-চাক্‌তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাক্‌তি প্রস্তুত করে, ফাইলোটোমা য়্যাকেরিস্ নামে খুব ছোট্ট এক রকম করাতে-পোকা। এই পোকাগুলির শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত একযোড়া যন্ত্র থাকে। যন্ত্র দুইটির শেষাংশ করাতের মত। এই যন্ত্র সাহায্যে উহারা সাইকামোর পাতার প্রান্তভাগে শয়ান ভাবে ছিদ্র করিয়া ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ একটি পাতায় একটির বেশী ডিম পাড়ে না; কিন্তু সময় সময় ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম ফুটিবার পর বাচ্চাটি পাতার উপর ও নীচের আচ্ছাদন চর্ম্ম দুইটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সবুজ কণিকাগুলি খাইতে খাইতে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়। রোদ, বৃষ্টি ও অন্যান্য শত্রুদের ভয়ে বাচ্চারা কখনও পাতার পাতলা ভাঁজের ভিতর হইতে বাহিরে আসে না। আট-দশ দিন পর্য্যন্ত পাতার সবুজ কণিকাগুলি খাইবার পর ইহাদের পুত্তলি অবস্থায় রূপান্তরিত হইবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাহারা পাতা হইতে নামিয়া আসিয়া মাটির উপরেই অবস্থান করে। কিন্তু মাটির উপর অবস্থান করিলেও নিজস্ব বাসগৃহের প্রয়োজন। বিশেষতঃ অনাবৃত শরীরে উপর হইতে নীচে নামিতে পারে না। এই সমস্যা সমাধান-কল্পে তাহারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পাতার অভ্যন্তরস্থ সবুজাংশ খাইতে খাইতে শেষ পর্য্যন্ত যেস্থানে পৌঁছে সেখানেই পোকাটি তাহার শরীরের

চাক্‌তিখানির নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে

চাক্‌তিখানি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে

পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সাঁড়াশীর মত ক্ষুদ্র যন্ত্রসাহায্যে একটি স্থান আঁকড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। পরে সেই কেন্দ্রস্থলে সংলগ্ন থাকিয়াই চতুর্দ্দিকে মুখ ঘুরাইয়া সুতীক্ষ্ণ চোয়ালের সাহায্যে পাতার উপরের দিকের পর্দ্দাটাতে বৃত্তাকারে পর পর কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দেয়। ছিদ্র করিবার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর উপরে ও নীচে সূতা বুনিয়া একটি আবরণ নির্ম্মাণ করে। উপরের দিকের আস্তরণটি পাতলা এবং পাতার সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু নীচের আস্তরণটি অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত হইলেও পাতার পর্দ্দার সহিত সংলগ্ন নহে। আঠার মত পদার্থ ও সূত্র সাহায্যে নির্ম্মিত চাক্‌তির নীচের দিকের আস্তরণটি স্প্রিঙের মতই নমনীয়। পোকারা এই নমনীয় আস্তরণটিকে ছিদ্রবেষ্টিত উপরের পর্দ্দার গোলাকার অংশের সহিত নিখুঁৎ ভাবে জুড়িয়া দেয়। এই গোলাকার অথচ চেপ্টা কুঠুরির মধ্যেই পোকাটাকে মাটির উপর কিছুকাল বাস করিতে হইবে। কিন্তু বাসাটা তখনও পাতার সঙ্গেই সংযুক্ত, মাটিতে নামিয়া আসিবে কেমন করিয়া? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আস্তরণ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বেই পোকাটা কেন্দ্রস্থলের চতুর্দ্দিকে মুখ ঘুরাইয়া বৃত্তাকারে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া রাখিয়া দেয়। আস্তরণ নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর নীচের মেঝের সূতা কামড়াইয়া ধরিয়া পোকাটা শরীরের পশ্চাদ্দেশের সাহায্যে বারংবার উপরের পর্দ্দার ছিদ্রযুক্ত অংশে আঘাত করিতে থাকে। একটু দূর হইতে এই আঘাতের খুট্ খুট্ শব্দ কানে শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ এরূপ আঘাত দিবার পর গোলাকার কর্ত্তিত অংশটা পাতা হইতে আল্‌গা হইয়া গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। বিচ্ছিন্ন চাক্‌তিটার উপরে থাকে পাতার অংশ ও নীচের দিকে থাকে জমাট সূতার আবরণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারাও রৌদ্র ও উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লাফাইয়া বা গড়াইয়া ছায়াযুক্ত স্থানে চলিয়া যায়। কিন্তু মটর ও চাক্‌তির লম্ফ প্রদানের কৌশলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। মটরের পোকা মস্তকের ধাক্কায় বীজটাকে উপরে ঠেলিয়া দেয়, চাক্‌তির পোকা পাতার দিকটায় সূতা কামড়াইয়া ধরিয়া শরীরের পশ্চাদ্দেশের সূক্ষ্ম সাঁড়াশীর সাহায্যে নীচের নমনীয় আবরণটিকে ভিতর দিকে টানিয়া লইয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দেয়। ইহার ফলে আস্তরণটা স্প্রিঙের মত ব্যবহার করে এবং সেই ধাক্কার ফলেই চাক্‌তিখানি ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠে। টানের তারতম্যানুসারে চাক্‌তি খানি এপাশে-ওপাশে গড়াইয়া যায় কিম্বা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

এ কোন দেশ ?

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

ভোর রাত্রে নিখিলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সবে কাল বিকালে সে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। এখান হইতে আধ মাইলের ভিতরে যে মাটিটুকু—তাহারই উপরে যে মানুষ কয়টি ঘর বাঁধিয়া আছে তাহারাই তাহার এই বন্দী-জীবনের একমাত্র বান্ধব। ইহার বাহিরের এতটুকু জমির উপরেও তাহার পা বাড়াইবার অধিকার নাই। কাল বিকালে এখানে পৌছিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিতেই তাহার অবশিষ্ট বেলাটুকু কাটিয়া গিয়াছে। কাহাদের লইয়া তাহাকে বসবাস করিতে হইবে, সে খবরটুকু লইবারও তাহার সময় হয় নাই।

নিখিল ঠিক করিয়াছে, আজ সকালে উঠিয়াই তাহার সীমানা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখিবে। সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রয়োজন এক জন চাকরের—যে তাহার পাক করা হইতে জুতায় কালি দেওয়া পর্য্যন্ত অম্লান বদনে করিয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে যেখানে সে ছিল, সেখানে এই পাকের জন্য কি হাঙ্গামাই না তাহাকে পোহাইতে হইয়াছে! তবু যা হোক সেখানে তাহার মত আরও দুই-তিন জন 'ডেটিনিউ' ছিল—অসুবিধাটা ভাগাভাগি করিয়া হইত। এখানে সে একা। একটা ভাল চাকর না জুটিলে কি অপরিসীম কষ্টেই না পড়িতে হইবে। কাল বিকালে সে এখানে আসিবার পর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ফীতোদর একটি লোক আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে—সে কাল সকালেই খুব ভাল একটি লোক তাহাকে দিবে—তাহাকে দিয়া তাহার সমস্ত কাজই নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে এখানে যে 'ডেটিনিউ' ছিলেন, তিনিও নাকি তাহাকে দিয়াই তাঁহার সমস্ত কাজ করাইয়া লইতেন।

ফাল্গুন মাসের সপ্তাহখানেক চলিয়া গিয়াছে—শেষ রাত্রের দিকে এখনও বেশ একটু মিঠেকড়া শীত পড়ে। নিখিল গায়ের উপরে একখানা কম্বল ঢাকা দিয়া এই সব ভাবিয়া চলিয়াছিল। এতক্ষণে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে—জানালার পাশে একটি আমগাছ কাত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারই একখানা ডাল জানালার ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে আর কি। এই ভোর হইতেই মৌমাছির দল আমের মুকুলের চারি পাশ ঘিরিয়া মৃদু গুঞ্জন তুলিয়াছে। পাশের বাগানের কি একটা গাছ হইতে কুহু কুহু করিয়া একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল—নিখিলের হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। গত ফাল্গুন মাসের কথা—তাহাদের বাড়ীর পিছনের আমবাগান হইতে এমনি করিয়া কোকিল ডাকিয়া উঠিত—ভোরবেলায় আধজাগ্রত, আধঘুমন্ত অবস্থায় কি ভালই না লাগিত তাহার! তাহার ছোট বোন রিনি লেপের ভিতর থাকিয়াই 'কুউ কুউ' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। এই সব ভাবিতেই সঙ্গে সঙ্গে মা, বাবা, ছোট ভাই অখিল, রিনি সকলের মুখ তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। আজ একটা বৎসর কাহারও সহিত তাহার দেখা নাই—পূরা একটি বৎসর করিতেছে সে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন। ব্যথায় সারা বুকটি তাহার টন্ টন্ করিতে লাগিল।

—বাবু!—বাহির হইতে হঠাৎ কে ডাকিয়া উঠিল। নিখিল বালিশ হইতে মাথা উঁচু করিয়া বলিল—কে? ভেজান দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল একটি যুবতী—হাতে তাহার এক কাপ চা। নিখিল কিছুই বুঝিতে পারিল না—এ মেয়েটিই বা কে—চা-ই-বা সে আনিল কোথা হইতে—কাহার জন্য। মেয়েটি পুনরায় অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিল—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে বাবু!

নিখিলের কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটিল না—আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিয়া উঠিল—চা খাব মানে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কাল আপনি লোকের কথা বলেছিলেন না? তাই তো ভোর হ'তেই আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বন্দীবাবুরা তো সবাই চা খান, আগের বাবুও এমনি খেতেন—এ-সব তিনিই আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

নিখিল এতক্ষণে বুঝিতে পারিল—কালিকার সেই লোকটি ইহাকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু এমনি একটি যুবতী মেয়েকে যে তাহার কাজ করিবার জন্য ঠিক করা হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

—আমরা বাবু, জাতে পোদ্—বন্দীবাবুরা তো জাত

মানেন না—আগের বাবুর পাক্‌শাক্‌ সব আমিই ক'রে দিতাম।

নিখিল তাহার হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া বলিল—না, জাত আমিও মানি নে—পাকটাক্‌ যা হয় তুমিই করো।

শূন্য চায়ের কাপটি নিখিলের হাত হইতে লইয়া মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিখিল পুনরায় কম্বলখানি গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এই মেয়েটিকে লইয়া নিখিল খানিকটা চিন্তার খোরাক পাইল—মেয়েটি দেখিতে তো মন্দ নয়—রং তেমন পরিষ্কার নয়—তবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ দুইটি বেশ। বড় বড়—এই চোখ দুইটিতেই মেয়েটির চেহারাখানি যেন খুলিয়া গিয়াছে। বয়স তাহার বেশী হইলেও বছর কুড়ি হইবে। কিন্তু এই মেয়েটি সেই লোকটির কে? হয়ত বা দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হইবে।

এতক্ষণে বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। জুতা মস্‌ মস্‌ করিতে করিতে একটি সিপাহী তাহার ঘরের কাছে আসিয়া ডাকিল—নিখইল বাবু—এ নিখইল বাবু, আপ্‌কো দারোগা বাবু বোলাতা হ্যায়।

নিখিল ঠোঁট মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল—বাবুকো বোলো যাতা হ্যায় হাম।

তার পর কম্বলখানি গা হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

২

থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল দেখিল, কালিকার সেই লোকটি রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিয়া মেয়েটির সহিত কি গল্প করিতেছে। নিখিলের সাড়া পাইয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উবু হইয়া নিখিলের পায়ের উপরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল—"কেমন বাবু, লোক পছন্দ হ'ল তো?" এই লোকটির ভক্তির আতিশয্য নিখিলের নিকট মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কিন্তু মেয়েছেলের পক্ষে তো সব কাজ করা সম্ভব হবে না।

—কেন হবে না বাবু? দেখবেন ও দু-দিনের ভিতরেই সব ঠিক ক'রে নেবে। আগের বুড়ো বন্দীবাবু ওকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। রান্না করা, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, হাট-বাজার করা—দরকার হ'লে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে অসুখ-বিসুখে হাত-পা টিপে দেওয়া সব এক হাতে ক'রে যাবে। এমন লোক আর একটিও আপনি এ মুলুকে খুঁজে পাবেন না—তা বলছি।

নিখিল অবাক্‌বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—লোকটি বলে কি? এই যুবতী মেয়েটিকে দিয়া দরকার হইলে সে হাত-পা টিপাইয়া লইবে?

—কিন্তু মেয়েটি তোমার কে হয় তা তো বল নি?

লোকটি এবার যেন একটু লজ্জা পাইয়া হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু উটি আমার পরিবার।

—পরিবার?

—"হাঁ বাবু আমার ইস্তিরি।" নিখিল পুনরায় লোকটির সারা দেহের উপরে ভাল করিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া লইল—বয়স তাহার কত হইয়াছে ঠিক অনুমান করা শক্ত—ম্যালেরিয়ার বীজাণু স্থায়ীভাবে তাহার সারা দেহের একেবারে অণু-পরমাণুতে পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। সমস্ত দেহের মধ্যে উদরটি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, পাঁজরার হাড়গুলি দৃষ্টি বুলাইলেই গণিতে পারা যায়, মাথাটি দেহের তুলনায় অত্যন্ত ছোট বলিতে হইবে, তাহাও আবার কেশবিরল, অসুখের জন্যই বোধ হয় স্থানে স্থানে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কত দিন হইতে লোকটি যে এমনি চেহারা লইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর দিন গণিতেছে তাহা কে বলিবে? কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া চোখ-মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া কে বলিবে যে তাহার কোন অসুখ আছে? তাহার চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেই নিখিলের মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল—এই কদাকার লোকটি মেয়েটির স্বামী!

তার পর লোকটি উঠিয়া বলিল—তাহ'লে এখন আসি বাবু—মাইনে আপনি যা দেবেন তাই স্বীকার। দু-দিন গেলেই দেখবেন বাবু—এ ছিরিমন্ত হাজরা মিথ্যে বলে নি।—বলিয়া আর এক বার গড় হইয়া প্রণাম করিয়া লোকটি বিদায় হইল।

নিখিল কাপড় জামা লইয়া তাহার সীমানা পর্য্যন্ত গ্রামটি ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাহির হইতেছিল এমন সময় মেয়েটি আসিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছেন বাবু, একেবারে স্নান খাওয়া সেরে বেরুবেন।

নিখিল তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমি রান্না সব শেষ কর ততক্ষণ, আমি এই একটু বাদেই ঘুরে আসছি।

—তা কেমন ক'রে হবে বাবু—সকাল বেলা শুধু এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খান নি—আর এখন বেলাও বোধ করি দশটা হ'ল—তা ছাড়া এদিকে আমার রান্নাও
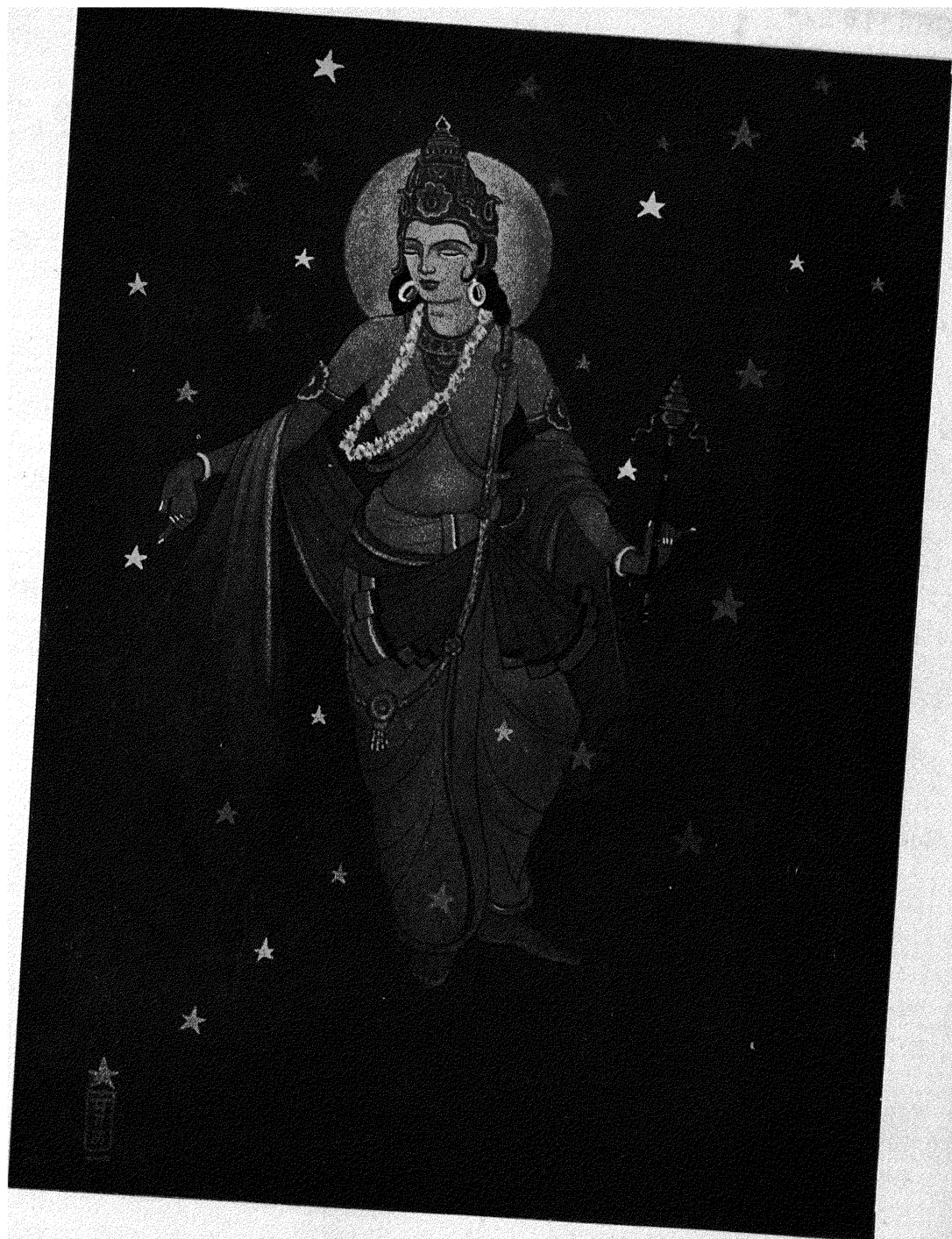
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মালকোষ
কুমার মঙ্গল সিংজী (লাঠী)

সব শেষ হয়ে গেছে—জল তুলে রেখেছি, চট্ ক'রে স্নানটা সেরে নিয়ে চাট্টি খেয়ে নিন্।

নিখিল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বেশ তাই ভাল।" শ্রীমন্ত হাজরা মিথ্যা কথা বলে নি—মেয়েটি সত্যই কাজের—এই বেলা ১০টার মধ্যে চা করিয়াছে, বাজার করিয়াছে, রান্না শেষ করিয়া তাহার জন্য স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়া, ইহারই মধ্যে তাহাকে তাগিদ দিতে আসিয়াছে।

আহারে বসিয়া নিখিলের চোখ জুড়াইয়া গেল—দিব্যি সরু রূপশাল চালের ভাত, তা ছাড়া ভাজা, ঘণ্ট, তরকারি, এই সবই চার-পাঁচ রকম—বাটিতে প্রকাণ্ড একটা গল্দা চিংড়ী, সর্ব্বোপরি অন্য একটি বড় বাটিতে প্রায় আধ সের খানেক গরম দুধ,—এই সমস্ত অতি যত্নে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া, সে তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে। এমনি করিয়া আজ একটা বৎসর নিখিলকে কেহ খাইতে দেয় নাই। এই একটা বৎসর বন্দী-নিবাসে চাকরের রান্না নিতান্ত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে হইয়াছে মাত্র।

—অত দুধ আমি কিছুতেই খেতে পারব না কিন্তু। খানিকটা তুলে রাখ।

—অত কোথায়, মোটে আধ সের ক'রে যে দুধের যোগান নিয়েছি—আগের বুড়োবাবু তো এক রকম দুধ খেয়েই থাকতেন।

—তা হোক তবু রাখ খানিকটা তুলে।

—তা কেমন ক'রে হবে বাবু?

নিখিল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

মেয়েটি গম্ভীর হইয়া বলিল—দুধ সামনে দিয়ে তুলে নিতে নেই—তাতে অকল্যাণ হয়।

নিখিল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—বেশ কথা তো, তা হ'লে পেটে না ধরলেও খেতে হবে?

মেয়েটিও হাসিয়া বলিল—আপনি খান, পেটে ঠিক ধরবে।

খাইতে খাইতে নিখিল মেয়েটির চোখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—কিন্তু একটি কথা—তোমার নামটি তো জানা হয় নি—ডাকবো কি ব'লে?

মেয়েটি মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল—আমাকে রাধা ব'লে ডাকবেন।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া নিখিল গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। থানার সম্মুখ দিয়া একটি প্রশস্ত রাস্তা রেল-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তারই দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ—মাঠের দক্ষিণ সীমানায় একটি জল-নিকাশের খাল, দক্ষিণ হইতে গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে বহিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার শেষ সীমায় খালের ধারে একটি হাট। মাস দুই হইল ধান কাটা শেষ হইয়াছে—ধান-ছোপের গোড়াগুলি খাড়া হইয়া সারা মাঠ জুড়িয়া আছে। নিখিল জীবনের বহু দিন পল্লীগ্রামেই কাটাইয়াছে—জমি ভালমন্দ সে চেনে—মাঠে নামিয়া জমির একটা ফাটলের মধ্যে সে হাত ঢুকাইয়া দিয়া খানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল—বেশ এঁটেল মাটি তো? এ জমিতে নিশ্চয়ই খুব ভাল ফসল দিবে—তার পর ধান-ছোপের গোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া সে স্থিরনিশ্চয় হইল। রাস্তার ধারে ধারে কপি, বেগুন, আলু প্রভৃতি সবজির চাষ হইয়াছে। বেগুন, সে এত বড় ইহার পূর্ব্বে দেখে নাই—কপিগুলি সতেজে বাড়িয়া উঠিয়াছে—দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। খালের ধার দিয়া শুধু কৃষকদের বস্তি। নিখিল দূর হইতে দেখিল; আজ আর বেলা নাই বলিয়া ওদিকটা যাইতে পারিল না।

এখানকার কৃষকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রমী—মাঠের অবস্থা দেখিয়াই নিখিল তাহা অনুমান করিয়া লইল।

হাটটি ছোট, দোকানপশার বড় বিশেষ কিছু নাই—সকাল হইতেই বাজার বসে, আবার দশটার ভিতরে ভাঙিয়া যায়।

নিখিল বাসায় ঢুকিতেই শুনিতে পাইল—রান্না ঘরের মধ্যে রাধা ও শ্রীমন্তের কিসের যেন বচসা সুরু হইয়াছে—শ্রীমন্তের কণ্ঠস্বর উঠিয়াছে একেবারে উগ্র হইয়া—"তুই দিবি না কেন শুনি—তোর এত মাথাব্যথা কিসের? এক হাতা দুধ দিলে বাবু অমনি দেখতে আসবে আর কি? নিখিল কাসিয়া শব্দ করিতেই শ্রীমন্ত গলা বাড়াইয়া তাহাকে দেখিয়াই একেবারে দাঁতে জিব কাটিল—তার পর চাপা গলায় রাধাকে বলিল—এই চুপ কর বউ, বাবু এসেছেন। শ্রীমন্ত সুড়সুড় করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, একেবারে নিখিলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

—তোমাদের এতক্ষণ ধরে ঝগড়া চলছিল কিসের শ্রীমন্ত?

—ঝগড়া নয় বাবু। আজ সকাল থেকে সারাটা দিন গা ভাল নাই—মুখটায়ও হয়েছে এমন অরুচি যে ও ক্ষুদের জাউ আর মুখে তুলতেও ইচ্ছে করছে না—তাই ওকে বলছিলাম কি—এক হাতা দুধ দে, বাবুর দুধ থেকে,

এবেলা চাট্টি ক্ষুদের মুড়ির সঙ্গে তাই খেয়ে থাকি। তাই নিয়ে ঝগড়া—ও কিছুতেই দেবে না—বলে বাবু শুনলে কি মনে করবে। আমি বললাম—তুই বলিস কি, এরা কি যে-সে বাবু যে কিছু মনে করবে?—আগের বাবু থাক্‌তে কত দিন এখানে ভাত খেয়ে গেছি।

—বেশ এবেলা এখানেই আজ খেয়ে যেও। তার পর নিখিল ঘরের ভিতরে রাধাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—চাট্টি বেশী করে চাল নিও রাধা, শ্রীমন্ত আজ এখানেই খাবে। আনন্দে ও উৎসাহে শ্রীমন্তের সারা দেহ যেন নাচিয়া উঠিল—চোখ দুইটি উঠিল উৎফুল্ল হইয়া।

—কত দিন ভাত খাই নি বাবু—ভাতের স্বাদটাই বুঝি ভুলে গেছি, চাল চাট্টি বেশী করেই নিস্ বউ।

—কত দিন খাও নি মানে?

—কত দিনই তো খাই নি বাবু।

—তবে খাও কি?

—কেন ক্ষুদের জাউ খাই।

—রোজ ক্ষুদের জাউ খাচ্ছ?

—তবে কি?

আশ্চর্য্য! রোজ রোজ ক্ষুদের জাউ খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে কখনও! নিখিল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল। কথা শুনিয়া খানিক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—আপনি বলছেন কি বাবু—এ কি শুধু আমি খাচ্ছি, আমাদের দেশসুদ্ধ যে সব্বাই খাচ্ছে।

"সব্বাই খাচ্ছে?"—হাঁ, এ কি কল্‌কাতা শহর যে মানুষ দু-বেলাই ভাত খাবে? এখানে সব্বাই এক বেলা ক্ষুদের জাউ আর এক বেলা মুড়ি খেয়ে থাকে। ভাত? সে তো বড়মানুষী খাওয়া, তবে মাঝে সাঝে এক আধ বেলা যে সখ ক'রে আমরাও না খাই তা নয়। নিখিল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ভাবিল—এ বলে কি?

—তোমাদের দেশের এত চাল তবে যায় কোথায়?

শ্রীমন্ত হাসিয়া বলিল—এইবার হাসালেন বাবু! চাল কোথায় যায় তা আপনি দেখেন নি বুঝি? ঐ যে টোল দারোগার খাল, ওরই পূব দিক ধরে গেলে পাবেন সারি সারি তিন-চারটে চালের পাইল। একটা সাহেব কোম্পানীর, একটা মাড়োয়ারী ভাইয়াদের, আর একটা ওলন্দাজ আর একটা গুজরাটী, এই চারটিতেই সব চাল সাবাড় ক'রে নেয়।

—চালের পাইল বলে কাকে?

—সব রকমের চাল সেখানে কিনে নিয়ে দুই তিন রকমের চাল একসঙ্গে মিশিয়ে নূতন এক প্রকার পদের চাল তৈরি করে, তার পর বস্তাবন্দী হ'য়ে সেগুলো যায় কলকাতায় আরও বড় বড় শহরে।

—চাল তোমরা বেচ কেন?

শ্রীমন্ত পুনরায় হাসিয়া বলিল—আপনি কি ছেলেমানুষ বাবু! টাকা পাই যে!

—তাই ব'লে নিজের খাবার বেচে টাকা?

—শুধু খেলেই কি হ'ল বাবু, সংসারে আর খরচ নাই! মহাজন নাই, ধার তাদের শুধবো কি ক'রে?

—কেন অন্য ফসল করতে পার—আলু, কপি বেগুন?

—আপনি কিছুই জানেন না বাবু। জমিদার ধান চাষ ভাগীদার দিয়ে করিয়ে নেয়; তার পর অন্য ফসলের বেলায় আবার তাগিদের জন খাটায়, মুজুরি আপখোরাকী মোটে আটদশ পয়সা। কারো এক ছটাক জমি নেই। জমিদারের উপরেই সব নির্ভর। ধানের সময় তাদের খামারে গিয়ে ধান করতে হবে, গোলায় গিয়ে ধান মাড়িয়ে ঝেড়ে, উড়িয়ে, তুলে দিয়ে নিজের বাকীটা বাড়ীতে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। বছরের বাকী সময়টা আর চাষাদের কাজ কি? চুরিটুরি করে, মাছ ধরে, তাড়ি খায়। কারো ভাগ্যে সপ্তাহে দুই-এক দিন হয়ত জমিদারের সবজি-ক্ষেতে কাজ জোটে। এরা ক্ষুদ খাবে না তো কি রূপশাল চালের ভাত খাবে? এক টাকার ক্ষুদে যদি যায় এক মাস তো চালে যাবে পনর দিন। এক বেলা ক্ষুদের জাউ আর অন্য বেলা ক্ষুদের মুড়ি—এই তো এখানকার চল্‌তি খাবার। আর সত্যি কথা বলতে কি বাবু, রোজ রোজ ভাত খাওয়া অত বাবুগিরি দিয়েই বা আমাদের দরকারটা কি? ক্ষুদের দরটা একটু কম থাকলেই আমরা বেঁচে যাই।

—এত ক্ষুদ আসে কোথেকে?

—ওই পাইলওয়ালারাই রেঙ্গুন থেকে আনে। চাল কেনে, ক্ষুদ বেচে। তাই ভাবি বাবু ঐ ওরা যদি এখানে এসে না বসতো ক্ষুদ আমাদের যোগাতো কে? বাঙালীর কি শক্তি হতো সেই কোন্ রেঙ্গুন থেকে ক্ষুদ নিয়ে আসে?

এই নির্ব্বোধ ও মূঢ়কে কি বলিয়া বুঝাইবে, নিখিল ভাবিয়া পাইল না। এই সব বিদেশী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারীদের তুলনায় বাঙালী জাত যে অতি নগণ্য, ইহা তাহারা একেবারে নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া লইয়াছে। দুই বেলা ভাত খাওয়াটা যাহাদের নিকট বাবুগিরির সামিল, ক্ষুদের দর একটু কমিলেই যাহারা সন্তুষ্ট—এই সব মানুষ আর কয়েকটা ধাপ নামিলেই তাহাদের সহিত আর পশুর কোনই প্রভেদ থাকিবে না—তাহাদের

কথা চিন্তা করিয়া নিখিলের সারা মন একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেল। বাংলা দেশের অনেক জায়গায় সে ঘুরিয়াছে। এ দেশের কৃষক সারা বৎসর রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া দু-মুঠো পেট ভরিয়া অন্ন পায় না, ম্যালেরিয়ায় ঔষধ পায় না, ইহা সে জানে। কিন্তু যাহারা গায়ের রক্ত জল করিয়া ধান জন্মাইবে, তাহাদের একদানা চাউলের অন্নও মুখে তুলিবার অধিকার নাই ; ইহা তাহার একেবারে কল্পনার অতীত। অথচ এই সুন্দর ও সরু রূপশাল চাউলের অন্নের ছড়াছড়ি যাইতেছে শহরে শহরে, ধনীর অট্টালিকায় অট্টালিকায়। আর ইহারা চাহিয়া থাকিবে সুদূর রেঙ্গুনের দিকে, কবে সেখান হইতে মানুষের অব্যবহার্য্য ক্ষুদ এখানে আসিয়া সস্তায় বিকাইবে তাহার আশায়। ইহারাই নিখিলের প্রতিবেশী, ইহাদের লইয়াই তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। রাত্রে আহারে বসিয়া তাহার সমস্ত ভোজনের আনন্দ ও তৃপ্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৩

নিখিলের বাসার সম্মুখের রাস্তাটি ভোর হইতেই একেবারে জনমুখর হইয়া উঠে। সে সকাল বেলা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল ভারে ভারে, গরুর গাড়ীতে গাড়ীতে বোঝাই হইয়া কপি, বেগুন প্রভৃতি নানা শাকসবজি হাটে চলিয়াছে। নিখিল অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকে পা চালাইয়া দিল—হাটে আসিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, এতটুকু ক্ষুদ্র হাটে যে এত শাকসবজির আমদানী হইতে পারে এইটাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু হাটটির আর একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাধারণ হাটের মত না আছে তেমন হৈ চৈ, না আছে ক্রেতা-বিক্রেতার তেমন ভিড় ; এখানে যাহারা ক্রেতা তাহারা সকলেই ব্যাপারী, যাহারা বিক্রেতা তাহারা সকলেই ধনী জমিদারের কর্ম্মচারী। আর যাহারা দ্রব্যাদি বহিয়া আনিতেছে তাহারা সকলেই মুটে মজুর, হাটে যত জিনিস আসিতেছে, ব্যাপারীরা সব কিনিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিতেছে।

রাত্রের গাড়ীতে সব সবজি কলিকাতায় চালান যাইবে। নিখিল সারা হাট ঘুরিয়া দেখিল এখানে স্থানীয় ক্রেতা বড় একটা নাই, থাকিলেও তাহার পক্ষে জিনিসপত্র কেনা এক অসম্ভব ব্যাপার, কারণ ভাল কোন জিনিস কেহ ব্যাপারী ছাড়া অন্য কাহাকেও বেচিতে চায় না। মাছের বাজারে প্রচুর গল্‌দা চিংড়ী, তপ্‌সে আমদানী হইয়াছে কিন্তু সেখানেও ব্যাপারীতেই সব কিনিতেছে। নিখিল অন্যমনস্কভাবে এই সব দেখিতেছিল, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই ফিরিয়া দেখে পাশের জেলেটির সঙ্গে রাধা তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। জেলের ঝাঁকার ভিতরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ী, সে খুচরো কিছুতেই বেচিবে না, অথচ রাধা নাছোড়বান্দা—যে দাম হউক সে কিনিবেই। সকলের অলক্ষিতে নিখিল সেখান হইতে সরিয়া গেল।

হাট ততক্ষণে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিখিল ধীরে ধীরে রাস্তা বাহিয়া অন্যমনস্কভাবে বাসার দিকে চলিতেছিল, কাল শ্রীমন্তর নিকট হইতে ইহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আজ সারা হাটময় ঘুরিয়া তাহার মন বাস্তবিকই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এই যে রাশি রাশি ধান ইহার একদানা তাহারা পাইবে না—এত যে স্তূপীকৃত শাকসবজি তাহার সবটাই কলিকাতায় যাইবে চালান হইয়া, ইহারা তবে কি খাইয়া বাঁচিবে ?

বিকালবেলা নিখিল বেড়াইবার জন্য ঘরের বাহির হইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে এক ভদ্রলোক ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন,—"নিখিলবাবু, নিখিলবাবু, আরে এই যে আপনিই নিখিলবাবু নিশ্চয় ? নমস্কার !" নিখিল প্রতি-নমস্কার করিয়া একটু অবাক্ হইয়া লোকটির মুখের দিকে তাকাইল।

—আমি এখানকার চেরিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তার।

—তাই নাকি, বেশ আসুন বস্‌বেন।

ডাক্তারটি নিখিলের বিছানার উপর বসিয়া বলিল—বেশী বসা-টসা ভাল নয় মশাই, জানেন তো আপনারা কি বিপজ্জনক লোক !" বলিয়া নিজের রসিকতায় হা হা করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইয়া পুনরায় গলা খাটো করিয়া বলিল—যত খাতিরই থাক, ও পুলিস নামেরই দোষ মশাই, ওরা সব পারে। আপনার কাছে ব'সে দুটো কথা বলেছি কি ওদের গোপন খাতায় আমার নামটি উঠে গেছে। আমি কিন্তু অত ও-সব ভয়টয় করি নে মশাই—তবে কি জানেন আবার চাকরিটাও তো দেখতে হবে। শেষে যদি—।

নিখিল বলিল—তা তো বটেই। রাধা রান্নাঘরে বসিয়া কি যেন করিতেছিল। সেদিকে নজর পড়িতেই বলিল—"রাধা বুঝি এসে জুটেছে আপনার এখানে ? তা বেশ। যে ডেটিনিউ বাবুই আসুক, রাধা ভিন্ন গতি নেই ; আগের ভদ্রলোকের তো ছিল একেবারে রাধা-

অন্ত প্রাণ! তা যা হোক শ্রীমন্ত হাজরা লোকটির রুচি আছে বলতে হবে—ডেটিনিউ বাবুদের পয়সাও আছে, সখও আছে। আর লোকটিও দেখতেও তো একেবারে মন্দ নয়—কে বলবে পোদের মেয়ে? সেবার যোগীন শুঁড়ী মাসে মাসে মোটা মাসোহারা দিতে চেয়ে কত খোশামোদ, ওর মন কিন্তু কিছুতেই টললো না। হাজার হ'লে ভদ্র আর অভদ্র ওরাও বুঝতে পারে, কি বলেন? ওদের পাড়ার অন্য মেয়ে হ'লে কোন্ কালে বর্ত্তে যেত। যোগীন শুঁড়ীর এ অঞ্চলজোড়া নাম।

ভদ্রলোকটির আলাপের ধরণ দেখিয়া নিখিল অবাক্ হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়েই যিনি এম্‌নি সব আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন, তিনি কোন্ শ্রেণীর লোক—নিখিল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাই ভাবিতেছিল এমন একটা কিছু বলিবে যাহাতে আলোচনার গতিটা অন্য দিকে ফিরিয়া যায়।

—আরে অত সঙ্কোচ কচ্ছেন কেন, মশাই—আমাদের অত ঢাক্-ঢাক্ গুড়গুড় নেই, যা করবো সব খোলাখুলি। আর সত্য কথা বলতে কি মশাই—ওসব মরালিটী-ফিটীর দিক দিয়ে ওরাও যেমন একটু আলগা, আমরাও তেম্‌নি,—আর হ'বেই বা না কেন বলুন, ঐ দেখছেন সব চালের পাইলের বাবুরা—সব্বাই তো দেশ ছেড়ে একা একা বিদেশ-বিভুঁয়ে পড়ে আছে, মানুষের মন তো—যদি একটু এদিক-ওদিক হ'ল তো সেটা কি একেবারে নিতান্তই অন্যায় বলবেন আপনি?" বলিয়া ভদ্রলোক নিখিলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, নিখিল কি জবাব দিবে? সে ভাবিতেছিল কতক্ষণে লোকটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। সে না পারিতেছিল কোন একটি রূঢ় কথা বলিয়া আলোচনাটি থামাইয়া দিতে, না পারিতেছিল উপভোগ করিতে।

—চলুন না বাঁধের ধার দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্। বিকেলবেলা এমনি ঘরের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে থাকবেন না।

—আপনি যান, আমার মাথাটা কেমন বেদনা করছে আজ আর বেরুব না।

—আচ্ছা আজ তবে আসি—যাবেন আমার বাসায় গল্পগুজব করা যাবে ব'সে ব'সে। বলিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

নিখিলের মাথা সত্যই ধরিয়া আসিয়াছিল, এ লোকটি বলে কি? এখানকার সকলেরই কি নৈতিক চরিত্র এমনি? এ যে সমাজ ও সংসার ছাড়া কোন্ বর্ব্বরের দেশে আসিল। নিখিল সারা দেহ বিছানায় এলাইয়া দিয়া এই সব ভাবিতেছিল। কিন্তু তবু মাস দুই যাইতে-না-যাইতেই এই সব নীচ ও ছোট জাতের লোকগুলিরই নিখিল এক মাত্র অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তাহার উপাধি হইল "দা-ঠাকুর"। উঠিতে বসিতে তাহারা এই দা-ঠাকুরটির উপদেশ লইবার জন্য ছুটিয়া আসিত। নিজেরা ঝগড়া করিত, মারামারি করিত, কেহ কোন অপকর্ম্ম করিত, সব গিয়া দা-ঠাকুরকেই মিটাইতে হইত। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক-ঘটিত অনেক ব্যাপারের মীমাংসাও তাহাকে করিয়া দিতে হইত। সামন্তের পরিবারকে হয়ত হৃদয় ফুসলাইয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। নিকুঞ্জের বোন স্বামীর ঘর করিতে যায় না। রোগা স্বামীটি একা একা রোগে ভুগিয়া মরিতেছে, এ দিকে নিকুঞ্জের বাড়ীতেও পাড়ার ছিদাম এক প্রকার প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করিতেছে। তারিণী তাড়ি খাইয়া বউকে পিটাইয়াছিল, তাহার পর হইতে আর তাহার খোঁজ নাই—এমনি সব। নিখিল আজ-কাল অবলীলাক্রমে এই সব লইয়া আলোচনা করে। অপরাধীকে মুখ খারাপ করিয়া যাচ্ছেতাই গালাগালি দেয়, একটুও সঙ্কোচ করে না, কিন্তু তবু সকল ব্যাপারেরই তো মীমাংসা হয় না, কোথাও বা ঘরের বউকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসিত; কোথাও বা ব্যভিচারের স্রোতকে একটুও বাধা না দিয়া চুপ করিয়া চোখ কান বুজিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

স্বামী হয়ত রুগ্ন শরীর লইয়া সামান্য যাহা কিছু রোজগার করে তাহাতে নিজেরই খোরাক চলে না, তার উপর তাড়ি আছে; স্ত্রীকে খাওয়াইবে কি? অনেক সময়ে স্ত্রীকেই চাউলের পাইলে কাজ করিয়া, মাঠে খাটিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে হয়। এই রকম মেয়েরাই অনেক সময় স্বামীকে ফেলিয়া পলাইয়া যায়।

নিখিল সেখানে কোন ব্যবস্থাই খুঁজিয়া পায় নাই, নীরবে মাথাটি গুঁজিয়া চলিয়া আসিয়া স্বামীটিকেই গালাগালি করিয়াছে। সভ্য ও ভদ্রলোক হয়ত নাক সিঁটকাইয়া বলিবেন এ কোন্ আদিম যুগের দেশ হে? জবাবটি অত্যন্ত সোজা, কলিকাতার সভ্য ও ভব্য সমাজ হইতে মাত্র ত্রিশটি মাইল দূরে—দিনের পর দিন এম্‌নি সমাজ ব্যবস্থায়, এম্‌নি এক দল বুভুক্ষু মানুষের বংশধর কোন রকমে এখনও টিকিয়া আছে।

ইহাদের সামাজিক জীবন লইয়া, মেয়েদের মর্য্যাদা-বোধের পরিমাণ লইয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যিনি সত্যিকারের দরদী মন লইয়া ইহার মূল অনুসন্ধান

করিবেন, তাঁহার সমস্ত ব্যঙ্গ এক নিমিষে উবিয়া যাইবে। নিখিলের মনে তাই অহরহ বাজিতে থাকে যাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই তাহাদের নিকটে মান-মর্য্যাদার উপদেশ ব্যঙ্গ বই আর কি হইতে পারে? সতী নারীর মুখের অন্নের ও পরিধানের বস্ত্রের যদি কোন প্রয়োজনই না থাকিত তো সে স্বতন্ত্র কথা।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিখিল তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতেছিল—সরকারী ডাক্তারখানার পাশ দিয়াই পথ, হঠাৎ ডাক্তারখানার ভিতর হইতে দুই-একটা কথার টুক্‌রা ভাসিয়া আসিতেই নিখিল দাঁড়াইয়া গেল, ডাক্তারটি বলিতেছেন—তুই বুঝে দেখ শ্রীমন্ত, আর কিই বা পাচ্ছিস ঐ বন্দীবাবুর কাছ থেকে, মাসে মাসে দুটো ক'রে টাকা এই তো? শ্রীমন্ত জবাব দিল—আজ্ঞে রোজ রোজ দুই বেলা পেট ভরে ভাতটাও যে ওখান থেকেই পাই বাবু। —ভাত? ভাতের তো আর অভাব থাকবে না শ্রীমন্ত, আমার কথামত কাজ কর। কালই পরিবারকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয়—জানিস ওরা মাড়োয়ারী, টাকার কুমীর—তাও আবার যে-সে মাড়োয়ারী নয়—চালের পাইলের ম্যানেজার, লোকটা নূতন এসেছে কিনা তাই এত দিন নজর পড়ে নি। শ্রীমন্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিল—কিন্তু আমি রাজী হলেই তো হ'বে না ডাক্তারবাবু—বউটিরও তো মত চাই।—তুই বলিস কি শ্রীমন্ত—এতেও মত হ'বে না? লোকটি মাড়োয়ারী হ'লে হয় কি, দেখতেও দিব্বি সুপুরুষ! তোদের বন্দীবাবু তার ছাওয়ায় দাঁড়াবার যুগ্যি নয়, ইঃ—ভারী তো আমার চেহারা! আমার কথা শোন্, মেয়েদের যৌবন, আর জোয়ারের জল দুই-ই সমান, গেলে আর আসে না।

নিখিল আর শুনিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে বাসায় আসিয়া ঢুকিল, ইহা নূতন নয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহারাও নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইয়াছে যে সেও ঠিক তাহাদেরই দলে। এমন কি ঐ শিক্ষিত ডাক্তারটি পর্য্যন্ত তাহা একেবারে অভ্রান্তভাবে বুঝিয়া লইয়াছে। নিখিল ভাবিতেছিল, সে যদি পারিত তাহা হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া সে এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করিয়া যাইত।

ইহারই কয়েক দিন পরে নিখিল বাসায় ফিরিয়া দেখে শ্রীমন্ত আর রাধা তুমুল কলহ জুড়িয়া দিয়াছে, শ্রীমন্তের রসনা একেবারে উঠিয়াছে বল্গাহীন হইয়া—"হারামজাদী মাগী—কেন যাবি না শুনি? চুলের মুঠি ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব না?" রাধার কণ্ঠও তেমনি ঝাঁঝালো স্বরে বাজিয়া উঠিল—ইস্! কি আমার মরদ রে—আয় না দেখি কেমন সাধ্যি? প্রত্যুত্তরে শ্রীমন্ত নিকটে বারান্দা হইতে একখানা চেলা কাঠ লইয়া রুখিয়া উঠিল—ঠিক এমনি সময়ে প্রবেশ করিল নিখিল। বাহির হইতে এই সব কানে যাইতে তাহার মন একেবারে ঘৃণায় ও রাগে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। "কি এত চেঁচামেচি কিসের? বেরোও ছোটলোক কোথাকার আমার বাসা থেকে।" শ্রীমন্ত নিখিলকে দেখিয়া হাতের কাঠখানা ফেলিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু একটুও দমিল না। নিখিলের দিকে কঠিন মুখ করিয়া কহিল—তা যাচ্ছি বাবু আপনার বাসা থেকে। আর আমিও দেখবো বাবু আপনি কেমন ভদ্দরলোক, পরের পরিবারকে নিজের বাসায় ধরে রাখেন। দেশে কি পুলিস নাই, বিচার নাই, ছিরিমন্ত হাজরা সব দেখে নেবে, বলিতে বলিতে শ্রীমন্ত পথে নামিয়া গেল।

নিখিল কিছুক্ষণ হতবাক্ হইয়া সেখানে তেম্‌নি দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি বলে কি? যে শ্রীমন্ত প্রত্যহ নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত আসিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিত, আজ কোন্ যাদুমন্ত্রে তাহার মুখ দিয়া নিখিলের বিরুদ্ধে এম্‌নি সব মিথ্যা অপমানকর কথা বাহির হইল। এ ঘটনাটি যে সেদিন সরকারী ডাক্তারখানার পাশ হইতে যাহা তাহার কানে আসিয়াছিল তাহারই পরিণতি, তাহা বুঝিতে নিখিলের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। রাগে অপমানে তাহার অন্তর রি রি করিয়া জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে আসিয়া তেম্‌নি অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বেলা প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দ্বারের নিকট হইতে মৃদু ও সসঙ্কোচ একটি ডাক আসিল, বাবু! নিখিল তাকাইয়া দেখিল রাধা আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছে। বেলা যে একেবারে পড়ে গেল—স্নান করবেন না! নিখিলের মন কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সমান ভাবেই রি রি করিতেছিল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল—সে ভাবনা আজ থেকে আর তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও আমার বাসা থেকে—আজই—এখনই।

৪

একেবারে শেষ বেলায় নিখিল পুনরায় বাসায় ফিরিয়া আসিল। সারাটা দিনের উপবাসে পেটের অন্ত্রগুলি যেন একেবারে জ্বলিয়া যাইতেছিল। বাসায় ফিরিয়া দেখে সেখানে কেহই আর নাই। নিখিল বুঝিল রাধা নিশ্চয়ই

চলিয়া গিয়াছে, যাক্ বেশ হইয়াছে। কাল দেখিয়া শুনিয়া একজন ছোঁড়াগোছের চাকর ঠিক করিলেই চলিবে। তাহার একলার জন্য রান্নাবান্না দেখাইয়া শুনাইয়া দিলে সেই এক প্রকার চালাইয়া লইতে পারিবে। রান্নাঘরের দরজা খুলিয়াই নিখিলের মন অনেকখানি তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। রাধা তাহার জন্য পরিপাটী করিয়া খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ঢাকা খুলিতেই ঠিক অন্য দিনের মতই বাটিতে বাটিতে তরকারি, ব্যঞ্জন সাজান দেখিতে পাইল, মায় জলের গ্লাসে এক গ্লাস জল .একখানি চায়ের প্লেট দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। নিখিল হাত ধুইয়া আহারে বসিল, পরম তৃপ্তির সহিত কয়েক গ্রাস মাখিয়া মুখে তুলিতেই হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই যে অন্ন-ব্যঞ্জন যে এমন সযত্নে তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে—আজ সারা দিনে তাহার আহার হইয়াছে তো? ভাবিতেই তাহার হাতের গ্রাস সহসা থামিয়া গেল। নিখিল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বাঁ-হাত দিয়া একেবারে হেঁসেলের উপরের ভাতের হাঁড়ীর সরা তুলিয়া দেখিল সেখানে আরও প্রায় একজনের ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। নিখিল খানিকটা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল, সমস্ত অন্নব্যঞ্জন ঘরের মেঝেয় তেম্‌নি ভাবে পড়িয়া রহিল। এই তো ঘণ্টাখানেক মাত্র পূর্ব্বে নিখিলের মন যে-মেয়েটির উপরে নিতান্ত ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার তাহারই সমবেদনায় তাহার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এতক্ষণে ভাবিয়া দেখিল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারই নিতান্ত রূঢ় হইয়াছে। অমন কঠিন করিয়া না বলিলেই তো পারিত। দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া রাধা যে চোখের জল ফেলিয়াছিল, তাহাকে সে ন্যাকামি ভাবিল কেমন করিয়া? আর যদি বলিবেই তবে আহারান্তে শেষ বেলায় বলিলেই পারিত, মেয়েটি সারাটি দিনের মত দুটি মুখে তুলিয়া যাইতে পারিত।

পরের দিন সকাল ৭৷৮টা পর্য্যন্ত নিখিল নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুইয়া রহিল। আজ আর কোন তাড়া নাই, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আর কেহ তাহাকে হাত মুখ ধুইতে, চা পান করিতে তাড়া দিবে না। নিখিল বিছানা হইতে উঠিয়া টেবিলের উপরে অন্য দিনের মত দাঁত-মাজা বুরুশ, পেষ্ট সব খুঁজিয়া পাইল না। কাল মুখ ধুইবার পর সেগুলি কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া দেখে সেখানে কেহ অন্য দিনের মত পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ঘটিতে জল তুলিয়া জলচৌকি পাতিয়া তাহার উপরে তোয়ালেখানা ভাঁজ করিয়া রাখে নাই।

নিখিল বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্কভাবে উদাস দৃষ্টিতে দূর প্রান্তরের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পর উঠানের আমগাছটা হইতে একখানা ডাল ভাঙিয়া লইয়া দাঁতন করিয়া নিকটস্থ টিউব-ওয়েলটিতে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। সকালবেলায় চা খাওয়া হইল না। স্টোভ ধরাইতে হইবে, জল গরম করিতে হইবে, তার পর চা আছে, হয়ত চিনি নাই, নিখিল এই সমস্ত সমস্যার ধার দিয়াও গেল না অর্থাৎ চা না খাইয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। দুপুর বেলা রান্না করিতে গিয়া জল পড়িয়া সমস্ত হেঁসেল কাদা হইয়া গেল, ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরিয়া গেল অথচ উনান ধরিল না, অবশেষে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর দুই চোখ জবাফুলের মত লাল করিয়া নিখিল আলু-সেদ্ধ ভাত নামাইল, তাহারই কতকটা খাইয়া কতকটা ছড়াইয়া ফেলিয়া রান্নাঘরের বাহির হইয়া গেল। না, পুরুষমানুষের নিজ হাতে রান্না করিয়া খাওয়া একটা বিড়ম্বনা মাত্র।

পরের দিন চাকর একটা মিলিল, তাহার নাম বিশু। নিখিল প্রশ্ন করিল—তুই রান্না করতে জানিস বিশু? কি কি রান্না করতে জানিস?—"ডাউ ভাত।"—আর কি? বিশু বিস্মিত ভাবে নিখিলের দিকে তাকাইয়া জবাব দিল—"আর আবার কি?" ডাউ আর ভাত ভিন্ন দুনিয়ায় যেন কিছু রান্না করিবার নাই, মাছের ঝোল? "দেখিয়ে দিলে তাও পারি বাবু,"—ডাল? "ডাল পাক করা আপনি শিখিয়ে দেবেন।" তরকারি? "বললাম যে আপনি শিখিয়ে দেবেন।" আর প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। পরের দিন হইতে বিশুর রন্ধন-বিদ্যা আরম্ভ হইল। নিখিল একটি মোড়া লইয়া রান্নাঘরে বসিয়া সব দেখাইয়া দিতে লাগিল। মাছের ঝোলে নুন দেওয়া লইয়া বিভ্রাট বাধিল। অবশেষে নিখিল বলিল, এখানে নিক্তি পাওয়া যায় বিশু? বিশু জবাব দিল—"নিক্তি কেনে বাবু।" রোজ মেপে নুন দেওয়া যেত।—"হঃ, নিক্তি কি হবে বাবু—নুন বেশী হ'লে একটু জল ঢেলে দিলেই হবে, আর যদি কম হয় তো চেখে দেখে আর একটু গুলে দিলেই হ'ল।" আহারে বসিয়া নিখিল বিশুর রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। রোজ যাহা খায় তাহার সিকি ভাতও পেটে গেল না। অবশেষে দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। গত দুই দিন হইতেই নিখিলের শরীর ভাল ছিল না। সারা দেহটা যেন কেমন ভার-ভার

বোধ হইতেছিল। আজ রাত্রে সমস্ত দেহ-সন্ধিতে এত বেদনা বোধ হইতেছিল যে সে সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। শেষ রাত্রির দিকে বেশ একটু জ্বরও অনুভব করিল। ভোরের দিকে সে অন্যমনস্কভাবে বুক ও পেটের উপর হাত বুলাইতেই কয়েকটি গোটা-গোটা কি সব হাতে ঠেকিতে লাগিল। দিনের আলো ফুটিতেই নিখিল সভয়ে দেখিল তাহার সারা গা ছাইয়া এমনি অসংখ্য ফুস্কুরি জাগিয়া উঠিয়াছে।

সে নিশ্চিত বুঝিল ইহা আর কিছু নয়, একেবারে খাঁটি বসন্ত। তাহার পর বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর প্রবল আকার ধারণ করিল। সমস্ত দেহের বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিল। বিকালের দিকে তাহার মাথার ভিতরে দপ দপ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, তাহার ভিতরের শিরা ধমনী সব যেন ছিঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। নিখিল কয়েক বার মাথা তুলিয়া চাকরটাকে ডাকিল, কিন্তু বাসায় আর তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে নিশ্চয় ভয়ে পলাইয়াছে। নিখিল অসহায়ের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল।

রাধা সেই যে সেদিন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহার পর দুইটা দিন স্নান-আহার কাজকর্ম সমস্ত বন্ধ করিয়া একেবারে ঘরে ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমন্ত আসিয়া ডাকাডাকি করিয়াছে, অনুনয়-বিনয় করিয়াছে, অবশেষে কিছুতেই না পারিয়া রাগিয়া অনেক অকথা-কুকথা কহিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই রাধা কর্ণপাত করে নাই। এই সব কথার অন্তরালে কি কথা লুকাইয়া আছে রাধা তাহা বুঝে। তাহার আশেপাশের অনেক বাড়ীতেই কত মেয়ের অদৃষ্টে এম্‌নি ঘটিয়া থাকে। রাধার চারিদিকে এমনি আবেষ্টনী। কিন্তু সেও কি তাহাদের দলে মিশিবে? ভাবিতেই তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠে। স্বামীকে সে কোন দিনই ভালবাসে নাই। সে তো শুধু পুরুষের জীর্ণ কঙ্কাল, চিররুগ্ন, চিরঅকর্ম্মণ্য।

এই দুই দিন শুইয়া শুইয়া রাধার বিগত তিন মাসের সমস্ত স্মৃতি একে একে মনে উঠিতে লাগিল। যেদিন সে প্রথম নিখিলের কাজ করিতে গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে তাহার বাসার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। হাট-বাজারের হিসাব রাখা, খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা, সরকার হইতে মাসে মাসে খরচের টাকা আসিলে তাহা তুলিয়া রাখা সমস্তই তাহাকে করিতে হইত। নিখিল কোন কিছু দেখিতে আসিত না, না লইত টাকার হিসাব, না করিত তাহার ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ। নিখিল যে তাহার সমস্ত সেবাযত্ন পরম তৃপ্তির সহিত একান্ত আত্মীয়ের মত তাহার হাত হইতে গ্রহণ করিত, তাহা রাধা মনে মনে বুঝিত, রাধা তাহার এই বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এমন আপনার করিয়া এমন আগ্রহের সহিত কোন দিনই কাহারও সেবাযত্ন করে নাই। সে যে সামান্য দাসী মাত্র, দাসীত্বের উর্দ্ধে এতটুকু মাথা তুলিয়া উঠিবারও যে তাহার ক্ষমতা নাই, এ কথা সে ভাবিতেই পারিত না। দুই দিন উপবাসের পর সেদিন বিকাল বেলা রাধা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল যে অসহায় লোকটি নিজের কোন কিছুই কোন দিন ভাবিতে পারে না। নিজের স্নানাহারের কথা দিনের মধ্যে বারে বারে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। আজ দুই দিন না জানি তাহার কেমন করিয়া কাটিতেছে। নিজের হাতে পাক করিয়া আহার করিতে গিয়া হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কিছুই রান্না করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর সমস্তই তেম্‌নি ফেলিয়া রাখিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ীর একটি দশ-ব্যরো বৎসরের মেয়ের নাম কালী, রাধা তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—একটা কাজ করতে পারবি বোন্?

কালী জবাব দিল—কি কাজ রাধি-দি?—

—ঐ যে বন্দীবাবু উনার ওখানে যাবি—দেখে আস্‌বি বাবু বাসায় আছে কি না, কি করছে, রান্নাঘরের মাঝে উঁকি মেরে দেখবি—সেখানে আজ রান্না হয়েছিল কি না—কে রান্না করলে—বুঝলি তো?

— তা আর পারবো না, এখুনি যাচ্ছি—

—বেশ যা শীগ্‌গির আস্‌বি।

কালী সেই গিয়াছিল কোন্ বেলা থাকিতে—ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যাবেলায়। রাধা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—কি দেখে এলি কালী?

কালী এক গাল হাসিয়া বলিল—রোজ রোজ তুমি এম্‌নি ক'রে খবর জান্‌তে পাঠিও রাধি-দি, রোজ রোজ আমি এম্‌নি রূপশাল চালের ভাত খেয়ে আস্‌বো। আঃ কি মজা করেই না খেলেম দিদি!

রাধা বাধা দিয়া বলিল—কি দেখে এলি বল্ না শুনি, খেতে তোকে দিলে কে?

—কেন ঐ বাবুটি গো?

—বাবু দিল কেন?

—বাসার কাউকে দেখতে না পেয়ে তোমার কথামত রান্নাঘরের শিকল খুলে দেখি, ঘরের মেঝেয় থালা বাটিতে ভাত, ডাল মাছ কত সব নষ্ট হচ্ছে, দেখে আমার জিব

চক্ চক্ করতে লাগলো, সেই কবে ওমাসে একবার ভাত খেয়েছিলেম, তার পর এত দিন ধরে তো কেবল জাউ আর জাউ। এমনি সময়ে কোথা থেকে রাধি-দি, বাবু একেবারে তেড়ে এলো—এই তুই কে রে—কি কচ্ছিস্? আমি তো একেবারে ভয়ে কেঁদে দিলাম। বাবু নরম হয়ে বললেন—কি কচ্ছিলি তুই? আমি বললাম—রান্নাঘর দেখছিলাম। বাবু বললেন—কেন? তার পর তোমার কথা সব খুলে বললাম।

—বললি সব? কি বললি শুনি?

কালী জবাব দিল, তুমি যা যা বল্‌লে না, তখন সেই সব—তার পর তুমি আজ দু-দিন কিছু মুখে তোল নি, সারাটা দিন বিছানা থেকে ওঠ নি। ছিরিমন্তদা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছ—সব বললাম।

রাধা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—বোকা মেয়ে!

কালী হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ বোকা বইকি, বোকা হ'লে বুঝি এক পেট খেয়ে আর এতগুলো ভাত বয়ে নিয়ে আস্‌তে পারতাম।

—ভাত তোকে দিলে কে?

—বাবুর সঙ্গে যখন কথা বলি না—তখন একটা বিড়াল এসে মাছের বাটিটা চাট্‌ছিল, আমি সেটাকে তাড়িয়ে অন্য একটা বাটি দিয়ে মাছের বাটিটা ঢেকে ফেলতেই বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি, ভাত খাবি চাট্টি? আমি মাথা নেড়ে বললাম—হ্যাঁ বাবু, অনেক দিন ভাত খাই নি। তার পর অন্য একখানা থালায় করে হাঁড়ি থেকে এই এতগুলো ভাত ধরে দিলেন আর একটা বাটি থেকে দিলেন ঝোল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বললেন এঁটো পাতের ভাতগুলো যেন খাস্ নে, অসুখ করবে। বাবু কি বোকা! ভাত খেলে কখনও অসুখ করে, আমি তাই শুনতে গেলাম আর কি? খেয়ে আসবার সময় কাপড়ের আঁচলে ক'রে সব ভাতগুলো লুকিয়ে বেঁধে নিয়ে এলাম, কাল সকালে আবার খাব, বলিয়া কালী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরের দিন রাত্রি আট-নয়টার সময় কালী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—রাধি-দি শুনেছ—তোমার বাবুর বসন্ত হয়েছে।

—সে কি রে? কে বললে তোকে?

—কে আবার বললে—আমি নিজে গিয়ে দেখে এলাম। আমি যেতেই বাবু মাথা তুলে চাইলেন, দুই চোখ জবা ফুলের মত রাঙা। সারা গায়ে সব উঁচু উঁচু হয়ে ফোটের মত ফুলে উঠেছে। বাবু বললেন—এই তুই কেন এসেছিস্—যা পালা—আমার বসন্ত হয়েছে। আমি এই না শুনেই সেখান থেকে দে ছুট, আর কি দাঁড়াই—ইস্ মাগো কি ভয়ানক রোগ না বসন্ত? রাধা ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় কিছুক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিল না, তার পর বলিল—কিন্তু এতক্ষণ আমাকে জানাস্ নি কেন কালী? কি অন্যায়টাই না করেছিস্!

—বা রে! জানাবো কখন? আমি কি বাড়ী ছিলেম্ না কি! মার সঙ্গে গিয়েছিলেম মাড়োয়ারী পাইলে চাল ঝাড়তে—এই সেখান থেকে ফিরছি। এখন যাই রাধি-দি! কিন্তু তুমি যেন আর কখনও ওমুখো হয়ো না—মা আমাকে বার-বার ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে, ও ব্যারাম কি ভাল হয়, না মানুষ বাঁচে! আর একটু ছোঁয়াছুত করেছ কি অম্‌নি হয়েছে, ইস্ মাগো, এমন রোগও মানুষের হয়। কালী তাহার কথা থামাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এত কথার কোনটিই বোধ হয় রাধার কানে ঢুকিল না, সে সেখানে বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। দিন দুই পরে নিখিলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রাধা তাহার মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। সে পরম নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৫

নিখিলের জলবসন্ত হইয়াছিল। সাত-আট দিনের মধ্যেই অসুখের তীব্রতা অনেকখানি কমিয়া গেল, শুধু দুর্ব্বলতা ছাড়া অন্য উপসর্গ বড় একটা রহিল না। রাধা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত সংসার বুঝিয়া লইয়াছে। নিখিলের কোন সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই। টেবিলের উপরের চাবির গোছা আবার আঁচলে বাঁধিয়া লইয়াছে। নিখিলের পথ্যাপথ্যের জোগাড় করিতেছে। ভিন গাঁয়ের একজন কবিরাজ ছিল; তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সে যেন দুই দিনের জন্য কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত সংসার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে।

দিন সাতেক পরের কথা, রাত্রি তখন বোধ হয় একটা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাস। সারাটা দিন ও রাত্রি সমান ভাবেই গরম পড়িয়াছিল। নিখিল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গরমে ঘুমাইতে পারে নাই, বিছানার পাশে বসিয়া রাধা বাতাস করিতেছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিতেই নিখিল দেখে রাধা তাহার পায়ের তলায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ডান হাতখানা তখনও পাখা-সমেত

নিখিলের পায়ের উপরে পড়িয়া আছে। নিখিল ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, সাতটা রাত্রি পর পর বেচারী এমনি করিয়া তাহারই রুগ্ন শয্যার পাশে বসিয়া জাগিয়া যাইতেছে। যে রোগ এমনি ছোঁয়াচে ও মারাত্মক যে একান্ত আপনার জন পর্য্যন্ত ভয়ে দূরে সরিয়া যায়, আর এই মেয়েটি তাহার কে যে এমনি নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ভয়লেশহীন মনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে? অথচ সে তাহার কেহই নয়। কয়দিন পূর্ব্বে তাহাকে সে দূর দূর করিয়া নিজের বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। নিখিল একটুখানি নড়িয়া উঠিতেই রাধা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পাখাখানা হাতে করিয়া বাতাস করিবার জন্য নিখিলের শিয়রের দিকে অগ্রসর হইল। ইহারই মধ্যে নিখিল ঘামিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। রাধা পাখাখানি নামাইয়া রাখিয়া অতি সন্তর্পণে নিজের আঁচল দিয়া নিখিলের কপাল ও গায়ের ঘাম মুছিয়া লইতে লাগিল। নিখিল তেম্নি অসাড়ের মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় সারাটা রাত্রি একটুও ঘুমাইতে পারিল না। সকালবেলা রাত্রের মানসিক বিকারের কথা স্মরণ করিয়া নিখিল একেবারে মরমে মরিয়া গেল। তাহার সারা অন্তর ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল।

কি একটা ঔষধ নিখিলের গায়ে রোজ মালিশ করিতে হয়, রোজ সকালে রাধাই মালিশ করিয়া দেয়। আজ ঔষধ হাতে করিয়া রাধা ঘরে ঢুকিতেই নিখিল বলিয়া উঠিল—ঔষধ আর তোমাকে মালিশ করতে হবে না। টেবিলের উপরে রেখে যাও, আমিই মালিশ ক'রে নেব। রাধা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, নিখিল প্রবল ভাবে বাধা দিয়া বলিল—না না, তুমি যাও, ও আমিই পারবো। রাধা ফিরিয়া যাইতেছিল, নিখিল পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিল—আর একটা কথা শোন।

—দেখ এখন তো আমি বেশ সুস্থ হয়েছি, আজ থেকে আর রাত্রে তোমাকে এখানে থাকবার দরকার নেই। আমার কোন অসুবিধা হবে না। রাধা কথাটি না কহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দিন-পনর পরে এক দিন সকাল প্রায় আটটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া নিখিল সবিস্ময়ে দেখিল, আজ তো এ পর্য্যন্ত কেহ আসিয়া তাহার হাত মুখ ধুইতে চা খাইতে ডাকে নাই। বাহিরে আসিয়া কোথাও রাধাকে দেখিতে পাইল না, এমন সময় সেদিনের সেই মেয়েটি দৌড়াইয়া বাসায় ঢুকিয়া বলিল—বাবু রাধিদি আপনাকে ডাকছে।

—ডাকছে?

—কেন রে, কোথায় সে?

—সে তাদের বাড়ীতে আছে গো, ছিরিমন্ত-দার কাল থেকে বড্ড অসুখ করেছে কিনা তাই আপনাকে ডাকছে।

পথ চলিতে চলিতে নিখিল ভাবিতেছিল, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া শ্রীমন্তর যা অবস্থা তার উপরে আবার নূতন করিয়া কোন ব্যারাম হইল না কি?

শ্রীমন্তের ঘরে আসিয়া নিখিল একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মাচার উপরে শ্রীমন্ত বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে—আর মাঝে মাঝে কাশিতেছে, কাশির দমকে যাহা উঠিতেছে তাহার অধিকাংশই রক্ত। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হয়ত খানিকটা রক্তবমিই করিয়াছে। কারণ মেঝেয় অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রক্তের দাগ শুকাইয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। সারা ঘরের মধ্যে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। রাধা শ্রীমন্তের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল। নিখিল ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার কয়েক বৎসরের মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের যে জ্ঞান তাহাতে সে একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। চারি পাশে মাটির দেওয়াল দেওয়া এতটুকু একটু ঘর, তাহার না আছে একটা আলো বা বাতাস প্রবেশ করিবার পথ। ইহারই মধ্যে পাশাপাশি বাঁশের মাচার দুইখানা বিছানা, একটায় শয়ন করে শ্রীমন্ত নিজে, আর একটায় রাধা। রক্ত মুখে করিয়া মাছির দল বিছানায়, কাপড়ে, খাবার জিনিসের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পড়িতেছে। ইহা যে কত বড় মারাত্মক, ইহাদের মত অজ্ঞ লোকে তাহার কি বুঝিবে! নিখিল বাজার হইতে ফিনাইল আনাইয়া মেঝেয় জমাট রক্তের উপরে ঢালিয়া দিল। নিজে গিয়া সরকারী ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তারবাবু শ্রীমন্তকে পরীক্ষা করিয়া খাইবার জন্য কয়েকটি ক্যালসিয়ামের পুরিয়া দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া নিখিল জিজ্ঞাসা করিল—রক্ত বন্ধের জন্য কোন ইন্‌জেকশন দিলে হ'ত না?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল—ইন্‌জেকশনের দাম দেবে কে বলুন?

—কেন সরকারী ডিস্‌পেন্সারিতে নাই?

—কেন সরকারের আর কাজ নাই—এই সব ছোট-লোকদের জন্য আবার ইন্‌জেকশন! দুই-চারটে কুইনাইন আর কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন আছে তাও বিশেষ কঠিন অবস্থা না হ'লে দেই না, এরা সব এমনিই

ভুগে ভুগে সেরে উঠে মশাই, আমাদের দেশের মত নয়! ওকে ইন্‌জেকশন দিয়েই বা হবে কি শুনি—ও কি বাঁচবে? আর ও আপদটা যত শীঘ্র শীঘ্র যায় আপনার ততই তো ভাল?

—তার মানে?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল—মানে অত্যন্ত সোজা, বলিয়া ডাক্তারটি নিখিলের দিকে তাকাইয়া একটু মুচকি হাসিল। নিখিল কথাটিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসা করিয়া এই সব মানুষগুলির হৃদয় এমন কঠিন হইয়া উঠে কেমন করিয়া, সে ভাবিয়া পাইল না।

বিকালবেলা নিখিল শ্রীমন্তকে পুনরায় দেখিতে আসিল, ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে শ্রীমন্ত নিজের বিছানায় বসিয়া ঢুলিতেছে। জ্বর এবেলা বেশী আসিয়াছে, তবে রক্ত আর উঠে নাই। শ্রীমন্ত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু দুটি ভাত যদি খেতে দিতেন। খিদেয় পেটের নাড়ীগুলো জ্বলে গেল।

নিখিল বলিল—এত জ্বরের উপরে ভাত খেয়ো না শ্রীমন্ত। কাল জ্বর কমলে খেয়ো।

—আর কাল—আজ বাঁচলে তো কাল।

শ্রীমন্ত অবসন্নের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

—আপনারা কিছু বুঝেন না বাবু—ভাত খেলে কি মানুষের কখনও অসুখ করে! না খেয়ে খেয়েই তো আমার এই কাল ব্যাধি হয়েছে বাবু। দিন গেলে চারটি পেট ভরে ভাত খেতে পারলে কি আর আমার এ রোগ হ'ত? বলিতে বলিতে চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল—ভাত তো দূরের কথা দু-বেলা পেট ভরে জাউও খেতে পাই নি বাবু। নইলে আমার এমন যে শরীর সেই শরীর কি এমনি ক'রে নষ্ট হয়ে যায়। পনর বছর বয়সে বাপের সঙ্গে মাঠে মাঠে হাল বইতে শিখেছি—তার পর বাপ মারা গেলে সাতটি বৎসর নিজ 'হাতে একখানা লাঙ্গল চালিয়েছি। কিন্তু তখনও সারা বছর পেট ভ'রে খেতে পাই নি। সারা বছর ভাগে চাষ ক'রে জমিদারের অর্দ্ধেক তার বাড়ীতে মলে-ডলে তুলে দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক বাড়ী বয়ে এনেছি।—তার পর মহাজনের ধার শুধতে, কাপড় কিনতে, দারোগার নজর দিতে সবই ফুরিয়ে গেছে। সে বার, আজ বছর দুয়েকের কথা, সেই যে জ্বর হ'ল সে জ্বর আর তিন-চার মাসের মধ্যে ছাড়ল না। লাঙ্গল গেল, গরু গেল, চাষার ছেলে শেষে দিনমজুর হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলাম। শরীর আমার আর ভাল হ'ল না বাবু—এই যে রক্ত দেখছেন বাবু ও আজ দু-বছর ধরে উঠছে। কিন্তু কি আর করব বাবু, এক ফোঁটা ওষুধ নেই, একটু ভাল খাবার নেই, এমনি ক'রে কি রোগ সারে বাবু? অথচ এই যে গাড়ী গাড়ী রূপশাল চাল যাচ্ছে—ওর সবটাই তো আমরাই নিজের হাতে তৈরি করেছি। ঐ যে সব বড় বড় চালের পাইল—ঐ যে সব কলকাতার ধনী জমিদার—ওরা সবাই তো আমাদেরই বুকের রক্ত শুষে বড় হয়েছে। আমরা দিন দিন এমনি ক'রে মরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি এ সত্যি বলছি বাবু—এতে কি ওদেরই ভাল হবে, চিরটা কাল আমাদের এমনি ক'রে ঠকিয়ে খেতে পারবে? তা কখনই পারবে না, মাথার উপরে তো ভগবান্ আছে? বলিয়া শ্রীমন্ত, চুপ করিল, প্রবল উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, দুই চোখ হিংস্র পশুর মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। নিখিল একটি কথাও কহিল না, কহিবার কিছু ছিলও না। শুধু বলিল—কথা কয়ো না শ্রীমন্ত, দুর্ব্বল শরীরে অত কথা বলা ভাল নয়। শ্রীমন্ত পুনরায় উত্তেজিত হইয়া জোর করিয়া বলিয়া উঠিল—না না বাবু, সব ভুল, সব মিছে, ভগবান নেই, ভগবান্ নেই। ভগবান্ যদি কেউ থাকতো, এমন অবিচার এমন অত্যাচার হ'তে পারত না। উত্তেজিত শ্রীমন্ত বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবার এক ঝলক তাজা রক্ত কাশির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। বাসায় ফিরিবার সময় উত্তেজিত শ্রীমন্তের সেই কথাটি বারে বারে নিখিলের মনে হইতেছিল। ভগবান্ নাই—ভগবান্ নাই। থাকা-না-থাকার প্রশ্ন লইয়া সে নিজেকে পীড়িত করিতে চাহিল না কিন্তু এই ভগবান্, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, ইহা যে মানুষকে অনবরত পিছে টানিতেছে—বঞ্চিতকে, অত্যাচরিতকে, মিথ্যা ধোঁকার মোহে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে শিখাইতেছে, ইহা তো পরম সত্য। তাই আজ মরণের দ্বারে আসিয়া শ্রীমন্ত যদি এমনি করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পরের দিন সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিতেই কালী দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল বাবু ছিরিমন্ত-দা মারা গেছে। আঃ এই সুন্দর প্রভাতটা এক নিমিষে নিখিলের নিকট একেবারে বিশ্রী হইয়া গেল!

শ্রীমন্তের মৃত্যু হইয়াছিল শেষ রাত্রের দিকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বার অনেকখানি রক্ত উঠিয়াছিল, তাই সম্ভবতঃ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। দেহটাকে বাহিরের উঠানে একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। এই তো মাত্র কয়টা

ঘণ্টা আগে বাক্যে কার্য্যে চিন্তায় যে এই জগতে অত্যন্ত চলমান্ হইয়া অবস্থান করিতেছিল, এখন কোন্ যাদুমন্ত্রে তাহাকে এমনি একটা জড়পদার্থে পরিণত করিয়া দিল ? এ চিন্তা এক মুহূর্ত্তের বেশী নিখিল করিল না। সে তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।—যাক্ বেচারা মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। কলুর বলদ যত দিন কার্য্যক্ষম থাকে, তত দিন ঘানির চারি পাশেই তাহাকে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তার পর যখন অচল শরীর লইয়া ঘানিগাছ হইতে বাহির হয়, তখন সে যত তাড়াতাড়ি মরিতে পারে, তারও লাভ, কলুরও লাভ। ইহারাও তেমনি, যত দিন শরীর একেবারে অচল না হইয়া পড়ে তত দিন জমিতে দিন-রাত খাটিয়া যায়—তার পর আসে স্বাস্থ্যভগ্ন হইয়া। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে ভুগিয়া অকালে তিলে তিলে জমিদার ও ধনীর জন্য নিজের দেহরক্ত ক্ষয় করিয়া এক দিন এমনি করিয়া মরিয়া যায়। শুধু একা শ্রীমন্তেরই যে মন্দভাগ্য তা নয়, ইহাদের শতকরা কত জনের অদৃষ্টে যে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার হিসাব কে রাখে ?

নিখিলের কল্পনা থামিয়া গেল, ঘরের পাশে দেয়ালে ঠেশ দিয়া রাধা ঠায় বসিয়া ছিল। তাহার চারি পাশে পাড়ার কয়েক জন স্ত্রীলোক বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। রাধা কিন্তু একটুও কাঁদে নাই, এক বিন্দু অশ্রুও ফেলে নাই।

নিখিল শুনিল কে যেন বলিতেছে—তোর ভয় কি রাধি, সোয়ামী তোর না দিত ভাত-কাপড়, না বাসতো ভাল, বন্দীবাবু যত দিন আছেন তত দিন তোর ভাত খাবে পরে, বাবু কি আর তোর ফেলতে পারবে ? আমার কালী পর্য্যন্ত সেদিন বলছিল, বন্দীবাবু রাধা-দিকে বড্ড ভালবাসে। নিখিল এ-সব শুনিয়াও শুনিল না। ইহাদের সমাজে কি সব গণ্ডগোল ছিল তাহা না মিটিলে শ্রীমন্তকে কেহ দাহ করিবে না। বেলা বারটা পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে সমস্ত গণ্ডগোল মিটাইয়া শ্রীমন্তের দেহটাকে বাড়ীর বাহির করাইয়া তবে সে বাসায় আসিল।

সন্ধ্যাবেলা বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া নিখিল এলোমেলো কি সব চিন্তা করিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাধা শ্মশান হইতে ফিরিয়াছিল। বাড়ী হইতে কাপড় বদলাইয়া নিখিলের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

নিখিল কি বলিবে ঠিক না পাইয়া উঠিয়া বসিতেছিল, কিন্তু রাধা একেবারে তাহার পায়ের উপরে উবু হইয়া পড়িয়া দুই পায়ের তলায় মুখ লুকাইল। নিখিল হতবুদ্ধির মত রহিল বসিয়া, কি করিবে না-করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কতক্ষণ এমনি কাটিয়া যাইবার পর নিখিল বুঝিল, রাধা কাঁদিতেছে।

নিখিল ধীরে ধীরে পায়ের তলা হইতে তাহাকে উঠাইয়া বলিল—ছিঃ ! এত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে রাধা ? চুপ কর, শ্রীমন্ত যে এক দিন ছেড়ে যাবে, এ তো জানা কথা, ঐ শরীর নিয়ে এত দিন সে যে কেমন ক'রে বেঁচেছিল, এই আশ্চর্য্য ! তা ছাড়া কেঁদে কি লাভ বল তো, মানুষ ইচ্ছা করলে যদি ভালবাসার জনকে ধরে রাখতে পারতো, তা হ'লে পৃথিবীতে এত হাহাকার থাকতো না।

রাধা চোখ বুজিয়া জবাব দিল—এ আপনার ভুল বাবু, যে স্বামীকে কোন দিন সত্যি ক'রে ভালবাসতে পারি নি তার শোকে আমি কখনও চোখের জল ফেলতাম না।

নিখিল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তবে কাঁদছিলে কেন ?

—এখানে বাকী জীবনটা আমার কেমন ক'রে কাটবে এক বার ভেবেছেন কি ? তাই আজ আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন—ভদ্র অভদ্র যারা বাঘের মত ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছে, তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবেন—এ কথা না পেলে পা আমি ছাড়বো না, মাথা খুঁড়ে মরবো।

নিখিলের সমস্ত চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, নিজের কোঁচার খুঁটের কাপড় দিয়া রাধার দুই চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—বেশ দিলাম আমি তোমায় আশ্রয়—নিলাম তোমার সকল ভার।

কিন্তু ইহা যে কত বড় বঞ্চনা নিখিল তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিল না।

কাল সারা দিনের অনাহারে ও নানা চিন্তার জন্য রাধা রাত্রিতে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বেলা হইয়া গেলেও জাগে নাই। সকাল বেলা বাহিরে কাহার কাশিবার শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিল, উঠানের দিকে চাহিয়া দেখে যোগীন ডাক্তার ঘরের দরজার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এক মুহূর্ত্তে রাধার মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে ঘর হইতে বাহির হইতেই যোগীন ডাক্তার আগাইয়া আসিয়া বলিল—কি গো রাধি, বলি একটা দিনও কি আর সবুর সইল না।

রাধা তাহার কথা কানে না তুলিয়া এক পাশে সরিয়া যাইতেছিল, যোগীন ডাকিয়া বলিল—আরে শোন, যাচ্ছ কোথায়—তোমার জন্যই যে সেই সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। বলিতে বলিতে যোগীন ডাক্তার রাধার

নিকট আগাইয়া আসিয়া কোটের পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—কিন্তু তুমি যে এমন রাতারাতি নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে এখানে এসে উঠবে, এ তো হ'তে পারবে না রাধি। পরে কাগজখানি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এই দেখ, একেবারে শ্রীমন্তর নিজের হাতের টিপসই ক'রে দলিল লিখে দেওয়া, তুমি সহজে রাজী না হ'লে পুলিস দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে জেন, ওরা টাকার কুমীর—টাকার অসাধ্য কাজ কি আছে বুঝেছ তো?

রাধা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। "আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে ডাক্তারবাবু?"

—বলছি শোন—আজ এক মাস হ'ল শ্রীমন্ত চালের পাইলের ম্যানেজার ঐ মাড়োয়ারীবাবুর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম এনেছে—আর এই দলিল লিখে দিয়ে এসেছে যে ঐ পঞ্চাশ টাকার জন্যে তার পরিবারকে মাড়োয়ারী বাবুর বাসায় এক বৎসর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা উপস্থিত থেকে কাজকর্ম্ম করতে হবে, এ একেবারে শ্রীমন্তের নিজের হাতের টিপসহি—না গেলে আদালত পুলিস ক'রে ধরিয়ে নিয়ে যাবে। আমাকে আজ মাড়োয়ারীবাবু বললে কি না, তাই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে এলাম।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া নিখিল সবই শুনিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল এই মুহূর্ত্তে উঠিয়া গিয়া ডাক্তারটির নাকে মুখে কয়েকটি ঘুসি বসাইয়া দেয়—বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বোঝাচ্ছেন ডাক্তারবাবু!

—এই শ্রীমন্তের পরিবারের কথা!

—শ্রীমন্তের পরিবারের কথা মানে!

—মানে শ্রীমন্তের পরিবারকে আপনার ছাড়তে হবে।

নিখিলের চোখ মুখ এক মুহূর্ত্তে রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। "যা বলতে হয় ভদ্রভাষায় বলবেন, নইলে আমরা কাউকেও তোয়াক্কা রাখি না জানবেন।"

ডাক্তারটি কিন্তু তবুও রাগিল না, এক প্রকার হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল—আজ্ঞে খাঁচায়-পোরা বাঘের দাঁত বের করাই সার। তা সে আপনি যত বড় এনার্কিষ্টই হন।

—কিন্তু কোন্ আইনের কথা আপনি ওকে শুনাচ্ছেন শুনি?

—আইন? আইন এখানে আমরা যা করি তাই, আইনের কথা যদি বল্‌বার ইচ্ছা থাকে তবে বলবেন আপনাদের ভদ্দরলোকের দেশে গিয়ে। এখানকার আইন পুলিস, এখানকার আইন আমরা পাঁচ জন, টাকাওয়ালা ভদ্দরলোক। আর আপনিই বা মশাই কোন্ মুখে আইনের কথা বলছেন, শুনি? এ সেই আইন যে-আইনে আপনি শ্রীমন্তের পরিবারকে নিয়ে এক ঘরে রাত্রি যাপন করেন।

নিখিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া আসিতেই যোগীন ডাক্তার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটি যে ভাল হইল না, এতক্ষণে নিখিলের হুঁস্ হইল। এ যে একটি অনাগত বড় রকমের বিপদের পূর্ব্বাভাস ইহা সে বুঝিল। অন্যের তুলনায় সে নিজেই যে কত বড় অসহায়, তাহার হাত পা যে একেবারে আইনের নাগপাশে বাঁধা, এ কথাই যে সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখানকার একটা অশিক্ষিত চাষীর যে স্বাধীনতা আছে, তাহার যে তাহাও নাই। যোগীন ডাক্তার তো ঠিকই বলিয়াছে—খাঁচার ভিতরের বাঘের মত তাহার দাঁত বের করাই সার।

বিকাল বেলা দারোগার সহিত যোগীন ডাক্তার আসিয়া হাজির হইল। নিখিল তখন বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। দারোগা বলিলেন—শ্রীমন্তের পরিবারকে আমি আপনার এখানে থাকতে "এলাউ" করতে পারি না নিখিলবাবু।

নিখিল প্রশ্ন করিল—কেন? এক জন "সারভেণ্ট" তো সব সময় থাক্‌তে পারে।

—কিন্তু যে-স্ত্রীলোক নিয়ে, এক ঘরে রাত্রি কাটান হয় তাকেও কি "সারভেণ্ট"ই বলে?

নিখিল ক্রমে ক্রমে একেবারে বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিল। সে জবাব করিল—দেখুন দারোগা-বাবু, আপনারা এ বিষয়ে আমাকে যাই বলুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কিন্তু আপনাদের কাছে সে কথা বলার যে কোন অর্থ হয় না তা আমি জানি, তবু আমি বলছি, তাকে আমি ঠিক্ দাসীর মত দেখি না, আত্মীয়ের মত দেখি।

দারোগা বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—আত্মীয়টা কোন্ পর্য্যায়ের তা হ'লে?

নিখিল মরিয়া হইয়া বাধা দিয়া বলিল—বেশ শুনুন, ওকে আমি বিয়ে করব স্থির করেছি।

—বিয়ে করবেন?

—হাঁ।

—সে যে বিধবা!

—বিধবা-বিবাহে তো দোষ নাই?

—ব্রাহ্মণ হয়ে পোদের মেয়ে বিয়ে করবেন?

—হোক্ পোদ, জাতিভেদ আমি মানি না।

দারোগা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল—বলেন কি মশায়, আপনি যে দেখছি একেবারে খৃষ্টান। আমরাও পুলিসে চাকরি করি, কিন্তু আপনার মত এমন জাত-ধর্ম্মনাশা সংকল্প তো কোন দিন করি নি।

নিখিল হাসিয়া বলিল—বেশ আপনারা পুলিসের লোক, চিরকাল জাতধর্ম্ম বাঁচিয়েই চলুন, যত অধর্ম্মের বোঝাটা আমাদের উপরেই ছেড়ে দিন্।

—আচ্ছা সে বোঝাপড়া পরে হবে। আমার কাজ আছে, চল হে ডাক্তার। বলিয়া দারোগাবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

ঝোঁকের মাথায় মানুষ অনেক কিছু বলিতে পারে, কিন্তু শেষটায় তাহা লইয়াই ভাবিয়া মরিতে হয়। কথার ও কাজের তফাৎটা এখানেই। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে নিখিল ভাবিয়া দেখিল, এ সে কি বলিয়া ফেলিল? এ সে কোথায় নামিয়া যাইতেছে? হোক সে পোদের মেয়ে, হোক সে বিধবা, তাতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু শিক্ষিত ও সভ্য-সমাজের ভাবলেশহীন এই যে মেয়েটি—সত্যই যদি ইহাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সভ্যসমাজে পালিত মন ঘৃণায় কি মুখ ফিরাইবে না?

তাহার সেবাযত্ন, তাহার আন্তরিকতায় এতটুকুও তো সে কোথায়ও কোন দিন ত্রুটি পায় নাই, যাহার অপরাধে সে তাহাকে নীচ ও অসভ্য বলিয়া দূরে রাখিবে? তাহার অন্তর বৃথাই বলিতে থাকে—এ কুসংস্কার, এ দুর্ব্বলতা। কিন্তু বাহিরের শত সহস্র আইন ও শাসন তর্জ্জনী তুলিয়া শাসাইতে থাকে—সাবধান!

পরের দিন বিকাল বেলা নিখিলের পায়ের কাছে রাধা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ছোট একটি কাপড়ের পুঁটুলি। নিখিল ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। রাধা মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল—আমি চলে যাচ্ছি বাবু।

—তার মানে?

—আমি এখান থেকে চিরদিনের মত যাচ্ছি। আবাদের দিকে আমার এক ভাইপো থাকে, তাকে খবর দিয়েছিলাম, সে-ই নিতে এসেছে।

নিখিল রীতিমত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কই আগে থাকতে আমাকে কিছুই বলনি তো?

—আগে জানালে আপনি বাধা দেবেন, তাই জানাই নি।

রাধা মুখ তুলিল—নিখিল দেখিল তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

—আপনি যা বলেছিলেন তা অন্যায় নয়—মিথ্যাও নয়—কিন্তু তবু যে হবার নয়।

—কেন হবার নয়।

—যাতে আপনার অমঙ্গল তা আমি হ'তে দেব কেন?

—আমার অমঙ্গল কেন?

—এখানকার রাজত্ব পুলিসের—এখানে রাজত্ব টাকা-ওয়ালাদের, তারা কখনও এ হ'তে দেবে না, অথচ আমি এখানে থাকলে নিজেকে রক্ষাও করতে পারবো না, আপনি কি করবেন, আপনার হাত পা যে বাঁধা—আপনি যে বন্দী। তা ছাড়া আমার জন্যে আপনার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছাড়তে হবে যে। তার চেয়ে আমি দূরে চলে যাই, যে কয়টা দিন বাঁচি আপনার কথা মনে ক'রে রাখব।

রাধা কি যেন বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ বাহির হইতে ডাক আসিল—নিখিল বাবু—নিখিল বাবু—।

নিখিল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখে—দারোগা ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দারোগা নিখিলের দিকে একখানি কাগজ আগাইয়া ধরিয়া বলিল—আপনাকে দিনাজপুরে পত্নীতলা থানায় বদল করেছে, আজ রাত্রির ট্রেনে যেতে হবে—প্রস্তুত থাকবেন।

—আজই?

—হাঁ! বলিয়া দারোগা প্রস্থান করিল। নিখিলের মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না। বুঝিল তাহাকে কোন খবরই না দিয়া গোপনে গোপনে এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে।

রাত্রি আটটার ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। দুই জন "এস্কর্ট"এর সহিত নিখিল আসিয়া ট্রেনে উঠিল। "মার্কেটভ্যান"গুলিতে তখন অজস্র তরি-তরকারি মাছ বোঝাই হইতেছিল। কয়েক মিনিট পরে হুইসিল দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নিখিলের চোখের উপর হইতে সমস্ত দীনহাটা গ্রামখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছয় মাস পরে পত্নীতলা হইতে নিখিল সবে পরশু মুক্তি পাইয়াছে। এই দুইটা দিন তার পথে পথেই গিয়াছে। আজ বিকালের গাড়ীতে আসিয়া দীনহাটায় নামিল। রেল-ষ্টেশন হইতে সোজা রাস্তা ধরিয়া একেবারে শ্রীমন্তের বাড়ীর উঠানে আসিয়া পৌঁছিল। নিখিল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কই এখানে তো জনমানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেই ঘরখানা কোন প্রকারে খাড়া হইয়া আছে বটে, কিন্তু এক পাশের দেওয়াল ধ্বসিয়া গিয়াছে। সারা উঠান

আগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি রাধা এখানে নাই? বোধ হয় তাহার সেই ভাইপোটির সহিত এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশের বাড়ী হইতে কালী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—এ কি বন্দীবাবু আপনি?

—হাঁ।

—কখন এলেন?

—এই তো আসছি কালী, তোমরা ভাল আছ সব?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ, আপনি তো রাধি-দিকে খুঁজছেন বাবু?

—হাঁ, সে কোথায় গিয়েছে বলতে পার?

—"উঁহু, ও গাছটার তলায় অমনি ক'রে বস্‌বেন না, এখানটায় এলে আমার গা ছম্ ছম্ করে। আমরা কেউ সন্ধ্যে হ'লে এদিকটা মাড়াইনে।"

—কেন কি হয়েছে?

—এ দিকটায় সরে আসুন, সব বলছি।

কালী নিখিলের হাত ধরিয়া কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গেল। পরে গলা খাটো করিয়া বলিল—রাধি-দি তো নাই বাবু—

—নাই মানে?

—সে মরেছে। বলছি আপনাকে সব কথা। যেদিন রাত্রে আপনি এখান থেকে চলে গেলেন, ঐ দিন রাত্রে রাধি-দিও তার ভাইপোর সঙ্গে এখান থেকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ঐ চালের পাইলের মাড়োয়ারীবাবু সে তার লোকজন নিয়ে রাধি-দিকে ধরে নিয়ে যায়। ভাইপোটিকে মার-ধোর ক'রে তাড়িয়ে দেয়, তার পর সাতটা দিন আর কেউ রাধি-দির কোন খোঁজ পায় নি, সবাই বলতো মাড়োয়ারীবাবু তাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছে।

কয়দিন পরে সকাল বেলা আমরা সব ঘুমুচ্ছি—এমন সময় আমার মা এধার থেকে চীৎকার করতে লাগলো, আমরা সব ঘুম ভেঙে ছুটে এসে দেখি—রাধি-দি গলায় দড়ি বেঁধে ঐ আমগাছটায় ঝুলছে। কি যে বিকট চেহারা হয়েছিল রাধি-দির, বাবু! আমরা তো সব ভয়ে মরি!

সূর্য্য তখন ডুবিতে বসিতেছে—সন্ধ্যা হয় আর কি—কালী কোন্ সময় চলিয়া গিয়াছে। নিখিল এতক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মত বসিয়া ছিল, এইবার উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিল—রাত্রির ট্রেণটি ধরিতে হইবে।

আবার সেই রাত আটটার ট্রেন। বিপুল কলরবের মধ্যে মার্কেটভ্যানগুলিতে তরি-তরকারি, মাছ বোঝাই হইতেছে। আজ আর কিছুই নিখিলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিল না। সে একান্ত উদাসীন, একান্ত নির্লিপ্ত মনে ট্রেনের কামরায় বসিয়া আছে।

হঠাৎ প্লাটফরমের দিকে নজর পড়িতেই দেখে কে এক জন মাড়োয়ারী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া গেল, নিখিল এক মুহূর্ত্তে চিনিয়া লইল। এই তো সেই চাউলের পাইলের ম্যানেজার। নিখিলের দুই চোখ হিংস্র পশুর মত জলিয়া উঠিল। এক নিমিষের মধ্যে নিজের সুটকেশ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা বড় রকমের ছুরি বাহির করিল! তার পর দরজা খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

জন্মদিনে*

কবির একাশীতিতম জন্মদিনে তাঁহার উপহার এই নূতন কাব্য আমরা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিলাম।

"কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে, কত সারিগান জাগায়ে" জীবনতরণী বাহিয়া আজ তিনি সাগর-মোহানায় পৌঁছিয়াছেন। এখানে তিনি একা—অনন্তের যাত্রী। তাঁহার গানে আজ অনন্তের আভাস।

"যেমন সুদূরে ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে,
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।"

সেই "অজানা পরিণামে"র পথে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে কবি চলিয়াছেন, কণ্ঠে তাঁহার অমৃতমন্ত্র। আদি অন্তহীন এক মহারহস্যের উপলব্ধি হৃদয়কে অভিভূত করিতেছে। তিনি অনুভব করিতেছেন :

"অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।"

মরণের সম্মুখে আসিয়া কবি জীবনকে আরও ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন। পৃথিবীর আয়ুষ্কালই তো সমগ্র জীবন নহে।

"এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি—রয়েছে গোপনে অগোচর।"

এই মৃত্যুভেদী দৃষ্টি, এই চিরন্তন মহাজীবনের উপলব্ধি—তাঁহার আধুনিক রচনাবলীকে এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

বিদায়ের দিনে পৃথিবীকে আরও সুন্দরী, আরও রহস্যময়ী মনে হয়। নানা স্মৃতি রূপ ধরিয়া আসে। ধরণীর নানা তীর্থে তিনি পুণ্যতীর্থবারি আহরণ করিয়াছেন, সে কথা মনে পড়ে। যাহারা অচেনা, তাহারাও আপন হইয়াছিল,

"খসে পড়ে' গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ,
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ।
*   *   *
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে,
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।"

আজিকার গান 'বসন্ত বাহারে' নয় ("মনে করি গান গাই বসন্ত বাহারে, আসন্ন বিরহ স্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।"), উদাত্ত গাম্ভীর্যময় এ সঙ্গীত। কাব্যকুঞ্জ আজ তাপস তপোবন, সন্ধ্যার অন্ধকার ধূপধূম্রে সুরভিত।

কিন্তু তবু এ তপোবনে অতর্কিতে কখন বসন্ত নামে, হয়তো অকাল বসন্ত। মুহূর্ত্তের বর্ণমাধুরী দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। কালিম্পঙের ছবি আঁকিতে কবি রঙের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন।

"বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি,
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনী মৌমাছি"

এ চিত্র সৌন্দর্য্যমোহে, ইন্দ্রিয়বিভ্রমে ভরপুর।

২১ সংখ্যক কবিতায় দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভাষায় আধুনিক সভ্যতার আত্মঘাত বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্মশান বিহার বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্ত্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি'
বক্ষ ভেদি' দেখা দিল আত্মহারা
শবস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি' পান।"

এই সভ্যতার বিলয়ের পর আসিবে নূতন সৃষ্টির দিন।

"এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।"

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাটি কৌতূহলোদ্দীপক; যাহারা আজ 'ভাষা ও সাহিত্য'কে ভাঙিয়া গড়িতে কোমর বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের অনুধাবনের বস্তু। "অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি দীর্ঘকাল ব্যাকরণ দুর্গে বন্দী" থাকিয়া আজ বিদ্রোহী হইয়াছে; "সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে" তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে।

"লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন
নিয়েছে অবুদ্ধি লোকে অবন্ধ ভাষণ
ছিন্ন করি' অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধু সাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গ হাস্যে হানে পরিহাস।"

এই শব্দমত্ততার উপমাও চমৎকার :

"যেমন মাতিয়া উঠে দশবিশ কুকুরের ছানা
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা।"

কবি একান্তে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন, শুনিতেছেন :

"আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।"

এই ধরণের রচনা আলোচ্য কাব্যে ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি।

"জন্মদিনে"র প্রধান সুর আত্মোপলব্ধির এবং আরাধনার। লীলাময়ের বিশ্বলীলার মাধুর্য্যে কবির হৃদয় পরিপূর্ণ।

"ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা
নব বিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্বুদ মণিকার।"

বিদায়-মুহূর্ত্ত আজ সুন্দর হউক, মধুর হউক, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। সকল কোলাহলের ঊর্দ্ধে ধ্যানলোকে পরম মিলনের স্বপ্নে আজ তাঁহার চিত্ত বিভোর :

"জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্ব্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।"

আমরাও প্রণাম নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মায়ের পূজা

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

সনাতন রীতিনীতির উপর রাঘবের অশেষ শ্রদ্ধা। আবার অবস্থা সচ্ছল থাকায় স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ইনি শীর্ষস্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপ-ঘরে ইঁহার একটা চতুষ্পাঠীও ছিল। গ্রামের দু-পাঁচটি ছাত্র তথায় আসিয়া সংস্কৃত চর্চ্চা করিত। সন্ধ্যার পর ঐ আসরে আবার বৃদ্ধদিগের পাশার আড্ডাও বসিত। এবার নিজ পুত্র রমেশকে লইয়া রাঘব কিছু গোলযোগের মধ্যে পড়িলেন।

রমেশ আই-এ অবধি পড়ার পর লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া রাজনীতি চর্চ্চা শুরু করিল। তখন তিনি তাহাকে কয়েক বার উপদেশ এবং ধমক দিয়া চিঠিপত্র লিখিলেন। তাহাতেও ছেলের মতি ফিরিল না। অধিকন্তু স্বদেশী সভা ও মিছিলে আইনবিগর্হিত কার্য্য করায় রাজদ্রোহের অপরাধে সে জেলও খাটিল। এবার রাঘব স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন যে, পুত্রের সহিত তিনি অতঃপর আর কোন সংস্রব রাখিতে চাহেন না। চিঠি পড়িয়া রমেশ একটু হাসিল মাত্র।

রমেশ দীর্ঘদেহ, গৌরকান্তি, পেশীবহুল দিব্য হৃষ্টপুষ্ট নধর যুবক। তাহার চোখে একটা স্বচ্ছ ভাব ছিল। নিজের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সৌজন্যে অতি শীঘ্রই লোকের মন সে টানিতে পারিত। ঔদ্ধত্য বলিতে কোন বস্তু তাহার স্বভাবে ছিল না। যত দুর্গম মনই হউক না কেন, সে অতি অল্প আয়াসেই নিজেকে তাহার সান্নিধ্যে লইয়া গিয়া ভিড়াইতে পারিত। এই বিশেষ শক্তিটি তাহার মধ্যে ছিল।

পিতাই পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—পুত্র পিতাকে ত্যাগ করে নাই। মাতাকেও সে বহুদিন দেখে নাই। তাই ইঁহাদের চরণধূলি মস্তকে লইবার জন্য এবার পূজার কিছু পূর্ব্বে সে বাড়ীতে আসিল। তাহাকে কাছে পাইয়া গ্রামের নব্যসম্প্রদায় কৃতার্থ হইল, কিন্তু বড়রা ইহাকে বড় সুনজরে দেখিতেছিলেন না। রাঘবের মনেও ত্রাসের সঞ্চার হইল, না জানি গৃহের মধ্যে আবার কি বিপদ ডাকিয়া আনে। পুত্র আসিয়া গৃহে পা দিতেই রাঘবের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী স্বামীকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"ছেলেটা অনেক কাল পরে বাড়ীঘরে এল, তুমি যেন সর্ব্বদা অমন মারমুখো হয়ে থেক না।" পুত্রকে দেখিয়া পিতারও যে মন না টলিয়াছিল এমন নয়। তিনি যে এত কাল খোঁজ-খবর না লইয়া তাহাকে একেবারে ভুলিয়াই ছিলেন—কই, পুত্রের চক্ষে ত কোন অনুযোগই নাই।

রমেশ মনে করিল, বাড়ীতে এ সময়টাও অলসভাবে বসিয়া কাটাইয়া দেওয়া হইবে না। যে ক-দিন গ্রামে থাকিবে, ছেলেদের মনে সে একটা চেতনা সঞ্চার করিয়া দিয়া যাইবে।

গ্রামের কয়েক বাড়ীতে পূজা হইয়া থাকে। পাল আসিয়াছে, প্রতিমার গঠনকার্য্য চলিতেছে। উহা দেখিয়া তাহার খেয়াল হইল, ছেলেদের সাহায্যে গ্রামের মধ্যে এবার সে সার্ব্বজনীন পূজা করিবার সূচনা করিয়া দিয়া যাইবে। সনাতনীরা হয়ত ক্ষেপিয়া যাইবেন। তা যাউন, এরূপ বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মুখীন হইতে তাহারা ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। তাহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ছেলেরাও তাহাকে সমর্থন করিল ও মাতিয়া উঠিল। ক্রমে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাঘবও শুনিলেন।

আকাশে সেদিন চন্দ্রালোক ছিল না। রাঘব মণ্ডপঘরের খাটের উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। অদূরে মেঝের উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। তাহার খানিকটা আলো ঘরের দ্বার দিয়া রাস্তার উপর আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রমেশ কোন্ সময় গৃহে আসিয়াছিল তিনি জানিতে পারেন নাই। এখন আবার সে মণ্ডপঘরের মধ্য দিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেছিল। তিনি ডাক দিলেন—শোন।

রমেশ মাথা নীচু করিয়া পিতার খাটের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

রাঘব বলিলেন—তোমরা নাকি গাঁয়ের মধ্যে আবার সার্ব্বজনীন পূজো—না, কি করছ ?

রমেশ বলিল—হ্যাঁ।

রাঘব একটু বক্র দৃষ্টিতে বলিলেন—মুচি মেথর নিয়ে একাকার করবার এ খেয়াল আবার তোমাদের কেন হ'ল ?

রমেশ বলিল—খেয়াল কিছুই নয়। মায়ের কাছে সকল ছেলেই সমান। মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আর কত কাল ওদের বন্দীভাবে রাখা যাবে? শহর-ঘাট অঞ্চলে আজকাল এ সকল আর রীতিবিরুদ্ধ ব'লে কেউ মনে করেন না। মাঠে ঘাটে অলিতে গলিতে এ রকম কতই হচ্ছে।

রাঘব বলিলেন—শহরের কথা ছাড়। সেখানে কি জাত-জন্ম বিচার আছে? ম্লেচ্ছর দেশ—যার যা মনে হয় সে তাই ক'রে হজম করে। সেখানে না আছে সমাজ - না আছে শাসন। এখানে ও সকল চলবে না।

রমেশ অপরের সঙ্গে বেশ তর্ক করিতে পারিত। পিতার সহিত তর্ক করিয়া ন্যায় অন্যায় বুঝাইয়া দিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিত। পিতা পুনর্ব্বার হুঁকায় টান দিতে শুরু করিলেন দেখিয়া সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোকে রাঘব দেখিলেন, নিত্য যেমন আসিয়া থাকেন, পাশার খেলোয়াড়েরা তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার চিত্ত চিন্তাকুলিত হইয়া উঠিল। সকলে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলে বৃন্দাবন বলিলেন—ব'সে ব'সে হুঁকোই টানছ, এখনও যে আসর পাত নি?

রাঘব বলিলেন—এই পাতি, এস।

তিনি খাটের পার্শ্বে অবস্থিত একটা রং-চটা ভাঙা আলমারীর মস্তক হইতে পাশার সরঞ্জাম পাড়িয়া ইঁহাদের হাতে দিয়া আর একবার কলিকায় তামাক সাজিলেন।

গ্রামে এই যে একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড হইতে যাইতেছে রাঘবের পুত্রই ইহার মূলে বলিয়া কথাটা এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহ উত্থাপন করিতে পারে নাই। রাঘবও চুপ করিয়াই ছিলেন। কিন্তু সময় ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, আর ইঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। আজ সকলে যুক্তি করিয়া আসিয়াছিলেন, কথাটা যেরূপে হউক তুলিতেই হইবে। এ জন্য তাঁহারা গ্রামের জমিদার অমরেশ চট্টোপাধ্যায়কেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। অমরেশ ইঁহাদের মধ্যে বয়সে কাঁচা; গোঁপ দাড়ি কামানো, ছিপছিপে গৌরকান্তি, রূপবান সাহসী পুরুষ, স্বাস্থ্যটি যেন সযত্নে রক্ষণ করিয়া চলিয়াছে। লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি বৃহন্নলার ন্যায় পৃষ্ঠবিলম্বিত। বয়সে অল্প হইলেও সে জমিদারপুত্র, সে হিসাবে পসার-প্রতিপত্তি যাহা থাকিবার সমস্তই তাহার ছিল। খাটের উপর পাশার বাজি পাতিয়া লইতেই অমরেশ প্রথমেই কথাটা পাড়িল। রাঘবকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—এদিকে যে এক অনাছিষ্টি কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল, খুড়ো মশা'র কানে কিছু এসেছে?

রাঘব সমস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—কানে এসেছে বইকি! নিজের ছেলেটাই বাঁদর হয়ে গেল, আমি আর কাকে কি বলি? বাপ-পিতামোর নাম এরাই ডুবুবে।

অমরেশ বলিল—এত বড় একটা কাণ্ডর কথা শুনে আপনি নিশ্চিন্ত আছেন, আশ্চর্য্য!

রাঘব বলিলেন—নিশ্চিন্ত কি আর আছি? নিজের ছেলেটাকেই সর্ব্বাগ্রে দেখছিলাম, শোধ্রাবার হ'লে শুধ্রে যেত। যাক্ গে, অমন অকালকুষ্মাণ্ডে আমার প্রয়োজন নেই। মুচি মেথরের গলা ধ'রে দুগ্গো পুজো—দু-দিন বাদে ব্যাটারা বলবে—তোমরা ঢাক পেটাও, আমরা পুজো করি।

সর্ব্বজয় বাঁড়ুয্যে বলিলেন—কথাই ত তাই। গাঁয়ের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ না হ'তে পারে তার উপায় তুমি কর।

রাঘব বলিলেন—উপায় আর কি? মুখের কথায় কিছু হবে না, লাঠৌষধের প্রয়োজন। অমরেশ এসেছেন, ভালই হয়েছে। তোমার চাকর নিজামতুল্যাকে বলে রেখ, ছোট বড় খান-পঞ্চাশেক বাঁশের লাঠি যেন জোগাড় ক'রে রাখে।

অমরেশের চাকর শুধু নিজামতুল্যা নয়—আরও অনেক-গুলি ছিল। নিজাম লাঠিখেলায় মজবুত, সে কারণ তাহারই নামটি লওয়া হইল।

অমরেশ বলিল—শেষ পর্য্যন্ত তাই দাঁড়াবে দেখছি। কিন্তু আগে থাকতে যত্ন নিলে বোধ করি ভাল হ'ত।

রাঘব বলিলেন—কি ভাল হ'ত? নিজের ছেলেটাকেই বাগে আনতে পারলাম না, ওরা কি কারুর হিত কথা শুনবে? একটা আধলা পয়সার সামর্থ্য নেই, দেশ-উদ্ধারে মেতেছেন।

পুত্র ইহার মধ্যে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সমাজের গাত্রে আসিয়া প্রচণ্ড আঘাত পড়িতেছে ইহা স্মরণ হইলে রাঘব আর মনের উষ্মা দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। না হয় পুত্রের সঙ্গে এবার প্রকৃতই বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে—সমাজ ত রক্ষা পাইবে।

সর্ব্বজয় বলিলেন—লাঠি-ঠেঙা নিয়ে শেষটা একটা হাঙ্গামা বাধাবেন?

রাঘব বলিলেন—তার আর কি করা যাবে? নীতি-

ধর্ম্ম যারা মানে না, সে সকল ম্লেচ্ছদের ওষুধই হ'ল তাই। তবে কি না আমরা হলাম ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে বেড়ানই আমাদের ব্যবসা। লাঠির কসরৎ আমাদের জানা নেই। সে সকল বিধি-ব্যবস্থা অমরেশকেই করতে হ'বে। পূজোর জন্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত না পায়, সেটা আমি দেখব।

লাঠিসোঁটার কথা শুনিয়া সর্ব্বজয় কিছু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন; শেষটা যদি পুলিস-কেস্ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়, কাকে ধরবে, কাকে টেনে বাঁধবে, কে জানে? তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন—রমনার মাঠে হোগলা দিয়ে মণ্ডপ বাঁধতে আরম্ভ করেছে দেখলাম, এই সময় গোড়াতেই বাধা দিলে ত ভাল হ'ত?

রাঘবের মনেও অবশ্য এক এক বার ইহা খেলিতেছিল। ভয়ভীত দেখাইলে যদি নিরস্ত হইয়া যায়। কিন্তু অমরেশ জমিদারের ছেলে, তাহার দেহের রক্ত কিছু উষ্ণ। সে কহিল—এখন ঘা দিলে অপর এক জায়গায় গিয়ে মণ্ডপ তুলবে। নয় ত ঐখানেই পুলিস এনে মোতায়েন করবে। তার চেয়ে সপ্তমী পূজোর দিনই একেবারে 'মার' 'মার' ক'রে গিয়ে পড়ে ঘট-পট উল্টিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে এলেই হবে।

ইহার প্রতিবাদ আর কেহ করিলেন না।

এদিকে ছেলেরাও বুঝিয়াছিল, নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের কার্য্য সমাধা হইবে না। কে কোন্ তর্কে ফিরিতেছে, তাহাদের চর সর্ব্বত্র ঘুরিতেছিল, পূজার দিনে একটা হাঙ্গামা হইবে তাহারাও জানিতে পারিল। রমেশকে তাহারা বলিল—জমিদারবাড়ীতে নিজামতুল্যা লাঠি তৈরি করতে লেগে গেছে, তুমি হুকুম কর রমেশ-দা, দেশে যত বাঁশের ঝাড় আছে তোমার পায়ের গোড়ায় এনে জড় করি; দেখা যাক, কার লাঠির জোর কত।"

রমেশ জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল—বাপ দাদার মাথায় লাঠি মারলে নিজেরাই আমরা হতবল হব। এমন বুদ্ধি কোন দিন ক'রো না। প্রাচীন মতগুলো ত আর এক দিনে গড়ে ওঠে নি, যে এক দিনেই তা ভাঙা যাবে? ওঁদের দোষ কিছু নেই, একটা অভ্যস্ত পথ ধ'রে চলেছেন, সহজে সেটা ত্যাগ করতে পারছেন না।

বিভূতি বলিল—সে যেন বুঝলাম। কিন্তু শেষটা যদি ওঁদের দিক্ থেকে আক্রমণই সুরু হয়?

রমেশ হাসিয়া বলিল—বেশ ত। লাঠির নীচে মাথা পেতে দিলেই হবে। পুত্রের রক্ত—ভ্রাতার রক্ত দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন। তাতেই আমাদের কাজ হবে। তবে লাঠির জোর যাতে ওঁদের কমে, তেমন কৌশল আমি দেখব।

রমেশের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে আবার আগ্রহের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইল। ইহার পর রমেশ গৃহে-গৃহে অন্দরে-অন্দরে ফিরিয়া খুড়ী, জ্যেঠী, দিদি, পিসী ইঁহাদের দরজার গোড়ায় বসিয়া কাহাকেও বলিল—এক কাপ চা খাওয়ান না পিসীমা? কাহাকেও বলিল—চিঁড়ে চাপাটি ঘরে আছে দিদি! বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

খাইতে বসিয়া সে গল্প জুড়িয়া দেয়। যাহা সে বলে তাহার উপর তাহার কি পবিত্র বিশ্বাস—আর কি রহস্যময় তাহার চক্ষু দুটি। দেশের অন্যায় অত্যাচারের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে প্রস্তুত। সমাজে যাহারা লাঞ্ছিত পীড়িত তাহাদের কল্যাণের জন্য—মুক্তির জন্য ইঁহারা শুধু একটু প্রার্থনা করুন ইহাই সে চাহে, আর কিছুই নয়। ইহার মুখের যুক্তিপূর্ণ এই সকল মিষ্ট বাক্য শুনিতে শুনিতে নূতন একটা চিন্তা ও অনুপ্রেরণায় সময় সময় ইঁহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে দিনও সংক্ষেপ হইতেছিল আর অমরেশের বাড়ীতে বৃদ্ধদিগের ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছিল এবং পূজার দিনে ছেলেদের যে উপায়ে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবেন এক এক দিন তাহার এক একটি মনোরম চিত্র নেত্রসম্মুখে অঙ্কিত করিয়া তাঁহারা সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন।

রমনার মাঠে মণ্ডপ প্রস্তুত শেষ হইয়া গেলে, তন্মধ্যে এক উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া ছেলেরা তাহার উপর মহামায়ার মূর্ত্তি স্থাপিত করিল। বেদীর চতুষ্পার্শ্বে বাঁশের বেড়া দেওয়া। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ ফটক। পথের যেখানে যেখানে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে সেখানেও এক একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্তই পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত। পূজার দিন গ্রামের ত বটেই, পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের ইতর ভদ্র অনেকেই এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিয়াছে। সমাজে যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত, প্রত্যেকেরই হস্তে পূজার অর্ঘ্য ও ভোগ-সামগ্রী। মুখে হাসির হিল্লোল—আনন্দ উৎসাহ ও ব্যস্ততার যেন আর শেষ নাই। যেন বহুকালের এক বেদনাদায়ক কলঙ্ক হইতে মুক্তির কারণে মায়ের চরণে আসিয়া সকলে একত্র হইয়াছে। দৃশ্যটি দেখিয়া পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইবে যে, কি নিষ্ঠুরতা দিয়া এত কাল এই মহা আনন্দ হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

রাঘব পণ্ডিতের দল যখন শুনিলেন উৎসবক্ষেত্রে আশ-পাশের গ্রাম হইতেও বহু লোক আসিয়া একটা জনসমুদ্রের

সৃষ্টি করিয়াছে তখন তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আবার এতটা আগাইয়া উঠিয়া এখন পিছাইয়া পড়িলেও সমাজের লোকের কাছে নেতা বলিয়া আর মুখ উঁচু করিতে হইবে না। অমরেশও ভরসা দিলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, নির্জ্জীব জনতা, উহার কোন শক্তিই নাই। বিশ-চল্লিশখানা লাঠি লইয়া পড়িলে কোথায় কে ভাগিয়া পলাইবে।

কথাটা একেবারে অসত্যও নহে। জমিদারবাড়ী হইতে লাঠি-সোঁটা লইয়া লোক আসিতেছে গুজব শুনিয়াই বাহিরের লোক সমস্ত পূজার স্থান ছাড়িয়া মাঠের অপর প্রান্তে গিয়া জড় হইতে লাগিল। ইঁহারা আসিয়া সমস্তই ফাঁকা দেখিলেন। কিন্তু জটলা পাকাইয়া আসিতে আসিতে এদিকে তখন মায়ের পূজা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্কল্পই ছিল যে মহামায়ার বিগ্রহটি গুঁড়া করিয়া দিয়া যাইবেন, যেন ইহার পর অষ্টমী নবমী ইত্যাদি যথা-বিহিত পূজাগুলি আর সম্পন্ন না হইতে পারে। তখন মহামায়া আর দেবতা থাকিবেন কি থাকিবেন না ইঁহারাই বলিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবেন এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। আসিয়া রাস্তা ফাঁকা পাইয়া তাঁহারা সকলে 'মার' 'মার' শব্দে একেবারে মণ্ডপঘরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজার জন্য ছেলেরা কোনও ব্রাহ্মণই পাইবে না, তাঁহাদের অটুট বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামের হরিহর ভট্টাচার্য্য ও মধু ঠাকুর আসিয়া পূজায় বসিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সকলেরই ঘরের গিন্নীবান্নীরা আসিয়া বেদীর উপর মহামায়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া মায়ের আরত্রিক কার্য্যে—কেহ বা ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া দিতেছেন, কেহ বা ময়ূরপাখার দ্বারা মহামায়াকে বাতাস করিতেছেন, কেহ বা চামর ঢুলাইতেছেন। ইঁহারা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন যে কি করিয়া প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি সে মানসিক দৃঢ়তা ইঁহারা হারাইয়া ফেলিলেন। তখন ক্রোধে কেহ ফুলিতেছিলেন, কেহ কাঁপিতেছিলেন, কাহারও বা মাথার শিরা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

অমরেশের স্ত্রী সাবিত্রীও আসিয়াছিলেন। তিনি বয়সে তরুণী, শিক্ষিতাও বটে। তিনি ইঁহাদের এই রণমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী খুড়ীমা জ্যেঠাইমা—ইঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, এঁরা আবার কি মূর্ত্তিতে এসে হাজির হলেন। এখন উপায় কি?" বলিয়াই সাবিত্রী আর কালহরণ না করিয়া তাড়াতাড়ি রেলিঙের ধারে চলিয়া আসিলেন এবং স্বামীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—তোমরা দেখি একেবারে রণ-সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছ, কিন্তু এই লাঠি ঋষি চণ্ডাল যার মাথায় মার না কেন আমাদের মাথায় এসেই পড়বে।

রামতারণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী বেদীর উপর হইতে আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে স্বামীকে বলিলেন—কাঙ্গাল ছেলেদের নিয়ে মায়ের আজ কি আনন্দ! আহা, কি আনন্দ! এমনটি কোন দিন দেখ নি, একবার চর্ম্মচক্ষে দেখে যাও।

সর্ব্বজয় বাড়ুয্যে রাঘবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খুড়ো, আমরা কেবল বাহিরে বাহিরেই লাঠি-সোঁটা জড় ক'রে মরেছি। ছোঁড়ারা দেখি একেবারে অন্দরে এসেই হাত দিয়েছে। বেদীর উপর মধু ঠাকুরের পাশে বসে ধুনোর ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন কে? খুড়ী না?"

রাঘব দেখিলেন, তাঁহারই স্ত্রী ভুবনেশ্বরী। এই সময় স্বামীর সহিত চোখোচোখি হইতে ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি তাম্রকুণ্ড হস্তে লইয়া রেলিঙের ধারে আসিলেন। বলিলেন, "তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে। মায়ের এক-একটু চন্নামেত্ত ধর।"

তিনি চরণামৃতের কুশীটি স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

মধ্যভারতে বাঙ্গালীদের কৃতি সম্বন্ধে গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে মিঃ ভিভিয়ান বোসকে সার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র লেখা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পৌত্র।

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষিক্ষেত্রসমূহে যন্ত্রসাহায্যে গম ও অন্যবিধ ফসল এইরূপে তোলা হইয়া থাকে

রুশের সমস্যা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের আরম্ভের সময় ব্রিটিশ মিত্রবর্গ সহায়তা করিতে চাহিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মুখপাত্র তাহাতে বলেন যে, রুশ দেশ বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়াই দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে যে কোন প্রকার সাহায্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। আজ ঠিক দেড় মাস কাল অবিশ্রাম ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, এখনও যুদ্ধের পরিণতির কোনও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় নাই, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে জার্ম্মান সেনাবাহিনী রুশ দেশের যে পরিমাণ ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়াছে তাহা হইতে এই আধুনিক কুরুক্ষেত্রে কি বিরাট্ ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলিতেছে তাহা বুঝা যায়।

রুশ সেনা ও রুশ রাষ্ট্রকে ভীষণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সময়ের অনুপাতে জার্ম্মান সেনা কর্ত্তৃক দেশাধিকারের এবং রুশ-শক্তির সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ নাশের পরিমাণও অতি বিষম। কিন্তু এরূপ বিশাল সমর-অভিযানকে ইতিহাসের যথাযথ দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের যুদ্ধশক্তি ও দেশরক্ষার আয়োজনের যে খ্যাতি জগৎময় প্রচারিত হইয়াছিল তাহা অতিরঞ্জিত নহে। উপরন্তু যদি অতর্কিত আক্রমণ, যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় শক্তি যোজনার ব্যবস্থা এবং সমর-অভিযান চালনার কার্য্যক্রমের বিধানে দুই পক্ষের অবস্থার বিচার করা হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, ইয়োরোপের অন্যান্য অংশের উচ্চ শিক্ষিত এবং আভিজাত্যস্পর্দ্ধী সেনানায়ক চালিত সৈন্যদল অপেক্ষা গণতন্ত্রবাদী রুশসেনা জার্ম্মান সেনার বিরুদ্ধে অধিকতর যুদ্ধক্ষমতা দেখাইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত সমর-ক্ষেত্রে মান-অপমানের কোঠায় তাহাদের খ্যাতি হ্রাস হয় নাই।

অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত এই জার্ম্মান আক্রমণের আরম্ভ হয়। একমাত্র নরওয়ে আক্রমণে জার্ম্মানগণ এইরূপ অতর্কিত আঘাত দিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং এই অভিযানের দিগন্তপ্রসারী ব্যাপক আক্রমণের ব্যবস্থা এবং প্রচণ্ড বলে সংহারশক্তির প্রয়োগনৈপুণ্য বোধ হয় জার্ম্মানীর বাহিরে কোনও যুদ্ধশাস্ত্রবিদ্ কল্পনাও করেন নাই। বিরাট্ জার্ম্মান বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের সৈন্যচালনা ও শক্তিযোজনার ব্যবস্থা চরমে উঠিয়াছিল এবং এই ব্যবস্থা ও চালনা যাহাদের নেতৃত্বে হয় তাহাদের যুদ্ধশাস্ত্রের জ্ঞান অতি আধুনিক। শস্ত্রবলের ক্ষেত্রেও কি স্থলে কি আকাশে জার্ম্মান শক্তি অভিনবতম অস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

রুশ যে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা জানিত যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের যুদ্ধে নামিতে হইবে, কিন্তু এত শীঘ্র যে দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা যে তাহারা ভাবিতেও পারে নাই তাহার প্রমাণ যুদ্ধের প্রথম কয় দিনেই তাহাদের বিষম ক্ষতি এবং যুদ্ধ বাধিবার পর স্টালিন কর্ত্তৃক শত্রু-অধিকৃত দেশে "পোড়া মাটি" মাত্র রাখিবার আদেশ দান। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সৈন্য-যোজনা ও যুদ্ধ-ব্যবস্থা দুইই সময়সাপেক্ষ এবং যানবাহনের ব্যবস্থায়ও অনেক ক্রটি আছে। সুতরাং এখনও তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধ-ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। আধুনিক যুদ্ধে কালক্ষয় অতি সাংঘাতিক ব্যাপার। জার্ম্মানী এই বিষয়ে এখনও রুশ অপেক্ষা

ট্রান্স-ককেসিয়া ও উরাল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত
ইউরোপীয় রুশিয়ার মানচিত্র

FINLANDE
ESTHONIE
LETTONIE
LITHUANIE
POLOGNE
ROUMANIE
TURQUIE
LENINGRAD
25 et 26 Juin
Leningrad-Moscou
650 Km.
Moscou-Leningrad
650 Km.
Bologoe
Tver
Volga
Moscou-Nijni-Novgorod
450 Km.
Niegoreloje-Moscou
800 Km.
MOSCOU
A. 19 Juin, D. 27 Juin
A. 21 Juillet, D. 3 Août
Vladimyr
NIJNII-NOVGOROD
28 Juin
KAZAN
MINSK
Orska
Smolensk
Viazma
Niegoreloje
A. 18 Juin
D. 4 Août
Tula
Ulianovsk
SAMARA
Dniepr
Kharkov-Moscou
781 Km.
Orel
Nijni-Novgorod-Stalingrad
1752 Km. (en bateau)
Kursk
SARATOV
Shepetovka
25 Juillet
KIEV
Kharkov-Kiev
493 Km.
KHARKOV
20 Juillet
Don
Oural
Kiev-Shepetovka
316 Km.
Poltava
Dniestr
Rostov-Kharkov
400 Km. (en avion)
U K R A I N E
STALINGRAD
2 Juillet
Odessa-Shepetovka
547 Km.
Dnieprostroy
19 Juillet
Stalingrad-Rostov
338 Km.
Zaporojie
ROSTOV
5 Juillet
ODESSA
22-24 Août
Yalta-Kharkov
749 Km.
Sovkhoz-Verblud
3 et 4 Juillet
Armavir
Bakou-Rostov
1140 Km. (en avion)
Novorossysk
Yalta-Odessa
420 Km. (en bateau)
Yalta
Tuapse
Rostov-Bakou
1270 Km.
Sotchi
VLADIKAVKAZ
Grosny
M E R N O I R E
C A U C A S E
Batoum-Yalta
750 Km. (en bateau)
240 Km.
BATOUM
TIFLIS
9 et 10 Juillet
Tiflis-Batoum
349 Km.
Gianja
Bakou-Tiflis
550 Km.

এই মানচিত্রে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান রুশ-অভিযানের লক্ষ্যের বিষয়গুলি প্রদর্শিত হইতেছে

সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্পকারখানার মহিলা কর্ম্মিগণ

অনেকখানি শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে আছে, সুতরাং যে অনুপাতে রুশের বলক্ষয় ও যুদ্ধোপকরণ নাশ হইতেছে তাহাপেক্ষা অনেক দ্রুতবেগে ক্ষতিপূরণ না করিতে পারিলে তাহার সমূহ বিপদ অনিবার্য্য।

শস্ত্রসজ্জায় রুশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের তুলনা করিলে জার্ম্মান যুদ্ধোপকরণ উৎকৃষ্টতর সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধোপকরণের পরিমাণে এবং শস্ত্রচালনায় শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যায় রুশ অধিকতর বলশালী বোধ হয়। যন্ত্রচালিত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থায় গণতন্ত্রবাদী "সাধারণ শ্রেণীর" রুশ অধিকারীবর্গ পাশ্চাত্য দেশে উচ্চবর্ণের সমরচালকদিগকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল মনে হয়।

জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠতর স্থিতির কারণ ও পরিমাণ যাহাই হউক রুশ এখনও অদম্য সাহসে যুঝিতেছে, এখনও তাহার সৈন্যদল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভগ্ন ব্যূহে শক্তিপরীক্ষা করিতেছে। মানবজাতির ইতিহাসে এত বিরাট যুদ্ধের তুলনা পাওয়া যায় না এবং এ যুদ্ধের সংহার ও ধ্বংসেরও ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু রুশ—অসংস্কৃত গণতন্ত্রবাদী রুশ—আজ এই দেড় মাসের অবিশ্রাম কঠোর অগ্নিময় প্রলয় কাণ্ডের সম্মুখে যে শৌর্য্য ও ধৈর্য্য দেখাইয়াছে তাহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে একমাত্র চীন-সেনা কিছু পরিমাণে দেখাইয়াছে। এই যুদ্ধে এই প্রথম বার জার্ম্মান সেনাদল এক ব্যাপক আক্রমণে শত্রুজয়ে সফল হয় নাই।

* * *

জার্ম্মান-অভিযান এক বার গতিরুদ্ধ হইবার পর (১১ই জুলাই) এখন লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে মনে হয়। প্রথম আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সমরক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া সোভিয়েটকে ফ্রান্সের ন্যায় শক্তিহীন ও পদানত করা। সে উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় এখন বোধ হয় জার্ম্মানী সোভিয়েটের শক্তির আকরগুলি অর্থাৎ তাহার যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করার চেষ্টায় আছে। ইয়োরোপীয় রুশ দেশের ছয়টি অঞ্চলে এই সোভিয়েট কলকারখানা ও খনিগুলি আছে। তাহার মধ্যে উত্তরে লেনিনগ্রাডের কলকারখানা এবং দক্ষিণে উক্রাইন অঞ্চলের খনি, কারখানা ও শস্যক্ষেত্রগুলিই জার্ম্মান সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। উক্রাইনের যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলি ও তাহার পরে ডন নদ অঞ্চলের খনি ও ধাতুপরিষ্কৃতির কারখানাগুলি এখনও কিছু দূরে আছে। উরাল ও খনিজ তৈলের আকরপূর্ণ ট্রান্স-ককেসিয়া বহু দূরে আছে, তাহার পূর্ব্বেই বোধ হয় মস্কো আক্রান্ত হইবে। তবে যুদ্ধের এখন যেরূপ গতি হইয়াছে তাহাতে মস্কোর পতনে বা উক্রাইন অধিকারে যে যুদ্ধের শেষ হইবে তাহা মনে হয় না। সোভিয়েট বাহিনীর প্রধান বিপদের কারণ তাহার যন্ত্রচালিত যুদ্ধাস্ত্রের নাশ। এই বিষয়ে তাহার ক্ষতিপূরণ না হইলে ক্রমেই তাহাকে ক্ষীণবল হইয়া পিছাইতে হইবে। উক্রাইন, লেনিনগ্রাড ও মস্কো অদূর ভবিষ্যতে শত্রুহস্তে গেলে এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী, কেন না ব্রিটিশ মিত্রবর্গের সাহায্যপ্রদান ব্যাপার যে এখনই বিশেষ কিছু ঘটিয়া উঠিবে তাহা মনে হয় না। কিন্তু পিছু হটা ও পরাজিত হওয়ায় অনেক প্রভেদ। রুশদল ভগ্নোদ্যম বা বিপ্লবকলুষ্ট হইলেই তাহার পরাজয় সম্ভব। এখনও এই দুইয়ের কোনও চিহ্ন মাত্র নাই।

রুশ প্রকৃতপক্ষে এশিয়াটিক এবং এশিয়াটিকের দুঃখ-কষ্ট বরণ করিবার ক্ষমতা অসীম, অনন্ত, তাহার প্রমাণ

উক্রাইনের শস্যক্ষেত্র

ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে বর্ত্তমান। আধুনিক কালে চীন যে দুঃখ যে ক্ষতি সহ্য করিয়া এখনও ধীর স্থির ভাবে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহার তুলনা পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। চীন যেরূপে পিছু হটিয়া সমস্ত দেশের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া এখনও টি কিয়া আছে, রুশ ইচ্ছা করিলে উহা অপেক্ষা প্রবলতর বাধা দিতে দিতে পিছু হটিয়া তাহার ৮০,০০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত দেশের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে আর বহুদিন অতিবাহিত করিতে পারে। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ সংগ্রাম পরিণতির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া সোভিয়েট নেতৃগণ রাষ্ট্রের অতি দূরস্থ নানা অঞ্চলে কলকারখানা, শস্যক্ষেত্র, খনি খাদান ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করেন। এত দিনে সেগুলির কার্য্য নিশ্চয়ই কতক অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং বিপরীত অভিযানেও রুশ সম্বলবিহীন হইবে না।

গত মহাযুদ্ধে রুশ-সাম্রাজ্যের সৈন্যদল অতি বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দারুণ অস্ত্র ও রসদের অভাব সত্ত্বেও, প্রায় তিন বৎসর কাল জার্ম্মান সৈন্যের শ্রেষ্ঠ অংশ ও শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ৭০,০০,০০০ সৈন্যকে যুদ্ধে আহুতি দিবার পর দেশে অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় রুশগণ পরাজিত হয়। কিন্তু এই তিন বৎসরের যুদ্ধে জার্ম্মানীর ও অষ্ট্রিয়ার যে বলক্ষয় হয় তাহারই ফলে মিত্রপক্ষ যে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হয়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধেও সোভিয়েট নেতৃবর্গ হতোদ্যম না হইলে বা দেশ বিপ্লববিধ্বস্ত না হইলে জার্ম্মানীর ঐ ক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের আশা সুদূরপরাহত। অন্য দিকে আবার যুদ্ধে সম্পূর্ণ

জোসেফ ষ্টালিন

জয়লাভ না করিতে পারিয়াও জার্ম্মানী রুশ রাষ্ট্রের মহামূল্য ভূমিজাত সম্পদ অধিকার করিতে পারিলে তাহার বর্ত্তমান প্রবল পরাক্রান্ত ভাব বহুদিন রাখিতে পারিবে। সুতরাং এই যুদ্ধে মানব জাতির ভাগ্যপরীক্ষা চলিতেছে বলা যাইতে পারে।

১৯এ শ্রাবণ।

মহিলা-সংবাদ

আগ্রার অধ্যাপক জীবনচন্দ্র তালুকদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দীপালি তালুকদার এ বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীমতী দীপালি তালুকদার

শ্রীমতী ইরা চৌধুরী এ বৎসর অপেক্ষাকৃত কম বয়সে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্গীত, নৃত্য ও ললিতকলায় তিনি বিশেষ নিপুণা। তিনি জব্বলপুর স্পেন্স্‌ ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মণিলাল চৌধুরীর কন্যা।

লেডী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ গুজরাটি মহিলাদের মধ্যে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী মেহ্‌তা এম্‌-এ উপাধিধারিণী। তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী বৎসলা মেহ্‌তা সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লেডী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ (দক্ষিণে), শ্রীমতী সরোজিনী মেহ্‌তা (বামে), কুমারী বৎসলা মেহ্‌তা (মধ্যস্থলে)

শ্রীমতী ইরা চৌধুরী

লেনিনগ্রাডের শীতকালীন প্রাসাদ। রুশ সম্রাটদের আমলে এই প্রাসাদে মন্ত্রিগণ কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন

খারকোভে সরকারী শিল্প-ভবন

নিজ্‌নি-নভগোরডের সমীপবর্ত্তী ভল্‌গা নদী। নদীবক্ষে নৌকা

মস্কোর কাল্‌চারাল পার্কে সমবেত লোক-নৃত্য

বিবিধ প্রসঙ্গ

বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্য

মহাকবি টেনিসন তাঁর "স্মরণে" ("In Memoriam") কাব্যে বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্যকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করেছেন :—

"Sleep, gentle winds, as he sleeps now,
My friend, the brother of my love;
My Arthur, whom I shall not see
Till all my widow'd race be run;
Dear as the mother to the son,
More than my brothers are to me."

—

রবীন্দ্রনাথের "স্মৃতিচিহ্ন"

রবীন্দ্রনাথের "স্মৃতিরক্ষা"র কথা উঠেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইংলণ্ডেও উঠেছে। ইংলণ্ডের কথা ইংলণ্ডের লোকেরা ভাব্‌বেন, আমাদের কথা আমরা যেন ঐকান্তিকতার সহিত ভাবি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি কাউকে রক্ষা করতে হবে না। ঈশ্বরকৃপায় তিনি যে নানা শক্তি পেয়েছিলেন, তার সুব্যবস্থার দ্বারা তিনি যা ক'রে গেছেন, তার দ্বারাই তিনি চিরস্মরণীয়, চিরস্মৃত, অমর হয়ে থাকবেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন,

ধন্য সেই নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে যারে পূজে অনুক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁকে মানুষ যাতে না ভুলে, এমন কিছু অন্য কাউকে ক'রতে হবে না।

তাঁর স্মৃতিচিহ্ন অনাবশ্যক বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার স্থায়ী কিছু চিহ্ন চাই।

জগৎকে তিনি দিয়ে গেছেন অপরিসীম ঐশ্বর্য। জগৎ তার কি প্রতিদান ক'রবে? যথাযোগ্য প্রতিদান অসম্ভব। কিন্তু কৃতজ্ঞতা অনুভব ও প্রদর্শন সম্ভব।

কবি সকলের চেয়ে বেশী দিয়েছেন, সাক্ষাৎভাবে দিয়েছেন, বাঙালীকে। বাঙালীরা কেউ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে নি, এমন নয়। এই কৃতজ্ঞতার বাহ্য রূপ চাই। কবি মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছিলেন, বিশ্বভারতীরূপ নৌকাতে তাঁর জীবনের সব ধনরত্ন নিহিত হ'য়েছে। এই বিশ্বভারতীর যে আদর্শ তিনি ব্যক্ত ক'রে গেছেন, তা সম্পূর্ণ বজায় রেখে এটিকে স্থায়ী করা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়। সেই উপায় অবলম্বন করা হোক।

লক্ষ্য হওয়া উচিত, বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। তা অনেক মাস আগে বলেছি। কিন্তু আপাততঃ কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে, দু-বৎসরের জন্যে নয়, পাকাপাকি অঙ্গীভূত (affiliated) করুন।

—

"মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই"

সন ১২৯৪ সালে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি এক দাদামশায় ও তাঁর নাতির ৯ খানি চিঠির সমষ্টি। নাতির শেষ চিঠির শেষের দিকে আছে, "**মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই।**"

নাতি তার শেষ চিঠিতে কি লিখেছিলেন, কেন লিখেছিলেন, জান্‌তে হ'লে, দাদা মশায়ের তার আগেকার চিঠির কোন কোন কথা জানা দরকার। দাদা মশায় শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন :—

"আমি তো ভাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে-দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায় সেখানে বড়ো জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলাজমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আনিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিতেছে কিন্তু উপায় নাই, কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই, অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভালো— আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্ম্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা পরিবারপ্রতিম প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভালো। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণ সকল আমরা কোথায় পাইব, কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট। অবিশ্রাম কর্ম্মানুষ্ঠান, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ, নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন, অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দহন— সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল

দেহে পারিব কেন। কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।"

এই কথাগুলির মধ্যে মোটেই সত্যি কিছুই নাই বলা যায় না। তবু এমন কথা প'ড়ে কোন্ উষ্ণশোণিত সবল-দেহ যুবক উত্তেজিত না হয়? তাই এর উত্তরে নাতি লিখলেন :—

শ্রীচরণেষু

তবে আর কী। তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরেজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো। অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া একত্রে কাজ করিবার জন্য অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে-সমস্ত হইতে দূরে থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান, ডাবা হুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষ্য পদার্থ করিয়া রাখো।"

তার পর, আরো নিঃসংশয় হবার জন্যে নাতি দাদা-মশায়কে জিজ্ঞেস করছেন :—

দাদামহাশয়, তুমি কি সত্য সত্যই বলিতেছ, আমরা এক শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেইরূপ থাকাই ভালো, আর কিছু মাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই; জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। লোকহিতপ্রবর্তক উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই, পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড়োলোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্বল হৃদয়ে বড়োলোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়। তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাকো, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করো, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন করো।"

দাদামশায়ের পরামর্শ কিন্তু নাতি গ্রহণ করতে পারবে না। নাতির ভাষায় তার কারণটা শুনুন।

"কিন্তু এমন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, **আমরা গৃহের বাহির হইব**। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানব জাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিতেছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য, দাম্পত্য প্রেম—সমস্ত সে চাহিতেছে। তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামিপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে, তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামিসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না, তেমনি আমরা মানবপ্রেমের মর্ম অবগত হইতেছি এখন আমরা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদামশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। **মরণ হয় তো মরিব, কোনো উপায় নাই। কী সুখেই বা বাঁচিয়া আছি।**"

দাদামশায় লিখেছিলেন, "প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া" "আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—" ইত্যাদি। তারই উল্লেখ ক'রে নাতি লিখছেন :—

"আনন্দের কথা বলিতেছ। এই তো আনন্দ। এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ। আনন্দের লক্ষণ কি নূতন কিছু ব্যক্ত হইতেছে না, জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না। বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না। তাই কি সমাজের সর্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। আমাদের এদেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এ দেশে রোগশোকতাপ আছে, রোগে শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেই জন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেই জন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক—**মরিতেই যদি হয় তো যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি।**"

৫৪।৫৫ বৎসর পূর্বে ২৫।২৬ বৎসর বয়সের যুবা রবীন্দ্রনাথ তখনকার বাংলা দেশ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, এখনকার যুবকরা এখনকার বাংলা দেশ সম্বন্ধে তা বলতে পারেন কি না, তা তাঁরা বিবেচনা করবেন।

দাদা মশায় লিখেছিলেন, "কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।" মরতেই যে হবে নাতি তা মেনে নিতে পারেন নি; উত্তরে লিখেছেন :—

"আর, মরিব কেন। তুমি এমনি কি হিসাব জান যে, এক বারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা মরিতেই বসিয়াছি। তোমার বুড়ো মানুষের হিসাব অনুযায়ী মনুষ্যসমাজ চলে না। তুমি কি জান, মানুষ কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে। মনুষ্যসমাজ সাধারণত হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে সেখানে যেন ভেলকি লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয় সহসা এক দিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়ো মানুষেরা চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে তখনই সে ভেলকি লাগিবার সময়—তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর

পাইবার জো নাই। অতএব আম বাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্রনীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।"

যুবা নাতি নবীনকিশোর শর্মা বৃদ্ধ দাদামশায় ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মাকে আপন প্রতিজ্ঞা জানাবার জন্যে লিখছেন :—

"হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমওয়েল যখন প্রজাদলের দাসত্বরজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন; ওয়াশিংটন যখন নূতন জাতির স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কী। **নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু।** আমরা হয় বাঁচিব না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদা মশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। **তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে। জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে। সমস্তই যে অন্ধকার।**

"বিদায় লইলাম, দাদা মহাশয়। আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার পরে বুড়োমানুষের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌছিবার পূর্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ পথের মধ্যে খানা আছে ডোবা আছে সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভালো—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বল পাইতেছি না; আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীনবুদ্ধি বটে কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বুদ্ধি পাইতেছি না। অতএব আমার যেটুকু বল যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম, **মরিতে হয় তো চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।"**

নাতির এই পত্রের উত্তরে দাদামশায় যে চিঠি লিখেছিলেন, সেইটিই "চিঠিপত্র" বইয়ের শেষ চিঠি। সেটি পড়লে বোঝা যায়, তিনি নবীনকিশোরের অযোগ্য দাদা-মশায় ছিলেন না। তার গোড়াতে তিনি বলছেন :—

"চিরজীবেষু,

"ভায়া তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মতো শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কী করিয়া। তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।"

সমস্ত চিঠিটিই অভিনিবেশপূর্বক পড়বার যোগ্য। তার থেকে কেবল দু-একটি কথা উদ্ধৃত করি।

"কাজ নাই ভাই, আমার সংশয় আমার বিজ্ঞতা আমার কাছেই থাক, তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান করো, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করো, যে স্রোতে পড়িয়াছ এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি-তীর্থের দিকে ধাবমান হও; নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।"

"......সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে বাঁধিয়া রাখো।"

[এই নিবন্ধিকাটি ২১শে শ্রাবণ লেখা ও প্রেসে মুদ্রাক্ষরে নিবদ্ধ করা হয়।]

—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জয়ন্তী

গত ১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনের আশী বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সেই দিন সেই উপলক্ষ্যে কল্‌কাতার সেনেট হাউসে সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে জয়ন্তী কমীটি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তা ছাড়া, কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট্‌স্ ও বিজ্ঞান বিভাগ দুটির অভিনন্দনপত্র এবং অনেক সভাসমিতির অভিনন্দনপত্র পড়া হয় ও তাঁকে দেওয়া হয়। অভিনন্দনপত্রের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং সবগুলি পড়বার সময় না থাকায়, অনেকগুলি সভাসমিতির অভিনন্দনপত্রের কেবল উল্লেখ করা হয় ও সেগুলি আচার্য রায়ের হাতে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও তাঁর গলায় কয়েকটি পরাবার পরেই দেখা গেল যে, আরো বেশি পরাতে গেলে সেটা হবে প্রীতিশ্রদ্ধার অত্যাচার; সুতরাং অধিকাংশ মালা স্তূপাকার ক'রে রাখা হয়েছিল।

আচার্য রায়ের বিখ্যাত ছাত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত অভিভাষণ সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল এবং সেটি পড়বার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রত্যেকটি কথা তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে বেরচ্ছে।

বলা বাহুল্য; সেনেট হাউস ও তার বারাণ্ডা শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন।

আচার্য রায় বাংলা ও ইংরেজী অনেক খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার অনেক-গুলি যে তাঁর লেখা, তা সকলের জানা নাই, কিন্তু অনেক সম্পাদক তা জানেন। যে-গুলি তাঁর নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে, সে-গুলি যে তাঁর লেখা, তা সব পাঠক জানেন। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক না হ'য়ে সাংবাদিক হ'তেন, তা হ'লে জ্ঞানবান ও নিপুণ সাংবাদিক হ'তে পারতেন; কিন্তু হন নি যে, দু দিক্ দিয়ে তা ভালই

ক'রেছেন। হ'লে তিনি বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা মানুষের হিত করতে পারতেন না, এবং তাঁর নানা মত ও প্রচেষ্টা তাঁর কাগজ ছাড়া অন্য কাগজে সমর্থিত হ'ত না ও তাঁর প্রশংসায় সব কাগজ মুখর হ'ত না।

তিনি খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে কেবল প্রবন্ধ লিখেই যে সম্পাদকদের ও পরিচালকদের সাহায্য করেছেন তা নয়, তাঁর সাক্ষাৎ চেষ্টা ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানা বৃদ্ধি পাওয়াতেও খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রগুলি নানা প্রকারে উপকৃত হয়েছে। এই জন্যে যখন সেনেট হাউসে অনেক 'অভিনন্দনপত্র পড়া হচ্ছিল, তখন আমরা ভাবছিলাম ইণ্ডিয়ান জার্ন্যালিস্টস্ এসোসিয়েশন আচার্য রায়কে অভিনন্দিত করবেন কি না; কিন্তু দেখলাম তাঁরা তা করলেন না। (১৯শে শ্রাবণ।)

—

আচার্য রায়ের জীবন শুধু বেঁচে থাকা নয়

ইংরেজী 'লিব্' (live) ক্রিয়াপদটির একটি অর্থ 'to enjoy life, to lead a life of varied emotions and experience', 'to get full pleasure, etc. from existence,' অর্থাৎ, সংক্ষেপে, 'জীবন সম্ভোগ করা, নানা রকম ভাববিলাসে ও অভিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা,' 'বেঁচে থাকার থেকে পূরা মজা পাওয়া।' ইংরেজী 'লিব্' শব্দটির অন্য এবং উচ্চতর অর্থও আছে। কিন্তু মজায়, আরামে, আমোদপ্রমোদে, বিলাসিতায় দিন কাটানও একটা অর্থ। চিরকুমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে ৮০ বৎসর বেঁচে আছেন, তাঁর বেঁচে থাকার মানে ওরকম কিছু নয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের আশীবৎসরব্যাপী জীবন গাছপালার জীবন নয়, পশুপক্ষীর জীবন নয়। তাঁর জীবন উচ্চ চিন্তা ও উচ্চভাবের এবং তার অনুযায়ী কাজের জীবন। তাঁর চিন্তা ও তাঁর হৃদয়ের নানা উচ্চ ভাব তাঁকে নানা কার্যক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে।

তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নী বিদ্যা শিখে ডী. এস্সী (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধি লাভ করেন। সেখানে ছাত্র থাকবার কালেই তিনি গবেষণা করতে শিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর মন তখন নিবিষ্ট থাকলেও তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব সম্বন্ধে সেই সময় এমন একখানি বই লিখেছিলেন, যা বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হ'লে, লেখকের কোন শাস্তি না হ'লেও, বইখানি অন্ততঃ নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হ'তে পারত।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেকালে সাধারণতঃ ইংরেজরাই যে-সব উচ্চতর চাকরী পেত, সে রকম কোন উচ্চ অধ্যাপকের পদ তিনি পান নি। তখন তাঁর চেয়ে খুব কম যোগ্যতাবিশিষ্ট ইংরেজ উচ্চ অধ্যাপক-পদ পেত,—এখনও পায়। এতে ভারতীয়দের অপমান হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার উৎকর্ষ কমে নি; গবেষণা দ্বারা নূতন আবিষ্কার করবার ক্ষমতাও তাঁর লোপ পায় নি। তিনিই আধুনিক ভারতের প্রথম রাসায়নিক আবিষ্কর্তা। তিনি শুধু যে বিস্তর ছাত্রকে পাস করিয়েছেন তা নয়, তাঁর অধ্যাপনা, উপদেশ ও পরিচালনায় এবং তাঁর দৃষ্টান্তে তাঁর কয়েক জন ছাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষকও হয়েছেন। বস্তুতঃ, তাঁর দৃষ্টান্তের প্রভাব তাঁর ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; ভারতবর্ষে বাংলা দেশের বাইরে ও তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাইরে যে রাসায়নিক গবেষণা বেড়েছে, তা অংশতঃ তাঁর দৃষ্টান্তের ও প্রভাবের পরোক্ষ ফল।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে রসায়নী বিদ্যার উন্নতি কত দূর হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখে এ বিষয়ে জগতের জ্ঞান বাড়িয়েছেন। এই গ্রন্থটি লিখবার জন্যে তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়েছিলেন। সেই কাজে তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁর সাহায্য করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু রসায়নী বিদ্যা সম্বন্ধীয় তাঁর ইংরেজী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন মহাপণ্ডিত ডক্টর সর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এর দ্বারা গ্রন্থখানির গুরুত্ব বেড়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ইংরেজীতে আত্মচরিত লিখেছেন এবং তার বাংলা অনুবাদও হয়েছে। তা ছাড়া তিনি বাংলায় আরো কোন কোন বই লিখেছেন;—যেমন একখানি সরল সচিত্র প্রাণিবৃত্তান্তের বই। ইংরেজীতে ও বাংলায় তিনি খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে বিস্তর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-সব বাঙালী সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় কৃতী হয়েছেন, তাঁদের কারো কারো পরিচয় তিনিই প্রথম সাময়িক পত্রে দিয়েছেন। বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্যমুখো করবার জন্যে তিনি, এবং অন্য কোন কোন বাঙালীও, বিস্তর বক্তৃতা করেছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর সাহিত্যিক চেষ্টা এই রকম সব রচনার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সাহিত্যের কাব্য বিভাগেরও তিনি রসজ্ঞ। দেশী ও বিদেশী বহু কবি ও অন্য মনীষীর বিস্তর কবিতা ও বাণী তিনি আবৃত্তি করতে পারেন। এই সে-দিনও তিনি ক্যালকাটা রিব্যিয়ুতে শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রতিভা কেবল শিক্ষাদানে এবং নিজের গবেষণা ও ছাত্রদের গবেষণায় সাহায্য করায় পর্য্যবসিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার দ্বারা নানা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করবার চেষ্টাও তিনি অনেক বৎসর ধ'রে ক'রে আসছেন। কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্ক্‌স্ স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান এখন বৃহৎ যৌথ কারবারে পরিণত হয়েছে। এর দৃষ্টান্তে বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে আরো অনেক রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাবে শুধু যে রাসায়নিক কারখানাই স্থাপিত হয়েছে, তা নয়, কাপড়ের কল প্রভৃতিও হয়েছে। তিনি এক দিকে সুতা ও কাপড়ের কল, অন্য দিকে চরকার সুতা ও হাতের তাঁতের খদ্দর, উভয়কেই উৎসাহ দিয়ে আসছেন। জলপ্লাবন ভূমিকম্প ঝড় প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্যে তাঁর উৎসাহে সঙ্কটত্রাণ সমিতি স্থাপিত হয়। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি এর উৎসাহী কর্মীদের মারফৎ এই সমিতি হাজার হাজার বিপন্ন গরীব লোককে সাহায্য করেছেন। তুলা ও চরখা দিয়ে সুতা নেওয়া ও মজুরি দেওয়া এই সমিতির একটি কার্যপ্রণালী।

কারখানা ও কুটীরশিল্পের বিস্তারে দেশের যত ধন আগে বিদেশে যেত, এখন তত যায় না। অনেক বেকার লোকের অন্ন হচ্ছে, এবং পণ্যশিল্পে মানুষের বুদ্ধি খেলছে ও দক্ষতা বাড়ছে।

আচার্য রায় কত ছাত্রকে সাহায্য দিয়ে শিক্ষিত হতে সমর্থ করেছেন, তার কোন হিসাব আছে কি না, জানি না। যত দিন তিনি সরকারী চাকরী করতেন, তাঁর বেতনের একটা বড় অংশ এই কাজে খরচ হ'ত। যখন হ'তে পেন্স্যন নিয়েছেন তখন থেকে পেন্স্যনেরও এইরূপ একটা অংশ ছাত্রদের জন্যে ব্যয়িত হ'য়ে আসছে। সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ'য়ে সেই পদের মোটা বেতন তিনি নেন নি;—তা জমা হ'য়ে সেই থোক টাকার আয় থেকে পোস্ট গ্র্যাডুয়েট শিক্ষা ও গবেষণার সাহায্য হচ্ছে।

এ ছাড়া তাঁর চেষ্টা, প্রভাব ও উৎসাহে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি সাহায্য ক'রে থাকেন। নারী-শিক্ষা সমিতি তার মধ্যে অন্যতম।

তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতির সদস্য। অনেক বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কাজ তিনি করেছেন।

তাঁর নিজের চরিত্র পবিত্র। সমাজের সকল স্তরে তিনি সুনীতি সুরক্ষিত দেখতে চান। কোন ব্যক্তির চরিত্র মন্দ হ'লেও যদি তাকে তার ধন বা সামাজিক মর্য্যাদার খাতিরে সার্বজনিক নানা অনুষ্ঠানে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তিনি তার প্রতিবাদ করেন।

দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে ও সামাজিক কুসংস্কারের দোষে অনেক বালিকা ও নারী নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়ে। নারী-কল্যাণ আশ্রম তাদের আশ্রয় ও শিক্ষার স্থান। প্রফুল্লচন্দ্র এর সভাপতি। কেবল নামে সভাপতি নন্—দুর্বল জরাগ্রস্ত দেহ নিয়েও এর কাজ কিছু কিছু করেন এবং এতে টাকাও দিয়ে থাকেন।

তিনি সব রকম সামাজিক কুপ্রথার বিরোধী সমাজ-সংস্কারক। তিনি প্রথমে ছিলেন সরকারী চাকর্যে, তার পর এখন সরকারী পেন্স্যনভোগী। কিন্তু যখনই রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে তাঁর ডাক পড়েছে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁর অভিভাষণে নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলেছেন। অনেক অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকর বিলের দোষ উদ্‌ঘাটন ক'রে তিনি তার প্রতিবাদ ক'রেছেন।

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বৈজ্ঞানিক হ'লেই মানুষ নাস্তিক কিংবা সংশয়বাদী হ'য়ে থাকে। কিন্তু, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের মত, প্রফুল্লচন্দ্রও ভগবদ্বিশ্বাসী। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান সভাপতি। কয়েক বৎসর পূর্বে আসাম ও বাংলার ব্রাহ্ম সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাষণ রচনা করেন, তাতে তিনি সমগ্র জাতির উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের আনুগত্য, ধর্ম এবং সৎচরিত্র কত আবশ্যক, তা বিশদ ভাবে লিখেছিলেন। এই রকম মত তিনি আরো অনেক বার প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা তাঁর ছবি দেখেছেন, তাঁরাই তাঁর গরীবানা কাপড়চোপড় দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই। বাইরের আড়ম্বরের জোরে তিনি বড় মানুষ নন্, অন্তরের ঐশ্বর্যের গুণে তিনি বড়। বাইরের আড়ম্বর তিনি করবেন কি নিয়ে? সামান্য ভাত কাপড় মুড়ি, ভাঙা দু-একটা চেয়ার বেঞ্চি, একটা সেকেলে খাট, নিজের জন্যে রেখেছেন; বাকী সব অন্যকে দিয়ে আসছেন। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার একটা অসম্পূর্ণ

ফর্দ সে দিন দৈনিক কাগজে দেখছিলাম। কিন্তু কোন্ কোন্ মানুষকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার ফর্দ কে দিতে পারে ?

টাকার পরিমাণ হিসাবে তাঁর চেয়ে বেশী দান ভারতবর্ষের বাইরে, ভারতবর্ষে, বাংলা দেশেও অনেকে করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রদত্ত জিনিসের সঙ্গে নিজেকেও দান করেছেন। আমেরিকান কবি লাউয়েলের লেখা "The Vision of Sir Launfal" নামক কবিতায় একটি বাক্য আছে, "The gift without the giver is bare," "দাতা যদি নিজেকে নিজের জন্যে রেখে দান করেন, দানের সঙ্গে নিজেকেও না দেন, সে দান যথেষ্ট নয়।" প্রফুল্লচন্দ্র শুধু নিজের যথাসর্বস্ব নয়, নিজেকেও দেশের সেবায় মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

তাঁর জয়ন্তীর দিনে তাঁকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রগুলির উত্তরে তিনি সর্বশেষে বলেন :—

"বন্ধুগণ, যখন আমার দিন ফুরিয়ে যাবে, তখনও আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাইব তাদেরই মাঝে যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম ক'রে—যত দিন না আমার নির্যাতিত দেশজননীর ললাট থেকে মুছে যায় এই কলঙ্ককালিমা।"

তিনি জাতিধর্মশ্রেণীনির্বিশেষে সকল মানুষকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও সচ্ছল দেখতে চান। গরীবদুঃখী গ্রাম্য লোকদের সঙ্গ যে তাঁর প্রিয়, তার কারণ তাঁর মানবপ্রেম। (২০শে শ্রাবণ।)

["প্রবাসী"র আগে আমার "প্রদীপ" নামে একটি মাসিক কাগজ ছিল। তাতে আমি প্রায় আধ শতাব্দী আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলাম। কয়েক মাস আগে সেটি "সংহতি" মাসিকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তার পর আবার তাঁর জয়ন্তীর দিনে দৈনিক "বসুমতী"তেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।]

ব্রহ্মদেশে হলচালন উৎসব

এক শত বৎসর পরে ব্রহ্মদেশে গত মাসে হলচালন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথাকার প্রধান মন্ত্রী উ স (U Saw) একটি ক্ষেতে এক হাঁটু জলে নেমে এক জোড়া সুসজ্জিত বলদ জুতে একটি সোনার লাঙ্গল কয়েক মিনিট চালিয়েছিলেন। অসুস্থতার জন্যে ব্রহ্মের ইংরেজ গবর্নর সে দিন সেখানে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, কিছু লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে এই কথা ছিল যে, তিনি স্বয়ং চাষীর ছেলে এবং চাষীদের কাজের নানা দুঃখ কষ্ট তিনি বোঝেন। প্রধান মন্ত্রীও বলেন, তিনি কৃষকের ছেলে, সুতরাং লাঙ্গল চালান তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

শান্তিনিকেতনে হলচালন উৎসব

অনেক বৎসর আগে থেকে শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল
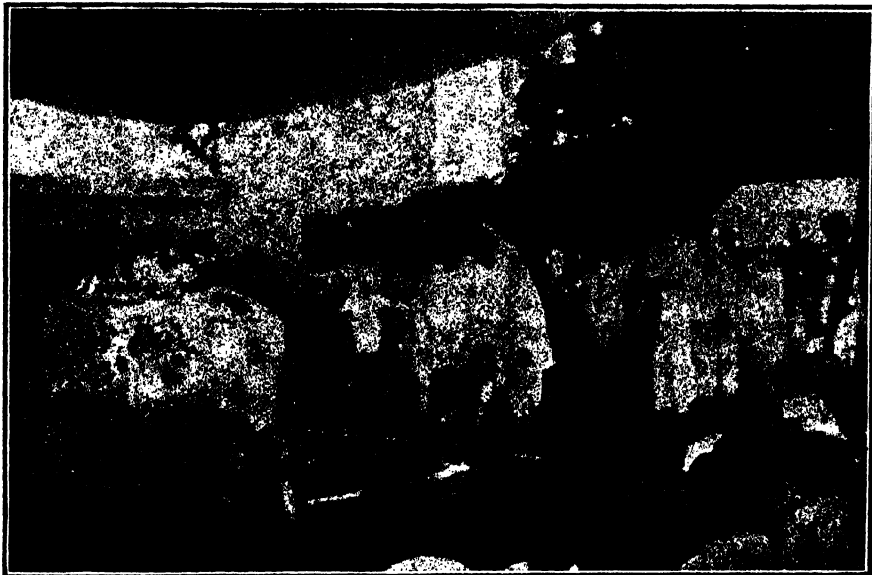
শান্তিনিকেতনে হলচালন উৎসব

উৎসব হ'য়ে আসছে। হলকর্ষণ তার একটি অঙ্গ। কৃষি-প্রধান সকল দেশেই বর্ষার সময় কোন-না-কোন রকম উৎসব হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নূতন রূপ ও প্রেরণা দিয়ে এই উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত ক'রেছেন। গোরুর গাড়ীর দৌড়, বৃক্ষরোপণ, চাষের উৎকৃষ্ট বলদ প্রদর্শন প্রভৃতি, এবং পুরস্কার বিতরণ এই সময় হ'য়ে থাকে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক নির্বাচিত অনেক বৈদিক মন্ত্র এই সময় উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান এই সময় গাওয়া হয়, এবং কখন কখন তাঁর রচিত নাটিকারও অভিনয় হয়। কোন কোন বৎসর কবি স্বয়ং হল চালনা করেছেন। তের বৎসর আগে তাঁর হল-চালনার যে ছবি তোলা হয়েছিল, তা এখানে মুদ্রিত হ'ল। (২১শে শ্রাবণ।)

"দেশরক্ষা" পরামর্শ-কমীটি

গত ১৭ই জুলাই সিমলায় সাংবাদিকদের একটি কন্‌ফারেন্সে প্রধান সেনাপতি জানান যে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-পরিষদের চারি জন সদস্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাসেমব্লীর ছয় জন সদস্য "দেশরক্ষা" পরামর্শ-কমীটির সভ্য হ'তে রাজী হ'য়েছেন।

তথাকথিত "দেশরক্ষা"র মানে অবশ্য দেশকে ইংরেজ ছাড়া আর কোন জা'তের অধীনতা হ'তে, এবং স্বাধীনতা হ'তেও, রক্ষা করা। এ কথা আমরা অনেক বার বলেছি।

প্রকৃত দেশরক্ষা ক'রতে হ'লে ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরামর্শ নিয়ে সব অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিন্তু এই পরামর্শ-কমীটিতে আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র-দেশ, তামিল দেশ, কেরল, প্রভৃতির কোন সদস্য নাই।

ডাক্তার আশুতোষ দাস

বিগত ৩১শে জুলাই, ১২ই শ্রাবণ, ডাঃ আশুতোষ দাস হরিপালে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহান্ন বৎসর। তিনি ছিলেন হুগলি জেলা কংগ্রেস কমীটির একজন সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটীর সভ্য এবং নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমীটির সদস্য। ১৯১৪ সালে এম. বি. পাস করেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে তিনি যুদ্ধে যান এবং ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন। ১৯২২ সালে ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান করেন এবং হরিপালে মেডিকেল মিশন গঠন ক'রে আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রামবাসিগণের চিকিৎসায় ব্রতী থাকেন। অনেকগুলি ছেলেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত ক'রে তাহাদিগকে গ্রামের সেবাকার্য্যে ব্রতী করেন। ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে শতাধিক লোককে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। ১৯৩০, ১৯৩২ এবং ১৯৪০ সালে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে বারম্বার তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে এফ. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন দেশহিতব্রতী নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর থেকে বঞ্চিত হ'ল।

ঢাকার "দাঙ্গা"র তদন্ত

ঢাকার "দাঙ্গা"র সরকারী তদন্ত চলছে। তদন্ত-কমীটি কিরূপ রিপোর্ট লিখবেন, রিপোর্ট লেখা হ'য়ে গেলে প্রকাশিত হবে কি না, এবং রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কাজ গবর্ন্মেণ্ট করবেন কি না—সবই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফল যাহাই হোক, তদন্ত একটা যে হচ্ছে, এর কিছু মূল্য আছে। "দাঙ্গা" সম্বন্ধে সাক্ষীদের মুখ থেকে অনেক কথা জানা যাচ্ছে, যা তদন্ত না হ'লে জানা যেত না। কল্‌কাতার ইংরেজী দেশী দুটি দৈনিকে সাক্ষ্যের যে রিপোর্ট বেরচ্ছে, আসল সাক্ষ্য বোধ হয় তার চেয়ে বিস্তারিত। তদন্ত-কমীটির রিপোর্টে বোধ হয় পূরা, বিস্তারিত রিপোর্টই প্রকাশিত হবে। কিন্তু সেই রিপোর্ট কখন লেখা হবে ও প্রকাশিত হবে, তা তো জানা নাই; সুতরাং ইংরেজী দৈনিক দুটিতে যা প্রকাশিত হচ্ছে, তা একসঙ্গে নথী ক'রে রাখা উচিত; ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সংবাদপত্রের কার্যালয়ে, সাংবাদিকদের লাইব্রেরিতে, এবং বড় বড় লাইব্রেরিতে খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলি থাকা আবশ্যক।

কলিকাতা মিউনিসিপাল (সংশোধক) বিল

"কলিকাতা মিউনিসিপাল (দ্বিতীয় সংশোধক) বিল" কেবল যে হিন্দুদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে, তা নয়, বাঙালী মুসলমান সমাজ থেকেও এর প্রতিবাদ ও নিন্দা হয়েছে, এবং এর বিরুদ্ধে বঙ্গের বাঙালী-অবাঙালী হিন্দুদের ও বাঙালী মুসলমানদের সম্মিলিত প্রতিবাদ-সভাও হয়েছে। কাগজে দেখেছি, মন্ত্রীদের সমর্থক কোয়্যালিশ্যন দলের সব সদস্য এই বিলটাকে আইনে পরিণত করা বিষয়ে খুব উৎসাহী নন্—কেহ কেহ অবশ্য উৎসাহী। কিন্তু কোয়্যালিশ্যনি অনেক সদস্যের উদাসীনতা সত্ত্বেও চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জিদেই এই বিলটা প্রত্যাহৃত হয় নি।

বিলটা নিয়ে য়্যাসেমব্লীতে হট্টগোলও হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ এটা ভোটের জোরে আইনে পরিণত হবে—কি আকারে আইন হবে বলা যায় না। কিন্তু এর দ্বারা বাঙালী মুসলমান সমাজের যে কোন উপকার হবে না, তা নিশ্চিত; হিন্দু ও অন্য অমুসলমানদের তো হবেই না। ইংরেজদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হবে—সেই জন্যেই ইংরেজ কৌন্সিলররা মন্ত্রীদের সমর্থক।

এর খুব একটা বিষময় ফল এই হবে যে, এটা থাকতে আন্তরিক সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত হ'তে পারবে না। এর প্রতিবাদ চলছে, এটা যদি আইন হয়ে যায়, তা হলেও চলতে থাকবে। (২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৮।)

[উপরের মন্তব্যটি লিখিত ও মুদ্রাক্ষরে নিবদ্ধ (composed) হবার পর দৈনিক কাগজে বেরিয়েছে যে, এই বিলের বিরোধী দলের পাঁচ জন সদস্য সিলেক্ট কমীটিতে যোগ ক'রে নূতন সিলেক্ট কমীটি দ্বারা বিলটি বিবেচিত হবে এবং গবর্ন্মেণ্ট "খোলা মন" নিয়ে এই কমীটির রিপোর্ট বিবেচনা করবেন।]

—

বঙ্গীয় কৌন্সিল অব্ স্টেটে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের প্রস্তাব

বাংলার কৌন্সিল অব্ স্টেটে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন করবার চেষ্টার প্রয়োজন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব যে একান্ত আবশ্যক, তা চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। বস্তুতঃ দেখাও গেছে ঐ প্রস্তাবের সমর্থকদের মধ্যে এ রকম লোকও আছে।

কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি এক দিকে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপনের ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকার করে, আবার অন্য দিকে কল্‌কাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের কোনই দোষ দেখতে পায় না, তা হ'লে তার সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করা উচিত? (২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৮।)

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ থামে নি, থামা উচিত নয়।

প্রধান মন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী এর বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি সংগ্রহ ক'রে বিবেচনা করবার জন্যে যে কমীটি নিযুক্ত ক'রেছিলেন, তার কাজ কত দূর এগিয়েছে এখনো কোন কাগজে তা প্রকাশিত হয় নি। কমীটির সংগৃহীত আপত্তিগুলির সমষ্টি ও সে বিষয়ে সভ্যদের মত প্রকাশিত হবে কি? (২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৮।)

[উপরের মন্তব্যটি লিখিত ও মুদ্রাক্ষরে নিবদ্ধ হবার পর খবরের কাগজে দেখেছি, মন্ত্রীরা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে পুনর্বিবেচনা করবেন, এই রকম আভাস পাওয়া গেছে।]

—

ঝড় "দাঙ্গা" প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য

প্লাবন ঝড় দাঙ্গা প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকরা কি সরকারী কি বেসরকারী কোন রকম সাহায্যই এ পর্যন্ত যথেষ্ট পান নি। বেসরকারী সাহায্য আরো বেশী পরিমাণে দেবার চেষ্টা এখনও চলছে।

—

ত্রিপুরায় আশ্রিত লোকদের সাহায্য

দৈনিক কাগজে দেখেছি, ঢাকার "দাঙ্গা" প্রযুক্ত যে-সব লোক পালিয়ে গিয়ে স্থায়ী ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে, মহামহিম মহারাজা ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুর তাদিগকে নূতন ক'রে জীবিকার পত্তন করতে সমর্থ করবার জন্যে ৪০,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর ক'রেছেন। এই কাজটি তাঁর যোগ্য ও তাঁর বংশোচিত হয়েছে। অস্থায়ী ভাবে আশ্রিতদের প্রভূত সাহায্যও তিনি ক'রেছিলেন।

—

বঙ্গের বাইরে রবীন্দ্র জয়ন্তী

কানপুরে যে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব গত জুলাই মাসে হয়ে গেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমাদের কাছে এসেছিল। স্থানাভাবে ছাপতে পারলাম না। সেই বৃত্তান্তটি থেকে, "ভারত" কাগজে প্রকাশিত বৃত্তান্তটি থেকে, এবং সর্বোপরি উৎসবের সুমুদ্রিত বাংলা ও হিন্দী কার্যসূচী থেকে বুঝলাম অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বক্তৃতা করেছিলেন তিনি, অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রবাসী-সম্পাদকের একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। তদ্ভিন্ন আবৃত্তি, বাংলা ও হিন্দী অভিনয়, মূক অভিনয়, নৃত্য, এবং অনেক গান হয়েছিল।

দেহরাদুনে প্রবাসীর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ২০শে

জুলাই বাংলায় কিছু বলেছিলেন, ২২শে জুলাই তাঁর সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পড়েছিলেন।

—

বার্নপুরে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত জুলাই মাসে "আগমনী সংঘে"র উদ্যোগে বার্নপুরে রবীন্দ্র জয়ন্তী হয়েছিল। অনেক আবৃত্তি গান নৃত্য ও বক্তৃতা হয়েছিল। শেষে প্রবাসীর সম্পাদক কিছু বলেছিলেন।

—

কার্কীতে বাঙালী সম্মেলন

"গত তিন বৎসর যাবৎ পুনা জেলার কার্কীতে সমবেত বাঙালীদের আন্তরিক চেষ্টায় 'কার্কী বঙ্গীয় সম্মিলন' নামে একটি বাঙালী সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ এবং পরস্পর মিলন-সুযোগের কল্পনা ছাড়াও গত বৎসর একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগারও এই সম্মিলনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে প্রায় পনের শত মাইল দূরে—মহারাষ্ট্রপ্রধান দেশে, স্থানীয় বাঙালীদের সাধারণ মেলামেশার সুযোগ দান উদ্দেশ্য ছাড়াও বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি সম্মান রাখার কল্পনায় পুস্তকাগার স্থাপনা করাতে এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের যথেষ্টই আন্তরিকতা ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।"

গণেন মহারাজ

গণেন মহারাজ নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে বহু প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বাল্যকালেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প্রধানত স্বর্গগত স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বিদ্যালয়ের লেখাপড়া বলিতে গেলে কিছুই হয় নাই। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ ও অন্যান্য সাধু মনীষী ও বিদ্বানদের সংসর্গে বহু শাস্ত্রের এবং রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের উপদেশের মর্মজ্ঞ তিনি হ'য়েছিলেন। তিনি বলতেন, তিনি ছিলেন ষ্ট্রীট বয়, স্বামী সারদানন্দ তাঁকে মানুষ করেন। ইংরেজী লেখাপড়া না-শিখলেও তিনি ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় ইংরেজী চলনসই রকম বুঝতে ও বলতে পারতেন। রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সহধর্মিণী সারদামণি দেবী তাঁকে স্নেহ করতেন ও গণেশ বলে ডাকতেন। সারদামণি দেবীর যে ছোট একটি জীবনী "প্রবাসী"র জন্যে আমি লিখেছিলাম, তার জন্যে উপকরণ তিনিই দিয়েছিলেন এবং তাতে যে-সব ভাল ভাল ছবি বেরিয়েছিল, তার ফোটোগ্রাফগুলিও তিনি দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার পরিচর্য্যা তিনি নানা রকমে করেছিলেন। নিবেদিতার সাহচর্যে তাঁর ললিতকলা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। বাগবাজারের নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় নির্মিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সর্ জগদীশচন্দ্র বসু মশায়ের স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁর অনেক কাজ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন তথ্য বা তাঁর লেখা কোন বইয়ের দরকার হ'লে আমরা গণেন মহারাজকে বললেই তা পেতাম। তিনি চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সমঝদার ছিলেন। অজণ্টাগুহা চিত্রাবলী থেকে অনুকৃত যে ভগ্ন-দূতের ছবি আমাদের কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও এলবামে প্রকাশিত হয়, সেটি তাঁরই আঁকা। ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁর মার্জিত রুচি থাকায় তিনি কোন কোন প্রদর্শনী সাজাবার ভার পেতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ম্যুজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক তিনি কয়েক বৎসর হয়েছিলেন। তিনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর বন্ধু ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে আত্মচরিতাংশ শ্রীমতী রাণী চন্দ "প্রবাসী"তে বের করেছেন তাতে দেখতে পাই, গণেন মহারাজই বালক নন্দলালকে চিত্রবিদ্যা শিখবার জন্যে অবনীন্দ্র বাবুর নিকটে নিয়ে যান। "উদ্বোধন" কাগজটির ও উদ্বোধন আফিসের জন্যে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ হাঙ্গেরিয়ান চিত্রকরের আঁকা রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের তৈল চিত্রের ফোটোগ্রাফ তিনিই "প্রবাসী" ও "মডার্ন রিভিয়ু"কে দিয়েছিলেন।

—

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলন

গত ১২ই ১৩ই জুলাই বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেছে। এতে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, খাঁ বাহাদুর এম. এ. মোমিন, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, মাননীয়া ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বালিকাদের ড্রিল দেখান হয় এবং বিভিন্ন সমিতি কর্তৃক জিউজিৎসু, অনেক ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল দেখান হয়।

মারবাড়ী রিলীফ সোসাইটীর রজত জয়ন্তী

মারবাড়ী রিলীফ সোসাইটী গত পঁচিশ বৎসর ধ'রে জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে নানা প্রকারে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ক'রে আসছেন। গত মাসে এই সভার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সোসাইটী একটি সুন্দর সচিত্র হিন্দী রিপোর্ট প্রকাশ ক'রেছেন। তার সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে দেওয়া হ'য়েছে। জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়ুর্বেদ প্রদর্শনী হয়, তার উদ্বোধন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সাধারণ সভার অধিবেশনের দিন সভাপতি ছিলেন সর্ মন্মথনাথ মুখুজ্যে মশায় এবং বক্তৃতা করেন কর্ণেল এ সি চাটার্জি, রামানন্দ চাটুজ্যে, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ উকীল,, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ইত্যাদি। এই সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি ও কার্যবিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়। ডাঃ উকীল ব'লেছিলেন, রোগ নিবারণে, বিশেষ ক'রে যক্ষ্মারোগ নিবারণে সমিতির আরও মন দেওয়া উচিত।

কাপড়ের দাম বাড়া

যুদ্ধের জন্যে এদেশে ইংলণ্ড ও জাপান থেকে কাপড় ও সূতার আমদানী অনেকটা ক'মে গেছে। এদিকে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অনেকগুলি কল যুদ্ধ বিভাগের জন্যে দরকারী কাপড় তৈরি করতে ব্যস্ত আছে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের নিকটবর্তী ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য দেশেও জাপান ও ইংলণ্ড থেকে কাপড় আমদানী কমে যাওয়ায় ঐ সব দেশে ভারতীয় কাপড় ও সূতার রপ্তানী অনেক বেড়েছে। এই সব কারণে ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় কাপড়ের যোগান ক'মে যাওয়ায় যুদ্ধের আগেকার সময়ের তুলনায় এখন ভারতবর্ষে মিলের কাপড়ের দর জোড়া পিছু ১৸৹ আনা থেকে ১৷৹ আনার মত বেড়েছে। সূতার দর বাড়ায় তাঁতের কাপড়ের দামও ঐ রকম বেড়েছে। এ জন্যে দেশের জনসাধারণের যে বিশেষ কষ্ট হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ভারত-সরকার এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় ক'রে তুলেছেন। ঐ সরকারের এক সপ্তাহের গেজেটে জাপান থেকে আমদানী কার্পাস সূতা, কৃত্রিম রেশমের সূতা, সূতি কাপড়, কৃত্রিম রেশমের কাপড় ইত্যাদি সমস্ত জিনিসের উপরই আমদানী শুল্ক বাড়ল ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কল্‌কাতার বাজারে মিল ও তাঁতের তুলার এবং কৃত্রিম রেশমের কাপড়ের দাম বেশ বেড়েছে। ভারত-সরকার জাপানের সহিত ভারতের 'প্রতিকূল বাণিজ্যে'র প্রতিকারের জন্যেই এই ভাবে শুল্ক বাড়িয়েছেন ব'লে মন্তব্য ক'রেছেন। কিন্তু যে-সময়ে কাপড়ের দাম খুব বাড়ায় সব গরীব লোককে বিশেষভাবে বিব্রত হ'তে হ'য়েছে, সেই সময়ে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের প্রতিকারের জন্য এত ব্যগ্র না হ'লে কি চল্‌ত না? ইতিপূর্বে অনেক বার অনেক দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রতিকূল হ'য়েছে অর্থাৎ ঐ সব দেশে ভারতবর্ষ থেকে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী হ'য়েছে, তার তুলনায় ঐ সব দেশ থেকে বেশী টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হ'য়েছে। কিন্তু সেই সময়ে ভারত-সরকারকে এই ব্যাপারে হাত দিতে দেখা যায় নাই।

আবার, ভদ্রলোকের এক কথা

ভারত-সচিব মিঃ এমারি সেই যে কবে বলেছিলেন, যুদ্ধ থেমে যাবার পর ভারতীয়েরা তাদের দেশের নূতন কন্সটিটিউশ্যন অর্থাৎ মূল রাষ্ট্রবিধি গড়তে পাবে **কিন্তু**— এই কিন্তুটাই চিরন্তন—**কিন্তু**, তা পাবে যদি তারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক দল ইত্যাদির মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন স্থাপন করতে পারে, সেই "ভদ্রলোকের এক কথা" সম্প্রতি আরও বার দুই পার্লেমেণ্টে আওড়েছেন। আওড়াবার উপলক্ষ্যটা পরে বলছি।

ভদ্রলোকের দু-কথাও হয় দেখছি

কিন্তু উক্ত ভদ্রলোকটি কেবল যে বরাবর এক কথাই আওড়াতে জানেন, তা নয়, আগে যা বলেছিলেন তার উল্টো কথাও বলতে জানেন। শেষ যে উপলক্ষ্যে "ভদ্রলোকের এক কথা" আওড়েছিলেন, তখন বক্তৃতায় বলেছিলেন, "যেমন হল্যাণ্ড একটা দেশ বেলজিয়ম একটা দেশ, ভারতবর্ষ সে রকম কোন একটা দেশ নয়;—বস্তুত ভারতবর্ষটা একটা দেশ না হ'য়ে বরং নানাভাষাভাষী নানা জাতীয় লোকের দ্বারা অধ্যুষিত ইয়োরোপের মত একটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ড। কিন্তু এর আগে তাঁর কোন কোন বক্তৃতায় ভারতের একদেশত্ব ও অখণ্ডত্ব তিনি স্বীকার করেছিলেন—যদিও তখনও ভারতবর্ষে নানাভাষাভাষী নানা জাতির লোক বাস করত। আমাদের তর্কযুক্তি তাঁর কাছে পৌঁছায় না, পৌঁছলেও কি তাঁর মতন হোমরা-চোমরা মানুষ আমাদের মতন সাধারণ লোকের কথা

গ্রাহ্য করতেন? তা করতেন না। সুতরাং তিনি কোন্ কোন্ বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব ও একত্ব স্বীকার করেছিলেন, তা উল্লেখ করায় লাভ নাই। কেবল একটা বক্তৃতার কথা উল্লেখ কচ্ছি, যেটাতে তিনি ভারতবর্ষীয়-দিগকে "সবার আগে ভারতবর্ষ" ("India first") এই মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে ব'লেছিলেন। তাতে তিনি এই মর্মের কথা বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা যে-ভাষাভাষী, যে-অঞ্চলবাসী, যে-সম্প্রদায়ভুক্ত, যে-জাতিরই হোক না কেন, তারা ভারতীয় ব'লে গৌরব বোধ করে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টই যে ভারতবর্ষকে এই একত্ব ও অখণ্ডত্ব দিয়েছে, তা ব'লে তিনি ব্রিটিশ আত্মাভিমানও তৃপ্ত ক'রেছিলেন।

এখন কিন্তু সেই ভদ্রলোক মিঃ এমারিই বলছেন, ভারতবর্ষ কোন একটা **এক** দেশ নয়!

অন্য দিকে আবার কিন্তু পাকিস্তানেরও সমর্থন করছেন না, বলছেন সে-পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে পরিণত করার পথে বহুৎ কার্য্যগত (practical) বাধা বা কঠিনাই ("ডিফিকল্টিজ") আছে। এ কথায় কিন্তু পাকিস্থান-বিরোধীরা যেন আশ্বস্ত না হন। কেন না, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে তিনি কোন্ দিন ব'লে ব'সবেন, পাকিস্তান পরিকল্পনাটা তোফা জিনিস, খুব সহজেই ওটাকে বাস্তবে পরিণত করা যায়। আমাদের কথা এই যে, পাকিস্তান বা অন্য যে কোনো 'স্থান' বাস্তবে পরিণত করা যত সহজই হোক না কেন, আমরা তার বিরোধী; ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড, 'যাবৎচন্দ্রদিবাকর' এক ও অখণ্ড থাকবে; এখন যে এই দেশ ব্রিটিশ ভারত, দেশী ভারত, ফ্রেঞ্চ ভারত, পোর্তুগীজ ভারতে বিভক্ত—এ বিভাগ অস্থায়ী, এ বিভাগ লোপ করতে হবে।

বড়লাটের শাসনপরিষদ বৃহত্তর হ'ল

বড়লাটের শাসনপরিষদকে বৃহত্তর করা হ'ল এবং একটা ন্যাশন্যাল সিবিল (অর্থাৎ অসামরিক) "দেশরক্ষা" কৌন্সিল গঠিত হ'ল, এই কথাটা ভারতবর্ষে ও বিলাতে ঘোষণা করা উপলক্ষ্যে ভারতসচিব মিঃ এমারি "ভদ্র লোকের এক কথা" আওড়ান এবং ভদ্রলোকের পরস্পর-বিপরীত দু-রকম কথা বলারও দৃষ্টান্তস্থল হন।

বড়লাটের শাসনপরিষদে যে-সব ভদ্রলোককে নূতন সদস্য নিযুক্ত করা হ'য়েছে, বলা হ'য়েছে তাঁরা "প্রতিনিধিস্থানীয়" লোক এবং শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তি ("representative non-officials of the highest possible standing")। এই মানুষগুলির কোনো যোগ্যতা নাই, এমন নয়;—তাঁদের যোগ্যতা আছে। কিন্তু তাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয় কি অর্থে? খুব যোগ্য লোকও যদি শুধু গবর্মেণ্ট দ্বারা নির্বাচিত হন, যদি কোন জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত না-হন, তাঁদিগকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায় না। তাঁরা যে শীর্ষস্থানীয় লোক তাও স্বীকার করা যায় না। তাঁরা যোগ্য লোক হ'তে পারেন, কিন্তু যাকে যে-বিভাগের কর্তা করা হয়েছে, সেই বিভাগের কাজের জন্যে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তির নাম সহজেই করা যেতে পারে।

বড়লাটের সরকারী জ্ঞাপনীতে বলা হ'য়েছে এঁরা সব "দায়িত্বপূর্ণ" পদে অধিষ্ঠিত হ'বেন। কিন্তু তাঁরা দায়ী হবেন কার কাছে? ভারতবর্ষের জনগণের কাছে দায়ী হবেন না, আইন-সভাগুলিতে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী হবেন না—ভারতবর্ষীয় কোন মানুষের কাছেই দায়ী হবেন না; দায়ী হবেন বিদেশী গবর্মেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত বিদেশী বড়লাটের নিকট।

"ন্যাশন্যাল" অসামরিক "দেশরক্ষা" কৌন্সিল

যে ত্রিশ জন লোককে নিয়ে "ন্যাশন্যাল" অসামরিক "দেশরক্ষা" কৌন্সিল গঠিত হচ্ছে, তাদের নির্বাচনে বা মনোনয়নে ভারতীয় নেশ্যনের অর্থাৎ জনসমষ্টির কোনই হাত ছিল না, নাই; তাঁরা মনোনীত হয়েছেন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দ্বারা। সুতরাং কৌন্সিলটি ন্যাশন্যাল কেবল এই অর্থে যে, কৌন্সিলের লোকগুলি ভারতীয় নেশ্যনের মানুষ। যদি কেও বলেন, ভারতীয় নেশ্যন যে-দেশের মানুষ সেই দেশকে রক্ষা করার কাজে এই কৌন্সিল সাহায্য করবে ব'লে একে ন্যাশন্যাল বলা হয়েছে, তা হ'লে "দেশরক্ষা"র ব্রিটিশ-সরকারী অর্থের যে ব্যাখ্যা আমরা অনেক বার করেছি, তাঁকে তা স্মরণ করতে ব'লব।

সাধারণতঃ প্রতি দু-মাসে একবার এই কৌন্সিলের অধিবেশন হবে, তাতে বড়লাট থাকবেন সভাপতি। সভার কাজ প্রকাশ্য হবে না, তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হবে। সাধারণতঃ কৌন্সিলের সভ্যরাই উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু বড়লাট তাঁর শাসন-পরিষদের সদস্যদিগকে কিম্বা কোন রাজকর্মচারীকে উপস্থিত হ'তে দিতে পারবেন। প্রত্যেক অধিবেশনে, অন্যান্য কাজ ছাড়া, কৌন্সিল যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে এবং যুদ্ধের জন্যে দরকারী দ্রব্যসামগ্রীর জোগান সম্বন্ধে পুরা ও গোপনীয় বিবৃতি পাবেন। কৌন্সিল প্রাদেশিক যুদ্ধ-

প্রচেষ্টা ও কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

দেখা যাচ্ছে কৌন্সিলের কোনো ক্ষমতা ও কোনো দায়িত্ব থাকবে না। অবশ্য, বিবৃতিগুলা গোপন রাখার দায়িত্বের কথা বলছি না।

সামরিক "দেশরক্ষা", অর্থাৎ ইংরেজের কোন শত্রু যদি ইংলণ্ডের জমিদারী ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তার আক্রমণ থেকে "দেশরক্ষা", এই কৌন্সিলের এক্তিয়ারবহির্ভূত থাকবে। এই কৌন্সিল সম্বন্ধীয় সরকারী জ্ঞাপনীতে আছে, "পলাতক জনসমষ্টির ও গৃহহীন লোকদের হেফাজৎ করা, আক্রমণের আতঙ্ক নিবারণ করা" ইত্যাদি এই কৌন্সিলের অন্যতম কাজ হবে। বাংলা দেশ থেকে এই কৌন্সিলে নেওয়া হয়েছে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাসেম ফজলল হক্ সাহেবকে। তিনি ও তাঁর সহযোগী অন্য মন্ত্রীরা এই রকম কাজ ঢাকা শহরে ও জেলায় সাতিশয় যোগ্যতার সহিত করেছেন ব'লে তিনি কৌন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়ে থাকবেন।

বৃহতীকৃত শাসনপরিষদ কি অ-সাম্প্রদায়িক ও অ-রাজনৈতিক ?

সরকারী জ্ঞাপনীতে বলা হয়েছে যে, বড়লাটের বৃহতীকৃত শাসনপরিষদটি অ-রাজনৈতিক ও অ-সাম্প্রদায়িক। এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। এর গঠনের পশ্চাতে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কূট চা'ল আছে। কেন না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব'লতে রাষ্ট্রের যে-যে বিভাগের উপর ক্ষমতা নিশ্চয়ই বুঝায়, যেমন সামরিক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, মানুষ ও মাল চলাচলের উপায় রেলওয়ে ইত্যাদি বিভাগ, তার কোনটিরই ভার কোনো দেশী সদস্যকে দেওয়া হয় নাই। এগুলি ইংরেজ সদস্যদেরই হাতে রইল ও থাকবে।

বৃহতীকৃত শাসনপরিষদ নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকও বটে; কেন না, যদিও ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানদের তিন গুণ এবং হিন্দুরাই অধিকাংশ ট্যাক্স দেয়, ও অধিকাংশ শিক্ষিত ও সার্বজনিক-কাজে-উৎসাহী ভারতীয় হিন্দু, তথাপি পরিষদে মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সমানসংখ্যক পদ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু সদস্যদের সংখ্যা মুসলমান সদস্যদের তিন গুণ হওয়া উচিত ছিল।

জ্ঞাপনীতে বলা হয়েছে গবর্মেণ্টের কার্যসামর্থ্য (efficiency) বাড়াবার জন্যে পরিষদ বড় করা হয়েছে। গবর্মেণ্টের কার্যসামর্থ্য অযথেষ্ট ব'লে ধরা পড়ল কখন? যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে অনেক আগে? তখন কার্যসামর্থ্য কিরূপ ছিল? পরিষদে দেশী লোক বাড়িয়ে কার্যসামর্থ্য বাড়ান হ'ল স্বীকার করায় মেনে নেওয়া হয়েছে যে, ইংরেজ সদস্য বাড়ালে কার্যসামর্থ্য বাড়ত না, অর্থাৎ ভারতবর্ষে (এবং যে-কোন দেশে) গবর্মেণ্টকে যথোচিত কার্যসমর্থ করতে হ'লে বিদেশীর চেয়ে দেশী কর্মীর উপযোগিতাই বেশী। সময়বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ঐ কথা সত্য।

আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দলের মতানৈক্য না হওয়া সত্ত্বেও তো এখন শাসন-পরিষদ বড় করা চল্‌ল; তা হ'লে এই কাজটা বছরখানেক আগে কেন করা হয় নি? তা হ'লে সম্ভবত বছরখানেক আগেই দেশের শাসনকার্য উৎকৃষ্টতর হ'তে পারত।

জ্ঞাপনীতে বলা হয়েছে, সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কন্সটিটিউশ্যনের কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন করা হয় নি। এটা না বললেও চলত। আমরা খুবই জানি ভারতের কন্সটিটিউশ্যন উন্নততর করা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত নয়।

শাসনপরিষদে ভারতীয় লোক বাড়াতে ভারতীয় মহাজাতির ক্ষমতা কিছুই বাড়ল না; কারণ, সমগ্র শাসনপরিষদের মত অগ্রাহ্য করবার যে ক্ষমতা আগে থেকে বড়লাটের ছিল এবং এখন আছে, শাসনপরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়বার পরেও তা থাকবে। এই শাসনপরিষদে ভারতীয়েরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হ'লেন ব'লেই যে তাদের মত বজায় থাকবে এ রকম আশা করা বৃথা।

যুদ্ধের সময় কি কন্সটিটিউশ্যন পরিবর্ত্তন করা যায় না ?

মিঃ এমারির সাম্প্রতিক যে বক্তৃতার আলোচনা কচ্ছি, তাতেও তিনি সেই পুরাতন কথা আওড়েছেন যে, ব্রিটেন যখন জীবনমরণ-যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন রাষ্ট্রবিধিপরিবর্ত্তন করা কার্যত অসাধ্য ("impracticable")। কিন্তু এই যুদ্ধেরই মধ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে অভাবনীয় সম্মিলিত ব্রিটিশ-ফরাসী পৌরত্বের (Joint Franco-British citizenship-এর) প্রস্তাব করেছিলেন এবং যা বাস্তবে পরিণত হয় নি কেবল ফ্রান্সের পূর্ণ পরাজয়ের জন্যেই, সেটাকে কি অত্যন্ত ভিত্তিগত গুরুতর কন্সটিটিউশ্যন্যাল পরিবর্ত্তন বলা যায় না? জামেকা, ট্রিনিডাড ও ব্রিটিশ গিয়ানাতে এই যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাদের কন্সটিটিউশ্যন পরিবর্ত্তন করতে মনস্থ করেছেন ও পরিবর্ত্তন

ক'রেছেন। ইতিপূর্বে বর্তমান ভারতশাসন-আইন এই যুদ্ধের মধ্যেই দু-বার পরিবর্তিত হয়েছে এবং আবার এই তৃতীয় বার পার্লেমেণ্টে পরিবর্তিত হচ্ছে ভারতবর্ষের আইন-সভাগুলার নির্বাচন স্থগিত রাখবার জন্যে। তা ছাড়া বেদল নেতাদের বোম্বাই কন্‌ফারেন্সে যে-রকম শাসন-পরিষদ চাওয়া হয়েছিল, কোনো রকম কন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল পরিবর্তন না-ক'রেও যে তা গঠন করা চলত, সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রু তা দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের উপর তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতা একটুও ছাড়তে চান না ব'লে বোম্বাইয়ের কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব অনুসারেও কাজ করেন নি। আগেই বলেছি, শাসনপরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ভারতীয় জনগণের ক্ষমতা কিছুই বাড়ল না। কেউ কেউ বলবেন, আট আট জন ভারতীয় শাসন-পরিষদে থেকে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তাঁকে পরামর্শ দেবেন, কখনো বা তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবেন, তাতে কি তাঁর মন একটুও প্রভাবিত হবে না? তার উত্তরে বলি, যাঁরা শাসনপরিষদে গেলেন তাঁদের চেয়ে বড় বড় নেতারা দীর্ঘকাল ধ'রে ত কত তর্কযুক্তি করেছেন, গবর্মেণ্টকে কত পরামর্শ দিয়েছেন, কত প্রতিবাদ ক'রেছেন,- তার **প্রভাবের** দ্বারা কী ফল হয়েছে? **আমরা প্রভাব বৃদ্ধি চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি দেশের কাজে পূর্ণ ক্ষমতা।** সেই **ক্ষমতা** শাসনপরিষদের সভাসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ভারতীয়দের হাতে একটুও যাচ্ছে না। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ক্রমাগত মোআ দিয়ে ছেলে ভুলোবার চেষ্টা কচ্ছেন।

ব্রিটেন ও ভারতের "সাধারণ অভীষ্ট"

মিঃ এমারি বলেছেন, ব্রিটেন ও ভারতের "সাধারণ অভীষ্ট" ("common cause") সিদ্ধির জন্যে বড়লাটের শাসনপরিষদ বৃহত্তর করা এবং "দেশরক্ষা" কৌন্সিল গঠন করা হ'য়েছে।

নাৎসীদের পরাজয় অবশ্য ব্রিটেনের বাঞ্ছিত এবং ভারতবর্ষেরও বাঞ্ছিত। এটি ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য যা ঈপ্সিত, ব্রিটেনের তা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। ভারত চায় স্বাধীন হ'তে, ব্রিটেন চায় তাকে নিজের বশে রাখতে।

নূতন রাষ্ট্রবিধি বিবেচনার একান্ত আবশ্যক ব্রিটিশ সর্ত

ভারতবর্ষের জন্যে কোনো নূতন রাষ্ট্রবিধি গড়বার প্রস্তাব বিবেচনা করবার আগে ভারতীয় সব সম্প্রদায়ের ও রাজনৈতিক দলের মিল ও নিজেদের মধ্যে চুক্তি একটা ভিত্তিগত একান্ত আবশ্যক সর্ত—মিঃ এমারি পার্লেমেণ্টে তাঁর বক্তৃতায় আবার বলেছেন। কিন্তু শোচনীয় মজার কথা এই যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকৃত এমন সব ব্যবস্থা রয়েছে এবং হয়ে চলছে যেগুলা মিল ও চুক্তির পরিপন্থী।

—

কংগ্রেসী ও মুসলিম-লীগী সদস্য

মিঃ এমারি বলেছেন, বড়লাটের শাসন-পরিষদের নূতন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে মুসলিম লীগের সভ্য আছেন এবং এমন লোকও আছেন যাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ঐ মুসলিম-লীগওআলারা মিঃ জিন্নার অনুমোদন নিয়ে এখনও লীগে আছেন কি? নাই। ঐ প্রাক্তন কংগ্রেসীরা এখনও কংগ্রেসনীতি মানেন কি? মানেন না।

মিঃ এমারি সবার সেরা লোক বেছেছেন!

অত্যুক্তিরও একটা মাত্রা থাকা ভাল। মিঃ এমারি তাঁর বক্তৃতায় শাসনপরিষদের নূতন সদস্যদের একটা হাস্যকর প্রশস্তি করেছেন। যথা—

Mr. Amery to-night described those who had joined the Viceroy's Executive Council as a "team of ability and experience which it would be difficult to rival in India or indeed elsewhere."

তাৎপর্য। যাঁরা বড়লাটের শাসনপরিষদে যোগ দিয়েছেন মিঃ এমারি তাঁদিগকে এই ব'লে বর্ণনা করেন, যে, তাঁরা এমন একটি যোগ্য ও অভিজ্ঞ (খেলোয়াড়) দল যাঁদের সমকক্ষতা করবার যোগ্য লোক ভারতবর্ষে অথবা বাস্তবিক অন্যত্রও পাওয়া কঠিন হবে।

আচ্ছা, এঁরা যদি ভারতে, এমন কি জগতে, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক, তা হ'লে এমন লোকদের দ্বারা অলঙ্কৃত ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? এবং মিঃ এমারিই বা তাঁদের উপর পিঠচাপড়ানো মুরুব্বিআনা করবার সৌভাগ্য পেলেন কি ক'রে?

মিঃ এমারির ১লা আগষ্টের বিবৃতির একটা সাংঘাতিক কথা

১লা আগস্ট পার্লেমেণ্টে মিঃ এমারি যা বলেন, তার মধ্যে এমন বিস্তর কথা আছে, যার অসত্যতা বা আংশিক অসত্যতা প্রদর্শিত হ'তে পারে। কিন্তু এ রকম বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান ও সময় নাই। কেবল একটা সাংঘাতিক কথার উল্লেখ করি। ভারতবর্ষের নেতারা বরাবর ব'লে আসছেন, তাঁরা বিলাতী পার্লেমেণ্টারি

প্রথার মত এদেশেও চান জাতিবর্ণধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা। কিন্তু মিঃ এমারি বলছেন, ভারতবর্ষে তা হ'তে পারে না। বিনা অনুবাদে নীচে তাঁর কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"It is today a matter of general acceptance that India should, as soon as is practicable, attain to Dominion Status or as I prefer to describe it to a free and equal partnership in the British Commonwealth. How that development is to be expedited, what provision will still have to be made for the fulfilment of the obligation imposed upon us by the past or by India's present dependence upon this country for her defence are matters which, however important in themselves, are still matters of detail and method rather than of fundamental principle. Today, the major issue is not whether India should govern herself, but how she is to govern herself : under what type of constitution it is possible to preserve her unity and yet secure freedom and reasonable self-expression for the varied elements which compose her national life.

"Six years ago that issue had hardly loomed over the horizon. We knew there was the communal problem and we assumed that we had met it by providing for separate communal franchise. We knew there were hesitations by the Princes as to the surrender of their powers and we provided specially favourable terms in order to induce them to come in. But we and Indian political leaders alike took it for granted that the Central Government of India should follow the customary lines of our British system of responsible parliamentary government and the Act of 1935 was framed on that assumption.

"The course of events since then and the experience of the actual working of responsible government in the provinces have raised most formidable queries as to the possibility of that system in India, at any rate so far as the Central Government is concerned. We must remember that our system of government here, which we rightly prize as the most flexible and efficient form of democratic government in the world—a system which seems to us so natural and easily workable—does depend entirely for its working upon certain indispensable conditions. It postulates a party system in which loyalty to party is never the supreme loyalty, but is always in the last resort subordinate to a sense of loyalty to national interest as a whole and responsibility for the successful working of parliament as an institution. That system of ours is based on majority decisions because it assumes that the majority in every case is the result of free discussion and that minority of today will very probably be the majority of tomorrow. These conditions do not exist where party loyalty and party discipline override all other considerations, where party executives outside the parliament are the only arbiters of policy and real rulers, where the minority always remains the under-dog. There, our system ceases to be workable and other methods have to be devised to preserve freedom and democracy.

"In India experience of party government in the provinces has rightly or wrongly convinced great and powerful elements in Indian national life that their lives and their liberties would not be assured under the central provisions of the present Act or under any amendment of it which would still leave the executive control of all India in the hands of a Government, dependent upon a parliamentary majority from day to day which, in its turn, obeys unswervingly the dictates of an outside executive. This reaction against the dangers of what is called the Congress Raj or the Hindu Raj has gone so far as to lead to a growing demand from Moslem quarters for a complete breaking up of India into separate Hindu and Moslem dominions. I need say nothing today of the manifold, and to my mind, insuperable objections to such a scheme, at any rate in its extreme form. I would only note that it merely shifts the problem of permanent minorities to somewhat smaller areas without solving it. It is a counsel of despair and, I believe, wholly unnecessary despair, for, I do not doubt that there is enough constructive ability and enough natural goodwill among the Hindus and Moslems and enough Indian patriotism to find a constitutional solution which will give fair recognition to all communities and all interests.

মিঃ এমারি বলেছেন, বিলাতে কোনো সময়ে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব'লে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে দেশের রাষ্ট্রীয় কাজ চালায়, পরবর্তী সাধারণ পার্লামেণ্ট সদস্য নির্বাচনে সে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না থেকে অন্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'তে পারে এবং শেষোক্ত দল মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে দেশের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাতে পারে। এই প্রকারে কোন দলই চিরকাল সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে না, দলের লোকদের সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে বরাবরই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যে-দল সংখ্যালঘু সে বরাবরই সংখ্যালঘু থাকে। অতএব, মিঃ এমারির মতে, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য রকমের —বিশেষ করে ব্রিটিশ রকমের গণতন্ত্র চলতে পারে না; সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা দেশ শাসন (majority rule) চলতে পারে না।

মিঃ এমারি ব্রিটেনের বেলায় দল কথাটা রাজনৈতিক দল অর্থে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ব্যবহার করেছেন, ধর্মসাম্প্রদায়িক দল অর্থে। এদেশে যে সাম্প্রদায়িক পৃথক্ পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় দলগুলিও রাজনৈতিক দল না হয়ে ধর্মসাম্প্রদায়িক দল হয়েছে, তার জন্যে তো ভারতীয়েরা দায়ী নয়;—দায়ী ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট। ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান, সর্ববৃহৎ, সকলের চেয়ে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কোন কালেই সাম্প্রদায়িক পৃথক্ পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা পৃথক্ নির্বাচন চায় নাই। এখন অগণিত মুসলমানরাও চাচ্ছেন না। ভারতবর্ষ যাতে একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী হ'তে না পারে, তারই জন্যে এক রকম ব্যবস্থা প্রবর্তিত করে তাতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সেই অবস্থার অজুহাতে ভারতবর্ষকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধির অনুপযুক্ত বলা দুরভিসন্ধিগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকের পক্ষেই সম্ভব। ব্রিটেন যদি পরাধীন হ'ত এবং তার প্রভুজাতি

সেখানে সাম্প্রদায়িক পৃথক্ পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত ক'র্‌ত, তা হ'লে ব্রিটেনের অবস্থাও ভারতবর্ষের মত হ'ত এবং তার বিরুদ্ধেও বলা চল্‌ত যে ব্রিটেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা শাসনরূপ গণতান্ত্রিক রীতির অনুপযুক্ত। কারণ, দল কথাটা যদি ধর্মসাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'লে দেখা যাবে যে, এখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্রিটেনেও প্রটেস্টাণ্ট খ্রীস্টীয়ান দল স্থায়ী ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং রোমান কাথলিক দল ও ইহুদী দল স্থায়ী ভাবে সংখ্যালঘু।

মিঃ এমারির অন্যান্য উক্তিও বিচারসহ নহে।

—

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী

লণ্ডন, ১০ই আগষ্ট

অদ্য ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে জাতির প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সভায় ভারতের স্বাধীনতা দাবী করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মিঃ ডব্লু. ই. ডবি (এম. পি.)। তিনি এমারি সাহেবের বিবৃতি আলোচনা করিয়া বলেন যে, ঐ বিবৃতির মধ্যে কতকগুলি অসার মিষ্ট কথা ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি যদি ভারতবর্ষকে কবে নূতন মর্য্যাদা দিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতেন তবে ভারতবাসীরা কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইতে পারিত কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। হয়তো বা আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে কিংবা যুদ্ধের পরে ভারতে প্রচার-কার্য্যের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবে।

হয়তো বা ছলাকলারও পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ঠিকই থাকিবে। ব্রিটিশ শ্রমিক দল ভারতে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। এক্ষণে ব্রিটিশ শ্রমিক দল নাৎসী-প্রাধান্য বিনষ্ট করিবার জন্য অন্যান্য দলের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্রিটিশের মিত্র হইয়াছে। সুতরাং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে।

মিঃ ডবি বলেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে ভারতের রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি চাহেন। ব্রিটেনের গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য এই :—

ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস করুন, বন্দীদিগকে মুক্তি দিন, যুদ্ধের দরুন নহে আন্তর্জ্জাতিক ন্যায়ের বিধান অনুসারে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করুন।

ভারতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য আটটি কমিটি গঠিত হওয়ার পর সভা স্থগিত থাকে।

অতঃপর পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ সোরেনসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলন পুনরারম্ভ হয়। তিনি বলেন যে, এমারি সাহেবের প্রস্তাবের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। ভারতবাসীরা প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা চাহিয়াছিল সেই দাবী মিটাইবার জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থার জন্যও কিছু করা হয় নাই। যত দিন এরূপ চলিবে তত দিন ভারতের অচল অবস্থা বলবৎ থাকিবেই। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কিছু না দেওয়া অপেক্ষা ভাল এবং ভবিষ্যতে যে আরও দেওয়া হইবে তাহার সূচনা। কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ তা ভারতবাসীরাই ঠিক করিবে। কেবল ভারতীয় বন্দীদিগকেই মুক্তি দিলে চলিবে না, স্বয়ং ভারতকেই মুক্তি দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে অনুরোধ করিয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে :—

(১) ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হোক।

(২) স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি গণপরিষদ আহ্বান করা হউক।

(৩) সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হউক।

(৪) পারস্পরিক মৈত্রী এবং সহযোগিতার জন্য একটি সন্ধির প্রস্তাব করা হউক। যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে না, সে সমস্ত বিষয় সালিসীর দ্বারা মীমাংসিত হউক।

প্রস্তাবে এই বিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এ সমস্ত বিষয় ঘোষণা করিলে অবিলম্বে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবে এবং মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। —রয়টার ("ভারত")

—

ব্রহ্ম-ভারতীয় চুক্তি

ব্রহ্মদেশকে যে-উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক্ করা হয়েছে, ব্রহ্ম-ভারতীয় চুক্তিও সেই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইংরেজরা চায় ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কাজে লাগাতে, কিন্তু ভারতীয়েরা সে-দেশে থেকে যদি ব্রহ্মদেশীয়দের সহযোগে ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন চালায়, তার দ্বারা ইংরেজদের এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'তে পারে।

ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশ শোষণ কচ্ছে, এর কোন প্রমাণ নাই। শোষণ কচ্ছে ইংরেজরা। বিস্তর ভারতীয় হয়ে গেছে স্থায়ী ব্রহ্মদেশবাসী। ব্রহ্মদেশে যত লোক বাস করে, তার দ্বিগুণ লোক সেখানে স্থায়ী ভাবে অনায়াসে থাকতে পারে। দেশের শোষণ স্থায়ী অধিবাসীদের দ্বারা হয় না।

ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশে যাবার ও সেখানে বসবাস করবার পথে যে-সব বাধা উপস্থিত করা হ'ল, চীনাদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে, জাপানীদের বিরুদ্ধে তো তা করা হয় নি। কেন হয় নি?

—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামের কৃতিত্ব

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামের পরীক্ষার্থীরা পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে চারটি স্থান অধিকার করেছে। প্রশংসার বিষয়। এই জন্যে আনন্দ প্রকাশ করবার নিমিত্ত আসামের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আসামের সব বিদ্যালয়কে এক দিন ছুটি দিয়েছিলেন। আসামে বোধ হয় ছাত্রদেরকে হুজুকে মাতাতে, উত্তেজিত করতে, ও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেগার খাটাতে মজবুত নেতা যথেষ্ট নাই।

গোরক্ষিণী সভায় মালবীয়জীর বক্তৃতা

কাশীতে যে নিখিলভারতীয় গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়েছে, তার দ্বারা আহূত একটি সভায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় গোরক্ষার আবশ্যকতার উপর খুব জোর দিয়ে বলেন যে, সর্বত্র গোচারণের যথেষ্ট জমি রাখা উচিত। গোহত্যারও তিনি খুব নিন্দা করেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলকে, কসাইখানায় গোরু যেতে না দিয়ে, তাদের জন্যে গোশালা স্থাপন করতে বলেন। আমরা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু গোবধ না করাতেই হিন্দুদের কর্তব্য শেষ হয় না। যে-সব হিন্দু গৃহস্থ তাদের গোরুগুলিকে প্রায় অনশনে রেখে তিলে তিলে বধ করে, যে-সব হিন্দু গোয়ালা কসাইদের কাছে গোরু বিক্রী করে, তাদের গর্হিত আচরণের প্রতিবাদ ও প্রতিকার হওয়াও আবশ্যক।

—

রবীন্দ্রনাথ কোনো দলের ছিলেন না ও নন্

রবীন্দ্রনাথ কোনো দলের কখনো ছিলেন না, এই কথাটা এখন মনে পড়িয়ে দেওয়া দরকার মনে কচ্ছি। তিনি যে সব দলের বাইরে ও উর্দ্ধে ছিলেন, তার প্রমাণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তাঁকে কেউ কোনো দলে টানে, তা যে তিনি চাইতেন না, নীচে মুদ্রিত চিঠিটিতে তার উল্লেখ আছে।

"ওঁ

"কল্যাণীয়াসু,

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুশি হলুম। আমি কলকাতায় পৌঁছিয়েই জনতার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি—নইলে তোমাকে খবর পাঠিয়ে দেখা করতুম। আমি যে জীবনের চতুর্থ প্রহরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেচি প্রতি দিন সে-সম্বন্ধে আমার সংশয় দূরে যাচ্চে। প্রাণ-যাত্রার গোড়াতেই উদ্ভিদের পালা—চক্রপথ ঘুরে এসে সেইখানেই লীলা সাঙ্গ করতে হয়—আমার এখন সেই উদ্ভিদের দশা—সচলতা ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসচে। তা নিয়ে মনে কোনো পরিতাপ নেই—কেবল মুস্কিল এই যে চারদিকে আর সকলে চঞ্চল—**তারা আমাকে নিয়তই দলে টানতে চায়, স্থির থাকতে দেয় না,—মনে ভয় হয় যে শেষ-দিনেও তারা ঘন ঘন ষ্ট্রিক্‌নীন ইন্‌জেক্ট্‌ ক'রে আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে।**

"ভেবেছিলুম কলকাতায় শীঘ্র যাব না। কিন্তু সেখানে একটা বসন্ত-উৎসবের পালা হবে, আমি উপস্থিত না থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে' না। তাই জনসাধারণের দরবারে হাজিরা দেওয়া চাই। অতএব সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৭ই মার্চ্চ ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

—

চিত্র-পরিচয়

কুরুক্ষেত্রের সমরে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডবেরা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু অসংখ্য লোকক্ষয় এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব-বধ জনিত শোকে তাঁহাদের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। কিছু কাল পরে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব সশরীরে স্বর্গ-গমনে মনস্থ করিলেন। হিমাচলের পথে সারমেয়রূপী ধর্ম্ম পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদের অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। "স্বর্গারোহণে" সেই দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে।

—

মালকোশ বা মালবকৌশিক শাস্ত্রোক্ত ছয় রাগের অন্যতম। ইহার ঠাট ভৈরব, গীত হইবার কাল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেষ ভাগে। ইহার প্রকৃতি গম্ভীর, বীরত্ব-ব্যঞ্জক। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার ধ্যান বর্ণিত আছে,

আরক্তবর্ণো ধৃত রক্তযষ্টিঃ
বীরঃ সুবীরেষু কৃত প্রকীর্ত্তিঃ
বীরৈর্ধৃত বৈরীকপালমালা
মালামতো মালবকৌশিকোয়ং।

এই ধ্যানমূর্ত্তিকেই মালকোষ চিত্রে রূপ দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

রাখী-পূর্ণিমা

শ্রীমণীশ ঘটক

রাখী-পূর্ণিমার দিনে, কাহারে পরাতে
হে কবি চলিলে তুমি, শেষ রাখী হাতে?

শোকাহত স্তব্ধ বিশ্ব। উৎফুল্ল নন্দন,
প্রসারি' দক্ষিণ কর, বন্দে দেবগণ!

২৩শে শ্রাবণ ১৩৪৮।

রবীন্দ্র-স্মৃতি
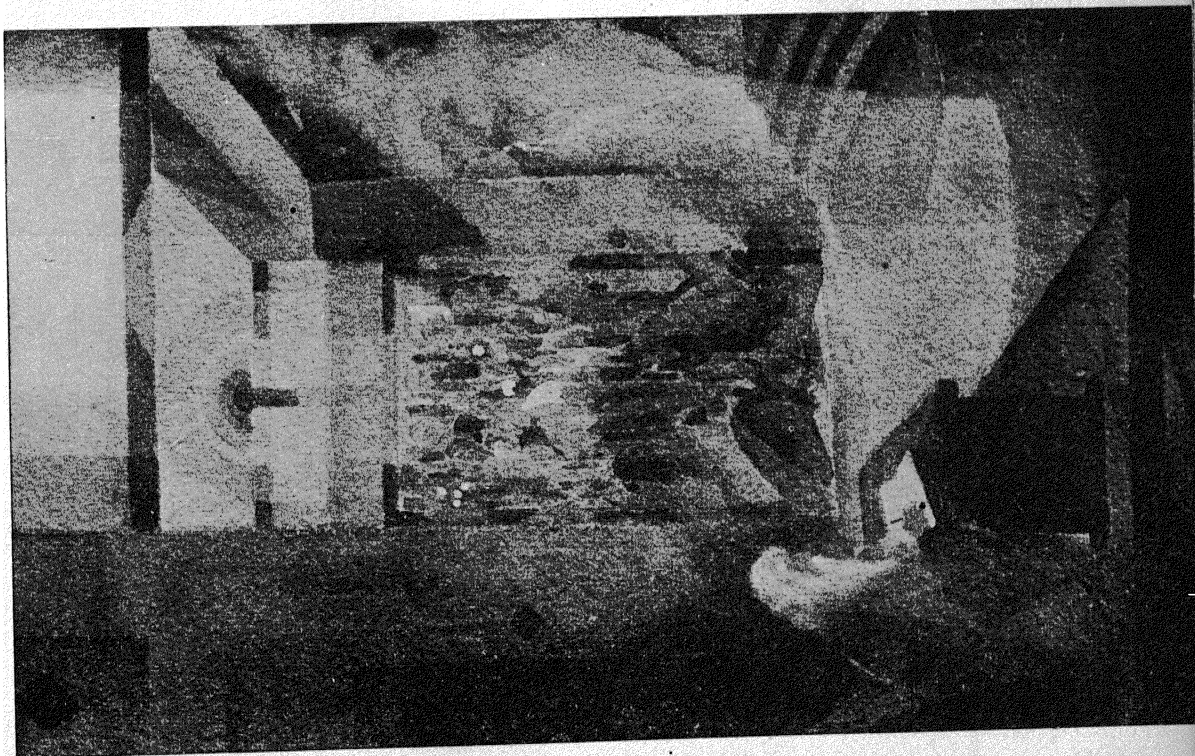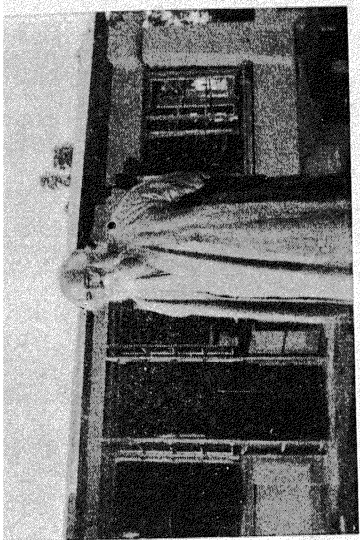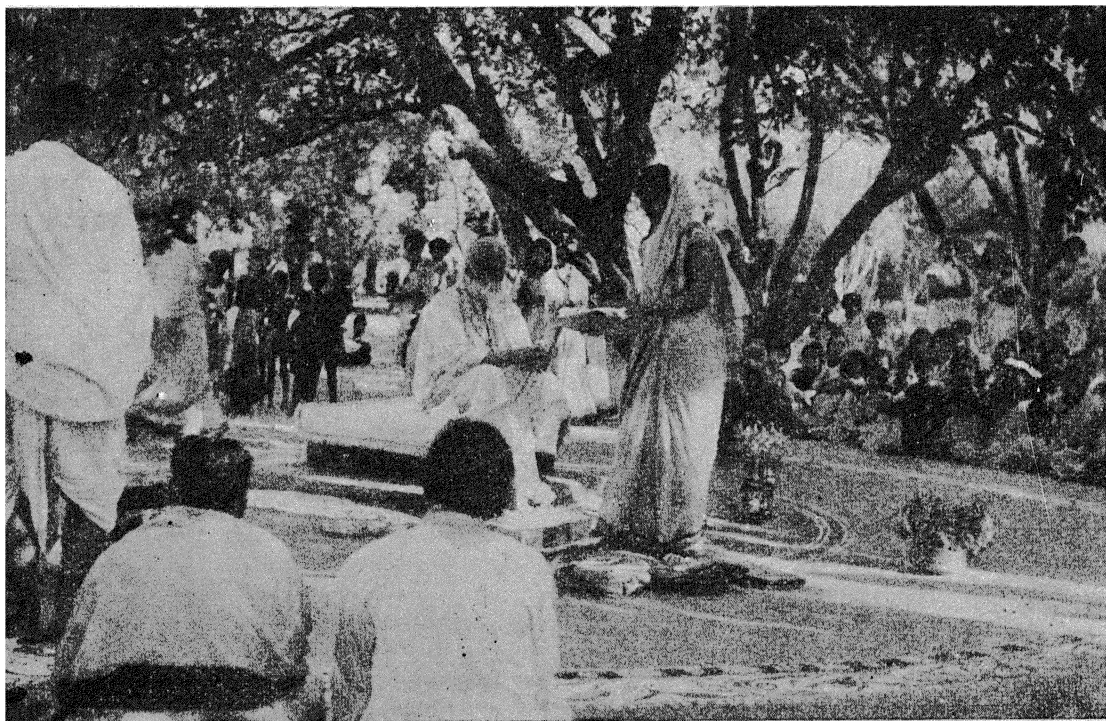
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

—রবীন্দ্রনাথ

"Thy voice is on the rolling air;
I hear thee where the waters run;
Thou standest in the rising sun,
And in the setting thou art fair.
What art thou then? I cannot guess;
But though I seem in star and flower
To feel thee some diffusive power,
I do not therefore love thee less:
My love involves the love before;
My love is vaster passion now;
Though mix'd with God and Nature thou,
I seem to love thee more and more.
Far off thou art, but ever nigh;
I have thee still, and I rejoice;
I labour, circled with thy voice;
I shall not lose thee though I die."

—Tennyson.

১৭৮৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১২৬৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ১৮৬৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১৩৪৮ সালে ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর এই দীর্ঘ জীবন মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সত্য বটে, কোন মানুষের জীবন যদি শুধু দীর্ঘই হয়, তা হ'লে শুধু সেই কারণেই তাকে মূল্যবান্ মনে করা যেতে পারে না। যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে আছে :—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

"গাছপালাও বেঁচে থাকে, পশুপক্ষী বেঁচে থাকে, কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকাই সত্য বেঁচে থাকা যাঁর মন মননের দ্বারা জীবিত।"

মনন ও আনন্দানুভূতি এবং সাহিত্যে ও কাজে তার জীবনব্যাপী প্রকাশ লোকোত্তর বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। তাঁর সঙ্গে খুব দীর্ঘকালের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁকে ভাল ক'রে চিনেছি বুঝেছি, এ অহংকার আমাদের নেই। যে নিজেই জানে না, সে কেমন ক'রে অন্যকে জ্ঞান দিবে? এই প্রবন্ধে তাঁর নানাবিধ কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কৃতিগুলির সমষ্টি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সে-সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত একটি অখণ্ড সত্তা, এই কথা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে খুব দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন, তা নয়; তিনি তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ (ন') বৎসর বয়সে শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ ক'রেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও, তিনি লিখেছেনই তো ৬৭।৬৮ বৎসরের অধিক কাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭।১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তা ছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসআত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী নাট্য আছে, গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের, জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প ব'লে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় ক'রে এবং আরও নানা রকমে ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেও নয়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই তো তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি ক'রে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ

ছিল, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর ক'রে গেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্ম্যান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারোও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোস্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক রূপে—এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম-ভারতীয়-দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চ্যর্স্ দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন,—

"Victor in Drama, Victor in Romance,
Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears,"
"Lord of human tears," "Child-lover,"
"Weird Titan by thy winter weight of years
as yet unbroken."

আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই সব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রীমণ্ডিত ব'লে অনুভব ক'রতে পারি।

তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেন নাই। মহাকাব্য সাধারণতঃ কোনো প্রসিদ্ধ রাজবংশ কোনো মহাযুদ্ধ কোনো বড় রাজা মহারাজা সম্রাটকে অবলম্বন ক'রে লিখবার রীতি সর্বদেশপ্রচলিত। কিন্তু রাজতন্ত্রের ও রাজা মহারাজা সম্রাটদের যুগ চলে গেছে, যুদ্ধ ঘৃণ্য বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অতিকায় জীবজন্তুর যুগ যেমন এখন আর নাই, মহাকাব্যের যুগও তেমনি অতীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা গীতিকবিতাতেই সমধিক ভাস্বর হয়েছে। তিনি "ক্ষণিকা"য় রহস্য ক'রে লিখেছেন :—

"আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি'
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্তি কলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

তাঁর গান ও গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরো বেশী বহু ও বিচিত্রভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্য মহাদেশের লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানের রচয়িতা মনে করে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে

তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে বহুপরিমাণে গ'ড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়; যেমন নিম্নলিখিত গীতাংশে।

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা!
জনগণদুঃখ-ত্রায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ কথাবার্ত্তায় তিনি সুরসিক ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও ছিল সাহিত্যধর্ম্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত কল্লেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্রজাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী রূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশী দিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন এবং তার কার্যতঃ প্রতিবাদস্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। "মুক্তধারা" নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগী এই রকম কথা ব'লেছেন।

তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁর "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন ক'রে লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃত কচ্ছি।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

তৃতীয় প্রজা। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বল্‌ব?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃ প্র। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা হ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ প্রজা। বাবা, একথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্।

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়, তখনি শান্তি হয়।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

প্রতাপাদিত্য। দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না! এখন কাজের কথা হোক্‌। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

।। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি ব'লে!

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস্‌ নে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বললেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করেছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দিবার পর—

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্চ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। (ধনঞ্জয় বন্দী হইলেন)

আগুন লেগে কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাইরে এসেছেন।

ধনঞ্জয়। জয় হোক্‌ মহারাজ! আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না; কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটার পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি ক'রে? তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক'দিন কাট্‌ল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এ সব তার লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

(ওরে) শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার!
তোমার পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর!
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না?

"অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জাতি-ভেদবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে রচিত "গীতাঞ্জলি"র অন্তর্গত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

"গীতাঞ্জলি"র ইংরেজি অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্ব-সাহিত্যিকবাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজি লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার জন্যে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কী অলোকসামান্য নম্রতা!

দীনদরিদ্র নিরক্ষর লোকদের প্রতি তাঁর প্রীতি শ্রদ্ধা সমবেদনা করুণা যে তাঁর কত রচনাতে আছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করাও কঠিন। ঐ "গীতাঞ্জলি"তেই আছে,

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।'

আরো আছে,

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।"

গত ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ "ঐকতান" কবিতাতে আছে :—

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে তাঁর এই রকম নানা কথা শুধু পুঁথিগত নয়। "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বাচৌড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর পরিবারে ও শান্তিনিকেতনে "অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য বরাবর নিযুক্ত হয়ে আসছে অবাধে।

যে-সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তার পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরো দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও স্কুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন। সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত তাঁর জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা বেরিয়েছিল। তিনি রেয়ৎ প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তার একটা সত্যি গল্প বলি। একবার এক ইংরেজ মাজিস্ট্রেট্ তাঁর সঙ্গে তাঁর জমিদারী দেখতে যান। তাঁর যে প্রজার উপরে তাঁদের যানবাহনের ব্যবস্থা করবার ভার ছিল, সে একখানি মাত্র পাল্কি এনে হাজির করে! তার ধারণা তাদের রাজার সঙ্গে যে যাবে সে হেঁটে যাবে, হোক্ না কেন সে ইংরেজ মাজিস্ট্রেট! রবীন্দ্রনাথ অনেক বলা-কওয়ায় সেই প্রজা সাহেবের জন্য শেষ পর্যন্ত একটা বেতো ঘোড়া এনেছিল!

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তার পরও তাঁর অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে তিনি এই সব কথা বলেছেন। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান বিভাগ শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য, পল্লীশিল্প, গ্রামে দরকারমত কৃষকদের মূলধন সরবরাহ, ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ ক'রে থাকেন।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনের, এবং ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সমর্থন কখনও করেন নি।

অন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় এক চল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁহার "ন্যাশন্যালিজ্ম্" নামক ইংরেজী গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে "নৈবেদ্য" গ্রন্থে প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

তিনি ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত দেখার আনন্দ সম্ভোগ ক'রে যেতে পান নাই, একথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাহ্য রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন হ'তে মুক্তি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু সামাজিক ও আন্তরিক সর্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয়

তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিক্‌গুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি ছিলেন।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' সম্বন্ধে তাঁর শেষ উক্তি গত ১লা বৈশাখের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট" সাতিশয় বেদনাপূর্ণ; কিন্তু তিনি তাতেও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কথা বলেন নাই। তাতে বলেছেন :—

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

তিনি ছিলেন সমুদয় বিদেশীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। তাঁর এই উদার ভাব তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে তাঁর "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতাটি সুবিদিত। তার দুটি কলি উদ্ধৃত ক'রব।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

*　　*　　*　　*

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

তিনি চীন জাপান জাভা বালী ও ভারত-মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনোবাক্যে ক'রে গেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাক্‌বেন এক ও অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত

করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি-ও-সমষ্টি-গত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে শিক্ষা লাভ করেন একত্র। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়, চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতির অনুশীলনও হ'য়ে থাকে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীর অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীশ রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত-উৎপাদক ও সম্ভাব্য-স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জ্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকারও সে অর্জ্জন করিবে। (অনুবাদ)।

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যেতে পারে, তার তালিকা আছে। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, ছুতরের কাজ, প্রভৃতি তার অন্তর্গত। লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁরা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হ'য়েছে, তা, এবং এর মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যা লিখিত হ'য়েছে, তাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন এর আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান লিখছি।

এর পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই;—এতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষা-সত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাবে ও দেশ স্বাধীন হবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওআর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে—যেমন তাঁর চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থ নৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে!

বিশ্বভারতীতে ছাত্র ও ছাত্রীরা কেন গীতবাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় করে এবং সেখানে এইগুলি শিখাবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। এ বিষয়ে কবি চীনদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহামান্য তাই চি তাও মহাশয়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন:—

Tonight we shall present before you another aspect of our ideal where we seek to express our inner self through song and dance. Wisdom, you will agree, is the pursuit of completeness; it is in blending life's diverse work with the joy of living. We must never allow our enjoyment to gather wrong associations by detachment from educational life; in Santiniketan, therefore, we provide our own entertainment, and we consider it a part of education to collaborate in perfecting beauty. We believe in the discipline of a regulated existence to make our entertainment richly creative.

In this we are following the ancient wisdom of China and India; the *Tau*, or the True Path, was the golden road uniting arduous service with music and merriment. Thus in the hardest hours of trial you have never lost the dower of spiritual gaiety which has refreshed your manhood and attended upon your great flowerings of civilisation. Song and laughter and dance have marched along with rare loveliness of Art for centuries of China's history. In India Sarasvati sits on her lotus throne, the goddess of Learning and also of Music, with the Golden Lyre—the *Veena*—on her lap. In both countries, the arcanea of light have fallen on divinity of human achievements. And that is Wisdom.

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষ ভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কেরাও যাতে অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও কৈশোরে বাড়ীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক জন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২।১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌরগোপাল ঘোষ, বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে

দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এ সকলের শিক্ষার স্থান। বিশ্বভারতীর কোন কোন ছাত্রকে সার্কাসের শক্ত শক্ত ব্যায়াম ও দুঃসাহসের কাজ করতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনের ফুটবল খেলোয়াড়রা মফস্বলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক খেলাধূলার মধ্যে নানা রকম দৌড় এবং তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে।

আগে আগে কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের থাকবার ঘরে তাদিগকে গল্প বলতেন; তা ছাড়া কিছু দূরের খোলা মাঠে বা স্বাভাবিক কোন কুঞ্জেও বলতেন। সেখান থেকে ফিরবার সময় ছেলেরা কখন কখন তাঁকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত। এ ৩০।৩৫ বৎসর আগেকার কথা। দৌড়ে তিনিই সব বারেই জিততেন। তিনি তখন বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ পুরুষ; বোলপুর স্টেশন থেকে হেঁটে শান্তিনিকেতন যাতায়াত করতেন।

ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষত্রুটির বিচারের জন্যে তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রভাব অনুভব সম্বন্ধে সকলকে জাগরিত করবার জন্যে কবি ঋতু-উৎসবগুলি প্রবর্তন করেন;—যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব।

আর্তের সেবা, রোগীর সেবাশুশ্রূষা তিনি শুধু বাক্যে প্রচার ক'রে ক্ষান্ত হন নি, কাজেও ক'রেছেন। তার একটি অনুপ্রাণনাপূর্ণ আখ্যান এই মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে দেওয়া হয়েছে।

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকালসন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা-সংসদ" স্থাপন ক'রে গেছেন। এর জন্যে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন; এর কেরানীগিরি পর্যন্ত ক'রেছেন; স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য সহকারে পড়িয়েছেন; কিছু দিন আগেও নিজের কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহমনের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারী কবির অন্য ব্যসন তো ছিলই না; পান তামাকের অভ্যাস পর্যন্ত না-থাকায় তিনি সকলের আদর্শ 'গুরুদেব' ছিলেন।

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্বখ্যাতি না থাকলে পাণ্ডিত্যখ্যাতি র'টত। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছিলেন, ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

Farming; philology; history; medicine; astrophysics; geology; bio-chemistry; entomology; co-operative banking; sericulture, indoor decorations; production of hides; manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms; lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology; synthetic dyes; parlour-games; Egyptology; road-making; incubators; wood-blocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing; etc.

এ সকল ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত পড়তেনই। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।

উপরে তাঁর অধীত নানা বিষয়ের যে ইংরেজী তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা একটি। হোমিওপাথির বড় বড় বই তিনি দস্তরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক্যাল চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখন কখন রহস্য ক'রে বল্‌তেন, "আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।"

ইংরেজি ফর্দটির মধ্যে রান্নার পাঁতি ও "সুন্দর হস্তাক্ষর" (calligraphy)এর উল্লেখ আছে। তিনি নানা রকম রান্নার পরীক্ষা করতেন। নানান্ খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষাও করতেন। এক সময়ে নিমপাতা তাঁর একটি প্রধান খাদ্য ছিল। চিনির চেয়ে গুড় তিনি বরাবর ভাল বাসতেন। ভাতের ফেন ফেলে দেওয়ার নিন্দা করতেন। এক সময় রেড়ির তেলের ময়েন দেওয়া রুটি খেতেন। তাঁর অতি সুন্দর বাংলা ও ইংরেজী হাতের লেখার কথা কোন্ বাঙালী না জানে?

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, এক দিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না—যদিও নিজের আহার সম্বন্ধে কখন কখন অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন; তাই মৃত্যুর সম্বন্ধে বলেছেন:—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযুষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযুষ পান করান।

কবিকে আমি সাধক ব'লে জানতাম। কিন্তু বৈরাগ্য তাঁর সাধনার পথ ছিল না। তিনি লিখেছেন:—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

কবি নারীকুলের—বিশেষ ক'রে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশি ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা ক'রেছেন ও করতে চেয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যেই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল; অর্থাভাবে তা ঘটে ওঠে নি। বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশি উদ্বিগ্ন হ'তেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে দিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীত-ভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষণব্যবস্থা-সমেত শ্রীভবনটি রাখবেন।

নারীদের সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ কি ছিল? তাঁর বহু কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্পে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাধারণত "চিত্রাঙ্গদা"র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে।

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

"মহুয়া"র 'সবলা' কবিতায় অন্য সুরের ঝঙ্কার পাই। ঐ গ্রন্থের 'নাম্নী' কবিতাবলীতে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নারীচিত্র আছে।

"আরোগ্য" গ্রন্থে 'নারী তুমি ধন্যা' কবিতায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরিকাদের মহনীয় বহু স্বরূপের বন্দনা কবি ক'রেছেন।

কবি তাঁর সহধর্মিণীর পরলোকযাত্রার পর "স্মরণ"-শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এই বিষয়ে আলোকপাত ক'রেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কী গভীর ছিল। কবির সন্তানস্নেহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক। এর থেকে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ীর এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে—এক সঙ্গে একই খাদ্য।

"কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।"

"কবি-পত্নী এক বার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন ব'লে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা।"

"কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।"

"নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'"

"সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন, এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট ক'রে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা।"

"ভৃত্যরা খুশী মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ সাজে সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, 'এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ-সম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই।

বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে, সে-সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।' "

"সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এর পর কবি কর্তৃক পত্নীর সেবার যে পবিত্র চিত্রটি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যদি মহাপুরুষ না হ'তেন তা হ'লেও তারই জন্যে তিনি জগজ্জনের চির-আরাধ্য হয়ে থাকতেন।

"শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হ'তেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন, তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

"স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্ত রূপে। তখন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ধ'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।"

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত। পত্নীর মহাপ্রয়াণে তিনি মর্মন্তুদ বেদনায় "স্মরণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতায় প্রার্থনা ক'রেছিলেন :—

"আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হ'তে হ'র;
প্রভাত-জগত হতে মোরে ছিঁড়ি,
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি',
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহ বাহু ডোর।"

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানসত্ত্বেও এই দম্পতি অভিন্নাত্মা হয়েছিলেন। কবি স্বর্গগতা পত্নীকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন :—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।"

আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নাই। এখনো মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র সুন্দর রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো। "ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,"—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

তাঁর কামনা ছিল—

"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি' কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ উর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরবার আগে।"

"এ জন্মের সত্য অর্থ" তিনি জেনে গেছেন।

তিনি বিশ্বজনকে এত দিয়েও তৃপ্ত হন নাই। আরো কিছু দিতে চেয়েছিলেন—নিশ্চয় দিয়েও গেছেন, নেবার যোগ্য হ'লেই, নিতে জান্‌লেই পাব :—

"আমি কিছু দিতে চাই, তা না হোলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কি করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,

ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্ব পরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
র'বে না সম্মান, তাই আশঙ্কার এ দুরন্ত হ'তে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হ'তে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি ॥"

এই "শুভ শঙ্খধ্বনি" শুনবার আশায় আছি—এ তো আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাবার নয়। ধ্বনি শুনে কবির—

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলতে পারব, "সকল প্রভাতেই কবি তুমি আছ" ;

"সকল খেলায় ক'রবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।"

দিব্যধামবাসীদের মধ্যে কবির শুভ আগমনের উৎসবকলরোল মিশ্রিত সেই শঙ্খধ্বনি শুনে তখন তাঁর ঐ কথাগুলির অর্থও হৃদয়ঙ্গম হবে। তখন আর এখনকার মত বলতে হবে না,

"ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বকবির মহানির্বাণ

কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায়

মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন মনে হয় বেঁচে থাকার যেন আর কোনও প্রয়োজন নেই। এ জীবনের হিসাব-নিকাশ এখন চুকে যাওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্নের উদয় কিছু দিন থেকে হয়েছিল তা তাঁর গত কয়েক বৎসরের রচনাভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যায়। মনে পড়ে বছর দুই আগে বৈশাখের এক বৈকালে বেলঘরিয়ার বাসভবনে এই সম্বন্ধে একবার কথা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "মৃত্যুকে আপনি ভয় করেন ?" উত্তর হ'ল, "শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না ; ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে। যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা করি না।" সেদিন তিনি হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি যে, মৃত্যু তাঁকে পৃথিবীর কাছে হাসিমুখে বিদায় নিতে দিবে না।

আর এক দিনের কথা। বছর দেড়েক আগে জোড়াসাঁকোর বাসভবনে এক সন্ধ্যায়। মংপু যাত্রাপথে কবি কলকাতায় এসেছেন দু-দিনের জন্য। দেখা করতে গেছি—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও আমি। কবি তখন চোখের অসুখে ভুগছেন। চিকিৎসকের নির্দেশ যে চোখে আলো লাগানো হবে না, যত দূর সম্ভব আলোক পরিহার করতে হবে। কবির কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত বাবু সে কথা কবিকে মনে করিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেবার আদেশ চাইলেন। সে কথা শুনে কবি যেন মুহূর্ত্তের জন্য অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ ক'রে অতি মৃদু হেসে বললেন, "আলো ? আচ্ছা, তা আলো নিবিয়ে দে।" এই "আলো নিবিয়ে দে" কথাটার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ছিল যে, কেন জানি না আমার সমস্ত চেতনা যেন মুহূর্ত্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ যেন মনে হ'ল যে এবার সত্যই বুঝি আলো নেবার সময় এসেছে। ঘরের আলো নয়, বাংলার আলো নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের আলো। আলো নিবিয়ে দিয়ে সুধাকান্ত চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীও কি কাজে কিছুক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে গেলেন। অন্ধকার ঘরের ভিতর কেবল মাত্র কবি—আর আমি। তার পরের ঘটনা জীবনে কখনো ভুলব না। ঘরের ভিতরে অন্ধকার।

অন্তিমশয়নে রবীন্দ্রনাথ

ফোটো—শ্রীতারক দাস

বাহিরে অন্ধকার রাত্রি। আর কবি আপন মনে বহু দিন পূর্ব্বেকার রচিত একটি গানের একটি পংক্তি অতি মৃদুস্বরে আত্মসমাহিত হয়ে গাইছেন—

"জানি হে যবে, প্রভাত হবে, তোমার কৃপা তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে"

এ গান সেদিন তিনি যে কেন গেয়েছিলেন তা সেদিনও বুঝতে পারি নি—আজও বুঝতে পারি না। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুতে, সেই নির্জ্জন অন্ধকার ঘর ও সেই অতি মৃদু সঙ্গীতধ্বনি আমার মনে কিছুক্ষণের জন্য যে অপার্থিব মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিল, তার স্মৃতি আমার অন্তর থেকে কখনো মুছে যাবে না।

আগের ও পরের কথা বাদ দিয়ে এবার শেষের ক'দিনের কথা সংক্ষেপে ব'লে আমার কথা শেষ করি। তারিখ ঠিক মনে নেই। বোধ হয় ১লা কি ২রা জুলাই হবে শান্তিনিকেতন থেকে সুধাকান্তবাবুর চিঠি পেলাম যে, কবির শরীর গত বৈশাখে যা দেখে এসেছিলাম তার থেকেও খারাপ হয়েছে। তখনো কল্পনা করতে পারি নি যে তাঁর "জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা" এত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। ২৫শে জুলাই কবি কলকাতায় এলেন অস্ত্রোপচারের জন্য। ২৯শে জুলাই বৈকালে প্রণাম ক'রে একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ কেমন আছেন?" ক্লান্ত চক্ষু দুটি তুলে মৃদু হেসে বললেন, "ভাল আছি বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে। তবে আছি এক রকম।" তার পর ৩০শে জুলাই বেলা সাড়ে দশটার সময় কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা কবিকে অস্ত্রোপচার করলেন। বৈকালের অবস্থা দেখে সকলের মনে হ'ল যে, এবারের মত মেঘ বোধ হয় কেটে যাবে, আবার সূর্য্যালোক দেখা দেবে। কিন্তু অলক্ষ্যে যে কখন আবার ঘন-মেঘ-সঞ্চার আরম্ভ হয়েছিল তা হয়ত কেউ লক্ষ্য করে নি। ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট নিরুপদ্রবে কাট্‌লো কিন্তু রোগের গতি পথ পরিবর্ত্তন করলে ২রা আগষ্ট থেকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হিক্কা সুরু হ'ল ও সেই সঙ্গে আহারে বিরাগ। চিকিৎসকেরা গ্লুকোজ ইন্‌জেকশান দিতে সুরু করলেন উপায়ান্তর না দেখে। তার পর থেকে আরম্ভ হ'ল জীবন নিয়ে মৃত্যুর

সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। এই সময় দেখেছি কবিকে সেবা করছেন তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা, শ্রীমতী রাণী চন্দ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তাঁরা মুহূর্ত্তের বিশ্রাম না নিয়েও যে অক্লান্ত সেবা এই কয়দিন করেছেন তা বর্ণনা করার শক্তি আমার ভাষায় নেই। মানুষ যে মানুষের এই রকম সেবা করতে পারে, তা এই সর্ব্বপ্রথম দেখতে পেলাম। কবিকে দেখে সবচেয়ে অসহ্য মনে হ'ত তখন যখন দুই চোখ খুলে ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। যে-চোখের দিকে একবার তাকালে অতিবড় শক্তিশালীরও মাথা মুহূর্ত্তের মধ্যে নত হয়ে পড়ে, সেই চোখ যখন অসহায় শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকায় তখন তা কল্পনা করাও অসহ্য মনে হয়। সোমবার থেকেই চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হ'তে শুরু করল। মঙ্গলবার রাত্রে অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছল। সে রাত্রে ঘরের বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির উন্মত্ত গর্জ্জন ও ঘরের ভিতর জীবন-প্রদীপের স্তিমিত শিখা—এই দুয়ে মিলে যেন কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের চরম দুঃসংবাদের সূচনা বহন ক'রে আনছিল। কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল। সমস্ত রাত্রি ধ'রে টেলিফোনে কবির অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ নেওয়ার বিরাম ছিল না। সকাল থেকে তা দ্বিগুণ ক'রে শুরু হ'ল। টেলিফোনের রিসীভার নামিয়ে রাখার সময় পাওয়া ভার, এমনি অবস্থা।

অবস্থা তো ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছিল, সকাল থেকে আরও খারাপের দিকে চল্‌তে শুরু করলে। বেলা ১০॥ টার সময় ডাঃ ললিত বাঁড়ুজ্যে এলেন কবিকে পরীক্ষা করতে। বাহিরের বারান্দার ও বসবার ঘরের সমস্ত লোক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল ডাক্তারের অভিমত শোনবার জন্য। পরীক্ষা-শেষে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পর যখন কবির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন ম্লানমুখে মৃদুস্বরে বললেন যে, "We are not happy, এ কথা আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল।" শেষ আশার রেশটুকুও মিলিয়ে গেল। সকলের বুকের উদ্গত নিঃশ্বাস একসঙ্গে বেরিয়ে এল। তার পর সমস্ত দিন টেলিফোনের বিরামহীন ধ্বনি—প্রেস থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ইত্যাদি মিলিয়ে সমস্ত দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা না-হ'তেই বাহিরের ঘর লোকে ভরে গেল। অত বড় ঘরটিতে এতগুলি লোক; কিন্তু তবুও সমস্ত ঘর যেন মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

রাত্রি এল। পূর্ণিমার রাত্রি। এই রাত্রে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে এটি চিরস্মরণীয় রাত্রি। ঠিক বারটার সময় একটি সঙ্কট-অবস্থা দেখা দিল কিন্তু তা কেটে গেল। আমরা ডাক্তার নই। সেই জন্যই হয়ত মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে রাত্রি ৩টার সঙ্কট-অবস্থা যদি কেটে যায় তাহ'লে হয়ত পূর্ণিমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কেটে যেতে পারে, আর যদি পূর্ণিমা কেটে যায় তাহলে হয়ত—, এই হয়ত পর্য্যন্তই মনে হচ্ছিল, তার পর আর কোন আশার কথা ভাবতে সাহস হচ্ছিল না। অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে কয়েকটি প্রাণী ব'সে আছি। কখন ৩টা বাজবে। ৩টা বাজলো। আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারা গেল অবস্থার নিম্নাভিমুখ দ্রুত পরিবর্ত্তন। ডাক্তারের কথা শুনেও অ-ডাক্তার হয়ে যে ক্ষীণ আশাটুকু মনে ধরে রাখা হয়েছিল তা মুহূর্ত্তের ভিতর শেষ হয়ে গেল। পূর্ণিমার নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। পরিপূর্ণ চন্দ্রমার আলো সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে অভিষিক্ত করছে। রাজপথ থেকে কদাচিৎ দু-একটি গাড়ীর শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর কানে আসছে পাশের ঘর থেকে মুমূর্ষু পুরুষসিংহের অন্তিম নিঃশ্বাসধ্বনি। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই অগণিত জনস্রোত রাজপথ থেকে বাড়ীর অঙ্গন ভরিয়ে ফেলেছিল। ৭টার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু কবির অন্তিম শয্যাপার্শ্বে শেষবারের মত উপাসনা করলেন আর তার পর বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় একাশী বৎসরের লক্ষ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত জীবন-নাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নূতন ক'রে বলবার ত কিছু নেই। কেন না, আমাদের যা-কিছু বক্তব্য ছিল, তা তিনি একাই সমস্ত ব'লে গেছেন। তবে এ দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবার একটি রীতি আছে, এই কথা স্মরণ ক'রে আমিও মহাকবিরই ভাষায় তাঁর পূজা শেষ করি—

"এনেছিলে সঙ্গে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
ক'রে গেলে দান।"

মৃত্যু

[মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পূর্বে রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত]

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে।
এক মাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভাল, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত,
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যত বার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
তত বার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হা'র-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

[সর্বস্বত্ব বিশ্বভারতী কর্তৃক সংরক্ষিত]

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম স্বরচিত প্রার্থনা

গান

সমুখে শান্তি-পারাবার,
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও, লও হে, ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুব তারকা।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

[কবি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গীত হইবার নিমিত্ত এই গানটি কয়েক মাস পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। ২২শে শ্রাবণ কলিকাতায় যখন নিমতলায় শেষ অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন শান্তিনিকেতন মন্দিরের উপাসনায় ইহা গীত হয়। ইহা "বিশ্বভারতী নিউস্‌" নামক মাসিকের আগষ্ট সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে গৃহীত হইল।]

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি ঃ—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II সা রা গা -া | গা -পা পা -া I পা -হ্মা ধপা -হ্মা | গা -মা -গা -া I
স মু খে o শা ন্ তি o পা o রা o বা o o র্

I গা -হ্মা পা -া | হ্মপা গহ্মা গা -ঋা I গা -পা গা -ঋা | গা -ঋা সা -া I
ভা o সা ও তo রo গী o হে o ক র্ ণ o ধা র্

I পা পগা পা -হ্মা | হ্মধা -া পা -া I ধর্সা র্সা র্সা -না | র্সর্সা -নর্সা -া -া I
তু মি হ o বে o o o চিo র সা o থীo oo o o

I পর্সা -া -না -ধা | ধনাঃ -ধঃ ধনা -ধপা I হ্মপা -ধনা নধা পহ্মা | গা -া -া -া I
লo o ও o লo ও হে oo ক্রোo oo ড় পাo তি o o o

I গপা গা পা -া | পা ·পা পহ্মা পহ্মা I ধপা -া -হ্মা -গা | র্সা -র্গা র্র্সা -না I
অ সী মে র্ প থে জ্বo লিo বে o o o জ্যো o তি র্

I ধা না ধনর্সা ধনা | ধপা -া -পহ্মা -গা II
ধ্রু ব তাoo রo কাo o o o

II সা -রা গা পা | গা গরা সা -া I সা রা গা হ্মা |
মু ক্ তি o দা o তা o তো মা র ক্ষ

| পা -া -া :-া I হ্মা পা ধা ধা | ধনা -া -ধা -পা I পা ধা না র্সা |
মা o o o তো মা র দ য়া o o o হ বে চি র

| র্সা -র্গা র্রা র্সনা I ধা পহ্মা ধপা -পহ্মা | গা -া -া -া I পা -া পা গা |
পা o থে য়o চি রo যা o ত্রা o o র্ হ য় যে ন

| পা -হ্মা ধা পা I ধা -র্সা র্সা র্সনা | র্র্সা -া -া -া I র্সা র্সা -র্গা র্গর্রা |
ম র্ ত্যে র ব ন্ ধ নo ক্ষ o o য়্ বি রা o ট

| র্রর্সা -া র্সা -না I পধা -নর্সা র্সনা নধা | -নর্সা র্সনা ধপা -হ্মা I গপা -া পা -া |
বিo o শ্ব o বাo oo ক্ষo মেo oo লি লo য়্ পাo য়্ অ ন্

| পা -হ্মা পা -া I পা -হ্মধা ধপা হ্মা | গা মা গা -া I র্সা -র্গা র্র্সা -না |
ত o রে o নি oর্ ভ য় প রি চ য়্ ম o হা o

| ধপহ্মা -া ধপা -হ্মা I গা -মা -গা -া | -া -া -ঋা -সা II II
অoo o জা o না o o o o o o র্

পুস্তক পরিচয়

অশোক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪০, ৭৩ পৃ.।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐতিহাসিকগণের নিকট সুপরিচিত। মহারাষ্ট্র জাতির অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া তিনি পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে তিনি মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা একাধারে চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "ঐতিহাসিক প্রণালীতে অশোক অনুশাসন হইতে নির্ভরযোগ্য যে সকল সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাই যথাসাধ্য সরলভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অশোকের সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাদানুবাদ ও অলীক গল্প উপাখ্যান প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া তিনি অশোকের অনুশাসন ও তাহা হইতে অশোকের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতের (কাহারও কাহারও মতে জগতের) এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সম্বন্ধে সঠিক খবর জানিতে চান অথচ ইংরেজীতে লেখা মোটা মোটা বই পড়িবার সুবিধা বা অবসর পান না, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

বইখানিতে একখানি মানচিত্র ও দুইখানি ছবি আছে। মাসকি লিপির যে প্রতিলিপিখানি দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্টা করিয়া বসান হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শুভশ্রী—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। গ্রন্থকার কর্তৃক ৯ নং সত্যেন দত্ত রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য বইখানিতে তেরটি রচনা আছে। সব রচনাগুলিকে ঠিক গল্পের কোঠায় ফেলা না গেলেও, সবগুলিই মনে গল্প পড়িবার আগ্রহকেই জাগাইয়া তোলে। সবগুলিতেই একটু সূক্ষ্ম হাস্যরস হয় ব্যঙ্গের রূপে, না-হয় নিছক কৌতুকের রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কয়েকটি রচনা—যেমন "পদ্মা", "রোয়াক" একটু অন্য ধরণের। গৃহস্থের বাড়ি-সংলগ্ন এক ফালি রোয়াকের উপর বাহিরের নিত্যপ্রবহমান জীবনে যে বিচিত্র ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা খুব মনোজ্ঞ হইয়াছে। "পদ্মা" গল্পটিতে নিয়তির ক্রূর পরিহাস ছোট একটি করুণ ঘটনার মধ্য দিয়া অদ্ভুত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা অতর্কিত একটা খুব রূঢ় শক্ পাইয়া যেন অসাড় হইয়া পড়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রক্তগোলাপ—জ্যোতির্ম্মালা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি একখানি উপন্যাস। বইখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। এ ধরণের মধুর রচনা বাংলা সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না। প্রেমের কাহিনী, কিন্তু সে কাহিনী গতানুগতিকতা ও ন্যাকামির ভারে আদৌ ভারাক্রান্ত নয়। স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে আপনার বেগে পরিণতির দিকে প্রবহমানা।

লেখিকার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব পরিমাণে কিছু অধিক, সংলাপ এবং সংস্থান স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি বলিলেও চলে, কিন্তু তবুও লেখিকার কৃতিত্বে তাহা অন্ধ অনুকরণ বা হাস্যোদ্রেককারী ব্যর্থ চেষ্টা নয়। তথাপি এই অনুকরণের গন্ধটুকু না থাকিলে রচনাটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিতে পারিতাম।

বই পড়িয়া যাঁহারা আনন্দ পাইতে চান—তাঁহারা 'রক্তগোলাপ' পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন।

বইখানির ছাপা ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম। এ বিষয়ে আমরা অভিযোগ জানাইতেছি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ।০ + ১৬০। মূল্য এক টাকা।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া যে সকল কর্ম্মবীর নানা দিক্প্রসারী চিন্তা ও কর্ম্মধারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি ও সংস্কৃতির বিকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পুণ্য জীবন-কাহিনী লেখক এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন, জন এডামস, টমাস জেফারসন, গ্যারিসন, এব্রাহাম লিঙ্কলন, গ্রাণ্ট, গারফিল্ড, বুকার টি ওয়াশিংটন, উড্রো উইলসন ও রুজভেল্ট এই এগার জনের জীবন-কথা অনেকেই জানেন, অথচ সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাবে লিখিত জীবনীর মধ্যে এই সকল কর্ম্মবীরকে নূতন করিয়া জানিবার উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে। ইঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে শতাব্দীব্যাপী যে ঘটনাপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়া গিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পথটি সুগম করিয়া দিয়াছে—তাহা ষ্ট্যাম্প আক্ট প্রত্যাহারের দাবী হইতে নিগ্রো-দাসদের মুক্তি-আন্দোলন ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পর্য্যন্ত নবরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসে—জাতির মনোবল, কর্ম্মপন্থা ও মানবহিতৈষণার পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। যোগেশবাবুর লিপি-সংযম ও তথ্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি পুস্তকে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিশোরচিত্তের উপযোগী করিয়া লেখনী চালনার দক্ষতাও তাঁহার আছে। এই জীবনী-আলেখ্যগুলি হইতে স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপকরণও যথেষ্ট রহিয়াছে। সুলিখিত জীবনীর সঙ্গে প্রত্যেক কর্ম্মবীরের একখানি করিয়া চিত্র সংযুক্ত হইলে কিশোরদের পক্ষে অনুযোগের কিছু থাকিত না। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রকাশকেরা এই দিকে দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ঋষি অরবিন্দ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের ক্ষুদ্র ভূমিকা-সম্বলিত অরবিন্দের নাতি-বিস্তৃত জীবনী। মানুষ দ্বিরূপী। এক রূপে বিকশিত হয় তার জীবজীবন যেখানে সে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে সমগোত্রীয়, সে জীবন মরণশীল; আর এক রূপে প্রতিভাত হয় তার ভাবজীবন যেখানে প্রাণি-জগতে সে একক স্বতন্ত্র, সে জীবন শাশ্বত, সনাতন। ক্ষয়িষ্ণু জীবজীবনের উপরে মৃত্যুঞ্জয়

ভাবজীবনের প্রতিষ্ঠা যিনি করিতে পারেন তাঁহাকেই বলা হয় মহামানব। সুতরাং মহামানবের জীবনী রচনায় এই ভাবজীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আবিষ্কার করাই জীবনীকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ঋষি অরবিন্দ পড়িয়া দেখিলাম গ্রন্থকার এই উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। গ্রন্থখানিকে ঘটনাপঞ্জীর দ্বারা স্তূপীকৃত না করিয়া স্বল্প পরিসরের মধ্যে তিনি ঋষি অরবিন্দের আত্মবিকাশের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। বড়োদার তপস্বী-অধ্যাপক অরবিন্দ এবং স্বদেশী যুগের স্বদেশপ্রেমিক অরবিন্দ কি করিয়া পন্দিচেরীর ঋষি-অরবিন্দে রূপান্তরিত হইলেন তাহাই বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থখানিকে অরবিন্দের তথ্যবহুল জীবন কিছুতেই বলা চলিবে না, পন্দিচেরীর আর্য-জীবনকথাও ইহাতে অল্পই বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বদেশী যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অরবিন্দের ধর্মপ্রাণ স্বদেশপ্রীতির আলোচনায় লেখক অরবিন্দের যথার্থ রূপটিই উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সুললিত চলিত ভাষা প্রশংসার্হ।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় শব্দকোষ। পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল আলাদা।

যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট অভিধানটি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। ৭৭তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ "মূল," এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪৫২।

বঙ্গীয় মহাকোষ। (Encyclopaedia Bengalensis)। পরলোকগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও আরব্ধ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল পৃথক লাগে। প্রাপ্তিস্থান, ইণ্ডিয়ান রিচার্চ ইন্সটিটিউট, ১৭০ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইহার ২য় খণ্ডের ১৯শ ও ২০শ সংখ্যা পাইয়াছি। ১৯শ সংখ্যার প্রথম শব্দ "অনুশাসিতা" ও শেষ শব্দ "অনেকান্তবাদ", ২০শ সংখ্যার প্রথম শব্দ "অনেকান্তিক হেত্বাভাস" ও শেষ শব্দ "অন্তর্বেদ, অন্তর্বেদী"।

ড.।

মনে ছিল আশা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। একটি ছোট উপন্যাস। দরিদ্র যুবক অমলের জীবনসংগ্রাম ও ছোট বড় সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার ইতিহাস। বইখানি ঘাটশিলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, হাতে তখন কোনও কাজ ছিল না বলিয়া। কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখিলাম গল্পটি প্রথম হইতেই মানুষের মনকে স্পর্শ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে কৌতূহল মিটে না। গল্পটিতে আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ, ঘোরালো প্লট, অপূর্ব্ব চরিত্র বিশ্লেষণ কিংবা আধুনিক স্বাধীন চিন্তার নামে স্বেচ্ছাচারিতার বিশদ বর্ণনা নাই। আছে একটি উচ্চাভিলাষী যুবকের মেসের জীবনের নানা খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতার কথা, ঋণগ্রস্ত দুই বন্ধুর আর্থিক উন্নতির ব্যর্থ প্রয়াস, হতাশ অমলের দেশ-বিদেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা ও তাহার ফলাফলের কাহিনী, পরিশেষে দরিদ্র বাঙালীর কাম্য কেরানী-জীবনে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। তরুণ মানুষের মনের নিভৃত কোণে যে সুখস্বপ্নটি এক দিন সত্য হইয়া উঠিবার আশা রাখে, সংসারের সুবিধা দেখিতে গিয়া সে আশাতেও অমলকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। "সমস্ত যৌবন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে পরম প্রতীক্ষায়" সে প্রতীক্ষার অবসান হইল একটি বস্তুতান্ত্রিক প্রগলভা বালিকার অশোভন প্রবেশে। মোটের উপর বইখানি আগ্রহের সহিত পড়িতে ইচ্ছা করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনা, আশেপাশের সাধারণ বস্তু ও মনের কোণের ছোটবড় আনন্দ-নিরানন্দ, আশা-নিরাশাকে দরদের সঙ্গে খুঁটাইয়া দেখিবার ক্ষমতা লেখকের আছে। চরিত্রগুলি সবই প্রায় স্বাভাবিক। বালিকা-বধূ পারুলকে তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বেশী পাকা ও কাটখোট্টা মনে হয় এবং জ্যোৎস্নারও দুই-একটি ব্যবহার অস্বাভাবিক লাগে।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। ছোট গল্পের বই। বইখানির নামটি একটু আপত্তিজনক, নাম দেখিলেই মনে হয় স্ত্রীজাতিকে ঠাট্টা করা হইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। বইখানি বিদ্রূপাত্মক রচনা নয়। জীবনে চলার পথে যত রকমের স্ত্রী-পুরুষের দেখা পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই যেন অন্তরের কথা লেখক দরদের সহিত লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'অব্যক্ত'তে আঠারো বৎসর বিবাহের পর বিরহী স্বামী স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করিতে গিয়া থমকিয়া থামিয়া গেল। তাহার মনকে ভালবাসা আজ যেমন করিয়া পীড়ন করিতেছে তাহা সে সন্তানবতী ঘরণী গৃহিণীকে বুঝাইতে পারিবে না, হয়ত হাস্যাস্পদ হইবে। তাহার অন্তরের কথা অব্যক্তই রহিয়া গেল। শুধু জানিলেন লেখক আর পাঠকবৃন্দ। এই একটি অতি ছোট ঘটনা অথচ ব্যক্তিবিশেষের মনের একটি অতি বড় ব্যথা লেখক সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন।

দরিদ্র কেরানী পরিমল জীবনে এক দিন বড়লোকের মত অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিলাসে গা ভাসাইয়া দিবে বহুদিনের এই স্বপ্ন তাহার মনে ছিল। তাই দৈনিক একটি করিয়া মুড়ির পয়সা বাঁচাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে সে দশটি টাকা জমাইয়াছিল। কিন্তু ট্যাক্সি চড়িয়া মিটারে প্রতিটি দোয়ানি বৃদ্ধি যখন আট দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণা লইয়া তাহার চোখের সামনে বীভৎস মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন সিনেমা দেখা ও হোটেলের ফাউল কাটলেট আস্বাদনের লোভে জলাঞ্জলি দিয়া সে বাকী কয়টি টাকায় স্ত্রীর ঔষধ ও ছেলেপিলের শীতের কাপড় লইয়া আপনার কুটীরে ফিরিল। কেরানীর বহুদিনের কাম্য এই এক দিনের উৎসবের এইরূপ করুণ পরিণতিটি লেখকের রচনানৈপুণ্যে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষক।

বিষ্ণুপুর—সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। "বিষ্ণুপুর বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ স্থান। বাঙ্গলা দেশে কেবলমাত্র বিষ্ণুপুর রাজ্য বহুকাল যাবৎ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। স্বাধীন রাজ্যের শাসনপ্রণালী, বিদ্যানুশীলন, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি যেরূপ উন্নত হওয়া সম্ভব বিষ্ণুপুরে তাহা হইয়াছিল।" ভূমিকাতে লেখক বিষ্ণুপুরের পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন। বইখানি সেই বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। "বর্ত্তমান কালে রাঢ়ের যে অংশ বাঁকুড়াজিলায় অবস্থিত, তাহাই অতীত যুগের স্বাধীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি বহন করিতেছে। এক সময় মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, এবং বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছোটনাগপুরের কিয়দংশ বিষ্ণুপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ আঠারটি মন্দিরের ছবি ইহাতে আছে। তাছাড়া মন্দিরের বিগ্রহ, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ স্থান, বিষ্ণুপুর রাজবংশের কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিষ্ণুপুরের কয়েক জন সঙ্গীতবিশারদের ছবিও আছে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পর বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধনাই পুস্তকটির প্রধান বক্তব্য বিষয়। "বিষ্ণুপুর রাজ্য সঙ্গীতালোচনার জন্য সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।" সঙ্গীতাচার্য্যদের জীবনী, তাঁহাদের রচিত গান ও তাহার স্বরলিপি ইহাতে আছে। আশা করি, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীতরসিক সুধীগণ বইখানির সমাদর করিবেন। ইহাতে কয়েকটি ভুল চোখে পড়িল, সবগুলির সংশোধন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটির বিষয় লিখিলাম।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার নাম ৺সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় নহে, তাঁহার নাম ৺শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শিশুর শিক্ষা—শামসুন নাহার লিখিত। আমাদের দেশে শিশুদের অক্ষর-পরিচয়ের পূর্ব্বে তাহাদের শিক্ষার বিষয় বড় কেউ চিন্তা করেন না। শিক্ষা মানে এদেশে লেখাপড়া করিতে শেখা। কিন্তু শিশুকে প্রকৃত মানুষ হইতে সাহায্য করাই যে প্রকৃত শিক্ষা এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এ কথা এখনও লোকে ভাবে না। সাধারণ মানুষ মনে করে ছেলেমেয়েরা আপনা আপনিই ভাল মন্দ হয়। তাহা যে একেবারেই মিথ্যা তা নয়। কারণ শিশুরা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট স্বভাব ও বুদ্ধির অনেক বিশেষত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। তা ছাড়া স্বাস্থ্যও মানুষকে ভালমন্দ বুদ্ধিমান কি বোকা করে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও শিশুচরিত্র গঠনের আর দুইটি সহায় আছে। প্রথম পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দ্বিতীয় শিক্ষা। সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব শিশুচরিত্রে জন্মের পর হইতেই কাজ করে। শিশুর স্বভাবের ভিত্তি প্রথম ছয় সাত বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং জন্ম হইতে ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে মানুষ করিবার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের সর্ব্বাপেক্ষা যত্নশীল হইতে হইবে। লেখিকা এই কথাগুলিই তাঁহার বইখানিতে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। এই ৮২ পৃষ্ঠার ছোট বইখানিতে ৮টি অধ্যায় আছে। ইহা সহজ বাংলায় লেখা। সুতরাং বাঙালী মায়েরা এটি পড়িয়া লাভবতী হইবেন এবং শিশুপালনে বিশেষ যত্নবতী হইবেন আশা করা যায়। তাহা হইলে লেখিকার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীশান্তা দেবী

রেযারেক্‌শন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইউ এন. ধর এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় সিকা।

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে অনুবাদের প্রয়োজন। মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত পরিচয়ে সাধারণের মন বিভিন্নমুখী চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে সক্রিয় ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। অনুবাদ ভাষার শরীরেও শক্তি সঞ্চার করে। ইংরেজীর মত শক্তিশালী সাহিত্যও অজস্র অনুবাদের দ্বারা পুষ্ট। বাংলায় কয়খানিই বা ভাল অনুবাদগ্রন্থ আছে! উনবিংশ শতাব্দীর রুশ-ঋষি অপূর্ব্ব মনীষী কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের প্রতিভাপ্রদীপ্ত উপন্যাসগুলি ভাষান্তরিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশের সকল সাহিত্যেই উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। "রেযারেক্‌শন" তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই পুস্তকের অনুবাদে লেখকের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। রেযারেক্‌শন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরুত্থান। আমাদের ভাষায় নবজন্ম বা নবজীবন বলা যাইতে পারে। বহু বর্ষ পরে দৈববশে দায়িত্বজ্ঞানহীন কৃতকর্ম্মের অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিণাম দর্শনে প্রিন্স ডিমিট্রি আইভানিচ নেখলিউডভের মনে একটা আকস্মিক বিপ্লব সংঘটিত হইল। অপূর্ব্ব ত্যাগ, অসীম ধৈর্য্য ও অমিশ্র অনুতাপের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নবজন্ম লাভ হইল এবং সেই ত্যাগ ও প্রেমের সঞ্জীবন স্পর্শে সমাজপ্রপীড়িতা কাটুসা মাসলোভার মূর্চ্ছিত নারী-জীবনে যে নবচেতনা ও জাগরণের সূচনা হইল—"রেযারেক্‌শন" তাহারই কাহিনী। বিবিধ ঘটনা, চরিত্র ও অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া এক বিরাট মানসিক পরিবর্ত্তনের আধুনিক এপিক কাহিনী "রেযারেক্‌শনে" সাবলীল ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। উপন্যাসের অনুবাদে কোথাও ক্লিষ্টতা নাই, ভাষা কোথাও পঙ্গু হইয়া পড়ে নাই। "রেযারেক্‌শনে"র ভাষান্তরীকরণে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দি ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

ডাইরেক্টরগণ

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য এম, এল, এ, ময়মনসিংহ।
খান বাহাদুর মহম্মদ আলী, এম, এল, এ
দি প্যালেস, বগুড়া।
শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী ষ্টেট,
ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, ডাইরেক্টর, দি ন্যাশনাল এজেন্সী কোং লিঃ
২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, জমিদার, নেহালিয়া, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, ষ্টক ব্রোকার ডাইরেক্টর, দি শীতলপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ, ৬৪নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য (একস্‌অফিসিও) মার্চ্চেণ্ট ও ইঞ্জিনীয়ার, ডাইরেক্টর, দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
এ, ৩ ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা।

প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭৲ টাকা ও অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে॥

প্রায় ১,০০,০০০ লক্ষ টাকারও অধিক গভর্ণমেণ্ট অর্ডার হাতে মজুত আছে॥

কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন:—

দি ম্যানেজিং এজেণ্টস্—ইণ্ডো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারস্

এ, ৩ ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—INTISH—কলিকাতা টেলিফোন—কলি: ১৮১৭।

শ্রীশ্রীলীলাভাগবত—প্রথম খণ্ড। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় (অকিঞ্চন) কর্তৃক পত্যছন্দে গ্রথিত ও সঙ্কলিত। শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম্-এ কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৪ নং বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

'শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ' অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা এই বিশাল কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সমগ্র গ্রন্থখানি আকারে '১২০০ পৃষ্ঠারও অধিক' হইবার কথা—সুতরাং ৩২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 'শৈশব, বাল্য ও কৈশোরলীলা সমন্বিত' এই প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির চতুর্থাংশ মাত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন এ জাতীয় একাধিক গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু সাধারণ পাঠকসমাজে—এমন কি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যেও—বর্তমানে তাহাদের যেরূপ আদর ও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আলোচ্য গ্রন্থকারের এই বিপুল পরিশ্রমের সফলতা সম্বন্ধে খুব বেশী আশান্বিত হওয়া যায় না। বৈষ্ণবোচিত বিনয়সহকারে গ্রন্থকার নিজেকে 'অকিঞ্চন দাস' নামে পরিচিত করিয়াছেন। আশা করি, পাঠকের আগ্রহ বা ঔদাসীন্য তাঁহাকে উৎফুল্ল বা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাঁহার এই ছদ্মনামের সার্থকতা বজায় রাখিবে।

প্রভু জগদ্বন্ধু—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি-লীলামৃত কার্য্যালয়, ২৯ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ সাধক জগদ্বন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ ও আবেগবহুল, তবে স্থানে স্থানে শিথিলবন্ধন ও সুসঙ্গতিহীন। জগদ্বন্ধুর সাধনা ও উপদেশ সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চাহেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। ভক্তমণ্ডলী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখ পাইবেন। তবে অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকের নিকট ইহার সমাদর লাভের সম্ভাবনা কম। দুঃখের বিষয়, সর্বলোকপ্রিয় সর্বজীবে সমদর্শী সাধকগণের পবিত্র জীবন লইয়া যখন কোন ভক্ত আলোচনা করেন, সাহিত্য ও সাধারণ পাঠকের কথা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট কথঞ্চিৎ উপেক্ষিত হয় বলিয়া আশঙ্কা হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রতিভা—শ্রীসূর্য্যকুমার দে। আকিয়াব হলি ক্রস ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। আকিয়াব, বর্ম্মা। ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥/০ আনা মাত্র।

অধুনা মানুষ যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব ইত্যাদি যাহা কিছু সে জানিয়াছে, তাহা সমস্তই আর্য্য মনীষীদের অধিকারে ছিল; শুধু একটা দৈব অভিশাপের ফলে আমরা বর্ত্তমান আর্য্যেরা সেই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; একথা অনেকেই বলেন এবং বিশ্বাসও করেন। ইঁহাদের মতে, ইউরোপ বর্ত্তমানে যে নিত্য নূতন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিতেছে, সেটা আর্য্যদেরই সেই প্রাচীন, অধুনালুপ্ত জ্ঞানের পুনরাবির্ভাব মাত্র। আমরা যদিও বর্ত্তমানে একটি সূচও তৈয়ার করিতে পারি না, তথাপি অতীতে এই দেশেই ব্যোমযানও তৈয়ার হইত। প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকারও এই তত্ত্বই আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।

ভূমিকায় দেখি, একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া লেখক বইখানা সুসম্পন্ন করিয়াছেন! কিন্তু তিনি উপনিষদের 'দেবযান'কে ব্যোমযান মনে করিয়া (১৫ পৃঃ) যে উৎকট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। 'দেবযান' যদি ব্যোমযান হয়, তবে 'পিতৃযান' কি 'গোযান'?

শাস্ত্র মন্থন করিবার আগে তার পরিধি জানিয়া লওয়া ভাল; আর নিজেদের গৌরব অগৌরবের কথাটাকেই বড় না করিয়া একমাত্র সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইতিহাস-চর্চ্চা করা উচিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাহিষ্য জাতির প্রাচীন গৌরবকাহিনী—শ্রীবিহারীলাল কাল্যে। প্রকাশক—গ্রন্থকার, দেউলপুর, গঙ্গাধরপুর পোঃ, হাওড়া। মূল্য ।৵০।

গ্রন্থকার হালিক-কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মাহিষ্যগণের প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাহিষ্যগণ পূর্ব্বকালে বহু দেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, বঙ্গের পালবংশ এবং উড়িষ্যার গঙ্গাবংশও মাহিষ্যজাতীয় ছিলেন, ইহাই তাঁহার অনুমান।

গ্রন্থকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন, কিন্তু তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মাহিষ্য জাতির প্রাচীন গৌরবের সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—দাশনগর, (বেঙ্গল)

অনুমোদিত মূলধন	...	১০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	... ...	১৪,০০,০০০৲ উর্দ্ধে
আদায়ী	... ...	৭,০০,০০০৲ উর্দ্ধে
ডিপোজিট্	... ...	১২,৫০,০০০৲ উর্দ্ধে।

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ঃ—
গভর্ণমেণ্ট পেপার ও
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১,০০,০০০৲ উর্দ্ধে

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি

সুদের হার ঃ—কারেণ্ট···১½%
সেভিংস···২%
ফিক্সড্ ডিপোজিটের হার আবেদনসাপেক্ষ।

শাখাসমূহ ঃ—ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, নিউ মার্কেট, শ্যামবাজার, সিলেট, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, সিলিগুড়ি, জামসেদপুর, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সমস্তিপুর।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়।

কাশী কাহিনী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত। নবভাব লাইব্রেরী, ১ নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানিতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসীধামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও আধুনিক অবস্থার বিবরণ আছে। কাশীদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণের বিশেষ কাজে লাগিবে। পুস্তকখানি সুলিখিত। ভূমিকাটি পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

১। গল্প দাদু ২। জেনে রাখা দরকার—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য যথাক্রমে।০ ও ৵০।

দু-খানি বইই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। প্রথমখানিতে কয়েকটি ছোট ছোট সচিত্র সাধারণ গল্প ও দ্বিতীয়খানিতে দেশ-বিদেশের কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতার নাগরিক—শ্রীহরিদাস মজুমদার। প্রকাশক—অমৃত পাব্লিসিং হাউস, ৬, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। ৬৪ পৃষ্ঠা।

কলিকাতার পৌরজন ও তৎসংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনা। ইহাতে নাগরিকগণের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রচার-পুস্তিকা হিসাবে উত্তম।

সরল হিসাব প্রণালী—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বুক কোম্পানী লিঃ, ৪।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৬৩ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

বুককিপিং এবং হিসাব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে হরিদাস বাবু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার ইংরেজী হিসাব-বিজ্ঞানের পুস্তকও ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজে বহুদিন হইতে আদৃত হইতেছে। বর্ত্তমান পুস্তক বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত হিসাব বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক। দ্বিগুণাত্মক হিসাবনীতি (Theory of Double Entry) হইতেছে বিদেশী হিসাব রক্ষা প্রণালীর বিশেষত্ব এবং এই প্রণালীর বিশেষ বর্ণনা ও প্রয়োগ পদ্ধতির সুনিপুণ নির্দ্দেশেই এই পুস্তকের সার্থকতা। প্রাথমিক রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ্ক, হুণ্ডী, লাভ-লোকসান, অংশীদারী কারবার, যৌথ কারবার প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞাতব্য সকল বিষয় সুন্দর ভাবে লেখা হইয়াছে। যাঁহারা বাংলা হরফে ইংরেজী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব রাখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক কাজে লাগিবে এবং হিসাব-বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। হরিদাসবাবুর ইংরেজী পুস্তকের মত এই পুস্তক ছাত্র মহলে বিশেষ আদৃত হইবে আশা করা যায়। ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দগুলি সুন্দর হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ লেখকগণের এই পথে পুস্তক প্রণয়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বংশ গৌরব (কায়স্থ-তত্ত্ব ও পটলডাঙ্গা বসু-বংশের ইতিহাস)—শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক প্রণীত। ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

পুস্তকখানির নামেই ইহার পরিচয়। উল্লিখিত বংশে রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইতিহাস, তথা কায়স্থ জাতির ইতিহাসও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শ্রীঘৃত
স ম্ব ন্ধে
আচার্য্য ডাক্তার স্যার পি, সি, রায়ের অভিমত

"মেসার্স অশোকচন্দ্র রক্ষিতের আমন্ত্রণে আমি তাঁহাদের ঘৃতের গদি, গুদাম ও অফিস দেখিয়াছি। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইঁহারা বাজারে বিক্রয় করিতে দিবার পূর্ব্বেই সকল রকম ঘৃতের নমুনা বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষা করাইয়া থাকেন।

"ইঁহারা সংযুক্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ঘৃতের মোকামে নিজেরা যাইয়া থাকেন এবং নিজ ঘৃতের বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট যত্ন লন; এবং এজন্য সেখানেই তাঁহারা নিজ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের "শ্রী" মার্কার টিন যে বিশুদ্ধতার নিদর্শন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানটি যেরূপ যোগ্যতার জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইয়াছে, আমি আশা করি তাঁহারা তাহা বজায় রাখিতে সক্ষম হইবেন। আমি ইঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়"

কষ্টিপাথর

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি আবিষ্কার—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

'রূপ ও রীতি'র পরিচালক শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ আমাকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন; এ অনুরোধের অর্থ কি ঠিক জানি নে। তবে একদিন তাঁর চরিত্রের একটি পরিচয় পাই, যা আমাকে বিস্মিত করে এবং যার দরুন মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে যায়। ঘটনাটি যুগপৎ এত সামান্য ও অসামান্য যে, তার পরিচয় দিলে অপরের মনেও তাঁর প্রতি ভক্তি বেড়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীস্বরূপে আমার পাবনায় সাহিত্য সম্মিলনে যাবার কথা ছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহে, আর আমি ছিলুম কলকাতায়। তাই বন্দোবস্ত ছিল যে আমি শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বজরায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে পাবনায় যাব। পাবনা শিলাইদহ থেকে বেশী দূর নয়। একটু উজিয়ে গিয়ে পদ্মা পাড়ি দিলেই পাবনা শহরে উপস্থিত হওয়া যায়।

আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমার দুটি অনুচর সমভিব্যাহারে শেয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। আমার একটি অনুচরের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কারণ এ দুটিকে আমি ছাড়া অপর কেউ হজম করতে পারতেন না। আমার আত্মীয় মহেন্দ্র রায় ছিলেন বে-পরোয়া লোক। কথা বলতেন চোখা চোখা, আর অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। এ পরিশ্রমশক্তির কারণ পরে আবিষ্কার করি। মহেন্দ্র গাঁজা খেত আর গাঁজায় দম দিয়ে সে বিনা আপত্তিতে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট হেঁটে চলে যেত। আর হেদাৎ নামক মুসলমান ছোকরাটি বাল্যকাল থেকেই আমার বাড়ী থাকত। বড় হয়ে মধ্যে মধ্যে বছর কয়েকের জন্য অন্তর্ধান হ'ত। জাহাজে চলে যেত বাবুর্চি হিসেবে আবার ফিরে এসে আমার গাড়ীতেই আস্তানা গাড়ত, আমার অনুমতি না নিয়ে। তার প্রধান গুণ ছিল যে রাঁধত চমৎকার,—দেশী বিলেতী দু-রকমই। আর এরা উভয়েই আমার বিশেষ অনুগত ছিল।

শেয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখি ঠাকুরবাবুদের আমলা গোপাল চাটুয্যে আর জামাই মণিলাল গাঙ্গুলী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মণিলাল আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে এক কামরায় কুষ্টিয়া যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বললেন যে, শিলাইদহের

সৌখিন বিলাস প্রসাধনের বিশিষ্ট কয়েকটি উপকরণ—

ক্যালকেমিকোর

তুহিনা

বিউটি মিল্ক

মুখে ও অঙ্গে মাখবার জন্য সদ্যস্ফুট গোলাপের মধুর সৌরভে ভরা এই স্নিগ্ধশুভ্র রূপোজ্জ্বলকর সৌন্দর্য্য প্রলেপ তনুশ্রী কমনীয় করে, সুকুমার অঙ্গে ললিত লাবণ্যের পেলব সুষমা এনে দেয়, দেহে লালিত্যের সঞ্চার করে। "তুহিনা" প্রলেপের পর ক্যালকেমিকোর **রেণুকা** পাউডার মাখ্‌লে এই রূপরেণু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক মনে হয়।

ক্যালকেমিকোর

ল্যাভেণ্ডার

আপনার কেশ বেশ অঙ্গ উপাধান শয্যা আবাস-মন্দির সুবাসে ভরে দেবে।

অডিকলন

মাথা ঠাণ্ডা করে, যন্ত্রণার লাঘব হয়, ইহার সুগন্ধ প্রীতিকর। এই দুইটি অতুলনীয় সুগন্ধ সার উৎকৃষ্ট বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট নয়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

কুঠীবাড়ীতে একজনের ওলাউঠো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে খবরটা আমাকে দিতে বলেছেন। খবরটা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল। কারণ ওলাউঠা ও বসন্ত, এ দুটি রোগকে আমি ভারি ডরাই।

মণিলাল আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু মনে সোয়াস্তি ছিল না বলে সে-সব প্রশ্নের উত্তরে যা মনে এল তাই বল্লুম। একটি প্রশ্ন আমার আজও মনে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কবির মনে কি প্রথমে ছন্দ আসে, তার পরে কথা সেই ছন্দে ফেলা হয়? না আগে কথা আসে, পরে সে কথাকে ছন্দোবদ্ধ করা হয়?—আমি উত্তর করলুম, এ দুই হয়, আর যথার্থ কবির অন্তরে কথা ও ছন্দ একসঙ্গেই আসে।

আমি তখন কথায় বার্ত্তায় মহেন্দ্রের মতই বেপরোয়া হয়েছিলুম। নইলে কি এক রকম সাহিত্যকে খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করি? যথা, খেজুর গাছ দেখতে বেজায় শুকনো ও কর্কশ, কিন্তু অন্তরে রসপূর্ণ।

সে যাই হোক, শেষটা কুষ্টিয়ায় নেমে খেয়ানৌকায় গড়াই পার হয়ে, পাল্কিতে শিলাইদহে গিয়ে হাজির হলুম। কুঠীবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি আমাকে দেখে বললেন যে, আমার টেলিগ্রামে এখানকার খবর পাও নি?

আমি বললাম—পেয়েছিলুম, মাঝপথে। তিনি বললেন, যে লোকটির কলেরা হয়েছিল, সে আজ সকালে মারা গেছে। পথচলতি একটি হিন্দুস্থানীর কলেরা হয়ে রাস্তায় পড়েছিল। আমি খবর পেয়ে তাকে রাস্তা থেকে তুলিয়ে এনে এই কুঠীবাড়ীতে রেখেছিলুম। দু-দিন ধরে তার সেবাযত্ন করেছি ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছি, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলুম না।

আমি ভয়ে ভয়ে সেখানে মধ্যাহ্নে ভোজন করলুম। তার পর তিনি বললেন যে—প্রমথ, তোমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না। আজ বিকেলেই আমরা বজরায় গিয়ে উঠব, এবং কোন বালির চরের পাশে বজরা লাগাব। আমি অবশ্য ভয় পাই নে; কিন্তু তুমি ভয় না পাও, কলকাতায় তোমার স্ত্রী ভয় পাবে।

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এবং রবীন্দ্রনাথকে বললুম যে, আমার দুটি অনুচর আছে, অনুমতি করেন ত তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব। একজন রাঁধে ভাল, আর একজন খুব করিৎকর্ম্মা লোক। এ কথা শুনে তিনি খুশী হলেন আর আমার অনুচরদ্বয়ের সঙ্গে আমরা কুঠীবাড়ী ছেড়ে বোটে গেলুম এবং তিন রাত বোটেই রইলুম।

এই সময় আমি আবিষ্কার করি যে, তিনি মনে মনে মৃত্যুঞ্জয়, যা আমরা নই।

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাকতেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে। এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাড্‌কোভাইন" সেবন করা, কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা ক'রে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাডকোভা[ইন]
মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে

লিষ্টার এন্টিসেপ্টিক্স :: কাশীপুর, কলিকাতা

দেশ-বিদেশের কথা

বাঙ্গলার বাহিরে শিক্ষা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দান

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান" শীর্ষক তথ্যবহুল প্রবন্ধের এক স্থানে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বহু টাকা দানের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ বাঙ্গলার বাহিরে অন্য কোন্ কোন্ শিক্ষা বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কোন্ কোন্ বাঙ্গালী কি ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, 'প্রবাসী'র মারফত তাহা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজা স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বাঙ্গলার বাহিরের বিভিন্ন শিক্ষা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যে অর্থসাহায্য করিয়া গিয়াছেন, এখানে আমরা তাহারই একটি অসম্পূর্ণ বিবরণ দিতেছি। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে তিন কোটিরও অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নামযশের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এত গোপনে দান করিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা সে দানে উপকৃত হইয়াছেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাহা প্রকাশ না করিলে আজ তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দূরে থাকুক আংশিক বিবরণও সংগ্রহ করা দুষ্কর। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই মহাপুরুষের দানে উপকৃত হইয়াছেন, বা যাঁহারা তাঁহার এই দানের সঠিক সংবাদ জানেন, তাঁহারা যদি তাহা প্রকাশ করেন, বা "প্রবাসী"-সম্পাদকের ঠিকানায় তাহা আমাদিগকে জানান, তাহা হইলে আরও বিস্তৃততর তালিকা সঙ্কলন ও প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সঙ্কলনের চেষ্টা করিতেছি, আশা করি এ সম্বন্ধে যিনি যাহা সঠিক জানেন, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া আমাদের এই কাজে সহায়তা করিবেন।

১। বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়...প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির (Ancient Indian Culture) অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য ৩,০০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ—১৩২৩ সাল।

২। রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়...১,৪২,৪১৮৲ টাকা। সাধারণ শিক্ষার সহিত যাহাতে ছাত্রদের ধর্ম্মশিক্ষা এবং চরিত্রগঠনও হয় তদুদ্দেশ্যে রাঁচীতে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। ১৩২৪ সাল হইতে ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত কাগজপত্রে দেখা যায় যে, তিনি এই কয় বৎসরে উক্ত বিদ্যালয়কে ১,৪২,৪১৮৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে তাঁহার দানের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইবে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

৩। রাঁচী মডেল কলেজ ফাণ্ড...২০০০৲ টাকা—১৩১২ সাল।

৪। এ্যানি বেসান্তের বেনারস হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ...১০০০৲ টাকা। ১৩০৮ সাল। এই কলেজ পরে বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

৫। দিহিকা ব্রহ্মচর্য্যালয়...৭৬৫৬৲—১৩২৩ ও ১৩২৪ সাল।

৬। হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রম ১০০০৲—১৩২২ সাল।

৭। ইন্দ্রপ্রস্থ গার্লস্ স্কুল ৫০০৲—১৩২১ সাল।

৮। ভাগলপুর মোক্ষদা গার্লস্ স্কুল ৫০০৲—১৩২৮ সাল।

৯। রাঁচী অন্ধ বালিকা-বিদ্যালয় ১০০৲—১৩১৬ সাল।

১০। বেনারস জগদ্বন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন ২২৫৲—১৩১৭ ও ১৩২০ সাল।

১১। মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট এইচ, ডি স্কুল ১৮২৲—১৩২১ সাল।

১২। লক্ষ্ণৌ হরিমতি গার্লস্ স্কুল ১০০৲—১৩২২ সাল।

১৩। পুরী কর্ম্মকুণ্ড বিদ্যালয় ১০০৲—১৩২৪ সাল।

১৪। কানপুর গার্লস্ স্কুল ১০০৲—১৩২৫ ও ১৩৩৫ সাল।

১৫। বেনারস ছাত্র-হিতসাধিনী ১৩১৬ সাল হইতে ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত বার্ষিক সাহায্য মোট ৪৩৪১৲ টাকা।

১৬। কাশী ছাত্রাবাস টোল ৩৪০৲—১৩৩৩, ১৩৩৪ ও ১৩৩৬ সাল

১৭। ঝাঁজা স্কুল বিল্ডিং ফাণ্ডে সাহায্য ২৯০৲—১৩১৮ সাল।

১৮। বৃন্দাবন দর্শন বিদ্যালয় বিভিন্ন বৎসরে ৩৫০৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত ভাগলপুর হাই স্কুল, গয়া মহাকালী পাঠশালা, দিল্লী বেঙ্গলী বয়েজ হাই স্কুল, বেনারস আর্য্য মহিলা বিদ্যালয়, মধুপুর এড্‌ওয়ার্ডস্ জর্জ্জ স্কুলও তাঁহার অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও তিনি কয়েকটি কলেজে কৃতী ছাত্রদের মেডেল দিবার জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নে দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। দিল্লী সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজে মেডেলের জন্য তিনি বৎসরে ৫০৲ হইতে ৬৫৲ হিসাবে ১৩২৩ সাল হইতে ১৩৩৫ সাল পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

২। পাটনা কলেজে মেডেলের জন্য দিয়াছেন ৬০৲ ১৩২৬ সাল।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও তিনি বহু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকটির নাম উল্লেখ করিলাম।

১। বৃন্দাবন ড্রেনেজ ইম্‌প্রুভমেণ্ট বাবদ ১০০০৲ ১৩২০ সাল।

২। বাঁকীপুর টাউন হল নির্ম্মাণ ৫০০৲ ১৩১৭ সাল।

৩। এলাহাবাদ এক্‌জিবিশন ১০০০৲ ১৩১৭ সাল।

৪। মুঙ্গের টাউন হল নির্ম্মাণ ১০০৲ ১৩০৬ সাল।

৫। বেনারস চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্সারী ১০০৲ ১৩০৭ সাল।

৬। কামাখ্যা তীর্থনিবাস ১০০৲ ১৩১০ সাল।

৭। নাসিক অনাথ আশ্রম ১০০৲ ১৩১৭ সাল।

৮। কটক সেণ্ট্রাল হস্‌পিটাল ১০০৲ ১৩১৮ সাল।

৯। সুপল (ভাগলপুর) হস্‌পিটাল ১০০৲ ১৩১৮ সাল।

১০। লাহোর লাইব্রেরি ১০০৲ ১৩২১ সাল।

১১। ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বিভিন্ন বৎসরে ১,৪০০৲ টাকা।

১২। সিমলা কালীমন্দির ১০০৲ ১৩২৩ সাল।

ইহা ছাড়া বৃন্দাবন জিম্‌নাসিয়াম, কামাখ্যা মন্দির, বেনারস মাতৃ-মন্দির, বেনারস লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, নবদ্বীপ নিত্যানন্দ মন্দির, সিমলা সনাতন ধর্ম্ম মন্দির, বেনারস রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ছোটনাগপুর গোরক্ষিণী সভা, রাঁচী মেণ্টাল হস্‌পিটাল প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিকট হইতে এককালীন অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছে।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে

শরৎ-কাল

আনন্দ ও উৎসবের কাল। এই সময়ে সদ্য-বর্ষা-স্নাতা, পত্র-পুষ্পালংকারা ধরিত্রীর সুনীল আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড, মাঠে মাঠে কাঞ্চনবর্ণা ধান্যমঞ্জরী ও শঙ্খধবল কাশগুচ্ছ, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শেফালির আলিম্পন, হ্রদে ও তড়াগে কুমুদ কহ্লার, শাখে শাখে শুক সারী. নীলকণ্ঠ প্রভৃতি প্রকৃতির বৈতালিকের কলগুঞ্জন এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুর ঝংকৃত করে। সেই আনন্দ ঝংকার আমাদের জাতীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিভাত হয়। জাতি শক্তিপূজায় মাতিয়া উঠে, সমাজ অতীত ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করিয়া পরস্পরের সহিত সখ্য-বন্ধনে উন্মুখ হয়, গৃহস্থ শোক দুঃখ অভাব ও অভিযোগ ভুলিয়া বৎসরান্তে প্রবাস-প্রত্যাগত আত্মীয়কে আলিঙ্গনে পাইবার জন্য, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে সাধ্যমত বিবিধ উপহার দানে তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য উদগ্রীব হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লি
কলিকাতা :: বোম্বাই

এই সর্বজনীন আনন্দের দিনে ব্যবহার ও উপহারের জন্য আমাদের স্নিগ্ধ, সুরভিসংহত চিত্ত-বিমোহী প্রসাধনদ্রব্যগুলি বিশেষ প্রশস্ত। সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্দোষ উপাদানে, বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বলিয়া ইহাঁদের যে কোনওটি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। 'অগুরু', 'কস্তুরী', 'ইরা', 'গৌরী', 'স্বাতি', 'রেবা', 'উৎপল', 'সিপ্রা', প্রভৃতি গন্ধসার স্থায়িত্বে ও গন্ধ-মাধুর্যে অপরাজেয়। প্রত্যেকটির উপাদান সুনির্বাচিত উপকরণ হইতে আহৃত।

•

স্নানে ও প্রসাধনে গন্ধ তৈলের ব্যবহার বহু যুগ হইতে প্রচলিত। ইহা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই রূপচর্চার পরম সহায়। আমাদের ক্যান্থারাইডিন, ক্যাস্টর অয়েল, গোল্ডেন আমলা, 'লোটাস' নারিকেল তৈল প্রভৃতি গন্ধাধি-বাসিত তৈলাবলীর উপাদান বিশুদ্ধ,

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই
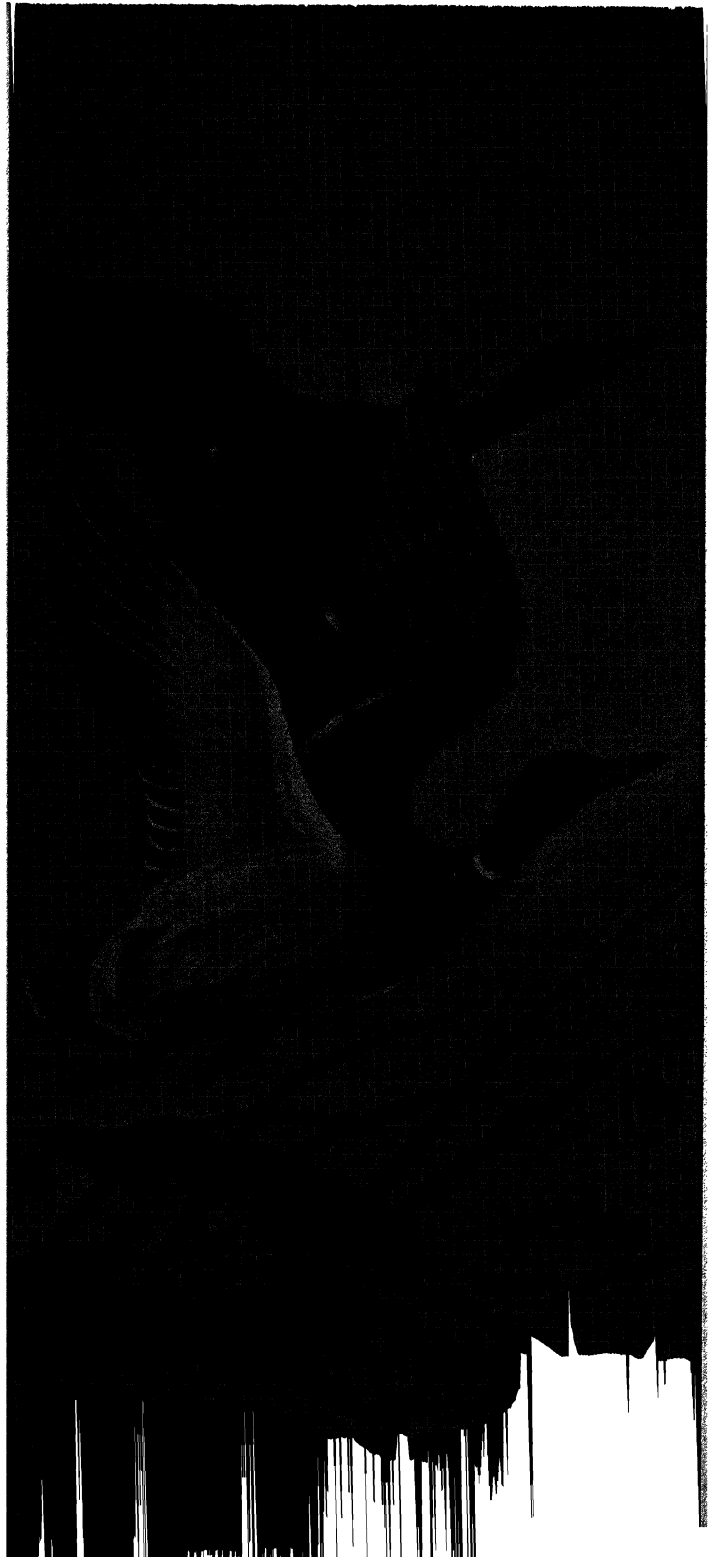
গন্ধবস্তু নিরাপদ এবং গন্ধমাত্রা পরিমিত অথচ মনোরম। ইহাদের সুদূর প্রসারী, স্থায়ী ও মধুর স্নিগ্ধ গন্ধ সকলকেই মুগ্ধ করে। গুণানুসারে ইহাদের ব্যবহারে আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি অনিবার্য।

গন্ধফেন বা সুগন্ধি সাবান আধুনিককালের প্রসাধন উপকরণের অন্যতম। ইহা কেবলমাত্র রূপ-সজ্জারই সহায় নহে, স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল। চর্মের ও বর্ণের পক্ষে ইহার নিত্য ব্যবহার পরম হিতকর। আমাদের 'গ্লিসারিন', 'সিপ্রা', 'গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড', 'যমুনা', 'ফ্রাগরাণ্ট পাইনটার' প্রভৃতি সকল সাবানই সুনির্বাচিত উপাদানে, আধুনিক প্রথায় প্রস্তুত। ইহাদের কোনওটিতেই চর্মের হানিকর কোনও পদার্থ নাই। শিশুর কোমল অঙ্গেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার্য। গন্ধমাধুর্যে ইহাদের প্রত্যেকটিই মনোরম ও অনন্য-সাধারণ।
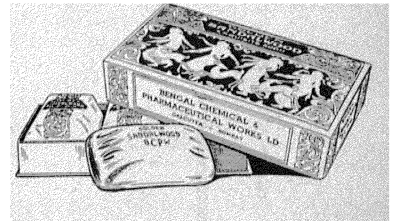
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

নারীর ন্যায় পুরুষেরও রূপচর্চা অবশ্য কর্তব্য। সুবেশ সুদর্শন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুরুষের আকর্ষণী শক্তি কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অপ্রতিহত। আমাদের 'রাকা' ও 'লাইমজুস গ্লিসারিন' পুরুষের রূপসাধনার পরম সহায়। 'রাকা' কামাইবার প্রকৃষ্ট সাবান। ইহার ফেনপ্রাচুর্য ও মৃদু মধুর সুরভি ক্ষৌরকার্যকে কষ্টসাধ্য নিত্য কর্মের পরিবর্তে পরম প্রীতিপ্রদ ও ঈপ্সিত করিয়া তোলে। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে কর্কশ মুখচর্ম অচিরে মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। অবাধ্য ও রুক্ষ কেশরাশিকে সংযত, উজ্জ্বল, মসৃণ ও পরিপাটি করিতে আমাদের 'লাইমজুস গ্লিসারিন' অপরিহার্য উপকরণ।

LIME JUICE AND GLYCERINE
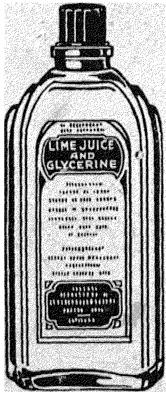
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই
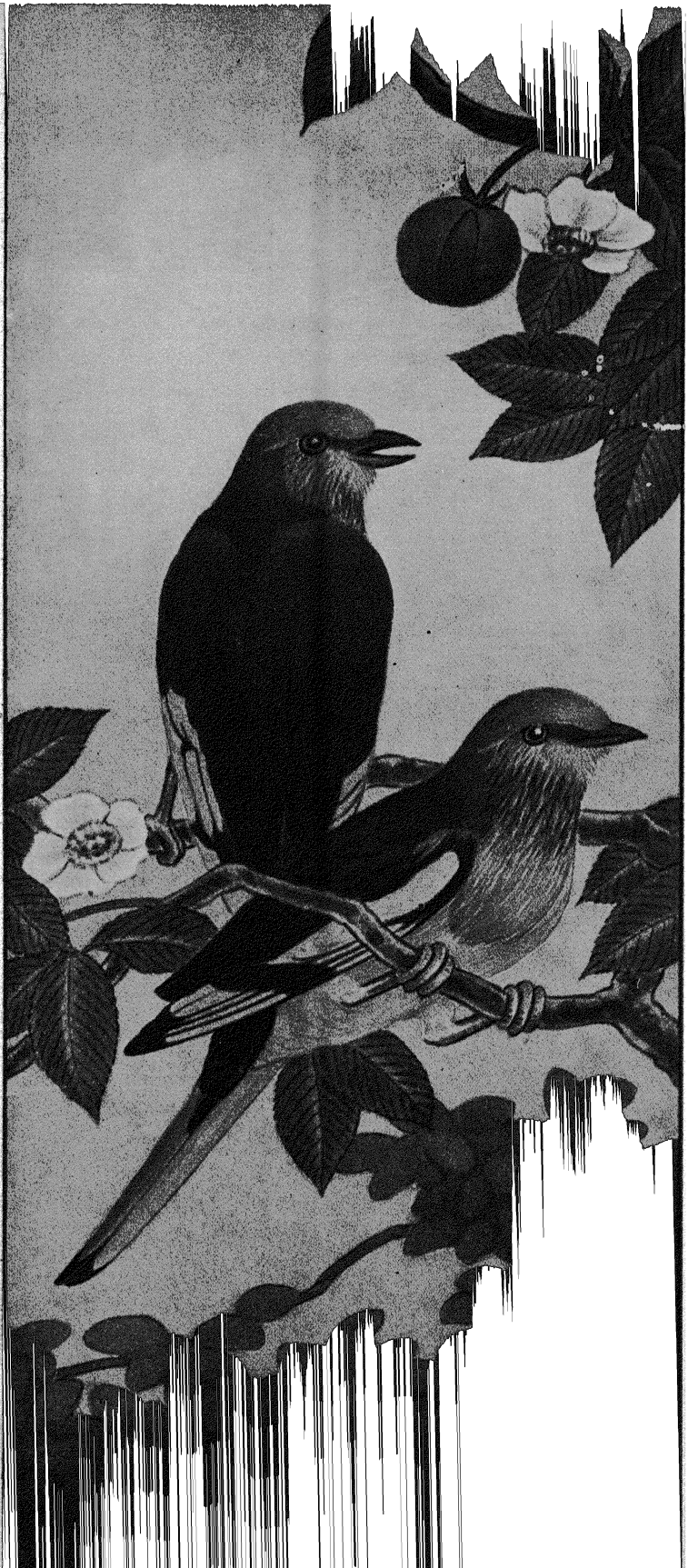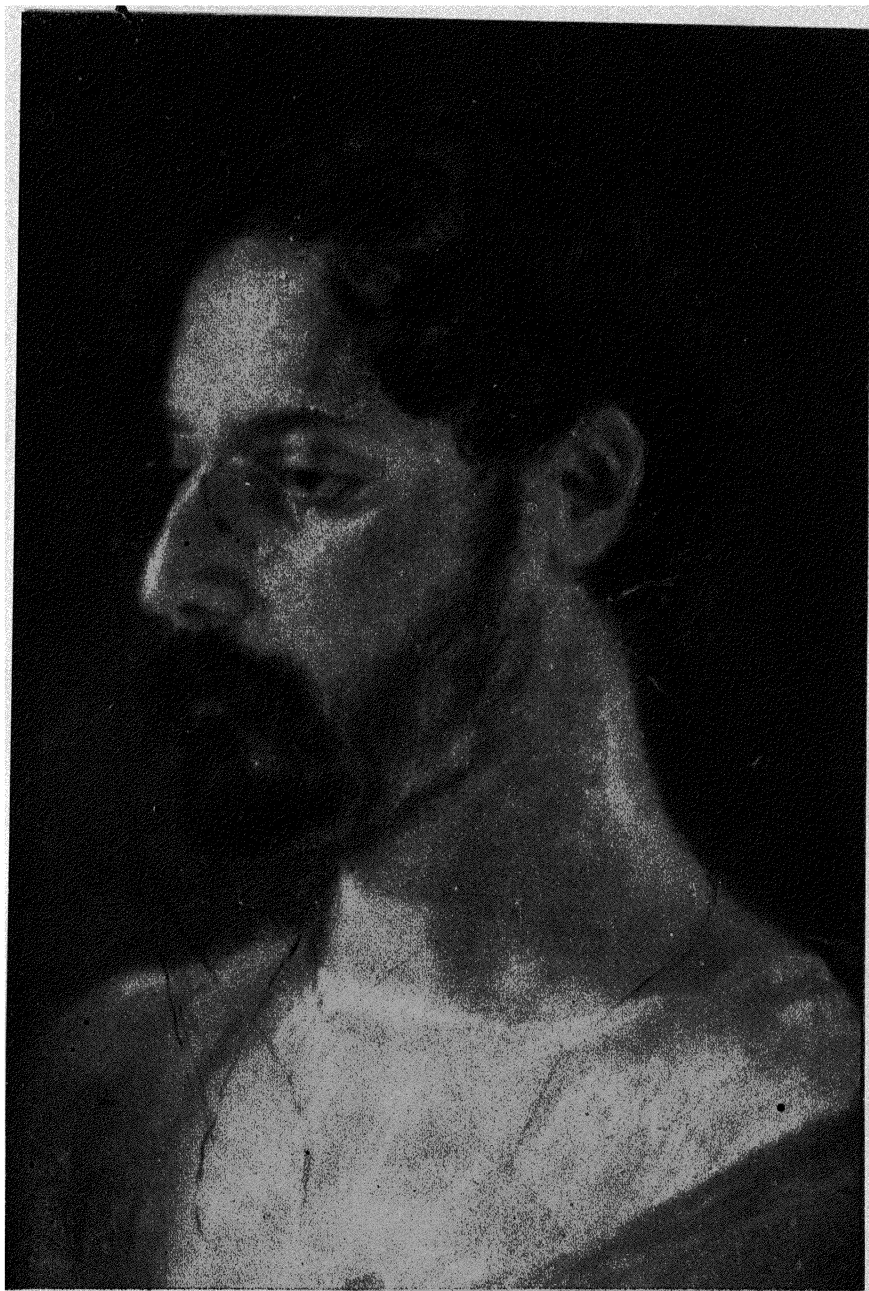
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর.
(৩২ বৎসর বয়সে)
ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

স্যার জগদীশ বসু সংগৃহীত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
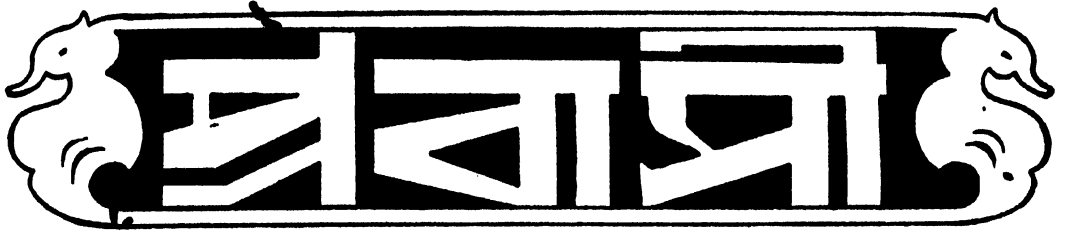
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিন্দু ও সিন্ধু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

৭ই পৌষ, ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন

[কবিতাটি শ্রীযুত সত্যজিৎ রায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

[ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত]

১৩০৮ সালে লিখিত চিঠিগুলিতে প্রায়ই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে মহারাজকুমারই তথায় প্রথম ছাত্ররূপে প্রবেশ লাভ করবেন—কথা ছিল। গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁকে কুমিল্লায় যেতে হয়, সেখানে সাহেবদের ক্লাবে যোগদান করায় এই চিঠির অবতারণা।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

আমার শরীর ভাল নাই। কুমিল্লায় তোমাকে ক্লাবে প্রবেশ করান হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ইহা যে তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই বিজাতীয় বর্ব্বরগুলার অশিষ্ট ঔদ্ধত্য এবং কদর্য্য আচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ তাহারা আমাদিগকে চায় না আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরা তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াই ইহা আমাদের পক্ষে অবমানকর। আমাদের সমস্ত জাতিকে যাহারা ঘৃণা করে আমাকে তাহারা সম্মান করিবে কি করিয়া, এবং করিলেই বা তাহা আমি গ্রহণ করিব কেন? অপমানিত জাতির পক্ষে এই সাহেবের সোহাগ লইবার চেষ্টা—এমন লজ্জাকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা হউক তুমি সহ্য করিয়া থাক—এবং মনে মনে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর—এরূপ হইলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তুমি নিজের তেজ রক্ষা করিতে পারিবে। যাহা শিখিবার তাহা শিক্ষা কর, যাহা দেখিবার তাহা চুপ করিয়া দেখ এবং যাহা মনে রাখিবার তাহা চিরদিন মনে পোষণ করিয়া রাখ। ঈশ্বর তোমাকে বিজাতির মোহ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

যোড়াসাঁকো
কলিকাতা

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার অধ্যয়নের সুব্যবস্থা জন্য আমার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। শুনিলাম সম্প্রতি ত্রিপুরায় একটা গোলযোগ বাধিয়াছে—সেই জন্য আমি এ সময়ে মহারাজের কাছে কোন প্রস্তাব করিলাম না। যতীকে* বলিয়া দিবে সেখানকার বিপ্লব শান্তি হইলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়। মহারাজ যদি বা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তথাপি পারিষদবর্গ যদি সম্মান ও ব্যয়বাহুল্যের দোহাই দিয়া আপত্তি প্রকাশ করে তবে কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। এরূপ অবস্থায় কোন প্রকার সদভিপ্রায় সাধন প্রায় অসাধ্য বলিয়া আমার মনে এক এক সময় নৈরাশ্য উপস্থিত হয়—এবং ঐশ্বর্য্যশালীদের দ্বার হইতে বহু দূরে থাকিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা বোধ করি। লক্ষ্মীমান

* যতীন্দ্রনাথ বসু এক সময়ে প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন।

পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাদিগকে পৃথিবীর শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। ইতি ১৮ই শ্রাবণ ১৩০৮

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কাল শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি—কলিকাতা হইতে সর্দ্দিকাশি সঙ্গে আনিয়াছি—এখানে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না আশা করিতেছি। মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি—তোমার এখানে আসিতে কোন বাধা হইবে না বলিয়াই ভরসা করি। রথী তোমার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। আসিবার সময় তোমার যন্ত্রাদি অর্থাৎ carpentry, fretwork প্রভৃতির হাতিয়ার সঙ্গে আনিয়ো। বাইসিকল্ ও ঘরে পড়িবার বই প্রভৃতিও আনিতে পার। আমরা এক জন সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেছি তিনি সর্ব্বপ্রকার হাতের কাজে সুনিপুণ—তিনি ফোটোগ্রাফি প্রভৃতিও ভাল জানেন। তুমি আসিলেই* আমি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ মাস উত্তীর্ণ হইতে দিয়ো না। আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ। ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো য়ুরোপীয় বর্ব্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ো। তোমার শিক্ষক যদি ভারতবর্ষকে নিন্দা করে তুমি সে নিন্দাকে নিরুত্তরে অবজ্ঞা করিয়ো। আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়ত না আসাই ভাল। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে সহস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না

---

* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্ররূপে মহারাজকুমারের যাওয়ার কথা ছিল।

হোক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আস্‌বাব আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। তুমি মুখে কোন বাদ প্রতিবাদ করিয়া অনর্থক সংঘর্ষে বল নষ্ট করিয়ো না—স্তব্ধমৌন ভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর। তোমার বর্ত্তমান শিক্ষা ও সঙ্গ এই ভাবের প্রতিকূল বলিয়াই এই বিরোধের সংঘাতে তোমার দৃঢ়তা আরো দ্বিগুণতর হইবে। এই বিরোধই তোমার শিক্ষার কারণ হইবে। আমি জানি তোমার অন্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের সহজ মাহাত্ম্য আপনি বিরাজ করিতেছে—সে তোমাকে এত কাল অনেক বিপৎ হইতে রক্ষা করিয়াছে—এখনো সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান ও নির্ব্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে—সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্দ্ধিত হইয়া এই দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক। ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক, ঈশ্বরের অভয় হস্ত তোমাকে রক্ষা করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক! বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।" মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া আমাকে সুখী করিবে। আগামী নববর্ষে তুমি নবতেজে নববলে ভারত-সন্তান হইবার ব্রত গ্রহণ কর—সেই ব্রতকে প্রাণের চেয়ে বড় করিয়া মরণান্তকাল পালন করিয়ো। ইতি ২৪শে চৈত্র ১৩০৮

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ—এই পত্রে অভিব্যক্ত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না। কোন শিক্ষায় কোন সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়। বিদেশীর উপদেশে যদি আমরা নিজেদের হীন বলিয়া মনে করি তবেই আমাদের যথার্থ পরাভব। ইংরাজের শিক্ষায় ক্রমাগতই আমাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্ভ্রম চলিয়া গিয়া আমাদের মন য়ুরোপের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য বেশভূষা আহার বিহার গৃহসজ্জা বিলাস উপকরণে আমরা কেবলই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম্ম অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত। এমন পবিত্র উন্নত ব্রত আর কিছুই হইতে পারে না, ভয় ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, দুঃখকে বরণ করিয়া, দৈন্যকে উপেক্ষা

করিয়া, আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শকে পুনরায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সেই ভার গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সমস্ত তেজকে হোমাগ্নির ন্যায় হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে। মহাভারতের ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। সেই আদর্শটি গ্রহণ করিয়ো। মূল মহাভারতে কালে কালে অনেক বাজে জিনিস প্রক্ষিপ্ত হইয়া এই মহাকাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সমস্ত বাদ দিয়া ইহার মূল কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া চলিলে প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। মহাভারত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না। বলবীর্য্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য। স্বেচ্ছাচার, বিলাস, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পারিষদগণের চাটুবাক্যে শূন্য অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া থাকা সুমহৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে। এইরূপে আমাদের ক্ষত্রিয়দের তেজ নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ হইয়া তাহারা অবনতির পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার অবমাননায় অসাড় হইয়া কেবল কলুষিত প্রমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। যাহারা সমস্ত সমাজের আশ্রয় ছিল তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিনযাপন করিতেছে! ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় নহে? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ জীবন কি চরমতম দুর্গতি নহে? বাঁচিয়া কি হইবে যদি এমন করিয়াই বাঁচিতে হয়? নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্ম্ম রক্ষা, ও আর্ত্তত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো—তোমার জীবন চরিতার্থ হউক—ঈশ্বর তোমার ললাটে ক্ষাত্র মাহাত্ম্যের তিলক স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া দিন্। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩০৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ বৈশাখের বঙ্গদর্শনে আমার "নববর্ষ" প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা। তাহা ক্ষত্রিয়ের জন্য লিখি নাই। তথাপি তাহাতে চিন্তার বিষয় পাইবে।

[ক্রমশঃ

ক্ষত্রিয়-সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুবক মহারাজকুমারকে উপদেশ।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে রাত্রে শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম তাহার পরদিন প্রাতেই এখানে চলিয়া আসিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, ঘটিয়া উঠিল না। আশা করি পুরীতে গিয়া আপনারা সুস্থ হইয়াছেন।

আপনাদের এখানকার বাড়ি অনেক দিন ব্যবহার করেন নাই। ক্রমশই উহা জীর্ণ হইতেছে। যদি বিদ্যালয়কে এই বাড়ি বিক্রয় করেন তবে ইহা আমাদের বিশেষ উপকারে লাগে। এখানে অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অনুরোধে পড়িয়া বিচলিত হইবেন না—এ ঘর যদি আপনাদের প্রয়োজনে লাগে তবে আমরা খুসিই হইব—এখানে আপনাদের থাকা আমাদের পক্ষে লাভ।

আমেরিকার নেশন পত্র এক খণ্ড ডাকে পাঠাইতেছি। এনাটোল ফ্রাঁসের একটি বক্তৃতা ইহাতে বাহির হইয়াছে তাহা *Modern Review*তে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য।

গোরার ইংরেজি তর্জ্জমার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়া সুরেনকে চিঠি লিখিলে হয়ত ফল হইতে পারে। তার কাজের ভীড় হয়ত কিছু কমিয়াছে।

শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩২৬।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

উত্তর দিতে দেরি হইল, তার কারণ অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি, একটুও সময় পাই না। আপনি জানেন ইংরেজি প্রবন্ধ অত্যন্ত দায়ে না পড়িলে লিখি না, কারণ অভ্যাস নাই, ভরসা নাই, এ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষিপ্রতা নাই—তার উপরে আমি স্বভাবত অত্যন্ত অলস—তার উপরে আমার ঘাড়েই রাজ্যের কাজের দায় চাপিয়াছে। তবু আপনার অনুরোধ ঠেলিতে পারি না—তাই আমার অনবকাশের ছোট ছোট ফাঁকের ভিতর দিয়া খানিকটা পুরাতন খানিকটা নূতন লেখা রিফু করিয়া তালি দিয়া একটা কাঁথা গোছের প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইলাম। আপনিও ইহার মধ্যে কিছু সূচিকর্ম্ম করিয়া এটাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিবেন। নামকরণের ভার আপনারই উপর। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে তিন শত্রু। তিনখানা কাগজের বোঝা মাথায় লইলেন এ সংবাদে আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন লোকবাক্যকে আমি বিশ্বাস করি না—অনেক সময়ে কেবলমাত্র তিপ্পান্নতেই নৌকাডুবি ঘটে। শাকের আঁটিতে ভার নাও বাড়িতে পারে, কিন্তু

ভারসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী কাঁধে তুলিয়া ভার-লাঘবতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে বসিলাম—ইহাতে আপনি কৌতুক বোধ করিবেন---শান্তা সীতাকেও এই কৌতুকের ভাগ দিবেন। ইতি তারিখ জানি না অগ্রহায়ণ ১৩২৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"মুক্তধারা"র বইগুলি আপনি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৭ মাঘ ১৩২৯।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথা-সময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।

Irelandএর মনীষী AE (George Russel) *Freeman* সাপ্তাহিকে Lessons of Revolution নামক যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভাবিবার কথা অনেক আছে, সেই জন্য কাগজ-খানি আপনাকে পাঠাইলাম। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩০।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চিঠিখানি পেয়ে আরাম পেলুম।

"বৈকালী" লোকহস্তে পাঠাচ্ছি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব।

অত্যন্ত শ্রান্ত আছি। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

—র —টির মৃত্যু হয়েছে শুনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করচি। তার যে রকম বেদনাপ্রবণ মন, সে খুব কষ্ট পাচ্চে সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এ রকম শোকের সান্ত্বনা দিতে পারে এমন শক্তি কার আছে? এ সময়ে সে * * * দূরে আছে এও দুঃখের কথা।

আপনি কবে আসতে পারবেন লিখবেন। আপনার সেই কুটীর প্রস্তুত আছে। ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯২৭।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার যে ক'খানি চিঠি ছাপা হয়েচে তাতে এমন কিছুই নেই যা অছাপ্য। যাতে কাউকে আঘাত করতে পারে এমন জিনিষ বর্জ্জন করলেই আর কিছুতে ক্ষতি হবে না। ব্যক্তিগত আলোচনা চিঠি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে চিঠিত্ব চলে যায়—সেই সহজ ভাবটি রাখবার জন্যে অন্য হিসাবে অনাবশ্যক হলেও কিছু কিছু ঘরের কথার আমেজ থাকা ভালো।

আমি রবিবার প্রাতে অত্যন্ত পীড়িত ক্লান্ত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আস্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম— শ্বাস বড় বেশি বাকি ছিল না। আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ হ'ল না। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি কল্‌কাতায় বাস আমার পক্ষে পথ্য নয়। এই শীতের সময় এখানে বিদেশী অতিথির আমদানী প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণেই হচ্চে কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা কর্ত্তব্যের অঙ্গ ব'লে সেটা স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কলকাতায় ভূরি পরিমাণ অকৃত্যের চাপে একেবারে তলিয়ে যেতে হয়,—এ বয়সে সেটা সয় না।

নটীর পূজার অভিনয় কলকাতায় হবে সম্প্রতি তারই আয়োজনের ভার নিতে হয়েচে। কাজটা সহজ নয়—অবকাশ একেবারে সম্পূর্ণ গিলে খাচ্চে। শান্তার কন্যার সঙ্গে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি এখনো হল না—কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়েছে—দেখা হ'লে হয়ত পাকা হবে। ইতি ১ মাঘ ১৩৩৩।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্ভবত আগামী কাল বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্নের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব —দুই-তিন দিনের জন্যে সেখানে থাক্‌বার কথা। ইতিমধ্যে আপনি যদি আশ্রমের অভিমুখে না আসেন তাহলে সেখানেই দেখা হবে। ইতি বুধবার [১৯২৭ সালের ৫ই জানুয়ারি। (?)]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uplands
Shillong

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি বোধ হয় জানেন বালী দ্বীপে হিন্দুসভ্যতা আলোচনার জন্য কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সেখানে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে আমি যুগলকিশোর বিরলা মহাশয়ের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেম।

এখনো পাই নি, পাব কিনা জানি নে। জাভা গভর্মেণ্টের কাছে আমি অর্থসাহায্য প্রার্থনাও করি নি। বিরলা যদি সাহায্য না করেন তবে আমি যেমন ক'রে পারি নিজের ব্যয়েই যাব—সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্য হতেও পারে। জাভা গবর্মেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ—আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধানকার্য্যের সুবিধা হ'তে পারবে।

এখানে এসে প্রথমটা জ্বরে প'ড়ে কিছু দিন অসুখে কেটেচে। আমি যদি বা উঠেচি পুপের জল-বসন্ত হল, অল্প অল্প করে সে সেরে উঠ্‌চে—এবারকার হাওয়া বদলটা, যাকে বলে successful, তা নয়। হাওয়াটা ঠাণ্ডা একথা স্বীকার করতে হবে—নিম্নভূমিতে জ্যৈষ্ঠ মাস বলতে যে কি বোঝায় তা ভুলে যাই বলেই কেবলমাত্র ঠাণ্ডার জন্যে মনে কৃতজ্ঞতা জন্মায় না। যা সহজে পাই তার চেয়ে বেশি পাবার ইচ্ছে মন থেকে ঘোচে না। শিলঙ শিলঙই থাক্‌বে অথচ দার্জ্জিলিংও হবে এইটেই মনের কামনা। ইতি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সেই ছাঁটা কাগজগুলি আমার টেবিলের উপর ছিল এই পর্য্যন্তই জানি—তার চেয়ে হাল আমলে কোথায় তাদের গতি হয়েচে আমি তার কিছুই ঠিকানা জানি নে। তাদের আর উদ্ধার হবে বলে বিশ্বাস করি নে—এই শৈলমালার ধূলির ভিতর দিয়ে একদা এখানকার পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাদের নবজন্ম লাভ হবে।

পুপে সেরে উঠেচে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও ঘন বৃষ্টিধারায় অবগুণ্ঠিত। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহা কোন্ শৈলনিবাস হইতে কবি লিখিয়াছিলেন, স্থির করিতে পারিলাম না।

ওঁ

Sravasti
Colombo.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোনো মতে শরীরটাকে টান্‌তে টান্‌তে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এত দূরে এসে পৌঁচেছি—কিন্তু আর চল্‌চে না। ঘাটের থেকেই ফিরতে হোলো। দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেচি—ছোট ছোট দাবীর শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। ডাক্তার বল্‌চে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।

চিঠি দুটো ছাপবেন।

অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হোয়ে বড়োই তৃপ্তি পেয়েছি। এ সম্বন্ধে একটা লিখেছি ফিরে

গিয়ে আপনার হাতে দেব। আগামী ১০ই তারিখে একটা জাহাজ যোগে যাব মাদ্রাজে—সম্ভবত ১৪ই ছাড়ব মাদ্রাজ থেকে রেলযোগে—যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কামনায় না নামতে হয় তাহলে বোধ করি ১৬ই পৌঁছব কলকাতায়। ইতি ৮ই জুন ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর শ্রাদ্ধদিনের উপাসনা উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেছি যদি কোনরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন ত করিবেন। ইহার কাপি আমার কাছে নাই। অতএব প্রয়োজন অতীত হইলে ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন—অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতনে ছাপিব। ইতি বুধবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা জরুরী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলে আপনার অনুরোধ রাখতে পারি নি। শুধু তাই নয়, তর্জ্জমা করতে বসেছিলেম কলম গেল ঠেকে। আজকাল প্রায় এমন হয়। বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব। স্থান পরিবর্ত্তনে যদি বুদ্ধির উদ্যম বাড়ে চেষ্টা করে দেখব। ইংরেজি লেখাটা স্বাভাবিক নয়—বয়স যত বাড়চে এই কথাটা ততই স্পষ্টতর হচ্চে। ইতি ২২ মে ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহিলাদের সম্মেলনে উদ্বোধনের ভার নিতে যদি অনুরোধ করেন তবে আমি প্রস্তুত হব। বড়ো জনতায় সভার কার্য্য পরিচালনা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

অক্টোবরের ৪।৫ তারিখে কলকাতায় আমার কাজ আছে। তার দু-চার দিন পূর্ব্বে বা পরে যদি সভার দিন স্থির করেন এবং যদি নিতান্ত অক্ষম না হই তবে কর্ত্তব্য পালন করব।

কাহিনীতে পরিশোধ বলে যে কবিতা আছে তা গানের সুরে নাট্যীকৃত করেছি, সেটি কপি করে প্রবাসীর জন্যে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেটি ৪।৫ অক্টোবরে নাট্যসূচিরূপে প্রকাশিত হবে। অন্য সমস্ত কবিতা সম্প্রতি নিঃশেষিত। কবে নূতন লেখার অঙ্কুরোদগম হবে বলতে পারি নে। ইতি ১ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শরীর ভালো ঠেকচে না। চৌন হলে যে দুর্গতি হয়েছিল সে-কথা মনে করে উদ্বিগ্ন আছি—মহিলা-সম্মেলনের ভিড় এবং কর্ত্তব্যের পেষণ জীর্ণ শরীরে সইবে কি? এখন শরীরে যে ব্যয় ঘটে তা আর পূরণ হবার আশা নেই। মেয়েরা কি আমার পরে দয়া করবেন না। বিশ্বভারতীর অবশ্যসম্পাদনীয় কাজ নিয়ে আমাকে অগত্যা কলকাতায় যেতে হবে, সে কাজের পীড়নটাও কম হবে না কিন্তু ও দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই; অভাবের দুশ্চিন্তার ভারও যে দুর্ব্বহ। আমার অবস্থার কথা চিন্তা করে আপনি যথোচিত পরামর্শ দেবেন। দোতলায় ওঠানামার কথাটাও বিচার্য্য। শান্তা আমাকে একখানি স্বরচিত গল্পের বই পাঠিয়েছিলেন, সেখানি আমার অগোচরে কোনো সাহিত্যরস-লোলুপ কর্তৃক আমার টেবিল থেকে অন্তরায়িত হয়েছে। আমার সেই অনবধানতার জন্যে লজ্জিত আছি। আজকাল আমার ঘরে এ রকম ঘটনা বিরল নয়। জরায় দেহটাও যেমন, মনোযোগটাও তেমনি শিথিল হয়ে যায়। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের অনুরোধ অস্বীকার করা আমার সাধ্য নয়। কলিকাতায় বিচিত্রায় সঙ্গীতভবনের সাহায্যকল্পে পরিশোধ অভিনয় করাতে যাব। আট নয় দশ তারিখ স্থির হয়েছে। তার পরে কোনো একটা দিন আমাকে ডাকবেন। লিখতে বলেছেন, সময় করে উঠতে পারচি নে, মনও ক্লান্ত। যদি না লেখা হয় তবে মুখে কিছু বলব; বেশি নয়। ইতি ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অঘ্রানের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি কাটাকুটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে যদিও পূর্ব্বপ্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তবুও তাকে নূতন বলেই গণ্য করা উচিত। আপনি সেটি বোধ হয় এখনও দেখেন নি।

মহিলা-সম্মেলনীর অধিনেত্রীদের দয়া করে জানাবেন তাঁদের সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। কারণ বলি। * * * আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীতাভিযানে যাত্রা করে থাকি। এবার নানা কারণে বিলম্ব হয়ে গেছে কোনোমতে ছুটির পূর্ব্বে কলিকাতায় শনি রবি দুটি দিনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে স্বয়ং আমাকে আবৃত্তি প্রভৃতি শ্রমসাধ্য নানা কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। তার উপরে রবিবারে সভানায়কতা আমার জীর্ণ দেহের পক্ষে অসাধ্য।

আমার অভিভাষণ লিখতে আরম্ভ করলেম। ভেবেছিলেম মুখে মুখেই বলব—কারণ রিহর্সল প্রভৃতি নানা ব্যাপার নিয়ে সময়ের অত্যন্ত টানাটানি। কিন্তু সভায় যখন উপস্থিত থাকতে পারব না তখন না লিখে উপায় নেই। শান্তা যদি আমার হয়ে লেখাটি পড়ে দেন তাহলে এবারকার মত প্রাণ নিয়ে নিষ্কৃতি পাই। নিজের অপরিহার্য্য দায় নিয়ে শরীরের উপর যে পীড়ন চলচে তাই আমার পক্ষে দুঃসহ।

যাই হোক যথাস্থানে আপনি আমার আর্ত্তি জানিয়ে ক্ষমা সংগ্রহ করে দেবেন—আমি আর পেরে উঠচি নে। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি ······র ইংরেজি লেখা পড়ি নি। ইংরেজি লেখাকেই আমি ভয় করি। আধুনিক ইংরেজি গল্প রচনার ভাষা আমাদের কাছে দুর্গম—আমরা যে ইংরেজি শিখেছি তার আদর্শ বিস্তর বদলে গেছে। আমি সেই জন্যে এই দুঃসাধ্য কাজে সহজে হাত দিতে চাই নে। যদি এই সময়ে থাকতুম ইংলণ্ডে, হয়তো ওদের আধুনিক ভাষার ছাঁচটা অলক্ষ্যে মনের ভিতর জমে উঠত। কিন্তু ওদের এখনকার সাহিত্যিক ইংরেজি দূরে থেকে আয়ত্ত করা অসম্ভব। মোটের উপর আমার এই বক্তব্য। বস্তুত আজকাল আমার লেখার ইংরেজি তর্জ্জমার উপর আমার কিছুই আসক্তি নেই—জানি প্রত্যেক ভাষা আপন সাহিত্যসম্পদ কৃপণের মতো বন্ধ করে রেখে দেয়, ভাষান্তরে তার রস পৌঁছতে দেয় না। দেবেন ······কে তর্জ্জমা করতে। আমার আপত্তি নেই।

নারীসম্মেলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে সেকথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমি এখন কৃপার যোগ্য। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৪৩।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজকাল লেখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য না হওয়াতে যথাসম্ভব কলম বন্ধ করে আছি। শুধু যে শরীর অপটু তা নয় মনও বিমুখ। লেখার স্রোত ভিতরের থেকে বন্ধ হয়ে আসচে। ভাষার ক্ষীণতায় আমার চিন্তার ধারা এখন আর নৌবাহ্য নয়।

······আমার কবিতা তর্জ্জমা করে থাকেন আমি জানি। বই আকারে সেগুলি প্রকাশ করবার ইচ্ছা জানিয়ে আমার সম্মতি চেয়েছিলেন। না দেবার কারণটা আপনাকে বলি। ইতিপূর্বে ······আমার কবিতার অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন। অসম্মতি দিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। সেটা আমার দুর্ব্বলতা। এ নিয়ে ম্যাকমিলানরা বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করে পত্র লেখেন—বলেন এর দ্বারা আমার যে অখ্যাতি হয় তাতে আর্থিক দিকেও আমার ক্ষতি ঘটে। আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যাঁরা তাঁদের কাব্যরচনার ভাষা ও রীতি মধ্যভিক্টোরীয় যুগের, এখনকার সাহিত্যবাজারে সে অচল হয়ে এসেছে। মডার্‌ন্ কালের যোগ্যতা পাকা হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নেবে। আমি নিজে অনুবাদ করতে সাহস এবং উৎসাহ হারিয়েছি। ···তাঁর অনুবাদগুলি তিনি ম্যাকমিলানকে পাঠিয়ে দিলে তাদের বিচারে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তা হলে কোনো কথাই থাকে না। ইতি ২০।১।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

······র বিরুদ্ধে ······র অন্যায় আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সঙ্গত নয়। বিশেষত ·· ··· যে পদ

পেয়েছেন তার সম্মান কোনো আলোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে আমি ক্ষমা করতে পারি নে এ আমার দুর্বলতা। বিধাতা আমাকে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন; কেবল এই ক্ষেত্রেই আমার স্মরণশক্তি কাঁটাগাছ রোপণ করতে ছাড়ে না এটা আমার পক্ষে না আরামের না কল্যাণের। আপনি আমাকে অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ইতি ২৫।১।[১৯]৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

Gouripur Lodge,
Kalimpong.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি প্রথমে আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্পপরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে—সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কালিম্পং]

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আমি তিন চার দিনের মধ্যে নেমে যাব—যথাস্থানে গিয়ে ঝুলি ঝেড়ে দেখব—যদি দেবার যোগ্য কিছু পাই পাঠিয়ে দেব। এখানে পাহাড়ি আষাঢ় জাপানি চালে নির্মম ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করচে রাস্তাঘাট দিচ্চে ধ্বসিয়ে—মার এড়িয়ে যাত্রা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ২৯।৬।[১৯]৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কিছু দিন থেকে নানা কাজে ও অকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলুম এবং এখনো আছি—সেই জন্যেই নোগুচির চিঠির উত্তর এখনো দিতে পারি নি—যত শীঘ্র পারি দেব—ক্লান্তির জন্যে কিছু লেখবার উৎসাহ বোধ করি নে। এদিকে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে হলকর্ষণ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত হতে হচ্ছে। ইতি ৩০।৮।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

সেন্টজেভিয়ার্সের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আপনার সুগ্রথিত অভিভাষণটি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। আমার উদ্দেশে আপনাদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বাণী আমার জীবনে বিধাতার প্রসন্নতাকে সার্থক করে। ইতি ৪।৯।[১৯]৪০

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশান্তা দেবী, শ্রীসীতা দেবী, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীনন্দিনী দেবী, প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মুলু)]

[রবীন্দ্রনাথের আমাকে লেখা চিঠি আরো আছে। সেগুলির মুদ্রণ সম্বন্ধে বিবেচনা পরে করব। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৮।]

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১১

সাঁতরায় চারিটা দিন বেশ কাটিল। বেশ লাগিতেছে; তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, অবিমিশ্র আনন্দেরই অনুভূতি নয়, তাহার উপর সৌদামিনী আসিয়া একটা যেন মর্মনিংড়ান ব্যথা জাগাইয়াছে বুকের মধ্যে। কাল যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, ঐ কথাই ভাবিয়াছিলাম—সেই সদু!—তার এই দশা!—আহা!...

অনিলের প্রস্তাবটা বড় অশুচি বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না যে, অমোঘ সম্মোহনে ঐ চিন্তাটা আমায় আকর্ষণ করিতেছিল,—সত্যই তো, সিঁথির সিঁদুর তো ঘুচিল বলিয়া; আজ না হয় দু-দিন বাদে; তার পর?—ভাগবৎ হালদার? ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ ঐ ওর নিশ্চিত পরিণতি।..."কাল যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম" বলাটা ভুল হইয়াছে, আসলে কাল একেবারেই নিদ্রা হয় নাই।

কোথায় মীরা। ভাবিলাম সুখে-বেদনায়, হরিষে-বিষাদে জীবনটা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, যাই দু-দিন একটু মুক্তির আস্বাদ লইয়া আসি।

এই মুক্তি!

আজ দুপুরে আবার আসিয়াছিল সৌদামিনী। সেই কালকের ব্যাপারের পুনরনুষ্ঠান, প্রায় আগাগোড়াই। সেই আমাদের নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকা, আর ওর ছেলেমেয়ে দুইটাকে লইয়া আকুলি-বিকুলি; বেশ বুঝা যায় ও যেন অনুভব করিতেছে এই সন্তান তো ওরই হইবার কথা ছিল। ওদের বুকে করিয়া ওর নাড়ীতে টান পড়িতেছে।

আজ বারান্দায়ই কাটাইল, বলিল, "ও ঘরটায় তোর বড্ড গরম বৌ। ওঁরা ঘুমুচ্ছেন, এইখানেই আয় আমরা গল্প করি। এই সময়টা একটু ফুরসৎ পাই, পালিয়ে আসি, তোর নন্দাই এই সময়টায় একটু ভাল থাকে।...আর ভাল থাকা!..."

এক বার বলিল "আজ শৈলদা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাব ভাবছি, মনে করবে দুটো দিনের জন্যে এলাম সাঁতরায়, সদী এল, অথচ এক বার দেখা করলে না।"

কপট-নিদ্রা শেষ দিকটায় কখন একটু অকপট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন উঠিলাম দুই জনে তখন, সৌদামিনী চলিয়া গিয়াছে। বরাবরই ঘুমাইয়া থাকিবার কথা বলিয়া অম্বুরীর কাছে ওর প্রসঙ্গটা তুলিতেই পারিলাম না।

সদু দেখা করিবে বলিল, আবার কি ভাবিয়া চলিয়া গেল?

বিকাল বেলায় দুই জনে বাহির হইব। আমি রকে দাঁড়াইয়া আছি, অনিল ওর বাক্স থেকে কিছু পয়সা লইবার জন্য ভিতরে গিয়াছে। বাহিরে যেন কতকটা পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন কানে আসিল, "এটা পরলোকগত সদাশিব বাবুর বাড়ী?"

বাহিরের উঠানে পাড়ার কয়েক জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সান্তু খেলা করিতেছে, প্রশ্নটা তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া।

দুই-তিন বার প্রশ্নের পরও কোন উত্তর হইল না, অবশ্য হওয়াই অস্বাভাবিক। একে তো বছর কয়েক পূর্বে যে মারা গিয়াছে শিশুরা তাহার নাম মনে করিয়া রাখে না, তাহার উপর প্রশ্নকারী "পরলোকগত" কথাটা জুড়িয়া দিয়া আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষে বোধ হয় ওরই মধ্যে একটু বড়গোছের একটি মেয়ে উত্তর করিল, "না, পরলোকের বাড়ী নয় গো, সান্তুর বাবার বাড়ী।"

অগ্রসর হইতে হইতে শুনিতেছি, "কি নাম বাবার?"

সান্তু ঠাকুরমার কাছে শোনা নামটা বলিল, "বাবার নাম অনা, টোমার নাম কি?"

—রাজীবলোচন।

বাহির হইয়া দেখি রাজু বেয়ারা চৌকাঠের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। "পরলোকগত" কথাটার জন্য বিস্মিত হইলাম না। পরে অবশ্য তরুর কাছে টের পাইলাম মীরা দুষ্টামি করিয়া গালভরা কথাটা শিখাইয়া দিয়াছিল। যাহোক, ওর উপস্থিতির জন্য বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাজু যে!—কি ব্যাপার?"

কিছু বলিবার পূর্বে রাজুর দৃষ্টিটা যেন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই বাড়ীর উপর একবার ঘুরিয়া গেল, কহিল, "এই বাড়ীতেই রয়েছেন আপনি মাষ্টারমশা?"

উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ, এইটেই আমার বন্ধুর বাড়ী রাজু।...তার পর, ব্যাপার কি বল্ তো, তুমি হঠাৎ?"

অনিল আসিল, চাপরাশ-আঁটা মানুষ দেখিয়া একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিল, "কে রে শৈল?... কি দরকার তোমার?"

আমি উত্তর করিলাম, "মিস্টার রায়ের বেয়ারা।"

"ডাকতে এসেছে তোকে?"

রাজু উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, দিদিমণি এসেছেন।"

অনিল সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমিও অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজুকে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার আমরা পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। রাজুকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "কোথায়?"

"ওই মোড়ের মাথায় পন্টিয়াক্‌টা দাঁড় করিয়ে আছেন।"

এ কি নিদারুণ লজ্জায় ফেলিল মীরা—আমাকেও আর অনিলকেও! আমি যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া অনিলের পানে চাহিলাম, ঠিক ইচ্ছা করিয়া চাহিবার উপায় ছিল না, দৃষ্টিটা আপনা হইতেই তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িল। অনিল কিন্তু নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছে। বলিল, "একটু দাঁড়া শৈল, এলাম ব'লে।"

মিনিটখানেকের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল্," বেয়ারাকেও বলিল—"এস হে।"

আঁকাবাঁকা গলিপথ, পথ থেকে বাহির হইয়াই আমরা মীরার মোটরের সামনে পড়িলাম। কয়েক জন কৌতূহলী বালকবালিকা মোটরটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং ধরিয়া সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তরু দরজার উপর মুখ চাপিয়া একটু বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। মীরা গাড়ীর ও-পাশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে।

তরু আমায় দেখিয়াই উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও দিদি, মাস্টারমশাই!"

মীরা ফিরিয়া চাহিতেই আমরা দুই জনে নমস্কার করিলাম। আমি অনিলকে পরিচিত করিয়া দিতে, অনিল আর এক বার নমস্কার করিয়া দরজাটা খুলিয়া বলিল, "আসুন, নামুন।"

তরুকে বলিল, "নাম খুকী।"

তরু লক্ষ্মী পাঠশালার পোষাকে আসিয়াছে; জড়িত পদে নামিয়া প্রথমে অনিলের, পরে আমার, পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

মীরা নামিয়া অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাদের বোধ হয় ভয়ানক আশ্চর্য ক'রে দিলাম; খুব ব্যতিব্যস্ত করলাম বোধ হয়।"

অনিল হাসিয়া উত্তর করিল, "আমাদের মুখ চেয়ে, ব্যতিব্যস্ত করবার ক্ষমতা থেকে ভগবান্ আপনাদের বঞ্চিত করেছেন। যদি সে-রকম অভিসন্ধি ওঠেও কখন আপনাদের মনে তো আপনারা আগে থাকতেই নোটিস দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে ফেলেন।" আমরা তিন জনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "তবুও নিশ্চিন্দি হবেন না, নোটিস্ দিয়েও যে উপদ্রব করা চলে, তার নজির আমাদের দেশে আছে অনিলবাবু।—জানেন তো, এই দেশেই চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত।"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা গেলেন পূর্ণিয়া শৈলেনবাবু, তাঁর কাছ থেকে হুকুম আর মোটর চেয়ে রেখেছিলাম, এলাম চলে।"

বলিলাম, "আমাদের সৌভাগ্য; আপনি যে মনে ক'রে আসবেন, এটা আশা করি নি।"

তরুর মুখটা যেন একটু বিষণ্ণ। মীরা-অনিলের কথাবার্তার মধ্যে আমায় একটু একান্তে বলিল, "মাস্টার-মশাই, উনি বাড়ীতেও সবার সামনে আমায় 'খুকী' বলবেন নাকি?"

ও বেচারীর দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না। মীরা জিজ্ঞাসা করিল—কি হইয়াছে। প্রথমটা বলিতে চাহিলাম না, কিন্তু ওর জেদাজেদিতে বলিতেই হইল। আমাদের তিন জনের হাসিতে তরু একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া আমার গায়ে সাঁটিয়া গেল। মীরা বলিল, "সত্যিই, কি রকম আক্কেল আপনাদের! দেখছেন কত বড় একটা মেয়ে,—অত কষ্ট ক'রে বেচারা শাড়ী পর্যন্ত প'রে এল, তবু 'খুকী' বলবেন!"

চৌকাঠের কাছে গলিতে অম্বুরী দাঁড়াইয়া আছে। একটা ধোপদস্ত শেমিজ আর শাড়ী পরা, চুলটাও সামান্য একটু গোছগাছ করিয়া লইয়াছে।

মীরাকে দেখিয়া প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল যেন, তখনই আবার সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কয়েক

পা অগ্রসর হইয়া মীরার বাঁ-হাতটা ধরিয়া বলিল, "এস ভাই।"

তাহার পর তরুর পিঠে হাত দিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এই তোমার ছাত্রী ঠাকুরপো? সত্যি কি চমৎকারটি! এত ছোট মেয়ে মেমেদের স্কুলে পড়ে ঠাকুরপো?"

মীরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সর্বনাশ! দেখবেন, তা ব'লে ওকে যেন 'খুকী' ব'লে বসবেন না আপনিও।"

মীরা নিজেও এবং আমরা দুই জনে হাসিয়া উঠিলাম; তরু আবার লজ্জায় অম্বুরীকে জড়াইয়া কাপড়ে মুখ লুকাইল। অম্বুরী আমার মুখের পানে চাহিল, ব্যাপারটা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "না, এ অন্যায়। ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই মিলে আপনারা ওর কি অবস্থা ক'রে তুলেছেন দেখুন তো!"

তাহার পর প্রথম সুযোগেই আমায় একটু একান্তে ডাকিয়া ব্যগ্র মিনতির সহিত বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, আমায়ও যেন 'অম্বুরী' ব'লে ডেক না—শুধু আজকের দিনটা—ওঁকেও ব'লে দিও—দোহাই তোমাদের…।"

(১২)

মীরা প্রথমটা আলাপ-পরিচয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, নূতন পরিচয়ের জড়িমাটাও লাগিয়াছিল একটু, চৌকাঠ ডিঙাইয়া বহিরঙ্গনে পা দিতেই কিন্তু তাহার মনটা যেন নূতন আবেষ্টনীতে একেবারে সাড়া দিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, "কি সবুজ, শৈলেনবাবু, যেন ছোবান—এবার বুঝতে পেরেছি আপনি কিসের টানে আমাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছেন।"

বাড়ীর দিকে না গিয়া ডান দিকে তরুলতায় জড়ান ছোট চাঁপাগাছটার কাছে চলিয়া গেল, পুষ্পভরা লতার একটা ডগা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি চমৎকার ফুল! কি ছোট্ট! কি রাঙা!…কি নাম এর? বিলিতী ফুল নাকি?—আর পাতা কি চমৎকার—চিরুনির মত!"

বলিলাম, "না, বিলিতী হ'তে যাবে কেন? একেবারে দিশী। তরুর অন্ততঃ চেনা উচিত।"

হাসিয়া তরুর পানে চাহিলাম।

মীরা রহস্যটা বুঝিতে না পারিয়া অম্বুরীর পানে চাহিল, অম্বুরী বলিল, "একেই তরুলতা বলে, তাই বলছেন ঠাকুরপো।"

নামের এই মিলে মীরার মুখটা এক রকম বিস্ময়-মিশ্রিত হাসিতে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওদিকে তরু আরও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। মীরা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার লতার একবার তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য শৈলেনবাবু!—এই তরুলতা?

একটু নালিশের সুরে বলিল, "আপনি জানতেন অথচ বলেন নি আমাদের—"

মীরা আবার ছেলেমানুষ হইয়া পড়িয়াছে, কোন কিছুতে অভিভূত হইয়া পড়িলে উহার এই অবস্থা হয়।… জানিলেও এ-সম্বন্ধে আমার বলিবার কি ছিল?

হঠাৎ অম্বুরীর পানে চাহিয়া বলিল, "আমি যাবার সময় কতকগুলো চুরি ক'রে নিয়ে যাব, মা যে কি ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন!—কিছু বলতে পারবেন না কিন্তু আপনি; আমার ভয়ঙ্কর ভাল লেগেছে।

অম্বুরী বলিল, "বলব বৈকি, শুধু এক কড়ারে না ব'লতে পারি।"

মীরা একটু থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিল—"কি?"

অম্বুরী তরুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার তরুলতাটি আমায় দিয়ে যাবেন; আমারও বড্ড ভাল লেগেছে। সত্যি কি চমৎকার!"

সকলের হাসিতে তরু আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মীরা হাসির পরেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না।"

এবার অম্বুরী একটু থতমত খাইয়া গেল। কোথাও আধুনিক ভদ্রতার ত্রুটি হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মীরার চেয়েও অপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করিল, "কি?—কি ঠিক হয় নি?"

মীরা বলিল, "আমি আসতেই আপনি—'এস ভাই' ব'লে আমায় ডেকে নিলেন; এরই মধ্যে কিন্তু সুর বদলে 'তুমি' থেকে 'আপনি' ক'রে বসেছেন।"

অম্বুরী যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"এই কথা?"

মীরা বলিল, "এই কথা বটে, তবে সামান্য কথা নয়, কেন না ঐ স্নেহভরে ছোট ক'রে যে ডেকেছিলেন তারই জোরে আমিও মনে মনে একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম।"

তাহার পর তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, তরুর দিদি আছে, আমার নেই,—আমার হিংসে হবে না?"

একটা প্রীতির রস যেন সবার মনটাকেই ভিজাইয়া তুলিতেছে।

অম্বুরী বলিল, "আমি ভেবেছিলাম পাড়াগেঁয়ে মানুষ—মস্ত একটা ভুল হ'য়ে গেছে কথাটা ব'লে, তাই···"

মীরা বিপন্ন ভাবে বলিল, "তবুও মনে করবেন—মস্ত একটা ভুল হয় নি? পাড়াগেঁয়েদের বোঝান বড় শক্ত দেখছি তো!"

আবার একটা হাসি উঠিল।

আর একটু দেখিয়া মীরা বলিল, "চলুন ভেতরে যাই, যেখানে দাঁড়িয়েছি কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করছে না অনিলবাবু। আর কে কে আছেন বাড়ীতে?"

অনিল বলিল, "ঠিক তো; চলুন ভেতরে। ভেতরে শুধু আমার মা আছেন, আর···। আপনাকে সেই থেকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, দুই গেঁয়োতে মিলে আমরা কি ভুলটাই করছি দেখুন সেই থেকে।"

হাসিতে হাসিতে আমরা ভিতরে আসিলাম। রকের এক দিকটা অনিলের মা সানু আর খুকীকে লইয়া একটা মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। পাশেই আর একখানা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি বিছান, আগন্তুকদের জন্য। অম্বুরীর অতন্দ্রিত চেষ্টায় বাড়ীটা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আজ যেন আরও ঝকঝকে তকতকে। যা মিনিট পাঁচ-ছয় হাতে পাইয়াছিল তাহাতেই সে ছেলেমেয়ে থেকে আসবাবপত্র পর্যন্ত সব-তাতেই ত্বরিতে তাহার যাদুস্পর্শটুকু দিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রশংসা হইবে জানিয়াই আগেভাগেই বলিয়া রাখিল, "এই তোমার দিদির গেরস্থালি ভাই, আপন জেনে যদি একটু আনন্দ পাও। আগে একটু ব'সে জিরিয়ে নাও। তার পর হাত পা ধুয়ে···আমি ততক্ষণ একটু চা ক'রে ফেলি···ঝি! নাইবার ঘরে জল, তোয়ালে···"

ঝি রকের পাশে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "দিয়েছি জল।"

মা নূতন মানুষের সঙ্গে প্রবেশ করিতেই খুকী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সানু মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "ঠব্বনাশ! কলকাটা ঠেকে সবাই এসেছেন খুকু, ঠভ্য হ'য়ে ব'সটে হয়।"

তাহার কাণ্ডখানা দেখিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অনিলের মায়ের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, তরুও অনুকরণ করিল। অনিলের মা উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা ওষ্ঠে ঠেকাইলেন; বলিলেন, "এস মা, এইমাত্র এলে?"

মীরা খুকীকে কোলে লইতে লইতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার এইমাত্র চলে যেতে হবে।"

বৃদ্ধা একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওমা!—কেন?"

মীরা খুকীকে বুকে চাপিয়া এবং সানুর হাত ধরিয়া পাটির উপর বসিতে বসিতে বলিল, "আপনার বৌ আমাদের এক মিনিট বসিয়ে, তার পরেই পা ধুইয়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই চা খাইয়ে বিদেয় ক'রে দিতে চান।"

আবার হাসি উঠিল। অম্বুরী বলিল, "না ভাই ঘাট হয়েছে, তোমার যখন যা খুশী কর। ঐগুলো তো সব সারতে হবে, যত দেরি কর ততই আমার লাভ।"

খানিকক্ষণ ধরিয়া বেশ গল্প জমিয়া উঠিল,—কেন্দ্র খোকাখুকী, পাড়ার খানিকটা পরিচয়, খানিকটা কলিকাতার প্রসঙ্গ। এক সময় রাগিলও মীরা আমার উপর, বলিল—"অনিলবাবুর যে খোকাখুকী আছে একথা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানতে দেন নি, পুতুল নিয়ে আসতাম তা হ'লে, এখানে আর কি পাওয়া যাবে?"—বলিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বাহির করিয়া, অনিল-অম্বুরী আপত্তি করিবার পূর্বেই সানুর দুই হাতে দিয়া মুঠাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর তরুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঠ তরু, দিদির বাড়ী-ঘর-দোর ভাল ক'রে দেখে আসি; উনি নিজে দেখাবেন না।"

মীরা ক্রমেই মুক্তভাবে জায়গাটার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। ওরা তিন জনেই উঠিয়া গেল, আমরা বসিয়া রহিলাম। ঘর-দুয়ার দেখিয়া ছাদে গেল, কিছু বেশীক্ষণ কাটাইল সেখানে। মাঝে মাঝে এক-একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কানে আসিতেছে—মীরার মুখের; চারি দিকের আবেষ্টনীর প্রশংসা—কোন একটা গাছের, লতার, কোনও ফুলের। উপরে গিয়া তরুরও মুখ খুলিয়াছে। তরু বলিতেছে, "আজ সক্কাল বেলা এলে হ'ত দিদি, এক্ষুণি তো চলে যাবে···"

সময়ের অল্পতার কথাই উহাকে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

একটু পরে উহারা নামিয়া আসিল। অম্বুরী বলিল, "এইবার ভাই ঠাট্টাই কর আর যাই কর, শুনছি না। মুখ-হাত ধোও গিয়ে; আমি ততক্ষণ চায়ের জোগাড় দেখি। কত দূর থেকে এসেছ বল দিকিন! আর এই রোদ্দুরটা গেছে তো মাথার ওপর দিয়ে?"

মীরা বলিল, "না, আপনি চা করলে চলবে না দিদি, দাঁড়ান আমি মুখ-হাত ধুয়ে এক্ষুণি আসছি।"

অম্বুরী বলিল, "বাঃ, আমি খারাপ চা করি নাকি? জিজ্ঞেস কর বরং ঠাকুরপোদের।"

মীরা স্নানাগারে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল, "ঠাকুরপো প্রভৃতি যাঁরা খুশী হবার জন্যেই সর্বদা তোয়ের হয়ে রয়েছেন তাঁদের খুশী করা শক্ত নয়। আমার কিন্তু বিশ্বাস 'পাড়াগেঁয়ে'রা যেমন কথা বলতে ভুল করে তেমনি চা করতেও মোটেই পারে না। তাই নিজে করে খাব।" —বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া মীরা আমাদের বলিল, "আপনারা এবার একটু ওপরে যান। রান্নাঘরের মধ্যে রান্নার নুন্ মশলা খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের একটু ঝগড়াঝাঁটি হ'তে পারে, আমরা চাই না যে পুরুষে দেখে সেটা।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "ঝগড়াঝাঁটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই বিচার-সালিসী প্রভৃতির জন্যে পুরুষের থাকা প্রয়োজন।"

মীরা বলিল, "মাফ্ করবেন, আপনারা দূরেই থাকুন, ব্যারিস্টারের মেয়ে—বিচার-সালিসীতে আপনারা কতটা সাহায্য করেন আমার খুব জানা আছে।"

একটা হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা বিভক্ত হইয়া গেলাম।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক ওপরে থাকিতে হইল। মীরা যে একটা রন্ধনযজ্ঞ লাগাইয়া দিয়াছে, তাহা ওপর হইতে বেশ টের পাইতেছি। একবার সিগারেট্ লইবার জন্য নীচে নামিয়া দেখি মীরা শাড়ীর আঁচলটা বাঁ কাঁধ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া কোমরে জড়াইয়া পাকা গিন্নীর মত একটা খুন্তি হাতে লইয়া কড়ায় প্রবল বেগে কি একটা সঞ্চালিত করিয়া যাইতেছে। অম্বুরী বোধ হয় লুচি বেলিতেছে, পিঠের উপর খুকী। কাজের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা হাসির কথা চলিতেছে যেন। রকটা দক্ষিণ দিকে উঠানটাকে ঘিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ দিকে একটা জামরুল গাছের তলায় রান্নাঘরটা। উহারা দুই জনেই আমার দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও বেশ টের পাওয়া যায় গৃহিণীপনার এই নূতন কাজে ঘরের তরল অন্ধকারের মধ্যে মীরার একটা নূতন রূপ ফুটিয়াছে। এলো-খোঁপার গেরো আলগা হইয়া গিয়াছে, ব্লাউজের বাঁকা ছাঁটের উপরে অনাবৃত স্কন্ধের খানিকটা দেখা যায়—অর্দ্ধচন্দ্রাকার, মাঝখানটিতে চেন হারের সোনা চিক্ চিক্ করিতেছে; সুডৌল, অনাবৃত হাতটি সখের রন্ধনকার্যে যতটা দরকার তার চেয়েও একটু বেশী চঞ্চল, তাহাতে একটু যেন ছেলেমানুষির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যতটুকু না দেখিয়া পারা গেল না দেখিয়া লইয়া সিগারেট লইয়া উপরে চলিয়া গেলাম। অনিল ওদিককার আলসের উপর একটু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া ছিল, প্রশ্ন করিল, "তৃষ্ণানিবৃত্তি হ'ল?"

বলিলাম, "দেখছিস সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম; চোখ নেই তোর?"

অনিল বলিল, "আমি তারও বেশী দেখতে পাচ্ছি; তিনটে চোখ আছে।"

একটু মৌনতাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে আমি। সিগারেট ধরাইয়া কয়েকটা টান দিয়া প্রশ্ন করিলাম—"ভাবিস কি?"

অনিল যেন একটা ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিল, বলিল, "যা ভাবছিলাম তোকে আর সে-কথা বলা চলবে না।" এবং সঙ্গেই সঙ্গেই, সে-প্রসঙ্গটা অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল—"আশ্চর্য শৈল, আশ্চর্য এই মেয়েছেলেদের ক্ষমতা,—মীরা এইটুকুর মধ্যে কি নিশ্চিহ্নভাবে মিশে গেছে দেখছিস?"

আমি বলিলাম, "সে অম্বুরীর গুণ।"

"সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় মীরা এর মধ্যে আর এক জনকে বেশী ক'রে পেয়েছে।"

আমি একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল, "তোকে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি রান্নাঘরে রান্না করছি না অনিল, তোর কাছে রয়েছি।"

অনিল বলিল, "মীরার কাছে তুই রান্নাঘর থেকে নিয়ে বাইরের চৌকাঠ পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে রয়েছিস শৈল, তাই এখানকার মাটি, এখানকার গাছপালা, এখানকার মানুষ যাদের সঙ্গে তুই রয়েছিস, ওর কাছে বেশী মিষ্টি হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আরও একটা কথা রয়েছে, অবশ্য আমার আন্দাজ, কিন্তু ভুল আন্দাজ নয়।

প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"মীরা ভেবেছিল—অন্তত মীরার বোধ হয় একটা সন্দেহ ছিল, তুই নেই এখানে; সত্যিই তুই একটা ছুতো করে কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিস কোথাও। মীরার দোষ নয়, দেবকন্যাও ভালবাসলে এ-সন্দেহটা করত, মীরা তো মানুষ।...এখানে তোকে দেখে মীরা বর্তে গেছে।"

বলিলাম, "তার তো কৈ কোন লক্ষণ দেখলাম না।"

"তোর মোটা দৃষ্টি, দেখতে পাস নি; ঐখানেই তো মীরার জিৎ। ও বরং তোর সঙ্গেই সব চেয়ে কম কথা কয়েছে, তোর দিকে সব চেয়ে কম দেখেছে, কিন্তু ঐ সবই হচ্ছে লক্ষণ। দেখিস, ও যা কিছু এখানে করবে, তোকে বাইরে বাইরে

যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে করবে। শৈল, মেয়েরা সত্যই শক্তির অংশ;—ওরা একই সঙ্গে; একই সময়ে খুব কাছে আর খুব দূরে থাকতে পারে। আমরা, পুরুষেরা জড়—একটা পাথরের চাঁইয়ের মত—যদি কাছে থাকি তো না ঠেলে দিলে দূরে যেতে চাই না, দূরে থাকি তো না টেনে নিলে কাছে আসবার ক্ষমতা নেই,—ঐ চেতনা শক্তির নিগ্রহ বা অনুগ্রহের নিতান্তই অধীন, কপালে যেটা যখন জোটে…"

অম্বুরী আসিয়া বলিল, "মীরা একটু চা খাবার জন্যে ডাকতে পাঠালে।"

অনিলকে বলিলাম, "ওঠ, কপালে আপাততঃ অনুগ্রহ দেখা যাচ্ছে।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "আমার মনে হয় নিগ্রহ,—দু-ঘণ্টা ধ'রে দু-জনে যে রকম খেটেছে দেখছি, তাতে গুরুতর একটা কিছু…"

প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত বাড়ীটাতে একটা উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া রাত প্রায় আটটার সময় মীরা চলিয়া গেল। অম্বুরী আমাদের এবং পরে উহাদের নিজেদের এবং রাজু ও ড্রাইভারের আহারাদির পর কাছের দু-একটা বাড়ী হইতে মীরাকে একটু ঘুরাইয়া আনিল। তাহার পর আমরা সকলে মোটরে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। বিদায়ের সময় মীরা অম্বুরীর হাতটা ধরিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তখন বলেছিলাম—বুঝতে পেরেছি কিসের টানে আপনি এখানে পালিয়ে এসেছেন, এখন বুঝছি কাদের টানে। এই দুটো টানের প্রভাব কাটিয়ে আপনি আবার আসছেন তো শৈলেন বাবু?"

* * * *

ফিরিবার সময় সবাই চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ীর বহিরঙ্গনে আসিয়া অম্বুরী বলিল, "একটা কথা বলব ঠাকুরপো? বলেই ফেলি—পেটে কথা থাকে না এ বদনাম তো আমাদের আছেই…। মীরা বললে, শৈলেন-বাবুকে ব'লো না দিদি,—আমার ভয় হয়েছিল উনি বোধ হয় একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দেশে চলে গেছেন, কেন না ক'লকাতা বোধ হয় ওঁর ভাল লাগে না। তুমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দিও দিদি, না হ'লে তরুর ভয়ানক ক্ষতি হবে'…"

অনিল আড়চোখে একবার আমার মুখের পানে চাহিল।

ক্রমশঃ

দারা-বাবালাল সংবাদ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোয়

পঞ্জাব প্রদেশে বাবালালী নামে এক সম্প্রদায় আছে। মধ্য-যুগে উত্তর-ভারতে বাবালাল নামধারী একাধিক* সাধু-পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে এই প্রবন্ধোক্ত বাবালাল [আসল নাম—লালদাস] বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। ইনি জাতিতে ছত্রী বা ক্ষত্রিয় ছিলেন; সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫—১৬২৭ খ্রীঃ) মালব প্রদেশে তাঁহার জন্ম। লালদাসের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। কথিত আছে, এক দিন চেতনস্বামী নামক একজন যোগীপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সন্ন্যাসী বাবালালের কাছে কিছু চাল ও জ্বালানী কাঠ ভিক্ষা করিয়া রান্না চড়াইলেন; তাঁহার উনুন কিংবা ইট প্রয়োজন হইল না, পায়ের গোড়ালির উপর ভাণ্ড রাখিয়া তিনি নীচে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। যোগীর দেহে অগ্নির দাহিকাশক্তি নিষ্ক্রিয় হইল দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট লালদাস স্বামীজীর পায়ে পড়িয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন। ভোজন শেষ করিয়া চেতনস্বামী তাঁহাকে মাত্র একদানা অন্ন প্রসাদ করিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া লালদাস বুঝিতে পারিলেন তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে; আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগতের জটিল রহস্যসমূহ তাঁহার জ্ঞাননেত্রে দর্পণ-

* অন্য তিন জন বাবালালের মঠ পঞ্জাবের ভেরা, গুরুদাসপুর এবং পিণ্ডিদাদন জিলায় বিদ্যমান। পিণ্ডিদাদনের বাবালাল তেহলীওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোকে বলে তিনি শুষ্ক ডালপালাকে অলৌকিক শক্তিবলে জীবন্ত শিশম্ (পঞ্জাবী নাম তেহ্‌লী) গাছ করিতে পারিতেন। এই জন্য তিনি তেহ্‌লীওয়ালা নামে পরিচিত। (Rose: *Glossary of Tribes and Castes*, ii. 31)

প্রতিবিম্ববৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহার পর লালদাস কয়েক বৎসর চেতনস্বামীর সহিত নানা স্থান পরিভ্রমণ এবং গুরুর কৃপায় হঠযোগ এবং রাজযোগ শিক্ষাপূর্ব্বক অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লাহোরে অবস্থানকালে চেতনস্বামী এক দিন পরীক্ষাচ্ছলে চেলাকে দ্বারকাতীর্থ হইতে হরিচন্দন আনিবার হুকুম করিলেন। আজকালকার দিনে রেল-জাহাজে লাহোর হইতে দ্বারকা তীর্থ অন্ততঃ চারি দিনের রাস্তা, মোগল-আমলে কোন্ পথে কি ভাবে বাবালাল দ্বারকা প্রয়াণ করিয়াছিলেন জানা নাই। কথিত আছে, আদেশমাত্র অতিসত্বর লালদাস দ্বারকা হইতে হরিচন্দন আনিয়া গুরুকে নিবেদন করিয়াছিলেন। চেলা যোগসিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া চেতনস্বামী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সাবাশ্ বেটা! অব্ গুরু বন্ জা! এই কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র—বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা নয়। সাধু মহাপুরুষদের কার্য্যাবলীর বিচার ঐতিহাসিক সমালোচনার গণ্ডীর বাহিরে; সুতরাং "যথা পঠিতং* তথা লিখিতং" ব্যতীত এ সমস্ত ব্যাপারে অন্য পন্থা নাই। তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় অন্ধবিশ্বাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশিক্ষিত অতিশিক্ষিত গ্রামীণ নাগরিক সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনে আবহমান কাল হইতে বদ্ধমূল; জড়বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। এই বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি উপেক্ষা করিলে ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশ কাল ও সমাজের চিত্র ফুটিয়া উঠে না।

যাহা হউক, লালদাস গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবের সরহিন্দ জিলার অন্তর্গত ধ্যানপুরে মঠ স্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার মাথায় জটার বহর ছিল না; মাথা মুড়াইয়া ফেলিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে মুণ্ডিয়া বা নেড়ে বাবালাল বলিত। দারা তাঁহার 'শতাহৎ'† নামক পুস্তকে বাবালালকে কবীর-পন্থী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হঠযোগী মুণ্ডিত-মস্তক, শাস্ত্রজ্ঞ, মূর্ত্তিপূজার সমর্থক সাধু বাবালালকে স্বয়ং কবীর সাহেব‡ কবীর-পন্থী বলিয়া স্বীকার করিতেন কি না সন্দেহ। কবীর তাঁহার জন্মগত ইস্‌লামী সংস্কার লইয়া হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়াছেন; উহার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা তিনি করেন নাই। অপর পক্ষে বাবালালের মতে মূর্ত্তিপূজা নিন্দনীয় নহে; যাহারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় নাই, অবিবাহিত বালিকার ন্যায় যে পুতুলকে পুতুলের চেয়ে অধিক কিছু মনে করে, মূর্ত্তিপূজাদি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। দারার অনুভূতি এ বিষয়ে আরও প্রাণস্পর্শী। শাহজাদা তাঁহার অন্যতম পীর শাহ্ দিলরুবার নিকট এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"দরু' হর্ বুতে জান্ ইস্ত্ পিন্‌হান্;
বে-জের্-ই-কুপ্ ফার ইমান্ ইস্ত্ পিন্‌হান্।"

অর্থাৎ প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণ লুক্কায়িত আছে; কাফেরী বা বেইমানীর আড়ালে ইমান্ লুক্কায়িত আছে।

যাহা হউক, কবীর সাহেব সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও রাম-রহিমের অভেদ-বুদ্ধির বাণী এ দেশে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকগণ এবং স্বয়ং সম্রাট্ আকবরও এই হিসাবে কবীর-পন্থী। প্রপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণকারী শাহজাদা দারা এবং তাঁহার গুরুস্থানীয় বাবালালও কবীরের বাণী ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২

অনিচ্ছায় ভগ্নহৃদয়ে শাহ্জাদা দারা শুকো কান্দাহার-অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া মুলতানের পথে ২২এ নবেম্বর (১৬৫৩ খ্রীঃ) লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সুপরিচিত রণকৌশল ও শৌর্য্য, এবং হিন্দুস্থানের বুজুর্গ-মিহির উজীর সাদুল্লার নীতি যে-কার্য্যে দুই বার বিফল হইয়াছে, সম্রাট্ শাহজাহান্ দারাকে সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবকে জব্দ করিবার গোপন মতলবও হয়ত শাহজাহানের ছিল; কিন্তু দারার অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে তিনিই অধিক বিব্রত হইলেন—ভাবী অমঙ্গলের ছায়া বরং ঘনীভূত হইয়া তাঁহার মনকে অভিভূত করিল। তাঁহার আদেশে পরাজিত দারা সর্ব্বত্র বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় সাড়ম্বরে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। কিন্তু স্নেহাতুর পিতার এই প্রলেপে দারার মনের ঘা শুকাইল না। স্বপ্নবিলাসী দারার মন বাস্তবতার প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া

* Garcin de Tassy: *Histoire de la Litterature Hindoui et Hindustani*, Tome I, pp. 94-96.

† উর্দ্দু অনুবাদ, মুক্তাবাই প্রেস, লাহোর।

‡ কবীর ও যোগী:—

মথবা মুড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৈলে
গীতা, বাঁচি কৈ হোই গৈলে [...]

কবীর ও মূর্ত্তিপূজা

পাইন [পাথর] পূজে হরি মিলৈঁ, তো মৈঁ পূজুঁ পহার।

পড়িল; পরাজয়ের অপমান ও অবসাদ তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য যাত্রার পথে হীরাবাঈর রূপের পেয়ালা পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন; ইহার পরে গোলকুণ্ডা-বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়্‌যন্ত্র তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ী মনের খোরাক যথেষ্ট জোগাইতেছিল। দারা ও আওরঙ্গজেবের রুচি ছিল বিভিন্ন; সুতরাং তাঁহাদের মনোব্যাধির ঔষধও স্বতন্ত্র। দারা প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, পুস্তক রচনা, সূফী ধ্যান-ধারণায় সময় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার ছিল ধর্ম্মের বাতিক এবং সাধু-ফকীরদের সহিত তত্ত্বালাপ করিবার নেশা। বোধ হয় বিমর্ষচিত্ত দারাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহভাজন ফার্সী ভাষায় সুকবি মুন্‌শী চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ এই সময়ে সাধু বাবালালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময় বাবালাল লাহোর শহরের বাহিরে কোতল-মেহরান্* নামক মহল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন। রায় চন্দ্রভান বাবালালের এক জন ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। লাহোরের নিউলা† [নৌলাখা] মহল্লায় অবস্থিত চন্দ্রভানের হাবেলীতে দারা ও বাবালালের সাক্ষাৎকার সম্ভবতঃ এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ঘটিয়াছিল। প্রকাশ্য সভায় সকাল বিকাল দুই বার নয় দিন পর্য্যন্ত বাবালাল ও দারার শাস্ত্রালাপ ও তত্ত্বকথালোচনা হইয়াছিল। বিচারের প্রারম্ভে স্থির হইয়াছিল উভয় পক্ষ যেখানে শাস্ত্রবিষয়ক কোন কথা উদ্ধৃত করিবেন, উহার নির্ভুলতা প্রমাণের জন্য দরকারী পুস্তক হাতের কাছে রাখা হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও শাহজাদার পাণ্ডিত্যাভিমান কিছু কিছু ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি পণ্ডিতগণের সাহায্যে হিন্দু দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন; এবং তাঁহার পুস্তকাগারে নানা ভাষার লক্ষাধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার এক অংশ সফরের সময় শাহজাদার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। প্রথম কয়েক দিন পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া স্বয়ং শাহজাদাই হয়রান হইয়া পড়িলেন।

* লাহোর গেজেটিয়র পুস্তকে (পৃ. ১৯২) কুই-মিরান্ নামক লাহোরের এক শহরতলীর উল্লেখ আছে। ইহাই সম্ভবতঃ কোতল-মিহরান।

† লাহোরের রেলষ্টেশন এবং নূতন শহরের চৌরাস্তা [Mall] মধ্যবর্ত্তী স্থানে নৌলাখা মহল্লা অবস্থিত ছিল (লাহোর গেজেটিয়র, পৃ. ১৬৪)। 'নিউলা'র কোন উল্লেখ গেজেটিয়রে নাই। বোধ হয় নৌলাখাই নিউলার শুদ্ধ নাম।

অবশেষে তিনি বাবালালের কাছে প্রস্তাব করিলেন পুঁথির নজীর প্রমাণ দরকার নাই।*

(৩)

দারা ও বাবালালের নয় দিন ব্যাপী বিতর্কের স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারে না। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সংশয় এবং সাধনার বিভিন্ন স্তরের উপর আলোকপাত করিতে পারে এরূপ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর মাত্র আমরা উদ্ধৃত করিব।†

অথ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা

দারা—নাদ এবং বেদের মধ্যে বিভিন্নতা কি?

বাবালাল—বাদ্‌শাহ এবং বাদশাহী হুকুমের মধ্যে যে পার্থক্য, এই উভয়ের মধ্যেও সেই পার্থক্য।

[অর্থাৎ "নাদ" ব্রহ্ম; "বেদ" তাঁহারই বাণী। ইস্‌লামে "আল্লা" এবং "কালামুল্লা"র (কোরাণশরীফ) মধ্যে বিভিন্নতার তুলনা করাই বোধ হয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল]

* "If it be necessary in every question and answer to quote word for word the terms mentioned in the book present here, where will we not be carried by this process? Because it will be necessary to peruse them, to stop for a moment to search for them. Now over conversation is aimed at the heart, it is then in our hand to take rest; we will be satisfied by it, and the truth, when discovered will be precious to us."

† সেকালে ষ্টেনোগ্রাফি না থাকিলেও শর্টহাণ্ড ছিল—পাকা মুন্‌শীরা দরবার-মজলিসে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ শিকস্তা অর্থাৎ ভাঙ্গা উর্দ্দুতে অতি তাড়াতাড়ি লিখিয়া যাইত। লাহোরে নয়-দিনব্যাপী সভায় দারা এবং বাবালালের প্রশ্নোত্তর যদুদাস বা যাদব দাস ক্ষেত্রী নামক এক মুনশী তাঁহার খসড়া-বহিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দারা ও বাবালাল দু-জনেই উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। এই উর্দ্দু খসড়া কিছু দিন পরে রায় চন্দ্রভান্ ফার্সী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দারার অনুরোধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের নাম 'নাদির্-উল্-নুকাৎ'। কালক্রমে ইহাই পুনরায় উর্দ্দুতে অনুবাদ হইয়াছে—অনুবাদের নাম 'রিসালা-ই-উম্‌লাহ ওয়া আজুবাহ্-ই-দারা শুকো ওয়া বাবালাল'। সর্ব্বপ্রথম সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব এই পুস্তক সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (*Asiatic Researches*, XVII, p. 296.) কিছু দিন পূর্ব্বে ফরাসী পণ্ডিত হুয়ার্ট (Huart) এবং ম্যাসিনো (L. Massignon) একাধিক পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই পুস্তকের পাঠোদ্ধার এবং উহার ফারসী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন (*Journal Asiatique*, 1926: Oct. Decr.)। কিন্তু মনে হয় 'নাদির-উল্-নুকাৎ', তিন নকলে আসল খাস্তা অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অনেক স্থলে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে গরমিল এবং বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট ও অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশিত মূল ও অনুবাদ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্নগুলি বিষয়ক্রম হিসাবে মূল হইতে ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

দারা—পবিত্র "ওম্" শব্দ উচ্চারণ করিলে মানুষ কি স্বর্গে যায়?

বাবালাল—বস্তুতঃ শব্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ওম্ উচ্চারণ করিবার ফল এরূপই বটে। এক রকম ছাপ থাকিলেও যিনি আসল ও মেকী চিনিয়া লইতে পারেন, যাঁহার জ্ঞান মলিন-ও পঙ্গু হয় নাই তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা।

দারা—"পরমাত্মা" কি এবং "জীবাত্মা"ই বা কি? "জীবাত্মা" কেমন করিয়া পুনরায় পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়?

বাবালাল—জল হইতে মদের উৎপত্তি; কিন্তু মদ যখন মাটির উপর ঢালিয়া ফেলা হয় উহার মধ্যে দূষণীয় পদার্থ—নেশা অপবিত্রতা—যাহা কিছু থাকে সমস্তই মাটির উপরিভাগে থাকিয়া যায়; কিন্তু জল মাটির নীচে গিয়া আবার বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। "জীবাত্মা" যতক্ষণ মানুষের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তাহারও সেই অবস্থা। কিন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহের ময়লা (অর্থাৎ কর্ম্ম এবং উহার দোষগুণ) ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে সে পুনরায় "পরমাত্মা"র সহিত এক হইয়া যায়।

দারা—"আত্মা" এবং "পরমাত্মা"র মধ্যে কি প্রভেদ?

বাবালাল—মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।

দারা—তাহা হইলে শাস্তি ও পুরস্কার কেন দেখিতে পাওয়া যায়?

বাবালাল—এই সমস্ত দেহের ধর্ম্ম ("তাসির"); দাগ দেহকেই চিহ্নিত করে—যেমন গঙ্গা এবং গঙ্গার জল।

দারা—এই উদাহরণ দ্বারা কি পার্থক্য সূচিত হয়?

বাবালাল—এই পার্থক্যের অনেক দিক্ আছে এবং উহা অসংখ্য। মোট কথা, গঙ্গাজীর জল যদি একটি কুজাতে রাখা যায় এবং এক ফোঁটা শরাব উহার মধ্যে পড়ে তাহা হইলে ঐ জল শরাবের মত হারাম ও অপবিত্র হইয়া যায়। অপর পক্ষে, যদি গঙ্গানদীতে শত সহস্র কলসী মদ ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবুও গঙ্গার জল অপবিত্র ও দূষিত হয় না—গঙ্গাজী গঙ্গাই থাকিবেন।

দারা—"স্রষ্টা" এবং "সৃষ্ট জীব"—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? এই প্রশ্ন আমি কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁহারা বলেন—গাছ ও বীজের মধ্যে যে প্রভেদ; ইহা কি ঠিক না অন্য রকম?

বাবালাল—"স্রষ্টা" যেন মহাসমুদ্র; "সৃষ্ট জীব" জলপূর্ণ একটি ঘট। যদিও মহাসমুদ্র এবং ঘট—উভয়ের আধেয় বস্তু একই পদার্থ (অর্থাৎ জল), কিন্তু আধারদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী। সেই প্রকার, স্রষ্টা স্রষ্টাই বটেন; সৃষ্ট জীব জীব মাত্র।

দারা—হিন্দুদের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা কি রকম ধর্ম্ম? কে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছে?

বাবালাল—এই প্রথা দিলকে (হৃদয়কে) মজবুত করিবার জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছে সে এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম জানিতে পারে নাই, সে এই জাহিরী সুরৎ বা বাহ্যিক রূপকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা—ছোট ছোট অবিবাহিতা বালিকারা পুতুল লইয়া খেলা করে, কিন্তু বিবাহের পর আর পুতুল খেলা খেলে না। মূর্ত্তিপূজাও এই রকম ব্যাপার। যে পর্য্যন্ত কেহ "বাতিন্" অর্থাৎ আসল গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারে না সে পর্য্যন্ত লোক বাহ্যিক আকৃতির প্রতি আসক্ত থাকে। মূর্ত্তির ভিতর কি আছে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি বাহিরের দিক্‌টা বর্জ্জন করেন।

দারা—হিন্দুদের পুস্তকে লেখা আছে, যাহারা কাশী-বারাণসীতে দেহত্যাগ করে তাহারা নিশ্চয়ই "মোক্ষ" লাভ করে। যদি ইহাই হয়, তবে ধর্ম্মাত্মা ও পাপীর অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না।

বাবালাল—বাস্তবিক পক্ষে "কাশী" বলিতে ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের "পূর্ণাবস্থাকে"ই বুঝায়। যিনি ঐ পূর্ণাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করেন।

দারা—প্রত্যেক মানুষ জীবন লাভ করিয়াছে; সুতরাং প্রত্যেকেই মোক্ষ লাভ করিবে?

বাবালাল—"মহাপুরুষ" ব্যতীত কেহ জীবনের পূর্ণতা (কামনাশূন্য) অবস্থায় মরিতে পারে না; অপরন্তু মানুষ "বাসনা" লইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে। "বাসনা" (খ্বায়েশ) ও 'আসল সত্ত্বা" (ওজুদ) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী। কারণ, বাসনা মানুষের মধ্যে আরও বহুবিধ বাসনা জাগাইয়া তোলে এবং এই কারণে মানুষ মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না।

দারা—হিন্দু ধর্ম্মমতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আসল রূপ ব্রজধামে গোপীগণের নিকট প্রকটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ রূপ মানুষ কি দেখিতে পারে?

বাবালাল—যাহারা সংসারের প্রতি আসক্ত, এই অশরীরী রূপ তাহাদের দর্শনীয় নয়;......মানুষের মধ্যে যে-সমস্ত ফকীর সাধুপুরুষ দেহের মধ্যে সমস্ত বাসনাকে

দমন করিয়াছেন, ভাবাবেগ স্তব্ধ অথচ প্রাণবন্ত রাখিতে জানেন—যেন নিজের মন এদিক-ওদিক না যায়—এই অশরীরী রূপ কেবল তাঁহাদের পক্ষেই অভিগম্য।

দারা—রামায়ণে [অধ্যাত্ম রামায়ণ ?] বলা হইয়াছে শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, উভয় পক্ষে বহু সৈন্য মারা গিয়াছিল; যখন "আব-ই-হয়াৎ" বা অমৃত উহাদের উপর সিঞ্চিত হইল তখন শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণ নূতন জীবন পাইয়া খাড়া হইল অথচ রাবণের ফৌজ মৃত পড়িয়া রহিল। যদি সিঞ্চিত বস্তু অমৃত না হইত, উহা সমস্ত মরা মানুষের উপর না পড়িত এবং শ্রীরামচন্দ্র অন্য মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইতেন, তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু কতকগুলি বাঁচিয়া উঠিল অন্যগুলি বাঁচিল না; উহা কেমন ব্যাপার ?

বাবালাল—যে হেতু রাবণের সৈন্যগণ দিনরাত কেবল শ্রীরামচন্দ্রকেই চিন্তা করিয়াছিল এবং মরিবার সময়ও শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনা ভাবিয়াছিল তাহারা নিষ্পাপকল্পনা এবং বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণের ন্যায় মুক্ত হইয়া গিয়াছিল; সেজন্য তাঁহাদের আত্মা মৃতদেহে পুনরায় ফিরিয়া আসে নাই।

দারা—রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন; অথচ সীতার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ঘটিল না, ইহা কি রকম ?

বাবালাল—বস্তুতঃ সীতা ছিলেন মূর্ত্তিমতী অকৃত্রিম ন্যায়, রাক্ষসের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্পর্শ ঘটে নাই।

দারা—রাবণ যখন নিজগৃহে সীতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন সীতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। তবে রাবণ এই পবিত্র ন্যায়ের ক্রোধাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল না কেন ?

বাবালাল—প্রকৃত পক্ষে সীতা ছিলেন পূর্ণা প্রকৃতি [স্থফী মতে "ইন্‌সান-ই কামিল"—রাগ-দ্বেষ বর্জ্জিত পূর্ণ জীব]। স্থতরাং তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে না।

দারা—ফার্সি পুস্তকে লেখা আছে সৃষ্টির উপাদান চারি ভূত—মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু দ্বারা খোদাতালা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; পরন্তু হিন্দুদের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ পঞ্চভূতের সমষ্টি। পঞ্চম উপাদানটি কি ?

বাবালাল—···পঞ্চম ভূত "আকাশ" (শব্দগুণাত্মক) যাহাকে শ্রবণ-শক্তি বলা হয় এবং যাহা দ্বারা ভাল মন্দ অনুভব করিতে পারি। শ্রবণ-শক্তি আমাদিগকে খোদাতালার দিকে আকৃষ্ট করে···।

দারা—যে ব্যক্তির কদর্ (পুরুষকার) আছে তিনি প্রকৃতই অসাধারণ মানুষ; পুস্তকাদিতে ইহাও বলা হইয়াছে যাহার কদর আছে তিনি অতিশয় সুখী, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা ব্যাখ্যা করা যায় ?

বাবালাল—কদর নিজেই খোদাতালা···এবং উহা খোদাতালা কর্ত্তৃক সৃষ্টও বটে।

দারা—উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে আমরা কেমন করিয়া ইহার অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি ?

বাবালাল—যতক্ষণ সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে, ততক্ষণ কদর মায়ের মধ্যে থাকে···যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কদর অর্দ্ধেক সন্তানের মধ্যে চলিয়া যায়; অপর অর্দ্ধেক খোদার রহমৎ রূপে মায়ের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করে। সন্তান কাঁদিয়া উঠিলেই মা দুধ দিয়া থাকেন। শিশু যখন বয়স্ক হইয়া উঠে, রিপু ও বাসনার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হয় এবং ভালমন্দের সংস্পর্শে আসে, তখন সে স্বয়ং পূর্ণ কদর্ হইয়া যায়। কারণ খোদাতালা ভালমন্দের বহু উর্দ্ধে।

দারা—"দিল" (অন্তঃকরণ) যাহা দেখা যায় না, তাহার রূপ কি প্রকারে ?

বাবালাল—উহা বায়ু-প্রবাহের ন্যায়।

দারা—"দিলে"র কার্য্য কি ?

বাবালাল—ইহা আমাদের মনের দালাল [মন এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যস্থ]।

দারা—দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই শরীরের উপাদানভূত শক্তিসমূহকে বলবান্ করিবার নিমিত্ত পান, আহার, দর্শন, শ্রবণ, শয়ন ইত্যাদি কার্য্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পরিচালনা করে, এমন কি যাহারা বিশুদ্ধাত্মা তাঁহারাও এই সমস্ত বিষয়ে ইহাদের অর্থাৎ প্রাকৃত জনের সমধর্ম্মী—যদিও মাত্রায় কিছু কম। তাহা হইলে সাধারণ মানুষ এবং বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বাবালাল—মনের অবস্থার বিভিন্নতাই পার্থক্যের পরিমাপ। যাঁহারা বিশুদ্ধাত্মা, তাঁহারা মনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং সাংসারিক ভাব ও চিন্তা পরিহার করেন। উদাহরণ—এক জন যুবা এবং একটি বালক ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার অর্থাৎ ভোজন শয়ন দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি কার্য্য সম্বন্ধে সমধর্ম্মী; কিন্তু তৎসত্বেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই বিষয়ে দেখা যায়, যদি এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক একটি বালককে কোলে করে উহা আপত্তিকর হয় না; কিন্তু পরিবারের সহিত অপরিচিত কোন যুবক যদি তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে তাহা হইলে শত পাপ

হয়। তদ্রূপ যাঁহাদের আত্মা পাপশূন্য তাঁহাদের অবস্থা শিশুর মত নিষ্পাপ।

দারা—কোন্ অবস্থায় বলা যায় ফকীর দুনিয়া হইতে ফারেগ (বন্ধনমুক্ত) হইয়াছে?

বাবালাল—প্রাণী মাত্রই ভোজন, পান, দর্শন, শ্রবণ, শয়ন ইত্যাদি নিত্যই করিয়া থাকে। তাহারা এ সমস্ত বিষয়ে অসহায়ভাবে আসক্ত এবং বদ্ধ। কিন্তু যিনি এই সমস্ত কার্য্য অনাসক্তভাবে করিয়া থাকেন এবং ভোজনাদির অভাব ঘটিলেও যিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা দুনিয়া হইতে "ফারেগ" বা মুক্ত মনে করি।

দারা—মালিক (খোদাতালা) বান্দার এবাদৎ (প্রার্থনা ও ধর্ম্মকার্য্য) কবুল করিয়াছেন কি না কেমন করিয়া জানা যায়?

বাবালাল—ফকীর যদি নিজের ফকীরির বড়াই না করিয়া বলে—আমার এবাদৎ কিছুই নয়, অতি সামান্য; তখন আমাদের বুঝা উচিত এই ব্যক্তি যাহা হউক কিছু কাজ করিয়াছে। অন্যথা যে ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করে এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, তখনই আমরা মনে করিব এই ব্যক্তির এবাদৎ তাহার কাছেই রহিয়াছে—উহা কবুল হয় নাই (ইহা সূফীদিগের রীয়া বা আত্মাভিমান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর)।

(৪)

শাহজাদা প্রকৃত জিজ্ঞাসুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত বাবালালের সঙ্গে নানাবিষয়ক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা 'তজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' পুস্তকে বর্ণিত বাদশাহী দরবারে হিন্দু পণ্ডিতগণের মুণ্ডপাত, অথবা কবি ভারতচন্দ্র-কল্পিত ধর্ম্মবিষয়ে জাহাঙ্গীর কর্তৃক ভবানন্দ মজুমদারের জেরা ও মজুমদারের নির্ভীক পাল্টা জবাব নহে। এই সাক্ষাৎকারের ফলে দারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া কিছু দিন পরেই একাগ্রমনে শাস্ত্রালোচনা এবং হিন্দুদর্শনাদি অনুবাদের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাবালাল পাইয়াছিলেন একজন ভক্তিমান্ উপযুক্ত শিষ্য। *

* দারা মুখ্যতঃ হজরত মোল্লা সাহ বদক্‌শীর মুরীদ হইলেও তত্ত্বজ্ঞান-আহরণে তিনি ভ্রামরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার একাধিক গুরু ছিল। বম্বে শহরের প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মিউজিয়মে দারার গুরুবৃন্দের একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম। উহার মধ্যে একটি বাবালালের ছবি বলিয়া মনে হয়।

বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, হিন্দু ও মুসলমান একেবারে বিপরীতধর্ম্মী; তেল আর জলের মত দুই সম্প্রদায় কিছুতেই মিশ খাইবে না। এ বিষয়ে মোল্লা ও পণ্ডিত উভয়েই একমত। বিরোধে ঘৃতাহুতি দেওয়া যত সহজ, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মে সাম্যমৈত্রীর মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে উভয়ের মিলন কার্য্যকরী করিয়া তোলা তেমনই কঠিন ও বিঘ্নসঙ্কুল। বিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নির ধ্বংসলীলা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষে কবীর-নানক, আকবর-আবুলফজল, দারা-বাবালাল, মজহর-রামমোহন* বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃথাই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের বাণী প্রচার করিতেছেন। এই সাম্প্রদায়িক ব্যাধির চিকিৎসা-বিভ্রাটে ঐতিহাসিক স্থিরচিত্তে বসিয়া শুনিতেছে ইতিহাসের সেই অনাহত ধ্বনি—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—অন্য পথ নাই! আকবরের "সুলহ্-ই-কুল" (Peace with all) ব্যতীত হিন্দু-মুসলমানের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

মনের বন্ধনদশা না ঘুচিলে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা এ দেশে স্থায়ী হইবার নয়। শাহজাদা দারার নিগমবোধ-প্রাসাদ দিল্লী নগরীর ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার উদাত্ত নিগমবাণী আজও ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দারার ছিন্নমুণ্ড হুমায়ুঁ-মক্‌বরার মিনার হইতে আজও যেন সকরুণ স্বরে আজান দিতেছে—"বিস্‌মিল্লহ্...

তাঁহারই নামে যাঁহার কোন নাম নাই, কিন্তু যিনি যে নামে ইচ্ছা নিজকে প্রকটিত করেন; [দৃশ্যতঃ পরস্পর-বিরোধ-ভাবাপন্ন ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্ম জুল্‌ফদ্বয়ের [অলকগুচ্ছ] ন্যায় যাঁহার নিরুপম মুখমণ্ডলে শোভা পাইতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে কোন একটি পর্দ্দার মত তাঁহার মেহেরবান্ চেহারাকে ঢাকিয়া ফেলে নাই; ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়ই যাঁহার তালাশে ফিরিতেছে...।"†

ইতিহাস কবির সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছে, "রে মৃত ভারত, শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।"

* মির্জ্জা জান্-জানান্ মজহর দিল্লীবাসী ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে; ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি এক প্রসিদ্ধ সূফী-সাধক ও কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনী ও রচনাবলী পড়িলে মনে হয়, শাহজাদা দারা যেন দ্বিতীয় বার দিল্লীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

† দারা-কৃত 'মজমুয়া-অল্-বহারিন' [দুই সাগর-সঙ্গম] পুস্তকের নমস্ক্রিয়া হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষত

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শঙ্কর ঘোষের বৈঠকখানায় জমাটি আড্ডা বসেছে। শঙ্কর অবশ্য জমিদার মানুষ, বড়লোক। তাকে চাকরি করতে হয় না। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধব বলতে যারা, তাদের সবাই চাকুরে। তাদের কেউ ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে। সকাল ন'টায় খেয়ে বেরোয় আর রাত্রি আটটায় ফেরে। আবার কেউ বা কলকাতাতেই মেসে থাকে। শনিবার বিকেলে বাড়ী আসে। রবিবারটা থেকে সোমবার সকালের ট্রেন ধ'রে আপিস করে।

সুতরাং রবিবারের সকালে এবং সন্ধ্যাতেই আড্ডাটা জমে বেশী। শনিবার সন্ধ্যা এবং রবিবার দুপুরটাও একেবারে নিরামিষ যায় না। কেউ না কেউ আসেই। প্রকাণ্ড হল-ঘরে লম্বা ফরাস পাতা। কোথাও তাস, কোথাও পাশা, কোথায় দাবা চলছেই। রাত এগারোটা, বারোটা, একটা পর্য্যন্ত। তার সঙ্গে চলছে চা, পান, তামাক। এই সব যোগাতে রঘু চাকর হিমসিম খেয়ে যায়।

শঙ্করের যে তাস-পাশার বাতিক খুব বেশী তা নয়। লোকজন না থাকলে সেও অবশ্য খেলায় বসে। তার পরে কেউ এলেই তার হাতে খেলা দিয়ে এক পাশে বসে। তার সঙ্গী মনোমোহন। মনোমোহনকে যুদ্ধবিশারদ বলা যেতে পারে। অতি নিরীহ এবং শীর্ণ চেহারা। কিন্তু কলকাতার আপিস এবং পল্লীর গৃহের বাইরে তার গতিবিধি নেই। কিন্তু ব্রেষ্ট-লিটভস্কে কি যুদ্ধ চলছে, জার্ম্মান কামানের ওজন কত, কাইটেলের যুদ্ধের নতুন টেকনিকটা কি, এই সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব তার নখদর্পণে। তার উপর তার গল্প বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে, চোখের তারা কখনও উপরে, কখনও নীচে নামিয়ে সে যখন যুদ্ধের বর্ণনা করে, তখন গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। মনে হয়, সঞ্জয়ের মত সে যেন দিব্যচক্ষে সমস্ত নিরীক্ষণ করছে আর বর্ণনা করছে।

কিন্তু যুদ্ধের সম্বন্ধেই যে শঙ্করের খুব আগ্রহ আছে তাও নয়। তবু সেদিনের সান্ধ্যসংস্করণ খবরের কাগজখানা বগলে নিয়ে মনোমোহন ঘরে ঢুকতেই শঙ্কর তাকে সাদরে নিজের পাশে ডেকে নেয়।

—কি খবর বল মনমোহন।

ব্যস। এর বেশী আর কিছু শঙ্করকে বলতে হয় না। দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মত মনোমোহন অনর্গল যুদ্ধের ভূত-ভবিষৎ-বর্ত্তমানের কথা শুনিয়ে চলে। গলা শুকিয়ে গেলে কখনও চায়ে, কখনও তাম্বূলরসে সিক্ত ক'রে নেয়। তার আশ্চর্য্য গবেষণার কথা শঙ্কর কিছু শোনে, কিছু বা শোনে না। অন্যমনস্ক হ'লে মনোমোহনের কাঠির মত শক্ত আঙুলের ঠেলা খেয়ে মনোযোগের সঙ্গে শোনবার ভান করে মাত্র।

আসলে কিছুরই সম্বন্ধেই শঙ্করের উৎসাহ, আগ্রহ বা আকর্ষণ নেই। তারা এই গ্রামের বহু পুরুষের জমিদার। জমিদারী চালের অঙ্গ হিসাবে যেমন দেউড়িতে দারোয়ান আছে, সদরে নায়েব-গোমস্তা-কর্ম্মচারী আছে, আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পূজার দালানে বিগ্রহ আছেন, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ আছে, তেমনি বালাখানার এই আস্তানাটিও আছে। শঙ্কর থাকুক বা না থাকুক তাতে আড্ডার কোন অসুবিধা হয় না। চা-পান-তামাক অব্যাহত ভাবেই আসে। এও সেই পুরুষানুক্রমিক জমিদারীর শৃঙ্খলা। যে শৃঙ্খলা কলের মধ্যে আছে সেই শৃঙ্খলা। তার মধ্যে খুঁৎ নেই, কিন্তু প্রাণও নেই। যন্ত্রের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কাজ নির্দ্দিষ্ট ভাবে হয়ে যায়।

কিন্তু সমস্ত-কিছু সম্বন্ধে এই নিস্পৃহতার জন্যে শুধু যে তার জমিদারী নীল রক্তই দায়ী তা নয়। শঙ্করের বয়স পঁয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। সন্তানাদি হয় নি, আর হবার আশাও নেই। এই অট্টালিকা, দাসদাসী-পরিজন, জমিদারী, সমস্ত দেখতে দেখতে তার কাছে ফিকা হয়ে এল। তারও পরে যদি বা কর্ম্মশক্তি থাকত, দুর্দ্দান্ত গৃহিণী তাও নিলে হরণ করে।

সুকুমারী সত্যই দুর্দ্দান্ত গৃহিণী এবং সুকুমারীই তার সংসারের কেন্দ্র। তারই আকর্ষণে প্রভু থেকে ভৃত্য পর্য্যন্ত সবাই ঘুরছে। কে কি খাবে, কে কি পরবে, কে কোথায় শোবে—সমস্ত স্থির করার ভার সুকুমারীর। সে যা স্থির ক'রে দেবে তাই হবে। সুকুমারীর সন্তান নেই। তার তাড়নায় এই পরিবারের

বুড়ো থেকে ছেলে পর্য্যন্ত সবাই খোকাতে পরিণত হয়েছে।

যে রবিবারের কথা বলছি, সে দিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে অবিরত ধারায়। দেখতে দেখতে পথ বেয়ে হু-হু শব্দে জলস্রোত বইতে লাগল। আকাশে কালো মেঘে যেন মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে। আকাশ একেবারে মেঘে-মেঘে ঠাসা—কোথাও এতটুকু ছিদ্র নেই। বজ্রের গর্জ্জনে, বৃষ্টির নর্ত্তনে, বিদ্যুতের হাস্যে পৃথিবীর রূপ একেবারে বদলে গেল।

যারা পাশা খেলছিল তারা হয়তো বৃষ্টির কথা জানতেই পারলে না। তাদের মুহুর্মুহু চীৎকারে বজ্রের গর্জ্জনও ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু তাসের দল বাইরের দিকে চেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল:

—তাই তো হে! বৃষ্টি সহজে ছাড়বে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর হেসে বললে, নাই ছাড়ল! জলে তো আর পড় নি।

—যা বলেছ! খিচুড়ি লাগাও দাদা!

মনোমোহন সেই স্তিমিত আলোয় খবরের কাগজখানা চোখের পুরু চশমার একান্ত সন্নিকটে এনে বোধ করি জার্ম্মানদের ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিল। খিচুড়ির নামে সেও সোজা হয়ে বসল।

বললে, ঘাবড়াও মৎ ব্রাদার! অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছি, তখন উপোসে কাটবে না। লুচি হোক, পোলাও হোক, খিচুড়ি হোক, একটা কিছু হবেই। এমন বর্ষা মিথ্যে যাবে না।

মিথ্যে যায় না কোনো দিনই। আজও গেল না।

শঙ্কর ভিতরে খবর পাঠাবার পূর্ব্বেই রঘু চাকর এসে সুসংবাদ দিয়ে গেল, বাবুমশায়রা কেউ যাবেন না। খিচুড়ি হচ্ছেন।

ক্রমাগত ভদ্র-সহবাসের ফলে রঘুর কথাবার্ত্তায় ভদ্রতার পরিমাণ একটু বেশী হয়েছে।

উপস্থিত খেলোয়াড়বৃন্দ এই সংবাদে চীৎকার করে বাইরের দুর্য্যোগকে পর্য্যন্ত চমকে দিলে। সবাই বললে, এ আমরা আগেই জানতাম। অন্নপূর্ণার মন্দিরে এসে... ইত্যাদি।

তারা অত্যুক্তি করে নি। মাঝে মাঝে লোকজনকে খাওয়ানো সুকুমারীর একটা রোগ বললেই হয়। সাধু-সন্ন্যাসী, অন্ধ-আতুর, এক জন দু-জন প্রত্যহই আছে। আর স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের তো কথাই নেই। কখনও শীতের জন্যে, কখনও শীত না থাকার জন্যে, কখনও বর্ষার জন্যে, কখনও বর্ষা নেই ব'লে তাদের জন্যে একটা-না-একটা কিছু মাঝে মাঝে হচ্ছেই। ওরা যখন অন্নপূর্ণা ব'লে ডাকে, সুকুমারীর বড় ভাল লাগে। খেতে বসে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বার বার ওরা যখন স্তুতি করে, আড়াল থেকে তাই শুনে ও খুব আনন্দ পায়।

বন্ধুদের উদ্দেশে ভুরিভোজনের সুসংবাদ জানিয়ে রঘু শঙ্করকে বললে, আপনাকে মা ওপরে ডাকছেন।

শোনামাত্র বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল।

বললে, কেন?

—তা জানি নে।

বন্ধু মহলে ব'সে থাকলে সুকুমারী যখন এমনি ক'রে হুকুম পাঠায় শঙ্কর তখন বড় লজ্জা বোধ করে। লজ্জায় সে বন্ধুদের মুখের দিকে চাইতে পারে না। তার মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সকলের ঠোঁট হাসিতে বঙ্কিম হয়ে উঠেছে, সকলের চোখে চোখে একটা কৌতুকের ইঙ্গিত খেলে যাচ্ছে।

শঙ্করের জীবনে এইটেই আশ্চর্য্য! ছ'ফুট দীর্ঘ তার দেহ। ধবধবে রঙ, কটা চোখ, মাথায় বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গালের আধখানা পর্য্যন্ত জুলফি, মোম দিয়ে মাজা গোঁফ। এ অঞ্চলে এত বড় শিকারী, আর এত বড় ঘোড়-সোয়ার নেই। কর্ম্মচারী এবং প্রজারা তার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করে না। তার মোটা ভারী কণ্ঠের আহ্বানে সব তটস্থ হয়। আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় রাশভারী এবং শক্তিমান্ লোক হয়েও শঙ্কর সুকুমারীর কাছে একেবারে কেঁচো। অথচ সুকুমারীর চেহারা মোটেই জাঁদরেল গোছের নয়। সে নিতান্তই ছিপছিপে, বেঁটে একটি মেয়ে। তবু তারই ভয়েই শঙ্কর সব সময় সন্ত্রস্ত।

সুকুমারীর সামনে এসে দাঁড়ালেই শঙ্করের তেজ, দর্প এবং শক্তি কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়। তার সামনে অপরাধীর মত সে যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সুকুমারীকে সে যে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি মাতৃত্ব দিতে পারে নি এইতেই সব সময় সে সন্ত্রস্ত এবং মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য সাপের মত নিস্তেজ হয়ে থাকে, কিছুতেই মাথা তুলতে পারে না।

চাকরের মুখে সুকুমারীর আহ্বান শুনে সে সকলের দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে দ্বিধা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে তার লজ্জা করছিল।

মনোমোহন বললে, যাও না হে! তলব যখন এসেছে ...ভয়টাই বা কি! মারবেন না তো!

শঙ্কর হাসতে হাসতে উঠে অন্দরে চলে গেল।

অন্দরে প্রবেশ করামাত্র সুকুমারী শঙ্করকে টানতে টানতে উপরে নিয়ে এল।

বললে, যত বুড়ো হচ্ছ তত তোমার আক্কেল বাড়ছে না কমছে?

বিব্রত ভাবে শঙ্কর বললে, কি করলাম?

—কাল ভোর বেলায় ওই রকম ক'রে কাশছিলে আর আজকেই···

—আমি?

—আজ্ঞে হাঁ মশাই! ঘুমোও যখন জ্ঞান তো থাকে না! সে কী কাশি! আর এখন বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ওই পাংলা গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে বেশ আড্ডা দিচ্ছিলে! লজ্জাও করে না!

শঙ্কর বুঝলে, তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ভোরের বেলায় সে হয়তো কেশে থাকবে। কিন্তু সে নিশ্চয় এমন কিছু নয়। সুকুমারীরও পরে আর এ নিয়ে খেয়াল ছিল না। এখন বৃষ্টি পড়তেই যখন খেয়াল হয়েছে তখন আর কোনোমতেই নিষ্কৃতি নেই।

শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ঐ ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিতে হবে তো? দাও।

শঙ্কর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। সুকুমারী তার ললাটের উত্তাপটা পরীক্ষা ক'রে নিজের হাতে তাকে ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটা পরিয়ে দিলে।

বললে, আর ঠাণ্ডায় নীচে যেতে হবে না। এইখানেই বসে থাক।

শঙ্কর আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল: বল কি! নীচে সব ব'সে রয়েছে যে!

—থাক গে বসে। ওদের জন্যে খিচুড়ি হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বৃষ্টি থামলেই চলে যাবে।

—ওরা নীচে রইল আর আমি এখানে বসে থাকব? সে কি হয়?

সুকুমারী অত্যন্ত চটে গেল।

বললে, বেশ হয়। তুমি আমাকে আর জালিও না বলছি। যা বললাম, তাই কর।

বলেই সে আর দাঁড়াল না। হন হন ক'রে বোধ হয় রান্নার তদারক করতেই নীচে চলে গেল।

শঙ্করের আর একটা কথা কইতেও সাহস হ'ল না। সে নিঃশব্দে টেবিলের উপর থেকে সুকুমারীর অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস টেনে নিয়ে আপন মনে পাতা ওলটাতে লাগল।

বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কাঁচের শার্সি-গুলো বৃষ্টির ভয়ে বন্ধ আছে। তাতে বৃষ্টির ছাট পড়ছে ছিপ্ ছিপ্ শব্দ ক'রে। শঙ্কর সেই রুদ্ধ গৃহকোণে ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে অসহায় ভাবে বসে বসে ঘামতে লাগল।

নীচে গিয়ে সুকুমারীর বোধ হয় দয়া হ'ল। বালাখানা থেকে ওদের চীৎকার ও হাস্যকৌতুক অন্দরে এসে পৌছুচ্ছিল। উপরের শয়নঘরে শঙ্কর একা বসে। আহা বেচারা! কিন্তু সুকুমারী কি ইচ্ছা ক'রে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? ভোরের দিকে কাশছিল যে! শরীর যে ওর মোটেই ভাল নয়! এতটুকু ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। এখনি হয়তো জ্বর হবে। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় সে দিন তো ঘোষেদের অমন চাঁদের মত ছেলেটা মারাই গেল!

ঘোষেদের ছেলেটার কথা মনে হ'তেই সুকুমারী শিউরে উঠল। তখনই সওয়া পাঁচ আনা পয়সা মা সর্ব্বরক্ষার নামে তুলে রেখে সুকুমারী উপরে এল।

শঙ্কর তখনও উপন্যাসখানির পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুকুমারী এসে হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে আর একবার ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করলে।

নাঃ, জ্বর নয়। মাঝে মাঝে এমন ভয় লাগে, মাগো! সুকুমারী মনে মনে আবার মা সর্ব্বরক্ষাকে প্রণাম করলে। কালই ভোগটা পাঠিয়ে দিতে হবে।

আশ্বস্ত হয়ে সে স্বামীর পাশে এসে বসল।

—পড়ছিলে বইখানা? ভারি সুন্দর লিখেছে। পড়তে পড়তে কেঁদে আর বাঁচি না। নবদুর্গার শাশুড়ী, কি দজ্জাল মাগী বাবা! আচ্ছা, সত্যি অমনি হয়? এই যে লিখছে···

সুকুমারী অপাঙ্গে একবার শঙ্করের দিকে চাইলে।

বললে, তোমার ভালো লাগছে না, না? নীচে অমন হৈ হৈ হচ্ছে, আর এখানে একা, বিরক্ত লাগছে, না?

শঙ্কর সাড়া দিলে না।

ওর মাথার চুলগুলো পরম স্নেহে ঠিক ক'রে দিয়ে সুকুমারী বললে, আচ্ছা যাও নীচে। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিও না। বেশীক্ষণ থেকোও না। বরং এই কম্ফর্টারটা বেঁধে নাও। কি বল?

সভয়ে শঙ্কর বললে, সর্ব্বনাশ! এই গরমে ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়েই ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তার ওপর কম্ফর্টার! রক্ষে কর!

সুকুমারী আবার রেগে উঠল।

বললে, ওই তো তোমার দোষ! ঠাণ্ডা লাগিয়ে

আমাকে খানিকটা কষ্ট দেবে এই তো মতলব? কিন্তু ভুগবে কে? তুমি না আমি?

হাসতে হাসতে শঙ্কর বললে, তুমি।

—তাই তো ভোগাচ্ছ! বিশ বচ্ছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একটি দিনের জন্যেও তুমি যদি আমাকে শান্তি দিয়ে থাক! তোমাকে নিয়ে চিরটা কাল আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম!

সুকুমারীর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

বললে, কিন্তু কম্ফার্টারটা না জড়িয়ে নিলে আমি কিছুতে তোমাকে নীচে নামতে দোব না। তাতে তুমি রাগই কর, আর যাই কর।

শঙ্কর রাগ ক'রে বললে, তাহ'লে থাক আর নীচে যাব না।

সুকুমারীও রাগ ক'রে বললে, সেই ভালো।

সে রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে শঙ্করের আর দেখাই হ'ল না। বন্ধুরা খেলার শেষে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কলরব করতে করতে খেয়ে গেল। শঙ্কর নীচে নেমেই এল না। তার খাবার উপরে এল।

বন্ধুদের মধ্যে একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাবু কোথায় হে চক্রবর্ত্তী?

চক্রবর্ত্তী উত্তর দেবার পূর্ব্বেই মনোমোহন বললে, বাবু কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে। খিচুড়িটা কেমন খাচ্ছ তাই বল?

—চমৎকার!

—বাস্‌। বাবু যেখানেই থাকুন, খিচুড়িটা চমৎকার হলেই হ'ল।

ওরা শঙ্করের অনুপস্থিতির জন্যে আর অভিযোগ করলে না। তার জন্যে অপেক্ষাও করলে না। নিজেরা খেয়ে নিয়ে কেউ বা সেই বৃষ্টিতেই কেউ বা বৃষ্টি থামলে বাড়ী চলে গেল।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল, শঙ্করের মাথাটা কেমন ভার বোধ হ'ল। সেই সঙ্গে ঘাড়েও কেমন ব্যথা। ঘাড় ফেরাতে পারছে না।

কিন্তু সে কথা সুকুমারীকে জানাতে তার ভয় হ'ল। এই নিয়ে সে এমন সমারোহ আরম্ভ করবে যে সে এক বিপদ। মাথা ভার হওয়ার জন্যে সে অবশ্য ভয় পায় না। মুখ-হাত ধুয়ে একটু গরম চা খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু ঘাড়ের যন্ত্রণাটা···যন্ত্রণার জন্যে নয়, সুকুমারীর কাছে লুকানো সম্ভব হবে কি না তাই ভেবেই সে চিন্তিত হয়ে উঠল।

চিন্তার কারণও আছে। আজকেই একটা গুরুতর ফৌজদারী মামলার তদারকের জন্যে তাকে সদরে যেতেই হবে। সদর দূরে নয়, মাইল দশেকের পথ। এই পথ সাধারণতঃ সে ঘোড়াতেই যায়। ঘোড়ায় যাওয়াই সুবিধা। কিন্তু সেই যে ভোরবেলাকার ঘুমের ঘোরের কাশি, তারই জন্যে ঘোড়ায় যাওয়া বন্ধ হয়েছে। ওঁকে পাল্কীতে যেতে হবে।

পাল্কীই সই। শঙ্কর তার যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে চাকরকে হুকুম দিয়েছে।

রঘু পাল্কীর ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসে বললে, স্নান করতে মা নিষেধ করলেন। শুধু মাথাটা ধুয়ে ফেলুন। খাবার তৈরী হয়েছে।

শঙ্কর মাথাটা ধুয়ে ফেলে খেতে বসল।

সুকুমারী পাশে বসে বাতাস করতে লাগল। ভদ্রলোক তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বোধ করি দুটি গ্রাস মুখে দিয়েছে, হঠাৎ সুকুমারী থমকে পাখার বাতাস বন্ধ করলে:

—তুমি অমন করছ কেন? ঘাড়ে কি হয়েছে? বেদনা নাকি? দেখি, দেখি?

শঙ্করের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল।

শুষ্ককণ্ঠে বললে, কিছু হয় নি তো?

সুকুমারী কপালে করাঘাত করলে, সে আঘাত যেন শঙ্করেরই গণ্ডদেশে এসে পড়ল।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, কিছু হয় নি ব'লে আমাকে ফাঁকি দেবে? একটি চোখ আমি দিবারাত্রি তোমার অঙ্গে বুলোচ্চি দেখতে পাও না? খুব জ্বলিয়েছ, ওঠ, আর খেতে হবে না।

বিব্রত ভাবে শঙ্কর বললে, শোয়ার দোষে ঘাড়ে অমন ব্যথা হয়। তাতে হয়েছে কি?

—তাতে কি হয় না-হয় সে আমি বুঝব। তুমি ওঠ দেখি। ওরে, বাবুকে এইখানেই একটু হাত ধোবার জল দে।

—কী আশ্চর্য্য ব্যাপার, সদরে আমার কঠিন মামলা রয়েছে যে!

সুকুমারী রেগে উঠল। বললে, দেখ আমাকে রাগিও না বলছি। মামলা থাকে থাক। আমি এখনি সরকার মহাশয়কে ঘোড়ায় সদরে পাঠাচ্চি। সেই সঙ্গে তিনি ডাক্তারও একজন ডেকে নিয়ে আসবেন।

—ডাক্তার!—বিস্ময়ে শঙ্করের চোখ কপালে উঠল—ডাক্তার কি হবে? বালিশটা রোদ্দুরে দিলে ঘাড়ের ব্যথা সেরে যায়। তার জন্যে ডাক্তার আনতে হবে! তুমি পাগল হ'লে না কি?

শঙ্করকে হাত ধ'রে টেনে তুলতে তুলতে সুকুমারী বললে, পাগল হই নি, এইবারে হব। তোমার হাতে প'ড়ে শেষ পর্য্যন্ত তাই আমার অদৃষ্টে আছে। তোমার যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তা'হলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।

ওর কণ্ঠ অশ্রুতে অবরুদ্ধ হ'ল।

শঙ্করের আর বলবার কিছু রইল না। তেলাপোকা যেমন ক'রে কাঁচপোকার অনুগমন করে, তেমনি ক'রে সে সুকুমারীর পিছু পিছু শয়নকক্ষে গেল। সেখানে সেই ফ্লানেলের পাঞ্জাবী আর পশমী কম্ফর্টার তার জন্যে অপেক্ষা করেই ছিল। সেইগুলো যথাস্থানে চড়িয়ে সে শয্যাগ্রহণ করলে।

সন্ধ্যা নাগাদ শহর থেকে ডাক্তার এল। সারারাত তিনি রইলেন। ব্যবস্থা হ'ল রকমারি ঔষধ এবং পথ্য, মালিশ এবং সেক। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার উৎপাতে শঙ্কর ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। দিনে-রাত্রে তার নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। রোগের যন্ত্রণা তো আছেই, তার চেয়ে বেশী হ'ল শুশ্রূষার যন্ত্রণা। ঔষধ যদি খাওয়া হ'ল তো পথ্য আছে। মালিশ যদি দেওয়া হ'ল তো সেক আছে। একটা শেষ হয় তো অন্যটা, দিনে এবং রাত্রে তার আর শেষ নেই। একটার পর একটা ঘড়ির কাঁটা ধরে পর্য্যায়ক্রমে আসছেই।

জেগে থাকলে সুকুমারী ঘুমোবার জন্যে মাথার দিব্যি দেয়। নিজের হাতে পাখা ক'রে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু শঙ্কর চোখ বন্ধ করলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে, ওগো তুমি কথা কইছ না কেন? অমন অসাড় হয়ে রইলে কেন? এই যে আমি বসে—আমার দিকে চাও। ওগো, আমার ভয় করে যে!

তখনই শঙ্করকে নিদ্রাতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইতে হয়। প্রমাণ দিতে হয় সে বেঁচেই আছে।

কিন্তু তাতেই কি রক্ষা আছে! শঙ্করের চোখ অমন লাল হ'ল কেন? ওর স্বাভাবিক চোখ অমন লাল তো নয়। এ আবার কী নতুন ব্যাধি! সুকুমারী আর পারে না। তারও বুক যেন কেমন করছে। স্নায়ু যেন ছিঁড়ে আসছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তার পরে চোখ মুছে উঠে তখনিই ডাক্তারকে আনতে লোক পাঠায়।

শঙ্কর সাত দিন এবং সাত রাত্রি এমনি অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করার পর ডাক্তারে অবশেষে তাকে সুস্থ ব'লে ঘোষণা করলেন। রকমারি ঔষধ, মালিস এবং সেক বন্ধ হ'ল। তার গলার কম্ফর্টার এবং গায়ের ফ্লানেলের পাঞ্জাবী খুলে নেওয়া হ'ল এবং এই গরমের দিনেও যে লেপখানা সকল সময় তার গায়ের উপর চাপান থাকত সেটাও তুলে নেওয়া হ'ল।

সাত দিন পরে শঙ্কর সুস্থ হয়ে বাইরে এসে বসল। তার ঘাড়ের ব্যথা সেরে গেছে। এই সাত দিন ধরে দিবারাত্রি স্নেহের যে অত্যাচার সে সহ্য করলে, মনের কোথায় তা যেন একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। সে ক্ষত আর কিছুতেই সারল না। সে সারবার নয়ও। অবশিষ্ট জীবনভোর সেই ক্ষত সুকুমারীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখাই হ'ল তার কঠিনতম কাজ—তার কঠোরতম সাধনা।

রবি-জিজ্ঞাসা

শ্রীরাধারাণী দেবী

আজকের যুগে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও কিছু বলার প্রকৃত মূল্য যে কতটুকু, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ, আমরা রবীন্দ্রযুগের মানুষ। আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বর্তমান। আজও তাঁর দিৎসা ক্লান্ত হয়নি; দানের অপূর্বতা সমভাবেই দীপ্যমান।

শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু হয়েচে আমাদের জীবনে। অক্ষর চিনবার আগেই পরিচয় হয়েচে রবীন্দ্রনাথের গান ও সরল পদ্য বা ছড়ার সঙ্গে। তার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে লাগলাম শ্রেণীর পর শ্রেণীতে গদ্যে ও পদ্যে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীরই মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত স্বাদু সুপথ্য আমরা পাঠ, আবৃত্তি, গান মুখস্থ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাভ করেচি।

আমাদের জীবনে আলো বাতাসেরই মতো একান্ত প্রত্যক্ষ অথচ অগোচরে তিনি আমাদের মনঃপ্রকৃতির গঠন ও পুষ্টিসাধন করেছেন। আজ আমরা যে-রুচি, যে-মন, যে-রসবোধ নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিচার করতে বসব, সে-মন যে তাঁরই রুচির আলোয় দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং লবণ-পুত্তলীর সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতো আমাদেরও সহজেই মিশিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রবীন্দ্রসাহিত্যের পারাবারে।

তাই মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের কাজ ভাবী কালের, বর্তমানের নয়। কারণ, এখনও আমরা তাঁর দানের প্লাবনে প্লাবিত, বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন অভিভূত।

বর্তমান কালের কর্তব্য তাঁর সার্বত্রিক সাহিত্যকে সযত্নে ও সাবধানে বিচয়ন করা। যে-কাজ ভবিষ্যৎকালের দ্বারা সম্ভব নয়।

'সার্বত্রিক' শব্দটি আমি যে-অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছি, খুলে বলি। সার্বত্রিক-সাহিত্য বা সর্বত্রব্যাপী সাহিত্য অর্থে বলতে চেয়েছি, বিশ্বভারতীর মুদ্রাযন্ত্রের বাহিরেও তাঁর যে মহামূল্য বিপুল দান ছড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে, তাদের বিচয়ন (অর্থাৎ—অনুসন্ধান, সংগ্রহ, একত্রকরণ ও সঞ্চয়) করে সাহিত্যলক্ষ্মীর ডালায় সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল বর্তমান কালের। যেমন, তাঁর অননুকরণীয় স্বকীয়তাপূর্ণ কথোপকথন, আলাপ আলোচনা। সুমধুর অথচ সুতীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ অথচ দ্ব্যর্থক রহস্যালাপ। জীবনের বিচিত্র অনুস্মৃতির মৌখিক ব্যঞ্জনা। বিভিন্ন মনীষী শিল্পী, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনেতা, নারী, ছাত্র, যন্ত্রী, সমাজকর্মী, বন্ধু, প্রার্থী, জিজ্ঞাসু, দর্শনাগী প্রভৃতির সঙ্গে তত্তদ্ বিষয়ে আশ্চর্য মেধা-প্রদীপ্ত সুন্দর আলোচনা ও আচরণ।

তাঁর দেশ-দেশান্তরে যাত্রার ছোট বড় সমস্ত ঘটনা; দেশবিদেশের নানা গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, রাষ্ট্রনেতা, সমাজ নেতা, রাজ্যাধিপতিদের সঙ্গে তাঁর মিলন ও আলাপের সুসম্পূর্ণ সুস্পষ্ট অনুলিপি। সমগ্র পৃথিবীর নানা সমাজের নানা জাতীয় মানুষদের কাছে যে কত রকমে সম্মান ও আদর পেয়েছেন, দেশে দেশে কতো রকমই যে তুচ্ছ ও বৃহৎ বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে, তার সামান্য অংশ মাত্রই ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি নিজে যেটুকু চিঠিপত্রে ডায়েরীতে বা অন্য রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বেশি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। কিন্তু নিজের বিপুল সম্মান সমারোহ ও সমাদর সম্বন্ধে ছোটখাটো ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে তাঁর স্বাভাবিক সংকোচের বাধা ঘটেছে, সুতরাং যতটুকু মাত্র তাঁর নিজের মুখে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ শোভন, তদতিরিক্ত সুসম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রমাণ বাঁদ পড়ে গেছে। এইগুলি ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োজনে বর্তমান কালের সদ্য-সদ্য অনুস্যূত করার দায়িত্ব ছিল। আজও আছে।

তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণ বর্তমানের পক্ষে সুকঠিন। নিকট-ভবিষ্যৎও এ পারবে বলে মনে হয় না। এ কাজে সমর্থ হবে দূর-ভবিষ্যৎ।

রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্ রূপে জানা অনায়াসসাধ্য নয়। তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। বহুমুখীনতার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ মাত্র একজন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর মধ্যে এক বিশাল মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান। যাদের সমন্বয় এক

বিরাট্ সংস্কৃতিকে মূর্ত করে তুলেছে। সেই বহুবিচিত্র জনতার উৎসবঅঙ্গনে আমরা কার দেখা না পাই? আছেন তার মধ্যে উদার জ্ঞানীপুরুষ, যাঁর জ্ঞান গভীরতায় অতল, ব্যাপকতায় যুগযুগান্ত পরিব্যাপ্ত। আছে চির সুকুমার কলভাষী শিশু, যার উল্লাস-কাকলিতে অপরিসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত কিন্তু অর্থ বা সংগতির দিকে খেয়াল নেই। তার মধ্যে আছেন প্রশান্ত ঋষি, যাঁর দৃষ্টিপথে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ত্রিকাল উদ্ভাসিত। আছে বলদৃপ্ত চিরনবীন যুবা, যার উদ্দীপনা ও অগ্রবেগের আজও বিরাম নেই। আছে কৌতূহলী চঞ্চল কিশোর বালক। তার মধ্যে আছে নব নব চারুকারুশিল্পী, আশ্চর্য প্রতিভাশালী নট, অসামান্য গায়ক, অপূর্ব সুরস্রষ্টা, অদ্ভুত রূপকার। তার মধ্যে বিদ্যমান বিচিত্ররূপিণী নারীপ্রকৃতি, যাদের দেখা পেয়েছি তাঁর কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, গানে, উপন্যাসে। এই জনতারই মধ্যে স্থির আত্মসংস্থায় অটল রয়েছেন এক নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক। যাঁর লক্ষ্য সামান্যে নিবদ্ধ নয়, বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎপ্রসারী। কোনও কারণেই যিনি সুদূর পরিণাম-বিস্মৃত নন্ এবং বর্তমানের ক্ষণিক উত্তেজনায় যাঁর স্নায়ু কখনই সাময়িক-চঞ্চল হয় না। এই জনসমারোহে আছেন অকৃত্রিম দেশসেবক, সমাজ-সংস্কারক, পল্লীউন্নয়নকারী গণ-সেবক। আছেন অনলস অক্লান্ত কর্মী-পুরুষ,—আছেন ঘর-পালানোমনা স্বপ্নলোকবিহারী কবি। আছেন অপরিণতমনা বালককুলের উপযুক্ত শিক্ষক; আছেন শিক্ষিত জ্ঞানপ্রার্থী ছাত্রদলের আচার্য। এই বিস্ময়কর জনকল্লোলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক উদাসী বৈরাগী বাউল। এঁর কোনও কামনা বাসনা নেই, গৃহের বন্ধন সমাজের শাসন নেই, পথে পথে ষড়ঋতুর তালে তালে আনন্দের গান গেয়ে বেড়ানোই একমাত্র কর্ম। মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে, হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে ফেরে এই ক্ষ্যাপা বাউল। বাংলার আকাশ বাতাস অনুরণিত হয়ে উঠেছে এর স্বকীয় গানে গানে আর নিজস্ব ভঙ্গীর সুরে সুরে।

শুধু এরাই নয়, আজও এই অশীতিতম বয়সেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক দল ছাত্র, তাদের অপরিসীম জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে অধ্যয়ন করে চলেছে। যাদের কেউ পাঠ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, কেউ পাঠ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন শাস্ত্র, কেউ পাঠ করে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আবার কেউ বা অধ্যয়ন করছে একান্ত অভিনিবেশে হোমিওপ্যাথি বাইওকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্র। সে-ছাত্র-দলের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের ছাত্রদের পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় ভূতত্ত্ব বা কৃষিতত্ত্বের ছাত্রকে।

এক জন কবির মধ্যে এই বিভিন্ন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-মণ্ডলী দেখে সত্যই আশ্চর্যে অভিভূত হতে হয়। মনে হয়, বিশ্বভারতী কবির কেবলমাত্র কল্পনারই সৃষ্টি নয়, অন্তরের প্রতিচ্ছবি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং অন্তর্লোকও যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে বিশ্বজগতের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিরাট্ দৃশ্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ নতশির না হয়ে থাকতে পারে না।

এই মহান্ জনতীর্থে আমরা দর্শন পেয়েছি, ধ্যানী মানবের, জ্ঞানী মানবের, কর্মযোগী মানবের, প্রেমিক মানবের, বিপ্লবী মানবের। দেখেছি রাজাধিরাজোচিত ভোগী, দেখেছি সর্বস্বত্যাগী অনাসক্ত পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পাই প্রকৃত অকৃত্রিম আভিজাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ—আবার তারই পাশেই দেখেছি এক জন নিরভিমান, ভিক্ষাপাত্রহস্ত, পথচারী মহাভিক্ষু।

ব্যষ্টি মানবের মধ্যে মানবপ্রকৃতির সমষ্টিরূপের এমন সাংস্কৃতিক সুন্দর প্রকাশ এর আগে বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে প্রাচ্যের অতলস্পর্শী জ্ঞানের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। আর তারই ফলে জীবন হয়ে উঠেছে তাঁর এক আশ্চর্য মহামূল্য সামগ্রী।

আমরা পরম সৌভাগ্যশালী মানব, আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি, রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আমাদের ভাষা, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আগামী কালের রবীন্দ্রানুরাগী দিদৃক্ষু মানবদের কাছে আমরা সশ্রদ্ধ-সবিস্ময়-ঈর্ষার পাত্র।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাপের বাড়িতেও দিনগুলি আজকাল মন্থর মনে হয়। সঙ্গিনীদের সকলকে পাওয়া যায় না। গঙ্গা-যমুনা বা কুমীর-কুমীর খেলাতেও মনোমত সঙ্গিনীর অভাব। বয়সে বড় দুই এক জন যাহারা বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছে—তাহাদের সঙ্গেও ঠিকমত মনের মিল হয় না। যেমন অপর্ণার কথাই ধরা যাক।

মাত্র তো বছরখানেকের বড়, যোগমায়াকে পাইয়া যে সব কথা সে ফাঁদিয়া বসিল, তাহা যোগমায়ার শাশুড়ীর মুখ হইতে বাহির হইলেই মানায়।

কি লা, যুগি—কেমন আছিস? শ্বশুরবাড়ির ভাত খেয়ে গতর লেগেছে কৈ লো! শাশুড়ী যত্ন-আত্তি করে তো?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, না, মারে।

সেকি লো, বউ কাঁট্কি নাকি? খেতে দেয় না বুঝি ভাল করে? কিন্তু সহানুভূতি দেখাইতে সে আসে নাই। পরক্ষণেই বলিল, আমার শাশুড়ী কিন্তু ভাই ভারি ভাল। একেবারে মাটির মানুষ। আমি যা করি, বলি, কথাটি কন না। এই দেখ না, ক্যাশবাক্সের চাবিটা আমার আঁচলেই বেঁধে দিয়েছেন। ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছাটা পিঠের দিক হইতে হাতের মুঠায় ভরিয়া সে বিজয়িনীর মতই হাসিল। সংসারে পাশা খেলার জিতের বাজিটি যেন তাহারই স্বপক্ষে চলিতেছে!

যোগমায়া হাসিল। বলিল, তবে তো ভালই হ'য়েছে, অপি।

শুধু ভাল! উনি এই নারকেল ফুল আর জশম গড়িয়ে দিলেন—শাশুড়ীর কত আনন্দ। উনি কাজ করেন জমিদারী সেরেস্তায়—উপরি পান কি না।

যোগমায়া অত বুঝিল না। অপর্ণার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে, ভাই।

আসচে পূজোয় সিঁথি নেব। ও বলে চিক্ নিও। তুই কি বলিস, যুগি, সিঁথি ভাল, না চিক্ ভাল?

যোগমায়া অপর্ণার মতেই মত দিল। কেন, সিঁথি। যেন যাত্রার দলের রাধিকের মত।

তোদের শ্বশুরবাড়ির দেশে বারোয়ারী পূজো হয়? তাতে বাইনাচ, টপ, চণ্ডী, যাত্রা হয়?

কই, যাত্রা তো শুনিনি। বেউলার গান নাকি হয়। মোছলমানদের একটা দল আছে। আমাদের বাড়ি 'থেকে তাদের আকড়ার গান শোনা যায়।

শুনিসনি যাত্রা? আঃ রে! ঠোঁটের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়া অপর্ণা বলিল, তোদের তাহ'লে অজ পাড়া-গাঁ বল। খুব ম্যালেরিয়া আছে তো? কোঁ—কোঁ জর? আমাদের গাঁয়ে ভাই ওসব কিছু নেই। আর দুধ, ঘি, মাছ, তরিতরকারি—সব সস্তা।

অপর্ণা যোগমায়ার কথা শুনিতে চাহে না, কেবল নিজের ঐশ্বর্য্য-খ্যাতির গল্প, স্বামী-শাশুড়ী-শ্বশুর-ভাসুরদের আদর যত্নের কথা, এবং সেই পল্লীকে শহরের কোঠায় তুলিয়া গৌরববোধ ইত্যাদিতেই মশ্‌গুল হইয়া থাকিতে চাহে। বাপের বাড়িতে দুঃখের ভাত ব্যঞ্জন-উপকরণে জুটিত না, অপর্ণা তাই—কুড়াইয়া-পাওয়া ঐশ্বর্য্যের গৌরবে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপর্ণার কথা ছাড়িয়া দিলে কুমুদিনীও তো অন্য জগতের মানুষ হইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী, অলঙ্কার, গ্রাম ইত্যাদির গল্পে সে মাতিল না বটে, স্বামীকে লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিল বৈকি। ভালবাসিলেই যে নির্লজ্জ হইতে হয় একথা যোগমায়া তাহার মুখেই প্রথম শুনিল। গুরুজনদের লুকাইয়া কি করিয়া ইঙ্গিতে ও পত্রটুকরায় তাহারা ভালবাসাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশ করিয়াছে—তাহার বিচিত্র ইতিহাস অতি দীর্ঘ হইলেও—সুখস্মৃতির মত সে অনর্গল বলিয়া যাইতেছে। মাথা ধরার অছিলা করিয়া যোগমায়া পলাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গিনীদের হাত হইতে যদি বা পরিত্রাণ আছে, পরিত্রাণ আছে এই জন্য যে স্বামী-সোহাগের কথা শুনিবার জন্য প্রথমটা তাহারা পীড়াপীড়ি করিলেও—খানিকটা শুনিবার পর বক্তা হইয়া বসে। সে তো গল্প নহে, সংক্রামক রোগ। তরুণ বয়সে এই সংক্রামতা অত্যধিক। সৌভাগ্যে কেহ যে কাহাকেও অতিক্রম করিবে—এমনটা আশা বোধ হয় কেহই করে না।)

হরপার্ব্বতী

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পরিত্রাণ নাই বয়োজ্যেষ্ঠাদের কাছে। তাঁহারা শুধু খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা শুনিতে চাহেন। তাঁহারা এমন সব প্রশ্ন করেন—যাহাতে অতিগোপন কথাটুকুও না বলিয়া নিস্তার নাই। কানে-কানে-বলা কথার মর্য্যাদা ও শপথ না ভাঙিলে তাঁহাদের বুঝি স্বস্তি নাই। কথা শুনিয়া তাঁহারা হাসেন, খানিক চুপ করিয়া কি ভাবেন, পুনরায় প্রশ্নবাণে কিশোরীর চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়া নিঙড়াইয়া সবটুকু রস বাহির করিয়া লন। বয়স্থাদের এই কাঙালপনার অর্থ যোগমায়া বুঝিতে পারে না। যাহার অঙ্গনে সবেমাত্র সোনালী রৌদ্ররেখায় সোনার আলিপনা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যাহ্ন-বিদগ্ধ প্রান্তরের ধূম ও তাপের জ্বালা সে কি বুঝিবে?

দু'টি দিনেই হরিপুর গ্রাম পুরাতন হইয়া গেল। মা বেশিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন মেয়ে সম্বন্ধে। এই সতর্কতা তাঁহার কেন? মেয়ে তাঁহার কোন জিনিসটি খাইতে ভালবাসে—সে সব তো তিনি প্রতিদিনই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাঁধিতে থাকেন। তবে আসন পাতিয়া, থালায় ভাত সাজাইয়া, বাটিতে ডাল ও ঝোল দিবার অত ঘটা কেন? যখন সে চিরদিনের মেয়ে হইয়া এ-বাড়িতে ছিল—তখন তো এমন পরিপাটী যত্ন মায়ের মধ্য হইতে অঙ্কুরিত হইতে সে দেখে নাই। সেই এক সঙ্গে এলোমেলো ভাত বাড়িয়া—এখানে ওখানে তরকারী দিয়া—ভাতের মাঝখানে খানিকটা ডাল ঢালিয়া দেওয়া—তাহাতে যত্নের অভাব কোন দিন যোগমায়া বোধ করে নাই। মেয়েকে সতর্ক হইয়া সেবা করার মধ্যে আগ্রহ ও যত্ন দুই থাকিতে পারে, কাছে টানিবার উপকরণ যেন কি ভাবে কমিয়া গিয়াছে! বৎসরের আবর্ত্তনে মা যেন শাশুড়ী হইয়াছেন!

তার পর এক দিন রামচন্দ্রের পত্র আসিল। সে পত্র লইয়া সঙ্গিনী মহলে কি কাড়াকাড়ি—হুড়াহুড়ি।

অপর্ণা বলিল, আমাদের উনি ওর চেয়ে ঢের ভাল লেখেন।

কুমুদিনী বলিল, আমাদের উনিও।

সুভাষিণীও ছাড়িবার পাত্রী নহে। বলিল, নিয়ে আয় তোদের চিঠি, মিলিয়ে দেখব।

কুমুদিনী যে চিঠিখানি আনিল—সেটি সম্প্রতি আসিয়াছে। ছেলেমানুষ বর, স্কুলে বেশিদূর পড়ে নাই। অজস্র বানান ভুল করিয়াছে। তবে হাতের লেখাটি তাহার বড় বড় ও স্পষ্ট। কাজেই সুভাষিণী বলিল, মন্দ কি, বেশ চিঠি। অপর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কৈ, দেখা তোর চিঠি?

অপর্ণা বলিল, বড় চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেছি—এটা তত ভাল নয়।

এমন জড়ানো হাতের লেখা যে, সম্বোধন ছাড়া বাকিটার পাঠোদ্ধারে রীতিমত পরিশ্রম হয়। সুভাষিণী বলিল, কুমির বরের চেয়েও তোর বরের লেখা খারাপ। যাই বল, যুগির বরই সব্বার চেয়ে ভাল লিখেছে।

অপর্ণা বলিল, ছাই লেখা! মোটিস একটা তো গান চিঠিতে!

তোর তো একটাও নেই, খালি বক্তিমে!

সে চিঠিখানা হারিয়ে গেছে, তাতে চারটে গান ছিল।

জান তো ভারি!

মুখ ভার করিয়া অপর্ণা চলিয়া যায় দেখিয়া কুমুদিনী বলিল, আর ক'দিন আছ ভাই এখানে?

ঠোঁট উল্টাইয়া অপর্ণা বলিল, ক'দিন! বলে, আমি না গেলে ওদের চলে! এসেছি তো মোটে দশ দিন, এর মধ্যে মাস্-শাশুড়ী এলেন একবার, উনি এলেন একবার। বলেন, চল, না গেলে যে সংসার যায়।

সুভাষিণী বলিল, যাই বল ভাই, বাপের বাড়ি দু'দিনই ভাল লাগে।

যোগমায়া বলিল, তা কেন, সে বরঞ্চ শ্বশুর-বাড়ির কথা বলতে পার।

তিন জনেই সশব্দে হাসিয়া উঠিল। দীর্ঘ-বিলম্বিত হাসি—থামিতে আর চাহে না। এক একবার হাসি স্তিমিত হইয়া আসে, পরক্ষণেই দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া হাসির উৎসমুখে ভাসিয়া চলে।

বিরক্ত হইয়া যোগমায়া বলিল, মরণ! এত হেসে মরছ কেন?

অপর্ণা বলিল, তোর কথা শুনে। নেকু!

কুমুদিনী বলিল, মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর ছাড়া আর তীর্থ আছে নাকি? বিয়ে হলেই তো বাবা-মা পর হ'য়ে যায়।

যায় বৈকি! মুখ ঘুরাইয়া যোগমায়া বলিল, সে যারা নিমমায়া—তারা বলে ও-কথা।

অপর্ণা বলিল, শোন তাহলে। সেবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মাকে বললাম, মা, আমার দিদিমা যে খোরাখানা দিয়ে গেছেন—ওখানা দাও, গ্রীষ্মিকালে ওতে করে পান্তা ভাত খাব। মা কি বললেন, জানিস? বললেন, আগুসারা মেয়ে, বিয়ের সময় মুঠো মুঠো টাকা নিয়েও সাধ মেটে নি। বলে:

ঘরের ছলো খায়
আর বনের পানে চায়।

তোরাও হচ্ছিস তাই। শুনলি ভাই?

কুমুদিনী বলিল, ওই বিয়ের সময়েই যা দেওয়া-থোওয়া। অন্য সময়ে চাইলে ক্যাঁট ক্যাঁট করে কত কথা না শুনিয়ে দেয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, বিবাহের পর পিতৃগৃহে কন্যার কোন অধিকার থাকে না। যদি অধিকার খাটাইতে যাওয়া যায় তো মনঃকষ্ট ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

এ-কথায় যোগমায়া সায় দিল না। সে-কথা সে স্বীকার করে না। মা কখনও পর হইতে পারেন? তাহার মা তো নহেই। যে মেয়ে মায়ের বাক্স হইতে টানিয়া নিজের বাক্স ভরাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, সে স্বার্থপর নহে তো কি! নিজের দোষগুলি—নিজে কেহ দেখিতে পায় না।

সারা দুপুরটা যোগমায়া রামচন্দ্রের চিঠিখানা পড়িল। চিঠি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—শ্বশুরবাড়ির খাটো প্রাচীর ঘেরা আমকাঁঠাল গাছ বুকে-করা সেই ছায়াচ্ছন্ন নাতিপ্রশস্ত উঠানটি, সেই ভাঙ্গা ঘরখানির মধ্যে একখানি বড় তক্তাপোষ এবং সমস্তটা ঘিরিয়া রাত্রি—অন্ধকার রাত্রি নামিতেছে সেই বিরলবসতি ভিটাখানির চারিদিকে। একটি রাত্রির স্মৃতিতে অনেকগুলি রাত্রি ভরপুর হইয়া আছে। সেই রাত্রিই যখন তখন মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া যোগমায়ার চোখে ঘনাইয়া আসে। রাজপুত্র তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া কোন প্রবাসে উধাও হইয়া গিয়াছে, রাজকন্যা নিদ্রা-মধুর পুরীর মাঝে কেশদাম এলাইয়া—সোনারূপার কাঠি শিয়রে লইয়া ঘুমাইতেছে শুধুই সে ঘুমাইতেছে না, স্বপ্নও দেখিতেছে সেই সঙ্গে।

কলমি-ডোবায় পা ডুবাইয়া বাসন মাজিতে মাজিতে যোগমায়া ভাবে, এখানকার সব কিছুই দিনে দিনে বদলাইয়া যাইতেছে কেন? কিসের ত্বরায় সঙ্গিনীরা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে? কোন্ প্রয়োজনে মনের আকাশে রঙের খেলা চলিতেছে? সাতরঙা রঙ—কোথা হইতে আসিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়! যাহাদের লইয়া রঙের খেলা জমে—এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল খেলাঘরে—সেই খেলিবার সঙ্গী-সাথীগুলির দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কাল যাহাকে লইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে, আজ তাহাকে লইয়া সে হাসি জমে না। আজ অপর্ণা-কুমুদিনী-সুভাষিণীরা ফিকে হইয়া আসিতেছে।

ফাল্গুনের শেষে একদিন রাধারাণীর পত্র আসিল সে লিখিয়াছে:

ভাই, বোশেখে যদি আস তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি আর বড় জোর বোশেখ মাসের খানিকটা এখানে আছি। এবার বাপের বাড়ি যাব। যাবার ইচ্ছে নেই, তবু যেতে হবে। কেন না, প্রথা। ভাবছি, কি করে ওঁকে ছেড়ে থাকব! তুই তো খুব কঠিন। গিরিকন্যা কি না, তাই এখানকার জন্যে তোর প্রাণ কাঁদে না। আচ্ছা কেমন করে তুই প্রাণ ধরে থাকতে পারিস? একটুও কষ্ট হয় না? একটু—ও না? ভালবাসা নিবি। তবে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে একটু একটু আনন্দ না হচ্ছে তা নয়। কেন জানিস? একটা নতুন জিনিস পাব বলে। কি জিনিস জানিস? না, চিঠিতে সে-কথা বলব না। তুই আয়—শুনতেই পাবি। কেমন আছিস?

আশ্চর্য্য চিঠি মনের গোপন তারে করুণ সুরে আঘাত করিতেছে বার বার। এক বার ঘুরিয়া আসিলে কি ভাল হয় না? একবার মাত্র, দিন দুইয়ের জন্য।

খাইতে বসিয়া যোগমায়া বলিল, মা, রাধুদিদির চিঠি পেলাম আজ।

কি লিখেছে?

সব বুঝতে পারিনে। অনেক করে আমায় যেতে লিখেছে।

এই তো অঘ্রাণে এলি—পূজো না এলে পাঠাচ্ছি কি না!

কিন্তু রাধুদিদি যা করে লিখেছে!

তুই যাবি নাকি, মায়া? মা সবিস্ময়ে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

মায়ের দৃষ্টি যোগমায়া সহ্য করিতে পারিল না, মুখ নামাইয়া বলিল, না গেলে রাধুদিদি দুঃখু করবে।

মা একদৃষ্টে মেয়ের পানে খানিক চাহিয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তাই যাস।

তুমি হাসলে কেন, মা? নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাইতে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

এমনি।

না, এমনি নয়।

দেখ মেয়ের কথা! এমনি নয় তো কি?

যোগমায়া ঘাড় গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল, অন্নের গ্রাস মুখে তুলিল না।

মা বলিলেন, ও ক'টি মুখে দিয়ে নে। দেখ একবার কাণ্ড! কি যে বলে, বিয়ে হলে আর ঘর চলে না, তোরও হয়েছে তাই।

মুখ গোঁজ করিয়া যোগমায়া ভাত ক'টি খাইল। এবং মুখ গোঁজ করিয়াই সকাল সকাল শুইতে গেল।

আলো নিভিলে—ও ঘর হইতে যোগমায়া শুনিল মা বলিতেছেন, বোশেখের প্রথমেই দিন দেখো—মেয়ে তোমার থাকতে চায় না এখানে।

বাবা বলিলেন, পাগল!

না গো, আজ স্পষ্ট বললে আমাকে—তার রাধুদিদিকে দেখতে যাবে।

রাধুদিদিকে? তাই বল!

তুমি দিন দিন যেন খোকা হ'চ্ছ? রাধুদিদি মানেই—বুঝছ না?

তিনি তথাপি অবুঝের মত বলিলেন, তা রামচন্দ্র তো ছুটি নিচ্ছে না।

নিচ্ছে না, নিতেও তো পারে। কি লিখেছে মেয়েকে আমি দেখেছি নাকি?

কাল দেখো একবার।

মেয়ের চিঠি? বল কি গো, বোকা বলে আমি কি এমনই বেহুঁস?

পিতা বলিলেন, গজের কিস্তিতে আজ মাৎ হয়ে গেলাম! নইলে গুপ্ত কিনা আমায় ঠাট্টা করে বলে—

তা মেয়ে পাঠাচ্ছ কি না?

নিশ্চয় পাঠাব। বেয়ানের চিঠি আসুক। উঃ, নৌকোখানা যদি সেই সময়ে চেপে দিতাম!

এ-ঘরে অন্ধকারে শুইয়া যোগমায়ার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল। মা আবার বাবার সামনে এই কথা বলিলেন। কাল সকালে বাবা যখন ডাকিবেন, বুড়ি, মুখ ধোয়ার জল নিয়ে আয় তো? তখন প্রতিদিনকার মত হাসিমুখে যোগমায়া জলের ঘটি ও গামছা আগাইয়া দিতে পারিবে কি? মা ভারি বোকা।

শ্বশুরবাড়ি আসিলেই কিন্তু রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করা যায় না। সেই দিন দ্বিপ্রহরে যোগমায়া পিসিমার ঘরে গিয়া বসিল।

পিসিমা বলিলেন, কম্বলের আসনখানা টেনে নিয়ে বোস, মা। কাপড়ে ধুলো লাগবে।

লাগুক। যোগমায়া বসিয়া পড়িল মেঝেয়। কহিল, পিসিমা, একটা কথা আপনাকে বলব?

চরকার গতি শ্লথ করিয়া পিসিমা হাসিমুখে বলিলেন, কি কথা মা?

বলিবার পূর্ব্বে যতটা সহজ মনে হইয়াছিল, বলিতে গিয়া তত শীঘ্র সে কথা যোগমায়া বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া ডান হাতের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে অবনত মুখে বলিল, রাধুদিদির সঙ্গে সই পাতাবার ইচ্ছে করে।

পিসিমা হাসিলেন, এই কথা! তা আজই আমি সদু পিসিকে ডাকিয়ে বলব'খন।

মা কিছু মনে করেন যদি? কুণ্ঠিত স্বরে যোগমায়া বলিল।

বউ আবার কি মনে করবে! ছেলেবেলায় অমন সবাই, সই, মকর, গঙ্গাজল পাতায়। খরচ আছে বটে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, এবার কিন্তু এক খরচে হয়ে যাবে।

ভীরুকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, আপনি যদি আমার নাম করেন—

পাগল! পিসিমা হাসিলেন। আমিই বলব তোমার শাশুড়ীকে।

এত শীঘ্র কথাটা পাকা হইয়া যাইবে যোগমায়া আশা করে নাই।

বৈকালে শাশুড়ী বলিলেন, চুয়ো আনতে হবে, খাজা, গজা কিছু ময়রার দোকানে করে আনতে হবে। কাল ভাল দিন আছে—পাঁচখানা ভাজা দিয়ে—একখানা লাল-পেড়ে শাড়ীও চাই—নতুনহাটে না গেলে কি পাওয়া যাবে?

পিসিমা বলিলেন, এত তাড়াতাড়ি না করে দু'দিন পরে করলে—

শাশুড়ী বলিলেন, পরশু সে বাপের বাড়ি যাবে বউ। আমরা কালই করব, ওরা করবে পরশু।

নূতন করিয়া যোগমায়া আজ রাধারাণীকে অভ্যর্থনা করিল। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি একখানা গালিচার আসন হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিলেন, এইখানা পেতে বস, মা। বউমা, চন্দন ঘষে রেখেছ তো মা? দুর্ব্বো, ফুল, চুয়ো সব ঠিক আছে। একটা পিদীম জ্বেলে ওই কোণে রাখ। আর তুমিও একখানা ভাল কাপড়—শুদ্ধ, শাড়ী পরে এস,—বিয়ের চেলিখানাই না হয় পর।

রাধারাণী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কোণের প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় রাধারাণীকে সত্যই রাধারাণী বলিয়া মনে হইতেছে। এই ছয় মাসে সে কিছু মোটা হইয়াছে, রঙ তাহার ফরসা হইয়াছে এবং মুখেচোখে এমন এক

অপরূপ শ্রী নামিয়াছে—যাহা দেখিলে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কথাই মনে পড়ে।

রাধারাণী বলিল, অমন করে 'হাঁ' করে কি দেখছিস?

যোগমায়া বলিল, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই। যেন পীরের হাটের জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ।

দূর, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনা করতে নেই। তুমিও একদিন এমনি সুন্দর হবে ভাই।

আমি! তোমার মত আমার গায়ের রং আছে, না অমন টানা টানা বড় বড় চোখ আছে?

সে কথা আমি বলে মুখ নষ্ট করি কেন, বরঞ্চ তোর তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস।

যোগমায়া বলিল, উনি তো কিছু বলেন না।

বলেন না, কিন্তু লেখেন। মাগো, কি সব কবিতা! আমিই কি ছাই বুঝতে পারি সব? চাঁদ, ফুল, পদ্ম—কত কি!

লজ্জাবনত মুখে যোগমায়া বসিয়া রহিল। সত্য, লোকটার যেন চিঠি লিখিয়া আর আশা মেটে না। মুখ তুলিয়া কি বলিতে যাইবে, এমন সময়ে শাশুড়ী জনকয়েক মেয়েছেলের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। রাধারাণীর শাশুড়ী, দুই ননদ ও পাড়ার পাঁচ-ছয় জন প্রতিবেশিনী সই-পাতানো দেখিতে আসিয়াছেন।

বেশ কৌতুককর অনুষ্ঠান। অগ্নি সাক্ষী করিয়া কপালে চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দেওয়া, পরস্পরের মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়া ও লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে তিন বার 'সই' বলিয়া ডাকা—বেশ অনুষ্ঠান। দেবতা ও মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া—যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ—এমনই আত্মীয়তা পাতাইয়া আসিতেছে। মানুষের সমাজ মানুষকে দিয়া তৈয়ারী করিয়া মানুষের যেন ভয় ঘোচে নাই, দেবতার প্রয়োজন সেই সমাজবিধির ধারাগুলিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

বেলা দশটার মধ্যে সই পাতানো হইয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ী কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। বসিয়া রহিল—রাধারাণী আর যোগমায়া।

যোগমায়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমাকে আপনার করে পাবার জন্যে কত যে ঠাকুর দেবতাকে ডেকেছি, ভাই। পিসিমাকে কথা পেড়ে অবধি বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে মরি আর কি! কেবল ভাবি, ওঁরা যদি রাজী না হন, যদি বকেন!

রাধারাণী বলিল, আমারও অন্য জায়গায় সই পাতানোর কথা চলছিল। শাশুড়ীর খুব ঝোঁকও ছিল। বউটি ভাল, বড় মানুষের বউ, কিন্তু শাশুড়ী ভারি দেমাকে! আমিই তো ওঁকে বলিয়ে মার মত করালাম।

সত্যি? আনন্দে বিহ্বল হইয়া যোগমায়া রাধারাণীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। বেষ্টনের আনন্দে খানিকটা পরিপূর্ণ থাকিয়া সে অবশেষে বলিল, আচ্ছা ভাই, তুমি এখন বাপের বাড়ি নাই বা গেলে? বেশত থাক না এখানে। এখন সই পাতানো হ'লো, আমরা যাব আসব—কেউ কিছু বলতে পারবেন না।

রাধারাণী বলিল, কিন্তু আমার যে যেতেই হবে ভাই। প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে নেই।

যোগমায়া হতবুদ্ধির মত প্রশ্ন করিল, প্রথমবার কিসের? তুমি তো কতবার এসেছ—

না গো, সই, না। আজ তোমার শাশুড়ী আমায় সাধ দিচ্ছেন—এ খবরটিও রাখ না?

যোগমায়া সহসা আর একবার রাধারাণীকে বেষ্টন করিয়া সানন্দে বলিল, আজ সই পাতানো না হ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি দিতাম।

কেন, সই?

কেন? অঘ্রাণে যখন বাপের বাড়ি যাই—তখন তো আমায় কিছুটি বলনি?

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, বলবার সময় ছিল কই, তোমার বরের চিঠি নিয়ে যা ব্যস্ত ছিলাম!

ধ্যেৎ—তোমার খালি ঠাট্টা!

তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রাধারাণী বলিল, আচ্ছা সই, একটা কথা বল দিকি? ওই পিদীম জলছে এখনও—এই মাত্র সই পাতিয়েছ ধর্ম্ম সাক্ষী করে, দেখি তোর কথাটা সত্যি হয় কি না।

কি কথা, বল না?

বলিতে গিয়া রাধারাণীর একটু লজ্জা করিল বৈকি। সে বয়সে বড়। সম্বন্ধটাও লজ্জা করিবার মত নহে। তবু কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপি চুপি বলিল, খোকা হবে, না, খুকী?

যোগমায়া ভাবিতে লাগিল।

রাধারাণী ঘরের কোণের দিকে চাহিয়া বলিল, এখুনি পিদীমটা নিবে যাবে। বল না, সই?

রাধারাণীর এই ব্যাকুলতায় যোগমায়ার বিস্ময় বাড়িল। ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, সন্তান ত। সে জন্য রাধারাণীর এত ব্যাকুল হইয়া উঠিবার প্রয়োজন কি?

রাধারাণী তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল, বল না, সই ?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, যাই হোক না কেন, তোর এত ভাবনা কেন, সই ?

আছে। ওর সঙ্গে বাজি ফেলেছি কি না। শীগ্‌গির বল ?

যোগমায়া হাসিমুখে বলিল, খোকা।

দপ্‌ দপ্‌ করিয়া প্রদীপটা নিবিয়া গেল।

রাধারাণী যোগমায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভাই। এমন দুষ্টু, বলে কি না মেয়ে হবে ? মেয়ে হ'লে যেন ওর আর দু'টো হাত বেরুবে !

(ক্রমশঃ)

নবযুগের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তিনটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের সঙ্গম-স্থলে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তখন ধর্ম্মজগতে এসেছে একটা নূতন আন্দোলনের বন্যা। সেই আন্দোলনের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়। জ্ঞান তখন শাস্ত্র-কারাগারে মৃতপ্রায়। বিচারের চেয়ে আচার বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্ম্মের মর্ম্মকথা ভুলে গিয়ে মানুষ বাইরের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। রাজা রামমোহন অচলায়তনের মধ্যে আনলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন, নতুন আদর্শের সূর্য্যালোক। এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের একজন পুরোহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা। যে-পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাকে ব্রাহ্ম-আন্দোলন দস্তুর মত নাড়া দিল। কবি মানুষ হয়েছেন এই বিপ্লবের আবহাওয়ার মধ্যে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আন্দোলন আনলেন বঙ্কিমচন্দ্রের গগনস্পর্শী প্রতিভা। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভাষার আড়ষ্টতার জন্য বঙ্গসাহিত্যে যথোচিত গতিবেগ ছিল না। ভাষাকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছিল তার অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ভাষাকে জীবন্ত ক'রে তুললেন। সেই ভাষা সজীব বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার যোগ্যতা লাভ করল।

তৃতীয় আন্দোলন দেখা দিল স্বদেশপ্রীতির বাহন হ'য়ে। পাশ্চাত্যের চোখে আমরা ছিলাম বর্ব্বরের সামিল। আমাদের আচার-ব্যবহার-সাহিত্য-ধর্ম্ম—সবই ছিল তাদের কাছে উপহাসের বস্তু। ইংরেজদের কাছে এই সব কথা শুনতে শুনতে পরানুকরণপ্রিয়তার একটা হিড়িক আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। সেই হিড়িকে প'ড়ে আমরা নিজের দেশের সাধনাকে অশ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছিলাম। সহসা এই মোহ এক দিন কেটে গিয়ে আমরা স্বদেশের সংস্কৃতির গৌরবকে আবিষ্কার করলাম। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরে এল। জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হ'ল—অতীতকে বর্জ্জন করবার বেলায় আমরা বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবো না—এই সত্যকে ঘোষণা করবার জন্য।

এই রকমের তিনটে তিনটে যুগান্তকারী আন্দোলনের মিলনক্ষেত্রে যাঁর আবির্ভাব তাঁর মন তো স্বভাবতই বিপ্লবী হবে। ঠাকুর-পরিবার তাঁদের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার জন্য সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন। দশের কাছে যাঁরা ছিলেন প্রত্যাখ্যাত তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না দশের ছায়া অথবা প্রতিধ্বনি হওয়া। তাঁরা নিজেদের মনের জোর দিয়ে, চিন্তার শক্তি দিয়ে আপনাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র জগৎ গ'ড়ে তুললেন। এই স্বতন্ত্র জগতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রকাশের পথকে খুঁজে পেলেন নিজের মনের আলোয়। ধার-করা মাপ-কাঠি দিয়ে তিনি আদর্শের বিচার করলেন না। বহু যুগের পদচিহ্ন-আঁকা পুরাতন পথে তিনি চললেন না। চলার বেগে তাঁর পায়ের তলায় আপনা থেকে রাস্তা জেগে উঠল। সেই নূতন রাস্তায় তিনি তাঁর জয়-যাত্রা শুরু করলেন প্রাণের দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' খুব জোরালো ভাষায় এই

বিপ্লবের আত্মাকে একটা রূপ দিয়েছে। বিপ্লবের মর্ম্মকথা হচ্ছে সংগ্রামের মধ্যে। এই সংগ্রাম বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সংগ্রাম। আত্মা ভিতর থেকে আপনাকে প্রকাশ করতে চাইছে বিপুল মুক্তির মধ্যে—জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি, প্রেমের মধ্যে মুক্তি। বাহিরের বাধা আমাদিগকে বেঁধে রাখবে, মুক্ত হ'তে দেবে না। সমস্ত বাধাকে ঠেলে ফেলে আপনাকে মুক্ত করবার জন্য, শুদ্ধ করবার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য যেখানে এই সংগ্রাম নেই সেখানে বিপ্লবও নেই।

আত্মপ্রকাশের পথে যারা বাধা হ'য়ে আছে তাদের সরিয়ে ফেলে আপনাকে মুক্ত করবার জন্য আমাদের মধ্যে বীর্য্যের অভাব কেন? 'তাসের দেশে' ছক্কা বলছে রাজপুত্রকে, "চলবে কেন তুমি? চলবে নিয়ম।" এই যে জীবনের চেয়ে নিয়মকে, রুটিন্‌কে অধিকতর মূল্য দিয়ে এসেছি—এই 'রুটিন'-প্রীতিই আমাদিগকে সামনের দিকে আগিয়ে যেতে দিচ্ছে না, অতীতের শৃঙ্খলে আমাদিগকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। নিয়মকে ভালাবাসি কেন? কারণ শান্তির প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে। চিন্তা করবার চেয়ে বিশ্বাস করা সহজ আর মানুষের স্বভাব হ'ল বিশ্বাস-প্রবণ। ছেলেবেলা থেকে যে-সব ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাদের আঁকড়ে ধ'রে থাকতেই আমরা ভালবাসি। কেউ যদি এসে তাদের সমালোচনা করে আমরা তাকে একটা উৎপাত ব'লেই মনে করি। সকাল ছয়টায় বিছানা থেকে উঠি—রাত্রি দশটায় শুতে যাই। হঠাৎ যদি কেউ এসে নিয়ম করে ভোর চারটায় উঠতে হবে আর রাত্রি আটটায় ঘুমোতে যেতে হবে, ভাত খাওয়া অভ্যাস আছে নিয়ম হয় যদি রুটি খেতে হবে, তবে সেটা খুব প্রীতিকর লাগে না। আমরা যাতে অভ্যস্ত তার বাইরে পা বাড়াতে কেমন একটা বিরক্তি আমরা অনুভব করি। যে রকম ভাবে আমরা শৈশব থেকে ভেবে আসতে অভ্যস্ত তার বিরোধী কোন ধারণাকে অন্তরে ঠাঁই দিতে আমরা যে এত কুণ্ঠা অনুভব করি—সে আমাদের রুটিন-বিলাসী মনের জড়তার জন্য।

তাসের দেশের মানুষগুলো সব নিয়মের দাস। সেখানকার 'হাওয়া যেমন স্থির যেমন ভারী, এমন কোন গ্রহে নেই।' তাস-দ্বীপের কৃষ্টিকে বিদেশের কৃষ্টির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্য রাজা শশব্যস্ত। তাসেরা বলে 'চাই নিয়ম।' তাদের চাল আছে, চলন নেই। চালে বিপদ নেই, কিন্তু চলন জিনিষটার আপদ বিস্তর। রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে, খোচা আছে। তাসেরা সব গুরুমশায়ের হাতে মানুষ হ'য়েছে। একটু নড়লেই তারা দোষ ধরে। ছক্কা বলছে, 'ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন সেই পবিত্র হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

এমন যে শান্তিপ্রিয় তাস মহাদ্বীপ—সেই মহাদ্বীপে সমুদ্র পারের দূত এলো রাজপুত্রের বেশে। বললে 'যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।' ছক্কা বললে "কিন্তু নিয়ম!" রাজপুত্র বললে "বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে। নইলে এগোব কী করে?" বেড়ার নিয়মের দেশে রাজপুত্র নিয়ে এল পথচলার নিয়মের উৎপাত। ঘুমের দেশে এলো ঝড়ের বাণী। রাজা তাসদ্বীপের কৃষ্টিকে বাঁচাবার জন্য যখন বাধ্যতামূলক আইন জারির প্রস্তাব আনলেন, টেক্কাকুমারী বললে, 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' জড়তার শৃঙ্খল গেল ভেঙে—শান্তির প্রতি অনুরাগ বন্দরের নিরাপদ কোলে মনকে আর বেঁধে রাখতে পারলো না। আত্মপ্রকাশের বেদনা হৃদয়ে হৃদয়ে জাগলো নিবিড় হ'য়ে। তাসের দেশের কারাগারে এলো দিগন্তের ডাক, কূলহীন সমুদ্রবক্ষে বেরিয়ে পড়বার দুরন্ত আহ্বান। অজানাকে ভয় করার দিন ফুরিয়ে গেল তাসের দেশে। পঞ্জা বললো, "শান্তি ভঙ্গ করব পণ করেছি।" হরতনী বললো, "আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো, পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলাই চাই।" চিঁড়েতনী বললে, "ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্থকের আবর্জনা।" রুইতন বললে, "ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।"

সমুদ্রপারের দূত শান্তিপ্রিয় তাসের দেশে এনেছে নব জীবনের চাঞ্চল্য 'অশান্তি মন্ত্র' উচ্চারণ ক'রে।

যারা ছিল নির্জীব বস্তুর পর্য্যায়ে প'ড়ে—রাজপুত্র 'ইচ্ছে মন্ত্র' দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও আমাদের এই মৃতের দেশে একটা চাঞ্চল্য এনেছেন মুক্ত পথের গান শুনিয়ে। হুইটম্যানের সঙ্গীতে আছে My call is the call of battle, I nourish active rebellion—রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও একই গান।

"আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোক বনের রাঙা নেশায় রাঙি।"

তাসের দেশে রাজপুত্রের এই গানই হোলো রবীন্দ্রনাথের গান।

শান্তির দোহাই দিয়ে, কৃষ্টির দোহাই দিয়ে, শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে যারা বেড়ার পর বেড়া বেঁধেছে মানুষের আত্মপ্রকাশের দাবীকে উপেক্ষা ক'রে—তাদের চিত্তের মূঢ়তা এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

> I am for those that have never been master'd,
> For men and women whose tempers have never been master'd,
> For those whom laws, theories, conventions, can never master.

> "আমি হচ্ছি তাদেরই জন্ম যাদের কেউ দাস বানাতে পারে নি,
> সেই সব নারী আর পুরুষদের জন্ম হচ্ছি আমি যারা এখনও কারও প্রভুত্ব স্বীকার করে নি,
> আমি শুধু তাদেরই জন্ম নিয়ম, মতবাদ, আচার যাদের কখনো বাঁধতে পারে না।"

এই কথাগুলিই একদা হুইট্‌ম্যানের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিলো। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হুইটম্যানের ভাবধারার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই বিপ্লবী মূর্ত্তির জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাই-চরিত্রে। হরিমোহন আর জগমোহন দুই সহোদর ভাই। জগমোহন নাস্তিক। হরিমোহন একদিন দেখলে, বাড়ীর যে অংশে জগমোহনের বাস সেখানে বৃহৎ ভোজের আয়োজন চলছে। তার পাচক এবং পরিবেষকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন আপত্তি জানালে জগমোহন বললে—

> "তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না—আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব ইহাতে বাধা দিও না।"

ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?"

বড় ভাই উত্তর দিলেন—

> "ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।"

জ্যাঠামশায়ের এই যে বাণী এই বাণীই হোলো নব যুগের বাণী। ধর্ম্ম ফোঁটাতিলকে নয়, তীর্থদর্শনেও নয়, বাহিরের নানাবিধ অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের মধ্যেও নয়। ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রেমের সূত্রে যুক্ত হওয়ার মধ্যে। বিশ্বের সঙ্গে এই যে অন্তরের যোগ—এই ঐক্যবোধের আনন্দ যুগে যুগে উৎসারিত হোলো কত কবি আর সাধকদের কণ্ঠ থেকে। ব্যক্তিত্ব আপনার গণ্ডীকে ভেঙে ফেলেছে, চেতনা ছড়িয়ে গেছে দিক্ থেকে দিগন্তরে, সমস্ত পৃথিবী পরমাত্মীয় হ'য়ে দেখা দিয়েছে, হস্ত প্রসারিত হয়েছে অনন্তের পানে। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম বোধের এই অনুভূতিই নাস্তিক জ্যাঠামহাশয়কে দিয়ে বলিয়েছে, 'হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।'

এই যে মানুষকে সকলের পুরোভাগে আসন দেওয়া—এখানেই তো রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী। আস্তিক হরিমোহন রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপবাণ সর্ব্বাঙ্গে বহন ক'রে বঙ্গসাহিত্যে দাঁড়িয়ে আছে। নাস্তিক জগমোহনের মাথায় কবি কিন্তু স্বহস্তে পরিয়ে দিয়েছেন সম্মানের জয়মুকুট। নাস্তিক যে মানুষকে মর্য্যাদা দান করতে কখনও কার্পণ্য করে নি! তার চেতনা যে ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে সকলের মধ্যে! মানুষকে আমরা বিচার করব না টিকি আর দাড়ির দৈর্ঘ্য দিয়ে, তাকে বিচার করব না তার পাণ্ডিত্যের অথবা ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের কষ্টিপাথরে। মানুষকে বিচার করবো তার ভালবাসার শক্তির মাপকাঠি দিয়ে। ভালবাসার ক্ষমতার নেই যে তারতম্য এই তারতম্যের জন্যই মানুষে মানুষে তফাৎ। হরিমোহন মানুষকে ভালবাসতে পারে নি, জগমোহন পেরেছে। এইখানেই জগমোহন হরিমোহনের চেয়ে বড়। যাদের আমরা ফিলিস্টাইন বলি তাদের বৈশিষ্ট্যই হ'ল হৃদয়ের দৈন্যে। তারা প্রাণের চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে মূল্য দেয় বেশী, মানুষের শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ তাদের কাছে অনেক বেশী দামী। পুণ্যলোভাতুর 'ফিলিস্টাইন' পুরুত পাণ্ডার পিছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করবে—কিন্তু মানুষের ছোঁয়াকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলবে। এই ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধেই ছিল খ্রীষ্টের অভিযান—এই ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এবং গান্ধীরও অভিযান। পতিতা ননীবালাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ এল যখন জ্যাঠামশায়ের কানে, তিনি শুধু বললেন,

> "মা যে;—টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাঁসপাতালে পাঠাইব হরিমোহনের এ কেমন কথা?"

জ্যাঠামশায় আর ননীবালা—এ যেন খ্রীষ্ট আর মেরি ম্যাগ্‌ডেলেন্।

জগমোহনের এই যে বিপ্লবাত্মক দৃষ্টি এই দৃষ্টিই হোলো বিপ্লবী মহামানবদের দৃষ্টি। এই দৃষ্টি নিয়ে যারা এসেছে পৃথিবীতে—তাদেরই সৃষ্টি মহাকালের ললাটে কোহিনুরের মতো জল্ জল করে, তাদেরই বাণী যুগের বুকে দাগ রেখে যায় আর সেই দাগ কিছুতেই মুছতে চায় না।

প্রণতি জানাই তাসের দেশের রবীন্দ্রনাথকে, প্রণতি জানাই চতুরঙ্গের বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে। তিনি

স্বয়ং ছিলেন আস্তিক—মতে-আস্তিক ও কাজে-আস্তিক; কাজে-আস্তিক জগমোহনকে শুধু মতে-আস্তিক হরিমোহনের চেয়ে উচ্চতর স্থান দিয়ে গেছেন। পাপ-পুণ্য বিচার করবার নতুন মাপকাঠি দিয়েছেন যিনি আমাদের হাতে, যিনি আমাদের চিত্তকে মুক্ত করেছেন সাহিত্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে, নয়নে নূতন দৃষ্টি এনেছেন চোখের পিচুটি মুছিয়ে দিয়ে, ভাবতে শিখিয়েছেন শৃঙ্খলমুক্ত নতুন মন নিয়ে—তাঁর কাছে সত্য সত্যই আমাদের ঋণের কোনো অন্ত নেই। তিনি কেবল শান্তিনিকেতনের গুরুদেব নন, গান্ধীজীর গুরুদেব নন—তিনি সমস্ত জাতির গুরুদেব।

বাগগুহার অভিজ্ঞতা

শ্রীনন্দলাল বসু

[বাগগুহার এই কাহিনীটি নন্দ-দা'র মুখে অনেক বার শুনেছি। মজা লেগেছিল শুনে নানা রকমে। আজ সেই মজার ভাগ অপরদের কাছে গোচর করছি এই ভেবে যে তাঁরাও এর থেকে আনন্দ পাবেন। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব নন্দ-দা'র নিজের গল্প বলার ভঙ্গী ও ভাষা সব জায়গায় বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। তবু এই কাহিনীটিকে অনুলেখন বা শ্রুতি-লেখনের পর্যায়ে ফেলা যায়—এই আমার বিশ্বাস। নন্দ-দা'র মধ্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে চিরন্তন কিশোরের সন্ধান পেয়েছেন—এই গল্পটিতে আশা করি তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে। বাগগুহা থেকে তিনি যে বন্ধুবান্ধবদের পোষ্টকার্ডে স্কেচ্ করে পাঠাতেন, তারই কয়েকখানি এই সঙ্গে দিলাম। ---শ্রীরাণী চন্দ।]

১৯২১ সাল—তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে কলাভবনের গোড়াপত্তন হয়েছে, চার-পাঁচটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে ছবি আঁকা শেখানোর কাজ চল্‌ছে—হঠাৎ এক দিন এক নিমন্ত্রণ এসে হাজির গোয়ালিয়র রাজ্য থেকে। গোয়ালিয়র রাজ্যের এলাকায় যে বাগগুহা আছে, সেই গুহার দেয়ালের ছবি কপি করতে হবে। যাওয়া-আসা ও খাওয়া-থাকার খরচ বাদে জনপ্রতি মাসিক দু-শ টাকা দেবে। এদিকের লোভ যতই থাক না কেন—বাগগুহার ফ্রেস্কো দেখা ও তার কপি করবার লোভ প্রবল, কাজেই রাজী হলাম।

আমি অসিত ও সুরেন তিন জন শুভ দিন ক্ষণ দেখে রওনা হলাম। সঙ্গে নিলাম ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম—রং, তুলি, বোর্ড, কাগজ প্রচুর পরিমাণে; আর নিলাম কলকাতা থেকে একটি চাকর—নাম তার ইন্দ্র, উৎকলবাসী, মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধফেরত, খুব চটপটে ও চৌকোস।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম। বাঙালী সাজ—মাথায় গান্ধী-টুপি। ট্রেনে ভীড় বেশী ছিল না। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে বসেছি; কিন্তু কপালে আরাম বেশী ক্ষণ সইলো না—ক্রমশঃ ভীড় বাড়তে লাগল—আর সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ির বহর। যত ট্রেন এগিয়ে চল্‌ছে ততই পাগড়ির বহর বেড়েই চলেছে। ক্রমে যখন ট্রেন মির্জ্জাপুরে এসে পৌছলো, তখন দেখি পাগড়ির চাপে আমাদের গান্ধীটুপি কোথায় ফুটকড়াইয়ের মত হারিয়ে গেছে। ট্রেন থামলো ক্যান্টন মাউতে সকাল ন-টা নাগাদ। সেখান থেকে চল্লিশ মাইল মোটর-বাসে গিয়ে ধার স্টেশন, আবার সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে যেতে হবে ষাট মাইল, তবে পৌছবো বাগগ্রামে। বাগগুহা আবার বাগগ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে। স্টেট্ থেকে সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে রেখেছিল। মোটর-বাসে উঠলাম তল্পীতল্পা নিয়ে। বেলা তিনটের সময়ে পৌছলাম ধার স্টেশনে। রাস্তায় এক জায়গায় নেমে সঙ্গে যা খাবার ছিল খেয়ে নিয়েছিলাম। ধার-এ এসে রাত্রের জন্য দোকান থেকে কিছু খাবার করিয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে সবাই গরুর গাড়ীতে উঠতে যাব—দেখি অসিত আর নড়তে পারে না। পায়ে হাঁটুর কাছে বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেই ফুলেছে—আর দারুণ ব্যথা। কি করা যায়—অসিতকে বললাম—কোনো রকমে গরুর গাড়ীতে উঠে যেতে পারবে কি না, নয়ত এখানেই কিছু দিন অপেক্ষা করা যাবে। তখন কতক্ষণে বাগগুহায় গিয়ে পৌছবো সেই আগ্রহে সবাই ব্যাকুল—অসিতেরও কিছুতেই দেরি সইছে না। সে বললে, "গরুর গাড়ীতে যেতে পারব দাদা—তবে এক কাজ করতে হবে। আগুর

যেমন তুলোর প্যাডে প্যাক করা থাকে তেমনি ক'রে আমাকে নিয়ে যেতে পার যদি।"

খান তিনেক গরুর গাড়ী মোতায়েন ছিল। তার একটাতে আমাদের সঙ্গের যত বিছানা আর লেপ ছিল— পেতে নরম গদি ক'রে অসিতকে ধরাধরি ক'রে শুইয়ে দিলাম। আর একটাতে উঠলাম আমি ও সুরেন—অন্য গরুর গাড়ীটাতে জিনিসপত্র নিয়ে ইন্দ্র। পর পর তিনখানা গরুর গাড়ীতে চার দিন সমানে চললাম। রাস্তায় ডাক-বাংলোতে নেমে খাওয়া, নাওয়া, সেরে নিতাম। চমৎকার ডাক-বাংলোগুলি, আর ব্যবস্থাও বেশ ভালই ছিল, কাজেই অসুবিধা বিশেষ কিছু হয় নি। নির্জ্জন পথ দিয়ে, ছোট ছোট নদী পেরিয়ে যেন ছবির মত রাস্তা ধরে চলেছি। অচেনা দেশ-বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে গরুর গাড়ী চলেছে—রাত্রিবেলা কখনো বা একটু ভয়-ভয় করতো। গাড়ীর সামনে ও পিছনে লম্বা লম্বা কাঠের ও টিনের চোঙগুলি—যাতে ক'রে কাগজ-ক্যানভাস গুটিয়ে এনেছিলাম—সেগুলি সাজিয়ে রাখতাম আর এমন ভাবে বলাবলি করতাম যেন গ্রামের লোকেরা বন্দুক ব'লে সেগুলোকে ভুল করে। পথে লোক চলাচল বড়-একটা দেখা যায় না—দূরে ছোট ছোট গ্রাম মাঝে মাঝে নজরে পড়ে।

চতুর্থ দিনে এসে পৌছলাম বাগগুহাতে। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চার দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট টিলা পর-পর চলে গেছে, তার উপরে কুকুরগুলি দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে নতুন লোকের সাড়া পেয়ে,—নীচে সাদা সাদা কয়েকটি তাঁবুর মাথা—আরও দূরে দেখা গেল বাগগুহার বড় পাহাড়ের চূড়া। কাছে এলাম—দেখি পাহাড়ের নীচে পাশাপাশি তিন-চারটে তাঁবু খাটানো। একটি নিলাম আমরা তিন জনে—একটি নিলেন ওখানকার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তা, নাম গার্দ্দে সাহেব বলেই জানতাম। একটিতে এক ওভারসিয়র—জাতিতে মরাঠী ব্রাহ্মণ—গার্দ্দে সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন ও তাঁদের দু-এক জন কর্ম্মচারী; আর ইন্দ্র একটিতে রান্নার জিনিসপত্তর নিয়ে। তাঁবুর সামনে সারা রাত আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে। অসিতের পায়ের ব্যথাও সেরে গেছে অনেকটা।

গত কয় দিনের রাস্তার ক্লান্তিতে সবাই অবসন্ন। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, মালপত্র কোন রকমে একটু গুছিয়ে নিয়ে, কিছু খেয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি; দু-পাশে আমার ও অসিতের বিছানা—মাঝখানে সুরেনের; বিছানা পাতা হচ্ছে—হঠাৎ তাঁবুর এক দিকের দড়িটা জোরে ধাক্কা লেগে ন'ড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের
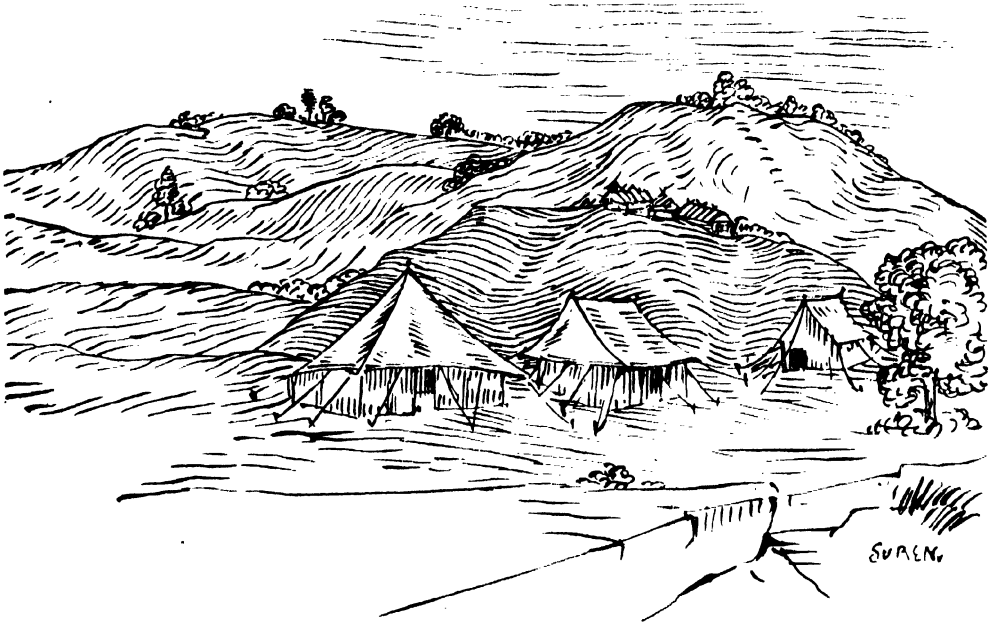
চীৎকার, কুকুরের ঘেউ ঘেউ—ভীলদের টিন-কানাস্তারা পেটাবার শব্দে চারিদিক ঝঙ্কারিত। তাঁবুর বাইরে এলাম—ব্যাপার কি জানতে—কোথায় গেল যুদ্ধ-ফেরতার বীরত্ব—ইন্দ্র হাঁউমাউ ক'রে এসে আছড়ে পড়লো। একটা বাঘ নাকি ইন্দ্র ও আমাদের তাঁবুর মাঝখানের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল কয়েক মুহূর্ত আগেই। তারই ধাক্কা লেগেছিল তাঁবুর দড়িতে। মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের—এই রকম জায়গায় এমনি ভাবে থাকতে হবে হাতের ভিতর প্রাণটি নিয়ে—কখন বাঘের পেটে যাই এই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে! কারও গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। বিছানায় গেলাম—ঘুমুবো কি ছাই—চুপচাপ পাথরের মত পড়ে রইলাম সবাই। মাঝরাত্রে আবার বাঘের গর্জ্জন। বাঘের সঙ্গে এই ভাবে মিলেমিশে দিনের পর দিন কাটাতে হবে—কপালে এও লেখা ছিল—ভাবি নি তো কোনদিন। পরে অবশ্য সয়ে গিয়েছিল অনেকটা—পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট একটি নদী আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেছে—বাঘেরা নির্জ্জন পথে এই দিক দিয়েই যাওয়া-আসা করত—তাদের সাড়া-শব্দ প্রায়ই কানে আসত—আশেপাশে থাবার দাগ হামেশাই নজরে পড়তো। সেই রাত্রে কিন্তু অসিত আর কিছুতেই রাজী হ'ল না পাশের বিছানায় ঘুমুতে। অগত্যা আমার ও সুরেনের মাঝখানেই তার শোবার ব্যবস্থা হ'ল এবং যত দিন ওখানে ছিলাম সেই ব্যবস্থার আর নড়চড় হ'তে দেয় নি অসিত।

পরদিন সকালে সবাই মিলে গেলাম বাগগুহাতে। আমাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলেরও কম দূরত্ব গুহার। সঙ্গে গার্দ্দে সাহেব ও সেই ওভারসিয়র ভদ্রলোকটি। গুহার সামনে বারান্দা—বারান্দার ছাদ ভেঙে গেছে কবে তার ঠিক নেই। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছবির উপর দিয়ে দেয়াল বেয়ে পড়ে। দেয়ালে ছবি কিছুই দেখা যায় না—সব কালচিটে রঙে একাকার হয়ে গিয়েছে। গার্দ্দে সাহেব হুকুম দিলেন, আর ওখানকার দরোয়ান এসে ঘড়ায় ক'রে জল এনে ছবির গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। জল দেয়ালের গায়ে লাগাতে ছবি একটু একটু করে দেখা যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেখ্‌ছি জল লাগার দরুন ঝুর ঝুর ক'রে দেয়ালের আস্তরও ঝরে পড়ছে। কি করা যায় ভাবছি—ছবি দেখতে হ'লে জল ছিটোতে হয়, আর জল লাগলে ছবিসুদ্ধ দেয়াল ঝরে পড়ে—আর্টিষ্ট হয়ে তো এই অন্যায়টা করা যাবে না। তখনকার মতো তো ওদের থামিয়ে দিলাম জল ঢালা থেকে।

আমাদের সঙ্গে ছিল বড় বড় স্পঞ্জের টুকরো—পরদিন সেই স্পঞ্জ এক একটা লম্বা সুতোর ডগায় বেঁধে নিয়ে গেলাম

পাহাড়ে, ছবির ট্রেস করতে। এক একজন এক একটি স্পঞ্জ নিয়ে তার সুতো দাঁতে কামড়ে ধরে ঝুলিয়ে দিলাম। এখন অল্প অল্প ক'রে ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে দেয়ালে বুলোলেই ছবি বেশ দেখা যায় কিন্তু 'ট্রেসিং কাগজ' যেই চাপালাম—চোখে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল ট্রেসিং কাগজের ভিতর দিয়ে তা'ও দেখা যাচ্ছে না। বড় বিপদে পড়লাম। অসিত বললে—দাদা উপায় বাত্‌লাও—এ রকম ক'রে তো চলবে না।

হঠাৎ মনে পড়লো—একবার জাপানী আর্টিষ্ট আরাই কাম্পোকে দেখেছিলাম এক ভাবে ট্রেস করতে। আমিও সেই পন্থা ধরলাম। ট্রেসিং কাগজ বাঁ-হাতে গুটিয়ে নিয়ে একটু একটু করে বারে বারে তুলে ছবি দেখে নিই আর ট্রেস করি। এমনি ক'রে দেখি বেশ কাজ চলে যায়। এখন আমাদের তিন জনের মধ্যে কে কোন্ দিকটা আঁকে তাই হ'ল সমস্যা। কিছুই জানি না, দেয়ালে কি ছবি আছে—কতখানি তার দেখতে পাব। লটারী করলাম—আমি পেলাম মাঝখানটা—তা'তে ছিল নাচের 'গ্রূপ'টি, অবশ্য তখন কিছু জানতে পারি নি। অসিত পেলেন—ডান দিকটা—তা'তে ছিল হাতী ঘোড়ার প্রোসেশন—আর সুরেন পেলেন বাঁ-দিকটা—যেখানে রাণী গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে।

এই বারে পুরো দমে কাজ সুরু ক'রে দিলাম। গান্ধে সাহেব প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে তত ভালো ব্যবহার করেন নি। যখন আমরা কাজ করতাম তখন প্রায়ই দেখতাম তিনি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন আর থেকে থেকে জিজ্ঞেস করতেন, "আজ কি পেলেন! হদিস পেলেন কিছুর?"

কোন দিন বলতাম, "হ্যাঁ—আজ একটা হাত পেলাম—কোনদিন বা জামার খানিকটা, কোনদিন একটা নাক, কোনদিন বা পদ্মপাতা। অবনীন্দ্রনাথকেও আমরা চিঠিতে লিখলাম যে, আমাদের ভারী মজা লাগছে—রোজই ছবিতে নতুন কিছু না-কিছু আবিষ্কার করছি।

তিনি উত্তরে লিখলেন, "নতুন জিনিস দেখছ বটে কিন্তু যাঁকে দেখে তাঁরা ঐ সব ছবি এঁকে গিয়েছেন তিনি তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে—তাঁর দিকেও ফিরে ফিরে দেখো।" এই রকম ইসারা দিয়ে উনি আমার জীবনে কতবার আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন—যা ভুলে থাকতাম—মনে করিয়ে দিতেন।

দিন-কয়েক পরে—যখন প্রায় সব ছবিটা এক রকম ট্রেস ক'রে এনেছি, তখন একদিন গান্ধে এসে বললেন, "এই দেখুন, আমাদের কাছে এই দেয়ালের ছবির ফটো আছে।" অনেক কাল আগের তোলা নিশ্চয়ই—যখন ছবিটা দেখা

যেত পরিষ্কার ভাবে। কিন্তু বড় রাগ হ'ল গার্দ্দে সাহেবের উপরে—তবে কি উনি আমাদের কাজের পরীক্ষা করছিলেন! এই ফটোটা যদি আগে পেতাম—কত আসান হ'ত ছবি আঁকতে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয়েছে আমাদের।

যাক্—তার পর তো ছবিতে রং দিতে সুরু করলাম। প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে কথা ছিল যে আমরা যা-যা ছবি কপি করব তার এক এক কপি আমাদের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য আনতে পারবো। কিন্তু তা আর আরম্ভ করতে পারছি না। গার্দ্দে সাহেব কেবলই বলেন যে অনুমতি চেয়ে লিখেছি—সেই অনুমতিপত্র এলেই আপনারা ডুপ্লিকেট কপি সুরু করবেন। মহা মুশকিল—লুকিয়ে যে অন্ততঃ একটু ট্রেস ক'রে রাখবো তারও উপায় নাই। সারাক্ষণ গার্দ্দে সাহেব ও ওভারসিয়র ভদ্রলোকটি পাহারা দিচ্ছেন।

আমরা সকালবেলা চা খেয়েই চলে যেতাম গুহাতে। দুপুরের খাওয়া ওখানেই সারা হ'ত—ইন্দ্র নিয়ে আসতো রোজ। তাঁবুতে ফিরতাম একেবারে সন্ধ্যের সময়। প্রথম দিকে গার্দ্দে সাহেব বলতেন, "কেন আপনারা এতক্ষণ খাটছেন—আমাদের তো নিয়মই আছে—দশটা থেকে চারটে। এর বেশী খাটবার দরকার কি?" কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্য রকম—আমরা ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি যদি ছবিগুলো শেষ ক'রে দিতে পারি, তবে কলাভবনের জন্য কপিগুলোও ওখান থেকেই ক'রে আনতে পারবো।

আমাদের রান্না ইন্দ্রই করতো। আশেপাশে ছিল ভীলদের গ্রাম। সেই গ্রাম থেকেই আসতো মুরগী, ডিম, দুধ ইত্যাদি। প্রথম প্রথম এ সব জিনিস পেতে বড় অসুবিধা হ'ত। স্টেটের চাপরাশী দিয়েই বাজার আনাতাম—তাতে খরচ পড়তো অনেক বেশী। অথচ নতুন দেশ, হালচাল জানি না, চিনি না কাউকে। ওরা যা দাম চায় তাই দিতে হয়। কিন্তু এমনি ক'রে তো চলবে না। এক কাজ করা গেল। সঙ্গে কিছু ওষুধ ছিল—আর বটকৃষ্ণ পালের দোকানে লিখলাম—যত পেটেণ্ট ওষুধ পাঠিয়ে দিলে। তাই দিয়ে গ্রামের লোকদের ছোটখাটো রোগে চিকিৎসা সুরু ক'রে দিলাম। রোজ সন্ধ্যের পর তাঁবুর সামনে ভীলদের ভীড় জমতো—ওষুধ বিতরণ করতাম; আমাদেরও সন্ধ্যেটা কাটতো ভাল, তাদেরও উপকার হ'ত। সস্তায় মুরগী দুধ শেষে তারাই দিয়ে যেত। এই রকমে আমাদের অনেক মুরগী জমা হয়ে রীতিমত একটা 'পোল্ট্রী' হয়ে গিয়েছিল। আবার দুটো কুকুরও পুষেছিলাম। এক দিন গুহাতে গিয়ে দেখি একটা বড় পাথরের পাশে দুটি কুকুরছানা কেঁউ কেঁউ করছে। সঙ্গে ছিল ভীল চাকর—রং কাগজ বয়ে আনা-নেওয়া, টুকিটাকি ফাইফরমাস করতো। তাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম—প্রায়ই নাকি এমনি পথে ঘাটে ওরা কুকুরের বেশী বাচ্চা হলে ফেলে দিয়ে যায়। রাত্রে বিকেলে বাঘে শেয়ালে খেয়ে নেয়—ফুরিয়ে যায় আপদ। আমরা সেই বাচ্চা দুটিকে নিয়ে এলাম তাঁবুতে। ইন্দ্র তাদের খাইয়ে দাইয়ে নানা রকম খেলা শিখিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতো।

গ্রামবাসীর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের খুব আপনার জনের মতো হয়ে গিয়েছিল। কি সুন্দর শরীর তাদের—কালো কুচকুচে রং—যেন কালো পাথরে খোদাই-করা মূর্ত্তি সব। ছেলেদের বুকের ছাতি যেমন চওড়া, সাহসও তেমনি। বেশভূষার বাহুল্য নেই—একখানি নেংটী, আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্য কারও সেই নেংটীতে সূচের কাজ করা, আর গায়ে বড় একখানি চাদর। মেয়েদের পরনে ঘাগরা—বুকে কাঁচলি—গায়ে ওড়না। আমি যখন ফিরে আসি শান্তিনিকেতনে সেই ঘাগরা কাঁচলি এনেছিলাম সঙ্গে। সেবারে দোলের উৎসবের সময়ে তা কাজে লেগেছিল। অক্ষয়বাবু, তেজেশবাবু সেই ঘাগরা কাঁচলি পরে নেচেছিলেন—দিনুবাবুর গানের সঙ্গে সঙ্গে।

ভীলদের বাড়ীগুলি বেশ মজার—তিন-চারখানা ক'রে বাড়ী এক একটা টিলার উপর—তার চার পাশে ঘন কুল কাঁটার বেড়া-দেওয়া দু-মানুষ উঁচু ক'রে। বাঘের উপদ্রব ওখানে প্রচুর—তাই কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে বাড়ীগুলি—যাতে সহজে বাঘ এসে উপদ্রব না করতে পারে। গরু ছাগল নিয়ে সবাই এক ঘরেই থাকে। শিকার করতে এরা খুব ভালবাসে। চাষবাসও করে। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভুট্টা। এক দিন এদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম এরা রোজ 'রেউড়ী' খায়। শুনে ভাবলাম—বুঝি বা রাবড়ী হবে—ভারী ফূর্ত্তি হ'ল আমাদের। তা হলে তো রোজই বেশ রাবড়ী খাওয়া যাবে। ওদের একদিন তো আনতে বললাম। সন্ধ্যের সময়ে একটি ভীল বেশ যত্ন ক'রে নিয়ে এলো পাতার ঠোঙাতে—এক ঠোঙা ভুট্টাসিদ্ধ। আমরা তো একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

ভুট্টা কুটে নিয়ে তাই সিদ্ধ করে একটা মাটির হাঁড়িতে,

আর থাকে ওদের একটা করে কাঁসার বাটী—বাড়ীর গিন্নি সেই হাঁড়ি ও বাটি নিয়ে মাঝখানে বসে। তার চার দিক্ ঘিরে বসে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা, এক একটি পাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে। গিন্নি বাটি ক'রে হাঁড়ি থেকে ভুট্টা-সিদ্ধ—মানে 'রেউড়ী' তুলে পাতার ঠোঙাতে সবাইকে পরিবেশন করে। নুন ওদের কদাচিৎ মেলে—সেটা বিলাসের সামগ্রীর মতোই দুষ্প্রাপ্য বস্তু ওদের কাছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে এই মেলামেশা আবার আমাদের গার্দ্দে সাহেব পছন্দ করতেন না—তাঁর আত্মগরিমায় আঘাত লাগতো। কিন্তু আমাদের তাঁর পছন্দ বা অপছন্দে কিছু আসে যায় না—আমরা ভীলদের সঙ্গে মিলে মিশে খুব খুশীতেই দিন কাটাতে লাগলাম। সারাদিন কাজ করতাম গার্দ্দে সাহেবের কড়া পাহারায়—আর সন্ধ্যে কাটতো সহজ সরল নিরীহ ভীলদের নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের জন্য থেকে থেকে মন কেমন করতো। সেখানকার বন্ধুবান্ধব, গাছপালা, খোয়াই, মাঠ—সব কিছুরই অভাবে মাঝে মাঝে কাতর হয়ে পড়তাম। শান্তিনিকেতনের বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি ও খবরাদি পেলেই আবার মনে নতুন ক'রে উৎসাহ জেগে উঠতো। একবার দিনুবাবু লিখলেন—

ভো ভো শিল্পীত্রয়
লেখনীর তীর জুড়ি কর ধনুখান
ছাড়িল তিনেরে লখি শব্দভেদী বাণ।
সে বাণ বিঁধিল কারে পথ মাঝখানে?
কে সে জন নিল হরি' খোদা-তাল্লা জানে!
তিন তিন মহাবীর এক হেথা দীন,
তুলি রঙে মারে টান ছোটে 'গয়া' 'চীন'
শব্দেরে আটকি' জব্দ কর রেখা টানে
এ ভোতা কলম তাই লাজে হার মানে।
কলাভবনের কালাবঁধু নন্দলাল
ভীলেদের মথুরায়?—হায় রে কপাল!
ইন্দ্রপুরী আধা রচি শচীশূন্য সুর
খ্রি-কাসেল ধোয়া—স্বর্গে ভাবরসে চুর।
হলধর অসিত সে বলরাম সম
বয়সে কালার ছোট, উচ্চে দাদাতম—
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে,
সে রসে বঞ্চিত—তবু চাতাল তো বটে।
অসহযোগিতা চিঁড়ে ভেজে না কথায়,
অসহ বিরহ জ্বালা সহিয়া হোথায়
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছ বাস—
এরাই গাঁধীর চেলা, সাবাস সাবাস।
বুরোক্রাসি বুড়খাসি করিতে জবাই
ছেলে—বুড়া, বাবা, খুড়া লেগেছে সবাই।
কলিকাতা এলো রাজা জারজের খুড়ো,
খেয়ে গেল ঝাঁটা, তাও একেবারে মুড়ো।
কেন মিছে আছ পড়ি গুহার গরতে
মরতের জীব ফিরে এস গো মরতে॥

এই রকম সরস চিঠিতে নিঃসঙ্গ প্রবাসে আপন মনের সঙ্গ পেতাম—ক্লান্তি, অবসাদ দূর ক'রে দিত।

কাজ তো চলছে—কিন্তু আমাদের জন্য যে ছবি আঁকবো, তার জন্য অনুমতি আর কিছুতেই পাচ্ছি না। গার্দ্দে রোজই ভরসা দেয়, "এই এল ব'লে—আপনারা এদিকের কাজটা শেষ করুন না আগে, তত দিনে অনুমতি-পত্র ঠিক এসে যাবে।" ব্যাপার সুবিধের নয়। অসিতকে বললুম যে গার্দ্দে সাহেবের মনোভাব অনুকূল নয়—যে রকম দেখছি শেষ পর্যন্ত আশায় আশায় কাটবে—যাবার সময়ে খালি-হাতেই ফিরতে হবে। অথচ লুকিয়ে কিছু করবার জো নেই—ওদের লোক দিনরাত চার পাশে ঘোরাঘুরি করে।

এর মধ্যে এক দিন সুখবর পেলাম—গার্দ্দে সাহেব

কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। শুনে মনটা নেচে উঠলো। এইবারে নিজেদের কাজ ক'রে নেবার সুযোগ পাব। কিন্তু গার্দ্দে সাহেব আবার ওভারসিয়রকে এমন ভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেলেন যে তিনি দেখি গার্দ্দে সাহেবকেও ডিঙিয়ে যান। বড় রাগ হ'ল আমাদের। ওভারসিয়র যে কাজ করবেন তা'র দেখাশোনার ভার ছিল আবার আমার ওপর। ভাবলাম—এবারে এঁকে জব্দ করতে হবে। পঁচিশ-তিরিশ ফুট উপরে এক কোণায় ছাদের সিলিঙে চৌকো একটা ডিজাইন ছিল—তাকে বললাম ওটা আঁকতে হবে। তিনি তো ভড়কে গেলেন, বললেন অত উঁচুতে কি ক'রে উঠব—পারবই বা কেমন করে। আমি বললাম—তারও ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি;—এই না ব'লে লোক লাগিয়ে অত উঁচুতেই ভারা বেঁধে একটা দড়ির খাটিয়া ঝুলিয়ে দিলাম। বললাম—এইবারে আঁকুন। কি করেন বেচারা—চামচিকা, বাদুরের উৎকট গন্ধ, তিন দিনের দিন 'কলিক' ব্যথায় মর-মর অবস্থা তাঁর। তাড়াতাড়ি তাঁকে তাঁবুতে এনে শুশ্রূষা করতে লাগলাম সবাই মিলে। সঙ্গে ওষুধ কিছু তো ছিলই, আমাদের সেবা-শুশ্রূষায় কিছু দিন বাদে তিনি একটু ভাল হয়ে উঠলেন। অসুখে ভুগে ও আমাদের সেবা পেয়ে মনটা বোধ হয় তাঁর খুব নরম হয়ে গিয়েছিল—তাই এক দিন দুঃখ ক'রে বললেন যে, গার্দ্দে সাহেব ওকে আমরা যা'তে কোনও ট্রেসিং বা কপি না নিতে পারি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়ে গেছেন। আরও ব'লে গেছেন যে "আমি আসব ছয় তারিখে কিন্তু সবাইকে বলবে যে আমি দশ তারিখে আসব। আর আমি সোজা রাস্তায় আসব না—কোন্ রাস্তায় আসব তা তোমাকেও বলব না। আমি হঠাৎ এসে দেখব চুরি কোথায়ও হচ্ছে কি না"—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওভারসিয়রেরও নানা কারণে গার্দ্দে সাহেবের উপর রাগ ছিল। আমাদের বললেন, "আপনারা এই ফাঁকে যা যা পারেন কপি ক'রে নিন—আমি কাউকেই কিছু জানাবো না।" আর আমাদের পায় কে? দিন রাত তাঁবুর ভিতরে ব'সে তিন জনে মিলে আগের ট্রেসিংটা থেকে ট্রেস করছি। ওভারসিয়রও আমাদের কাজে তখন সাহায্য করতে লাগলেন। রাস্তা ও আশেপাশের চার দিক অনেক দূর অবধি দেখা যায়—এমন জায়গায় ইন্দ্রকে বসিয়ে রেখেছি—যেন গার্দ্দে সাহেবকে দেখামাত্র আমাদের খবর দিতে পারে—আর সময় মতো আমরাও যেন সব লুকিয়ে ফেলতে পারি। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক—তিন জনে উপুড় হয়ে ব'সে ছবি ট্রেস করছি, অর্দ্ধেকেরও বেশী হয়ে এসেছে—হঠাৎ দেখি গার্দ্দে সাহেব একেবারে তাঁবুর ভিতরে।—এ কি ব্যাপার—অসিত হক্‌চকিয়ে তুলি রং ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—আমি তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বসিয়ে দিলাম। গার্দ্দে সাহেব ত রেগে টং! বললেন, আবার কেন ট্রেসিং হচ্ছে? আমি বললাম, "দেয়ালের যা অবস্থা—জল লাগলেই ত ঝরে যাচ্ছে—কবে কি হয় বলা যায় না, ছবি ত শেষ করতে হবে আমাদের—একটা ট্রেসিঙের উপর ভরসা কি? দেয়ালের যদি কিছু হয়—তবে এদিক ওদিক দু-দিক যাবে। এত পুরণো জিনিস, একটা কেন—তিন তিনটে ক'রে ট্রেসিং আগে হাতের কাছে রাখা দরকার।" ওদের ছবির জন্যই ট্রেসিং করছি—কিছু বলবার আর মুখ নেই, গট্ গট্ করে গার্দ্দে সাহেব নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। অসিত জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—কি বাঁচানই বাঁচালে এবারে দাদা তুমি।

সেদিন ছিল ভীলদের এক পরিবারে বিয়ে। জীবনে পুরোহিতের কাজও করেছি একবার—সে ঐ ভীলদের বিয়ের সময়। ওদের বিয়ে ভারী মজার আর বেশ সহজ। প্রথম ও প্রধান হচ্ছে—এক দিনের মধ্যে বরের জন্য একটা ঘর তুলে দিতে হয়। ব্যাপারটা তেমন শক্ত কিছু নয়। সকালে জনকয়েক মিলে একটা তৈরী চাল ধরাধরি করে এনে একটা জায়গায় কতকগুলি খুঁটি গেড়ে বসিয়ে দিয়ে চালের বাতা থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় কয়েকটি দড়ির খাটিয়া। বৃষ্টি-বাদলের বালাই নেই ওদিকে—চালের উপর কিছু শুকনো ডালপাতা ছড়িয়ে দিলেই হ'ল। তার পর সামনে পাঁচ জন বিশিষ্ট লোক ছোট ছোট চারপায়াতে বসে। আমি সেবারে পাঁচ জনের মধ্যে এক জন ছিলাম। প্রথম আসে বরের বাবা—পাঁচ জনের হাতে খানিকটা ক'রে গুড় দেয় খেতে, পরে আসে ক'নের বাবা, সেও পাঁচ জনের হাতে গুড় দেয়, গুড় খাওয়া হ'লে আসে বর ক'নে পাঁচ জনকে প্রণাম করে হাত ধরাধরি করে চলে যায়—হয়ে গেল বিয়ে। তার পর চলে নাচ গানের হুল্লোড়, মদ খাওয়া, মাংস রান্না, চলল উৎসব দুই-তিন দিন সমানে। মদ খেতে পেলে আর ওরা কিছু চায় না। তিন চার দিন ভোঁ হয়ে থাকে। এই রকম উন্মত্ত অবস্থায় খুনজখমও হরদম হয়ে থাকে।

তখন অসহযোগের যুগ—মহাত্মাজীর বাণী ওখানেও পৌঁছেছিল। ভীলরা মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। আবগারী আয় স্টেটের কমে যায়, তাই একবার স্টেট থেকে মদের পিপে খুলে দেওয়া হয় ওদের আবার মদ ধরাবার জন্য। আর

ভীলদের নাচ

যায় কোথায়? ভেসে গেল মহাত্মার বাণী—চলল দিনের পর দিন মদ খাওয়া। সেই অবস্থায় একটা ভীলের সঙ্গে আর একটার হয় ঝগড়া,—ফলে মুহূর্তে তার মুণ্ডপাত। সবাই ছুটে দেখতে গেল। এই রকম খুনে আদালতে ওরা খালাস পেয়েই যায়। ভয় কাকে বলে ওরা জানে না। বাঘ ভাল্লুককে সুবিধে পেলেই তাড়া করে। আমরা ওখানে থাকতেই এক দিন শুনি হৈ হৈ ক'রে সবাই বনের দিকে ছুটছে। খবর নিয়ে জানলাম একটা বাঘ গ্রামে ঢুকে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। কিছুকাল বাদে দেখি—ঠিক ছাড়িয়ে এনেছে ছাগলটা, বাঘের মুখ থেকে। বাঘ সবে বোধ হয় খেতে সুরু করেছিল—শেষ করতে পারে নি। সেই রাত্রে সেই বাঘে-মারা ছাগল রান্না ক'রে উৎসব চলল সমস্ত রাত ব্যাপী—মদ ও নাচগানের সঙ্গে সঙ্গে।

সুখেই দিন কাটছে এক রকম। আমাদের জন্য ট্রেসিং-টাও শেষ ক'রে এনেছি। রোজ সকালে গার্দে সাহেব ঘণ্টা-দুয়েক গীতা পড়তেন, সেই সময়ে আমরা ট্রেসিঙের উপরে কিছু কিছু রঙের নমুনা দিয়ে নিতাম যেন শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তা থেকেই ছবি করতে পারি। গার্দে সাহেবের তাঁবুতে তাঁর অজানিতে একটা ফুটো ক'রে দিয়েছিলাম—একজন সেই ফুটো দিয়ে দেখতো—যতক্ষণ গার্দে সাহেব গীতা পড়তো ততক্ষণ এদিকে আমাদের কাজ সামলে নিতাম। এমনি ক'রে আমাদের ছবির জন্য ট্রেসিং ও রঙের নমুনা মোটামুটি শেষ ক'রে ফেলেছি। এখন কি ক'রে পাঠান যায়! দু-মাইল দূরে পোস্টাফিস—সেখানকার পোষ্টমাষ্টারটি মরাঠী বামুন, ভদ্রলোক। আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তিনি বললেন, উটের ডাকে পাঠালে তাড়াতাড়ি পৌঁছবে। রাত্রে ব'সে সিলমোহর লাগালাম—ছবির পার্শেল। সকালে গার্দে সাহেব গীতা পাঠে মগ্ন, আমরা এদিকে মাল চালান করলাম ইন্দ্রর হাত দিয়ে একেবারে পোস্টাফিসে।

পাঠালাম তো—এখন পৌঁছান সংবাদ না আসা অবধি মন সুস্থির হচ্ছে না। রোজ অপেক্ষায় থাকি কবে শান্তি-নিকেতন থেকে খবর পাব যে নিরাপদে সব গিয়ে পৌঁছেছে। নয়ত এত দিনের শ্রম বৃথাই যাবে। দিন বড় দীর্ঘ ঠেকছে—সহজে কাটতে চায় না। যে প্রেরণায় এত দিন কাজ ক'রে গেছি সেই কাজ হাসিল হয়েছে, ওদেরও কাজ প্রায় শেষ ক'রে এনেছি।

শীতের শেষ—বসন্তের ছোঁয়াচ লেগেছে চার দিকে, এক সময়ে দেখি, গাছে পলাশ ফুটতে সুরু হয়েছে—আমের ডালে মুকুল ধরেছে। দেখে ছেলেমানুষের মত আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। আমের বোল পলাশের কুঁড়ি চির-পরিচিত আপনার জনের মত ভুলিয়ে দিলে আমাদের প্রবাসের দুঃখ।

এক দিন ভীলদের নিমন্ত্রণ করলাম। এত দিন ওদের নিয়ে সুখেই ছিলাম, এবারে ছেড়ে আসবার পালা আসছে, গার্দে সাহেবের খুঁৎ খুঁৎ সত্ত্বেও ওদের নিয়ে একটু হৈ হৈ করবার বাসনা দমাতে পারলাম না। চার-পাঁচটা খাসি কাটা হ'ল—ভীলরাই সব কিছু জোগাড় ক'রে আনলে—মেয়েরা আনলে বড় বড় হাঁড়ি, নিজেরাই তৈরী ক'রে মাটি দিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে, ইঞ্চি দেড়েক পুরু,—দু বেলা মেজে ঘষে রাখে—পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে। এতো মজবুত যে দু-তিন পুরুষ ওদের অনায়াসে চলে যায় ঐ এক মাটির হাঁড়িতেই। সুরেন রান্নার ওস্তাদ—সব দেখিয়ে দিলেন—ওরা নিজেরাই রান্না করলো। আমরা যা নিমন্ত্রণ করেছিলাম প্রায় তার দুই গুণ লোক বেশী এল। খাবারও সেই অনুযায়ী কম পড়বারই কথা। কিন্তু ওরা নিজেরাই তা বিবেচনা ক'রে যা খাবার ছিল—সবার জন্যই সমান
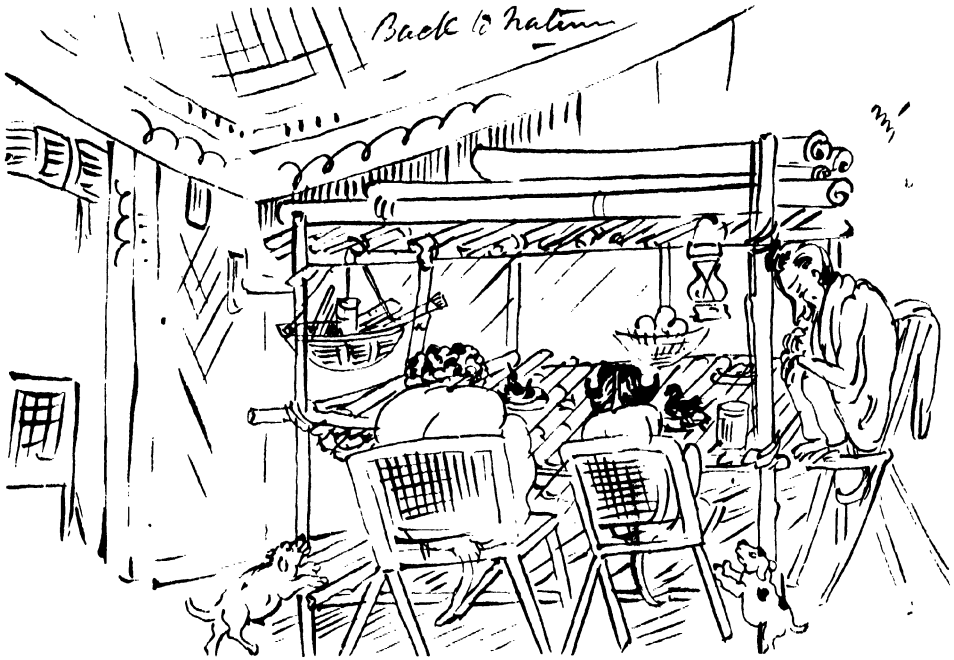
াবুর ভিতরে আমরা তিন জন

ভাবে পাতার ঠোঙাতে ভাগ ক'রে সকলের হাতে হাতে দিয়ে দিল। কেউ একটু প্রতিবাদ করলো না। ওদের সেদিনের ব্যবহার চিরদিনের মত অন্তরে গাঁথা রইলো। ওদের বিনম্র আচরণ সভ্য সমাজকে লজ্জা দিল।

দু-দিন বাদে চিঠি পেলাম—শান্তিনিকেতন থেকে জগদানন্দবাবু লিখেছেন, "জিনিস নিরাপদে পৌছেছে"—এই ছিল আমাদের সাঙ্কেতিক কথা। উল্লাসে সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলাম—'বন্দেমাতরম্'। গার্দ্দে সাহেব ছুটে এলেন—বলেন ব্যাপার কি! আমি বললাম, কিছু না এই একটু স্বদেশী আন্দোলন করছিলাম—আমরা এ রকম মাঝে মাঝে করেই থাকি।

গার্দ্দে সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের অনুমতি-পত্রের কি হ'ল? গার্দ্দে সাহেব বললেন, "এই এল ব'লে, আর বেশী দেরী নেই। আমি বললাম—আর আমাদের দরকারও নেই। যা পাঠাবার তা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি—মাল সেখানে পৌছে গেছে। আজকের এই উল্লাস সেই জন্যই। গার্দ্দে সাহেব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিন মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। ওঁদের যা যা ছবি 'কপি' করে দেবার চুক্তি ছিল তা শেষ হয়ে গেছে—এবারে এখানকার পার্ট তুলতে হবে।

ভীলদের দোলের উৎসব আসন্ন। আমরা চলে আসব শুনে ওদের দোলের উৎসব কুড়ি দিন এগিয়ে দিল এবং আমাদের করল মাননীয় অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ। উৎসবের দিনে বিশেষ আসনে আমাদের বসতে দিয়ে এক ধারে দাঁড়াল মেয়েরা লাইন ক'রে, এক ধারে ছেলেরা বাজনা নিয়ে—আর একদিকে চলতে লাগল রান্নার আয়োজন। উৎসবের প্রারম্ভে মেয়েরা আমাদের নাম জেনে নিল। তার পর সুরু হ'ল উৎসব। আমাদের নাম ধরে এমন কি বাপ-ঠাকুর্দা তুলে মেয়েরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। আমরা তো অবাক্—এত দিন মিলে মিশে সুখে দুঃখে দিন কাটালাম—আর শেষটায় এই ছিল কপালে লেখা? সর্দ্দার বললে—এই-ই হচ্ছে ওদের উৎসবের রীতি। আমরা মাননীয় অতিথি—আমাদের উপলক্ষেই আজকের এই উৎসব, তাই উৎসব-মন্ত্র আমাদের উপরই বর্ষণ হচ্ছে। কি আর করি, ওদের আন্তরিকতায় উৎসবের অত্যাচার শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করতে হ'ল।

পরদিন চলে আসব, ভীলেরা অনেকেই কাঁদতে

লাগল আমাদের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় কাতর হয়ে। ওদের ছেড়ে আসতে আমাদেরও কম কষ্ট হয় নি। মোটঘাট বেঁধে তৈরী হলাম। আবার সেই গরুর গাড়ী। আগের গাড়ীতে চলেছি আমরা, পিছনে ইন্দ্র আর একটা গাড়ীতে জিনিসপত্তর নিয়ে। দূরে দেখি ভীলরা তখনও দাঁড়িয়ে, গাড়ী দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্য্যন্ত বোধ হয় আমাদের বিচ্ছেদ-দুঃখকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। ক্রমে গ্রাম মিলিয়ে এল। মাইলের পর মাইল ব্যাপী দু-পাশে লম্বা লম্বা সোনালী ঘাস। হঠাৎ দেখি ঘাসের ভিতর দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি ছিট্‌কে বের হচ্ছে, আর পুর পুর ক'রে ঘাস পুড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল ও আশেপাশে আগুন ছড়িয়ে যেতে লাগল। এই ঘাস হচ্ছে গ্রামের লোকের প্রাণ—সযত্নে রক্ষা করে, গরু ছাগল এইতেই প্রতিপালিত হয়। পাশের গ্রামের লোকেরা আগুন দেখে বড় বড় লাঠি ও কোদাল হাতে নিয়ে দৌড়ে এল। ইন্দ্র ভয় পেয়ে ছুটে এল আমাদের গাড়ীর পাশে। সে-ই এই কাণ্ডটি করেছে। বলে লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস দেখে কেমন লোভ হ'ল, তাই একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে ফেলে দিয়েছিল ঘাসের মাঝে। আমরাও একটু ভাবিত হলাম—তাই তো এবারে না জানি লোকগুলো আমাদের আক্রমণই করে বা। গ্রামের লোকেরা এসেই আগে জ্বলন্ত ঘাসের দু-দিকে হাত-তিনেক চওড়া ক'রে রাস্তার মতো কেটে পরিষ্কার ক'রে দিল—পরে লাঠি দিয়ে ঘাসের আগুন পিটিয়ে পিটিয়ে নেবাতে লাগল। কে আগুন লাগাল—কেন লাগালে সে খোঁজ ক'রে সময় নষ্ট করবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করল না। আশ্চর্য্য হলাম—আবার এক বার। গরুর গাড়ী বাঁক ঘুরল। দু'-দিকে পলাশবন—চার দিক্ পলাশের রঙে রাঙা হয়ে গেছে।

সুখে দুঃখে জড়ানো কত স্মৃতি নিয়ে ফিরলাম দেশে—কিছু বা তাদের মনেও রেখে এসেছি—আজ কে তা আর বলতে পারে।

মাঝ রাস্তায় এসে খবর পেলাম রেল-লাইনে ষ্ট্রাইক হয়েছে—রেল-চলাচল বন্ধ। এত দূর এসে এবারে মাঝ রাস্তায় আটকে থাকতে হবে—এখন উপায় ?

অসিত বললে—দাদা এক কাজ করা যাক্—চল সবাই সন্ন্যাসীর বেশ ধরি—তাহলে আর ভাবনা কি ? এই ব'লে সে গান ধরলে—

(সুর চড়কগাছ তাল বেতালা)
রেলগাড়ি কি হর তাল হুয়া
আব লেও রাম নাম
বাম তীরথ সে লৌটো সাধু,
আপনা শান্তি ধাম।
(সদা) জপো সীতা রাম।

ভূমিকা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হৃদয়নাথের বাল্য ইতিহাস অনেকটা এইরূপ :—

কলিকাতা শহরে তাহার জন্ম, কিন্তু জন্মভিটা বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে সে-ধারণা তাহার বুদ্ধির অগোচর। অর্থাৎ, তাহারা যে কলিকাতার আদি বাসিন্দা এ-গৌরবটুকু বংশের পূর্ব্বগামীদের নিকট হইতেই পাওয়া। তাঁহারা এক কালে গল্পের রাজারাজড়ার মতই খ্যাতিমান ছিলেন; বহু গবেষণা করিয়াও সে রাজপ্রাসাদের স্থান নির্ণয় হৃদয়নাথ কেন, তাহার ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষেও করিতে পারেন নাই। টালিগঞ্জ হইতে টালা পর্য্যন্ত অনবরত বাসা বদল করিয়া তাঁহারা কয়েক পুরুষই জীবনী লেখার মশলাকে অত্যন্ত অনাদরেই নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। হৃদয়নাথের অবশ্য ইতিহাসের প্রতি তেমন নিষ্ঠা নাই; উত্তর, দক্ষিণ অথবা মধ্য কলিকাতার কোন অখ্যাত বাসায় সে জন্মিয়াছে সে-টুকু পর্য্যন্ত সে জানে না। পৃথিবীকে জানিবার চেষ্টা যে বয়সে সুরু হয় এবং যাঁহারা এ-সময়ের আদিগুরু, তাঁহারাই ত হৃদয়নাথকে সে অবসর দেন নাই। দূরসম্পর্কের মাসী আসিয়া অনাথ বালকটিকে কোলে তুলিয়া না লইলে এ-কাহিনী হয়ত গড়িয়াই উঠিত না। কিন্তু সহসা মাসীর কাছে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া হৃদয়নাথ মানুষ হইয়া উঠিল এবং জগৎকে ভাল করিয়া চিনিল। হৃদয়নাথের অভিজ্ঞতার পরিধি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই জগৎ-পরিস্থিতির সামঞ্জস্যহীন রূপটা চক্ষুপীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। সঙ্গীসাথীদের বেশভূষার পানে চাহিয়া, রাস্তায় মোটরফিটনের পানে চাহিয়া ও পথ চলিবার কালে দুধারের প্রাসাদোপম বাড়িগুলির পানে চাহিয়া এই অসাম্যকে সে রীতিমত অনুভব করিতে শিখিল। সে ভাবিতে লাগিল, যদি বিধাতা বলিয়া কোন সমদর্শী হৃদয়বান্ পুরুষ কোন অলক্ষ্যে আজও জীবিত থাকেন— তবে তাঁহার পক্ষপাতদুষ্ট সৃষ্টির কলঙ্কে তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি হয়ত নাই; থাকিলেও বার্দ্ধক্য-জনিত দৌর্ব্বল্যে মন ও চোখের দোষ তাঁহার নিশ্চয়ই হইয়াছে। উচ্চরোলে যাহারা কাঁদে ও নীরবে যাহারা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাহাদের আর্ত্তনাদ বা আর্ত্তি কোনটাই ত বৃদ্ধ বিধাতার কানে বা অন্তরে ঘা দেয় না।

অনেক ভাবিয়া হৃদয়নাথ স্থির করিল, এক দিন হয়ত ছিল যখন সত্যই স্রষ্টার আবশ্যক ছিল; আজ তিনি অনাবশ্যক। বীজ বপন করিয়াই তিনি ইহলৌকিক কার্য্য শেষ করিয়াছেন; এখন গাছগুলি আপন স্বভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। যে ভাল জমি পাইয়াছে তাহার বহুমুখী সতেজ শাখায় পত্র, পুষ্প ও ফলের সমারোহ, যাহার মাটিতে বালির ভাগ বেশী, সে গাছগুলি স্বতঃই ন্যাড়া। শাখাপুষ্ট স্বাস্থ্যসম্পন্ন গাছগুলির আওতায় ও-গুলির আয়ু সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। বিধাতা জমি দিয়াছেন, মানুষ (অর্থাৎ গাছ) কেন সে জমিকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে না? যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের পরমায়ু হইতে ওই সব মৃতপ্রায়দের দেহে কিছু জীবনীরস সঞ্চার করিতে হইবে, এক জমির সার লইয়া আর এক জমির উৎকর্ষ সাধন না করিলে মানুষের বুদ্ধি বা কর্ম্মক্ষমতার কোন মূল্যই থাকে না। অনেক ভাবিয়া এক দিন হৃদয়নাথ শহর ত্যাগ করিল এবং পাড়াগাঁয়ে এক বন্ধুর আশ্রয়ে পল্লী-উন্নয়নকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

*　　　*　　　*

পল্লীর একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আছে। দু-দণ্ড তাঁহার পানে চাহিলে চক্ষুর জ্বালা অনেকখানি কমিয়া আসে। হৃদয়নাথও শান্তি পাইল। বন্ধুর গৃহে নিরুদ্বিগ্ন আহার, খোলা মাঠে চাষীদের সঙ্গে ঘোরা (অবশ্য গ্রীষ্ম বা বর্ষাকাল হইলে রৌদ্র-বৃষ্টির উৎপাতে এই সুখভ্রমণটুকুর আনন্দ দেহ বা মন গ্রহণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ!), সকাল বিকাল চা সেবনের সঙ্গে প্রবল তর্কবিতর্ক কোন দিক্ দিয়াই জীবন জটিল হইবার কথা নহে। হৃদয়নাথেরও ভাল লাগিল।

বন্ধুর অবস্থা সচ্ছল, অনেকখানি জমিজমা তাঁহার আছে, বহু চাষী প্রজার নিকট হইতে তিনি রাজোচিত সম্মান পাইয়া থাকেন। হৃদয়নাথের সবই ভাল লাগিল, কিন্তু বন্ধুর এই অত্যধিক সম্মানলাভটা সে ঠিক অন্তরের সঙ্গে পরিপাক করিতে পারিল না।

এক দিন মাঠের মাঝে বেড়াইতে বেড়াইতে চাষরত

অনেক চাষীকে সে প্রশ্ন করিল, 'বলি শুনছ মোড়লের পো, ক-বিঘে জমি তোমার আছে?'

মোড়লের পো কৃশকায় বলদের ল্যাজ মলিতে মলিতে ও মুখে 'হেট্' 'হেট্' শব্দ করিতে করিতে উত্তর দিল, 'নিজের জমি আর কই কর্ত্তা, ভাগে জমি চাষ করি।'

'মানে?'

'জমি জমিদারের; টাকা দেন তিনি, ফসল হ'লে আধাআধি।'

'আর ফসল যদি না হয়?'

চাষা উপর পানে চাহিয়া এক বার কপালে হাত দিল ও সজোরে বলদ চালনা করিতে করিতে খানিকটা অগ্রসর হইল। হৃদয়নাথও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলিল, 'তোমার নিজের জমি গেল কিসে?'

—'অজন্মা, ধার-কর্জ্জ, খাজনা দিতে পারি নি—'

—'হুঁ। কিন্তু জান, যে জমি চাষ করে জমি তারই—এই হচ্ছে নিয়ম।'

চাষা খানিক অবাক্ হইয়া হৃদয়নাথের দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, 'যে খাজনা দেয়—'

হৃদয়নাথ কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলিয়া বলিল, 'যেমন ফসল হবে, তেমনি খাজনা দেবে। তুমি কি বল ভগবানের এমনি অবিচার যে, এক জন অঢেল টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর এক জন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে? যার টাকা আছে, অথচ পাঁচ জনের কল্যাণে খাটায় না, আইন হওয়া উচিত, তাদের জেলে দেবার।'

মোড়লের পো এই কথায় বিশেষ উৎসাহিত হইল না, পূর্ব্ববৎ 'হেট্' 'হেট্' শব্দে লাঙ্গল ঠেলিতে লাগিল।

চা পানের সময় হৃদয়নাথ বলিল, 'আমায় খানিকটা জমি দাও, আমি আদর্শ কৃষি প্রণালী শিক্ষা দেব।'

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা দেব।'

* * *

আমার এক জন বয়োবৃদ্ধ বন্ধু প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলেন, 'এ-কালে আর সভা-সমিতিতে যেতে ইচ্ছা হয় না, সুরেন বাঁড়ুয্যে বা বিপিন পালের মত বক্তা আজকাল নেই।'

কথাটা আমার ভাল লাগে নাই। সত্য বটে আমরা, তরুণ যুবকেরা, বন্দ্যোপাধ্যায় বা পালের বক্তৃতা শুনি নাই, তাই বলিয়া কয়েক বৎসর আগে জন্মাইবার সুবিধা লইয়া উনি যে আমাদের এতখানি খাটো করিয়া দিবেন তাহাই বা সহ্য করিব কেন?

উনি হয়ত এ-কালের বক্তা হৃদয়নাথের নাম শোনেন নাই। নাম শুনিলেও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যে নিশ্চয়ই বঞ্চিত আছেন। তিনি রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চেঁচাইতে পারেন না সত্য, টেবিল চাপড়াইয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, কখনও ঝুঁকিয়া, কখনও বুক ফুলাইয়া অর্থাৎ চেষ্টা মারিয়া, বিবিধতর ভঙ্গীতে কথার তুবড়ি ফুটাইতে পারেন না সত্য, কিন্তু দুটি কর বক্ষোবদ্ধ করিয়া অথবা চোখের চশমাটি মাঝে মাঝে এক হাতে ধরিয়া মনোজ্ঞ গ্রীবাভঙ্গী সহকারে যে কয়টি কথা ঝিম্ আওয়াজে বলিয়া যান তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ, তেমনই হৃদয়-উত্তেজক। টেবিল সম্মুখে থাকিলেও তিনি তাহা চাপড়ানো দূরে থাকুক, মৃদু টোকাটি পর্য্যন্ত মারেন না; অত্যন্ত উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মুখের হাসিটি শুধু তাঁহার প্রখর হইয়া উঠে। কথার সঙ্গে সে হাসির ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

এক দিন বন্ধুকে হৃদয়নাথের বক্তৃতা শুনিতে লইয়া গেলাম। সেদিন তিনি বলিতেছিলেন:

বন্ধুগণ, জমি যারা চাষ করে, তারা কেন জমির মালিক নয় এ-কথা আমি বুঝতে পারি না। জিনিসের মালিকানা-স্বত্ব থাকলেই জিনিসকে নষ্ট করে ফেলবার অধিকার কারও নেই। কেউ উপোস দিয়ে মরবে, কেউ উদ্বৃত্ত খাবার পচিয়ে ফেলে দেবে—এ অসাম্যবাদকে মানুষ জন্তুর মত মেনে নিয়েছে কেন? এর প্রতিকারও ত মানুষের হাতে। এক জনকে বড় করে হাজার জন আমরা পথের ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছি। ছেলের ওপর বাপের যেমন অধিকার, জমির ওপর তেমনি তার সৃষ্টিকর্ত্তার। ইত্যাদি—

বন্ধু মনোযোগ সহকারে হৃদয়নাথের বক্তৃতা শুনিলেন, কোন মন্তব্য করিলেন না। বুঝিলাম, অভিভূত হইয়াছেন।

বাহিরে আসিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন শুনলেন?'

সে-কথার উত্তর না দিয়া বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার হৃদয়নাথ কি করেন?'

এই ধৃষ্ট প্রশ্নে ক্রোধ হওয়াই উচিত, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া বলিলাম, 'কেন, ওঁর পদমর্য্যাদা অনুসারে বক্তৃতার মর্য্যাদা দিতে চান নাকি?'

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, 'যার যা মর্য্যাদা সে তা পেয়েই থাকে। ওঁর বক্তৃতা শুনে আমার কিছু কৌতূহল হয়েছে ওঁর জীবন-বৃত্তান্ত জানবার জন্য তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

—'কেন, যদি বলি উনি কোন কাজকর্ম্ম করেন না?'

বন্ধু বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সম্ভব।'

বলা বাহুল্য ক্রুদ্ধ হইলাম, 'আপনার যেমন মন তেমনি কথাই বলছেন। ওঁর জমিজমা নাই থাক, সামাজিক মর্য্যাদা নাই থাক—এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন উনি সর্ব্বসাধারণের জন্য—'

বাধা দিয়া বন্ধু বলিলেন, 'সর্ব্বসাধারণের জন্য আমাদের কতখানি মাথাব্যথা, সেটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নে। আমরা নিজের জন্য যা করি, সব সময়ে তাই কি যথেষ্ট?'

'অর্থাৎ?'

'যার ধন নেই সে ধন কুড়োতে ব্যস্ত, যার মান নেই সে মানের কাঙাল, আর যার বিষয় নেই সে ধনিক শৃঙ্খলা ভাঙতে ব্যস্ত।'

রাগ করিয়া বন্ধুর কথার উত্তর দিলাম না।

সেই হইতে বন্ধুকে আর হৃদয়নাথের বক্তৃতা শুনিতে লইয়া যাই নাই। অবশ্য কিছুদিন পরে বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চ হইতে হৃদয়নাথ সহসা অপসৃত হইলেন। শুনিলাম, কথার দ্বারা জনচিত্তকে অভিভূত করার চেয়ে কাজের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে তিনি পল্লীবাসী হইয়াছেন।

* * *

বোধ হয় বৎসর তিনেক পরেই হইবে, কোন এক পল্লীগ্রামে যাইবার সুযোগ ঘটিল। এক ভাইঝির বিবাহ দিয়াছিলাম হাওড়া-আমতা লাইনের কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে। মাছ ধরিবার বাতিক আমার ছেলে বেলা হইতে পুরামাত্রায় বিদ্যমান। ভাইঝির শ্বশুরেরা ও-দিককার সম্পন্ন গৃহস্থ; জমিজমা ও পুকুরবাগিচায় তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। মাছ ধরিবার নিমন্ত্রণটা উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করিলাম।

কুটুম্বের খাতিরে যে অমানুষিক আয়োজন তাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দিয়া অন্যকে আর প্রলুব্ধ করিতে চাহি না, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুকুরের চারকাটিতে অসংখ্য মাছ আসিয়া ঠোকর মারিলেও বৈঠকখানায় শুইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া কষ্ট উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারি নাই। মধ্যাহ্নভোজন এবং গুরুভোজন দুইটিই শিকারের পরিপন্থী।

সুতরাং গল্পই চলিতেছিল। এবং সে-গল্প জমিজমা সম্বন্ধেই। রাশিয়ার পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য কাহিনী কেহ বর্ণনা করিতেছিল, কেহ এ দেশের চাষ-বাসের দুরবস্থা। গুরুভোজনজনিত উদ্গার তুলিয়া ও সিগারেট ফুঁকিয়া চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশার আলোচনা ভালই লাগিতেছিল।

ওখানকারই এক জন ভদ্রলোক এই আলোচনার অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়াই হয়ত বলিলেন, 'যাই বলুন, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। কাজের দ্বারা চাষীদের দুর্গতি দূর করতে না পারলে সমস্ত মিথ্যা।'

হঠাৎ হৃদয়নাথের কথা মনে পড়িয়া গেল। কোমরের ঢিলা কাপড় কষিতে কষিতে তাকিয়াটির উপর ঈষৎ দেহ উঠাইয়া বলিলাম, 'কাজের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন অনেকে করছেন বৈ কি।'

বক্তা তর্ক তুলিলেন, 'কই আমি ত জানি না। মুখে যে যতই বক্তৃতা দিয়া বেড়ান না কেন, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। সম্পদ এমনি জিনিস, ওর একটা প্রচণ্ড মোহ আছে—'

কণ্ঠ উচ্চ করিয়া বলিলাম, 'আমি জানি এমন লোক আছেন যিনি শহরের সুখ অগ্রাহ্য ক'রে পাড়াগাঁর কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছেন।'

বক্তাও কণ্ঠ উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, 'কই, আমি ত এমন লোকের নাম আজ পর্য্যন্ত শুনি নি, বলুন ত তাঁর নাম?'

'কখনও কাগজে হৃদয়নাথ ভঞ্জের নাম শুনেছেন?'

বক্তার মুখে হাসি ফুটিল, ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইলেন।

উৎসাহিত হইয়া বলিয়া চলিলাম, 'তেমন বক্তা বাংলা দেশে আজকাল দুর্লভ, সর্ব্বহারাদের অমন অকৃত্রিম বন্ধুও বাংলায় কম। তিনি এক দিন বক্তৃতা ছেড়ে, শহরের সুখ ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে এসে নামলেন—হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে।'

বক্তা হাসিমুখেই বলিলেন, 'তার পর? তাঁর সে শিক্ষাদানের ফলাফল কি, সার?'

ঈষৎ উষ্ণ হইয়া বলিলাম, 'ফলাফল অবশ্য ভালই,—আমরা সে সংবাদ আর পাই নি।'

—'কিন্তু আমি জানি।'

চমকিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিলাম।

তিনি হাসিমুখেই বলিলেন, 'আমি তাঁর আদিঅন্ত সব জানি। আপনিও জানবেন। এই গ্রামের তিন মাইল দূরে দক্ষিণে আপনার সেই লোকরঞ্জক বক্তা হৃদয়নাথ ভঞ্জ বাস করছেন। বক্তা আর তিনি নন, তাঁর জমিজমার সম্পদ্ দিন দিন বৃদ্ধির পথে। এক হিসাবে তিনি চাষীর অকৃত্রিম বন্ধু, কেন-না, তাঁর কাছ থেকে কর্জ্জের টাকা

না পেলে ওদের চাষ-আবাদ কোন্ কালে শিকেয় উঠতো।'

আহত সম্মান লইয়া আর তর্ক করিলাম না। শুধু বলিলাম, 'সেই হৃদয়নাথ ইনি কি না—'

বক্তা বলিলেন, 'এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা এত শীঘ্র সংসারে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে থাকি যে, আসল মানুষটি তার তলায় চাপা পড়ে যায়। তবু সেদিন হৃদয়নাথকে চিনতে আমিও ভুল করেছিলাম। সে বন্ধু-পরিচয়ে আমার বাড়িতে এসেই উঠেছিল, আমার প্রজাদের দরদ দেখিয়ে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছিল। থাক, সে-সব অবান্তর কথা আজ বলব না। সন্দেহ থাকে, এখানকার যে-কোন লোককে হৃদয়নাথ ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, সে-ই তার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। বলবেন হৃদয়নাথ—যিনি চাষীর বন্ধু অর্থাৎ চড়াসুদে মহাজনী কারবার করেন।'

* * *

হৃদয়নাথের সমগ্র ইতিহাসটি মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। ভূমিকার স্তূপ ঠেলিয়া আসল মানুষটি কি এতদিন পরে দেখা দিল ?

গুরুদেব

শ্রীপ্রতিমা দেবী

যিনি ছিলেন দু-জনের মাঝে
ইন্দ্রধনুর সেতু
যাঁর রঙের তুলি বুলিয়েছিলেন চোখে
সেই আলোতে দেখছি বিশ্বের রূপ।
আজ সেতু ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন
মাঝের ফাঁকা আকাশ পূর্ণ হ'ল
অনুভূতির স্তব্ধতায়—।
যে নীড়ে বেঁধেছিল প্রকৃতি
কবি-চিত্তের তার
সেই জ্ঞানের প্রাচুর্য ধ্যানের ইন্দ্রজাল
দিনের গোধূলিতে মিশিয়ে গেছে।
তিনি নিভে গেছেন, দৃষ্টির সীমানায়
নির্বাপিত জ্যোতি তাঁর উদ্দীপ্ত হ'ল
নিখিলের আকাশ-প্রদীপে।
অন্তিম দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেল
বাহিরের জনসমুদ্রের বুকের ভিতর
মানব-হৃদয়ে রহস্যগুহায়, বাণী হ'ল
তাঁর বন্দী—
যে শ্রাবণ-পূর্ণিমা কত বার তাঁর
প্রাণকে উদ্বেলিত করেছে
সেই পূর্ণিমা তিথিতে ভাসল
পরপারের খেয়া
বিদায়ের সারি গানে।
বর্ষার দিন উচ্ছলিত
ছিন্ন মেঘের পালে পালে,
ভূমার অনুরাগদীপ্ত
অস্তাচলের আবেগ
রইল থমকে।
স্নেহের অজস্রতায়
সমাপ্তির শেষ কথা
চিত্তে দিয়ে গেলে ভরে
সেই নীরব কণ্ঠের সংকেত প্রেরণায়
পূর্ণ থাক আমাদের
নিত্য নিবেদনের থালা।

প্রাচীন সংস্কৃতির দান

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পুরাকালে আকাশ ও ভূমণ্ডল উভয়ই অধিকতর চঞ্চল ছিল। আবহাওয়ার যেমন পরিবর্ত্তন হইত, তেমনি ভূমিকম্প ও পাহাড় উপত্যকার উত্থান এবং সমতল ভূমির পতনও খুব হইত। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সবুজ আচ্ছাদন ও জীবজন্তুর সমাবেশ ও প্রাদেশিক বিচরণেরও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। আবহাওয়ার এই পরিবর্ত্তন চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত। পূর্ব্ব-মানুষ তখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং দিকে দিকে পর্য্যটনও করিতেছে। তখন সে ছিল বন্যজন্তুরই সমধর্ম্মী। পাথরের বা লাঠির, এমন কি আগুনের ব্যবহার জানিলেও অথবা পালিত কুকুরের সাহচর্য্য পাইলেও তাহার জীবন নিতান্ত অনিশ্চিত ও আশঙ্কামূলক ছিল।

অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব ছয় হাজার বৎসর কালে পৃথিবীর আবহাওয়ায় সমতা লক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন উত্তরের তুষারখণ্ড শেষ বার মেরুর দিকে ফিরিল এবং উত্তর-আফ্রিকা, উত্তর-সিরীয়া, ইরাক, ইরাণ এবং পঞ্জাব প্রদেশ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ঝড় ও তুফান আসিয়া এই সকল অঞ্চলকে স্নিগ্ধ ও সবুজ ঘাস ও বনের আচ্ছাদনে শ্যামল করিয়া দিত, তাহা এখন উত্তর দিকে ধাবিত হইল। যাহা পূর্ব্বে অরণ্য ও তৃণভূমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল, এখন সেখানে ধূসর প্রান্তর ও মরুভূমি বিস্তার করিতে লাগিল।

জীবজন্তুর জগতে তখন একটা মহা বিপর্য্যয় ঘটিল। এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে মানুষের আদিম সভ্যতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল নীল, ইউফ্রেটিস ও সিন্ধু নদীর উপত্যকা ভূমিতে।

উত্তাপ বৃদ্ধি ও মরুভূমি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি সঙ্কুচিত হইতে লাগিল এবং বন্যজন্তু যাহাদিগকে শিকার করিয়া প্রাগৈতিহাসিক মানুষ জীবনধারণ করিত, তাহারা মরূদ্যান অথবা নদীপ্লাবিত বিস্তীর্ণ নিম্নভূমির অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যেখানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ছিল, সেখানে এখন নিকৃষ্ট ও বিচ্ছিন্ন শুষ্ক ঘাস অথবা প্রান্তর দেখা দিয়াছে। সেখানে জীবনধারণ ক্রমশঃ অসম্ভব হইতে লাগিল। অনেক বন্যজন্তু দক্ষিণের গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে অথবা উত্তর-ইউরোপে যেখানে অরণ্যভূমি বিস্তৃত, সেখানে পলাইয়া গেল। তাহার পশ্চাতে মানুষ দৌড়িল। অনেক বন্যজন্তু ও মানুষ আফ্রিকা হইতে সিন্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অথবা এই অঞ্চলে যেখানে মরূদ্যান এবং স্রোতস্বতী নদী ছিল সেখানে চারি দিক্ হইতে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

মরূদ্যানের চারি পাশে কিংবা বিশাল নদীর উপত্যকা, ব-প্রদেশ বা জলাভূমিতে মানুষ ও পশুর একত্র অভিযান, বসবাস ও সংমর্দ্দনের ফলে মানুষের আদিম সভ্যতার জন্ম।

মানবের ইতিহাসে ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, যে-অঞ্চলে তাহার গৃহপালিত গরু, ছাগল, মেষ এবং শূকর প্রভৃতি পশুগুলির পূর্ব্ব-বংশ বন্য অবস্থায় বেড়াইত, সেইখানেই সে বন্য ঘাস হইতে গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্যের রূপান্তর করিতে শিখিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ পশু-পালন এবং কৃষি নিদারুণ প্রকৃতির যমজ সন্তান, একই সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ ছয় বা সাত হাজার বর্ষে মরূদ্যানের আশেপাশে কিংবা বিপুল নদীর তটভূমি বা ব-প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সকলেই পশু-পালন যে কৃষিকার্য্যের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা মনে করেন না। অনেকেই মনে করেন যে, একই সঙ্গে মানুষ কোথাও পশুপালন, কোথায়ও বা কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠিত করিত; কিংবা কৃষিকার্য্য বরং পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পশুপালন কি ভাবে প্রথম দেখা দিয়াছিল তাহা অনেকটা কল্পনাসাপেক্ষ। কিন্তু এটা ঠিক যে সব সময় মানুষের যে জ্ঞানকৃত চেষ্টা ইহার পশ্চাতে ছিল, তাহা নহে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, নিয়েণ্ডারথাল মানুষের কুকুর সঙ্গী ছিল এবং কুকুরই প্রথম গৃহপালিত পশু। কুকুর মানুষের সঙ্গ লইত তাহার ভক্ষ্যাবশেষের দ্বারা ক্ষুধা নিবারণের জন্য। ক্রমশঃ সে তাহার হিংস্রভাব ত্যাগ করিয়া মানুষের যত্ন ও প্রীতি লাভ করিতে লাগিল।

মানুষও অন্য হিংস্র জন্তুর সহিত সংগ্রামে তাহাকে অগ্রগামী ও সতর্ক সহচররূপে লাভ করিল। কুকুরের মত অন্য অর্দ্ধ-বন্য অর্দ্ধ-পালিত পশু বা পশুর দলকে মানুষ তাহার বসবাসের নিকট উঁকিঝুঁকি মারিতে বারণ করিত না কারণ অনাহারের সময় ঐ পশুদল তাহার রক্ষিত বা সঞ্চিত আহার্য্যস্বরূপ। অথচ সে বিনা কারণে পশুকে ভয় দেখাইত না বা হত্যা করিত না এবং সর্ব্বাপেক্ষা শিশুও পোষমানা পশুকে মারিতে যাইত না। বোধ হয় এই রীতি অনুসারেই পশুপালনের সূচনা। মানুষ যখন সর্ব্বাপেক্ষা অ-বশ্য বা দুর্দ্দমনীয় ষাঁড় বা মেষকে বাছিয়া নিহত করিতে লাগিল, তখনই সে পশুর উৎপাদনে নির্ব্বাচনের সুরু করিল এবং বশ্য পশুর সুবিধা বিধানে তাহার সন্তানসন্ততি ক্রমশঃ বশীকরণের আরও উপযোগী হইতে লাগিল। পশু পাইল মানুষের নিকট তাহার খাদ্য ও জীবনরক্ষা। মানুষ পশুর নিকট হইতে পাইল তাহার খাদ্য, তাহার বস্ত্রের উপাদান ও তাহার স্ত্রী-জাতিসুলভ স্নেহের সামগ্রী। মানুষ ও জন্তুর উভয়ের জীবনধারণের অনুকূল আদানপ্রদানই পশুপালনের আদিম ভিত্তি।

কখন কোন মাতৃহারা গো-বৎস আদিম মানবের গৃহ-প্রাঙ্গণে আশ্রয় পাইল। সেখানে কোন শিশুহারা মাতার স্নেহ তাহাকে আপনার করিয়া লইল। শুধু যে প্রয়োজনের মাপকাঠিতে মানুষ পশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে তাহা নহে, মানুষের ও সমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধারা আসিয়া পশু ও মানুষের সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছে। উত্তর-এশিয়ায় বল্গা হরিণ খুব সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম গৃহপালিত হয়। ইহার অনুকরণে ক্রমশঃ ছাগল, গরু প্রভৃতি পরে বশীকৃত হইল।

মানুষের সঙ্গে পশুর সম্বন্ধের অভিব্যক্তিতে বশীকরণ ও লালনপালনের প্রভেদ মানিয়া লওয়া আবশ্যক। হয়ত অনেক স্থলে শিকারী মানুষ অনেক বন্য জন্তুকে কোন জায়গায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। যে জন্তু পলাইল সে বাঁচিল। যাহারা বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ হইল তাহাদিগের সন্তানসন্ততি অপেক্ষাকৃত অধিক বশ্য হইল। ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে এমন গুণ দেখা দিল ও বংশ-পর্য্যায়ে সঞ্চারিত হইল যে পরে তাহারা মানুষের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে শিক্ষণীয় বা পরিচালনীয় হইতে লাগিল। কত যুগ ধরিয়া এইরূপে দুর্দ্দমনীয় অবস্থায় প্রথম শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ হইবার পর তাহারা ক্রমশঃ মানুষের বশীভূত ও গৃহপালিত হইয়াছে। মানুষ তাহাকে লালনপালন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাকে বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছে, তাহার দ্বারা লাঙ্গল বা শকট টানাইয়াছে, অপরের সঙ্গে সংগ্রামে তাহাকে সঙ্গী করিয়া তাহাকে যুদ্ধ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছে।

কুকুর, ঘোড়া ও হাতী জন্তুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষণীয়। মানুষের দৈনন্দিন শ্রম-লাঘবের জন্য অথবা বিষম দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে তাহাদিগের নিয়োগ বহুযুগ হইতে পরিচিত। যুদ্ধের ঘোড়া বা হাতী কত সেনাপতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। ডিটেকটিভের কাজে বা সৈন্য-বাহিনীতে কুকুরও আশ্চর্য্য নিপুণতা ও শিক্ষানুগতা দেখাইয়াছে। জন্তুর এই নমনীয়তা বহুযুগ-প্রসারিত নির্ব্বাচন ও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রজননের ফল।

মানুষ গরুকে লাঙ্গলে জুতিয়া প্রথম আপনার সংস্কৃতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করে। পশুচালিত লাঙ্গলের ব্যবহারের পূর্ব্বে কৃষির দ্বারা জনবহুল সমাজে আহার্য্য যোগান অসম্ভব ছিল। খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেবিলনে গরু, ছাগল, মেষ ও শূকর পালিত হইতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ চীন-সভ্যতায় একটি রাজাজ্ঞায় ঘোড়া, গরু, মুরগী, শূকর, কুকুর ও মেষ পালনের ও প্রজননের ইঙ্গিত আছে। খ্রীঃ পূঃ ৩৬৭ সালের এই রাজাজ্ঞা। সেইরূপ সিন্ধুতটস্থ সভ্যতায় ও (খ্রীঃ পূঃ ৩,২৫০-২৭৫০) গরু, ককুদ-বৃষ, মহিষ, শূকর, মেষ ও ছাগল প্রভৃতি পশুকে পালিত দেখা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞের মত এই যে, সিন্ধুতটে অনেকগুলি পশুর প্রথম গৃহপালনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশই গরু, মেষ, ছাগল, কুকুর, মহিষ ও উট পালনের প্রধান এবং হয়ত একমাত্র প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় ককুদ-বৃষ এবং ক্ষুদ্র শৃঙ্গবিশিষ্ট ককুদবিহীন গরু মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার মোহরে মোহরে অঙ্কিত আছে। ইহারা উভয়েই পূর্ব্ব যুগের শিবালিক নর্ম্মদাতীরস্থ গো-জাতির বংশধর। সুপণ্ডিত লিডেকারের মত এই যে, ভারতীয় ককুদ-বৃষ বেবিলন ও পাশ্চাত্যের গৃহপালিত গরুর জনক। একটি মোহরে শৃঙ্গসম্বলিত এক দেবতা (যাঁহাকে কেহ কেহ মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক পশুপতি বা শিব) অঙ্কিত দেখা যায়, যাঁহার চারি দিকে বিন্যস্ত রহিয়াছে হাতী, বাঘ, মহিষ, গণ্ডার ও হরিণ। ইহা বিচিত্র নহে যে, যে সিন্ধু উপত্যকায় মানুষ কৃষি ও পশুপালন প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সেখানে সে নগরবাসী ও বাণিজ্যনিপুণ হইলেও পশুপতিকে দেবতা বলিয়া মানিত।

সৈন্ধব সভ্যতায় শকট ছিল, কিন্তু শকটচালক ঘোটক ছিল না। খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ঘোটক প্রথম আসিল

আর্য্যদিগের সঙ্গে, মধ্য-এশিয়া হইতে। বৈদিক সভ্যতায় ঘোটকের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। নানা যজ্ঞে, বিশেষতঃ পরবর্ত্তী যুগে প্রচারিত অশ্বমেধ যজ্ঞে, রাজন্যবর্গের মধ্যে ঘোটকের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পশুপালনের সঙ্গে ধর্ম্ম ও যাদু আসিয়া মিশিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষের মুখ চন্দ্রমণ্ডলের মত দেখায়। চন্দ্রের পূজার সঙ্গে বৃষের লালনপালনের সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। সৈন্ধব সভ্যতায় ককুদ-বৃষের খুব সম্ভবতঃ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শূকর ও মুরগীর রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অসভ্য জাতির পশুপক্ষী-সম্বলিত ধর্ম্ম ও সমাজবিন্যাসের যোগ দেখা যায়। মানুষ এই প্রকারে তাহার রীতিনীতি ও ধর্ম্ম পশুপালনের প্রয়োজনে লাগাইয়াছে এবং পশুকেও তাহাদিগের মাপকাঠিতে ব্যবহার করিয়াছে।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, খ্রীঃ পূঃ ৭,০০০-৬,০০০ কালে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হয় এবং তুষার-যুগের অবসানে উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষ ও বন্য জন্তু সলিল ও সবুজতার অন্বেষণে মরূদ্যান, নদীর উপত্যকা বা ব-প্রদেশে একত্র সমবেত হয় তখনই একই সঙ্গে কৃষি ও পশুপালনের প্রবর্ত্তন ঘটে। এখনকার গৃহপালিত পশুগুলির দুর্দ্দমনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ঠিক সেই স্থানগুলিতে অবাধ বিচরণ করিত যেখানে যেখানে মানুষের খাদ্যশস্যগুলি নৈসর্গিক অবস্থায় বনে প্রান্তরে পাওয়া যাইত। মিশর, বেবিলন ও সৈন্ধব প্রদেশে মানুষ যখন অরণ্যভূমির সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে শিকার হারাইল এবং ঐ সব অঞ্চলে কৃষির গোড়াপত্তন করিল, তখনই সে পশুপালনও আরম্ভ করিয়াছিল। একটা বিশাল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় না ঘটিলে বন্য জন্তু মানুষের কৃষিক্ষেত্র ও বাস-ভবনের কাছে আসিয়া এমন ভাবে ধরা দিত না। মানুষের মত তাহারাও মরুপীড়িত হইয়া নদীর উপত্যকা বা জলা-ভূমিতে মানুষের বসবাসের সন্নিকটে আহার্য্যের অন্বেষণে দলে দলে উপস্থিত হয়। মানুষও তাহার প্রয়োজন অনুসারে অবিলম্বে তাহাদিগকে পালন করিতে শিখে এবং ক্রমশঃ আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণে, কৃষিক্ষেত্রে ও ধর্ম্মোৎসবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া লয়।

ঐ প্রাচীন যুগে মিশর, বেবিলন ও সিন্ধুপ্রদেশ প্রথম মরুপীড়িত হইলেও এখনকার মত উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। পুরাতন মিশরে এবং সিন্ধুপ্রদেশে এমন সব পশুর পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলি নিম্নতর সিক্ত অঞ্চল ছাড়া বাস করিতে পারে না। মিশরে জলহস্তী, কুমীর, হাতী ও হরিণ পাওয়া যাইত এবং সিন্ধুপ্রদেশে পুরাকালে হাতী, বাঘ, মহিষ, হরিণ এবং গণ্ডার ছিল। হাতী এবং গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সিন্ধুপ্রদেশের কির্ত্থর পর্ব্বতের পূর্ব্ব ভাগে।

সুতরাং এই বিরাট্ অঞ্চল যখন মরুময় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল সেই সময়ে মানুষ একই সঙ্গে কৃষি ও পশুপালন প্রবর্ত্তন করে, একই সঙ্গে হলধর ও পশুপতি হইয়া আপনার ও পশুর জীবন প্রাকৃতিক বিপ্লব হইতে রক্ষা করে। কোথাও মানুষ একই সঙ্গে খাদ্যশস্য ও খাদ্যপশুর সন্ধান পাইল। কোথাও বা ঐ মরুপ্রান্তর অঞ্চলে সে বিপুল পশুদল সংগঠিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। যেখানে পশুর উপর সে একান্ত নির্ভর, সেখানে সে ঘর ও গ্রাম না বাঁধিয়া যাযাবর হইল। কারণ পশুর দলকে পোষণ করিতে গেলে তাহাকে ঋতুপর্য্যায়ের সঙ্গে যেমন ঘাস ও গুল্ম শুষ্ক বা সবুজ হয় তেমনই উষ্ণ অঞ্চল হইতে সিক্ত অঞ্চলে পশুদলকে লইয়া ঘুরিতে ফিরিতে হইত।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে যাযাবর পশুপালকের দান কম নহে। যখন মানুষ পশুর দল হইতে দুগ্ধ ও মাংসের অফুরন্ত যোগান পাইল, তখন তাহার পুরাতন শিকারী জীবনের অনিশ্চিততা ও আশঙ্কা ঘুচিল। বহুল পরিমাণ এবং অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। লোকবলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজবিন্যাস দেখা দিল। গ্রীষ্ম ও শীতকালে সমস্ত দলবল লইয়া মেষপালক জাতিকে দূর দেশান্তরে যাইতে হয়। সুব্যবস্থার জন্য শাসক ও শাসন, আজ্ঞা ও তাহার পালন আবশ্যক। হিংস্র জন্তু অথবা শত্রু জাতি হইতে পশুদল রক্ষার জন্যও শৃঙ্খলা ও সংগঠন অতি প্রয়োজনীয়। শাসন ও সংগঠনের ভার ন্যস্ত হয় সমস্ত পরিবারের কর্ত্তার মধ্যে যিনি প্রাচীনতম তাঁহার উপর, কারণ তাঁহারই প্রকৃতির বিবর্ত্তন, ঋতুপর্য্যায় ও পশুরক্ষা ও গতিবিধি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। বয়োবৃদ্ধ গোষ্ঠীপতির শাসন অমান্য করিবার উপায় নাই। তাঁহার পশুশাসনদণ্ড সমাজের ন্যায়দণ্ড ভাবে গৃহীত হয়। শুধু তাই নহে, মহামান্য গোষ্ঠীপতির বিচার যেমন ন্যায়ানুমোদিত, তেমনই তাঁহার ত্যাগও অসীম। পশুর জন্য, স্বগোষ্ঠীর জন্য তিনি বলি-প্রদত্ত। পশুপালক সমাজে শ্রম-বিভাগ বিশেষ পরিস্ফুট হয়। পুরুষেরা পশুরক্ষার ভার লয়। স্ত্রীলোকেরা লোম, চামড়া প্রভৃতি লইয়া কাপড় বা তাঁবু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
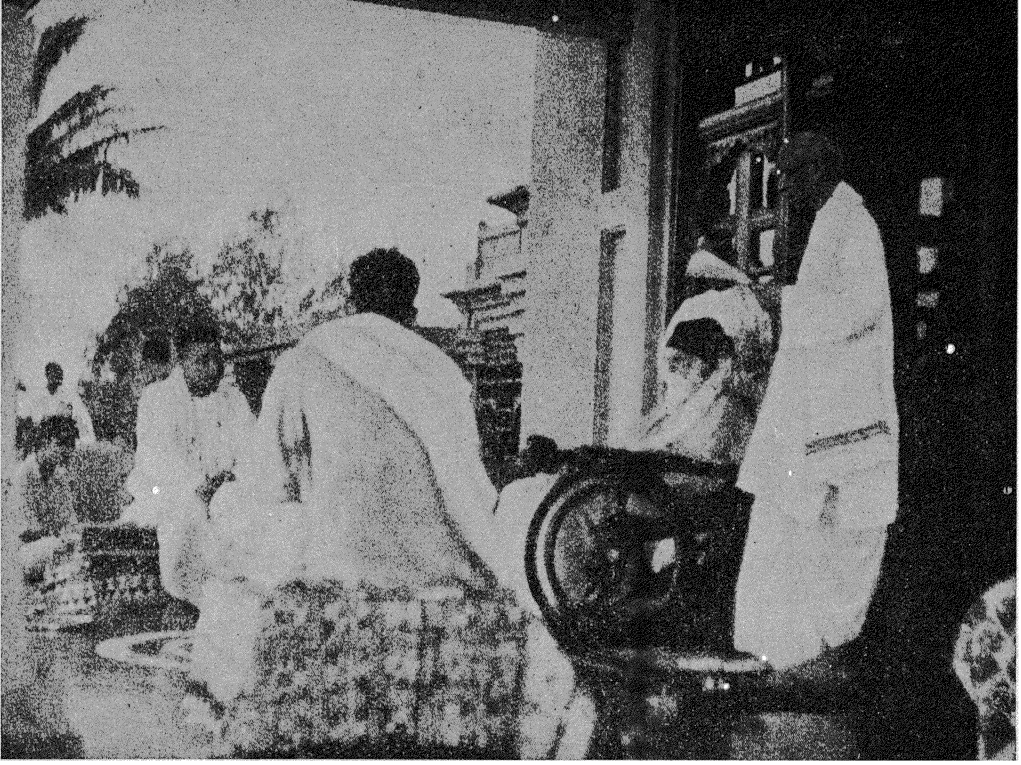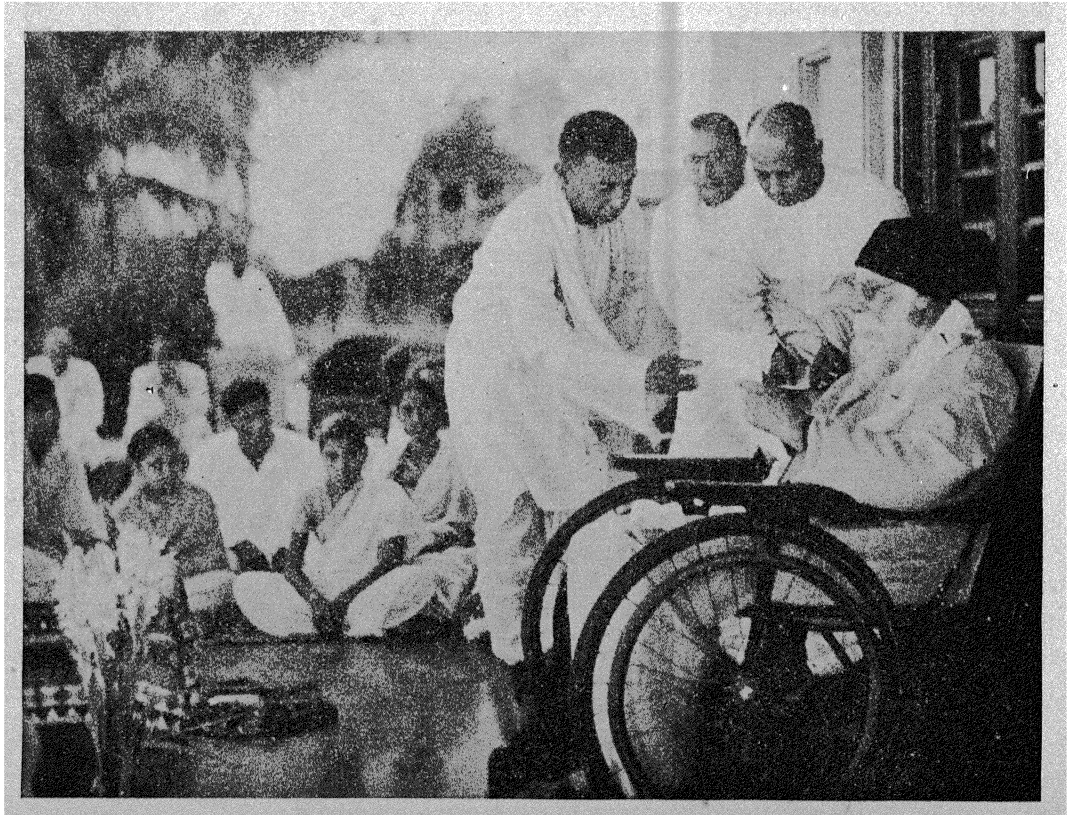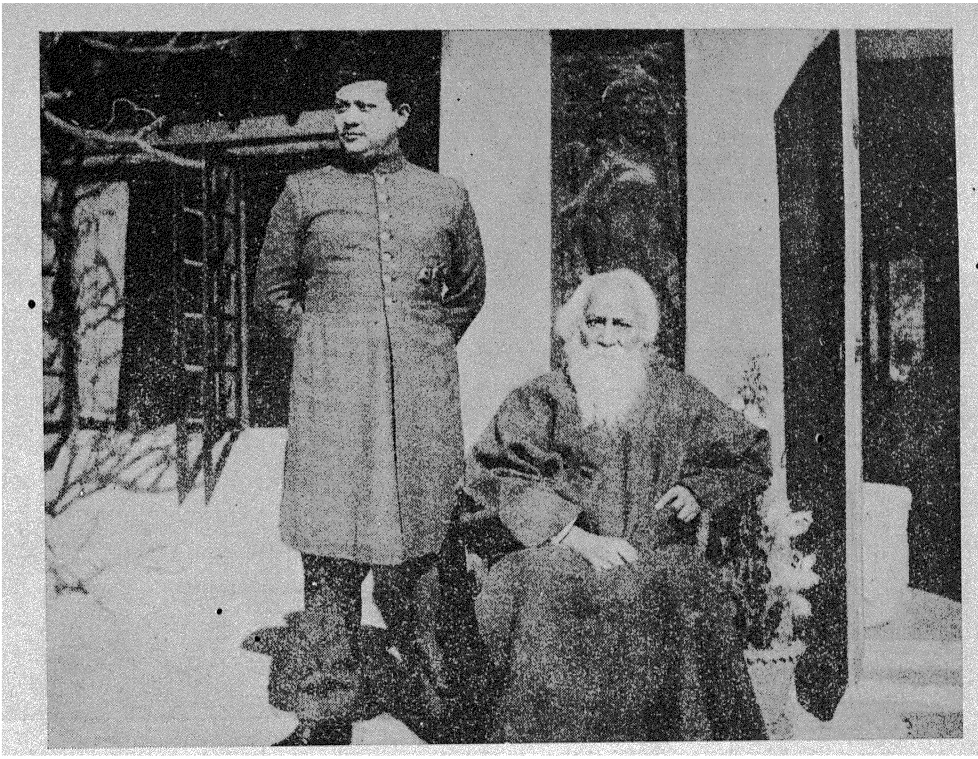
রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পার্শ্বে ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
[১৯৩৮ সনে শান্তিনিকেতনে গৃহীত চিত্র]
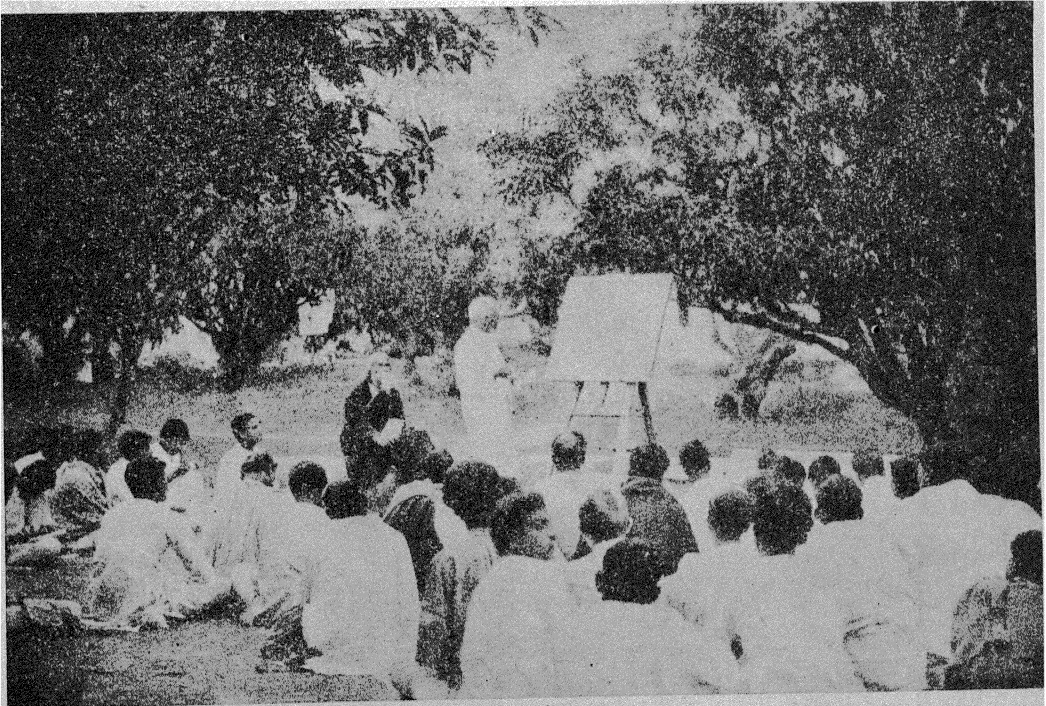
শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী শিক্ষকতায় ব্যাপৃত—কবি পার্শ্বে উপবিষ্ট
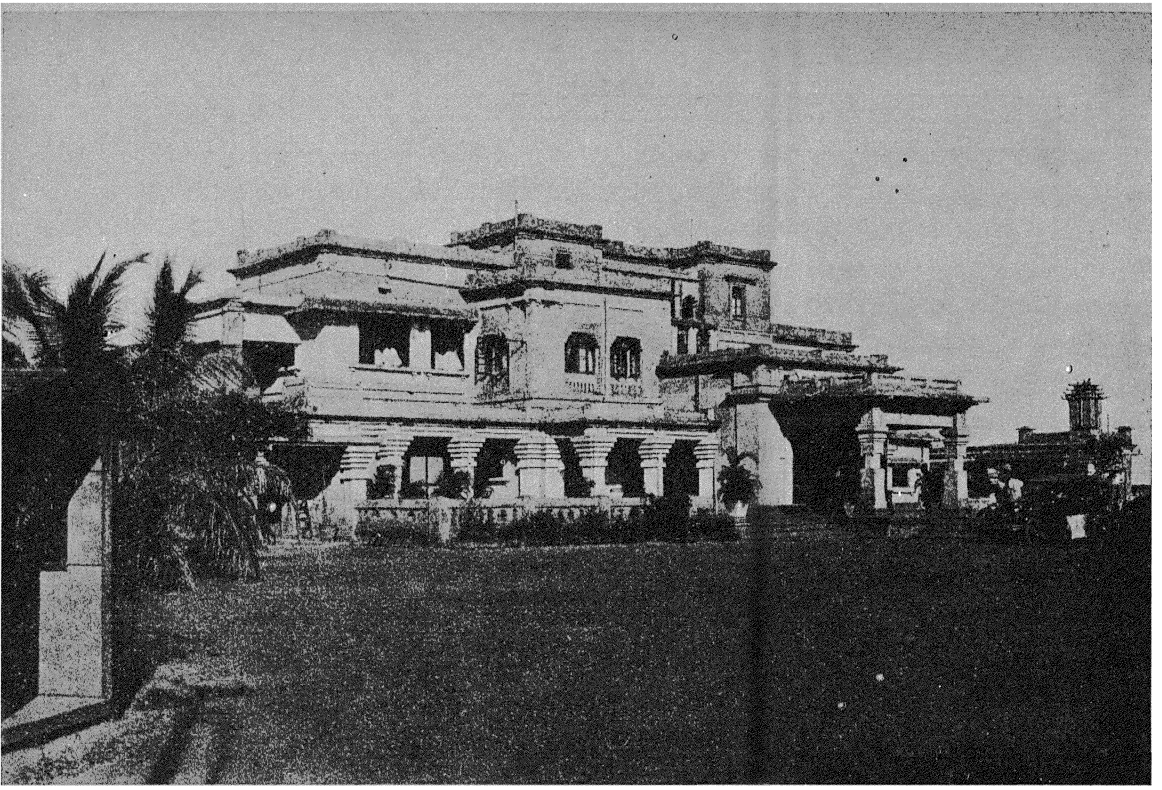
উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন
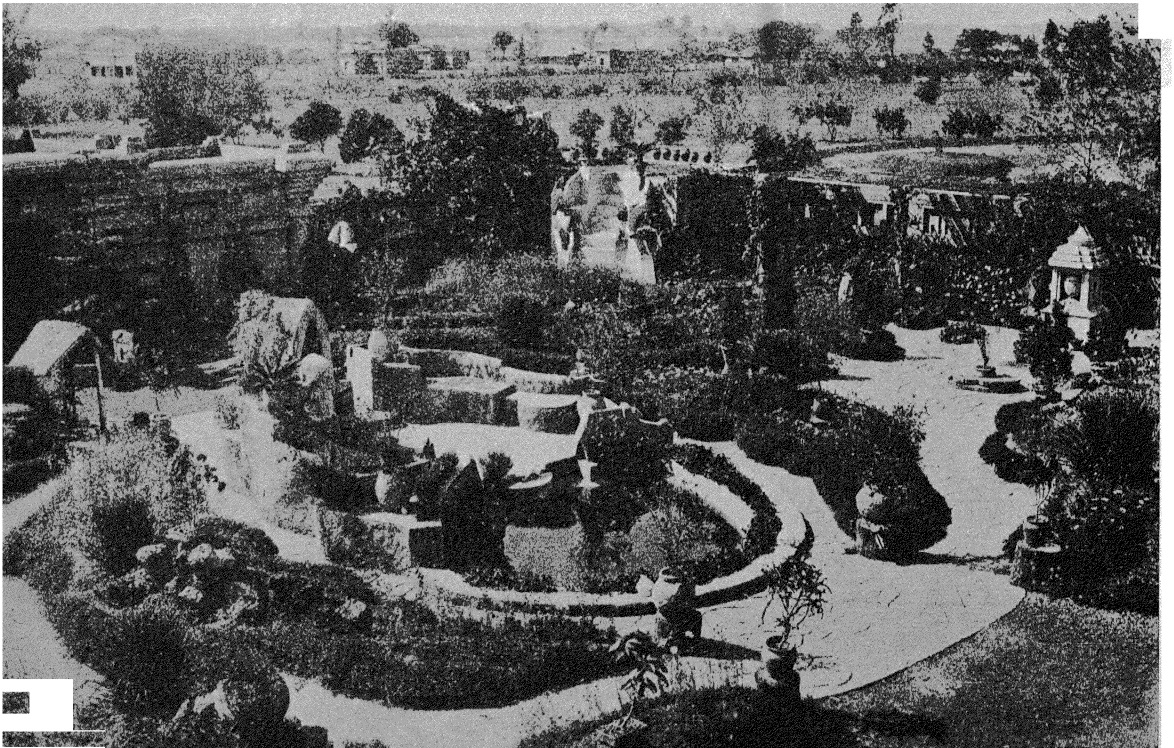
উদ্যান—উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন

বনে। নানা প্রকার হস্তশিল্পের উদ্ভব হয় পশুপালকদিগের মধ্যে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইগুলি স্ত্রী-শিল্প। শিশুরা গো বা মেষ শাবক লইয়া খেলা করে। এইরূপে বিভিন্ন বয়সের লোকের বিশিষ্ট কাজে নিয়োগের ফলে সমাজের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইতে থাকে। মেষপালক সমাজে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য অধিক লক্ষিত হয় না। বরং যখন শত্রুর আক্রমণে অথবা প্রকৃতির অভিশাপে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার সর্ব্বস্ব গোধন সমান ভাবে হারায়, তখন ধনী নির্ধনের প্রভেদ থাকে না। পশুপালক জাতির মধ্যে আতিথেয়তা চির-প্রসিদ্ধ। বিশাল প্রান্তর ও বনভূমিতে মানুষ পথ হারাইলে বা তাহার গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সে একেবারে নিঃসহায়। সমাজে অতিথিবাৎসল্য ও ঔদার্য্য না থাকিলে জীবন-রক্ষা অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামাজিক সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ, পরস্পরের আপদ-বিপদে সহানুভূতি পশুপালক সমাজে বিশেষ পরিস্ফুট। এইখানেই মানব-সভ্যতায় গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি প্রথম স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে সুদৃঢ় করিয়াছে পশুপালকের অবিরাম, নিয়মানুগত স্থান পরিবর্ত্তন যাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে জাগে আত্ম-নির্ভরতা, সাহস ও স্বাতন্ত্র্য। সমগ্র মধ্য- ও পশ্চিম-এশিয়ায় যাযাবর জাতিসমুদয়ের মন্ত্রণা-সভায় একটা নিছক গণ-তান্ত্রিকতার প্রভাব যুগের পর যুগ লক্ষিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা মোঙ্গলরাষ্ট্রনায়ক জেঙ্গিস খাঁর প্রভুত্ব মোঙ্গল জাতিসমুদয়ের নির্ব্বাচন ও অনুমোদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পশুপালকেরা যখন পশুদলের অগ্রে বা পিছনে না গিয়া তাহাদিগকে বাহনরূপে ব্যবহার করিতে শিখিল, তখন তাহাদিগের শুধু যে গতি নিতান্ত দ্রুত হইল তাহা নহে, সব দিক্ হইতে তাহারা অশান্ত, চলমান হইল। বিক্ষুব্ধ যাযাবর জাতির পূর্ব্ব-জগতে চীন ও ভারতের উপত্যকাভূমিতে ও পশ্চিমে ডানিয়ুবের উপত্যকাভূমি দিয়া রুশিয়া ও হাঙ্গেরি পর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত ঝঞ্ঝার মত অভিযান যুগে যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার জনমণ্ডলকে উদ্বেলিত করিয়াছে, কত রাজ্য ও সাম্রাজ্য নূতন করিয়া গড়িয়াছে ও ভাঙ্গিয়াছে। মরুপ্রান্তর ও কর্ষিত ভূমির সীমানা যুগ-পরম্পরা ধরিয়া রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের কেন্দ্রভূমি হইয়াছে।

যাযাবর জাতি সহজে স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। কৃষির কাজে যে নিরুদ্বেগ ও অবিচলিত ভাব অবশ্য-প্রয়োজনীয় তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে কৃষিলব্ধ সঞ্চিত ধন তাহারা নিরীহ কৃষককে সহজেই পরাস্ত করিয়া লুট করিয়া লইতে পারে। কৃষক ও পশুপালক সমাজের দ্বন্দ্ব যুগ-পরম্পরার্জ্জিত। আরব ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালডুন কৃষক ও পশুপালকের খাদ্যসমস্যা পূরণের এই চিরপরিচিত কলহের উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রের প্রথম অভিব্যক্তির ভৌগোলিক নির্দ্দেশ করেন। এমন কি, যখন কৃষক ও পশুপালক আধুনিক যুগে এক রাষ্ট্রে অঙ্গীভূত হইয়া শান্তিতে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আপনার জীবন অতিবাহিত করে সেখানেও কৃষি ও পশুপালনের বিবাদ অনেক সময় রাজনীতিকে চঞ্চল করিয়া তুলে। সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও সুইডেনে এই বিরোধ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছে।

যাযাবর জাতিসমুদয় মিশ্রজাতি। রক্ত সংমিশ্রণ তাহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য ও পৌরুষের প্রধান কারণ। পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার প্রান্তরে যে সকল জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইউরোপ ও এশিয়ার নানা জাতি তাহাদিগের দেহে ও মনে এখনও উহাদিগের ছাপ বহন করিতেছে। শুধু তাই নহে। পশ্চিম জগতে ডানিয়ুব উপত্যকার ভিতর দিয়া যাযাবর জাতি ইউরোপে পশুপালন ও এশিয়ার নানাবিধ খাদ্যশস্য পৌঁছাইয়া দেয়। ইউরোপে পশুপালন মিশ্রিত কৃষি যাযাবর জাতি প্রচলন করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের স্বাধীন, কর্ত্তাধীন পারিবারিক অনুষ্ঠান ও সমূহ তন্ত্র ঐ অঞ্চলে প্রচলিত হয়। এখনও বল্‌কান প্রদেশ ও দক্ষিণ-রুশিয়ায় যাযাবর জাতিগুলভ পারিবারিক ও সমূহ জীবন ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, রুশিয়ায় সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহজ হইয়াছে যাযাবর জাতির প্রাবল্যের জন্য। এশিয়াখণ্ডেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যাযাবর জাতি সমুদয়ের রক্ত এখনও চীন ও ভারতবর্ষের সমতলভূমির অনেক কৃষক-বংশের মধ্যে সঞ্চারিত। অনেক অঞ্চলে কর্ত্তানুগ পরিবার ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য এবং উহার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা কোন পুরাতন বিস্মৃত যাযাবর অভিযানের সাক্ষ্য দেয়।

এইরূপে এশিয়ার প্রান্তর ও মরুভূমি দূর দূরান্তরের জাতির দেহ ও প্রকৃতি, তাহার আর্থিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের উপর তাহাদিগের প্রভাবও বড় কম নহে। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অবিরাম শ্রান্তিকর, মন্থর অভিযান তাহাদিগের চলিয়াছে প্রান্তরের উপর প্রান্তর দিয়া যেখানে কোন গাছ কোন পাহাড় মানুষের কোন বসতি তাহাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। ক্লান্তিকর দিনযাপনের ক্ষুদ্র অবসরে তাহাদিগের মন সহজেই অতীন্দ্রিয়ের দিকে ছুটে, সীমাহীন, বর্ণবৈচিত্র্য-

হীন, ধূসর প্রান্তরকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের চিন্তা অনাদি ও অনন্তের কাছে পৌছায়। রাত্রে গ্রহ চন্দ্র তারার উদয় ও অস্ত, উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নের অভিযান তাহাও তাহাদিগের অন্তরে অনন্তের ভাব জাগায়। মর্ত্যে যাযাবরের ধূসর প্রকৃতি অসীম, অবিসম্বাদী। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকার নিয়মিত বিবর্ত্তন তাহাদিগের বিনিদ্র চক্ষে রজনীর নিবিড় অন্ধকারে ও উদ্বেগে অনন্তকে বিস্ময়ের গণ্ডী হইতে টানিয়া আনিয়া একবারে অন্তরের অন্তস্তলে পৌছাইয়া দেয়। যাযাবরের নিকট যিনি অনন্ত তিনি এক, যিনি বহুদূরে তিনি অত্যন্ত সন্নিকট।

পশুপালনের নির্ব্বাচন ও উৎপাদন রীতি পশুর উৎকর্ষ সাধন করে। ধীরে ধীরে পশুপালকের হৃদয়ে মানবজাতির চরম পূর্ণতার স্বপ্ন ও আদর্শ জাগে। পশুপালক মানবের পূর্ণাঙ্গতায় শ্রদ্ধাবান্ এবং সেই চরম উৎকর্ষের জন্য তাহার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। মানুষ ও পশুর সমৃদ্ধি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ অতীত ও বর্ত্তমানের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতে প্রসারিত। ইহাতে মানুষের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। মেষপালক ও মেষদল একই জীবন-সূত্রে গ্রথিত। ভগবানের অনুকম্পা ও দেবদূতের মধ্যস্থতায় বিশ্বাস, বিশ্বশক্তিতে পরম কল্যাণের আদর্শ প্রভৃতি পশুপালক সমাজে সহজেই আসে। মেষপালকের মেষের প্রতি সস্নেহ ও সুকোমল ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মের বিশাল আদর্শ গড়িয়া উঠে যে পরম কারুণিক দেবতা তাঁহার আপনার জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পশুপালক জাতি সমুদয় বিশ্বের ধর্ম্মের ইতিহাসে মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম উৎকর্ষ, তাহার বিপুল প্রসারিত জীবনের অনবচ্ছেদ, মানুষের সঙ্গে দেবতা ও মানুষের নিবিড় প্রেম ও মিলন সম্বন্ধ যেমন প্রকাশ করিয়াছে অন্য কোন জাতি তাহা করিতে পারে নাই। কাল অনন্ত, নিরবধি জীবন, বিপুল এই পৃথ্বী, প্রাণীর সহিত প্রাণী ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, এই সকল ভাব পশুপালক তাহার দৈনন্দিন জীবনে যে অনুরাগ ও উদ্বেগের সহিত অনুভব করিয়াছিল, তাহা যে শুধু পশুপালক সমাজের বিকাশ ও সমৃদ্ধির কারণ হইয়াছে তাহা নহে, বিশ্বমানবেরও নিকট উহা তাহাদিগের অপূর্ব্ব দান। মানবের ধর্ম্মানুশীলনে সাধনপথ বা কর্ম্মমার্গের ইঙ্গিত অনেক ধর্ম্মেই পাওয়া যায়। মহাজনের পদাঙ্কিত পথ। জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ বা কর্ম্মমার্গ সবেরই কল্পনা ও আদর্শও বিশ্বমানবের নিকট পশুপালকের মোহনীয় দান। সভ্যতার ইতিহাসে পশুপালক কবে লুপ্ত, তবুও বর্ত্তমান সংস্কৃতির অনুষ্ঠান ও ব্যবহার, নীতি ও ধর্ম্ম তাহার অভিজ্ঞতাকে সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের দেহে যেমন অনেক অস্থি ও শিরা-উপাদান আছে যাহা তাহার বিগত জৈবিক অভিব্যক্তির সাক্ষী, তেমনই মানুষের সভ্যতারও মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রহিয়াছে অনেক পুরাতন অবলুপ্ত সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা। মানব সভ্যতার ধারায় ব্যবচ্ছেদ ঘটে না। কত যুগের স্মৃতি যে মানুষের আধুনিক ব্যবহার ও নীতির সহিত অজ্ঞাতে মিশিয়া সমাজের প্রগতির প্রতিকূল বা অনুকূল আচরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আলোচনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত ওড়িয়ার "কোনারক" যে কোন বাংলা পুস্তকের অনুবাদ নহে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ শর্ম্মা সে বিষয়ে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "আনন্দ বাজারে"র 'পুস্তক পরিচয়ে'র সমালোচক মহাশয় কোনারকের ইতিহাস বিষয়ক এক পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতির বশবর্ত্তী হইয়া আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, ভুল হইলে আমি দুঃখিত। কিন্তু শর্ম্মা মহাশয়ও সুনিশ্চিত নহেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্গত কৃপাসিন্ধু শর্ম্মার পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়াছেন কিনা, কারণ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম দেওয়া নাই। তিনি আমাকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে অতিরিক্ত উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। "It is an age of self-exaggeration. Where is the place of truth in this age?" যে ভাষার কবি নোবেল উপহার পাইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; যাহা জগত-ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা; পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে যাহা সপ্তম স্থান অধিকার করে; যাহা এক জন ইংরেজ প্রশংসাকারীর মতে "unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas," সে ভাষার নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য কোন প্রকার অত্যুক্তির আশ্রয় লইবার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বে ওড়িয়ার সহিত বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভারতের অন্যান্য ভাষা বাংলা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া নিজেকে ধনী করিয়াছে। যদি আধুনিক ওড়িয়ার সেরূপ করায় মর্য্যাদা হানি হয় তবে সেটা শ্লাঘার বিষয় নহে বরং দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

আমাদের গুরুদেব

১

গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির অবসানে আশ্রমে মিলিত হয়েছে আশ্রমবাসিগণ। শুরু করেছে আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা। ঘন-সবুজ শ্রাবণ-প্রকৃতি উৎস জোগাচ্ছে প্রাণে। অন্যান্য বার এমনি সময়ে সাড়া প'ড়ে যেত বর্ষা-মঙ্গল উৎসব-আয়োজনের, শান্তিনিকেতনের সুচারু-সজ্জিত প্রকৃতিকে অভিনন্দিত করতে। এবার ঠিক তেমনি সময়ে কোন্ অচিন্ লোক থেকে অদৃশ্যরূপে এল মৃত্যু-দূত। অজানা আশা আশঙ্কায় দোদুল্যমানহৃদয় আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে, একান্ত করুণ কাতর হাসিমুখে, আমাদের গুরুদেব ছিন্ন হয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো সেই চুপি-চুপি-আসা মৃত্যু-দূতের আনাগোনা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর সবাই আশায় উন্মুখ হয়ে ভাবলে, অস্ত্রোপচার-শেষে নিরাময় হয়ে আবার তিনি ফিরে আসবেন আমাদেরই মাঝখানে। তার পরে উদ্বেগ উদ্বেলিত পনেরোটা দিন;—এল নিদারুণ দুঃসংবাদ, পৃথিবীময় পড়ল ছড়িয়ে।

ঘুম থেকে সজাগ হয়ে উঠল যেন সবাই। মর-জগতে অমর কেউ নয়, স্বতঃসিদ্ধ; তবু আশ্রমবাসী সবারই মনে মিশিয়ে ছিল—গুরুদেব যেন চিরদিনই থাকবেন। আশ্রম থাকবে, আশ্রমবাসী আমরা থাকব, আর থাকবেন না শুধু গুরুদেব?—এ ভাবনা কেউ সত্যি করে ভাবিই নি। বহু বৎসর ধ'রে তাঁকে একই চেহারায় দেখে এসেছে সবাই,—সেই শুভ্রসুন্দর কান্তি, পরিণত বয়সের পূর্ণ বিকাশ। যাঁরা তাঁর শুশ্রূষা করতেন প্রতি দিন, তাঁরা হয়তো বুঝেছিলেন, বা, দেখেছিলেন তাঁর নিভে আসা ভগ্ন স্বাস্থ্য, কিন্তু আশ্রমের আর-সবাই আশ্রম থেকে শেষ-বিদায়ের মুহূর্তেও দেখলে সেই চিরপ্রস্ফুটিত মুখ-পদ্ম, একই জ্যোতিপূর্ণ গুরুদেব। তাঁকে দেখে দেখে অভ্যস্ত চোখ তাঁর বার্ধক্য বা জীর্ণতা ধরতেই পারে নি; তাই একাশী বছর বয়সেও তাঁর সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই ছিল।

কঠিন সত্য ভারতের রবীন্দ্রনাথ নেই, আরো সুকঠোর সত্য, হারিয়েছি আমরা আমাদের আশ্রমের প্রাণ—পূজনীয় গুরুদেবকে। যেই অত্যাশ্চর্য দৈহিক সৌন্দর্য, অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, দেব-দুর্লভ ভাষা ও স্বাভাবিক প্রীতিতে তিনি দেবতার মতো আশ্রমের যত উৎসব-অনুষ্ঠানে, সাধারণ আয়োজনে যোগ দিতেন, ভবিষ্যতে কোনোদিনই তেমনি ক'রে আর আসবেন না। আশ্রম তাঁকে বিশেষরূপে বিশেষ ঘনিষ্ঠ করে পেয়েছিল সত্য, নয়তো সমস্ত ভারতেই যে-কোনো অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তাঁকে জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তা উদ্বোধন করা ছিল অর্ধ-শতাব্দীর স্বাভাবিক কাজ। অন্তত এটুকু জাগরূক থাকত সবার মনে,—লেখক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, পরহিতব্রতধারী যার কথাই বলা যাক, অজ্ঞাতে উন্মুখ আশা থাকত সবারই,—রবীন্দ্রনাথ জানছেন, দেখছেন, তিনি আছেন মাথার উপরে।

অমর থাকবেন তিনি তাঁর অনবদ্য সাহিত্যে, তাঁর জীবন্ত লেখায়। তা নিয়ে অনেক হয়েছে লেখা, বিচার বিশ্লেষণ, আরো হবে অনাগত ভবিষ্যতে। ব্যাস, বাল্মীকি, শেকস্‌পিয়ার ও টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর চিরকালের ধন। শত কেন, সহস্র বছর পরেও তাঁর কবিতা নিয়ে ব'সে ঠিক আজকের যুবক-যুবতীর মতোই সেদিনকার যুবক-যুবতী শুধু কৌতূহলভরে নয়,—গাঢ় অনুরাগে যে অভিনন্দিত করবে বসন্তকে, তা সুনিশ্চিত। সে নিয়ে কোনো কথা আজ বলতে ইচ্ছে করি নে, আজকের দিনে শুধু মনে জাগছে,—আমাদের গুরুদেব, কত আপনার ছিলেন আমাদের। চিরদিন আশ্রমে ছাত্রছাত্রী অধিবাসিগণ গেয়ে এসেছে,—"আমাদের শান্তিনিকেতন, সব হতে আপন,"—কিন্তু গুরুদেব আর শান্তিনিকেতন যে একেবারে অবিচ্ছেদ্যরূপে আপনার হয়ে ছিলেন, এ-কথা আগে এত সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় নি। ফুলের ভিতর সুবাসের মতো আশ্রমের সমস্ত সত্তাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত ক'রে ছিলেন। মৌমাছি বা প্রজাপতির কাছে ফুল, মধু এবং সুবাস আলাদা আলাদা রূপে প্রতিভাত হয় না। গুরুদেব ও আশ্রম সমভাবে আপন ও অভিন্ন হয়ে ছিলেন আশ্রমবাসীর কাছে।

কোনো অনুষ্ঠান শুরু হবে, আশ্রমবাসিগণ সমবেত হয়েছে, দেশ-বিদেশাগত নরনারীর ভীড়, ফুলে আলপনায়, সাজ-সজ্জায় সুরচিত রয়েছে পটভূমি, সকলেই উন্মুখ,

প্রতীক্ষায় অধীর। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট শব্দে থামল এসে গুরুদেবের মোটর। দেখা গেল, সেই শুভ্রজ্যোতি-পরিপূর্ণ মুখ। বৃদ্ধ-তাপস নন্দনকাননের কলারসিক দেবরাজ ইন্দ্রের মতো আবির্ভূত হলেন। পূর্ণ করলেন স্পর্শোৎসুক শূন্য আসনটি। ঠিক এইটুকুই ছিল বাকী। চিত্রকর তার চিত্রাঙ্কনে যেন শেষ তুলির টানটি দিয়ে দিলেন। ভ'রে উঠল সবার মন। অনেক বর্ষা-উৎসব, শারদোৎসব, অসংখ্য বসন্ত-পূর্ণিমা, নাটক-অভিনয়, সভা-সমিতি প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর আগমনে, তাঁর উপস্থিতিতে। যাঁরা আশ্রমবাসী তাঁরাই জানেন কত সজীবতায় উদ্দীপ্ত ছিল সে-সব অনুষ্ঠান। গুরুদেব এসেছেন, সামনে বসে দেখছেন, নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানরত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ আনন্দে ভয়ে প্রাণপণে সুন্দর ক'রে তুলতেন তাঁদের কলানিপুণ আয়োজন। প্রত্যেকটি উৎসব এমনি ক'রে অভিসিঞ্চিত হয়েছে তাঁর সাহচর্যের আনন্দরসে। মন্দিরের উপাসনার আহ্বান নিয়ে উপস্থিত হোত ছাত্রছাত্রীগণ। কারুকার্যখচিত উন্মুক্ত কাচের মন্দিরে সুন্দর আল্‌পনার সামনে ভক্তিনত হৃদয়ে বিশ্বকবি বসতেন বিশ্ব-স্রষ্টা মহানের উপাসনায়। সম্মুখে পূর্ব-গগনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রভাত-সূর্য। অরুণরশ্মি এসে পড়ত মানুষ-রবির তেজোময় অনুপম রূপ-মাধুরীতে। মন্দিরে সমাগত জনগণ দুই রবির সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকত নির্বাক নিস্পন্দ। দেবমূর্তিহীন মন্দিরে জীবন্ত দেবতা যেন প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। রাত্রের মন্দিরের ছবিও এমনি অনির্বচনীয় অপূর্ব। সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ নৈঃশব্দ্য-পারাবার, নিবিড় অন্ধকার, মন্দিরের চারপাশে সাজানো প্রদীপমালা, তারই মাঝে স্বল্পালোকে সবার চোখে প্রতিভাত হোত জ্যোতির্ময় অদ্ভুত রূপ আর ধ্বনিত হোত সুমিষ্ট গভীর স্বর। এমনি কত ছবি সদ্য-প্রত্যক্ষ-রূপে চোখের সামনে চিরদিনের জন্য ভাসমান রয়েছে। আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছে ছবিগুলি এই জন্যে যে, তিনি যা বলেছেন, ছাপার অক্ষরে তা মুদ্রিত আছে চিরতরে; কিন্তু তাঁর যে-রূপ, সে তো আর দেখতে পাব না কোনো দিন, অতি ইচ্ছায়ও নয়। শেষ চার-পাঁচ বছর ক্রমান্বয়ে মানসিক আঘাত, বহির্জগতের জন্য উদ্বেগ-বোধ, দৈহিক দুর্বলতা এবং বিশেষ ক'রে প্রবীণদের অনুরোধ-উপরোধপূর্ণ নিষেধহেতু তিনি আমাদের ভিতর আশ্রমের বিশেষ অনুষ্ঠান ভিন্ন আসতে পারেন নি, নয়তো আশ্রমের পূর্বেকার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও আশ্রমকর্মিগণ আনন্দে স্বীকার করবেন যে, কী নিরহংকার মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে প্রীতিময় হাসি দিয়ে সব কাজ তিনি করতেন অভিষিক্ত। সেই বরাভয় মূর্তি দেখে এক নিমেষে মনের ভয় সংকোচ সব কেটে যেত, মনে হোত তিনি আমাদের, আমাদেরই গুরুদেব। বিশ্বকবি, জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথকে ভুলেই যেতাম, দেখেই মনে হোত, শুধু তিনি গুরুদেব। সবাই তাঁকে জানতাম, চিনতাম আমাদের গুরুদেব নামে: ঐ নামের মাধুর্য যে কত,—উপলব্ধি করেছিলেন, তাই গান্ধীজী ও জহরলাল এত দরদভরা প্রাণে ডেকেছেন ও ডাকেন **গুরুদেব** ব'লে। আগেকার আশ্রমবাসী যারা, জীবনে তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গ, সাহচর্যের স্মৃতি পরমবিত্ত স্বরূপ জমা আছে। আট-দশ বছরের ছাত্রছাত্রী, অধিবাসী যাঁরা তাঁরাও কম লাভবান নন। ক-বছর আগেও তিনি এক-একদিন সন্ধ্যার পরে গল্প কবিতা পড়ে শুনিয়ে মোহিত করেছেন সবাইকে। এই প্রসঙ্গেই মনে জাগে,—এই সেদিনও তিনি ছাত্র-অধ্যাপকদের ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়ে শুনিয়ে, আলোচনা করেছেন তা নিয়ে। আশ্রমের শিক্ষাভবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স যখন প্রথম প্রবর্তিত হোলো, গুরুদেব স্বয়ং এসে তার ক্লাস নিলেন কিছু দিন। কিন্তু পড়ার সঙ্গে আর একটি দৃশ্য তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনে চিরস্থায়ী থাকবে। খালি চোখে শেষ অবধিই তিনি বই পড়ে এসেছেন, পড়া শেষে চশমাটি তুলে চোখে দিয়ে সবার দিকে চোখ মেলে চাইতেন,—কী স্নিগ্ধ মধুর সে-হাসি, কত প্রীতিপূর্ণ নির্মল চাহনি দিয়ে আনন্দিত করতেন শ্রোতাদের। সমভাবে অবিস্মরণীয় তাঁর পাঠ, লেখা, আর সে-চাহনি। রূপ ও বাণীর এমন সুসংগত মিলন কেউ কোথাও দেখে নি—সে তাঁর গানের কথা ও সুরের মিলনের মতো। সস্নেহে তিনি স্কুল-কলেজের সাহিত্য-সভার সভাপতির পদ পূর্ণ করেছেন। ছেলে-মানুষের মতো কৌতুক-আগ্রহ নিয়ে হর্ষোজ্জ্বল চোখে বসে বসে শুনতেন। একবার স্কুলের সভায় বলেছিলেন,—"তোমরা নানা বিষয়ে লিখে এনেছ, আমি খুব খুশী। আমি চাই তোমরা অল্পবয়েস থেকে নিজেদের সাধনার ক্ষেত্র জেনে নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হও, ভবিষ্যৎ পথ তোমাদের সুগম হোক।" তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রের আদর্শের মূল কথাও হয়তো তাই,—প্রকৃতির মধ্যে ছেলেবেলা থেকে আনন্দোৎফুল্ল সতেজ উন্নত মনে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হওয়া। মনে যাদের স্বাভাবিক বিকাশপ্রবণ গতি আছে, আপন স্বাধীন চিন্তা দ্বারা তারা আপন পথ সুগম করে নিতে পারেই। অতি সহজ কথায় গুরুদেব ছাত্রছাত্রীকে তাঁর

শিক্ষার সবচেয়ে গভীর কথাটি ব'লে যেতেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ, জীবনাদর্শ এত ভাব-ব্যঞ্জনা-প্রসারিত, এত মহান্ সুন্দর যে, কোনো দেশে কোনো কালে তার পরিকল্পনাও করে নি কেউ। অতীত ভারতের ঋষিগণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনা করেছিলেন সত্য; এমন একান্ত, এমন বিরাট রূপে বুঝি সে-আদর্শ ঠিক এ-রূপটি পরিগ্রহ করে নি। তাঁর ছাত্রছাত্রী ছোটোকাল থেকে বেড়ে উঠবে অনাড়ম্বর জীবনে, নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে শিখবে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টিয়ানে কোনো তফাত ধারণা মনে রাখবে না, এ-কথা তাঁর বইয়ে, কাজে এবং কথায় চিরকাল জেনে আসছে সবাই। একই বোর্ডিং-এ, খাবার-ঘরে, খেলা-ধুলার মাঠে, সব জায়গায় নানাদেশী, নানারকম বিভিন্ন ধর্মের জন-সমাগম, ছাত্রছাত্রীর মেলামেশা—এ যে কত বড়ো সৌভাগ্য, কত গভীর আনন্দ সে ছাত্রছাত্রীমাত্রেই জানেন। নানা দেশের আচার-বিচার, ভাব-বিশ্বাস, মানব-প্রকৃতি এ-জায়গায় এক হয়ে এক ধারায় মিলে গিয়ে পূর্ণ মানবরূপ গড়ে উঠবার আয়োজন হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নীচ দলাদলি, ঠেসাঠেসি, মিথ্যা মান-অভিমান, আক্রোশ-দ্বন্দ্ব কিছু নেই। সকাল সন্ধ্যেয় শুধু তাদের উপাসনা-মন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে ওঠে,—"তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি, তোমায় নত হয়ে যেন মানি।"

পাঁচ-সাত বছর পূর্বেকার ছাত্রছাত্রীরাই জানেন এখানকার শিক্ষাধারার প্রভাবেই ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টিয়ান সবাইকে দল বেঁধে ভাগে ভাগে সপ্তাহে এক দিন কি দু-দিন ক'রে আশেপাশের গাঁয়ে গিয়ে অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকদের লেখাপড়া, সেলাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে হোত। শ্রীনিকেতন-শিক্ষাকেন্দ্রে যা পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে, ছোটো গণ্ডিতে তাই আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য কর্ম ছিল। কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা, জানাশুনা, এবং প্রাণের যোগ সম্পূর্ণ হোত না ব'লে কোনো-কোনো দিন উৎস খুলে গেছে হাসি-গল্প-মস্করার। গুরুদেবও মাঝে-মাঝে গ্রামে যেতেন,—বিশেষ ক'রে গত বারের আগের বার দোলপূর্ণিমার রাত্রে গোয়াল-পাড়ার মাঠে গিয়ে গান, গল্প, তাঁর কবিতা-আবৃত্তি চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে দর্শকদের মনে। এমনি ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্র খুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়;—সকল দেশের এমন-সকল উচ্চ ভাব-ধারা দেখবার শুনবার ও নিজের মধ্যেও মিশোবার সুযোগ কোনো শিক্ষাক্ষেত্রে হয় নি, হওয়া অসম্ভব। আজ মনে হচ্ছে কত ধন্য তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। গুরুদেব তাঁর কবিতাতে বলেছেন, এই ভারতবর্ষ মহামানবের মিলন-তীর্থ স্বরূপ। অনাদি কাল থেকে এর বুকে জোয়ার স্রোতে কত ধারা এসে মিলেছে, কত বিচিত্র সুরে নব-নব রূপে। সবাই শুধু দিয়েছে আর নিয়েছে। হৃদয়ের তন্ত্রে এক মন্ত্রে রণিয়ে উঠেছে ভারতের বিরামহীন ওঁকারধ্বনি। এই দেশ যে একটি বিরাট যজ্ঞশালা; সবার জন্যেই অবারিত দ্বার এই সীমাহীন ভারত মহাসাগরতীরে। ভারতবর্ষের এই রূপ যে শুধু অতীতেরই রূপ থাকবে তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি। পরাধীন ভারত আজ দেবে না কিছু, শুধু উঞ্ছবৃত্তিতে নিজের ঝুলি ভরবে,—এ দৈন্য ঘুচিয়ে তিনি, শুধু সাহিত্যের দরবারেই নয়, শিক্ষার মিলন-দরবারেও এক নূতন বিরাট আদর্শ তুলে ধরলেন জগতের সামনে। মন শুচি ক'রে সমস্ত আর্য-অনার্য-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টিয়ান সবাইকার হাত ধ'রে অভিষেকের মঙ্গল ঘট ভরতে শুধু কবিতাতেই বলেন নি, তাঁর লেখা শুধু আদর্শ বা মতবাদই নয়,—এই বিশ্বভারতী শিক্ষাক্ষেত্রে তার পূর্ণ বিরাট রূপ দিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন কষ্ট লাঞ্ছনা সব স্বীকার করে নিয়ে। অতীত তপোবনের কল্পনাতীত উচ্চ আদর্শ ও ভাবধারা আপন ভাবের সঙ্গে ঢালাই ক'রে আধুনিক ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার শিক্ষাদর্শ গড়ে তুলতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তিনি ঘুরেছেন প্রায় সমস্ত পৃথিবী। প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা দোষকটি কেমনভাবে চোখে তাঁর প্রতিভাত হয়েছে, তা দু-তিনখানা বিখ্যাত বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে। সব-কিছুর সারবস্তু এনে রূপায়িত করলেন বিশ্বভারতী তাঁর আদরের শান্তিনিকেতনে। এখানকার সমবায়-ভাণ্ডার, পায়ে হেঁটে বাইরে গিয়ে পিকনিক, একটি ব্যাগ লাঠি প্রভৃতি স্বল্প জিনিস নিয়ে ছুটিতে ছুটিতে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ—এ হচ্ছে য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রসারিত রূপ। য়ুরোপ-এশিয়া, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবার মিলিত সভ্যতার শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্বভারতী! বিশ্বকবি তিনি বিশ্বের সব দেশে সব জায়গায় সসম্মানে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে সমাদৃত, তবু তিনি একান্তভাবে আমাদের গুরুদেব। এই আশ্রম থেকে তিনি তফাতে থাকতে পারতেন না, থাকতে চাইতেনও না। বাইরের সমস্ত কাজ, সমস্ত বক্তৃতা, ঘোরাফেরার মধ্যে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিতি তাঁর মনে লেগে থাকত, ব্যাকুল হয়ে থাকত মন এখানে আসবার জন্যে। বিশ্বভারতীই ছিল তাঁর সাধনা ও কর্মের কেন্দ্রস্থল। তাইতো তাঁকে ঘিরে ভারত, চীন, জাপান, য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের

বিশ্বভারতীতে আনাগোনা, এর সঙ্গে প্রাণের টানে মেলামেশা। ভারত অনাদৃত, সমস্ত পৃথিবীর কত আদর্শ সংস্কৃতি শিক্ষা যখন হিংসা প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত, অবলুপ্তপ্রায়, তখন এই ভারতেরই দুই কেন্দ্র থেকে নতুন দুই ভাব সমুত্থিত—রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মানব-প্রীতি আর মহাত্মাজীর অহিংসা নীতি। এ-সব আজ উপেক্ষিত, অবহেলিত হোতে পারে, তবু এরা চিরসত্য এরা অবিনশ্বর। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ জানেন তাঁদের জীবনে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা লাভ হয়েছে এই সব ভাবাদর্শের এবং সেই সঙ্গে এই মহামনীষীদের দর্শনে ও সংস্পর্শে আসাতে। গুরুদেবের এই শিক্ষার মর্ম যখন আজ ক্রমে সবাই বুঝতে পারছিল, দেশ-বিদেশ থেকে সবাই যখন এখানে এসে মিলিত হচ্ছিল স্থায়ী ভাবে,—চীনাভবন, হিন্দিভবন, নিখিল-ভারত-কাটুনি সংঘ স্থাপনা হোলো যখন,—ঠিক সেই সময়েই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। এই শিক্ষাদর্শের মধ্যে নাচে, গানে, লেখায়, কাজে, নানা ভুল ভ্রান্তিতে তাঁকে পরিবেষ্টিত করেছিলেম আমরা, সমস্ত আশ্রম অধিবাসী। তিনিও সবার মাঝে একান্ত আপন হয়েই মিশে ছিলেন। ছোটো ছেলেমেয়েরা তাঁকে প্রত্যেক বুধবার প্রণাম দিতে যেত ফুল নিয়ে। গুরুদেব হেসে কারু পিঠ চাপড়ে দিলেন, কারুর বা মাথায় দিলেন হাত বুলিয়ে, তার পরে হেসে সবার হাতে দিতেন টফি, চক্‌লেট, লজেন্‌স্‌। জানতেন, এর উপরেই যত লোভ ছোটোদের। সবাই একত্রে তাঁর কাছে ব'সে খায়, এ দৃশ্য দেখতে তিনি খুব ভালো-বাসতেন। শিক্ষক ও আশ্রম-কর্মিগণকে তো মাঝে মাঝে উত্তরায়ণে চায়ের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেনই, তাছাড়া গত জন্মদিনে অত্যন্ত অসুস্থ ব'লে যখন নড়াচড়া করতে অশক্ত তখনো নিজের চোখে সকলের খাওয়া দেখবার জন্যে উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে খাবার জায়গা করিয়ে সকলকে খাইয়েছিলেন। মেয়েদের হাতে রান্না খেতে চাইতেন ব'লে কত দিন মেয়েরা নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াত তাঁকে। বিশ্বকবি যিনি, এমনি ভাবেই সাধারণের মতো মিশতেন তিনি সবারই সঙ্গে। তিনি ছিলেন সবার পরমাত্মীয়। আশ্রমের প্রত্যেকের জন্যে দরদ ছিল তাঁর অসীম। কারুর অসুখ হয়েছে শুনলে অমনি নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন তার। নিজে ঘাঁটতেন বাইওকেমিক বই আর শিশি,—পুলিন্দা পুলিন্দা পাঠিয়ে দিতেন সে-ওষুধ। মনে আছে, বোর্ডিং-এ একবার ছোটো একটি মেয়ের কঠিন অসুখ করেছিল। ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিগণ ভিন্ন আর কারু যাওয়া ছিল নিষেধ—খারাপ রকমের টাইফয়েড্‌। শুধু প্রায়ই এসে দেখে যেতেন গুরুদেব। কোনোদিন আনতেন ফুলের তোড়া, কোনোদিন বা মজার কোনো খেলনা। কাছে ব'সে কত ডাকাতের গল্প, হাসির গল্প বলতেন ওর মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে। রোগ-যন্ত্রণা ভুলে মেয়েটি আনন্দে জোর পেয়ে উঠত মনে। কয়েক বছরের মধ্যে আশ্রম এবং শ্রীনিকেতনের অনেক কর্মী ছাত্রছাত্রী ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন,—প্রত্যেকের জন্যে তাঁর কী ব্যাকুলতা, কী মর্মান্তিক বেদনা। মনে হোত একান্ত আপনজনের বিয়োগ ঘটেছে। শুধু শান্তিনিকেতন নয়, শ্রীনিকেতনের অধিবাসীদের জন্যও তাঁর টান ছিল সমানই। ও জায়গার ভার তাঁর কর্মী-সন্তান রথীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ছিলেন, তবু মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন, মিশতে যেতেন অধিবাসীদের সঙ্গে। শ্রীনিকেতন-উৎসবে সমবেত হোত ওখানকার আশেপাশের গ্রামের লোক, গুরুদেব ক-বছর আগেও জরাজীর্ণ দেহে নিজহাতে উৎসাহে হল-কর্ষণ উৎসবের উদ্বোধন ক'রে চতুর্গুণ উৎসাহিত করেছেন চাষীদের ও কৃষাণদের। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও লেখা তাঁর এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকে নি। যখনই চাওয়া গেছে, লেখা প্রস্তুত। সবাই চেকে নিয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রতিভার দান। ঝরনাধারার মতো ঝরেছে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি, তাঁর প্রতিভার ধারা। কোনোদিন বিমুখ হোতে হয় নি কাউকে। তাই তো বলছিলুম, গুরুদেব দেবতার মতো উর্ধ্বেই ছিলেন না, ছিলেন মানুষের মতো আমাদের গুরুদেব হয়ে।

এখানে একটা কথা বলি,—চিরদিনই প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, কবি, দার্শনিক, শিল্পী স্রষ্টাদের নামে অপবাদ আছে যে, তাঁরা আত্মভোলা। নিজের ভাবনা, নিজের কাজ এবং আপন সৃষ্টির মাঝেই তাঁরা নিবিষ্ট থাকেন। গুরুদেব যে এর একেবারেই ব্যতিক্রম, সর্বজনবিদিত তা। নিজের পরিবেশের 'পরে এত দূর ভালোবাসা তিনি রেখেছিলেন, এত সতর্ক দৃষ্টি ছিল সব বিষয়ে যে, আহারে-বিহারে, সাজে-সজ্জায়, লেখায় রচনায়, কোনোখানেই এতটুকু ত্রুটি রাখতেন না। তিনি যে রসিক, শিল্পী, নিষ্ঠুর নিয়মী, সবার উপরে তিনি যে শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য-স্রষ্টা কবি—প্রত্যেকটি কাজেই তা প্রমাণ ক'রে গেছেন। দিন যখন তাঁর অবসান-প্রায়, নিজের দেহের দখলস্বত্ব পরের হাতে ন্যস্ত,—তেজোদ্দীপ্ত শরীর স্তিমিত-প্রায়,—বিখ্যাত সুন্দর অজস্র শ্মশ্রু-গুম্ফ এসেছে ক্ষয় হয়ে,—তখনো মন তাঁর রস-পিপাসু। কুশ্রীতাকে বরদাস্ত

করতে পারেন নি কিছুতেই। এবারও, ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনে শয্যাগত তিনি। শুনেছি, নাতনী তাঁর—"দিদিমণি", সস্নেহ যত্নে অত্যন্ত সুচারুরূপে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে ফুলে চন্দনে জরির-পাড় গরদের কাপড়ে চাদরে। কী নাকি খুশী, যেন একেবারে ছেলেমানুষ। কেশে তাঁর পাক ধরলেও তিনি সত্যিই পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো সবারই এক-বয়সী ছিলেন। তাঁর সেদিনের রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন দেবদুর্লভ মূর্তি ছিল সে। যেন সজীব গ্রীক-ভাস্কর্য, খোদিত মূর্তি। মানুষ যে কত দূর অতিমানবতার সীমারেখায় দেহে মনে পৌঁছাতে পারে, তিনি ছিলেন তারই জীবন্ত প্রতীক। নিজেও ছিলেন পূর্ণাঙ্গ, কোনোখানে তাই ভুল ত্রুটি হোলেই ধরতে পারতেন। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যে বসে থেকে থেকে নাটকের রিহার্শ্যাল দেখেশুনে কেটে ছেঁটে ভেঙেচুরে ঠিকঠাক করেছেন এই সেদিনও। যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখা গেছে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, তা সারা জীবনের অভ্যাসের ফল। একেবারে আনকোরা নতুন গাইয়ে নাচিয়ে অভিনয়কারী নিয়েও তাঁকে নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছে। কত বকুনি, ভ্রূকুটি বিরক্তি সহ্য করত তাঁর ছাত্রছাত্রীগণ। গানের একটু বেসুরো স্বর কানে যেতেই চেঁচিয়ে উঠতেন—"আরে থাম্ থাম্।" সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হয়তো টান দিয়ে বসলেন গানে। আর যখন সম্পূর্ণ সুন্দর হোত, নিখুঁত হোত সব আয়োজন, খুশির আর অন্ত নেই। এ সবাই দেখেছি, শুনেছিও।

সব দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল মেলা। মেয়েদের প্রতি তাঁর স্নেহ যে কত গভীর, কত প্রবল, সাহিত্যে তার নিদর্শন অজস্র। তাঁরই ভাষায় নারী পেল শ্রেষ্ঠ সম্মান; পেল প্রকৃত দরদ এবং তাদের প্রাণের রুদ্ধ ভাবাবেগের জ্বলন্ত অগ্নিময়ী ভাষা। এ-কথা সমস্ত ভারতবাসীকে স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের নারী-পুরুষের একত্র শিক্ষা মেয়েদের শ্রীমণ্ডিত নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা, পুরুষের পার্শ্বে সমান অধিকার পাওয়ার প্রবলতম পৃষ্ঠপোষক তিনিই। তবু তাঁরই মুখে তাঁর ছাত্রীরা একদিন শুনেছে সংসার গড়বার কঠোর আদর্শ নিয়ম। এখানকার মেয়ে-বোর্ডিং-এর নাম শ্রীভবন। একবার সমস্ত মেয়েকে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন,—"তোমাদের বাসস্থানকে আমি নাম দিয়েছি শ্রীভবন। শ্রী মানে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী শুধু ধনেরই প্রতীক নন, তার চেয়েও বড়ো তিনি, শ্রী রূপিণী। মেয়েরা লক্ষ্মী, কারণ শ্রীতে তাদের জন্মগত অধিকার। ধন না থাকুক যে সংসারে শ্রী আছে লক্ষ্মী সেখানেই বিরাজমানা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো চিরদিন সেই সংসারই খুঁজে বেড়ায়। তোমরা যেখানে থাকবে, যে-কাজ করবে, শ্রী যেন তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে। তারই জন্য তোমাদের থাকবার জায়গার নাম শ্রীভবন। বিলাসিতায় নয়, শ্রীতে মণ্ডিত হয়ো তোমরা।" এই কথাটা আমাদের শোষিত দুর্ভাগা দেশের মেয়েদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এর জন্যই বলছিলুম সমস্ত দেশের সমস্ত যুগের কবি, বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আপন-ভোলা নামের অপবাদ তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আবার এটাও ঠিক এত বড়ো আত্ম-ভোলা দার্শনিক কবি, স্রষ্টা শিল্পী অত্যন্ত দুর্লভ এবং এত বড়ো মনীষীও কেউ জন্মান নি; তা ছাড়া আমাদের গুরুদেবের আসন চিরদিনের জন্যেই শূন্য হয়ে রইল।

আমরা আমাদের গুরুদেবকে কত দিন কত সময় ছোটো বড়ো কত কাজে, কথায় নিকটে পেয়েছিলাম। প্রত্যেকের জীবনেই তাঁর অনেক কথা, হাসি-ঠাট্টা, প্রীতি-ভালোবাসা অক্ষয় হয়ে আছে, আজ তা পরিষ্কার রূপে পরিস্ফুট। রসিকচূড়ামণি গুরুদেব শুধু সাহিত্যেই রস সৃষ্টি করে যান নি—রোগশয্যার চুটকি কবিতাতেই তাঁর রসের জোগান সীমাবদ্ধ নয়, সবদা মুখের কথায়ও যে তাঁর রস এবং অভিনবত্ব ছিল সে জানেন তাঁর সঙ্গে চেনা পরিচিত যারা। শরতের মেঘের মতো সে সব কথা যেন ক্ষণকালের জন্য অজস্র ধারায় ঝরে পুলকিত করে তুলত সবার মন। সরসতা তাঁর চিরকালের জন্যে মনে লেগে থাকত এবং চিরদিনই তা টাটকা থাকবে। এমনি ক'রে ভাবে-ভাষায় স্নেহ-প্রীতিতে গুরুদেব সবার জীবনে মধু দান করে গেছেন।

পূর্ণ বয়েস তাঁর হয়েছিল, শেষ ক মাস দুঃসহ যাতনা পেয়েছেন তিনি। রোগ-ভোগের মধ্যে তাঁকে আর বেশি দিন ধ'রে রাখবার ইচ্ছে আমাদের স্বার্থপরতা। মর-জগতের জ্বালা-যন্ত্রণা পেরিয়ে চির-শান্তি লাভ করেছেন তিনি, তাঁর জন্যে দুঃখ করবার কিছুই নাই। তবু যে-শূন্যতায় ভ'রে গেছে দিক-বিদিক সকল আশ্রমবাসীই তা উপলব্ধি করছেন। নিজের হাতে গড়া তাঁর এই আশ্রম, চিরদিনের অতি-প্রিয় আবাস উত্তরায়ণ, তাঁরই সঙ্গ-লিপ্সু ছাত্রছাত্রী আমরা, তাঁকে বাদ দিয়ে এর কোনো অর্থ, কোনো আনন্দই যে পাচ্ছি নে। কত নিশ্চিন্তভাবনায়, শান্তিতে আনন্দে ছিলাম। শূন্য মনে তাইতো আজ সবাই ভাবছে—কী হবে—কেমন ক'রে শুরু হবে পথ-চলা। শুধু মানুষেরই নয়, যে রসহীন মরুর বুকে তিনি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র সুন্দর শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রকৃতির প্রাণও বুঝি আজ শূন্যতায় ভরে গেছে। তিন

দিন অসহ্য গুমোটের পরে বৃহস্পতিবার ঠিক বেলা বারোটায় গুরুদেবের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর ধারায় ঝরে পড়ল মূক প্রকৃতির অন্তরের রুদ্ধ বেদনা। এখানকার প্রত্যেক ঋতু-প্রকৃতিকে কত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন তিনি,—গানে, কবিতায় ও তাঁর স্মরণীয় বলায় হয়ে আছে তা চিরদীপ্যমান। প্রত্যেক ঋতু-প্রকৃতিকে আন্তরিক-ভাবে অভিনন্দিত করা হোত উৎসবের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির জীবন্ত অনুচর পশুপাখিগুলিকে পিপাসা নিবারণের জন্য জলপানের আধার তৈরি করে দিয়ে জড়প্রকৃতিকে করা হয়েছে কল-কণ্ঠা, প্রাণবতী। শুনেছি উত্তরায়ণের দোতলায় পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে সম্মুখে তাকিয়ে, তিনি বলেছেন,—"অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক জায়গা দেখেছি, কিন্তু দিগন্তরালের এমন অপরূপ সৌন্দর্য আর কোথাও চোখে পড়ে নি।" শেষ-বিদায়ের আগেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাতর স্বর,—"আর বুঝি এ প্রকৃতি দেখতে পাব না আমি, চিরদিনের জন্য মুছে যাবে এ-সব আমার কাছে।"

জীবনে তাঁকে আমরা অতি নিকটে, অতি পরমাত্মীয়-রূপে দেখেছিলুম, পেয়েছিলুম ; সম্পূর্ণ ছিল না সে-পাওয়া। মৃত্যুতে সে-পাওয়া হোলো পূর্ণ। তাঁর বিচ্ছেদে আজ গভীরভাবে মনে জেগে জেগে উঠছে—তাঁর দীর্ঘ-জীবনের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অভিলাষ, তাকে আজ দেখছি নতুন রূপে। এই পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া। গুরুদেব যখন বেঁচেছিলেন, আচ্ছন্ন ছিলুম তাঁর জ্যোতিতে। ভালো ক'রে উপলব্ধি করি নি তাঁর ভাবধারা, তাঁর আদর্শ, তাঁর কাজ। আঘাতে আজ সেই অস্পষ্টতা গেল কেটে। এখন বুঝতে পারছি তিনি ছিলেন আমাদের কতখানি। তাই যদি বুঝতে পারি, ভালোবেসে থাকি যদি পরমাত্মীয় রূপে—তবে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি ভাবধারার উপরেই প্রবল অনুরাগ অনুভব করব। তাঁর এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে যদি নিমগ্ন হোতে পারি মনে প্রাণে, প্রত্যেকেই যদি নিতে পারি এই ব্রত—রূপ দিতে পারি তাঁর বিশ্বভারতীর ভাবধারাকে, তবেই পূর্ণ হবে আমাদের কর্তব্য, তাঁর শিক্ষার প্রভাব।

হিন্দু-ধর্মের শাস্ত্রে আছে শ্রাদ্ধ তর্পণ করবার নিয়ম। পিতৃ-পুরুষগণ নাকি আসেন অদৃশ্যরূপে, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন তর্পণ—আমরা তর্পণ করব তাঁর বিদেহী আত্মাকে তাঁরই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ ক'রে। তবেই পরিতুষ্ট হবে তাঁর আত্মা। শুনেছি মৃত্যুর অবচেতনে চেতনা বিলুপ্ত হবার পূর্বেও শেষ কথা না কি ব'লে গেছেন—"কী যে হবে, কিছু বুঝতে পারছি নে।"—কী ভাবনা-প্রসূত এ উক্তি, কেউ জানেন না। এর নানা দিক্ দিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা হোতে পারে কিন্তু এ-ও একটা অর্থ হোতে পারে যে, তাঁর বিশ্বভারতীর কী হবে,—কেমন ক'রে বেঁচে থাকবে তাঁর কাল্পনিক বিরাট মহীরুহের এ-ক্ষুদ্র বীজ। সকলেই জানেন কত ব্যাপক উৎকণ্ঠা, অসীম-বেদনা ছিল এর জন্যে; তিনি না থাকলে এর অবস্থা এই সংকটপূর্ণ দিনে কী হবে ভেবেও এ কথা বলতে পারেন—বলা স্বাভাবিকও। নিছক সত্য যে, বিশ্বভারতীর যে-মূলমন্ত্র যে-মহান ভাবধারা, এ কোনোকালেই লয় হবার নয়। আমাদের দেশে শক্তি, উৎসাহ ও অর্থাভাবে ব্যর্থ যদি হয়েও যায়, তবু এ ভবিষ্যতে কোনোদিন কোনোদেশে রূপ-পরিগ্রহ করবেই। অনেক যুগ আগের অনেক দূর দেশের মহাঋষি টলস্টয়ের ভাবধারা যেমন দেখতে পাই আজ বাস্তব রূপ ধরে উঠছে আমাদের দেশে, আমাদের গুরুদেবের উচ্চতর ও পূর্ণতর ভাবাদর্শ এবং কর্মের প্রতীক বিশ্বভারতীর প্রেরণাও হয়তো তেমনি দেশদেশান্তে সার্থকতর রূপ ধরবে নানা সাধকদের ভিতর দিয়ে নানা প্রতিষ্ঠানে, ধরবে তা এর অন্তর্নিহিত আপন প্রবর্তনা বেগেই। তবু আমরা তাঁর দেশবাসী তাঁর আশ্রমবাসী তাঁর বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মী ও ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকেই, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্ভবপর শেষকথা ও চির-দিনের ইচ্ছা এই বিশ্বভারতীকে রূপ দেবার কাজে আত্ম-নিবেদন করতে চেষ্টিত হব—অন্তত হওয়া উচিত, যদি তাঁর প্রতি আমাদের একটু শ্রদ্ধা একটু ভালোবাসাও থেকে থাকে। তবেই তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিয়ে গর্ব ক'রে সবার কাছে বলতে পারব—তিনি আমাদের গুরুদেব, তাঁর শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।

শ্রীসাধনা কর

ফিরে এসো, এসো ফিরে,—
অবুঝ বেদনা চেয়ে র'রে পথ চির অসীমের তীরে।
সারা আশ্রম নীরব নিথর, পাড়া মূঢ় ঘর-বাড়ি,
মাথার উপরে ভেসে যায় মেঘ, কোন্ দূরে জমে পাড়ি!
ঘাটে-পথে আজ এখানে-সেখানে জমেছে লোকের মেলা,
মিছেই এ ওর মুখেতে তাকায়, কখন গড়ায় বেলা।
মাঝে মাঝে আসে ঘন ঘোর ক'রে পুঞ্জিত মেঘভার,
ভিজে বাতাসের দম্কা গতিতে ভেসে ওঠে হাহাকার।
মাধবী-লতার ফুল ঝ'রে পড়ে লাল কাঁকরের পথে,
প্রিয় শিশুদল ভাবে,—আজো তুমি আসছ-বা কোথা হতে!
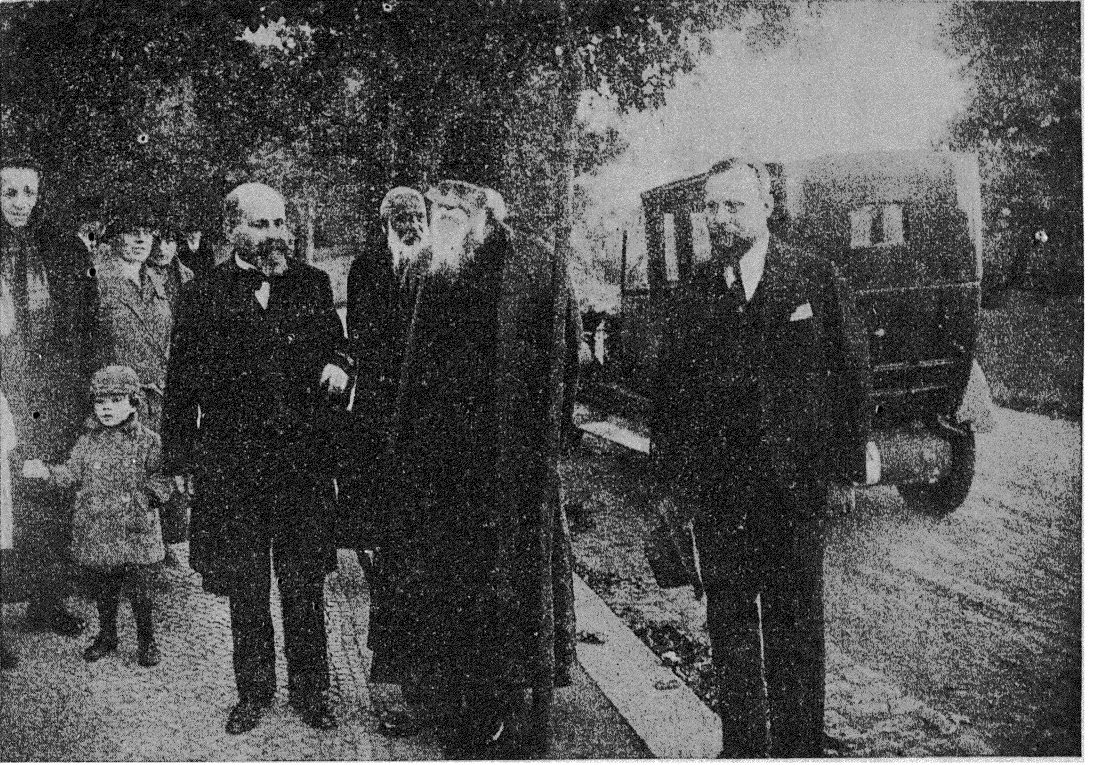
পুরাতন স্মৃতি

প্রাগে রবীন্দ্রনাথ—১। অধ্যাপক উইণ্টারনিট্জ ২। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩। রবীন্দ্রনাথ ৪। অধ্যাপক লেজ
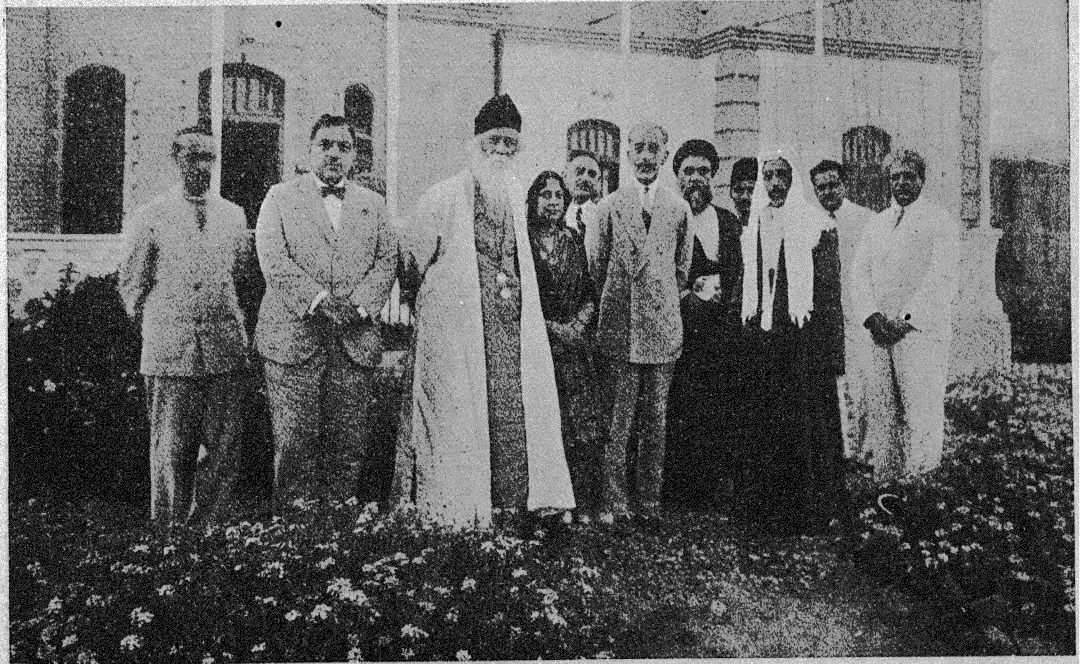
বাগদাদে রবীন্দ্রনাথ—জাফর পাশা, কবি, রাজা ফৈজল

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও জবাহরলাল
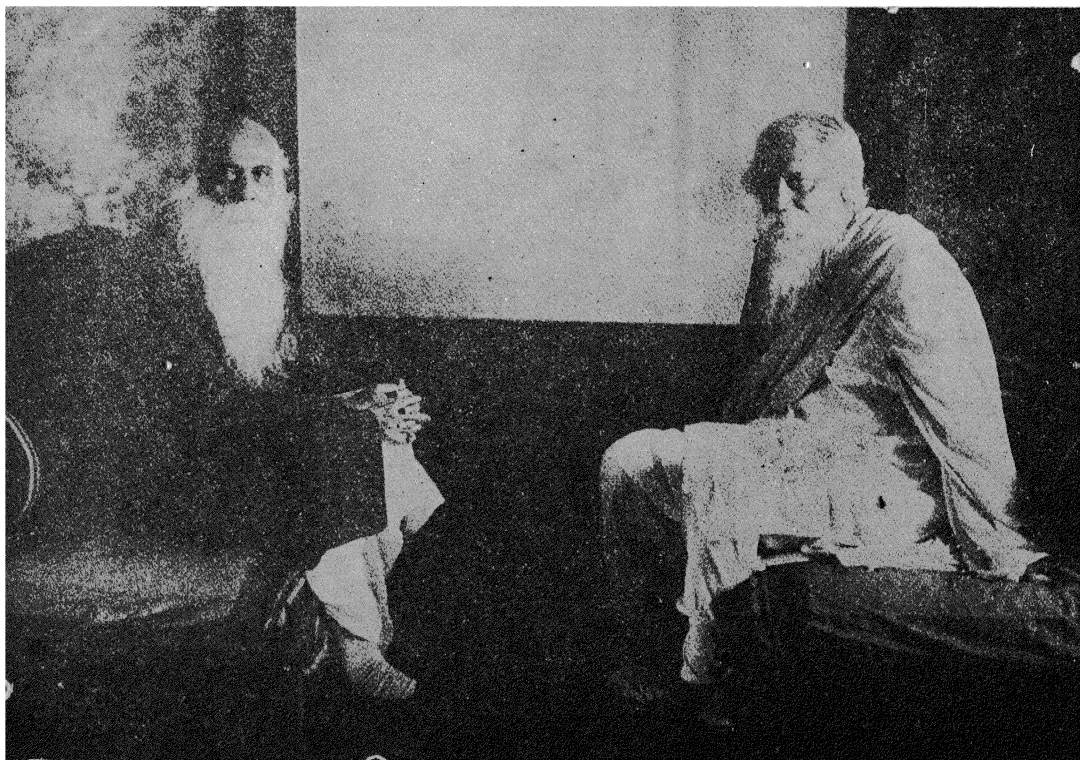
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ
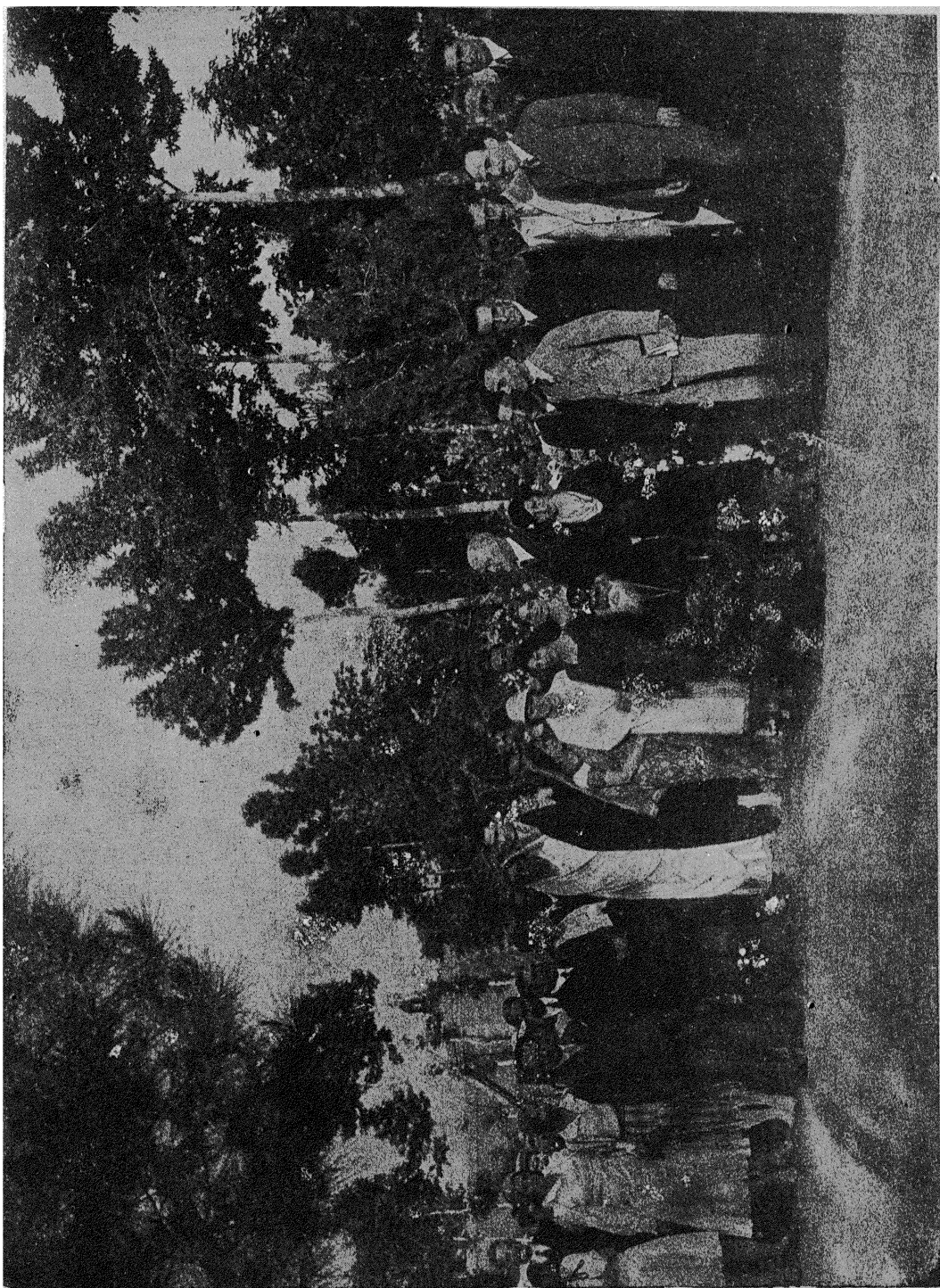
তেহেরাণে রবীন্দ্রনাথ
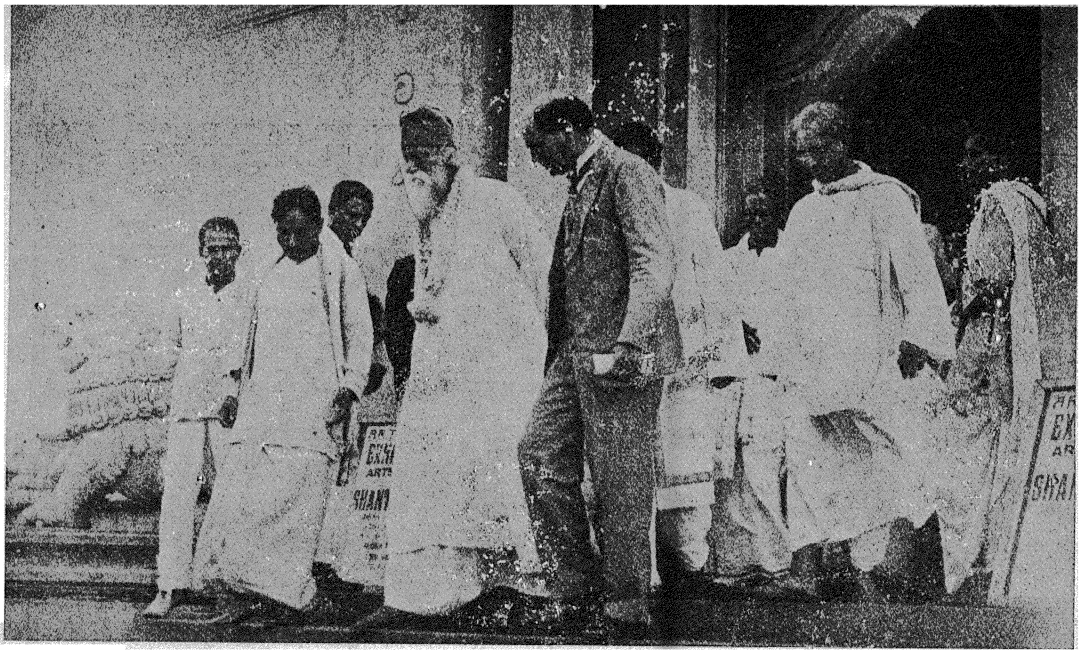
সিংহলে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও উইলিয়ম পিয়ার্সন

এই আশ্রমে ছিলে তুমি, ছিলে এই আকাশের তলে,
এত সত্য-সে, এত মিথ্যা কি হোতে পারে এক পলে!
দেখি না-ই দেখি, আছ তুমি আছ, ছিলে সে
যেমন কাল-ও,
চোখের আড়াল,—তবু জানা ছিল, মনে
তুমি বাসো ভালো।
তুমি যে রয়েছ এই বিশ্বাসই আলো ক'রে এ ভুবন!
হোক সে মৃত্যু আলো-হরা, তার নেই সেই আবরণ,—
শোকের কালিতে কালো হোক যত বিচ্ছেদ-যবনিকা
তোমার সত্তা তারো পার হতে বিচ্ছুরে প্রাণশিখা।
জীবন-মরণ দুই পার ব্যাপী তুমি আজ বিরাজিত,
আর তো তোমারে হারাবার ভয় করবে না চির ভীত।
দেব-দুর্লভ দেহ নিয়ে তুমি ছিলে নয়নের আগে,
আজ হতে তুমি মনে পুরোপুরি, আরো যে
কাছের লাগে।
স্পর্শের সাধ ঘুচিয়ে ফুরাল হাতে পায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি,
সে-মুখের হাসি, কণ্ঠের স্বর হারালেম বুঝি দুই-ই।
যদি সে হারায় কালের তাড়ায় তাতে যা হবার শোক,
তারে ছেপে ওঠে এই আনন্দ,—এক নামে এত লোক!
প্রাণে প্রাণে তুমি প্রাণময় আজ কী নিকটে কীবা দূরে,
এমন বিরাট এত স্বগভীরে এতখানি ছিলে জুড়ে'!
"বিশ্বজগত আমারে মাগিলে কে মোর আত্ম পর"—
কী সত্য,—দেখি, ঐ তো তোমার ঘরে ঘরে আজ ঘর!
আপন কি পর সবাই হারাল আজ পরমাত্মীয়,
সকলের সব ভাবনা বেদনা, আর রূপ পাবে কি ও?
মূক প্রকৃতিও কথা কয়েছিল, গেয়েছিল পশু পাখি,
শেষ কথা খুঁজে সব কাজে আর কার মুখ চেয়ে থাকি!
কত উৎসব, কত সে ব্যসন, শুভকাজ, ক্ষতি ক্ষত,
লোক উদ্যোগে সর্বব্যাপী সে কার প্রাণযোগ অত!
"পড়ে থাকা পিছে ম'রে থাকা মিছে"—শুনে
ধিক্কার কথা,
কার গানে জাতি প্রাণ পেয়ে চায় প্রাণ দিয়ে
স্বাধীনতা!
"ভিক্ষায়াং-সে নৈব-চ"—বাণী কে বলে আর সে-তেজে,
আত্মার বল ক'রে সম্বল দাঁড়াতে জাগাবে কে যে!

"সাবধান!"—কে সে করে গর্জন মানুষের অপমানে,
নীচ দরিদ্র অপমানিতেরে তুলে দিয়ে গেলে প্রাণে।
মানুষে মানুষে মিলিয়ে বিশ্বে নর-দেবতার সেবা,—
অসীমের সাথে সীমার মিলন এমন দেখাবে কেবা।

দেখেছি তোমারে আমাদের ক'রে এই আশ্রম মাঝে,
নিজেও আমরা দেখি নিজেদেরে কী ছোটো, স্বার্থ কাজে।
আজ দেশে দেশে সীমা লোপ ক'রে মানুষের
ভালোবাসা
তোমার মহান রূপটি দেখায়, অশ্রু জলে সে ভাসা।
সাথে ফুটে' ওঠে নিজেদেরো রূপ,
বিস্ময় জাগে সে কী,—
এক অনুভবে বিশ্বের লোক সবাই যে এক দেখি।
"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"তে আজ
দেখি মানুষের বিশ্বস্বরূপ, পরা অসীমের সাজ।
গ্রহতারকায়, মাটিতে, মানুষে, বাহিরে কি
ঘরে-দোরে—
স্থূলে কি শূন্যে, সাধে সাধনায় যেখানেই মন ঘোরে—
সবখানে তুমি মিশিয়ে রয়েছ তোমার সে গানে গানে;
আসে দিন রাত, আলো-ছায়া তার তোমারেই
মনে আনে।
শ্রাবণের ধারা, শরতের হাসি, বসন্ত-পূর্ণিমা,
নদীকল্লোল, অলিগুঞ্জন মেঠোপথ-মাধুরিমা,
জননীর স্নেহ, শিশুদের খেলা, যুবকযুবতী-প্রেম,
প্রৌঢ়জনের সংসার-দায়, বৃদ্ধের দয়া ক্ষেম,
সব কিছুতেই দিয়ে গেছ তুমি "আরেকটু মধু ভ'রে,"
মধুতর হয়ে আজ তারা মন নাড়া দেয় আরো জোরে।
এই পৃথিবীরে ভালোবেসেছিলে হিসাব-নিকাশ ভুলে',
চাহনি তোমার কার চাহনিতে মেশা এরি তারা ফুলে।
এখানেই লীন আকাশে বাতাসে শেষ নিঃশ্বাসখানি;
এরে যত দেখি, যত ভালোবাসি তোমারেই
আরো জানি।

যতই বেদনা দুঃসহ হয়, তত পাই প্রাণভরা,
স্মৃতি যে তোমার নিত্যকালের অমৃত-নির্ঝর-ঝরা।
সে অমৃত আজ মর আমাদেরে জোগাবে জীবন নব
মৃত্যু-আঁধার-পার হতে সবে তোমার প্রসাদ লব।
তোমার কামনা, তোমার সাধনা, তোমার অমর বাণী,
কিছুতে সে নয় ব্যর্থ হবার, যত হোক হানাহানি,—
সংকটময় পৃথিবীতে হবে মহামানবের আসা,
শেষগানে তুমি রেখে গেছ গুরু যে অমর প্রত্যাশা।
সেই আশাতেই শেষ শুভাশিস্ দিয়ে গেছ পৃথিবীরে,
সেই আশাতেই মনে মনে ঘুরে আছ আমাদের ঘিরে।
যেখানেই থাকো চিরদিন জানি তুমি পৃথিবীর লোক,
আজ পৃথিবীর প্রার্থনা শুধু,—পূর্ণে পূর্ণ হোক॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

সন ১৩১১ সাল। আমি তখন কাশীতে বছর ছাব্বিশ বয়সের একটি সাধারণ সংস্কৃতবিদ্যার্থী। বছর সাত তখন আমার সেখানে কাটিয়াছে। দিন রাত সংস্কৃত পড়ি, সংস্কৃতে লিখি, সংস্কৃতে সভা-সমিতি করি আর মাসিক পত্রিকা বাহির করি। কাশীর সংস্কৃত আলোচনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ায় তখন সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছু জানিবার আছে মনে হইত না। ঐ সময়ে কাশীতে কোন এক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় বাঙালী পণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এক দিন কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"রবিঠাকুর লেখে ভাল, কিন্তু দাশুরায়ের মত নয়।" আমার মত টোলের সাধারণ ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি তখন কী ভাব ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

কাশীতে তখন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিনী এনি বিসান্টের উদ্যম ও উৎসাহে থিওসফিক্যাল সোসাইটির খুবই প্রভাব ছিল। আমার কয়েকটি বন্ধু উহার সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কখনো কখনো আমি ওখানে যাইতাম। উহা একটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগানবাড়ীর মধ্যে ছিল, এবং তাহাতে অতিসুন্দর একটি পাঠাগার ছিল। উহা দেখিয়া আমার মনে হইত, আমি যদি এইরূপ একটি বাগান-বাড়ীতে থাকিয়া পাঠাগারে পড়িবার সুবিধা পাই তো কত ভাল হয়। অন্তর্যামী বিশ্বনাথ আমার এই অন্তরের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। তিনি আমার অগোচরে তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রথী ও সন্তোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহারা এখন উচ্চতর পাঠ্য পড়িবে। তাহাদিগকে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য লোক চাই। তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্বর্গীয় মোহিতবাবু ছিলেন, আর আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল দাদা মহাশয় আশ্রমের সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেন। ভূপেন দাদা আমাকে জানিতেন। সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ কাজের জন্য এখানে আসিবার জন্য তিনি আমাকে কাশীতে পত্র লিখিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পরেই আমার আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। মাঘ মাসে আসা ঠিক হইল।

শান্তিনিকেতন-সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। গুরুদেবকে তখন রবিঠাকুর ভিন্ন বেশী কিছু বুঝিতাম না। ঠাকুর-পরিবারের সন্তান আর কবি, ইহা ছাড়া তাঁহাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করিবার আমার তখন কিছুই ছিল না। কাশী হইতে কী উদ্দেশ্যে আমি শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম জানি না। ভবিষ্যতে সেখানে আমার ভাল মন্দ কী হইবে না হইবে, সে কথা মনেই আসে নাই। টাকাপয়সা রোজগারের চিন্তা তো সেখানে আসিবার পূর্বে একটুও মনে হয় নি। কেন না তখন পয়সা রোজগার না করিলে সংসার চলিবে না, এ অবস্থা আমার ছিল না। আমার পিতা জীবিত ছিলেন, আর জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষত আমি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়া পরিবারবর্গের কেহ আমার কাছে পয়সার আশাও রাখেন নাই। যাহা হউক, আমার দক্ষিণা স্থির হইয়াছিল মাসিক ৩০্ টাকা।

শান্তিনিকেতনের কী তবে তখন আমাকে কাশী হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল? সংস্কৃত-আলোচনার অত বড় ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম? কোন একটি নির্জন-নিরুপদ্রব বাগানবাড়ীতে পুস্তকালয়ের মধ্যে পড়াশুনা করিবার আকাঙ্ক্ষা খুবই ছিল। ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যখন আমি শুনিলাম যে, শান্তিনিকেতন দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এক বাগানের ভিতরে অবস্থিত, আর সেখানে একটি পুস্তকালয় আছে এবং তাহাতে অনেক সংস্কৃত বই আছে, তখন আমার সেখানে আসা সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক হইয়া গেল। আমার কোন-কোন নিষ্ঠাবান্ বন্ধু মন্তব্য করিলেন, আমি রবিঠাকুরের পাল্লায় পড়িয়া ব্রাহ্ম হইতে যাইতেছি। কেহ-কেহ বা বলিলেন 'যাও রবিবাবু বড়লোক, তাঁহার কাছে থাকিলে তোমার ভাল হইবে।' যাহাই হউক, আমি আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

১১ই অথবা ১২ই মাঘ দুপুরে বেনারস-ক্যান্টনমেণ্ট হইতে বোলপুর পর্যন্ত একখানি টিকিট কাটিয়া বেলা ৩টার সময় মোগলসরাই স্টেশনে নামিলাম। এখানে গাড়ী বদল করিয়া পঞ্জাব মেলে যাইতে হইবে। সেখানে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন যে, পাঁচ-ছয় দিন হইল মহর্ষি পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বোধ হয় রাত্রি ১০॥ টায় গাড়ী মোকামা স্টেশনে পৌঁছিল। আমি নামিয়া পড়িলাম। ওখান হইতে আমাকে লুপলাইনের গাড়ীতে এখন যাইতে হইবে। গাড়ী বদল করিয়া শুইয়া পড়িলাম। যতক্ষণ ঘুম আসে নাই শান্তিনিকেতনেরই নানারূপ কল্পনার ছবি আঁকিতে লাগিলাম।

সকাল হইল। সাঁইতে আসিয়া পড়িয়াছি। ওদিকে নূতন চলিয়াছি, তাই ই. আই. রেলের একখানা টাইম-টেবল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। উহা মিলাইয়া বোলপুর স্টেশনের অপেক্ষা করিতেছি। আহ্মদপুর পার হইয়া গেলাম। এইবার বোলপুর। তখন ইহাদের মধ্যে অন্য স্টেশন দুইটি হয় নাই। কোপাই নদীর পুল পার হইয়া রেল লাইন একটা গভীর খাতের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ঐ জায়গাটি চারি দিক হইতে খুবই উঁচু বলিয়া রেলের রাস্তাটিকে সমতলে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত মাটি তুলিয়া দুই ধারে ফেলিতে হইয়াছে। একে তো স্বভাবতই ঐ স্থানটি অত্যন্ত উচ্চ, তাহার পর উহার উপরে প্রচুর মাটি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রেল লাইনের দুই দিকে দুইটি ছোট-খাট পাহাড়ের মত দেখায়। বহু কাল হইতে বৃষ্টির জলে-জলে ধারের মাটিগুলি ধুইয়া যাইবার ফলে, ঐ কৃত্রিম পাহাড়ের ধারগুলি অতিবিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল, বড় সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল। রেলগাড়ী যখন এই পথের মধ্যে ঢুকিল, তখন মনে হইতেছিল, শান্তিনিকেতন যদি ইহার কাছে হয় তো এইখানে বেড়াইতে আসিব। ইহা অন্যথা হয় নি। এই রাস্তাটুকু অতিক্রম করিয়াই বোলপুর স্টেশন। নামিয়া পড়িলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি অনেক বলদের গাড়ী রহিয়াছে। তখন সাধারণ লোকে শান্তিনিকেতনের নাম তত জানিত না। ভুবনডাঙার কাচ-বাঙ্‌লা নামই তাহাদের বিশেষ পরিচিত ছিল। আমি শান্তিনিকেতনের কথা বলায় প্রথমে গাড়োয়ানেরা বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, চারি আনায় একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া আমি শান্তিনিকেতনে রওনা হইলাম। উত্তর মুখে একটু আসিবার পরে গাড়ী ভুবনডাঙা গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া একটা বড় বাঁধের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইল। এই বাঁধটা তখন আরও অনেক লম্বা ও চওড়া ছিল। তাহার পশ্চিম দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট এক অতিদীর্ঘ তালশ্রেণী ছিল। প্রথম দর্শনে ইহা কত সুন্দর দেখাইয়াছিল বলিতে পারি না। বাঁধে তখন প্রচুর জল থাকিত। শান্তিনিকেতনের পদ্মা ও চিত্রা নামে দুইখানি ছোট ছোট নৌকা ইহাতে ছিল। ইহাদের একখানি ছিল দিনুবাবুর। এই নৌকায় দাঁড় টানিয়া পাল লাগাইয়া কত খেলাই এক দিন করা গিয়াছিল। কালক্রমে বাঁধটির অবস্থা খারাপ হওয়ায় কিছু দিন হইল ইহার পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে। বাঁধের ধারে গাড়ীখানা থামাইয়া আমি হাত মুখ ধুইয়া লইলাম। ঐখান হইতে দেখিতে পাইলাম শান্তিনিকেতনের শালশ্রেণী দেখা যাইতেছে।

গাড়ীতে আবার উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতেই উহা ধীরে ধীরে আদি-কুটীরের নিকট উপস্থিত হইল। আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। ছেলেদের থাকিবার জন্য ঐ ঘরখানিই আশ্রমে প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া পরে উহার ঐ নাম দেওয়া হয়। ইহা একখানি মাটির দেয়ালের উপর রাণীগঞ্জ টাইলে ছাওয়া দুই চালের লম্বা ঘর, ইহার দক্ষিণে ও উত্তরে সঙ্কীর্ণ এক-একটি বারাণ্ডা। তখন ছাত্রদের জন্য এইখানাই একমাত্র ঘর। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গাব গাছের ধারে তখন একটা প্রকাণ্ড কূপ ছিল। আর ইহারই পাশে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছোট একখানি খড়ের ঘর ছিল। ইহার ভিটাটা এখনো দেখা যায়। ইহার পশ্চিমের কুঠরীতে থাকিতেন দিনুবাবু। মাঝের কুঠরী ছিল শিক্ষকগণের উঠিবার বসিবার সাধারণ ঘর, আর পূর্বের কুঠরীতে কে ছিলেন মনে নাই। মহর্ষির শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দিনুবাবু কলিকাতায় যাওয়ায় আমি আপাতত তাঁহার ঘরে স্থান পাইলাম।

প্রথম দেখাতেই আশ্রমটি আমার মনে লাগিয়া গেল। ধীরে ধীরে ইহার চারি দিকে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। আশ্রমটি শাল ও তাল তরুর শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত বাগানের মধ্যে। আমার বাসার কাছেই বিশাল অতিথিভবন। একটি উচ্চ দোতালা বাড়ী। তার সামনে উত্তরে লাল কাঁকরে ঢাকা প্রশস্ত পথ। ইহার দুই ধারে বড় বড় আমলক বৃক্ষের পঙ্‌ক্তি। তাহার পর প্রকাণ্ড ফটক। তাহার উপরে সোনালী অক্ষরে লেখা "ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্।" পাশেই পূর্ব দিকে মন্দির। ইহার

সমস্ত দেয়াল কাচের, কোন আবরণ নাই। মেজেটি সাদা পাথরে বাঁধান। সামনে পূর্ব দিকে একটি চমৎকার বারাণ্ডা। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্জন-নীরব। মন্দিরের সামনে দক্ষিণে একটি ছোট ফুলবাগান। ইহাতে ছোট-ছোট বেদি করিয়া নানা রকমের ফুল লাগান। আর ঐ বেদিগুলিতে বহু ভাল-ভাল কথা লেখা। মন্দিরে ঢুকিতে একটি প্রকাণ্ড তোরণে "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি উপনিষদের শ্লোকটি সোনার জলে বড়-বড় অক্ষরে লেখা ছিল। আশ্রমের বহু স্থানেই উপনিষদের কথা লিখিত বা উৎকীর্ণ। মন্দিরটি দেখিয়াই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম দিকে আচার্যের আসন, তাঁহার দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে ধর্মগ্রন্থ রাখিবার জন্য শ্বেত পাথরের ছোট-ছোট চৌকি। পূর্ব প্রান্তে যাঁহারা সঙ্গীত করিবেন তাঁহাদের আসন ও বাদ্য-যন্ত্র। আর উত্তরে ও দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সার করিয়া উপাসকদের জন্য কার্পেটের আসন। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া উপাসনা হইবে। কেহ আসুক বা না আসুক। ইহাই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা। আমার মন ভরিয়া উঠিল।

এখান হইতে একটু দূরে পশ্চিম দিকে বায়ুকোণে মহর্ষির সাধনা-স্থল। দুইটি সপ্তচ্ছদতরুর মূলে একটি শ্বেত প্রস্তরে বাঁধান বেদি। ইহারই ঠিক উপরে একটি প্রস্তর ফলকে, "তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি" এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ। আর ঐ সপ্তচ্ছদযুগলের একটির প্রধান ডালটিতে লিখিত দেখিলাম "সত্যাত্মপ্রাণারাম"। বেদির সম্মুখে একটু দূরে আর একখানি শ্বেতপ্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ ছিল, "ওঁ শান্তং শিবমদ্বৈতম"। এই স্থানটি তখন নিবিড় লতাপাতায় বেশ আবৃত ছিল। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ দুইটির উপরটা তখনো একটি মালতী লতা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। এ সব ক্রমশই আমাকে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পুস্তকালয় দেখিতে গেলাম। তখন তাহা কতই ছোট। বর্তমান গ্রন্থভবনের মাঝখানে সামনের বারাণ্ডায় উঠিয়াই যে বড় ঘরটা দেখা যায়, তখনকার তাহাই ছিল আশ্রমের পুস্তকালয়। পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও খুব ভাল-ভাল বাছাই-বাছাই অনেক পুস্তক তাহাতে ছিল। ইংরেজী অংশের সমস্ত বই গুরুদেবের নিজের, আর সংস্কৃত অংশের সমস্ত বই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বহু পুঁথি সংগৃহীত ছিল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, তন্ত্র, ইত্যাদি বহু বিষয়ের পুঁথি এই সংগ্রহে ছিল। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুরোধে পরে এই পুঁথিগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দান করা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে ঐ সময়ে মুদ্রিত বহু সংস্কৃত পুস্তক ছিল। বাঙ্লার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক এই সংগ্রহের মধ্যে ছিল। আমার অদেখা-অশোনা বহু পুস্তক এখানে দেখিতে পাইয়া আমার মন উৎসাহে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কাশীতে মন যাহা চাহিতেছিল, সে তাহা এখানে পাইল।

তা ছাড়া চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তো বলিবারই নহে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই চোখ আবদ্ধ হইয়া থাকে। দেখিয়া দেখিয়া আশা আর মেটে না।

আশ্রমে অল্প বয়সের বিশ-পঁচিশটি মাত্র ছাত্র। আশ্রমটি তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ। ছেলেরা ব্রহ্মচারী। যতটুকু সম্ভব তাহারা ব্রত পালন করে। তাহারা খুব ভোরে স্তোত্রপাঠ করিয়া বিছানা হইতে ওঠে, কিছু ব্যায়াম করে, স্নান-সন্ধ্যা করে, সমবেত হইয়া স্তোত্রপাঠ করে। তাহারা আতপ ও নিরামিষ আহার করে, জুতা-ছাতা ব্যবহার করে না, নিজের কাজ নিজেই করে, তাহারা উপাধ্যায়ের আজ্ঞানুবর্তী, সংযম ও বিনয়ে তাহারা অভ্যস্ত, অতিথি-পরিচর্যায় তাহারা উৎসাহী। অধ্যয়নের সময় তাহারা এক একটি লম্বা গৈরিক জামা গায়ে দেয়, গাছ তলায় উপাধ্যায়কে প্রণাম করিয়া ঝাড়ন দিয়া পা মুছিয়া নিজের নিজের আসনে বসিয়া আনন্দে তাহারা পড়াশুনা করে। আনন্দে তাহারা খেলা-ধূলা করে।

পূর্বে কোন দিন ব্রহ্মচর্য পালন করি নি। ছেলেদের দেখিয়া উহা পালন করিবার ইচ্ছা হইল।

এইরূপ দেখাশুনা করিতেই কয়দিন কাটিয়া গেল। আমার কোন কাজ-কর্ম তখনো নির্দিষ্ট হয় নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথ তখনো কলিকাতা হইতে ফেরেন নাই। জানিয়াছিলাম তিনি নিজেই ইহা করিয়া দিবেন। ইহার মধ্যে শোনা গেল তিনি এক রাত্রে আসিতেছেন, পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবে। দিনুবাবু, অজিতবাবু ও সত্যবাবু (গুরুদেবের মধ্যম জামাতা) প্রভৃতির সঙ্গে ঐ রাত্রেই দেখা হইয়াছিল।

সুপ্রভাত হইল। ব্রহ্মচারীদিগের নিয়মিত কাজ চলিতেছে। অল্প একটু বেলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আদি কুটীরের সামনে আসিয়াছেন। সঙ্গে অধ্যাপকদের দুই

কেজন রহিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মনে নাই। এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, গুরুদেব আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। দূর হইতে দেখিলাম তিনি পায়চারি করিতেছেন। কী উজ্জ্বল মূর্তি! পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতে মুখের রং আরও ধপ্-ধপ করিতেছে। তিনি সাদা পশমীর একটি আপাদলম্বিত জামা পরিয়া আছেন। আমি গিয়া নমস্কার করিলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন। প্রথম দেখা-মাত্রই কেমন তাঁহাকে ভাল লাগিল, তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম, আর মনে হইল তিনিও আমাকে ভাল চোখে দেখিলেন। পরে ইহা ভাবিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, যাহাকে সংস্কৃতে "তারামৈত্রক" বলে আমাদের তাহাই হইয়াছিল। একজনের চোখের তারার সঙ্গে অপরের চোখের তারা মিলিলেই যে ভালবাসা হয় তাহার নাম "তারামৈত্রক"। যাহাই হউক, আমাদের আলাপ হইতে লাগিল। মনে হইয়াছিল, প্রথম আলাপই আমাদের মধ্যে জমিয়া উঠিয়াছিল। কী যেন কাব্য সম্বন্ধে কথা হইতেছিল, বিশেষ কিছু মনে নাই। তবে একটা কথা মনে আছে। আলোচনার মধ্যে আমি তাঁহাকে এই শ্লোকটি শুনাইয়াছিলাম—

> "জানকীহরণং কর্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
> কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥"*

তিনি ইহা শুনিয়া খুব খুসী হইয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে তিনি আসার পর, আশ্রমের প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক কার্যে তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে লাগিলাম। তখনকার শিক্ষকগণের প্রত্যেকের মধ্যে সাহিত্যালোচনার একটা অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের পরিচয় অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলাম। আশ্রমে তখন কয়েকটি মাত্র ছেলে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই তাহারাই সম্বল। তাহাদিগকে লইয়াই সকলের সময় কাটিত।

ক্রমশ আমার কাজ-কর্ম স্থির হইয়া গেল। রথী ও সন্তোষকে সংস্কৃত পড়ান আমার প্রথম কাজ। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের ছোট-ছোট ব্রহ্মচারীদিগকেও কিছু কিছু সংস্কৃত শেখান আমার কাজ হইল। দেখিলাম, আমি আসিবার পূর্বেই রথী ও সন্তোষ নিজে নিজেই অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঙলায় অনুবাদ করিতেছে। তাদের সম্মুখে রহিয়াছে সংস্কৃত মূল ও কাউয়েল সাহেবের করা ইংরেজী অনুবাদ। ইহা রবীন্দ্রনাথের উপদেশে। যত দূর পারে নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে মূল বুঝিতে হইবে। তাহারা ইহাতে কিছু দূর অগ্রসরও হইয়াছিল। ব্রহ্মচার্যশ্রমের ছেলেরা সবে সংস্কৃত আরম্ভ করিয়াছে। যাহাতে তাহারা সহজে সংস্কৃত শিখিতে পারে এইরূপে রবীন্দ্রনাথ নিজেই "সংস্কৃতসোপান" নামে একখানি বই নূতন প্রণালীতে লিখিয়াছিলেন। "বঙ্গীয় শব্দকোষে"র প্রণেতা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই অবলম্বন করিয়া "সংস্কৃত-প্রবেশ" নামে কয়খণ্ড বই রচনা করেন। দেখিলাম ছেলেদের তাহাই পড়ান হয়। ইহাদিগকে ঐ পুস্তক অবলম্বনে 'কাকঃ কৃষ্ণঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলাম। রথী ও সন্তোষকে বোধ হয় আমি প্রথমে "উত্তরচরিত" পড়াইতে আরম্ভ করি। তাহারাও তখন ব্রহ্মচারী। তাহারা নগ্নপদে থাকিত। নিয়ম-সংযম পালন করিত, দণ্ডধারণ করিত, এবং জুতা-ছাতা ব্যবহার করিত না। পাঠের সময় উপাধ্যায়ের কাছে তাহাদের যে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, বিনয় ও সংযম দেখিয়াছি, তাহা আর কোথাও দেখি নাই।

আমার কাজ অতি অল্প। হাতে সময় যথেষ্ট। পুস্তকালয়ে সংস্কৃত পুস্তকও প্রচুর। ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আমিও নূতন করিয়া তাহাদের মত পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম। বোধ হয় তাহারা আমা অপেক্ষা বেশী পড়িত না।

রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনায় ক্রমশই তাঁহার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতেছি। কয়েক দিন যাইতে-না-যাইতেই তিনি আমাকে রথী ও সন্তোষের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "দেখুন, বৌদ্ধ যুগের ভাল ইতিহাস নাই। আপনার ছাত্র দুইটিকে ইহা উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু পালি না জানিলে ইহা সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি নিজে পালি পড়ুন, আর আপনার ছাত্র দুইটিকে পড়ান।" অপূর্ব আদেশ, অপূর্ব উপদেশ। আমি তখন পুস্তকালয়ে অনাদৃত সংস্কৃত বইগুলি ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া, সাজাইয়া-গোছাইয়া তাহাদের সহিত পরিচয় লাভ

---

* এই শ্লোকটি রাজশেখরের করা, এবং ইহা "সূক্তিমুক্তাবলী"তে পাওয়া যায়। ইহার দুইটি অর্থ আছে। প্রথম অর্থ হইতেছে—রঘুবংশ অর্থাৎ রঘুকুল থাকিতে জানকীহরণ অর্থাৎ সীতাহরণ করিতে যদি কেহ সমর্থ থাকেন তবে তিনি হইতেছেন রাবণ। আর দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে রঘুবংশ অর্থাৎ কালিদাসকৃত সুপ্রসিদ্ধ "রঘুবংশ" কাব্য থাকিতে জানকীহরণ অর্থাৎ এই নামে প্রসিদ্ধ (এবং "রঘুবংশের"ই মত সুন্দর) কাব্য করিতে যদি কেহ সমর্থ থাকেন তবে তিনি হইতেছেন কবি কুমারদাস। ইঁহার "জানকীহরণ" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

করিবার জন্য লাগিয়া গিয়াছি। পড়া-শুনার সুবিধা হইবে বলিয়া পুস্তকালয়ের পাশেই একটি ছোট কুঠরীতে আমার পড়িবার আর শুইবার স্থান করিয়া লইয়াছি। কাহারও কোন আপত্তি হয় নাই, আর তখন তত কড়াক্কড় নিয়মও ছিল না। আমি যেন সেই সময়ে পুস্তকালয়েরই একটা অঙ্গ হইয়া গিয়াছি। উহা যেখানে সরিত, আমিও তাহার সঙ্গে সরিতাম। একবার ইহা পুরাতন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। আমিও উহার মধ্যে থাকিতে লাগিলাম। যাই হউক, তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বিপুল উৎসাহ হইল। কিন্তু মজার বিষয় এই যে, আমি তখন পালির এক অক্ষরও জানিতাম না। কাশী ছাড়িবার পূর্বে এক দিন হিন্দুকলেজের পুস্তকালয়ে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা কী যেন একখানা পালি বই এক-আধ মিনিটের জন্য দেখিয়াছিলাম, উহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই, বইখানার নামও না। ইংরেজী হরপে পালি পড়া তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

উৎসাহে তাঁহার আদেশ তো শিরোধার্য করিয়া লইলাম, কিন্তু চিন্তা হইল কেবল তো নিজে পড়া নহে, ছাত্রকে পড়াইতে হইবে। কীরূপে ইহা হইবে? কে আমাকে সাহায্য করিবে? ইহা ভাবিতে ভাবিতে পুস্তকালয়ে গিয়া দেখিলাম দুইখানি পালি বই আছে। গুরুদেব ইহা আমাকে বলেন নাই। একখানি Frank Farter-এর Hand Book of Pali, আর একখানি Childers-এর Pali-English Dictionary। দুইখানিই টানিয়া বাহির করিয়া লইলাম। বই দুইখানির কতকগুলি পাতা উল্টাইয়া দেখি রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। কোনো পাঠক এখনো তাহা দেখিতে পাইবেন। আমি উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কথাপ্রসঙ্গে ইহা জানাইলে তিনি হাসিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার জন্য তাঁহাকে ইহা করিতে হইয়াছিল। পালি আলোচনার জন্য যে-কোন পুস্তক আবশ্যক তাহা আনাইয়া লইবার জন্য তিনি ঝাড়া হুকুম দিয়াছিলেন, যদিও সে সময়ে আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রধানত আমার জন্য আনীত এই সব পুস্তকেই আশ্রমের পালিপুস্তক-সংগ্রহটি হইয়াছে। কেবল যে তিনি আমাকেই পড়াশুনা করিবার এইরূপ সুবিধা দিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রত্যেক অধ্যাপকই, যিনি যে বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে সে বিষয়ে এইরূপ সুবিধা পাইয়াছেন। কেহ ইহা কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন, কেহ বা পারেন নাই, সে স্বতন্ত্র কথা। প্রত্যেক অধ্যাপক কোন এক বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবেন, ইহা করিতেই হইবে, তিনি ইহাই চাহিতেন। একবার তাঁহার মনে হইয়াছিল, সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্‌লা ভাল জানা যায় না। তাই যে সকল শিক্ষক বাঙ্‌লা পড়াইতেন, তাহাদের সকলকে তিনি সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে "লঘুকৌমুদী" হাতে করিতে হইয়াছিল। শিক্ষকদের পড়াশুনার সুবিধা করিয়া দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হন নাই—তা যতই না কেন অর্থের অনটন হউক। আমার প্রতি তো, তাঁর করুণার সীমা ছিল না। তাঁহার আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশে আমি পড়াশুনা করিয়া চলিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই উঠিতেছে। একবার মনের মধ্যে হইয়াছিল পারশীদের ধর্মভাষা অবেস্তাটা কেমন একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিব। আমি তখন অসুস্থ। হাজারীবাগে আছি গুরুদেবকে ঐ কথা জানাইলাম। আমার পত্র যাইতে হয়তো একটু বিলম্ব হইয়া থাকিবে, কিন্তু উত্তর আসিতে এক দিনও বিলম্ব হয় নাই, দেখি উত্তরের সঙ্গে ১০০৲ টাকার নোট আসিয়া হাজির। আমি মুগ্ধ। উহা দিয়া কয়েকখানি বই কিনিয়া ফেলিলাম।

শান্তিনিকেতনে আমি মাঘ মাসে আসি: ফাল্গুনে আমি নিজের চেষ্টায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। ফল বাহির হইলে দেখা গেল, আমি উত্তীর্ণ হই নাই। ইংরেজীতে আমার গলদ ছিল। আমি আমার ঘরে আছি। সকাল বেলায় গুরুদেব ওখানে আসিয়া বলিলেন, "মশায়, খুব ভাল হয়েছে। আপনি ফেল করিয়াছেন জানিয়া আমি খুব খুসী। পাস করিলে আপনি কোনো কলেজে ছুটিতেন। ও সব ছাড়িয়া দিন। এখন হইতে ভাল করিয়া পড়াশুনা করুন।"

আমার শুভ বুদ্ধি হইল। তিনি আমাকে যখন যেমন যে আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ দিতে লাগিলেন, যতদূর পারি তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহার মহত্ত্ব প্রতিপদে অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথমে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতাম। বেশী দিন ইহা চলে নাই। মাথা আপনা-আপনিই নীচু হইয়া আসিল। প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলাম, পায়ের ধূলি লইতে আরম্ভ করিলাম, অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ধন্য হইয়াছি।

প্রথমে রবি ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই কেহ 'রবি ঠাকুর' বলিলে কানে বাধিত।

"কবি" বা "রবি বাবু" বলিয়াও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু যেমন যেমন দিন যাইতে লাগিল, মনেরও গতি পরিবর্তন প্রাপ্ত হইল। তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলাম।

আশ্রমের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণে দ্বিজেন্দ্রনাথ। ইহা মনে করিয়া ভাবিতাম হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। এই আর্যাবর্তের মধ্যে যে সংস্কৃতির উদ্ভব, তাহা অনন্যসাধারণ।

আশ্রমটি ক্রমশই বড় হইয়া উঠিল। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইল। গুরুদেব মূলত ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান নাই, উহা ছিল তাহার বাহ্যরূপ। তিনি বিশেষ ভাবে উহা দ্বারা বিশ্বের সহিত ভারতের যোগ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি যখন "যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্" এই বেদবাক্যটি তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলাম, তখন তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছায় ও আদেশে বিশ্বভারতীর বার্ষিক উৎসবসভায় তাহার সঙ্কল্প বাক্যের মধ্যে ইহা পাঠ করা হয়। কেহ উপহাস করেন, করুন, কিন্তু তথাপি বলিব, গুরুদেব সমগ্র পৃথিবীর সহিত বিশ্বভারতীর এইরূপই একটি যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হইত আমরা যেন শান্তিনিকেতন-নামে কোন পরিচ্ছিন্ন স্থানে নই, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাস করিতেছি। জাতি-ধর্ম-দেশ-নির্বিশেষে জগতের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। সকলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী। জগতে যাঁহারা সত্য-সত্যই মনীষী, জ্ঞানী ও বিশ্বহিতৈষী তাঁহাদের সহিত ভাব-বিনিময়ে গুরুদেব যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সমগ্র আশ্রমবাসীকে তিনি তাহার ফল উপভোগ করাইয়াছেন। বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক সমূহকে আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার মূল উদ্দেশ্যও ইহাই যে, তাঁহাদের সংসর্গে পূর্ব-পশ্চিমের সঙ্কীর্ণতার ক্ষয়ে সত্য ও উদার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। টাকা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না। মনে হয় প্রধানত নিজের মহিমায় তিনি বিশ্বভারতীর জন্য যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও অন্যের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হইত না।

কবির কল্পনা নহে। তাঁহার কল্পনা বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বিশ্বভারতীর—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের —ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, উহা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের ভিতরের কথাটাকে, ভাবটাকে যদি কেহ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন তো বিস্মিত হইয়া যাইবেন, কী তাঁহার চিন্তা, আর কী প্রকারে ইহা এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কী প্রকারে ইহা সম্ভব হইয়াছে। আমি যখন ভাবি, মুগ্ধ হইয়া যাই। আর যখন ইহার সঙ্গে নিজের কথাটা আসে, তখন মনে হয়, কী আমার সৌভাগ্য! আমি তাঁর আশ্রয় পাইয়াছি! তিনি আমাকে কত ভালবাসিতেন! ভালবাসিয়া তিনি আমাকে কত দিকে কত কী দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্রতা ও অযোগ্যতায় তাহার আমি কতটুকুই বা লইতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি যতই কিছু অল্প লইয়া থাকি তাহা আমার কাছে অল্প ছিল না। তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়াছেন যাহা পাইয়া আমি সমগ্র দিনের কর্মের অবসানে রাত্রিতে বেণুকুঞ্জের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া শুইবার সময় মনে করিতাম, আমি রাজার হালে আছি, আমি রাজার মত খাই, রাজার মত পরি, রাজার মত ঘুমাই। হয় তো শেষের কথাটা ঠিক নয়। কোনো রাজা এমন নিশ্চিন্ত মনে আনন্দে ঘুমাইতে খুব কমই পারেন। আমার মনে হইত, তিনি বিদ্যাভবনের এক কোণে আমাকে যে একখানি আসন দিয়াছিলেন, তাহা আমার রাজসিংহাসন, আর আমি তাহার রাজা। তাঁর আশ্রয় না পাইলে আমার জীবনের গতি এবং দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহা আমার কল্যাণের জন্য হইত না।

আমি এইরূপে সুখের সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছি। কিন্তু বিধাতার তাহা সহিল না, আর পিছনে যার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল। দৈবের দুর্বিপাক! অদৃষ্টের কী পরিহাস! যাহা ছিল চিন্তার অতীত, যাহা ছিল স্বপ্নের অগোচর, আমার কপালে তাহাই হইল। এক দিন কোথাও কিছু নাই। আকাশ নির্মল। সহসা এক কোণে কোথা হইতে এক টুকরা কাল মেঘের রেখা দেখা দিল। ঝড় উঠিল। কিছু কিছু ওলট-পালট হইয়া গেল। এক অঘটন-ঘটনা হইল এবং ইহা হইল আমারই দ্বারা। গুরুদেবকে বড় আঘাত দেওয়া হইল। কিন্তু উহা প্রতিহত হইয়া আমার নিজেরই বুকের পাঁজর ভাঙিয়া দিল। এখনো ভাবিয়া পাই না, কীরূপে ইহা সম্ভব হইল। তিনি ছিলেন লোকোত্তর, অনায়াসেই সে আঘাত তিনি ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমার পরিচয় পাইতে আমার বিলম্ব হয় নাই। তিনি আমার প্রতি ছিলেন এইরূপই স্থিরপ্রসাদ। কিন্তু আজ সেই কথা মনে হইয়া আমার বুকের প্রত্যেকটি মর্মকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিতেছে! হায়! কেমন করিয়া আমি তাহা করিয়াছিলাম! যাহাই হউক, এ বিষয়ে তিনি একটি ভবিষ্যদুক্তি

করিয়াছিলেন। যদি তাহা ফলে তবেই আমি সান্ত্বনা পাইব, অন্যথা এ দুঃখ আমার আজন্ম থাকিবে।

আদেশ, উপদেশ ও অনুশাসন করিয়া এবং জ্ঞান দান করিয়া তিনি ছিলেন আমার গুরু, আশ্রয় দিয়া ও রক্ষা করিয়া তিনি ছিলেন আমার পিতা, আর স্নেহ-আদর-প্রণয়-ভালবাসা দিয়া তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কী না ছিলেন?

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৮।

"পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়"

পূর্ণিয়া
১৭ই আগষ্ট ১৯৪১

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপে—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মনের অবস্থা আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। দুর্লভ সম্পত্তি খুইয়ে সর্বহারার মত বিমূঢ়, চঞ্চল। মৃত্যু অনিবার্য্য সত্য হ'লেও মৃত্যু-ভয় কেহ সহজে এড়াতে পারে না। সাধকের প্রাণকেও তা বিচলিত করে। আমাদের আশার কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বারে বারে কত প্রকারে সে ভুল ভেঙে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন—তাঁর অননুকরণীয় সুমধুর বলিষ্ঠ ভাষায় সে অলীক শঙ্কা সম্বন্ধে আশ্বস্ত ক'রে গিয়েছেন। তাঁর আসন্ন দিনেও তা বলে যেতে ভোলেন নি! মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায়ও মানুষের মঙ্গল চিন্তা তাঁকে ত্যাগ করে নি। মানুষকে এতো ভালবাসার নিদর্শন কোথাও খুঁজে পাই না।

তাঁর "মৃত্যু" নামা শেষ কবিতায় বলে গেলেন—

*   *   *   *

"দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্পে বিকীর্ণ আঁধারে।"

যথাসাধ্য অভয় দানের শেষ নিদর্শন!

আমি প্রায় তাঁর সমবয়সী—এক বৎসর কয়েক দিনের ব্যবধান মাত্র। গত জানুয়ারী মাসে নিজে পীড়িতাবস্থায় তাঁর কাছে পাথেয় রূপে আশীষপ্রার্থী হই। তাঁর স্নেহকরুণ আশ্বাসবাণী, এই কৃতজ্ঞের প্রাণে যেন আশার স্নিগ্ধ প্রলেপ দান করে—মর্ম কিন্তু বিচলিতও কম হয় নি। বেশ জানি—বাংলার তথা বিশ্বের রবি, চিরদিনই মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকবেন—তবু...বস্তুতান্ত্রিক অভ্যাস ব্যথা দেয়!

তাঁর সেই দুর্লভ আশীষবাণী, নিম্নে সমগ্রই উদ্ধৃত করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তা'তে মৃত্যুকে যে অভিনন্দন দিয়েছেন, তা সকলেরই সম্পত্তি—সকলকেই অভয়দানে ভয়-মুক্ত করবে বলেই আমার ধারণা।

প্রথম দুইটি লাইন তাঁর মহত্বের নিদর্শন রূপেই গ্রহণ করবেন। যে হেতু—ব্যক্তিগত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

"হে বন্ধু হে সাহিত্যের সাথী,
আসিছে আসন্ন হয়ে রাতি।
আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ায়
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।
পথে দীপ ধরে আছে জানি না সে কোন্ শুকতারা,
কোন্ প্রভাতের কূলে বিদায়ের যাত্রা হবে সারা!
মায়াবিজড়িত এই জীবনের স্বপ্নরাজ্য হোতে
চির জাগরণ হবে পূর্ণের আলোতে,—
মৃত্যুর আনন্দ রূপ এ আশ্বাসে অন্তিম আঁধারে
দেখা দিবে এ জন্মের দ্বিধাদ্বন্দ্বপারে।"

ইতি ১৭-১-৪১

সহযাত্রী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিনত
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবজন্তুর লড়াই

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লড়াইয়ের প্রবৃত্তিটা জীবজগতের মজ্জাগত সংস্কার। প্রাণী জগতে পরস্পরের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত প্রত্যেকের কোন-না-কোন উপলক্ষ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। মোটের উপর, একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে—জীবনটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকগুলি দ্বন্দ্বেরই সমষ্টিমাত্র। দ্বন্দ্ববিহীন নিশ্চেষ্ট জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবে না। দ্বন্দ্ব চালাইবার ক্ষমতা যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে ততক্ষণই জীবন; দ্বন্দ্ব চালাইবার অক্ষমতাই মৃত্যু। অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা বাদ দিলেও, আহার্য্য সংগ্রহ, সম্পত্তি রক্ষা, স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ, আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে দেখা যায়, মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যেতর যাবতীয় প্রাণীরাই ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম চালাইতেছে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের সভ্যতার বালাই নাই, কাজেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত বীভৎসতার নগ্নরূপ সহজেই আমাদের নজরে পড়ে। কিন্তু আহার্য্য, বাসস্থান ও স্ত্রীদের অধিকার লইয়া আদিম মনুষ্যসমাজ যেরূপ খুনাখুনি ও নগ্ন বীভৎসতার সৃষ্টি করিত, সভ্যতার চরমোৎকর্ষের দিনে

সাপের লড়াই

আজও তাহার অবসান ঘটে নাই। বরং বাহ্যিক সভ্যতার আড়ালে বিধিনিষেধাত্মক আইনকে ফাঁকি দিয়া পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহারা সুকৌশলে অধিকতর কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। যাহা হউক, মনুষ্যসমাজ আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে স্বজাতীয়ের মাংসে উদর পূরণের প্রবৃত্তি, একে অন্যের এলাকায় অনধিকারপ্রবেশ এবং স্ত্রীদের দখলীস্বত্ব প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে ভীষণ লড়াই বাধিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের এই লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পিপীলিকা, বোল্‌তা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি কীট পতঙ্গেরা সামাজিক প্রাণী। মনুষ্যসমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ইহাদের হাজার হাজার প্রাণী একই পরিবারভুক্ত হইয়া বসবাস করে। এই সকল একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরস্পরের মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি না হয় এমন নহে; কিন্তু তাহা খুবই কম। কিন্তু স্থানাধিকার, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে একই জাতীয় বিভিন্ন পরিবারভুক্ত দুই দলে

মাকড়সার লড়াই

ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। সময় সময় একক ভাবে পরস্পরে এমন লড়াই সুরু করে যে, একটি সম্পূর্ণ পরাজিত বা নিহত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের অবসান ঘটে না। পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের বিভিন্ন দলের

হরিণের লড়াই

মধ্যে নিকট জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক থাকিলেও, উপরোক্ত কারণে লড়াই বাধিতে পারে; কিন্তু তাহা তত মারাত্মক হয় না। দূর সম্পর্কিত বা সম্পর্কশূন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই বাধিলে এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত অপর পক্ষ নিরস্ত হয় না। ইহাদের মধ্যে দলগত বা বংশগত এমন কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা কোন অজ্ঞাত উপায়ে নিজেরা পরস্পর বুঝিতে পারে। কারণ, বংশবৃদ্ধি হেতু সংখ্যাধিক্য হইলে কোন কোন দলের কিয়দংশ অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নূতন পরিবারের পত্তন করে। এই ভাবে ক্রমশঃ কোন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বড় একটা সংঘর্ষ ঘটিতে দেখা যায় না। উত্তেজনার মুখে কোন কারণে যুদ্ধ বাধিলেও শত্রুতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু সম্পর্কবিহীন দুই দলের যুদ্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক হইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিজেতারা পরাজিতের মৃতদেহ উদরস্থ করিয়া ফেলে। নালসো, ডেঁয়ো, ক্ষুদে প্রভৃতি পিঁপড়েরা লড়াইয়ের সময় পরস্পর পরস্পরকে মরণ কামড় দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। লড়াইয়ের অবসানেও বিজেতাকে পরাজিতের মৃতদেহ বা বিচ্ছিন্ন মস্তকসংলগ্ন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সুড়সুড়ে পিঁপড়েরা পরস্পরকে দংশন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইয়া শত্রুকে ঘায়েল করিয়া থাকে। বিষ-পিঁপড়ে, জীঁয়া ও কাঠ-পিঁপড়েরা লড়াইয়ের সময় শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে।

ফড়িং ও গঙ্গা-ফড়িঙেরা স্বজাতীয়দের মাংস অতি উপাদেয় বোধে ভোজন করিয়া থাকে। এই কারণে সামনাসামনি দেখা হইলেই গঙ্গাফড়িঙেরা পরস্পর লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণ ফড়িং অবশ্য তেমন কোন লড়াই করে না। বাঘ যেমন শিকার ধরিয়া মুখে করিয়া লইয়া যায়, ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। অতর্কিত আক্রমণে দুর্ব্বল সবলের বিরুদ্ধে লড়িবার কোনই সুযোগ পায় না। কিন্তু মিলন সময়ে পুরুষ ফড়িঙদের মধ্যে বেশ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। উড়ন্ত অবস্থায় উভয়ে জড়াজড়ি, কামড়া-কামড়ি করিয়া থাকে। গঙ্গা-ফড়িঙের লড়াই কতকটা পালোয়ানদের কুস্তী লড়িবার মত। তাহারা সাঁড়াশীর মত সম্মুখস্থ 'করাতে' পা দু'খানির সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে কুস্তীর প্যাঁচে কাবু করিবার চেষ্টা করে। যুদ্ধের অবসানে বিজেতা পরাজিতকে উদরস্থ করিয়া ফেলে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌনমিলনের পর স্ত্রী-ফড়িং পুরুষ-ফড়িংকে আক্রমণ করে। এই লড়াইয়ের ফল অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ-ফড়িঙের পক্ষে মারাত্মক হইয়া থাকে। পুরুষ-ফড়িংকে পরাজিত করিয়া স্ত্রী-ফড়িং তাহার দেহ উদরসাৎ করে।

মাকড়সারা সামাজিক প্রাণী নহে। ইহারা একক ভাবেই ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা শিকার ধরিবার জন্য জাল পাতিয়া রাখে। যাহারা জাল বোনে না এরূপ মাকড়সাদের মধ্যে যৌন ব্যাপারে পুরুষ-মাকড়সারা পরস্পর লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। কামড়া-কামড়ি ও জড়াজড়িই ইহাদের লড়াইয়ের কৌশল। লড়াইয়ের ফলে উভয়েরই দুই একখানা ঠ্যাং বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যায়। পুরুষ-মাকড়সা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি অদ্ভুত কৌতুকপ্রদ ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া স্ত্রী-মাকড়সার মনোরঞ্জন করে। যৌন-মিলনের পর পুরুষ-মাকড়সা ছুটিয়া পলায়ন করে; কিন্তু

শ্বেত ভল্লুকীর লড়াই

অষ্ট্রেলিয়ার খঙ্গা গোসাপের লড়াই

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-মাকড়সার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহার উদরে স্থান লাভ করিতে বাধ্য হয়। যৌন-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেকড়ে ও পিঁপড়ে মাকড়সার পুরুষদের পরস্পর দেখা হইলেই ভীষণ লড়াই সুরু হইয়া যায়। নেকড়ে মাকড়সার লড়াই অনেকটা ষাঁড়ের লড়াইয়ের মত। উভয়েই সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া পালোয়ানী কায়দায় পাঁয়তারা কষিতে থাকে। তার পর পায়ে পায়ে ঠেকাঠেকি করিয়া পরস্পরে ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। এক পক্ষ একটু কাবু হইয়া পড়িলেই সুরু হয় কামড়াকামড়ি। একজন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন না করা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে না। পুরুষ পিঁপড়ে-মাকড়সাদের যুদ্ধাস্ত্র অতি ভীষণ। তাহাদের শরীর অপেক্ষাও বৃহত্তর, করাতের মত দাঁত বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুইটি ঠোঁট গজায়। কুমীরের মত হাঁ করিয়া এই ভীষণ ঠোঁটের সাহায্যে পরস্পর আক্রমণ চালায়। লড়াই করিলেও কিন্তু ইহারা স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করে না।

শঙ্খিনী, রাজগোখরা, বোয়া, মাস্তুরানা ও ক্রিবো প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সাপ স্বজাতীয়ের দেহ উদরসাৎ করিয়া থাকে। ইহারা প্রকাণ্ড এক একটা আস্ত সাপকে বেমালুম গিলিয়া ফেলে। মাস্তুরানা, ক্রিবো প্রভৃতি সাপেরা নির্ব্বিষ হইলেও বিষধর কি নির্ব্বিষ যে কোন সাপ দেখিতে পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করে এবং উভয়ে ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। পাক খাইয়া পরস্পরের শরীরকে জড়াইয়া ফেলাই ইহাদের লড়াইয়ের প্রধান কৌশল। প্রবল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের শরীরের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে পাক খাইয়া পিষিয়া ধরে যে, তাহার আর বন্ধনমুক্ত হইবার উপায় থাকে না। বিষম চাপে নির্জীব হইয়া পড়িলে অবশেষে ধীরে ধীরে শিকারকে গিলিতে আরম্ভ করে। পাইথন, বোয়া প্রভৃতি অজগরেরা খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হরিণ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুদিগকে আক্রমণ করিতেও ইতস্ততঃ করে না; এমন কি সময় সময় বাঘ, কুমীর প্রভৃতির ন্যায় হিংস্র জন্তুদিগকেও আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়া থাকে।

আহার ও বাসস্থান লইয়া বিভিন্ন জাতীয় মাছের মধ্যে অনেক সময় কলহ ও মারামারি হইতে দেখা যায়। এমন কি যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ইহাদের মধ্যে কম নহে। ভেট্‌কি, ন্যাদস্, বোয়াল, চেতল প্রভৃতি মাছের হিংস্র ও উগ্রভাবে অন্যান্য মাছ তো সন্ত্রস্ত ভাবে অবস্থান করেই, স্বজাতীয়েরাও লড়াইয়ের ভয়ে পরস্পরকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। অন্যথায় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে সবলের উদরস্থ হইতে হয়।

কতকগুলি প্রাণীর মধ্যে জোর করিয়া অপরের বাসস্থান দখল করিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উইচিংড়ি, কয়েক জাতীয় কুমোরে পোকা ও সন্ন্যাসী কাঁকড়ার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক জাতীয় উইচিংড়ি মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। সুবিধা পাইলেই ইহারা একে অন্যের গর্ত্ত দখল করিতে চেষ্টা করে এবং এই উপলক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সময় সময় প্রবল আকার ধারণ করে। ইহাদের গান শুনিবার ও লড়াই দেখিবার জন্য চীনা ও জাপানীরা সুদৃশ্য খাঁচায় পুরিয়া অতি যত্ন সহকারে ইহাদিগকে পুষিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন বাজী রাখিয়া ভেড়া, মোরগ ও তিতির প্রভৃতির লড়াই বাধান হয়, চীনারাও সেইরূপ বাজী রাখিয়া উইচিংড়ির লড়াই বাধায়। এই লড়াই
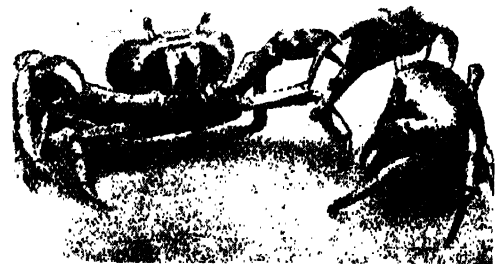
কাঁকড়ার লড়াই

পেলিকানদের লড়াইয়ের উদ্যোগ

দেখিতে যথেষ্ট জনসমাগম হয় এবং বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হইয়া থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় কাঁকড়া জলের ধারে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। মাটি তুলিয়া গর্ত্ত নির্ম্মাণ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। এই পরিশ্রম এড়াইবার জন্য অনেকেই অপরের তৈয়ারী গর্ত্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করে। গর্ত্তের অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সাঁড়াশীর মত ভীষণ দাঁড়াই ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। প্রবলের দাঁড়ার চাপে দুর্ব্বল প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় অথবা বিকলাঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। তখন বিজেতা তাহার গর্ত্ত অধিকার করিয়া বসে। আমাদের দেশে নদীর মোহনায় ও সমুদ্রের উপকূলে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্যে লাল রঙের প্রচুর কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 'ফিডলার ক্র্যাব' বা লাল-কাঁকড়া নামে পরিচিত। পুরুষ-কাঁকড়ার একটা দাঁড়া শরীরের তুলনায় অসম্ভবরূপে বড় হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের বিশেষতঃ দাঁড়ার রং টক্‌টকে লাল। ইহারা সুবিধা পাইলেই একে অন্যের গর্ত্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করে; ফলে লড়াই বাধিয়া যায়। পুরুষদের মধ্যে যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ভীষণাকার ধারণ করে। নদীর মোহনায় বা সমুদ্রের ধারে আমাদের দেশে যথেষ্ট সন্ন্যাসী-কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি সাধারণ কাঁকড়ার মত নহে। মস্তকের দিক বাদে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ খুবই কোমল এবং দেখিতে অনেকটা চিংড়ির মত। অন্যান্য কাঁকড়ার মত ইহাদের শরীর শক্ত খোলায় আবৃত নহে বলিয়া শত্রু হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত শঙ্খ, শামুক প্রভৃতির পরিত্যক্ত খোলায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শামুক, গুগ্‌লির মত খোলাসমেত ইতস্ততঃ বিচরণ করে। বয়োবৃদ্ধি হেতু শরীরের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে অপেক্ষাকৃত বড় খোলায় আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন পরিত্যক্ত খোলা পায় তো ভালই নচেৎ কোন বড় খোলার মালিকের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার আস্তানাটি কাড়িয়া লয়। যুদ্ধে হারিয়া গেলে অপর কোন মালিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

কয়েক জাতীয় মেঠো-কুমোরে পোকা পিপীলিকাদের মত এক পরিবারে বাস না করিলেও ডিম পাড়িবার সময় হইলে অনেকে মিলিয়া এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। গর্ত্ত নির্ম্মাণ শেষ হইলে বাচ্চাদের জন্য খাদ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তাহারা উইচিংড়ি বা মাকড়সা শিকারে বহির্গত হয়। ইত্যবসরে হয়তো অপর কোন কুমোরে পোকা তাহার গর্ত্ত দখল করিয়া বসে। প্রকৃত মালিক ফিরিয়া আসিলেই উভয়ে লড়াই বাধিয়া যায়। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিলে অন্য কোন কুমোরে পোকা শিকার লইয়া উধাও হয়। এইরূপে নানাভাবে বিব্রত হইয়া তাহাদিগকে প্রায়ই কাহারও না কাহারও সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মোরগ, পায়রা প্রভৃতি পশুপক্ষীর মধ্যেও নিজ নিজ এলাকায় অপরের প্রবেশ করিবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। আহার্য্য সংগ্রহের জন্য কাকেদেরও এক একটা

স্ত্রী-চাফিন্স পাখীদের যুদ্ধ। উপরে পুরুষ-পাখীটি বসিয়া শিস্ দিতেছে

কুমীরের লড়াই

নির্দিষ্ট এলাকা থাকে। অন্য কাক সেখানে প্রবেশ করিলে উভয়ে ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। ডিম পাড়িবার সময় পেঙ্গুইন পাখীরা নিজ নিজ এলাকায় অপর পেঙ্গুইনকে আসিতে দেয় না এবং এই উপলক্ষ্যে পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মর্কট, হনুমান, বেবুন, গিবন প্রভৃতি বানরজাতীয় প্রাণীদের এক একটি দল এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিচরণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটি দলে একটি মাত্র পুরুষ থাকে, বাকী সকলেই স্ত্রী। এক দলের এলাকায় অপর কোন দল অনধিকারপ্রবেশ করিলে ঝগড়া তো বাধেই তাছাড়া স্ত্রীদের দখলীস্বত্ব লইয়া উভয় দলের সর্দ্দারদের মধ্যে দীর্ঘ দিনব্যাপী ভীষণ লড়াই চলিয়া থাকে। উভয় দলের বানরীরাও এই যুদ্ধে যোগ দেয়। বিজেতা পরাজিতের স্ত্রীগুলিকে দখল করিয়া লয়। পেলিকান পাখীরা বিশ্রাম করিবার জন্য সুবিধা মত একটু উঁচু স্থান দখলের নিমিত্ত পরস্পর ভয়ানক ঝগড়াঝাঁটি করিয়া থাকে এমন কি তাহার ফলে গুরুতর লড়াইয়ে পর্য্যন্ত লিপ্ত হইয়া পড়ে। লম্বা ঠোঁট ও শক্তিশালী ডানার সাহায্যেই ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ঘায়েল করিয়া থাকে।

যৌন-মিলনের সময় হইলে চাফিন্স নামক ফিঙ্গে-জাতীয় স্ত্রী-পাখীরা তাহাদের এলাকায় পুরুষ-পাখীদের প্রবেশে কোন আপত্তি করে না। কিন্তু কোন স্ত্রী-পাখী তাহার এলাকায় প্রবেশ করিলে উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রীদের এই প্রাণান্তকর লড়াইয়ের সময় পুরুষ-পাখীটি গাছের ডালে বসিয়া লড়াই দেখে এবং মনের আনন্দে শিস্ দিতে থাকে। জয়লাভ করিলে আগন্তুকই নূতন এলাকার অধিকারিণী হয়। বিচরণ-ভূমির অধিকার অপেক্ষা যৌন প্রয়োজনই এই লড়াইয়ের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ডিম পাড়িবার সময় উট পাখীদের মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি স্ত্রী-পাখীর মধ্যে একটি মাত্র পুরুষ-পাখী থাকে এবং পুরুষটিই ডিম পাড়িবার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করে। পুরুষ-পাখীটির একাধিক স্ত্রী পাখীর সহিত মিলন ঘটিতে পারে; কিন্তু সে বাসা নির্ম্মাণ করে মাত্র একটি। একটি স্ত্রী-পাখী সেই বাসায় ডিম পাড়িলে অন্যান্য স্ত্রী-পাখীরা সেই বাসা ঘেঁসিয়াই ডিম পাড়িতে চেষ্টা করে। তখন স্ত্রী-পাখীদের মধ্যে ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। এই লড়াইয়ের ফলে অধিকাংশ ডিমই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। মেরুপ্রদেশের শ্বেত ভল্লুকদের মধ্যেও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষিত হয়। পুরুষ ভল্লুকের একাধিক সঙ্গিনী থাকে। সঙ্গিনীদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়াই থাকে। সময়ে সময়ে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি চরমে উঠে। তখন পুরুষ ভল্লুক আসিয়া উভয়ের মধ্যে পড়ে এবং ঝগড়া মিটাইয়া দেয়। অন্যথায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

পাখীদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষ পাখীরাই আকারে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে অধিকতর সুদৃশ্য হইয়া থাকে। টার্নিশ ও ফ্যালারোপ পাখীদের মধ্যে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহাদের স্ত্রী-পাখীরা পুরুষ পাখী অপেক্ষা বৃহদাকার এবং পালকের বর্ণ-বৈচিত্র্যেও পুরুষদের অপেক্ষা সুদৃশ্য। যৌন-মিলনের সময় হইলে পুরুষ-পাখীকে লাভ করিবার জন্য স্ত্রী-পাখীদের মধ্যে ভয়ানক লড়াই বাধিয়া থাকে। বিজয়িনী পুরুষ পাখীকে লাভ করে। পুরুষ পাখীটিও ডিম এবং বাচ্চাদের তদারকের ভার গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ প্রাণীজগতে যৌন-সম্মিলনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীদের দখলীস্বত্ব লইয়া এই সময়ে পুরুষদের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় পশু-

কুমীরের সহিত সাপের লড়াই

উটের লড়াই

পক্ষীদের ত কথাই নাই, মশা, মাছি, মাকড়সা, ফড়িং, প্রজাপতি, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতির পুরুষদের মধ্যেও যৌন-সম্মিলনের প্রাক্কালে ভীষণ যুদ্ধ বাধিতে দেখা যায়। মশা, মাছি, ফড়িং, প্রজাপতির মধ্যে লড়াই হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ব্বল প্রবলের আক্রমণের মুখেই পলায়ন করে; কিন্তু উইচ্চিংড়ি, গুবরে পোকা, টিকটিকি প্রভৃতির লড়াই গুরুতর আকার ধারণ করে। কোন কোন জাতীয় পুরুষ-গুবরে-পোকা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত বা বিকলাঙ্গ করিয়া স্ত্রী-পোকাটিকে মুখে করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। পুরুষ টিকটিকিরা লড়াই করিতে করিতে এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, জড়াজড়ি, কামড়াকামড়ি করিয়া উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলেও লড়াই থামে না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছুটাছুটি করিয়া পরস্পরকে ঘায়েল করিতে চেষ্টা করে। অবশেষে পরস্পর মুখে মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে। এরূপ গুরুতর লড়াইয়ের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের লেজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন বিকলাঙ্গ টিকটিকি কোনক্রমে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহাদের ছিন্ন লেজ পুনরায় গজাইয়া থাকে। লড়াইয়ের ফলে মাকড়সা এবং কাঁকড়ার ঠ্যাং ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু পরে সেস্থলে নূতন ঠ্যাং গজায়। অষ্ট্রেলিয়ায় বহু জাতীয় ভীষণাকৃতির টিকটিকিজাতীয় জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌন-মিলনের পূর্ব্বে স্ত্রীদের দখলীস্বত্ব লইয়া ইহাদের পুরুষদের মধ্যে ভীষণ লড়াই বাধে। এইরূপ যুদ্ধের পরে ক্যারোলিনা-গোসাপ পরাজিতের ছিন্ন লেজ উদরস্থ করিয়া থাকে। গোসাপ এক প্রকার বৃহদাকার টিকটিকিজাতীয় জানোয়ার। ইহাদের লড়াই অতি ভীষণ। দুইটি পুরুষ গোসাপের পরস্পর দেখা হইলেই উভয়ে প্রথমতঃ গলা ফুলাইয়া ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকে। তার পর লেজের আস্ফালনে বনজঙ্গল তোলপাড় করিয়া তোলে। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়—জড়াজড়ি ও কামড়াকামড়ি। পরস্পরের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া উভয়ে সময় সময় এমন বেপরোয়া ভাবে ছুটিতে থাকে যে, মনে হয় যেন বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বীরা লেজের উপর দাঁড়াইয়া উভয়ে উভয়কে পালোয়ানের মত জড়াইয়া ধরে। এই যুদ্ধ প্রায়ই একাধিক দিন চলিয়া থাকে। পুরুষ-কুমীরদের মধ্যেও এইরূপ লড়াই হইতে দেখা যায় এবং একটি সম্পূর্ণরূপে নির্জীব না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াইয়ের অবসান ঘটে না। নিউট বা জল-টিকটিকিরাও অনুরূপ কারণে পরস্পরের সহিত লড়াই করিয়া থাকে।

যৌন মিলনের পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় পুরুষ মাছকে পরস্পরের সহিত লড়াই করিতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় পাখীদের মধ্যেও এই যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান বিভিন্ন জাতীয় পায়রা, মোরগ, হাঁস প্রভৃতি পাখীদের মধ্যে এরূপ ব্যাপার হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কুকুর, বিড়াল, ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুদের লড়াইও প্রধানতঃ যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। পুরুষ-বাইসন, ন্যু প্রভৃতি জন্তুরা সাধারণতঃ একাকী বিচরণ করে; কিন্তু যৌন-মিলনের সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা স্ত্রী-পশুদের

কাঙ্গারুর লড়াই

পিঁপড়ের লড়াই

নিউট বা জল-টিকটিকির লড়াই

দলে ভিড়িয়া যায়। সে তখন স্ত্রী-পশুদের দলের সর্দার-রূপে পরিগণিত হয়। এই সময়ে দুইটি পুরুষ পশুতে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াই থামে না। বন্য মহিষেরাও এইরূপ উত্তেজিতভাবে লড়াই করে এবং উত্তেজনার বশে সময়ে সময়ে অন্য কোন হিংস্র প্রাণীকেও আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ন্যু ও ব্রহ্মদেশীয় বান্টেং প্রভৃতি জন্তুদের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ইহাদের অল্পবয়স্ক ষাঁড়গুলি দলবদ্ধ হইয়া যৌন-মিলনের সময় বৃদ্ধ ষাঁড়গুলিকে দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। উটেরা শান্ত প্রকৃতির প্রাণী হইলেও যৌন-মিলনের সময় পুরুষেরা ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠে এবং পরস্পর ঘাড়ে ঘাড়ে জড়াইয়া এমন ভাবে মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া থাকে যে, সময়ে সময়ে উভয়েরই শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন জাতীয় হরিণের যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ ইহারা খুব শান্ত ও বশীভূত। কিন্তু যৌন-মিলনের সময় পুরুষ-হরিণেরা ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠে। যৌন-মিলনের কিছুকাল পূর্ব্বেই ইহাদের পুরাতন শিং পড়িয়া গিয়া নূতন শিং গজায়। এই শিং প্রধান যুদ্ধাস্ত্র হইলেও সময় সময় ইহাই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এক একটি পুরুষ-হরিণের দলে কয়েকটি হরিণী থাকে। কোন দলপতির সঙ্গে অপর কোন পুরুষ-হরিণের সাক্ষাৎ হইলেই লড়াই বাধিয়া যায়। দলের মালিক পরাজিত হইলে বিজেতাই হরিণীদের অধিকারী হয়। লড়াইয়ের সময় পরস্পরের প্রতি ভীষণ বেগে গুঁতা মারিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উভয়ের ডালপালা-ওয়ালা শিং এমন ভাবে আটকাইয়া যায় যে, শত চেষ্টাতেও আর খুলিতে পারে না। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে উভয়ের অনাহারে মৃত্যু বরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। লড়াই করিবার সময় আইবেক্স নামক বিরাট শিং-ওয়ালা জানোয়ারেরাও এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুয়ানাকো, ভিকুনা, দক্ষিণ-আমেরিকার বন্য অশ্ব,

গঙ্গাফড়িঙের লড়াই

আফ্রিকার জেব্রা, ওয়াপিটি, মুজ, বন্য গর্দ্দভ, কাঙ্গারু প্রভৃতি জানোয়ারদের মধ্যেও এরূপ মারাত্মক যৌন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়া থাকে। কাঙ্গারুদের লড়াইয়ের কায়দা ঠিক যেন পালোয়ানদের মত। সম্মুখের পা দিয়াই ইহারা লড়াই করিয়া থাকে কিন্তু শরীরটা পরস্পরের নিকট হইতে বেশ তফাতে রাখে। কারণ ইহাদের পিছনের পায়ের লাথ্ অতি ভয়ানক।

লোমওয়ালা শিল ও অন্যান্য জলজন্তুদের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ লড়াইয়ের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি পুরুষ-শিল এক এক দল স্ত্রী-শিলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। অপর কোন পুরুষ-শিল দলের নিকটে আসিলেই পরস্পরে লড়াই বাধিয়া যায় এবং বিজেতা স্ত্রী-শিলগুলিকে অধিকার করে। এইরূপ আরও বহুবিধ দৃষ্টান্ত হইতে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণী-রাজ্যের এই সহজাত যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ফলে সবল ছাড়া দুর্ব্বলের বংশ রক্ষার সুবিধা হয় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের প্রধান উপায়।

আছ তুমি প্রাণবন্ত অমর অক্ষয়—

"বনফুল"

এসেছে গগন ঘিরে স্তরে স্তরে শ্রাবণের কৃষ্ণ জলধর,
সজল-সমীর-স্নিগ্ধ কদম্বের অঙ্গে অঙ্গে জাগে শিহরণ,
গুরু গুরু গুরু গুরু প্রকম্পিয়া শূন্য ব্যোম ধ্বনিছে ডম্বরু,
ঝিল্লীরবে কেকাছন্দে কণ্টকিতা কেতকীর খসিছে গুণ্ঠন,
আকাশ বিদীর্ণ করি বিদ্যুতের মুহুর্ম্মুহু প্রদীপ্ত প্রকাশ;
কোথা বরষার কবি? কোথা তুমি, কোথা আজ,
কোন্ অধরায়
উত্তরিলে অকস্মাৎ তেয়াগিয়া প্রিয়তমা মৃন্ময়ী ধরারে?

আজও মনোরমা সে যে, নিত্য নব সৌন্দর্য্যের মাধুরী ভাণ্ডার
আজও তার অফুরন্ত, আজও তার অঙ্গে অঙ্গে ওঠে ঝলসিয়া
নব-দ্যুতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দিত কবি-চিত্ত চরিতার্থ করি;
আছে সেই রাঙা-মাটি-পথ, বাঁশী বাজে বেণুবন ছায়ে,
বকুল মল্লিকা চাঁপা কদম্ব করবী ফুটে আছে থরে থরে,
পলাতকা স্বপ্ন-সখী দেখা দেয় আজও ওই দামিনী-ঝলকে,
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হিম-শীত-বসন্ত-শরতে, রৌদ্রে, মেঘে, অন্ধকারে,
সন্ধ্যা-ঊষা-জ্যোৎস্নালোকে, কান্তারে প্রান্তরে, গৃহকোণে
ধরণী মোহিনী আজও; তুমি তারে ছেড়ে,
মাটির দুলাল কবি,
কোথা গেলে, কেন গেলে, গেলে কোন্ অমৃতের
নব প্রত্যাশায়?

সে কি স্বর্গ দেব-লোক? দেব-লোকে আছে স্থান
মানব-কবির?
লক্ষ কোটি নরনারী-হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজেশ্বর তুমি,
ধরণীর মৃত্তিকায় অভ্রভেদী সিংহাসন তব জ্যোতির্ম্ময়,
আকাশের সূর্য্য চন্দ্র সন্ধ্যা-ঊষা ইন্দ্রধনু জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
ছয় ঋতু নৃত্য করে বিচিত্র ভঙ্গীতে তব চন্দ্রাতপতলে,
রূপসী উর্ব্বশী আসে নন্দনবাসিনী কাব্য-কুঞ্জ-দেহলীতে
সিন্ধু-স্নান সমাপন করি; শুচি-স্মিতা বীণাপাণি পদ্মাসনা
সুর দেন তব গীতে স্বর্ণ বীণা তন্ত্রে তন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিয়া
মর্ত্ত্যের কবির কণ্ঠে জাগাইয়া অনবদ্য অমর্ত্ত্য-মূর্চ্ছনা,
অনন্ত অসীম আসে বন্ধন-লোলুপ তোমার সীমার মাঝে;

তুমি যাবে দেব-লোকে কিসের আশায়? তুমি কবি আমাদের,
লাঞ্ছিতের পীড়িতের দুর্গতের অন্তরের প্রিয় কবি তুমি,
কাঙালিনী মেয়ে, সাঁওতাল ছেলে, পুঁটুরাণী, ভৃত্য পুরাতন,
অবোধ শিশুর দল, সরমশঙ্কিতা বধূ, মূঢ় দেশবাসী,
ইহাদের ফেলে রেখে কবি, যাবে তুমি কোন্ স্বর্গলোকে?
যেতে পার? সুনিবিড় এ বন্ধন ছিন্ন করা এত কি সহজ?
বন্ধন-বিলাসী তুমি, 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়'
চেয়েছিলে মুক্তি-স্বাদ, অবন্ধন লোকে তুমি লভিবে নির্ব্বাণ?

মিথ্যা কথা; তুমি নাই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মূঢ় এ কল্পনা—
প্রতারিত ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ মিথ্যা অনুভূতি;
তুমি আছ, হে ভারত-হৃদয়-সম্রাট্, আছ তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রাণে প্রাণে গানে গানে ছন্দে ছন্দে শতবক্ষে স্পন্দিত-হৃদয়ে
আছ তুমি আছ তুমি জড়াইয়া মরমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ লোকে আছ তুমি প্রাণবন্ত অমর অক্ষয়।

পুরাতন স্মৃতি
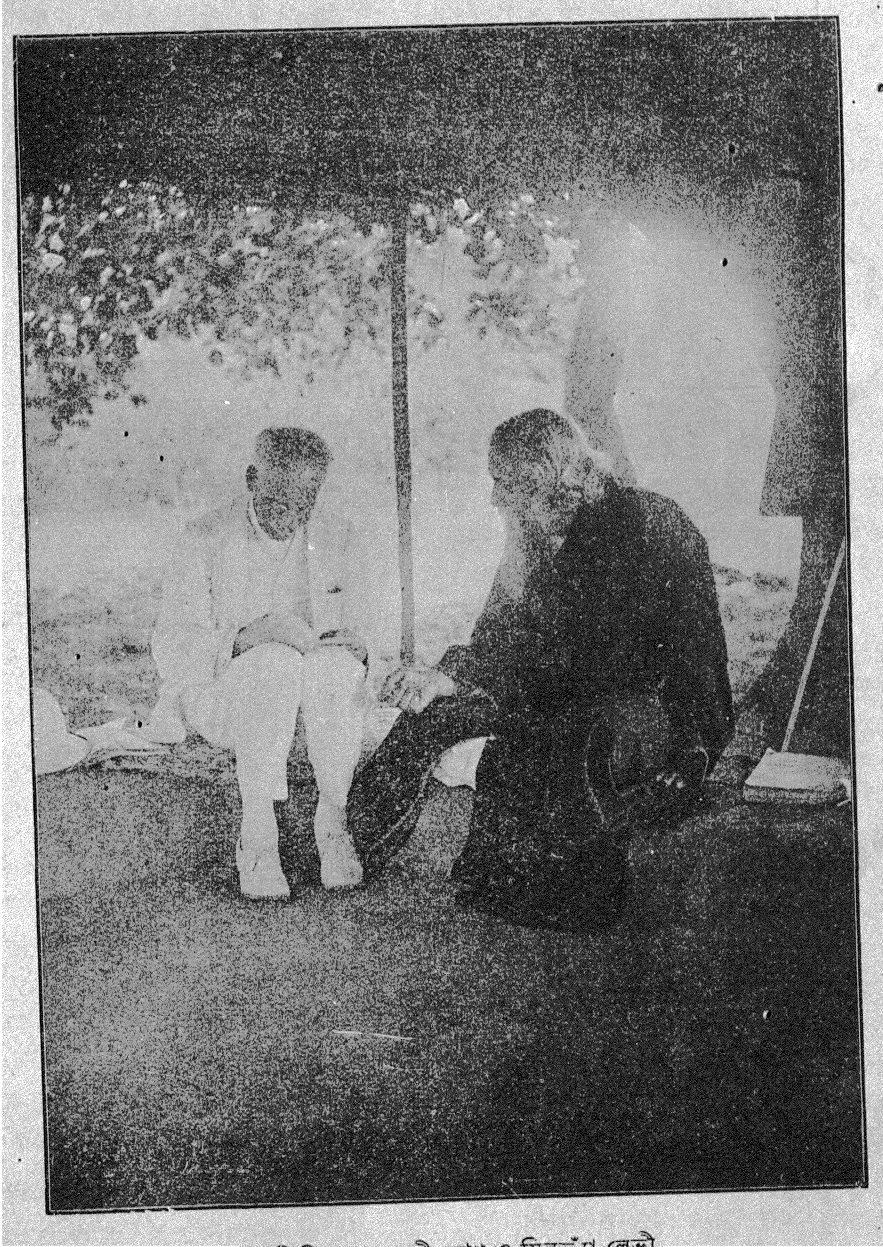
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও সিলভ্যাঁ লেভী

বর-বুদুরের পাদমূলে রবীন্দ্রন
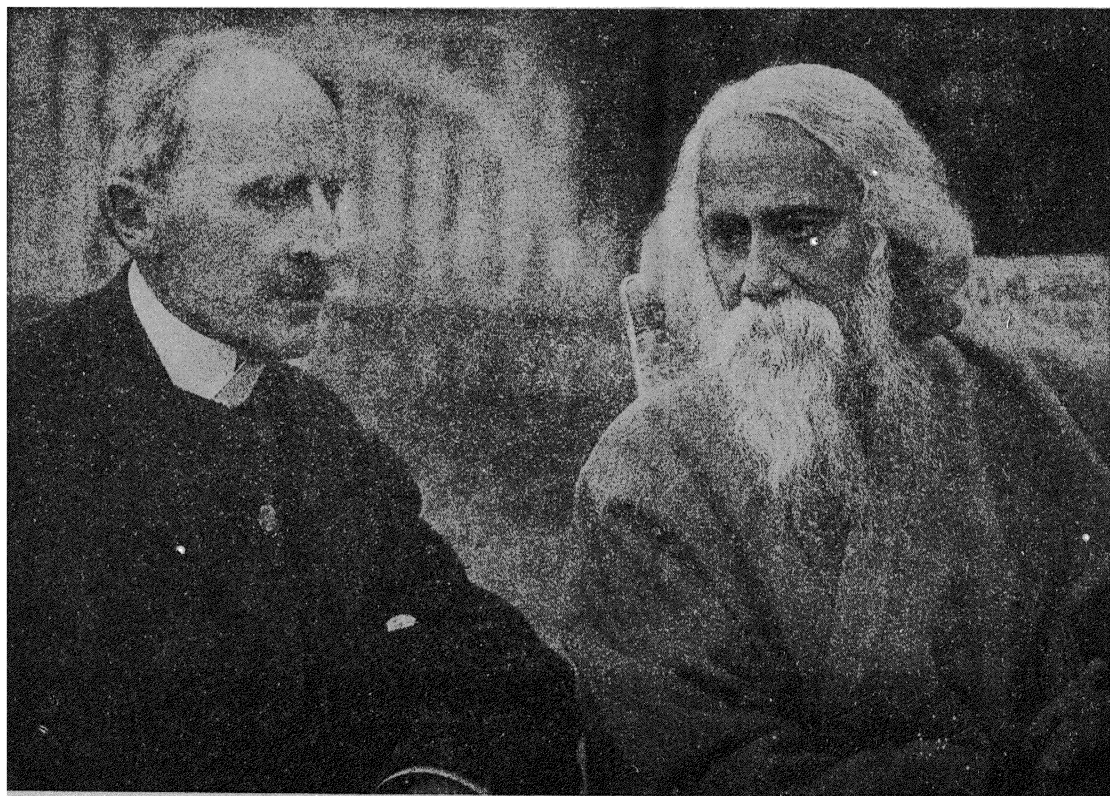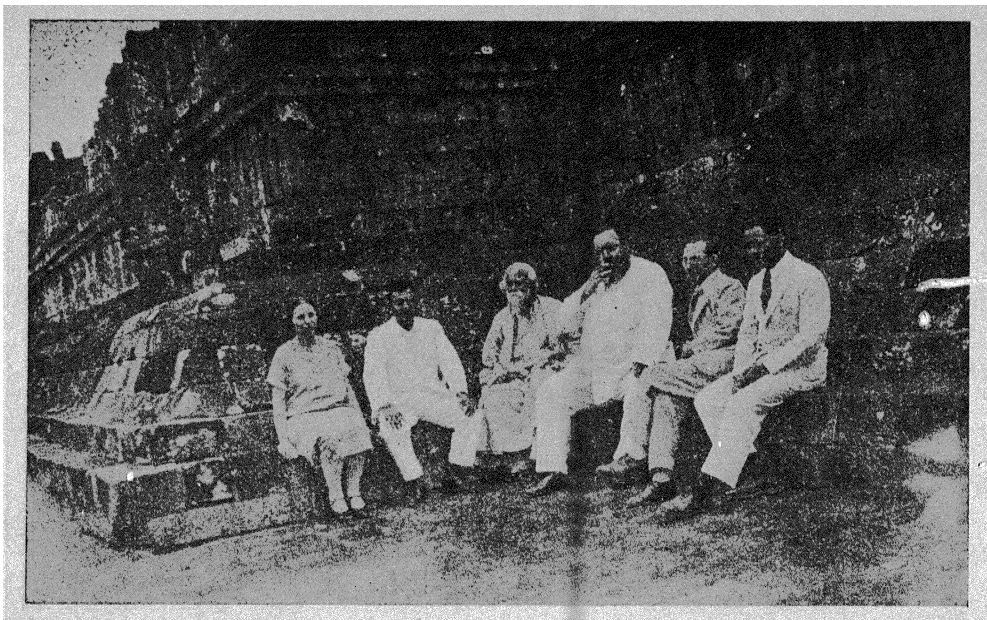
রম্যাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ
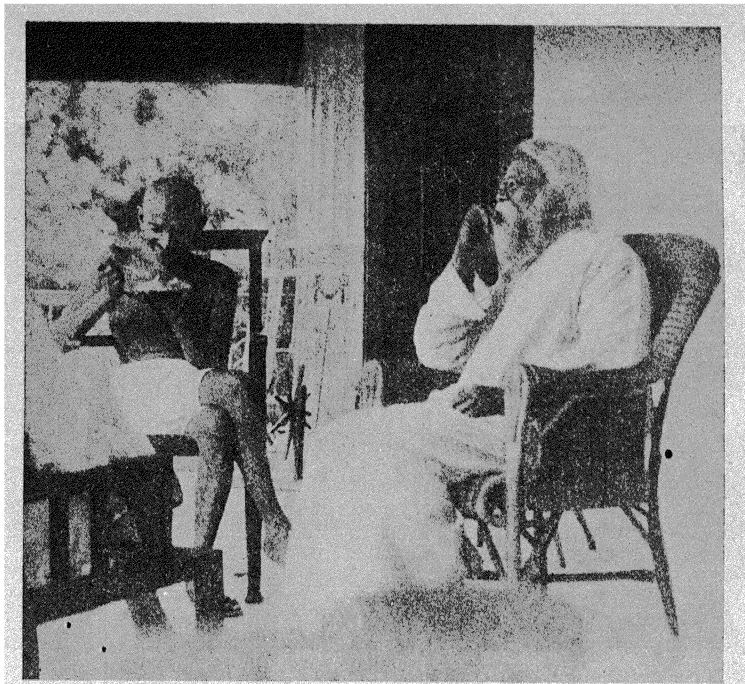
শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ
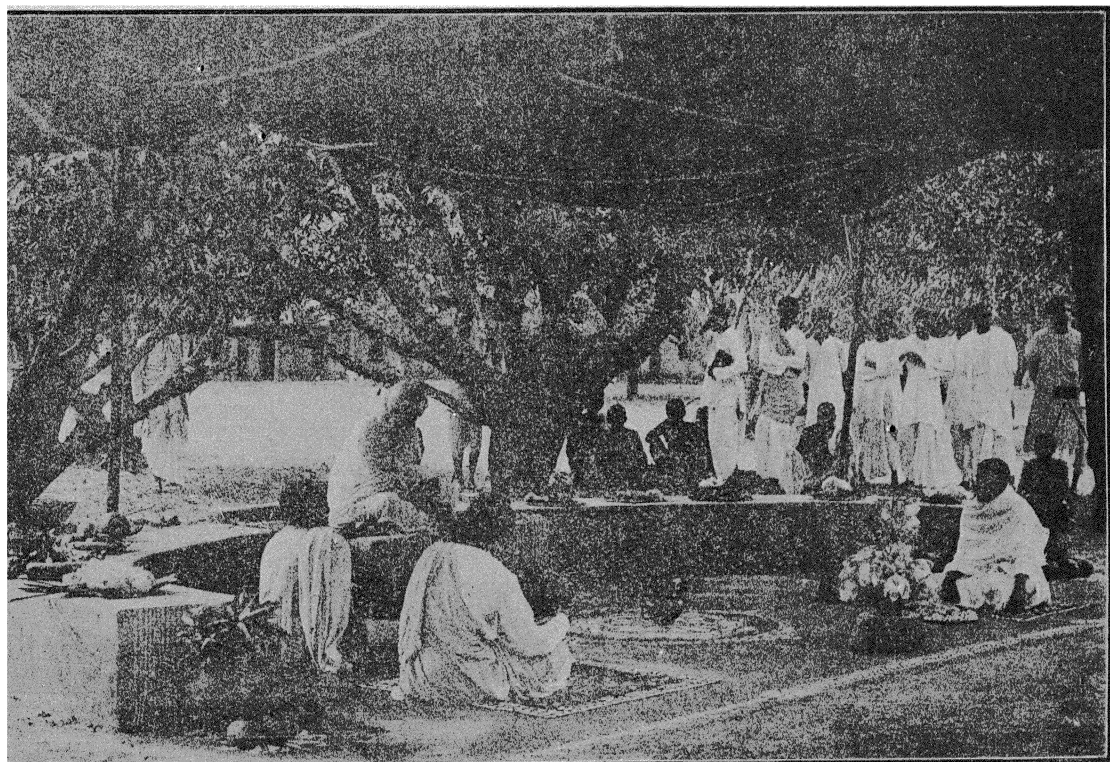
শান্তিনিকেতনে:রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, ১৯২৬

উদ্বাহযাত্রা
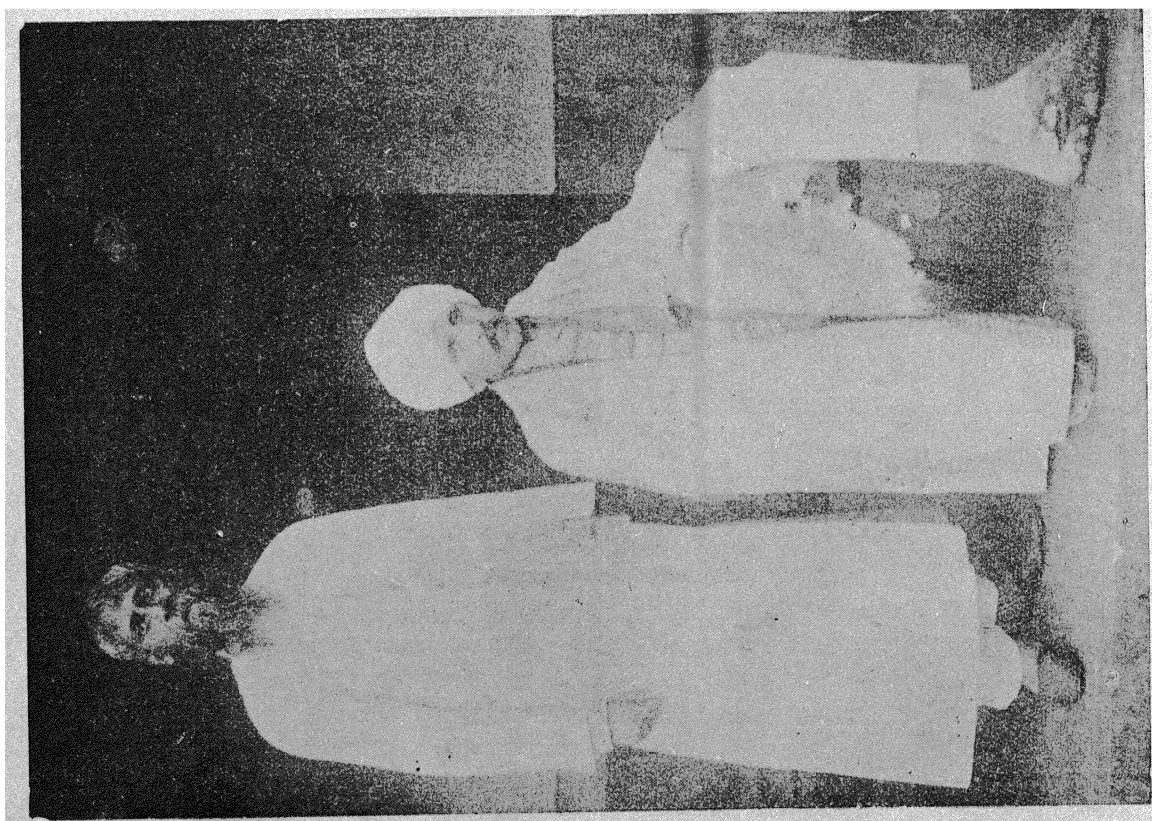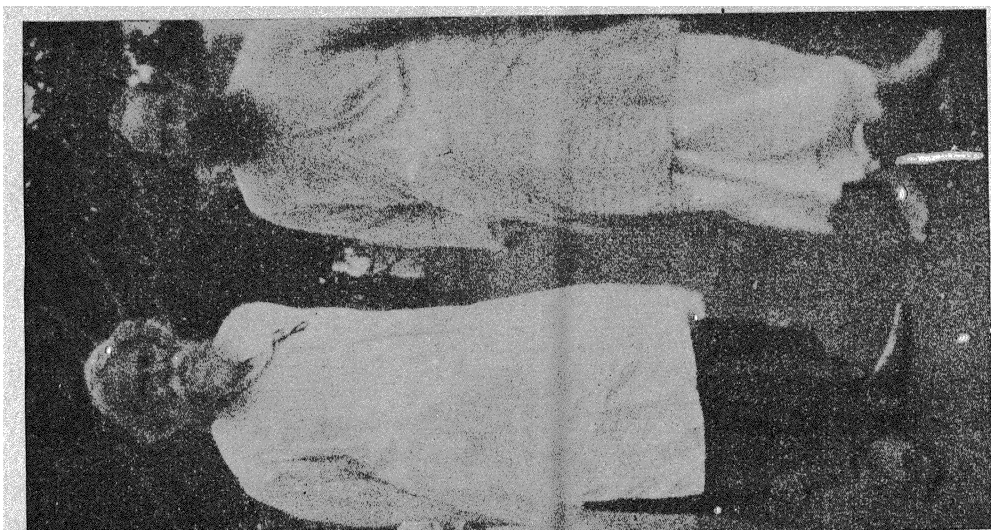
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

একটা চমৎকার গল্প তোমাদের বলি শোন। অনেক কাল আগে ভার্মগু্ জেলার স্ভার্টস্জো গ্রামে মহাসমারোহে এক বিবাহের আয়োজন চলেছিল।

প্রথমে হবে গির্জায় বৈবাহিক অনুষ্ঠান। তার পর তিন দিন ধ'রে কেবল চলবে ভূরিভোজ আর আনন্দের মেলা, সেই সঙ্গে ভোর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত শুধু উদ্বেলিত হবে নৃত্যলীলার তরঙ্গভঙ্গ।

নাচটাই যখন হবে মুখ্য ব্যাপার, তখন চাই এক জন পাকা রকমের বেহালার ওস্তাদ। কন্যার পিতা হচ্ছেন গ্রামের মোড়ল, নাম নিল্স্ ওলাফ্সন। সমস্ত আয়োজন রেখেছেন নিজের হাতে। সব চেয়ে তাঁর দুর্ভাবনা এই বেহালাদারকে নিয়ে।

গ্রামের যে সেরা বেহালা বাজিয়ে, তাকে বাহাল করতে চায় না তাঁর মন। লোকটির নাম জ্যান্ অষ্টার। মণ্ডল মশাই বেশ জানতেন ওর খ্যাতি আছে খুব। কিন্তু লোকটা এমন গরীব যে অনেক সময়ে বিবাহ-সভায় এসে হাজির হয় ঝুলঝুলে ছেঁড়া জামা গায় দিয়ে, আর পায়ে নেই জুতো। কাজেই তাঁর আদৌ ইচ্ছা নয় যে, শোভা-যাত্রার সম্মুখে চলবে একটা ছেঁড়া-ন্যাক্ড়া পরা সং। তাই তিনি স্থির করলেন, জস্-গ্রামে লোক পাঠাবেন, সেখানকার বেহালাদার মার্টেনকে বায়না দেবার জন্যে।

মার্টেন ত পত্রপাঠ প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিলে, বলে, স্ভার্টস্জো গ্রামে বেহালা বাজানো আমার দ্বারা হবে না বাপু! কারণ ওখানে যে ওস্তাদ আছেন তাঁর মত বাজিয়ে এ তল্লাটে কোথাও নেই। বলি, তিনি থাকতে আর কাউকে ডাকবার দরকারটা কি?

নিল্স্ ওলাফ্সনের কাছে এ খবরটা যখন পৌঁছল, তখন তিনি হলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কদিন চিন্তা ক'রে বিগ্‌কিল্ গ্রামে ওল্-সাবীর কাছে লোক পাঠালেন, যদি সে তাঁর মেয়ের বিবাহে বেহালা বাজাবার ভার নেয়।

ওল-সাবীর উত্তর সেই একই। মোড়লজীকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে, জ্যান অষ্টারের মত গুণী যে গ্রামে আছে, সেখানে গিয়ে সে বেহালা ধরবে কোন্ স্পর্দ্ধায়?

নিল্স্ ওলাফ্সনের মন কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল। যত সব বেহালাদার মিলে জোর ক'রে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাবে? আপন ইজ্জৎ রক্ষার জন্যেই জ্যান অষ্টারের বদলে অন্য যাকেই হোক নিযুক্ত করতে হবে।

ওল-সাবীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পাবার কদিন পরেই তিনি এবার উলারাড গ্রামে লার্স লার্সনের কাছে লোক পাঠালেন। লার্সনের অবস্থা ভাল, জোতজমি আছে। লোকটার বিবেচনা আছে, ওদের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ নয় কিন্তু লার্সনের মনেও প্রশ্ন জাগল, জ্যান অষ্টারের মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ওস্তাদ থাকতে তার ডাক পড়ে কেন?

ওলাফ্সনের তাঁবেদার বুঝিয়ে বলে, জ্যান অষ্টার ত আমাদের গ্রামেরই লোক। ওর বাজনা যখন-তখনই ত শোনা যেতে পারে। কর্তার ইচ্ছে এমন একটা ধুমধামের ব্যাপারে নিমন্ত্রিত সকলকে আপ্যায়িত করবার জন্যে বাজনার বন্দোবস্তটা আরও সুন্দর ও অতুলনীয় ক'রে তোলা।

"আমার ত মনে হয় না জ্যান অষ্টারের চেয়ে পাকা লোক আর কোথাও পাবে"—লার্স লার্সনের এই মন্তব্য।

"তুমিও দেখছি মার্টেন আর ওল সাবীর সুরে সুর মিলোচ্ছ"—এই ব'লে আগন্তুক সব কথাই তাকে খুলে বললে।

লার্স লার্সন মন দিয়ে তার কথা শুনল। তার পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে বললে, "আচ্ছা, তোমার কর্তাকে জানিও আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।"

পরের রবিবার লার্স লার্সন স্ভার্টস্জো গ্রামে যথাসময়ে উপস্থিত হ'ল। সে গির্জার অদূরে পৌঁছল যখন, তখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে বিবাহসভায় যাত্রারম্ভের জন্যে। সে নিজের গাড়ীতে এসেছে। ঘোড়াটি দিব্যি দেখতে, তার নিজের বেশভূষাও পরিপাটি। চক্‌চকে পালিশ করা বাক্স থেকে বেহালাখানি বাহির করলে। নিল্স্ ওলাফ্সন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাকে জানাল সম্বর্দ্ধনা। তার সাজগোজে মহা খুশী।

হাঁ, এই রকম ওস্তাদকেই ত ভদ্রলোকের আসরে আনা চলে, তাঁদের মানরক্ষা হয়।

লার্স লারসন আসতে-না-আসতেই জ্যান অষ্টারও গির্জার সামনে এসে উপস্থিত, বেহালাটা বগল-দাবায় ক'রে। ক'নেকে ঘিরে যেখানে সবাই ভিড় জমিয়েছে, একেবারে সটাং সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, যেন এ বিবাহ-সভায় বেহালা বাজাবার ভার তার উপরেই। জ্যান অষ্টারের গায়ে বহু বছরের পুরানো মেটে রঙের তাঁতে-বোনা একটা ছেঁড়া কোট। তবে এই বিরাট্ ব্যাপারের সম্মানরক্ষার জন্যে তার স্ত্রী কোটের কনুইয়ের ফুটোর উপর বড় বড় দুটো সবুজ তালি জুড়ে দিয়েছে। জ্যান্ অষ্টার সুপুরুষ। লম্বা ছিপ্ছিপে দেহ, ইজের-উর্দিটা একটু চলন-সই গোছের হ'লে, আর কপালে মুখে নানা দুর্ভাবনা ও দারিদ্র্যের রেখাগুলি না থাকলে সে সুশ্রী ব'লেই বিবেচিত হ'ত।

জ্যান অষ্টারকে আসতে দেখে লার্স লারসন যেন একটু বিরক্তই হ'ল। "ওকেও ডেকেছেন দেখছি" ফিস্ ফিস্ ক'রে নিল্স্ ওলাফ্সনের কানে কানে বলে। সেই সঙ্গেই আবার বলে, "হাঁ, এত বড় ব্যাপারে দুজন বেহালাদারকে ডাকায় ক্ষতি কি?"

"আমি নিশ্চয়ই ওকে ডাকি নি!" উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে নিল্স। "ও কেন যে এলো তা ও-ই জানে। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি ওকে বলছি, ওর এখানে ঢুঁ মারবার কোনও দরকার নেই।"

"তা হলে কেউ তামাশা ক'রে ওকে ডেকে থাকবে" —লার্স বলে। "তবে আমার কথা যদি শোনেন ত বলি, যেন কোনও দোষ হয় নি এই রকম ভাব দেখিয়ে প্রফুল্ল মুখে ওকে অভ্যর্থনা করুন। শুনেছি লোকটি বদ্‌রাগী। যদি বলেন ওকে ডাকা হয় নি, তাহলে হয়ত গণ্ডগোল বাধিয়ে লড়াই শুরু ক'রে দেবে।" মোড়লেরও সেই ভয়।

অভ্যাগত বরকন্যা পক্ষীয়েরা যখন গির্জায় প্রবেশের জন্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছেন, এ সময়ে একটা গোলযোগের সৃষ্টি যাতে না-হয় সেই উদ্দেশ্যে কন্যাকর্তা গিয়ে জ্যান অষ্টারকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তৎক্ষণাৎ দুই ওস্তাদ মিলে মিছিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বধূবর মস্ত একটা রাজচ্ছত্রের তলে চলেছে, নিত-ক'নে নিত-বরের দল তার পর চলেছে জোড়ে জোড়ে, সব পিছনে বাপ মা আর আত্মীয়স্বজনের সারি। দীর্ঘ বাহিনী ধীর পদে সগৌরবে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

সবাই যখন প্রস্তুত, তখন এক জন নিত-বর এসে ওস্তাদ-যুগলকে "উদ্বাহ-যাত্রা"র তানটি ধরবার জন্যে অনুরোধ করলে। দু-জনেই তৎক্ষণাৎ থুৎনি দিয়ে বেহালা চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কেউই আরম্ভ করে না। স্‌ভার্টস্‌জো পল্লীর আবহমান কালের রীতি এই, প্রধান গুণী যিনি, "উদ্বাহযাত্রা"র সুরটি পরিচালকরূপে তিনিই প্রথম ধরবেন। নিত-বর তাকালো লার্স লারসনের দিকে, অর্থাৎ তাঁকে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু লার্স লারসন চেয়ে থাকে জ্যান অষ্টারের পানে, বলে, "তোমাকেই ধরতে হবে ভাই।" জ্যান অষ্টারের মনেই হয় না, অমন দিব্যবেশধারী সুরশিল্পীর আগে তার পালা যার গায়ে ছেঁড়া জামা, দুঃখ-দারিদ্র্যের বাস্তুভিটা থেকে যার আগমন। "না না, তা কি হ'তে পারে।" সে দেখতে পেল, বর লার্স লারসনের পিঠ চাপড়ে বললে, "লারসন আরম্ভ করবে।"

শুনবামাত্র জ্যান অষ্টার বেহালা নামিয়ে স'রে দাঁড়াল।

লার্স দাঁড়িয়ে রইল অচল হয়ে, মুখে প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত ভাব। "আরম্ভ করবে জ্যান অষ্টার" এই কথাই বলল আবার দৃঢ়তার সঙ্গে, যেন নিশ্চয়ই জানে তার নির্দেশের হবে না কোনও ব্যতিক্রম।

অকারণ বিলম্বের জন্যে ভিড়ের মধ্যে একটা কলরব জেগে উঠল। গির্জার পরিচারক দরজায় দাঁড়িয়ে মিছিলকে ইসারা করে, চটপট অগ্রসর হবার জন্যে। পুরোহিত বেদির কাছে প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

"আপনারা জ্যান অষ্টারকে আরম্ভ করতে বলুন। আমরা ওঁকে আমাদের সর্দার ব'লে মানি।"—চেঁচিয়ে বলে লার্স। নেপথ্যে এক চাষী হাঁকে—"তা হ'তে পারে তোমার মতে, কিন্তু আমরা গাঁয়ের লোক ভাবি তোমারই প্রথম স্থান।" চাষীরা ওকে ঘিরে ফেললে। বলে, "আর দেরি কেন, আরম্ভ ক'রে দাও, পুরুত মশাই অপেক্ষা করছেন, শেষকালটা লোক হাসাবে নাকি?"

লার্স লারসন আগেকার মতই দৃঢ়স্বরে বলে, "গাঁয়ের লোকে মিলে স্বগ্রামের সেরা বেহালাদারকে পিছনে ঠেলতে চায় কেন, বুঝতে পারলুম না বাপু!" নিল্স ওলাফ্সন তেলেবেগুনে উঠল জ্বলে। জোর ক'রে জ্যান অষ্টারকে খাতির করতে চায় গাঁয়ে মোড়লের ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে? লারসনের কাছে এসে চুপি চুপি বলে, "এ তোমার নষ্টামি! তুমি ওকে ডেকে এনে ওকে মাথায় তুলবে এই হচ্ছে তোমার মতলব। চট ক'রে আরম্ভ কর, নইলে ওই জংলি ভূতটাকে এই গির্জার আঙিনা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।"

লার্স লারসন প্রশান্ত মুখে নিল্‌সকে অভিবাদন ক'রে বলে—"হাঁ ঠিক কথা, আর বিলম্ব নয়।" এই ব'লে জ্যান অষ্টারকে তার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে আহ্বান করল। তার পর দু-এক পা এগিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে সবাই তাকে দেখতে পায়। তার পর বেহালার ছড়টা বোঁ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলল, পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে কুটকুট ক'রে কাটল তা'র বেহালার চারটে তার। "কেউ আর এ কথা বলতে পারবে না যে আমি জ্যান অষ্টারের চেয়ে নিজেকে যোগ্যতর বিবেচনা করি।"

আজ তিন বৎসর ধ'রে একটি সুর কেবল গুম্‌রে গুম্‌রে মরেছে জ্যানের বুকের ভিতর, সে সুর ফুটিয়ে তুলতে পারে নি তা'র বেহালার তারে। সে সুর ফুটতে পারল কই তার নিরানন্দ দুর্ভাবনাময় অন্ধকার কুঁড়ের ভিতর? সেখানে এমন কিছুই ঘটে নি যা গভীর বেদনায় বা আনন্দে তার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, প্রত্যহের ঘানিটানার গ্লানি আর অবসাদকে অতিক্রম ক'রে। লার্স লারসনের বেহালার তারগুলি ছিন্ন হবার পট্ পট্ শব্দ যখন পৌঁছল তার কানে, সে একবার মুখ তুলে সজোরে বুক ভ'রে নিল একটা দীর্ঘশ্বাস। উৎসুক তার মুখশ্রী, যেন সুদূরের কি এক ধ্বনি শুনছে সে উন্মনা হ'য়ে। তার পর দিল তার ছড়ে একটি মাত্র টান। তিন বৎসর ধ'রে যে সুরটি ছিল তার ধ্যানের জীবন্ত কবরে, হঠাৎ যেন আজ পেল আত্ম-প্রকাশের অবাধ নির্মুক্ত স্বরকম্প্র তন্ত্রে তন্ত্রে। এক পা এক পা ক'রে সে এগিয়ে চলল মন্দিরের দ্বারে।

অনুযাত্রীর দল এমন অপূর্ব সুরঝঙ্কার শোনে নি কখনও জন্মাবধি। সুরের ঘূর্ণিপাকের আবেগ তাদের টেনে নিয়ে চলল উৎসবযাত্রার পথে। নিল্‌স্ ওলাফ্‌সনও বাঁধা পড়ল সেই সুরের ইন্দ্রজালে। আপামর সাধারণ সকলেরই আন্তরিক প্রশস্তি বর্ষিত হ'ল এই ওস্তাদ-যুগলের মস্তকে। মন্দিরে উপনীত হ'ল যখন, সকলেরই চোখে অশ্রুসিক্ত দিব্যদীপ্তি।*

* সেল্‌মা ল্যাগারলভের Wedding March হইতে।

অপরাজিত

শ্রীজীবনময় রায়

আজি ক্ষুব্ধ প্রাবৃটের বক্ষে বাজে বজ্রের নির্ঘোষ,
হানে ঘন বিদ্যুতের অসি;
রুদ্ধ তার অন্তরেতে অসহায় অসহ আক্রোশ
চাহিছে গ্রাসিতে পূর্ণশশী।
ক্রন্দনে শিহরে শূন্য—মহাব্যোমে জাগে হাহাকার,
উন্মথিত শ্রাবণের ব্যথা,
নিথর মৃত্যুর কোলে কবি তার—কে গাহিবে আর
বর্ষামঙ্গলের কল-গাথা?

বিশ্বমানবের কণ্ঠ চাহিছে তোমারে আজ ফিরে,
এস কবি ডাকিতেছে সবে,
আবার সঙ্গীতে নৃত্যে তোমার আসনটিরে ঘিরে
আনন্দে মাতিব মহোৎসবে।

যেতে নাহি দিব মোরা, কার সাধ্য নিয়ে যাবে কেড়ে,
বন্দী তুমি প্রেমে ভুবনের;
তুমি কি যাইতে পারো মৃত্যুর আহ্বানে সব ছেড়ে,
"পরম" তুমি যে জীবনের।
নিখিল প্রকৃতি আর নিখিলের মানব-হৃদয়ে
তব নয়নের জ্যোতি লাগে,
এস ফিরে এস কবি, ছিন্ন কর সকল সংশয়ে,
দাঁড়াও মোদের আঁখি-আগে।

তোমার মহেন্দ্রকান্তি আজি হের বিশ্বের হৃদয়ে
পাতিয়াছে প্রেম-সিংহাসন;
হে কবি, নিবিড় স্পর্শে, তোমার অমৃত পরিচয়ে
অভিষিক্ত নিখিল ভুবন।

তোমার কণ্ঠের বাণী অনাহত অমৃত বীণায়
টুটিয়া কালের ব্যবধান
ধ্বনিছে আকাশ ভরি, আজিকে অযুত মূর্চ্ছনায়,
ভরিয়াছে নিখিলের প্রাণ।
তব নয়নের আলো ছড়ায়েছে দিকে দিগন্তরে—
আনন্দলোকের পরশন—
তোমার প্রেমের স্পর্শ, আজি ক্ষুব্ধ মানব-অন্তরে
সুধাধারা করে বরষণ।
তব ধ্যানদৃষ্টি পথে—নয়নের অন্তরালবাসী—
আনিয়াছ ভূমার সৌরভ;
সঁপিয়াছ তুচ্ছতারে—অমৃত-নির্ঝর-অবগাহী,
মহত্ত্বের বিজয় গৌরব।
শিখায়েছ গান তব—ভরিয়াছ ভুবন গগন,
রচিয়াছ নব নব সুর;
উৎসবে আনন্দে শোকে সে সঙ্গীত রসে নিমগন
মানবের চিত্ত পরিপূর।
খুলিয়া দিয়াছ তুমি এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার
মোর মুগ্ধ নয়ন সম্মুখে—
নিদাঘ-বসন্ত-বর্ষা-শরতের আনন্দসম্ভার
উৎসারিত আজি শতমুখে।

বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি তোমার বিভূতি বিভূষিত—
গানে প্রাণে আশায় ভাষায়;
তুমি করিয়াছ পূত, যাহা ক্ষুদ্র কলঙ্ক-দূষিত,
পুণ্যধারা দিয়া পিপাসায়।
তিল তিল করি নিত্য, আপনার প্রাণস্পর্শ দিয়া
গড়িয়াছ বাঙালীর আশা,
তোমার বিজয় রথে ত্রিভুবন ফিরেছে ভ্রমিয়া
কণ্ঠে ল'য়ে বৈজয়ন্তী ভাষা।
নির্ভয় করেছ চিত্ত, মুক্তির অমোঘ মন্ত্রে তব,
তুলিয়াছি উচ্চে নত-শির।

শতধা-পৌরুষে নিত্য নির্দ্দেশিয়া বীর্য্য অভিনব
কর মোরে বিশ্বজয়ী বীর।

অরুণ-কিরণ সম মোর চিত্তকমলকোরকে
তব প্রেমোজ্জ্বল কর দিয়া
আনিয়াছ আহ্বানিয়া তোমার সৃষ্টির স্বর্গলোকে,
পঙ্কশয্যা হইতে টানিয়া।
বাণীর পূজার যজ্ঞে সত্যশিবসুন্দরের রূপ
মন্ত্রে তব করিলে প্রকাশ;
ছন্দের মাধুর্য্যে নৃত্যে এ বিশ্বের আনন্দস্বরূপ
মোর মাঝে দিলে অবকাশ।
প্রতি রক্তকণিকায় বিচ্ছুরিত আজি তব প্রাণ
আমারে করিছে উতরোল;
আমার হৃদয়স্পন্দে তোমারি ধমনী স্পন্দমান—
স্তব্ধ চিত্ত শুনি সে কল্লোল।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, হেন ঠাঁই কোথা বিশ্বে আজ
যেথা তুমি নাই মোর মাঝে!
ঘেরিয়া রয়েছ নিত্য ওতঃপ্রোত, ওগো রাজরাজ,
সকল চিন্তায় সর্ব্ব কাজে।

কেমনে কাড়িবে মৃত্যু তোমারে মোদের বক্ষ হ'তে,
নিজেরে করেছ তুমি দান
মোদের সকল কর্ম্মে, সকল চিন্তার ধারাস্রোতে
তোমারি উঠিছে জয়গান।
আজি ঘুচিয়াছে বন্ধু মর্ত্ত্যের সকল ব্যবধান
মরণের অমৃত পরশে,
তোমাতে পেয়েছি আজ পরিপূর্ণ প্রাণের সন্ধান
সঞ্জীবিত সুধাময় রসে;
মৃত্যু আজি পরাজিত, খুলে গেছে মিলনের দ্বার
নিখিলের হৃদয়-মন্দিরে,
পরিপূর্ণ প্রকাশের সন্ধিক্ষণ এসেছে এবার
আজ বন্ধু আসিয়াছ ফিরে।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শামসুন নাহার

বাংলার বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নেই। বিশ্বপ্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ চিরদিনই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির যত নব নব রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার প্রত্যেকটিরই বৈচিত্র্য তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তিনি ছিলেন বর্ষার কবি। বর্ষার প্রকৃতি তাঁর মনকে যেমন দোলা দিয়েছে তেমন বুঝি আর কিছুতে নয়। যৌবনে তিনি গেয়েছিলেন—

> শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে
> পড়ুক ঝরে
> তোমার ঐ গানটি আমার মুখের পরে
> চোখের পরে

গত ২২শে শ্রাবণ অপরাহ্নবেলায় বিপুল জনতা যখন কলকাতার রাজপথ দিয়ে তাঁর শবদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখলাম শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা অঝোরে ঝরছে তাঁর মুখে চোখে। মনে হ'ল তাঁর যৌবনের সেই কামনা স্মরণ ক'রে কোন্ অনাদি কবি শ্রাবণের ধারার ভেতর দিয়ে তাঁর গানের সুর অঝোরে বর্ষণ করছেন এই বিদায়বেলায়। শ্রাবণের সন্ধ্যাকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন। শ্রাবণেরই এক সন্ধ্যায় তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল 'বুলবুলে'র ভেতর দিয়ে। 'বুলবুল'কে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। বুলবুল যে কয় বছর বেঁচে ছিল, আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের স্নেহ একে সঞ্জীবিত করেছে।

'বুলবুল' সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্য্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে কোথাও ধ্বনিত হ'তে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ ব'লে মনে করি। আপনার বিনাশ যখন আপনি ঘটাতে বসি তখন তাকেই বলি মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মারীকে মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুবিষ আপনার মধ্যে থেকেই উদ্ভাবিত ক'রে তোলে তখনই পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আজ আমাদের। আমাদের দুঃখ, আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে। আমরা স্পর্দ্ধা ক'রে আত্মঘাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্ব্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা কর, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।"

হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি চিরদিনই তাঁকে বেদনা দিয়েছে। তাঁর এই বাণীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই গভীর বেদনাবোধ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বের, আবার তিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকের। ছোট শিশুটি পর্য্যন্ত তাঁকে একান্ত আপনার ব'লে জানতো। তাই রবীন্দ্রনাথ যেদিন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন, বাড়ীর অবুঝ শিশুটি ঘুরে ফিরে কেবলি বারে বারে প্রশ্ন করছিল—রবীন্দ্রনাথ কেন চলে যাবেন? রাস্তায় অত যে লোক রয়েছে, তারা যাবে না—রবীন্দ্রনাথ যাবেন কেন? মুখে মুখে সে আওড়াচ্ছিল—

> এখনো তো বড় হই নি আমি
> ছোট আছি ছেলেমানুষ বলে
> দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
> বড় হয়ে বাবার মত হলে
> দাদা তখন পড়তে যদি না চায়
> পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়
> তখন তারে এমনি বকে দেব
> বলব, তুমি চুপটি করে পড়
> বলব তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে
> যখন হব বাবার মত বড়।

যে পরমাত্মীয় তার মুখে ভাষা জুগিয়েছেন তাঁর বিদায় চার বছরের অবুঝ শিশুটিকেও বুঝি কম আঘাত দেয় নি।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব এর প্রকাশের বৈচিত্র্য। উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, গান ও কবিতায় এ প্রতিভা শতধারে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। আবার তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কত বিচিত্র রকমের উপাদান।

বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমানব, প্রেম ও বিরহ, দেশের দুর্ভাগ্য, হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি, সমাজের অন্ধ মূঢ়তা, তাঁর

চিত্তকে একই রকম আলোড়িত করেছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, একই কালে একেবারে বিপরীত ভাবের ধারা তাঁর হৃদয়কে করেছে আন্দোলিত। একই সময়ে জীবনের বিচিত্র রসের সম্ভোগ ও প্রকাশ রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই জন্যে আমরা দেখতে পাই—যখন তিনি বিধবা-বিবাহ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, ঠিক সেই সময়েই লিখেছেন অনবদ্য প্রেমের কবিতা।

শুধু কাব্য নয়, জীবনেও দেখতে পাই যখন তিনি প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ভারতের এবং বিশ্বের রাজনৈতিক বা শিক্ষাবিষয়ক নানা জটিল সমস্যার আলোচনা করেছেন তখনও একটি ছোট শিশু কত সহজে তাঁকে আকর্ষণ করতে পেরেছে।

কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন তিনি শান্তি-নিকেতনে। আমার ছয় বছরের ছেলেটি তাঁকে একটা ছোট চিঠি লিখেছিল। তাতে লিখেছিল—"হে কবি, তোমার 'সহজ পাঠ' আমি পড়েছি। আমি বড় হ'লে তোমায় দেখতে শান্তিনিকেতনে আসব!" আশ্চর্য্য হলাম যখন ঠিক ফেরত ডাকে সে চিঠির জবাব এল—সেক্রেটারীর হাতে লেখা কবির নাম সই-করা মৌখিক ভদ্রতাসূচক চিঠি নয়। কবি নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছেন স্নেহসিক্ত চিঠি—"আমার ছোট বন্ধুটি, তুমি যখন আমার 'সহজ পাঠ' পড়েছ, তখনই তোমার সঙ্গে আমার জানাজানি হয়ে গেছে। তুমি বড় হ'লে আমায় দেখতে আসবে বলেছ। তাহলে একটু তাড়াতাড়ি কর, বিলম্বে দেখা নাও হ'তে পারে।"

আজ মনে পড়ছে আমার 'শিশুর শিক্ষা' বইখানা যখন বেরোয় তখন সকলের আগে তিনিই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে শান্তিনিকেতন থেকে সাদর আহ্বান পেয়ে সেখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের মহিলা বিভাগে সভানেত্রীত্ব করতে ব'লে তাঁরা আমায় সম্মানিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের জীবনের স্বপ্ন শান্তিনিকেতনকে কি ভাবে, কি চোখে দেখলাম সে কথা এখানে বিস্তারিত বলতে চাই না। শুধু দু-একটা কথাই বলব। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মিলন—শিক্ষার ভেতর দিয়ে, সভ্যতার ভেতর দিয়ে—এই-ই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নসাধ। এই স্বপ্ন তাঁর শান্তিনিকেতনে অভিনব রূপ লাভ করেছে। ভারতীয় সভ্যতা বলতে তিনি বুঝতেন একটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়—এ সভ্যতা একটি বিচিত্র সম্মিলিত জাতির সম্পদ। আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান, ইংরেজ খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ পতিত সকলেরই দানে ঐ সভ্যতা পুষ্ট।

> হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন
> শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন,
> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার
> দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কিন্তু তিনি বলেছেন এক হওয়া আর একাকার হওয়া এক কথা নয়। ভারতীয় সভ্যতাকে তিনি তুলনা করেছেন একটা শতদল পদ্মের সঙ্গে। পদ্মের দলগুলি প্রত্যেকেই পৃথক্ কিন্তু তা সত্বেও তারা একই বৃন্তে গাঁথা রয়েছে। প্রত্যেকটি জাতিও তেমনি নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র শতদলকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই কথাগুলো বারে বারে মনে পড়েছিল যখন দেখলাম শান্তিনিকেতনে শিশু-ভবনে, সঙ্গীত-ভবনে, কলা-ভবনে, চীনা-ভবনে, গ্রন্থাগারে, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, চৈনিক-ভারতীয়, দেশী-বিলাতী, সকল শ্রেণীরই ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে জ্ঞানের সাধনা করছেন। শান্তিনিকেতনে—যেখানে প্রকৃতির রুক্ষতার আর সরসতার সংমিশ্রণ হয়েছে—শুকনো লাল মাটির বুকে প্রকাশ পেয়েছে যেখানে অপরূপ শ্যামলিমা—মানুষে প্রকৃতিতে যেখানে মুখোমুখি আলাপ—নাগরিক সভ্যতার আর প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্যের সেই মিলনক্ষেত্রেই বুঝি একমাত্র সম্ভব হ'তে পারে মানুষে মানুষে প্রাণের মিলন, জ্ঞানের মিলন, সভ্যতার মিলন।

গ্রন্থাগারের ও অন্যান্য বাড়ীগুলির দেয়াল অনেক জায়গায় আগাগোড়া চিত্রিত। দেয়ালগুলি চিত্রিত করেছেন সেখানকারই ছাত্রছাত্রীরা। দূর থেকে দেয়ালের গায়ে সেই বিচিত্র রঙের খেলা দেখে মনে হয়েছিল—ইউরোপ ও আমেরিকা, চীন ও ভারত একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণের রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের স্বপ্ন।

শান্তিনিকেতনের পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি, আসবাব সব কিছুর মধ্যে দেখেছি একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। উত্তরায়ণের ভোজনকক্ষে রাণী দেবী (মিসেস প্রশান্ত মহলানবিশ), মিস মারজারি সাইকস্, শ্রীযুক্তা লতা রায়, প্রতিমা দেবী ও ঠাকুর-পরিবারের অন্য মহিলাদের সঙ্গে খেতে ব'সে দেখেছি—এক দিকে যেমন টেবিল চেয়ার কাঁটা চামচের ব্যবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি খাবার পরে কারুর হাত ধোবার দরকার হ'লে সিলুপচি, বদনারও

ব্যবস্থা রয়েছে। কবি অসুস্থ ছিলেন ব'লে উত্তরায়ণের বসবার ঘর তখন প্রায়ই বন্ধ থাকত। সে ঘরে ঢুকে সকলের আগে চোখে পড়ল তার রঙের ঐশ্বর্য। দরজা-জানালার, পর্দা, আসবাব ও দেয়ালের বিচিত্র রং যেন একে এক মায়াপুরীর রূপ দিয়েছে। এক দিকে বিলাতী কায়দায় সোফা, কৌচ পাতা রয়েছে—অন্য দিকে মোগলাই ধরণের গালিচার ফরাসের উপর তাকিয়া সাজানো।

যে কয়দিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, উত্তরায়ণে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। তখন সেখানে ছিলেন কবি নিজে এবং তাঁর পরিবারবর্গ। কবি রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী, নন্দিতা দেবী ও নন্দিনী দেবী—এঁদের প্রত্যেকে যেভাবে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের আবহাওয়াতেই বুঝি মানুষে মানুষে এ আত্মীয়তা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। সকাল বিকাল তাঁর ঘরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যেতাম। তখনো তিনি বাড়ীর বাহিরে যেতেন না। শ্রীনিকেতনের উৎসবে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু উত্তরায়ণে তাঁর নিজের কক্ষে ব'সে সমস্ত বিবরণ জানবার জন্যে তাঁর কি ব্যাকুলতা। তাঁর দৌহিত্রী নন্দিনী দেবীর ওপর ছিল তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ভার। তিনি প্রায়ই দাদামশায়ের ঘরে থাকতেন। প্রতিমা দেবী ও অন্যান্য মহিলারা মাঝে মাঝে যেতেন। মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট কর্মীরা আসতেন। বাইরের কোন অতিথি-অভ্যাগত সেই সময়ে কবির সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেতেন না। সেখানে একজন চীনা অতিথির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কবিকে দেখতে পেলেন না ব'লে তিনি অনেক দুঃখ করলেন। অসুস্থ শরীরেও রবীন্দ্রনাথকে দারুণ পরিশ্রম করতে দেখেছি। এদিককার যে কটা বই তাঁর বের হয়েছিল, তারই মধ্যে বোধ হয় কোন একটা তখন প্রেসে যাচ্ছিল। লেখাগুলো সাজানোর ব্যাপারে সারা দুপুর পরিশ্রম ক'রে বিকেলের দিকে দেখেছি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

মাঝে মাঝে রাত্রে আধো-ঘুম আধো-জাগরণের অবস্থায় তিনি অনুভব করতেন কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব। ঘুমের ঘোরে একটা কি দুটো নূতন চরণ আওড়াতে দেখলেই যারা কাছে থাকতেন তাঁরা সেটা টুকে রাখতেন। পরের দিন সেই চরণগুলি তাঁর সামনে ধরলেই তিনি রাত্রির স্বপ্নজড়িত সেই ভাবকে কবিতায় রূপ দিতেন।

'বুলবুলে'র জন্যে একটা কবিতা পাঠাবার সময় তিনি এক বার লিখেছিলেন, "আমার কাছে কবিতা চেয়ে তোমরা আমার অক্ষমতাকেই লজ্জা দিচ্ছ—আর কি আমার সে ক্ষমতা আছে?" কিন্তু এটা যে তাঁর কত বড় ভুল ধারণা তা আমরা সবাই জানি। তিনি বলেছিলেন, "জল পড়ে পাতা নড়ে—আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" জীবনের প্রত্যুষে সেই যে সেদিন তাঁর সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়তে ও পাতা নড়তে লাগল, তার পর থেকে এক দিন নয়, দু-দিন নয় দীর্ঘ সত্তর বছরের কাছাকাছি অজস্র ধারায় তিনি রস বিতরণ ক'রে গেছেন। মৃত্যুর আগে শেষ চৈতন্য লুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সে ধারা থামে নি।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন

মরণ যেদিন দিনের শেষে
আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কি ধন দেবে উহারে।

আবার এর উত্তর নিজেই দিয়েছিলেন—

যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এত দিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দেবো উহারে।

সেই চরম দিন অবশেষে এল। এমন বিচিত্র উপহার, এমন অমূল্য উপহার তার ভাগ্যে ক'টি মেলে জানি না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "জগতে কারুর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে গেলাম না—জগতকে ঋণী ক'রে গেলাম—শেষ দিনে এই হবে আমার সান্ত্বনা।" "জগতকে ঋণে বেঁধে গেলাম" অত বড় কথা রবীন্দ্রনাথই বলতে পারতেন!

তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিভা এ দেশকে জগতের সঙ্গে নূতন ক'রে পরিচিত করেছিল। কিন্তু সে পরিচয় সার্থক হয় নি। তিনি বলেছিলেন—ভারতবাসীকে আগে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে হবে, তবেই বিদেশীর সঙ্গে মিলন সার্থক হবে। আমাদের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার পরিচয় আমরা বিদেশীকে দিতে পারছি না বলেই তাদের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার দেখাও আমরা পাচ্ছি না। সেই জন্যেই ইংরেজে ভারতবাসীতে বিরোধের আর শেষ নেই। তাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব তার সত্যিকার পরিচয় পেতে হ'লে আমাদেরকে তার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাদের যা দেবার আছে তা আমরা দীনভাবে হাত পেতে নেব না—যোগ্যতার জোরেই নেব।

কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। বড় দুঃখে তিনি বলেছেন, "আমি পারস্য ইরাক ঈজিপ্টে ভ্রমণ ক'রে এসেছি। বহু শতাব্দীর মোহান্ধকার ভেদ ক'রে সর্ব্বত্রই নব প্রভাতের আলোক আজ প্রকাশিত—সর্ব্বত্রই সেখানকার নানা লোকের মুখে শুনে এলেম ভারতবাসীর অন্ধতার প্রতি ধিক্কার।". ('বুলবুল'—পৌষ ১৩৪০)

দুর্ভাগ্য জাতি রবীন্দ্রনাথের ঋণ শোধ করবার কল্পনাও আজ করতে পারে না। এ ঋণ চোখের জলে শোধ হবার নয়। যদি কোন দিন পারে, তবে জাতি জীবন দিয়ে এ ঋণ শোধ করবে। জানি না কবে সেদিন আসবে? যদি কখনো আসে তবে সেদিনই সার্থক হবে আজকের এই বেদনার অশ্রু।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি

সূর্য্য নাই—পৃথ্বী আছে! মহাকাল, এ কি কথা কহ?
এ আঁধারে, যাত্রাপথে দণ্ড দুই স্থির হয়ে রহ;—
সে বিলম্বে তব, বন্ধু, বিশ্বের হবে না কোনও ক্ষতি
আজি এ প্রলয় দিনে! হের উৎকণ্ঠিত বসুমতী
উৎকর্ণ হইয়া আছে তব কাছে বার্ত্তা শুনিবারে;
অপরূপ সে রহস্য তুমি ছাড়া কে বুঝাবে তা'রে?

কাল ছিল জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি ধরি' বিশ্ব আলো করি',—
আজ দেখি, সেই নাই! অন্ধ চোখে নামে বিভাবরী
লয়ে তার দ্বন্দ্ব আর দুর্ভাবনা,—নির্ব্বাপিত আশা!
মানবের মনে যে-বা সৃষ্টি-কাব্যে বেঁধেছিল বাসা
স্নেহ দিয়া প্রেম দিয়া রসের অমৃত বর্ত্তিকায়,
সহসা সে অন্তর্হিত কোন্ পাপে এ মর্ত্ত্য-সভায়?

মৃত্যু কি এতই বড়? মানে না সে কোনও অধিকার!
ধরণীর শ্রেষ্ঠ যাহা, তারেও সে করে অস্বীকার
সবল উপেক্ষাধর্ম্মে, ধর্ম্মরাজ নামের কৃপায়,—
যা-কিছু রচনা বিশ্বে, সকলই সে ধ্বংসিবারে চায়!
হেন দম্ভ কিসে তার? মহাকাল, সাক্ষী তুমি তা'র;
কীর্ত্তিময়ে এ সৃষ্টির মান রাখো,—কর প্রতীকার।

তুমিও সবার মতো, হায় কবি, মৃত্যুর অধীন?
এত দীপ্তি, এত শক্তি, তা'তেও ফুরা'ল তব দিন!
সমগ্র জীবন-কাব্য—অপরূপ—সঁপিয়া চরণে
ভুলাইতে পারিলে না দুর্ব্বিনীত দুরন্ত মরণে?
তোমার 'পরাণ-বধূ' তোমারও না রাখিয়া সম্মান
অপরিচিতের সেই হিম হস্তে দিল আত্মদান!

দুর্ভাগিনী বঙ্গবাণী!—আর কেন? বীণা রাখ তুলি'।
যাদু-মন্ত্রভরা সেই তেজোদীপ্ত মোহন অঙ্গুলি
আর না স্পর্শিবে তোরে। বাণী যাহা ফুটিত সে তারে,
ভগ্নবুকে মৌনমুখে আজি তা লুটাক্ অন্ধকারে।
হায় অন্ধ বঙ্গবাসী,—ধ্যান করো আজি অনুক্ষণ
হারায়ে আঁখির দৃষ্টি—কি ছিল সে দরিদ্রের ধন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয় দিন

শ্রীসেবিকা

২৫শে জুলাই, ১৯৪১ ; শুক্রবার।

আজ বেলা তিনটে পনর মিনিটের সময় গুরুদেব জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এলেন। খবরটা জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাই ষ্টেশনে বা বাড়ীতে একেবারেই ভীড় হয় নি। বেশ নিরিবিলিতেই তাঁকে আনা হয়। সারাদিন ট্রেনে গরমে কষ্ট পেয়েছিলেন—তাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যে স্টেচারে করে তাঁকে আনা হয়েছিল তাইতে সেই ভাবেই শুয়ে রইলেন। খাটে আর তোলা গেল না তখন। বললেন, "এখন আর আমাকে নাড়াচাড়া করো না, এই ভাবেই থাকতে দাও।"

জোড়াসাঁকোর পুরান বাড়ীর দোতলায় 'পাথরের ঘরে'ই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গেলবারের অসুখেও এই ঘরে তিনি ছিলেন। আগে এই ঘরটি 'বসবার ঘর' হিসেবে ব্যবহার হ'ত। এবারে অপারেশন হবে বলে আগে থেকে ঘরের যাবতীয় জিনিস পত্তর বের করে দেওয়া হয়েছিল—এমন কি দু-দিকের দেয়ালে মহর্ষিদেব ও দ্বারকানাথের বড় বড় দুটি ছবি ছিল, তাও রাখা হয় নি। গেলবারে গুরুদেব তখন অসুস্থ—ঘরের মাঝখানে বিছানায় শুয়ে থাকতেন, মনে হ'ত যেন দু-পাশ থেকে মহর্ষিদেব ও দ্বারকানাথ তাঁকে দেখছেন। সে এক শোভা! এবারে সেই সব ছবি সরিয়ে দেয়াল পরিষ্কার করে, ঘরের সমস্ত জিনিস 'লাইসল' দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখা হয়েছিল।

বিকেলে দু-এক জন যাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কারো সঙ্গে তিনি তেমন কথাবার্ত্তা বলতে পারেন নি। সন্ধ্যের দিকে বেশ খানিকটা ঘুমুলেন, ঐ স্টেচারে শুয়ে শুয়েই।

সাড়ে সাতটার সময় এক বার ব'লে উঠলেন "কি জানি—ভালো লাগছে না যেন আমার।" ঘরে একা আমিই ছিলুম। একটু ভয় হ'ল কিন্তু গুরুদেবের কাছে তা সামলে গেলুম। জানতুম তিনি তা পছন্দ করেন না। মিনিট দুয়েক তাঁর পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে—একবার এক ফাঁকে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে পাশের ঘরে রথীদাকে ডেকে বললুম, "গুরুদেব বলছেন তাঁর ভালো লাগছে না—এক বার এ ঘরে আসুন।" গুরুদেব ইদানীং কানে কম শুনতেন, তাই রক্ষে। আমার কথা উনি শুনতে পেলেন না। রথীদা এ ঘরে এলেন, ভান করলেন যেন এমনিই এসেছেন তাঁকে দেখতে। কারণ সবাই তো জানতুম—গুরুদেবের শরীর সম্বন্ধে কোন রকমে কেউ উতলা হ'য়ে পড়ে তা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এক জন ডাক্তারও এলেন রথীদার পিছন পিছন। ডাক্তার নাড়ী টিপলেন, কি একটা ওষুধ খাওয়ালেন, বললেন, "ভয়ের কিছু নেই—কিন্তু খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন।" খানিক বাদে তাঁরা সবাই ঘর থেকে চলে গেলেন। মীরাদি* এলেন তিনি গুরুদেবের পাশে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, এখন তুমি কেমন আছো?" মীরাদি অবশ্য এই কয় মিনিটের ব্যাপার জানতেন না—তিনি ট্রেনের ক্লান্তির কথা ভেবেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু তত-ক্ষণে গুরুদেব টের পেয়েছিলেন যে, তিনি বলাতেই ডাক্তার রথীদা সবাই এ ঘরে এ সময়ে এসেছিলেন—ওষুধ খাওয়ালেন—ইত্যাদি। তাই মীরাদি যেই জিজ্ঞেস করলেন "বাবা, এখন তুমি কেমন আছ"—গুরুদেব ওমনি চোখ বড় বড় ক'রে—কথাগুলোর উপর জোর দিয়ে ব'লে উঠলেন "খুব ভালো আছি,—জিজ্ঞেস কর না—ঐ ওকে?" ব'লে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আমি হেসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। শরীর খারাপ লাগছে, বলেছেন,—ডাক্তারকে খবর দিলুম ওষুধ খাওয়ান হ'ল, তাইতে আবার কী অভিমান!

রাত্রে গুরুদেবকে খাটে শোয়ানো হয়—সারা রাত বেশ ভালোই ঘুমিয়েছেন।

২৬শে—

আজ সকালে গুরুদেব খুব প্রফুল্ল ছিলেন। ক্লান্তিও তেমন নেই। রাত্রে ভালো ঘুম হওয়াতে বেশ বিশ্রাম হয়েছিল। সকালে আমাদের অনেকের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। সমরেন্দ্রনাথ[১] অবনীন্দ্রনাথ[২] চারুবাবু[৩]

* গুরুদেবের কন্যা শ্রীমীরা দেবী

১ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

অমিয়বাবু[৪] এঁরা অনেকেই এসেছিলেন। গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব গল্প করলেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া গল্প' সম্বন্ধে বললেন, "অবন, আজকের দিনে আমাকে এমন রূপ দেওয়া—এ আর কারো দ্বারা সম্ভব হ'ত না। সবাই আমাকে ছিন্নভিন্ন করেছে, আমাকে স্তুতি করতে গিয়ে আসল আমাকে ধরতে পারে নি। তোমার মুখ দিয়ে এত দিনে সবাই জানবে তোমাদের কর্ম্মী রবিকাকাকে। কী নিঃশঙ্ক, বেপরোয়া জীবন চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—তোমাদের রবিকাকা এক দিন।"

এই রকম নানা কথাবার্ত্তা ও সে যুগের গল্প চলতে থাকে। কখনও অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "তোমার মনে আছে রবিকাকা সেই গল্প—চার দিকে ঝমাঝম বৃষ্টি—মাল গাড়ীর নীচে বসে কুলিমজুরদের নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে—এমন সময় এঞ্জিন এসে গাড়ী টান্তে স্থরু করলে—"। কখনও বা গুরুদেব বলছেন, "তোমার মনে আছে অবন—খবর পেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাঁদা তুলতে গেলুম। অন্ধকার সিঁড়ি—অতিকষ্টে উপরে উঠে দেখি একটি ছোট ঘ'রে একটি ছোট্ট কাঠের বাক্সের সামনে এক ভদ্রলোক বসে। আমাদের দলবল দেখে তখুনি পাঁচ-শ টাকা দিয়ে আমাদের বিদেয় ক'রে যেন বাঁচলেন। কেন টাকা দিলেন—কা'কে দিলেন সে সবের খোঁজ নেবারও দরকার মনে করলেন না গো।" এই ব'লে গুরুদেব হেসে উঠলেন। এই রকম নানা মজার গল্প হচ্ছিল। কথাবার্ত্তার সময় তাঁদের মুখের ভাব আর গলার স্বরে কে বলবে যে আশি বছরের খুড়ো আর সত্তর বছরের ভাইপো গল্প করছেন।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উৎসব করা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তি। গুরুদেব তাঁকে ধমকে দিলেন, মা যেমন বেয়াড়া ছেলেকে দেয়। বললেন, "অবন, তোমার এতে আপত্তির মানে কি? দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে—তোমার তো তাতে হাত নেই।"

অবনীন্দ্রনাথ আর কি করেন—ছোট ছেলে বকুনি খেলে যেমন মুখের ভাবখানা হয়—তেমনি মুখখানা হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তা আদেশ যখন করেছ—মালাচন্দন পরবো, ফোঁটানাটা কাটবো, তবে কোথাও যেতে পারবো না কিন্তু।" এই বলেই অবনীন্দ্রনাথ গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে 'পড়ি কি মরি' ঘর থেকে পালালেন। গুরুদেব হেসে উঠলেন, বললেন, "পাগ্‌লা বেগতিক দেখে পালালো।"

তার পর গুরুদেব চারুবাবু, অমিয়বাবু ও ঘরের অন্যান্য সবাইকে বললেন, "অবন কিছু চায় না, জীবনে চায় নি কিছু। কিন্তু এই একটি লোক যে শিল্পজগতে যুগ প্রবর্ত্তন করেছে—দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে—সমস্ত দেশ যখন বিরুদ্ধ ছিল—এই অবন তার হাওয়া বদলে দিলে। তাই বলছি—এঁকে যদি তোমরা বাদ দাও তবে সব বৃথা।"

তার পর অবনীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে বললেন, "অবনের গল্প যখন শুনি—মনে হয় তখন কত সহজভাবে নতুন জীবন চালনা ক'রে গেছি। কিছু ভাবতে হ'ত না। এমন সময়টা যেন পূর্ণ হয়ে গেছে—আর নতুন কোনও উত্তেজনা নেই। তখন প্রতি দিন নতুন ছিল। সে কি আশ্চর্য্য যুগ—অবনের গল্প পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তোমরা সবাই। তখন মানুষ নতুন ক'রে নানা বিষয় 'রিয়ালাইজ' করছে। কোন ভয়ডর নেই। অথচ দেখ, তখন অবনরা ছোট ছিল—সাহসও তত ছিল না বললেই হয় কিন্তু কি করবে—আমার প্রতি সম্মান বল ভালোবাসা বল ছাড়তে পারে না। কখন কি কাণ্ড হবে—পুলিস এলো—সব ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছে। সে এক নতুন রকমের 'লাইফে'র আত্মোপলব্ধি। এই বইটা বের হ'লে একটা সময়কার ইতিহাস—আমি যে সেটাকে কতটা বহন করেছি—সমস্তটাকে কি রকম চালিয়ে নিয়েছি—তা জানতে পারবে। অবনের কথায় যা ছবি আছে সেই ঢের। এখন আমরা ভগ্নদূতের মতো চললুম। যৌবনের কী দীপ্তি ছিল—অনুভব করতুম নিজের ভিতরকার একটা তেজ।—এখন সব কৃত্রিম। দেখতে পাই তো। বানিয়ে বানিয়ে সব কথা কয়—ভালো লাগে না।"

দুপুরে গুরুদেব ভালোই ছিলেন। বিকেলে সাড়ে চারটার সময় ৫০ সি. সি. গ্লুকোস ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়—ডান হাতের শিরার মধ্যে। গুরুদেবের বেশ একটু লেগেছিল। রাণীদি* নুনের পুঁটুলির শেক দিতে লাগলেন হাতে—আমিও ছিলুম কাছে। গুরুদেব আমাকে বছর দেড়েক হয় "দ্বিতীয়া" নামে ডাকতেন। আমাকে বললেন, "দ্বিতীয়া—গেল সব জ্বলিয়া"। এই রকম দু-চারটে হাসি তামাশার কথা বলতে বলতেই হঠাৎ সমস্ত শরীরে ভীষণ কাঁপুনি। কম্বল চাপা দিয়ে সবাই চেপে ধরে রইলুম। আধ ঘণ্টারও উপরে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপলেন। তার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। ইনজেকশনের জন্যই নাকি এই কাঁপুনি হয়েছিল। গুরুদেব খুব কষ্ট

৪। কবির পূর্ব্বতন সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* শ্রীযুক্তা নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশ।

পেয়েছিলেন। জ্বর ১০২.৪° অবধি উঠেছিল। সারারাত খুব ভালো ঘুমিয়েছিলেন॥

২৭শে—

আজ সকালে একটি কবিতা মুখে মুখে বললেন—আমি লিখে নিলুম। গুরুদেব বললেন, "সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে—কয়েক লাইন—লিখে রাখ—নয়ত হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেক বারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল—এবারে চুপচাপ ব'সে থাকি কিন্তু পারি নে। এ পাগলামি নয়তো কি?"

গুরুদেব বছর-খানেক হয় নিজের হাতে বেশী কিছু লিখতে পারতেন না। গল্প, প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র যা কিছু লিখবার উনি মুখে ব'লে যেতেন—লিখে নিতুম। কিন্তু কবিতা মুখে মুখে ব'লে কখনও লেখান নি। দু-এক বার শান্তিনিকেতনে চেষ্টা করেছিলেন—বলতেন—"এ হয় না রে—কবিতা লেখা হচ্ছে ঠিক কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নেবার মতো। কুঁজোটা একটু কাত ক'রে দিতে হয়। কবিতার বেলায়ও—আমি কলমটি না ধরলে ঠিক হয় না।"

মুখে মুখে ব'লে কবিতা লেখানো—এই-ই প্রথম।

সকালের দিকটায় গুরুদেব বেশ খুশী মনেই আছেন। রাণীদি*১, বেবুদি২, দেবেনবাবু৩ ওঁদের সঙ্গে খুব গল্প করলেন। বললেন, "ডাক্তাররা বড় বিপদে পড়েছে। কত ভাবে রক্ত নিচ্ছে—পরীক্ষা করছে—কিন্তু কোনও দোষই পাচ্ছে না তাতে। এ তো বড় বিপদ হ'ল হে ডাক্তারদের। রোগী আছে রোগ নেই,—এতে ডাক্তাররা ক্ষুণ্ণ হবে না তো কি—বল?"

এই এক বছর অসুস্থ অবস্থায় গুরুদেবের আধশোয়া ভাবে বিছানায় শুয়ে ঘুমোন অভ্যেস ছিল। বিছানায় কোমর থেকে ঘাড় অবধি অনেকগুলো বালিশ জড়ো ক'রে রাখা হ'ত—হাঁটুর নীচেও সর্ব্বদা একটা মোটা বালিশ থাকতো। অপারেশনের পরে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে কিছু দিন অবধি, তাই ডাক্তাররা বলেছিলেন এখন থেকে দু-একটা করে বালিশ কমিয়ে সেই অভ্যেস করিয়ে নিতে হবে। আজ বিকেলে যখন পায়ের নীচের বালিশটা ঠিক ক'রে দিতে চাই তখন গুরুদেব বললেন, "আর কেন—পা তুলে থাকা আমার চলবে না গো, উঁচু ঘাড়ও আমার আর সাজবে না। যে ঘাড় কোনদিন নামাই নি—আজ ডাক্তাররা বলছে—ঘাড় নামাও- পা সোজা কর। কি অধঃপতন হ'ল আমার বল দেখি।"

২৯শে—

এ দু-দিন গুরুদেব খুব বিমর্ষ হয়ে আছেন। অপারেশন নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছেন। বলছেন, "যখন অপারেশন করতেই হবে তখন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকে গেলেই ভালো।" রোজ গ্লুকোস ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। উনি ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করেন, "বড় খোঁচার ভূমিকা স্বরূপ এই ছোট ছোট খোঁচা আর কত দিন চালাবে?"

আমরা সবাই জানি কাল্ অপারেশন হবে কিন্তু গুরুদেবকে জানতে দেওয়া হয় না। জ্যোতিদাকে* ডেকে গুরুদেব নানা ভাবে প্রশ্ন করেন—জ্যোতিদাও নানা ভাবে এড়িয়ে যান—অন্য গল্প করেন—অপারেশনের সঠিক দিনটার কথা আর বলেন না—পাছে গুরুদেব কোন রকম বিচলিত হয়ে পড়েন। গুরুদেব বলেন, "আচ্ছা জ্যোতি আমাকে বুঝিয়ে বল তো—এই ব্যাপারে আমার কত দূর কি লাগবে—আমি সব বুঝে রাখতে চাই—আগে থেকে।"

জ্যোতিদা বললেন, "আপনি টেরও পাবেন না কিছু—এই তো রোজ গ্লুকোস ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে—এই রকম একটা খোঁচার মতো হয়তো একবার একটু লাগবে। আপনি কিছু ভাববেন না এ নিয়ে, এমনও হ'তে পারে যে—অপারেশন টেবিলে এক দিকে অপারেশন হচ্ছে, আর একদিকে আপনি কবিতা বলে যাচ্ছেন।" গুরুদেব হাসলেন, বললেন, "তা হ'লে তুমি বলতে চাচ্ছ যে আমার কিছুই লাগবে না।"

জ্যোতিদা বললেন, "একটুও না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

গুরুদেব আমাদের বললেন, "তা'হলে আজকে তোরা জ্যোতির এখানে আহারের ব্যবস্থাটা একটু ভালো ভাবেই করিস।"

গুরুদেব যখনই বিমর্ষ হয়ে পড়েন জ্যোতিদার এই রকম হাল্কা কথাবার্ত্তায় বেশ যেন খুশী হয়ে ওঠেন।

আজ বিকেলে একটা কবিতা বললেন, লিখে নিলুম "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে—এসেছে আমার দ্বারে"। পড়ে শোনালুম—গুরুদেব ব'লে ব'লে সেই কবিতা সংশোধন করালেন। আবার জায়গায় জায়গায় আমাকে বকুনিও দিলেন বললেন, "কি লিখেছ—ছন্দ মিললো কোথায়?" আমি কলম হাতে নিয়ে ব'সে হাসি। বলি—"কবিতা কি লিখেছি কোন দিন যে ছন্দ বুঝবো।"

১ শ্রীযুক্তা নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশ

২ শ্রীযুক্তা নলিনী বসু

৩ বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু।

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ সরকার।

গুরুদেব বললেন, "তা'হলে দেখ্‌ছি এবার তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়বো—এ ভাবে তোমাকে দিয়ে কবিতা লেখালে তুমিই কোন দিন কবিতা লিখতে সুরু ক'রে দেবে যে। এখন তোমাকে আমি খাটাচ্ছি—তখন আমাকেই তুমি খাটিয়ে নেবে।"

৩০শে—

আজ অপারেশন হবে—সকাল থেকে তোড়জোড় চল্‌ছে। 'পাথরের ঘরে'র পূর্ব্ব দিকের বারান্দায় টেবিল সাজানো হয়েছে—অপারেশনের অন্যান্য জিনিসপত্তর চার দিকে রাখা হয়েছে। ঘর, বারান্দা ধোয়ামোছা হচ্ছে। গুরুদেব পূবশিয়রী শুয়ে আছেন—তিনি কিছুই টের পাচ্ছেন না। আমাদের মন যেন কেমন করছে—কি জানি কি হবে। সবাই তো বলছেন 'ভয়ের কিছু নেই'।

গুরুদেব জ্যোতিদাকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা—আমাকে বল তো—ব্যাপারটা কবে করছো তোমরা?"

জ্যোতিদা বললেন, "এই কাল কি পরশু। এখনও ঠিক হয় নি—ললিতবাবু* যেদিন ভালো বুঝবেন—সে দিনই হবে।"

গুরুদেবকে আজ তেমন প্রফুল্ল দেখাচ্ছে না যেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ ক'রে আছেন—কি যেন ভাবছেন। বুঝলুম কিছু কথা মাথায় এসেছে—কাগজ কলম নিয়ে পাশে বসলুম। আমাকে দেখে ইসারা করলেন—আমি লিখে যেতে লাগলুম—গুরুদেব মুখে মুখে ধীরে ধীরে ব'লে যেতে লাগলেন—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে—
হে ছলনাময়ী।"

কবিতাটি বেশ বড়ই, বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আজকাল কিছু ভাবতে গেলে অল্পেতেই ওঁর ক্লান্তি আসে —এ কথা উনিও বলেন। খানিকক্ষণ আবার বুকে হাত দিয়ে চুপচাপ ক'রে চোখ বুজে রইলেন। সাড়ে নয়টার সময় আবার তিন লাইন কবিতা বললেন—

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

ব'লে—বললেন, "সকাল বেলার কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস্।"

বোঠান* শান্তিনিকেতনে অসুস্থ—এখানে আসতে পারেন নি। তাঁর খুব খারাপ লাগছে। গুরুদেবকে চিঠি লিখেছেন। খানিক বাদে গুরুদেবকে বললুম, "বোঠানকে একটি চিঠি লিখবেন? উনি যে বড় ভাবনায় আছেন আপনার জন্য।"

বেলা দশটার সময় গুরুদেব বোঠানকে চিঠি লেখালেন —উনি বললেন—আমি লিখে ওঁর হাতে দিলুম। গুরুদেব চিঠির নীচে 'বাবামশায়' সই করলেন। তখনও তিনি জানেন না যে আজই তাঁর অপারেশন হবে।

সাড়ে দশটার সময় ললিতবাবু অপারেশনের সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক ক'রে গুরুদেবকে জানান। বললেন, "আজ দিনটা ভালো আছে—তা'হলে আজই সেরে ফেলি—কি বলেন?"

গুরুদেব প্রথমটা একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন—বললেন, "আজই?" পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা ভালো—এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।" তার পর আর আমাদের সঙ্গে তেমন কোনও কথাবার্ত্তা কইলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে আমাকে বললেন, "একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ।" আমি কানের কাছে মুখ নিয়ে আজকের কবিতাটি পড়ে শোনালুম। বললেন, "কিছু গোলমাল আছে, তা থাক্—ডাক্তাররা তো বলছে—অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভালো হয়ে পরে ঠিক করব'খন।"

এগারোটার সময়ে বাইরের বারান্দায় স্ট্রেচারে ক'রে গুরুদেবকে অপারেশন-টেবিলে আনা হয়। এগারোটা কুড়ি মিনিটে অপারেশন হয়—বাঁধাছাঁদা শেষ হ'তে আধঘণ্টাটাক্ সময় লাগে। সব বেশ ভালো রকমেই হয়। গুরুদেব দিনের বেলা খুব ঘুমুলেন। মাঝে মাঝে দু-চারটা কথাও বলেন—তবে ডাক্তারদের বারণ, তাই থামিয়ে দেওয়া হয়। বিকেলের দিকে "জ্বালা ও ব্যথা করছে" বলেন। গায়ের তাপ অন্য দিনের তুলনায় কম। ললিতবাবু সন্ধ্যে সাতটাতে আবার এসেছিলেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন খুব লেগেছিল কিনা। গুরুদেব বললেন, "কেন মিছে মিথ্যে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে।" অপারেশনের সময়ে নাকি বেশ লেগেছিল গুরুদেবের। বললেন, "জ্যোতিকে আমি একবার জিজ্ঞেস করতে চাই—সে যে আমাকে বোঝালে যে একটুও লাগবে না—তার মানে কি?" এই রকম দু-চারটে কথা যা বলেছেন তাতেও হাসি ঠাট্টার সুর। দারুণ কষ্টের মধ্যেও হাসি, এইখানেই গুরুদেবের বিশেষত্ব।

ললিতবাবু বললেন, "তা এক রকম সব তো ভালোয়

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ব্যানার্জী

* কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী

ভালোয় হয়ে গেল কেবল জ্যোতির দুঃখ রয়ে গেল। আপনার কবিতাই বলা হ'ল না।" গুরুদেব হাসলেন। ডাক্তাররা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর গুরুদেব আমাকে বললেন, "দ্বিতীয়া, জ্যোতি নাকি একটি কবিতার জন্য দুঃখ করেছিল।" আমি বললুম, "তা'হলে বলবেন আপনি? আমি লিখে নিই?"

গুরুদেব বললেন, "ক্ষেপেছিস তুই, এখন বলব?" আমি বললুম, "তবে আজকের কবিতাটি—।" উনি বললেন, "না—তাতে যে গোলমাল আছে একটু। কাল যেটা লিখেছি এক বার পড়ে শোনা আমাকে।" আমি কাল বিকেলের লেখা কবিতাটি কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে পড়ে শোনালুম। গুরুদেব বললেন, "ঠিক আছে, এটাই ঠিক হবে, লিখে জ্যোতিকে দে।" আমি একটি কাগজে "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে"—এই কবিতাটি খাতা থেকে কপি ক'রে পাশের ঘরে জ্যোতিদাকে দিলুম। সেখানে অন্যান্য ডাক্তাররাও বসে ছিলেন—তাঁরা কবিতাটি সবাই কপি ক'রে নিলেন। ডাক্তাররা বোধ হয় ভাবলেন তখুনি ওই কবিতাটি লেখা হ'ল। বুঝতে পারলুম না ঠিক। রাত্রে গুরুদেব ভালোই ঘুমিয়েছেন।

৩১শে—

আজ সকালে গুরুদেব দু-একটা কথা বলেছেন, "ব্যথা করছে—জ্বালা করছে" ইত্যাদি রকমের। কিন্তু দুপুর থেকে একেবারে অসাড় হয়ে আছেন। গায়ের তাপও বেড়েছে। দিনে বেশ ঘুমিয়েছেন কিন্তু রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নাই॥

১লা আগষ্ট—

আজ সকাল থেকে গুরুদেব কোনও কথাবার্ত্তাই বলছেন না। নিস্তব্ধ—অসাড় হয়ে আছেন। যন্ত্রণাসূচক আওয়াজ করছেন থেকে থেকে। দুপুরে কিছু জিজ্ঞেস করলে কেবল মাথা নাড়ছেন। থেকে থেকে যখন তাকান —সামনে মুখ নিয়ে যাই—ভাবি কিছু বুঝি বা বলতে চাচ্ছেন কিন্তু কিছু বলেন না—তাকিয়েই থাকেন। কখনো কখনো ঐ তাকানি দেখে ভয় করে, কখনো চোখে জল আসে। কি যে ভাবেন উনি জানি না,—বুঝতে পারি না। শিশুর মতো অসহায় দৃষ্টিও দেখতে পাই ওঁর চোখে। আজ সারাদিনে কথা মোটেও বলেন নি—বলবার শক্তিও যেন নেই। অল্প অল্প জল, ফলের রস খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তাররা একটু ভাবিত। অন্য কোনও উপসর্গ আছে কি না ধরতে পারছেন না। সারাদিন ডাক্তারদের আনাগোনা বুদ্ধি পরামর্শ ফিস্‌ফাস্ চলেইছে। যেতে আসতে কানে কিছু কিছু কথা আস্‌ছে। আমাদেরও ভয় ভাবনা হচ্ছে॥

২রা—

কাল রাতটা নানা রকম ভয় ভাবনাতেই কেটেছে। গুরুদেব কেমন যেন বেহুঁস হয়ে ছিলেন। থেকে থেকে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করেছেন। আজ সকালেও তাই—তবে মাথাটা একটু পরিষ্কার। কথাও দু-চারটে যা বলেছেন— পরিষ্কার। কিছু খাওয়াতে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, বলেন, "আঃ, আমাকে আর জ্বালাস্ নে তোরা।" আজ ওঁর মুখের দু-চারটে এ রকম কথা শুনেও ভালো লাগছে। এ দু-দিন যেন দম্ আট্‌কে ছিলুম সবাই। সকালে গুরুদেব দু-এক বার 'উঃ উঃ' শব্দ করতে—আমি তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলুম, "কি কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার?" তিনি বললেন, "কি—কি করতে পারবে তুমি? চুপ ক'রে থাক।" এক জন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার?" গুরুদেব স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, "এর কি কোন বর্ণনা আছে?"

দুপুর থেকে আবার কেমন বেহুঁস হয়ে পড়েন—সারা রাত তেমনিই কাটে। বিধানবাবু* এসেছিলেন। গুরুদেবের খুব হিক্কা হচ্ছে, মাঝে মাঝে কাশিও আছে॥

৩রা—

সকালে শান্তিনিকেতনে ফোন করা হয় বোঠানকে† আসবার জন্য। কাল সারা রাতে গুরুদেবের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক ছিল। আজ সকালে গুরুদেব একটু ভালো— মানে দু-একটা কথাবার্ত্তা কইছেন—ওষুধ বা কিছু খাওয়াতে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। দুপুর থেকে আবার অন্য দিনের মত বেহুঁস হয়ে পড়েন।

সন্ধ্যের গাড়ীতে শান্তিনিকেতনের ডাক্তারবাবু‡ ও কৃষ্ণ[১] বোঠানকে নিয়ে এলেন। বোঠানের অবস্থাও খুব খারাপ। রাতটা গুরুদেবের ভালো কাটে নি।

৪ঠা—

আজ সকালে অল্পক্ষণের জন্য গুরুদেব একটু কথাবার্ত্তা বলেছেন। ডাকলে বা খেতে বললে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু বেশী কিছু নয়। সকালে যখন কফি খাওয়াই— গুরুদেব বারে বারে বলছিলেন "গিলে ফেলব যে—গিলে

* শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়

† শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী

‡ শান্তিনিকেতনের ডাক্তার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী

ফেলব যে।" মনে হ'ল বুঝি বা দাঁতের কথা বলছেন। বাঁধানো দু-পাটি দাঁত খুলে নিয়ে বললুম, "এবারে কিছু গিলে ফেলবার ভয় নেই—কফিটুকু খেয়ে নিন্।" আস্তে আস্তে 'ফিডিং কাপে' ক'রে কফি ঢেলে দিলুম—বেশ কয়েক আউন্স কফি খেলেন।

বোঠান এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন—মনে হ'ল যেন বুঝতে পেরেছেন। একবার চোখ দু'টি জোর করে টেনে বোঠানের দিকে তাকালেন—আর মাথা নাড়লেন।

ডাক্তাররা দু-বেলাই আসছেন যাচ্ছেন। দু-তিন জন ডাক্তার তো দিনরাত বাড়ীতেই থাকছেন। রাত্তিরে একবার খুব ভয় হয়—সাড়েদশটার সময় ইন্দুবাবুকে* ফোন ক'রে আনানো হয়। ওষুধপত্র সবই তো নিয়ম মতো পড়ছে কিন্তু রোগের উপশম কই? রোজই কিছু না কিছু একটা নতুন উপসর্গ জুটছে। জরও বেড়েই চলেছে রোজ—ক্রমেই দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ছেন। রাত এগারটার সময় একবার ডানহাতটি তুলে আঙ্গুল ঘুরিয়ে আবছা স্বরে বললেন, "কি হবে কিছু বুঝতে পারছি নে—কি হবে—?" ঐ পর্য্যন্তই। তার পর সারারাত্রে আর কোনও কথা নেই॥

৫ই—

আজও গুরুদেব সারাদিন সেই রকম বেহুঁস অবস্থায় আছেন। সন্ধ্যেতে স্যর নীলরতনকে নিয়ে বিধানবাবু এলেন। গুরুদেবকে আজ আর ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। স্যর নীলরতন গুরুদেবের পাশে ব'সে সব দেখলেন, শুনলেন। যতক্ষণ কাছে ছিলেন গুরুদেবের হাতে হাত বুলোচ্ছিলেন। যাবার সময়ে গুরুদেবের শিয়রের কাছে ব'সে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, গুরুদেবকে আবার খানিক দেখলেন—তার পর চলে গেলেন। কি তাঁর মনে ছিল—কে জানে। কিন্তু তাঁর গুরুদেবকে যাবার সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখবার ভঙ্গীটির মানে যেন সুস্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে।

রাত্রে স্যালাইন দেওয়া হয়—অক্সিজেনও আনিয়ে রাখা হয়েছিল। নাকটি কেমন যেন বাঁ-দিকে হেলে গেছে, গাল দু'টো ফুলেছে, বাঁ চোখটা ছোট ও লাল হয়ে গেছে। পায়ের আঙ্গুলে ও হাতের আঙ্গুলে ঘাম ঘাম মনে হয়। ললিতবাবু আজ অপারেশনের একটা সেলাই খুলে দিয়ে গেছেন।

৬ই—

আজ সকাল থেকে বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। কয় দিন থেকেই অবশ্য লোকজনের ভীড় চলছিল—কিন্তু আজ যেন আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কাউকেই। আজ আবার পূর্ণিমা—আজকের দিনটা যদি কোন রকম ক'রে কাটে তবে হয়তো একটু ভরসা পাওয়া যাবে, কিন্তু ভরসাই যে কম। আজ এক একবার খুব জোরে কেশে উঠছেন—হিক্কাও সমানে চলেছে। কাল তো এক একবার হিক্কা আধ ঘণ্টার উপরে ছিল। আজ আর গুরুদেবের কোনও সাড়াশব্দ নেই। বোঠান একবার সকালে গুরুদেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে "বাবামশায়—বাবামশায়" ব'লে ডাকতে একবার "এ্যাঁ" বলে তাকালেন। মনে হ'ল যেন বুঝেছেন, কিন্তু কিছু প্রকাশ করতে পারছেন না। দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে। কাল রাত থেকে অনেক সময়ে তাকিয়ে থাকেন, কোথায় তাকিয়ে আছেন বোঝা যায় না। দেখলে ভয় করে। এক একবার ভুরু কুচকে থাকেন—সেটা ব্যথার জন্য বা আর কিছু—কি ক'রে বলি। এখন দুপুর বারোটা বেজেছে—এখনও সেই একই অবস্থা। মুখে জল বা ফলের রস যা দেওয়া হচ্ছে—গিলছেন ঠিকই কিন্তু বেশী দিতে ভয় হয় কখন হিক্কা উঠবে আর বিষম লাগবে। কাশিটাতেও কষ্ট পাচ্ছেন খুব। কিসে যে কষ্ট পাচ্ছেন না—তা-ই বলা শক্ত।

বিকেলও কাটলো ঐ ভাবেই। সন্ধ্যেতে অনেকেই গুরুদেবের ঘরে এসে তাঁকে দেখে যেতে লাগলেন। গুরুদেবের দিদি বর্ণকুমারী দেবী ভাইকে দেখতে এলেন। রাত্রে এখানেই রইলেন—একবার ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে আসেন ভাইকে দেখতে—সামনে আর আসতে পারেন না—মাথার কাছ থেকেই ফিরে যান—মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য। চারিদিক নিস্তব্ধ—পূবের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—গুরুদেবের ঘর থেকে বরাবর দেখা যায়। রাত বারোটায় একবার অবস্থা খুব খারাপের দিকে যায়—আবার খানিক বাদে ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন। প্রতি নিঃশ্বাসে ঘড় ঘড় আওয়াজ।

৭ই—

ভোর চারটে থেকে মোটরের আনাগোনা—এক এক ক'রে নিকট আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সব আসতে লাগলেন।

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে এলো। অমিয়াদি* নতুন গাছের চাঁপাফুল অঞ্জলি ভরে এনে দিলেন।

* শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু

* ঠাকুরবাড়ীর শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী

শাদা শাল দিয়ে ঢাকা গুরুদেবের পা দুখানির উপর ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলুম। তাঁর মুখের রঙে চাঁপার রঙে যেন মিশে গেল। বেলা সাতটার সময় রামানন্দ বাবু গুরুদেবের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করলেন। শাস্ত্রীমশায়* পায়ের কাছে ব'সে মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ—এ মন্ত্র আমরা গুরুদেবের মুখে কত বার শুনেছি—বাইরের বারান্দায় আস্তে আস্তে কে যেন গান করছিলেন। চেষ্টা করেও নিজেকে সামলে রাখা যাচ্ছিল না। নয়টার সময় অক্সিজেন দেওয়া সুরু হ'ল। নিঃশ্বাস সেই ভাবেই পড়তে লাগলো। কিন্তু এখন আর তাতে আওয়াজ নেই, কিছু ক্ষীণ শব্দ নিঃশ্বাসে। সেই ক্ষীণ শব্দ ক্ষীণ হ'তে হ'তে বেলা দ্বিপ্রহরে বারোটা দশ মিনিটে আমাদের গুরুদেবের শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

বাইরের জনতার ভীষণ কোলাহল—তারা গুরুদেবকে দেখবার জন্য অস্থির। অমিতাদি†, বুড়ী‡ আমরা সকলে মিলে গুরুদেবকে শাদা বেনারসী জোড় পরিয়ে ভালো করে সাজিয়ে দিলুম। কোচানো ধুতিটি, গরদের পাঞ্জাবী, পাটকরা চাদরটি গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো—কপালে চন্দন, গলায় ফুলের মালা, দু পাশে শাদা ফুলের রাশি—বুকের উপর হাতের মাঝে একটি পদ্মের কুঁড়ি গুঁজে দিলুম। দেখে মনে হ'তে লাগলো 'রাজবেশে রাজকীয় ভাবে রাজা ঘুমোচ্ছেন। সে কী শোভা—কিছু ক্ষণের জন্য সব শোকতাপ ভুলে সেই শোভায় তন্ময় হয়ে রইলুম, লোকজনরা এসে তাঁর পায়ে প্রণাম ক'রে যেতে লাগলো। এক দিকে গান হ'তে লাগলো। তিনটে বাজতে হঠাৎ এক সময়ে তাঁকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল।

উপর থেকে দেখলুম।—জনস্রোতের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকো হুহু ক'রে নিমেষে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

রাত আটটা বেজেছে, প্রতিপদের চাঁদের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। বাড়ী—নীরব, নিস্তব্ধ। ভিতর বাহির খাঁ খাঁ করছে। বজ্রাহতের মতো বসে আছি, আর এই হাত দু'খানি বারে বারে মাথায় ঠেকাচ্ছি। এই হাতেই যে তাঁর সেবা ক'রে ধন্য হয়েছি!

* শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী
† ঠাকুরবাড়ীর শ্রীযুক্তা অমিতা দেবী
‡ কবির নাৎনী শ্রীযুক্তা নন্দিতা কৃপালনী

আলোর আভাস

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

তখনও ফোটে নি উষার আলোক,
আঁধার পূর্ব্ব দিক;
শেষ কি মধ্য রাত্রি তখন
কিছুই হয় না ঠিক।
সহসা শালিক আমের গাছেতে
ছাড়িল একটি বুলি;
আমি ভাবি বুঝি ঘুমের মাঝারে
ওঠে কল্লোল তুলি'।

কিন্তু এ কি এ!—কিছু পরে ঐ
পূরব ফর্সা হয়।
চেয়ে চেয়ে সেই আলোকের পানে
লাগে বড় বিস্ময়।—
ঐ যে শালিক গাছের আড়ালে
কেমনে ও মনে মনে
উষার আলোর চরণের ধ্বনি
নিয়ত চকিতে শোনে?

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীনন্দলাল বসু

অবনীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তাঁর শিষ্য বললে ঠিক্ বোঝাবে না। শিল্পের ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাণের যোগে তাঁর পুত্রস্থানীয় হয়েছি। উত্তরাধিকারী হিসাবে অবিনশ্বর সম্পদ পেয়েছি। পূজনীয় গুরুদেব এক সময় শান্তিনিকেতনের জন্যে অবনীবাবুর কাছ থেকে চেয়ে এনে আমায় আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। আজ তিনি আশ্রমে স্থূল দেহে বর্তমান নেই; তাঁর প্রেরণা ও আদর্শ আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের সেবার কাজ এখনো শেষ হয় নি। আমরা আজ নববলে বলীয়ান্ হয়ে তাঁর এই আশ্রমের সেবায় কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করব।

শিল্পগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষ্যে কয়েকটি সমস্যার কথা বলব। গুরু ও শিক্ষক দুটো কথা আছে। গুরু বললে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ সাধারণ গুরু-চেলার সম্বন্ধই তাঁদের মনে পড়ে। গুরু বলি তাঁকে যাঁর আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হই, শুধু তাঁর শিক্ষাদানে নৈপুণ্যের জন্য নয়। শুধু শিল্পের কৌশল শিক্ষা করব, কিন্তু গুরুর আদর্শে শ্রদ্ধা হবে না, গুরুর সঙ্গে প্রাণের যোগ হবে না, এ হলে শেখা ও শেখানো একটা ব্যবসা হ'য়ে দাঁড়ায়। ইুডিও বা ক্লাসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে কিছু শিল্পবিষয়ক কৌশল শিখে চলে গেলাম, শিক্ষককে কিছু পারিশ্রমিক দিলাম, এ যেন হোটেলে এসে কিছু পয়সা ফেলে খেয়ে যাওয়া। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা হয় গুরুশিষ্যের মনের মিলনে, গুরুশিষ্যের প্রাণের যোগে।

গুরু যে পথে নিজে শিল্প ফুটিয়েছেন, সেই পথেই কেবল চলতে হবে, শিষ্যের স্বাধীনতা থাকবে না, তা নয়। গুরু জোর ক'রে শিষ্যের উপর নিজের আদর্শ ও অঙ্কনপদ্ধতি চাপিয়ে দেন না। আমরা আকৃষ্ট হয়েই তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর কাছে প্রেরণা পাই; এতে ব্যক্তিত্ব হারাবার ভয় অমূলক। প্রদীপ জ্বালার দরকার হ'লে আরেকটি দীপ থেকে আলো জেলে নিই; এতে কেউ বলবে না যে, এই আলোটি অমুক আলোর অনুকারী। আলো আলোই থাকবে কিন্তু সেটি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে না। আরেকটি কথা হচ্ছে শ্রদ্ধা। যদি কারও প্রতি কোন কারণে শ্রদ্ধা হারাই, তবে তাঁর গুণ পেতে পারি নে; তাঁর দোষটাই পাই। অশ্রদ্ধার কারণ নিজের অহংকার। প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু শেখার আছে; তবে গুণগ্রাহী ও উদার হওয়া চাই। দোষ দেখার অভ্যাস হলে, 'ক্রিটিক্' হ'য়ে দাঁড়ালে, শিল্পশিক্ষার পথে বড় বাধা। তবে জ্ঞান লাভের জন্য বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। গুরু থেকে প্রেরণা নানা প্রকারে পাই,—কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গ ক'রে বা কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি দে'খে। কিন্তু সাবধান হওয়া চাই যেন কেবল ফ্যাশনের খাতিরে, নাম কেনবার লোভে বা অর্থ উপার্জ্জনের তাগিদে কোনো পদ্ধতি বা আদর্শকে অনুকরণ না করি। আজকাল শিল্পী-গোষ্ঠীর ভেতর মনোমালিন্য ও বিভেদের বিভীষিকা দেখা দিয়েছে। বিভেদের কারণ ঘটে যখন শিল্পের যথার্থ স্বরূপ না জেনে কেবল তার বাহ্যিক আড়ম্বর নিয়ে ভুলি।

প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক দলের বিশেষত্ব থাকবেই, সুতরাং আমার সঙ্গে অমুকের মিল নেই, অতএব সে খারাপ, তা বলা যায় না। পদ্ম ভালো লাগে ব'লে গোলাপের উপর চটে যাওয়া ভালো নয়। গোলাপ নাই বা নিলে? বিশেষ কোনো গোঁড়ামি থাক্‌লেই ঐরূপ চটাচটি হয়। আর একটা কারণ হ'ল হাম্-বড়া ও সবজান্তা ভাব। নাম ও অর্থের জন্য কাড়াকাড়িতে বিভেদ বেড়ে চলে। শিল্পী নিজের শিল্প-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্ হ'লে এসব তুচ্ছ কারণে কোনো বিভেদ ঘটতে পারবে না।

অনেকে ভাবছেন আজ কোন্ পথে যাই, কোন্ বিষয় ধরি। এত দিন তো অবনীবাবুর পদ্ধতি ও বিষয় নিয়ে চললাম; এখন একটা নূতন পদ্ধতি ও বিষয় না হ'লে বাজারে আর্টিস্ট ব'লে নাম রাখা দায়। কেবল পদ্ধতি ও বিষয় পাগলেই খোঁজে। কোথায় যাব ঠিক্ নেই, পথ পথ ক'রে অস্থির। এর কারণ হ'ল—যথার্থ শিল্পপ্রেরণার অভাব, কোনো কিছুর প্রতিই অন্তরের আকর্ষণ না থাকা। ফলে ফ্যাশন ও লোকদেখানই সার হয়। যা জানি না, যা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধ, তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই ভাল।

অহমিকা, হিংসা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানের বশে যেন অমূল্য রত্ন হেলায় না হারাই। যাঁরা মহাগুণী ও দ্রষ্টা-শিল্পী হয়ে গেছেন ও আছেন, আজ তাঁদের কাছে প্রার্থনা তাঁদের আশীর্বাদে আমরা যেন মনের দৈন্য ও অহঙ্কার দূর ক'রে নিজের নিজের পথে শিল্পের সাধনায় অগ্রসর হ'তে পারি ও অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করতে পারি।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
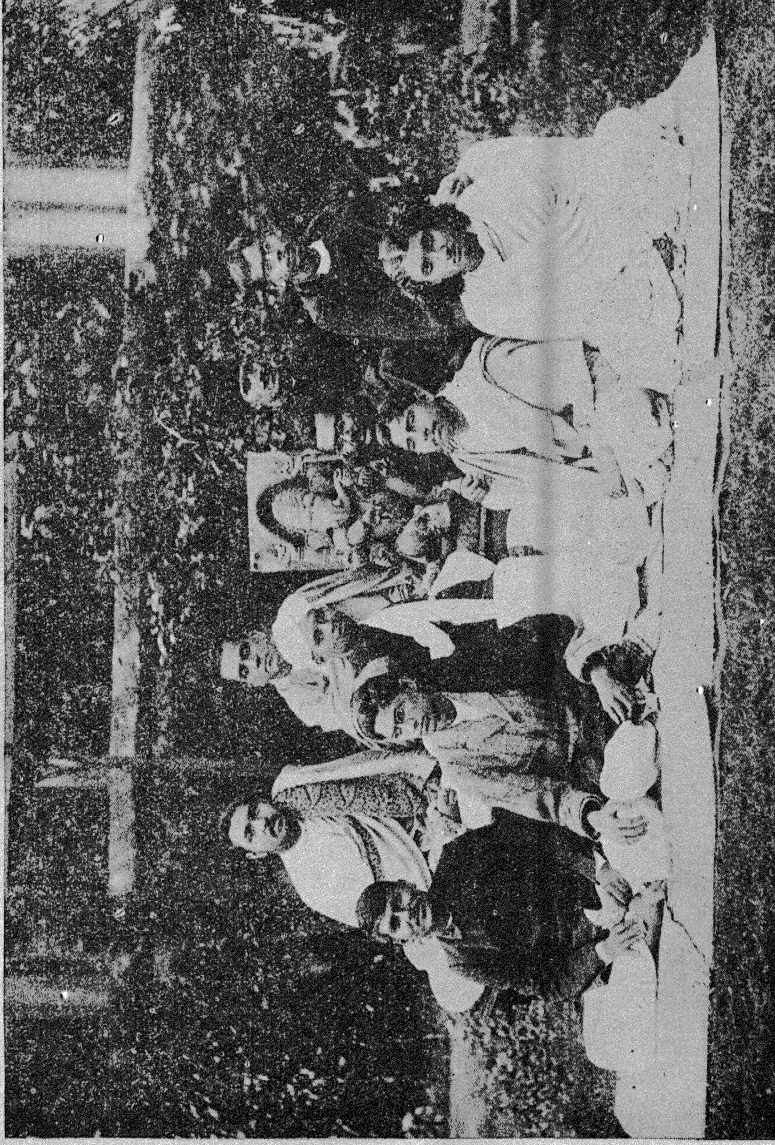
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ

পশ্চাতে বাম দিক হইতে—সত্যেন দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ, হাকিম খাঁ, স্থরেন কর, বেঙ্কটাপ্পা, নন্দলাল বসু

সম্মুখে বাম দিক হইতে—দুর্গেশ সিংহ, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ*

শ্রীমণি বর্দ্ধন

জাতি যখন স্বকীয়তা হারিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপ করতে বসে, রুচিরসবোধ যখন পঙ্কিল হয়ে গতিহীন হবার উপক্রম হয়, চিন্তা ও ভাব-দুর্গতের দৈন্য যখন জাতিকে অসহায় ক'রে তোলে, জাতির সেই মৃত্যুক্ষণে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের এমনি দুর্দ্দিনে যাঁরা জন্ম নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই এক জন। শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, তাঁর দান ভারতকে জগৎসমক্ষে উন্নীত করেছে।

শুধু দর্শন, কাব্য, সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয় এমন কি নৃত্যকলা-ক্ষেত্রেও ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনঃপ্রচলনের জন্য তিনিই প্রথম উদ্যোগী হন। দেশবাসী কিন্তু সেদিন এই সত্যসুন্দরের সাধনায় এই একনিষ্ঠ সাধককে শ্লেষে, বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে ছাড়েন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সুন্দরের মাহাত্ম্য এক দিন দেশবাসী স্বীকার করবেই, তাই এই সুন্দরের পূজারীর সুন্দরের সাধনা যাত্রাপথে সেদিন গতি হারায় নি। দেশের পক্ষে, শুধু দেশের পক্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বের নৃত্যজগতের পক্ষে বিধাতার এই যে কি আশীর্ব্বাদ, তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মত রুচিরসবোধ আমাদের আজও জেগেছে কি না সন্দেহ।

প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতকেই কত দূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল তা নাট্যশাস্ত্র দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নানা দৈবদুর্বিপাকে যুগধর্ম্মের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে দেশে সেই প্রাচীন নৃত্যকলারই অবশিষ্ট রইল শুধু বাইজীর শৃঙ্গার-রসাত্মক অশ্লীল গ্রীবা, অক্ষিপুটতারকা ও কটিকর্ম্মে এবং বিভিন্ন প্রদেশের রঙ্গমঞ্চে ও যাত্রার আসরের জাতীয় বিজাতীয় নৃত্য-সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত নৃত্যপদ্ধতি, যার ফলে দেশের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় নৃত্যকলাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল। রঙ্গমঞ্চের প্রমোদকক্ষে নৃত্য তখন "ঠুন ঠুন পিয়ালা" ইত্যাদি গানের সঙ্গে সুরাপায়ীর দৃশ্যে চিত্তবিনোদনের উপায়রূপে আবদ্ধ। নৃত্যে যে সত্যসুন্দরের অভিব্যঞ্জনাও সম্ভব, দেশবাসী তা ভুলেই গেল।

সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনেই প্রথম নৃত্যকলার এই মর্ম্মন্তুদ পরিণতি নির্ম্মম হয়ে বেজে উঠল। তাই দেশবাসীর বিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে, নৃত্যশিল্পে পুনর্জাগরণের জন্য যত্নবান হলেন এবং তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চ্চা ব্যবস্থায় তৎপর হলেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, কর্ম্মোদ্যম ও অধ্যবসায়ের স্পর্শে মৃতপ্রায় নৃত্যকলায় জাগরণের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হ'ল। আজ যে-দেশে ভদ্র-বিজ্ঞ-জ্ঞানী-সজ্জন সকলেরই নৃত্যকলার প্রতি পূর্ব্বের সেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব বিদূরিত হয়েছে এবং ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৃত্যচর্চ্চার এ 'দুঃসাহস' জেগেছে, এর মূলেই কি রবীন্দ্রনাথের উদ্যম প্রচেষ্টাই নয়?

উনবিংশ শতকের শেষাংশে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা-পদ্ধতি বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন রূপে প্রায় (অশিক্ষিত?) নিরক্ষর মুষ্টিমেয় লোকের চর্চ্চার মধ্যে কোন প্রকারে বেঁচে ছিল। কিন্তু প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতি ও রূপের পূর্ণ রূপ কোথাও ছিল না। 'কথাকলি' নৃত্যে তখন মুদ্রা, অভিনয়ে আংশিক রূপবন্ধ ও রীতি প্রাধান্য লাভ করেছে; দক্ষিণী নৃত্য অঙ্গহার করণ, চারী, বর্ত্তনা প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত; কথক নৃত্য তাল-লয়ের সূক্ষ্ম বিভাগের সুদীর্ঘ "চক্রদার বোলের" সমষ্টি এবং মণিপুরী নৃত্য গমক-মীর-প্রধান দেহকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তার কারণ এই নৃত্যচর্চ্চা এ দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত না থেকে, যেহেতু শুধু মুষ্টিমেয় ধর্ম্মপ্রাণ নৃত্যরসিকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল সেজন্যই শিল্পীদের সেই প্রাদেশিক ধর্ম্ম, তদুপরি দেশের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবে নব রসের মাঝে দু-চারটি রসব্যঞ্জনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণী নৃত্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেশের—তাই বীর-রৌদ্ররসমূলক দেহকর্ম্মই তাদের নৃত্যের প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল; তেমনি মণিপুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের দেশের ব'লে শিল্পীর শুধু শান্ত-ভক্তি-রস-ব্যঞ্জনার সহায়ক দেহকর্ম্ম করণ অঙ্গহার গ্রহণ করেছিল। এমনি ক'রে কথাকলি, কথক প্রভৃতি নৃত্যে বিভেদ ও অপূর্ণতা এসে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করল এবং বংশপরম্পরায় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে নৃত্যকলা স্পন্দনহীন,

বৈচিত্র্যহীন, মৃত-প্রায় হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শুদ্ধ নামাবরণের ক্ষীণ গতানুগতিকের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে নৃত্যকলাকে সংমিশ্রণ-নৈপুণ্যে প্রাণবান ক'রে মুক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত প্রত্যেক প্রাদেশিক নৃত্যপদ্ধতিতে, যেহেতু নব রসের পূর্ণ ব্যঞ্জনা সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্নধর্ম্মী, এই নৃত্যে নব রসের পূর্ণ ব্যঞ্জনার জন্য কোন এক বিশেষ পদ্ধতিকে আঁকড়ে না থেকে, রসভাব-প্রকাশ-উপযোগী বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব নৃত্যরীতির স্থষ্টি করলেন। ভারতের শিল্পীর দীর্ঘকালাচরিত নৃত্যপদ্ধতির অবিমিশ্র শুদ্ধতার মোহে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নৃত্যপদ্ধতির শুদ্ধতার ও অবিমিশ্রতার চেয়ে নৃত্যে রসের প্রাধান্য দিলেন। নৃত্যে রসভাব ব্যঞ্জনার পূর্ণতার জন্য যদি বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণের প্রয়োজন হয় তা দোষাবহ নহে এবং এই প্রকার নৃত্যসংমিশ্রণ যে অপরিহার্য্য এ কথা তিনি দেশবাসীকে শেখালেন। যেমন সমষ্টিগত শব্দযোজনায় যখন কোন ভাব প্রকাশ পায় তখনই হয় শব্দের সার্থকতা, তেমনি বিভিন্ন নৃত্যকর্ম্মের সহায়তায় কোন ভাব যখন পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখনই হয় নৃত্য রূপবন্ধের সার্থকতা। নৃত্যের উদ্দেশ্য, নৃত্যরীতি-পদ্ধতিজ্ঞানের অবিমিশ্রতা প্রদর্শন করাই নয়—রস স্থষ্টি করা—নৃত্যকর্ম্ম নৃত্যপদ্ধতি ও রীতি রসস্থষ্টির বাহন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মনেই প্রথম জাগল, নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রথম প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত—দীর্ঘযুগ-অবজ্ঞাত নৃত্যকলার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করা এবং সেজন্য নৃত্যকে যুগোপযোগী করে গড়তে হবে নূতন ভাবসম্পদের নব ব্যঞ্জনায়। যে-শিল্পকলা দীর্ঘকাল দেশবাসীর অশ্রদ্ধার চাপে ক্ষীণপ্রাণ, সেই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তখনই যখন অশ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে দেশবাসী তাকে সশ্রদ্ধভাবে দেখতে পারবে। অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা রসানুভূতির প্রধান অন্তরায়।

তাই রবীন্দ্রনাথ নূতন নৃত্যনাট্যের রচনা করলেন, সেই নাট্যোপযোগী নূতন গান লিখলেন, এবং আধুনিক রুচিসম্মত ব্যঞ্জনায় ও প্রকাশভঙ্গীতে ক'রে তুললেন তাকে যুগরুচি-অনুকূল। শুধু তাই নয়, অবজ্ঞাত শিল্পের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগাবার জন্যে আপন জন পরিজন সহ নিজে রঙ্গমঞ্চে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হলেন, যা কোন দিন দেশবাসী স্বপ্নেও ভাবে নি। প্রথমে অনেকেই উপহাস করলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কান দেন নি, তিনি জানতেন সুন্দরের মাহাত্ম্য এক দিন এরা স্বীকার করবেই—সুন্দরের সাধনায় কোন হীনতার স্থান নেই। আজ সেই সত্য-সুন্দরের পূজারীর ঐকান্তিক সাধনার বলেই দেশবাসী আপনার হারান সম্পদ আবার ফিরে পেয়েছে। কত যুগের সুকৃতির ফলে বাংলার বুকে এ হেন অদম্য অক্লান্ত সত্যসুন্দরের সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল কে জানে! রবীন্দ্রনাথ যখন নৃত্যাভিনয়ে স্বয়ং ভূমিকা গ্রহণ করতেন, এমন কি নৃত্যাভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীর মত নিজেও তাঁহার দেহ নৃত্যচ্ছন্দে দোলায়িত করতেন, তখন তাঁহার বয়স ষাটের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যে-বয়সে এ দেশের লোক স্থবির হয়ে পড়ে, সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের শৈথিল্য অবসাদ নেমে আসে। কিন্তু এ বয়সেও নৃত্যে পর্য্যন্ত তিনি ভূমিকা গ্রহণ করলেন, শুধু আত্মবিস্মৃত, আত্মবঞ্চিত দেশবাসী যদি তার হারান সম্পদ আবার ফিরে পায় এই আশায়। তিনি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। অযথা বাহ্যিক আড়ম্বরে মগ্ন দেশবাসীর ভাব ও রুচিরসের দৈন্য যে তাদের আজ অসহায় ক'রে তুলেছে তাই কি তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করত? তাই কি তিনি দেশবাসীর রুচিরসবোধ জাগাবার জন্য দেশবাসীর শ্লেষ বিদ্রূপ উপেক্ষা করেছিলেন? তাঁর এই রূপস্থষ্টিকে কেউ কেউ অশ্রদ্ধা করলেও তিনি কিন্তু সমগ্র দেশকে ভালবেসেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ বোধ হয় অবান্তর হবে না। কলকাতারই এক রঙ্গমঞ্চে কবিগুরু আপন জন পরিজন ছাত্রছাত্রীসহ কোন এক নৃত্যাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। অগণিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আমার এক সম্ভ্রান্ত জনৈক বন্ধু অভিনয় দেখতে দেখতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চেরই এক স্বনামখ্যাত অভিনেতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কেমন লাগছে?" অভিনয়ের অজস্র সুখ্যাতি করার পরে বিশেষ ক'রে সেই অভিনেতা বললেন, "এ অভিনয়ে এরূপ পূর্ণব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, কারণ প্রথমতঃ কবিগুরু নিজে এদের পরিচালনা করছেন; দ্বিতীয়ত, সুশিক্ষিতা ভদ্রপরিবারের যে মেয়েদের নিয়ে এ রূপদান করেছেন, যে কারণে পূর্ণরূপব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, তা শুধু এ জন্যই সম্ভব হয়েছে যে কবিগুরু নিজেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভদ্রপরিবারের সুশিক্ষিতা মহিলাদের সাহায্য রঙ্গমঞ্চে আমাদের পক্ষে পাওয়ার আশা শুধু দুরাশাই নয়—দুঃসাহস। আমাদের পক্ষে প্রতিদিন এমন কল্পনা করা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ ব'লে দেশবাসী ভাবতেন। কবিগুরুর ব্যক্তিত্বের জন্যই আজ ইহা সম্ভব হয়েছে। শুধু এই নয়, আমাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লে এদের

ভদ্রস্থ রাখা সম্ভব হয়তো হত না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকায় আছেন ব'লে দেশবাসী মুখ ফুটে বিরুদ্ধাচরণ করছে না, নইলে—। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের বজ্রাবরণ।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভদ্রপরিবারের ছেলেমেয়ে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন বলেই অপাংক্তেয় নৃত্য পাংক্তেয় হ'ল। দীর্ঘ যুগের অবজ্ঞাত নৃত্যকলার প্রতি আবার দেশের শ্রদ্ধা জাগলো। ভদ্র ঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্যচর্চ্চা সুরু হ'ল, অতিবড় রক্ষণশীল অভিভাবকও রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর প্রবর্ত্তিত নৃত্যচর্চ্চায় বাদ সাধলেন না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে ইহাই প্রথম সূচনা। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শ্রদ্ধা জাগালেন, তাঁরই গড়া ভিত্তিতে এসে অন্যান্য ভদ্র শিল্পী নৃত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ভারতের নৃত্যকলা শুধু প্রাণ ফিরে পেল তাই নয় ধন্য হয়ে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল।

বিশ্বের নৃত্যভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দানপ্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর নৃত্যনাট্যের উল্লেখ করতে হয়। শিল্পী কবির ঐকান্তিক চেষ্টায় নৃত্যনাট্যেই প্রথম আত্মবিস্মৃত দেশবাসী বুঝতে শিখল যে নৃত্যের দেহরেখায় নৃত্যের ভাব রূপ রসও অপরূপ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হ'তে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে বা পূর্ব্বে যে ভারতে নৃত্যনাট্যের অস্তিত্বই ছিল না তা নয়। নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) নৃত্যনাট্যের পূর্ণবিকাশই লাভ করেছিল, যার আংশিক রীতি-পদ্ধতি দক্ষিণ ভারতে—বিশেষতঃ কথাকলি নৃত্যের অযথা আহার্য্য-অভিনয়ের আড়ম্বরের মধ্যে রক্ষিত ছিল। মুষ্টিমেয় নৃত্যরসিকমধ্যে চর্চ্চা হচ্ছিল। আর ছিল নৃত্যনাট্যের প্রচলন আসাম অঞ্চলে মণিপুরে ঠাকুরঘরের সম্মুখে রাজানুগ্রহে বিশেষ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়ক লীলাভিনয়ে। যদিও কথক শিল্পী বলেন যে কথক ও নৃত্যাভিনয় ছিল কিন্তু একই শিল্পী রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ ক'রে রূপব্যঞ্জনা দিতেন ব'লে তাকে নৃত্যনাট্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আমাদের আলোচ্য কালে কথকের এই নৃত্যাভিনয় আমরা "বাইজী"দের মধ্যেই ভাও বাৎলানে দেখতে পাই। কিন্তু উপরোক্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই যেহেতু প্রায় নিরক্ষর শিল্পীদের মধ্যেই নৃত্য আবদ্ধ ছিল, সেজন্য তাতে যুগোপযোগী রুচিসম্মত ভাবসম্পদ ও রূপরস পরিবেশনের ধারা সুমার্জ্জিত ছিল না। এমন কি নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত সম্পর্কেও শিল্পীর ঔদাসীন্য নৃত্যের ভাবব্যঞ্জনার পূর্ণতা লাভের অন্তরায় ছিল। কথক নৃত্য তখন চলেছে একঘেয়ে "লহরা"র সঙ্গে সম ফাঁকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে; কথাকলি নৃত্যে তখন কর্ণাটক রাজ্যের নৃত্যের ভাবসম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধবিবর্জ্জিত একঘেয়ে শ্লোকম্ পদম্-এর সঙ্গে রূপায়নের চেষ্টা চলেছে—মণিপুরে নৃত্যনাট্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, নূতন ভাবসম্পদ যোজনার চেষ্টা নেই, মুখমণ্ডলে কোন ব্যঞ্জনা নেই, কারণ ঠাকুরঘরের সম্মুখে ভক্তিরসাত্মক নৃত্যের বিধান, এবং নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত বলতে শুধু কীর্ত্তনই প্রচলিত। এবং ভারতের নৃত্যকলা গতানুগতিকের বদ্ধ আবহাওয়ায়, মরণের ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যানুরাগ নৃত্যকে নূতন রূপে পরিবেশন ক'রে প্রাণবন্ত ক'রে তুললে। তিনি একের পর একটি নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করে চললেন, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। যে মণিপুরী নৃত্যের কথাকলি-নৃত্যের একঘেয়েমি মনে অবসাদ আনত, রবীন্দ্রনাথের সেই মণিপুরী কথাকলি রীতিপদ্ধতি রূপবন্ধই তার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংমিশ্রণের অভিনবত্বে ও স্বকীয়তায় দেশবাসীর চোখের সম্মুখে অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠলো।

নৃত্যসংগঠননৈপুণ্যে, সঙ্গীতরচনাকৌশলে, সুরসংযোজনার কৃতিত্বে, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্য্যে রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট নূতন নৃত্যনাট্য বিশ্বের নৃত্য-জগতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। নৃত্যানুষঙ্গিক আবহসঙ্গীত তিনিই প্রথম রচনা করলেন নৃত্যের ভাব প্রকাশের অনুকূল ক'রে। দেহরেখায়, মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনায়, যে ভাব পূর্ণব্যঞ্জনা পেতে পারে, সেই ভাবটি বজায় রেখে তিনি গান রচনা করলেন, এবং সুরও সেই ভাবরসানুযায়ী সংযোজনা করলেন, ফলে নৃত্যনাট্যের প্রতিটি নৃত্যকর্ম্ম, আঙ্গিক অভিনয়, সুরের প্রতিটি মূর্চ্ছনা, এমন সামঞ্জস্য ও অর্থপূর্ণ হয়েছে যে বিশ্বের নৃত্যজগতে লুপ্তগৌরব ভারতের নৃত্য ভারতীয় নৃত্যেরই সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াল। এ যাবৎ আমরা নৃত্যনাট্যের পূর্ণতার আদর্শরূপে রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যের কথাই ভাবতাম। কলকাতার প্রশংসামুখর প্রেক্ষাগৃহে ব্যালে-শিল্পীসম্প্রদায়ের "লা সিলফাইডিছ" ম্যাজিক ফ্লুট, ঈজিপ্সিয়ান ব্যালে, কার্ণিভ্যাল প্রভৃতি নৃত্যনাট্য দেখে উৎফুল্ল পরিতৃপ্ত মনে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে ঘরে ফিরেছি কিন্তু আনন্দাতিশয্যে আবেগে একটু ধীর ভাবে ভেবে দেখি নি যে এ নৃত্যনাট্যের আবেদন ও পূর্ণতার মূলে রয়েছে তাদের সঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত। আমাদের দেশে তখন মাদলম্, "চণ্ডাই" নয়তো সরেঙ্গী হারমোনিয়াম

সঙ্গে নৃত্য চলছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বুঝলেন এবং দেশবাসীকে বুঝালেন যে, নৃত্যের ভাবসম্পদের পূর্ণ ব্যঞ্জনার পক্ষে আবহাওয়া-উপযোগী নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত অপরিহার্য্য। তিনি নিজেই তাই নৃত্যসঙ্গীত রচনা ক'রে নিজেই সুর সংযোজনা করলেন—ফলে পেলাম, "বাঁধন ছেঁড়া সাধন হবে, ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে" এর মত গান, এখনও চোখে ভাসছে সেই "বাঁধন ছেঁড়া" সঙ্গে হস্ত-চালনায় বিদ্রোহের সেই ভাবটি এবং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধি-লাভের আশার উৎফুল্লতার ব্যঞ্জনা যা শিল্পীদের দেহরেখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠতো। এই পূর্ণরূপ ভাবে ভাষায় সুরে রসে সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ গান, সুর ও পরিচালনা নিজেই করেছিলেন বলেই। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সুরকার ও নৃত্যরসিক। তাই তাঁর সৃষ্টি নৃত্যজগতে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রইল, এমন কি রাশিয়ান ব্যালেকেও কোন কোন বিষয়ে ছাপিয়ে গেল। রাশিয়ান ব্যালে ছিল সুরসঙ্গতিসম্পদে সম্পৎশালী, নইলে নৃত্যরূপরীতি ও রূপ-বন্ধের ব্যঞ্জনায় ভারতীয় নৃত্যরূপবন্ধের তুলনায় নিষ্প্রভ। (অনেকে বলেন যে রাশিয়ান ব্যালের বর্ত্তমান রূপবন্ধের অনেকটাই উদ্ভূত হয়েছিল ভারতীয় নৃত্যরীতি হতেই বৈচিত্র্য সমন্বয়ে। কোন সময়ে ভারতীয় রীতি মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছিল, সেখান থেকে যায় বোখারা ও খিভায়, সেখান থেকে রাশিয়াতে গিয়ে সংগঠনের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে এবং সংমিশ্রণে রাশিয়ান নৃত্যের বর্ত্তমান রূপ পায়) কারণ রাশিয়ান ব্যালেতে নৃত্যকর্ম্ম আয়াসসাধ্য হলেও অর্থহীন, প্রায় ব্যঞ্জনাবিহীন। ভারতীয় নৃত্যকর্ম্মে যেমন সামান্য অঙ্গুলি-সঞ্চালনের "মুদ্রায়" ও ভ্রূকর্ম্মে গ্রীবাকর্ম্মে চরিত্রের যে ইঙ্গিত দেয়, পাশ্চাত্যের নৃত্যকর্ম্মে তেমন কোন নৃত্যকর্ম্ম নেই। সে দেশের দেবদূত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে "পিরোয়েট" ক'রে দাঁড়ায়, আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা দেবদূতের গতিতে স্নিগ্ধতা, ধীর মন্থর ভাব দেখতে পাই না—আবার সেই একই "পিরোয়েট" রূপবন্ধ দেখি শয়তান এবং সামান্য মানব-চরিত্রের ব্যঞ্জনাতেও। আমাদের দেশে কিন্তু মানব-গতি, দেবগতি, অসুরগতি সম্পর্কে চরিত্রানুযায়ী যুক্তিসম্মত কঠোর বিধান ছিল এমন কি চরিত্রানুযায়ী নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীততাললয়াদিরও বিচিত্র বিধান ছিল। রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় নৃত্যকর্ম্মে প্রকাশভঙ্গী ব্যঞ্জনার যোজনা করলেন। যে মণিপুরী নৃত্যে মুখমণ্ডলে কোন ব্যঞ্জনা ছিল না, সেই মণিপুরী নৃত্যই প্রয়োগ ও মিশ্রণ নৈপুণ্যে অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত হয়ে নৃত্যনাট্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতের যে অভাবের জন্য নৃত্যনাট্যের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব ছিল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে অভাব দূর করলো। নাট্যের চরিত্রের সংলাপ পর্য্যন্ত ভাবে ভাষায় সুরে গীত হয়ে অনুপম আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। এমন কি অঙ্গরাগ রূপসজ্জা, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-পটাদির স্থলে বিশেষ প্রতীকাত্মক একটিমাত্র স্বস্তিকাচিহ্নই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির অনেকটা প্রকাশ করলো। এ ভাবেই রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য অনবদ্য হয়ে উঠলো। তবুও আমরা অনেকে বলে থাকি যে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য আর যাই হোক ক্লাসিক নয়। "ক্লাসিক" অর্থে কি বুঝেন তাঁরাই জানেন। তাঁদের মতে, হয়ত আয়াস-সাধ্য নৃত্যকর্ম্মের সমষ্টি, এবং ভাবসম্পদহীন একঘেয়ে হস্তকর্ম্ম-চালনার ক্রিয়া, এবং ক্লাসিক অঙ্গ হিসাবে ঘর্ম্মাক্ত শিল্পীর সমে আসার প্রয়াসে চক্রদার বোলের শেষাংশে সামর্থ্যের অভাবে বিশ্রী মুখভঙ্গীটুকু পর্য্যন্তও (এ ক্ষেত্রে বলা ভাল আমি শুধু তাঁদের কথাই বলছি যাঁরা একমাত্র কথক নৃত্যকেই ক্লাসিক বলতে চান)—গণচিত্ত তাতে রসাস্বাদন করুক আর নাই করুক। রবীন্দ্র-নৃত্যের সহজ স্বচ্ছ সাবলীল গতির অপরাধই হয়ত তাঁদের মতে ক্লাসিক হওয়ার অন্তরায় হয়েছে। তাঁরা মস্ত পণ্ডিত কিন্তু রসিক নন এ কথা বলা চলে এবং রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্যে গণচিত্ত মুগ্ধ পরিতৃপ্ত হয় এবং তাতে মনের ও চোখের খোরাক উভয়ই আছে—এ কথাও কিন্তু স্বীকার্য্য, তাঁদের মতে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য ক্লাসিক হউক আর নাই হউক।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শুধু সাময়িক আনন্দ পরি-বেশনের জন্যই সৃষ্ট হয় নি। তিনি রস ও আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে শ্লেষ বিদ্রূপের নির্ম্মম আঘাতে দেশের সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দেশের লোকের চোখের সামনে ধরে তুলেছেন। কাব্যে শুধু "হিং-টিং ছট"-এর মত কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নি "তাসের দেশে"র মত নৃত্যনাট্যেরও রচনা করেছেন। কৃষ্টি গেল কৃষ্টি গেল বলে কাকে বিদ্রূপ করেছেন দেশবাসী বেশ জানেন—আমার চোখে কিন্তু এখনও ভাসছে হরতনের পাঞ্জা, ইস্কাবনের টেক্কা, রুইতনের গোলামের শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভাবাবেগে, নৃত্যে আনন্দ প্রকাশের প্রচেষ্টা, যা দেখে আমাদের হাস্যোদ্রেক হচ্ছিল। এ বিদ্রূপ কি আমাদের গায়ে লাগে নি, আমরাও তো শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য মনের অজানিতে, সংস্কারাবদ্ধ হওয়ার ফলে, অনেক কিছুই ক'রে থাকি যা সত্যিই হাস্যকর—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্য রচনার ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে আমাদের যে হাস্যোদ্রেক

করেছেন, যখন ভেবে দেখেছি,—বুঝেছি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি অংং জ্ঞানই আমাদের হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়েছে—আমারা হয়ত লজ্জিত হয়েছি। দেশবাসীকে ভালবাসতেন বলেই নৃত্যপরিবেশন ছলেও এ শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন। এখনও হরতনের পাঞ্জা ইস্কাবনের টেক্কা রুইতনের গোলামের সোজা সোজা কার্য্যাকার্য্য অদ্ভুত হস্তপদ চালনা-স্মৃতি আমাদের হাস্যোদ্রেক করে—এই যে অপূর্ব্ব রূপবন্ধের সৃষ্টি তা কথাকলি কথক প্রভৃতি নৃত্যে মিলবে না—এ ছিল কবিগুরুর মনের গড়া। এ বিশেষ হস্তপদের রূপবন্ধ দ্বারা ঠিক এমন রূপটি বিশুদ্ধ ঘরয়ানা নৃত্যের রীতি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ সম্ভব হ'ত কি? নৃত্যের সংমিশ্রণ সম্পর্কেও বলা চলে যে কবিগুরুর রসবোধের সূক্ষ্মতার জন্য তাঁর মিশ্রণ আমাদের এত মুগ্ধ করে রাখতো যে কখন কোন্ নৃত্যরীতির মিশ্রণ কোথায় হ'ল আমরা ভাববার অবকাশই পেতাম না। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে তিনি কাণ্ডী নৃত্যের পরিবেশন করলেন; কিন্তু মণিপুরী কথাকলি পদ্ধতির সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে গেল, অনেকের চোখেই ধরা পড়ল না। তিনি কিন্তু ঠিক জায়গাতেই মিশ্রণ করলেন। নায়িকার মন যখন বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দকে পাবার জন্যে উন্মুখ, সে সময়ে বশীকরণ মন্ত্রে মায়ের প্রতিশ্রুতিতে সে করলো আনন্দে নৃত্য, তার দেহরেখায় কিন্তু মনের স্বার্থপরতার তামসিক ভাবের ব্যঞ্জনাই ফুটে উঠল, কাণ্ডী নৃত্যের রীতি দেহভঙ্গীতে—উদ্দাম ভাবে। যথাস্থানে এমন প্রয়োগ অন্য দ্বারা সম্ভব হ'ত না। "শাপমোচনে"র নৃত্যের তালভঙ্গের অপরাধে ইন্দ্রের, যক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদানকালীন হস্তের দৃঢ় ব্যঞ্জনাত্মক নির্দ্দেশ থেকে—শেষ অবধি সঙ্গতিপূর্ণ নৃত্যাভিনয় দর্শন কালে আমার জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধু কোন এক বিদেশীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনয়ের মর্ম্মার্থ বুঝিয়ে দেবার সময়ে সেই বিদেশী ভদ্রলোক নাকি বলেছিলেন যে তিনি বাংলা ভাষা না জানলেও গানের এবং অভিনয়ের মর্ম্মার্থ নৃত্যাভিনয়েই স্পষ্ট অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ক্ষেত্রেই কি বুঝা যায় না, যে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রকাশ প্রয়োগনৈপুণ্যের জন্য আবেদন কত ব্যাপক ছিল? একথা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সমস্ত প্রযোজনা সম্পর্কেও বলা চলে। তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যই নয়—তাঁর শেখাবার ক্ষমতাও যে কত ছিল, আমাদের অনেকেরই সে ধারণা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার নৈপুণ্য অনুমিত হবে।—আমার জাপানী বন্ধুবরকে যেদিন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করতে দেখলাম, আমার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না।—উৎসুক হয়ে, এত সহজে এমন নৃত্য কি ক'রে এত অল্প সময়ে সে শিখলে, প্রশ্ন করতেই সে ধীর ভাবে বললো—"Gurudev directed me." অথচ কিছু দিন পূর্ব্বেই এই জাপানী বন্ধুটিকেই আমি ভারতীয় নৃত্য শেখাবার চেষ্টায়, তার অত্যধিক পাশ্চাত্য নৃত্যচর্চ্চার ফলে তার দেহে নমনীয়তার অভাব দেখে হতাশ হয়ে ভেবেছিলাম আর যাই হোক ভারতীয় নৃত্য আয়ত্তাধীন তার কোন কালেই হবে না। আশ্চর্য্য হয়ে সেদিন ভেবেছিলাম—গুরুদেব কি অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন!

আজ মনে পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে যেদিন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যাই, তিনি স্মিত হাস্যে বললেন বোলপুরে যেও। বোলপুরে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। তিনি কি নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত—আমাকে দেখেই তো তিনি নৃত্য-সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন—অনেক কথাই শুনালেন—আমি কিন্তু ভেবে গিয়েছিলাম অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবো—জিজ্ঞেস করার পূর্ব্বেই তিনি সব বলতে সুরু করলেন; আমি সশ্রদ্ধ ভাবে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। নানা দেশের নৃত্য প্রসঙ্গেও এমন অনেক কথাই শুনলাম যা হয়ত জীবনে শুনতাম না—যখন ফিরে আসি, ভাবতে লাগলাম তিনি কি সবই জানেন।" তাঁর এত সান্নিধ্য ও আন্তরিকতা উৎসাহ পেয়ে খুশী হলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে মণিপুর হ'তে নৃত্য শেখার পর গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে—দেখি সবাই ফিরে আসছে, শুনলাম তিনি অসুস্থ। তবুও গেলাম, দেখা করার অনুমতিও পেলাম। দেখলাম, শান্ত মুখমণ্ডলে একটা ম্লান ছাপ। অবসন্ন দেহ চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ব'সে আছেন। আমাকে পেয়েই সোজা হয়ে বসলেন—মিষ্টি হেসে মণিপুর নৃত্যরীতি প্রসঙ্গে অনেক কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস করলেন এবং দেহমনের অবসাদ নিয়েও এমন ভাবে আলোচনা শুরু করলেন, আমি অবাক্ হয়ে শুধু ভাবলাম যে নৃত্যকে তিনি কত ভালবাসেন। পরে বললেন, 'এবার তোমার নূতন নাচ দেখবো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে কলকাতা আসছেন?' শিশুর মত মিষ্টি হেসে বললেন, "আমি—আমি যখন কলকাতায় যাব, ঠিক জানতে পারবে—আমি কোথাও যখনই যাই ঢাক ঢোল পিটিয়েই যাই।" কবিগুরুর একি অপরূপ রূপ! মনে পড়লো

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নৃত্যবিদ্ মণিবর্দ্ধন

ছেলেবেলার কথা—১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। স্কুল ছুটি হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে করতে গর্ব্ব ক'রে বাড়ী ফিরলাম, তখন জানতাম না রবীন্দ্রনাথ কি! তার পর রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেলাম ছবিতে, তাঁর কাব্যে, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আমার মনে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার রেখাপাত করল। তার পর দর্শনে কাব্যে শিল্পে জগতের মনস্বীদের সম্মান শ্রদ্ধা তিনি পেলেন। বুক ভরে উঠল, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এসে আজ তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। শুধু আমিই নই, ভারতে এমন শিল্পী বোধ হয় কেউ নেই যে তাঁর উৎসাহ, আন্তরিকতা পায় নি। তিনি ছিলেন শিল্পীগুরু, শিল্পীদরদী, শিল্পীর সহায়ক উৎসাহদাতা।

আজ রবীন্দ্রনাথ নেই—শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে তাঁর দান অতুলনীয়। কিন্তু তাঁকে আর আমরা আমাদের মধ্যে পাব না----উপদেশ উৎসাহের জন্য তাঁর সংস্পর্শে আমরা যেতে পারব না---এ কথা মনে হলেই বুক কেমন ক'রে উঠে---বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না যে ভারতের রবি আজ অস্তমিত।

রবীন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

স্মৃতিরে রক্ষিব কোথা? একমাত্র অন্তরের হিমাদ্রিশিখরে
আছে তার গুপ্ত গুহা। সেথা ধ্যানাসনে বসি নিভৃতে
একাকী
দুয়ারে অর্গল রুধি ঘরে ঘরে মোরা আজ যদি ব'সে থাকি,
শুচিশুভ্র মেঘমালা ঘনীভূত হবে সেথা মোদের অন্তরে,
অমল তুষারপুঞ্জে বিরচিবে হে সুন্দর তব মুখচ্ছবি।
বাংলার এ শ্মশানে শিবমূর্তি সম যেন চক্ষে আজি জাগে
শ্বেতশ্মশ্রুজটাধারী চন্দ্রভাল সে আনন, বাম পার্শ্ব ভাগে
কাব্যলক্ষ্মী, শিবের শিবানী সম অর্দ্ধাত্মিকা যিনি তব কবি!
বাহিরে হারায়ে মোরা অন্তরে তোমারে খুঁজি,
হে অন্তরতম।
স্বপ্ন অনুভূতি তব, ভারতের চিরাদর্শ শান্তশিব অদ্বৈতের
ধ্যান,
তোমার জীবনবীণা নানা মীড়ে মূর্চ্ছনায় ছন্দে অনুপম
রটিয়াছে গানে গানে, অতীতের ঋষিমন্ত্র তোমার ব্যাখ্যান
লভিয়া হয়েছে স্বচ্ছ অর্বাচীন অনভিজ্ঞ মোদের নয়নে।
হোক তব স্মৃতিপূজা সে মন্ত্রের মননে ও নিদিধ্যাসনে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে চন্দননগরের স্থান

শ্রীহরিহর শেঠ

যে কাব্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই প্রসাদলব্ধ পাথেয় লইয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংস্কৃতির প্রতীক হইয়াছিলেন, তাহার আরম্ভ যে স্থানে হইয়াছিল বলিয়া তিনি জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতা বা অন্যত্র নহে,—তাহা চন্দননগরের গঙ্গাতীরে এক নিভৃত প্রান্তে। তাঁহার অধ্যাত্ম কবি-প্রতিভার প্রকৃত জন্মক্ষেত্র এই স্থানেই। সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে গঙ্গার আবাল্য উপাসক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে এখানকার গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহারী মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সেও তাঁহার সে স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত যখন প্রথম চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন তখনকার গঙ্গার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি—করুণ দিন রাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেষণ হইয়া থাকে।..."

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গাজলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনও বা ঘন ঘোর বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষায় রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।"*

তখনই তিনি সন্ধ্যা-সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে স্মরণীয় বলিয়া তিনি তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়া গিয়াছেন। উত্তর জীবনে চন্দননগরের পৌরজনের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তাঁহার চন্দননগরে প্রথম বাস প্রসঙ্গে তথাকার শান্ত সুন্দর প্রকৃতির নীরব সম্বর্দ্ধনার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন,—
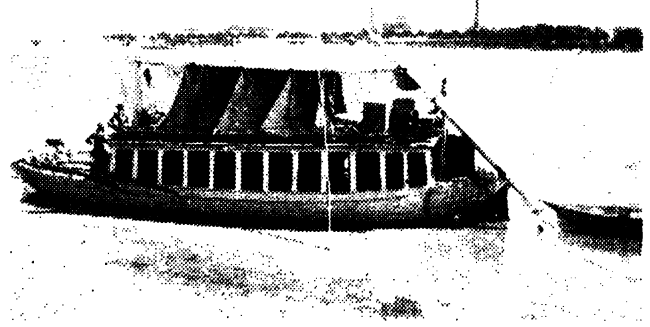
চন্দননগর—গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্রনাথের বজরা

"সে দিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলেম প্রচ্ছন্ন, কোন ব্যক্তি, কোনো দল আমাকে অভ্যর্থনা করে নি। কেবল আদর পেয়েছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে। গঙ্গা তখন পূর্ণ গৌরবে ছিলেন, তাঁর প্রাণধারায় সঙ্কীর্ণতা ঘটে নি; ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামলতায় তাঁর দুই তীরের গ্রামগুলি শান্তি ও সন্তোষের রসে ভরা ছিল। ...আমার অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট মন এখানে এসে মুক্তির অমৃত অঞ্জলি ভ'রে পান করেছে। ..."।†

"সেই অতিথিবৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অবারিত আঙিনায় সে-দিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার বাঁশিটি বাজাও।' বালক সে দাবী মেনেছিল।"†

"ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজত আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি, বড় যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগডালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার

সে ঘর নেই সে বাড়ি আজ লৌহদণ্ড দন্তুর কলের কবলে কবলিত। সে গঙ্গা আজ অবমাননায় সঙ্কুচিত, বন্দী হয়েছে কল-দানবের হাতে—ত্রেতাযুগে জানকী যেমন বন্দী হয়েছিলেন দশমুণ্ডের দুর্গে। দেবী আজ শৃঙ্খলিতা।...†

* জীবনস্মৃতি—১৩৪০ সালের সংস্করণ, ২১৭-১৯ পৃষ্ঠা।
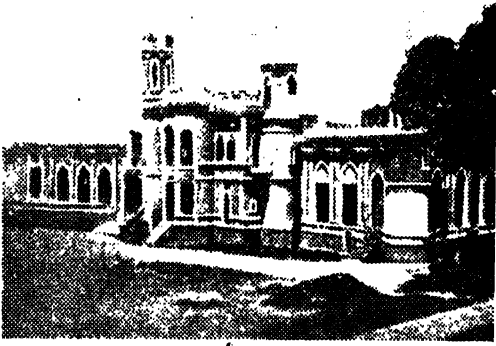
অধুনালুপ্ত মোরাণ্ সাহেবের বাগানবাড়ি—গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। এই স্থানে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সূচনা হইয়াছিল।

"সেই জন্মেই এত ক'রে মনে পড়ে চন্দননগরের গঙ্গার তীর, সেই মোরানের বাগানবাড়ির উপরিতলের খোলা ঘরটি, যেখানে বাতাস আলো এবং বালকের কল্পনার পরস্পর অবাধ মেলামেশার মাঝখানে জনতার খ্যাতি নিন্দার কলরব আবর্ত্ত তৈরী করে নি।" †

কলিকাতার 'ইটের খাঁচা' হইতে এখানকার মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে আসিয়া কবির ক্ষুধিত তৃষিত মন মুক্তির অমৃত অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছিল। তাঁহার জগৎজয়ী মোহিনী বাঁশির সুর দেবীর ইঙ্গিতে এইখানেই প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "সে দিনকার দান দেবতার প্রত্যক্ষ দান, সে আমি আকাশে বাতাসে, বনের ছায়ায়, গঙ্গার কলস্রোতে পেয়েছি।"†

কবিগুরুর এসব কথা কোন দিনই মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কথায়, বক্তৃতায়, লেখায় যখনই কোন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি তাঁহার কবিজীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল যে এইখানেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিয়াছেন। সেই প্রথম যৌবনে নিত্যনবরাগে যখন হৃদয়মন রঞ্জিত, রাজধানীর শুষ্ক আবেষ্টন হইতে আসিয়া কি সুন্দর দৃষ্টিতেই না তিনি এই পল্লীশ্রী উপভোগ করিয়াছিলেন! তিনি তখন এখানকার আকাশ, বাতাস, গঙ্গা, তরুরাজি সবই সুষমা-মণ্ডিত দেখিয়া কি অনুরাগের তুলিকায় না তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন! অধুনালুপ্ত মোরান সাহেবের সেই জাহ্নবী-প্রবাহচুম্বিত, বকুলরাজিশোভিত বিলাসভবনের কি মনোরম ছবিই না তাঁহার বর্ণনা হইতে মানসপটে ফুটিয়া উঠে!

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে আসিয়া তিনি আরও স্পষ্টতর করিয়া চন্দননগরের সহিত তাঁর সম্পর্কের কথা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর এক দিনের কথা এল। সেই সময় এ শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্মো আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে, এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম যে, বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে। ....‡

সেই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন,—

"সেটা হ'ল প্রথম বয়স। তখন বাণী ফোটে নি, সুর বেরোয় নি। তার কিছু কাল পরে আমি মোরান সাহেবের বাগানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। গঙ্গার তীরের উপর সেই হর্ম্ম্যের অলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়েছিলেম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করেছিলাম, যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনই আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।"‡

চন্দননগরকে তিনি যে বরাবরই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহার লেখার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতার বাহিরে অদূরে কোন স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে প্রায় চন্দননগরের গঙ্গাতীরে কোন বাটীতে আসিয়া থাকিতেন। অল্প দিনের জন্য হইলে অনেক সময় এখানকার গঙ্গাবক্ষে তাঁহার পারিবারিক বজরার মধ্যেও বাস করিতেন। বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট দেহে সেদিনও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন উপলক্ষে চন্দননগরের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এ সকলই তাঁহার চন্দননগরের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতিও এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন।

চন্দননগরে এমন কিছু বৈচিত্র্য নাই যদ্দ্বারা কোন বিরাট্ মানবমনকে আকর্ষণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রতিভার বীজ প্রকৃতির অনুকূলতায় এই স্থানেই ঘটনাক্রমে অঙ্কুরিত হয়। দেবীর বরে তাঁহার জীবন-সাধনা এই স্থান হইতেই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সেটা চন্দননগরের সৌভাগ্য, চন্দননগরের গৌরবের কথা। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তেই চন্দননগরের শিরে এই গৌরবমুকুট পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা চন্দন-নগরবাসীর অমূল্য সম্পদ। যেমন বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভে বুদ্ধগয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভে দক্ষিণেশ্বর, তেমনই রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের উন্মেষে চন্দননগর ধন্য হইয়াছে, বাঙালীর পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহার জন্মস্থান, শান্তিনিকেতন তাঁহার কর্ম্মস্থান, তেমনই কাব্যসাধনার পীঠস্থান এই চন্দননগর।

† ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাণী—সম্মান, ৪১৭-১৯ পৃষ্ঠা।

‡ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণী—অভিভাষণ, ১ ও ২ পৃষ্ঠা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"প্রবাসী"র বর্তমান সংখ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি ছাপা হ'য়েছে তার চতুর্থ চিঠিটিতে তিনি মহারাজকুমারকে উপদেশ দিয়েছেন, "ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না।" ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে গদ্যে ও পদ্যে তাঁর অনেক উক্তি আছে। তার মধ্যে তাঁহার "ধর্ম" থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামি বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্ম্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জ্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্ক-চিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্য্যোগের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্ব্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জ্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্ম্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে এক মনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি!

অধর্ম্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

এক দিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্য্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব্বে-পশ্চিমে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্দ্ধে নির্ব্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জ্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্য্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্ম্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে!

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাইবার বিলাতে প্রথম সংবাদ

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালের ১৩ই নবেম্বর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন। সেই খবরটি সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্ম থেকে ঐ দিনই বিলাতে প্রেরিত হয়, এবং তার পরের দিন

NOBEL PRIZE FOR INDIAN POET.

STOCKHOLM, Nov. 13.—The Nobel prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian poet Rabindranath Tagore.—Reuter.

Mr. Tagore who is fifty-two years old, is a Bengal poet, beloved and almost worshipped in his own country. He is one of those rare authors who have produced fine literature in two languages. After a few delicate lyrics in English periodicals he gave us "Gitanjali," or "Song Offerings," and later "The Garden," both volumes being translations into rhythmic English prose of his own poems in Bengali.
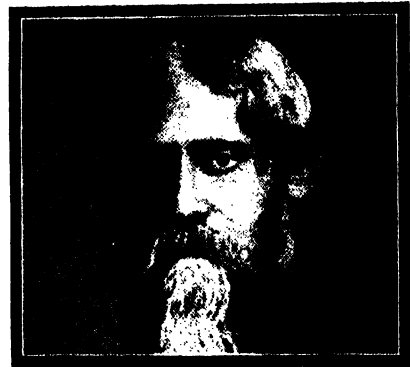
RABINDRANATH TAGORE.

[টাইম্‌সের টুকরাটি শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইম্‌স্ কাগজে ঐ খবরটি কবির ছবি সমেত ছাপা হয়। ঠিক্ যে-অক্ষরে যে ছবি দিয়ে যতটুকু জায়গায় যে শব্দগুলির দ্বারা টাইম্‌স্ এই খবর ছেপেছিলেন, তার ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

পাঠকেরা দেখবেন, টাইম্‌স্ লিখেছিলেন যে, কবি তাঁর নিজের দেশে "beloved and almost worshipped" অর্থাৎ তাঁর দেশের লোকে তাঁকে ভালবাসে, এবং পূজা করে বল্‌লেও চলে। সুতরাং যাঁদের এই ধারণা ছিল যে, নোবেল প্রাইজ পাবার আগে তিনি স্বদেশে পূজিত হন নি এবং স্বদেশের বাইরে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করে নি, তাঁরা ভ্রান্ত। নোবেল প্রাইজ পাবার আগেই তাঁর খ্যাতি বিদেশে পৌঁছেছিল। না পৌঁছে থাকলে যে তাঁর কোন ক্ষতি হ'ত তা নয়;—কেবল ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে টাইম্‌সের টুকরাটির ফোটোগ্রাফ ছাপলাম।

টাইম্‌স্ তখন এ কথাও লিখেছিলেন যে, তিনি সেই খুব অল্পসংখ্যক গ্রন্থকর্তাদের মধ্যে এক জন, যাঁরা দুটি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। টাইম্‌সের উল্লিখিত যে-অল্প-সংখ্যক সাময়িক কাগজে কবির গীতিকবিতা ইংরেজীতে বেরিয়েছিল ইংরেজী গীতাঞ্জলির আগে, তার মধ্যে মডার্ন রিভিয়ুতেই তাঁর গীতিকবিতা সর্বাগ্রে বেরিয়েছিল। এবং তার আগেও (১৯১০ সালে) তাঁর "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পের অনুবাদ মডার্ন রিভিয়ুতে বেরিয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু। তিনি তখন বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি সরকারী বিচার-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং "ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা"র বিচার করেন। তাঁর অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছিলেন।

"গানের রাজা"

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার অনেক আগে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সম্বোধন ক'রে লিখেছিলেন—

"জগৎকবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব;
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।"

তিনি "গান" শব্দটি গীতিকবিতা ও গান উভয় অর্থেই ব্যবহার ক'রেছিলেন। বাংলা গানের ও গীতিকবিতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রবাবুর পরিচয় ত ছিলই, অধিকন্তু নানা ভাষার নানা কবিতার অনুবাদও তিনি ক'রেছিলেন। এ বিষয়ে জ্ঞানবান্ কবি তিনি ছিলেন।

তাঁর ঐ দুই পংক্তির অর্থ অনুসারে তিনি একটি চিত্র রচনা করেছিলেন। চিত্রের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ এবং তাঁর ফোটোগ্রাফকে ঘিরে শেক্সপীয়ার গেটে হিউগো বার্ণস্ হুইটম্যান ও টল্‌স্টয়ের ছবি।

জগতের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি গীতিকবিতা লিখেছেন। তাঁর নিজের ধারণাও ঐরূপ ছিল।

"রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান"

কয়েক দিন পূর্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মানুষকে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাঁর গান। মানুষকে রবীন্দ্রনাথের দান এত বিচিত্র, ব্যাপক, প্রচুর ও অমূল্য যে তার মধ্যে কোন্ রকম দান যে শ্রেষ্ঠ হঠাৎ তা বলা বড় কঠিন। কিন্তু এ কথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর গানের চেয়ে তাঁর আর কোনো দান বড় নয়।

তাঁর গানগুলি তাঁরই দেওয়া সুরে যাতে গাওয়া হয়, সেদিকে গায়ক ও শ্রোতা উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ও আবশ্যক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে "সম্মুখে শান্তি-পারাবার" গানটি গীত হয়েছিল, প্রবাসীতে প্রকাশিত তার স্বরলিপিটিই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত স্বরলিপি।

বাঙালিকে সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর অনুরোধ

কলিকাতার টাউনহলে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁর বক্তৃতায় বাঙালিদের সম্মুখে দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন :—

১। কবির বাংলা রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদের একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ।

২। তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানবান ও রসজ্ঞ কোন বাঙালি বিদ্বানের দ্বারা তাঁর একটি ভাল জীবনচরিত রচনা।

উভয় প্রস্তাবই খুব সমীচীন এবং উভয় প্রস্তাব অনুসারেই কাজ হওয়া উচিত।

"জগৎ-কবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব ;
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।"
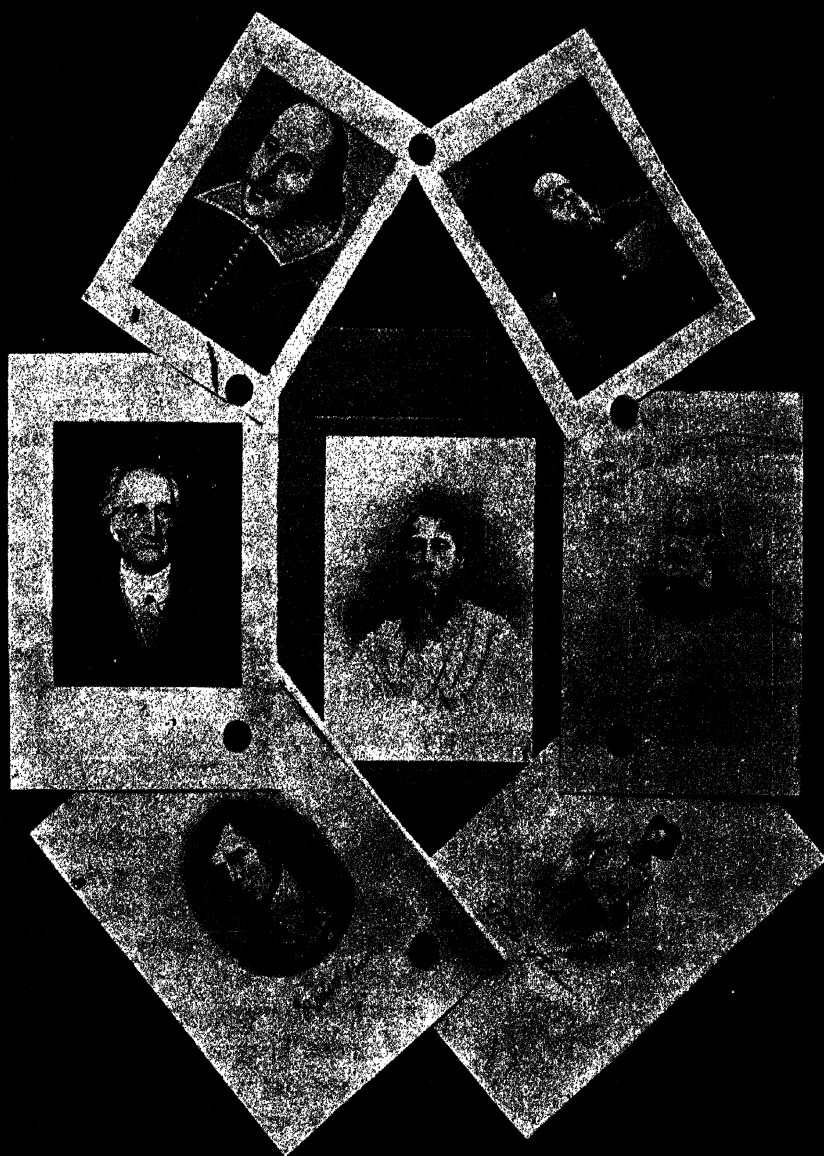
রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কিয়দংশের ইংরেজি অনুবাদ বিলাতের ও আমেরিকার ম্যাকমিলান কোম্পানী ছেপেছেন। কিন্তু তাঁরা অনেক বৎসর আগে যা ছেপেছিলেন, তার পর নূতন কিছু অনুবাদ ছাপেন নি। অথচ নূতন অনুবাদ তার পর অনেক হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি কবি নিজে করেছেন, কতকগুলি অন্যেরা করেছেন এবং তিনি সংশোধন ও অনুমোদন করেছেন। তা ছাড়া যা ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে, তা বেশি নয়।

কবির স্বকৃত এবং অন্যের কৃত ও তাঁর দ্বারা অনুমোদিত সমুদয় ইংরেজী অনুবাদ একত্র ক'রে বিশ্বভারতী যদি প্রকাশ করেন, তা হ'লে বড় ভাল হয়। এগুলির অধিকাংশ মডার্ন রিভিয়ুতে ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে পাওয়া যাবে। সবগুলি একত্র করে ছাপলে বিশ্বভারতীর কিছু আয়ও হ'তে পারে—অন্ততঃ লোকসান হবে না।

ইংরেজি অনুবাদ থেকে অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদও কবির অনেক গ্রন্থের হ'য়েছে। এগুলির একটি সংগ্রহ বিশ্বভারতীতে আছে। এই সব অনুবাদের প্রকাশকরা বিশ্বভারতীকে কোনো রয়্যাল্টি দেন কিনা, জানি না। দেওয়া উচিত।

যুদ্ধের সময় কাগজ দুর্মূল্য হওয়ায় বিশ্বভারতী এখনই এই ইংরেজি সংকলন ছাপাতে না পারেন, কিন্তু জিনিসগুলি এখন থেকে সংগ্রহ ক'রে রাখা সুবিধাজনক।

—

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি প্রবন্ধ বক্তৃতা ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা অনেক ইংরেজি প্রবন্ধ এবং (বঙ্গের ও ভারতের বাইরে দেওয়া) বক্তৃতা ইত্যাদি আছে। সেগুলি সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে একত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত।

তাঁর যা-কিছু বাংলা ও ইংরেজি লেখা, বক্তৃতা, "বাণী" সমস্তই বিশ্বভারতীর কিংবা শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি। সমুদয়েরই প্রকাশ হয় তাঁরা করতে পারেন কিংবা সমুদায়ের প্রকাশ তাঁদের অনুমতিসাপেক্ষ।

—

ভারতীয় নানা ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ

আমরা ঠিক্ না জানলেও আমাদের অনুমান এই, যে, ভারতবর্ষের যে-যে ভাষার সাহিত্য আছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের কোন-না-কোন বইয়ের অনুবাদ হ'য়েছে। হিন্দীতে তাঁর যত বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, তার একটি তালিকা আমরা সংগ্রহ ক'রে সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে ছেপেছি। সেই তালিকায় ৩৭খানি বইয়ের নাম আছে। হিন্দী অনুবাদ আরও থাকতে পারে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের তালিকা পেলে তাও আমরা পরে ছাপব।

—

সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদ দুঃসাধ্য

কবির সমগ্র রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদ দুঃসাধ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা সবগুলিরও অনুবাদ এখনও হয় নি। শ্রেষ্ঠগুলিরও অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করতে পারলে খুব বড় কাজ হবে এবং তাতে জগদ্বাসীর কল্যাণ হবে ও সকলে আনন্দ পাবে। এই কাজটি করবার মত অবসর কোন এক জন বাঙালীর হবে কি না বলতে পারি না। এক জনের দ্বারা না হ'লে ভিন্ন ভিন্ন রকমের লেখার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য অনুবাদক বিশ্বভারতী মনোনীত করতে পারেন। তা করলেও বোধ হয় এক বা একাধিক সম্পাদক, কিংবা একটি ছোট সম্পাদকসমিতি আবশ্যক হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত

বাংলায় ও ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি বই আছে—হয়ত অন্যান্য ভাষাতেও আছে, তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তকটি সকলের চেয়ে বড়। সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রুর প্রস্তাবিত প্রামাণিক একখানি জীবনচরিত বোধ হয় প্রথমে বাংলাতেই লিখিয়ে তার পর ইংরেজীতে অনুবাদ করা'লে ভাল হয়। এই কাজটি বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা সাপেক্ষ। তথ্য ও অন্যান্য উপকরণ প্রভূত পরিমাণে বিশ্বভারতীর নিকট ও ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংস্পর্শের সৌভাগ্য বিস্তর লোকের হয়েছে। তাঁদের জানা তথ্য তাঁরা বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলে পরে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার হ'তে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় আখ্যানমালা

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা পরে আশ্রমের পূর্বতন ছাত্রদের একটি সভা হয়। তার নির্ধারিত প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা কাজ আরম্ভ করতে যেন বিলম্ব না করেন। সভার কাজ হ'য়ে যাবার পর এক জন পূর্বতন ছাত্র ব'লেছিলেন, পূর্বতন ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের যে-সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর যে-সব কথা শুনেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল,—সমুদয় আখ্যানমালা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে একখানি পুস্তকের আকারে প্রকাশ করলে খুব ভাল হয়।

আমরা এই প্রস্তাব অনুমোদন করি।

—

রবীন্দ্রাব্দ

কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রবীন্দ্রাব্দ প্রচলনের প্রস্তাব করেছেন। তিনি সাহিত্যিকদের দ্বারা এই অব্দের ব্যবহার দেখতে চান। সমুদয় বাংলা পুস্তকে ও সাময়িক-পত্রে, (এবং সংবাদপত্রেও) এই অব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত হ'তে পারে। আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি। বর্তমান বৎসরটি ৮১ রবীন্দ্রাব্দ।

—

বিদেশে রবীন্দ্র-প্রশস্তি

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর পৃথিবীর নানা দেশে সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে, সেখানকার সভা-সমিতিতে অনেক কথা বলা হয়েছে। শান্তির সময়ে পৃথিবীর নানা দেশের খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র, পুস্তক, চিঠিপত্র অন্য নানা দেশে যায় আসে। যুধ্যমান জগতে তা হচ্ছে না। এই জন্যে অধিকাংশ বিদেশেই তাঁর সম্বন্ধে যা লেখা ও বলা হয়েছে, তার খবর আমরা পাচ্ছি না। অথচ এ নিশ্চিত যে তিনি বারো বার বিদেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে যত দেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার মনীষী ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, অন্ততঃ সেই সব দেশে (এবং নিশ্চয়ই অন্য কোন কোন দেশেও) তাঁর নানা গুণ ও কীর্তি কীর্তিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র, তাঁদের সকলের এবং বিশেষ করে বিশ্বভারতীর সহিত সম্পর্কযুক্ত সকলের মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ থামবার পর নানা দেশের এই সব রবীন্দ্র-প্রশস্তি সংগ্রহ করতে হবে। এখনও যদি কারো কাছে কিছু এসে পৌঁছে থাকে বা পৌঁছে তা তিনি সযত্নে রাখবেন বা বিশ্বভারতীকে দেবেন।

আমরা অবগত হয়েছি যে, ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপের কোন কোন দেশের রবীন্দ্র-প্রশস্তি রেডিয়োতে শোনা গিয়েছিল এবং তাতে খুব স্পষ্ট সত্য কথা ছিল। সে-গুলি কেও লিখে রেখেছেন কি না জানি না।

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু রমাঁ রলাঁ, আইন্‌স্টাইন, প্রভৃতি কি বলেছেন লিখেছেন, জানবার যোগ্য।

—

ভারতবর্ষে রবীন্দ্র-প্রশস্তি

ভারতবর্ষে বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে নানা ভাষার কাগজে ও সাময়িক পত্রে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না কিছু লেখা হয়েছে। অগণিত শোকসভা হয়েছে ও তার কোন কোনটিতে ভাল ভাল বক্তৃতাও হয়েছে; কিন্তু অনেকগুলির শুধু উল্লেখ পর্যন্তও খবরের কাগজে হ'তে পারে নি। সুতরাং সবগুলির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু বঙ্গে ও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে যা বেরিয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হ'ত না যদি অন্যান্য সভ্যদেশের মত এ দেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে খবরের কাগজের টুকরা সরবরাহের এজেন্সি (News-paper Cuttings Supply Agency) থাকত। কিন্তু আমরা যত দূর জানি, তা নেই। তথাপি সংবাদপত্রের পরি-চালকেরা ও সংবাদপত্রের পাঠকেরা সাহায্য করলে এবং এসোসিয়েটেড প্রেস ও য়ুনাইটেড প্রেস সাহায্য করলে অনেক কাগজেরই রবীন্দ্রনাথসম্পর্কিত লেখার ও সংবাদের টুকরা পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি বিশ্বভারতীতে প্রেরিতব্য।

—

স্বাক্ষর-পুস্তকে রবীন্দ্র-কবিতাবলী

স্বাক্ষর-পুস্তকে (অটোগ্রাফ বইয়ে) যাঁরা প্রসিদ্ধ লোকদের নাম দস্তখত করিয়ে নেন, তাঁরা কিছু 'বাণী'ও লিখে দিতে বলেন। যাঁরা তা লিখে দিতে রাজী হন, তাঁদের মধ্যে সবাই ত কবি নন্। সুতরাং তাঁরা প্রচলিত কোন সংস্কৃত, ইংরেজী বা বাংলা উপদেশ বা আশীর্বাদ লিখে দেন।

কিছু কাল আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কোন স্বাক্ষর-পুস্তকে তাঁর নামের সঙ্গে কিছু লিখে দিতে বললে তিনি তখনি তখনি কিছু কবিতা রচনা ক'রে লিখে দিতেন। এই রকম কবিতা যে তিনি কত জনের খাতায় কত

লিখেছেন, তা কেও বলতে পারে না। এই রকম কবিতা সংগ্রহ ক'রে আমরা প্রবাসীতে একাধিক বার ছেপেছি। আপাততঃ সে চেষ্টা করছি না। কিন্তু যাঁদের স্বাক্ষর-পুস্তকে তাঁর কবিতা আছে, তাঁরা সেগুলি হারাবেন না। ভবিষ্যতে হয়ত বিশ্বভারতীই সেগুলি সংগ্রহ করিয়ে ছাপাবেন।

আমাদের এই সতর্ক ক'রে দেবার কারণ এই যে, সম্প্রতি অবগত হয়েছি, শান্তিনিকেতনের কোন পূর্বতন ছাত্রের এইরূপ একটি মূল্যবান্ পুস্তক অন্তর্হিত হয়েছে। তার মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর রবীন্দ্রনাথের উত্তরগুলি চমৎকার। কয়েকটি দিচ্ছি। "প্রশ্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে? উত্তর—সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কেহ নাই। প্রশ্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? উত্তর—জনগণ। প্রশ্ন—আপনার হীরো কে? উত্তর—রামমোহন রায়।"

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা সামান্য এক টুকরা কাগজও খুব যত্ন ক'রে রাখা একান্ত আবশ্যক।

—

প্রবাসীর রবীন্দ্র-সংখ্যা একটি নয়

প্রবাসীর একটি রবীন্দ্র-সংখ্যা দেখবার অভিলাষ যাঁরা সম্পাদককে মৌখিক জানিয়েছেন, তাঁদের সকলকে শত ধন্যবাদ।

আমরা বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসংখ্যা নাম দিয়ে প্রবাসীর কোন সংখ্যা প্রকাশ করি নি, ভবিষ্যতেও করতে পারব না। এই রকম সংখ্যাতে যে-সকল রচনা ও যে-সকল চিত্র প্রকাশিত হবার যোগ্য, আমাদের হাতে সেরূপ রচনা এত সঞ্চিত হয়ে আছে ও আরো জমছে, যে, সেই সবগুলি একটি সংখ্যায় মুদ্রিত করা দুঃসাধ্য। এই জন্যে আমরা প্রত্যেক সংখ্যাতেই কিছু ছাপছি এবং ভবিষ্যতেও কিছু কাল ছাপব। বস্তুতঃ, যে চল্লিশ বৎসর ছয় মাস ধ'রে প্রবাসী প্রকাশিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে কোন্ বৎসর কোন্ সংখ্যায় যে তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয় নি, তা বলতে হলে গবেষণা করতে হবে। আর তাঁর ছবির কথা বলতে গেলে তিনি প্রবাসীর পরলোকগত সহকারী সম্পাদক চারুবাবুকে একবার যা লিখেছিলেন, সেই কথাই মনে পড়ে যায়। একটা কি উপলক্ষ্যে চারুবাবু তাঁর কাছে তাঁর তৎকালে আধুনিক একখানি ফোটোগ্রাফ প্রবাসীতে ছাপাবার জন্যে চেয়েছিলেন। তিনি তার উত্তরে লিখেছিলেন, "চারু, তোমরা আমার এত রকম ছবি ছেপেছ যে আয়নায় মুখ দেখা ছেড়ে দিয়েছি—সব ভঙ্গীর ছবিই তো তোমরা ছেপেছ।" —

"রবি-বকুল"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখে গেছেন। তবু, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে এবং যা দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে এ রকম কিছু স্মারক চিহ্ন রাখবার জন্যে নানা উপায় চিন্তিত হচ্ছে এবং অবলম্বিত হবে। যত রকম উপায় আলোচিত হয়েছে, তার থেকে পৃথক্ একটি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ উপায় নিউ দিল্লীর বাঙালী সমাজ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা যথাবিধি অনুষ্ঠানসহকারে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন "রবি-বকুল"। তাঁদের অনুষ্ঠানটির বৃত্তান্ত পড়ে "ফাল্গুনী" নাটকে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে পড়ে গেল :—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরবো না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি?—**আমি বকুল।**
কে গো তুমি?—আমি পারুল।
তোমরা কে বা?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে॥
এবার যখন ঝ'রবো মোরা
ধরার বুকে
ঝ'রবো তখন হাসি মুখে।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
ম'রবো মোরা প্রাণের সুরে।
তুমি কে গো?—আমি শিমুল।
তুমি কে গো?—কামিনী ফুল।
তোমরা কে বা?—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে॥

নিউ দিল্লীতে যাঁরা এই সুন্দর স্মারকোপায়টি অবলম্বন করেছেন তাঁদের কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছি। তাঁরা বকুল গাছটির সন্নিকটে একটি মর্মর পাথরের ফলকে কবির ঐ গানটি যদি উৎকীর্ণ করিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে আমাদের বিবেচনায় তাঁদের কাজটির সুষমা আরো বাড়বে।

—

সমগ্র শহরে রবীন্দ্রভক্তি-উদ্বোধন

বঙ্গের নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের জন্য শোকসভা ও তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য সভা হয়েছে। এর মধ্যে বার্নপুরের অনুষ্ঠানটিতে কিছু বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা ছিল। সেখানে

বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, কবির রচিত সময়োপযোগী সংগীত গান, প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতাদি দ্বারা ভক্তি নিবেদন—এ সমস্তই কবির শ্রাদ্ধবাসরে হয়েছিল। অধিকন্তু কবির রচিত একটি সময়োচিত সংগীত গাইতে গাইতে দলবদ্ধ ভাবে শহরের রাস্তাগুলি পরিক্রমণ করা হয়েছিল।

তার পর দিন শহরের উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ঐরূপ গান করতে করতে শহরের রাস্তা পরিক্রমণ করেন ও তার পর সভার অধিবেশন হয় এবং তাতে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা কবির বিদেহী আত্মার উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

—

কল্‌কাতার টাউন হলে শোকসভা ও স্মৃতিসভা

বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে শোকসভা ও স্মৃতিসভা হয়েছে। তার মধ্যে কল্‌কাতার টাউন হলের সভার মত এত বড় সভা বোধ করি আর কোথাও হয় নি। সভা আরম্ভ হবার অনেক আগেই দোতলার হল একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; নীচের তলাতেও জায়গা ছিল না। উপরে উঠবার সিঁড়ি, বড় রাস্তার উপরের সোপানশ্রেণী, হলের সম্মুখের ও পাশের সব রাস্তা লোকে লোকারণ্য। বৃষ্টি সত্ত্বেও এই রকম ভীড় হয়েছিল। সভাস্থলে প্রস্তাব উপস্থাপন করবার বা তার সম্পর্কে বক্তৃতা করবার কথা ছিল, এ রকম কোন কোন বিশিষ্ট লোকও সিঁড়ি বেয়ে ভীড় ঠেলে উপরে উঠতে পারেন নি—যেমন বড়লাটের শাসনপরিষদের মনোনীত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সর্ আজিজুল হক্ ইত্যাদি।

প্রথমটা সভাস্থলে বড় গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। এরূপ গোলমাল করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও শোচনীয়। যা হোক্, তার পর বেশ ভাল ভাবে সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা এবং কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কীয় বক্তৃতাগুলি হয়েছিল। বাঙালী অবাঙালী অনেকে বক্তৃতা ক'রেছিলেন।

—

রবীন্দ্রনাথ-স্মারক উপায় অবলম্বন

কল্‌কাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় স্বরূপ বিশ্বভারতীকে স্থায়ী করবার জন্যে টাকা তুলবার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এতদর্থে নিযুক্ত কমীটি তা ছাড়া অন্য রকম কিছু স্মারকের ব্যবস্থাও করতে পারবেন বলা হয়েছে।

আমাদের বিবেচনায়, অন্য স্মারক গোড়া থেকেই বাদ না-দিয়ে, আপাততঃ বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের উপরই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

—

রবীন্দ্র-স্মারক সম্বন্ধে বাঙালীর কর্তব্য

কল্‌কাতা টাউন হলের সভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর প্রথম ও শেষ উভয় বক্তৃতাই তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতির উপযুক্ত হয়েছিল। শেষ বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্র-স্মারক সম্বন্ধে বাঙালীদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সকল বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, বাঙালীরাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী ব'লে সকলের চেয়ে বেশি গৌরব বোধ করেন; অতএব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্তব্য ও দায়িত্ব বাঙালীদেরই সকলের চেয়ে বেশি।

আমরাও এই মর্মের কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের দান জগদ্বাসী সকলের জন্যে বটে। কিন্তু তিনি যা-কিছু লিখেছেন বলেছেন তার প্রায় সবই আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। তাঁর জীবনের প্রধান কর্মস্থান শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন বাংলাদেশে অবস্থিত। অতএব, আমরা বাঙালীরা তাঁর কাছে যত ঋণী এত আর কেউ নয়। সেই ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু তা হ'লেও কিছু প্রতিদানের যথাসাধ্য চেষ্টা তো করতে হবে। অন্যেরা কি করবেন না-করবেন তা না ভেবে, আমরা কি করব তাই আমরা স্থির ক'রে অবিলম্বে কাজে লেগে যাওয়া কর্তব্য।

যত শোকসভার অধিবেশন হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যত কবিতা ও প্রবন্ধ সম্পাদকেরা পাচ্ছেন, তার থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে, বাঙালীর মন খুব আলোড়িত হয়েছে; যা দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে, সব হুজুক নয়।

বাষ্পীয় যন্ত্রের (steam engineএর) দ্বারা পৃথিবীর বড় বড় কাজ চলে। চলে এই জন্যে যে বাষ্পটাকে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালিয়ে তার দ্বারা কাজ নেওয়া হয়। সব বাষ্পটা যদি খুব জোরে শব্দ ক'রে ক্রমাগত বেরতে থাকত, তাহ'লে খুব একটা কিছু কাণ্ড হচ্ছে মনে হ'ত বটে, কিন্তু বাষ্পটা দ্বারা কোন কাজ হ'ত না।

মানুষের মনের প্রবল ভাবাবেগ অনেকটা স্টীম এঞ্জিনের বাষ্পের মত। যদি আমাদের সব ভাব কবিতার বক্তৃতার আকারেই বেরিয়ে যায়, যদি আমরা ভাবটিকে

হৃদয়ের মধ্যে সংযত ক'রে রেখে তার থেকে কাজের প্রেরণা না-পাই, তা হ'লে আমাদের ভাবাবেগ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়।

বাঙালীরা বড় ভাবপ্রবণ ব'লে যে একটা অখ্যাতি আছে, তার কারণ এ নয় যে, ভাব জিনিসটাই খারাপ। ভাববিহ্বলতাটা খারাপ, ভাব খারাপ নয়। আমরা যদি আমাদের ভাব থেকে কর্মে প্রেরণা পাই, তা হ'লে কর্মেও আমরা অনতিক্রান্ত হ'তে পারব্।

বাঙালীর পরীক্ষার সময় এসেছে। আমরা যদি আগে আগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'য়ে থাকি, তা হ'লেও নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ভাবকে হৃদয়ের মধ্যে রেখে আমরা কাজে লাগাতে পারলে নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব।

—

পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিহ্ন

পানিহাটিতে এখন যে-বাড়ীটি গোবিন্দকুমার আশ্রম (Gobindakumar Home) ব'লে পরিচিত, বাল্যকালে সেই বাড়ীটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুজনদের সঙ্গে কিছু দিন ছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কথা তিনি তাঁর "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন। তাঁর জীবনের সেই সময়টি স্মরণ ক'রে গত ১৪ই ভাদ্র পানিহাটির অধিবাসীরা গোবিন্দকুমার আশ্রমে একটি রবীন্দ্র-স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিলেন। অবিরাম বৃষ্টি সত্ত্বেও হল ও বারাণ্ডা ও পাশের ঘর জনাকীর্ণ হয়েছিল। বক্তৃতাগুলি বেশ ভাব-গম্ভীর হয়েছিল।

এই সভায় প্রস্তাব হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে এই বাড়ীতে ছিলেন তার স্মারক স্বরূপ অট্টালিকার প্রাচীরগাত্রে একটি প্রস্তরফলকে সেই কথা উৎকীর্ণ থাকবে। পানিহাটি-বাসীরা উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের উৎসাহ দেখে মনে হয়, তাঁরা শীঘ্রই এই শুভ কাজটি করে ফেলতে পারবেন।

কবি যেখানে যেখানে কিছু কাল ছিলেন, এমন কি যে-সব বাড়ীতে কখনও তাঁর শুভ পদার্পণ হয়েছে, সর্বত্র তাঁর এই রকম স্মৃতিফলক থাকলে তা বাহুল্য হবে না।

—

জ্ঞানগর্ভ রবীন্দ্র-প্রশস্তি

রবীন্দ্র-স্মৃতিসভাসমূহে তাঁর সম্বন্ধে যত বক্তৃতা হচ্ছে, প্রবন্ধ পড়া হচ্ছে, তার কোনটিই জ্ঞানগর্ভ নয়, সবই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সাধারণ প্রশংসা, এমন বলা যায় না। অনেকগুলিই অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল। এই রকম জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠ যত হয়, জাতির পক্ষে ততই তা কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথ নিন্দা-প্রশংসার অতীত লোকে ও অবস্থায় বিরাজমান। আমাদের আপনাপন হিতের জন্যই তাঁর জীবনী ও সাহিত্য জানা আবশ্যক।

—

রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা কাগজ প্রভৃতি আগেকার সব খণ্ডের মতই ভাল আছে। এই খণ্ডে রচনা আছে—কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, ব্যঙ্গকৌতুক (প্রহসন), শারদোৎসব, চতুরঙ্গ, ব্যঙ্গকৌতুক (প্রবন্ধ)। তা ছাড়া বিজ্ঞপ্তি, গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে। চিত্র আছে—আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ, "কল্পনা"র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা, "হতভাগ্যের গান"এর পাণ্ডুলিপি, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রবীন্দ্রনাথ, "সুখদুঃখ" কবিতার পাণ্ডুলিপি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড দু-বার ফুরিয়ে যাওয়ায় তৃতীয় বার ছাপাতে হয়েছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর চাহিদা এত বেশী হবে বিশ্বভারতী অনুমান করতে পারেন নি।

—

রবীন্দ্রনাথের নবতম দুখানি বই

পূজার ছুটির আগেই রবীন্দ্রনাথের দুটি নূতন বই প্রকাশিত হবে। একটি ছোট ছোট কবিতার বই, আর একটি ছেলেমেয়েদের জন্যে ছড়ার বই।

শিশু ও বালকবালিকাদের আনন্দ ও কল্যাণের চিন্তা শেষ পর্যন্ত তাঁর হৃদয় মন অধিকার ক'রে ছিল।

—

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"

আজকাল বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে বিশ্ব-ভারতীকে স্থায়ী করবার কথার বলা-শোনা ও লেখা-পড়া হচ্ছে। বিশ্বভারতী যে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের পরিণত রূপ, তার উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যপ্রণালী অনেকেরই ভাল ক'রে জানা নাই। কিন্তু জানা উচিত। জানবার সুবিধাও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ক'রে দিয়েছেন। বিশ্বভারতীর ২৯ সংখ্যক বুলেটিনটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" বর্ণনা ক'রেছিলেন। সেটি বিশ্বভারতী আবার নূতন ক'রে ছাপিয়েছেন। দাম চার আনা মাত্র। এর থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করবার খুব লোভ হচ্ছিল; কারণ,

তার দ্বারা প্রবাসীর সমৃদ্ধি ও আকর্ষণ বাড়ত। কিন্তু লোভ সংবরণ করলাম। যাঁরা পারেন চার আনা দাম দিয়ে পুস্তিকাটি কিনে পড়ুন। আনন্দ পাবেন, এবং বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার জন্মিবে।

—

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ

পরিচিত অপরিচিত কত লোককে কত চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। যত দিন শরীর বয়েছে আঙুল চলেছে, নিজের হাতে পরিচিত অপরিচিত সবাইকার চিঠির জবাব দিয়েছেন। পীড়িত হবার পরও সেক্রেটারিদের দ্বারা জবাব দিয়েছেন এবং সেই সব জবাবের অনেকগুলিতে স্বাক্ষরও ক'রেছেন। তাঁর লেখা একখানা পোস্টকার্ডেও তাঁর স্বকীয়ত্ব কিছু আছে, সাহিত্যরস কিছু আছে। নানা বিষয়ে তাঁর মতামতও চিঠিগুলিতে আছে যা হয়ত তাঁর কোন বইয়ে নাই। কারো সাধ্য নাই তাঁর লেখা সব চিঠি সংগ্রহ ক'রে ছাপাতে পারেন। বিশ্বভারতী অবশ্য সংগৃহীত কতকগুলি ছাপবেন। আমাদের পুঁজিতে যত চিঠি আছে, সব ছাপা হয় নি, হবেও না। অকস্মাৎপ্রাপ্ত অন্যকে লেখা তাঁর ২।১ খানি চিঠি কোন-না-কোন বিশিষ্টতার জন্যে ছাপা হবে।

বাঁকুড়া জেলার রাহাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সরকারকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। চিঠিখানি নীচে উদ্ধৃত করছি।

"ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তুমি আমার লেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েচ এতে আমি আনন্দ বোধ করি। বিশেষত আমি জানি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই অধ্যবসায়ে সাধারণের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কাই তোমার বেশি। আমি তোমাকে উৎসাহ দিয়ে পত্রাদি লিখি নে তার একমাত্র কারণ, আমার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। নিরন্তর নিন্দাবাক্য আমি নীরবে সহ্য করেচি। তোমাদের প্রশংসাবাক্যও আমি তেমনি নীরবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমার রচনার সমাদর করে থাক এতে আমি উদাসীন এমন কথা মনে কোরো না—তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক এ ইচ্ছা স্বভাবতই আমি মনে পোষণ করে থাকি। আমার রচনায় যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা তোমাকে সুহৃৎ বলেই গণ্য করবেন এতে সন্দেহ নেই।

তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩০শে আশ্বিন ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

—

ইরানের দশা

ইরানে জার্ম্যানরা নানা ব্যাপদেশে সেখানকার নানা সরকারী কাজে ও ব্যবসাতে ঢুকেছিল। সে দেশে জার্ম্যান প্রভুত্ব স্থাপিত হ'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন হ'ত, এই কারণ দেখিয়ে দু-দিক্ থেকে এই দুই প্রবল রাষ্ট্রশক্তি ইরানে প্রবেশ ক'রে নানা ঘাঁটি দখল ক'রে বসেছে। যুদ্ধ যত দিন চলবে তত দিন ব্রিটেনের ও রাশিয়ার সৈন্য সেখান থেকে সরবে না। তারপর যে ইরানের কি হবে, কে জানে?

এখন ব্রিটেন ও রাশিয়ার এই সুবিধা হ'ল যে, ব্রিটেন ইরানের ভিতর দিয়ে রাশিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে পারবে।

—

মুসলিম লীগ ও দেশরক্ষা কৌন্সিল

জন ত্রিশ পুরুষ নারী নিয়ে গবন্মেণ্ট একটি দেশরক্ষা কৌন্সিল গড়েছেন। তার মধ্যে বাংলা পঞ্জাব আসাম ও সিন্ধুর চার জন মুসলমান প্রধান মন্ত্রী ও আরো কোন কোন মুসলমান মনোনীত হন। তাঁরা ঐ কৌন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

মুসলমান প্রধান মন্ত্রীরা মুসলিম লীগের সভ্য। তাঁরা কৌন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করবার আগে মুসলিম লীগের অর্থাৎ তার সর্বেসর্বা জনাব জিন্না সাহেবের অনুমতি নেন নি। তাঁরা চাইলে মুসলিম লীগ অনুমতি দিতেন কি না, জানি না। কিন্তু তাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করায় লীগের কার্য্যনির্বাহক কমীটি তাঁদিগকে সদস্যপদ ইস্তফা দিতে বলেন, নইলে তাঁদের শাস্তি হবে। পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সর্ সিকন্দর হায়াৎ খান এবং আসামের প্রধান মন্ত্রী সর্ মোহাম্মদ সাদউল্লা ইস্তফা দিয়েছেন; বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক ভেবে দেখবার জন্যে দশ দিন সময় নিয়েছেন ও পেয়েছেন। (১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৮।) [আজ ১৮ই ভাদ্রের দৈনিকে দেখছি সর্ সাদুল্লা এখনো ইস্তফা দেন নি এবং মিঃ ফজলল হকের দশাহ পার হ'য়ে গেছে, কিন্তু তিনিও ইস্তফা দেন নি।—১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৮।]

ভারতসচিব এমারি বলেছেন, চারটা প্রদেশের উক্ত খ্যাতনামা মুসলমানদের কৌন্সিলের সদস্য মনোনয়ন হয়েছিল ঐ ঐ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ব'লে, মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, সুতরাং মুসলিম লীগের এতে কিছু বলবার নেই। সিমলা থেকে ভারত-সরকারের যে একটা জ্ঞাপনী (communique) বেরিয়েছে তাতেও এই মর্মের কথাই বলা হয়েছে। অন্য দিকে কিন্তু বড়লাট বোম্বাই গবর্ণরের মারফৎ মিঃ জিন্নাকে জানিয়েছিলেন যে, ঐ চার জন প্রধান মন্ত্রীকে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসাবেই কৌন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মিঃ এমারির উক্তি ও সিমলার সরকারী জ্ঞাপনীতে যা বলা হয়েছে, বোম্বাই-লাটের মারফৎ প্রেরিত বড়লাটের কথার সঙ্গে তার মিল নেই—একটা আর একটার বিপরীত। এই দুই উল্টো উক্তির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সরকারী ভাষ্যকারেরা কেমন ক'রে করেন বা করবেন, তা এখনও কাগজে দেখি নি। সুতরাং এ-পর্য্যন্ত জিন্না সাহেবের জিৎ মানতে হবে।

কিন্তু লীগের ও জিন্না সাহেবের ব্যবহারেরও রহস্য বুঝা ভার। কৌন্সিলটার কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি পরামর্শ দিবারও না। ওটার অধিবেশন হবে দু-মাস অন্তর একবার এবং তাতে সদস্যেরা বড়লাটের মুখ থেকে যুদ্ধের অবস্থা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহর অবস্থা ইত্যাদি শুনবেন এবং যা শুনবেন তা নিজের নিজের প্রদেশে ও পাড়াপড়শীদের মধ্যে প্রচার করবেন। বাস্, তাঁদের কাজ এই পর্যন্ত। এই কাজকে যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করার অপরাধ মনে ক'রে জিন্না সাহেব খাপ্পা হয়ে প্রধান মন্ত্রীদের সবাইকে শাসিয়েছেন, কেন-না যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করাটা নাকি মুসলিম লীগের নীতি ও আদেশ বিরুদ্ধ। কিন্তু এ পর্যন্ত পঞ্জাবে প্রধান মন্ত্রী সিপাহী সংগ্রহ করছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার জন্যে কুলিমজুর সংগ্রহ করছিলেন, যুদ্ধের মাল-মশলা জোগাচ্ছিলেন, যুদ্ধ-ফণ্ডের টাকা আদায় করছিলেন —এসব কাজ যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য-করা ব'লে মিঃ জিন্না মনে করেন নি, কেবল কৌন্সিলটির সদস্য হ'য়ে বড়লাট সাহেবের বাণী দু-মাস অন্তর শ্রবণগোচর ক'রে তা প্রচার করাটাই হ'ল যুদ্ধোদ্যমে-সাহায্য-অপরাধ! অন্যান্য মুসলমান প্রধান মন্ত্রীরাও, পরিমাণে কম হ'লেও, পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর অনুরূপ কাজ করছিলেন; সেগুলা যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করা হয় নি, বড়লাটের বাক্যসুধা পান ও বিতরণটাই হ'ল অপরাধ! বাইবেলে এক শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তারা উট গিলতে পারে কিন্তু মশা গিলতে গেলে তারা বিষম বেগ পায়। মুসলিম লীগ যুদ্ধোদ্যমে প্রাত্যহিক সত্যিকার সাহায্য-করা রূপ উট হজম ক'রে আসছিলেন, কিন্তু এখন দ্বৈমাসিক বড়লাট-বাক্যসুধা-পান-রূপ মশা বরদাস্ত করতে পারলেন না।

আমাদের অনুমান, ভারতসচিব ও বড়লাট যে পাকিস্তান পরিকল্পনাটা মেনে নেন নি, অধিকন্তু ভারতসচিব তাঁর সাম্প্রতিক কোন কোন বক্তৃতায় সেটার কঠিনাঙ্গগুলার (difficultiesএর) উল্লেখ করেছেন, এইটেই হচ্ছে মিঃ জিন্নার চোখে ব্রিটিশ সরকারের আসল এবং খুব জবর অপরাধ।

সর্ সিকন্দর, মৌলবী ফজলল হক ও সর্ সাদুল্লার আচরণও চমৎকার। তাঁরা যে প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, তা তো মুসলিম লীগের প্রভাবে, কৃপায় বা অনুমতি নিয়ে নয়, সুতরাং এখন তাঁরা হঠাৎ লীগের এত বাধ্য কেমন ক'রে হলেন? সর্ সিকন্দর পঞ্জাব আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দলের নেতা সে দল য়ুনির্য়নিস্ট দল। তার মধ্যে মুসলমান অমুসলমান দুই আছে। তিনি স্বয়ং পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধী এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর মতের অন্য গরমিলও আছে। আসামের প্রধান মন্ত্রীও আইন-সভায় যে দলের নেতা, সেটা মুসলিম লীগ দল নয়; সে দলে মুসলমান অমুসলমান দুই আছে। মৌলবী ফজলল হকের কথা না-বলাই ভাল। তিনি মুসলিম লীগের মনোনীত আইন-সভার সদস্যপদপ্রার্থীকে হারিয়ে দিয়ে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন; কৃষকপ্রজা দলেরই নেতা তাঁর থাকা উচিত ছিল। তিনি যে মুসলিম লীগের মনোনীত লোককে হারিয়ে দিয়ে আইন-সভার সদস্য হয়েছিলেন, সেই লীগ দলেরই প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কত গরম গরম বক্তৃতাই না তিনি করেছেন!

ভারতসচিব মহোদয়কেও কিছু বলবার আছে। তিনি ও তাঁর সমমতাবলম্বী লোকদের মতে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের যোগ্য নয় এই জন্যে যে, কংগ্রেস-মন্ত্রীরা ও আইন-সভার কংগ্রেসী সদস্যেরা তাঁদের নির্বাচকদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে বাইরের একটি মানুষের (মহাত্মা গান্ধীর) বা মনুষ্যসমষ্টির (কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের) আদেশ মেনে চলেন। এই অপরাধে ভারতসচিব প্রভৃতি ব্রিটিশসিংহনাদ ক'রেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রধান মন্ত্রীরা যখন নিজেদের নিবাচকদের মতামতের অপেক্ষা না-রেখে বাইরের এক জন মানুষের (মিঃ জিন্নার) বা মানুষসমষ্টির (মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমীটির) হুকুম অনুসারে চলেন, তখন ব্রিটিশ সিংহ গর্জন না-করে ঠাণ্ডা সিমলাশৈল থেকে

টাণ্ডা জ্ঞাপনী (communique) বের করেন। (১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৮। ২-৯-১৯৪১।)

—

অখণ্ড-ভারত প্রচেষ্টা

বোম্বাইয়ের অন্যতম ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী পাকিস্তান পরিকল্পনার মধ্যে ভারতবর্ষের যে বিপদ লুকিয়ে আছে তা বুঝতে পেরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব রক্ষার আবশ্যকতা প্রচার করছেন এবং এই অখণ্ডত্বরক্ষাভিলাষী সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁর এই চেষ্টার পূর্ণ সমর্থন আমরা করি। বাল্যকাল থেকে আমরা ভারতের অখণ্ডত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিশ্বাস ক'রে আসছি;—বস্তুতঃ এর বিপরীত যে কিছু হ'তে পারে, সেকথা আমাদের মনে আসে নি।

ভারতবর্ষে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে বটে, কিন্তু তার জন্যে দেশটাকে টুকরো টুকরো কেন করতে হবে? চীনদেশ ভারতবর্ষের চেয়ে বড় এবং সেখানেও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে; মুসলমানও আছে কয়েক কোটি, কিন্তু সেখানে তো চৈনিক মুসলমানরা দেশটা ভাগ করতে চায় নি। জাপানীদের পক্ষ থেকে তারা এই রকম উস্কানি পেয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের দেশভক্তি এবং অন্য চৈনিকদের প্রবল বাধা জাপানী উস্কানিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। চীন স্বাধীন দেশ ব'লে জাপানী উস্কানি ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতবর্ষ পরাধীন। এর ব্রিটিশ প্রভুরা একে অধীন রাখবার জন্যে যত রকম উপায় সম্ভব অবলম্বন ক'রে আসছে ও করবে। কোনো পরাধীন দেশে অনৈক্য যত বাড়বে, তার স্বাধীন হওয়া ততই কঠিন হবে। পাকিস্তানের ধুয়া অনৈক্য বাড়াবার একটা ফন্দী। ব্রিটিশ প্রভুদের প্রশ্রয়ে কতকগুলি মুসলমান এই ধুয়া তুলেছে। পার্লেমেণ্টে ভারতসচিব পাকিস্তান পরিকল্পনার অল্পসল্প সমালোচনা করেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মত তিনি ভারতীয় স্বাজাতিকদের স্বাধীনতার দাবী অবহেলা করবার এই অজুহাতটা পেয়ে খুশিই আছেন।

আমরা বলেছি, "কতকগুলি মুসলমান এই ধুয়া তুলেছে।" এটা একটা আন্দাজী কথা নয়। মুসলিম লীগের মুসলমানদের চেয়ে মোমিনদের, জামিয়ৎউল উলেমার সভ্য ও অনুবর্তীদের, অহ্রর দলের, কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যদের এবং বঙ্গের কৃষকপ্রজা দলের সভ্যদের সংখ্যা ঢের বেশী। তারা পাকিস্তানের বিরোধী। কিন্তু মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী ব'লে ব্রিটিশ প্রভুরা জগতের কাছে এইরূপ ভান করেন যেন তাঁরা মুসলিম লীগের সভ্য ছাড়া অন্য কোন মুসলমানের অস্তিত্বই অবগত নন।

ভারতবর্ষে উদ্ভূত সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোক স্বভাবতই ভারতব্যবচ্ছেদের বিরোধী। হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা সবাই ভারতবর্ষের অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী। এই অখণ্ডত্ব তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁরা আধ্যাত্মিক প্রেরণা ভারতবর্ষের সকল অংশ থেকে পেয়েছেন। শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজী, সবাই ভারতের অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী এবং তা রক্ষা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ভারতবর্ষের বাইরে উদ্ভূত খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী ভারতীয়েরা এক জনও ভারতবর্ষকে দু তিন টুকরা করতে চান, এমন কথা কখনো শুনি নি; বরং তাঁদের নেতৃ-স্থানীয়েরা এর বিরোধী এই কথাই জানি।

পাকিস্তানের বিরোধী যদি কেবল হিন্দুরাই হ'তেন, তা হ'লেও হিন্দুদের আপত্তিই ঐ অসঙ্গত প্রস্তাবটাকে অগ্রাহ্য করবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হ'ত; কারণ ভারত-বর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অধিকাংশ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসঙ্গত কিছু করা গণতান্ত্রিক রীতিবিরুদ্ধ এবং সমীচীন নয়, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু শুধু হিন্দু নয়,—অগণিত মুসলমান এর বিরোধী, এবং জৈন, বৌদ্ধ, ভারতীয় খ্রীষ্টীয়ান, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজীরা এর বিরোধী।

অখণ্ড-ভারত আন্দোলনের সভা করবার সময় খুব চেষ্টা করা উচিত ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়েরই সেই সব লোককে আহ্বান করতে ও তাঁদের দ্বারা সভা করা'তে যাঁরা ভারতের অখণ্ডত্বের সমর্থক। এ রকম ধারণা হ'তে বা বদ্ধমূল হ'তে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয় যে, কেবল হিন্দুরাই ভারতের অখণ্ডত্ব চায়।

—

রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা

কংগ্রেসের অনেক আগে থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকেরা "অস্পৃশ্যতা" মানতেন না এবং তা সমূলে বিনষ্ট করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন। কংগ্রেসের "অস্পৃশ্যতা" বিরোধী চেষ্টা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য স্বাজাতিক রাজনৈতিক দলেই নূতন রকমের অস্পৃশ্যতা ঢুকেছে। তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই সেদিন যে শ্রীযুক্ত মুন্শী ভারতের অখণ্ডত্ব

সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন, তাতে দু-এক জন বে-দল লোক ছাড়া আর যত লোক ঐ বিরাট সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সব হয় হিন্দু মহাসভার সভ্য, নয় হিন্দু মহাসভার সহানুভূতিকারী। কোন দলের কংগ্রেসীই তাতে উপস্থিত হন নি—পাছে রাজনৈতিক ছোঁয়াচ লেগে যায়—যদিও তাঁরাও মনে মনে ভারতের অখণ্ডত্বেরই অনুরাগী।

—

জগতে একতা বাড়াবার চেষ্টা ও পাকিস্তান

বর্তমান যুদ্ধ বাধবার আগে সমগ্র পৃথিবীকে কেমন করে একটা রাষ্ট্রে (Stateএ) পরিণত করা যায়, তার আলোচনা চলছিল। সমগ্র ইয়োরোপকে একটা রাষ্ট্র করবার প্রস্তাবও আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এগুলো ফেডারাল রাষ্ট্র করবার কথা হচ্ছিল।

ছোট ছোট স্বতন্ত্র ও অন্যনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দিন চ'লে গেছে, এ এখন সব বড় রাষ্ট্রনীতিবিদই মানেন। হিটলারেরও এই ধারণা আছে। তবে হিটলার চান সারা ইয়োরোপকে এবং পারলে সারা পৃথিবীকে তাঁর তাঁবে এক করতে; গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা চান সব রাষ্ট্রকে সমান মর্যাদা দিয়ে একটা বড় ঐক্যবদ্ধ ফেডারাল রাষ্ট্র বানা'তে।

এই রকমে, মনীষীরা সব দেশকে জোড়া দিয়ে এক করতে চাচ্ছেন, আর পাকিস্তানি বুদ্ধিমান্‌রা চাচ্ছেন যেটি গোটা আছে, অখণ্ড আছে, এক আছে, তাকে টুকরো টুকরো ক'রে কাটতে। তাঁরা কি জানেন না, যে, ভারতবর্ষকে কেটে টুকরো টুকরো করলে এই দেশ কখনো স্বাধীন হ'তে ও থাকতে পারবে না, এবং স্বাধীনতা ভিন্ন কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদেরই সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হবে না?

—

কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হবে। আঠার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে কাশীতে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হ'য়েছিল। আগামী অধিবেশনের উদ্‌যোক্তাদের আশা ছিল, আবার রবীন্দ্রনাথেরই আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা এই অধিবেশন করতে পারবেন। তা হ'ল না। তাঁদের ইচ্ছা যে, এবারকার অধিবেশন তিন দিনে সমাপ্ত না ক'রে তাঁরা চার দিন করবেন এবং তার মধ্যে এক দিন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবেন। এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সাধারণত তিন দিন হয়, জামশেদপুরে দু-দিন হয়েছিল। কাশী বড় জায়গা, সেখানে অনেক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী আছেন। তা ছাড়া তাঁরা লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি শহরের বাঙালীদের আনুকূল্য পেতে পারবেন। চারি দিন ব্যাপী অধিবেশন কাশীতে করা দুঃসাধ্য হবে না।

—

রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমি বিদ্যালয়ের সাফল্য

আমরা রেঙ্গুন থেকে এই চিঠিটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি:—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"গত বার রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমী স্কুল হলে বসিয়া ইহার বার্ষিক ফলের খবরে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল হইবে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আপনার বাণী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে—এবার প্রত্যেকটি মেট্রিক পরীক্ষার্থী (২৭টি ছেলে ও ১১টি মেয়ে) খুব ভাল পাস করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত সাত জন মাসিক ৫৩৲ টাকা করিয়া ৫ বৎসরের জন্য Collegiate Scholarship পাইয়াছে। এরূপ 100°/. pass against 46°/. for Burma এ প্রদেশে কখনও হয় নাই। এই গৌরব আমাদেরই। আশা করি অপর বাণীটিও (কলেজে উন্নীত হওয়া) অচিরে ফলিবে।

"(১) শ্রীমান বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
(২) " দেবনারায়ণ চৌধুরী
(৩) " পরেশচন্দ্র গুহ
(৪) " অনিমেষ ঘোষ
(৫) কুমারী পুষ্পরাণী চৌধুরী
(৬) " জয়লক্ষ্মী } (মাদ্রাজী)
(৭) " সরস্বতী }

প্রণত
শ্রীঅরুণচন্দ্র বসু।"

—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

কলকাতার কার্জন পার্কে সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সু-উচ্চ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙালীদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ সামান্য পরিমাণে শোধ হ'ল। সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর দ্বারা মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মূর্তি প্রতিষ্ঠা

উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করায় অনুষ্ঠানটির সমগ্রভারতীয়ত্ব সূচিত হয়েছে। রাজনীতি বিষয়ে জাতীয় জাগরণের চেষ্টা সাফল্যের সহিত সুরেন্দ্রনাথ কেবল বঙ্গে করেন নাই; উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রদেশ পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ ক'রে বক্তৃতা ক'রেছিলেন। পঞ্জাবে তাঁর কাজের ফলের সাক্ষ্য এখনও ট্রিবিউন নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক দিচ্ছে।

তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কেবল বক্তৃতা করেন নি; প্রতিষ্ঠানও গড়েছিলেন। ভারত সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময়কার স্টুডেণ্ট্‌স্ এসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে যুবকদের জাগরণের মূলীভূত ছিলেন, যে কল্‌কাতা ম্যুনিসিপালিটিকে গবর্ন্মেণ্টের তাঁবেদার করবার চেষ্টা চলছে, তার যতটুকু আত্মকর্তৃত্ব ছিল, তা সুরেন্দ্রনাথেরই রাজনীতিজ্ঞতা ও চেষ্টার ফলে, বেঙ্গলী কাগজ তিনি দক্ষতা ও সাহসের সহিত পরিচালন করতেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের তিনি নেতা ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ শুধু রাজনীতিক ছিলেন না, শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি কলেজ ও স্কুল স্থাপন ক'রে ও স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে দেশে শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করেছিলেন।

—

মোহিনীমোহন মজুমদার জয়ন্তী

মোহিনীমোহন মজুমদার বিখ্যাত লোক নন; কিন্তু তিনি তাঁর দু-জন বন্ধুর সহযোগিতায় ও সিটি-কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মশায়ের পরামর্শ ও সাহায্যে একটি মহৎ কাজ আরম্ভ ক'রেছিলেন। এদেশে বধিরমূকদের শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় কল্‌কাতা বধিরমূক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার। তাঁর একটি ছোট ইংরেজি জীবনচরিত পেয়ে প্রীত হয়েছি।

—

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত" বিরোধী সভা

সম্প্রতি কল্‌কাতায় "সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত" (Communal Decision) বিরোধী একটি সভার অধিবেশন হ'য়ে গেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর উদ্বোধন করেন এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির কাজ করেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার এই যে সিদ্ধান্ত, এটাকে ব্রিটিশ সরকার সালিসী রোয়দাদ ("Award") ব'লে চালাতে চান। মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডন্যাল্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে এটা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁকে ভারতবর্ষের কোন দলেরই লোক সালিস মানে নি।

এর বিরুদ্ধে এখন নূতন ক'রে লিখবার বলবার কিছু না-থাকলেও এর প্রবল প্রতিবাদ বরাবর হওয়া উচিত ও আবশ্যক। কংগ্রেস তো এটাকে এক রকম মেনেই নিয়েছেন। কিন্তু এক সময় কংগ্রেসী "জাতীয়" দলের সব প্রদেশেরই সভ্যেরা এর প্রতিবাদ করতেন। এখন এবার কেবল বঙ্গের রাজধানী কল্‌কাতায় প্রতিবাদ হ'ল। এটা দ্বারা বঙ্গেরই সব চেয়ে ক্ষতি হ'য়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষতি হয় নি মনে করলে খুব ভুল করা হবে। কোন মানুষের একটা হাত একটা পা একটা আঙুল···যদি আহত হয়, তা হ'লে সেই মানুষকে সুস্থ সবল বলা যায় না। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলের লোককে দুর্বল করলে সমস্ত দেশটাকেই দুর্বল করা হয়। অথচ যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা মনে করেছেন, তাঁরা "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" (provincial autonomy) পেয়েছিলেন, এটা তাঁদের লাভ, সমগ্র ভারতবর্ষের লাভ; বাংলা দেশের ক্ষতিটা যে তাঁদের বেদনার কারণ হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বাংলা দুর্বল হওয়ায় সারা ভারত দুর্বল হয়েছে, তাঁদের এ রকম কোন ধারণা হ'য়েছিল, তা বোঝা যায় নি।

সব প্রদেশের পরস্পর সহানুভূতি ভিন্ন দেশ কখনো শক্তিশালী হতে পারবে না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা বিরোধী সভা বাঁটোআরাটার বিরোধী সব সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে করলে ভাল হয়। বাঙালী খ্রীষ্টীয়ানরা এর বিরোধী। অনেক বাঙালী মুসলমানও এর বিরোধী।

—

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

ওয়ার্ধা, ১লা সেপ্টেম্বর।

গান্ধী সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত সেপ্টেম্বরের 'সর্বোদয়' হিন্দী পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন :—

"মৃত্যুহীন গুরুদেবের প্রাণ। মৃত্যুর মধ্যেই তিনি অমৃত হইয়া বিরাজ করিবেন। ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া গুরুদেব বিশ্বের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বমঙ্গলের চিন্তা করিতে করিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহ লোকান্তরিত হইয়াছে—তাঁহার আত্মা অবিনশ্বর।

এই দিক হইতে চিন্তা করিলে কেহই মরে না, কেহই জন্মায় না—"ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা।" গুরুদেব ভাস্বর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বিশ্বপ্রেম—পারমার্থিকতার

মধ্য দিয়া তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী—তাঁহার কর্ম্মধারার বহিঃপ্রকাশ। ইহারাই ছিল তাঁহার প্রাণ—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আপন প্রাণ দিয়াছেন, গুরুদেবও ইহার কথা ভাবিতে ভাবিতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। উর্দ্ধলোক হইতে তিনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন—গুরুদেবের প্রতি আমাদের প্রকৃত সম্মান দেখান হইবে এইগুলিকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়া। —এ, পি

—

যুদ্ধোদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ-আমেরিকান্ ঘোষণা

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট সমুদ্রের উপর সাক্ষাৎকারের পর বর্তমান যুদ্ধটার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত ঘোষণাপত্র রচনা করেন। রয়টার কর্তৃক প্রচারিত সেটি এই :—

The President of the United States and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing his Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for better future for the world.

First.—Their countrie seek ggrandisement, territorial or other.

Second.—They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.

Third.—They respect the right of all peoples to choose the form of Government under which they will live and they wish to see Sovereign rights and Self-Government restored to those who have been forcibly deprived of them.

Fourth.—They will endeavour, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access on equal terms to trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.

Fifth.—They desire to bring about the fullest collaboration between all nations, in the economic field with the object of securing for all improved labour standards, economic advancement and social security.

Sixth.—After the final destruction of Nazi tyranny, they hope to see the establishment of a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries and which will afford assurance that all men in all lands may live out their lives in freedom from fear and want.

Seventh.—Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.

Eighth.—They believe that all nations of the world for realistic as well as spiritual reasons must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea, or air armaments continue to be employed by nations which threaten or may threaten aggression outside their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armament.

গত মহাযুদ্ধ এত বৎসর আগে হয়ে গেছে, যে, আজ-কালকার নবীন যুবকরা তখন পৃথিবীতে আসেন নি কিংবা শিশু ছিলেন; তাঁরা তখনকার সমকালিক খবরের কাগজ থেকে তার কথা কিছু পড়তে পারেন নি, এখন ইতিহাসে পড়তে পারেন। তখন আমেরিকার তাৎকালিক রাষ্ট্রপতি উইলসন সেই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি চৌদ্দ-দফা বিবৃতি দিয়েছিলেন। তখন বলা হ'য়েছিল যে, পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপন এর উদ্দেশ্য এবং এর শেষে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব জাতি ও দেশ নিজের নিজের শাসনপ্রণালী বেছে নেবার অধিকার ("self-determination") পাবে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের চৌদ্দ-দফা বিবৃতি ইতিহাসের পাতায় আছে, সে অনুসারে কাজ হয় নি; ইয়োরোপের তখনকার দু-একটা পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, আবার পরাধীন হয়েছে; এশিয়া আফ্রিকার কোন দেশ স্বাধীনতা পায় নি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারও পায় নি।

আমরা ভারতবর্ষের কথাই স্বভাবতঃ বেশী ভাবি। গত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ সেল্ফ্-ডিটার্মিনেশ্যনের অধিকার পায় নি। তার প্রধান কারণ এই যে, ভারতের প্রভু ব্রিটেন বিশ্বাস (?) করেন ভারতবর্ষ ব'লে কোনো একটা দেশই নেই, সুতরাং তার সেল্ফ্‌ও (স্বও) নেই; যেমন যার মাথা নেই তার মাথাব্যথা হতে পারে না, তেমনি যে-দেশ নাই, যার "স্ব" নাই, তার স্বনির্বাচিত শাসনবিধি ও শাসনপ্রণালীও থাকতে পারে না।

প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যে ঘোষণাপত্র রচনা ও প্রচার করেছেন, তার আটটি দফার দশা রাষ্ট্রপতি উইলসনের চৌদ্দ-দফার মত হবে কি না, কেমন ক'রে বলব? মাসিক পত্রের পাতায় ত রইল; পরবর্তী কালের নবীন যুবকেরা ঘোষণা এবং তদনুযায়ী কাজের বা অ-কাজের তুলনা করতে পারবেন। ঘোষণাপত্রটির সার মর্ম দু-একটা টিপ্পনীসমেত নীচে দিচ্ছি।

(১) ব্রিটেন ও আমেরিকা রাজ্যবিস্তার দ্বারা বা অন্য রকমে আরও বড়ত্ব চাচ্ছেন না।—আমেরিকার ভূসম্পত্তি যুদ্ধটার ফলে সম্ভবতঃ বাড়বে না, ব্রিটেনের বাড়তেও পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় এরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও অনেক নিযুত বর্গমাইল ভূভাগ ব্রিটেনের থালায় 'আপ্‌সে' ম্যাণ্ডেট ইত্যাদি ব্যাপদেশে এসে প'ড়েছিল।

(২) মিত্রদ্বয় কোন সাম্রাজ্যের, রাজ্যের বা দেশের এমন কিছু পরিবর্তন চান না যেটা তথাকার লোকদের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত অভিলাষের অনুযায়ী নয়।—ঠিক কথা! দেশের লোকদের স্বাধীন ভাবে প্রকাশিত অভিলাষ যে কি, তা প্রমাণ করা—পরাধীন দেশের বিদেশী

প্রভুদের বিশ্বাসজনক ও সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করা—হয়ত অসম্ভব, সুকঠিন ত বটেই। ভারতবর্ষের কথাই ধরুন না। ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনতা চায়, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অধীনতার বাইরে যেতে চায়, এবং সেই চাওয়াটার রকম যে-যে ক্ষেত্রে প্রভুদের পছন্দসই হয় নি ও হচ্ছে না, সেই সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীরা জেলে গেছে বা অন্য নানা রকম দুঃখ ভুগেছে। তোমরা যদি বল, ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতা চায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকতে চায় না, তার উত্তরে ব্রিটেন বিস্তর ভারতীয়কে হলপ করিয়ে বলাতে পারবেন—মুসলিম লীগকে ও আরও অনেককে—যে, তারা স্বাধীনতা চায় না, জন্মজন্মান্তরে ব্রিটেনের আশ্রয়ে থাকতে চায়।

(৩) মিত্রদ্বয় সব দেশের লোকদের নিজ নিজ শাসন-প্রণালী নির্বাচনের অধিকার মানেন এবং যারা নিজের দেশের প্রভুত্ব ও স্বায়ত্তশাসন হারিয়েছে তা তাদিগকে ফিরিয়ে দিতে চান।—এই সাধু ইচ্ছাটা ভারতের বেলায় খাটবে কি? লক্ষণ ত সে-রকম নয়।

(৪) তাঁরা তাঁদের বর্তমান দায়িত্বের সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রেখে, জয়ী বা পরাজিত ছোট বড় রাষ্ট্রকে বাণিজ্যের ও কাঁচামাল পাবার সমান সুবিধা দেবার চেষ্টা ক'রবেন।—গোড়ার আটটা শব্দের মধ্যে এমন একটা সর্ত প্রচ্ছন্ন আছে যার সাহায্যে ব্রিটেন ও আমেরিকা এই চতুর্থ দফা অনুসারে কাজ না-করতেও পারবেন। স্টেট বা রাষ্ট্র কাকে বলে তা নিয়েও তর্ক উঠবে। যে-দেশ স্বাধীন নয়, সেটা (যেমন ভারতবর্ষ) স্টেট বা রাষ্ট্র কি না, সুতরাং বাণিজ্যের ও কাঁচা মাল পাবার সমান সুবিধা পেতে পারবে কি না, সে বিষয়ে অনায়াসেই সন্দেহ ও তর্ক উঠতে পারে।

(৫) তাঁরা পণ্যশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে সব নেশ্যনের মধ্যে পূর্ণতম সহশ্রমিতা (collaboration) ঘটাতে চান, উন্নততর শ্রমিক মান ও আদর্শ (improved labour standards), অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা সকলকে দেবার জন্যে।—ভারতবর্ষ যে নেশ্যন নয়, তা তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ব'লেই দিয়েছেন। সুতরাং এই ৫ম দফা থেকে আমরা কী বা আশা করতে পারি?

(৬) নাৎসি অত্যাচার-স্বেচ্ছাচারের শেষ বিনাশের পর মিত্রদ্বয় এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করেন যা সকল জাতিকে নিজেদের দেশের সীমানার মধ্যে নিরাপদে বাস করবার উপায় করে দেবে এবং যা এরূপ নির্ভরযোগ্য আশ্বাস দেবে যে, সব দেশের সব মানুষ ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত যাপন করতে পারবে।

—আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে এ রকম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে আনন্দিত হব। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন না-হ'লে, শুধু ভারতে শান্তি নয়, বিশ্বশান্তিও সম্ভবপর হবে না। সুতরাং খোলাখুলি এই প্রশ্ন ভারতবর্ষ করছে, "যুদ্ধের অবসানের পর অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হ'তে দেওয়া হবে কি না।"

"নিজেদের দেশের সীমানার মধ্যে নিরাপদে বাস করবার" কথায় ভয় হচ্ছে, যুদ্ধের অবসানের পরেও ভারতীয়দিগকে এখনকারই মত ব্রিটিশ উপনিবেশ ও অন্য নানা দেশে যাওয়া-আসা করতে বাধা দেওয়া হবে!

(৭) সব মানুষকে সাগর সমুদ্র বিনা বাধায় অতিক্রম করতে সমর্থ করা এ রকম শান্তির উচিত?

—ভারতবর্ষের নিজের জাহাজে তারা যেতে পারবে তো? তাহ'লে আরম্ভেই চাই, ভারতের সমীপবর্তী সমুদ্রের উপকূলের পাশ দিয়ে দিয়ে জাহাজ চালাবার একচেটিয়া অধিকার ভারতীয়দের। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুত্ব থাকতে ভারতীয়েরা সে অধিকার পাবে না।

(৮) মিত্রদ্বয় বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক কারণ প্রযুক্ত পৃথিবীর সকল জাতিকে বলপ্রয়োগ পরিত্যাগ করতে হবে; যে-সব জাতি নিজেদের সীমানার বাইরে অন্যের প্রতি আক্রমণ চালায় বা চালাবার ভয় দেখায় তারা যদি জল-স্থল-আকাশে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে থাকে, তা হলে কোনো ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষিত হ'তে পারে না ব'লে, মিত্রদ্বয় বিশ্বাস করেন যে, ব্যাপকতর ও স্থায়ীতর সাধারণ নিরাপত্তা প্রণালী যে-পর্যন্ত স্থাপিত না-হচ্ছে, সে-পর্যন্ত ঐ আততায়ী জাতিসমূহকে নিরস্ত্র করা একান্ত আবশ্যক। শান্তিপ্রিয় জাতিদের উপর অস্ত্রসম্ভার-ব্যয়ের নিষ্পেষক বোঝা হাল্কা করবার অন্য সব কেজো ব্যবস্থাতেও তাঁরা সাহায্য করবেন ও উৎসাহ দেবেন।

—অষ্টম দফাটার মানে বোধ হয় এই যে, জার্মেনী পরাজিত হবার পর তাকে ও তার মিত্র ইটালীকে নিরস্ত্র করা হবে (জাপানকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা বোধ হয় ভায়ারা করবেন না!), কিন্তু ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা... অস্ত্রসজ্জা ত্যাগ করবেন না। এ রকম একপেশে নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা স্থায়ী শান্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। পৃথিবীতে কি কেবল জার্মেনীই এই প্রথম অন্য দেশ আক্রমণ করেছে? আর সব সশস্ত্র দেশ কি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অহিংসাধর্ম অবলম্বন ও পালন ক'রে

আসছে? কোনো স্বাধীন প্রবল সশস্ত্র জাতির পক্ষেই "আমরা বড় সাধু" এরূপ কথা ও ভাবভঙ্গী নিতান্ত হাস্যকর।

গত মহাযুদ্ধের পর তো জার্মেনীকে নিরস্ত্র করবার ও রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল; সে ব্যবস্থা সার্থক হয়েছে কি?

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধি-দের নিয়ে যে বৃহত্তর কমীটি গঠিত হ'য়েছিল, সেই বিশেষ কমীটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন সম্পর্কে কোন আপোষ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে না পারায় সিলেক্ট কমীটি বিলটি যে আকারে প্রেরণ ক'রেছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তার আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে গত ১৬ই ভাদ্র। রায় হরেন্দ্র-নাথ চৌধুরী আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, নিম্নোক্তরূপে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করবার নির্দেশ দিয়ে বিলটিকে আবার সিলেক্ট কমীটিতে প্রেরণ করা হোক। তাঁর প্রস্তাবটি এই :—

(১) এইরূপে মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞার সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে উহা দ্বারা ঐ পর্য্যায়ের ধর্ম্মসংস্রবহীন শিক্ষা এবং কারিগরী কৃষি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বুঝাইবে। (২) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কার্য্যকরী পরিষদ ও অন্যান্য কমিটিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষামূলক ও অ-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে উহাতে কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে না। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে স্কুল পরিচালকমণ্ডলীর এবং কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) এই ভাবে প্রস্তাবিত ধারাসমূহের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে সরকারী ও বাহিরের প্রভাব বর্জ্জিত হইয়া বোর্ড একটি সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। (৪) স্কুলসমূহকে অনুমোদন প্রদান ও তাহাদিগকে সাহায্য মঞ্জুরীর সর্ত্তাদি নিরূপণের জন্য এক বা একাধিক ধারা যোগ করিতে হইবে। (৫) বর্ত্তমানে যে সমস্ত হাই স্কুল আছে সেগুলির রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য এই মর্ম্মে একটি ধারা যোগ করিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সহিত স্থায়ীভাবে যুক্ত আছে সেইগুলিকে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে গঠিত বোর্ডের স্থায়ী অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। (৬) বর্ত্তমান স্কুলগুলির সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা করিতে হইবে ও শিক্ষকদিগকে অবসরকালীন ভাতা প্রদানের পরিকল্পনা করিতে হইবে। (৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার (তাহার নাম ম্যাট্রিকুলেশন হউক বা অন্য কিছু হউক) পাঠ্যতালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন-ক্রমে গঠন করা হইবে, এই মর্ম্মে এবং যদি যথেষ্ট ক্ষতিপূরণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে পরীক্ষা ব্যবস্থা সরাইয়া লওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সম্মত কমিটির হস্তে প্রদান করা হইবে, এই মর্ম্মে বিলে সুস্পষ্ট সর্ত্ত সংযোগ করিতে হইবে। (৮) প্রকাশক কমিটির ব্যবস্থা বাদ দিয়া তাহার স্থলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কমিটির ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) সমস্ত মাদ্রাসা এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল হইতে বাদ দিতে হইবে। (১০) গবর্ণমেণ্ট স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১১) বোর্ডের কার্য্য আরম্ভ হইলেই ইন্‌স্পেক্টার বিভাগকে বোর্ডের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯৪১ সনের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রস্তাবটি সুচিন্তিত। এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে সুফল হবার আশা করা যেতে পারে। (১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৮।)

—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততি পূর্তি

গত আগস্ট মাসে শিল্পাচার্য ও শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে যে জয়ন্তী উৎসব হওয়া উচিত, তা আমরা বাংলায় ও ইংরেজীতে অনেক আগে লিখেছিলাম। জয়ন্তী যথাসম্ভব সমারোহ সহকারে আগেই হ'ত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে হওয়া সম্ভবপর হয় নি। তথাপি শান্তি-নিকেতনে এবং শান্তিনিকেতন থেকে কল্‌কাতায় আগত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা কল্‌কাতায় তিনি যে অভিনন্দিত হয়েছেন ও তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপহার দেওয়া হয়েছে—সর্বাগ্রে এই অনুষ্ঠান দুটি হওয়া স্বাভাবিক ও যথাযোগ্য হয়েছে। প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে, তাতে পাঠকেরা দেখবেন রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন, কবি কিন্তু তা সস্নেহে অগ্রাহ্য করেন। তার পর অবনীন্দ্রনাথ দ্বিরুক্তি করেন নি।

শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর কতকগুলি ছবি স্লাইডের সাহায্যে দেখান হয়েছিল। অবনীন্দ্রবাবুর শিষ্য নন্দলালবাবু তাঁর সম্বন্ধে কিছু ব'লে-ছিলেন। নন্দলালবাবুর ভাষণের সার কথাগুলি একটি প্রবন্ধের আকারে অন্যত্র মুদ্রিত হ'ল।

শান্তিনিকেতন যে কর্তব্য পালন করেছেন, তার বাইরের শিল্পিগণকে ও সমগ্র জাতিকেও তা ক'রতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যা করেছেন, তা অতুলনীয় ও অনতিক্রান্ত। তিনি শুধু স্বয়ং মহাশিল্পী নন, তাঁর কাছে শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পেয়ে তাঁর অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য শিল্পী হয়েছেন, এবং প্রকৃত শিল্পের দিকে এদেশের মানুষের চোখ খুলেছে। তিনি যদি বড় শিল্পী না

হ'তেন, তা হ'লে নিপুণ সাহিত্যিক ব'লেও তাঁর খ্যাতি হ'ত। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি সামান্য নয়। আবার তিনি যন্ত্রসঙ্গীতেও ওস্তাদ। এমন গুণী মানুষের সংবর্ধনা করবার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্য।

—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা

গত ১৬ই ভাদ্র কল্‌কাতার টাউন হলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আবরণ উন্মোচন করেন। টাউন হলে কেশবচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি ছিল। সেটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে স্থানান্তরিত হয়েছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রতিকৃতিটির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষ্যে ইংরেজীতে যা বলেন, বাংলায় তার তাৎপর্য এই :—

"আজ আমরা এমন একজন মহাপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি, যিনি সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জাতির ভাগ্যগগনে উদিত হইয়া দেশকে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন; তিনি স্বনামখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন। তখনকার দিনে ইয়োরোপবাসীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিত না! যদিও ইয়োরোপে তখন রাজা রামমোহন রায়ের মত একজন বিখ্যাত ভারতবাসীর সমাধি-মন্দির বিরাজ করিতেছিল, তথাপি ভারতবর্ষ ও ভারতের জনসাধারণ সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না—এমন কি রাজা রামমোহনের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান অতি সামান্যই ছিল। যখন কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতা লইয়া আবির্ভূত হইলেন, তখন সেই সুদূর দেশের সাধারণ লোকও চমকিত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্রের বাক্যের ইন্দ্রজালে তাহারা বিস্মিত ও অভিভূত হইল। কিন্তু কোন্ জাদুমন্ত্রে কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে বশ করিলেন? কি ছিল তাঁহার বাণী? যে পুরুষপ্রবর ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব অনুভব করিয়াছেন, যিনি প্রতিদিন সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির উৎস সাধারণ লোক কি করিয়া বুঝিবে? কেশবচন্দ্র প্রচার করিয়াছেন স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী। আমরা আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আলোচনা করি, কিন্তু তিনি প্রচার করিয়াছেন, মানুষের আত্মার মুক্তির বাণী। সে মুক্তি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারকে চূর্ণ করিয়া মানব সমাজকে এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। এই আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী পরবর্ত্তী যুগে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক মুক্তির বাণী বহিয়া আনিয়াছে। সুতরাং কেশবচন্দ্রকে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিমন্ত্রের এক দীক্ষাগুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব এই মহাপুরুষের একখানি প্রতিকৃতি কলিকাতা নগরীর কেন্দ্রস্থলে এই "টাউন হলে" স্থাপন করা খুবই যুক্তি-সঙ্গত।

আমার মনে হয় যে, সর্ সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তির ন্যায় কেশবচন্দ্রেরও একটি প্রতিমূর্ত্তি এসপ্লানেডের সন্নিকটে স্থাপিত হওয়া উচিত এবং তাঁহার রচনাবলী বেতারকেন্দ্র হইতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। কেশবচন্দ্র মহান্ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তরাধিকারী, সুতরাং আমাদের দায়িত্ব যে কত গুরুতর তাহা যেন আমরা কখনও না ভুলি।"

—

"রবীন্দ্রনাথ ও মহাজাতি-সদন"

উপরে মুদ্রিত নাম দিয়ে আমি সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে একটি ছোট নোট লিখেছিলাম। সেইটি উপলক্ষ্য ক'রে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁর দলের দুটি দৈনিকে দীর্ঘ ইংরেজী ও বাংলা বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতির দৈর্ঘ্যে এবং তাতে অনেক অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা ও গালাগালি থাকায় আসল আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়টি চাপা পড়বার ও পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঘটেছে। আমার ইংরেজী নোটটি প্রবাসীর সব পাঠকের চোখে না পড়তে পারে। সেই জন্যে সেটি নীচে উদ্ধৃত হ'ল।

RABINDRANATH AND MAHAJATI-SADAN

It is a well-known fact that Rabindranath Tagore performed the opening ceremony of what was intended to be the Mahajati-Sadan or Congress House, and he delivered an inspiring address on the occasion in Bengali. It was he who gave the name Mahajati-Sadan to the house to be built on the site selected for the purpose.

These facts and the desire expressed by the public to do something to perpetuate Rabindranath Tagore's memory are being utilized to induce the public to subscribe for the completion of the building on the understanding that it or a part of it is to be named after the Poet.

We are entirely opposed even to the consideration of any other Tagore memorial before the Visva-Bharati has received all the help that the people can give it.

But apart from that fact, we have a few questions to ask:

1. To whom do the site and the unfinished building now belong? To Government, the Calcutta Corporation, or any private party?

2. So far as our information goes, the property does not now belong to any non-official person or persons. So how can any money subscribed for completing the building be utilized for the purpose?

3. But supposing the money subscribed for the purpose can be utilized for completing the building, to whom will it belong after completion?

4. When Sj. Subhas Chandra Bose was in our midst, he was in possession of the property. But now that his whereabouts are unknown and he does not own any property, can any non-official person or party own any property of which he was in possession before he disappeared?

5. But supposing the property in question can somehow come into non-official possession, why are not trustees representing the different nationalist parties in the country appointed to hold and administer it?

6. Is it not an admitted fact that Rabindranath Tagore did not belong to any party?

7. And, therefore, is it not quite plain that his name should not be exploited for party purposes?

প্রবাসী বাংলা কাগজ। সেই জন্যে শরৎ বাবুর বাংলা বিবৃতি অবলম্বন করেই কিছু ব'লব।

এই বিবৃতিতে তিনি আমার উদ্দেশে "নীচতা", "জঘন্যভাবে", "নাম ভাঁড়ান", এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তার কোন উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁর বিবৃতির উত্তর দফায় দফায় দেওয়াও অনাবশ্যক। মডার্ণ

রিভিয়ুতে আমার নোটটি লিখবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাঁরা রবীন্দ্রাথের "স্মৃতিরক্ষা"র জন্যে টাকা দেবেন, তাঁরা সর্বাগ্রে বিশ্বভারতীতে টাকা দিন্, এই নিবেদন করা; বিশ্বভারতীতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হ'য়ে গেলে তবে তাঁরা অন্য স্মারক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিলেই ভাল হয়। আমার ধারণা ছিল, যে, চাঁদা সংগ্রহ ক'রে মহাজাতিসদন সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা হচ্ছে। শরৎবাবু তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন :—

"আমার বক্তব্য এই যে আমার প্রস্তাবে জনসাধারণকে শোষণ করা ত দূরে থাকুক, যে সম্পত্তির বর্তমান মূল্য নিতান্ত নগণ্য নহে, তদ্দ্বারা কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার কথাই বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাম অনুসরণে মহাজাতিসদন অথবা তাহার কোন অংশের নামকরণ করা হইবে, এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া গৃহটির নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য জনসাধারণকে চাঁদা দিতে প্ররোচিত করা হইতেছে, একথা মোটেই সত্য নহে।"

মহাজাতি-সদন সম্পূর্ণ করবার জন্যে "এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া" জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে না, হয় নি, বা হবে না, এই মর্মের উক্তি অনুসারে কাজ হ'য়ে থাকলে ও হ'লে তা খুবই সুখের বিষয়।

আমার ধারণা এই যে, মহাজাতি-সদন নামক সম্পত্তিটিতে এখন বেসরকারী কারো হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা নেই। শরৎ বাবুও ব'লছেন, "উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে ক্রোকবদ্ধ", "বিষয়টি এক্ষণে বিচারাধীন।" আমার বক্তব্য, সম্পত্তিটি বিচারান্তে ক্রোকমুক্ত হ'য়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসমষ্টি-বিশেষের হাতে আসবার পর তবে রবীন্দ্রনাথের নাম তার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব সঙ্গত ভাবে উঠতে পারত। এখন সে প্রস্তাব অ-যথা-সাময়িক (premature)।

ট্রষ্টী নিয়োগ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, জমীটি ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে পাবার পরই ট্রষ্টী নিয়োগ ক'রলে সম্ভবতঃ সম্পত্তিটি ক্রোক হ'ত না। আমি আইনজ্ঞ নই, সুতরাং আমার ভুল হ'তে পারে।

মডার্ন রিভিয়ুতে আমি যে নোটটি লিখেছি, সেটি ইংরেজীতে লেখা। তার ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রশ্নে আমি ইংরেজী "পার্টি" (party) শব্দটি ব্যবহার ক'রেছি এবং নোটটিতে এই মত প্রকাশ ক'রেছি যে, রবীন্দ্রনাথ কোন পার্টির লোক ছিলেন না। পার্টি শব্দটি আমি রাজনৈতিক দল উপদল অর্থে ব্যবহার করেছি। বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি ধর্মোপদেষ্টারা ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের শিক্ষার ফলে যে ক্রমবর্ধমান শিষ্যানুশিষ্যের সমষ্টি গ'ড়ে উঠেছিল, তাদিগকে কেও পার্টি বলে না— ইংরেজিতে বলে না, বাংলাতেও বলে না। বাংলায় বলে ধর্মসম্প্রদায়। লুথার ইগ্নেশ্যাস লয়লা প্রভৃতির উপদেশের ফলে যে-সকল সমষ্টি গ'ড়ে উঠেছে তাদিগকে ইংরেজিতে কেও পার্টি বলে না, সেক্ট অর্ডার্ ইত্যাদি বলে; বাংলায় বলে উপসম্প্রদায়। ধর্মসম্প্রদায় ধর্মসমাজ ইত্যাদি সমষ্টি বুঝাতে যে ইংরেজিতে পার্টি শব্দ ব্যবহৃত হয় না, তা ওএবস্টারের ইণ্টারন্যাশন্যাল অভিধানে পার্টি শব্দের ব্যাখ্যা হ'তে বোঝা যাবে; পার্টির যে-সব সংজ্ঞা এই অভিধানে আছে তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই।

রবীন্দ্রনাথ কোন পার্টির বা দলের ছিলেন না, আমার এরূপ মন্তব্যে আমি পার্টি বা "দল" কথাটা এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার ক'রেছি, সবাই এই রকম বুঝবেন আশা ক'রেছিলাম! বুদ্ধ যীশু প্রভৃতিকে এক্ষেত্রে টেনে আনা অদ্ভুত ওকালতী।

প্রবাসীর সম্পাদক কোনো দলের কি না, তার বিচার সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

আমার শেষ প্রশ্ন ছিল :—

"7. And, therefore, is it not quite plain that his (Rabindranath's) name should not be exploited for party purposes?"

শরৎবাবুর বাংলা বিবৃতিতে এর এই ভ্রান্তিজনক অনুবাদ করা হয়েছে :—

"সপ্তম প্রশ্ন :—কাজেই তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) নাম ভাঁড়াইয়া দল বিশেষের স্বার্থসাধন করা হইবে না, স্পষ্ট রূপে এ কথা বোঝা যাইতেছে না।"

এমন আজব তর্জমা আমি কমই দেখেছি। নাম "এক্সপ্লয়েট" করার মানে "নাম ভাঁড়ান" হয়, তা আমার জানা নাই। এই কদর্থের কথা বাদ দিলেও, আমার প্রশ্নটির ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। ঠিক্ অনুবাদ এই :—

"অতএব ইহা কি সম্পূর্ণ স্পষ্ট নহে যে, তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) নাম দলগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক্সপ্লয়েট্ করা উচিত নয়?"

শরৎবাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এবং তার উপর মন্তব্য করতে গিয়েও "নাম ভাঁড়ান" শব্দ দুটা ব্যবহার করেছেন। যথা :—

"উত্তর। রামানন্দবাবু প্রতিপাদ্য বিষয়টি যত সহজ মনে করিয়াছেন, উহা তত সহজ নহে। মডার্ণ-রিভিয়ু পত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঁড়াইয়া দলগত স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ তেমন ভাল শোনায় না। রবীন্দ্রনাথের নামে মডার্ণ-রিভিউ ও প্রবাসী যে ব্যবসায়গত সুবিধা পাইয়াছে তাহা উক্ত মাসিকপত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই প্রমাণিত হয়।"

আমাকে পুনর্বার বল্‌তে হচ্ছে আমি কারো বিরুদ্ধে "নাম ভাঁড়ানো"র অভিযোগ করি নি।

অনেক বৎসর ধ'রে আমি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তাঁর

বাংলা ও ইংরেজী বিস্তর রচনা এবং তাঁর বাংলা রচনার ইংরেজী অনুবাদ ছেপে আস্‌ছি। তাঁর লেখা চিঠিপত্র ছাপবার অনুমতি পেয়ে তাও ছেপে আস্‌ছি এবং পরেও ছাপ্‌ব। অন্যান্য কাগজের মত আমার কাগজ দুটাতেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যাদি সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরয়। এতে আমার ব্যবসাগত সুবিধা অবশ্যই হ'য়েছে ও হবে। এরূপ ব্যবসা ও ব্যবসাগত সুবিধাভোগ বিন্দুমাত্রও দোষের নয়। কেবল দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত কল্পনাই এতে "নাম ভাঁড়ানো"র ইঙ্গিত আমদানি করতে পারে। কিন্তু আমার ব্যবসা ও ব্যবসাগত সুবিধা দোষের হোক বা না হোক, তার উল্লেখ শরৎ বাবু কেন করলেন? আমি যদি তাঁর আইন-ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবসা (যদি তা থাকে) নিয়ে তর্ক তুলতাম, তা হ'লেই তার জবাবে আমার ব্যবসার কথা তোলা সঙ্গত হ'ত। কিন্তু আমি তো এরূপ বলি নি, ইঙ্গিতও করি নি, যে মহাজাতি-সদন তাঁর একটা ব্যবসা।

"যুগান্তর"ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মডার্ন রিভিয়ু"কে সমর্থন ক'রেছেন।

—

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ

বর্ধমানের পরলোকগত মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ বাংলা দেশের প্রধান জমিদার ছিলেন। তিনি জমিদার শ্রেণীর সমুদয় অধিকার রক্ষা বিষয়ে খুব আগ্রহশীল থাক্‌লেও রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রগতিশীল (Progressive) দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্‌, সংস্কৃতিমান এবং স্বাধীন-চিন্তাশীল ছিলেন। এক সময়ে বঙ্গের শাসনপরিষদের সদস্যের কাজ তাঁর দ্বারা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ইম্পীরিয়াল কন্‌ফারেন্সে তিনি ভারত-গবন্মে'ণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। বর্ধমানে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেছিলেন, তার অভ্যর্থনা-সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন এবং বর্ধমানে তার অধিবেশন তাঁরই উদ্যোগে ও আহ্বানে হ'য়েছিল। তাঁর নিজের লেখা সুরচিত অভিভাষণটি তিনি বাগ্মিতার সহিত প'ড়েছিলেন। সেই অধিবেশনের প্রতিনিধিরা তাঁর আতিথ্য ভুলতে পারবেন না। তাঁর নিজের লেখা কয়েকটি বই ও কিছু গান আছে। বোম্বাইয়ের বেদল নেতাদের কনফারেন্সে তিনি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত জাতীয় গবন্মে'ণ্টের সমর্থন ক'রেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে যাপন করেছিলেন। সে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল।

—

পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র রায় বিদ্যারত্ন

উনআশী বৎসর বয়সে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র রায় বিদ্যারত্নের মৃত্যু হ'য়েছে। তিনি দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান জর্নালিস্টস্‌ এসোসিয়েশনের অন্যতম সভ্য ও উপসভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং তিনি ইংরেজীর সুলেখক ছিলেন। তাঁর নির্মল চরিত্র এবং সস্নেহ ও সহৃদয় ব্যবহারে তাঁর ছাত্রেরা তাঁর অনুরক্ত ছিল। ধর্মব্যাখ্যাতা ও আচার্যরূপে তিনি সমাজের হিতকর সেবক ছিলেন।

—

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে সকল দলের সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই চুক্তির নানা অনিষ্টকর ধারার দোষ দেখিয়ে এর বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত আবেদন ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্‌ কমার্স, মান্দ্রাজে সর্বদলীয় কন্‌ফারেন্সের কমীটি এবং ইম্পীরিয়্যাল ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এসোসিয়েশন ভারত-গবন্মে'ণ্টের বরাবরে পাঠিয়েছেন। আবেদনটি খুব দীর্ঘ।

—

বঙ্গের হাতের তাঁতের কাপড়ের প্রদর্শনী

গত কয়েক বৎসর যেমন কল্‌কাতায় ওএলিংটন স্কোয়্যারে হাতের তাঁতের কাপড়ের প্রদর্শনী হয়েছিল, এবারও সেই রকম হয়েছে। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এর উদ্বোধন করেন।

বাংলা দেশের তন্তুবায়েরা নানাবিধ দুঃখদৈন্যের মধ্যে বঙ্গের একটি শিল্পকে রক্ষা ক'রে আসছেন। তাঁদের এই দেশসেবার কাজটির প্রতিদান বাঙালী সমাজের করা একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু আমরা শুধু সেই জন্যে দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদিগকে আমাদের তন্তুবায়দের তৈরি কাপড় কিন্‌তে বলছি না। কাপড়গুলি সুন্দর ও টেকসই, এই জন্যেও বলছি। বেশী দামের কাপড় কিন্‌বার সামর্থ্য যাদের নাই, তাঁদের সামর্থ্যের উপযোগী ধুতি সাড়ী ছিটও এই প্রদর্শনীতে তাঁরা দেখতে পাবেন। এই প্রদর্শনীটি একবার অন্ততঃ দেখা সকলের উচিত।

শরৎ বাবুর মহাজাতি-সদন বিবৃতি সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য

৪ঠা সেপ্টেম্বরের "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

Parties may come and go. Public men may fight and contest. But in no such controversies the fundamental interests of the community or of the public generally should ever be subordinated to the petty considerations of private gain or the exigencies of a *caucus*. That, however, is not to be in this unfortunate Province. Immediately, for instance, on the passing away of Rabindranath Tagore which overwhelmed a whole nation with grief and an over-powering sense of irreparable loss in this crisis of history a suggestion was thrown in indecent haste that the public should be induced to subscribe for the completion of the *Mahajati-Sadan* on the understanding that the entire structure or part of it was to be named after the Poet.

In ordinary circumstances there was nothing in the proposal to which exception could be taken. But what are the circumstances? Are not the sponsors of the proposal aware of them? The *Visva-Bharati* which in a sense was the embodiment of the Poet's cherished ideals of cultural fellowship must not only be maintained in its present stature but strengthened and expanded for the fulfilment of the Poet's dreams. The suggestion made in connection with *Mahajati-Sadan* obviously carried with it the sinister implication that public attention should be diverted from the immediate needs of the Visva-Bharati, which are so many, to the exigencies of a political *caucus*. Besides, everybody knows that the legal status of the *Mahajati-Sadan* is now the subject-matter of a dispute before a competent court of law. It is not for us to pronounce any opinion on a matter which is *subjudice*. Without prejudice, however, to the legal issues involved one may refer to a simple fact. That fact is that whatever Mr. Subhas Bose's intentions originally were, nobody knows who the *Sadan's* trustees are. If, therefore, the court comes to the finding that it is Mr. Subhas Bose's personal property, it would be extremely difficult, if not impossible, to convert it into public property having regard to the fact that Mr. Bose's mind and whereabouts are not known. That being the case,—and Mr. Sarat Bose is a practising lawyer—this matter should not have been introduced in connection with a memorial to the Poet. It was, therefore, quite in the fitness of things that in the September issue of the *Modern Review* our esteemed countryman, Srijut Ramananda Chatterjee, should have sounded a note of warning against the thoughtless and mischievous move initiated by Mr. Sarat Bose. "These facts and the desire expressed by the public to do something to perpetuate Rabindranath Tagore's memory," writes the *Modern Review* "are being utilised to induce the public to subscribe for the completion of the building. . . . . We are entirely opposed even to the consideration of any other Tagore memorial before the *Visva-Bharati* has received all the help that the people can give it." Then our contemporary, quite rightly, proceeds to ask a few questions regarding the legal status of the *Mahajati-Sadan*. In reply, while evading the questions or seeking to cloud them by a smoke-screen of tendentious words, Mr. Sarat Bose poured down his vials of wrath upon the devoted head of Srijut Ramananda Chatterjee. What are things coming to?

১৮ই ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বরের "ভারত" প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিমন্দির সম্পর্কে মহাজাতি-সদনের দাবী আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রতি অশোভন উক্তি করিবার কোন অধিকার শরৎবাবুর নাই, স্থিরচিত্তে চিন্তা করিবার শক্তি থাকিলে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন. "রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার জন্য জনসাধারণ যে আগ্রহ দেখাইতেছেন মহাজাতি-সদন অথবা উহার একটা অংশকে কবির নামে নামকরণ করিবার কথা বলিয়া চাঁদা তুলিবার জন্য সেই আগ্রহকে কাজে লাগাইবার একটা চেষ্টা চলিতেছে।" শরৎবাবু এই মন্তব্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা শরৎবাবু যাহা করিতে চাহিতেছেন, বন্ধুদলের নামে তাহা করিতে পারেন, কলিকাতার সকল নাগরিকের নাম ব্যবহার করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। কলিকাতাবাসীর নামে কোন কাজ কেহ করিতে গেলে যে কোন নাগরিকের তাহার সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা আছে, সেই সমালোচনা অথবা মন্তব্য শুনিয়া চটিবার তাঁহাদের কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-মন্দির রূপে মহাজাতি-সদনের দাবীর কথা বিচার করিয়াছেন। মহাজাতি-সদনের জমি ও অর্দ্ধনির্ম্মিত গৃহ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নামে ছিল, আজ উহা সরকারের দখলে আছে। আইনজ্ঞ শরৎবাবু আইন দেখাইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ট্রাষ্টি নিয়োগ না করিয়া জমি ও গৃহ কেন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত নামে রাখা হইল তাঁহার কোন জবাব দেন নাই। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক কর্ম্মী, যে কোন সময় কারাবরণ করিবার অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা তাঁহার ছিল। মহাজাতি-সদন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত নামে থাকিলে ন্যায়তঃ উহা জনসাধারণের সম্পত্তি হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে ক্রোক হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই কারণেই বাঙ্গলা দেশের বসু বুলেটিনদ্বয় ব্যতীত অপর সমুদয় সংবাদপত্র ট্রাষ্টি নিয়োগ দাবী করিয়াছিল। আইনজ্ঞ শরৎবাবু আজ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে আইন দেখাইতে অগ্রসর হইতে লজ্জা বোধ করিলেন না, কিন্তু সেদিন আইনের অতি প্রয়োজনীয় কাজের কথাটাই ভ্রাতাকে বুঝাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজও তিনি শুধু ইহাই বলিতেছেন যে, ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হইবে, কিন্তু এখনও কেন করা হয় নাই এবং কেন করা হইতেছে না সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে নীরব।

রবীন্দ্রনাথও একটা দলভুক্ত লোক ছিলেন এই অনুযোগ করিয়া অপূর্ব্ব গবেষণাপ্রসূত থিওরী আওড়াইয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মার্টিন, লুথার, রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও একটা না একটা দলের লোক ছিলেন। উত্তেজনার আতিশয্যে বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়া শরৎবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন যে দল গঠন এবং নিস্বার্থভাবে সত্য ও আদর্শ প্রচার এক জিনিস নহে। বাঙ্গলা দেশের চরম ও পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এই প্রকার অহমিকাপূর্ণ এবং সমালোচনা-অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ এখনও দেশের নেতৃত্ব করিবার স্পৃহা রাখেন।

ডি্‌পার নদীর বিখ্যাত বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছে

রুশ শ্রমিকগণ
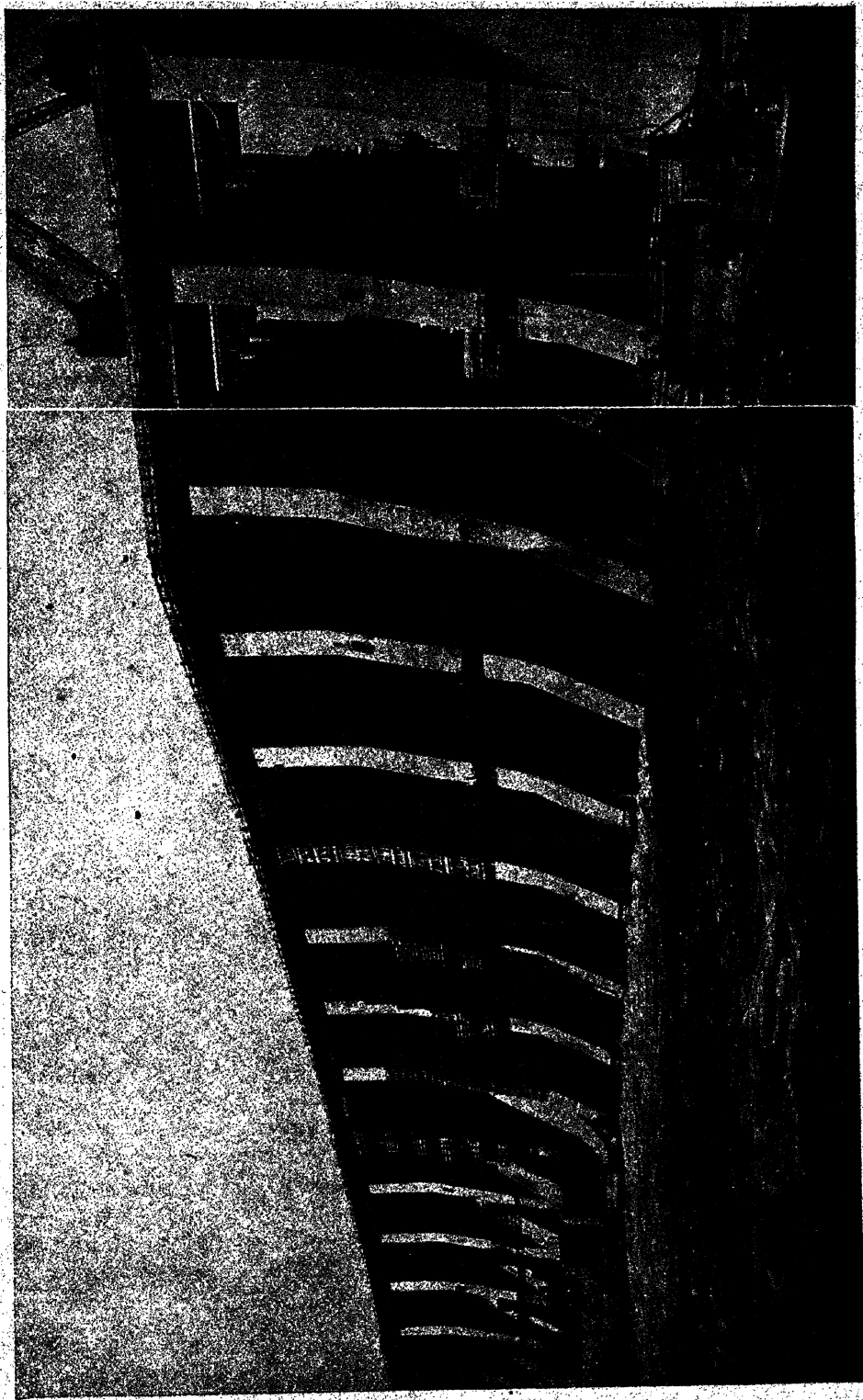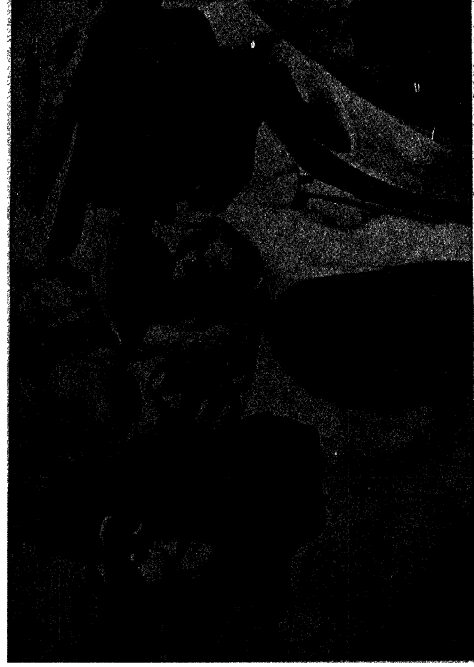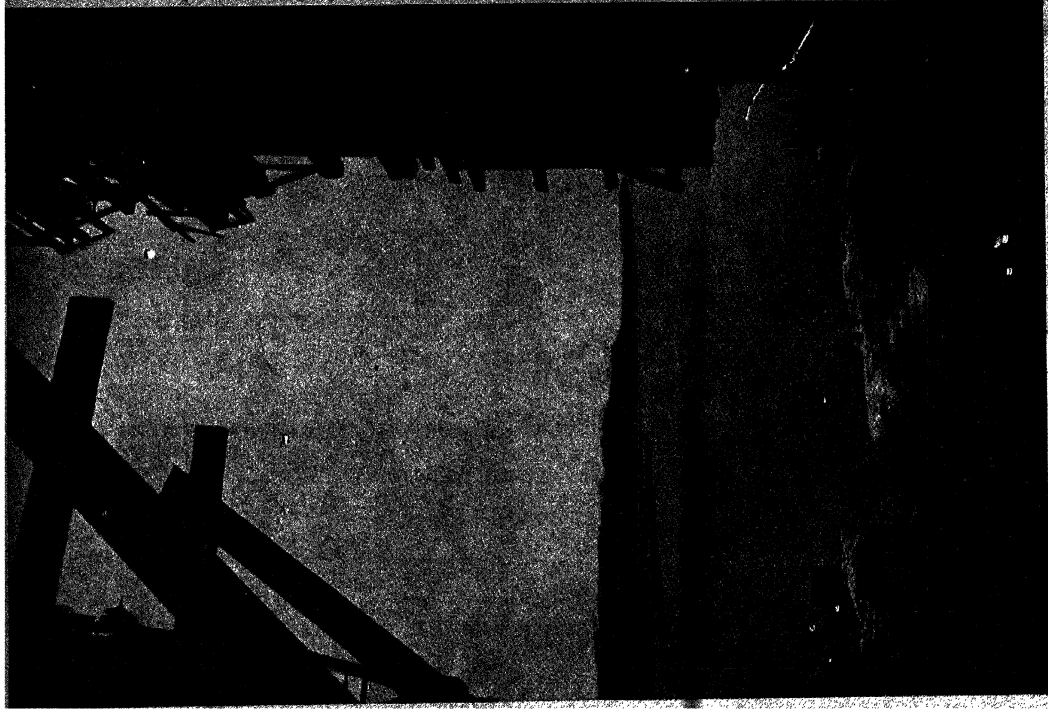
ডি্‌পারের দৃশ্য—ওপারে এখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে

রুশিয়ার সমস্যা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হইল। গত মহাযুদ্ধে এই সময় মিত্রপক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী, রুশিয়া, রুমানিয়া, পোর্ত্তুগাল, সার্ব্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও জাপান লড়িতেছে! আমেরিকা যুদ্ধে প্রবেশ করিতে তখনও ইতস্ততঃ করিতেছে এবং চীন মিত্রদলের সপক্ষে ও জার্ম্মান সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা জানাইয়াছে। বিপক্ষে তখন জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, বুলগারিয়া ও তুর্কি লড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের পশ্চিম প্রান্তে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখন আক্রমণ করিয়া বিপক্ষকে হটাইতে চেষ্টা করিতেছে, পূর্ব্ব প্রান্তে রুশ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও লড়িতেছে, তুর্কি সাম্রাজ্য নানা দিক হইতে আক্রান্ত এবং আরব বিদ্রোহ সূচনাতেই শেষ করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। বিমান আক্রমণে জেপেলিনের ব্যবহার তখনও চলিয়াছে, স্থলযুদ্ধে "ট্যাঙ্কে"র আবির্ভাব হইয়াছে এবং অন্যদিকে যুদ্ধে গ্যাস ও অগ্নিক্ষেপকের ব্যবহার হইয়াছে। সমুদ্রে সাবমেরিন আক্রমণ তখন ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে এবং বিমান যুদ্ধে এরোপ্লেনে "কুত্তার লড়াই" শেষ পর্য্যন্ত "সার্কাস" যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। বেতার যন্ত্র তখনও যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হয় নাই। সুতরাং স্বপক্ষের পবিত্র সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার চেষ্টা ও বিপক্ষের অতি অসৎ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়াস সম্বন্ধে চীৎকার করিয়া কেহই জগদ্বাসীর কর্ণপটাহ ফাটাইবার চেষ্টা করে নাই। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ড তখন (ও শেষ পর্য্যন্ত) নিরপেক্ষ হইয়া চড়া দামে মাল সরবরাহ করিয়া অর্থকোষ পূর্ণ করিতেছে। যুদ্ধসম্ভার ব্যবসায়িগণ অর্থলালসায় সমস্ত জগতের যাবতীয় ব্যাপারিক ক্ষেত্র উৎকোচ ও অন্যায় আচরণ দিয়া কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এবারকার যুদ্ধের দুই বৎসরের হিসাব নিকাশের সময় এখনও হয় নাই। মামলা বিচারাধীন থাকিলে যে কারণে মতামত প্রকাশ করা চলে না, এরূপ যুদ্ধে দু-দিকের সমস্ত খবর না জানিয়া কৈফিয়ৎ টানা চলে না। যুদ্ধে যে পক্ষ-বদল (গতবারের তুলনায়) হইয়াছে এবং যুদ্ধদেবতার পরিভ্রমণকক্ষ যে গতবার অপেক্ষা বহুদূর প্রসারিত হইয়াছে একথা তো সকলেই জানে। যুদ্ধের রীতি এখন যন্ত্রযুগে পৌঁছিয়াছে, নীতি প্রায় আদিম অসভ্য যুগে ফিরিয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম তো টাকার চাপে অনেকদিন যাবৎই মরণোন্মুখ। ভারতবর্ষের অবস্থা "যে তিমিরে, সে তিমিরে।"
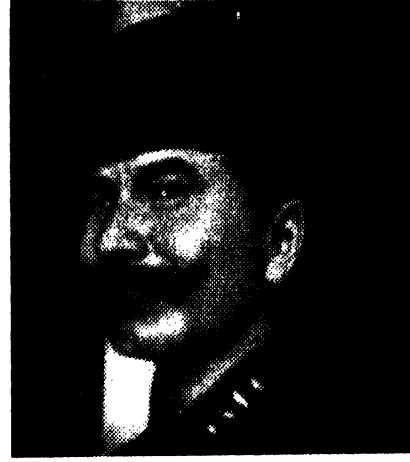
মার্শাল বিউডেনি

* * *

রুশ যুদ্ধের একাদশ সপ্তাহ প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। রুশ সৈন্যের স্থিতির কিছু অবনতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে বিপক্ষদল যে ভাবে সেটা একেবারে অন্তিমকালের অবস্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহে তাহা কোন মতেই ঠিক বলা যায় না। উত্তর দিকে ফিনগণ ভিইপুরি দখল করায় ফিনল্যাণ্ড খাড়িতে সোভিয়েটের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং জার্ম্মানগণও আর দুই দিকে অগ্রসর হওয়ায় লেনিনগ্রাড এখন প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায়। নভগরড ও ইলমেন হ্রদের দিকের আক্রমণের প্রসারে মস্কো ও লেনিনগ্রাডের সোজা রেলপথ এখন শত্রু-আচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে। এস্থোনিয়ায় টালিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ নৌবহরেরও বলটিকে অবরোধের মধ্যে পড়িবার আশঙ্কা হইয়াছে। কিন্তু অবরোধ ও অধিকারের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ,

কিয়েফের পুলিস

বিশেষে অবরুদ্ধ সেনাদল ও তাহাদের রণনেতাগণ যদি যুদ্ধক্ষম ও দৃঢ়সংকল্প হয়। এ অঞ্চলে মার্শাল ভোরোশিলফের সৈন্যবাহিনী সম্প্রতি প্রতিঘাতের আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং ভোরোশিলফ ঘোষণা করিয়াছেন যে এখানের সৈন্যগণ ও নাগরিকগণ শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত পুরী-রক্ষার চেষ্টায় লড়িবে। সোভিয়েট সৈন্যের যুদ্ধশক্তি ও পৌরুষের যে পরিচয় আমরা এই দুই মাসেই পাইয়াছি তাহাতে এরূপ ঘোষণার ফলে কিরূপ তুমুল প্রতিরোধ চেষ্টা চলিবে তাহা অনুমান করা সহজ। যদি লেনিনগ্রাড যায় তবে বলটিক সমুদ্রের রুশ নৌবহর বিপদগ্রস্ত হইবে এবং সোভিয়েটের যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণের একটি প্রধান কেন্দ্রও যাইবে। কিন্তু এই জয়লাভের জন্য জার্ম্মানিকে যে অর্থের, নিজ-সেনার রক্তের ও যুদ্ধাস্ত্রের ধ্বংসের দারুণ শুল্ক দিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মধ্য অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর অধীনস্থ সেনাদলগুলি এখনও বিপুল বিক্রমে লড়িতেছে। এখানের জার্ম্মান সৈন্য অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ক্রমাগত আক্রমণ করিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। আরও নীচে গোমেল ও কিয়েফ অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কো ও মার্শাল বিয়ুডেনির মধ্যে সংযোগ ভাঙ্গিবার একদফা চেষ্টায় কিছু সফল হইবার পর আবার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এখানের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়, কেননা গোমেলের দুর্গমালা ভেদ করিয়া শত্রুদল অগ্রসর হইয়াছে এবং ডিপার নদীর বাঁকও তাহারা এখানে অতিক্রম করিয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো সৈন্যচালনায় সুদক্ষ এবং এই মহাযুদ্ধে জার্ম্মানির বিপক্ষে তিনিই প্রথম সংগ্রামে সাফল্য দেখাইয়াছেন। তিনি এক্ষেত্রে বিপক্ষের গতিরোধের কি ব্যবস্থা করেন তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার ও মার্শাল বিয়ুডেনির সমরকৌশলের উপর এখন সোভিয়েটের এক মহামূল্য ও সম্পৎশালী প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই আক্রমণ যদি আরও প্রসারিত হয় তবে উক্রাইন ও ডন নদের অঞ্চল জার্ম্মানির কবল হইতে রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইবে।

দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের কূলে ও ডিপার নদীর পশ্চিমের উক্রাইনে নাৎসি অভিযান এই প্রথম বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। হিটলারের স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে উক্রাইন নন্দনকাননবিশেষ। এত দিনে তাহার এক অংশ জার্ম্মানির হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে যে সোভিয়েটের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, কেননা যে অঞ্চল এখন শত্রুর অধিকারে আসিয়াছে বা শত্রুর যুদ্ধাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে পড়িয়াছে তাহা হইতে সোভিয়েট লৌহ, ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, বৈদ্যুতিক শক্তি ও গম-আদি শস্য প্রচুর পরিমাণে পাইত এবং এখন ঐ সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন! তবে জার্ম্মানির লাভের পরিমাণ ঐ অনুপাতে বিশেষ কিছুই নয়। শস্যের ক্ষেত্র এখন "পোড়ামাটি", কলকারখানা ও খনি ভাঙ্গা ইট ও লোহার স্তূপ এবং বিরাট ডিপার বাঁধ, যাহা দৈনিক ২০,০০০ শ্রমিকের অশেষ পরিশ্রমের ফলে ছয় বৎসরে নিৰ্ম্মিত হয় এবং যাহা হইতে এই সেদিন পর্য্যন্ত ৫৫০,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইত, সেই ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম বাঁধ ও জলজ বৈদ্যুতিক শক্তির আকর এখন বিরাট ধ্বংস-স্তূপ। এই বৈদ্যুতিক শক্তির আকর হইতে সোভিয়েট রুশের শক্তিতে ও আলোকে যে-পরিমাণ সরবরাহ হইত তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সকল প্রাদেশিক কেন্দ্রনগর ও তাহাদের সকল কলকারখানা চালাইয়াও কিছু অবশিষ্ট রহিত।

এই দুই মাসের যুদ্ধে সোভিয়েট গণতন্ত্রের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অতি ভীষণ। সৈন্যসামন্তে, ধনসম্পদে এবং যুদ্ধোপকরণে রুশগণ স্বাধীনতার বেদীর সম্মুখে যে বলি দান করিয়াছে তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে নাই। কিন্তু এই ক্ষতি এখনও মারাত্মক হয় নাই বা রুশজাতির আশা ও উদ্যমের বাধাদানকারী হয় নাই। উক্রাইনে ও ডন-নদ তীরবর্ত্তী অঞ্চলে সোভিয়েটের খনিজ ও ভূমিজ সম্পদ বিশাল

ছিল। কিন্তু এই ৮০,০০,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী সুমহান রাষ্ট্রের সঙ্গতিও অসীম। যাহা গিয়াছে তাহার ক্ষতি পূরণ করার উপযুক্ত সম্পত্তি ঐ দেশেই আছে—যদিও তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সময়সাপেক্ষ। জার্ম্মান এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে যাহাতে রুশ তাহার সেনাবাহিনীর বল-সঞ্চয়ের জন্য এবং তাহার রণসম্ভার উৎপাদনের নূতন নূতন কেন্দ্রের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য সেই অত্যাবশ্যক সময়, অবকাশ এবং সুযোগ না পায়। শীতের সময় রুশ দেশে যুদ্ধ করা অতি কঠিন, বিশেষতঃ তুষার ও তুহিন, বৃষ্টি ও করকাপাত এই সমস্তই যন্ত্রযুদ্ধের অতি প্রবল বিঘ্নকারী। কুয়াসা ও মেঘ বিমানবাহিনীকেও বিশেষ বাধা দেয়। এই সকল কারণেই জার্ম্মানি এরূপ প্রচণ্ড তেজে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাইয়া রুশের যুদ্ধশক্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু এই চেষ্টা সফল হইবে না মনে হয়। মার্শাল ব্যিউডেনির সৈন্যদল এখনও অদম্য শক্তিতে ড্নিপার নদীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লড়িতেছে এবং ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করিয়া হারানো দেশ পুনর্ব্বার অধিকার করার চেষ্টা করিতেছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধগণ গোমেল দুর্গমালার পার্শ্ব হইতে প্রিপেট জলাভূমির অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় শক্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল বেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। মার্শাল ভোরোশিলফ লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্যও পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছেন। সোভিয়েটের লোকবল বা সৈন্যবলের কিছুমাত্র অভাব নাই, তবে এখন যুদ্ধাস্ত্র ও অন্য রণসম্ভারের অভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

জার্ম্মানি পূর্ব্বদিকে রুশের বিরুদ্ধে যে ভয়ানক সংগ্রাম-শক্তির প্রয়োগ করিয়াছে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায় তুর্কিতে বৃটিশ রাজদূতের এক বিবৃতিতে। ইহা যদি সঠিক হয় তবে পশ্চিমে যে বলপ্রয়োগ করিয়া জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নরওয়ে ও বৃটিশ সৈন্যদলকে পরাজিত করে এ ক্ষেত্রে প্রায় তার চতুর্গুণ শক্তির যোজনা হইয়াছে এবং এখনও তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ইটালী, হাঙ্গেরী ও স্পেনের সৈন্য-দলও আছে, তাহাদের সম্মিলিত শক্তিও কম নয়। রুশ-জাতির পুরুষকার, শৌর্য্য ও সহশক্তির যে পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পাইয়াছি তাহা অতুলনীয়। তাহা যে এখন শেষ সীমায় পৌছিয়াছে তাহাও মনে হয় না, তবে এখনও সম্মুখে অনেক ক্ষতি অনেক অগ্নিপরীক্ষা আছে সন্দেহ নাই, কেননা ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মানির শক্তি এখনও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয় নাই।

জার্ম্মানগণ নিজেরাই স্বীকার করিতেছে যে এরূপ দৃঢ়-সংকল্প, যুদ্ধক্ষম ও সাহসী শত্রু ইতিপূর্ব্বে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায় নাই। সব দিক দেখিয়া মনে হয় এ যুদ্ধ আরও বহুকাল চলিবে—যদি যুদ্ধোপকরণ-বিষয়ে সোভিয়েট যথেষ্ট সাহায্য পায়।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রী"চিত্রগুপ্ত"

এ নহে মরণ তব, মৃত্যুঞ্জয় ওগো মহারথি!
এ তব রথের যাত্রা, যেই রথে স্বয়ং সারথি
ভাগ্যলক্ষ্মী, আপনারে মানে ভাগ্যবতী। কণ্ঠে তব
জয়শ্রীর শ্রীহস্তের বরমাল্যখানি অভিনব,
রূপে রসে ছন্দে গন্ধে বর্ণের বৈভবে অনুরাগে
স্বরচিত আত্মদান; সাষ্টাঙ্গ প্রণতি। ঊর্দ্ধে জাগে
গগন-বিদারী তব কীর্ত্তিধ্বজ রথের চূড়ায়
দিগ্বিজয়-বৈজয়ন্তী—অবিরাম স্পন্দনে উড়ায়
যশের সুরভি নভে; এ তব বিজয়-অভিযান
অমর-লোকের পানে, করি মর্ত্ত্য-লীলা অবসান
রথ তব চলিয়াছে মরণের সিংহদ্বার ভেদি,
রাজচক্রবর্ত্তী তরে অনুপম রত্নময় বেদী—
সাজায়ে রেখেছে যেথা আগ্রহে আপনি মহাকাল।
তোমার সপ্তাশ্ব রথ—উদ্ভাসিয়া আকাশের ভাল
প্রসারিয়া সপ্তবর্ণ আলোক-পতাকা, চলে ধেয়ে
মৃত্যু ভেদি পুরোভাগে;—দক্ষিণের পথখানি বেয়ে।
হে রবি! নিশান তব পিছনেতে মেলি ধরে হাওয়া
সুদীর্ঘ তাহার কর যেন তব পিছু ফিরে চাওয়া
করুণা কোমল যেন তব আঁখি-পক্ষের স্পন্দন
উত্তর-কালের পানে বিদায়ের কর-সঞ্চালন।
ধরণীর 'পরে তব রেখে গেলে অন্তিম সোহাগ
মাটির কোমল বক্ষে তব রথচক্রের যে দাগ
তোমার অজস্র দান, অপরূপ বিচিত্র লেখায়
ভবিষ্যৎ মানবের পথের নিশানা ইসারায়।
অজস্র দাক্ষিণ্যে ভরা পরিপূর্ণ দানপাত্রখানি
নিঃশেষে উজাড় করি, প্রক্ষালিয়া রিক্ত দুই পাণি
গৌরবের গঙ্গোদকে; উত্তরিয়া করমের সীমা
তবে উঠিয়াছ রথে—পরি শিরে মুকুট-মহিমা।
ধরার আয়ুর ঋণ শুধিতে কোথাও কিছু ফাঁকি
রাখো নাই কোনোখানে, চুকাইতে কোনো মূল্য বাকী
কোনো পল অনুপল লাগি। হে নিষ্ঠুর! তব লাগি
কাঁদিবার অবসর তাও নাই কোনোখানে জাগি।
অনর্গল সৃজনের পূর্ণিমা-প্লাবনে দেছ ঢেকে
সকল ঋণের চূড়া—একে একে ডুবেছে প্রত্যেকে।
ফিরে দেছ এ ধরার কাছ হ'তে লয়েছ যা কিছু
শৌর্য্যে তব, তার কাছে মৃত্যুরে করায়ে মাথা নীচু।

তুমি যে জানিতে মনে আর কোনো কবি রহিল না
তোমার প্রয়াণ পরে শোকগাথা করিতে রচনা।
তাই তুমি কাঁদিবার রাখিলে না কোনো প্রয়োজন
হরিলে সবার লজ্জা; দায়মুক্ত আজি সর্ব্বজন।
অকাল মরণ নহে, অসম্পূর্ণ নহে কোনো দান
কর্ম্মসিন্ধু সন্তরিয়া পার হয়ে এ তব প্রয়াণ!
বিস্ময়ের বহ্নি দেয় শুষ্ক ক'রে নয়নের জল
এক বাক্যে মানে সবে জন্ম তব সার্থক সফল!
তবু কবি, উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রণতি-প্লাবনে
বিস্ময়ের বহ্নিশিখা নিভে গিয়ে এ মোর নয়নে
ঘনায়ে আসিছে অশ্রু সব ছাড়ি শুধু এক ক্ষোভে
সহস্র বৎসর পরে কীর্ত্তি তব কোন্ রূপ লভে
দেখিতে পাব না তাহা জন্মিলাম কেন এত ত্বরা?
আজি হ'তে দীর্ঘ এক সহস্র বরষ! বসুন্ধরা—
যত দিনে ধীরে ধীরে পলে পলে খোদিয়া তুলিবে
তোমার মর্ম্মর-মূর্ত্তি—যে প্রতিমা অতুল ত্রিদিবে!
রচিতে যা আছে ভবে হিমগিরি একমাত্র শিলা,
যে পারে ধরিতে বক্ষে এ বিরাট্ তব মর্ত্ত্য-লীলা!
পূজিবে সমগ্র বিশ্ব তোমার সে বিশাল বিগ্রহ
বন্দনার সুরভিতে আকুল হইবে গন্ধবহ।
সহস্র বৎসর-ব্যাপী সুবিস্তীর্ণ পটভূমি 'পরে
তোমারে কল্পনা করি আনন্দের অশ্রু মোর ঝরে।
এ-যুগের নর তুমি সেই যুগে হইবে দেবতা,
এ নহে অলীক স্বপ্ন—চিরকাল এ ধরার প্রথা।
তবুও তাদের তরে অনুকম্পা মনে উঠে জাগি
আজিকে জাগিছে ঈর্ষ্যা সেদিনের যে-মানুষ লাগি;
যখন ভাবিয়া দেখি—এ সৌভাগ্য তাহারা পেল না—
জন্মেছি তোমার কালে—নিত্য কত নবীন রচনা—
তোমার প্রবীণ দান—নবীন বয়সে পড়িয়াছি,
আসিয়াছি কাছাকাছি; কথা কহে ধন্য হইয়াছি,—
তোমার মুখের পানে চাহিয়াছি চোখে চোখ রাখি
রঞ্জন-রশ্মির সম সর্ব্বভেদী তব দু'টি আঁখি,—
দৃষ্টি যার দৃষ্টি নয়, সোনা-করা পরশ রতন
বুলায়ে ক'রেছ ধন্য আমার এ দেহ প্রাণ মন।
প্রতিদানে নিয়ে যাও অশ্রু-সিক্ত বিদায়-প্রণাম
এ প্রণাম অনাগত মানবের সাথে করিলাম॥

রবীন্দ্র-শ্রাদ্ধবাসর, ৩২শে শ্রাবণ ১৩৪৮

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীনীহাররঞ্জন রায় লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অলোকসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সমালোচনার ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ মাত্রেরই এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে ভয় হয়, কলম উঠিতে চাহে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে তাহাকে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব না এবং অপরকে দেখাইব না ইহাও উচিত বলিয়া ভাবিতে পারি না। আমরা তাঁহাকে যে যেদিক হইতে যেমন দেখি সব ছবি খুলিয়া প্রকাশ্যে দেখাইলে পরস্পরের আমরা সহায়ই হইব। একটি পুরাতন গল্পে আছে—এক দল অন্ধকে একটি হস্তীকে স্পর্শ করিয়া বলিতে বলা হইয়াছিল, "কি দেখিলে বল।" তাহাতে কেহ বলিল, "হস্তী স্তম্ভের মত", কেহ বলিল, "হস্তী রজ্জুর মত," কেহ বলিল, "প্রাচীরের মত" ইত্যাদি। আমরা নিজেদের একেবারে অন্ধ বলিতে পারি না, তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করিতে গেলে অন্ধ না হউক কতকটা এক চক্ষুর মত সমালোচনা হইবে। আমরা কেহ বলিব রবীন্দ্রনাথ কবি, কেহ বলিব তিনি সুপণ্ডিত, তিনি দার্শনিক, কেহ বলিব তিনি সাধক, বিশ্বপ্রেমিক, জীবকল্যাণবাদী, ঋষি অথবা যুগ-অবতার মহাপুরুষ। আরও বহু নাম তাঁহাকে দেওয়া যায়, অকারণ দীর্ঘ ফর্দ্দ করিলাম না। যাই হউক, আমাদের যাহার দৃষ্টিতে যাহা বড় হইয়া পড়িয়াছে তাহার কোনটিই বলিলে মিথ্যা হইবে না। কিন্তু কেবল মাত্র একটি নামকে তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মূলসূত্র বলিয়া ধরিয়া লইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাঁহার অন্যান্য বহু নামের সার্থকতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহায়তায় দেখাইতে বসেন তবে তাঁহার সময় ও সামর্থ্যে কুলাইবে কি না ভাবিবার বিষয়। সে চেষ্টা আজ করিব না। বর্ত্তমান গ্রন্থকার বলেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বর্ত্তমান জগতে আর কোনও জীবিত মানুষের পক্ষেই হয়ত ততখানি সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কবি-প্রতিভা।"

বর্ত্তমান জগতে জীবিত মানুষের কথা আমরা জানি না যাহার সর্বতো-মুখী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উর্দ্ধে উঠিতে পারে; সুতরাং লেখকের সাবধান হইয়া "হয়তো" বলিবার প্রয়োজন ছিল না।

গ্রন্থকার বলেন, "রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে যে অনুভূতির আবেগ জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয় যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া। তাঁহার এই কবি-মানস যে শুধু তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মচেষ্টার মধ্যেই জয়যুক্ত হইয়াছে তাহা নয়; তাঁহার সর্বপ্রকার রচনায়, সর্বত্রই ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ কবি-

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

শ্রীঘৃত
সম্বন্ধে
কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের
বাণী

বাংলা দেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালির জীবনধারণে সহায়তা করুক এই কামনা করি,

১ বৈশাখ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার জীবনে যে বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম্মের প্রবাহ, যে বিচিত্র প্রকাশ, তাঁহার জীবন ও কর্ম্মকে যখন একটু দূর হইতে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি, কেবলই মনে হয় এই সব কিছুর মধ্যে একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেন পাই—তিনি কবি, কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের শাস্ত্রে বুঝিবা কবিকে ঋষি অপেক্ষাও বড় আসনই দেওয়া হইয়াছে

অমূত্র সন্নিহ বেখেতঃ সংস্তানি পশ্যমি।

একটিমাত্র লোকে বাস করিয়া সর্ব্বলোকের রহস্য তিনি জানিতে পান, দেখিতে পান। রবীন্দ্রনাথ সেই কবি। রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বলিলে আমাদের মনে হয় যেন আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভাগীরথীর প্রাণদায়িনী বিরাট্ প্রবাহকে গঙ্গোত্রীর ক্ষীণ ধারার মধ্যে খুঁজিতেছি। তবে মনকে বুঝাইতে পারি আমাদের অভিধানকারগণ কবি অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মা, সূর্য্য, পণ্ডিত: আদি কবি হইতেছেন পরমেশ্বর। সুতরাং আমাদের যুগের মানস-লোকের ঊর্দ্ধমুখী শিখাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের জগৎকে তাঁহার প্রতিভার কিরণসম্পাতে যিনি প্রদীপ্ত ও ও প্রাণবান্ করিয়াছিলেন, আধুনিক সকল শাস্ত্র ও বিদ্যাবারিধিকে যিনি অগস্ত্যের মত পান করিয়াছিলেন, বিশ্বমানবের প্রতি যাঁহার কল্যাণদৃষ্টি বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত বিচ্ছুরিত হইত তিনি কবি।

গ্রন্থকার কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন, কাব্যপ্রবাহ, ছোট গল্প, নাটক ও নাটিকা, উপন্যাস, এই ছয়টি অধ্যায়ে এই ৪৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থটিকে বিভক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন—"রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা একান্তভাবে গীতি কবিতার বা লিরিক-প্রতিভা। মানসীর কবিতায় যে শান্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, যে করুণ কোমল সুকুমার শ্রী, নিসর্গের যে অনির্ব্বচনীয় রূপ বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অতুলনীয় সম্পদ, ইহাই রবীন্দ্র-কবিতার মূল ঐশ্বর্য্য।" এখানে গ্রন্থকারের মত মাত্র দিলাম, কারণ ইহার পূর্ব্বাপর অনেকখানি উদ্ধৃত না করিলে আমার বক্তব্য বলিতে পারিব না।

গ্রন্থকার বলেন, "কীট্স অথবা চণ্ডীদাসকে আমরা যে-হিসাবে প্রেমের কবি বলি, রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে প্রেমের কবি বলিতে পারি না।" রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় মানবচিত্ত প্রেমাস্পদকে পাইবার অথবা ভোগ করিবার আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠে না, বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। আমার মনে হয় প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি কীট্স ও চণ্ডীদাস হইতে বড়।

নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির আলোচনায়

বুকের মধু খাবে শুধু খুকী নূতন এসে,
আর খোকা তোমার এলো বুঝি বানের জলে ভেসে?

খোকা ছোট থাকতেই যখন আর একটি নূতন অতিথি এসে উপস্থিত হয় তখন খোকা ও মা উভয়েরই অবস্থা বড় করুণ হ'য়ে ওঠে। এ অবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিশুদের বাঁচাতে হ'লে মায়ের উচিত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত "ল্যাডকোভাইন" সেবন করা, কারণ এই উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন টনিক খাদ্যের লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অংশ গ্রহণে সহায়তা ক'রে মায়ের বুকের মধু অফুরন্ত রাখে।

ল্যাডকোভাইন
মাতৃদেহের উৎস অফুরন্ত রাখে

লিষ্টার এন্টিসেপ্টিক্স :: কাশীপুর, কলিকাতা

গ্রন্থকার ৩০ পৃষ্ঠা স্থান দিয়াছেন। ইহা কবির অধ্যাত্মজীবনের অধ্যায়। তাঁহার ভাগবত উপলব্ধি ও সাধনাকে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উন্নতির শিখরে দাঁড়াইয়া কবি তাঁহার দেবতা বন্ধুর সৃষ্ট বসুন্ধরাকে ভুলিয়া যান নাই ইহাতে গ্রন্থকার বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির কবি কি করিয়া যে হঠাৎ বলাকায় জন্মলাভ করিলেন, তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।"

গ্রন্থকার স্বয়ং গীতালির ৯৯ নং গান উদ্ধৃত করিয়া ইতিপূর্বে বলিয়াছেন:—

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই স্বর্গভূমি
. . সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি॥

এই উপলব্ধি যখন জাগিল তখন পুরাতন ধূলিময় স্বর্গভূমি, সুখদুঃখময় ধরণীর প্রতি বহু পুরাতন প্রেম নূতন করিয়া জাগিল পুরাতন পথ নূতন হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।"

সুতরাং এই নবজন্মলাভে বিস্ময়ের কিছু নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেবতাকে বলিয়াছেন,

"পান্থ তুমি, পান্থ জনের সখা হে,
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।"

এই জীবনে তাই তাঁহার পথ চলা শেষ হয় নাই, তিনি অধ্যাত্ম সাধনার শিখরে উঠিয়াও স্থবিরতা প্রাপ্তিকে মুক্তি মনে করেন নাই।

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং গতি-রাগের কাব্য বলাকার আলোচনায় আর প্রবেশ করিব না। গ্রন্থকার বলাকা, পলাতকা ও পূরবীর আলোচনা করিয়া কাব্য-প্রবাহের স্রোতে বাঁধ দিয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তী কাব্য-প্রবাহকে এই গ্রন্থের ভিতর না আনাতে কাব্য আলোচনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তার পর ছোট গল্প। লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট গল্পের সৃষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ।" পোষ্টমাষ্টার, মেঘ ও রৌদ্র, সমাপ্তি, দুরাশা, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ গল্পের বিস্তৃত আলোচনা তিনি করিয়াছেন।

নাটক-নাটিকা ও উপন্যাসের আলোচনার পর তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীর আলোচনা দেখিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকখানিতে "চিরকুমার সভা," "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রভৃতি হাস্যরসের উৎস ও সমুদয় গদ্য প্রবন্ধাবলীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইয়াছে।

উপন্যাসের আলোচনায় বিশেষ করিয়া 'গোরা,' 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'র আলোচনায় গ্রন্থকারের সহিত আমার অনেক জায়গায় মতভেদ আছে, সেগুলির উল্লেখ আজ করিব না। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, "কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত ধর্ম ও প্রকৃতি, একেবারে বদলাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'।" এই সত্য কথাটি আজকালকার দিনে মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। বাস্তবিকই চোখের বালি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজজীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক সমস্যা-নিষ্ঠ উপন্যাস। গ্রন্থকার বলেন, "গোরার প্রসারিত পটভূমি, ইহার সুবিস্তৃত পরিধি, বিশাল ও গভীর জাতীয়-সত্তার তুলনা আজ পর্যন্তও বাংলা উপন্যাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।" খুঁজিয়াছি অনেক, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে গোরার তুলনা সৃষ্ট হয় নাই, নিকট ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

গ্রন্থকার শেষের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের এক সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি ও চরম কাব্যোপন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে বুদ্ধি ও কল্পনায় সর্বোপরি প্রেমলীলার বোধ ও অনুভূতিতেও তাহার প্রকাশ-ক্ষমতায় তরুণদের মধ্যে তরুণতম, আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।' সত্যই বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থটিতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, পরিশ্রম, অধ্যবসায় সুললিত ভাষা ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর অনেকাংশ আলোচিত হয় নাই বটে, তবে যতটুকু আলোচিত হইয়াছে ততটুকুতে লেখকের আলস্যের কোনও চিহ্ন নাই। তিনি কবির প্রত্যেকটি রচনাকে নিজের অন্তর দিয়া বুঝিতে এবং বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি মার্জ্জিত এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারের উপর তাঁহার দখল আছে বলিয়া কাজটি আরও সহজ হইয়াছে।

শ্রীশান্তা দেবী

প্রেম ও পৃথিবী—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। কাত্যায়িনী বুকষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮০। মূল্য ২৷০

প্রেম কি একটা সাময়িক মোহ, না মনের সেই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি যাহার মূল হৃদয়ের গহনতম প্রদেশে? যদি সত্যই মানুষের গভীরতম সত্তার সহিত এর যোগ থাকে তো সংসারের শত ঘাতপ্রতিঘাত সহিয়াও এ নিজের মহিমায় শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিবেই। এক দিকে তপন আর ছায়া, অপর দিকে কালিকেশ ও আভার জীবনেতিহাসের

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—ক্যালকাটা ৩০৯৯

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত

বঙ্কিম-কণিকা

ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রথম প্রকাশিত হইল।

* একটি নাটক
* একটি প্রবন্ধ
* তাঁহার পত্র
* তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**প্রকাশনী,** শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত অপর গ্রন্থ

বঙ্কিম-প্রতিভা

ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, সার যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়া **বঙ্কিমচন্দ্রের** Letters on Hinduism এবং দেবীচৌধুরাণীর স্বকৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস,
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

1. A Changing World and Other Essays—

আধুনিক নানা সমস্যা সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য—২৲।

2. সাহিত্য ও সমাজ (যন্ত্রস্থ)

সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের সমষ্টি।

3. স্বদেশ ও সমৃদ্ধি (যন্ত্রস্থ)

ভারতীয় পটভূমিকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ।

প্রাপ্তিস্থান—**প্রকাশনী,** শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মধ্যে দিয়া লেখক এই তত্ত্বটি ফুটাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেম মিলনের মধ্যে সার্থক নয় হইয়া উঠিলেও, আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়া, চিরবিরহের মধ্যে দিয়া আরও মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

উপন্যাসের গল্পাংশটি সুন্দর হইয়াছে। তবে বর্ণনা এবং বিশেষ করিয়া রিফ্লেক্‌শনের আতিশয্যে অনেক জায়গায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। বইখানি আরও ছোট হইতে পারিত এবং তাহা হইলে ঘটনাগুলি অযথা বিক্ষিপ্ত এবং বিলম্বিত না হইয়া গিয়া বইখানিকে আরও মনোজ্ঞ করিতে পারিত।

রামপদবাবু সাহিত্যে সুপরিচিত। বইখানিতে চরিত্র সৃষ্টি, ভাষা প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁহার হাতের বিশিষ্টতা আছে, এবং মূল বক্তব্য ভাল ভাবেই ফুটিয়াছে। সে-সব সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তার না করিয়া যেটুকু ত্রুটি বলিয়া মনে হইল সেটুকুর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেদেনী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, ১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। ত্রয়োদশটি ছোট গল্পে "বেদেনী" সম্পূর্ণ। প্রথম গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। ছোট গল্পের প্রাচুর্য্য বাংলা সাহিত্যের এক লক্ষণীয় বিষয়। এত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও কিন্তু সত্যকার গল্পের জন্য মন উন্মুখ হইয়া থাকে। তারাশঙ্করের গল্পে প্রকৃত গল্পত্ব আছে। সে গল্প কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে, মনকে আকর্ষণ করে। চিত্রে, মনোব্যাখ্যানে, বিবিধ বুদ্ধিগত বিষয়ের বিশ্লেষণে, নাগরিক ভাব-ব্যঞ্জনায়, সাম্প্রতিক সমাজের আলোচনায়, অথবা আত্যন্তিক রোমাণ্টিক ব্যাপারে সেগুলি পর্য্যবসিত নয়। "বেদেনী"র বিচিত্র চরিত্রগুলি বইয়ের মানুষ হইয়া দেখা দেয় নাই। সেগুলি জীবন্ত, চলন্ত এবং সক্রিয়। গল্পগুলির মধ্যে জীবন কোথাও আবর্ত্তে আবর্ত্তিত, কোথাও আবেগে প্রবহমান। কোথাও একটি সূক্ষ্ম অথচ নিদারুণ ঈর্ষা, কোথাও নির্ভয় অসামাজিক অসঙ্কোচ, কোথাও আদিম মনোবৃত্তি, কোথাও স্বভাব-নিহিত অদমনীয় প্রবৃত্তির প্রেরণা—চরিত্রগুলিকে বাস্তব অথচ অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। "বেদেনী"র অধিকাংশ গল্প প্রথাগত সচরাচর জীবনের কাহিনী নয়। সংসারে সাক্ষাৎ মেলে অথচ সমাজের সাধারণ পথে যাহাদের যাত্রা নয়, এই বইখানিতে এমন সব চরিত্রের চিত্রণে তারাশঙ্কর কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "বেদেনী"র গল্পগুলিতে অভিনবত্ব আছে।

ব্ল্যাকবোর্ড—কলেজ বয়। পরাগ্ পাবলিশার্স, ১, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভাল-বাঁধা কালো মলাটের এই কবিতার বইখানিতে সাতটি কৌতুক-তরল কবিতা আছে। পারিবারিক, প্যারডি, গবিতা, হরেকরকম্বা প্রভৃতি নানা ভাগে কলেজ বয় "ব্ল্যাকবোর্ড"কে ভাগ করিয়াছেন। কবিতাগুলির ছন্দ লীলায়িত, শব্দবিন্যাসে কৌশল আছে। তারুণ্যের উচ্ছলতায়, লঘু চাপল্যে এবং দ্রুতগতিভঙ্গে কবিতাগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সেই কারণেই কোথাও কোথাও রুচির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তথাপি সকল পাঠকের মধ্যে যে দুষ্টুমিভরা, কৌতুকপ্রিয় কিশোর থাকিয়া থাকিয়া মনকে অসম্বৃত করে "ব্ল্যাকবোর্ডে"র কবিতাগুলি তাহার তৃপ্তি বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলা পড়ানো—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। ভারতীভবন, কলিকাতা, ১৩৪৮। মূল্য ১৲।

ছোট ছোট কুড়িটি প্রকরণে সম্পূর্ণ এই পুস্তকে বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের অধ্যাপনা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষকতাকার্যে ব্যাপৃত তথা শিক্ষকতাবৃত্তিপরীক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক বোধ হয় এই প্রথম। ১৯৩৫ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-বৃত্তি শিক্ষা দিবার নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর হইতেই সেন মহাশয় এই বিষয়ের অধ্যাপনাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার এই অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা এই পুস্তক-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এই পুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষকতাবৃত্তিপরীক্ষার্থী উভয়েরই কাজে লাগিবে এবং অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিস্তৃততর ও ব্যাপক আলোচনায় উৎসাহিত করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই উৎকৃষ্ট বৃহৎ অভিধানটি কাগজের যুদ্ধজনিত দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। ইহার ৭৮তম সংখ্যা শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ 'ম্রিয়মাণ' এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২৪৮৪।

ড.

উলশিল্প—প্রথম ভাগ। শ্রীমতী মীরা দেবী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাওনিয়ার্স কোম্পানী লিমিটেড। সীবন বিভাগ। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত এই মনোরম পুস্তকখানিতে উলশিল্প সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঁটা ধরা, উল ধরা, উলের বল করা, ঘর কমান, ঘর বাড়ান প্রভৃতি গোড়ার কথা ইহার প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বন্ধনী, যবের শিস, শশাবীচী প্রভৃতি ৫১ রকমের বুননের নমুনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুদের নিত্যব্যবহার্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় টুপি, ইজের প্রভৃতি পোষাক প্রস্তুত করার নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনীয় বিষয় সুগম করিবার জন্য অনেকগুলি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। উল বোনার কাজে যাঁহাদের ঝোঁক আছে এই পুস্তক তাঁহাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে। ইহা যে ইতোমধ্যেই সাধারণের আদর লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। আমরা এই পুস্তকের অধিকতর প্রচার কামনা করি।

চ.

কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত
সদ্যপ্রকাশিত নূতন কাব্যগ্রন্থ

হেমন্ত-গোধূলি ২৲

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত
পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত নূতন সংস্করণ
ডিমাই সাইজ ভাল কাগজে চমৎকার ছাপাই
উপহারোপযোগী শ্রেষ্ঠ পুস্তক

অ-ভ্র-আ-বী-র (২য় সং) **২৲**
কুহু ও কেকা (৫ম সং) **২॥৹**
বেলাশেষের গান (৩য় সং) **১৸৹**
বিদায়-আরতি (৩য় সং) **১৸৹**

তন্ত্রজগতের গোপন রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল!
শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই গ্রন্থখানি বাংলাসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে। এক দুঃসাহসিক পরিব্রাজক তান্ত্রিক সাধুদের ও তাঁহাদের দুর্গম আশ্রমগুলির সংস্রবে থাকিয়া যে রহস্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার চমকপ্রদ কাহিনী ও পর্যটকের চোখে-দেখা বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন শ্রেণীর সাধু, অসাধু, নানা বয়সের ও নানা স্তরের নরনারীর যে বিচিত্র চিত্রাবলী এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন মনোজ্ঞ তেমন চিত্তাকর্ষক। যাঁহারা ইহা পুস্তকাকারে পাইবার জন্য আগ্রহশীল, তাঁহারা এইবার ইহা সংগ্রহ করুন। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

দিলীপকুমার রায় প্রণীত
অভিনব উপন্যাস

নানারূপী ২॥৹

প্রকাশক ঃ শ্রীঅজিত শ্রীমানী—২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাগ্‌লা মহেশ্বর—শ্রীগুরু লাইব্রেরী—দাম ।৶০ আনা।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ শিশুসাহিত্যের এক জন জনপ্রিয় লেখক। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ "পাগ্‌লা মহেশ্বর" তাঁর প্রতিষ্ঠাকে আরও দৃঢ় করবে।

একটি বিরাটকায় ঐরাবতের জীবনকাহিনী ও মনস্তত্ত্ব এই গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। এই জাতীয় বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না; কিন্তু বিষয়বস্তুর, অসাধারণত্বের এই বাধা অতিক্রম ক'রে গ্রন্থকারের সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায় বইখানি শিশু এবং বয়স্ক উভয়েরই মনোরঞ্জন করবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই কৃতিত্ব সাহিত্যিকের পক্ষে সামান্য নয়।

কিন্তু শিশুসাহিত্য প্রণয়ন কালে গল্পাংশের সরসতা এবং বর্ণনাচাতুর্য্য যেমন সাহিত্যিকের লক্ষ্যবস্তু, ভাষার, ভঙ্গীর (ইডিয়ম) এবং শব্দপ্রয়োগের বিশুদ্ধতা ও সুষমার (ব্যালান্স) প্রতিও তেমনি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা অমনোযোগী।

যদিচ এই বইখানি অন্যান্য বইয়ের মত এই বিষয়ে বেপরোয়া নয় তবু এই খুঁৎগুলি বইখানিতেও কিছু কিছু আছে।

উদাহরণস্বরূপ কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল। যথা:—

১। হসন্তের অযথা প্রয়োগ, যথা—পাগ্‌লা; বোস্‌ সাহেব; দেখ্‌ছিলেন; সর্‌ষে; ভাব্‌ল ইত্যাদি।

২। সহজ চলতি বাংলার সঙ্গে কেতাবী বাংলার সাধু শব্দের বিষম প্রয়োগ যথা—আর এর বদলে এবং; ওঠে র বদলে উঠে ইত্যাদি।

৩। সহজ মোলায়েম শিশুরোচন বাংলার মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ; যথা—দাসত্ব, শিক্ষানবিশী, পরক্ষণেই, উদ্দেশ্য, অপকর্ম্ম ইত্যাদি।

৪। শিশুদের বইয়ে চিত্রের মূল্য অল্প নয়; অথচ ছবির মধ্যে প্রচ্ছদপটখানি ও ভৈরবের তাড়া করার ভঙ্গী দুটি মাত্র মোটামুটি ভাল। অন্য ছবিগুলি খারাপ এবং বীণার ছবি কাঠের পুতুলের মত। এই ত্রুটি প্রকাশকের—লেখকের নয়। আজকালকার দিনে এ রকম খারাপ ছবি ছাপার কোন অর্থ হয় না। প্রকাশক একখানা চমৎকার নক্সা করা জাজিমের উপর যেন এক এক ধাবড়া কালি ঢেলে দিয়েছেন।

অন্য কোন দেশে শিশুদের প্রতি এই রকম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবার দুঃসাহস কোন প্রকাশকের হওয়া সম্ভব হ'ত না।

এই সব সামান্য ও অমার্জ্জনীয় ত্রুটি সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং বর্ণনাভঙ্গীর মাধুর্য্যে বইখানি সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে। আশা করি এর পরের সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হবে।

ছাপা আর কাগজ ভালই।

শৈলেনবাবুর হাত আছে। শিশুসাহিত্যে এক দিন তাঁর নাম হবে ব'লে আশা করছি।

শ্রীজীবনময় রায়

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস—দাশনগর, (বেঙ্গল)

অনুমোদিত মূলধন ...	১০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১৪,০০,০০০৲ ঊর্দ্ধে
আদায়ী	৭,০০,০০০৲ ঊর্দ্ধে
ডিপোজিট্	১২,৫০,০০০৲ ঊর্দ্ধে।

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট :—
গভর্ণমেণ্ট পেপার ও
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১,০০,০০০৲ ঊর্দ্ধে

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি

সুদের হার :—কারেণ্ট···১%
সেভিংস···২%
ফিক্সড্ ডিপোজিটের হার আবেদনসাপেক্ষ।

শাখাসমূহ :—ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, নিউ মার্কেট, শ্যামবাজার, সিলেট, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, জামসেদপুর, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সমস্তিপুর।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়।

SACHIDA
নারীর স্বাস্থ্য নিটোল করে
অশোক কর্ডিয়েল
ভাইটামিন যুক্ত
বন্ধ্যাত্ব, প্রদর, রজঃকষ্ট প্রভৃতি
যাবতীয় স্ত্রীরোগের আদি ঔষধ
বহু প্রকার নকল হইয়াছে
ডাঃ প্রসূর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা

কৌতুক-কথা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

৫১টি ছোট ছোট হাসির গল্প। ইহার কতকগুলি আমাদের দেশে মুখে মুখে প্রচলিত, অন্যগুলি বিদেশী পত্রিকাদি হইতে সংগৃহীত অথবা স্বকপোল-কল্পিত। অবসর বিনোদনের পক্ষে মন্দ নহে।

অঞ্জলি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸০।

ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। 'সৌন্দর্য্য', 'উষার উত্থান' এবং 'যৌবনপ্রবাহ' কবিতা তিনটি ভাল লাগিল। ভাষায় ও ভাবে সরল মাধুর্য্য আছে। অনুবাদ-কবিতাগুলি সরস হয় নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সদ্‌গুরু সঙ্গে কুলানন্দ—শ্রীব্যোমকেশ কোঙার। ভূমিকা—ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম. এ, ডি-লিট লিখিত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরকুমার শাস্ত্রী, ১ নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫৫+।০+।০। মূল্য ১।০ মাত্র।

লেখক শ্রীমৎ কুলানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। কিন্তু শিষ্য হইলেও লেখকের নানা কারণে গুরুর সহিত সঙ্গ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি শ্রীমৎ কুলদানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ' গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে কেবল মাত্র ব্রহ্মচারীজীর জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; স্থূল ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্মপিপাসুগণ এই পুস্তকে ধর্ম্ম-জীবন গঠনের অনেক উপকরণ পাইবেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

গীতা ও গীতার্থ-বোধিনী—শ্রীবসন্তকুমার দাস, বি,এ, বি,এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীসুবিনয়কুমার পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক বিদ্যাশ্রম, শিলং হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকগুলি ও তৎসমূহের পদ্যানুবাদে ব্যাখ্যা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদে গীতার উপদেশের মূল ভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গী যথাযথভাবে রক্ষিতহইয়াছে। স্থানে স্থানে শব্দার্থ-বোধক ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকে অনেক ছাপার ভুল আ[illegible] পরিশিষ্টে সুবোধিনী টীকায় উল্লিখিত শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী গীতা-মাহাত্ম্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

গীতামৃত—ডাঃ বিধুভূষণ পাল, এল, এম, এস কর্ত্তৃক প্রণীত এবং ৩৯।৫এ গোপালনগর রোড, পোঃ আলিপুর হইতে শ্রীনবেন্দুভূষণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ (মূল সংস্কৃত শ্লোক সহিত) গীতার পদ্যানুবাদ। যাঁহারা গীতার মূল শ্লোকগুলি পড়িতে ও বুঝিতে অপারগ, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

অনুবাদে গীতাতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থশেষে গীতোল্লিখিত বীরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, কিন্তু গ্রন্থে গীতা-মাহাত্ম্য সন্নিবিষ্ট হয় নাই। আশা করি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মায়ের
এবং
শিশুদের জন্য
ক্যালকেমিকো'র
নিম টুথ্ পেষ্ট
নিম দাতনের সর্ব্বগুণ সংরক্ষিত অভিনব দাঁতের মাজন। দাঁত শক্ত করে, মাঢ়ি দৃঢ় হয়। দাঁতের রোগে কখনও কষ্ট পেতে হয় না।
ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

উপনিষদের আলো—অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

ইহা উপনিষদের আলোর পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হওয়াতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই পুস্তক পাঠকদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। পুস্তকের আয়তন ৩০ পৃষ্ঠা বাড়িলেও মূল্য বাড়ে নাই। প্রথম সংস্করণের বর্ণাশুদ্ধি কয়টি এই সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

বলীদের গল্প—শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৮৪।

আলোচ্য বইখানিতে লেখক বহু ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যায়ামবিদ্ ও কুস্তিগীরদিগের কাহিনী ও তাঁহাদের ব্যায়াম-কৌশল প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক স্বয়ং একজন ব্যায়ামবিদ্ এবং পুস্তকবর্ণিত বলীদিগের সংস্পর্শে আসিবার ও তাঁহাদের ব্যায়ামকৌশল প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং এই কারণে প্রত্যেকের দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিখ্যাত বলীদিগের গল্প বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের নিজের অতি অল্প বয়সে ব্যায়ামচর্চার দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও নানা বাধা, অসুবিধার মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যায়ামসাধনা পাঠকের মনকে চমৎকৃত করে। বিখ্যাত বলীদিগের বহু চিত্র বইখানিতে মুদ্রিত হইয়াছে। আশা হয়, বাঙ্গালী যুবকগণ বইখানি পাঠ করিবেন ও আরও অধিক সংখ্যায় স্বাস্থ্যগঠনে মন দিবেন।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

ঘাত-প্রতিঘাত— উপন্যাস। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভবন, বজ্‌বজ্। মূল্য আড়াই টাকা।

নিজের পরিচয় গোপন করিয়া পিতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বিরিঞ্চিমোহন দরিদ্র কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করেন। পিতা হরমোহন স্ত্রী-আচার-বহির্ভূত এই বিবাহকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন না ও পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। ইতিমধ্যে লতার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় একমাত্র শিশু-সন্তান লইয়া সে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনী হরমোহন পুত্রবধূকে অস্বীকার করিলেও তাহার ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে গোপনে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির অর্থসাহায্য লইয়া পল্লীসমাজে আন্দোলন সুরু হয় এবং কুৎসার বিষে লতা ও লতার মা জর্জ্জরিত হইতে থাকেন। একদা লতা এই অর্থসাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া শিশুপুত্র ও মাকে লইয়া মাতুলালয় পরিত্যাগ করে। তার পর আরম্ভ হয় কঠোর জীবন-সংগ্রাম। জীবন-যুদ্ধের এই অংশে তেজস্বিনী লতার চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সে চরিত্র চিত্রণে লেখকের দরদও পরিস্ফুট। কিন্তু এই কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া সমাজ-সংস্কারের তথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নূতন নরনারীর ভিড়ে ও মতবাদের বাহুল্যে লতা চরিত্রটি অতঃপর নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; যদিও সেবিকা মাতৃরূপে মাঝে মাঝে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং পরম ত্যাগে শেষ পর্য্যন্ত সে মহিমময়ী। গ্রন্থকার প্রাচীনপন্থী নহেন, সংস্কার-পন্থী। নিজ আদর্শকে রূপ দিবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, এবং তাহাতেই মূল কাহিনীর গতি ব্যাহত হইয়াছে। তা ছাড়া কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রায় সুদীর্ঘ হইয়াছে; কাহিনীকে খর্ব্ব করিয়া পাঠকের কৌতূহল স্তিমিত করিবার ইহাও একটি হেতু।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাহসের নেশা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০১। মূল্য ৷৷০।

বিনয় নামে একটি সাহসী স্কুলের ছেলের কীর্ত্তি লেখক সহজ সরল ভাষায় বইখানিতে বর্ণনা করিয়াছেন। বিনয়ের সাহসের তারিফ করি, কিন্তু যে-সব পরিবেশের মধ্যে তাহার সাহসের পরিচয় দেখানো হইয়াছে তাহার কোন-কোনটিতে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার সাহস স্থানে স্থানে সাহসিকতার সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বালসুলভ চাপল্যের কিনারায় গিয়া পৌছিয়াছে। গজেন্দ্রবাবু সুলেখক। ছেলেরা তাঁহার নিকট হইতে আরও উৎকৃষ্টতর বস্তু আশা করে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৬১৫) প্রকাশিত "জন্মদিনে" শীর্ষক প্রবন্ধটির লেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
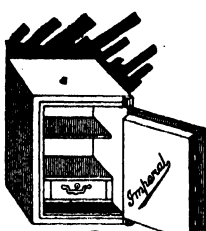
'ইম্পিরিয়েলের'
প্রস্তুত সিন্দুক, আলমারী, ষ্ট্রং রুম-ডোর
এবং তালা বিশেষ-মজবুত ও নিরাপদ
পত্র লিখিলে মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।
ফোন-বি-বি ৪১১৮
ইম্পিরিয়েল সেফ ম্যানুঃ কোং
PROP:- DAYS INDUSTRIES LTD.
১০৫-হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ষ্টীল লৌহ হইতে প্রস্তুত।
চোর ডাকাতে-ভাঙ্গিতে পারে না

রবি-বকুল

[রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধদিনে নবদিল্লী বৌদ্ধ বিহারে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান]

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

১৭ই আগষ্ট—শ্রাবণ সংক্রান্তির সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধদিনে মহাকবির স্মৃতির উদ্দেশে নবদিল্লীর বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে স্থানীয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও রবীন্দ্র-ভক্তগণের উপস্থিতিতে একটি বকুল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

রবি-বকুল রোপণ অনুষ্ঠান
ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী ঔগ্রায়ণ (প্রধান পুরোহিত বৌদ্ধ বিহার, নবদিল্লী)

স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান প্রাচীন-কালে ভারতে প্রচলিত ছিল, আধুনিক যুগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রবর্ত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই ভাবে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান আর কোথাও হইয়াছে কি না জানি না, তবে নবদিল্লীর বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে এই বকুল বৃক্ষটির সঙ্গে সঙ্গে মহাকবির অমর নাম চিরদিন সকলের মনে অম্লান হইয়া থাকিবে।

প্রথমে বিহারের বাঙালী ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী ঔগ্রায়ণ একটি কমণ্ডলু ও খনিত্র একটি আধারের উপর স্থাপন করিয়া শিশু-বৃক্ষকে তিন বার পরিক্রমা করিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতের অতীত দিনে দত্তাত্রেয়, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বহু বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব ও বিলয় ঘটিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের মত বোধিসত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। তাঁহার নিজের মহাপরিনির্ব্বাণ তাঁহার কাছে দুর্লভ ছিল না, কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতের জনমণ্ডলীর হাত ধরিয়া পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে। সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী জানাইলেন যে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ বকুলগাছই নির্ব্বাচিত হইল তাহার কারণ বকুলের মধ্যে আছে বাংলার স্মৃতি, বাংলার নিজস্ব সুগন্ধ, বকুল শাখাপ্রশাখা বিস্তারে বৃহৎ বনস্পতির রূপ লইয়া ছায়া বিস্তার করিবে, পুষ্প বর্ষণ করিবে, সৌরভ বিকিরণ করিবে।

ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর উদ্বোধন-ভাষণের পর শ্রীমতী বীণা সেন কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীত গীত হইল।

অতঃপর সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ ডি. ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়ে বৃক্ষ রোপণ করিলেন। ডক্টর সেন খনিত্র দ্বারা বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা অর্পণ করিলেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কমণ্ডলু হইতে বারি নিষেক করিলেন।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ঋগ্বেদ হইতে নির্বাচিত সূক্ত পাঠ করিয়া শান্তিনিকেতনের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের সময় উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিলেন :—

রবি-বকুল রোপণ অনুষ্ঠান
(বামে) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার পত্নী

রবি-বকুল রোপণ অনুষ্ঠান
স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতেছেন

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবনম্।
ধন্যা মহীরুহা যেভ্যো নিরাশা যান্তি নার্থনঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া মূলবল্কল দারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাস ভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥
ছায়ামন্যস্য কুর্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।
ফল্যান্যপি পরার্থায় বৃক্ষা সৎপুরুষা ইব॥
হেতবঃ সম্পদাং লোকে কেতবঃ ধরণীশ্রিয়ঃ।
জীবতে কোহত্র জীবানাং জীবন্তু তরবোহক্ষতাঃ॥

মন্ত্রপাঠের পরে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্চারিত মাঙ্গলিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু দ্বারা পঠিত হইল—

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালক বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া; পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা গীতিকায়,
সন্ধ্যা বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণ মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠায়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই মহাপুণ্য দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের স্মৃতি হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে,
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল বকুল পরিমলে॥

মাঙ্গলিক পাঠের পরে বৃক্ষটির পরিক্রমা আরম্ভ হইল। প্রথমে সাতটি বালক বিউগল, বাঁশী ও ড্রাম সহযোগে সাত বার পরিক্রমা করিল। ইহার পরে সাতটি কুমারী ফুলের সাজি হস্তে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে সাত বার প্রদক্ষিণ করিল, তার পর সাত জন সধবা মহিলা বরণডালার উপকরণ লইয়া শঙ্খধ্বনিযোগে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া বৃক্ষকে বরণ করিলেন। অতঃপর ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ স্থানীয় সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দীপহস্তে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া বৃক্ষকে অভিনন্দন করিলেন। প্রদক্ষিণ সময়ে আবহ সঙ্গীতে "প্রণাম নিও, হে মোর প্রিয়" সঙ্গীতটি ধ্বনিত হইতেছিল।

প্রদক্ষিণ সমাপ্তির পরে ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী ঔগ্রায়ণ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিয়া বৃক্ষটির নামকরণ করিলেন—"রবি-বকুল।"

পরিশেষে শ্রীমতী বীণা সেনের নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে "প্রণাম নিও" গানটি সম্পূর্ণ ভাবে গীত হইল।

অনুষ্ঠানান্তে সমবেত দর্শকগণ রবি-বকুলের পাদমূলে মৃত্তিকা অর্পণ ও জলসেচন করিলেন।

রবি-বকুল রোপণ অনুষ্ঠান
(বামে) পুষ্পসাজি-হস্তে কুমারীগণ.
(দক্ষিণে) বরণেচ্ছু মহিলাগণ

মহিলা-সংবাদ

ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল সংক্রান্ত মহিলা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পূর্ণিমা বসাকের মৃত্যুতে মাত্র উক্ত স্কুলটিই ক্ষতিগ্রস্ত হইল না। বাংলা দেশের বিধবা ও নিঃসহায় নারী-কুলের তিনি মাতৃস্বরূপা ছিলেন। ১৯২১ সালে বি. টি. পাস

পূর্ণিমা বসাক

করার পরই উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপনবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ফিরিয়া আসার পরও, নিজের সমগ্র সাংসারিক উন্নতির কথা ভুলিয়া, ঐ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন; এবং ঐ সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত কুশল কর্ম্ম-প্রেরণা তাঁহাকে বাংলা তথা সর্ব্বভারতীয় নারী ও শিশু-শিক্ষার নানা সংগঠনধর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ কর্ম্মযোগে যুক্ত করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরি-চালক-সঙ্ঘের তিনি এক জন সর্ব্বজনপ্রিয় অপরিহার্য্য সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিরাড়ম্বর ব্যক্তিত্বে, অশ্রান্ত কর্ম্মশীলতায়, স্বভাবজাত করুণায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সদাপ্রসন্ন পবিত্রমধুর চরিত্রে তিনি ঘরে ও বাহিরে সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁহার শান্তকরুণাপূর্ণ সুমধুর চরিত্র ও সুচারু কর্ম্ম-নিষ্ঠা আধুনিক শিক্ষিতা নারীগণের আদর্শ হউক।

তাঁহার বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র—উক্ত ট্রেনিং কলেজটি তাঁহার নাম-যোগে পরিচিত হইলে শোভনরূপে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইবে।

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট এম্ বি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী মুকুলিকা দত্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী মুকুলিকা ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্স পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। প্রাথমিক এম্‌, বি পরীক্ষায় বোটানীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণপদক পান; ইহা ব্যতীত প্রতিযোগিতামূলক গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি ও মেরি চন্দ বৃত্তি লাভ করেন। শ্রীমতী মুকুলিকা কলিকাতার হাটখোলা দত্ত-বংশের কন্যা।

শ্রীমুকুলিকা দত্ত

তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

শ্রীঅশোকা বসু

শ্রীমতী অশোকা বসু কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস-সি পরীক্ষায় বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী অশোকা ডোরাণ্ডা (রাঁচী) গার্ল্‌স স্কুল হইতে এম ই ও রাঁচি বালিকা-শিক্ষাভবন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। ইনি ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত টাকী-জালালপুর গ্রামের বিখ্যাত বসু-বংশের শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, এম এ, মহাশয়ের কন্যা।

গৌহাটী কটন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী অমিয়া রায় এবার প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি-এ অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীঅমিয়া রায়

মোহমুক্ত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাসনা উদ্দাম ছিল যত দিন প্রাণে
দাবদগ্ধ মৃগসম এখানে সেখানে
ছুটাছুটি করিয়াছি দুঃসহ জ্বালায়।
কে যেন রাখিয়াছিল জলের তলায়
সজোরে চাপিয়া মাথা। সন্ধ্যার গগনে
মেঘে মেঘে এত রঙ—দেখি নি নয়নে!
বনে বনে এত গান—কানে শুনি নাই।
বসন্ত আসিয়া ডেকে গিয়াছে বৃথাই।
জানি না কখন কার মায়ামন্ত্র লেগে
শৃঙ্খল পড়িল খসি! উঠিলাম জেগে
রাতের দুঃস্বপ্ন হ'তে। বহুদিন পরে
শুনিনু পাখীর কণ্ঠ! শূন্য হ'তে ঝরে
আলোর অমৃতধারা! সুন্দর ভুবন
আমার ললাটে রাখে কোমল চুম্বন।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।